পা র্থি ব
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পার্থিব

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

রা-স্বা

বন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম

পার্থিব/শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

অনেকের গল্প
অসুখের পরে
আদম ইভ ও অন্ধকার
আলোয় ছায়ায়
আলোর গল্প, ছায়ার গল্প
আশ্চর্য ভ্রমণ
উজান
উপন্যাস সমগ্র (১ম-১০ম)
ঋণ
কাগজের বউ
কাপুরুষ
কালো বেড়াল সাদা বেড়াল
কীট
কোনও দিন এরকমও হয়
কোলাজ
ক্ষয়
খেলনাপাতি
গতি
গয়নার বাক্স
গুহামানব
ঘটনাক্রমে
ঘুণপোকা
চক্র

দ্বিতীয় সত্তার সন্ধানে
ধন্যবাদ মাস্টারমশাই
নরনারী কথা
নানা রঙের আলো
নীরে লোক
উপরের লোক
নীলু হাজরার হত্যারহস্য
পরিহাটির হরিণ
পারাপার
পিদিমের আলো
প্রজাপতির মৃত্যু
ও পুনর্জন্ম
ফজল আলি আসছে
ফুলচোর
বনদেবী ও পাঁচটি পায়রা
বাঁশিওয়ালা
বিকেলের মৃত্যু
ভুল করার পর
মাধব ও তার
পারিপার্শ্বিক
মানবজমিন
ম্যাডাম ও মহাশয়
যাও পাখি

চুরি
চোখ
জাদুনল
জাল
ঝাঁপি
দশটি উপন্যাস
দিন যায়
দূরবীন
দ্বিচারিণী
রহস্য সমগ্র
লাল নীল মানুষ
শিউলির গন্ধ
শ্যাওলা
সতীদেহ
সন্ধি প্রস্তাব
সাঁতারু ও জলকন্যা
সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে
হৃদয়বৃত্তান্ত

শ্রীঅলোক চক্রবর্তী (সুনুদা)
শ্রদ্ধাস্পদেষু—

সূচিপত্র

২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২
৫৩
৫৪
৫৫
৫৬
৫৭
৫৮
৫৯
৬০
৬১

৬২
৬৩
৬৪
৬৫
৬৬
৬৭
৬৮
৬৯
৭০
৭১
৭২
৭৩
৭৪
৭৫
৭৬
৭৭
৭৮
৭৯
৮০
৮১
৮২
৮৩
৮৪
৮৫
৮৬
৮৭
৮৮
৮৯
৯০
৯১
৯২
৯৩
৯৪

৯৫
৯৬
৯৭
৯৮
৯৯
১০০
১০১
১০২
১০৩
১০৪
১০৫
১০৬
১০৭
১০৮
১০৯
১১০
১১১
১১২
১১৩
১১৪
১১৫
১১৬
১১৭
১১৮
১১৯
১২০

১

বাদামতলায় রামজীবনের পাকা ঘর উঠছে ওই। সোঁদা স্যাঁতা মেঘলা সকালের ম্যাদাটে আলোয় ও যেন বাড়ি নয়, বাড়ির ভূত। চারদিকে বড় বড় দাঁতের মতো ইটের সারি যেন খিঁচিয়ে আছে। গায়ে ভারা বাঁধা। দেড় মানুষ সমান দেয়াল খাড়া হতে বছর ঘুরে গেল। এখন দেয়ালে শ্যাওলা ধরেছে, ভারার বাঁশ পচতে চলল। গেল মঙ্গলবার গো-গাড়িতে সিমেন্টের বস্তা এসেছে অনেকগুলো। খাটের নিচে সেগুলো ডাঁই হয়ে আছে। ছাদ কি আর ঢালাই হবে? বিষ্ণুপদ যে গতকাল রাতে কালঘড়ি দেখেছে। ও একবার দেখলে আর কথা নেই। দরিয়া পেরোনোর সময় ঘনিয়ে এল।

কালঘড়ির কথা এরা কেউ বিশ্বাস করবে না। তাই বলেওনি কাউকে বিষ্ণুপদ। কথাটা বুকে নিয়ে, কৌটোর মুখ আঁট করে বন্ধ রেখে বসে আছে। আর কৌটোর মধ্যে প্রাণভোমরা চক্কর মারছে বোঁ-বোঁ করতে করতে। বেরোনোর পথ খুঁজছে। একটা রন্ধ্র পেলেই পগার পার।

আজ এই মেঘলা সকালে, হাওয়ায় বৃষ্টির ঝাপটায় দাওয়ায় বসে বাদামতলার দিকে কাহিল চোখে চেয়ে আছে বিষ্ণুপদ। পারলি না তো বাপ, পেরে তো উঠলি না। তোর ঘর রোজ আমাকে মুখ ভ্যাংচায়, থাকবি বুড়ো? আয়, থাক এসে।

রামজীবনের দোষ কি? জোগাড়-যন্তর কি চাট্টিখানি কথা! এটা জোটে তো সেটা জোটে না, দুশো এল তো চারশো বেরিয়ে গেল। নাকের জলে চোখের জলে হয়ে রামজীবন তবু বাপ আর মাকে পাকা ঘরে রাখবে বলে জান বড় কম চুঁইয়ে দেয়নি। তা তার ভাগ্যটাও এমনি। এবার সব জোগাড় হল তো অলক্ষুণে বর্ষা কেমন চেপে ধরল দুনিয়াটাকে। ডাইনীর এলো চুলের মতো চেপে থাকে মেঘ। সারাদিন। একদিন একটু রোদ ওঠে তো হঠাৎ ফের ভুষোকালি মাখানো মেঘ থমথম করে ওঠে দিগন্তে। তারপর হাওয়া দেয়। রণপায়ে চলে আসে বৃষ্টি। টিনের চালে দিনরাত নাচুনে শব্দ। ঘরময় বাটি, কৌটো, ছেঁড়া বস্তা পাতা। চালের পুরনো টিন চালুনির মতো হয়ে এল। ক'টা ফুটোর জল সামাল দেওয়া যায় বাপ! নিত্যিনতুন ফুটো দিয়ে জল পড়ছে ঘরে। পাকাঘর এই হল বলে, আশায় আশায় এবার আর ঘরের টিন মেরামত হয়নি। হেমেন মিস্ত্রি কয়েক জায়গায় পুটিং ঠেসে দিয়েছিল শুধু। বর্ষার তোড়ে সে সব পুটিং কবে ভেসে গেছে।

বিষ্ণুপদ যে জীবনে ঘড়ি মেলা দেখেছে তা নয়। বিষ্ণুপদর ঘড়িই নেই। কাল শেষরাতে সে ঘড়িটা দেখতে পেল। কালো, গোলপানা, মস্ত বড়। তাতে দুখানা সাদা কাঁটা। একটা বড়, আর একটা ছোটো। কাঁটা দুখানা বাঁই বাঁই করে ঘুরে যাচ্ছে। তারপর ঘুরতে ঘুরতে গতিটা কমে এল। খুব কমে এল। তারপর একেবারে থেমে

আসতে লাগল। বড় কাঁটা এক পাক মারলে ছোটো কাঁটা এক ঘর এগোয়, এটাই নিয়ম। বিষ্ণুপদ দেখল, বারোটা ঘরের মধ্যে একটা মাত্র বাকি। বড় কাঁটা খুব ধীরে ধীরে পাক খাচ্ছে আর ছোটো কাঁটাটা শেষ ঘরের দিকে এগোচ্ছে।

কথাটা একমাত্র যাকে বলা যায় সে হল, রামজীবনের মা। নয়নতারা রান্নাঘরে।

বুঝলে একমাত্র নয়নতারাই বুঝবে। বিষ্ণুপদর সব কথা নয়নতারাই একমাত্র বুঝতে পারে। পৌনে একশ বছর বেঁচে আছে বিষ্ণুপদ, নয়নতারা তার সঙ্গে লেগে আছে নাহোক পঞ্চাশ বছর। পঞ্চাশ বছর ধরেই কাছে। বিষ্ণুপদ নিশ্চয়ই সারাদিনে সব কথা ঠিকমতো বলে না, ঠিক কথাও বলে না। কিন্তু নয়নতারা তার সব কথাই নেড়েচেড়ে ভেবে দেখে। কালঘড়ির কথাটাও নয়নতারা ফেলবে না।

লম্বা দাওয়ার উত্তরপ্রান্তে রান্নাঘর। ভেজা ঘুঁটে আর স্যাঁতানো গুল দিয়ে আঁচ তুলতে আজ সকালে দমসম হয়েছে সবাই। খুব ধোঁয়া হয়েছিল। এখন বোধহয় আঁচ উঠেছে। রান্নাঘর থেকে দুটো গলার আওয়াজও আসছে। একটা তর্ক বেধে উঠছে। ঝগড়ায় গড়াবে। ও দুজন হচ্ছে সেজো আর মেজো বউ। দুজনে প্রায়ই লেগে যায়। হাঁড়ি আলাদা হল বলে। এইসব ঝগড়া কাজিয়ায় নয়নতারা কখনও থাকে না। মাঝখানে পড়ে মিটমাটও করতে যায় না। আসলে নয়নতারা বড্ড ভীতু মানুষ। সবসময়ে সিঁটিয়ে আছে ভয়ে। মেজো বামাচরণের বউ শ্যামলীর জিভের যেমন ধার, গলার তেমনি জোর। সেজো রামজীবনের বউ রাঙা যে খুব ভালমানুষ তা নয়। তবে কমজোরি। হাঁপানী আছে। খুব ভোগে।

নয়নতারা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। হাতে একটা বড় সোলা কচু। বর্ষায় কচুঘেঁচুই সম্বল।

নয়নতারা কাছে এসে একবার বিষ্ণুপদর দিকে তাকাল। ভারী নিরীহ চোখ নয়নতারার। গরুর চোখ। বিষ্ণুপদ জানে, সে নিজেও তেমন বুদ্ধি রাখে না। তার বউ নয়নতারাও না। ভগবান তাদের একই ছাঁচে তৈরি করেছেন।

নয়নতারার কথা কম। কথা কওয়ার ধাতটাই নেই, কায়দাও জানে না। শুধু বিষ্ণুপদর সঙ্গেই যা একটু কয়। মৃদুস্বরে বলল, বৃষ্টি হচ্ছে। গায়ে ছাঁট লাগছে না তো! ঘরে গিয়ে বসলেই তো হয়।

ঘরখানা বড় আঁধার লাগে। একটু আলোয় বসে আছি।

তাহলে থাকো। একখানা চাদর এনে দিই, জড়িয়ে বোসো।

লাগবে না। এই বেশ আছি। কফ-কাশির ধাত তো নয়।

শরীর নিয়ে বড়াই করতে নেই। হতে কতক্ষণ। যা বাদলা হচ্ছে।

বিষ্ণুপদ কথাটা কইবার আগে ভণিতা করতে গিয়ে একটু কেশে নিয়ে বলে, তোমাকে একখানা কথা কইবার জন্য মন করছে। কবো?

বলো।

শেষ রাতে আমি কালঘড়ি দেখলাম। ব্যাপার সুবিধের নয়।

কালঘড়ি দেখলে?

তোমার মনে নাই, আমার ঠাকুর্দা দেখেছিল! সেই যে মাঘের শেষে যেবার ঠাকুর্দা চলে গেল।

নয়নতারার মুখখানা কেমন আরও বোকাটে মার্কা হয়ে গেল। বলল, মনে আছে।

ঠাকুর্দা ঘুম থেকে উঠেই সে কী হাঁকডাক। ওরে তোরা সব তাড়াতাড়ি রান্না-খাওয়া সেরে নে, আজ আর কেউ বেরোবি না ঘর থেকে, সবাই আমার কাছাকাছি থাক, আর গঙ্গাজল তুলসী চন্দনপাটা সব রাখ হাতের কাছে। সব মনে পড়ে?

পড়ে।

সেদিন শেষ রাতে ঠাকুর্দাও কালঘড়ি দেখেছিল। আমি মস্করা করে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন ঘড়ি ও ঠাকুর্দা? তা ঠাকুর্দা যা বলেছিল ঠিক হুবহু সেইরকম দেখলাম কাল রাতে। কালো একখানা চক্কর। তাতে দুটো সাদা কাঁটা কঙ্কালের হাতের মতো ঘুরে যাচ্ছে।

নয়নতারার চোখ দুখানা জুলজুল করছে। বেচারার এ দুনিয়াতে সব থেকেও কেউ নেই, একমাত্র বিষ্ণুপদ ছাড়া। এসব কথায় তার বুক উথাল-পাথাল হওয়ার কথাই। নয়নতারা বলে, সেই দিন তো আর ঠাকুর্দা মরেনি।

না। সাতদিনের মাথায় মরল। কি হবে কে জানে! আমিও দেখলাম।

কথাটা বলা ঠিক হল কিনা কে জানে! ও মানুষটাকে একটা উদ্বেগের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হল। নয়নতারা তো বিশেষ সুখে থাকেনি একটা জীবন।

বিষ্ণুপদ ফের বৃষ্টির ভিতর দিয়ে ময়লা আলোয় রামজীবনের ঘরটার দিকে চেয়ে রইল।

রামজীবনের আধখ্যাঁচড়া ঘর দাঁত বের করে খুব হাসছে। বাঁশের খাঁচায় আটকে আছে কতকাল।

ধপ করে উবু হয়ে বসে পড়েছে নয়নতারা। চোখে আঁচল। মেয়েদের কত যে কাঁদতে হয়। সংসারে রোজই এমন কিছু ঘটনা আছে যাতে মেয়েদের কাঁদতে হয়। নয়নতারাকে অনেক কাঁদতে দেখেছে বিষ্ণুপদ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, রামজীবনের ঘরখানা শেষ হলে বেশ দেখতে হবে কিন্তু।

নয়নতারা কিছু বলল না। ঘুনঘুন করে কাঁদছে। আকাশ আরও একটু কালো হয়ে গেল নাকি? আলোটা যেন মরে এল। বৃষ্টির সঙ্গে একটা দমকা হাওয়া আসছে। দমকে দমকে।

নয়নতারা ভেজা গলায় বলে, ওঠো, ঘরে যাও।

ঘরে যেতে ইচ্ছে নেই বিষ্ণুপদর। দাওয়ায় বসে এইরকম চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে আজ। জলেডোবা উঠোনের বাঁ ধারে করবী ফুলের গাছের তলা দিয়ে ওরা তাকে নেবে। তারপর আর ফিরে আসা নেই। আর ঘরবাড়ি নেই, সংসার নেই, নয়নতারা নেই। কেমন হবে তখন?

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, বুঝলাম না!

কী বুঝলে না গো?

কিছু বোঝা যায় না। অজান প্রান্তর পড়ে আছে সব। কত কি বোঝা গেল না। এই বলে নয়নতারার দিকে মায়াভরে তাকায় বিষ্ণুপদ। পঞ্চাশ বছরের বন্ধু। নয়নতারাও কি কিছু বোঝে! তারা দুটো বোকা মানুষ। কত কি ঘটে যায় চারদিকে, তাদের কাছে সব আবছা আবছা, ভয়-ভয়, কেমন-কেমন। নয়নতারাকে খুব ভাল কোনও কথা বলতে ইচ্ছে করে বিষ্ণুপদর। গাছের মতো ছায়া দিল এতকাল, বাসা বাঁধতে দিল, ছানাপোনা হল। এবার উড়ে যেতে দেয় কি করে? বড় মায়া যে!

তবে কালঘড়ির কথাটা এই বোকা মেয়েটাই বুঝবে। আর কেউ নয়।

মরার সময়টা চতুর্দশী পড়বে কি? ও সময়টা ভারী খারাপ। আজ কৃষ্ণপক্ষ সপ্তমী। বিষ্ণুপদর ঠাকুর্দা কালঘড়ি দেখার ঠিক সাতদিনের মাথায় গিয়েছিল। যদি সেই হিসেবে বিষ্ণুপদও মরে তা হলে চতুর্দশীই পায় সে।

চকবেড়ের হাট থেকে একখানা পকেট-পঞ্জিকা এনে দিয়েছিল রামজীবন। নয়নতারার দিকে চেয়ে বলল, পঞ্জিকাখানা দাও তো এনে।

কী দেখবে?

চতুর্দশীটা পাবো নাকি?

পঞ্জিকা দেখার দরকার নেই। ঘরে চলো।

আর ঘর। বলে বিষ্ণুপদ একটু হাসে। পুবের ভিটে থেকে কেতরে একটা ঢোঁড়া উঠোনের জলে নামল। গেছে শালার ঘরদোর ভেসে। বেরিয়ে পড়েছে হারা-উদ্দেশে। এইসময়ে ব্যাটারা বড্ড ঘরদোরে সেঁধোয় এসে। ঢোঁড়াই বেশী, তবে চক্করওলারাও আছেন।

দুপুর হয়ে এল। নাইতে যাও।

বিষ্ণুপদ অবাক হয়ে বলে, দুপুর কোথা? এই তত দশটা বাজল একটু আগে। বেলা এখনও ঢের আছে।

নয়নতারা বিনাবাক্যে ঘর থেকে পঞ্জিকাখানা এনে দিয়ে বলে, ওই দিনে আমিও যাবো।

বিষ্ণুপদ অবাক হয়ে বোকা মুখখানার দিকে চেয়ে বলে, কোথায় যাবে বলছ?

আমাকে একা ফেলে যাবে নাকি? এখানে কে আছে আমার?

বিষ্ণুপদ পঞ্জিকা ওল্টাল না। ভাববার মতো কথা। কারও যদি কেউ নেই তবে সংসারটা কি জন্যে? এতগুলো সন্তান, তাদের ছানাপোনা, এত থেকেও কেউ নেই নয়নতারার, সে ছাড়া?

বিষ্ণুপদ গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, আগুরি কিছু বলা ভাল নয়। যা হওয়ার যখন হওয়ার হবে। দুদিন এদিক আর ওদিক। এ তো ইচ্ছামৃত্যু নয়।

নয়নতারা কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে, স্বপন দেখনি তো?

তাই। তবে স্পষ্ট দেখলাম।

কেমন দেখতে?

কি? কালঘড়ির কথা বলছ?

হ্যাঁ, সেই অলক্ষুণেটা দেখতে কেমন?

সে খুব বড়। যেন আকাশটা জুড়ে দেখা দিল। বুকটা কেমন মোচড় মেরে খাঁ খাঁ করে উঠল। আঁধার-করা বিশাল একটা চাকা। দুটো সাদা লম্বা সরু হাত ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে।

ঠাকুর্দা তাই দেখেছিলেন?

অবিকল।

তাড়াতাড়ি নেয়ে খেয়ে একটু ঘুমোও। মাথাটা পরিষ্কার হবে, ওসব মনের ভূত নেমে যাবে।

মাথা পরিষ্কারই আছে।

রান্নাঘরে দুটো গলা চুপ মেরে গেছে। দিনটাই এমন স্যাঁতানো যে, মেজাজও সব ঠাণ্ডা মেরে যায়। গরম থাকতে চায় না কিছু।

ছানি কাটানো গেল না বলে বিষ্ণুপদর চোখ কিছু আবছা। পুলিন হোমিওপ্যাথির ওষুধ দিয়ে ছানিটা আটকে রেখেছে এক জায়গায়। নইলে এতদিনে চোখ একেবারেই অন্ধকার হয়ে যেত।

রামজীবন কাটাবে বলে ঠিক করেছিল। যা খরচ হত তাতে ঘরের খানিকটা ইট আর সিমেন্ট হয়ে যায়। বিষ্ণুপদ কাটাতে চায়নি। একা রামজীবন আর কত করবে?

চোখে এখনও অনেকটাই দেখতে পায় বিষ্ণুপদ। এই মেঘলা দিনের মরা আলোতেও কত কি দেখতে পায়। রামজীবনের আধখ্যাঁচড়া বাড়ি, নয়নতারার চোখের জল। পঞ্জিকাটা আর খুলল না বিষ্ণুপদ। চতুর্দশী পড়লেই বা কী করার আছে? ভেবে লাভ কি?

নয়নতারা ফের তাড়া দিল, ওঠো। বসে বসে ভাবতে থাকলে তোমার আরও শরীর খারাপ করবে। ওসব নিয়ে অত ভাবতে নেই।

বিষ্ণুপদ উঠল। পাকা ঘরটার দিকে আর একবার চাইল বিষ্ণুপদ। রামজীবন পেরে উঠল না।

কেউ কেউ পেরে ওঠে না। আবার কেউ কেউ পেরে ওঠে। যেমন কৃষ্ণজীবন। সাততলার ওপর আরামে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকে। বর্ষা-বাদলা হোক, ঝড়বাতাস হোক, খরা বান হোক, পরোয়া নেই।

মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, রামজীবন বুঝি বড় ভাইয়ের সঙ্গে রেষারেষি করেই তুলতে চেয়েছিল পাকা ঘরখানা। কিন্তু তাই কি পারে? কৃষ্ণজীবনকে ধরতে পারা কি রামজীবনের পক্ষে সম্ভব! সে যে বহুদূর এগিয়ে রয়েছে। রামজীবন তার নাগাল তো পাবেই না, বরং হেঁদিয়ে মরবে। তবু চেষ্টা তো করেছিল! বুকটা সেই কারণে একটু ভরে থাকে। মাতাল হোক কি আর যাই হোক, সারা দিনমানের কোনও না কোনও সময়ে বাপ-মায়ের কথা ভাবে তো।

আজ একটু সাবান দিয়ে চান করব, দেবে?

সাবান! আবার সাবান কেন! সাবান মাখলে বেশী চান হয়ে যাবে। যা বাদলা, বুকে ঠাণ্ডা বসে গেলে বিপদ।

রামজীবন একখানা গন্ধ সাবান এনে দিয়েছিল না! আছে?

সে তো কবেকার কথা। আছে। মাখে কে বলো? আমাদের বাংলা সাবানেই কাজ চলে যায়।

দাও, মাখি।

সাবানটা বর্ষা-বাদলায় বের করলে খরচ হবে খুব। জলে ক্ষয়ে যাবে।

আজ অত হিসেব কোরো না। দাও।

দিচ্ছি। কুয়োতলায় গিয়ে বোসো। বাক্সের তলায় রেখেছি। বের করতে হবে।

বিষ্ণুপদর বড় জানতে ইচ্ছে করে, সাবান জিনিসটা কী দিয়ে তৈরি হয়।

কত কি জানা হল না দুনিয়াটার। সব আবছা রয়ে গেল।

এই বর্ষায় কুয়ো একেবারে টৈটম্বুর। বালতিতে দড়ি না বাঁধলেও চলে। তবে কুয়োর চাকগুলো অনেক পুরনো। জোড় আলগা হয়ে কাদামাটি ঢুকে জল ঘোলা করে দেয়। চোত-বোশেখে বড় কষ্ট গেছে। কোন্ পাতালে নামাতে হত বালতি। কাদাগোলা জল উঠত, আর তাতে বিজবিজ করত পোকা।

বৃষ্টিতে কুয়োর ধারে বসে আনমনে চেয়েছিল বিষ্ণুপদ। তোড় কমে ভারী মিঠে ঝিরঝিরে ঝর্ণাকলের মতো জল পড়ছে এখন। একবার কৃষ্ণজীবন নিয়ে গিয়েছিল তার বাড়িতে। সাততলায় বাঁধানো ঘরদোরে যেন আলো

পিছলে যাচ্ছে। সেই বাড়ির বাথরুমে ঝার্ণা কলের নিচে বসে চান করেছিল বিষ্ণুপদ। তখন মনে হয়েছিল যেন বৃষ্টির মধ্যে বসে আছে।

মানুষ কত কল বানিয়েছে। আরও বানাচ্ছে। কলের যেন আর শেষ নেই।

উঠোনে সাইকেলের ঘন্টি। একটা নয়, তিন-চারটে সাইকেল। একটা হেঁড়ে গলা জিজ্ঞেস করল, রামদা নেই বাড়িতে?

রামজীবনের বউ ক্ষীণ গলায় বলে, না। সকালে বেরিয়েছে।

গেল কোথায়?

বলে যায়নি।

এলে বলে দিও বটতলায় যেতে। জরুরী কাজ আছে।

আচ্ছা।

কথাগুলো মন দিয়ে শুনল বিষ্ণুপদ। এরা সব কারা মাঝে মাঝেই রামজীবনের কাছে আসে তা জানে না বিষ্ণুপদ। দেখে বড় ভাল লোক বলে মনে হয় না। চেহারাগুলোই কেমন যেন রোখাচোখা। এই বৃষ্টিতেও কারও মাথায় ছাতা নেই। উঠোনে সাইকেল এসে থামে, সাইকেলে বসে থেকেই একটা হাঁক দিয়ে চলে যায়। কখনও নামে না, বসে না, বাড়ির কারও সঙ্গে কথাবার্তা কয় না। মনে হয় খুব কাজের লোক সব। খুব তাড়া আছে।

সাইকেল ঘুরিয়ে জলের মধ্যেই চলে গেল ছোঁড়াগুলো। কুয়োপাড় থেকে গাছপালার ভিতর দিয়ে, বৃষ্টির ভিতর দিয়ে ছানি-পড়া চোখে যতদূর দেখা গেল, চারজন।

এই দুনিয়াটা নিয়ে আর ভাববার কিছু নেই বিষ্ণুপদর। সে কালঘড়ি দেখেছে। সময় ফুরিয়ে এল। এখন চারদিক থেকে নিজেকে কুড়িয়ে তুলে এনে এক জায়গায় জড়ো করা ভাল। কে কি করছে, কার কোন্ মতলব, কে উচ্ছন্নে গেল এসব নিয়ে আর মাথা ঘামানো ভাল নয়।

রোজ বড় আশায় আশায় রামজীবনের ঘরখানার দিকে চেয়ে থেকেছে এতদিন। কৃষ্ণজীবনের ঝা-চকচকে ঘরদোরের মতো না হলেও পাকাঘর তো। এই গাঁ-গঞ্জে একখানা পাকাঘরে থাকারও একটা আরাম আছে। কিন্তু আর আশা নেই। ঘরখানা থেকে মনটাকে সরাতে হবে এইবার।

এই যে তোমার সাবান। কিন্তু বাক্স নেই, মোড়কের কাগজখানা ফেলো না। ওতে মুড়ে রাখা যাবে।

সাবানখানা হাতে নিয়ে চেয়ে থাকে বিষ্ণুপদ। কি দিয়ে যে কি বানিয়ে তোলে মানুষ। সাবানখান হাতে নিয়ে ভারী আহ্লাদ হল বিষ্ণুপদর। খুব হাসল সে। খুব হাসল।

সাবানের মজাই হচ্ছে তার ফেনায়। বগবগ করে ফেনা উথলে উঠবে তবে না সাবান। কিন্তু ফেনা তুলবে কি, গায়ে ঘষতে না ঘষতেই বৃষ্টিতে ধুয়ে যাচ্ছে সব। খামোখা ক্ষয়ে যাচ্ছে। নয়নতারা বুক-বুক করে আগলে রেখেছিল। থাক, মেখে কাজ নেই।

সাবানখানা কাগজে সাবধানে মুড়ে দাওয়ায় রেখে বিষ্ণুপদ হেঁকে বলল, তোমার সাবানখানা নিয়ে যাও।

নয়নতারা দৌড়ে এসে চাপা গলায় ধমক দেয়, সাবানের কথা চেঁচিয়ে বলতে আছে? বউদের কানে গেলে পাঁচটা কথা উঠে পড়বে। কে দিল, কোত্থেকে এল। রামজীবন চুপটি করে এনে দিয়েছিল।

বিষ্ণুপদ অপ্রস্তুত হয়ে বলে, তাও বটে। যাকগে, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন তুলে রাখো। জল ঢালতে ঢালতে আর একখানা সাইকেলের আওয়াজ পায় বিষ্ণুপদ। আওয়াজটা চেনা। পটলের ঝাঁ-কুরকুর সাইকেল। এই সাইকেল একসময়ে বিষ্ণুপদ নিজে চালাত। চালিয়ে সাত মাইল দূরে একখানা প্রাইমারি স্কুলে পড়াতে যেত। তারপর কৃষ্ণজীবন চালিয়েছে, বামাচরণ চালিয়েছে, রামজীবন চালিয়েছে, শিবচরণ চালিয়েছে। এখন চালায় পটল।

সাইকেলটা উঠোন অবধি এসে থামল। সেজ বউ ছুটে এল কোথা থেকে। ভয়ের গলায় বল্‌ল, ওরে শিগগির নিতাইকে গিয়ে একটা খবর দে। ওরা আবার এসেছিল।

কারা মা?

বটতলার ওরা। নিতাইকে এখনই খবর দিতে হবে।

নিতাইদাকে তো দেখলাম কলোনীর মোড় পেরিয়ে কোথায় যাচ্ছে। সঙ্গে কারা সব আছে।

দৌড়ে গিয়ে খবরটা দিয়ে আয় বাবা। কেন যে রোজ আসছে এরা কিছু বুঝতে পারছি না। এক্ষুনি যা।

যাচ্ছি। কিন্তু গিয়ে বলবটা কি?

বলিস বটতলার ওরা তোর বাবাকে খুঁজতে এসেছিল।

তাতেই হবে?

সকলের সামনে বলিস না। আড়ালে ডেকে চুপিচুপি বলিস।

কুয়োতলা থেকে সবই শুনতে পেল বিষ্ণুপদ। গায়ে জল ঢালল না অনেকক্ষণ। ভেজা গায়ে বসে রইল। সব জায়গা থেকে নিজেকে তুলে আনা কি সহজ কাজ?

রামজীবন কিছু পাকিয়ে তুলেছে। বটতলা তো এতকাল ভাল জায়গাই ছিল। শীতলার থান আছে। সবাই বলে জাগ্রত দেবী। একসময়ে এই জায়গার নামই ছিল শীতলাতলা। গাঁয়ের নাম বিষ্টুপুর বললে কেউ কেউ বলে, কোন্ বিষ্টুপুর গো! শীতলাতলা বিষ্টুপুর?

সেই শীতলাতলায় এখন আড্ডা হয়েছে। খারাপ খারাপ লোক এসে জুটেছে। কাছ ঘেঁষে বাসরাস্তা হওয়ার পর থেকেই অধঃপতন। কাঁচাপয়সার কারবার আছে।

পটল ফের সাইকেল ঘুরিয়ে বেরিয়ে গেল।

দাওয়ায় চালের তলায় দাঁড়িয়ে গামছাটা নিংড়ে নেয় বিষ্ণুপদ। মাথা মোছে, গা মোছে। মুছতে মুছতে অনেক কথা ভাবে। চারটে সাইকেল। চারটে আবছা লোক। হেঁড়ে গলা। সেজো বউ ভয় পেয়েছে। রামজীবনের কি কোনও বিপদ?

বৃষ্টিটা ফের চেপে এল। একরকম ভাল। বৃষ্টিতে সব ধুয়ে যাক। যত ভাবনা-চিন্তা, যত পাপ-তাপ সব ধুয়ে যাক।

আজ অনেকটা ভাত বেড়ে এনেছে নয়নতারা। বলল, ভাল ঘানির তেল আছে, একটু ভাতে মেখে খাবে নাকি?

তেল-ভাত বিষ্ণুপদর বেশ পছন্দ। সঙ্গে লঙ্কা আর নুন। বলল, দাও একটু। ভাতটা একটু বেশী মনে হচ্ছে।

খাও। কচুরমুখি সেদ্ধ, বেগুনের ঝোল আর ডাল। এই আছে আজ। হবে এতে?

খুব হবে।

খেয়ে উঠে বিষ্ণুপদ একটু ঘুমলো। শরীর কিন্তু খারাপ লাগছে না। শ্বাস ঠিক আছে। নাড়ীও ঠিক আছে। কোথাও কোনও গড়বড় টের পায় না সে। তবু কালঘড়িটা চোখের সামনে ভাসছে।

একখানা মোটে ঘর আছে আর। দুটো কাঁটাই সেদিকে ঘুরছে।

জেগে দেখল, পুলিন ডাক্তার বসে আছে জলচৌকিতে।

হল কি গো বিষ্ণুপদ? কালঘড়ি না কী যেন দেখেছ!

পুলিনের বয়স বিষ্ণুপদর সমানই হবে। বিষ্ণুপদ কথাটা পছন্দ করল না। নয়নতারার কথাটা ফাঁস করা উচিত হয়নি। এরা কেউ তো বুঝতে চাইবে না ব্যাপারটা।

বিষ্ণুপদ একটা হাই তুলে বলে, ডাক্তার কি আর সব সারাতে পারে?

সারাবার মতো কিছু থাকলে সারাতে পারবে না কেন? কিন্তু তোমার সারাটা কি? রোগটা কোথায়?

বিস্মুপদ মাথা নেড়ে বলে, রোগটোগ কিছু নেই। এ হচ্ছে ফুরিয়ে যাওয়া। ঘড়ির দম শেষ হয়, দেখনি?

দম দিলে ফের চলে।

বিগড়ালে দম আর নেবে কি?

তুমি কি বিগড়েছ ভাই?

মনে তো হয়।

লক্ষণ তো মিলছে না। থাকগে, হাতটা দাও, নাড়ী দেখি।

বিষ্ণুপদ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাতখানা বাড়াল। পুলিন নাড়ী দেখতে জানে কিনা তাতে ঘোর সন্দেহ আছে বিষ্ণুপদর। এ বিদ্যে সোজা নয়। জানুক না-জানুক, পুলিন ছাড়া তাদের আর ভরসাই বা কে?

হাতখানা রেখে দিয়ে পুলিন বলে, কিছু হয়নি তোমার। নাড়ী দিব্যি টনটনে আছে।

এখনও আছে। নাড়ীটাড়ীতে কিছু বোঝা যাবে না হে।

তবে কিসে বোঝা যাবে? এটা একটা বিজ্ঞান, মানো তো!

তা মানে বিষ্ণুপদ। মানুষ কত কিছু জানে, কত খবর রাখে, কত ওষুধপত্র বের করে ফেলেছে। বিষ্ণুপদ অজান জিনিস সব মানে।

তবে কি জানো পুলিন সব জেনেও কিছু যেন অজান থেকেই যায়। এই দেহ-যন্ত্রটার মধ্যে কত কলকব্জা বলল তো! কী সাংঘাতিক সব কাণ্ড।

সেসব তো তোমাকে একদিন আমিই বুঝিয়ে দিয়েছিলাম।

সে কথাই তো ভাবি। দেহের মধ্যে কত কী পুরে দিয়েছেন ভগবান।

ওষুধ দিচ্ছি। খেয়ো।

কিসের ওষুধ? অসুখ তো কিছু নেই বললে?

তবু দিচ্ছি। ভাবনাচিন্তা কমবে। ঘুম হবে। খিদে হবে।

সে সব তো হচ্ছেই।

২

বাসটা এয়ারলাইনস্ অফিসের কাছাকাছি এসেছে বলে টের পাচ্ছিল চয়ন। ঠাসা ভিড়ের মধ্যে সে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে। একটু আগে সে একজনের কব্জিতে ঘড়ি দেখতে পেয়েছিল। বিকেল পৌনে ছটা। সাড়ে ছ'টার মধ্যে গোলপার্কের কাছে মোহিনীদের বাড়িতে তার পৌঁছোনোর কথা। পৌঁছে যাবে বলে আশাও করছিল সে। সবই ঠিক চলছিল। বাস পাওয়া, বাসে ওঠা, পৌনে ছটা—এসব মিলিয়ে মিশিয়ে বিকেলটা ভালয় ভালয় কেটে যাচ্ছিল প্রায়।

কিন্তু হল না। ভ্যাপসা গরমে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ে চলন্ত ডবলডেকারের নিচের তলায় মানুষের গায়ে সেঁটে থেকেও সে আচমকা চোখের সামনে সেই নির্ভুল কুয়াশা দেখতে পেল। ঘন সাদা কুয়াশা। দুটো সরু রেল লাইন সেই কুয়াশায় উধাও হয়ে গেছে। আবছায়া একটা সিগন্যাল পোস্ট! ঝিক করে সিগন্যাল ডাউন হল। কুয়াশার ভিতরে কিছু দেখা যায় না। শুধু একটা রেলগাড়ির এগিয়ে আসার শব্দ পাওয়া যায়। ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক।

বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা আপনা থেকেই কেঁপে কেঁপে ওঠে চয়নের। ঝিক ঝিক ট্রেনের শব্দের সঙ্গে এক তালে।

আঙুলটা কেঁপে উঠতেই আতঙ্কিত চয়ন প্রাণপণে ভিড় কাটিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করতে থাকে। দুর্বল শরীরে সে এক অসম্ভব চেষ্টা। তার চারদিকে মানুষের দেয়ালে ফাটল ধারনার জন্য যে শক্তির দরকার তা তার এমনিতেই নেই। তার ওপর শরীরে যে কাঁপন উঠে আসছে সেটা ইতিমধ্যেই তার শরীরের আনাচে কানাচে সতর্কবার্তা পাঠিয়ে দিয়েছে। সমস্ত শরীর হাড়িকাঠে ফেলা বলির পাঁঠার মতো নির্জীব আত্মসমর্পণের দিকে ঢলে পড়ছে।

একটু নামতে দিন! একটু নামতে দিন দাদা! কাতর কণ্ঠে একথা বলতে বলতে চয়ন প্রাণপণে চেষ্টা করছে দরজার দিকে যেতে। দরজা বেশী দূরেও নয়। তিন চার ফুটের মধ্যে। তবু মনে হয়েছে কী ভীষণ দূর!

নামবেন! তা এতক্ষণ কী করছিলেন। বলে কে একজন ধমক দেয়।

বাধ্য হয়েই চয়ন তার অভ্যস্ত মিথ্যে কথাটা বলে, আমার বমি আসছে ভীষণ! একটু নামতে দেবেন!

এই কথাটায় বরাবর কাজ হয়। বমিকে ভয় এবং ঘেন্না না পায় কে? ভীড়ের মধ্যে একটু ঢেউ ঢেউ খেলে যায়। মানুষের শক্ত শরীরগুলো নমনীয় হয়ে যেতে থাকে।

যান দাদা যান! তাড়াতাড়ি এগিয়ে যান।

অনেক সময় হয়, এই কাঁপন ওঠার সঙ্গে সঙ্গে খোলা হাওয়ায় দম নিলে কাঁপনটা ধীরে ধীরে কমে যায়। সেটা ক্বচিৎ কদাচিৎ। কিন্তু অভ্যাসবশে চয়ন এই অবস্থাটা দেখা দিলেই খোলা হাওয়ার দিকে ছুটে যায়।

আজ কোনও সৌভাগ্যসূচক দিন নয় তার। স্টপে নেমেই সে বুঝতে পারে, বাঁ হাত ঝিঁঝি ধরার মতো অবশ হয়ে আসছে। কাঁপন ছড়িয়ে যাচ্ছে সর্বাঙ্গে। সে চোখে কুয়াশা দেখছে। শ্রবণ ক্ষীণ হয়ে এল। সে একজন অস্পষ্ট পথচারীকে বলল, দাদা, একটু হেলপ করবেন? আমি এপিলেপটিক—

কে শুনল বা বুঝল কে জানে! ডান হাতটা বাড়িয়ে সে একটা কিছু ধরার চেষ্টা করল। কিছু ধরল কিনা বোঝা গেল না। তবে এ সময়টায় তার সব শক্তি জড়ো হয় ডান হাতের মুঠোয়।

এ সময়ে তার ডান হাত বড় বিপজ্জনক। মুঠো করে কিছু ধরলে আর তা ছাড়ানো যায় না, যতক্ষণ না জ্ঞান ফিরছে। একবার অজ্ঞান হওয়ার মুহূর্তে সে কণিকার ডান হাত চেপে ধরেছিল। তারপর অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। কণিকার আতঙ্কিত চিৎকারে বাড়ির লোক ছুটে আসে এবং দৃশ্যটা দেখে তারাও ভয়ংকর ঘাবড়ে যায়। মুঠো থেকে কণিকার কজি ছাড়াতে না পেরে তাদের কেউ কাপড় কাচার কাঠের মুগুড় দিয়ে মেরে চয়নের ডান হাত ভেঙে দিয়েছিল।

ভাঙা হাত জোড়া লেগেছিল যথাসময়ে। চিকিৎসার খরচও দিয়েছিল কণিকার অভিভাবকেরা। কিন্তু টিউশনিটা ছাড়তে হয়েছিল চয়নকে। দেড়শ টাকার টিউশনি!

এখন সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের ভিড়ে সেরকমই কিছু আবার ঘটতে পারত। মুঠোয় কিছু ধরতে পারেনি ভাগ্যিস। জ্ঞান হারানোর আগে সেই ক্ষীণ সান্ত্বনা নিয়ে সে খাড়া থেকে কাটা গাছের মতো পড়ে গেল।

তারপর কুয়াশা আর কুয়াশা। একটা রেলগাড়ির ঝন ঝন শব্দ। তারপর সব মুছে যাওয়া।

জ্ঞান ফেরার পর বেশীর ভাগ সময়েই সে একটা পরিচিত দৃশ্য দেখতে পায়। চারদিকে মানুষের পা। অনেক ওপরে মানুষদের মুখ। অনেক মুখ। সব ক'টা চোখ তার ওপর নিবদ্ধ। আর টের পায়, তার মাথা মুখ সব জলে ভেজা। ভেজা জামায় জল, ধুলো, কাদা।

কলকাতায় এবার বৃষ্টি হচ্ছে খুব। ফুটপাথের জল সহজে শুকোয় না। একটা ছোট্ট জমা জলের গর্তে তার মাথাটা পড়েছে আজ। পা থেকে চপ্পল খসে পড়েছে কোথায়!

কে যেন বলল, কেমন লাগছে? উঠতে পারবেন?

মানুষকে তার খুব খারাপ লাগে না। এদের মধ্যে ভাল আছে, মন্দ আছে, দয়ালু আছে, উদাসীন আছে। কিন্তু কোনও মানুষ হঠাৎ এরকম পড়ে গেলে সকলেই জড়ো হয় চারপাশে। সবাই খারাপ নয়, এটাই যা একটা ভাল ব্যাপার।

চয়ন তার দুর্বল শরীর শোয়া অবস্থা থেকে টেনে তোলে, আগে লজ্জা করত। আজকাল তেমন লজ্জা করে না। এরকম তার অভ্যাস হয়ে গেছে।

একজনের দিকে চেয়ে সে স্তিমিত গলায় জিজ্ঞেস করে, কটা বাজে?

সোয়া ছটা।

তার মানে মোহিনীদের বাড়িতে যাওয়ার সময় নেই নাকি? যাওয়াটা খুব দরকার। মোহিনীর কাল ইংরিজি সেকেন্ড পেপারের পরীক্ষা। মোহিনীর বাবা গত পরশু একটু হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন।

সে উঠে বসার পর ভিড়টা পাতলা হচ্ছে।

কে একজন তার হাতের ওপরের দিকটা ধরে বলল, উঠতে পারবেন তো! তাহলে ধীরে ধীরে উঠে পড়ুন।

পারল চয়ন। আগে পারত না। আজকাল পারে। বাধ্য হয়ে পারতে হয়। তবে এই সময়টা এত দুর্বল লাগে যে মাথাটা অবধি ঘাড়ের ওপর লটপট করতে থাকে। হাত পা সব অবশ। শরীর জুড়ে ঝিঁঝির ডাক।

আমাকে ওই দেয়ালটায় ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিন।

পারবেন তো?

পারব। আমার প্র্যাকটিস আছে।

বলবান লোকটি তাকে দেয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে বলে, ট্যাক্সি নেবেন?

উদ্বেগের মাথায় চয়ন তাড়াতাড়ি বলে, না না। ট্যাক্সি লাগবে না।

বাড়ি যাবেন কি করে?

চয়ন বাড়ির কথায় শিহরিত হল। তার যদি সেরকম একটা বাড়ি থাকত যেখানে অসুস্থ শরীরে ট্যাক্সি নিয়ে গিয়ে নামলেই বাড়ির লোক ছুটে আসবে, ভাড়া মেটাবে এবং ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেবে?

আছে। এখনও মা আছে। ছুটে আসতে পারবে না বা ঘরেও নিয়ে যেতে পারবে না। তবু একমাত্র মা-ই ‘কি হল কি হল’ বলে চেঁচাবে। কাঁদবেও।

চয়নের সেই অর্থে বাড়ি নেই। দাদার বাড়িতে সে আর মা একরকম জোর করে আছে। একটা সুতোর মতো সম্পর্ক ঘরে আছে বটে, কিন্তু সেটা ঠিক থাকা নয়। উঠি-উঠি যাই-যাই ভাব সবসময়ে। দাদা আর বউদির ভয়, আর বেশীদিন থাকলে বাড়িটার ওপর তার এবং মায়ের একটা দাবী বা স্বত্ব দাঁড়িয়ে যাবে। তাই আজকাল তাদের তাড়াবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে তারা!

দেয়ালে ঠেস দিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে চয়ন। পারবে কি? মোহিনীর কাল ইংরিজি পরীক্ষা! যাওয়াটা দরকার।

যে লোকটা তাকে ধরে তুলেছে সে এখনও দাঁড়িয়ে, বাকিরা চলে গেছে।

লোকটা ভাল প্রকৃতির। বলল, ট্যাক্সি ভাড়া না থাকলে বলুন না, দিচ্ছি। সংকোচের কারণ নেই।

চয়ন মাথা নেড়ে বলে, না। এরকম আমার প্রায়ই হয়।

চিকিৎসা করিয়েছেন?

হোমিওপ্যাথি করাই! এটা ঠিক সারবার অসুখ নয়।

জানি। আমার ছোট বোনটার আছে।

লোকটাকে লক্ষ করে চয়ন! বেঁটে মতো, স্বাস্থ্যটা পেটানো, মাথায় একটু টাক আর গোঁফ, রংখানা কটা আর মুখে একটা সদাশয় ভাব আছে। বেশ লোক।

কোন দিকে যাবেন?

সাউথে।

সাউথ তো অনেক বড়। সাউথে কোথায়?

গোলপার্কের কাছে।

সেখানেই বাড়ি?

না, টিউশনি করতে যাই।

এ অবস্থায় সেখানে গিয়ে কি হবে? পড়াতে পারবেন?

পারব। আজ আর অজ্ঞান হবো না। দিনে একেবারের বেশী হয় না।

তার মানে কি দিনে একবার করে হয়? তাহলে তো সাংঘাতিক কথা!

না, রোজ হয় না। এক দুই সপ্তাহ পরে হয়। কখনও তারও বেশী গ্যাপ যায়।

আমার বোনটার মতোই। কি করেন?

টিউশনি।

আর কিছু নয়?

না। আর কি করব?

আমি সাউথের দিকেই যাব। আমার সঙ্গে যেতে পারেন।

তারও দরকার নেই। একাই পারব। একটু রেস্ট নিলেই হবে।

আপনার স্ট্যামিনা আছে মশাই। আমার বোনটার যেদিন অ্যাটাক হয় সারাদিন আর উঠতে পারে না। শুয়ে থাকতে হয়।

আমার শুয়ে থাকলে চলে না।

তা বলে—লোকটা একটু ইতস্তত করে কথাটা অসমাপ্ত রাখে।

চয়ন চোখ বুজে ঘন ঘন বড় শ্বাস নিতে থাকে। একমাত্র বড় বড় শ্বাসই তাকে তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক করে তোলে। একটু সময় লাগে, এই যা।

লোকটি দাঁড়িয়ে আছে এখনও। দয়ালু লোক। চয়ন চোখ মেলতেই বলে, কিছু খাবেন? এ সময়ে একটু গরম দুধ-টুধ খেলে ভাল হয়। কিন্তু দুধ এখানে বোধহয় পাওয়া যাবে না। অন্য কিছু খাবেন?

চয়ন লাজুক মুখে মাথা নেড়ে বলে, না না। এখন কিছু খেতে পারব না।

খুব দূর্বল লাগছে?

একটু লাগে।

পকেটে একটা নাম-ঠিকানা লেখা কাগজ রাখবেন। এপিলেপটিকদের ওটা রাখা দরকার।

চয়ন জবাব দেয় না। নাম-ঠিকানা লেখা কাগজ পকেটে রাখলেই বা কি লাভ হবে? কলকাতার পথচারী জনসাধারণের ওপর তার আস্থা অনেক বেশী। পথেঘাটে এই রকম প্রায়ই হয় তার। তবু দুবারের বেশী তার পকেটের টাকা-পয়সা খোয়া যায়নি। গেছেও সামান্যই। সেটা না ধরলে কলকাতার অনাত্মীয় জনসাধারণই তার দেখভাল করেছে। ঘন ঘন শ্বাস নিতে নিতে মাথা কিছু পরিষ্কার হল। লোকটা তার মুত্রে দিকে নিবিড় চোখে চেয়ে আছে। একটু লজ্জা করছে চয়নের। লোকটি একটু বেশীই দয়ালু! সে বলল, এবার আর ভয় নেই। আমি চলে যেতে পারব।

আমিও দক্ষিণেই থাকি। যাদবপুরে। একসঙ্গে যেতে আপত্তি আছে?

লাজুক চয়ন বলে, না না, আপত্তি হবে কেন! তবে ট্যাক্সির দরকার নেই।

দরকার থাকলেও পাওয়া যাবে কিনা সেটাই বড় কথা। আপনি আর একটু জিরিয়ে নিন বরং। এখনও হাঁফাচ্ছেন। টিউশনিতে কি আজ না গেলেই নয়?

কাল আমার ছাত্রীর পরীক্ষা। না গেলে কথা হবে।

ছাত্রীর বাবা খুব কড়া ধাতের বুঝি?

লজ্জিত চয়ন মাথা নেড়ে বলে, তা নয়। তবে টিউটরের তো অভাব নেই। সামান্য কারণে হয়তো ছাড়িয়ে দিতে পারে।

ক'টা করছেন?

তিনটে।

আমি আপনার মতো বয়সে দিনে ছ'-সাতটা করতাম। ভাল রোজগার ছিল। পরে হোম টিউটোরিয়াল খুলি। এখন চাকরি করি বলে টিউটোরিয়াল তুলে দিতে হয়েছে। আসুন, অন্তত একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক। তাতেও খানিকটা কাজ হবে আপনার।

লোকটার কব্জির ঘড়িটা বিরাট বড়। সেটা লক্ষ করছিল চয়ন। সাড়ে ছটা বাজে। আর দেরী করলে যাওয়াটা অর্থহীন হয়ে যাবে। সে মাথা নেড়ে বলে, আমার দেরী হয়ে যাবে।

বলতে একটু কষ্ট হল তার। লোকটা তার জন্য এতটা দরদ দেখাচ্ছে, মুখের ওপর না বলতে লজ্জা করছে। কিন্তু উপায় নেই।

লোকটা বুক পকেট থেকে একটা ছোটো নোটবই বের করে বলে, আপনার ঠিকানাটা অন্তত দিন। একজন সাধুর একটা মাদুন পেয়েছি। বোনটাকে ধারণ করিয়েছি গত পরশু। যদি উপকার পাওয়া যায় তবে আপনাকেও একটা জোগাড় করে দেবখন। কতরকম মিরাকল্ আছে মশাই। কী থেকে কী হয় কে জানে। আমার ঠিকানাটাও জেনে রাখুন। এই যে এল, আই. সি. বিল্ডিংটা দেখছেন এর চারতলায় মেশিন ডিপার্টমেন্টে আমি চাকরি করি। আশিস বর্ধন আমার নাম। এবার আপনার ঠিকানাটা আমায় বলুন।

চয়ন ঠিকানাটা বলল। তারপর অতিশয় সংকোচের সঙ্গে জানাল, বাড়িটা আমার দাদার। সেখানে—

সেখানে কী?

মানে সেখানে আমার বন্ধু বা পরিচিতরা ঠিক ওয়েলকাম নয়। আমি যদি বাড়িতে না থাকি তবে আমার বউদি খুব একটা পাত্তা দেন না।

লোকটি হাসল, বুঝেছি। আপনি কোন সময়টায় অ্যাভেলেবল্?

দুপুরবেলাটায় থাকি। বেলা বারোটা থেকে তিনটে।

লোকটা নোটবই পকেটে রেখে বলল, আশা করি আবার দেখা হবে। আপনি সংকোচ বোধ করছেন, নইলে আপনাকে গোল পার্ক অবধি পৌঁছে দিতাম। চলি।

লোকটা বোধহয় তাকে রেহাই দিতেই ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। যেন একটু স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল। মানুষের ভালবাসা, সহানুভূতি গ্রহণ করতে আজকাল তার লজ্জা হয় না বটে, কিন্তু খুব বেশীক্ষণ সে সইতে পারে না। শুধুই নতমস্তকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে যেতে যেতে সে আজকাল হীনমন্যতায় ভোগে। মানুষের জন্য উল্টে যদি কিছু করতে পারত সে!

ভাগ্যক্রমে পরের বাসটা দু' মিনিটের মধ্যেই পেয়ে গেল চয়ন। কষ্ট করেই সে এল, নাইন বাসের দোতলায় উঠল। এ বাসটা এসপ্লানেডে কিছুটা ফাঁকা হয়। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে বসার জায়গা পেয়েও যেতে পারে। অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর জ্ঞান ফিরলে তার বড্ড ঘুম পায়। এখন পাচ্ছে। চোখ জুড়ে আসছে বারবার! বসতে পারলে সে একটু ঘুমিয়ে নেবে!

আশিস বর্ধন নামটা তার মনে থাকবে। সে সহজে কিছু ভোলে না! না নাম, না মখ। তার স্মৃতিশক্তি চমৎকার। কিন্তু লোকটা যদি হুট করে তাদের বাড়িতে হাজির হয় তাহলে অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তার একজন উপকারী বন্ধু তার আরও বেশী উপকার করতে উপাযাচক হয়ে তাদের বাড়িতে গিয়ে অপমানিত হয়ে আসবে ভাবতেই সে সংকোচে মরে যাচ্ছে!

আগে অবশ্য ব্যাপারটা এরকম ছিল না। ভাল না হোক, বউদি অন্তত খুব খারাপ ব্যবহার বা অপমান করত না কাউকে। কিন্তু গোলমাটা পাকাল পাড়ার পটু।

মাস ছয়েক আগে তার দাদা আর বউদি মিলে তুমুল চেঁচামেচি আর অশান্তির পর চয়নকে আর মাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। বাড়িটা দাদার এবং দাদার পয়সাতেই মোটামুটি সংসার চলে। কিছু করার ছিল না তাদের। এক দিদি থাকে উল্টোডাঙা হাউসিং-এ, সেখানেই যেতে হত তাদের। গিয়ে কী হত কে জানে? তবে পোঁটলা-পুঁটলি বাক্স নিয়ে একরকম পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু সদর খুলে বেরোতেই এক বিপরীত দৃশ্য! সামনে পল্টু দাঁড়ানো, পিছনে পাড়ার বিস্তর ছেলে এবং কয়েকজন মহিলাও।

পল্টুই এগিয়ে এসে মাকে বলল, মাসীমা, ঘরে যান। চয়নদা, তুমিও ভিতরে যাও। আমরা না বললে খবদার বাড়ি ছাড়বে না।

পল্টু পাড়ার মোড়ল গোছের। তার ক্লাব আছে। মাঝে মাঝে রক্তদান শিবির, নাটক ইত্যাদি করে। তার প্রবল দাপটে পাড়ায় সাট্টার ঠেক আর দিশি মদের আস্তানা উঠে গেছে। পলিটিকাসও করে।

ভয়ে চয়ন তার মাকে নিয়ে দরজাতেই দাঁড়িয়ে রইল। ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা।

তাদের পাশ কাটিয়ে পটু ঘরে ঢুকে সোজা দাদার গলায় হাত দিয়ে চেপে ধরল দেয়ালে, এ পাড়ায় বাস করতে চান? যদি চান তাহলে এবার থেকে মা আর বেকার ভাইকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। করলে আপনাকেও এ বাড়ি ছাড়তে হবে। কথাটা আপনার বউকেও বুঝিয়ে দেবেন।

কথাটা বেশ নাটুকে এবং বীরত্বব্যঞ্জক বটে, কিন্তু ঝামেলা অত সহজে মেটেনি। বউদি ঝাঁপিয়ে পড়ল পল্টুর ওপর। তারপর অকথ্য গালিগালাজ। পাড়ার লোক ভিড় করে এল। পন্টুর বীরত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠল। পারিবারিক ব্যাপারে বাইরের লোকের নাক গলাননা কতটা যুক্তিযুক্ত তা নিয়েও কথা হতে লাগল। তবে মোটামুটি জনসাধারণের চাপে তারা রয়ে গেল দাদার বাড়িতে। সম্পর্কটা খুবই খারাপ হয়ে গেল এর পর। দাদা পন্টুর এই হামলা নিয়ে প্রবল আন্দোলন করতে লাগল। এমন কি গুণ্ডা লাগানোর চেষ্টাও করেছিল।

দাদার হাতে ছেলেবেলায় বিস্তর মারধর খেয়েছে চয়ন। বড় হওয়ার পর খায়নি। কিন্তু পল্টুর হামলাবাজির পর সেই রাতেই দাদা তাকে একটা লাঠি দিয়ে খুব পেটায়। সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল মার খেয়ে। পরে শুনেছে, বউদি একটা কৌটো ছুঁড়ে মেরেছিল মাকে।

এর পরও তারা আছে। বাড়িটা ছোটো এবং পুরোনো। এ বাড়িতে তারা ভাড়া থাকত একসময়ে। পরে বাড়িওলার কাছ থেকে দাদা সস্তায় কিনে নেয়। বাড়ি কেনার পর থেকেই দাদার ভয়, বেশী দিন এ বাড়িতে থাকতে দিলে চয়নের দাবী জন্মে যাবে।

এই ঘটনার পর থেকেই চয়নকে কেউ খুঁজতে এলে বউদি ভীষণ চেঁচামেচি করে। চয়নের নামও সহ্য করতে পারে না দুজন।

আশিস যেন অসময়ে গিয়ে হাজির না হয়, হে ভগবান! এইটুকু বলে এসপ্লানেড়ে একটা সীট পেয়ে বসেই ঘুমিয়ে পড়ল চয়ন। গভীর ক্লান্তির ঘুম।

গোল পার্ক টার্মিনাসে কন্ডাক্টর ডেকে তুলে দিল তাকে। মোহিনী তাকে দেখে আঁতকে উঠে বলে, কী হয়েছে চয়নদা! পড়ে গিয়েছিলেন নাকি? জামাকাপড় তো কাদায় মাখামাখি।

চয়ন যথাসাধ্য গম্ভীর হয়ে বলে, রাস্তা যা পিছল।

ইস, ভেজা জামাকাপড়ে থাকবেন?

কিছু হবে না। রোজ তো বৃষ্টিতে ভিজছি, এত জামাকাপড় পাবো কোথায়?

বাবার ধুতিটুতি কিছু দেবো?

চয়ন শিহরিত হয়ে বলে, না না। কিছু লাগবে না।

এ বাড়িতে বিকেলে দুখানা মাখন টোস্ট পাওয়া যায়। এক কাপ চা। কখনও কখনও অবশ্য টোস্টের বদলে বিস্কুট। আজ টোস্ট দুখানা তার বড় দরকার। খিদে পেয়েছে।

সে এক গ্লাস জল চেয়ে খেল এবং পড়াতে লাগল।

চয়নদা, আপনাকে কিন্তু অসুস্থ দেখাচ্ছে। ফ্যাকাসে লাগছে খুব। পড়ার মাঝখানে বলে ফেলে মোহিনী।

মৃগী রোগের কথা শুনলে এরা হয়তো আর রাখবে না তাকে। কণিকার বাড়ির তিক্ত অভিজ্ঞতা সে তো ভোলেনি। ভাঙা ডান হাতখানা তার আজও কমজোরি। ভারী জিনিস তুলতে পারে না।

সে মুখে একটু হাসির ছদ্মবেশ ধারণ করে বলল, না না, শরীর ঠিক আছে।

মোহিনীর বয়স পনেরো। বিপজ্জনক বয়স। এই বয়সে মেয়েরা বড় চঞ্চল হয়। চয়ন এসব জেনেছে টিউশনি করতে করতেই। তাই আজকাল সে তার কিশোরী ছাত্রীদের চোখের দিকে চায় না। জীবনের জটিলতা যত কম হয় ততই ভাল।

মোহিনী একটু উসখুস করে 'এক মিনিট আসছি' বলে উঠে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে মোহিনীর মা এলেন। হাতে এক গ্লাস কমপ্ল্যান আর দুটো টোস্ট।

মোহিনী বলছিল তোমার নাকি কি হয়েছে?

চয়ন বড্ড অপ্রতিভ হয়ে বলে, তেমন কিছু না। পিছল রাস্তায় একটা আছাড় খেয়েছি।

খুব লেগেছে?

সামান্য। জামাকাপড় নষ্ট হয়েছে জলকাদায়। অবশ্য শুকিয়েও গেছে এতক্ষণে।

শরীর ভাল আছে তো?

আছে।

এটা খেয়ে নাও।

চয়ন কৃতজ্ঞতায় মরমে মরে গেল। কিন্তু খিদের মুখে কী যে চমৎকার লাগল তার খাবারটুকু! বুকটা ঠাণ্ডা হল, জুড়িয়ে গেল।

পড়ায় সে ভালই। ইংরিজি আর অঙ্ক দুটোই ভাল পারে বলে টিউশনির অভাব হয় না। তবে বেশী টাকা দাবী করতে ভয় পায়।

৩

নতুন কেনা স্যুটকেসটার দিকে চেয়ে ছিল বীণাপাণি। দেখতে হুবহু চামড়ার জিনিস। কিন্তু বীণাপাণি জানে জিনিসটা পিচবোর্ডের। ওপরটা ঠিক চামড়ার মতো রং করা। সস্তার জিনিস। নিমাই তাতে পাটে পাটে নিজের জামাকাপড় গুছিয়ে নিচ্ছিল।

বীণাপাণির খুব অম্বলের রোগ আজকাল। সকালবেলাতেও টক জল বমি হয়েছে খানিকটা। বুক এখনও ঢক ঢক করছে তেঁতুলগোলার মতো অম্বলে। মাথাটা ঠিক থাকছে না। শরীরটা দুর্বল লাগছে। বিছানায় বসে সে একদৃষ্টে নিমাইয়ের স্যুটকেস গোছানো দেখছে। শুধু সুটকেস নয়, নিমাই গোছাচ্ছে তার আখের। এ দেশে মেয়ে হয়ে জন্মাননা যে কত বড় পাপ তা বীণাপাণির চেয়ে ভাল আর কে জানে! মাথাটা ধরে আছে খুব। চোখ ঝাপসা। বোধহয় চোখের জলেই হবে। কিন্তু কান্না নয়। বরং বুকে উথলে উঠছে রাগ। রাগের সাপ ছোবলাচ্ছে। বিষ ঢালছে শরীরময়।

বীণাপাণির রাগটা নিমাইও টের পাচ্ছে। তাই চোখে চোখ রাখছে না। মাথা নিচু করে খুব মন দিয়ে স্যুটকেস গোছাচ্ছে। তিনখানা ধুতি আর জামায় পাঞ্জাবিতে গোটা চারেক, সাকুল্যে এ ক'খানাই সম্বল। ওপরে দু'খানা লুঙ্গি আর একখানা গামছা পাট করে রাখতে যত সময় লাগা উচিত তার চেয়ে বেশী সময় নিচ্ছে। এই শেষ সময়টাতে বীণাপাণি কিছু বলবে, আস্কারা-দেওয়া, লাই-দেওয়া কোনও কথা, সেইজন্যই কি অপেক্ষা করছে? আগে, অর্থাৎ বিয়ের পর পর ওই বেঁটে রোগা কালো এবং অপদার্থ লোকটার মান ভাঙাতে পায়ে অবধি পড়েছে বীণাপাণি। তখন দুনিয়াটা একরকম ছিল, আজ সেই দুনিয়াটারই রং চটে, পলেস্তারা খসে তোবড়ানো চেহারাটা বেরিয়ে পড়েছে। কত কী ভাল লাগত তখন। এখন সবই বিস্বাদ।

এই মেনীমুখো মানুষটাকেই তার বাবা খুঁজে এনে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। বাবার মতে বড়ই ভাল ছেলে। শান্তশিষ্ট, স্থিরবুদ্ধি, চরিত্রবান। সবচেয়ে বড় কথা, মা-বাপের প্রতি ভক্তি আছে। ভগবানে বিশ্বাস আছে। চমৎকার কীর্তন গায়। শুধু পয়সাটারই যা অভাব। বড় জাগুলিয়ায় এক ঠিকাদারের গুদাম পাহারা দেয়। চাকরি পাকা নয়, তবে ঠিকাদারবাবুটি ভাল, স্নেহ করেন। চাকরির মেয়াদ বাড়তে পারে। পালপাড়ায় নিজেদের একখানা মেটে বাড়ি আছে, তিন-চার বিঘে জমি। সুতরাং মেয়েকে একেবারে জলে ফেলা হচ্ছে না। অন্তত অগাধ জলে নয়।

বীণাপাণি তখন কতটুকুই বা মেয়ে? বুদ্ধিটুদ্ধি কিছু পাকেনি, মা-বাপের ওপর নির্ভর। তবে বিয়ে নিয়ে একটা সুখের ভাবনা ছিল বড়। মিথ্যে বলবে না বীণাপাণি, বিয়ের পর সুখ হয়েছিল কিছুদিন। তার বুঝি তুলনা

নেই। বীণাপাণি এ কথাও বুকে হাত রেখে বলতে পারবে না যে, নিমাই লোকটা খারাপ। যদি মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবে তাহলেই বুঝতে পারে, এ লোকটার মনের জোর নেই বটে, কিন্তু দোষঘাটও বিশেষ নেই। নরম মনের মানুষ। সবসময়েই বিনয়ী বিগলিত ভাব। সেই কারণেই লোকে নিমাইকে ভালবাসে। ঠিকাদার নিরঞ্জনবাবুও বাসতেন। তবে তাঁর কাজটাই নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে। জাগুলিয়ার কাছে একটা রাস্তা তৈরির কাজ শেষ করে তিনি আসামে গেলেন আরও বড় কাজে। নিমাইকে নিতে চেয়েছিলেন, তবে বুড়ো মা-বাপ, ক্ষেতি-গেরস্তি, নতুন বউ ছেড়ে তিন চাশ টাকার ভরসায় অতদূর যাওয়ায় গা-ও বিশেষ নেই। জাগুলিয়ায় একখানা ফলের স্টল খুলেছিল নিমাই। তখনই তার ব্যারাম শুরু হয়। জ্বর, কাশি, বুকে ব্যথা। জল জমেছিল বুকে। এমন কিছু সাঙ্ঘাতিক রোগ নয়। আজকাল কত ওষুধ বেরিয়ে গেছে। কিন্তু ওই রোগের চিকিৎসা করতে গিয়েই দু'বিঘে জমি বেচে দিতে হল। হাঁড়ির হাল।

যে-সব ড্যাকরারা বক্তৃতা দিয়ে দেশ চালাচ্ছে, মানুষকে ন্যায়-অন্যায় নিয়ে জ্ঞান দিচ্ছে, তারা কি জানে গাঁয়ে গঞ্জে মাঠে ঘাটে লোকে রোগ-ভোগ খিদে-তেষ্টা বিপদ-আপদ নিয়ে কিরকম ভাবে বেঁচে আছে! আর কেমনতরো বেঁচে-থাকাটাই এটা? এই মলাম কি সেই মলাম বলে এই যে শ্বাসটুকু চালু রাখা—এর মধ্যে আবার ধর্ম-অধর্ম পাপ-পুণ্য ঢোকানোর কোনও মানে হয়? আকাশে যে আর এক ড্যাকরা থাকে তার তো নাকে তেল দিয়ে ঘুমোননা ছাড়া আর কোনও কাজ দেখতে পায় না বীণাপাণি। পাপ-পুণ্য কোলে করে বসে থাকলে কি ভাত জুটবে? বীণাপাণির ঘরের পাশ দিয়েই পেট-কোঁচড়ে পিস্তল নিয়ে এইটুকুন-টুকুন ছেলেরা প্রাণ হাতে করে যে-সব কাজ করতে যায় তা পাপ না পুণ্য তা কে বলে দেবে? পেট-ভাতের জোগাড় থাকলে যেত ওসব করতে? বেকারে ভরা দেশ, বাপে খেদায় মায়ে খেদায়, চা-বিস্কুট খাওয়ার, দাড়ি কামানোর অবধি পয়সা জুটতে চায় না, তা করবেটা কি? কোন ভগবান দেখবে তাদের? কোন সরকার? আছে নাকি তারা এদেশে?

নদেরচাঁদ লোকটা গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতা যে নয় সবাই জানে সে কথা। তার নামে লোকে দু-গাল ভাত বেশী খায়। নানা দোষ আছে তার, কিন্তু ওই বিপদের দিনে লোক বাছতে গেলে কি চলত? বিপদে যে পাপ-পুণ্য ভেসে যায়। ভগবানের যদি বিচার থাকত তাহলে পাপ-পুণ্যের নিক্তিখানা ধরার আগে কুলোর বাতাস দিয়ে আপদ-বিপদ রোগ-ভোগ তাড়িয়ে মানুষকে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে দিত। না বাঁচলে পাপ-পুণ্যি করবেটা কি?

ভগবানের কাজ ভগবান না করে যদি এক পাপীতাপী লম্পট এসে করে তবে সেই লম্পটই তখন বীণাপাণির ভগবান। নদেরচাঁদ তো ভগবানের মতোই এসে দাঁড়াল একদিন। তখন মেটে স্যাঁতসেঁতে ঘরে ধুঁকছে নিমাই। অ্যালোপ্যাথির পয়সায় টান পড়ায়, হোমিওপ্যাথি চলছে। পথ্যের জোগাড় নেই। জ্যেঠতুততা দেওরের বন্ধু নদেরচাঁদ উদয় হয়ে ব লল, বনগাঁর দিকে আমার কাকার একটা ব্যবসা আছে। তাতে একজন লোক দরকার। তবে পুরুষমানুষ হলে চলবে না। মেয়েছেলে চাই।

বীণাপাণি ডগমগে যুবতী। সে জানে মেয়েছেলে হয়ে জন্মানোর কিছু জন্মগত পাপ আছে। তার শরীরটা যে সব পুরুষেরই ভক্ষ্যবস্তু। যদি একটু দেখনসই হয় তাহলে তো কথাই নেই। ছেলে-বুড়ো সকলেই নরখাদকের মতো মনে মনে ঠোঁট চাটবে। এই হালুম-খালুম ভাবটা চারদিকে বড় টের পায় বীণাপাণি। কপালের দোষই

হবে, সে দেখতে ভাল! লম্বাটে গড়ন, রংখানাও ফার্সার দিকে, মুখের ডৌলটি নিখুঁত, দুটি টানা চোখ। নিজেকে কখনও আড়াল করেনি সে।

কথা হচ্ছিল নিমাইয়ের সামনে বসেই। বোকা শাশুড়িটাও ঘরে ছিল। এরা দুনিয়ার হালচাল কিছুই জানে না, বোঝেও না। লোকে অচেনা কথা বললে হাঁ করে চেয়ে থাকে। বোকা মাথায় কোনও ভাল বা মন্দের ঢেউ ওঠে না। এতদিন দুনিয়াতে কাটিয়েও দুনিয়াটা বড় অচেনা এদের কাছে। বীণাপাণিরও তো এর চেয়ে ভাল অবস্থা নয়। তবে সে নদেরচাঁদের চোখে একটা লোভানি দেখতে পেয়েছিল।

নিমাই বলল, ব্যবসাটা কিসের?

নানান জিনিসের। চালানি ব্যবসা। মাল আনা, চালান দেওয়া। পয়সা আছে।

শাশুড়ি বলে উঠল, বউমাকে দিয়ে হয়, ও বাবা নদেরচাঁদ?

খুব হয়। বউদি তো দিব্যি চটপটে মেয়ে। কাকা এরকমই খুঁজছে।

দেখবে নাকি বউমা?

বীণাপাণি জানে, এর মধ্যে একটা চক্কর আছে। তাকে গভীর জলে টেনে নামানোর জন্য কুমীর এসে ডাঙায় উঠেছে।

বাপের বাড়ির অবস্থা একটু ভাল হলে বীণাপাণি দুর্দিনে গিয়ে বাপ-ভাইয়ের ঠ্যাং ধরত। কিন্তু সে সুবিধে নেই। বউদিরা দাঁতে বিষ নিয়ে ফণা তুলে আছে। বাপ-মায়ের অবস্থা শোচনীয়।

বীণাপাণি সভয়ে বলল, কেমনধারা কাজ গো! আমি কি পারব?

নদেরচাঁদ উদাস গলায় বলল, মেয়েছেলেরই কাজ।

বোকা শাশুড়িটা নেচে উঠে বলল, দে বাবা নদেরচাঁদ, কাজটা করে দে। সবাই মিলে দুটি খেতে পাই তাহলে।

ভয়-ভাবনা-অনিশ্চয়তা নিয়েই একদিন নদেরচাঁদের সঙ্গে বনগাঁয় এল বীণা। কাকার সঙ্গে কথা বলে বিকেলেই ফিরে যাবে। বাসে বসেই নদেরচাঁদ বলে ফেলল, শোনো বউদি, নিমাইদা অবুঝ লোক বলে তার সামনে বলিনি। যে কাজে তোমাকে নামাতে চাইছি তা একটু অন্যরকম।

বীণা চমকে উঠে বলল, কিরকম? খুব মজার।

চাকরির একঘেয়েমি নেই। রংদার কাজ।

বনগাঁয়ে বিশ্ববিজয় অপেরা সবে ডানা মেলতে শুরু করেছে। বিশ্ববিজয় অপেরার স্বত্বাধিকারী বিজয় সাহাকে কেউ তার আসল নামে ভাল চেনে না। সবাই জানে কাকা বলে। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়স, কালো, লম্বা, ছিপছিপে চেহারা। অভিনয় তার নেশা। কলকাতার থিয়েটার পাড়া, যাত্রাপাড়া, ফিলমের স্টুডিওতে এতকাল ঘুরঘুর করেছে। সুযোগ পেয়েছিল কয়েকটা, কিন্তু সুযোগ এক কথা, উন্নতি আর এক জিনিস। শেষে একটা যাত্রাদলের চাকরি পেয়েছিল সামান্য মাইনের।

বনল না। তখন মাথায় রোখ চাপল, কলকাতায় আর নয়। দেশে বনগাঁয়ে ফিরে গিয়ে যাত্রাদল খুলবে। কলকাতার পেশাদারদের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে তবে ছাড়বে।

কিন্তু ভাবা আর করা তো এক কথা নয়। টাকা-পয়সার বন্দোবস্ত নেই, ভাল পালাকার কোথায় পাবে, গানবাজনার লোকই বা কোথা থেকে জুটবে, নটনটী জোটানোও কি সোজা কথা! কিন্তু সবার আগে দরকার টাকা।

নাটকের নেশাই কাকাকে পথ দেখাল। কাছেই বাংলাদেশ বর্ডার। চোরাইচালানের ব্যবসায়ে লোকে টাকা লুটছে। যাত্রাদল করতে হবেই, সুতরাং কিছু না ভেবেই সে চোরাইচালানের কাজে নেমে গেল। কাজটা বড় সহজ নয়। প্রথম প্রথম বিপদে পড়ত, মারধর খেত, অ্যারেস্টও হয়েছে। কিন্তু লেগে রইল। ধীরে ধীরে দল তৈরি হল, চোরাই ব্যবসার অলিগলি মুখস্থ হল, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পাকা ব্যবস্থা হয়ে গেল। সবচেয়ে বড় কথা, টাকা আসতে লাগল হাতে।

টাকা ওড়াত না সে। নেশাভাঙ ছিল না, জুয়া খেলত না, মেয়েমানুষের দোষ নেই। দিনরাত শুধু যাত্রার ভাবনা তার মাথায়। কলকাতার নামকরা অপেরাগুলোর ধোঁতা মুখ সে ভোঁতা করে ছাড়বে। মফস্বলের দল নিয়ে সে কাঁপিয়ে দেবে দেশ।

বিশ্ববিজয় অপেরা খুলেছে বছর দুই। গুটি কয়েক পালা করে একটু নামও হয়েছে। তবে সেটা কিছু নয়। বিরূপ চৌধুরীর হাতে পায়ে ধরে দুখানা পালার বায়না করেছে। ঐতিহাসিক পালায় বিরূপবাবুর জুড়ি নেই। গানের জন্য আকাশবাণীর পুরোনো এক গায়ককে ধরেছে। নিমাই পাল। কেউ পোঁছে না, কিন্তু নিমাইবাবুর অগাধ জ্ঞান। এইসব ফেলে দেওয়া লোককেই দরকার কাকার। কার ভিতর থেকে কোন প্রতিভা বেরিয়ে আসবে কে জানে!

প্রতিভা খুঁজবার নেশাটা ছিল বলেই কাকা নদেরচাঁদের আনা মেয়েটাকে প্রথম দর্শনেই ভাগিয়ে দিল না। নদেরচাঁদকেও সে একটু খাতির করে। তিন চারখানা বায়না করে দিয়েছে ছেলেটা।

মেয়েটা দেখতে ভাল। ছোটোখাটো পার্টে চলবে। তবে এখনও বড্ড গেঁয়ো আর জড়োসড়ো। ভয়ে আধখানা হয়ে আছে।

নদেরচাঁদ ধরে পড়ল, একে কাজ না দিলেই নয় কাকা।

বলতে নেই, প্রথম দর্শনেই এই কাকা লোকটিকে ভাল লেগেছিল বীণাপাণির। জন্মে সে অভিনয় করেনি। আসর-ভরা লোকের সামনে সে হয়তো কেঁদেই ফেলবে পার্ট করতে উঠে। তবে এই কাকা লোকটি যে আর পাঁচটা মতলববাজদের মতো নয়, এ যে যাত্রা-পাগল মানুষ, অন্য ধান্দা নেই, তা দশ-পনেরো মিনিট কথাবার্তর মধ্যেই বুঝতে পারল বীণাপাণি।

তবে বোকা-মাথার বুঝ, সেই বুঝকে তো আর বিশ্বাস নেই। এই তো নদেরচাঁদ চাকরির নাম করে নিয়ে এল তাকে, বুঝতে পেরেছিল কিছু বীণাপাণি?

শুধু একটা জিনিসই স্পষ্ট বোঝে সে, তার শরীরখানার দিকে সকলের নজর। মেয়েদের চারদিকে পাপের হাজারো পথ। যেদিকেই পা বাড়াও,পথ পায়ের নিচে হাজির হয়ে যায়!

সে বলেই ফেলল, এ কাজ আমি পারব না।

কাকা তার দিকে চেয়ে নিরাসক্ত গলায় বলল, ইচ্ছে না হলে জোর তো কেউ করছে না। জবরদস্তির কাজও নয় এটা। এসব আর্ট, ভালবাসার জিনিস। যদি টান না থাকে তাহলে পারবেও। না। তবে এসব কাজ

মানুষই করে, অভিনয় করতে তো আর স্বর্গ থেকে আসে না। চেষ্টা করলে পারা কঠিন নয়।

আমি ঘরের বউ, এসব যাত্রাপালায় নানা খারাপ ব্যাপার হয়, শুনেছি। মেয়েমানুষের ধর্ম থাকে না।

ধর্ম যে যার নিজের কাছে। আগেই তো বলেছি, জবরদস্তির কিছু নেই। বহু ছেলেমেয়ে ঘুরঘুর করে একটা পার্টের জন্য। এ বাজারে একটা সুযোগ পাওয়াই যে বড্ড কঠিন। কত মানুষকে ফিরিয়ে দিতে হয় রোজ। তোমাকে যে প্রথম চোটেই ফিরিয়ে দিইনি সেটা কিন্তু মস্ত ব্যাপার। তুমি চাইলে করতে পারো। শিখতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে, কষ্ট করতে হবে। এ লাইন খুব কঠিন। বাড়ি গিয়ে দেখ। রাজি থাকলে এসো। সামনের মাসেই পালা নামবে।

প্রথম দিন এর বেশী কথা হয়নি। কাকা ব্যস্ত লোক। সবসময়ই তার ঘরে ভিড়।

বাইরে এসে নদেরচাঁদ বলল, দিলে তো ডুবিয়ে! ওরকম বেঁকে বসলে কেন বলো তো! সারাক্ষণ যে পাখি-পড়া করে শিখিয়ে আনলুম।

শেখালেই হল! এক কথা বলে নিয়ে এলে, পরে দেখি আর এক ব্যাপার। তুমি ভীষণ খারাপ লোক।

এ বাজারে এ এক মস্ত সুযোগ তা জানো? কত বিদ্যেবুদ্ধি নিয়ে বেকার ছেলেমেয়েরা বসে আছে তা দেখছ না?

আমি এসব পারব না।

সে তো বুঝতেই পারছি। আমার বাসভাড়াটাই জলে গেল।

শেষ অবধি জলে গেল না। বাড়ি ফিরে সকলের নানা প্রশ্নে ভাসা-ভাসা জবাব দিয়ে সে গভীর রাত অবধি নিবিষ্ট হয়ে ভাবল। সামনে তার অনেক বিপদ। তার মধ্যেই যেন একটু ডাঙা জমি হল ওই কাকা।

পরের সপ্তাহে ফের বনগাঁয়ে নদেরচাঁদকে নিয়ে হাজির হল বীণাপাণি। কাকার সামনে সতেজে দাঁড়িয়ে অকম্পিত গলায় বলল, পার্ট দিন, করব।

তাহলে রোজ রিহার্সাল আসতে হবে। কঠিন কাজ। তোমার কোনও ট্রেনিং নেই। শিখতে সময় লাগবে, খাটতে হবে খুব।

আমাকে কত মাইনে দেবেন?

মাইনে! দল না দাঁড়ালে মাইনে আসবে কোথা থেকে? এ কি কলকাতার পেশাদার দল! শুধু পয়সার লালচ থাকে এসো না, তাতে লাভ নেই। অভিনয় অন্য জিনিস।

অন্য জিনিস তো বটেই। সিনেমা থিয়েটার কিছু দেখেছে বীণাপাণি। সিনেমার হিরো হিরোইনদের অনেক পয়সা আছে বলেও শুনেছে কিন্তু এ লাইন তার চেনাজানা জগতের বাইরে।

পারবে?

বীণাপাণি কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, আমার বরের খুব অসুখ। বাড়িতে হাঁড়ি চড়ছে না। আমার একটা ব্যবস্থা না করে দিলে কি করে পারব?

কাকা মৃদু হেসে বলে, সকলের গল্পই একরকম, বুঝলে? এদেশে কেউ সুখে নেই। সকলেরই নানা বিপদ। তবে সেসব সয়ে বয়ে এগিয়ে যেতে হয়।

কিন্তু নদেরচাঁদ আমাকে বলেছিল আপনি চাকরি দেবেন।

নদেরচাঁদ জানে না বলেই বলেছে। তবে তোমাকে আমি ঠকাব না। যদি লেগে থাকো, দল যদি দাঁড়ায় তবে ভালই পাবে। এখন অবশ্য থোক টাকা না দিলেও খাওয়া-পরা পাবে, থাকার জায়গা দেবো! কিছু হাতখরচ।

বীণা হাত পেতে কাকার দেওয়া পঞ্চাশটা টাকা প্রায় ভিক্ষে হিসেবে নিল। সেই টাকা পেয়ে শ্বশুরবাড়ির সকলেই খুশি। তাকে বনগাঁয়ে রহস্যময় চাকরিতে পাঠাতে কারও কোনও আপত্তি হল না। শুধু ধুঁকতে ধুঁকতে নিমাই বলল, বনগাঁ যে অনেক দূর!

নদেরচাঁদ বলল, কিসের দূর! দুনিয়াটা কি আর আগের মতো আছে নিমাইদা? লোকে কলকাতায় ঘুম থেকে উঠে রাত্তিরের খাবার আমেরিকায় খায়, তা জানো? দুনিয়াটা এই একটুখানি হয়ে এসেছে। পালপাড়া থেকে বনগাঁ যদি দূর তাহলে নাক থেকে কানটাও দূর।

ডাঙা থেকে কুমীরটা শেষ অবধি তাকে বিপদসঙ্কুল জলে টেনে নামালই। হাবুডুবু কিছু কম খেয়েছে বীণাপাণি! তবে না শক্তপোক্ত হয়েছে! বনগাঁয়ে তাকে আসতে হয়েছিল একা । যাত্রাদলের আর একটা মেয়ের বাড়িতে কাকা তার থাকার ব্যবস্থা করে দিল। তিন মেয়ে নিয়ে বিধবা মায়ের সংসার। বুড়ি একটু ভাল মানুষ গোছের। বড় মেয়ে একটা স্কুলে পড়ায়, সংসার তারই কাঁধে। মেজো একটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে বসে চলে গিয়েছিল, ফেরত এসেছে। ছোটো মেয়ে সীমা যাত্রাদলে ঢুকে পরে সিনেমায় নামবার স্বপ্ন দেখছে।

প্রথম প্রথম লজ্জা, ভয়, অনভ্যাস আর অস্বস্তিতে রিহার্সালের পর রিহার্সালে বকুনির পর বকুনি খেত বীণাপাণি। রাতে শুয়ে কাঁদত আর সীমা তাকে সান্ত্বনা দিত। একমাস তাকে খাটিয়ে জেরবার করে দিল কাকা। তারপর ভরাভর্তি আসরে একটা ছোটো রোলে সত্যিই নেমে পড়ল বীণাপাণি। কোনওরকমে পার্ট মুখস্থ বলে যেতে পারল।

কাকা তার মধ্যে কী দেখেছিল কে জানে! এর পরও তাকে দল থেকে তাড়ায়নি, বরং উঠে-পড়ে লাগল তাকে তৈরি করতে। শুরু হল বেদম খাটুনি। কাকা বলতে লাগল, এবার বড় রোল দিচ্ছি, কিন্তু দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই রোলটা ভাববে। ভাববে তুমি দময়ন্তী, তুমিই দময়ন্তী, দময়ন্তী ছাড়া আর কেউ নও।

তাই ভেবেছিল বীণাপাণি। দ্বিতীয়বার একই পালায় অন্য ভূমিকায় নেমে তার আর বিশেষ ভয় হল না। খানিকটা সহজভাবে পার্ট করে গেল। নল-দময়ন্তী দিয়ে চাঁদপাড়া, চাকদা, বড় জাগুলিয়া, কাঁচড়াপাড়ায় বেশ লোক টানল বিশ্ববিজয় অপেরা। ততদিনে পাকাপোক্ত হয়ে উঠল বীণাপাণি। নেশা ধরল অভিনয়ের।

সবচেয়ে বড় কথা হাতে টাকা আসতে লাগল। আর বেনোজলে ভেসে আসতে লাগল যতেক কামট কুমীর। ডাঙা থেকে তাকে জলে টেনে নামানোর অপেক্ষায় যারা ছিল। তাদের কাছে মেয়েছেলে মানে মেয়েছেলেই। তার বেশি আর কিছু নয়। কে আর্ট করে, কে লেখাপড়ায় ভাল, কার গানের গলা আছে বা লেখার হাত আছে সে সব নিয়ে বেশির ভাগ পুরুষেরই মাথাব্যথা নেই। মেয়েমানুষের গুণকে তারা মোটেই দাম দিতে চায় না। তাদের কাছে শরীরটাই আসল কথা।

শরীর বাঁচাতে বীণাপাণিকে কম কূটবুদ্ধি খাটাতে হয়নি। দু-একজন তো খুন করারও হুমকি দিয়েছিল।

শরীরের জন্য একজন পাহারাদার দরকার ছিল। সে চৌকিদার স্বামীর চেয়ে ভাল আর কে হতে পারে? নিমাই যতই সামান্য মানুষ হোক, তবু কলেরা-বসন্তের টীকার মতো স্বামীরও কিছু উপকার আছে। যাত্রায় নামবার ছ' মাস বাদে নিমাইকে আনতে গিয়েছিল বীণাপাণি। সে বনগাঁয়ে একখানা ঘর ভাড়া করেছে, নতুন চৌকি কিনেছে।

বীণাপাণির টাকায় ওষুধ-পথ্য করে নিমাই তখন শক্ত অসুখ থেকে খাড়া হয়েছে। ফলের দোকানে বসেছেও। বীণাপাণিকে দেখে তার অভিমান আকাশে উঠল বুঝি। বাঁকা গলায় বলল, আমাকে আর তোমার কিসের দরকার।

বীণাপাণি অবাক হয়ে বলে, দরকারের কথা ওঠে কেন? আমি তোমার বিয়ে—করা বউ, নাকি?

সে ছিলে কোনওদিন।

আজ নয়?

নিমাই মাথা নিচু করে বলল, আজ আর আমি কে! তোমার কত মোসাহেব জুটেছে।

মোসাহেব অত সস্তা নয়। যাত্রায় নামলেই বুঝি মোসাহেব জোটে? এখনও আমাকে কেউ পাত্তাই দেয় না। সবে তো একটু-আধটু শিখেছি, আড় ভাঙছে।

যাত্রায় নামলে কেন? আমি তো বেঁচে ছিলুম।

বাঁচতে না। ঠিক সময় ওষুধপত্র না পড়লে মরতে হত। ভাগ্যিস পালা দুটো ভাল চলল, তাই কাকা খুশি হয়ে মাস কয়েক হল তিনশো টাকা মাইনে দিচ্ছে।

এই কাকাটি কে বলল তো। খুব শুনছি তার কথা।

কাকার কথা বলার সময় কেমন যেন ভক্তিতে গদ্‌গদ হয়ে পড়ে বীণাপাণি। ভারী গলায় বলল, ওরকম মানুষ দেখিনি। নাটক আর অ্যাকটিং নিয়ে সারাক্ষণ বুঁদ হয়ে আছে। অন্য কোন দিকে মন নেই।

কিন্তু আমি শুনেছি লোকটা স্মাগলার।

সেটাও মিথ্যে শোনোনি। কাকা নাটকের জন্য বুঝি সব করতে পারে। এই যেমন তোমাকে বাঁচানোর জন্য আমি হায়া লজ্জা বিসর্জন দিয়ে যাত্রায় নামলুম, ঠিক তেমনি। ভালবাসার জিনিসকে বাঁচাতে মানুষ সব করতে পারে। কাকা স্মাগলিং করেছে যাত্রার দল বানাবে বলে।

তাহলে তাকে কি ভাল লোক বলা যায়?

একবার চলো না বনগাঁয়ে, দেখা হোক, কথাবার্তা হোক, তারপর নিজেই বুঝতে পারবে কেমন লোক।

আমি এই বেশ আছি বীণা।

বোকা শ্বশুর আর শাশুড়ি ছেলে আর ছেলের বউয়ের আড়াআড়ি দেখে ভয় খেল। খুব স্বাভাবিক। বউ টাকা রোজগার করছে, তারা সেই টাকায় দুটি খেতে পরতে পাচ্ছে। ছেলে আর বউতে আড়াআড়ি ছাড়াছাড়ি হলে তাদেরই বিপদ। পেটে টান পড়বে।

দুই বুড়োবুড়ি তখন ছেলেকে নিয়ে পড়ল, কাজটা খারাপ কেন হবে? সিনেমা থিয়েটারে আজকাল কত বাবুঘরের মেয়েরা নামে। পাশ-টাশ করা সব মেয়ে। ওসব এখন আর কেউ ধরে না।

শাশুড়ি গোপনে তাকে এমন কথাও বলল, মনিবকে খুশি রেখো। মনিব অন্নদাতা ভগবান। শরীর যদি এঁটোকাঁটা হয়ে পড়ে তো গঙ্গায় ডুব দিয়ে এলেই সব পাপ ধুয়ে ফর্সা।

গুণ একখানা ছিল নিমাইয়ের। মা-বাপের ওপর ভক্তি। শেষ অবধি যে সে বনগাঁয়ে বউয়ের ঘর করতে এল সে ওই মা-বাপের জন্যই। তাদের কথায় বা আদেশে ততটা নয়, যতটা তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য।

শ্বশুরমশাইয়ের খুব ইচ্ছে, বনগাঁয়ে গিয়ে ব্যাটা-বউয়ের সঙ্গে থাকে। সেটা হতে দিল না নিমাই। বলল, আগে আমি গিয়ে সব বুঝে আসি, তারপর দেখা যাবে।

বনগাঁয়ে এসেই যে নিমাই সব বুঝতে পারল, এমন নয়। তবে বীণাপাণি যে ভারী ব্যস্ত মানুষ এবং তাকে যে সেই গ্রাম্য সরল বোকা বউটির মতো আর পাওয়া যাবে না সেটা টের পেতে তার দেরী হল না। এতে তার অভিমান হতে লাগল, সে বেকার লোক, সারাদিন কাজ নেই বলে বসে থাকে, আর তার বউ সকাল-বিকেল রিয়ার্সাল দিতে যায় নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই—এটা ভাল লাগার কথাও নয়। তার ওপর পালা নিয়ে বাইরে যাওয়া তো আছেই। হয়তো দু' রাত্তির তিন রাত্তির ফেরেই না। বউয়ের বেশ নামডাক হচ্ছে চারদিকে। লোকে পথে-ঘাটে বাজারহাটে নিমাইকে টিটকিরি দেয়। তাই থেকেই বোঝা যায় যে, বউয়ের নামডাক হচ্ছে।

নাম হচ্ছিল বিশ্ববিজয় অপেরার। বারাসতে নিখিল বঙ্গ যাত্রা উৎসবে বিশ্ববিজয় অপেরার দু'খানা পালা হল, দু'খানাই মারকাট। কলকাতার দলগুলোর মতো অত হ্যান্ডস্ নেই তাদের, নামডাকের অভিনেতা-অভিনেত্রী নেই, তবু বিশ্ববিজয় ফাটিয়ে দিল।

বীণাপাণি সবে তার ঘরবন্দী নারীত্বের খোলস ছেড়ে হাজার মানুষের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার অদ্ভুত মুক্তির স্বাদ পাচ্ছে, এরকম সময়ে ঘরে ফিরে সে রোজ একখানা বিমর্ষ অন্ধকার মুখ দেখে খুশি হবে কেন? দেখে দেখে তেতো হয়ে যেতে লাগল।

কী হয়েছে তোমার বলো তো? অমন গোমড়া মুখ করে থাকো কেন?

নিমাই ঝগড়া করত না। ঝগড়াঝাঁটি, খিটিমিটি তার মোটে আসেই না। সে হল পান্তা-পুরুষ। জলে ভেজা, ঠাণ্ডা। শুধু ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে একটা নেতিবাচক ভঙ্গি করে। তার বেশি কিছু নয়। মাঝে মাঝে কাতরভাবে বলত, আমার যে এখানে করার কিছুই নেই। একটু কিছু না করলে কী হয়?

যাত্রার দলে লোকলস্কর লাগে। সে—কাজে ঢোকাতে চেয়েছিল বীণাপাণি, নিমাই রাজি হচ্ছিল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

কিসের বাড়াবাড়ি তা আর ভাঙল না।

বছর দুই এইভাবে চলল। বীণাপাণি একটু জমি কিনে ফেলল বনগাঁয়ে। দু'খানা ঘর তুলল। নিমাই নিজেই তত্ত্বাবধান করল, কিন্তু উদাসীনভাবে। বীণাপাণির যে উন্নতি হচ্ছে তাতে যেন ওর কিছুই না। বীণা ভারী বিরক্তি বোধ করে নিমাইয়ের ওপর।

ওর কিছুই কি ভাল লাগে না বীণার। লাগে। যখন খুব ভোরবেলা ঘুমচোখে সে শুনতে পায়, নিমাই উঠে বারান্দায় বসে সুরেলা গলায় প্রভাতী গাইছে। "ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ" শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দেয়। নিমাইয়ের আর একটা ব্যাপারও ভাল লাগে বীণার। তার বাবার সঙ্গে নিমাইয়ের আবছা একটা মিল আছে। দুজনেই ভারী নিরীহ।

বাইরে আজ মেঘলা দিন। গুঁড়ো বৃষ্টির একটা আবছায়া চারদিকে। এইসব দিন বীণাপাণির পক্ষে খারাপ, বিশ্ববিজয় অপেরার পক্ষে খারাপ। বর্ষাকালে বায়না নেই-ই প্রায়। এবারের ভারী বর্ষায় কয়েকটা বায়না কেঁচেও গেছে। আজকাল আর হাত পা ঠুঁটো করে ঘরে থাকা তার ভাল লাগে না। ঘর যেন গারদ। আর এমন দরকচা-মারা দিনে ওই লোকটা বাক্স গুছিয়ে চলে যাওয়ার জন্য পাঁয়তাড়া কষছে। দুধকলা দিয়ে কাল—সাপ পোরই সামিল হল বোধহয় ব্যাপারখানা।

অথচ এমন কি ব্যাপারটা ছিল? কাকার দলের ছেলেদের সঙ্গে বীণাপাণির চেনাজানা অনেকদিনের। যাত্রার দলে তারাও মাঝে মাঝে ভিড়ে যায়। আবার বর্ডার পেরিয়ে মালও নিয়ে আসে রাতবিরেতে। তারা কে কেমন লোক অত জেনে দরকার নেই বীণার। তবে তারা মাঝে মাঝে জিনিসপত্র গচ্ছিত রেখে যায় তার কাছে। একবেলা আধবেলা পর নিয়ে যায়। এদের একজন পগা। বীণা তাকে বেশ একটু পছন্দ করে। ভারী মিষ্টি তার কথাবার্তা। চোখ দু'খানা বড্ড ভাবালু। তার কাছে অনেক টাকা থাকে, ডলার থাকে, পাউন্ড থাকে। সে টাকারই কারবারি। সোনার বিকিকিনিও করে বলে শুনেছে বীণাপাণি। তবে সে কারোরই হাঁড়ির খবর নিতে যায় না। বন্ধুর মতো সম্পর্ক রেখে চলে। পগা মাঝে মাঝে তার কাছে মস্ত এক-একটা প্যাকেট জিম্মা রেখে যায়। সন্ধের পর সে যায় জুয়া খেলতে আর মদ খেতে। সঙ্গে বেশি টাকা থাকলে চোট হয়ে যেতে পারে। বীণাপাণি রেখে দেয়, কোনও কৌতূহল প্রকাশ করে না।

এ ব্যাপারটা নিয়েই নিমাইয়ের বড় অশান্তি। বারবার বলে, ওসব ছোকরাদের জিনিস গচ্ছিত রাখা ঠিক হচ্ছে না। কোনটা কী জিনিস কে জানে। হয়তো অস্ত্রটস্ত্রই রেখে গেল একটা ন্যাকড়ায় মুড়ে, বা বোমা।

অস্ত্রও থাকে, তবে সেটা আর নিমাইকে বলেনি বীণা। সে শুধু বলল, এ জায়গায় থাকলে হলে এদের সঙ্গে ভাব রেখেই থাকতে হয়। এরা বন্ধু থাকলে ভয় নেই।

এ ব্যাপারটা আমার বড় অশান্তির কারণ হচ্ছে।

বীণাপাণি এই ঘ্যানঘ্যান শুনে শুনে পরশু আর সহ্য করতে পারেনি। খুব এক তরফা ঝেড়েছে নিমাইকে। মুখে কোনও কথা আটকায়নি। শেষ অবধি বলেছে, তুমি এ বাড়ি থেকে বিদেয় হও। এখানে আর জায়গা হবে না।

কথাটা বলার সময় খেয়াল হয়নি যে, নিমাইকে সে যেচে নিয়ে এসেছিল।

এখন নিমাই ওই বাক্স গোছানো শেষ করে চুপচাপ বসে আছে। চোখ দুটো ছলছলে! কিছু বলবে বলে মনে করছে, কিন্তু কথা আসছে না মুখে। এত রাগারাগি করল সেদিন বীণাপাণি, একটিও জবাব দেয়নি। বড় নিরীহ।

আর এত নিরীহ বলেই রেগে যায় বীণাপাণি। সে শুধু চেয়ে আছে এখন। নিমাই চলে গেলে এ বাড়িতে একা থাকবে বীণাপাণি। একটু একা লাগবে। তা লাগুক।

এখন দুজনে ঝুম হয়ে বসে আছে। বীণা তাকিয়ে আছে নিমাইয়ের দিকে। চোখে জ্বালা, রাগ আক্রোশ; নিমাই চোখ নিচু করে বসে আছে মেঝেয়। ঘরে ছুঁচ পড়লে শোনা যায়। লোকটার কোনও দাম নেই বাইরের দুনিয়ায়। শুধু বীণাপাণির কাছে কিছু আছে। এক কানাকড়ি হলেও আছে। তবু আস্পর্ধা দেখ।

চোখে জল আসছিল বীণাপাণির। আঁচলটা চোখে তুলতে যাবে, ঠিক এই সময়ে জানলা দিয়ে একটা মুখ উঁকি দিল। পাড়ার একটা ছেলে।

বীণাদি, খবর শুনেছো? পগা কাল রাতে বটতলায় খুন হয়েছে।

অ্যাঁ!

লাশ ঘিরে দারুণ ভিড়। পুলিশ এসেছে। বলেই ছেলেটা চলে গেল।

নিমাই মুখ তুলে বীণার দিকে চাইল।

কাল রাতে পগা মস্ত একটা প্যাকেট রেখে গেছে বীণার কাছে। তাতে অনেক টাকা।

৪

একটা ন্যাকা বৃষ্টি অনেকক্ষণ ধরে হয়ে যাচ্ছে। হয়েই যাচ্ছে। ধরছে না, কমছে না। জোরেও নয়, আস্তেও নয়। ঘ্যান ঘ্যান ঘ্যান ঘ্যান ঘ্যান ঘ্যান। একখানা পাতলা ঝরোকার মতো ঢেকে আছে চারপাশ।

বৃষ্টি খুবই ভালবাসে মণীশ। মণীশের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি ঘটেছে বর্ষাকালে। এমন কি অপর্ণার সঙ্গে তার চমকপ্রদ প্রেমটাও। এখন মণীশ নার্সিং হোম-এ। শক্তিশালী ওষুধে আচ্ছন্ন। সেই গাঢ় কুয়াশার মতো আচ্ছন্নতার ভিতরে এই বৃষ্টির কোনও খবর পৌঁছোচ্ছে না। মাঝে মাঝে গভীর ব্যথায় এক একটা কাতর শব্দ উঠে আসে বুকের গহন থেকে।

মণীশের বাড়ির অবস্থাটা সন্ধে সাড়ে সাতটার সময় খুব ম্লান ও স্তব্ধ। টি ভি-টা চলছে। বাংলা খবর একটু আগেই শুরু হল। টি ভি-র মুখোমুখি বসে মণীশের ছেলে অনীশ। বাবাকে নিয়ে দু রাত জাগার পর এখন তার চোখের পাতা চুম্বকের টানে জুড়ে যাচ্ছে বারবার। করুণ গলায় একবার বলেছিল অনেকক্ষণ আগে, মা, একটু চা দেবে? একটু কড়া করে?

অপর্ণা বলেছিল, দিই।

সাড়ে সাতটা নাগাদই ঝুমকি তার কমপিউটার ক্লাস থেকে ফেরে। ফিরে চা চায় বা নিজেই করে নেয়। অপর্ণা একটু দেরী করছিল চা করতে। এখনই তো ফিরবে ঝুমকি।

এ বাড়িতে কারও মন ভাল নেই বলে সংসারটাই যেন এলিয়ে পড়েছে। ছোটো মেয়ে অনু এ সময়ে রোজ স্টিরিওতে গান শোনে। রাজ্যের হিন্দি গান। অনুশীলা অর্থাৎ অনু দু রাতের টেনশনের পর বাইরের ঘরে ডিভানে গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে পড়েছে কখন।

বাচ্চা কাজের মেয়েটা রান্নাঘরের মেঝেয় বসে আটা মাখছে। রাতের রুটি হবে। ফ্রিজ খুলে অপর্ণা দেখে নিয়েছে, আনাজপাতি প্রায় কিছুই নেই। রান্না করা ডাল-ডালনাও নয়। দুদিন তাদের এসব খেয়াল ছিল না। কিন্তু আজ রাতে রাঁধতে হবে, খেতেও হবে— ভাবতেই গায়ে জ্বর আসছিল অপর্ণার। খিচুড়ি করলে ঝামেলা মিটে যেত। কিন্তু স্বাভাবিক বুদ্ধি তো কাজ করছে না মাথায়।

খিচুড়ির কথা মনেই ছিল না।

মণীশ কি চলল? মণীশ চলে গেলে অপর্ণার কি করে চলবে?

আজ সব কাজ ফেলে রেখে অপর্ণার ইচ্ছে করছে কাউকে ডেকে গল্পটা শোনায়, তাদের প্রেম হয়েছিল কত অদ্ভুতভাবে, কী রোমান্টিক ভাবে।

বৃষ্টির জন্যই দেরী হচ্ছে মেয়েটার, ভিজে আসবে বোধহয়। মেয়েটার সাইনাস, ঠান্ডায় এলার্জি, ইসিনোফেলিয়া খুব বেশী। বাবার জন্য দুদিন ধরে মেয়েটা কেঁদেছে আর ছুটেছে এখানে সেখানে। ঝুমকি বরাবর তার বাপের বেশী ন্যাওটা। এখনও বাপের হাতে ভাত খায়, বায়না করে, কোলে অবধি বসে।

মণীশ যদি চলে যায় তাহলে এ বাড়ির আলোটুকু, সুখটুকু, উত্তাপটুকু সব টেনে নিয়ে যাবে। এটা মণীশের দ্বিতীয় অ্যাটাক এবং ম্যাসিভ। ডাক্তার প্রথমে ছত্রিশ, তারপর আটচল্লিশ এবং তারপর বাহাত্তর ঘন্টার অনিশ্চয়তার সতর্কবার্তা দিয়েছেন। এগুলো কথার কথা। পদ্মপাতার জলের মতোই টলমল মণীশের আয়ু, অপর্ণা জানে।

শক্ত হওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে অপর্ণা। কিন্তু মুঠোয় ধরবার মতো কিছু পাচ্ছে না। যথাক্রমে কুড়ি, আঠারো এবং চৌদ্দ বছরের তিন ছেলেমেয়ে তাদের। বয়সের অনুপাতে তিনজনই কিন্তু ছেলেমানুষ রয়ে গেছে। সংসারের কোনও আঁচ ওদের গায়ে লাগতে দেয়নি অপর্ণা আর মণীশ। আজ ওরা সবচেয়ে বেশী অসহায়, দিশাহারা।

জলের মতো টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। মহার্ঘ টাকা, কিন্তু টাকার কথাটা একদম ভাবতে চাইছে না অপর্ণা। টাকাটা তো আসল নয়, মণীশই আসল। টাকার অপচয়ের কথা ভাবাও বোধহয় মণীশের প্রতি অসম্মান।

ভাবতে চাইছে না। তবু ঘুরে ফিরে মাছির মতো একই জায়গায় এসে বসছে মনটা। কারণ আছে। গত কয়েক বছর মণীশ একটু টাকা ওড়াচ্ছিল। না, তার বাইরের কোনও দোষটোষ নেই। আসলে সে একটু বড়লোকের মতো থাকতে শুরু করেছিল। দামী জিনিসপত্র কিনে আনা, ভাল হোটেলে আকাশ-ছোঁয়া দামে সপরিবারে গিয়ে মাঝে মাঝে খাওয়া, সেকেন্ড ক্লাশের বদলে ট্রেনের এ সি কামরায় বেড়াতে যাওয়া। এসব বড়লোকী লক্ষণের পিছনে মণীশের প্রথম জীবনের অভাব-কষ্টের স্মৃতি কাজ করে নিশ্চয়ই। কিছু টাকা হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে যেন সব পুষিয়ে নিতে উঠে পড়ে লাগল সে। ইদানীং অপর্ণা লক্ষ করেছে, ছেলেমেয়ে এবং মণীশের মধ্যে একটা ভাব এসে গেছে— আমরা বড়লোক।

এই ভাবটাই মিথ্যে। মণীশের চাকরিটা চমৎকার। বহুজাতিক প্রথম শ্রেণীর কোম্পানিতে সে চাকরি করে। বিশাল মাইনে। কিন্তু সেটা মাইনেই। আমাপা, অফুরন্ত টাকা তো নয়। মাইনে মানেই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ সমন্বিত টাকা। সীমাবদ্ধ। বুদ্ধিমান মানুষ কখনও সীমাবদ্ধ টাকার ওপর নির্ভর করে বড়লোকী করতে যায় না। বড়লোক করার জন্য যে টাকার প্রয়োজন তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ আর বেধ থাকে না। তা মাসের শেষেও আসবে না।

এসব মণীশকে বোঝানো খুব সহজ কাজ নয়। মণীশ অবুঝ ও অত্যন্ত অভিমানী। কথায় কথায় সে বিগড়ে যায়। অপর্ণা তাই মণীশকে শাসন করতে হলে করেছে আদরের ছলে। বেশির ভাগ সময়ে ঘন আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে শ্বাসবায়ুতে শ্বাসবায়ু মিশিয়ে বলেছে, শোননা, আমরা কিন্তু বড়লোক নই। টাকা উড়িয়ে দেওয়াটা কি খুব ভাল? আমাদের না দুটো মেয়ে আছে, যাদের বিয়ে দিতে হবে?

সঞ্চয়ের কথা, মিতব্যয়িতার কথা শুনলেই মণীশ চটে যায়। এসব হিসেবী কথা সে একদম সইতে পারে না। ভবিষ্যতের ভাবনা তার একদম নেই। সে বলে, মেয়ের বিয়ে ফুঁয়ে হয়ে যাবে।

আমি কত প্রভিডেন্ট ফান্ড আর গ্র্যাচুইটি পাবো জানো?

অনেক বলেও মণীশকে এ ব্যাপারে লাগাম পরাতে পারেনি অপর্ণা। আর মণীশের ছায়াতে তিনটে ছেলেমেয়েও হল ওইরকম। টাকা-পয়সাকে টাকা-পয়সা বলে মনে করতে চায় না।

টাকা বোধহয় প্রতিশোধ নেয়। নার্সিং হোমের খাতায় প্রতিদিন মোটা টাকার অংক জ্বরের পারদের মতো ওপরে উঠে যাচ্ছে। ভাবতেও ভয় পায় অপর্ণা। এ সংসারে একমাত্র সে-ই বাস্তববাদী। সে একা। সে কখনও নিজেদের সীমাবদ্ধতা বিস্মৃত হয় না। সে জানে, মণীশের চিকিৎসার সব খরচ দেবে তার কোম্পানি। সেজন্য চিন্তা নেই। কিন্তু মণীশ যদি না ফেরে?

মণীশ না ফিরলে তার পিছনে চালচিত্রের মতো বহুজাতিক সংস্থাটিও মুছে যাবে। এককালীন কিছু টাকা গছিয়ে দিয়ে কোম্পানি তাদের সম্পূর্ণ ভুলে যাবে। আর তখনই কি শুরু হবে টাকার প্রতিশোধ?

চায়ের কাপে চামচে নাড়তে নাড়তে যখন সামনের ঘরে এল অপর্ণা তখন অনীশের মাথা ঝুঁকে পড়েছে বুকের ওপর। নাক ডাকছে। খুব আদর করে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে অপর্ণা নরম গলায় ডাকল, বুবকা, ও বুবকা! চা খাবি না?

অনীশ রক্তবর্ণ চোখ মেলে চাইল। তারপর লজ্জার হাসি হাসল।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, না?

ঘুমের আর দোষ কি? যা যাচ্ছে আমাদের ওপর দিয়ে!

আর এক কাপ চা করে ফেলেছে অপর্ণা, কিন্তু ঝুমকি এখনও এল না। যদি দেরী করে তাহলে চা নষ্ট হবে। ঠাণ্ডা চা ফের গরম করে দিলে তা ছোঁবেও না। নতুন করে বানিয়ে দিতে হবে। অপর্ণার একটা কান উদ্‌গ্রীব রয়েছে ডোরবেল-এর জন্য। ঝুমকির বুক দুর্বল। সর্দিকাশি জ্বরে খুব ভোগে। বড্ড রোগা। তবু নানারকম অকাজের ট্রেনিং নিচ্ছে। অনার্স ছাড়া বি এ পাশ করেছে। এম এ পড়ার উপায় নেই! গাদা গুচ্ছের টাকা দিয়ে কমপিউটার এবং গান শিখছে। এই অপচয়টাও যদি রোধ করা যেত!

মাছিটা উড়ে উড়ে ঘুরে ফিরে একটা জায়গাতেই এসে বসছে। টাকা। অপর্ণা ভাবছে, টাকা কি প্রতিশোধ নেয়? টাকাকে যদি অসম্মান, উপেক্ষা করা হয়, টাকাকে যদি যথোচিত মূল্য না দেওয়া হয়, তাহলে কি টাকা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে?

অপচয় এবং অপব্যয়ে বাঁধ দিতে চেয়েছিল অপর্ণা। পুরোপুরি পারেনি। সঞ্চয়মুখী করে তোলার অনেক চেষ্টা করেছে, মণীশ হয়নি। শুধু আয়কর থেকে বাঁচতে প্রতি বছর এন এস এস আর এন এস সি-তে যা একটু-আধটু জমা হয়। কিছু টাকা জমছে জীবনবীমায়। ব্যস।

নিস্তব্ধ বাড়িতে ডোরবেলের আওয়াজ প্রায় বজ্রাঘাতের মতো চমকে দিল অপর্ণাকে। ঝুমকি এল বুঝি! কত না জানি ভিজে এসেছে মেয়েটা!

দরজা খুলল বুবক। না, ঝুমকি নয়। অনুর বান্ধবী মোহিনী। চমৎকার দেখতে মেয়েটা। বাইরের চটক ততটা কিন্তু নেই। মোহিনীর সৌন্দর্য দেখতে হলে একটু মন দিয়ে দেখলে ধরা যায়। মুখ চোখ যেন সূক্ষ্ম সব যন্ত্র দিয়ে কমপিউটারে মাপজোখ করে তৈরি। কিন্তু মোহিনী খুব ফর্সা নয়, খুব লম্বা নয়। আলটপকা চোখে পড়ে না। কিন্তু মিষ্টি ধারালো মুখখানা আর ভারী পাতার নিচে ঢলঢলে দুখানা চোখ অপর্ণার খুব পছন্দ। একটাই দোষ, বড্ড ইংরিজিতে কথা বলে।

অপর্ণার বাড়িতেও একই অবস্থা। ঝুমকি বাদে বাকি দুজন প্রথম থেকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে! ওরা বাংলা বলতে একটুও ভালবাসে না। মণীশও ওদের ইংরিজিকে আকণ্ঠ প্রশ্রয় দেয়।

আন্টি, কি খবর জানতে এলাম।

একইরকম। বোসো। এই ড্রেসটা কবে করালে?

মোহিনী তার ঘাঘরা আর কামিজের নতুন পোশাকটাকে যেন হাত বুলিয়ে একটু আদর করে বলল, আমার বার্থ ডে ছিল তো গত মাসে। বাবা দিয়েছে।

বেশ পোশাকটা হয়েছে। ঘাঘরার তলায় রঙিন বলগুলো কি তোমরা লাগিয়ে নিয়েছো, না কি ওরকমই?

এরকমই কিনতে পাওয়া যায়। বাবা বম্বে থেকে এনেছে।

তাই বলো। এখানে এখনও এসব ফ্যাশন চালু হয়নি।

মিষ্টি করে হাসল মোহিনী, খুশির হাসি।

তবে এই বৃষ্টির দিনে ড্রেসটা পরে ভাল করোনি।

মোহিনী অকপটে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, চট করে চলে এলাম তো, খেয়াল করিনি।

বোসো। চা খাবে?

আমি তো খাই না। বলে আবার সেই মিষ্টি হাসি।

ওঃ, তাই তো। আসলে আমার এক কাপ চা বাড়তি হয়েছে। কী যে করি!

বুবকা বিরক্ত গলায় বলল, তোমার প্রবলেমগুলো এত ছোটখাটো কেন বলো তো মা! চা-টা আমাকে দিয়ে দাও।

আঠারো বছরের ছেলেরা আজকাল ভোট দেয়। বুকার আঠারো। তার মানে কি বুবকা সাবালক হয়ে গেল! এক কাপ চা বাড়তি হয়েছে, একথাটা বোধহয় মোহিনীর কাছে বলাটা উচিত হয়নি। যেন বাড়তি হয়েছে বলেই অফার করা হচ্ছে। বুবকা বোধহয় সেই কারণেই অপর্ণার ওপর বিরক্ত হল। আজকাল অপর্ণা কত কি শেখে ছেলের কাছ থেকে।

মোহিনী আসতেই এক ডাকে উঠে পড়ল অনু।

অপর্ণা মনে মনে এরকমই একটা কিছু চাইছিল। কেউ একজন আসুক। এই নিস্তব্ধ বিষণ্ণ বাড়িটার ভারী বাতাস কেটে যাক কথায় বার্তায় হাসিতে।

অফিস থেকে লিজ নেওয়া এই ফ্ল্যাটটা বেশ বড় এবং স্ট্যাটাস সিম্বল সবই প্রায় আছে। শুধু গ্যারেজে গাড়িটা নেই। আগের অ্যাম্বাসাডারটা ভাল দাম পেয়ে বিক্রি করে দিয়েছে মণীশ গত মাসেই। একটা মারুতি ভ্যান কেনার কথা। দরাদরি চলছিল। দু-চার দিনের মধ্যেই এসে যেত। কিন্তু মণীশের অসুখটাই বাধা হল বোধহয়। অপর্ণা একরকম খুশি। তেলের যা দাম বাড়ছে, গাড়ি পোষার মানেই হয় না। মণীশ অফিসে যায় আসে পুল কার-এ। তবে গাড়িটা দিয়ে কি হয়? অপর্ণার শখ ছিল গাড়ি চালানো শিখবে। মোটর ট্রেনিং স্কুলে শিখেও ফেলল। লাইসেন্স দিয়ে দিল। আর তারপরই সেই ভয়াবহ অ্যাকসিডেন্ট... অপর্ণা সে কথা আর ভাবতেই চায় না।

একটা নতুন আওয়াজ বজ্রাঘাতের মতোই ফের চমকে দেয় অপর্ণাকে, ভুল শুনছে না তো! করিডোরে টেলিফোন বাজছে নাকি? চার মাস ধরে টেলিফোন মূক ও বধির হয়ে ছিল। তারা ক্রমে ভুলে যাচ্ছিল টেলিফোনের কথা। পরশুদিনই ঝুমকি গিয়ে টেলিফোন অফিসে ধরে পড়েছিল, আমার বাবার ভীষণ সিরিয়াস অসুখ, আমাদের টেলিফোনটা ঠিক করে দিন।

এসব আবেদনে কাজ হয় কি?

টেলিফোনের আওয়াজে বুকা আর অনুও উঠে দাঁড়িয়েছিল। বিস্ময়ে।

অপর্ণাই গিয়ে সবার আগে ধরল।

হ্যালো।

আপনাদের লাইন ঠিক করে দেওয়া হল।

অপর্ণা বুকভরা কৃতজ্ঞতা অনুভব করে বলে, কি বলে যে ধন্যবাদ দেবো। আমার স্বামী ভীষণ অসুস্থ, নার্সিং হোমে। তাই টেলিফোনটা আমাদের এখন ভীষণ দরকার।

অসুখ আছে বলছেন! আচ্ছা ঠিক আছে।

লাইন এখন চালু থাকবে তো!

চেষ্টা তো আমরা সবসময়েই করি।

মেশিন সব পুরোনো, বুঝতেই পারছেন।

অপর্ণার অভিজ্ঞতা আছে। লাইন চালু হয়েই ফের বন্ধ হয়ে যায়। সে টেলিফোনটা রেখে আবার তুলল। ডায়ালটোন আছে। নিশ্চিন্ত।

বুবকা উঠে এসেছে। টেলিফোন তুলে নিয়ে বলল, দাঁড়াও, নার্সিং হোমে একটা ফোন করি।

এই তো সন্ধেবেলায় দেখে এলি।

তবু। টেলিফোনটাও একটু বাজিয়ে নেওয়া যাবে।

বাড়ির সকলে যতক্ষণ না ফিরছে ততক্ষণ স্বস্তি নেই অপর্ণার। সন্ধের পর একে একে ফিরতে থাকে সবাই। সকলে যখন ফিরল, কেউ বাকি রইল না, তখন স্বস্তি। অপর্ণা অস্বস্তি টের পাচ্ছে ঝুমকির জন্য। আটটা বাজতে চলল।

অফিসের বদান্যতায় তারা বেশ ভাল আছে। খুব ভাল আছে। বাইরে থেকে তাদের বড়লোক বলেই তো ভাবে লোকে। কিন্তু ভাল থাকাকে বিশ্বাস করে না অপর্ণা। যেদিন পিছনে পেখম ধরার মতো মণীশের মস্ত নামজাদা অহংকারী কোম্পানিটি থাকবে না সেদিন ব্ল্যাকবোর্ডের লিখন মুছে দেবে সময়।

মণীশ বাড়ি করতে আগ্রহী ছিল না। ফ্ল্যাট কিনতে রাজি ছিল, তবে খুব অভিজাত কোনও পাড়ায়। কিন্তু তাতে যা টাকা লাগবে তা মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু মণীশ কেবলই বলেছে, হয়ে যাবে। টাকা ঠিক জুটিয়ে নেবো।

কিন্তু সেরকম জুটিয়ে নেওয়ার মানে অর্পণা জানে। হয়তো এমন সোর্স থেকে টাকা জোগাড় করবে যাতে চড়া সুদ দিতে হয়। আর ফলে হাঁড়ির হাল হবে।

অন্যদিকে বুদ্ধি কতটা তীক্ষ্ণ তা অপর্ণা জানে না, তবে টাকা-পয়সার ব্যাপারে তার স্বাভাবিক মেধা খুবই বাস্তববাদী। সে মণীশকে ডুবে-মরার হাত থেকে বাঁচাতে রোজ রাতে পইপই করে বোঝাতো। বুঝিয়ে বুঝিয়ে মুখে ফেনা তুলে অবশেষে মণীশ অতিশয় তাচ্ছিল্য ও উপেক্ষার ভাব দেখিয়ে রাজি হল ইস্টার্ণ বাইপাসের কাছাকাছি অপর্ণার মিনি মাসীর একটা চার কাঠা প্লট কিনতে। দাম খুবই সুসাধ্য। তখনও ওপাশটায় লোকালয় নেই।

দু'বছর আগে জমিটা কেনা হয়েছে। মণীশ একবারও দেখতে যায়নি। ছেলেমেয়েরা দেখে নাক সিঁটকেছে। ওঃ, এই জায়গা!

এই তাচ্ছিল্য ও উপেক্ষা মেনে নিয়েছে অপর্ণা। দেয়াল দিয়ে প্লটটা ঘেরা করিয়েছে।

মাঝে মাঝে সে ওই চার কাঠা জমির কথা ভাবে আর মনটা আনন্দে ভরে যায়। সব জায়গা থেকে উৎখাত হয়ে গেলেও তাদের জন্য ওই চারকাঠা জমি কোল পেতে থাকবে। সেখানে অনেক গাছ লাগিয়ে এসেছিল অপর্ণা। গাছগুলো হয়েছে। তাদের ঘিরে আগাছাও জন্মেছে অনেক।

আজ এই বিষণ্ণ সন্ধ্যায় অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ভাবনার মধ্যে তার কাছে একটা দ্বীপের মতো ভেসে উঠল ওই চারকাঠা জমি। মণীশ, তুমি জানো না, এখন কত হিসেব-নিকেশের দিন এল আমাদের।

মা! একটু চা হবে?

অনু খুব করুণ গলায় বলে।

অপর্ণা মৃদু ধমক দিয়ে বলে, খালি পেটে চা কিসের? আগে কিছু খেয়ে নে। পাঁউরুটি টোস্ট করে দিচ্ছি।

না, কিছু খাবো না। অবেলায় খেয়ে বমি বমি লাগছে। চা দেবে মা?

মোহিনী তো চা খায় না, ওকে একটু মিষ্টি-টিষ্টি দে। দ্যাখ, ফ্রিজে বোধহয় আছে।

মোহিনী বলে, মাসিমা, আমার সঙ্গে ফর্মালিটি কিসের? মিষ্টি আমি খাই না।

তুমি তো চাও খাও না, কত ভাল তুমি! আর দেখ অনুর এ বয়সেই চায়ের নেশা।

টেলিফোনটা রেখে অনীশ রাগের গলায় বলে, ওরা কোনও ইনফর্মেশন দেয় না কেন বলো তো মা?

কেন, কী বলল?

বলল, পেশেন্ট স্টেবল, ঘুমোচ্ছেন।

তাহলে তো ঠিকই আছে। আর কী ইনফর্মেশন চাস?

তুমি বুঝছো না। ফোন ধরেই বলে দিল। তার মানে বাবার কেবিনে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে তো আর বলল না। সবাইকেই বোধহয় এরকম বলে দেয়। আমি বরং একবার গিয়ে ঘুরে আসি।

দূর পাগল! এত অস্থির হওয়ার কী আছে? দু রাত নার্সিং হোমের চেয়ারে বসে কাটিয়েছিস। আজ একটু রিল্যাক্স কর।

মা, তুমি নিজে রিল্যাক্স করতে পারছো কি? বাবা যতক্ষণ না আউট অব ডেনজার হচ্ছে ততক্ষণ আমার রিল্যাক্স করার প্রশ্নই নেই।

টেলিফোনটা আবার বেজে উঠতেই আবার যেন বজ্রাঘাতে কেঁপে ওঠে অপর্ণা। কী হল? ফোন বাজছে কেন?

বুবকা ফোন তুলল, কে? ... ওঃ দিদি! তুই কোথা থেকে ফোন করছিস! অ্যাঁ! ...নার্সিং হোম! তোকে কে বলল যে আমাদের ফোন ঠিক হয়ে গেছে! ... ওঃ। হ্যাঁ।

অপর্ণা স্তব্ধ হয়ে থাকে। কান ঝাঁ ঝাঁ করছে ভয়ে, উত্তেজনায়।

কী বলছে রে ও?

বুবকা হেসে বলে, দিদি নার্সিং হোমে চলে গেছে। ওখানে ওরাই বলেছে যে বাড়ির ফোন ঠিক হয়ে গেছে। তাই দিনি ফোন করছিল।

নার্সিং হোমে চলে গেছে! আর দেরি দেখে আমি এদিকে ভেবে মরছি।

বুবকা উদাস হাসি হেসে বলে, আমাদের এখন কোনও রুটিন নেই মা। মাথা কারও নর্ম্যাল কাজ করছে না। তোমারই কি করছে, বলো! মঙ্গলবার ওই দৃশ্য দেখার পর... ওঃ ইট ওয়াজ এ নাইটমেয়ার!

অপর্ণা চোখ বুজে শক্ত হয়ে যায়। প্রিয় মানুষের ব্যথা সহ্য করাই বোধহয় পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন কাজ। যখন বুক জুড়ে সেই ব্যথার বাঁশি বেজে উঠল মণীশের, সে শুধু চিৎকার করেছিল অপু... অপু... বাঁচাও... মরে যাচ্ছি...

বুক মথিত করা সেই ব্যথা। যেন এক মত্ত মাতঙ্গ পায়ের তলায় পিষে ফেলছে ওর বুক। দুটো চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছিল, বেঁকে যাচ্ছিল মুখ। সে যেন নিত্যকার চেনা মণীশ নয়। এ যেন অন্য মণীশ।

কিছুক্ষণ তারা সকলেই শুধু 'কি হল কি হল' বলে উদ্‌ভ্রান্ত আচরণ করেছিল। সবার আগে স্বাভাবিক বুদ্ধি ফিরে পেল অপর্ণা। সে দৌড়ে বেরিয়ে গিয়ে উল্টোদিকে বাড়ির ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনল। তিনি সাধারণ ডাক্তার। হার্ট স্পেশালিস্ট নন। কিন্তু প্রাথমিক একটা সামাল দিয়েই বললেন, ইমিডিয়েটলি হসপিটালাইজ করুন। কেস সিরিয়াস।

আজও সেই ঘোষণার ধাক্কা তারা সামলে উঠতে পারেনি। আজও যেন মণীশের সেই ব্যথা এ বাড়িতে রয়ে গেছে।

হঠাৎ ডোরবেল বেজে উঠলে, কেউ জোরে কথা বললে, হঠাৎ দমকা বাতাস বয়ে গেলে কেন যে ধক করে ওঠে অপর্ণার বুক! সামান্য শব্দই বজ্রপাতের মতো চমকে দেয় তাকে। আর অপর্ণার চারদিক যেন এক ঘোর লাগা অবাস্তব। রিয়ালিটি ব্যাপারটা সে ঠিক টের পাচ্ছে না। প্রাণপণে সে স্বাভাবিক থাকতে চাইছে। ঠিকঠাক পেরে উঠছে না। অভিনয় করে যাচ্ছে। রাতে একা ঘরে সে কেন টের পায়, মণীশের বুক—জোড়া গহন ব্যথা গুমরে বেড়াচ্ছে ঘরময়? এরকম ভাবা কি স্বাভাবিক?

এত ভয় করে! এত একা লাগে! এত দুশ্চিন্তা আসে মনে! কাজের মেয়েটা আগে বস্তা পেতে সামনের ঘরে শুততা। তাকে এখন শোওয়ার ঘরের মেঝেতে শোওয়ায় সে।

প্রথমবার মণীশের হৃদযন্ত্র বিনীত ভাবেই তার অক্ষমতা জ্ঞাপন করতে শুরু করেছিল বছর দুই আগে। সেবার খুব মারাত্মক হয়নি। নার্সিং হোমেও যেতে হয়নি। ব্যথাও উঠে যায়নি চৌদুনে। সেদিন সকালে অফিস যাওয়ার সময় খুব হাঁসফাঁস, শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা নিয়ে অফিসে যাওয়ার পোশাক সমেত বিছানায় শুয়ে পড়েছিল মণীশ। পাড়ার ডাক্তার দেখেই বলেছিল হার্ট স্পেশালিষ্ট ডাকতে। বড় ডাক্তার এসে মণীশকে বিছানার বাইরে এক পাও নড়তে, সিগারেট ও স্নেহযুক্ত বা মশলাদার খাবার খেতে বারণ করেছিলেন। দিন দশেক শয্যা নিয়ে ছিল মণীশ। সিগারেট ছাড়ল, খাওয়া-দাওয়ার নিয়ন্ত্রণ মেনে নিল। সেবার তারা সবাই মণীশের অনিশ্চয়তা নিয়ে এমন দিশাহারা হয়ে যায়নি। ভেবেছিল, ঠিক হয়ে যাবে।

দশ দিনের মধ্যেই সামান্য ডিগবাজি খাওয়া হৃদযন্ত্র ফের ঠিকঠাক চলতে শুরু করে। মণীশ ফিরে আসে স্বাভাবিক কাজেকর্মে। দুবছর লম্বা সময়। মণীশের হৃদযন্ত্রের কথা আর কারও মনে থাকেনি। মণীশেরও না। রুটিনমাফিক মাঝে মাঝে ই সি জি করা হত। কোনও বেচাল পাওয়া যেত না তাতে।

প্রথমটা ছিল প্রোলগ মাত্র। নেহাতই ভূমিকা। পাঁয়তারা। বহ্বাস্ফোট। লড়াইটা তখন শুরুই হয়নি।

দ্বিতীয়টা এল দিগ্বিজয়ী ঘোড়সওয়ারের মতো। সারা পৃথিবী জুড়ে তার দাপট। বুড়ো-বাচ্চা, ধনী-নির্ধন, পাবলিক-ভি আই পি সকলেই নতজানু তার কাছে। হার্ট অ্যাটাক—এ দুটি শব্দ যেন দামামা বাজিয়ে দেয়

বুকে।

কে জানে কেন, হার্ট অ্যাটাক কথাটা অপর্ণার ভাল লাগে। একটা স্পর্ধিত আভিজাত্য, একটা অমোঘ পরিণতির ধ্বনি আছে তাতে। অথচ কী সর্বনেশে ব্যাপার। একটা হার্ট অ্যাটাক মানে কত জন মানুষের কত কী বন্ধ হয়ে যাওয়া।

মণীশ যদি চলেও যায় তাদেরও কত কী বন্ধ করে দিতে হবে। প্রথমেই বন্ধ হবে সব বিলাসিতা, বাহুল্য, বড়লোকী। তারপরও হিসেব করে টিপে টিপে চলা শুরু হবে। এখন যেমন তাদের ছেলেমেয়েরা পাতে মাছ ভাত ফেলে উঠে যায়, অপ্রয়োজন ফ্যাশনের জিনিস কিনে উড়িয়ে দেয় টাকা, অন্যায্য বায়না করে বসে, ঠিক তেমনটি তো আর হবে না।

মোহিনী উঠে এল রান্নাঘরের দরজায়, মাসীমা, যাচ্ছি। আঙ্কল তো এখন আউট অফ ডেনজার, তাই না?

কে জানে বাবা! তুমি কিন্তু রোজ এসো।

আমি প্রায় রোজই আসি। তবে টিউটর পড়াতে আসেন তো সন্ধেবেলায়, তাই এ সময়টায় আসা যায় না।

যখন খুশি এসো। আমি তো বাড়িতেই থাকি।

মোহিনী চলে গেল। আচমকা অপর্ণার মনে হল, আচ্ছা, মোহিনীর সঙ্গে অনীশের কোনও গোপন ভাবসাব নেই তো? আঠারো বছরের ছেলে, চৌদ্দ বছরের মেয়ে!

৫

দোকানটায় ঢুকতে একটু লজ্জা করছে হেমাঙ্গর। প্রায় রোজই সন্ধের দিকে এসে হানা দিচ্ছে, একটা জিনিসই রোজ খুঁটিয়ে দেখছে এবং রোজই নানা নতুন প্রশ্ন করছে জিনিসটা সম্বন্ধে— এতে ওরা বিরক্ত হচ্ছে কি?

অবশ্য কোনও দোকানদারই হেমাঙ্গর ওপর বিরক্ত হয় না। যারা মোটামুটি ভাল দোকানদার তারা লোকের মুখ দেখেই অভ্যন্তরকে বুঝে নিতে পারে। এ দোকানটায় দত্ত বলে যে লোকটি আছে তার সঙ্গে সামান্য আলাপ হয়ে গেছে তার। ধৈর্যশীল দত্ত রোজ তাকে মাইক্রোওয়েভ সম্পর্কে জ্ঞানদান করে। ছাত্রের মতো শেখে হেমাঙ্গ। আর জিনিসটাকে অত্যন্ত পরীক্ষামূলক চোখে দেখে। পরশু দত্ত একটা লাইভ ডেমনস্ট্রেশন দিয়ে দেখিয়েছে, মাইক্রোওয়েভে বাস্তবিকই ছ'মিনিটে ভাত রান্না হয়। এবং তার ফ্যান গালবার দরকার হয় না। চাল আগে থেকে ভিজিয়ে রাখতে হয়। জলটা মেপে দিলে ফ্যান শুষে ভাত ঝরঝরে হয়ে যায়। ঠাণ্ডা চায়ের কাপটি মাইক্রোওয়েভে রাখলে মাত্র কয়েক সেকেন্ডে চা আগুন-গরম হয়ে যায় এবং চায়ের স্বাদগন্ধে কোনও অশুভ বদল ঘটে না। মিয়ানো মুড়ি বা ন্যাতানো বিস্কুট ফের নতুন মুড়ি আর টাটকা বিস্কুট হয়ে ওঠে। ফ্রিজের ঠাণ্ডা জিনিস কয়েক সেকেন্ডে হয়ে যায় পাইপিং হট। সবচেয়ে অদ্ভুত হল, মাইক্রোওয়েভে জিনিসটাই গরম হয়, কিন্তু পাত্রটি নয়। যত দেখছে তত মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে হেমাঙ্গ। যত মুগ্ধ হচ্ছে ততই লজ্জিত হয়ে পড়ছে ভিতরে ভিতরে। এই সব জিনিস—অত্যাধুনিক সব যন্ত্রপাতি বা ভোগ্যপণ্যের ছলাকলায় সে যে কেন এত সহজে বশ মানে তা সে ভাল বুঝতে পারে না। মদ মেয়েমানুষ মারিজুয়ানা কি এর চেয়ে বেশী বিপজ্জনক?

খুবই কুণ্ঠিত পায়ে, প্রায় নববধূর মতো সে প্রকাণ্ড দোকানঘরটায় ঢুকল। দিব্যি স্প্রিংএর দরজা। ভিতরটা ঠাণ্ডা এবং শব্দহীন। থরে থরে শুধু জিনিস আর জিনিস। যথেষ্ট খদ্দেরের ভিড়।

দত্তই তাকে প্রথম দেখল। বোধহয় শিকারীর চোখে অপেক্ষা করছিল তারই জন্য। দত্তর অভিজ্ঞ চোখ হেমাঙ্গর নির্মোক এবং প্রতিরোধ ভেদ করে দেখতে পাচ্ছে, ভিতরে ভিতরে হেমাঙ্গ ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ছে। হার মেনে নিচ্ছে। দুমাস আগে এই দত্তই তাকে ওয়াশিং মেশিনটা গছিয়েছিল, ঠিক একইভাবে। ধীরে ধীরে। অপেক্ষা করে করে। সুতো ছেড়ে ছেড়ে। আপনজনের মতে, বাল্যবন্ধুর মতো ব্যবহার করে করে। আর ওয়াশিং মেশিনটাও নীরবে নিবেদন করেছিল তার হৃদয়, যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং...

আরে, আসুন স্যার। গুড ইভনিং।

ওই দুর্দান্ত স্মার্ট লোকটা আসলে মাকড়সা। তার চারদিকে এই সব অত্যাধুনিক জিনিসপত্রের মায়াজাল পাতা। আর হেমাঙ্গ নিয়তি-নির্দিষ্ট সেই পতঙ্গ। নইলে স্বক্ষেত্রে হেমাঙ্গ কিছু কম স্মার্ট নয়। নিজস্ব ক্ষেত্রে সেও তো লোককে হিপনোটাইজ করে। তবু এইসব ভোগ্যপণ্যের কাছাকাছি এসে যে কেমন যেন এলিয়ে পড়ে। কেমন যেন আনস্মার্ট, লজ্জাতুর, আত্মবিশ্বাসহীন লাগে নিজেকে।

জিনিস কিনতে সে ভীষণ ভালবাসে। অথচ খামোখা যে এত জিনিস কিনে ঘরে জঞ্জাল বাড়ানো উচিত নয় এটাও সে ভালই জানে। জিনিস কেনা নিয়ে বিভিন্ন মানুষের কাছে তাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা সহ্য করতে হচ্ছে। মনের এই দ্বান্দ্বিক প্রতিক্রিয়া—টু বি অর নট টু বি—তাকে কাহিল করে ফেলছে কি? তাই দত্তের মুখখামুখি সে গোবেচারার মতো দাঁড়িয়ে আছে আজও।

দত্ত সামান্য উঁচু গলায় ডাকল, গৌরী, প্লীজ মিস্টার চট্টরাজকে একটু অ্যাটেন্ড করো।

সাইনবোর্ডের মতো মিষ্টি মেকানিক্যাল হাসি মুখে ঝুলিয়ে গৌরী এল, আসুন স্যার। মাইক্রোওয়েভ তো!

ওই আর কি। বলে হেমাঙ্গর মনে হল, কথাটার আদ্যন্ত কোনও মানেই হয় না। সে ভিতরে ভিতরে এত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছে যে, ভেবেচিন্তে সাজিয়ে-গুছিয়ে কিছু বলছে না।

ডিসপ্লে সারকেলে চূড়ান্ত পোজ নিয়ে চারখানা মাইক্রোওয়েভ তাকে একযোগে কটাক্ষে বিদ্ধ করল।

গৌরী-নাম্নী মেয়েটি বলল, আপনি কিন্তু স্যার এটাই পছন্দ করে রেখেছেন। দিস ওয়ান ইজ দ্য বেস্ট। ফুল্‌লি অটোমেটিক, ব্রাউনিং করা যায়, টাইমার আছে।

এ সবই হেমাঙ্গর মুখস্থ। সে সোফায় বসে গৌরীর মুখের দিকে সম্মোহিতের মত চেয়ে থেকে অন্যমনস্ক হাতে ব্রিফকেস খুলে চেকবই বের করল।

কত যেন একজাক্ট ফিগারটা?

উনিশ হাজার একশো...

সম্পূর্ণ আনমনা হাত চেকের ওপর অংকটা লিখল এবং সই করল, তারপর সেটা ছিঁড়ে মেয়েটার হাতে দিল। সবটাই করল তার হাত। সে নয় যেন।

থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, আপনার সঙ্গে কি গাড়ি আছে?

আছে।

গাড়িতেই তুলে দেবো তো! নাকি কাল হোম ডেলিভারিতে পাঠিয়ে দেবো?

না না, গাড়িতে তুলে দিন।

ভারী একটা স্বস্তিবোধ করে হেমাঙ্গ। যেন কিছুদিন ধরে একটা টেনশন ও টানাপোড়েন চলছিল মনে মনে। এই ট্রানজাকশনটা হয়ে যাওয়ার পর সে হালকাবোধ করছে। ব্রিফকেসটা বন্ধ করল তার দুটি হাত। হাতই, সে নয়।

ভ্রূ কুঁচকে সে ব্রিফকেসটার দিকে একটু চেয়ে থাকে। সিঙ্গাপুর থেকে কিনেছিল। আসল গুক্কি। এই ব্রিফকেসটাও তাকে ঠিক এরকমই টেনশনে ফেলে দিয়েছিল। কেনার পর শান্তি।

দত্ত এগিয়ে এল।

হয়ে গেল স্যার?

রুমালে ঘর্মাক্ত মুখ মুছে হেমাঙ্গ বলে, শুনেছি মাইক্রোওয়েভে খুব কমপ্লেন হয়। এদের সার্ভিস ভাল তো।

এ গ্রেড। তাছাড়া আমরা তো আছিই। কিছু হলে আমাদের কাছে কমপ্লেন করবেন, উই উইল সি টু ইট।

হেমাঙ্গ জানে, তার মাইক্রোওয়েভে বিশেষ কমপ্লেন হবে না। প্রথম প্রথম কয়েকদিন শখ করে ব্যবহার করবে বটে, তারপর পড়ে থাকবে। যেমন তার অন্যান্য জিনিস রয়েছে পড়ে। মোটর ড্রিভ্‌ন ক্যামেরা, ওয়াশিং মেশিন, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, দুটো ফ্রিজ, দুটো টিভি, দুটো ভি সি আর, এগারোটা ব্রিফকেস, আরও কত কী!

বাড়িটা পাওয়া গিয়েছিল খুব বরাতজোরে। তাদের অনেক বাড়ি কলকাতায়। বেশীরভাগ বাড়িতেই বহু পুরনোকালের ভাড়াটেরা পনেরো বিশ ত্রিশ চল্লিশ টাকা ভাড়ায় বসে আছে। কাউকেই নড়ানো সম্ভব নয়।

আচমকা এই একখানা বাড়ি থেকে এক বহু পুরনো ভাড়াটে চলে গেল। হেমাঙ্গ তার বাবাকে গিয়ে বলল, বাড়িটা আমায় দেবেন? আমি থাকব।

তার মানে? আলাদা হতে চাও নাকি?

না। তবে একটু হাত-পা খেলিয়ে থাকব।

কেন এই এত বড় বাড়িটায় তোমার হাত-পা খেলানোর জায়গার অভাব হচ্ছে নাকি?

কথাটা ঠিক। তাদের বিশাল দুই মহলা বাড়িতে জায়গার অভাব নেই। হেমাঙ্গরা ছয় ভাই, চারজনই বিয়ে করেছে। প্রত্যেকেরই একাধিক কাচ্চাবাচ্চা। তবু জায়গার সমস্যা নেই। সামনের দিকের বাড়িটায় হেমাঙ্গ তিনখানা ঘর নিয়ে যথেষ্ট হাত-পা খেলিয়েই থাকে। তবে অসুবিধে একটাই, বাড়িতে তার অভিভাবকের সংখ্যা বড্ড বেশি। পাঁচ ভাই-ই তার বড়। তাছাড়া বাবা, বাবার ওপরে বিরানব্বই বছর বয়সী দাদু, বিধবা এক পিসি, এক ব্যাচেলর কাকা, মা, এক বিধবা কাকীমা, খুড়তুতো এক দাদা, তার নিজের এক অবিবাহিতা দিদি — সবাই তার অভিভাবক। ফলে প্রাপ্তবয়স্ক ও স্বাধীন হয়ে ওঠা তার কপালে হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু কথাটা তো বাবাকে বলা যায় না। সে খুবই বিনয়ের সঙ্গে বলল, বাড়িটা ফাঁকা ফেলে রাখা ঠিক হবে না। আজকাল বাড়ি ফাঁকা রাখলে জোর করে তোক ঢুকে পড়ছে।

হেমাঙ্গর বাবা দুর্গানাথ খুবই অবাক হয়ে বললেন, এ খবর আবার কোথায় পেলে? এটা কি মগের মুল্লুক বলে তোমার ধারণা?

দুর্গানাথ যে খুব কড়া ধাতের লোক তা নয়। বরং রঙ্গরসিকতার দিকেই তাঁর পক্ষপাত এবং স্বভাবে খানিকটা শিথিলতাও আছে। আবার অন্যদিকে অতিকায় ক্ষুরধার বুদ্ধি ও প্রবল পরিশ্রমী। তিন পুরুষের একটি ব্যবসাকে প্রায় একা হাতে ধরে রেখেছেন এবং ফলাও করে তুলেছেন। পশ্চিমবঙ্গের কারখানাগুলিতে শ্রমিক-অশান্তির যে প্রাবল্য রয়েছে, ধর্মঘট-ধীরে চলো-লকআউট ইত্যাদি দুর্গানাথের প্লাগ তৈরির কারখানায় নেই। কোনও অশান্তি নেই তাদের সার্জিক্যাল গুডসের দুটি এবং ওষুধের একটি দোকানেও। সবই নিখুঁতভাবে চলছে। সামান্য অশান্তি দেখা দিলেই দুর্গানাথ সেটিকে গোড়াতেই মেরে দেন। খুব জোরালো যুক্তি ছাড়া দুর্গানাথকে কব্জা করা অসম্ভব। হেমাঙ্গ রণে ভঙ্গ দিল। জোরালো যুক্তি তার ছিল না, শুধু একা স্বাধীনভাবে থাকার একটা প্রবল ইচ্ছা ছিল মাত্র।

গড়চা বাই লেনের বাড়িটার মালিক যে তারাই এটা হেমাঙ্গরা ভুলেই গিয়েছিল একরকম। ভাড়াটে তোলার নিস্ফল চেষ্টা তারা কোনওদিন কোনও বাড়ির জন্যই করেনি। কিন্তু এই বাড়িটার ভাড়াটে মহিমবাবু একদম একা হয়ে গেলেন হঠাৎ। ছেলেমেয়ে দুজনেই অস্ট্রেলিয়ায়, হঠাৎ তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ ঘটল। একা বাড়িতে থাকতে

পারছিলেন না। তখন ছেলে এসে স্থায়ীভাবে বাবাকে অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে গেল। তাঁদের যথেষ্ট টাকা, বাড়িটা নিয়ে তারা কোনও ঘোঁট পাকাতে চায়নি।

কিন্তু মুশকিল হল, বাড়ি খালি হওয়ার পর নানা লোক আসছে ভাড়া নেওয়ার জন্য। দুর্গানাথ বিরক্ত হচ্ছেন। আসছে দালাল, রাজনীতির লোক, লোকাল মস্তান। একখানা আস্ত দোতলা বাড়ি খালি পড়ে থাকা সমীচীনও নয়। কলকাতায় যখন এত স্থানাভাব।

দুর্গানাথ একদিন হেমাঙ্গকে ডেকে বললেন, তুমি না গড়ার বাড়িটায় থাকতে চেয়েছিলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তোমার মতলবখানা কী?

হেমাঙ্গ একটু আশার আলো দেখতে পেয়ে বলল, আজ্ঞে আমার একটু নিরিবিলিতে থাকার শখ।

এ বাড়িতে কি সবাই তোমাকে উত্যক্ত করে?

না, তা কেন? আসলে এখানে ঠিক প্রাইভেসি নেই তো। লোকজন আসছে যাচ্ছে।

গড়চার বাড়িটা আমার আর ভাড়া দেওয়ার ইচ্ছে নেই। খালিও ফেলে রাখা যাচ্ছে না। তুমি সেখানে গিয়ে থাকতে পার। তবে একটা শর্ত আছে।

শর্ত! শর্ত কিসের?

তুমি এখনও ব্যাচেলর। তোমার পক্ষে একা থাকা বিপজ্জনক। তুমি বরং চট করে বিয়েটা সেরে ফেল, তারপর বউ নিয়ে ও বাড়িতে গিয়ে থাক।

আতঙ্কিত হেমাঙ্গ বলল, আমার ও বাড়িতে যাওয়ার আর কোনও ইচ্ছে নেই বাবা। আমি এখানেই বেশ আছি।

দুর্গানাথ ছেলের অবস্থা দেখে হাসলেন, বিয়ের কথায় ভয় পেয়ে গেলে দেখছি।

আজ্ঞে আমি ওনাদের খুবই ভয় পাই।

শুনেছি মহিলাদের সম্পর্কে তোমার একটু অ্যালার্জি আছে। নারীর প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা এবং তাঁদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখা খুবই ভাল। কিন্তু আতঙ্ক থাকা ভাল নয়। তোমার এই স্বভাবের জন্য তোমার মা-ও কিছু চিন্তিত। থাকগে, তা হলে বিয়েটা করতে চাইছ না?

আজ্ঞে না।

গড়চার বাড়িটা বেশ বড়ই। ওপর নিচে বোধহয় সাত-আটটা ঘর। এতগুলি ঘর নিয়ে একাই থাকবে?

যে আজ্ঞে! একা থাকা আমার খুবই প্রিয়।

দুর্গানাথ একটু হেসে বললেন, গড়চার গলির মধ্যে বাড়ি বলে তোমার বিবাহিত দাদারা কেউই ও বাড়িতে যেতে চাইছেন না। তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ফ্ল্যাটও ফাঁকা পড়ে আছে। বাধ্য হয়ে এখন তোমাকেই পাঠাতে হবে দেখছি। তা ওখানেই রান্নাবান্না হবে, নাকি এ বাড়িতে এসে খেয়ে যাবে! সকালের চা ইত্যাদি করে দেওয়ারও তো লোক চাই।

আজ্ঞে লোক রাখলে একা থাকার ব্যাপারটা নষ্ট হয়ে যায়। রান্না আমি নিজেই করে নেবো।

বলো কি? রান্না নিজে করে নেবে!

চেষ্টা করলে পারব।

পুরুষে মানুষ রাঁধে এ তো কস্মিনকালেও শুনিনি।

হেমাঙ্গ অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, বাবা, দুনিয়ার যত বড় বড় হোটেলের ওস্তাদ রাঁধুনীরা সবাই পুরুষ।

দুর্গানাথ একটু হোঁচট খেয়ে গেলেন এ কথায়। বললেন, তা বটে। খেয়াল ছিল না। মহাভারতের ভীমসেনও মস্ত রাঁধুনী ছিলেন। কিন্তু তুমি কি পারবে? সবাই সব কিছু পারে না। তোমার মা শুনলে তো মূর্ছা যাবেন। ভাল করে ভেবে দেখ।

আমি ভাল করে ভেবে দেখেছি। একা থাকব এবং নিজের সব কাজ নিজেই করে নেবো।

ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসনমাজা এসবও করবে নাকি?

ওসবের জন্য একজন ঠিকে নোক রাখলেই হবে।

তার দরকার নেই। বুড়ো দারোয়ান ফটিক আউট হাউসে থাকে। ও সব করে দেবেখন।

হেমাঙ্গ অবাক হয়ে বলে, ও বাড়িতে দারোয়ানও আছে নাকি?

ছিল না। বাড়ি খালি হয়ে যাওয়ার পর ফটিককে কারখানা থেকে ওখানে বদলি করেছি। পাহারা রাখলে বিপদ। ফটিক বিশ্বাসী লোক, সে তোমাকে ডিস্টার্ব করবে না। ফটকের পাশে একটা কুঠুরিমততা আছে। একা মানুষ, সেখানেই:দিব্যি থাকে। তোমার হঠাৎ একা থাকার বাই যে কেন উঠল কে জানে! শুনেছি তুমি কিছুটা বায়ুগ্রস্ত, সত্যি নাকি?

আপনাকে কে বলেছে?

তোমাকে যারা অহর্নিশ লক্ষ করে তাদেরই এরকম ধারণা।

হেমাঙ্গ সামান্য অভিমানী গলায় বলল, আমাকে অহর্নিশ লক্ষ করাটা কি সকলের উচিত?

সেইজন্যই তো আমি একা থাকতে চাই।

তোমাকে লক্ষ করা হয় লক্ষ করার মতো কিছু আচরণের জন্যই। সেইসব আচরণ যদি একা থাকলে বেড়ে যায়?

আমি কি অ্যাবনরমাল বলে আপনার ধারণা?

দুর্গানাথ ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলেন, আরে না না। অল্পবিস্তর অ্যাবনরমাল আমরা সকলেই। বাড়াবাড়ি না করলেই হল। আমি তো অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ, তাই সন্তানরা কে কেমন হল তা লক্ষও করি না, মাথাও তেমন ঘামাই না। এ ব্যাপারে যাবতীয় চিন্তা থেকে তোমাদের মা, কাকা আর দাদু আমাকে অনেকদিন আগেই রেহাই দিয়েছেন। তাই তোমরা আমার কাছে কিছুটা অচেনা রয়ে গেছ। সেইজন্যই কথাগুলো বলতে হল। আর একটা কথা, ও বাড়িতে যাওয়ার ব্যাপারে তোমার মা আর কাকার মতামত নেওয়াটাও দরকার।

হেমাঙ্গ জানে, সেটাই শক্ত কাজ। খুবই শক্ত।

মা শুনেই বলল, ওসব চিন্তা মাথা থেকে তাড়া। কিছুতেই তোকে আমি একা থাকতে দেব না। পাগল নাকি?

হেমাঙ্গকে আবার পিছোতে হল। হতাশ এবং ব্যর্থ। সে প্রাপ্তবয়স্ক, উপার্জনশীল এবং যোগ্যতাসম্পন্ন একজন মানুষ হওয়া সত্ত্বেও এ বাড়িতে তার প্রতি নাবালকের মতোই আচরণ করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে মা। মায়ের কাছ থেকে সে কখনোই পূর্ণবয়স্ক মানুষের মর্যাদা আদায় করতে পারেনি।

মানুষের জীবনে নানা ধরনের দুঃখ থাকে। হেমাঙ্গর জীবনে এইটেই ছিল সাংঘাতিক দুঃখ। মাথার ওপর এতগুলো অভিভাবকের ভার সে আর বহন করতে পারছিল না। নিজেকে তার মনে হত ইটচাপা ঘাস। বিবর্ণ, খবঁটে, ভবিষ্যৎ-হীন।

হঠাৎ হেমাঙ্গর ভাগ্যাকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হল। কিছুদিন বাদে খবর এল গড়চা বাই লেনের বাড়িটার একজন দাবীদার উঠেছে। লোকটা বলছে, তার কাকা মহিমবাবু বাড়িটা আদৌ ছাড়েননি, বরং তাকেই থাকতে দিয়ে গেছেন। বাড়ির ভিতরে তার কাকার ব্যবহৃত জিনিসপত্রও কিছু আছে।

কথাটা মিথ্যে নয়। বাস্তবিকই মহিমবাবুর খাট আলমারি চেয়ার টেবিল ইত্যাদি কিছু জিনিস তাড়াতাড়িতে বিলিব্যবস্থা করা যায়নি বলে ফেলেই গেছেন তিনি। দুর্গানাথকে বলে গেছেন, ওগুলোর একটা গতি যেন তিনিই করেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, লোকটি সত্যিই মহিমবাবুর ভাইপো। সে পাড়ার লোক এবং একজন পাকা উকিলের সহায়তায় বাড়ি দখলের জন্য নানা হুজ্জত শুরু করে দিল। তালা ভেঙে ঢোকার চেষ্টাও হল একটা। পুলিশ এল, কিন্তু কেমন যেন গা-ছাড়া ভাব তাদের।

দুর্গানাথ বিপদ বুঝে একটা পারিবারিক মিটিং ডেকে বললেন, বাড়ির পজেশন নেওয়াটাই আইনের বড় কথা। অবিলম্বে বাড়িতে লোক ঢোকানো দরকার। হেমাঙ্গ যখন স্বেচ্ছায় ওখানে থাকতে চাইছে তখন ওকেই পাঠাননা হোক।

মা অবশ্য বেঁকে বসল, হাঙ্গামার মধ্যে ছেলেকে পাঠাননা কেন? ও কি ভেসে এসেছে? যদি ওকে মারে?

বিস্তর বিতর্কের পর শেষ অবধি হেমাঙ্গই জয়টিকা পরল। পরদিন বাক্স-বিছানা নিয়ে গিয়ে সে গড়চা বাই লেনের বাড়ির দখল পত্তন করল। সঙ্গে পাড়ার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব। বন্ধুরা অবশ্য সাময়িকভাবে সঙ্গ দিতে গিয়েছিল।

মহিমবাবুর ভাইপো কিছু তিড়িংবিড়িং করেছিল বটে, কিন্তু ডাহা একটা মিথ্যে দাবী নিয়ে বেশিদূর এগোতে পারল না। দিন সাতেক বাদে সে নিরস্ত হল।

সেই থেকে হেমাঙ্গ এক সুখী ও একা মানুষ। দোতলায় চারখানা শশাওয়ার ও একখানা বড় বসবার ঘর নিয়ে বিশাল ফ্ল্যাটে সে থাকে। একতলাটা কিছুদিন ফাঁকা থাকার পর তার সেজদা গৌরাঙ্গ সেখানে একটা সাউন্ড রেকর্ডিং স্টুডিও করে। সেটা চলল না। এরপর টিভি সিরিয়ালের সেট হিসেবে সেটা ভাড়া দেওয়া হয় কিছুদিন। তারপর বিয়েবাড়ি হিসেবে ভাড়া দেওয়া হতে থাকে। অবশেষে ওটা এখন তাদের গুদামঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হেমাঙ্গ এখন নিশ্চিন্ত। সে এখন নিরঙ্কুশ একা।

একা বটে, কিন্তু উৎপাতহীন নয়। তার পৈতৃক বড় বাড়িটা বিডন স্ট্রিটে হলেও, তার সেজদি নীলা বন্ডেল রোড এবং পিসতুতে দিদি চারুশীলা গোলপার্কে থাকে। তারা সময় অসময়ে এসে হাজির হয় এবং যথেষ্ট হামলা মাচিয়ে যায়। প্রথম প্রথম বিডন স্ট্রিট থেকে গাড়ি হাঁকিয়ে মা বা ছোড়দি চলে আসত। আজকাল সেটা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু এই দুই দিদির খবরদারি বন্ধ হয়নি। হেমাঙ্গর প্রত্যেকটা শ্বাসপ্রশ্বাস অবধি এরা দুজন বিডন স্ট্রিটে ফোন করে জানিয়ে দেয়।

এই যে তার ফিয়াট গাড়ির ডিকিতে মাইক্রোওয়েভের বাক্সটি নিয়ে সে বাড়ি ফিরছে এটা দু'একদিনের মধ্যেই রাষ্ট্র হয়ে যাবে। ফি রোব্বার সে বিডন স্ট্রিটে মাকে দেখতে যায়। আর তখন কৃতকর্মের জন্য তাকে

শতেক গঞ্জনা শুনতে হয় নানাজনের কাছে। মাইক্রোওয়েভ তাকে যথেষ্ট বেগ দেবে।

হেমাঙ্গ কি বোঝে না যে এত জিনিসপত্র কোনও কাজের নয়? অবুঝ হেমাঙ্গর ভিতরে একজন যুক্তিবাদী হেমাঙ্গও বাস করে। যুক্তিবাদী হেমাঙ্গ ভালই জানে, এই সব জিনিসপত্র কেনা মানে দূর্লভ অর্থশক্তির অপপ্রয়োগ মাত্র। অবুঝ হেমাঙ্গ বলে, আরে, আয়ু তত দুদিনের। যা ইচ্ছে যায় তা করে নেওয়াই ভাল।

ডিকি থেকে বাক্সটা ওপরে তুলে দিল ফটিক। ফটিক একটি বেশ লোক। হেমাঙ্গর সব কথাতেই সে সায় দেয় এবং যথেষ্ট খাতির করে। ফটিকের বয়স ষাটের ওপর এবং হেমাঙ্গর বয়স ত্রিশের নিচে হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে।

বাক্স খুলে জিনিসটা বের করে রান্নাঘরের তাকে রেখে প্লাগ লাগিয়ে হেমাঙ্গ বলল, জিনিসটা দেখেছ ফটিকদা?

ফটিক সবিস্ময়ে চেয়ে থেকে বলে, রান্নাঘরে টিভি দিয়ে কি হবে দাদাবাবু?

এটা টিভি নয়। মাইক্রোওয়েভ। এতে রান্নাবান্না হয়। বসে দেখ।

ফটিক উবু হয়ে বসল। তার চোখের সামনে চোখের পলকে ফ্রিজের ঠাণ্ডা খাবার গরম করে ফেলল হেমাঙ্গ। পাঁপর সেঁকল। বিনা জলে আলু সেদ্ধ করল।

দেখলে?

ই রে বাবা! এ তো দেখছি অশৈলী কাণ্ডকারখানা! ধোঁয়া নেই, শব্দ নেই, তা হলে কী হল কাণ্ডখানা!

মাইক্রোওয়েভ হল পৃথিবীর নতুন বিস্ময়। আলট্রা মডার্ন জিনিস।

তাই তো দেখছি।

ফটিকের জিনিস এত কম যে সেটাও হেমাঙ্গর কাছে বিস্ময়। ফটিকের সম্বল মাত্র একটা তোলা উনুন, একখানা কড়াই, একটি হাঁড়ি আর থালা। একটা ঘটি, একটা বালতি, একখানা মগ ও একটা গামছা আছে তার। আছে দুটি লুঙ্গি, দুখানা ধুতি আর দু-তিনটে জামা। আবার বলতে একটা ছোট্ট চৌকি। এ সবই খুব খুঁটিয়ে লক্ষ করেছে হেমাঙ্গ। ফটিকের কাছে অনেক কিছু শেখার আছে তার। ফটিকের অতি ছোটো ঘরটায় গিয়ে মাঝে মাঝে বসে হেমাঙ্গ। চারদিকে চেয়ে ফটিকের একাবোকা সংসার দেখে। এরকমভাবেও মানুষের তো চলে যায় বেশ!

৬

ন'পাড়ার ছেলেরা তাকে পেলে কেন মারবে তা ঠিক ঠিক বলতে পারবে না পটল। বোধ হয় সে নিতু, নন্দ আর গৌরাঙ্গর বন্ধু বলে। ন'পাড়ার তাপসকে ওরা কদমতলায় ইস্কুলের পথে তিনজনে মিলে মেরেছিল। সে দলে পটল ছিল না। কাজটা ভালও করেনি ওরা। মারপিটে ন'পাড়ার বদনাম আছে। মারপিট হয়ে যাওয়ার পরদিন কলোনিতে হামলা করেছিল অন্তত বিশ জন ছেলে। হাতে রড, লাঠি, ড্যাগার অবধি। বড়রা বেরিয়ে মাঝখানে পড়ে মিটমাট করে নেয়। কলোনির লোকও জানে ন'পাড়া গুন্ডার জায়গা। তাই কেউ গা-জোয়ারি দেখায়নি। কিন্তু বাইরে থেকে মিটলেও আসলে ব্যাপারটা মেটেনি। নিতু, নন্দ আর গৌরাঙ্গ দুদিন ইস্কুল কামাই দিয়েছে, তারপর গোঁসাইপাড়া ঘুরে অনেক দূর হেঁটে ইস্কুল যাচ্ছে। পটল অত জানত না। মারপিটের পরদিন কদমতলার কাছে কিছু ছেলে তাকে তাড়া করে, বাঁশ চালিয়ে সাইকেল সমেত তাকে ফেলেও দিচ্ছিল। তার এই পুরনো সাইকেলখানা সেদিন পক্ষিরাজের মতো না উড়লে মার খেয়ে পিষে যেত পটল। আর কিছু না জানুক পটল সাইকেলটা জানে। এ গাঁয়ে সাইকেলের ওস্তাদ হিসেবে তার নাম আছে, লোকে বাহবা দেয়। তাও এই ঝাঁ—কুরকুর সাইকেল। পেত যদি একখানা এস এল আর বা স্পোর্টস সাইকেল তাহলে আরও কত কী দেখাতে পারে পটল।

ন'পাড়া যেমন ভয়ের তেমনই আরও কিছু ভয়-ভীতির জায়গা আছে তার। ওই যে পঞ্চাননের ইটভাঁটি। ও রাস্তাটা তাকে এড়িয়ে চলতে হয়। পঞ্চানন ঘোষের কাছে ইট বাবদ এখনও সাতশো টাকা বাকি। পটলকে দেখলেই ডেকে তার বাপের উদ্দেশে খারাপ খারাপ কথা শোনায়।

এ সব এড়িয়ে, চোখ কান খোলা রেখে চললে এ জায়গা যে কত সুন্দর তা জানে পটল আর গোপাল। গোপাল কখনও মুখ ফুটে বলতে পারবে না, কত সুন্দর এই গ্রামখানা। গোপালের চোখ থেকে সেটা বুঝে নেয় পটল। গোপাল পাখির ডাক শুনতে পায় না, ঝিঁঝির ডাক শুনতে পায় না, সাইকেলের ঘন্টি শুনতে পায় না। তার বোবা আর কালা পাঁচ বছর বয়সী এই ভাইটি তবু অনেক কিছু টের পায়। সবচেয়ে বেশী টের পায় বিপদ। তাদের দুই ভাইয়ের ঘরে আর বাইরে অনেক রকমের বিপদ থাকে রোজ। মায়ের মেজাজ বিগড়োলে, বাবা মাতাল হয়ে ফিরলে, কাকীমার সঙ্গে মায়ের ঝগড়া লাগলে, কাকার সঙ্গে বাবার লেগে গেলে তাদের দুই ভাইয়ের ওপরেও কিছু ঝাল ঝাড়া হয়ে থাকে। ইদানীং বটতলার কয়েকটা লোক বাবার বন্ধু জুটেছে। সেটাও এক বিপদ, কারণ লোকগুলো এলেই তাকে বাবার খোঁজে বেরোতে হয়, নয়তো নিতাইকাকাকে গিয়ে খবর দিতে হয়। নিতাইকাকা হল এ গাঁয়ের গান্ধীবাবা। সকলের ভাল করে বেড়ায়, ঝগড়া-কাজিয়া থামায়, সবাইকে

ভাল হতে বলে। নিতাইকাকা গাঁটগচ্ছা দিয়ে অন্যের সাহায্য করে, মড়া পোড়াতে যায় আর বক্তৃতাও দেয় মাইকে। তবু নিতাইকাকার মতো লোক থাকতেও বটতলায় বদমাইশি বাড়ছে, মদের ঠেক হচ্ছে, ন'পাড়ার ছেলেরা কলোনিতে ঢুকে মারপিট করে যাচ্ছে, চুরি ডাকাতি হচ্ছে, ব্ল্যাক হচ্ছে।

গান্ধীবাবাই কি পেরেছিল? এই যে দেশ ভাগাভাগি হল বলে তাদের যে সোনার দেশ ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল, তখন গান্ধীবাবা কাঁদেনি? আর সুভাষ বোস? আর শ্যামাপ্রসাদ? আরও কে যেন। সব ঠিকঠাক জানে না পটল। তবে এরকমই সে শুনেছে বটে তার ঠাকুর্দা আর বাবার কাছে।

তবে সাইকেল চালানোর সময় বেশী ভাবতে নেই। ভাবলেই বিপদ। চোখ কান একেবারে সজাগ রাখতে হয় রাস্তার দিকে। এ গাঁয়ের রাস্তাঘাট সব তার চেনা। সবসময় রাস্তা ধরে সাইকেল চালায় না পটল। তাতে অনেক ঘোরা পড়ে যায়, আর তাতে বাহাদুরীও নেই। বটতলার পানুর দোকান থেকে কেনা বনস্পতির বাটিটা তার বাঁ হাতে ধরা, ডান হাতে সাইকেলের হ্যান্ডেল, রডে গোপাল শক্ত হয়ে বসে আছে দু'হাতে হ্যান্ডেল ধরে। এই অবস্থায় সে বটতলার শীতলার থানের বাঁ দিকের রাস্তা ছেড়ে ঘোষপাড়ার মাঠে নেমে পড়েছে। চষা ক্ষেতের মতো উচু-নিচু আর ঢিবিতে ভর্তি মাঠ। বর্ষার জলে হড়হড়ে হয়ে আছে কাদা। চাকা বসে যায়, এক জায়গায় ঘুরতে থাকে।

কত কী হয়। পটল বলেই পারে। গোসাঁইপাড়ায় ঢুকবার মুখে দুধারে দু-দুটো পুকুর, মাঝখানে ক্ষয়া, পিছল, সরু একখানা রাস্তা। খুব ওস্তাদ সাইকেলবাজও এ রাস্তায় চালাবে না। নেমে হেঁটে পার হবে। পটল ঠিক পেরিয়ে যায়।

আজও পেরোচ্ছিল। কাল থেকে বৃষ্টি হয়নি। তবে আকাশ মেঘলা হয়ে থম ধরে আছে। ফ্যাকাসে মেঘ। কতকাল রোদের দেখা নেই। একটা দিন বৃষ্টি হয়নি বলে কাদাটা আঁট হয় আছে। আঁট কাদা আরও বিপদের জিনিস।

বাঁ ধারের পুকুর থেকে একটা সাপ উঠে ডানধারের পুকুরে নামতে যাচ্ছে। সেটা দেখতে পেয়েই বোধ হয় গোপাল গলায় একটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ তুলে সাবধান করছে তাকে। গোপাল ওভাবেই জানান দেয় বিপদের কথা, খিদের কথা, আনন্দের কথাও। ওই শব্দটাই তার সম্বল।

সাপকে বাঁচিয়ে চলার কোনও ইচ্ছেই নেই পটলের। সাপগুলো মহা খচ্চর। দু-দুটো পুকুর ভর্তি হাজারো জলঢোঁড়া চারাপোনা আর ছোটো মাছ সব খেয়ে ফেলে। গাঁয়ের লোক সাপ মারে না বলে ঝাড়েবংশে সাপগুলো বেড়েছে কম নয়। একটা দুটো মরলে কি যায় আসে। তাছাড়া হঠাৎ ব্রেক কষলে সাইলে উল্টে দুজনকে নিয়ে পুকুরে পড়বে। পটল ভচাক করে সাপের পেটের ওপর দিয়ে পেরিয়ে গেল। পিছু ফিরে দেখার উপায় নেই, সামনে সরু রাস্তা। এক চিলতে জায়গায় দু-দুটো চাকাকে সমান রেখে পেরোতে হবে। পৃথিবীর কঠিনতম কাজের একটা।

সমস্ত চৈতন্য আর চোখ আর মন একাগ্র রেখে রাস্তাটা শেষ করে এনেছিল প্রায় পটল। কিন্তু গোপাল তবু অস্ফুট শব্দটা করেই যাচ্ছে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ। অন্য কেউ হলে গোপালের ওই বোবা শব্দকে গ্রাহ্যই করত না। কিন্তু পটল জানে, তার এই অবোধ ভাইটাকে লোকে যা ভাবে তা নয়। সে চোখ রাস্তা থেকে তুলে এক ঝলক সামনের দিকটা দেখবার চেষ্টা করল।

দেখল, নীল শার্ট পরা কে একজন দাঁড়িয়ে আছে পথের শেষ দিকটায়। কচুবনের আড়ালে তার নিচের অংশ ঢাকা। তার মুখটা দেখতে পেল না পটল।

কিন্তু শক্ত আর জোরালো ঢিলটা সোজা এসে তার বাঁ চোখের নিচে লাগতেই মাথা অন্ধকার হয়ে গেল তার। সাইকেল টলে গেল।

পুকুরেই পড়ত পটল। সাইকেলের সামনের চাকা ডাইনে বাঁয়ে ভয়ংকর মোচড় খেল। কিন্তু মাথার অন্ধকারটা এক ঝাঁকিতে কাটিয়ে নিল পটল। তারপর প্রাণপণে প্যাডেল মারল। দুটো গর্তের মতো উচু-নিচু জায়গা ঝকাং ঝকা করে পার হয়ে সোজা নীল জামার দিকে সাইকেলখানা বাড়িয়ে দিল সে।

হুড়মুড় করে কচুবনে গিয়ে আটকাল তার সাইকেল। ততক্ষণে নীল জামা পরা ছোকরাটি হাওয়া হয়েছে। আর বাঁ চোখের কোল থেকে টপটপ করে রক্ত ঝরে পড়ছে জামায়, বনস্পতির বাটিতে।

সাইকেলটা কাত হয়ে থেমেছে। বাঁ পা বাড়িয়ে পড়ে যাওয়া আটকেছে পটল। ভয় খাওয়া মুখটা তার দিকে ফিরিয়ে চেয়ে আছে গোপাল।

ন'পাড়ার ছেলেটা একাই ছিল। দল জুটিয়ে আসেনি। ভাগ্যিস। তাই একখানা ঢিলের ওপর দিয়ে গেছে। পটল নেমে গোপালকে নামাল। তারপর সাইকেলখানা শুইয়ে রেখে পুকুরের জলে মুখের রক্ত ধুয়ে নিল। বনস্পতির বাটিটাও চুবিয়ে নিল জলে। বনস্পতি শক্ত জিনিস। জলে ধুলে ক্ষয় হয় না।

গোপাল তার দুটো অবাক চোখে চেয়ে আছে। গোলগাল, ন্যাদাভোঁদা ভাইটাকে দেখে বড় মায়া হল এখন। ঢিলটা ওরও লাগতে পারত। ভাগ্যিস ছোকরার হাতের টিপটা ভাল, তাই গোপালের লাগেনি।

পটলের রাগ হল না। রাগের চেয়ে অনেক বেশী তার ভয়। এতক্ষণে গোপাল আর সাইকেল সমেত তার জলে হাবুডুবু খাওয়ার কথা।

সাপটা খুব দাপাচ্ছে এখনও। মরেনি। এক চুলও এগোতে পারেনি। দাপাতে দাপাতে ওখানেই এক সময়ে মরে পড়ে থাকবে। ওই পাপেরই কি নগদ সাজা পেয়ে গেল পটল!

সাইকেল দাঁড় করিয়ে গোপালকে ফের রডে তুলে দিল পটল। তার ক্ষতস্থান খুব জ্বালা করছে, ফুলে উঠেছে এর মধ্যেই। চারদিকটা খুব ভাল করে দেখে নিল সে। এ দিকটায় পতিত জমি, আগাছা আর জঙ্গল। গোসাঁইপাড়া আর একটু এগিয়ে। পথটা খুব নির্জন।

কালঘড়ি না কি একটা জিনিস দেখেছে দাদু। সে জিনিস দেখলে লোকে নাকি আর বেশিদিন বাঁচে না। তার বাবা রামজীবনের যত দোষ থাক, কিন্তু নিজের মা-বাপকে বড় ভালবাসে। তাই নিয়ে বাড়িতে নানা অশান্তি হয়। কিন্তু মা-বাপের ওপর আর কারও কথাকে গ্রাহ্য করে না রামজীবন। দাদু মাঝে মধ্যে নানারকম বায়না করছে আজকাল। দিন তিনেক আগে পুলিপিঠে খেতে চাইল। বর্ষাকালে পিঠে করে না কেউ। তবু হল। আজ সকালে ঠাকুমাকে বলল, দুখানা লুচি করে দেবে? ঠাকুমা ধমক দিয়েছিল, কিন্তু বাবা বলল, না না, করে দাও। বুড়ো মানুষ, ভাল-মন্দ কিছু তেমন খাওয়াতে পারি না।

দাদু লুচির জন্য দাওয়ায় বসে আছে। আটা মাখা হচ্ছে। দেখে এসেছে পটল। আর দেরি করা ঠিক হবে না।

পটল সাইকেলে উঠে প্যাডেল মারতে লাগল। পিছনের চাকায় পাম্প কিছু কম বলে মনে হচ্ছে। গনার দোকানে আগে পাম্প করতে পয়সা লাগত না। আজকাল দশ পয়সা করে নিচ্ছে। একটা পাম্পার হলে...।

না, তাদের অত ফালতু পয়সা নেই।

বাড়ির দাওয়ায় যখন সাইকেলখানা ঠেস দিয়ে দাঁড় করাল পটল, তখন ফের রক্ত পড়ছে। তার খয়েরি জামার বাঁ দিকটায় মস্ত দাগ ধরেছে।

দরজার বাইরে থেকেই রান্নাঘরের ভিতরে বাটিটা ঠেলে দিয়ে পটল বলল, মা, এই যে লুচি ভাজার ঘি।

মা ফোঁস করে উঠল, লুচি খাওয়ার ইচ্ছে হলে বড়লোক ছেলের বাড়ি গিয়ে থাকলেই তো হয়। তিন দিনেই তো বড় গিন্নির মেজাজ সপ্তমে উঠেছিল। ঘাড় ধাক্কা দিতে পারলে বাঁচে। উঁচু বাড়িতে থাকলেই হল বুঝি। মনটা উচু করতে হয় না?

বড় ঘরের কুলুঙ্গিতে হাতকাটা তেল আছে। শিশিটা নামিয়ে কাটা জায়গায় তেলটা লাগাতে গিয়ে পটল টের পেল, ক্ষতটা বেশ গভীর। বাঁ দিকের গোটা মুখখানাই ফুলে বিষিয়ে আছে।

গোপাল তার হাঁটু ধরে দাঁড়িয়ে উর্ধ্বমুখ হয়ে দেখছে। সবসময়ে তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, সব টের পায়, শুধু কথা কইতে পারে না। শুনতেও পায় না কিছু।

হাঁটু গেড়ে বসে গোপালের করুণ মুখখানার দিকে চেয়ে হেসে পটল বলে, কিছু হয়নি রে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

লুচি ভাজার একটা উচাটন গন্ধে চনমন করে উঠল বাতাস। এই কচুঘেঁচুর সংসারে এমন বিদেশী গন্ধ বড় একটা পাওয়া যায় না। নাক উঁচু করে গন্ধটা নিল পটল। গোপাল শব্দ টের পায় না বটে, গন্ধ কিন্তু পায়।

দাদু উদাস মনে দাওয়ায় জলচৌকিতে বসে আছে। লুচি হচ্ছে। কিন্তু লুচির দিকে যেন ততটা মন নেই। সকালে লুচির কথা মনে হয়েছিল, এখন যেন ভুলে গেছে সে কথা। পাকা বাড়ির কংকালটার দিকে চেয়ে আছে।

দাদুর কাছাকাছি গিয়ে দাওয়ায় বসল পটল। কাছ ঘেঁষে গোপাল। লুচির ভাগ তারাও পাবে। সঙ্গে কিছু থাকতে পারে। না থাকলেও কিছু অসুবিধে নেই। শুধু শুধু লুচিও খেতে চমৎকার।

ও দাদু!

কি রে?

লুচির গন্ধ পাচ্ছো?

বিষ্ণুপদ মাথা নাড়ে, পাচ্ছি। হচ্ছে বুঝি?

বাঃ, হবে না! ঘি নিয়ে এলাম বটতলা থেকে।

বেশ বেশ।

তুমি কি এবার মরে যাবে?

আর কি! এবার গেলেই হয়। বাড়িটা হলে বেশ হত।

হবে তো! মিস্তিরি আসবে।

তোকে কে বলল?

শুনেছি।

বিষ্ণুপদ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, পারবে রামজীবন? শেষ অবধি পারবে তো! সাপটা যে ফণা তুলে আছে। কখন ছোবলাবে তার তো ঠিক নেই কিনা।

সাপ! কোন সাপের কথা বলছো?

মরণের কথা রে। যে শালা সারাটা জীবন ফণা তুলে রইল। সাপের ছায়া লম্বা হয়ে পড়ে আছে আমাদের ওপর। কবে কখন মর্জি হবে, দেবে বলে। তা সেই সাপের ছায়ায় বসে তো, কিছুই নিশ্চয় করে বলা যায় না। মানুষের সব ঠাট-ঠমক তার কাছে বড় জব্দ।

পটল কথাটা ভাল বুঝল না। চুপ করে রইল। সামনেই তাদের পাকা বাড়ি আধখানা উঠে থেমে আছে কবে থেকে। পঞ্চানন ঘোষ আর ইঁট দেবে কি? সাতশো টাকা এখনও বাকি। তবে কয়েক বস্তা সিমেন্ট এসেছে কয়েকদিন আগে। পটল যতদূর জানে, এ চোরাই সিমেন্ট। বটতলার গিরীনের চায়ের দোকানে কাজ করে পাঁচু। সেই বলেছে, একটা সিমেন্টের ট্রাক লুঠ হয়েছে ক'দিন আগে। পুলিশ এল বলে।

পুলিশ এখনও আসেনি। আসবে কিনা কে জানে। বাড়িটার ওপর দাদুর খুব টান।

তুমি কী একটা জিনিস যেন দেখেছে দাদু! কালঘড়ি না কী যেন।

কত কী দেখি। মানে বুঝতে পারি না। বুঝলি! তোদের যেমন মানে-বই আছে, শব্দের অর্থ, বাক্যের অর্থ দেওয়া থাকে, ঠিক তেমনি একখানা মানে-বই থাকলে ভাল হত। আজকাল তো কত সরল জিনিসকেও ভারি গোলমেলে লাগে। হ্যাঁ রে, বটতলা থেকে তোর বাবার খোঁজে কারা সব আসে? তারা কি ভাল লোক?

না দাদু। খুব হেক্কোড় মানুষ সব।

কথাটা কী বললি? হেক্কোড় না কি? ওটার মানে কি?

সবাই বলে ওরা সব হেক্কোড়। খারাপ লোক।

কিসের খারাপ করে তারা?

কে জানে! চাউনি দেখলে ভয় ভয় করে।

তা হবে। আগে দুনিয়ায় এত খারাপ লোক ছিল না। এখন খুব হয়েছে, না রে?

পটল মাথা নেড়ে বলে, সবাই ওদের খুব ভয় খায়। খাতির করে চলে।

বিষ্ণুপদ একটা শ্বাস ফেলে বলে, ওই বাস রাস্তাটা না হলেই ভাল ছিল। যতদিন হয়নি ততদিন গণ্ডগোল ছিল না। যখন প্রথম এসেছিলাম দেশ থেকে তখন কেবল চাষাভুষোর রাজত্ব। এক পাল এসে এখানে সেখানে বাঁশ গেড়ে বেড়া তুলে বসে গেলাম। ক্রমে জমিজিরেত একটু হল। কষ্ট ছিল, কিন্তু তেমন ভয়ডর ছিল না।

চোর ছিল না?

খুব ছিল। চোর ডাকাত ব ছিল। তবু ভয় ছিল না। কেন জানিস? এমন মদ আর জুয়ায় ছয়লাপ ছিল না চারদিকে। চোর ডাকাত বাইরে থাকবেই। সে থাকুক। ভয়টা হল, চোর ডাকাত যখন ভিতরে হয়ে ওঠে।

সেটা কেমন?

বললেই কি বুঝতে পারবি? চোর ডাকাতেরা আগে বাইরে থেকে আসত। আজকাল সব গা ঘেঁষেই বসত করে। এমন কি আমাদের মধ্যেই গজিয়ে ওঠে।

মেজো বউ রাঙা লুচির থালা নিয়ে বিরক্ত মুখে দাওয়ায় উঠে এসে বলল, লুচি খাবেন তো! বসুন।

বিষ্ণুপদ একটু অবাক হয়ে বলল, অবেলা হয়ে যাবে না?

খেতে চাইলেন যে!

ক'টা বাজে জানো?

ন'টা হবে বোধ হয়। নিন, গরম আছে।

বিষ্ণুপদ তবু হাত গুটিয়ে থাকে। আমতা আমতা করে বলে, তোমার শাশুড়ি কোথায় গেল?

দোকানে পাঠিয়েছি। ফোড়নের সর্ষে আনতে গেছে। থালাটা ধরুন, আমার মেলা কাজ পড়ে আছে।

ওদের দেবে না?

ওরা সকালে ভাত খেয়েছে।

দু'খানা করে দাও। এখান থেকেই দাও। এ তো মেলা লুচি দেখছি, একটা পল্টনের খোরাক।

আপনার ছেলে হুকুম দিয়ে গেছে যেন সাধ মিটিয়ে খাওয়াই। কম করতে ভরসা হয়নি, তাহলে তো এসে কিলোবে।

বিষ্ণুপদ লুচির থালাটা ধরে থাকে। রঙা চলে যাওয়ার পরও ধরে থাকে। খায় না। ইচ্ছেটা মরে গেছে।

ও দাদু, খাও।

কি জানি কেন, খেতে ইচ্ছে যাচ্ছে না। তোর ঠাকুমাকে ডাকবি একটু?

লুচি দেখেই বোধ হয় একটু চঞ্চল হয় গোপাল। ঘন ঘন ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে। ওই শব্দ ছাড়া

আর কিছু জানে না। মাতাল রামজীবন মাঝে মাঝে মধ্যরাত্রে ছেলেটাকে ঘুম থেকে তুলে বড্ড মারে। মারে আর বলে, কথা ক' হারামজাদা, কথা বের কর মুখ থেকে। বোবা হয়ে আমাকে জব্দ করবে ভেবেছো শালা? মারের চোটে তোর মুখ দিয়ে কথা বের করে ছাড়বো।

তারপর পেটায় আর পেটায়। কেউ থামাতে পারে না। সারা বাড়িতে হুলুস্থুল পড়ে যায়।

আর অত মারের চোটেও কাঁদতে পারে না গোপাল। শুধু গোঁ গোঁ শব্দ করে, আর ফোঁপায়। আর কাঁপে। থরথর করে কাঁপে।

মাও মারে। যখন তখন মারে। গোপালের কোনও বায়না নেই। তবে খিদে আছে। খিদে পেলে জিনিস ভাঙে। লাফায়। ছোটাছুটি করে বিপদ ডেকে আনে। তখন মারে মা।

গোপালকে বোঝে শুধু পটল। আর কেউ নয়। বড় হলে সে গোপালকে নিয়ে দূরে গিয়ে থাকবে। এ বাড়িতে থাকবে না। এদের সঙ্গে থাকবে না।

দাদু লুচি ভাগ করে দিল দুজনকে। দুটো করে।

দুপুরে রামজীবন ইরফান মিস্ত্রিকে নিয়ে ফিরল। খুব কথা হচ্ছিল দুজনে। ইরফান পাকা ঘরখানা ঘুরে ফিরে দেখছে।

কত দিনে পারবে ইরফান?

বাদলাটা না ছাড়লে তো কঠিন হবে রামজীবন!

তাই যদি হবে তো তোমাকে ডাকলুম কেন? তুমি ওস্তাদ লোক, খাড়া করে দাও।

ভারী জল না হলে হয়ে যাবে। নইলে বালি সিমেন্ট সব ধুয়ে যাবে। পয়সা বরবাদ।

হবে না কিছুতেই?

ইরফান দোনোমোননা করে বলে, ডবল খাটনি না পড়ে যায়। বালি সিমেন্ট সব রেডি আছে?

এনে ফেলব।

ইট ভিজিয়ে রাখবেন। রবিবার এসে হাত লাগাব। একটু কাগজ-কলম দিন। ইট সিমেন্ট আর বালির হিসেবটা লিখে দিয়ে যাই। লোহার শিক, বাঁশ এসবও লাগবে।

সে তো খোকাটিও জানে। লেখো, লিখে দিয়ে যাও।

রামজীবন চান করতে গেল। পটল দুনিয়া ভুলে ইরফানের কাছ ঘেঁষে বসে রইল।

মাটি থেকে ইঁট। ইঁট সাজিয়ে বাড়ি। একটা থেকে আর একটা, তা থেকে আর একটা কেমন হয়ে ওঠে। পটলের বড় ভাল লাগে। মাটি থেকে ইট। ইট থেকে বাড়ি।

আবার সেই বাড়িও পুরনো হয়। ভেঙে ভেঙে পড়ে। মাটিতে মেশে। মাটি হয়ে যায়। আবার মাটি থেকে ইট। ফের ইট সাজিয়ে বাড়ি।

৭

পৃথিবী কি দাড়ি কামায় বাবা?

না না, পৃথিবী মোটেই তার খোঁচা খোঁচা দাড়ি কামাতে চায় না। কিন্তু মানুষ বারবার জোর করে তার খেউরি করে দিচ্ছে। পৃথিবীর দাড়ি হল সবুজ। যদি আকাশের অনেক ওপরে কোনও স্যাটেলাইটে বসে দেখ, তাহলে দেখবে ওই সবুজ কত সুন্দর! গ্লোরিয়াস গ্রিন। আর কোনও গ্রহই এত সুন্দর নয়।

তুমি কি করে দেখতে পাও বাবা?

আমি চোখ বুজে ভিসুয়ালাইজ করি। আমাদের মোটে দুটো চোখ, তা দিয়ে তো অত দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু কল্পনাশক্তিও আর একরকম চোখ। তা দিয়েও দেখা যায়। কিরকম জানো? কালো মিশমিশে আকাশে সবুজ আর নীলে মেশানো একটা স্নিগ্ধ মুখ। মাথায় বরফের সাদা চুল, গলায় বরফের সাদা একটা বো।

চোখ বুজলে আমিও দেখতে পাবো?

নিশ্চয়ই পাবে। তুমি তো ছোটো, তোমার ইমাজিনেশন আরও ভাল। তুমি সহজেই পারবে।

কিন্তু পৃথিবীর দাড়ি কামানোর কথাটা বললে না!

পৃথিবীর দাড়ি হল তার গাছপালা, শস্যক্ষেত্র। একমাত্র পৃথিবী ছাড়া দৃশ্যমান কোনও গ্রহে প্রাণের লেশমাত্র নেই। তাই পৃথিবী তুলনাহীন। প্রাণহীন নিথর সৌরমণ্ডলে শুধু এই একটা গ্রহেই গাছ জন্মায়, জীবজন্তু ঘুরে বেড়ায়, মানুষ কথা বলে। কিন্তু এই গ্রহের সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণীটিই সবচেয়ে বেশী বোকা। সে পৃথিবীর সবুজ দাড়ি কামিয়ে দিতে চাইছে আর ডেকে আনছে সর্বনাশ। সে ব্রাজিলের রেন ফরেস্ট থেকে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল সব জায়গা থেকেই কেটে নিচ্ছে গাছ। গাছ কেটে বসতি বানাচ্ছে, কলকারখানা বসাচ্ছে, কাঠ পুড়িয়ে আগুন জ্বালছে, কাঠ দিয়ে আসবাব আর ঘরবাড়ি বানাচ্ছে। গাছ কাটছে, কিন্তু সেই পরিমাণে গাছ বসাচ্ছে না। এইভাবে চলতে থাকলে একদিন স্যাটেলাইট থেকে দেখা যাবে, কালো আকাশে যে সুন্দর ঢলঢলে নীলচে সবুজ হাসি-হাসি মুখখানা ভেসে থাকত সেটা একেবারে পাঁশুটে হয়ে গেছে। বুঝতে পারলে?

কেন এরকম হবে বাবা?

তুমি সব ঠিকঠাক বুঝতে পারবে না। শুধু জেনে রাখো, গাছ কাটা খুব খারাপ। জঙ্গল উড়িয়ে দেওয়া খুব খারপ। পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখছে গাছপালা। পৃথিবীর গাল থেকে ওই সবুজ দাড়ি কখনও কামিয়ে ফেলা উচিত নয়। যখন বড় হবে তখন তোমার যেন কথাটা মনে থাকে।

কৃষ্ণজীবনের সঙ্গে তার ছোট ছেলে দোলনের খুব ভাব। এতটা ভাব কৃষ্ণজীবনের সঙ্গে আর কারও নয়। দোলনের মধ্যে সে নানা ভাবে নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছে। তার মত, তার চিন্তা, তার যত জ্ঞান। বারো বছরের দোলনের অত বুঝবার ক্ষমতাই নেই। তবু সে বাবাকে গ্রহণ করার প্রাণপণ চেষ্টা করে। দোলন বোধহয় টের পায় সে ছাড়া কৃষ্ণজীবনের আর কোনও বন্ধু নেই।

কথাটা ঠিক। কৃষ্ণজীবনের তেমন কোনও বন্ধু নেই, যাকে সে সব কথা উজাড় করে বলতে পারে। তা বলে কৃষ্ণজীবনের যে অনেক কথা বলার আছে তাও নয়। তার মুখে যেমন কথা খুব কম, তার ভিতরেও তেমনি কথা খুব কম। তার মন ও মস্তিষ্ক দুটোই কিছুটা বোবা।

সাত তলার ওপর একটি সুন্দর ফ্ল্যাটে কৃষ্ণজীবন থাকে। এ তার নিজস্ব ফ্ল্যাট। সে ও তার স্ত্রী রিয়া এই ফ্ল্যাটের যুগ্ম মালিক। অথচ কেন কখনও এই ফ্ল্যাটটা তার নিজস্ব বলে মনে হয় না? কেন নিজস্ব বলে মনে হয় না তার আর দুটি সন্তান ও স্ত্রীকে?

এক অজ পাড়াগাঁয়ের উদ্বাস্তু বসতির ভাঙা ঘর থেকে এতদূর এসেছে সে। কিন্তু নিজের সবটুকুকে আনতে পারা গেছে কি? সবটুকু কৃষ্ণজীবন কি আনতে পারল? না বোধহয়। টেনে হিঁচড়ে আনতে গিয়ে কৃষ্ণজীবনের খানিকটা পড়ে রইল সেই ভাঙাচোরা মেটে বাড়ির আশেপাশে, খানিক পড়ে রইল পথে-বিপথে, খানিকটা কৃষ্ণজীবন এল। কিন্তু পুরোপুরি হল না এই আসা।

যার নাম কৃষ্ণজীবন, যার বাপের নাম বিষ্ণুপদ, তার বউয়ের নাম কি করে হয় রিয়া? কৃষ্ণজীবন আর রিয়া—এ যেন এক বিষম অসবর্ণ জোড়। না, বর্ণে তাদের অমিল নেই। তারা দুজনেই কায়স্থ। কিন্তু শুধু বর্ণে মিললেই কি হয়! কত যে অমিল! রিয়া তাকে এক সময়ে বলেছিল, আজকাল কত লোক তো এফিডেভিট করে নাম বদলায়। তুমিও বদলে ফেল না!

ভারী আশ্চর্য হয়েছিল কৃষ্ণজীবন। বলেছিল, কেন?

শোননা, রাগ কোরো না। পুরোপুরি বদলাতে বলছি না। শুধু জীবনটা ছেঁটে দাও। কৃষ্ণ নামটা চলবে।

কৃষ্ণজীবন গম্ভীর হয়ে বলেছিল, এটা যে খুব অপমানজনক রিয়া।

তার মাথা ছিল পরিষ্কার। লেখাপড়ায় ধুরন্ধর। আর চেহারাখানা বেশ লম্বা চওড়া, সুদর্শন। এ দুটি জিনিস তাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। যদিও যে ততদূর বিষয়বুদ্ধির অধিকারী নয় যাতে নিজে থেকেই এ দুটি মূলধনকে কাজে লাগাবে। সে ততদূর খারাপ ও ধান্দাবাজও নয়। কিন্তু চেহারা আর মেধা আপনা থেকেই রচনা করে গেছে তার পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিককে। উত্তর চব্বিশ পরগণা থেকে কলকাতা। ওই মেধা ও চেহারার মৃগয়ায় একদিন শিকার হয়ে গেল রিয়াও।

কিংবা ঠিক তাও নয়। কে করে শিকার তা কে বলবে?

আজ সাততলার এই ফ্ল্যাটবাড়িতে তার অবিশ্বাস্য অধিষ্ঠান। সে থাকে, রিয়া থাকে, তার দুই ছেলে আর মেয়ে থাকে। থাকে, তবু কিছুতেই থাকাটাকে তার বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। কেবলই মনে হয়, এ সবই স্বপ্ন। একদিন ভেঙে যাবে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠে দেখবে, সব ফক্কিকারি।

এত দুঃসহ ছিল তাদের দারিদ্র্য যে, যখন ক্লাস এইটে পড়ে তখন থেকেই তাকে টিউশনি করতে হত। জনপ্রতি দশটাকা করে রেট ছিল। তিনটে বাড়ি ঘুরে ঘুরে ছোটো ক্লাসের ছেলেদের পড়াত সে। সেই বয়সের তীব্র খিদের কথা কৃষ্ণজীবন কখনও ভুলতে পারে না। কখনও নেমন্তন্ন-বাড়ির ডাক পেলে কী যে আনন্দ হত।

ওই খিদেই তাকে জাগিয়ে রাখত রাতে। সে পড়ত। ওই খিদেই শান দিত তার মেধায়। সে বরাবর ফার্স্ট হত। ওই খিদেই তাকে চনমনে, উচাটন রাখত সবসময়। তাই সে সাহস করে পড়তে আসত কলকাতায়। কত দূরে রেল স্টেশন! কতক্ষণ ধরে ট্রেনের ধকল। তারপরও অনেকটা হেঁটে কলেজ। গাড়িভাড়া নেই, টিকিট নেই, বইপত্র নেই, খাতা কলমেরও অভাব। ট্রেনে টিকিট কাটত না। কতবার ধরা পড়ে নাকাল হয়েছে। তিন চারবার হাজতে নিয়ে গেছে তাকে। সুন্দর চেহারা দেখে এবং অতিশয় দরিদ্র এবং ছাত্র বলে ছেড়ে দিয়েছে শেষ অবধি। মেয়াদ হয়নি।

আজ খিদেটা নেই। আজ তার ভিতরটা মৃত।

তার বাবা এক বোকা মানুষ, তার মা এক বোকা মানুষ। তাদের বোকাসোকা সব ছেলেমেয়ে। তাদের মধ্যে এই একজন হঠাৎ কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল তা দেখে সবাই ভয় খেল, অবাক হল। কলেজ ইউনিভার্সিটি সে টপকাল হরিণের মতো লঘু পায়ে। কোথাও আটকাল না। বরাবর দারুণ ভাল রেজাল্ট। বড় আশায় বুক বেঁধেছিল বোকা বাবা আর মা। ভাইবোনরা ঝকমক করত দাদার অহংকারে। ক্লান্ত দিনশেষে যখন গাঁয়ের বাড়িতে ফিরে যেত তখন জোনাকি পোকা, অন্ধকার আর আপনজনেরা ঘিরে ধরত তাকে। সেও কত স্বপ্ন দেখত।

চাকরি বাঁধাই ছিল তার। পড়াশুননা শেষ করতে না করতেই সে অধ্যাপনায় বহাল হল। প্রথমে কলেজে। রিয়া তার অধ্যাপকজীবনের প্রথম বছরের ছাত্রী। সেও এক অধ্যাপকের মেয়ে। একটু ফাজিল, ফচকে ধরনের মেয়ে। নবাগত অধ্যাপকটির সঙ্গে খুনসুটি করতে গিয়েই বোধহয় বিপদে পড়ল। বিয়ে হতে দেরী হয়নি।

যৌবনের উন্মাদনা ছাড়া আর কি! উন্মাদনা মানেই পাগলামি। হিসেব-নিকেশহীন কিছু ঘটিয়ে ফেলা। সেই উন্মাদনা ছিল না বলেই রিয়ার বাবা তাদের গাঁয়ের বাড়ি ও পরিবারের অবস্থা দেখে এসে বিয়েতে অমত করলেন। রিয়া উল্টে গোঁ ধরল।

বিয়েটা শেষ অবধি হল বটে, কিন্তু বয়ে আনল নানা উপসর্গ আর জটিলতা। গাঁয়ের ওই বাড়িতে গিয়েই বিবর্ণ হয়ে গেল রিয়া। এই বাড়ি? এইসব অতি নিম্নমানের মা-বাবা-ভাইবোন? বোকা, আহাম্মক, হিংসুটে, লোভী! প্রত্যেক রাতে প্রেমের বদলে তাদের ঝগড়া হতে লাগল। প্রতি রাতে কাঁদত রিয়া। আর প্রতিদিন সকাল থেকে কৃষ্ণজীবনের ভাইবোনদের সঙ্গে মন কষাকষি শুরু হত রিয়ার। এই সাঙ্ঘাতিক অবস্থায় বড় কাহিল আর অসহায় আর একা হয়ে পড়ছিল কৃষ্ণজীবন।

দু'মাসের মধ্যে তাকে চলে আসতে হল কলকাতার ভাড়া বাসায়। বড় কষ্ট হয়েছিল কৃষ্ণজীবনের। কারণ সে ফাটলটা দেখতে পেয়েছিল। সে জানত, নিজের আপনজনদের সঙ্গে এই যে বাঁধন কাটল আর কিছুতেই তা গিঁট বাঁধা যাবে না। গাদাবোটকে টেনে নিয়ে যাবে একটি লঞ্চ—এরকমই আশা ছিল সকলের। কিন্তু লঞ্চ শিকল কেটে তফাত হল। সংসারের গাদাবোট যেখানে ছিল পড়ে রইল। উত্তর চব্বিশ পরগনার ওই অজ পাড়াগাঁয়ে আজও তার স্তিমিত পরিবারটি অভাবে, অশিক্ষার অন্ধকারে পড়ে আছে। অভাবের সংসারে ঝগড়া-কাজিয়া-অশান্তি আর নানা পঙ্কিলতার মধ্যে।

কৃষ্ণজীবন পারত। পারল না।

কে কার শিকার তা বুঝে ওঠা মুশকিল। আজ তো কৃষ্ণজীবনের মনে হয়, এক লোলুপ বাঘের থাবার নিচে লম্বমান পড়ে আছে তার মৃতদেহ। ধীরে ধীরে বাঘটা তাকে খেয়ে ফেলছে। তার কিছু করার নেই।

না, রিয়াকে সেই বাঘ ভাবে না কৃষ্ণজীবন। গোটা পরিস্থিতিটাই সেই বাঘ। রিয়া তার একটি থাবা মাত্র।

মাইনে কম ছিল তখন। তবু কষ্টেসৃষ্টে টাকা পাঠাত কৃষ্ণজীবন। প্রতি শনিবারে রবিবারে যেত গাঁয়ের বাড়িতে। আর তখন তাকে চোখা চোখা কথা শোনাতো ভাইবোনেরা। বিশেষ করে বোনেরা। বউয়ের চাক, ব্যক্তিত্বহীন ভেড়া, স্ত্রৈণ। এতকাল কৃষ্ণজীবনের মুখের ওপর কথা বলার সাহসই কারও ছিল না। এই গরিব, গৌরবহীন পরিবারে কৃষ্ণজীবন ছিল প্রায় গৃহদেবতার মতো সম্মানের আসনে। সবাই তাকে তোয়াজ করত, ভয় পেত। কিন্তু বিয়ের পর সব ভাঙচুর হয়ে গেল। একদিন তার বোন বীণাপাণি বলেছিল, তুই তো লেখাপড়া শিখে ভদ্রলোক হয়ে গেছিস, আমরা সেই ছোটলোকই আছি, আমাদের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখার দরকার কি তোর?

সবচেয়ে বেশী লেগেছিল ভাই রামজীবনের সঙ্গে। আগে খুব.বশংবদ ছিল রামজীবন। কি কারণে কে জানে, সেই রামজীবনই তার ওপর ক্ষেপে গেল সবচেয়ে বেশী। এক শনিবার বিকেলে সামান্য কিছু জিনিসপত্র নিজের পরিবারের জন্য নিয়ে গিয়ে গাঁয়ের বাড়িতে হাজির হয়েছিল সে। তার পদার্পণমাত্র বাড়ির আবহাওয়া থমথমে করে উঠল। ভিতরে ভিতরে একটা আক্রোশ পাকিয়ে ছিল আগে থেকেই। সন্ধের পর রামজীবন মদ খেয়ে ফিরল। মাতাল নয়, তবে বেশ টং। ফিরেই তাকে দেখে বাবার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল, এই তো আপনার লেখাপড়া জানা ছেলে এসে গেছে। শালা মেলা লেখাপড়া করেছে। মেলা বই পড়েছে। মেলা ভাল ভাল কথা জানে। কিন্তু শালা নিজের পরিবার, নিজের ভাইবোনের জন্য এক ফোঁটা বিদ্যে খরচ করেনি। করেছে বাবা? আপনিই বলুন, আমাদের কোনওদিন ডেকে বলেছে, আয় তোকে এটা বুঝিয়ে দিই বা সেটা শিখিয়ে দিই? কোনওদিন জিজ্ঞেস করেছে যে, আমরা কে কোন ক্লাসে পড়ি? আপনার বিদ্যাধর ছেলে শুধু নিজেরটা গুছিয়ে নিয়েছে। আর আমরা শালাকে তেল দিয়ে গেছি। বলুন সত্যি কিনা! আপনার গুণধর ছেলে এখন কলেজে পড়ায়, ছেলেদের ভাল ভাল জ্ঞানের কথা শেখায়। কী শেখাবে ও বলুন তো! ওর চরিত্র আছে, না মায়াদয়া আছে? ও জানে, মা-বাবা ভাই-বোনকে কেমন করে শ্রদ্ধাভক্তি করতে হয়, ভালবাসতে হয়? লেখাপড়া জানা বউকে দিয়ে আমাদের কম অপমান করে গেল? সব শেখানো ছিল আগে থেকে।

রামজীবন যে মদ খায় তা জানত না কৃষ্ণজীবন। হয়তো আগে খেত না। সম্প্রতি ধরেছে। মদ পয়সার জিনিস। এ বাড়িতে চাল কেনার পয়সা জোটে না তো মদ কেনার পয়সা আসবে কোত্থেকে? কৃষ্ণজীবন জীবনে খুবই কম আত্মবিস্তৃত হয়েছে। সেদিন হল। ওই মাতাল অবস্থায় রামজীবনের চেঁচামেচি তার সহ্য হয়নি। তার ওপর রামজীবন তাকে শুয়োরের বাচ্চা ও বেজন্মা বলে গাল দিয়েছিল। মায়ের পেটের ভাই হয়েও দিয়েছিল। সে উঠে তেড়ে গিয়েছিল রামজীবনের দিকে, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

রামজীবন একা নয়, সঙ্গে সঙ্গে তার সব ভাইবোন যেন এককাট্টা হয়ে উল্টে তেড়ে এল তার দিকে। বিস্তর চেঁচামেচি হয়েছিল। তার মধ্যে রামজীবনের একটা কথা খুব কানে বাজে আজও, তোর টাকায় আমরা পেচ্ছাপ করি। তোর লেখাপড়া জানার মুখে পেচ্ছাপ করি।

রামজীবনকে খুন করতে পারলে সেদিন তার জ্বালা জুড়োত। কিন্তু আজ আর সেই রাগটা তার নেই। কৃষ্ণজীবন আজ বুঝতে পারে তাকে বড় বেশী ভালবাসত তার পরিবার, অনেক নির্ভর করত তার ওপর, তাকে ঘিরেই ছিল ওদের স্বপ্ন। সেই স্বপ্নকে চুরমার করে দিয়েছে তো সে নিজেই।

সেই রাতেই ফিরে এল কৃষ্ণজীবন। সে কি মারতে গিয়েছিল রামজীবনকে? সে কি আত্মবিস্মৃত হয়েছিল? তার সঙ্গে কি ওদের আর সম্পর্ক থাকবে না? কী হল! সে কিছুতেই এইসব ঘটনার জট খুলতে পারল না। শুধু টের পেল, তাকে ঘিরে একটা অদৃশ্য পোকা একটা গুটি বুনে যাচ্ছে। তাকে বন্ধ করে দিতে চাইছে নিজস্ব খোলের মধ্যে।

কলকাতার বাসাই বা কোন কোল পেতে বসে ছিল তার জন্য? অভাবী সংসার থেকে মেধা দিয়ে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল সে, কিন্তু গা থেকে গাঁয়ের গন্ধ মোছেনি, মুছে যায়নি তার নিম্নবিত্ত, প্রায় অশিক্ষিত পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড। সে নিজেও টের পায়, সে পুরোপুরি ভদ্রলোক নয়, খানিকটা পেঁয়ো, খানিকটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন। রিয়া ঝকঝকে আধুনিক, ছলবলে, স্মার্ট। অসবর্ণের সেই শুরু।

তার বাবা বিষ্ণুপদর স্বভাব হল, সংসারের কোনও ব্যাপারেই জোরালো মতামত নেই। বিষ্ণুপদ ছেলেপুলেদের শাসন-টাসন করত না। তার চোখের সামনে কোনও অন্যায় অবিচার দেখলেও বিষ্ণুপদ রা কাড়ত না। ওটাও একরকম মূক-বধিরতা। বাবার কাছ থেকে ওই স্বভাবটি পেয়েছিল কৃষ্ণজীবনও। ভিতরটা যতই টগবগ করুক বাইরেটা শান্ত। সে কখনোই চেষ্টা করেনি রিয়াকে কিছু বোঝাতে বা শাসন করতে। চেষ্টা করলেও হয়তো পারত না। রিয়া বড্ড বেশী প্রখর, বড্ড বেশী মুখর।

কৃষ্ণজীবনের ওই আংশিক মূক-বধিরতা তার আর রিয়ার মধ্যে কোনও সেতুবন্ধন রচনা করতে দেয়নি। এক ঘরে থেকেও তারা পরস্পরের অচেনা থেকে গেছে। আর রিয়া তার ওপর ক্ষেপে উঠত সেইজন্যই। রাগ বাধা না পেলে অনেকসময়ে স্তিমিত হয়ে যায়। কিন্তু অনেক সময় উল্টোটাও হতে পারে। মানুষের চরিত্র তো নানা বৈচিত্র্যে ভরা। রিয়া হয়তো চাইত, কৃষ্ণজীবন তার প্রতিবাদ করুক। তাতে বোধহয় রিয়ার ধার বাড়ত। যত সে চুপ করে থেকেছে ততই রাগ বেড়েছে রিয়ার। বাড়তে বাড়তে আজ কৃষ্ণজীবনকে প্রায় পাপোশ বানিয়ে ছেড়েছে রিয়া।

রাগের কারণ অনেক। প্রথম কারণ, কৃষ্ণজীবনের নিম্নবিত্ত, নিম্নরুচি ও নিচু কালচারের পরিবার। অর্থাৎ কৃষ্ণজীবনের ম্লান পটভূমি। আর দ্বিতীয় কারণ, কৃষ্ণজীবনের নিরীহ অনুত্তেজক ব্যক্তিত্ব। বা ব্যক্তিত্বের অভাব। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম আরও নানা দাম্পত্য কারণ তো আছেই। সব সময়ে যথেষ্ট কারণেরও দরকার হয় না।

রাগ! রাগই রিয়াকে চালায়। রাগই তার চালিকাশক্তি। তার রাগের চোটে ঝি থাকে না। বাড়িওলার সঙ্গে খিটিমিটি বাধে, ছেলেমেয়েরা জড়োসড়ো হয়ে থাকে। তাদের সংসারে আনন্দের লেশমাত্র নেই।

তাকে উসকে ভোলার জন্য, দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ করার জন্যই কি বিয়ের দু'বছরের মধ্যেই একদিন, বাচ্চার জন্য কৌটোর দুধ আনতে ভুলে গিয়েছিল বলে, রাত বারোটা নাগাদ কৃষজীবনের হাতের বোটানির ভারী বইটা কেড়ে নিয়ে সেটা দিয়েই তার মাথায় মেরেছিল রিয়া? সরাসরি হাত তোলেনি, শুধু বইটা দিয়ে মেরেছিল।

ভারী বই। খুব সজোরে এসে মাথায় লাগতেই ঢলে পড়ে গিয়েছিল সে। মাথা অন্ধকার। আঘাতটা বড় কথা নয়। মানুষ মাঝে মাঝে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে পারে। সে ওভাবে পড়ে যাওয়ায়, নিজের কৃতকর্মে অনুশোচনায় পাগলের মতো আচরণ করতে শুরু করেছিল রিয়া। কৃষ্ণজীবন মাথার সাময়িক অন্ধকার কাটিয়ে উঠে রিয়াকে সান্ত্বনা দিয়েছিল। কান্না থামিয়েছিল। বলেছিল, কিছু হয়নি। আমার একটুও লাগেনি।

আমি যে তোমাকে মারলাম? এ কী করলাম আমি?

মার! একে কি মারা বলে? তুমি বইটা রাগ করে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়েছিলে। আমিই তো এগিয়ে যেতে গিয়ে —— ঠিক গুছিয়ে মিথ্যেটা সাজাতে পারল না কৃষ্ণজীবন। সেই দক্ষতা তার নেই। তবে কাজ হল। রিয়া শান্ত হল।

কিন্তু অনেকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, তুমি খুব অদ্ভুত!

এ কথাটা কৃষ্ণজীবনের বিশ্বাস হয়। সে কিছু অদ্ভুত। রিয়া মিথ্যে বলেনি।

তার নিজের চারদিকে একটা গুটিপোকার খোলস আছে। প্রকৃত কৃষ্ণজীবন বাস করে সেই খোলের মধ্যে। সেখানে শক্ত হয়ে থাকে সে। বাইরের কারও সঙ্গেই তার সম্পর্ক রচিত হতে চায় না সহজে।

সম্পর্ক রচনা হল না তার বড় দুই সন্তানের সঙ্গেও। ব্যস্ততা বা সময়ের অভাব নয়, আগ্রহের অভাব নয়। অভাব পড়ল বাক্যের। অভাব পড়ল ভাব প্রকাশের। যখন ছোটো শিশু ছিল তখন একরকম। যখন বড় হল, বুঝতে শিখল, মতামত হতে লাগল, তখনই অন্যরকম।

আজ সাততলার ফ্ল্যাটে তার সংসার। রিয়া আর সে দু'জনেই অধ্যাপনা করে। মিলিত রোজগার আর ধার মিলিয়ে কষ্ট করে কেনা। ধার এখনও অনেক শোধ হওয়ার বাকি। কিন্তু কোনওদিন এই ফ্ল্যাটটার সঙ্গেও কেন একটা আপন-আপন ভাব: রচনা করা হল না কৃষ্ণজীবনের পক্ষে? কেন কেবলই মনে হয় এ পরের বাড়ি?

এইসব কারণেই কৃষ্ণজীবনের কেবল মনে হয়, তার সবটুকুকে সে জড়ো করতে পারেনি আজও। এখানে ওখানে তার টুকরো-টাকরা পড়ে আছে আজও। অনেকটাই পড়ে আছে ওই অজ পাড়াগাঁয়ে। মেটে ঘর, দারিদ্র্যের ক্লিষ্ট ছাপ চারদিকে, প্রতি পদক্ষেপে এক পয়সা দু'পয়সার হিসেব রাখতে হয় মাথায়। নুন আনতে সত্যিই পান্তা ফুরোয়। তবু সেইখানে তার অনেকটা পড়ে আছে।

কৃষ্ণজীবন একবার একটা পেপার পড়তে আমেরিকা গিয়েছিল। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে যেতে হয়েছিল তাকে। রিয়ার ইচ্ছেতেই বিশেষ করে। স্বামী একবার বিদেশ ঘুরে এলে তার মুখ কিছু উজ্জ্বল হয়। ফলে একটা আলগা আমন্ত্রণপত্র যা বিশ্ববিদ্যালয়ে হামেশাই আসে, ব্যক্তিবিশেষকে নয়, সেই নৈর্ব্যক্তিক একটি আমন্ত্রণলিপিকে অবলম্বন করে, বিস্তর চিঠি চালাচালির পর সে রাহাখরচ ও অন্যান্য ক্ষতি স্বীকার করে গিয়েছিল। সেখানে সেই ঝা-চকচকে, উন্নত বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সভ্যতার দেশে পা দিয়েও তার মনে হয়েছিল উত্তর চব্বিশ পরগনার সেই অজ পাড়াগাঁ তার সঙ্গেই এসেছে। ধুলোটে পা, চোখে অসহায় আত্মবিশ্বাসহীন দৃষ্টি, ভিতরে কেবলই বিস্ময়ের পর বিস্ময়।

খুবই বিস্ময়ের কথা, পৃথিবীর বাতাবরণের ওপর তার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি সেখানে বিস্তর কদর পেল। শুধু হাততালি দিয়ে কদর জানানো নয়। সাহেবরা যার মূল্য বুঝতে পারে সেটাকে বাস্তবসম্মত ভাবেই কদর দেয়। একটা ফাউন্ডেশন তার যাবতীয় রাহাখরচ আর হোটেলের ব্যয় মিটিয়ে দিল। সঙ্গে দিল কিছু দক্ষিণাও। এক আশাতীত পুরস্কার। আজকাল মাঝে মাঝে তাকে আমেরিকা যেতে হয়। নিজের উদ্যোগে আর নয়, পুরোপুরি আমন্ত্রণ পেয়েই সে যায়। সারা পৃথিবী জুড়ে একটা দুশ্চিন্তা আতঙ্কে পরিণত হচ্ছে ক্রমে। ওজোন হোল, গ্লোব ওয়ার্মিং, সমুদ্রের জলস্তরে স্ফীতি। দ্বীপ রাষ্ট্রগুলি ইতিমধ্যেই চারদিকে করুণ আবেদন জানাতে শুরু করেছে ——কিছু একটা করো, নইলে অচিরে আমাদের প্রিয় ভূখণ্ড তলিয়ে যাবে সমুদ্রে।

খুবই বিস্ময়ের কথা, এই পৃথিবীকে প্রগাঢ় ভালবাসে কৃষ্ণজীবন। অন্য কারও সঙ্গে তার তেমন সম্পর্ক রচিত হয় না বটে। কিন্তু এই অদ্ভুত প্রাণময় গ্রহটির প্রতি হয়।

দোলন তার সরু গলায় খুব সাবধানে ডাকল, বাবা!

উঁ! গভীর আনমনা কৃষ্ণজীবন জবাব দিল।

কী ভাবছো বাবা?

কৃষ্ণজীবন মাথাটা সামান্য নত করে বলে, আমরা যখন ছোটো ছিলাম তখন আমাদের গাঁয়ে

অনেক গাছপালা ছিল।

তুমি কেন শুধু গাছপালার কথা ভাবছো বাবা?

কেন ভাবছি! তোমাকে যে এই পৃথিবীতে রেখে যেতে হবে আমাকে। মানুষ যে কেন তার সন্তানের কথা ভাবে না!

আমি গাছ কাটব না বাবা। আমি কখনও পৃথিবীর দাড়ি কামিয়ে দেবো না।

৮

মেঘলা দিনের কালো আলোয় ঘরের মধ্যে দুটি ছাইরঙা মানুষ দুজনের দিকে চেয়ে আছে। বাইরে সরু সরু অজস্র সাদা সুতোর মতো ঝুলে আছে বৃষ্টি। টিনের চালে ঝিমঝিম নেশাড় শব্দ। কথা নেই। বীণাপাণি আর নিমাই।

সেদিন অনেকক্ষণ পগার আচমকা মৃত্যুসংবাদটা ভাল করে বসছিল না বীণাপাণির মাথায়। কাঁদবে, না হোঃ হোঃ করে লটারি জেতার মতো আনন্দে হেসে উঠবে, সেটা তার ভিতরে তখনও স্থির হয়নি। আর ওই উজবুক লোকটা, পাঁচ ফুটিয়া, রোগাভোগা, ভীতু আর ধার্মিক লোকটা, চোখ তুলে ভাল করে বীণার দিকে যে তাকাতেই পারল না আজ অবধি, সেই লোকটা কেমন যেন চোখা চোখে চেয়ে ছিল তার চোখে। লোকটার সামনে গোছানো স্যুটকেস। একটু বাদেই চৌকাঠ পার হবে। তারপর হয়তো আর কোনওদিনই উল্টোবাগে চৌকাঠ পেরিয়ে এসে ঢুকবে না বীণাপাণির ঘরে।

বীণাপাণি এরকম অদ্ভুত অবস্থায় আর জীবনে পড়েনি। শোক, আনন্দ, উত্তেজনা, রাগ, ঘেন্না সব একসঙ্গে উথলে উঠছে ভিতরে। ঠিক এই সময়ে যদি চৌকির তলা থেকে তার পোষা বেড়াল বুঁচকি বেরিয়ে এসে তার কোলে না উঠে পড়ত, তাহলে কী যে করত বীণাপাণি কে জানে! কুঁচকিই সব কাটিয়ে দিল একটা আদুরে মিয়াঁও শব্দ তুলে। তার খিদে পেয়েছে।

বীণাপাণি বেড়ালটাকে বুকে চেপে ধরল। তার বুদ্ধি এখন স্থির নেই। মাথার ভিতরটা পাগল-পাগল। বুকটায় বড্ড দাপাদাপি। কী বলতে কী বলবে, কী করতে কী করে বসবে, কে জানে বাবা! আর ওই আহাম্মক লোকটা তাকে কেন যে ওরকম করে দেখতে লেগেছে! বীণাপাণির কি একটু কাঁদা উচিত? বাড়াবাড়ি হবে না তো!

কাঁদল না, তবে কাঁদার মতো একটা অবস্থায় সে থেমে রইল। চোখ ভরে উঠল জলে, কিন্তু গড়িয়ে পড়ল না। স্থির হয়ে জানালা দিয়ে বাইরের অজস্র সুতোর বুনটের মতো একঘেয়ে বৃষ্টির দিকে চেয়ে রইল।

নিমাই এ সময়ে একটা গলা খাঁকারি দিল। তারপর তার সরু নরম মেয়েলি গলায় জিজ্ঞেস করল, ছেলেটা কি পগার খবর দিয়ে গেল?

বীণা জবাব দিল না।

নিমাই জবাবের জন্য অপেক্ষা করল একটু। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, এরকম সব কাণ্ড হয় বলেই তোমায় বারণ করেছিলাম।

বীণা চুপ করে যেমন চেয়েছিল তেমনি চেয়ে রইল। বাইরে চুপ বটে, কিন্তু তার ভিতরে এ সময়ে একটা কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। ঠিক এরকম একটা গোলমেলে ব্যাপারের মধ্যে নিমাই চলে গেলে তার কি হবে? ওকে চলে যেতে দেওয়া কি ঠিক হবে? রাগের মাথায়, ঝোঁকের মাথায় যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। কিন্তু এখন তো সেই অবস্থাটা নেই। তাকে বুদ্ধি দেবে কে? বুদ্ধি চাইলে অনেকেই মাথা ধার দিতে আসবে, কিন্তু বীণাপাণির ভাল-মন্দ বুঝে কথা কইবে কি কেউ? তার বন্ধু অনেক, কিন্তু আত্মীয় তো এই একজনই। ম্যাদামারা, পান্তাভাত, সব ঠিক। তবু নিমাই তো লোভী নয়, পাজি নয়, ধান্দাবাজ নয়। বকাঝকা-অত্যাচার ওর ওপর কম করে না বীণা! তবু নির্ভরও করে। ওকে চলে যেতে দেওয়া কি উচিত কাজ হবে! আটকানোই বা যায় কি করে?

নিমাই উঠবার মতো একটু ভাব করে ফের বসে পড়ল উবু হয়ে, তারপর খুব সংকোচের সঙ্গে বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। এ কথাটার জবাব অন্তত মাথা নেড়ে হলেও দাও। পগা কি কাল রাতে টাকা পয়সা কিছু তোমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছে?

এই প্রশ্নটাকেই ভয় পাচ্ছিল বীণা। পগা এসেছিল সন্ধের মুখে। খুব তাড়া ছিল। বৃষ্টি হচ্ছিল তুমুল। নিমাই কোথায় বেরিয়েছে। খুব হাওয়া। হ্যারিকেনের আলোয় একখানা একসারসাইজ খাতা খুলে "পরশমণি" নামে একটা নতুন নাটকের পার্ট মুখস্থ করছিল বীণাপাণি। দরজায় ধাক্কা আর ডাকাডাকিতে উঠে দরজা খুলে দেখল, বর্ষাতি গায়ে পগা। জলে সপসপ করছে। মুখে একগাল হাসি। ফোম লেদারের ব্যাগ থেকে পলিথিনে মোড়া একটা প্যাকেট বের করে বীণার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, কাল সকালে নিয়ে যাবো।

বেশ ভারী প্যাকেট। এরা যে তাকে বিশ্বাস করে, ভালবেসে এসব রেখে যায় তা নয়। এরা জানে এদের টাকা পয়সা মেরে দিয়ে বীণাপাণি পার পাবে না। সীমান্ত জুড়ে এদের জাল বিছিয়ে রাখা আছে। সেই জাল কেটে বীণাপাণি কত দূর যাবে? যতদিন মাথা নিচু করে চলবে ততদিন ঠিক আছে। গড়বড় করলে রেহাই নেই।

বীণা বাধ্য মেয়ের মতো প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বলল, ঠিক আছে।

পগা আবার অন্ধকারে বাতাস-বৃষ্টির মধ্যে মিলিয়ে গেল। দরজা এঁটে বীণাপাণি প্যাকেটটা তোরঙ্গে রেখে তালা দিয়েছিল। এ সব প্যাকেটে কী থাকে তা তার জানতে নেই। জানতে চায়ও না সে। শুধু হেরোইন-টেরোইন না থাকলেই হল। পগা অবশ্য ও কারবার করে না। সে ডলার পাউন্ড আর টাকার লেনদেন করে।

পাউন্ড আর টাকার লেনদেন করে।

কেউ দেখেনি। কেউ জানে না।

বীণাপাণির অভিনয়ের প্রতিভা এখন কাজে লাগল। সে অকপটে নিমাইয়ের দিকে চেয়ে কঠিন দৃঢ় গলায় বলে, না। পগা রোজ আমার কাছে টাকা-পয়সা রেখে যায় না।

পার্টটা চমৎকার হল।

নিমাই চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, তাহলেই রক্ষে। নইলে বিপদ ছিল।

কিসের বিপদ?

নিমাই মাথাটা একটু নেড়ে বলে, তা কি জানি? বিপদ ওদের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে।

বিপদ থাকলে আমার ছিল, তোমার তো আর নয়। তুমি তো বাক্সপ্যাটরা নিয়ে চৌকাঠ ডিঙিয়ে পগারপার হবে। আমি পড়ে থাকব, একা মেয়েমানুষ।

নিমাই কি একটু তটস্থ হল? নড়েচড়ে বসল। তারপর স্তিমিত গলায় বলল, বিপদ তো তোমারও ছিল না। মেশামেশিটা বড্ড করে ফেললে যে ওদের সঙ্গে। ভদ্দলোকের বউ-ঝিরা কি ওরক্‌ম করে?

বীণাপাণি নিজেকে সামলাতে পারল না। থমকানো চোখের জলটা এবার নেমে পড়ল গাল বেয়ে। টপটপ করে নামতে লাগল। গালে ছ্যাঁকা দিয়ে নামতে লাগল। বীণাপাণি একটু ফুঁপিয়ে উঠে বলল, আগে বলল, আমরা কবে ভদ্রলোক ছিলাম! কবে ভদ্রলোকের মতো ছিলাম? কেউ মানে আমাকে ভদ্রলোকের মেয়ে বলে? বলো, মানে কেউ? গোনে কেউ? সেই চোখে দেখে কেউ?

নিমাই কথাটা স্বীকার করল না। ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলল, ওটা কথাই নয়। কথা হল তুমি মানো কিনা। তোমার বাবা মাস্টারমশাই ছিলেন। তোমার দাদা অত বড় বিদ্বান লোক।

বীণাপাণি কান্নার মধ্যেও ছিছিক্কার করে উঠল, তাই বুঝি আজ এই দশা আমার! বনগাঁয়ে যাত্রাদলে সঙ সাজতে হচ্ছে! রাস্তায় মুখোমুখি দেখা হলে আমার মায়ের পেটের দাদা আমাকে চিনতে চাইবে? আর বাবা! এ যাবৎ খোঁজ করেছে একবারও, মেয়েটা বেঁচে আছে না মরেছে?

আজ মাথাটা বড্ড গরম তোমার।

লোকে যখন আমাকে ভাল ভাল কথা বলে তখন আমার মুখে থুথু আসে, বুঝেছছ? আর তুমি! তুমিই বা কোন ভদ্রলোকটা শুনি! দাদার কথা বলছে, অমন মানুষের বোনকে বিয়ে করার মুরোদ কি তোমার ছিল? বাবা আহাম্মক বলেই না দিল ঝুলিয়ে!

নিমাই মাথা নিচু করেই বসে রইল। বড় অপরাধী ভাব।

আর বীণা জ্বলতে জ্বলতে ভিজতে লাগল চোখের জলে। কুঁচকি খিদে চেপে চুপ করে বসে রইল তার কোলে।

নিমাই অনেকক্ষণ বাদে গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, একটা কথা কই। কথাটা বাড়িয়ে বলছি না। বিয়ের কথাটা যখন উঠল তখন তোমার বাবাকে আমি কিন্তু বলেছিলাম, কাজটা আপনি ঠিক করছেন না মশাই। জাতে-কাটে এক হলেও, আমরা ঠিক সমান সমান নই। তা উনিও একটু বোকাসোকা মানুষ, লোক চিনতে পারেন না। বললেন, তোমার একদিন খুব উন্নতি হবে। এ আমি দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি।

বীণাপাণি নাটক করে বলেই নিজের ওপর রাশ টেনে রাখতে পারে। দমকা কান্নাটা সামলে চুপ করে বসে রইল।

নিমাই খুব ভীতুভাবে আরও একবার গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, কাজটা ঠিক হয়নি, জানি। আমি বড় নিচুতলার মানুষ। বড় পতিত। পড়েও ছিলুম কোন আঘাটায়। তোমার বাবাই কুড়িয়ে নিলেন। তা বলে সেই বুড়ো মানুষটার ওপর রেগে গিয়েও লাভ নেই। উনিও তাঁর কর্মের ফল ভোগ করছেন।

বীণাপাণি নিমাইয়ের দিকে অসুরবধের সময় মা দুর্গার মতো চেয়ে থেকে বলে, আর আমি কার কর্মফলটা ভোগ করছি শুনি! আমি কার পাকা ধানে মই দিয়ে এসেছি? দুনিয়াটা বুঝে শুনে উঠবার আগেই আহাম্মক বাপ আর একটা আহাম্মকের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে কন্যাদায় মিটিয়ে হাত ধুয়ে বসে রইল। একবার ভাবল না

মেয়েটা খাবে পরবে কি। শুধু শুনেছিলাম ছেলের নাকি স্বভাবচরিত্র ভাল। ওঃ ভাল চরিত্র ধুয়ে তো জল খাবো কিনা! এর চেয়ে যে স্মাগলাররাও অনেক ভাল। তারা তবু পুরুষমানুষ, ডাকাবুকো। এমন মেনীমুখো তো নয়!

নিমাই ফের অধোবদন। এই বিদায় নেওয়ার মুহূর্তটা আরও একটু অন্যরকম হতে পারত বোধ হয়। সে তো চলেই যাচ্ছে। তবে আর এই বাক্যবাণ কেন? স্যুটকেসটার দিকে হাত বাড়িয়ে নিমাই ফের গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, পাপমুখে একটা কথা আসছে। বলব?

বীণা জবাব দিল না।

নিমাই মাথাটা নিচু রেখেই বলে, আজকাল সবই হচ্ছে-টচ্ছে দেখছি চারদিকে। সেইসব দেখেই সাহস করে বলছি। বিয়ে ব্যাপারটা আগে যেমন পাকা ব্যাপার ছিল, আজকাল তেমনধারা নেই। ওসব অং বং মন্ত্রের কী-ই বা দাম। পুরুতরা তো দক্ষিণাটি পেলেই গড়গড় করে মন্ত্র পড়ে চারহাত মিলিয়ে দেয়। কেউ মানছে না ওসব। আমি বলি কি, তোমারই বা মানবার কি দরকার?

বীণা কুঁচকিকে এত জোরে চেপে ধরল যে বেড়ালটা হাঁচোড় পাঁচোড় করে উঠল। বীণা বলল, কী বলতে চাইছ?

বিয়েটা তোমায় মানতে হবে না। আমরা বড় নিচুতলার লোক, আমরা যাই করি, আমাদের নিয়ে সমাজে কথা ওঠে না। কেউ ভাল করে নজরই করে না আমাদের। তাই বলি কি, এখনও সময় আছে তোমার। নামডাক হয়েছে। দু-পাঁচটা টাকাও আসছে। কাউকে পছন্দ হলে বিয়ে করো।

কথাটা নতুন নয়। আগেও ঠারেঠোরে বলেছে নিমাই। বীণাপাণি দাঁতে দাঁত পিষে বলে, কথাটা বলতে লজ্জা হল না? জিব খসে পড়ল না তোমার?

নিমাই মাথাটা নেড়ে বলে, আমি যদি একটা মানুষের মতো মানুষ হতাম তবে কি বলতে পারতাম? দখল রাখা এখন বড় শক্ত কাজ। জোরালো লোক না হলে কিছুর ওপর দখল থাকে না আজকাল। অনেক ভেবে দেখেছি, বিয়েটাও মাঝে মাঝে একটা জুলুম ছাড়া কিছু নয়। যেখানে বনে না সেখানেও ধরে বেঁধে আটকে রাখা! কাজটা অন্যায়। ছোটোলোকদের তো দেখছ! পেটে এক মুখে আর এক নয়। পাঁচু রিকশাওলা এই তো মাসটা আগে টোপর পরে বিয়ে করে এল। সঙ্গে বাদ্যি-বাজনা, হ্যাজাকের আলো। মাস না ঘুরতেই বউ হাওয়া হয়েছে। পাঁচুও দিব্যি হাসিমুখে রিকশা চালাচ্ছে। যেন কিছুই হয়নি। আমার বেশ লাগল ব্যাপারটা। চাপান নেই, বাঁধন নেই। বেশ তো!

সেটা বুঝি ভাল হল!

খারাপটা কিসের বলো তো! আমাদের আর কি আসে যায়? কে মাথা ঘামাবে আমাদের নিয়ে?

তোমার নিজের আবার বিয়ে বসার ইচ্ছে হয়েছে, সে কথাটা কবুল করলেই তো হয়!

নিমাই জিব কেটে বলে, ও কথা বোললা না।

কেন বলব না? গরজ তত তোমারই বেশী দেখছি!

নিমাই দুঃখিত মুখে বলে, আমার আর্ষ নেই। অধিকারী না হলে কি হয়? তোমার মতো মানুষ পেয়েও কি হল কিছু? আর আমার জন্যই না তোমার এত আপদ-বিপদ-কষ্ট? অত বড় অসুখটা থেকে বাঁচিয়ে তুললে, খাওয়া পরার জোগাড় করলে। কিছু কম তো করোনি! আমার মা-বাবা বড় অভাবী, বড় লোভী। তারাই নামিয়ে দিল তোমাকে। সবই বরাত। এখন ভাবি, কিছু যদি শোধরানো যায়!

আমাকে বোধহয় আজকাল তোমার সন্দেহ হয়!

নিমাই সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, তা সে দোষও আমার আছে। মনে কত পাপ লুকিয়ে থাকে মানুষের।

কার সঙ্গে সন্দেহ হয়? কাকা তো?

সে বড় ভাল লোক। স্মাগলার হোক, কি আর যাই হোক, সে একটা জিনিস নিয়েই পড়ে আছে। পালা ছাড়া আর কিছু নিয়ে ভাবে না। অমন যার ধ্যান সে সহজে এসব দিকে ঝোঁকে? তাকে আমি খানিক চিনেছি। সে ঠিক ওরকম নয়। তবে যদি তোমার তাকে ভক্তি করতে ইচ্ছে করে তো মন্দ কী? কাকাকেই বিয়ে করতে পারো।

সম্প্রদানটা কি তুমিই করবে নাকি?

বড্ড রেগে যাচ্ছে। আমি হিংসুটে কথা বলিনি। আমার আর ওসব হয় না। বড় কষ্ট দিয়েছি তোমাকে। কোথায় একটা শক্ত গিট পড়ে গেছে, খুলছে না। আমি অত গুছিয়ে কথা বলতে পারি না।

বেশ গুছিয়েই বলেছে। শোনন, যদি কাউকে বিয়েই করতে চাই তবে কি এতদিন তোমার অনুমতির জন্য বসেছিলাম? অনুমতি বা আদেশ দরকার হত নাকি? বরং নিজেকে বাঁচাতেই তোমাকে জোর করে ধরে এনেছিলাম। ভুলে গেছ সব?

ভুলব? আমি কি তেমন নিমকহারাম?

তুমিই তো সবচেয়ে বেশী নিমকহারাম! নাহলে ওকথা কেউ মুখে উচ্চারণ করে? বেইমান নও তুমি!

নিমাই ফের মাথা নিচু করে। অনেকক্ষণ নিচু করে রাখে মুখ।

বীণা দেখতে পায়, নিমাইয়ের চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে মাটির মেঝের ওপর।

আমি মেয়েমানুষ, আমার অত বুদ্ধি নেই। মেয়েমানুষ চলে পুরুষের বুদ্ধিতে। কিন্তু পারলে তুমি আমাকে চালিয়ে নিতে? আমাকে নষ্ট বলে ধরে নিচ্ছো, কিন্তু যদি সত্যিই নষ্ট হই তার জন্য দায়ী কে থাকবে শুনি! তুমি ছাড়া আর কে? বউকে ফেলে চলে যাওয়ার মধ্যেই বুঝি তোমার সব বাহাদুরি? আর ভাবছো আমাকে আবার বিয়ে করার কথা বলে খুব উদারতা দেখানো হল।

পুরুষমানুষের কান্না দু'চোখে দেখতে পারে না বীণাপাণি। তার বুক জ্বলছে। সে মুখ ফিরিয়ে নিল। বাইরে অজস্র সুতো ঝুলছে। ঝুলেই আছে। টিনের চালে মিঠে মিহিন বৃষ্টির শব্দ। একটা ব্যাঙ লাফ মেরে নিমাইয়ের স্যুটকেসটা ডিঙিয়ে চৌকির তলায় ঢুকে গেল।

নিমাই ধরা গলায় বলল, আমরা একটু বোকাসোকা মানুষ। তোমাকে দেওয়ার মতো বুদ্ধিই কি আমার আছে! ভেবেচিন্তে একটা কথা হয়তো বললাম, সেটা তোমার হয়তো পছন্দ হল না। তোমাকে বড় ভয় খাই বীণাপাণি!

বীণাপাণি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সেটা জানি। আমার পয়সায় খাও বলে তোমার ভারী লজ্জা। সবসময়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকো, যেন পরকীয়া হয়ে যাচ্ছে। তাই না?

আজ তুমি বড় সুন্দর করে বলছো। এরকম করে বললে বুকের একটা জোর হয়! বলল, আরও খানিক বলো।

বীণা লোকটার দিকে তাকাল। মাথাটা কি ঠাণ্ডা হয়েছে ওর? অনুতাপ হচ্ছে? সে বলল, তাহলে কথাগুলো সত্যি?

খুব। তুমি যেন সবসময়ে আমার নাগালের বাইরে। যখন বিয়ে করে আনলাম তখন একরকম ছিলে এখন যেন গুটি কেটে প্রজাপতি বেরিয়ে পড়েছে। সেইজন্যই কেমন যেন পর-পর লাগে, ভয়-ভয় লাগে।

দোষটা কি আমার, বলো!

নিমাই মাথা নেড়ে বলে, তোমার দোষ কেন হবে? আমিই কি একটা মানুষ? রোগে ভুগে আমার খানিকটা গেছে, ভয়ে দুশ্চিন্তায় থাকি বলে আমার বারোআনাই বরবাদ। তার ওপর কাজ নেই, কর্ম নেই, আমি ষোল আনাই তো নষ্ট! তুমি ছিলে বলে টিক টিক করে বেঁচে আছি। কিন্তু পুরুষমানুষের এরকম বেঁচে থাকতে নেই, সে আমি খুব বুঝতে পারি।

আমার মাঝে মাঝে ভীষণ মাথা গরম হয়ে যায়। নিজেকে সামলাতে পারি না। জানো তো?

জানব না? এতকাল একসঙ্গে আছি।

জানোই যদি, তবে একটা কথার জন্য চলে যাচ্ছো কেন?

নিমাই এবার হাসল। তার রোগা মুখখানায় কোনও তেমন সৌন্দর্য নেই। তবে হাসলে ভারী ভাল দেখায়। লাজুক গলায় বলল, থাকতে বললে তবে তো থাকব। আমার তো কখনও তোমার ওপর রাগ-টাগ হয় না, অভিমান হয় না। শুধু ভাবি আমি থাকায় বীণার বড় অসুবিধে হচ্ছে।

হাঁড়ি কলসিতেও ঠোকাঠুকি হয়, তা বলে যা নয় তাই ভেবে নাও কেন? আর রাগ করে বাঁধন ছিঁড়লেই তো হবে না। তোমার মা বাবাকে খাওয়াবে কি? সব দিক বিচার করে তবে তো কাজ করতে হয়!

মা—বাবার কথা উঠলেই বড় দুঃখিত হয়ে পড়ে নিমাই। তার মা-বাবা বড় লোভী মানুষ। অভাবে অভাবেই এমনটা হয়েছে। একটু খাওয়া পরার আশায় সব ভাসিয়ে দিতে পারে। এমন কি বীণাপাণি যখন যাত্রায় নাম লেখায় তখন নিমাইয়ের মা খুব আশকারা দিয়ে বলেছিল, মনিবকে খুশি রাখতে চেষ্টা কোরো। শরীর যদি এঁটোকাঁটা হয়ে পড়ে তাহলে গঙ্গায় ডুব দিয়ে নিলেই হবে। একথা বীণাপাণিই বলেছে নিমাইকে। শুনে কানে হাত চাপা দিয়েছিল নিমাই। কিন্তু মায়ের ওপর তা বলে রাগ নেই তার। মা বড় বোকা মানুষ, বাবাও বড় বোকা মানুষ। এ দুটি বোকা মানুষের জন্য তার বড় মায়া। এ দুজন যদি খেতে না পায়, যদি কষ্ট পায়, তবে আর নিমাইয়ের বেঁচে থাকার মানে হয় না।

নিমাই কৃতজ্ঞতায় ছলছলে চোখে বীণাপাণির দিকে চেয়ে বলে, তোমার বড় দয়া বীণাপাণি! তোমার জন্যই বুড়োটা আর বুড়িটা এখনও বেঁচে আছে। কত আশীবাদ করে তোমাকে। তবে তাদের তো বুদ্ধি নেই, বড্ড লোভী, কখন কি বলে, কি করে তার ঠিক নেই! তুমি ওদের ওপর রাগ কোরো না।

তোমাকে অত গদ্‌গদ হতে হবে না। ওরকম গদ্‌গদ হও বলেই তো তোমার সঙ্গে আমার পট খায় না। বউয়ের সঙ্গে অত হাত-কচলানো ভদ্রতা কিসের? তোমার ভাবখানাই এমন যেন পরের বউ চুরি করে এনেছে।

নিমাই আবার নিরাশ-হওয়া গলায় বলে, আমি বড় বোকা মানুষ। খুব বুদ্ধি করে কিছু কইতে বা করতে পারি না।

আজ তোমাকে বোকা মানুষে পেয়েছে। শুধু বোকা বলে বসে থাকলেই হবে! বোকাদেরও তো বাঁচতে হবে, না-কি? আচ্ছা বলো তো, এই বাক্স-টাঙ্গ গুছিয়ে রওনা হচ্ছিলে কোথায়? আমার কাছে লুকিও না।

নিমাই ভারি লজ্জায় পড়ে গেল। মাথা নিচু করে মাটির ওপর আঙুল দিয়ে একটু আঁক কাটতে কাটতে বলল, বসন্তপুরের গোকুল একটা যোগালির কাজ দিয়েছিল। আজ সেইখানেই যাচ্ছিলুম।

যোগালির কাজ! সে কিরকম?

বিয়েবাড়িতে গোকুল রান্না করে। তার বেশ নাম-ডাক। বড় একটা বসে থাকে না। দু'তিনজন যোগালি লাগে। মাছ কাটা, মশলা পেষা, জল তোলা—এইসব আর কি।

মা গো! তুমি ওইসব করতে যাচ্ছিলে?

দোষের কি? কাজ অত গায়ে মাখতে নেই। গোকুল একটু খাতিরও করে। তবে পাকাপাকি করতুম না। দু'চারটে বড় জোর। ফলের দোকানটাই ফের করব একদিন।

সে তো এখানেও করতে পারো। করবে?

এখানে একটা অসুবিধে। তোমায় সবাই চেনে। দোকান দিলে তোমার অপমান হবে না তো! শোনো কথা! আমার আবার সম্মানটা কিসের? আর দোকানদারই বা কোন খারাপ?

বাঁচালে! আমি শুধু তোমার কথা ভেবেই এতদিন কথাটা মাথায় রাখিনি।

শোনো, খোলা রোদে হাওয়ায় স্টল দিয়ে বসলে হবে না। মাথার ওপর ছাউনি না থাকলে বড় কষ্ট। তুমি রোগা মানুষ, ওসব সইবে না। দিলে ঘর ভাড়া নিয়ে দোকান দিও।

ও বাবা! সে যে বেজায় ভাড়া চাইবে। বাজারের দোকান, সেলামিও চেয়ে বসবে নির্ঘাৎ।

ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না! যা লাগে তা আমি দেবো।

তুমিই তো দিচ্ছো। শরীর পাত করে দিচ্ছো। দরকার কি ওসব বাবুগিরির? মনোহারী দোকান তো আর নয়! ফলের দোকান খোলামেলাই ভাল।

মনোহারীই বা নয় কেন?

ও বাবাঃ! পাগলী বলে কি?

ওসব পরে ভাবা যাবে। আজ বাদলা দিনে খিচুড়ি আর পাঁপর ভাজা খাবে?

বসন্ত যে বসে থাকবে বটতলায় আমার জন্য!

তোমাকে আজ বেরোতে দিচ্ছে কে?

তাহলে অন্তত তাকে খবরটা দিয়ে আসতে হয়! লোকটা অপেক্ষা করবে। কাল সকাল থেকে যজ্ঞিবাড়ির রান্না, আজ বেলাবেলি গিয়ে সব ব্যবস্থাপত্তর যোগাড়-যন্তর করার কথা।

ওই অলক্ষুণে বাক্সটা খুলে জামাকাপড় সব নামিয়ে রাখো। তারপর ছাতাটা নিয়ে এক দৌড়ে তাকে জানিয়ে এসো গে যে, যেতে পারবে না।

কথার খেলাপ হবে না তাতে?

মোটেই হবে না! মাঝে মাঝে বাঁচার জন্য কথার খেলাপ করতে হয়। তাতে দোষ নেই। আর যোগালির কি অভাব নাকি? চারদিকে কত বেকার লোক।

তা বটে।

দোকান থেকে একটু ঘি এনো। রসময়ের দোকানে পাওয়া যায়। আর পঁচিশ পয়সার তেজপাতা।

ও বাবা! আজ তো দেখছি ভোজবাড়ি?

যাও, দেরি কোরো না।

উঠে পড়ল নিমাই। ছাতা মাথায় সে বেরিয়ে যেতেই দরজা এঁটে দিল বীণাপাণি। না, এখন নিমাইকে তাড়ালে তার চলবে না। নিমাইকে তার দরকার।

তোরঙ্গটা বের করার আগে সে জানালাগুলো বন্ধ করে নিল। সাবধানের মার নেই! তোরঙ্গটা যখন খুলছে তখন বুক কাঁপছিল ভীষণ। মস্ত ভারী প্যাকেটটা সে অস্থির হাতে টেনে হিঁচড়ে মোড়কটা ছিড়ে খুলল। যা দেখল তাতে তার চক্ষুঃস্থির। ডলার আর পাউন্ডের কয়েক কেতা নোট। মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছিল তার। তাড়াতাড়ি উল্টেপাল্টে যতদূর দেখল কয়েকটা একশ ডলারের নোটও আছে। তোরঙ্গের নিচে জামাকাপড়ের তলায় জিনিসটা আবার চাপা দিয়ে রেখে তালা বন্ধ করল সে।

একটু আগে নিমাই যখন চলে যাচ্ছিল তখন মনটা বিষ হয়ে ছিল বীণার। যাচ্ছে যাক। বেঘোরে কোথায় মরে পড়ে থাকবে হয়তো। তাই থাক! বীণা আর ভাববে না ওর কথা। মনটা শক্ত হয়ে ছিল। যেই পগার খুন হওয়ার খবরটা পেল অমনি সব ওলট পালট হয়ে গেল কেন? মনটা নরম হল। কেন যেন মনে হতে লাগল, নিমাই ছাড়া সে একা থাকতে পারবে না! সে কি এই এত এত পড়ে পাওয়া টাকার জন্য? সে জানে, এ টাকার কথা জানলে নিমাই কিছুতেই তাকে এ টাকা ছুঁতে দেবে না। বড় ধর্মভীরু মানুষ।

বীণাপাণিকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। সব দিক যাতে বজায় থাকে।

৯

আই সি এস ই পরীক্ষায় অনীশ পেয়েছিল শতকরা একাশি নম্বর। আর আপা পেয়েছিল তিরাশি। সেই থেকে খুব গোপনে এবং গভীরে অনীশের একটা হীনম্মন্যতা দেখা দিয়েছে। হায়ার সেকেন্ডারিতে সে ওকে টপকে যেতে পারে, আবার নাও পারে। আপা ভাল মেয়ে এবং তার খুব ভাল বন্ধু। আপা তাকে সব বিষয়ে সাহায্য করতে চায়, যদিও অনীশের সাহায্য লাগে না। কিন্তু আপা এতই ভাল যে, অনীশের হীনম্মন্যতার কথা জানতে পারলে নিজের বাড়তি শতকরা দু নম্বর এখনই তাকে দিয়ে দিতে চাইবে। সেটা অসম্ভব জেনেও চাইবে। আপা একটু ও ধরনেরই। তামিলরা বেশ বাস্তববাদী হয় বলে শুনেছে অনীশ। কিন্তু ব্যতিক্রম তো থাকেই। আপা সেই ব্যতিক্রম। এই কালো, রোগা, নিরহঙ্কারী, এবং সবসময়ে একটু ঘোরের মধ্যে থাকা মেয়েটি মোটেই বাস্তববাদী নয়। আঠারো বছর বয়সেও এই ছোটখাটো মেয়েটিকে মোটেই যুবতী বলে মনে হয় না, বরং বালিকা বলে ভ্রম হয়। আপা পুরোপুরি বালিকাও নয়, মনের মধ্যে এখনও অনেকটাই শিশু।

আপাতত আপা কলকাতার ভিখিরিদের জীবনী লিখছে। সেটা একটা কাণ্ডই। লাল কাপড়ে বাঁধাই খেরোর খাতা সবসময়ে তার সঙ্গে থাকে। ফুটপাথে হাঁটু গেড়ে বসে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভিখিরিদের সাক্ষাৎকার নেয় এবং তা যত্ন করে টুকে রাখে। মাঝে মাঝে টেপ রেকডারও ব্যবহার করে বটে, কিন্তু মাইক মুখের সামনে ধরলে অধিকাংশ ভিখিরিই ঘাবড়ে যায় বলে সেটা ব্যবহার করে খুব কম। বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে একটা বুড়ো ভিখিরিকে আপা বাবা বলে ডাকে। জীবনী-সংক্রান্ত নোট তার অনেক জমেছে। আপার ইচ্ছে ছবিসহ বইটা আমেরিকা বা ইংলন্ড থেকে বেরোবে। খুব বিক্রি হবে। তার রয়্যালটি থেকে সে ভিখিরিদের জন্য একটা প্রাসাদ বানাবে ইস্টার্ন বাইপাসের কাছে কোথাও।

নাসা এবং রাশিয়ার মহাকাশ গবেষণা প্রকল্পে একটা প্রস্তাব উঠেছিল, বন্ধু দেশের কতিপয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানুষকে মহাকাশে ঘুরিয়ে আনবে। সেই প্রকল্পে নিজের নাম নথিভুক্ত করার জন্য আপা বিস্তর লেখালেখি করেছে। কোনও আশাব্যঞ্জক জবাব পায়নি। সে শিখতে চায় এয়াররা ডায়নামিক্স। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে —অথাৎ কেরিয়ার নিয়ে আপা চিন্তিত নয়। সে শুধু চায় পৃথিবীর সামনে ভারতবর্ষকে তুলে ধরতে। ভারতবর্ষের দারিদ্র্য, আধ্যাত্মিকতা, ভারতের বিচিত্র মানুষ ও ইতিহাসকে। আপা সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী। এ নিয়ে সে কাগজে কাগজে চিঠি লেখে। কয়েকটা চিঠি ছাপাও হয়েছে।

আপার সঙ্গ খুবই পছন্দ করে অনীশ। ওর কোনও সেক্স অ্যাপিল নেই এবং ওকে মেয়ে বলে না ভাবলেও চলে। ভাবেও না অনীশ। শুধু আজকাল, আই সি এস ই পরীক্ষার ফল বেরোনোর পর থেকে তার একটু

আফসোস হয়, আপার কাছে দু নম্বরের জন্য হেরে যাওয়াটা তার পৌরুষের পক্ষে অপমানজনক।

চার দিন ক্লাশে যায়নি অনীশ। সবাই জানে, তার বাবার অসুখ। আজ পাঁচ দিনের দিন দুপুরে আপা নার্সিং হোমে এসে হাজির। সঙ্গে ক্লাসের আরও পাঁচটি ছেলেমেয়ে। সুমিত সিং, অর্চনা হায়দার, রোশন, পিটার, রচনা। অনীশ সকালে আসছে না। সকালে উঠতে তার দেরি হয়। আসে দুপুরে, বিকেলে আর মাঝে মাঝে রাতেও।

মণীশকে রাখা হয়েছে ইনটেনসিভ কেয়ারে। সেখানে ঢোকা বারণ। তবে কাচের পার্টিশন দিয়ে শায়িত বাবাকে দেখতে পায় অনীশ। হু-হু করা বুক নিয়ে সে দেখে। চব্বিশ ঘণ্টা মনিটারিং-এ রয়েছে তার বাবা। কথা বন্ধ, নড়াচড়া বন্ধ। শুধু ওষুধ দিয়ে নিরন্তর ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়।

বেশীর ভাগ সময়ে বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে অনীশ। আর ঘণ্টায় ঘণ্টায় খবর নেয়। বাবাহীন পৃথিবী কি সে সহ্য করতে পারবে? বাবা ছাড়া বেঁচে থাকাটার কি মানে থাকবে কোনও? আজকাল এই একটি চিন্তাতেই তার মাথা ভার হয়ে থাকে। মাইনাস বাবা এই পৃথিবীর, এই জীবনের কোনও বর্ণ, কোনও স্বাদ থাকবে না। বড় নিঃসঙ্গ লাগবে তার। ভীষণ একা। ভয় করবে।

পাশ করার পর ইদানীং তার বাবা তাকে মাঝে মাঝে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করছিল, ইউ আর কোয়াইট এ ইয়ংম্যান নাউ। এনি গার্ল? ইজ দেয়ার এনি গার্ল?

না বাবা, নো গার্ল।

মণীশ ভ্রূ কুঁচকে চিন্তিতভাবে বলে, সাম ডে এ গার্ল মে টেক এ প্লেস ইন ইওর লাইফ। এ ভেরি ইম্পট্যান্ট প্লেস। চুজ হার ইওরসেল্ফ্। বাট বি চুজি। ভেরি ভেরি চুজি।

কিন্তু অনীশের জীবনে এখনও সেই অর্থে কোনও মেয়ে বা মহিলা নেই। তার দিগন্ত কেউ আড়াল করে দাঁড়ায়নি। তার অনেক অনেক মেয়ে-বন্ধু আছে। সম্পর্ক খুবই সহজ, জটিলতাশূন্য।

এ সব প্রসঙ্গ উঠলে তার মা একটু রাগ করে, কেন এখনই ওসব ওর মাথায় ঢোকাচ্ছো বলো তো? ও তো বলতে গেলে এখনও দুধের শিশু।

মণীশ গম্ভীর হয়ে বলে, প্রাপ্তে তু ষোড়শবর্ষে পুত্রমিত্রবদাচরেৎ। আমি চাই আমার ছেলে আমার কাছে জলের মতো সহজ হোক, তাতে কমপ্লিকেশনসের ভয় থাকবে না। অধিকাংশ বাবাই এটা করে না বলে জেনারেশন গ্যাপ তৈরি হয়।

মায়েরা কখনও বোঝে না এসব। তার মা এখনও ছেলের শৈশব আঁকড়ে পড়ে আছে। তাই তর্ক করে বাবার সঙ্গে।

বাবাকে আকণ্ঠ ভালবাসে অনীশ। এত ভালবাসে যে, তার মনে হয় বাবা মরে গেলে তাকেও হয়তো আত্মহত্যা করতে হবে।

বন্ধু ও বান্ধবীরা যখন দুপুরবেলা আচমকা এসে হাজির হল, তখন নিঃসঙ্গ অনীশের মনে হল, এদের সঙ্গে তার দেখা হল দু হাজার বছর পর। কতকাল দেখেনি ওদের! এত একা, এত মৃত্যুহিম, এত অসহায় লাগছে নিজেকে যে, অনীশ নিজেকে দেখে নিজেই অবাক!

নার্সিং হোমের লবিটা বিরাট বড়। দুপুরবেলা একটু ফাঁকা। তারা বসে গেল। বন্ধুদের মুখ সময়োচিত গভীর। অনীশ শুকনো মুখে বলে, প্লীজ স্মাইল এ বিট। আমি একটু হাসিমুখ দেখতে চাই।

বাস্তবিক ওদের মুখের গাম্ভীর্য— যতই কৃত্রিম হোক— সহ্য হয় না অনীশের। চারদিকটা শোকার্ত হয়ে পড়লে সে যে জোর পায় না।

বন্ধুরা একটু হাসল। তবে জোর করে। একটু সাহস-টাহস দিল। সুমিতের বাবা মস্ত হার্ট স্পেশালিস্ট। তবে এখন আমেরিকায় গেছেন একটা কনফারেন্সে। সুমিত মুখে আফসোসের শব্দ করে বলল, ড্যাডি আমেরিকায় না গেলে আমি ড্যাডিকে নিয়ে আসতাম। এনিওয়ে অল বিগ ফিজিসিয়নস্ আর হিয়ার। নো ওরি।

একটু পড়াশুনোর কথা হল, একটু খেলাধূলার কথা হল, একটু পপ মিউজিকের কথা হল। তারপর আপা ছাড়া সবাই চলে গেল।

আপা বলে, তুমি কিছু খাওনি অনীশ? লানচ্?

লানচ্-ফানচ্ এখন মাথায় উঠেছে। খিদে পেলে— অর্থাৎ খুব খিদে পেলে দুটো কলা বা বিস্কুট খেয়ে নিই।

তুমি অনেক উইক হয়ে গেছ। চোখের কোল বসে গেছে। চলো তোমাকে কিছু খাইয়ে আনি।

আরে না ভাই, খেতে ইচ্ছে করে না আমার। টেনশনের মধ্যে কি খাওয়া যায়!

তোমাকে গুচ্ছের খেতে বলছি না। ট্রাই ফাস্ট ফুড। কিংবা ফ্রুট জুস। এগুলো খেতে কোনও বোরডম নেই। খেয়ে যাচ্ছি তো খেয়েই যাচ্ছি— আমারও ওরকম ভাল লাগে না। চলো, স্ট্রং না থাকলে তোমার বাবার কোন উপকার করতে পারবে তুমি?

অনীশ রাজী হয়ে গেল। ফলের রস খেতে তার আপত্তি নেই। আর শরীরটা তার বেশ দুর্বল লাগছে আজকাল।

নার্সিং হোমের কাছাকাছি একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে দুজনে দু'গ্লাস মুসুম্বির রস নিয়ে বসে গেল। অনীশ তার সব সহপাঠী বন্ধু এবং বাবার সঙ্গে ইংরিজিতেই কথা বলে। ব্যতিক্রম শুধু আপা। এ মেয়েটা ঝরঝরে বাংলা বলে এবং বাংলা ছাড়া ইংরিজিতে কখনও কথা বলে না অনীশের সঙ্গে। আপা বলে, তোমাদের প্যাট্রিওটিজম নেই জানি। এখন যা আছে সেটা হল প্রভিনসিয়াল প্যাট্রিওটিজম। তামিলরা তামিলনাড়ু, কন্নড়রা কর্নাটক, পঞ্জাবীরা পঞ্জাব নিয়ে পড়ে আছে। কিন্তু তোমরা বাঙালী আপার মিডলক্লাস— তোমাদের সেটাও নেই। আর কিছু না পারো মাতৃভাষায় কথাটা বোলো বাপু।

আপা বাংলা জানে বললে ভুল হবে, সে বাংলার গোটা ইতিহাস জানে। বাংলা সাহিত্য জানে। বাংলা লোকসাহিত্য অবধি জানে।

এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে অনীশ আরও এক গ্লাস নিল। তারপর আপাকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর— এ লাইন তুমি শুনেছো?

আপা অবাক হয়ে বলে, কেন বলো তো!

অনীশ একটু লজ্জা পেয়ে বলে, আমার সতেরো বছর কমপ্লিট হওয়ার পর থেকেই আমার বাবা মাঝে মাঝে এ লাইনটা বলে। আমি তো বুঝতেই পারি না, আঠারো বছর বয়সটাই কেন ভয়ংকর? বাবার ধারণা আঠারো বছর বয়স হলেই ছেলেরা রান আফটার গার্লস অ্যান্ড ডু আনডুয়েবল থিংস। কিন্তু দেখ আপা, আমাদের আঠারো বছর বয়সটা কি সত্যিই ওরকম? পড়াশুনো, কেরিয়ার বিল্ডিং, হাজারো টেনশনের মধ্যে আমরা কি বয়সটা টের পাই? ইজ ইট এ রিয়েলি ডেনজারাস এজ? লাইনটা কার জানো?

তোমাকে নিয়ে আর পারাই যায় না। এটা কবি সুকান্তর লাইন।

সুকান্ত! মিন, সুকান্ত ভট্টাচার্য?

হ্যাঁ বুদ্ধু। পড়োনি?

না। জাস্ট নামটা শোনা। পড়বার সময়টা কোথায় বলো তো? আমাদের সময় বলে কিছু আছে?

আমি তাহলে কি করে সময় পাই?

তুমি! তোমার কথা আলাদা, তুমি একসেপশনাল।

মোটেই নয় বাবা। তবে আমি তোমার মতো কেরিয়র-কনশাস নই। অমি যা পড়ি তা ভালবেসে পড়ি।।

ওই আঠারো বছর নিয়ে কবিতা একদিন আমাকে শোনাবে?

মুখস্থ নেই। তবে বই দিতে পারি।

ঠিক আছে। আমার বাবা কেন লাইনটা কোট করে তা আমার জানা দরকার! আপা, তোমার কি মনে হয় বাবা সারভাইভ করবে?

কেন করবে না? ওঁর বয়স কত?

পঞ্চাশের ঘরে। আরলি ফিফটিজ। কিন্তু বয়সটা বড় কথা নয়।

নৈরাশ্যের মধ্যেও আশার কথা ভাবতে পারাটাই সবচেয়ে বড় ফিলজফি—তা জানো?

ভাবতে হলে বুকের জোর চাই। আমি যে একদম জোর পাচ্ছি না আপা। বাবার কিছু হলে আমি বাঁচব না।

আপার চোখ হঠাৎ ছলছল করে উঠল। টেবিলের ওপর রাখা অনীশের হাতটা ধরে থেকে সে বলল, তুমি এই কারণেই ভীষণ ভাল।

কি কারণে?

পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্মঃ, পিতাহি পরমং তপঃ, তুমি কথাটা মানো?

শুনেছি, অতটা নয়, তবে আমি বাবা ছাড়া অন্ধকার দেখি। মা বলে, বাবাই নাকি আদর আর আশকারা দিয়ে আমাকে নাবালক করে রেখেছে।

মা বাবা ওরকমই হয়। ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে তারা ভীষণ প্যাশনেট। কিন্তু কি জাননা, স্নেহ সবসময়ে নিম্নগামী। মা বাবা আমাদের যতটা ভালবাসে আমরা কিছুতেই তাদের ততটা ভালবাসতে পারি না।

বাজে কথা আপা। আমি কিন্তু—

তুমি তো প্রকৃতির নিয়ম উল্টে দিতে পারো না। তবে আমি মানছি তুমি তোমার বাবাকে খুব ভালবাসো, যতটা আমাদের বন্ধুদের কারও মধ্যেই দেখি না। আর সেইজন্যই তুমি ভীষণ ভাল।

থ্যাংক ইউ। কিন্তু তুমি জানো না, আমার বাবাও ভীষণ ভাল। আইডিয়াল ম্যান।

কেন জানবো না! তোমার বাবার সঙ্গে তো আমি কত কথা বলেছি। অনেক খবর রাখেন। প্রচুর পড়াশুনো করেছেন। স্মার্ট।

অ্যান্ড অনেস্ট। অ্যান্ড লাভিং। অ্যান্ড কেয়ারিং।

আপা অনীশের হাতে মৃদু চাপড় দিয়ে বলে, শোনো, এখন বাবার কথা অত ভেবো না। মনটাকে অন্যদিকে সরিয়ে নাও।

কি করে?

জোর করে। সবসময়ে বাবার কথা ভাবছো, অথচ তার জন্য প্র্যাকটিক্যালি তোমার কিছু করার নেই, এটা তোমাকে ভীষণ দুর্বল করে ফেলছে। জোর করে মনটাকে অন্য চিন্তা-ভাবনায় নিয়ে যাও। পৃথিবীটা তো অনেক বড়, কত কি আছে, ভাবতে পারো না!

না।

তাহলে একটা কাজ করবে? আমার সঙ্গে দাবা খেলবে?

দাবা? যাঃ!

দাবা খুব ভাল খেলা। মনটাকে একদম গ্রেফতার করে নেয়। কিছুক্ষণ খুব রিলিফ পাবে। আর যদি থ্রিলার পড়তে চাও আমি তোমাকে একটা দারুণ বই দিতে পারি। রোড টু গনডলফো। পোপকে চুরি করার একটা মজাদার উপন্যাস। পড়বে?

অনীশ হেসে ফেলে। বলে, বাবার কথা ভাবতে তো আমার খারাপ লাগছে না। মনটাকে অত সহজে সরানো যাবে না আপা!

আমি মনে করি কাল থেকে তোমার ক্লাস করাও উচিত। তোমার বাবা নার্সিং হোম-এ, ডাক্তাররা যা করার করবে। তুমি কেন ক্লাসে যাচ্ছো না?

পড়াশুনোর চিন্তা মাথায় উঠেছে। আমাদের ফিউচারও খুব আনসার্টেন। বাবাই আমাদের সোর্স অফ ইনকাম। চাকরিটা ভাল। কিন্তু আমাদের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বা প্রপার্টি নেই।

তাহলে সুকান্তর কবিতাটা তোমাকে শুনিয়ে লাভ নেই, ও কবিতা তুমি বুঝবে না।

তার মানে?

সুকান্তর আমলে আঠারো বছরের ছেলেরা এত হিসেবী ছিল না। পকেটে টাকা নেই, ভবিষ্যতের আশা নেই, অথচ দুনিয়াটা তার নিজের বলে মনে হয়। তুমি সেরকম যুবক বোধ হয় কখনও হবে না।

না না, কবিতাটা আমি তবু শুনতে চাই আপা। কি কারণে আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর, আমাকে জানতে হবে।

'ভয়ংকর' শব্দটা এবং আপা দুপুর থেকে বিকেল অবধি তার সঙ্গে রইল। তারপর আপা চলে গেল, কিন্তু 'ভয়ংকর' শব্দটা গেল না।

ভিজিটিং আওয়ারে অপর্ণা এসে ছেলের দিকে চেয়ে বলল, তুই ভেবেছিস কি বল তো! এভাবে কি নিজেকে শেষ করতে চাস? দুপুরে কিছু খাসনি। বাবার অসুখ কি আর কারও করে না?

কাতর গলায় অনীশ বলে, অ্যাপেটাইট নেই মা। গা বমি—বমি করছিল।

খালি পেট বলেই ওরকম করেছে। সকালে শুধু দুখানা বিস্কুট আর চা ছাড়া তোর পেটে কিছুই যায়নি।

গেছে মা। আপা এসেছিল। আমরা ফ্রুট জুস খেয়েছি।

অত ভাবছিস কেন বল তো! আজ সকাল থেকে তোর বাবার অবস্থা স্টেবল। আমরা তো ফোনে খবর নিচ্ছিই। এখন বাড়ি যা। আমি খাবার সাজিয়ে রেখে এসেছি টেবিলে, খেয়ে নিস। তারপর একটু রেস্ট নে।

আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর...আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর বিড়বিড় করতে করতে তার বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হল। কোন এক ঘোরের মধ্যে কোন বাসে চড়ে যেন— বসে বা দাঁড়িয়ে— ঠিক মনে নেই, সে বাড়ি ফিরে এল। তার বাবা ইদানীং তাকে একটা স্কুটার কিনে দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করেছিল। বাসে ভিড়।

কিন্তু অপর্ণা এই প্রস্তাব ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করেছে, পাগল নাকি! স্কুটার ভীষণ বিপজ্জনক জিনিস। আমি যতদিন বেঁচে আছি ওসব হবে না।

একটা স্কুটার বা মোটরবাইক থাকলে তার অনেক সুবিধে হত। তার অনেক বন্ধুর আছে। অ্যাকসিডেন্ট জিনিসটাই তো অ্যাকসিডেন্ট। রাস্তায় হাঁটছিল একটা লোক, পাঁচতলার ছাদে কাপড় রোদে শুকোতে দিয়ে ইঁট-চাপা দিয়েছিল কেউ, বাতাসের তোড়ে কাপড় উড়ে ইঁট খসে পড়ল সোজা মাথার চাঁদিতে, লোকে তো এ ভাবেও মরে! খবরের কাগজে এ খবর পড়েছে অনীশ। মৃত্যু-ভয় আছে জেনেও মানুষ উঁচু পাহাড়ে চড়ে, রেসিং কার চালায়, প্লেন ওড়ায়, আরও কত কী করে!

ভেবে লাভ নেই। মা ওসব যুক্তির ধার ধারে না। কিন্তু তার বিবেচক বাবা কথাটা যে ভেবেছিল, তাতেই সে আজ যথেষ্ট কৃতজ্ঞ বোধ করে। বাবার অন্তত আপত্তি ছিল না।

রাত সাড়ে আটটার সময় দাবার এক চাল খেলা শেষ করল ঝুমকি আর অনীশ। জমল না। তারা কেউ মন দিয়ে চাল দেয়নি, কেউ জিততে চায়নি, ভুল চাল ফেরত নেয়নি। মাত্র পনেরো মিনিটে খেলাটা শেষ হয়েছে। ঘুঁটিগুলো নাড়াঘাটা করতে করতে অনীশ বলে, বাবা তোকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসে রে দিদি!

তোকে।

না, তোকে।

আগে আমাকেই বাসততা। এখন তোকে।

মোটেই নয়।

তোর চেয়ে বেশী কিন্তু আমি ভালবাসি বাবাকে।

চ্যালেঞ্জ।

জানিস তো, ছেলেরা বিয়ে করলেই কাত! কিন্তু মেয়েরা মোটেই সেরকম নয়।

বিয়েই করব না।

ওরকম সবাই বলে, আবার করেও। তারপর বউ-পাগলা, স্ত্রৈণ হয়ে সবাইকে ভুলে যায়। মা বাবা ভাই বোন কাউকে আর পাত্তা দেয় না। ছেলেগুলো ভীষণ ট্রেচারাস।

তুই মেয়েদের খুব সাপোর্টার, না?

তা কেন, যা সত্যি তাই বলছি।

শোন দিদি, আজ আমার ঝগড়া করতে ইচ্ছে নেই। মনটা বিগড়ে আছে। তুই একটা কবিতা পড়েছিস, যাতে এই লাইনটা আছে, আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর?

ঝুমকি একটু ভ্রূ কুঁচকে বলে, পড়েছি। সুকান্ত। কেন বল তো?

আমার একটুও বাংলা নলেজ নেই। এমন কি আপাও কত কী জানে। আমি কবিতাটা জানিই না!

কবিতাটা হঠাৎ তোর মনে পড়ল কেন?

আজকাল বাবা আমাকে প্রায়ই লাইনটা বলে। কেন বলে তা বুঝতে পারছি না। বাংলা আমি কিছু জানি না।

জানবি কি করে! ইংলিশ মিডিয়মে পড়ে পড়ে ট্যাঁশ গরু তৈরি হয়েছিস যে। আমি তো তোর মতো ইংলিশ মিডিয়মে পড়িনি। বাবা পড়ায়নি। তুই হচ্ছিস ড্যাডিজ ব্লু আইড বয়।

ইংলিশ মিডিয়মে পড়লে ট্যাঁশ গরু হয়? ট্যাঁশ গরু মানে কি বল তো! সামথিং মিক্সড আপ? ক্রস ব্রিড?

তোকে নিয়ে আর পারা যায় না। অনু আর তুই দুটোই ট্যাঁশ-গরু।

বল না!

কবিতাটা পড়েছিস?

বললাম তো বাংলা নলেজ নেই।

ট্যাঁশ গরু একটা মজার কথা। এ ফানি মিক্সড আপ। তবে আসলে ননসেন্স ভার্স।

আর ও কবিতাটা! আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর!

ওটা ননসেন্স ভার্স নয়। পোয়েট্রি।

বাবা ওটা আমাকে কেন বলে?

বাবার ভয় আঠারো বয়স হওয়ার পর তুই একটু ওয়াইল্ড হয়ে যেতে পারিস।

ওয়াইল্ড! আমি! আমি তো বরাবর শান্ত ছেলে।

ঝুমকি ভ্রূ কুঁচকে বলল, তাই বুঝি? আজকাল নিজের ক্যারেকটর সার্টিফিকেট নিজেই দিচ্ছিস? তোর কিল ঘুষি, চুলটানার ব্যথা আজও আমার যায়নি, তা জানিস?

ওঃ, তোর কথা তো আলাদা। দিদিদের সঙ্গে ভাইরা সকলেই ওরকম এক-আধটু করে।

ইস, মায়ের কথাগুলো কেমন মনে করে রেখেছে দেখ!

আচ্ছা, আমি সত্যিই ওয়াইল্ড হয়ে যেতে পারি বলে বাবা মনে করে?

বাবা তোকে নিয়ে ভীষণ ভাবে। তাই বলে। আঠারো বছর বয়সটা একটু খারাপ।

এই সময়ে রান্নাঘরে একা অপর্ণা। গ্যাসের উনুনে মাছের ঝোল আর ডাল ফুটছে। রুটি বেলছে কাজের মেয়েটা। রোজ একইরকম একঘেয়ে দৃশ্য। সে এই রান্না করা, খাওয়া, শোওয়া, ওঠা, রান্না করা... ইত্যাদি একটা ছক থেকে বেরোনোর কোনও পথ খুঁজে পায় না। মাকড়সার জাল যেমন এও ঠিক তেমনি। নিজের জালের পরিধিতে দিনের পর দিন আটকে থাকে মাকড়সা। অপর্ণাও কি তাই?

আজ বিকেলেও মণীশকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখতে পেল না অপর্ণা। ডাক্তার বলছে, অবস্থা স্টেবল। কিন্তু তেমন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলছে না। আজ মণীশের বস এসেছিল বিশাল একখানা কনটেসা গাড়িতে চেপে, বয়স চল্লিশের নিচে। দারুণ স্মার্ট, পার্শি লোকটা ডাক্তারের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ গম্ভীর মুখে কথা বলছিল। ইংরিজিতে। অপর্ণা পাশেই ছিল, কিন্তু এক বর্ণও বুঝতে পারেনি। অনীশ বা অনু হলে বুঝত। অপর্ণা ওরকম খই-ফোটা ইংরিজি বুঝতে পারে না। মণীশের বস বনাতওয়ালার আবার বিদেশেই জন্ম, সেখানেই লেখাপড়া।

পুরো না বুঝলেও ভাবসাব এবং গলার স্বর থেকে অনুমান করতে পারে, মণীশের বেঁচে যাওয়ার একটা আউটসাইড চান্স আছে। আউটসাইড চান্স কাকে বলে তা অবশ্য অপর্ণা জানে।

ছেলেমেয়েদের মতো অপর্ণা ভেঙে পড়েনি বটে, কিন্তু তাকে অনেক চাপ নিতে হচ্ছে মনের মধ্যে। অপর্ণা আর কতটা পারবে, তা জানে না। তবে সে পৃথিবীর এবং জীবনের নেতিবাচক দিকটাকে সবসময়ে বড় করে দেখে, সঠিক গুরুত্ব দেয়। তার আশা, ভরসা, স্বপ্ন কখনোই মাত্রা-ছাড়া নয়। মণীশ যেমন আদ্যন্ত স্বপ্নের ঘোরে বাস করে, অপর্ণার তেমনই সবসময়ে কঠিন মাটিতে পা।

মাছের ঝোল বেশী রাখতে নেই, তাহলে রুটির সঙ্গে ওরা ভাল খাবে না। আসলে রুটির সঙ্গে ডিম বা মাংসই ভাল। কিন্তু অপর্ণার সময় হয়নি বাজার করার। ফ্রিজে মাছ ছিল, তাই রাঁধছে। মণীশের অসুখ বলে ওরা হয়তো খাবার নিয়ে কথা তুলবে না। খুশী না হলেও না। ওরা খাবারের স্বাদ পায় না এখন। বাবা ওদের ভুবনময়। বাস্তববাদী অপর্ণা, হিসেবী অপর্ণা, একটু কৃপণ অপর্ণার চেয়ে ওরা অনেক বেশী পছন্দ করে বেহিসেবী, ক্ষ্যাপাটে, স্বপ্নশীল মণীশকে।

সেই একই কারণে কি অপণাও পছন্দ করেনি মণীশকে?

ঘুমচোখে অনুশীলা এসে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াল, মা, এ সময়ে কি ড্যাডিকে নিয়ে ডিসকাস করা ভাল?

কে ডিসকাস করছে?

ওই তো ওরা করছে। দাদা আর দিদি।

ডিসকাস করলে কী হয়?

এ সময়ে তো ড্যাডি সিক। এখন কি ডিসকাস করা ভাল? সুপারস্টিশন আছে না?

কিসের সুপারস্টিশন?

ডিসকাস করাটা আমার ভাল লাগছে না। আমাদের চুপ করে থাকা উচিত।

তা কেন? ডিসকাস করলে খারাপ কিছু হয় না। তুই আজ সারাদিন বেরোসনি, যা একটু ছাদে ঘুরে আয়।

ছাদটা ভীষণ অন্ধকার। আমি ভয় পাই।।

উঃ, তোর ভয় নিয়ে আর পারি না বাপু। ভয়ে ভয়েই তুই শেষ হয়ে গেলি। বড় হচ্ছিস, এখনও অত ভয় কিসের!

অনু ছলো ছলো চোখে চেয়ে থাকে। জবাব দেয় না।

অপর্ণা বলে, তাহলে যা না, স্টিরিওটা চালিয়ে গান শোন। পিয়াসার ক্যাসেটটা চালা, আমিও শুনতে পাবো।

তার চেয়ে আমি বরং মোহিনীদের বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি মা? ও রোজ আসে, আমি তো যাই না।

ক'টা বাজে?

পৌনে আটটা মাত্র। কাছেই তো!

একটু দোনোমোনো করে অপর্ণা। পাড়ার একটি কেষ্ট ঠাকুর সম্প্রতি অনুর পিছনে লেগেছে। ঘন ঘন বাড়ির সামনে দিয়ে যাতায়াত করে। লেটার বক্সে চিঠিও ফেলে গেছে দু দিন। গুরুতর কিছু নয়। তবু সাবধান হওয়া ভাল।

এত রাতে যাওয়া ভাল দেখবে না।

কেন, কি হয়েছে মা? এক মিনিটের তো রাস্তা!

সেই ছেলেটা যদি পিছু—টিছু নেয়?

নিক না। কী করবে? ওরা তো কাওয়ার্ড টাইপেরই হয়। সামনে আসতে সাহস পায় না। আমি পাত্তাই দিই না।

সে আমি জানি।

ও ছেলেটা একদম হ্যাংলা। মোহিনীর পিছনেও লেগেছিল। ওরকমই চিঠি দিত।

তারপর কী হল?
কী আবার হবে! মোহিনী পাত্তা দেয়নি, তাই আর পিছনেও লাগে না। তুমি ভয় পেও না।
যা তাহলে। মনটা একটু ভাল লাগবে। ছাতা নিয়ে যাস। বৃষ্টি আসতে পারে। আধঘণ্টার মধ্যে ফিরবি।
ঠিক আছে।
মোহিনী তোর কেমন বন্ধু?
জাস্ট বন্ধু।
ওরা ভাল লোক তো?
খুব ভাল। ওর বাবা ফার্মার ছিল।
কী ছিল?
ফার্মার। চাষ-টাস যারা করে।
চাষা নাকি?
ঠিক তা নয়। তবে ওরকমই। ওদের গ্রামটা ভীষণ নাকি অজ পাড়া গাঁ। শেয়াল ডাকে।
কে থাকে সেখানে?
সবাই। মোহিনী বলেছে ওর দাদু-টাদু সব সেকেলে আর আনএডুকেটেড।
কিন্তু ওর বাবা তো বিরাট চাকরি করে! বিদেশে যায় শুনেছি।
ওর বাবা একজন প্রাইম এনভিরনমেন্টালিস্ট।
সেটা আবার কী?
ও তুমি বুঝবে না। নাইস ম্যান। খুব শান্ত, ঠাণ্ডা, ভেরি আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ঠিক আমার বাবার মতোই।
চাষা ছিল বলছিস?
খুব গরিব। ওদের সঙ্গে একদম মেলে না। সম্পর্কও নেই।
তাই বল!
যাবো মা?
যা।

১০

রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, কামিনী-কাঞ্চন থেকে তফাত তফাত খুব তফাত থাকো। কাঞ্চনকে এড়াতে পারেনি হেমাঙ্গ। তবে কামিনীকে অনেকটাই পেরেছে। গড়চার বাড়িতে আসার পর তার জীবন প্রায় কামিনী-শূন্য।

তবে এই যে একটা গোটা বাড়ি নিয়ে সে একা থাকে এটা কারও কারও কাছে খুব অন্যায় রকমের বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। বিশেষ করে পিসতুতে দিদি চারুশীলার কাছে। পিসতুতো হলেও চারুশীলা একসময়ে তাদের বাড়িতেই লালিত পালিত হয়েছে। কারণ পিসিমার ছিল দুরারোগ্য নানা আধিব্যাধি। চারুশীলাকে দেখার কেউ ছিল না। সেই শিশুকাল থেকে চারুশীলা তার ওপর শতেক খবরদারি করে এসেছে। আজও করে। মাঝে মাঝেই এসে বলে, অ্যাই, তোর বাড়িটা সামনের শনিবার ছাড়তে হবে, আমি এখানে একটা পার্টি দেবো।

হেমাঙ্গ আপত্তি করলেও এঁটে ওঠে না। দিদিটি বড়ই প্রখরা। যখন মুখ ছোটায় তখন রোখে কার সাধ্য। হেমাঙ্গ অগত্যা বাড়ি ছেড়ে কোনও ছোটখাটো ট্যুরে আশেপাশে কোনও জায়গায় চলে যেতে বাধ্য হয়। মেয়েদের সে যে পছন্দ করে না তার অন্যতম প্রধান কারণ কি এই দিদিটি? হতে পারে। চারুশীলা দুর্দান্ত সুন্দরী। দুটো সিনেমার নায়িকাও হয়েছিল। মুখখানা এমনিতে সুন্দর হলেও ফটোগ্রাহী নয় বলে আর বিশেষ সুযোগ পায়নি। তবে সুন্দরী বলেই ভাল একখানা বর বাগিয়ে নিয়েছে। ওর স্বামী আন্তজাতিক সম্মান-টম্মান পাওয়া একজন বিখ্যাত স্থাপতি। সল্ট লেকে অনেকগুলো বাড়ি তার ডিজাইন করা। দিল্লি, বোম্বাই, নিউ জার্সি ও লন্ডনের শহরতলীতে সে বেশ কয়েকটা বাড়ি বানিয়ে নাম করে ফেলেছে। দেদার টাকা। উদয়াস্ত ব্যস্ত মানুষ। স্বামী যেমন ব্যস্ত, বউটির তেমনই অখণ্ড অবসর। সারাদিন নেই কাজ তো খই ভাজ করে বেড়াচ্ছে। পার্টি দেওয়ার জন্য চারুশীলার জায়গার অভাব নেই। গোলপার্কের কাছে তার নিজস্ব বাড়িটিই কি কম? তবু চারুশীলা যে হেমাঙ্গর বাড়ি মাঝে মাঝে ধার করে সে শুধু কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বজায় রাখার জন্য।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর সভ্যতাকে হেমাঙ্গ খুব অপছন্দ করে না। সে বিজ্ঞানের ছাত্র নয়, কারণ সলিড জিওমেট্রি ও ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস তাকে চোখ রাঙিয়ে এমন ভয় দেখিয়েছিল যে, সে পালিয়ে বাঁচে। কিন্তু বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারসমূহকে সে অতিশয় বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করে। বিশেষ করে ভোগ্যপণ্য ও নিত্য ব্যবহার্য যে সব জিনিস হাতের কাছে এগিয়ে দিচ্ছে বিজ্ঞান, সেগুলিই তাকে আকর্ষণ করে সবচেয়ে বেশী। তবে বিজ্ঞানের কিছু অভিশাপও আছে। তার মধ্যে একটা হল টেলিফোন। গড়চার বাড়িটাকে টেলিফোনমুক্ত রাখতে পারলে সে সত্যিকারের স্বাধীন হতে পারত। কিন্তু ভাড়াটে ভদ্রলোক অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে একটা জ্যান্ত টেলিফোনও রেখে গেছেন এবং হেমাঙ্গর বাবা সেটা বহাল রেখেছেন। ফলে বহির্জগতের

নানা কৌতূহল ও প্রশ্ন তাকে সময়ে অসময়ে ব্যতিব্যস্ত রাখে। পিসতুতে দিদি চারুশীলার আক্রমণ ওই টেলিফোনের মাধ্যমেই আসে সবচেয়ে বেশী।

রাত দশটায় হেমাঙ্গ অখণ্ড মনোযোগে ভি সি আর-এ একখানা সায়েন্স ফিকশনের ক্যাসেট চালিয়ে দেখছিল। ঠিক এই সময়ে চারুশীলার টেলিফোন এল।

কি রে কিম্ভুত! কী করছিস?

হ্যালো আইডল ব্রেন, আবার কিসের দরকার পড়ল?

তোর ঘরে কিসের শব্দ হচ্ছে বল তো! ভি সি আর চলছে নাকি? একা বাড়িতে বসে ব্লু ফিল্ম দেখছিস না তো!

তুই একটা অত্যন্ত বাজে মেয়ে, তা কি জানিস?

একটু হেসে চারুশীলা বলে, আহা, দোষের তো কিছু নয়। এখন বয়স হয়েছে, একা বাড়িতে থাকিস, ওসব তো হবেই বাবা। স্বীকার করলেই হয়। শুধু শুধু সাধু সেজে থাকা কেন বাপু?

তোর মতো সবাই রদ্দি মার্কা কিনা। আমি একটা সায়েন্স ফিকশন দেখছি।

আজকাল বেশীর ভাগ ইংরিজি ছবিতেই একটু পর্ণোগ্রাফি থাকে।

থাকলে থাকে। তোকে আমার মরাল গার্জিয়ান হতে হবে না।

আবার খিলখিল হাসি শোনা গেল।

হেমাঙ্গ গম্ভীর গলায় বলে, দেখ, রাত দশটার সময় ইয়ার্কি ভাল লাগে না। ছবিটা শেষ হলেই আমি শুতে যাবো। কাল অফিস আছে। তোর মতো বেলা ন'টায় ঘুম থেকে উঠলে আমার চলবে না।

তুই কিরকম কাজের লোক তা জানি। আমিও একটা দরকারেই ফোন করছি। মোটেই ইয়ার্কি নয় সেটা।

তাহলে ভ্যানতাড়া করছিস কেন? কী দরকার?

আচ্ছা, তোর একজন চেনাজানা হোমিওপ্যাথ আছে না? চৌধুরী না কী যেন।

আছে তো। কণাদ চৌধুরী।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া কি শক্ত?

দিন দশেক লাগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে। কেন?

আমার একটা বন্ধু আছে না, রিয়া, ওর একটু প্রবলেম হচ্ছে।

কী প্রবলেম?

মেয়েদের অনেক প্রবলেম থাকে। তাতে তোর কী দরকার?

যা বাবা! আমি তো স্রেফ অ্যাকাডেমিক ইন্টারেস্ট থেকে জিজ্ঞেস করলাম।

সব ব্যাপারে ছেলেমানুষদের অত ইন্টারেস্ট ভাল নয়। যাকগে, কাল একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দিবি? বিকেল ছটা সাড়ে ছটা নাগাদ?

রিয়া মানে সেই মোটাসোটা ফর্সা মতো না? যার হাজব্যান্ড একটু গেঁয়ো টাইপের, কিন্তু দারুণ কোয়ালিফায়েড!

হ্যাঁ। কিন্তু রিয়া মোটেই মোটা নয়। সলিড় হেল্‌থ।

একটু বেশী সলিড। তোর মতোই।

কী, আমি সলিড! জানিস, গত এক বছরে আমার ওজন দেড় কেজি কমেছে, দশ গ্রামও বাড়েনি।

দেখে তো তা মনে হয় না। স্বামী বেচারা হিল্লিদিল্লি করে মরছে আর বউ গ্যাঁট হয়ে বসে বসে খাচ্ছে আর মুটোচ্ছে। তোর মতো আইড্‌ল ব্রেনের অপদার্থ মেয়েদের দেখে দেখেই আমার বিয়ের ইচ্ছেটা চলে গেছে।

আর তোকে দেখে বহু মেয়ে চিরকুমারী থাকবে বলে তৈরি হচ্ছে, তা জানিস? আমার বর হিল্লি দিল্লি করে বেড়ায় সেটা কি আমার দোষ? আমি তো বলেই দিয়েছি, অত টাকা রোজগারের কোনও দরকার নেই, এবার একটু বাড়িতে থাকো। যা আছে তাতেই আমাদের ঢের। কিন্তু পুরুষদের তো টাকার নেশা। আরও চাই, আরও চাই। এই যে তুই, মামার টাকার পাহাড়ের ওপর বসে আছিস, তাও টাকার গন্ধে গন্ধে কোথায় কোথায় ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছিস। আজকাল তো শুনি গাঁয়ে গঞ্জের ছোটো ছোটো ইস্কুলে অবধি অডিট করতে যাস। শুনে ঘেন্নায় মরে যাই।

একটা চড়াই পাখির মাথায় যেটুকু ঘিলু আছে সেটুকুও যদি তোর থাকত! জানিস তো, ভগবান খুব ইমপারশিয়াল। যাকে বিউটি দেন তাকে ব্রেনটা দেন না, যাকে ব্রেন দেন তাকে বিউটি থেকে বঞ্চিত করেন। এরকমই আর কি! তবে ব্রেন না থাকা খুব ভাল। ব্রেনলেসরাই জগতে সুখী। পাখির মস্তিষ্ক না হলে কেউ ভাবতে পারে যে, আমি টাকার লোভে গাঁয়ে অডিট করতে যাই?

তাহলে কেন যাস?

আমার রুর‍্যাল লাইফ দেখতে ভাল লাগে, তাই যাই।

শেষে একদিন একটা গাঁয়ের বঁধূ এনে হাজির করবি নাকি? দেড় হাত ঘোমটার নিচে নোলক দুলবে, চোখে জ্যাবড়া কাজল, কনুই অবধি গয়না, পরনে রোলেক্স শাড়ি!

তবু তোদের চেয়ে ভাল। রাত হয়ে যাচ্ছে, ছাড়ছি।

ওরে দাঁড়া দাঁড়া। আমার অ্যাপয়েন্টমেন্টটার কী হবে?

কী আবার হবে! বলে দেখব'খন।

দেখব'খন বললে হবে না। কালকেই চাই।

হয়ে যাবে।

চেম্বারটা বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিটে না?

হ্যাঁ। তুই তো একবার গিয়েছিলি!

সে তো কবে! তিন বছর আগে।

তোর কথা শেষ হয়েছে?

না, না, শোন, লোকটার ভিজিট কত?

জানি না। ষাট-টাট হবে। কেন, রিয়ার কি টাকার প্রবলেম?

না। তবে ওর মেয়ের একটি প্রাইভেট টিউটর আছে। ছেলেটা খুব ভাল। দারুণ পড়ায়। কিন্তু বোধহয় ছেলেটা এপিলেপটিক। জানিস তো, এপিলেপসির কোনও চিকিৎসাই নেই। রিয়ার ইচ্ছে সেই ছেলেটাকেও নিয়ে যায়। ভিজিট বেশী হলে পেরে উঠবে না।

বেশী নয়। আমার রেফারেন্সে গেলে ভিজিট হয়তো নিতেই চাইবে না। তোরা মেয়েরা এত কিপ্পুস কেন রে? প্রাইভেট টিউটরের চিকিৎসা করাতে চায় সেটা বেশ ভাল জেসচার, কিন্তু ভিজিট বেশী হলে চিকিৎসা

করাবে না এটা কেমন কথা?

মেয়েরা হিসেব করে চলে বলেই স্বামীরা টিকে আছে।

বেশী বকিস না। নিজের শাড়ি, গয়না, সাজের জিনিস কেনার সময় স্বামীর টাকার মায়া করিস?

ওই একটা ব্যাপারে মেয়েরা মোটেই কিপ্পুস নয়।

তাহলে ভিজিট বেশী নয় বলছিস?

আমি খবর রাখি না। তবে কণাদকে বলে দেবোখন যেন প্রাইভেট টিউটরের ভিজিট না নেয়, আর রিয়ার ভিজিট যেন অবশ্যই নেয়।

ঠিক আছে বাবা, তাই হোক। রিয়া মোটেই বিনা ভিজিটে চিকিৎসা করাতে চাইছে না।

এবার কি কথা শেষ হয়েছে?

আর একটা কথা।

আবার কী?

একটা ফার্স্ট ক্লাস মেয়ে আছে আমার হাতে। তোর সঙ্গে খুব মানাবে।

সে তো পুরোনো কাসুন্দি। তোর হাতে সব সময়েই পাত্রী মজুদ থাকে, আর তাদের সবাইকেই আমার সঙ্গে মানায়।

না মাইরি, এ মেয়েটা দারুণ ভাল।

ভাল না হওয়ার তো কারণ নেই। দুনিয়াতে বিস্তর ভাল মেয়ে আছে।

আমার একটা কি সন্দেহ হয় জানিস? তোকে কেউ দাগা দিয়েছে। কিন্তু কে যে দিল সেইটেই বুঝতে পারছি না। আগে তো সব কথা আমাকে বলতিস, আজকাল লুকোস। বলবি সত্যি কথাটা?

বলছি। আমাকে একজন ভীষণ দাগা দিয়ে গেছে। হল তো!

ইয়ার্কি রাখ। সত্যি করে বল না ভাই!

তুই যা শুনতে ভালবাসিস তাই তো বলছি।

আচ্ছা, তুই কি নারীবিদ্বেষী?

প্রবল রকমের। তোর মতো মেয়েদের দেখে দেখেই বিদ্বেষটা জন্মেছে।

আমার জন্য কত ছেলে পাগল ছিল তা জানিস?

জানি। পৃথিবীতে আহাম্মকদের সংখ্যাই বেশী। আমার ঘুম পাচ্ছে, এবার ছাড়ছি।

ওরে দাঁড়া, দাঁড়া। কাজের কথাটাই তো হয়নি।

আবার কিসের কাজের কথা?

শোন না পাগলা, কাল ডাক্তারের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে একটু প্রবলেম রয়েছে যে!

কিসের প্রবলেম?

কাল আমাদের অন্তু ড্রাইভার দেশে যাচ্ছে। গাড়ি চালাবে কে?

তার আমি কি জানি? অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন থেকে ড্রাইভার নিয়ে নে।

দূর পাগলা, বাইরের একটা অচেনা লোক গাড়িতে থাকলে কি ফ্রীলি কথা বলা যায়, বল! গাড়ি চড়ার আরামটাই মাটি হয়ে যায়। অন্তু থাকলে কথা ছিল না, সে পুরোনো লোক।

কী বলতে চাস খোলসা করে বলবি? অন্তু না থাক, তোর আর একটা গাড়ি আর তার ড্রাইভারও তো আছে।

ছাই জানিস। সেটা তো আমার কর্তা নিজে চালায়। গত সপ্তাহে আমস্টারডাম যাওয়ার আগে ড্রাইভারকে ছাড়িয়ে দিয়ে গেছে। আমাকে বলে গেছে, যেন এই অয়েল ক্রাইসিসে দুটো গাড়ি ব্যবহার না করি। ফলে ও গাড়ি এখন অস্পৃশ্য। কর্তা ফিরলে ফের চলবে।

তাহলে মানেটা কী দাঁড়াল?

মানে দাঁড়াল, কাল তুই একটু সকাল সকাল অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা আমার এখানে চলে আসবি। তোর সঙ্গেই আমরা দুই বান্ধবী ডাক্তারখানায় যাবো।

অসম্ভব! অসম্ভব!

অসম্ভব কথাটা কাদের অভিধানে থাকে তা জানিস?

বোকাদের। আমি তো বোকাই।

বোকা একটু আছিস, তবে সেটা ধরছি না। আসলে তুই হচ্ছিস কলকাতার সবচেয়ে ভাল দশ জন মোটর ড্রাইভারদের একজন। ইন ফ্যাক্ট তুই-ই হয়তো এক নম্বর।

তেল দিয়ে লাভ হবে না রে। আমি পারব না। কলকাতায় ট্যাক্সির অভাব নেই।

কী যে বলিস তার ঠিক নেই। পুরুষ ছাড়া শুধু মেয়েরা ট্যাক্সিতে চড়ে কখনও? যদি নিয়ে পালিয়ে যায়?

তোকে নিয়ে কেউ পালাবে না, যদি ঘটে তার বুদ্ধি থাকে। তুই হচ্ছিস যে কোনও পুরুষের গভীর লায়াবিলিটি। আর, কলকাতার ট্যাক্সিওলাদের অনেক দোষ থাকলেও মহিলা হাপিস করার বদনাম নেই। প্রতিদিন শয়ে শয়ে মেয়ে একা একা ট্যাক্সিতে চড়ে দাবড়ে বেড়াচ্ছে।

আমরা কি ওরকম? অত সাহস আমার নেই। তা ছাড়া জায়গাটাও যে ভাল চিনি না। সেই কবে, একবার গিয়েছিলাম। লক্ষ্মী, ভাই, তোর তো পরোপকারী বলে একটা নাম আছে।

আমি আজকাল তেল নিই না রে।

তেল নয়, তোর কিছু ভাল গুণ তো সত্যিই আছে। তোর কি আর সবটাই খারাপ?

সবটাই খারাপ এমন লোক দুনিয়াতে বিশেষ নেই। ওটা কোনও কমপ্লিমেন্ট হল না। আর তোর মতো দুমুখো লোকের কমপ্লিমেন্ট আমি নিইও না।

আমি দুমুখো লোক! আচ্ছা বেশ তাই হল। কিন্তু একা ট্যাক্সিতে গিয়ে যদি আমাদের বিপদ হয় তো মামার কাছে মুখ দেখাতে পারবি? নিজের বিবেককেই বা কি বলবি?

তুই কলকাতা-চষা ঝানু মেয়ে, ন্যাকামি রাখ। তোকে যে-ট্যাক্সিওলা সীতাহরণ করবে সে এখনও মায়ের পেটে।

কিডন্যাপ নয় না-ই করল, টাকা-পয়সা গয়নাগাঁটি কেড়ে নিতে পারে তো!

না, পারে না। বাজে কথার সময় নেই। ছাড়ছি।

আহা, শোন না কথাটা! ছেলেবেলায় তোর মনটা কত নরম ছিল ভাব তো। আমার একদিন স্কুল থেকে ফিরতে দেরী হয়েছিল বলে কেঁদে ভাসিয়েছিলি। মনে আছে? আর একটা কথা শোন, পিন্টুটাও সঙ্গে যাবে। ওর খুব ইচ্ছে তোর সঙ্গে যায়।

উফ, তোদের চক্রান্তে একটা ইনোসেন্ট বাচ্চাকেও টেনে নামালি! তোর মতো.....

আচ্ছা আচ্ছা, তুই বরং পিন্টুর সঙ্গেই কথা বলে দেখ!

সে যে লড়াইয়ে হারছে তা হেমাঙ্গ বুঝতে পারছিল। কিছু করার নেই। চারুশীলার দুই সন্তানের মধ্যে বড়টি মেয়ে নন্দনা, ছোটোটি স্পন্দন বা পিন্টু। দুটিই সাহেব-বাচ্চাদের মতো সুন্দর। পিন্টুটা কোনও এক কার্যকারণে হেমাঙ্গর ভীষণ ন্যাওটা। যখন দুধের শিশু ছিল তখনই আর কারও কোলে নয়, শুধু হেমাঙ্গ হাত বাড়ালে ঝাঁপ খেয়ে চলে আসত এবং আর কারও কাছে যেতে চাইত না। হেমাঙ্গ চারুশীলাকে বলত, দেখ, শিশুরা ঠিক মানুষ চেনে। ওরা হচ্ছে ভগবানের লোক, তাই নিষ্পাপ মানুষ দেখলেই র কাছে চলে আসতে চায়। চারুশীলা বলত, তা নয় রে। ও আসলে তোর মধ্যে আর একটি অবোধ শিশুকেই দেখতে পায়, তাই অমন করে। তোর মাথাটা তো ডেভেলপ করেনি।

পিন্টুর বয়স এখন সাত আট হবে। আজও ওর প্রতি হেমাঙ্গর এক প্রগাঢ় মায়া। আর পিন্টুও বড্ড ভালবাসে হেমু মামাকে। পিন্টুর কথায় বরাবর হেমাঙ্গ দুর্বল। ফোনে পিন্টুর গলা পাওয়া গেল, মামা, আমি কাল তোমার সঙ্গে যাব কিন্তু।

যাবে। কিন্তু তোমার মা যে একটি বিচ্ছু তা কি তুমি জাননা?

হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে রোজ ঝগড়া করে।

আমি ভাল লোক হওয়া সত্ত্বেও করে। এসব দেখে রাখো। বড় হয়ে একদিন বিচার কোরো। কেমন?

পিন্টু বুঝল না, তবু বলল, আচ্ছা।

ফোনটা রেখে দিয়ে হেমাঙ্গ ভি সি আর বন্ধ করল। ছবিটা আর দেখতে ইচ্ছে করল না। আগামী কাল তার দু-দুটো এনগেজমেন্ট আছে। খুব গুরুতর কিছু নয়। একটা পার্টি, আর তার আগে একজন অসুস্থ ক্লায়েন্টকে নার্সিং হোম-এ দেখতে যাওয়া। দুটোই কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

মায়া জিনিসটা যে কী ভয়ংকর তা ঘুমোনোর আগে অনেকক্ষণ ভাবল হেমাঙ্গ। একথা নিশ্চিত যে সে বিয়ে করবে না। কিন্তু তার খুব ইচ্ছে হয়, পিন্টুর মতো নিষ্পাপ ও দেবদুর্লভ সৌন্দর্যের একটি ছেলে তার হোক। সে একবার চারুশীলাকে বলেছিল, পিন্টুকে দত্তক দিবি?

ইল্লি! দত্তক নিয়ে পাকাপাকি ব্যাচেলর থাকার ইচ্ছে? খুব তো স্বার্থপর দেখছি। বিয়ে করে নিজের ছেলের বাপ হ' গে যা। পরের ছেলে নিয়ে টানাটানি কেন রে অলম্বুস?

অলম্বুস শব্দের মানে হেমাঙ্গ জানে না। জানার দরকারও নেই। হয়তো ওটার কোনও মানে নেইও। চারুশীলার নিজস্ব ডিকশনারি আছে, তাতে এরকম বিস্তর শব্দ থাকে এবং যেগুলোর কোনও মানেই হয় না।

কিন্তু মায়া জিনিসটা ভাল নয়। একদম ভাল নয়। মায়াও একধরনের পরাধীনতা, এক ধরনের স্বাধীনতার অভাব, মুক্তির প্রতিবন্ধক। বাচ্চাদের সে খুব ভালবাসে। এই ভালবাসাটাই কি একদিন তার কাল হবে?

পরদিন অফিসের পর হেমাঙ্গ যখন গাড়ি নিয়ে চারুশীলার বাড়িতে হাজির হল তখন আরও একটা মায়া তার জন্য অপেক্ষা করছিল। সে হল ওই প্রাইভেট টিউটরটি।

রোগা, গোবেচারা ছেলেটাকে দেখলেই বোঝা যায়, এর ভিতরে গভীর ও গোপন অসুখ রয়েছে। তবু যেন বাঁচার এক প্রাণপণ ইচ্ছে এর দুখানা আয়ত চক্ষুতে এসে বাসা বেঁধেছে। সেখানেই দুটি পিদিমের মতো জ্বলছে এর সবটুকু প্রাণশক্তি। অস্বস্তিতে, লজ্জায়, হীনম্মন্যতা ছেলেটা নুয়ে পড়েছে। কৃতজ্ঞতায় ছলছল করছে চোখ।

কেননা তাকে এরা নিজেদের পয়সায় চিকিৎসা করাতে নিয়ে যাচ্ছে। তাও আবার গাড়িতে করে। এই বিরল সৌভাগ্যে তার যেন ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।

কয়েক মিনিট কথা বলেই ছেলেটাকে ভারী ভাল লাগতে লাগল হেমাঙ্গর। গরিব, দীনভাবসম্পন্ন, নিরহংকারী লোকেরাই কি ঈশ্বরের চিহ্নিত মানুষ? কে জানে, হতেও পারে। এ ছেলেটার কাছে বসলে একটা ভাল অনুভূতি হয়। যেটা অধিকাংশ মানুষের সান্নিধ্যে হয় না।

সাজগোজ করতে চারুশীলা সময় নেয়। আজও নিল। তারপর যখন বন্ধু রিয়া আর ছেলে পিন্টুকে নিয়ে বেরিয়ে এল তখন ঘর একেবারে মাতোয়ারা হয়ে গেল নানা সুগন্ধে।

নাক কুঁচকে হেমাঙ্গ বলে, ইস। তোকে যে ডাক্তারখানায় ঢুকতেই দেবে না।

চারুশীলা ফোঁস করল, ইস! কেন দেবে না শুনি?

হোমিওপ্যাথি ওষুধ দারুণ সেনসিটিভ। উগ্র গন্ধে তাদের গুণ নষ্ট হয়ে যায়।

যাঃ, বাজে বকিস না।

রিয়া কিন্তু একটু অস্বস্তিতে পড়ে বলে, হ্যাঁ, আমিও কিন্তু ওরকম কথা শুনেছি। কী হবে এখন!

চারুশীলা ধমকের গলায় বলে, ওর কথায় নাচিস না তো। ওটা এক নম্বরের পাজি। লোককে ভড়কে দেওয়াই ওর হবি।

হেমাঙ্গ গম্ভীর থেকেই বলে, আজ তোর কপালে অপমান লেখাই আছে। কণাদ নিশ্চয়ই তোকে বের করে দেবে চেম্বার থেকে। বিদেশ থেকে গুচ্ছের সেন্ট আনিয়ে মাখছিস, তোর আক্কেল নেই? এত সেন্ট মাখলে অন্য সব গন্ধ পাবি কি করে? ফুলের গন্ধ, ফলের গন্ধ, খাবারের গন্ধ, শিশুর মুখের গন্ধ এসবই তো তোর অজানা থেকে যাবে!

চারুশীলা চোখ পাকিয়ে বলল, থামবি? আমাকে আর গন্ধ চেনাতে হবে না। যা একখানা শহরে বাস করি, মাগো, ডাস্টবিনের গন্ধ, পচা ইঁদুরের গন্ধ, ডিজেলের গন্ধ গা গুলিয়ে দেয়। উনি এসেছেন গন্ধ নিয়ে বক্তৃতা দিতে।

গাড়িতে সামনের সীটে হেমাঙ্গর পাশে চয়ন বসল, জানালার ধারে পিন্টু। পিছনে কলরবমুখর চারুশীলা আর রিয়া।

গাড়ি চালাতে চালাতে হেমাঙ্গ নিচু গলায় জিজেস করল, আপনার প্রবলেমটা কি? এপিলেপসি?

চয়ন মাথা নেড়ে বলে, না না। এপিলেপসি নয়।

তাহলে?

একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়। কুয়াশার মধ্যে একটা ট্রেন ঝিক ঝিক করতে করতে এগিয়ে আসে। তখন আমার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা নড়তে থাকে। আর তারপর......

তারপর?

আমার আর কিছু মনে থাকে না।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামল। ওয়াইপারটা চালু করে হেমাঙ্গ বলল, অজ্ঞান হয়ে যান?

হ্যাঁ। কিন্তু সেটা ফিটের অসুখ বলে আমার মনে হয় না। আমার বিশ্বাস, ওই ট্রেনের শব্দটা না হলে আমিও আর অজ্ঞান হবো না। কেন যে শব্দটা হয়! আপনি জানেন?

দুনিয়ার কতটুকুই বা আমরা জানি? বাড়ি থেকে আপনার কোনও চিকিৎসা হয়নি?

একটু দোনোমোনো করে চয়ন বলে, হয়েছে। লাভ হয়নি।

অ্যালোপ্যাথি না হোমিওপ্যাথি?

দু'রকমই। মাদুলি-টাদুলিও দেওয়া হয়েছিল।

কখনও ব্যায়াম বা আসন-টাসন করেছেন?

আমি পারি না। শরীরে দেয় না। আমি ভীষণ দুর্বল।

অনেক সময়ে আসন করলে সারে।

চয়ন বিনীতভাবে চুপ করে থাকে। বড্ড কাঁটা হয়ে বসে আছে। এয়ার কন্ডিশনার চলছে বলে কাচের গায়ে ভাপ জমে যাচ্ছে। বাইরে বৃষ্টির তোড় বাড়ছে।

বাড়িতে কে কে আছে?

চয়ন যেন একটু সচকিত হয়ে বলে, মা দাদা বউদি।

কে আর্নিং মেম্বার?

দাদা।

দাদা কোথায় চাকরি করে?

একটা ব্যাংকে।

বাবা নেই, না?

না। আমার দশ বছর বয়সে মারা যায়।

বাড়িটা কি নিজেদের?

আবার একটু দোনোমোনো করে চয়ন বলে, বাড়ি দাদার।

বুঝেছি।

পিছন থেকে চারুশীলা বলে, এই উদ্ভট, ঠাণ্ডা লাগছে, এয়ারকুলারটা বন্ধ করে দে।

দিচ্ছি। কিন্তু এতগুলো লোকের শ্বাসের দূষিত বায়ু বেরোবে কি করে? জানালা খোলা যাবে না, বৃষ্টি হচ্ছে।

তোর দিকের জানালা একটু ফাঁক করে রাখ, তাতেই হবে।

সেলফিস আর কাকে বলে!

হেমাঙ্গ এয়ারকন্ডিশনার বন্ধ করে নিজের দিকের জানালার কাচ একটু নামিয়ে দিয়ে বলল, ব্যাচেলরদের সবাই এক্সপ্লয়েট করে।

তুই আবার ব্যাচেলার কিসের? এক ফোঁটা তো বয়স। বিয়ের যুগ্যি আগে হ, তারপর ব্যাচেলর কপচাবি।

কাল তো তুই-ই একটা পাত্রীর খবর দিলি।

ওরকম দিদিরা করেই থাকে। বিয়ের কথায় বেসামাল হয়ে আবার গাড়ি কোথাও ভিড়িয়ে দিস না। এত ঝাঁকুনি লাগছে কেন?

কলকাতার রাস্তা তো আর আমার বানানো নয়।

দেখে চালা। যা বকবক করছিস তখন থেকে। গাড়ি চালানোর সময় অত কথা কিসের?

বকবক তুইও কি কিছু কম করছিস?

করছি বেশ করছি। আমি তো আর গাড়ি চালাচ্ছি না।

বেশী মেজাজ দেখাবি তো গাড়ি থামিয়ে নেমে কোথাও চলে যাবো।

আচ্ছা বাবা, বকবক করতে করতেই চালা। রিয়া জানতে চাইছে কণাদ চৌধুরী কি বিলেত-ফেরত?

হ্যাঁ। জার্মানি আর আমেরিকাতেও ছিল। বলে হেমাঙ্গ চয়নের দিকে তাকিয়ে বলল, বাঁ হাতটা অমন চেপে ধরে আছেন কেন? সামথিং রং?

ক্লিষ্ট মুখে ভয়াতুর চয়ন বলে, সেই রেলগাড়ির শব্দটা হচ্ছে। বড্ড কুয়াশা।

মাই গড!

১১

কাল রাতে বামাচরণে আর রামজীবনে তুমুল হয়ে গেছে। সে এমন ব্যাপার যে মনেই হয়নি এরা ভদ্রলোকের ছেলে। ও একে আর এ ওকে শুয়োরের বাচ্চা, খানকীর বাচ্চা থেকে শুরু করে এমন সব গালাগাল দিয়েছে যা সহোদর ভাইরা পরস্পরকে দিতে পারে না। মুখে মুখে যতক্ষণ হচ্ছিল ততক্ষণ একরকম ছিল, তারপর দুজনেই একজন দা আর একজন টাঙ্গি নিয়ে উঠোনে নেমে পড়ল। বউ দুটো আর নয়নতারা প্রাণপণে চেঁচাচ্ছিল। নয়নতারা ভয়ে আর বউ দুটো রাগে। লোকজন যারা জুটেছিল তারাই শেষ অবধি খুনোখুনি হতে দেয়নি। উঠোনে যখন এ কাণ্ড চলছিল তখনও বারান্দায় জলচৌকিতে বিষ্ণুপদ ঝুম হয়ে বসা। নড়াচড়া নেই, ঝগড়া থামনোর উদ্যোগ নেই। বিষ্ণুপদর ভিতরটা কি মরে পাথর হয়ে গেছে? বিষ্ণুপদ নিজেই সেটা বুঝতে পারে না।

গাঁয়ের মাতব্বররা এসে বিষ্ণুপদকে বলল, এর একটা বিহিত তো করতে হবে বিষ্টুখুড়ো! সম্পত্তি ভাগ করে দিচ্ছেন না কেন?

বিষ্ণুপদ নিস্তেজ গলায় বলল, ভাগ তো ওরাই করে নিয়েছে। আর ভাগের কী?

রাজু হালদার বলল, ভাগের কাগজপত্র নকশা না থাকলে ভাগের মূল্যটা কী বলুন! বামাচরণের জমির মধ্যেই তো রান্নাঘর তুলে ফেলল রামজীবন। তা হলে আইনটা কী হবে?

এত লোক সোরগোল করছিল যে, বিষ্ণুপদর মাথাটা ভাল কাজ করছিল না। তবে এ কথা ঠিক যে, আজ দুপুরে হঠাৎ ইরফান মিস্ত্রিকে দিয়ে পশ্চিম দিকে একটা ছোটো ঘর গাঁথিয়ে ফেলছিল রামজীবন। তখনই বামার বউ শ্যামলী বেরিয়ে এসে চেঁচিয়েছিল, এটা কী হচ্ছে? ও তো আমাদের ভাগের জমি, ওখানে ঘর তুলছেন কেন?

রামজীবন প্রথমটায় জবাব দেয়নি, শুধু ইরফানকে তাড়া দিচ্ছিল ঘরখানা ঝটিতি বানিয়ে ফেলতে।

শ্যামলী তখন থাকতে না পেরে সোজা গিয়ে ইরফানকে এক ধাক্কা মেরে বলেছিল, খবর্দার আর একটাও ইট গাঁথবেন না। তাহলে খারাপ হয়ে যাবে।

আর তখন রামজীবন চোখ রাঙিয়ে উঠেছিল, চোপ মাগী!

শ্যামলী তার দেওরের দিকে ফিরে বলেছিল, অতই যদি মুরোদ তবে উনি বাড়ি থাকতে ঘর তোলেননি কেন? যেই উনি বেরিয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে ঘর তুলে ফেলছেন! মহা শয়তান তো আপনি!

সেই থেকে ঝগড়া চলছে।

শ্যামলী একবার এসে বিষ্ণুপদকেও বলেছিল, আপনি ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছেন যে বড়! আপনার চোখের সামনে এত বড় অন্যায়টা হয়ে যাচ্ছে দেখেও চুপ করে বসে আছেন! মুখে কি পুটিং ঠেসে দিয়ে গেছে কেউ? না কি গুণধর ছেলের পাকা ঘরে থাকবেন বলে সব অন্যায় মেনে নিচ্ছেন?

বিষ্ণুপদর মুখে কোনও জবাব এল না। মাথাটা বড় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তার চোখের সামনে বহু অন্যায় বহুবার হয়ে গেছে, বিষ্ণুপদর মুখে একটিও প্রতিবাদ কেউ শোনেনি। শ্যামলীর দিকে বিষ্ণুপদ শুধু চেয়ে ছিল।

নয়নতারা এসে পক্ষিণী যেমন শাবককে আড়াল করে তেমনি করেই বিষ্ণুপদকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বলল, ওঁকে এর মধ্যে টানছো কেন বউমা? এ লোক তো সাতে-পাঁচে থাকেনি কখনও। ভীতু মানুষ। ও সব তোমাদের গণ্ডগোল, তোমরা বুঝে নাও।

আহা, ন্যাকা! কিছু বোঝে না! ভীতু! অমন ছেলের জন্ম তাহলে দিল কি করে?

নয়নতারা বিষ্ণুপদকে বলল, যাও তো, জলচৌকি হাতে করে নিয়ে গিয়ে জামতলায় বসে থাকো তো। বাড়িতে থাকার দরকার নেই।

ভাগ্যিস বৃষ্টিটা তখন ছিল না। বিষ্ণুপদ গুটি গুটি গিয়ে বাইরের জামতলায় বসে রইল। কিন্তু গায়ে গু মাখলেই কি যমে ছাড়ে? সন্ধেবেলাতক বসে থেকে যখন বিষ্ণুপদ ঘরে এল তখনও উঠোনে দাপাচ্ছে শ্যামলী, বিস্তর বউ-ঝি কাচ্চা-বাচ্চা, দু-চারটে উটকো লোকও জুটে গেছে মজা দেখতে। রামজীবন বাড়িতে নেই। ইরফান কাজ বন্ধ রেখে চলে গেছে। তবে রান্নাঘরের দেয়াল চারটে প্রায় ছাদ অবধি গেঁথে ফেলেছে।

বামাচরণ ফিরল সন্ধের কিছু পর। ফিরতেই শ্যামলী এমন চেঁচিয়ে উঠল যেন তার নিকটজন কারও কাল হয়েছে। বামাচরণ এক সরকারী অফিসে পিওনের কাজ করে। সে খুব ফিকিরের লোক, দালালি-টালালি কিসের যেন একটু বাড়তি দু'পয়সা আয় আছে। তবে সে সব সে কখনও ফাঁস করে না। এক বাড়িতে থেকেও, এক হাঁড়ি হয়েও তারা খুব আলগোছ হয়ে থাকে। তবে হাঁড়ি আর এক রাখা যাবে না, বিষ্ণুপদ বুঝতে পারছিল। এক থাকলেই কি আর আলাদা হলেই বা কি? বিষ্ণুপদর আর সে সব ভেবে কাজ নেই।

ঝগড়াটা জম্পেশ করে লাগল সন্ধের পর। রামজীবন একটু মাতাল হয়েই রোজ ফেরে। আজও ফিরল। সে ফিরতেই বামাচরণ লাফ দিয়ে উঠোনে নামল। তারপর দুজনে গঙ্গাজলের মতো গালাগাল দিতে লাগল দুজনকে। তারপর খুনোখুনির জোগাড়।

বিষ্ণুপদ মাতব্বরদের কথার খেই ধরে বুঝতে পারছিল, তারা বামাচরণের পক্ষে! কাজটা অন্যায় হয়েছে।

রাজু হালদার বলল, আপনার চোখের সামনেই অন্যায্য ব্যাপারটা হয়ে গেল, এটা কেমন কথা? বামাচরণ কি আপনার ছেলে নয়? আমাদের একটা খবর দিলেই আমরা এসে মীমাংসা করতাম।

রামজীবনকে তার ঘরের কাছে কয়েকজন ঘিরে রেখেছিল। সেখান থেকেই সে গলা তুলে বলল, কোনও হারামীর বাচ্চার সালিশ মানব না। শালারা মাতব্বরী দেখাতে এসেছে! আবে এই খানকীর ছেলে রাজু, আমার বাবাকে চোখ রাঙাচ্ছিস কেন রে? বাপের ব্যাটা হয়ে থাকলে আমাকে চোখ রাঙাবি আয়! চোখ গেলে দেবো।

বিষ্ণুপদ টের পেল, মাতব্বরদেরও আর সেই দিন নেই। রামজীবনের হুমকিতে রাজু থিতিয়ে গেল।

ঘর তুলেছি বেশ করেছি। বুকের পাটা থাকলে একটা ইটও খসিয়ে দেখ, দেখ খসিয়ে কী হয়!

রাজুর বয়স পঞ্চাশের ওপর। এক সময় গাঁয়ের রাজনীতিতে বেশ নামডাক ছিল। এখন আর সেসব নেই। লোকেও তেমন মানে না। আগে এই রাজুরই কত হাঁকডাক ছিল। বিষ্ণুপদর একটু কষ্টই হল রাজুর জন্য।

রাজু বিষ্ণুপদকে বলল, শুনলেন রামজীবনের কথা? ওর যদি এরপর একটা বিপদ হয় তখন কিন্তু আমাদের দুষবেন না। রামজীবন কিন্তু খারাপ সংসর্গে পড়েছে।

বেশ চাপা গলায় বলল, যাতে রামজীবন শুনতে না পায়। রামজীবন অবশ্য শুনতে পেল না, কারণ সে নিজেই চেঁচিয়ে মাতব্বরদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করছিল।

বামাচরণ তার দাওয়া থেকে নেমে এসে বিষ্ণুপদকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে রাজুকে বলল, এই শালা বুড়োর জন্যই যত গণ্ডগোল বুঝলেন রাজু দাদা? কবে থেকে বলে আসছি, বাবা, বাড়িটা ভাগজোখ করে বেড়া তুলে দাও। শালা বসে বসে ঝিমোয় আর কাঁড়ি কাঁড়ি খায়। গা করে না। কেন করে না জানেন? ওই হারামজাদা রেমো ওকে হাত করেছে। রামজীবন ছাড়া উনি চোখে অন্ধকার দেখেন।

বামাচরণ বাপকে শালা বলাতেও কেউ তেমন কোনও আপত্তি করল না। শুধু কে যেন—লণ্ঠনের আলোয় মুখটা ভাল দেখা গেল না—বিড়বিড় করে বলল, ওভাবে বলছো কেন? ওভাবে বলা কি ঠিক?

বিষ্ণুপদর অবশ্য রাগ-টাগ হল না। কোনওদিনই হয় না। বামাচরণ হয়তো ঠিকই বলে।

বামা চেঁচাচ্ছিল, কেন ওই খচ্চর বুড়ো রামজীবনের পক্ষ নেয় জানো? রামজীবন পাকা ঘর তুললে সেখানে আরামসে থাকবে সেই লোভে। রামজীবন লুচি খাওয়ায়, রসগোল্লা খাওয়ায়, মাঝে মাঝে জামা জুতো দেয়; আর সেই সঙ্গে যত কু পরামর্শও দেয়।

ওপাশ থেকে রামজীবনও কী যেন বলে উঠল।

বিষ্ণুপদর হল গণ্ডারের চামড়া। সে শুধু অন্ধকার উঠোন পেরিয়ে ওপাশে রামজীবনের ঘরখানার দিকে চেয়ে রইল। বড় তাড়াতাড়ি কাজ হচ্ছে এখন। একটু বেশী তাড়াতাড়ি কি?

আর এক মাতব্বর কপিল ঘোষ বলল, আচ্ছা খুড়ো, আপনার বড় ছেলে কৃষ্ণজীবনের তো আর এই গাঁয়ের বাড়ির ভাগ দরকার নেই। তা তার ভাগেরটা এদিকে বাঁটোয়ারা করে দিলেও তো হয়।

সতীশ পাল মাথা নেড়ে বলে, আইন জানো না বলে বলছো। সে বা তার পুত্র পৌত্রাদি কেউ দাবি তুললে তো ছাড়তেই হবে বাপু। তার ওপর মেয়েদের ভাগের কথাটা ধরছে না কেন? জমি পুরো কুড়ি কাঠাও নয়। ছ'ভাগ করতেই হবে।

ভাগজোখের কথায় বিষ্ণুপদ ফের ভাবনায় পড়ে গেল। ভাগের বড় জ্বালা। ভাগ করতে করতে একশ বছর পর থাকবেই বা কি?

সতীশ পাল বলে উঠল, রামজীবনের রান্নাঘর সরাতে হবে। না সরাতে পারলে জমির দাম ধরে দিক। বখেরা মিটে যাবে।

রামজীবন ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে বলে, যে গু-খেগোর ব্যাটা এ কথা বলে তার মুখে পেচ্ছাপ করি, পেচ্ছাপ। বুঝলে! জমি এখনও বাবার। কোন শালাকে মূল্য ধরে দেবো?

খুব হতে লাগল তুমুল সব কাণ্ড। বিষ্ণুপদ শুনল, শব্দের পর শব্দ, আরও শব্দ। এ সব শব্দের যেন ঠিক মানে হচ্ছে না। এ সব যেন ফাঁকা কার্তুজের আওয়াজ।

একটু রাত হচ্ছিল। আরও গড়াত। হঠাৎ একটা ভেজা হাওয়া ছাড়ল। জয়ঢাকের শব্দ তুলল মেঘ। আর তারপর তেরচা ছাঁটের বল্লমের মতো বৃষ্টি নেমে এল। দুনিয়াকে গেঁথে ফেলতে লাগল যেন। লোকজন সব

বেমালুম গায়েব হয়ে গেল ভোজবাজির মতো। দাওয়ায় দু-তিনজন শুধু গাঁ বাঁচিয়ে বসে থেকে কিছুক্ষণ পর ভিজেই রওনা হয়ে গেল।

তারপরই নয়নতারা এসে হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেল বিষ্ণুপদকে।

আজও রোদ নেই। মাঝে মাঝে ছ্যাড় ছাড় করে বৃষ্টি হচ্ছে। থামছে। আবার হচ্ছে। রামজীবনের কাঁচা সিমেন্ট ধুয়ে যাচ্ছে। ইরফান আসেনি।

আজ সকাল থেকে বাড়িটা বড় নিঝুম। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ঘুলিয়ে উঠছে, পাকিয়ে উঠছে কত আক্রোশ, রাগ; তবে বাইরেটা আজ ভারি নিঝুম। যে কোনও সময়ে হঠাৎ বোমা ফাটানোর মতো ধুন্ধুমার লেগে যেতে পারে। দু'ছেলের কেউ বাড়ি নেই। শ্যামলী সকাল থেকে ঘরের বার হয়নি। সবই দেখছে বিষ্ণুপদ। দেখে যাওয়া ছাড়া তার কী কাজ?

বিষ্ণুপদর ঘড়ি নেই। কটা বাজে জানে না। কিন্তু সে ঠিক টের পায়, এইবার নয়নতারা একবার আসবে। এসে দেখে যাবে তাকে। কিছুক্ষণ পর পর এসে তাকে একবার করে দেখে যায় এই কদিন হল। বুড়িটার প্রাণে ভয় ঢুকেছে, বুড়োটা কখন টুকুস করে মরে যায়। ওই কালঘড়ি দেখার পর থেকেই ভয়টা খুব ধরেছে বুড়িকে। মানুষের শোকের একটা বড় কারণ হল, একা হয়ে যাওয়া। বিষ্ণুপদ চলে গেলে বুড়িটা খুব একা হয়ে যাবে। বড্ড আতান্তরে পড়ে যাবে।

ভয়-ডর আরও কত আছে। কাল রাতে যখন দু ভাই সুন্দ উপসুন্দের লড়াই করছিল তখন বুড়ি ভয়ে সেঁদিয়েছিল ঘরে। ঠাকুর দেবতার কাছে মাথা কুটছিল। কাল রাতে তারা বুড়োবুড়ি কেউ ঘুমোতে পারেনি। নয়নতারা বিস্তর কেঁদেছে। মেলা দুঃখের কথা বলেছে।

নয়নতারার বাবুগিরি হল তামাকপাতা দিয়ে পান খাওয়া। কলাইকরা একখানা বাটিতে তার পান সুপুরি চুন আর খয়ের থাকে ছোটো ছোটো কৌটোয়। সেই বাটিখানা হাতে করে নয়নতারা ঘর থেকে বেরিয়ে নিঃসাড়ে কাছে এসে উবু হয়ে বসল। বর্ষাকালে পান বেজায় সস্তা, তবু ভারি কৃপণের মতো একখানা পানের একটুখানি ছিঁড়ে নিয়ে তাতে চুন দেয়। সুপুরিগাছ বাড়িতেই আছে কয়েকটা। ভাগজোখ হয়েও যা পায় তাতে নয়নতারার বছর চলে যায়। কিন্তু কিছুটা বিক্রি করে দিতে হয় বলে নয়নতারা সুপুরি খায় এক চিমটি। দাঁতের জোর নেই বলে ছোটো হামানদিস্তায় ফেলে গুঁড়ো করে নেয়। তাতে খরচাও হয় কম। এক চিলতে কাঁচা তামাকপাতা ঠেসে মুখে পানটা পুরে দেয়। অনেকক্ষণ পানটা মুখেই থেকে যায়, রসস্থ হয়। সারা দিন ওই জিনিসই নয়নতারাকে চাঙ্গা রাখে।

পান সাজা থেকে মুখে দেওয়া অবধি লক্ষ করল বিষ্ণুপদ। দেখতে বেশ ভাল লাগল। কত যত্নে টুকটুক করে ভালবেসে পানটা সাজল নয়নতারা! পানের মধ্যেই যেন ওর প্রাণভোমরা।

কিছু বলবে বলে মুখটা তুলল বুড়ি। বিষ্ণুপদ চেয়েই ছিল। একটু হাসল।

নয়নতারা হাসল না। বলল, শ্যামলী আজ ঘর থেকে বেরোলো না। দেখলে?

দেখলাম।

আবার লাগবে বোধ হয়।

তা লেগে যাবে।

রামজীবনের ওই পাকাবাড়িটাই অপয়া। ওটা যখন উঠতে শুরু করল তখন থেকে অশান্তি।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, শান্তি আবার কবে ছিল?

শ্যামলী বলে, বীণাপাণি নাকি নটী হয়ে গেছে। লাইনে নেমেছে। খারাপ খারাপ সব কথা। আমি বলি কি, পাঁচজনের কাছে না শুনে একবার নিজেই খবর নাও না। যাত্রায় নামা কি ভাল?

হঠাৎ বীণার কথা উঠছে কেন?

কাল রাতে তাকে নিয়ে একটা খারাপ স্বপন দেখেছি। কী সব যেন দেখলুম, ভাল মনে নেই। কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে গেল।

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ভাল খবর কি আর পাবে? অজান থাকাই তো ভাল।

তুমি এমন করে বলো যে, ভয় খেয়ে যাই।

আর ভয় কিসের! ডাক এসে গেছে। মনটা তুলে নাও।

তুমি ওরকম বোলো না তো!

তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য বলিনি। আমার কি মনে হয় জানো, ওরা সব আমাদের চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধি-বিবেচনাওলা মানুষ। আমরা কি দুনিয়াটাকে বুঝি? যা সব ঘটে যাচ্ছে চারদিকে তা বুঝি? এই হাবলা-ভ্যাবলা মাথায় কি সব সেধোয়? আমাদের চেয়ে ওরা বোঝে অনেক ভাল। তা ওরাই দুনিয়াটাকে বুঝে-সুঝে নিক না। আমাদের আমল তো এটা নয়।

সে কথা ঠিক। তবে ভয় হয়, যদি নষ্ট পায়।

সেটাও ওরাই বুঝবে। নষ্ট কি ভাবে পায় তা কি তুমি জানো, নাকি আমিই জানি!

কিন্তু এ কথাও বলি, বীণার বিয়েটা তুমি ভাল দাওনি। নিমাই কি আর তেমন ছেলে? খাওয়াতে পরাতেই তো পারে না। পেটে টান না পড়লে বীণা কি আর যাত্রায় নামত?

ওই কথাই তো বলি, আমি বড় আহাম্মক। তাই আজকাল ভয়ে আর রা কাড়ি না। মুখ খুললেই কত কি ভুলভাল বলে ফেলব। বীণার বিয়েটাও তো ওই আহাম্মকিই হল কি না। ছেলেটা দেখলুম বড় সৎ। মা-বাপের ওপর অগাধ ভক্তি। ওই দেখেই বুকটা নেচে উঠল, এ আমলে তো এ জিনিস মেলে না। কিন্তু এখন বুঝি, কত বড় বোকার মতোই কাজটা হল। মেয়ে হয়তো আমাকে কত শাপশাপান্ত করে।

আজ আমার বীণার জন্য বড় মনটা খারাপ লাগছে। স্বপন দেখা ইস্তক বুকটা ভার।

তাহলে একবার রামজীবনকে বলো। সে তো এধার ওধার ঘোরাফেরা করে। সে গিয়ে খবর এনে দেবেখন।

সে কি আর এখন যেতে চাইবে? ঘর উঠছে, সে এখন ঘরের নেশায় বুঁদ। হা-টাকা জো-টাকা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে নড়ানো যাবে না।

তাও বটে।

আমি বলি কি, আমরা বুড়োবুড়ি তো অনেককাল ভিটে আকড়ে পড়ে আছি, কোথাও যাই-টাই না। তা একবার যাবে নাকি বনগাঁ? বুড়োবুড়ি মিলে যাই চলো। বেশী দূর তো নয়।

বিষ্ণুপদ হাসল, সে আর বেশী কথা কি! কিন্তু তোমাদেরই তো কিসে যেন বাধে। ছেলেপুলে না হলে নাকি মেয়ের বাড়ি যেতে নেই!

ও বাবা! তাই তো! মনে ছিল না কথাটা। তা হলে একখানা পোস্টকার্ড লিখে দাও, পটল আজই ডাকে দিয়ে আসবে। রিপ্লাই কার্ডে দিও। পটলকে পাঠাচ্ছি পোস্টকার্ড আনতে।

পাঠাতে হবে না। আমার কাছে একখানা জোড়া পোস্টকার্ড আছে। লিখে দিচ্ছি।

তাকে আসতে লিখো একবারটি। বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে মেয়েটাকে।

লিখব'খন। তবে এই অশান্তির মধ্যে এসে তার তো তেমন সুখ হবে না।

তবু আসুক। নিমাইকে নিয়েই যেন আসে।

সব দিক বুঝে-সুঝে বলছো তো!

বুঝবার আবার কি আছে! সেই কবে একবার এসেছিল, বছর চারেক হবে বোধ হয়। মুখখানাই তো ভুলতে বসেছি। আর বুঝসুঝ দরকার নেই, মনটা বড় খারাপ। একবার আসুক। তোমার তাকে দেখতে ইচ্ছে যায় না?

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, না। আমি বড় একা হয়ে গেছি। কেবল মনে হয় আমার আর কেউ নেই।

বলো কি গো! সর্বনেশে কথা যে!

থেকেও কি আছে! তুমিই বলো। ওরা কি আর আমার তোমার? ওরা সব নিজের নিজের। কাউকে আপনার জন ভাবতে পারি না। কৃষ্ণজীবনের কথা ভাবো তো একবার!

তার কথা আবার কি ভাবব?

ভাবো। ভাবলেই বুঝবে।

তুমিই বুঝিয়ে দাও না! জানো তো আমার মাথা নেই।

কৃষ্ণজীবন তো আমাদেরই ছেলে, নাকি?

তবে কার ছেলে?

তাকে কি আমাদের ছেলে বলে মনে হয়? সে যদি রামজীবন বা বামাচরণের মতো হত তাহলে ব্যাপারটা স্বাভাবিক হত। তা তো হল না। কত বিদ্যে শিখে সে এক লাফে কোথায় উঠে গেল। বিলেত-আমেরিকা অবধি ঘুরে আসছে। দুনিয়া-জোড়া নাম। এটা কেমন হল বলো তো! আমাদের ছেলের কি এ রকম হওয়ার কথা? আমরা দুটো বোকাসোকা মেয়েপুরুষ, আমাদের ছেলেপুলেরা তো আমাদের মতোই হবে নাকি! তা তো হল না কৃষ্ণজীবন!

লোকের পাঁচটা ছেলে কি একরকম হয়?

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, না। কিন্তু কেন হয় না তাই তো বুঝি না। রামজীবন, বামাচরণ এরাও কি আর আমাদের ছেলে? তুমি তো জানো, জীবনে আমার সঙ্গে কারও ঝগড়াঝাঁটি হয়নি, মুখে একটাও দূষিত কথা উচ্চারণ করিনি, কাউকে গালাগালি অপমান করিনি। রামজীবন বা বামাচরণ তাহলে ওরকম করে কি করে?

সে কপালের দোষে।

তাই হবে। আমি ভেবে দেখেছি, ছেলেপুলে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ নেই। আমরা তো আর তৈরি করিনি ওদের, আমাদের ভিতর দিয়ে জন্মেছে। যার যার নিজের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আর ওদের নিয়ে ভেবে কি লাভ?

ভাবনা কি ছাড়ে?

আমাকে তো ছেড়েছে। যখনই কৃষ্ণজীবনের কথা ভাবি তখনই বড় অবাক লাগে। আমার প্রাইমারি ইস্কুলে পড়ানোর বিদ্যে, বিষয়বুদ্ধি নেই, তেমন বড় কোনও বাবু-মানুষ এসে দাঁড়ালে কথা কইতে ভয় খাই। সেই আমার ছেলে ওরকম বাঘা বিদ্বান হয়ে ওঠে কি করে? এ যে অশৈলী কাণ্ড! আর সে অমনধারা হয়ে উঠল বলেই তো এদের সঙ্গে বনল না। একরকম মেরেধরে তাড়াল তাকে।

পুরনো কথা তুলে কি লাভ? তুমি কি বসে বসে ও সব ভাবো?

দুটো জিনিস খুব ঘোরাফেরা করে মনের মধ্যে। একটা হল কৃষ্ণজীবনের কথা। ইদানীং খুব তার কথা মনে হয় আর বড্ড অবাক লাগে। আর দু নম্বর হল রামজীবনের ওই বাড়িটা। কেন যে মনে হয়, ওই বাড়িটা যেই শেষ হবে অমনি আমার ঘড়ির সময় ফুরোবে।

সর্বনেশে কথা! তাহলে ওই অলক্ষুণে বাড়ি এখনই বন্ধ করে দিতে বলি।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, বোলো না। ও সব আবোল তাবোল ভাবনা, ওর মধ্যে কোনও সার নেই। মন হচ্ছে এক নিষ্কর্মা মানুষ, সারাদিন অকাজ করে যাচ্ছে। দুনিয়াতে যারা বড় মানুষ তাদের মন হল বিশ্বকর্মা। কত কী ভাবছে আর করে ফেলছে। সেই জন্যই তো দুনিয়ায় কত অশৈলী কাণ্ড ঘটছে। আকাশে এরোপ্লেন উঠছে, চাঁদে মানুষ যাচ্ছে, লোকে টি ভি দেখছে ঘরে বসে। ও সব তো আমার মতো বোকাসোকা মানুষের কর্ম নয়। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বেঁচে আছি মাত্র। নাড়ী চলছে, বুক ধুকপুক করছে, খাচ্ছি হাগছি, এইমাত্র। বিষ্ণুপদ থাকলেই কি, গেলেই কি। দুনিয়ার লাভও নেই, লোকসানও নেই।

নয়নতারা পানের একটুখানি পিক ফেলে হেঁচকি তুলে বলল, আর আমার কথা বুঝি ভাবতে নেই?

সেই তো কথা। তুমিই একমাত্র মানুষ যার কাছে বিষ্ণুপদ একটা তালেবর লোক। তোমার জন্যই তো দড়ি ছিঁড়তে চাইছে না আমার।

এ কথায় নয়নতারা হয়তো কেঁদে ফেলত, কিন্তু এ সময়ে বৃষ্টি মাথায় করে উঠোনে চারটে সাইকেল এসে ঢুকল পর পর।

ঘটনা পুরনো, বহুবার ঘটেছে। তবু নয়নতারা 'ওই আবার এসেছে' বলে একটা চাপা আর্তনাদ করে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল, বলল, তুমি কথা কইতে যেও না ওদের সঙ্গে। রাঙাকে ডেকে দিচ্ছি।

চারটে জোয়ান মর্দ ছেলে এসে দাওয়ার সামনে পা ঠেকিয়ে সাইকেল থামাল, নামল না।

কালো চেহারার একটা ছেলে বিষ্ণুপদর দিকে চেয়ে থমথমে গলায় বলল, রামজীবন কোথায়?

নয়নতারা কথা কইতে বারণ করে গেছে। কিন্তু রাঙাকে এখন পাবে না নয়নতারা। রাঙা একটু আগে পুকুরে গেছে এক ডাঁই বাসি কাপড় নিয়ে। বিষ্ণুপদ ছেলেটাকে দেখল ভাল করে। শক্ত পোক্ত শরীর, বয়সে রামজীবনের চেয়ে ছোটো, চোখের নজর মোটেই সাদা-সরল নয়। চোখে একটু ধমক আছে।

বিষ্ণুপদ নিরীহ গলায় বলে, সে তো সকালে বেরিয়ে গেছে।

সোডার বোতল খোলার আওয়াজের মতো পরের প্রশ্ন এল, কোথায় গেছে?

সে তো বলে যায়নি।

পিছনে তিনটে ছেলে পাথরের মূর্তির মতো সাইকেলে বসা। বৃষ্টিকে গ্রাহ্য নেই।

সামনের ছেলেটা বিষ্ণুপদর দিকে পলক না ফেলে চেয়ে থেকে বলে, কাল তার বটতলায় যাওয়ার কথা ছিল। যায়নি।

বিষ্ণুপদর একটুও ভয় হল না। ছেলেটার চোখের দিকে সেও নিষ্পলক চেয়ে থেকে বলল, কাল তার যাওয়ার উপায় ছিল না।

কী হয়েছিল?

একটু ঝামেলায় ছিল।

বটতলা দিয়ে আজকাল সে যাতায়াত করছে না। তাকে বলবেন আজ সন্ধের পর যদি না যায় তা হলে কিন্তু মুশকিল আছে।

বিষ্ণুপদ নিরীহ গলায় বলে, মুশকিল! কেন, সে কি কোনও খারাপ কাজ করেছে?

তাকে বলবেন, আমরা সন্ধের পর বটতলায় থাকব। কথা আছে।

বিষ্ণুপদ মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে নাড়ল। সে কিছু বুঝতে পারছে না। বৃষ্টি হঠাৎ চেপে নামল। চারজন সাইকেলবাজ আবছা হয়ে গেল বৃষ্টিতে। হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে ওরা চলে যাচ্ছে। যেন একটা পরোয়ানা ধরিয়ে দেওয়ার ছিল, কাজ শেষ করে ফিরে গেল।

উঠোনটা ফাঁকা হয়ে গেল বটে, কিন্তু মনটা কি হল? চারজন সাইকেলবাজ এখন অনেক সময় ধরে মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে। কিছুতেই যাবে না।

বামাচরণের ঘরের দরজা খুলে শ্যামলী বেরিয়ে এল। বিষ্ণুপদ প্রথমটায় ভেবেছিল, বোধ হয় পুকুরে বা কুয়োতলায় যাবে। কিন্তু ঘোমটা টেনে জলময় উঠোনটা পেরিয়ে শ্যামলী উঠে এল দাওয়ায়।

আপনাকে একটা কথা বলছি। আপনার এক ছেলে যদি আর এক ছেলেকে খুন করাতে গুণ্ডা লাগায় তাহলেও কি আপনি এ রকম নির্বিকার বসে থাকবেন?

বিষ্ণুপদ সচকিত হয়ে বলে, কে কাকে খুন করাবে বললে?

আপনার আদরের রামজীবন যে আমার স্বামীকে খুন করানোর সাঁট করছে তা কি জানেন?

বিষ্ণুপদ ভারি বেকুব হয়ে গেল। চেয়ে রইল শ্যামলীর দিকে।

১২

লিফ্‌টবাহিত হয়ে কী মসৃণ এই সাততলায় উঠে আসা। তারপর ডোরবেল বাজিয়ে দাও। কয়েদখানার দরজা খুলে যাবে। যখনই সে ফেরে তখনই তার মনে হয়, পাখি কি কখনও খাঁচায় ফেরে? গাঁয়ের বাড়িতে সে যখন কবুতর পুষেছিল, বারান্দায় ওপরে লটকানো কাঠের বাক্সের ঘরে রোজ ফিরে আসত পোষা কবুতরেরা। গৃহী পাখি। মানুষকে পুষল কে? মানুষ নিজেই কি? সে ঘর বানাল, কপাট বানাল, নিজেকে পুরল তার মধ্যে! কিন্তু গৃহের মধ্যে কী আশা করে মানুষ? নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা, স্বস্তি, নির্ভরতা, স্নেহ? আবার এই তার নিজস্ব ঘর তাকে পৃথিবী থেকে খানিকটা আলাদাও করে দেয় না? মানুষ কি ভাবতে শেখে না, এই ঘর আমার, এই বাড়ি আমার, অন্য ঘর-বাড়িগুলো আমার নয়? অন্য ঘরবাড়ি উড়ুক পুড়ুক, আমারটা থাকলেই হল। মানুষ এইভাবেই কি ক্রমে উদাসীন হয়ে যায় ঘরের বাইরের পৃথিবীর প্রতি? অন্য সকলের প্রতি?

অনেকের সঙ্গেই তার মতের অমিল হচ্ছে আজকাল—মন্ত্রী, আমলা, কতিপয় শিল্পপতি। কৃষ্ণজীবন তাদের কিছুই বুঝিয়ে উঠতে পারে না। সে বরাবর নন-কমিউনিকেটিভ। কিন্তু লিখিত প্রতিবেদনে সে তুখোড়। সে জানে, তার যুক্তি অকাট্য। তার মত আজ বা কাল পৃথিবীকে গ্রহণ করতেই হবে। আজ হলেই ভাল হয়। কাল বড় দেরি হয়ে যাবে না কি?

ইদানীং তাকে একগাদা কমিটির সদস্য করা হয়েছে। তাকে ডাকা হচ্ছে বিভিন্ন কনফারেন্সে। বিশেষজ্ঞরা তার কথা শুনছেন। এখনও মানতে পারছেন না। সেইসব লিখিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে দেশ ও বিদেশের নানা পত্র-পত্রিকায়। লোকে তার কথার সারবত্তা বুঝতে পারছে। মানতে পারছে না।

আজ দিল্লিতে সমবেদনাসম্পন্ন, বন্ধুভাবাপন্ন এক মন্ত্রী একটু ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, এটা কী করে হয় কৃষ্ণজীবনবাবু, আপনি ইন্ডাস্ট্রির গ্রোথকেই বন্ধ করে দিতে চাইছেন! ইন্ডাস্ট্রি কমে গেলে প্রোডাকশন কমে যাবে, সরকারের আয় কমবে, আন্‌এমপ্লয়মেন্ট দেখা দেবে।

কৃষ্ণজীবন খুব মৃদুস্বরে বলল, মানুষ অনর্থক কিছু বাহুল্য জিনিস তৈরি করে যাচ্ছে। আমি বিচার করে দেখেছি, অনেক কিছু না হলেও মানুষের চলে যায়।

আপনি অনেকগুলো ইন্ডাস্ট্রিকে ব্ল্যাকলিস্টে ফেলতে চাইছেন। একটা চালু ইন্ডাস্ট্রি কি হুট করে বন্ধ করে দেওয়া যায়? বরং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট রিসাইক্লিং-এর জন্য আপনি যে নানারকম প্ল্যান্টের কথা বলেছেন সেটা ভেবে দেখার মতো। কিন্তু তাতেও অনেক টাকার দরকার। এটা তো নতুন কনসেপশন! কিন্তু, কারখানার

ধোঁয়াকে মাটির তলার চেম্বারে ঢুকিয়ে তা থেকে বাই প্রোডাক্ট করার যে প্রস্তাব দিয়েছেন সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

আমিও জানি না কি করা যায়। সায়েন্টিস্টরা ব্যাপারটা ভাবলে এবং হাতে-কলমে চেষ্টা করলে কিছু একটা হতে পারে।

মন্ত্রী মাথা নেড়ে বললেন, আমাদের পক্ষে এসব ব্যাপার বড় বেশী নাগালের বাইরে। এটা গরিব দেশ। আমাদের ইন্ডাস্ট্রি তেমন গ্রো করেনি, এ তো আপনি জানেন। ভারতবর্ষের কলকারখানার দূষণ পৃথিবীর খুব বেশী ক্ষতি করছে না।

ঘরে কয়েকজন উচ্চপদস্থ আমলাও ছিলেন। তাঁরা বললেন, কোথায় আমরা নতুন ইন্ডাস্ট্রির কথা ভাবছি, আর এদিকে আপনি বলছেন ইন্ডাস্ট্রি কমাতে হবে।

কৃষ্ণজীবন যে অর্থনীতি বোঝে না, তা নয়। পরিবেশ, অর্থনীতি, বিজ্ঞান সবকিছুই পরস্পরের সঙ্গে অন্বিত। সে এও জানে ইন্ডাস্ট্রি কমলে ভারতের ওপর প্রথম ধাক্কাটা হবে মারাত্মক। তবে তার প্রস্তাব যে এঁরা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনাও করছেন না এবং সে চলে গেলেই যে তার বক্তৃতার কপি বাজে কাগজের ঝুড়িতে চালান হয়ে যাবে, এও সে জানে। সে বুঝতে পারছে এরা তাকে একটু বাজিয়ে দেখছে মাত্র, গুরুত্ব দিচ্ছে না। তবু যে সেমিনারের পর তাকে আলাদা ডেকে মন্ত্রী স্বয়ং কথা বলেছেন, এটাই ঢের। কৃষ্ণজীবন ক্লান্ত বোধ করছিল।

এরা কি তাকে পাগল ভাবে! তার প্রস্তাব কি এতই অবাস্তব? কিংবা খুব হাস্যকর? অনেক জ্ঞানীগুণী তাকে বলেছেন, দূষণরোধ খুব ভাল কথা, কিন্তু আপনি ইন্ডাস্ট্রি কমাতে বলছেন, সেটা তো ঘড়িকে উল্টোদিকে চালানো!

ঠিক কথা। কৃষ্ণজীবন গোটা দুনিয়াকেই হুঁশিয়ারি দিয়ে বলতে চাইছে, ভোগ কমাও, ভোগ্যপণ্য সংযত করো, অল্প নিয়ে থাকো, যদি শেষ অবধি বাঁচতে চাও, যদি সন্তানসন্ততির বেঁচে থাকা চাও। মন্ত্রী মানছেন না, আমলারা মানছেন না, অর্থনীতিবিদরা মানতে রাজি নন, তবু দূষণমুক্ত পৃথিবীর নানা দিকে যে শঙ্কিত পরিবেশ-চেতনার উন্মেষ ঘটছে তাতে ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণজীবনের কণ্ঠস্বরটিই কি প্রবল হয়ে উঠবে না একদিন? কিছু লোক কৃষ্ণজীবনের কথা শুনছে, অনুধাবন করছে, সমর্থন করছে। তাকে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না বলেই কি মন্ত্রী তাকে নিজের ঘরে আমন্ত্রণ করে আনেননি?

একজন আমলা বললেন, যথেষ্ট গাছপালা লাগানো হচ্ছে, নতুন নতুন বনসৃজন হচ্ছে, পলিউশন তাতেই কন্ট্রোলে থাকবে।

কৃষ্ণজীবন মূক ও বধিরের মতো বসে রইল। তার কথা আসতে চাইছে না। তার পেপারে ভারতবর্ষে বনসৃজনের নামে যে ধাষ্টামো হচ্ছে তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। জলদি জাতের গাছ লাগিয়ে দায় সারা হচ্ছে বটে, কিন্তু সেইসব গাছ তাড়াতাড়ি বাড়তে গিয়ে মাটির রসকষ টেনে ছিবড়ে করে ফেলছে। অন্য দিকে বন দফতরের পরোয়ানায় কাটা হচ্ছে সেইসব গাছ যা বহুদিন ধরে বাড়ে, বহুদিন বাঁচে এবং মাটিকে ধরে রাখে।

বলে লাভ কি? এরা কি জানে না? এরা কি জানে না আজকাল হিমালয় পর্বতমালায় অবধি বৃষ্টি অনিয়মিত এবং পশু-খাদ্যেরও অভাব? পাহাড়ী মানুষেরা জ্বালানী ও অন্য প্রয়োজনে নেড়া করে ফেলছে বৃক্ষ সংবলিত পাহাড়গুলিকে! এরা কি জানে না, পৃথিবী ছাড়া গোটা সৌরমণ্ডলে আর একটিও গ্রহ নেই, যাতে প্রাণের

বিন্দুমাত্র লক্ষণ আছে? জীবজন্তু, গাছপালা দূরে থাক, কোনও গ্রহে একটি জীবাণুও নেই? এই মহার্ঘ, অনন্য গ্রহটিকে শুধু অবিমৃশ্যকারিতায় একটি মৃত গ্রহে পরিণত করার অধিকার কার আছে?

নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট, ডিজেল ইঞ্জিন, কম্প্রেসর, রাসায়নিক ধোঁয়াশা, ক্ষতিকারক গ্যাস— সবকিছুর বিরুদ্ধেই সোচ্চার কৃষ্ণজীবন। শুধু ভারতবর্ষ তো নয়, গোটা দুনিয়ায় প্রগতির নামে এক বিপুল যন্ত্র সভ্যতার বিস্তারের বিরুদ্ধেই তার জেহাদ। পৃথিবীর মায়াময় বাতাবরণ ছিদ্রময় হয়ে এল। সকল প্রাণের উৎস মহান সূর্য অবিরল ছুঁড়ে দিচ্ছে তার মারক নানা বল্লম। পৃথিবীর মায়াময় আবরণ তা আটকাতে পারছে না আর। উষ্ণ হচ্ছে তার মরু অঞ্চল। বাড়ছে ক্যানসার, চর্মরোগ। অচিরে মেরু প্রদেশের বরফ গলে মহাপ্লাবনের জলের ঢল নেমে আসবে সমুদ্রে।

এত কথা কি বলা যায়?

মন্ত্রী তার দিকে চেয়ে ছিলেন। হয়তো ভাবছিলেন, লোকটা কি একটু বেহেড? একটু ডাম্ব?

মন্ত্রী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ইউ আর অ্যান এক্সপার্ট। আপনি ভেবে দেখবেন।

দুপুরের ফ্লাইটে ফিরে এসেছে কৃষ্ণজীবন।

আনমনে সে কিছুক্ষণ ডোরবেল বাজাল। বিরক্তিকর এক পাখির ডাকের মতো শব্দ হচ্ছে ভিতরে। কে যে এরকম বিরক্তিকর ডোরবেল পছন্দ করেছিল কে জানে! একবার বোতাম টিপলে অনেকক্ষণ ধরে বেজে যায়। অথচ ডোরবেলের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত জোরালো আওয়াজই যথেষ্ট। খামোকা এই শব্দময় শহরে আরও নতুন নতুন বিচিত্র শব্দের সৃষ্টি করা! কে জানে, এ আমলের লোকেরা বোধ হয় শব্দ ভালবাসে! কেবল শব্দ আর শব্দ। সেইজন্যই কি স্টিরিও, রক মিউজিক, চেঁচিয়ে কথা বলা?

দরজা খুলল না। একটা স্পেয়ার চাবি কৃষ্ণজীবনের কাছে থাকে। সে দরজা খুলে খাঁচায় ঢুকল।

বাড়িতে কেউ নেই। রিয়া তার ছেলেমেয়ে সহ কোথায় গেছে। এ বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টার কাজের একটি মেয়েও আছে। তাকেও হয় সঙ্গে নিয়ে গেছে, নয় ছাড়িয়ে দিয়েছে। রিয়া ঘন ঘন কাজের লোক পাল্টায়।

ফাঁকা বাড়িতেই অধিকতর স্বস্তি বোধ করে কৃষ্ণজীবন। লোক থাকলে সে অস্বস্তি বোধ করে। শুধু দোলন ছাড়া। অন্য সব জায়গা থেকে ধাক্কা খেয়ে প্রত্যাহৃত হয়েছে তার মন। তারপর জড়ো হয়েছে দোলনের ওপর। দোলনকে সে সবটুকু দিয়ে ভালবাসে। সে ভাবে, আমি দোলনকে একটা সবুজ পৃথিবী দিয়ে যাবো।

কৃষ্ণজীবনের কোনও নেশা নেই। চা অবধি খায় না। সে এক গ্লাস জল খেল। বাড়ির পোশাক পরে নিজের ঘরে গিয়ে বইপত্র নিয়ে বসল।

বইতে ডুব দিলে কৃষ্ণজীবনের কোনও বাহ্যজ্ঞান থাকে না। সে সম্পূর্ণ সম্মোহিত হয়ে থাকে। ডোরবেলটা তবু শুনতে পেল সে। অনেকক্ষণ ধরে বাজছে। মেকানিক্যাল পাখির ডাক।

কৃষ্ণজীবন গিয়ে দরজা খুলল। মুখটা চেনা, কিন্তু নামটা মনে করতে পারল না সে। তার মগজ অধিকার করে আছে বই।

তারপর হাসল কৃষ্ণজীবন। বলল, ওরা তো কেউ বাড়ি নেই।

মেয়েটা তার দিকে একটু বিস্ফারিত চোখে চেয়েছিল। বলল, আমি একটু ভিতরে আসব?

কেন আসবে তা বুঝতে পারল না কৃষ্ণজীবন। মেয়েটা তার মেয়ে মোহিনীর বান্ধবী। প্রায়ই আসে। নামটা মনে পড়ল না।

দরজা ছেড়ে কৃষ্ণজীবন বলল, আসতে পারো। কিছু দরকার আছে?

আমাদের বাড়ির ফোনে ডায়ালটোন নেই। আমি আপনাদেরটা একটু ব্যবহার করতে পারি?

বিরক্ত কৃষ্ণজীবনের মনেই পড়ল না, তাদের টেলিফোনটা কোথায় আছে। সে টেলিফোন যন্ত্রটাকে সুনজরে দেখে না। উপকারী যন্ত্র বটে, কিন্তু বড্ড জ্বালায়। টেলিফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতে ভালবাসে তার বউ রিয়া আর মেয়ে মোহিনী। কী করে বলে কে জানে!

কৃষ্ণজীবন বলল, করতে পারো। হয়ে গেলে যাওয়ার সময় দরজাটা টেনে দিয়ে যেও। আমি আমার ঘরে যাচ্ছি।

কৃষ্ণজীবন তার ঘরে এসে ফের বই খুলে বসল। জগৎ-সংসার ভুলে গেল।

কতক্ষণ কেটেছে কে জানে! হঠাৎ কে যেন ঘরের আলোটা জ্বেলে দিল।

এই অন্ধকারে কি করে পড়ছিলেন?

কৃষ্ণজীবন তার ঘোর-লাগা চোখ তুলে তাকাল। সেই মেয়েটি।

কৃষ্ণজীবন কী বলবে ভেবে পেল না। খুব অস্বস্তির সঙ্গে বলল, সন্ধে হয়ে গেছে, না?

হ্যাঁ। আপনার চোখ খুব ভাল, তাই এই অন্ধকারেও পড়ে যাচ্ছিলেন।

আলো জ্বালতাম। একটু বাদেই জ্বালতাম।

আমার ফোন করা হয়ে গেছে।

দরজাটা টেনে দিয়ে যেও।

আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

কি কথা?

আপনি কখনও লাঙ্গল চালিয়েছেন?

কেন চালাব না? অনেক চালিয়েছি।

সত্যি? দারুণ ব্যাপার, না!

কৃষ্ণজীবন মেয়েটির দিকে অবাক চোখে চেয়ে বলে, এমন কিছু দারুণ ব্যাপার নয়। সবই অভ্যাস।

আচ্ছা, আপনি তো হাইলি এরুডাইট। আপনি কেন চাষ করতেন?

করতাম। আমরা খুব গরিব ছিলাম।

আমি একটু বসতে পারি?

বোসো।

আপনাকে ডিস্টার্ব করছি না তো?

কৃষ্ণজীবন বিরক্ত হচ্ছে। তবু বলল, কিছু বলবে?

আমি প্রায়ই আসি, জানেন তো?

জানি। তোমার নামটা মনে নেই।

অনু। আপনার সঙ্গে ভীষণ কথা বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আপনি সবসময়ে এত ব্যস্ত থাকেন! আসলে আপনি তো থাকেনই না কলকাতায়।

হ্যাঁ।

আর আপনি ভীষণ গম্ভীর বলে একটু ভয় পাই।

কৃষ্ণজীবন খুব অবাক হয়ে বলে, ভয় পাও? কেন?

মনে হয় আপনি ভীষণ রাগী।

কৃষ্ণজীবন দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, আমার রাগ নেই। রাগতে পারিই না। রাগতে পারলে হয়তো ভালই হত।

রাগ কি ভাল? আপনি রাগবেন কেন? কখনও রাগবেন না।

কৃষ্ণজীবন ঠিক এ ধরনের কথাবার্তা কখনও শোনে না। মেয়েটি কি খুব সরল? বা মাথায় ছিট আছে? বুঝতে না পেরে সে চুপ করে থাকে।

অনু বলল, আপনার ভয়েসটা দারুণ ভাল। রিয়েল বাস। আর আপনি ভীষণ হ্যান্ডসাম।

মেয়ের বয়সী একটি মেয়ের মুখে একথা শুনে আর একটু বিস্ময় বাড়ল কৃষ্ণজীবনের। যৌবনকালে সে শুনেছে বটে যে, তার চেহারাখানা ভাল। কিন্তু ভাল চেহারার কোনও উপযোগ বা প্রয়োজনীয়তা সে তো অনুভব করে না! তার চিন্তার রাজ্যে চেহারার মূল্যই বা কী?

অনু খিলখিল করে হেসে ফেলল। তারপর বলল, কিন্তু আপনি একটু শ্যাবি। আজ শেভ করেননি কেন?

কৃষ্ণজীবন নিজের গালে হাত বুলিয়ে নিল নিজের অজান্তেই, বলল, শেভ! করিনি বলছো?

করেননি। সেটাই মনে নেই?

কৃষ্ণজীবন খুব ভাবিত হয়ে বলে, সকালে খুব তাড়া ছিল। কি জানি ভুলেও যেতে পারি! মিনিস্টারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। শেভ তো করার কথা।

ফের খিলখিল করে হাসল অনু। বলল, মোটেই করেননি। আপনার গালে স্টাবস রয়েছে।

হতে পারে। তুমি খুব হাসো বুঝি?

অনু একটু গম্ভীর হয়ে বলে, হাসিই তো আমার রোগ। কিন্তু ফর লাস্ট টু উইকস হাসছি না। এই প্রথম আপনার কাছে এসে হাসলাম। আমার বাবা সিরিয়াসলি ইল। হার্ট অ্যাটাক।

ওঃ! বলে কৃষ্ণজীবন খুব অস্বস্তির সঙ্গে চুপ করে থাকে।

এই বয়সের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎ বা কথাবার্তা হয়ই না। জানেই না এরা কেমন।

আজ বাবা একটু বেটার। পেইন নেই, সেডেটিভ কম দেওয়া হচ্ছে। আজ আমার মনটা খুব ভাল লাগছে।

এসব ক্ষেত্রে কী বলতে হবে তা কৃষ্ণজীবন ভেবে পায় না। একজন প্রম্পটার থাকলে ভাল হত। সে শুধু বলল, বাঃ, বেশ!

আচ্ছা, আপনি বাড়িতে বুঝি লুঙ্গি পরেন? আমার বাবা পরে পাজামা আর পাঞ্জাবি। সব সময়ে ফিটফাট।

কৃষ্ণজীবন প্রচণ্ড অস্বস্তি বোধ করছে। এ মেয়েটা কি ফাজিল? ফচকে? অসভ্য? ছিটিয়াল? এভাবে কৃষ্ণজীবনের সঙ্গে কেউ কথা বলে না। এ বাড়িতে তাকে ভাল করে লক্ষই বা করে কে? কৃষ্ণজীবন তার লুঙ্গিটার দিকে চেয়ে বুঝতে পারল না, কৃতকর্মের জন্য তার অনুশোচনা হওয়া উচিত কিনা! ভদ্রলোকদের কি বাড়িতে পাজামা-পাঞ্জাবি পরেই থাকা উচিত? সে পাজামা তো পরেইনি, এমনকি তার গা আদুর।

আপনি কি একসারসাইজ করেন?

একসারসাইজ! মানে ব্যায়াম?

হ্যাঁ। আমার বাবা একটুও করে না। ডাক্তার বলেছে, এখন থেকে রেগুলার হাঁটতে হবে। অনেকটা করে। অবশ্য এখনই নয়। টোটাল রিকভারির পর। আপনি কিন্তু খুব মাসকুলার। হি-ম্যান। আচ্ছা, গ্রামের বাড়িতে আপনার কে আছে?

কৃষ্ণজীবন এতক্ষণে কূল খুঁজে পেল। গাঁ নিয়ে কেউ প্রশ্ন করলে সে আজও কথা খুঁজে পায়। কৃষ্ণজীবন একটু হেসে বলল, সবাই আছে। মা-বাবা, ভাইরা, ভাইদের ছেলেপুলে। আমাদের বেশ বড় সংসার।

সবাই প্লাউম্যান?

প্লাউম্যান? না না, চাষের জমি এখন ভাগচাষীদের হাতে। বেশী নেইও। অভাবে বিক্রি করে দিতে হয়েছে। আমার ভাইরা সামান্য চাকরি বা ব্যবসা করে।

আপনার গ্রাম বেশী ভাল লাগে, না শহর?

কৃষ্ণজীবন স্বপ্নাতুর চোখে মেয়েটির দিকে চেয়ে বলে, গ্রাম। আমি একদিন সেখানেই ফিরে যাবো। চাষ করব। গাছের পর গাছ লাগাব। সবুজে সবুজ করে দেবো চারধার।

আপনি তো পলিউশন এক্সপার্ট। গাঁয়ে কোনও পলিউশন নেই, না?

আছে, আছে। পলিউশন সর্বত্র আছে। যেখানে কল-কারখানা নেই, ডিজেলের ধোঁয়া নেই, কেমিক্যাল ফিউম নেই, সেখানে কী আছে জানো? মানুষকে মানুষের গালাগাল, অশ্রাব্য কথা, করাপশন। এগুলোও পলিউশন। ভিতরকার পলিউশন। কলকাতার বস্তি বা ঝুপড়ি দেখনি?

দেখব না কেন! আমাদের বাড়ির পিছনেই একটা আছে।

ঝগড়া শুনতে পাও?

হ্যাঁ। কী অসভ্য অসভ্য গালাগাল দেয়।

সে কথাই বলছি। মানুষ এখনও এইসব পলিউশন নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেনি বোধ হয়। মাতাল, অশিক্ষিত বাপ দূষিত কথা বলে, গাল দেয়, মারধর করে। ছেলেমেয়েরা সেইসব শিখে নেয়। এইভাবেই এত পলিউটেড হয়ে যায় এরা, যখন আর পৃথিবীর সৌন্দর্য বুঝতে পারে না, জীবনের সৌন্দর্য বুঝতে পারে না। গোটা দুনিয়াকে ঘেন্না করতে থাকে।

ইউ টক নাইস। মুগ্ধ চোখে চেয়ে অনু বলে।

কৃষ্ণজীবন মৃদু হেসে বলে, গ্রামেও সেরকম পলিউশন আছে।

রুরাল লাইফ আমি কখনও দেখিনি। আমার খুব ইচ্ছে করে।

গাঢ় স্বরে কৃষ্ণজীবন বলে, সব মানুষেরই করে। প্রত্যেক মানুষের রক্তেই একটা ফিরে যাওয়ার টান আছে। কিন্তু যেতে পারে না। শহর বেঁধে রাখে।

আমরা মাঝে মাঝে বেড়াতে যাই। কখনও পাহাড়ে, কখনও সমুদ্রের ধারে, কখনও জঙ্গলে, কী যে ভাল লাগে! কিন্তু তিন চারদিন পর ইট বিকামস্ বোরিং। ভেরি বোরিং। রোজ পাহাড় দেখছি তো পাহাড়ই দেখছি। নাথিং চেঞ্জেস।

শুধু দেখতে গেলে এবং ইনভলভমেন্ট না থাকলে ওরকম হয়। যে জায়গায় যাচ্ছো সেই জায়গার সঙ্গে তোমার তো আত্মীয়তা নেই! থাকলে বোরডম টের পেতে না। আমি যখন গাঁয়ে ফিরে যাবো, ঠিক চাষী হয়ে যাবো, গেঁয়ো হয়ে যাবো, সব বিদ্যে ভুলে যাবো।

ইউ আর প্যাশনেটলি ইন লাভ উইথ ইওর ভিলেজ। আচ্ছা, আপনি কি চান শহর থেকে মোটরগাড়ি, বাস সব তুলে দিয়ে রিকশা, সাইকেল, ঘোড়ার গাড়ি আর ট্রাম চালু করতে? হাউ ফানি! মোহিনী বলছিল।

কৃষ্ণজীবন স্নান একটু হাসল। বলল, একদিন হয়তো তাই হবে। আমার মতে কী যায় আসে? আমি যা ভাল বুঝি, বলি। আমাদের চেয়ে তোমরা আরও বেশী দিন পৃথিবীতে থাকবে। তোমাদের সন্ততিরা থাকবে আরও বেশী দিন। পৃথিবীকে আমরা যদি তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে ফেলি তাহলে তাদের জন্য কী থাকবে? আমি তো ভাবী পৃথিবীর চেহারা দেখতে পাই, ঘোড়ার গাড়ি ফিরে এসেছে, সাইকেল চলছে। পালকি, গোরুর গাড়ি, নৌকো...

ইউ আর ফানি।

পাশাপাশি সোলার এনার্জি, ব্যাটারি আর উইন্ডমিল। পৃথিবী বসে থাকবে না। বাঁচবার পথ করে নেবেই। কিন্তু বোকারা কিছু বুঝতে পারছে না।

কারা বলুন তো!

মানুষেরা। ক্ষমতাবানরা। যারা পৃথিবীকে চালাচ্ছে তারা।

অনু মুগ্ধতার সঙ্গে চেয়েছিল। হঠাৎ বলল, ইউ আর নাইস। আই অ্যাডোর ইউ।

কৃষ্ণজীবনের আবার মনে হল, তার একজন প্রম্পটার দরকার। এই পরবর্তী প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের সংলাপ সে বুঝতেই পারে না। কত কী বলে দেয় এরা মুখের ওপর! এরা কি এরকমই নাকি! কিন্তু খারাপ লাগছে না। মোটেই খারাপ লাগছে না তার।

অনু চেয়ারটা আর একটু কাছে টেনে বসল। তারপর বলল, আমি শুনেছি, আপনার কোনও ফ্রেন্ড নেই। সত্যি?

কৃষ্ণজীবন অপ্রত্যাশিত এই প্রশ্নে আবার চকিত হল। তারপর মৃদু হেসে বলল, না। আমার কোনওদিনই তেমন কোনও বন্ধু ছিল না। কেন বলো তো!

আমি আপনার ফ্রেন্ড হতে চাই।

তুমি!

আমি খুব ভাল ফ্রেন্ড হবো। আই অ্যাডোর ইউ। ইউ আর এ নাইস ম্যান। মাঝে মাঝে চলে আসবো, গল্প করব। আবোল তাবোল গল্প কিন্তু! রাগ করবেন না তো! ফ্রেন্ডের ওপর রাগ করতে নেই।

মাই গড! তুমি তো মোহিনীর বন্ধু!

তাতে কি? আপনি কি ওল্ড কনসেপশনের লোক?

না, মানে...

কথা হারিয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ অনেকদিন পর একটা নির্মল হাসিতে তার মন উদ্ভাসিত হয়ে গেল। কেন যে ভীষণ ভাল লাগল তার এই অবাস্তব, অসম্ভব প্রস্তাবকে!

কি, রাজী?

কৃষ্ণজীবন সকৌতুকে অনুর দিকে চেয়ে বলে, রাজী। কিন্তু আমার তো অভ্যাস নেই বন্ধুত্বের। কি করতে হয় বলো তো!

আই উইল টিচ ইউ।

শেখাবে?

আপনি তো ভীষণ ভাল আর ছেলেমানুষ, তাই না? আমি আপনাকে সব শিখিয়ে দেবো। আজ যাই, নার্সিং হোম-এ যেতে হবে। বাই।

অনু চলে যাওয়ার পর আর কিছুতেই বইয়ে মন দিতে পারল না সে। তার আংশিক বোবা মন হঠাৎ যেন অনেক কথা বলে উঠতে চাইছে। মজা লাগছে, হাসি পাচ্ছে। মেয়েটা পাগল বোধহয়। কিন্তু এ গুড কম্পানি। তার জীবনে এরকম ঘটনা কখনও ঘটেনি। কত বয়স হবে মেয়েটার, হার্ডলি পনেরো বা ষোলো? পোশাকটা কী ছিল যেন? না শাড়ি নয়। কী যেন? বেশ স্মার্ট দেখাচ্ছিল তো! বোধহয় সালোয়ার কামিজ! হ্যাঁ, তাই হবে। বেশ ধারালো, বুদ্ধির ছাপওয়ালা মুখ।

একটু রাতে নিজস্ব ছোট টেলিস্কোপ আর দোলনকে নিয়ে যখন ছাদে বসে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে তারা দেখার চেষ্টা করছিল কৃষ্ণজীবন তখনও আনন্দের রেশটা রয়েছে।

বাবা, তুমি হাসছো কেন? আমাকে তারা দেখাবে না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আজ বড় মেঘলা, ভাল দেখা যাচ্ছে না।

তুমি হাসছিলে কেন বাবা?

এমনিই।

তুমি তো কখনও হাসো না! সবসময়ে গম্ভীর থাকো।

হাসলে কি আমাকে তোমার ভাল লাগে না!

খুব ভাল লাগে।

আজ আমার খুব মজা লাগছে।

কেন বাবা?

এমনিই।

কথাটা খাওয়ার টেবিলে রিয়াও তুলল, কী গো, আজ তোমাকে একদম অন্যরকম দেখাচ্ছে কেন?

কিরকম?

সেই চেনা মানুষটা তো নয় দেখছি! সেই গোমড়ামুখো, ভ্রূকুটি-কুটিল মুখখানা তো দেখছি না। কী হল হঠাৎ?

কৃষ্ণজীবন ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে গেল।

দোলন নিরীহ গলায় বলে, বাবার আজ খুব মজা লাগছে।

রিয়া ভ্রূ কুচকে বলে, কিসের মজা?

মোহিনী আর সত্রাজিৎ তাদের প্লেট থেকে মুখ তুলে কৃষ্ণজীবনের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তাদের বাবার মজা লাগছে, এরকম অদ্ভুত ঘটনার কথা তারা কখনও শোনেনি।

রিয়া বলল, সবই তো চেপে থাকো। সত্যি বলো তো, তুমি কোনও অ্যাওয়ার্ড বা রিকগনিশন পাওনি তো!

না, না, বলে কৃষ্ণজীবন নিজেকে ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। বন্ধুত্বও কি অ্যাওয়ার্ড নয়? রিকগনিশন নয়?

রিয়া একটু বিরক্ত মুখে বলল, বিষ্ণুপুর থেকে একটা চিঠি এসেছে। পোস্টকার্ড!

একটু চমকে উঠল কৃষ্ণজীবন, কার চিঠি! খারাপ খবর নাকি?

ইট ডিপেন্ডস্। তোমার বাবা তোমাকে একবার যেতে লিখেছেন।

কেন?

কি সব গোলমাল হচ্ছে। বাড়ি ভাগাভাগি হবে। তোমার নাকি যাওয়া দরকার।

ওঃ। বলে চুপ করে থাকে কৃষ্ণজীবন।

আমি একটা কথা বলব?

কি কথা?

তুমি কিন্তু নিজের ভাগটা ছেড়ো না। আজকাল কেউ কিছু সহজে ছাড়ে না। তুমিও বোকার মতো ছেড়ে দিও না।

'হুঁ। বলে চুপ করে থাকে কৃষ্ণজীবন। চোখে ভেসে ওঠে, কুলগাছ ছেয়ে সোনালতার বিস্তার। কী সবুজ মাঠ! মাটির মদির গন্ধ নাকে ভেসে এল বুঝি!

১৩

এবার যেমন ভ্যাতভ্যাতে বর্ষা তেমনি গুমসোনো গরম। দুদিন বৃষ্টি নেই। আকাশ থমকানো মেঘলা। ভেজা মাটির ভাপ আর গুম-ধরা আকাশের মাঝখানটা যেন সেঁকা রুটির পেটের মধ্যেকার মতো। বাতাস নেই, গাছের পাতাটিও নড়ছে না। ঘাম হয়, শ্বাসকষ্ট হয়। দুপুরবেলাটা এই ভ্যাপসা গরমে বড্ড সুনসান। মানুষ দূরের কথা, পথেঘাটে নেড়ী কুকুরটাও ল্যাং ল্যাং করে ঘুরে বেড়ায় না।

একখানা রিক্সা ট্যাঙস ট্যাঙস করতে করতে চলেছে। তাতে মাইক ফিট করা। ফাটা গলায় চিঁহিঁ সুরে প্রচার চলছে। বিশ্ববিজয় অপেরার আগামী পালা আউরঙ্গজে—ব! আউরঙ্গজে—ব!

পালা নামতে এখনও পাক্কা দুটি মাস। বর্ষা না গেলে, ক্ষেতের কাজ শেষ না হলে নামবার কথাও নয়। আহাম্মক ছাড়া এভাবে কেউ গাঁটগচ্চা দেয়?

বটতলায় রিক্সা থামিয়ে পাঁচু সিট থেকে নেমে গামছায় মুখের ঘাম মুছল। নিমাই প্লাস্টিকের বোতল থেকে ঢকঢক করে জল খাচ্ছিল। নিম-গরম জলে তেষ্টা যেতে চায় না। যা গরমটা পড়েছে, জলের কি ঠাণ্ডা থাকার জো আছে? টিপকল থেকে যখন ভরেছিল তখন ভারি ঠাণ্ডা ছিল।

পাঁচু বলল, একটু জিরিয়ে নাও নিমাইদাদা। আমি একটু বিড়ি টেনে নিই। নইলে জুত হচ্ছে না।

নিমাইয়ের তাতে বিশেষ আপত্তি নেই। এই দুপুরে ঘুরে ঘুরে বিশ্ববিজয়ের পালার কথা বলে তেমন লাভও তো হচ্ছে না। শুনছে কি কেউ? শুনলেও গা করছে বলে মনে হয় না। রিক্সা আর মাইকের দিনভর ভাড়া, নিমাইয়ের মজুরি মিলে টাকা কিছু কম যাচ্ছে না। তবে কাকা লোকটাই অমনি। চাপল বাই তো কটক যাই। যত্র আয়, তত্র ব্যয়।

নিমাই নেমে বটতলার বাঁধানো তলায় বসতে গিয়ে আঁতকে উঠল। শান তেতে আছে। রোদ নেই, তবু যে কেন তাতে কে জানে বাবা!

পাঁচু আড়চোখে কাণ্ডটা দেখে বলল, রিক্সার সীটটা নামিয়ে ওটা পেতে বোসো। আমি মকবুলের দোকান থেকে বিড়িটা ধরিয়ে আসছি।

সীটটা পেতেই বসল নিমাই। পাঁচু শিগগির আসবে না। অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে রিক্সা টেনেছে। হাঁপাচ্ছে। মালিকের ভাগেরটা দিয়ে কটা টাকাই বা থাকবে হাতে? মাস দুয়েক আগে টিবি থেকে সেরে উঠেছে। আবার হয়তো শিগগিরই রোগে পড়বে। গরিব মানুষদের বাঁচাও যা, মরাও তা।

নিমাই বিড়িটিড়ি খায় না। শরীরে সয় না তো বটেই, তাছাড়া ওসব তার কাছে বাবুগিরির সামিল। দিনে দশটা করে টাকা আসছে, এটাকে সে টুক টুক করে জমাচ্ছে। বাজারে একখানা দোকানঘর নিয়ে কথাবার্তা চলছে। এখনো বন্দোবস্ত হয়নি। এই ফাঁকে কাকাকে বলে এ কাজে তাকে বহাল করেছে বীণাপাণি। কাজটা খাটুনির নয়। তবে এই গরমে বড় কষ্ট।

কষ্টটাকে গায়ে না মেখে টাকাটা রাখছে নিমাই। শতখানেক হলেই পালপাড়ায় গিয়ে বাবার হাতে তুলে দেবে। আর তখন বুড়োবুড়ির মুখে যে হাসিখানা ফুটবে সেটাতেই জুড়িয়ে যাবে তার প্রাণ। ওই বোকাসোকা দুটো বুড়োবুড়ির জন্য নিমাই না পারে হেন কাজ নেই। কিন্তু কাজই জুটতে চায় না মোটে। দোকানটা হলে বাঁচোয়া। একখানা দোকান হলে সারা দিনমান খদ্দের সামলে সন্ধের পর একখানা কীর্তনের আসরে গিয়ে বসবে— এর চেয়ে বেশি নিমাই আর কিছু চায় না। তার ইচ্ছে ছিল, কীর্তন করে তা থেকে যা জোটে তাই দিয়েই চালিয়ে নেবে। পয়সা না থাক, বুকভরা আনন্দ তো আছে। গলায় সুর ছিল তার। কিন্তু আজকাল গলার আওয়াজটা তার নিজের কানেই ভাল ঠেকছে না। বুকে দমেরও যেন ঘাটতি হচ্ছে।

টাকাপয়সার চিন্তা বড় দূষিত চিন্তা। মনে ঠাঁই দিতে নেই। তবে ঘুরেফিরে কথাটা মনে হয়, সে বড় গরিব। বড় টানাটানির মধ্যে সে বড় হয়েছে। খিদের কষ্ট সইতে পারত না ছেলেবেলায়। কাঁদত। তার কান্না দেখে মাও কাঁদত। ফলপাকুড় পেড়ে খাবে তা সেরকম ফলন্ত গাছও ছিল না পালপাড়ায়।

তবে ভগবানের দয়াটা আছেই। খিদের কষ্ট পেতে পেতেই আস্তে আস্তে খিদেটা সয়ে যেতে লাগল। মানুষের দাঁতে ব্যথা হয়, মাথা ধরে, জ্বরজারি হয়, লোকে সয়ে থাকে না সেসব? খিদেটাও সেরকম আধিব্যাধি ঠাউরে নিল সে। ও যেন দাঁতের ব্যথা, পেটের ব্যামো। আজ আর খিদেকে ভয় নেই তার। খাওয়ার কষ্টটাও নেই। ইদানীং বেশ খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে তাদের। গেলবার তো বীণাপাণি একটু সরু চালই কিনে ফেলল। দোবেলা মাছ হচ্ছে। ডালের পাতে পটল বা ঢ্যাড়শ ভাজা জুটে যাচ্ছে। গত দু মাসে না হোক তিনবার মাংস হয়েছে। এ সময়টায় এই অপয়া বর্ষায় বীণাপাণির হাতে বাড়তি টাকা থাকার কথাই নয়। তবে আসছে কোত্থেকে?

দুপুরের এই ঝিমধরা গরমে প্রশ্নটা নিয়ে খুব ভাবিত হল সে। গালে হাত দিয়ে বসে ভাবতে লাগল। কাকা ভাল লোক, কিন্তু গাড়ল তো নয় যে, এই যাত্রার আকালে বেশী করে টাকা দিচ্ছে বীণাকে!

তবে কি অন্য কেউ দিচ্ছে? দিলে তো বলতে হবে, দেওয়াটা ধর্মত ন্যায্যত দিচ্ছে না, ভিতরে মতলব আছে। ধর্মে টাকা নেই, অধর্মে আছে। অধর্মের টাকা বড্ড হুড় হুড় করে আসে, সামাল দেওয়া যায় না।

পাঁচু একটা বিড়ি শেষ করে আর একখানা ধরিয়ে এসে ছায়ায় দাঁড়িয়ে একটু কনুই চুলকুলো, একটা হাই তুললল, তারপর উদাস গলায় বলল, আরও ঘুরবে নাকি? তার চেয়ে একটু জিরোই চলো। তুমি এদিকটায় গদি মাথায় দিয়ে শোও, আমি ওদিকটায় একটু গড়িয়ে নিই। বেজায় গরম।

নিমাই রাজি হয়ে গেল। বলল, ঘণ্টাখানেকের বেশী নয় কিন্তু। বটতলা খারাপ জায়গা, কেউ দেখে ফেলতে পারে।

কেউ দেখবে না। আর দেখলেই কি? মানুষের শরীর তো, নাকি?

নিমাই কথা বাড়াল না। শুয়ে পড়ল। ঘুমটাও আসত। তবে চিন্তাটা বড্ড কুটকুট করছে বলে ঘুমটা চোখের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল। বীণাকে টাকাটা দিচ্ছে কে? এই যে সকাল থেকে বিকেল অবধি মাইক খুঁকে

বেড়ানোর চাকরিটা বীণা তাকে জোগাড় করে দিয়েছে তার পিছনে মতলব নেই তো! এই ভরদুপুরে কি কেউ আসে-টাসে বীণার কাছে?

মন বড় পাপী। কথাটা মনে হতেই জিব কাটে নিমাই। ছিঃ ছিঃ, বীণা তার জন্য জান কিছু কম চুঁইয়েছে? সে চলে যাচ্ছিল, নিজেই সেধে যেচে রেখেছে। আজ অবধি এই পাপ-মুখে সে বলতে পারবে না যে, বীণার কিছু বেগোছ দেখেছে। তবে কথাটা মনে হচ্ছে কেন? একবার গিয়ে চুপি চুপি হাজির হবে নাকি বাড়িতে? গিয়ে যদি সত্যিই দেখতে পায় যে, বীণা পরপুরুষের সঙ্গ করছে, তাহলে? তাহলেই কি কিছু করতে পারবে নিমাই? দু ঘা কষাতে পারবে লোকটাকে? নাকি পারবে বীণাকেই ধমক চমক করতে? ওসব গণ্ডগোলে না পড়ে যাওয়াটাই তার পক্ষে মঙ্গল। গিয়ে কিছু বেগোছ দেখলে বিপদ তারই।

ঘুমটা এল আচমকা, নোটিস না দিয়ে। ঘুমিয়ে মেলা স্বপ্ন দেখতে লাগল নিমাই। একটা স্বপ্ন ভারি ভাল। তার মা মর্তমান কলা আর দুধ দিয়ে চিঁড়ে মেখে খুব খাচ্ছে এক ডেলা গুড় দিয়ে।

ও নিমাইচন্দ্র, ওঠো! ওঠো!

নিমাই উঠে বসে। ঘেমে একেবারে চান করে উঠেছে।

ডাকনি কেন?

মেঘ চমকাচ্ছে। নামল বলে।

নিমাই একবার ময়লা কালো আকাশের দিকে চেয়ে বলল, নামলে বাঁচি। যা পচা গরমটা পড়েছে!

কোনদিক যাবে এবার? আমাদের টাইম কিন্তু শেষ হয়েছে।

তাহলে বাজারপানেই চল। মাইক-টাইক সব বুঝিয়ে ফেরত দিয়ে দিই।

পোকাটা অনেকক্ষণ কুটকুট করে কামড়াচ্ছে। মাথাটা ঠিক নেই, বীণা টাকাটা পাচ্ছে কোথা থেকে?

ব্রজবাসীর মাইকের দোকান অবধি পৌঁছাতে পারল না তারা। তার আগেই রেলগাড়ির মতো একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা এল, আর তার পিছু পিছু রসমুণ্ডির মতো বড় বড় ফোঁটায় হরির লুঠ ছড়াতে ছড়াতে বৃষ্টি।

ভিজে চুব্বুস হয়ে ব্রজর দোকানে উঠে পড়ল দুজন। ব্রজবাসীর ছোকরা কর্মচারী যন্ত্রপাতি তুলে নিল দোকানে। বলল, ভিজিয়ে ফেললে? এসব ইলেকট্রনিক জিনিস, বরবাদ হলে দাম দেবে কে?

নিমাই কথা বলল না। তবে পাঁচু বলল, বৃষ্টি কি আমার বাপের চাকর যে হুকুম মেনে নামবে? অতই যদি তোয়াজের জিনিস তবে ভাড়া দেওয়ার সময় সঙ্গে একটা ঢাকনা দিয়ে দিস না কেন?

ব্রজবাসীর দোকানের সামনে একখানা বারান্দা আর তাতে বেঞ্চ আছে। দুজনে বসল পাশাপাশি। বৃষ্টির ছাঁট আসছে, প্রবল বাতাস।

পাঁচু বলল, একটু চা হলে হত, কী বলো!

নিমাই মাঝে মাঝে খায়, তবে নেশা নেই। বীণাপাণির চায়ের নেশা আছে বলেই নিমাইকে মাঝে মাঝে খেতে হয়। নিমাই উদাস গলায় বলে, তা খা না। ওই তো পল্টুর দোকানে হচ্ছে।

পাঁচু নড়ল না, বসে রইল। খানিকক্ষণ বাদে বলল, এবার বৃষ্টিটা খুব ভোগাবে, বুঝলে! লক্ষণ ভাল নয়। চাষবাসের বারোটা না বাজে।

চাষবাস নিয়ে নিমাইয়ের ভাববার সময় নেই। তার মাথায় অন্য পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বীণাপাণির ঘরে যদি পরপুরুষ ঢুকেই থাকে তবে এতক্ষণ কি সে আছে? থাকলে এই বৃষ্টিতে সেও বেরোতে পারবে না। টাকাওলা

লোক কি? জোয়ানমর্দ? নাকি বুড়োধুড়ো?

পাপের চিন্তা করলে শরীর শুকোয়, মন শুকোয়। দুনিয়াটাই শুকিয়ে যায়। এই বৃষ্টি-ভেজা বিকেলটা নিমাইয়ের কাছে ভারি শুকনো ঠেকছে। সে হঠাৎ বলল, হ্যাঁ রে পাঁচু, তুই ভগবান মানিস?

পাঁচু একখানা বিড়ি বের করেছে। দেশলাই রাখে না বলে ধরাতে পারছে না। বলল, তা মানি। শীতলা মানি, কালীঠাকুর মানি। তবে আমরা পাপী-তাপী লোক, ভগবানের কথা আর ভাবতে পারি কই বলো!

আমার খুব ভগবানের কথা মনে হয়। একটু শাস্তর জানা থাকলে, মন্ত্র নেওয়া থাকলে বেশ হত। কিছু হল না। সংসারের প্যাঁচে পড়ে গেছি।

পাঁচু তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, তোমার আবার সংসার! টোনাটুনি মিলে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে আছো। পাঁচখানা ছেলেপুলে নিয়ে আমার মতো ফাঁদে পড়তে তো বুঝতে!

বিয়ে কি সকলের সয় রে! সংসার আমার জন্য নয়। ইচ্ছে ছিল সারাদিন কাজটাজ করব, সন্ধেবেলা প্রাণভরে কীর্তন করব। তা আর হল কই?

তোমার একটু সাধু-সাধু ভাব আছে বটে।

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মেঘের ছায়ায়, বৃষ্টির ঘোরে চারদিকটা ছাইরঙা হয়ে গেল। দুর্জয় গরমটা উড়ে গেল কোথায়। ভেজা গায়ে বাতাস লেগে একটু শীত-শীত করছে। আগে সঙ্গে সবসময়ে একখানা গামছা থাকত। তাতে ভারি সুবিধে। কিন্তু আজকাল বীণাপাণি গামছা নিতে দেয় না। ওটা নাকি ভারি ছোটলোকি ব্যাপার। পাঁচু দিব্যি তার গামছাখানায় ভেজা মাথা আর মুখ মুছে নিয়ে বসে আছে। নিমাইয়ের সে সুবিধে নেই। পকেটে একখানা রুমাল আছে বটে, কিন্তু তা দিয়ে গামছার কাজ চলে না। পাঁচুর গামছাখানা ধার নিতেও ইচ্ছে যায় না। বড্ড নোংরা।

গা গরম করতেই গুনগুন করে একখানা গান ধরেছিল নিমাই। কিন্তু কপালের এমনই ফের, যে গানটা মনে এল সেটার মধ্যেই বিষ মেশানো। আমার বধুঁয়া আন-বাড়ি যায় আমার আঙ্গিনা দিয়া...। নিয়তিই হবে। নইলে এ গানখানাই ভুস করে মাথায় ভেসে উঠল কেন? গান ধরতেই মনটা কু গেয়ে উঠল, বীণাপাণির ওসব দোষ আছে কি? নিমাই তো ঝাঁঝালো পুরুষ নয়, পয়সার জোরও নেই। বীণার আর দোষ কী?

মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রুর কী জানিস পাঁচু?

পাঁচু একটু রাগ করে বলে, গানটা গাইছিলে তাই গাও না। বেশ তো শুনতে লাগছিল। এর মধ্যে আবার ওসব গন্ধমাদন কথা কেন?

না, বলছিলাম আর কি! মানুষের সব চেয়ে বড় শত্তুর হল তার মন।

আরে, ওসব জানি। ওসব হল তত্ত্বকথা। আমার মতো গরিবের মন কোথায় থাকে জানো? পেটে আর অণ্ডকোষে। সারাদিন রিক্সা টেনে মুখে রক্ত তুলতে তো বুঝতে, মনটন সব কোথায় গিয়ে সেঁধোয়। বরং গানটা গাও। কীর্তন শুনলে একটু ভাব আসে আমার।

নিমাই ফের গানটা ধরল। গলাটা খেলছে না ভাল। কিন্তু পাঁচু চোখ বুজে শুনছে। গানটা শেষ করে নিমাই বলল, মন ভাল থাকলে দুনিয়াটা ভারি ভাল, আর মন বিগড়োলে পরমান্নও তেতো।

আমি বলি কি, ছেলেপুলে করে ফেল এইবেলা। মনটন সব কব্জায় এসে যাবেখন। সবাই বলে বীণাপাণি সিনেমায় নামবে বলে চেহারা রাখছে। তাই ছেলেপুলে হচ্ছে না। সত্যি নাকি?

নিমাইয়ের কান একটু গরম হল। বীণাপাণিকে নিয়ে বেশ কথা হয় এ অঞ্চলে।

পাঁচু দূরের দিকে চেয়ে থেকে বলল, ওটাও অধর্ম হচ্ছে, বুঝলে? আত্মারা সব চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের জন্মাতে না দেওয়াটাও পাপ।

ছোটলোকে যা ভাবে তাই বলে, সবসময়ে মাথা খাটিয়ে তো বলে না। নিমাই তাই চুপ করে থাকে।

পাঁচু নিজে থেকেই বলে, অবিশ্যি সিনেমায় নামলে অন্য কথা। তখন তো সোনার খাটে মাথা, রুপোর খাটে পা। গাড়ি, বাড়ি, টাকায় ভাসাভাসি। টাকা থাকলে তখন আর পাপটাপ অর্শায় না। রাবণরাজার কথা তো জানো, স্বয়ং শিবঠাকুর তার বাড়ি চৌকি দিত।

বীণাপাণি সিনেমায় নামবে কিনা তা নিমাই জানে না। তবে ছেলেপুলে যে এখনই চায় না সেটা নিমাই জানে। স্টেজে উঠে মেলা নাচন কোঁদন করতে হয়, গলা তুলতে হয় সপ্তমে, ওসব করতে গেলে শরীরের তাগদ চাই। ছেলেপুলে হয়ে পড়লে অসুবিধে আছে। আর নিমাই-ই বা কোন মুখে চাপাচাপি করবে। নিজেই সে দাঁড়ের পাখি হয়ে আছে।

বৃষ্টিটা ছাড়ল না। তবে চাপটা একটু কমল। চারদিকটা যেমন ধোঁয়াটে হয়ে গিয়েছিল তেমনটা আর নেই।

নিমাই বলল, চল, কাকার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে বাড়ি যাই।

পাঁচু নড়ল না। বলল, অত তাড়া কিসের? আজ টাকা পেতে দেরি হবে। হাঙ্গামা আছে।

কিসের হাঙ্গামা?

বটতলায় একটা ছেলে খুন হল না সেদিন? সেটা নিয়েই কী সব হচ্ছে-টচ্ছে।

সে তো পগা।

পগাই বটে নামটা। ডলার আর পাউন্ড বিকিকিনি করত।

সে শুনেছি।

তা তার মহাজন কলকাতা থেকে লোকজন নিয়ে এসেছে। পগার কাছে নাকি মেলা সাহেবী টাকা ছিল।

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে... বলতেই যেন ভগবান জিবখানা টেনে ধরলেন। সে বলে ফেলতে যাচ্ছিল যে, বীণাপাণির কাছেও মাঝে মাঝে টাকা গচ্ছিত রেখে যেত। কথাটা পাঁচকান হওয়া ভাল নয়।

পাঁচু উদাস গলায় বলল, বড় বড় বানরের বড় বড় লেজ। কত খুনখারাপি হচ্ছে কেউ গা করে না। পগা মহাজনের লোক বলে এখন নাড়াঘাটা পড়েছে!

তাতে কাকার হাঙ্গামা হচ্ছে কেন?

কে জানে বাপু কি বৃত্তান্ত, নাম-ধাম শুনতে চেও না, তবে শোনা যাচ্ছে খুনটা যারা করেছে তারা কাকার দলের ছোকরা সব।

আজকের দশটি টাকা পেলে নিমাইয়ের সত্তরটা টাকা হয়। আরও তিনটে ক্ষেপ মারতে পারলে পুরো একশ। একশ হলেই পালপাড়া। মা-বাবার মুখে হাসির ঢল। নিমাইয়ের নিজের রোজগার বলে টাকাটার দামও কি একটু বেশী? কে খুন হল, কে সেটা করল আর কারা তার তত্ত্বতালাশ করতে এসেছে এসব নিয়ে নিমাইয়ের মাথাব্যথা নেই। তার ভাবনা হল, হাঙ্গামায় টাকাটা যদি আজ কাকা না দেয় তা হলে কাল এই বকেয়া টাকাটা দিতে কাকা ভুলে যাবে না তো? নাটক-পাগল লোক, ভুললে দোষ কি? তবে সমস্যা হল, মুখ ফুটে সেটা চাইতে পারবে না নিমাই। দিনের হিসেব দিনকে মিটে গেলেই ভাল।

দোকানটা কবে খুলছো?

নিমাই বেজার মুখ করে বলে, হবে।

হবে সে আমিও জানি। তবে মহেন্দ্র মোটা টাকা হেঁকে বসেছে তো। ছ'হাজারের নিচে নামতে চাইছে না, না?

এ বাজারে দরটা আর নামাচ্ছে কে?

তবে তোমার বউ যখন লেগেছে ও হয়ে যাবে।

এ কথাটা নিমাই বুঝল না। বীণাপাণি তো আর বড়লোক নয়। কাকার দয়ায় খেয়ে পরে কোনওক্রমে আছে। একেবারে হাততোলা অবস্থা। শহরের বাইরের দিকটায় এবং ভিতর বাগে একটুখানি জমি কিনতে দম শেষ হয়ে গিয়েছিল বীণার। বেড়া আর টিন দিয়ে যে ঘরখানা তুলেছে সে টাকার জোরে নয়, মনের জোরে। মহেন্দ্র যে ছ'হাজার টাকা চেয়েছে সেটা জানতই না নিমাই। এই শুনল। ফলের দোকান এমন কিছু লাভের ব্যবসা নয়। বনগাঁয়ে ফলটা খাবে কে? পুজোআচ্চায় কলাটা শশাটা কিছু বিক্রি হয় আর সিজন ফল। ছ'হাজার টাকা সেলামি দিলে সে টাকা উসুল করতে নিমাইয়ের বহু বছর চলে যাবে। আজই গিয়ে বীণাকে বারণ করতে হবে।

পাঁচু উদাস মুখে বলল, মনোহারি দোকানের খরচাও আছে। কম করেও পনেরো বিশ হাজার টাকা লাগসই না করলে হবে না। তার ওপর ধরো কাচের বাক্স, আলমারি এসবেরও খরচ ভালই।

নিমাইয়ের মাথায় ছোটো একটা বজ্রাঘাত হল। একদিন ঠাট্টা করে মনোহারি দোকানের কথা বলেছিল বটে বীণা। তা হলে সে কাণ্ডই হতে যাচ্ছে! নিমাইয়ের চোখটা ঘোলাটে হয়ে এল। এসব হচ্ছেটা কী? বীণার ট্যাঁকের তো এমন জোর নেই! আর এসব ঘরের কথা তাকে পাঁচুর মুখেই বা শুনতে হচ্ছে কেন? মনোহারির কথা, ছ'হাজার সেলামির কথা তো তাকে বলেনি বীণা! এদিকে বাজারে তো চাউর হয়েছে দেখা যাচ্ছে।

পাঁচু তেমনি উদাস মুখে বলে, বিয়ে তোমার সয় না বলছিলে। তা দেখ বাপু, তোমার মতো বউ এ তল্লাটে কটা লোকের আছে। তোমার মুরোদ না থাক বউ তো দশভুজার মতো আগলাচ্ছে!

কোনও কারণ নেই, তবু নিমাই তাড়াতাড়ি বলল, হ্যাঁ, বীণার মতো মেয়ে হয় না। আসলে বলতে চেয়েছিলুম কি জানিস, বীণার মতো বউ কি আমার কপালে জোটা উচিত? আমি কি একটা মনিষ্যি?

পাঁচু তার ক্ষয়া দাঁতে হাসল, তা যাই বলো বাপু, কার ভিতরে কী আছে ভগবান জানে। তোমার কথা বলতে হয় তো বলি, যখন কীর্তন গাও তখন কিন্তু মনটা ভারি ভিজে যায়। তোমার গলায় যেন হরি এসে বসেন।

নিমাই লজ্জার হাসি হাসল, হরির আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই।

পর পর দুখানা গাড়ি, একখানা জীপ আর একখানা মারুতি বটতলার দিকে বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে গেল।

পাঁচু বলল, ওই যাচ্ছে।

কে রে?

ওই যারা কলকাতা থেকে এসেছে। জিপ আর মারুতি নিয়ে।

এত কথা তোকে কে বলল?

সকাল থেকে কাকার বাড়িতে রিক্সা ঠেকিয়ে বসেছিলুম তো। ওখানকারই সুধীর বলল। সে কাকার অপেরার একজন বাজনদার। মুখ-পলকা লোক।

চিনি।

কলকাতার বাবুরা চলে গেল বোধ হয়। আবার আসবে ঠিক। একটা গণ্ডগোল পাকাচ্ছে। মারদাঙ্গা লাগবে মনে হয়। যাবে নাকি? গেলে বলো, এখন একটু ফাঁকায় পাওয়া যাবে তেনাকে।

নিমাই রিক্সায় উঠে বসল। তার বুকে বড় ভয়। বীণাকে এই এত এত টাকা জোগাচ্ছে কে? খুব বড় কোনও বাবু? কথাটা মুখোমুখি জিজ্ঞেস করতেও তো বাধে। কে দিচ্ছে টাকা? তার চেয়েও বড় কথা, কেন দিচ্ছে? সিনেমায় নামার যে কথা শুনছে পাঁচুর মুখে সেইটিই কি সত্যি নাকি? বীণাকে নিয়ে যে এত মাথা ঘামাতে হবে তা জানা ছিল না তার।

কাকার বাড়িতে আজ থমথমে ভাব। বাইরের ঘরখানায় যারা গম্ভীর মুখে বসে আছে কাকাকে ঘিরে, তারা কেউ যাত্রার দলের নয়। এরা কাকার অন্য দিককার লোক। স্মাগলার কাকা আর যাত্রাদলের কাকা দেহে এক হলেও দুটো আলাদা আলাদা মানুষ। এখন যে মানুষটা ঘরে সবার মধ্যমণি হয়ে বসা সে মোটেই যাত্রাদলের কাকা নয়। একে দেখলেই বুক দুরদুর করে।

কাকার বাড়িখানা পাকা আর দু মহলা। মহল না হলেও দুখানা আলাদা ভাগ আছে। সামনের বৈঠকখানা গোছের ঘরখানা বাড়ি থেকে অন্তত দশ বারো গজ তফাতে। গোটা বাড়ি দেয়ালবন্দী। গাছপালা আছে।

ঘরের ভিতরকার চেহারা বারান্দা থেকেই দেখতে পাচ্ছিল দুজন। গতিক সুবিধের নয়।

একটা ছোকরা এগিয়ে এসে বলল, কী চাই?

পাঁচু বলল, আমাদের মজুরীটা?

এখানেই দাঁড়াও। বলে ছেলেটা ঘরে গেল আর পরমুহূর্তেই বেরিয়ে এসে মজুরীর টাকা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, কাকা বলে দিয়েছে কাল থেকে আর বেরোতে হবে না। এখন যাও।

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একশ পুরল না।

বাড়ি যখন ফিরল তখন নিমাইয়ের বুকখানা বড় ভার। অনেক কথার জবাব খুঁজে পাচ্ছে না। অনেক কথার জবাব সে কখনও পাবেও না।

হাতমুখ ধুয়ে যখন ঘরে ঢুকে বসল তখন বীণাপাণি উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে একটা খাতায় কী যেন লিখছে।

কী লিখছো?

ও কিছু নয়। একটা হিসেব।

নিমাই একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, শুনলুম মহেন্দ্র অনেক টাকা সেলামি চাইছে।

কে মহেন্দ্র?

যার দোকান নেবে বলে ঠিক করেছো!

বীণা মুখ তুলে বলল, নিইনি এখনও। কথা বলছি।

কী দরকার? ছ'হাজার টাকা কি সোজা কথা? আমাদের অত টাকা তো বেচলেও উঠবে না।

তোমাকে ভাবতে কে বলেছে?

না ভেবে কি পারি? তোমার জন্যই ভাবি।

আমিও তো তোমার জন্য ভাবি বলেই করছি।

সে খুব জানি। তোমার মতো মেয়ে হয় না। সদ্বংশে জন্মেছো, তোমার ধরনই আলাদা। তবু বলি টাকাপয়সা হাতে রাখো। মহেন্দ্র যা টাকা চাইছে তা আমাদের নাগালের বাইরে। আমার চাকরিটাও আজ থেকে নট হয়ে গেল।

বীণা অবাক হয়ে বলে, কেন? কাকা তো বলছিল আউরঙ্গজেব খুব ঘটা করে নামাবে। দু মাস ধরে মাইকে প্রচার হবে।

কী সব গণ্ডগোল শুনে এলুম।

কিসের গণ্ডগোল?

ওই যে পগা খুন হয়েছিল, তার মহাজন আজ এসেছে পাইক-পেয়াদা নিয়ে। অনেক নাকি সাহেবী টাকা ছিল পগার কাছে। সেই সব খোঁজ-খবর হচ্ছে আর কি!

তাতে কাকার কি?

কাকার সঙ্গেই তো গণ্ডগোল। খুনটা নাকি তার দলের ছেলেরাই করেছে।

সন্ধের মরা আলোতেও দেখা গেল বীণাপাণির মুখটা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। লেখা ছেড়ে উঠে বসল সে, আর কী শুনে এলে?

এইটুকুই। কাকার ঘরে আজ সব ষণ্ডারা জুটেছে। শলাপরামর্শ হচ্ছে।

তোমাকে কে বলল?

বাতাসে কথা উড়ছে। রিক্সাওলাটা অবধি সব জানে।

বীণা হঠাৎ ভীষণ গম্ভীর আর দুঃখী হয়ে বসে রইল। এ সময়টায় নিমাই ফিরলে উঠে রুটি বা মুড়ি চানাচুর যা হোক কিছু দেয়। আজ নড়ল না।

নিমাই বিছানার একধারে পা তুলে বসল। বলল, আজ ঠাণ্ডা লেগেছে। যা আচমকা বৃষ্টিটা এল।

বীণা হঠাৎ তার দিকে চেয়ে বলল, কাল সকালে বিষ্ণুপুর যাই চলো।

বিষ্টুপুর? সেখানে কেন?

মা দেখতে চেয়েছে আমাকে। বাবার চিঠি এসেছে আজ।

তা আমার আর কাজ কি? গেলেই হয়। বাড়ি দেখবে কে?

দেখার লোক আছে। এখনই গোছগাছ করে নিই চলো। সকালের বাস ধরব।

গোছগাছ বেশী নয়। একখানা সুটকেসে সবই এঁটে যায়। বীণা তবু আর একখানা টিনের বাক্স নিল। তারপর হঠাৎ বলল, দোকান থেকে একটু মিষ্টিটিস্টি কিনে আনো তো! বাবা খুব গুজিয়া ভালবাসে।

গুজিয়া এনে নিমাই দেখল, গোছানো শেষ।

খেয়েদেয়ে সকাল সকালই বিছানায় গেল দুজন।

সকালের বাস পাঁচটায়। ভোরে না উঠলে হবে না।

কত রাত হবে কে জানে, হঠাৎ দরজায় ধাক্কা পড়ল।

বীণা? এই বীণা? দরজা খোলো!

দুজনেই উঠে বসল। ভয়ে সিঁটিয়ে থেকে বীণা বলল, কে?

আমি কাকা। দরকার আছে। দরজা খোলো।

অন্ধকারে বীণা হঠাৎ হাত বাড়িয়ে নিমাইয়ের একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে চাপা গলায় বলল, বড্ড ভয় করছে।

১৪

মায়ের সঙ্গে ঝুমকির বোঝাপড়ার অভাবটা অনেক দিনের পুরনো। এতই পুরনো যে এখন ব্যাপারটা তার গা-সওয়া, অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। কি থেকে কি হয়, কেমন করে হয় তা জানে না ঝুমকি। শুধু জানে, তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে সেই মায়ের সবচেয়ে অপছন্দের সন্তান। সে বড়, সে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েনি, সে একটু অলস, একটু প্রতিবাদী—এগুলো দোষ কিনা কে বলবে? কিন্তু তার মা অপর্ণার চোখে সবটাই তার দোষ। তার সব কিছুর মধ্যেই দোষ। এ সংসারে মোট পাঁচ জনের মধ্যে ঝুমকির পক্ষে আছে একমাত্র তার বাবা।

তার বাবার হার্ট অ্যাটাকের পর এ বাড়ি চলে গেল ভূতের হাতে। শোক, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ পাথরের মতো চেপে বসল বাড়িটার ওপর। মায়ের সঙ্গে ঝুমকির ব্যক্তিত্বের সংঘাত ক'টা দিন নিরুদ্দেশ ছিল। বাড়িটা নিঝুম আর চুপচাপ হয়ে রইল কিছুদিন।

বাবার সাঙ্ঘাতিক বিপদের অবস্থাটা খানিকটা সামাল দেওয়া গেছে। হার্টের ব্যাপার অবশ্য সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। সুস্থ হয়ে ওঠার পরই হয়তো আর একটা মারাত্মক অ্যাটাক এসে সব হিসেব ওলটপালট করে দেয়। তবু সংকট কাটিয়ে উঠছে তার বাবা। ব্যথা নেই, ঘুমের ওষুধ কম দেওয়া হচ্ছে। দু-এক দিনের মধ্যেই ইনটেনসিভ কেয়ার থেকে কেবিনে স্থানান্তরিত করা হবে তাকে।

কাল থেকে তাই, এ বাড়ির ওপর থেকে ভূতুড়ে ও ভারী আবহাওয়াটি খানিক ফিকে হয়েছে। স্বস্তির শ্বাস ফেলছে তারা। আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই লুকোনো গর্ত থেকে সাপখোপ বেরিয়ে পড়ছে নাকি? নইলে আজ সকালে ঝুমকি একটু বেশীক্ষণ ঘুমোনোর জন্য অপর্ণা ওরকম রেগে যাবে কেন?

শুধু ঝুমকির সঙ্গেই লাগে অপর্ণার। আর কারও সঙ্গে নয়। মণীশের সঙ্গে অপর্ণার অনেক বিষয়েই মতান্তর আছে, তবু ঝগড়া হয় না কখনোই। এক গভীর ভালবাসা বুঝি দুটি উলের কাঁটাকে পরস্পরের সঙ্গে নানা নকশায়, নানা বাঁধনে ও সম্পর্কে বেঁধে রাখে। ছেলে বুবকা মা অপর্ণার কাছে যেন এক দেবদূত। যখন ছেলের দিকে অপর্ণা তাকায়, তখন চোখ দুখানা স্বপ্নাতুর হয়ে যায়। যখন ছেলেকে ডাকে অপর্ণা, তখন গলায় যেন রবীন্দ্রসঙ্গীত এসে পড়তে চায়। অনু ততটা নয় বটে, কিন্তু অনুরও একটা দাবি আছে। সে কোলপোঁছা সন্তান, অথাৎ মণীশ ও অপর্ণার আরও সন্তান-সম্ভাবনার ওপর দাঁড়ি টেনে তার আসা। অনু লেখাপড়ায় ভীষণ ভাল, খুব বুদ্ধিমতী। বুদ্ধিমতী বলেই সে মায়ের কাছে সরলা বালিকা সেজে থাকে। অন্য সময়ে দারুণ অ্যাডাল্ট।

ঝুমকি বারবার নানাভাবে এই পাঁচ জনের সম্পর্ক বিচার ও বিশ্লেষণ করেছে। শুধু মায়ের সঙ্গে তার শত্রুতা ভিন্ন এ সংসারে তেমন কোনও অশান্তি নেই।

আজ সকালে তার ঘুম ভেঙেছে অপর্ণার বকুনিতে। বউনিটাই খারাপ।

কাল যে অনেক রাত অবধি ঘুমোয়নি ঝুমকি, অপর্ণা তা জানে না। বলল, কাজ করার ভয়ে মটকা মেরে পড়ে আছিস। তোকে হাড়ে হাড়ে চিনি। এত বড় মেয়ে, সংসারের কাজে এতটুকু সাহায্য পাই না তোর। কিসের চিন্তায় বিভোর থাকিস শুনি!

হতচকিত, শঙ্কিত ঝুমকি উঠে বসে ঘুমচোখে দুনিয়াকে খান খান হয়ে যেতে দেখে বলল, রাতে ঘুম হয়নি। ইনসোমনিয়া হয়েছিল—

কবে তোর সকালে ঘুম ভাঙে! রোজ কারও ইনসোমনিয়া হয়? এ সংসারটা কি আমার একার?

তার বিচ্ছিরি সর্দির ধাত আছে, টনসিল আছে। মাঝে মাঝে পেটে গ্যাস হয়। তা ছাড়া তার কিছু অদ্ভুত চিন্তাভাবনা আছে। ঝুমকি যে মাঝে মাঝে রাতে ঘুমোতে পারে না তার কারণ খানিকটা শরীর, খানিকটা মন। কিন্তু এসব শৌখিন কথা, সূক্ষ্ম যুক্তি, তার মা কখনও মানতে চায় না।

অপর্ণা আজ অনেকক্ষণ বকল মেয়েকে। অনেকক্ষণ। যেন বেশ কিছুদিন ধরে জমানো বিষ একসঙ্গে ঢেলে দিল। এমন নয় যে, ঝুমকি এক তরফা বকুনি খায়। উল্টে সেও ঝগড়া করে। প্রায়ই। ঝুমকি মাঝে মাঝে বুঝতে পারে, তার শরীরের নানা অস্বস্তির কারণেই সে নিজেকে সামলে রাখতে পারে না, মাঝে মাঝে সে খিটখিটে হয়ে যায়। রেগে যায়।

আজ ঝুমকি মায়ের কথার একটাও জবাব দেয়নি। একতরফা শুধু সহ্য করেছে। দাঁত বুরুশ করে, চুল আঁচড়ে এবং কিচ্ছুটি না খেয়ে সে নিজের ঘরে জানালার কাছে তার বিছানায় বসে আছে এখন। রাগ করলে সে কিছু খায় না। চা অবধি নয়। আর সেই জন্যই অশান্তি আরও বাড়তে থাকে। অপর্ণা রাগের ওপর আরও রাগতে থাকে।

ঠিক এ সময়ে—যখন অপর্ণা রান্নঘর থেকে তার চিকন গলায় কিছু শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করছিল—ঠিক সেই সময়ে পড়ার টেবিল থেকে একটা স্বপ্নস্বপ্ন মুখ নিয়ে উঠে গেল অনু।

মা!

অপর্ণা ঝাঁঝালো চোখে তাকাল মেয়ের দিকে, কী বলছিস?

আমাদের বোধ হয় এখন চুপ করে থাকা উচিত।

কেন, চুপ করব কেন?

আমার মনে হয় এখন আমাদের পিস অফ মাইন্ড দরকার। বাবা তো এখনও বাড়ি ফেরেনি!

তাতে কি হল? বাপের জন্য কারও মাথাব্যথা আছে? নাকি মায়ের জন্যই আছে?

খুব নরম পাখির মতো গলায় অনু বলল, আমাদের কিছু সুপারস্টিশন মানা উচিত। একটা রিচুয়াল আছে। এসব করলে হয়তো একটা পলিউশন হয়।

পলিউশন! কিসের পলিউশন?

সায়েন্টিস্টরা বলছেন, মানুষ যে মানুষের ওপর রেগে যায়, গালাগাল করে, অপমান করে—সেটাও পলিউশন। তাতেও ক্ষতি হয়।

এসব কোথায় শিখছিস?

হয় মা, সত্যিই। আমার মনে হয় বাবা সম্পূর্ণ রিভাইভ করা পর্যন্ত আমাদের চুপ করে থাকা উচিত।

অপর্ণা কি বুঝল কে জানে, হঠাৎ বলল, ঠিক আছে, চুপ করব। তোর দিদিকে ধরে এনে কিছু খাওয়া, তাহলে চুপ করব।

দ্যাটস এ গুড গার্ল! বলে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে গালে চকাম করে একটা চুমু খেয়ে অনু দিদির কাছে এল।

ঝুমকি একটু শক্ত হয়ে ছিল। অনু আর অপর্ণার কথা সে সব শুনেছে। সে সহজে ভাঙবে না।

অনু এসে ঝুমকির পাশে বসল। তারপর বলল, দিদি, ফর মাই সেক, টু সেভ মাই ফেস, একটু খা।

না। আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।

আমি ফ্রুট জুস করে দিচ্ছি, আর টোস্ট। নিজে করব।

তোকে কিছু করতে হবে না। আমি তো ভেসে এসেছি, আমার জন্য কিছু করার দরকার নেই।

ভেসে আসবি কেন? এ বাড়ির সত্যিকারের গার্জিয়ান কে বল তো! বাবা যখন বাড়িতে থাকে না তখন মা নয়, আমি তোকে গার্জিয়ান বলে ভাবি।

আমি গার্জিয়ান হতে চাই না। তুই এখন যা, জ্বালাতন করিস না।

অনু গেল না, তবে উপরোধ অনুরোধও করল না। গা ঘেঁষে চুপ করে বসে রইল।

ঝুমকি মুখ ফিরিয়ে বোনের দিকে চেয়ে বলে, বসে আছিস যে বড়!

অনু ছলছলে চোখে দিদির দিকে চেয়ে বলে, তোর জন্য কষ্ট হচ্ছে।

আমার জন্য তোদর কষ্ট হবে কেন? আমাকে বোধ হয় এরা কোথাও কুড়িয়ে পেয়েছিল। নইলে আমার সঙ্গে সবসময়ে এরকম করত না।

কিন্তু সেটা তো খুব রোমান্টিক ব্যাপার, তাই না?

রোমান্টিক! কিসের রোমান্টিক?

ধর আমি যদি চাইল্ডহুডে হারিয়ে যেতাম আর যদি কেউ—মানে কোনও কাপ্‌ল্ আমাকে কুড়িয়ে পেত, তাহলে কিরকম থ্রিলিং হত ব্যাপারটা! আমি জানতে পারছি না কে আমার মা-বাবা, আর তারাও আমাকে সার্চ করে বেড়াচ্ছে—উঃ, দারুণ ব্যাপার।

মোটেই দারুণ নয়।

আমার কাছে কিন্তু খুব থ্রিলিং লাগে। ইন ফ্যাক্ট, আমি মাঝে মাঝে চুপ করে বসে ভাবি যে, আমার আসল মা-বাবা এরা নয়, অন্য কেউ। আমাকে এরা কোনও ডেস্টিটিউট হোম থেকে বা অন্য কোনও জায়গায় কুড়িয়ে পেয়েছে। আই অ্যাম অলরাইট হিয়ার, নো প্রবলেম। কিন্তু অন্য কোথাও আমার আসল মা-বাবা আমার কথা দিনরাত ভাবছে, আমাকে খুঁজছে, আমার জন্য কাঁদছে। কী ইম্পর্ট্যান্ট ওদের কাছে এই লস্ট আমি! রিয়েল পেরেন্টরা তো একটু বোরিং। কিন্তু লস্ট পেরেন্টরা ভীষণ রোমান্টিক, তাই না?

ঝুমকি চুপ করে রইল। তবে তার মুখে একটু স্মিত হাসি।

অনু মৃদু স্বরে বলে, একটা কথা জিজ্ঞেস করব তোকে? ডোন্ট প্লে বিগ সিস্টার, প্লীজ! তোর কোনও বয়ফ্রেন্ড হয়নি?

ঝুমকির মুখ এ কথায় সামান্য কঠোর হয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে চাপা গলায় বলল, আমার কেন ওসব হবে? আমার তো কিছু নেই। না রূপ, না গুণ।

ডোন্ট ন্যাগ দিদি। সবাই জানে তুই কেমন।

আমি কেমন?

কোয়াইট অল রাইট। ইউ আর বিউটিফুল ইন ইওর ওন ওয়ে। কিন্তু তুই ভীষণ মেজাজী। আজকালকার ছেলেরা রাগী মেয়েদের ভয় পায়।

রাগী! কই আমি তো রাগী নই।

ভীষণ রাগী। তার মানে ইউ হ্যাভ এ পারসোনালিটি। ওটা সকলের থাকে না। রেয়ার। পারসোনালিটি মিনস্ স্ট্রং লাইকস্ অ্যান্ড ডিজলাইকস্। আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে, আমার মধ্যে বা দাদার মধ্যে পারসোনালিটি কিচ্ছু নেই।

খুব কথা শিখেছিস।

আমি যখন বড় হবো, ঠিক তোর মতো হবো। একটু স্নব, একটু অহংকারী, একটু দেমাক আর মেজাজ হবে। কেউ চট করে কাছে ঘেঁষতে পারবে না। তবে তখন একটা প্রবলেম হবে।

কি প্রবলেম?

যারা স্ট্রং পারসোনালিটির হয় তারা কিন্তু একটু লোন্‌লি। চট করে কারও সঙ্গে মিশতে পারে না তো। তাই দে আর ন্যাচারালি লোন্‌লি সোলস্।

খুব পেকেছিস তো।

আমি এসব নিয়ে খুব ভাবি। পিপল অ্যান্ড দেয়ার ক্যারেকটারিস্টিকস।

তোর কোনও ছেলে-ছোকরার সঙ্গে ভাব নেই তো!

অনু এ প্রশ্ন শুনে খিলখিল করে হাসল, সেই তো দিদিগিরি শুরু হল। বিগ সিস্টার, আমি তো কোএড-এ পড়ি। দেয়ার আর বয়েজ অ্যান্ড বয়েজ। কিন্তু ফ্রেন্ড একটাও নয়।

কেন?

আমার কনটেম্পোরারি ছেলেগুলোর ডেপথ্ ভীষণ কম। মগজ নেই। মনে হয় অল আর কম্পিউটারস।

ঝুমকি কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করে বলে, তাহলে তোর কী হবে রে?

কেন, আমার তো একটু এজেড, একটু এরুডাইট, একটু ফিলজফিক পুরুষকে বেশী ভাল লাগে। মানে মেন উইথ পারসোনালিটি। তোর?

ঝুমকি বিষণ্ণ মুখে মাথা নেড়ে বলে, আমার যে কী ভাল লাগে, আমি বুঝতেই পারি না। তবে মাঝে মাঝে মনে হয়, অন্য একটা ফ্যামিলিতে গিয়ে—মানে বিয়ের পর—একটু অন্যরকম লাগতে পারে।

অনু চোখ বড় বড় করে বলে, তুই এখনই বিয়ের কথা ভাবছিস? সত্যি!

আহা, ভাবতে দোষ কি? ভাবা তোত কিছু খারাপ নয়। ভাবা আর করা কি এক?

এনিওয়ে, আমি তো ভাবতেই পারি না।

আমার মতো বয়স হোক, তারপর ভাববি।

অনু ফের হাসে, সেই দিদিগিরি। তুই আমার চেয়ে কতই বা বড়! ইউ আর স্টিল ভেরি টেন্ডার এজেড।

তোর মাথা! মা এখন আমাকে বিয়ে দিয়ে বিদেয় করতে পারলে বাঁচে। আমি শুনেছি, মা প্রায়ই বাবাকে আড়ালে আবডালে বলে, ঝুমকির কিন্তু বয়স হল, পাত্র দেখতে থাকো।

হি হি। মা একটু পাগলি আছে, না রে?

একটু সেকেলে।

তুইও একটু সেকেলে। আচ্ছা, যখন ওকথা বলে, তখন বাবা কী জবাব দেয়?

বাবা উড়িয়ে দেয়। বলে, দুর দুর। এখনই বিয়ের কি!

বাবারা ওরকমই হয়। আচ্ছা দিদি, তোর কি খিদে পায় না? সত্যিই পায় না?

আবার ও কথা! পারলে আমি এ বাড়ির খাওয়া ছেড়েই দিতাম।

আহা, রাগের কথা বলছি না। কিন্তু এমনিতেই দেখি, তোর মিল খুব ফ্রুগ্যাল। একটুখানি করে খাস। চড়াই পাখির মতো। কিন্তু আমি আর দাদা খুব খাই।

আমার স্টমাকটা বোধ হয় ছোটো। খেতে আমার ভাল লাগে না।

কিন্তু তুই খুব ফুচকা খাস, আর তেলেভাজা। তাই না?

ঝুমকি হাসল, খাই। আর অম্বল হয় ভীষণ। তবু খাই।

আমি ফুচকাটা স্ট্যান্ড করতে পারি না। তেলেভাজাও না। ভীষণ আনহাইজিনিক।

হাইজিন ভেবে খেলে শুধু শুকতো আর ঝোল খেতে হয়। মা গো!

তুই পাতে ভাত ফেলিস, আমি ফেলি না।

আমিও ফেলতে চাই না। কিন্তু মা যে জোর করে বেশী ভাত দেয়।

মা পাগলি আছে। আমার কাছে একটা চকোলেট বার আছে, খাবি?

না।

রাগ করছিস কেন বাবা! আমার সঙ্গে তো ঝগড়া নয়।

রান্নাঘরে উৎকর্ণ হয়ে আছে অপর্ণা। দুই বোনে গুনগুন করে কথা হচ্ছে ঘরে। কি কথা হচ্ছে ওদের? ঝুমকি কেন এখনও কিছু খাচ্ছে না? খাওয়া নিয়ে বরাবর ঝুমকির নাক সিঁটকানো। কোনওদিন কোনও খাবার খেয়ে বলে না, উঃ, দারুণ হয়েছে তো! কোনওদিন বলে না, মা, ওমুক জিনিসটা রাঁধবে? খাওয়াটাই যেন ওর কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে অপছন্দের কাজ। সেই জন্যই রোগা, সেই জন্যই ওর শরীরে হাজারো রোগ। আর সেইজন্যই ওর ওপর অপর্ণার এই রাগ। সেই শিশুকাল থেকে ওকে খাওয়াতে হিমসিম খেয়েছে সে, গলদ্‌ঘর্ম হয়েছে, মেরেছে, বকেছে, কেঁদেছে। আজ অবধি স্বভাব পাল্টাল না। একটা জিনিস চেয়ে খায়, সেটা চা। কিন্তু চা তো কোনও খাদ্য নয়। বরং অনিষ্টকারী। বিশেষ করে খালি পেটে।

অপর্ণার চোখ কড়াইয়ের দিকে। মাংস ফুটছে। কিন্তু তেমন ভাল গন্ধ বেরোচ্ছে না। কী একটা জিনিস দিতে ভুল হয়েছে। কিন্তু মনে করতে পারছে না সে। মেজাজ বিগড়ে আছে, মাথা কাজ করছে না। আরও পনেরো মিনিট দেখবে অপর্ণা। তার মধ্যে ও যদি না খায় তাহলে—

এই 'তাহলে'-টা নিয়েই হল মুশকিল। তাহলে কী করবে অপর্ণা? ওকে ধরে মারবে, না আরও বকবে? কিন্তু লাভ হবে তাতে? আরও শক্ত, আরও গোঁজ, আরও গুটি পাকিয়ে যাবে। না হলে ঝগড়া করবে। অথচ ঝুমকিকে নিয়ে তার চিন্তার অর্ধেক ব্যাপৃত থাকে সবসময়ে। এই মেয়েটাকে কিছুতেই বুঝতে পারে না সে। একদম খোলামেলা নয়, অপর্ণার সঙ্গে বসে কখনও গল্প করে না। থাকে একটেরে। আলগোছ। কথা যেটুকু বলে তা বাবার সঙ্গে।

মণীশের প্রাণাধিক তিনজনই। ঝুমকি, বুবকা, অনু। তবু বুঝি ঝুমকিরই কিছু বেশী বশীভূত সে। রোগা, দুর্বল, অ্যালার্জিক এই মেয়েটিকে শাসন-টাসন করা একদম পছন্দ করে না মণীশ। বলে, ওকে ওর মতো থাকতে দাও। কোনও ব্যাপারে জোর জবরদস্তি কোরো না।

মণীশের বুদ্ধি পাকা নয় বলেই বলে। জবরদস্তি না করলে কি বাঁচিয়ে রাখা যেত ওকে এতদিন! উপোস করেই তো মরে যেত!

ডাক্তাররা বলে, খেতে না চাইলে খেতে দেবেন না। একদিন দু'দিন তিনদিন যদি খাওয়া নিয়ে প্রেশার না দেন তাহলে আপনা থেকেই খাবে।

ওসব ডাক্তারি বিদ্যেতে বিশ্বাস নেই অপর্ণার। মেয়ে তো আর ডাক্তারের নয়, তার। সে জানে, মেয়ে না খেয়ে থাকলে মায়ের ভিতরটা কেমন হয়।

পনেরো মিনিট পার করে অপর্ণা প্রস্তুত হল। আর একবার বকুনি দেওয়া দরকার। বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। মাংসটা চাপা দিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল অপর্ণা। মাথাটা গরম।

ঝুমকির ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল সে। চোয়াল ও ঠোঁট কঠিন।

অনু তাকে দেখে এক গাল হেসে হাত বাড়িয়ে বলল, কাম অন মম, জয়েন দা ক্রাউড।

আমি জানতে চাই, এসব আর কতক্ষণ চলবে।

মাংস হলেই দিদি ভাত খাবে।

অপর্ণাকে দেখেই ঝুমকি জানালার বাইরে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। অপর্ণা বলল, কথাটা আমি ওর মুখে শুনতে চাই।

অনু একটা ঠেলা দিয়ে বলে, দিদি, বল না।

বলব না।

অনু করুণ চোখে মায়ের দিকে চেয়ে বলে, মা, ইটস নাউ এ প্রেস্টিজ ইস্যু। দিদি এখন কমিট করলে ওর ইগো একটু উন্ডেড হবে। তোমার রান্না কি রেডি?

হয়ে এসেছে।

তাহলে যাও না, আমি দিদিকে ঠিক নিয়ে যাব।

অপর্ণা সামান্য শান্ত হল। বলল, যতক্ষণ রেডি না হচ্ছে ততক্ষণ এক কাপ দুধ খেয়ে নিতে বল।

অনু চোখ বড় বড় করে বলে, দুধ! মাই গড, দুধ আবার কবে দিদি খায়। মা, ইউ আর গোয়িং টু ফার। মাংসটা হোক, দিদি খাবে।

আমি কোনওকালে শুনিনি যে, বাচ্চারা দুধ খায় না। সব বাড়িতেই একটা নিয়ম আছে। মা যা দেয়, ছেলেমেয়েরা তাই খায়। শুধু এ বাড়িতেই উল্টো।

অনু হাসছিল। বলল, আমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ দুধ-টুধ খায় না মা। সব বাড়িতেই এ নিয়ে খুব ফাইট হয়।

খুব জ্ঞান হয়েছে দেখছি।

তবে অপর্ণা আর কথা বাড়াল না। যদি খায় তবেই বাপের ভাগ্যি। সংসারটা আজও অপর্ণা বুঝতে পারে না, ঠিক কেমন। ভাল না মন্দ? প্রয়োজন, নাকি না হলেও চলে? মণীশের সঙ্গে যখন তার ভালবাসা হল তখন

মণীশ প্রায়ই বলত, তাদের এক ডজন ছেলেপুলে হবে। দি মোর দি মেরিয়ার।

অপর্ণা বলত, তাহলে তোমাকে পুলিশে দেবো।

কোন অপরাধে? ছেলেপুলে হওয়া তো বে-আইনি নয়।

না হলেই কি? পুলিশের কাছে বলব, এ লোকটা অত্যাচারী। জোর করে—

আরে না ভাই, ওসব ঠাট্টার কথা। তোমাকে তা বলে কষ্ট দেব নাকি? কিন্তু আগেকার দিনে তো হত।

তখন ফ্যামিলি প্ল্যানিং ছিল না। বেশী ছেলেপুলে হলে কি হয় তা তো জানো। একটি সন্তানই যথেষ্ট। ভালভাবে মানুষ করা যাবে।

শেষ অবধি তিনটে হল। তাতে অপর্ণার বিশেষ আপত্তি হয়নি। কিন্তু এখন ভাবে, এ তিনজন তাদের দুজনকে তিনরকম দুশ্চিন্তায় রাখছে। একটা তো হল, ঠিকমতো বড় হবে কিনা! অসুখ-বিসুখ অ্যাকসিডেন্ট হবে না তো! মানুষ হবে তো! ড্রাগ-ফাগ ধরবে না তো! চরিত্র ঠিক রাখতে পারবে তো! হাজার রকমের প্রশ্ন আর প্রশ্ন।

এটা কি প্রেমের খাজনা? ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটু অচেনা মাত্রাও যোগ হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। যত বড় হচ্ছে তত কি নাগালের বাইরে যাচ্ছে? এই অচেনা ভাবটা সহ্য করতে পারে না সে।

ডোর বেল বাজল। দরজা খুলল অনু। বুবকা দরজার কাছ থেকেই চেঁচাল, মা! গুড নিউজ!

অপর্ণার বুক কেঁপে ওঠে। গুড নিউজ শুনেও ওঠে।

কি হল আবার?

দু ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে বাবার সঙ্গে এক মিনিট কথা বলতে পেরেছি।

কথা বলল! অপর্ণার অন্ধকার অভ্যন্তর যেন আলোয় ভরে গেল হঠাৎ। এ কয়দিন শুধু ঘুমন্ত মণীশকে দেখে এসেছে তারা। কখনও কথা হয়নি। মণীশের কণ্ঠস্বর প্রায় ভুলেই গেছে অপর্ণা।

কী বলল?

বুবকা মাকে দুহাতে ধরে বলল, তুমি কাঁদবে নাকি? চোখ তো টলমল করছে। বাবার কাছে যেতেই দিচ্ছিল না। অনেক ধরে করে যখন গেলাম তখন সেডেটিভের অ্যাকশন বেশী ছিল না। খুব টেনশন ছিল মুখে। আমি যেতেই বলল, তোরা কেমন আছিস? কি করে চলছে?

গলার স্বর কেমন শুনলি? নরমাল?

নরমাল। তবে একটু হাস্কি। আমি বললাম, আমরা খুব ভাল আছি। কোনও গণ্ডগোল নেই।

একটু হাসল কি?

একটুখানি। আর কিছু বলার আগেই নার্স বের করে দিল। আর একটা গুড নিউজ হল, বাবা সকালে স্যুপ খেয়েছে। নিজেই। নো হেল্প্। আজকেই হয়তো কেবিনে ট্রানসফার করতে পারে।

অপর্ণার দুচোখ বেয়ে টপটপ করে জল পড়ে ভেসে যাচ্ছে বুক। মণীশ ফিরবে। মণীশ ফিরছে। পৃথিবীতে এর চেয়ে বেশী অপর্ণা আর কী চাইতে পারে?

দুটো পেলব হাত পিছন থেকে তাকে ধরল, মা!

অপর্ণা চোখের জলের ভিতর দিয়ে ঝুমকির অস্পষ্ট মুখটা দেখতে পেল! মান অভিমান রাগ ভেসে গেল কোথায়। দুহাতে ঝুমকিকে আঁকড়ে ধরে তার বুকেই মাথা গুঁজে দিল সে। যেন সে বাচ্চা মেয়ে, মায়ের বুকে

আশ্রয় খুঁজছে।

১৫

এক সপ্তাহে পর পর দু-দুটো প্রেমে পড়ে গেল হেমাঙ্গ। একেই বলে ইন কুইক সাকসেশন। কুইক সাকসেশন কথাটার সঠিক বাংলা কী হবে? উপর্যুপরি? হ্যাঁ তাই। উপর্যুপরি দু-দুটো লাভ অ্যাফেয়ার। এবং কন্যাহরণের মতোই, অবৈধ প্রেমিকার মতোই খুব গোপনে গাড়ি করে বাড়ি নিয়ে এল সে। কিন্তু ঘরে তুলল না ফটিকের ভয়ে। একটু গাঢ় রাত্তিরে দু দিনই সে তার দুটি প্রেমিকাকে গাড়ি থেকে কোলে করে বয়ে আনল ঘরে। একটি সৌরচুল্লি এবং অন্যটি ইলেকট্রনিক ওয়াটার ফিল্টার। চুরি করে নয়, লোক ঠকিয়ে নয়, নগদ দামে কেনা। তবু এইসব জিনিস ঘরে আনার সময় এবং পরে কয়েকটি দিন কেন যে এক অদ্ভুত পাপবোধে কষ্ট পায় সে তা কে জানে!

ফটিকের চোখকে অবশ্য ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম। কারণ ফটিক সকালে ঘর ঝাঁটপাট দিতে আসে। ঘরের জিনিসপত্র তার সবই দেখা এবং গোনা। নতুন কিছু দেখলেই সে ঝাঁটা ফেলে খেল্ দেখতে বসে যায়, ই কি নতুন কিনলেন দাদাবাবু? তা দ্রব্যটা কি? একটু চালিয়ে ভেলকি দেখিয়ে দিন তো।

ফটিক ছাড়া আর দেখবেটাই বা কে? সুতরাং সৌরচুল্লি আর ওয়াটার ফিল্টার চালু করে দেখাল হেমাঙ্গ।

ফটিক মুগ্ধ। বাক্যহারা। অনেকক্ষণ বাদে বলল, এ বাড়ির বউদিমণির খুব সুবিধে হয়ে যাচ্ছে। কাজকর্ম আর বাকি থাকছে না কিছু। সব কলকব্জাই সেরে দেবে। পাউডার লিপস্টিক মেখে হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন শুধু।

বউদিমণিটা আবার কে রে?

আপনার যিনি বউ হবেন তার কথাই বলছি।

কেউ হবেন না। কস্মিনকালেও না।

ফটিক খুব রহস্যের হাসি হাসে। ভাবখানা যেন, ঠাট্টা ইয়ার্কি হচ্ছে! তারপর জিজ্ঞেস করে, তা কত দাম পড়ল দাদাবাবু?

হেমাঙ্গ মাথাটাথা চুলকোয়। সঠিক দাম থেকে অর্ধেক কমিয়ে বলে। তাতেও ফটিকের চোখ রসগোল্লার মতো হয়ে যায় বিস্ময়ে, অবিশ্বাসে। বলে, দেশের বাড়িতে এ টাকায় যে একখানা ঘর উঠে যায়!

হেমাঙ্গ সেটা জানে। আর জানে বলেই আর একদফা পাপবোধ এসে ভালুকের মতো চেপে ধরে তাকে।

এই পাপবোধ থেকে বেরোনোর একটা রন্ধ্র খুঁজছিল অনেকদিন ধরে। সুযোগটা পেল রবিবার। পিন্টুর জন্মদিন।

চারুশীলা যখনই যা করে তা বেহেড বাড়াবাড়ি রকমের। বরের টাকা আছে, যথেষ্টর চেয়েও বেশী আছে। ঠিক কথা। কিন্তু টাকা যে এরকম পাগলের মতো ওড়ানো যায়, তা না দেখলে বিশ্বাস হত না। পুঁচকে একটা সাত বছরের ছেলের জন্মদিন মাত্র, বিয়ে-শাদিও নয়। তবু সারা বাড়িতে আলোকসজ্জা, স্টিরিওতে সানাই। নামী ক্যাটারার ডাকা হয়েছে। ছোটো করে ককটেল পার্টি দেওয়া হচ্ছে। হলঘরে বেলুন, রঙিন কাগজের শিকলি, ফুল আর মালা, নানা বর্ণের আলোয় ছয়লাপ। একটা ক্ষুদে স্টেজের ওপর চলছে কুইজ কন্টেস্ট, অন্তাক্ষরী, ম্যাজিক শো, গান, আবৃত্তি ইত্যাদি। অন্তত পঞ্চাশ জন বাচ্চা আর শ' দেড়েক মেয়ে-পুরুষ এসেছে নেমন্তন্নে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারল, ক্যাটারার একশ দশ টাকা করে প্লেট নিচ্ছে।

উত্তেজিত হেমাঙ্গ চারুশীলাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ধরা মুশকিল। সবচেয়ে মুশকিল মেয়েদের দঙ্গলে ঢুকে ওকে টেনে আনা। মহিলাদের সমাবেশের ধারেকাছে কখনও যায় না হেমাঙ্গ। সুতরাং সে তক্কে তক্কে রইল। একটা ফুটফুটে অচেনা যুবতী মেয়ে তার হাতে একটা ঠাণ্ডা নরম পানীয় ধরিয়ে দিয়ে গেছে কখন। হেমাঙ্গ সেটাতে একবারের বেশী চুমুক দিতে পারেনি অন্যমনস্কতায়।

চারুশীলার বাড়িটা বিশাল। আর্কিটেক্ট স্বামী মনের সুখে বানিয়েছে। অজস্র খাঁজ-খোঁজ, গুপ্ত জায়গা, আচমকা দু ধাপ সিঁড়ি বা একটি ডিপ্রেসন। এ সব কেন কে জানে! তবে ডাইনিং হলের মাঝখান দিয়ে একটা নারকোল গাছের কাণ্ড সিলিং ভেদ করে ওপরে উঠে গেছে। প্ল্যানে বাড়ির মধ্যেই পড়েছিল গাছটা। সুব্রত— অথাৎ চারুশীলার বর সেটা কাটেনি। ছাদে উঠলে একদম হাতের নাগালে নারকোল ফলে থাকে। হাত দিয়েই পাড়া যায়।

নানা জায়গায় চেয়ার পাতা। বসবার জন্য একটা আড়াল খুঁজছিল হেমাঙ্গ। হলঘরটায় বড্ড হল্লা। পাশের ঘরে ককটেল, সেখানেও শান্তি নেই। আর প্রায় সর্বত্রই মেয়েদের জটলা। হেমাঙ্গ হলঘরের লাগোয়া বারান্দাটা ফাঁকা পেয়ে গেল। একটু অন্ধকার মস্ত বারান্দায় সার দিয়ে মোল্ডেড চেয়ার পাতা।

বসতে গিয়ে একটু চমকাল হেমাঙ্গ। না, ফাঁকা নয়। একদম কোণের দিকে দুজন মানুষ খুব কাছাকাছি বসা। নিচু গলায় গুনগুন করে কথা কইছে।

হেমাঙ্গ সামান্য অস্বস্তি বোধ করল। কেউ প্রেমট্রেম করছে নাকি? তাহলে মূর্তিমান রসভঙ্গের মতো তার এখানে থাকার দরকার কী? উঠতেই যাচ্ছিল, হঠাৎ মনে হল, একজন বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে একজন কিশোরী মাত্র। প্রেম কি? নাও হতে পারে।

হঠাৎ কিশোরীটিই আধো অন্ধকার থেকে হেমাঙ্গকে চমকে দিয়ে ইংরিজিতে বলে উঠল, উই আর টকিং অ্যাবাউট পলিউশনস।

কথাটা বুঝল না হেমাঙ্গ। তবু বলল, দ্যাটস ফাইন, ক্যারি অন।

কিন্তু জুটিটা ভেঙে গেল। বোধ হয় হেমাঙ্গর জন্যই ভাঙল। মেয়েটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে পুরুষটিকে বলল, অলরাইট, সি ইউ এগেন।

তারপর দৌড়পায়ে চলে গেল হলঘরে।

মেয়েটাকে চিনল না, কিন্তু দু তিনবার তাকাতেই পুরুষটিকে চিনতে পারল হেমাঙ্গ। তার মতোই ভীরু-ভীরু, গ্যাঞ্জাম-ভীতু, দার্শনিক টাইপের লোকটি কৃষ্ণজীবন, রিয়ার স্বামী। একটি বিশেষ ক্ষেত্রে এ লোকটি বিশেষ রকমের বিখ্যাত। স্বয়ং সরকার ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা এর পরামর্শ নেয়।

আরে, কী খবর? বলে চেয়ার বদল করে লোকটার একটু কাছাকাছি বসল হেমাঙ্গ।

লোকটা কম কথা বলে, মোটেই ভাল আড্ডাবাজ নয়, গেঁয়ো টাইপের এবং মুখচোরা। কিন্তু কৃষ্ণজীবন ওই কিশোরীটির সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলছিল এতক্ষণ? পলিউশন, গ্লোব ওয়ার্মিং, ওজোন হোল, ডিফরেস্টেশন, সমুদ্রের জলস্তরে স্ফীতি? কিশোরী বয়স কি অত জ্ঞান ধারণ করার বয়স? বিশেষ করে যখন লাগোয়া হলঘরে চলছে ম্যাজিক শো, অন্তাক্ষরী, কুইজ কন্টেস্ট এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত!

হেমাঙ্গ আলাপ জমানোর জন্য ততটা নয়, একটা চাপা উদ্বেগ নিরসনের জন্যই হঠাৎ প্রশ্ন করল, হ্যাঁ ভাল কথা, আপনাদের সেই প্রাইভেট টিউটর চয়ন কেমন আছে বলুন তো!

কৃষ্ণজীবন যেন কিছুক্ষণ আকাশ হাতড়ে বেড়াল। তরপর বলল, চয়ন! সে কে?

আপনার মেয়ে মোহিনীকে প্রাইভেট পড়ায় যে ছেলেটি! একটু এপিলেপটিক!

ওঃ, চয়ন! বলে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে কৃষ্ণজীবন অসহায় ভাবে মাথা নেড়ে বলে, জানি না তো! তার সঙ্গে আমার তো দেখাই হয় না। কী হয়েছে তার?

হেমাঙ্গ হেসে বলল, তাহলে না জানাই ভাল। তবে আমার বন্ধু কণাদ চৌধুরী তার চিকিৎসা করছিল।

হবে। আমাকে কেউ কিছু বলে না।

আর আপনার স্ত্রীর মাইগ্রেন?

কৃষ্ণজীবন ফের অসহায়ভাবে মাথা নাড়ল, জানি না। তবে ভালই আছে বোধ হয়। ওই তো আছে ভিতরে, জিজ্ঞেস করুন না!

দরকার নেই। পরে জেনে নেবো। আপনি বোধ হয় ডোমেস্টিক ফ্রন্টের কোনও খবরই রাখেন না।

সংকুচিত হয়ে কৃষ্ণজীবন বলে, রিয়া আমাকে কিছু বলে না যে।

দেন ইউ আর এ হ্যাপী ম্যান। শুনতে পাই বউদের ঘ্যানঘ্যানানিতে নাকি স্বামীরা জেরবার হয়ে যায়।

কৃষ্ণজীবন একটু হাসল। লোকটা হ্যান্ডসাম, হাসলে খুবই ভাল দেখায়। মেদহীন, রুক্ষ, ছিপছিপে চেহারায় বয়সের কোনও ছাপই পড়েনি। রিয়ার পাশে একে হয়তো বয়সে কিছু কমই মনে হবে।

হেমাঙ্গ একটু হিংসের গলায় বলে, আপনি কিন্তু বেশ ফিট, তাই না?

কৃষ্ণজীবন এই কমপ্লিমেন্টও নিতে পারল না। অস্বস্তি বোধ করে বলল, আমি কষ্টে মানুষ।

হেমাঙ্গ হেসে ফেলল, কী কথার কী জবাব! এ লোকের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার চেষ্টা বৃথা। প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার জন্যই সে বলল, একটু ককটেল চলবে? ব্যবস্থা আছে কিন্তু!

কৃষ্ণজীবন এ কথায় শঙ্কিত হয়ে বলল, না না, ওসব নয়। আমি খাই না।

হেমাঙ্গ একটা শ্বাস ছেড়ে উদাস গলায় বলে, এইরকম ম্যাসিভ স্কেলে জন্মদিন করার কোনও মানে হয়, বলুন! ক্যাটারার, ককটেল, ডেকোরেশন! এটা কি অপব্যয় নয়?

একথাটা কৃষ্ণজীবনের যেন পছন্দ হল। সে সঙ্গে সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, খুবই অপব্যয়। ভীষণ অপব্যয়। আমার বা আমার ভাইবোনদের কখনও জন্মদিন-টিন হত না। জন্মের তারিখও জানা ছিল না। স্কুলের খাতায় আন্দাজে জন্মের তারিখ লেখানো হয়েছিল, মনে আছে।

আচ্ছা, আপনার বাড়ি শুনেছি উত্তর চব্বিশ পরগনায়। কোন গ্রাম বলুন তো! আমার ওদিকে একটু যাতায়াত আছে।

বিষ্টুপুর। শীতলাতলা বিষ্টুপুর। স্টেশন থেকে দু মাইল দূর। আগে হেঁটে যাতায়াত করতে হত। আজকাল বাসরাস্তা হয়েছে। ছোটো গ্রাম।

নামটা চেনা। ওদিকে গেলে খোঁজ নেবো।

নেবেন। একটেরে জায়গা।

কিছু মনে করবেন না, আপনি তো প্রায় একটা ইন্টারন্যাশনাল ফিগার, তবু এখনও বেশ সহজ সরল আছেন। গাঁয়ের লোক বলেই কি?

কৃষ্ণজীবনের একথাটাও পছন্দ হল। আবার একবার হাসল। তারপর মৃদু স্বগতোক্তির মতো বলল, সহজ সরল আর থাকতে দিচ্ছে কই? বুদ্ধিমান মানুষেরা, বিদ্বান মানুষেরা গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে। ফলে গ্রাম বড় ফাঁকা আর অন্ধকার হয়ে যায়। আজেবাজে লোকেরা সেখানে রাজত্ব করে। ভুল শিক্ষা, ভুল রাজনীতি, ভুল ধর্ম, ভুল নৈতিকতা নষ্ট করে দিচ্ছে আমাদের গ্রামগুলোকে। গাঁয়ে গেলে লক্ষ করবেন, সব সেকেন্ড গ্রেড থার্ড গ্রেড লোক সেখানে ছড়ি ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে।

এত কথা কৃষ্ণজীবনের মুখে একসঙ্গে শুনে হেমাঙ্গ অবাক হল। ওই কিশোরী মেয়েটিও কি এ সবই শুনছিল? পলিউশনের কথা বলছিল না!

হেমাঙ্গ বলল, জানি। গ্রামে এখন খুব পলিটিকস। আপনি বোধ হয় বিষ্টুপুর ছেড়ে এসে খুব হ্যাপী নন!

একটুও না। কিন্তু হায়ার এডুকেশন, বেটার জব অপরচুনিটি, হায়ার স্ট্যাটাস টেনে আনে মানুষকে। মুশকিল কী জানেন? একবার চলে এলে আর কখনও ফিরে গিয়ে নিজের গ্রামে নিজেকে ট্র্যানসপ্ল্যান্ট করতে পারবেন না। গাঁয়ের লোকই থাকতে দেবে না আপনাকে। তবু আমি চেষ্টা করব।

হেমাঙ্গ অবাক হয়ে বলে, কী চেষ্টা করবেন?

ফিরে যেতে। আমি যদি যাই, তাহলে একদম চাষী হয়ে যাবো। নিজের হাতে লাঙ্গল চালাবো, ঘর ছাইব, মিশে যাবো।

হেমাঙ্গ হাসল, পারবেন না। আপনিই সবচেয়ে ভাল জানেন যে, আপনি পারবেন না। আমি মাঝে মাঝে গ্রামে যাই বলেই জানি, আপনার অ্যাসেসমেন্ট হান্ড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট।

কৃষ্ণজীবন কি একটু বিষণ্ণ হল? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিষাদ মাখানো গলায় বলল, কিন্তু গ্রামে না ফিরলেও, আমাদের সবাইকেই একদিন গ্রাম্য জীবনে ফিরে যেতেই হবে। এই সব বড় বড় শহর তৈরি করাই ছিল মানুষের মস্ত ভুল। এক জায়গায় এত মানুষকে জড়ো করলে বাতাস বিষিয়ে যায়, জমে ওঠে গাদ, দূষণ। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন আর বাক্সবন্দী হয়ে যায় মানুষ। ভবিষ্যতে একদিন মানুষ নিজেদের ভুল শুধরে নিতে শহর ভাঙবেই। ভাঙ্গবে কলকারখানা, কমিয়ে দেবে রাসায়নিকের ব্যবহার, বহু ভোগ্যপণ্যকে বাতিল করে দেবে।

আপনি জনসংখ্যার দিকটাও তো ভাববেন!

কৃষ্ণজীবন একটু হাসল ফের। উদাস গলায় বলল, আগামী কয়েক দশকে প্রকৃতির নিয়মেই লাখো লাখো মানুষ মরবে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, রোগ ভোগ, যুদ্ধ বা খুন—এ সবই হল জনসংখ্যার সিলিং। একমাত্র এইভাবেই কত মানুষ মরবে তা কি জানেন?

খবরের কাগজে পড়েছি বটে। নাম্বারটা অ্যালার্মিং।

আবহমণ্ডলে ওজোন হোল সৃষ্টি হওয়ায় ক্যানসার মহামারীতে দাঁড়িয়ে যাবে। ন্যাচারাল রিসোর্স আর জনসংখ্যার মধ্যে রেশিও রক্ষা করতে পার্জিং হবেই। আমি চোখ বুজলে দেখতে পাই পৃথিবী জুড়ে মৃতদেহের গাদি লেগে আছে। সৎকারের লোক নেই।

হেমাঙ্গ বারান্দার ঝুঁঝকো অন্ধকারে লোকটার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিল। সে যতদূর জানে, লোকটা পাগল নয়, বায়ুগ্রস্ত নয়। লোকটা একজন বিশেষজ্ঞ। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরিসংখ্যানের জোরে কথা বলছে। তবু সে স্বগতোক্তির মতো বলল, অতটাই কি হবে! বিজ্ঞানীরা যখন উঠে পড়ে লেগেছে তখন একটা কিছু সমাধান তো হবেই। তাই না?

বিজ্ঞানীরা মুষ্টিমেয়। পৃথিবীর যে সংকট আসছে সে সম্পর্কে অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষেরই ধারণা ভাসা ভাসা। আর অশিক্ষিতরা তো সম্পূর্ণ নির্বিকার। কয়েকদিন আগেই একজন সেন্ট্রাল মিনিস্টার আমাকে ডেকে বলেছেন, আমি যে কলকারখানা কমাতে বলছি তাতে নাকি উৎপাদন ও উন্নয়ন মার খাবে। তাকে আমি বোঝাতে পারিনি, আগে অস্তিত্বকে রক্ষা করা দরকার, নইলে উন্নয়ন আর উৎপাদন কার কাজে লাগবে? আমি পৃথিবীর লোককে বোঝানোর চেষ্টা করছি, সবগুলো রাষ্ট্রের উচিত অন্যসব ইস্যুকে উপেক্ষা করে পৃথিবীর পরিবেশ ও আবহমণ্ডলকে রক্ষা করার জন্য সব রিসোর্সেস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। কিন্তু কে শুনছে বলুন! রাজনীতিকরা তাঁদের কূটকচালিতে বন্দী হয়ে আছেন, আমলারা ব্যস্ত প্রশাসনিক কাজে। সাধারণ মানুষ অন্নবস্ত্রের বাইরে কিছুই ভাবতে চায় না। এই পৃথিবীর জন্য, মাটির জন্য, গাছের জন্য, প্রকৃতির জন্য তাদের যেন কিছুই করার নেই। সবচেয়ে ভয়াবহ হচ্ছে এই উদাসীনতা। নেগলিজেন্স। আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে আমি কী করতাম জানেন! কেউ গাছ কাটলে তার ফাঁসির ব্যবস্থা করতাম। সন্তান সংখ্যা যার বেশী হবে তাকে জেল-এ পাঠানোর ব্যবস্থা করতাম। জল বা বায়ু দূষিত হয় এমন কলকারখানার মালিকদের দেউলিয়া করে ছেড়ে দিতাম।

হেমাঙ্গ সামান্য সপ্রসংশ গলায় বলে, আপনাকে দেখে বোঝা যায় না বটে, কিন্তু ইউ আর এ টাফ ম্যান।

কৃষ্ণজীবন একটুও হাসল না। মাথা নেড়ে বলল, না। আমি বড় অসহায় আর দুর্বল। আমি কিছু করতে পারছি না। এ বিটন ওল্ড ম্যান।

ওল্ড কোথায়! আপনি তো দারুণ ইয়ং লুকিং।

বাইরেটা। ভিতরে ভিতরে আমি বুড়িয়ে যাচ্ছি দুশ্চিন্তায়, টেনশনে।

অবস্থাটা কি ততটাই খারাপ?

আপনি যতদূর ভাবতে পারছেন তার চেয়েও বোধ হয় বেশী। আমাদের আর একদম সময় নেই।

তাহলে বৈজ্ঞানিকরা এতদিন কী করল মশাই?

তাদের দিয়ে যা করানো হয়েছে তারা তাই করেছে। তারাও রাজনীতি আর প্রশাসনের শিকার। তাদের মস্তিষ্ক আছে, চরিত্র নেই। তাই তারা নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট, মারণাস্ত্র, দূষিত কেমিক্যালস তৈরি করে যাচ্ছে। তাদের লাগানো হচ্ছে কসমেটিক জিনিসপত্র তৈরির কাজে। লাগানো হচ্ছে লোককে চমকে দেওয়ার জন্য নানা ম্যাজিক আইটেম বানানোর কাজে। লোককে বোঝানো হচ্ছে, এটা বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানীরা ঈশ্বরের বিকল্প। বিজ্ঞান দুনিয়ার সব রহস্য ভেদ করতে চলেছে। কিন্তু যারা বিজ্ঞান জানে তারা এ কথা শুনে লজ্জায় জিব কাটে। বিজ্ঞান কোথায় পড়ে আছে তা কি জানেন? লোকে আকাশে রকেট পাঠানো দেখে, স্যাটেলাইটে টিভি

দেখে ভাবছে, বিজ্ঞান বুঝি কেল্লা মেরে দিল। কিন্তু আসল কথা কি তাই! বিজ্ঞানের ঘরে পচা ইঁদুরও কি নেই? মহাকাশের কথা বাদ দিয়ে শুধু এই সোলার সিস্টেমের কথাই ধরুন। এরই এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যেতে কত সময় লাগছে বলুন তো একটা রকেট বা প্রজেক্টাইলের? কত ফুয়েল খরচ হচ্ছে! কত কোটি ডলার ব্যয় হচ্ছে! দুনিয়ার মানুষকে উপোস, অশিক্ষা আর রোগেভোগে রেখে এই গবেষণা কী দিচ্ছে আমাদের? প্রায় কিছুই নয়। আমাদের নিকটতম নক্ষত্রটি পৃথিবী থেকে চার লাইট ইয়ার দূরে। যদি মানুষ কখনও আলোর গতি অর্জন করতে পারে তাহলেও সেখানে মহাকাশযান পাঠাতে লাগবে চার বছর। যদি না মাঝপথে অ্যাস্টোরয়েডরা সেই মহাকাশযান ধ্বংস করে দেয়। আলোর গতি অর্জন করাও আইনস্টাইনের মতে প্রায় অসম্ভব। সেই ফুয়েল আমাদের নেই এবং ওই গতি কোনও ম্যাটারের পক্ষে অর্জন করা অসম্ভব, বস্তুগত রূপান্তর ছাড়া। আলোর গতি পেলে ম্যাটার হয়ে যাবে এনার্জি, আমি কি একটু বেশী টেকনিক্যাল হয়ে পড়ছি?

আমি বুঝতে পারছি। আজকাল সবাই এসব বোঝে।

কৃষ্ণজীবন হতাশ গলায় বলে, বুঝছে কই? বৈজ্ঞানিকরা আমাদের খেলনা দিয়ে, চুষিকাঠি দিয়ে, রূপকথার গল্প বলে ভুলিয়ে রাখছে। কিন্তু আমরা পচা ইঁদুরের গন্ধ পেতে শুরু করেছি। আমি হিউস্টনে এক বক্তৃতায় বলেছিলাম, আমেরিকা যদি তার একটা বা দুটো রকেট উৎক্ষেপণ বন্ধ রেখে টাকাটা ইথিওপিয়ার মরু-প্রকৃতিকে বশে আনতে ব্যয় করে তাহলে পৃথিবীর অনেক বেশী উপকার হবে। আমেরিকানরা তুমুল হাততালি দিল, বাহবা দিল, কিন্তু প্রস্তাবটা কার্যকর করল না।

আপনি কি মহাকাশ গবেষণা বন্ধ করার পক্ষে?

না, আমি ততটা গাধা নই। কিন্তু আপনি হয়তো জানেন না, মহাকাশ গবেষণার বকলমে কিছু মানুষ বড়লোক হয়ে যাচ্ছে এবং চলছে ওয়াইল্ড গুজ চেজ। আমি বাড়াবাড়ির বিপক্ষে। আমেরিকা যখন চাঁদে মানুষ পাঠিয়েছিল তখন সেটা কত বড় হাই রিস্ক ভেনচার ছিল তা কি জানেন? তখনও ফুল-প্রুফ টেকনোলজি ছিল না, শুধু বাহবা পাওয়ার জন্য ওই সাঙ্ঘাতিক ঝুঁকি নিয়েছিল। এইসব ইউজলেস কাজ তো বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয়। তার উদ্দেশ্য মানুষের মঙ্গল। কিন্তু সে কথাটা মানুষ বুঝছে কই! বিজ্ঞান-পাগল মানুষ বিজ্ঞানকে মাথায় তুলেছে, ঈশ্বরের বিকল্প করে তুলছে, অথচ বাস্তববুদ্ধি থাকলে মানুষের বোঝা উচিত ছিল, বিজ্ঞানের ভূমিকা হল মানুষের ভৃত্যের। যার চাকর হওয়ার কথা তাকে মনিব করে তোলা কি উচিত?

আপনি নিজে বৈজ্ঞানিক, তবে বিজ্ঞানের ওপর ক্ষেপে আছেন কেন?

বিজ্ঞানের ওপর ক্ষেপব কেন! আমার রাগ আহাম্মক মানুষের ওপর। অস্ত্র গবেষণায় কত কোটি কোটি ডলার খরচ হয় তা কি জানেন? এক একটা যুদ্ধে কত কোটি ডলার খরচ বলুন তো! এক একটা ক্ষেপণাস্ত্রের দাম কত, একটা পুওর ম্যান্স্ অ্যাটম বোমার? প্রতি মিনিটে কত মিলিয়ন ডলার ছারখার হয়ে যায়? মাটির নিচে তেল ফুরিয়ে আসছে, তবু কিছু আহাম্মক শত্রুতা করে জ্বালিয়ে দেয় তেলের খনি। কত তেল পুড়ে গেল! কত ক্ষতি হল মানুষের! কতখানি বিষিয়ে গেল পৃথিবীর বায়ু আর জল! কী হবে আপনার এই বৈজ্ঞানিক সভ্যতা দিয়ে, যা বর্বর, অদূরদর্শী, আত্মঘাতী?

লোকটা এত গুছিয়ে কথা বলতে পারে, এটা একদমই জানা ছিল না হেমাঙ্গর। বরং সে শুনেছে, লোকটা গ্রাম্য, মুখচোরা, একটু ক্ষ্যাপাটে এবং আনমনা, হয়তো তাই। হয়তো শুধু নিজের গবেষণা ও উপলব্ধির ক্ষেত্রেই লোকটা সহজ ও বাক্‌পটু। সে একটা বড় শ্বাস ছেড়ে বলে, ইউ আর পারহ্যাপস রাইট।

আই অ্যাম রাইট। আমি ফিকশ্যনাল সায়েন্সে বিশ্বাস করি না, ডেস্ট্রাকটিভ সায়েন্সে বিশ্বাস করি না, ওয়েলফেয়ার সায়েন্সে বিশ্বাস করি। সভ্যতায় অনেক কদম এগিয়ে গিয়েও যখন মানুষকে বর্বর, আহাম্মক, নির্বোধ আর উদাসীন দেখি তখন মনে হয়, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি-নির্ভর সভ্যতার কোনও দাম নেই। আমাদের কোনও সৎ শিক্ষাই এই সভ্যতা দিচ্ছে না। চাকা সুতরাং উল্টোদিকে ঘোরাতেই হবে।

বারান্দার ঝাঁঝালো বাতিটা হঠাৎ জ্বলে উঠতেই চমকে গেল হেমাঙ্গ।

এই অলম্বুস! বলেই জিব কাটল চারুশীলা, আরে, আপনিও এখানে! বলে কৃষ্ণজীবনের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল।

হেমাঙ্গ গম্ভীর হয়ে বলে, যা তো। এখন কাজের কথা হচ্ছে।

সে কি! খাবি না? ডিনার শুরু হচ্ছে যে!

আরও পরে খাবো।

চারুশীলা কৃষ্ণজীবনের দিকে চেয়ে বলে, প্লীজ, আপনি আসুন। রিয়া খুঁজছে আপনাকে। আপনার নাকি আজ রাত বারোটায় প্লেন ধরতে হবে।

আজ্ঞে হ্যাঁ। বলে কৃষ্ণজীবন উঠে দাঁড়ায়। ভারী আপ্যায়িত ভঙ্গি।

হেমাঙ্গ বলে, কোথায় যাচ্ছেন রাত বারোটার প্লেনে?

লন্ডন। এমনভাবে বলল, যেন লিলুয়া-টিলুয়া কোথাও যাচ্ছে।

একা বারান্দায় আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে হেমাঙ্গ। পৃথিবীর আসন্ন বিপদ নিয়ে মোটেই দুশ্চিন্তা নেই তার। কৃষ্ণজীবন যতই বলুক, সে জানে পৃথিবীর ভাল করার কথা যারা ভাবছে, তারা ঠিকই ভাল করবে। ঘুরেফিরে তার কেবলই একটা প্রশ্ন আসছে মনে, ওই কিশোরী মেয়েটি এইসব গুরুতর কথাই কি চুপ করে শুনছিল কৃষ্ণজীবনের কাছ ঘেঁষে বসে? কে মেয়েটা?

চারুশীলা আবার এল, কী হচ্ছে বল তো? খাবি না নাকি?

নাও খেতে পারি। প্রতিবাদ হিসেবে।

তার মানে!

এই গরিব দেশে এত খরচ করে কেউ ছেলের জন্মদিন করে? এই অপচয়ের মানে হয় কোনও?

ওঃ, তাহলে এই হল ব্যাপার! আর তুই যে আজেবাজে জিনিস কিনে রোজ টাকা উড়িয়ে দিচ্ছিস!

তোর মাথায় ঘিলু বলে পদার্থটা নেই বলেই বলছিস। জিনিস কিনলে টাকার অপচয় হয় না, টাকাটা জিনিসে কনভার্টেড হয় এবং ঘরে থাকে।

ওটা তো আই-ওয়াশ। জিনিসগুলো বেচলে ফের পুরো টাকাটা কখনও ফেরত পাবি?

ফেরত পাওয়ার প্রশ্নই নেই। জিনিসগুলো আমাকে সারভিস দিচ্ছে।

ছাই দিচ্ছে। আয় বলছি খেতে।

এই গরিব দেশে একশ দশ টাকা প্লেট মূর্খের মতো অপচয়। বহু খাবার নষ্ট হবে। আই প্রটেস্ট।

মারব থাপ্পড়, কিপ্পুস কোথাকার। নইলে পিন্টুকে লেলিয়ে দেবো। তখন সুড়সুড় করে যাবি।

তুই পিন্টুটাকে নষ্ট করছিস।

বেশ করছি। আর একটা কথা বলে রাখি, আমার সামনে গরিব কথাটা উচ্চারণ করবি না কখনও। গরিব কথাটাই আমি সহ্য করতে পারি না। গরিবদের দুচোখে দেখতেও পারি না।

হেমাঙ্গ অবাক হয়ে বলে, বলতে পারলি কথাটা! জিবে আটকাল না? তুই সত্যি খারাপ হয়ে গেছিস।

তোর চেয়ে খারাপ নই। তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। নীলা বণ্ডেল রোডে ফিরবে। ওর গাড়ি নেই। ওকে নামিয়ে দিয়ে যাবি।

আমার খিদে পাচ্ছে না।

খপ করে তার চুলের মুঠি চেপে ধরল চারুশীলা, খাবি কিনা?

উঃ। যাচ্ছি যাচ্ছি!

খাওয়ার ঘরেই কিশোরীটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্লেটে সামান্য একটু মাছের কারি নিয়ে একটু খাওয়ার ভান করছে। এটা খিদের বয়স, কিন্তু এই প্রজন্মের হাই ব্রাও মেয়েরা তেমন খেতে-টেতে চায় না। অন্তত পাবলিকলি নয়।

ভিড়ে মেয়েটার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল হেমাঙ্গ, তুমি কে বলো তো?

মেয়েটা মুখ তুলে তাকে দেখে হাসল, আমি অনু। নন্দনা আমার বন্ধু। আপনি?

আমি! আমি নন্দনার মামা। হেমাঙ্গ! তুমি ওটা কী খাচ্ছো?

মাছ। কিন্তু বিচ্ছিরি খেতে হয়েছে।

তবে খাচ্ছো কেন? অনেক আইটেম আছে, নিয়ে খাও না।

আসলে আমার অ্যাপেটাইট নেই। মাই ড্যাড ইজ সিক। নট ফিলিং হাংরি।

বাবার কী হয়েছে?

হয়েছিল। ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। তবে হি ইজ পুলিং থ্রু। ইনটেনসিভ কেয়ার থেকে পরশু কেবিনে ট্রান্সফার করা হয়েছে।

তাহলে তো ভাল খবর।

ভালই। তবু কেন যেন বাবার অ্যাটাক হওয়ার পর থেকে খেতে পারি না।

কৃষ্ণজীবনবাবুকে তুমি চেনো?

মেয়েটা টপ করে তার দিকে একবার তাকাল। তারপর স্মার্ট হেসে বলল, উই আর ফ্রেন্ডস।

ফ্রেন্ডস!

ভেরি গুড ফ্রেন্ডস।

হেমাঙ্গ মেয়েটার পাকামিতে একটু হাসল। একটু চিমটি কেটে বলল, পারহ্যাপস নট এ বয় ফ্রেন্ড?

অ্যান্ড হোয়াই নট? বলে হিহি করে হাসল মেয়েটা।

মাই গড!

আপনি একটু ওল্ড ফ্যাশনড্, তাই না?

কি জানি! হবে হয়তো।

আসলে ওঁর মেয়ে মোহিনী আমার খুব বন্ধু।

তাই বলো।

উনিও বন্ধু।

হেমাঙ্গ একটা মুর্গির ঠ্যাং সন্তর্পণে কামড়ে বলল, হি ইজ ইন লাভ উইথ দিস আর্থ। জানো?

সবাই জানে। হি ইজ এ গুড গাই। জেম অফ এ গাই।

বোধ হয় তুমি ঠিকই বলছো। আফটার অল হি ইজ ট্রাইং টু ডু সামথিং ফর ম্যানকাইন্ড অ্যান্ড দিস প্ল্যানেট।

দ্যাটস হোয়াই আই অ্যাম ইন লাভ উইথ হিম।

এরা যে কী ভাষায় কথা বলে তা ঠিক পায় না হেমাঙ্গ। সে একটু অস্বস্তি বোধ করে চুপ করে রইল।

অনু তার মাছসুদ্ধ প্লেটটা একজন চলন্ত বেয়ারার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, ডু ইউ নো সামথিং অ্যাবাউট ইওরসেলফ?

কী বলো তো!

ইউ আর এ হ্যান্ডসাম ম্যান!

বলে হিহি করে হাসল অনু। তারপর বলল, যাই।

হেমাঙ্গর হাত থেকে মুর্গির ঠ্যাংটা পড়েই যাচ্ছিল।

১৬

বিষ্ণুপদর পেটটা একটু নেমেছে। সকাল থেকে বার চারেক দাস্ত, পেটটা ভার। একটা বিশেষ বয়সের পর শাস্ত্রে আছে মলভাণ্ডং ন চালয়েৎ। চালাতে হয়নি, ইদানীং খাওয়া-দাওয়াটা একটু বেহিসেবী মতো হওয়ায় সামাল দিতে পারা যায়নি। রামজীবন খাওয়াচ্ছে খুব। পরশু কোথা থেকে ক্ষীর নিয়ে এল এক ভাঁড়। থকথকে ক্ষীর, সরে ননীতে একেবারে মাখামাখি, ভাঁড়টা একবার তাকে শুঁকিয়ে নিয়েছিল রামজীবন। আহা, কী মিঠে গন্ধ! প্রাণ জুড়িয়ে জিব রসস্থ হয়ে পড়ল। ইদানীং নোলাটা যে বেড়েছে তা বিষ্ণুপদ নিজেই টের পায়। কাল যখন ডাকে, তখন এরকমই হয়। নোলা বাড়ে।

ক্ষীর দেখে নয়নতারা চেঁচামেচি শুরু করল, ওই বুড়ো মানুষটাকে এই বিষ গেলাবি নাকি রে বাবা? এ কি ওর পেটে সইবে!

রামজীবন উদার গলায় বলে, আহা, খাক না মা। সাধ মিটিয়ে খাক। ভালমন্দ অত হিসেব করার কি বয়স এটা? এখন প্রাণ খুলে সাধ মিটিয়ে যা খুশি খেয়ে হরি বলে চলে যাওয়া।

নয়নতারা রাগ করে বলল, আমি বাপু তোদের মতো করে বুঝি না। আমি বুঝি যতদিন রাখা যায় ধরে বেঁধে ততদিনই রাখলাম। ওই ঘন পাকের জিনিস হজম হবে না বাবা। তোরা বরং ভাগজোগ করে খেয়ে নে। আমি একটা ফোঁটা বুঝেসুঝে দেবোখন তোর বাপকে।

রামজীবন জিব কেটে বলে, তা কি হয়! বাবার নাম করে এনেছি, বাবাই খাবে। ওতে ভাগজোগ চলবে না।

বিষ্ণুপদ বারান্দায় বসে শুনছিল। শুনে মনে মনে খুব বাহবা দিল রামজীবনকে। এ তার বিদ্বান ছেলে নয়, দোষঘাটওলা মুখ্যু ছেলে, কিন্তু বাপ-মায়ে ভক্তি এর কাছ থেকে লোকে শিখতে পারে। আর নয়নতারার তারিফও না করে পারে না বিষ্ণুপদ। ওই একটা মানুষই তার ভালমন্দর কথা ভাবে।

নাড়ে পরশু রাত্তিরে একটু ক্ষীর পড়ল। রামজীবন একেবারে সামনে খাড়া দাঁড়িয়ে দেখল, কম দেওয়া হচ্ছে কিনা। সাদা বাতাসা গুঁড়িয়ে দিল রাঙা, সঙ্গে পাকা একখানা মর্তমান কলা। নয়নতারা একটু আবডাল থেকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছিল, বুঝেসুঝে খেও গো। মরা পেট, ওসব খাওয়ার অব্যেস নেই তো। পেটে ঢুকে কী হুলুস্থুল বাঁধায় কে জানে বাবা!

রামজীবন একটু অসন্তোষের গলায় বলল, খাওয়ার সময় অমন টিকটিক কোরো না তো মা!

সাধে কি বলি বাবা, ভুগতে তো হবে আমাকেই।

ক্ষীরটা আজও যেন জিবে লেগে আছে। যেমন স্বাদ, তেমনই গন্ধ। দু'হাতার একটু বেশীই খেয়ে ফেলল বিষ্ণুপদ। ঢেঁকুরখানায় অবধি ক্ষীরের গন্ধ আসছিল।

ভুটভাট শুরু হল শেষ রাতে। কাল সারাদিন থম ধরে রইল পেট। খিদেই হল না। আজ সকাল থেকে নেমেছে। বর্ষা ঋতুটা এমনিতেই ভাল নয়। রোগ সহজে ছাড়তে চায় না। ছাতা মাথায় দিয়ে বার বার ঘটি নিয়ে দৌড়োতে হচ্ছে পুকুরধারে। এ তো আর কৃষ্ণজীবনের সাততলার ফ্ল্যাটবাড়ির পাকা ঝা চকচকে পায়খানা নয়! নিতান্তই চট দিয়ে ঘেরা কাঁচা ব্যাপার। ওপরে কোনও ছাউনিও নেই। তবে রামজীবনের পাকা ঘরখানা হলে তাতে সব বন্দোবস্ত থাকবে। লাগোয়া না হলেও, কাছেই বারান্দার শেষ দিকটায় স্যানিটারি হচ্ছে। বাবা-মায়ের জন্য জান-কবুল করে লেগেছে ছেলেটা।

চারবার হয়ে গেল। লক্ষণ ভাল বুঝছে না বিষ্ণুপদ। শরীরটা কাহিল লাগছে, সিঁটিয়ে যাচ্ছে যেন। জিবটা খসখসে, বিস্বাদ।

নয়নতারা এসে বলল, ক'বার হল।

চারবার।

আরও হবে?

বলি কি করে?

বুঝছো কেমন?

ভয় খাওয়ার মতো কিছু নয়।

থানকুনি আর গ্যাঁদাল রস করে রেখেছি। খাও। বমির ভাব নেই তো!

না।

নয়নতারা গেলাসে রসটা নিয়ে এল। বিষ্ণুপদ ঢক করে রসটা খেয়ে বলল, সব ভাল যার শেষ ভাল।

দাসীর কথা বাসি হলে তবে কানে যায়। পিচকিরি যে ছুটবে সে তো তখনই বুঝতে পেরেছিলাম।

বিষ্ণুপদ কাহিল হাসি হেসে বলল, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। কিন্তু লোভের ক্ষমতা কি কিছু কম? শয়তানের গায়ে মেলা জোর। তার সঙ্গে আমরা পেরে উঠব কেন? তবে যদি এখন কলেরা হয়ে মরি তবে দুঃখ থাকবে না। একখানা জম্পেশ জিনিস খাওয়াল বটে রামজীবন। তুমিও একটু চেখে দেখেছো তো!

সে খোঁজ আর নিলে কোথায়?

খোঁজ নিইনি বটে। দোষই হয়েছে। তবে মনে হয় তুমিও একটু জিবে ঠেকিয়েছো, তাই না?

কী পুরুষের সঙ্গেই জীবনটা কাটল! বলি, দুধ সর ক্ষীর কবে মুখে তুলতে দেখেছো আমায়? আমার হল সাদা-পাতা খাওয়া পচা মুখ, ওসব ভাল ভাল জিনিস কি সয় আমার?

তাও বটে। তুমি তো সত্যি দুধটুধ খাও না। তবে এটা একটু খেয়ে দেখলে পারতে। বড় খাঁটি জিনিস।

ধোঁয়াটে গন্ধ পাওনি?

না তো! ছিল নাকি?

আমি তো ভাঁড় শুঁকেই পেয়েছি। মোষের দুধের ক্ষীর।

মোষের দুধে কি ধোঁয়াটে গন্ধ হয়?

তাই তো জানি।

বিষ্ণুপদ একটু হাসল, আমাদের আর গরু মোষের তফাত করে লাভ কি?

মোষের দুধ তেজী জিনিস। গুরুপাক। পেট ডাকল নাকি? শব্দ পেলাম যেন!

ডাকছে।

তাহলে আবার হবে। টোটকাতে আর ভরসা পাচ্ছি না। ডাক্তার ডাকি।

ব্যস্ত হয়ো না। ধরেও যেতে পারে। আজকালকার অ্যালোপ্যাথি মানেই তো বিষ। বিষে বিষ ক্ষয়। আজকের দিনটা উপোস দিলেই হবে।

আজ খুব সকালে রামজীবন বেরিয়ে গেছে। শুনছি আজ নাও ফিরতে পারে। বামাচরণ তো সম্পর্ক রাখছে না। এখন বিপদ হলে কাকে ডাকি?

বিষ্ণুপদ হাসে, কাউকে ডাকতে হবে না। বিষ্টুপুরে এতকাল আছি। পাড়া-প্রতিবেশীরা কি আর আসবে না ডাকলে! কিন্তু অত কিছু করতে হবে না।

এ বয়সে পেট-ছাড়া কি ভাল? কথায় বলে, ছেলে হাগে বাড়তে, বুড়ো হাগে মরতে।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, তাই খারাপ কি? সময় হলে চলে যাওয়াই তো ভাল।

এ কি হাসিঠাট্টার কথা!

আহা, রাগ করো কেন? পানের বাটাখান নিয়ে এখানেই বোসো। পাহারা দাও। যমদূত এলে তাড়িয়ে দিও।

বিষ্ণুপদ আর একবার গেল। ঘুরে যখন এল তখন আর হাসিখুশি ভাবখানা নেই।

বুঝলে, একটু শোবো।

নয়নতারা উঠে পড়ল। বলল, আগেই ভেবে রেখেছি। বিছানা করাই আছে। শুয়ে পড়বে চলো। রক্তটক্ত যাচ্ছে না তো!

না। এখনও ততটা খারাপ নয়।

ঘরে অন্ধকার ঘনিয়ে আছে। বাইরে মেঘলা। বৃষ্টি পড়ছে টিনের চালে খই-ভাজার শব্দ তুলে।

নয়নতারা দাওয়ায় বেরিয়ে পটলকে ডাকল। এইবেলা যা দাদা, পুলিনবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়। পেট খারাপের কথা বলিস, ওষুধ যেন সঙ্গে করে নিয়ে আসে।

পটল ছাতা আর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল। তার সেই ঝাঁ-কুরকুর সাইকেল। এই নাতিটিকে বড় ভালবাসে নয়নতারা। বড় হলে কেমন হবে কে জানে! কিন্তু এখন অবধি ভারি বাধ্যের, এ বয়সেই বুদ্ধি বিবেচনা খুব হয়েছে, বোবা ভাইটাকে বুকে বুকে আগলে রাখে।

দুই বউ আজকাল আলাদা রাঁধছে। রান্নাঘরটা রাঙার দখলে। শ্যামলী নিজের ঘরে স্টোভ জ্বেলে বা তোলা উনুনে রেঁধে নিচ্ছে। সেই ঝগড়ার পর থেকেই এই ব্যবস্থা। ভিতরে ভিতরে ভাইয়ে ভাইয়ে জায়ে জায়ে ভাগ হয়েই ছিল। মনের মধ্যেকার ভাগটাই এখন বেরিয়ে পড়েছে। যতদিন যাচ্ছে তত ভাগাভাগিটা যেন বাড়ছে চারদিকে।

নয়নতারা ঘরে এসে দেখতে পায়, চোখ চেয়ে নিঝুম শুয়ে আছে বিষ্ণুপদ। যেন ভাবন-জগতে।

কী হচ্ছে পেটের মধ্যে!

বিষ্ণুপদ বলে, পেটের মধ্যে নয়, মনের মধ্যে। সেখানে অনেক কিছু হচ্ছে।

তোমার তো মন নিয়েই যত জ্বালা। কী যে সারাদিন ভাবো বসে বসে!

তোমার ভাবনাচিন্তা আসে না, না?

তা আসবে না কেন? মেয়েমানুষের মাথায় তেল-নুন, রোগ-ভোগ, সংসারে পাঁচটা ভালমন্দ এইসব ছাড়া আর কী আসবে বলো! এই যে রোগ বাঁধালে এখন এইটেই মাথা জুড়ে থাকবে।

এইমাত্র কী ভাবছিলাম জানো?

কী ভাবছিলে?

ভাবছিলাম কলকাতায় থাকলে এখন বেশ হত। না, কৃষ্ণজীবনের বাড়িতে নয়। সে বড় সাহেবী জায়গা। কলকাতার বড় রাস্তার একটি ধারে যদি বসে থাকতে পারতাম সারা দিনমান তাহলে বেশ হত।

রাস্তায় বসে থাকলে আবার ভালটা কী হবে?

এই গাঁয়ে গঞ্জে যেমন সব কিছু থেমে থাকে, নড়াচড়া নেই, কলকাতায় তেমনি আবার সবসময়ে সব কিছু কেবল চলছে। ধুন্ধুমার করে চলছে। কী শব্দ! কী হই-চই!

যাই বলো বাপু, ও আমার সয় না। ক'বার তো গেলুম। কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, একবার চিড়িয়াখানা। আমার মনে হয়, বেড়াতে খারাপ নয়, কিন্তু সারাক্ষণ থাকলে মাথা ধরে যাবে।

আমারও কি আর ভাল লাগবে! আমরা হলুম মাটি-ঘেঁষা মানুষ। সে কথা বলছি না। কিন্তু মাঝে মাঝে ইচ্ছে যায়, ওরকম ধুন্ধুমার কাণ্ডখানা কিছুক্ষণ বসে দেখি। চারদিকটা যেন বড় জীয়ন্ত মনে হয় কলকাতায়। আর এই বিষ্টুপুরের বাড়ির দাওয়ায় বসে থেকে থেকে কী মনে হয় জানো? এত নিস্তেজ, এত মরা চারধার যে, হঠাৎ চমকে উঠে ভাবি, ওরে বাবা, আমি মরে যাইনি তো!

পেট ভাঙল বুঝি! শব্দ পেলাম যেন!

অত ভাবছো কেন? বদহজম হলে ওরকম একটু হয়। কলেরা-টলেরা নয়। ভয় নেই। বরং পানের বাটাখানা নিয়ে এইখানে বোসো। একখানা পান সেজে খাও। দেখি।

পান খাওয়ার আর দেখার কী আছে?

আছে। সবকিছুর মধ্যেই দেখার জিনিস আছে। তুমি যখন পান সাজো তখন ভারি আদর করে, যত্ন করে সাজো। দেখতে বেশ লাগে। ইস্কুলে যখন পড়াতুম তখন একখানা বাংলা গল্প পড়াতে হত। তাতে ছিল, জাপানীরা যখন চা তৈরি করে তখন এত যত্ন নিয়ে করে, এত সুন্দর ভঙ্গীতে যে, সেটাও নাকি চেয়ে দেখার মতো ব্যাপার। তোমার পান সাজার মধ্যেও খানিকটা ওরকম কিছু আছে।

কী যে মাথামুণ্ডু বলো তার ঠিক নেই! সাদা পাতা দিয়ে একটু চুন জেবড়ে মুখে ফেলে দিই। দেখার যে কী আছে বুঝি না!

নয়নতারা পানের বাটা আনতে গেল। কিন্তু সহজে এল না। সংসারী মানুষ, একটা কাজ করতে গেলে সেটার সঙ্গে আর একটা জড়িয়ে পড়ে।

দুর্বল শরীরে একটু ঘুম-ঘুম পাচ্ছিল বিষ্ণুপদর। পেটে হাঁড়িকলসি ভাঙছে, জিব তেতো। শরীরটা জুত-এর নেই মোটেই। চোখ জুড়িয়ে যখন এল তখনই হঠাৎ মনে হল, ঘুমও কি ছোট করে মরণ? ঘুমোলে তো শরীরের বোধ মুছে যায়, সমাজ সংসার, আত্মীয়স্বজন সব মুছে যায়। মরণও তাই। তবে কি নিত্যি দিন ঘুমের মধ্যে আমরা একটু একটু করে মরি! মরণের পর কি সব ফক্কিকারি! মাথায় আজকাল কত কথাই আসে। উদ্ভুটে সব কথা। বিষ্ণুপদ বৈতরণীর কথা ভাবে, যমরাজার কথা ভাবে, স্বর্গ বা নরকের কথাও ভাবে। ওসব

কি আছে বটে? বিষ্ণুপদর তেমন বিশ্বাস হতে চায় না। তবে আছেটা কি? মানুষ জন্মায়, বাঁচে, তারপর মরে হারিয়ে যায়? তাহলে তো এর কোনও মানেই হচ্ছে না। বিষ্ণুপদর শাস্ত্রটাস্ত্র পড়া নেই, তবে আজকাল মনে হয়, এই জীবনটার একখানা মানে-বই থাকলে বড় ভাল হত। সহজ করে সব বোঝানো থাকত তাতে।

জানালাব সরু সরু শিকের ওপাশের বর্ষার জল পেয়ে সতেজ পেয়ারা গাছটার ডালপালা আর পাতা উঁকি দিতে থাকে। গাছ যেন হাসছে। খুব হাসছে। গাছখানার স্বর্গ-নরক নেই, কর্মফল নেই। এক ঠাঁই দিব্যি একটা গোটা জীবন কাটিয়ে যায়।

চটকাটা ভাঙল পুলিন ডাক্তারের ডাকে।

আবার কী বাধালে হে?

এসো ভায়া, বোসো। তোমাকে আবার এই বাদলায় ছেঁচড়ে আনল কেন?

বাদলা বলে কি আর হাত পা গুটিয়ে বসে আছি নাকি ঘরে? চাষবাস দেখতে হচ্ছে। তা খুব নাকি ক্ষীর খেয়েছো?

খুব রটেছে দেখছি। বলে উঠে বসে বিষ্ণুপদ। মাথাটা একখানা চক্কর মারল।

তা রটেছে। তোমার নাতি গিয়ে বলল, ক্ষীর খেয়ে পেট ছেড়েছে। জরুরি তলব।

বিষ্ণুপদ হেসে বলে, ছেলে শেষ খাওয়া খাওয়াচ্ছে হে। ত' আমারই বা আপত্তিটা কিসের? দিলুম ঠেসে। মরণ-বাঁচন ভগবানের হাত।

সবটাই ভগবানের ওপর ছেড়ে দিও না! মরণ-বাঁচনে তোমার আমারও একটু হাত আছে। ক'বার হয়েছে?

বার পাঁচেক হবে বোধহয়। বমিটমি নেই।

খিদে আছে?

শোনো পাগল ডাক্তারের কথা! খিদে থাকবে না কেন? এ কি বড়লোকের পেট? গরিবের পেটে সবসময়ে খিদে।

হরি বলো মন! তুমিই যদি গরিব তবে আমরা যাই কোথা! অত বড় বিলেত-ফেরত তালেবর ছেলে থাকতে তুমি গরিব কপচাচ্ছো? এও কি ধর্মে সয়?

বিষ্ণুপদ এক গাল হাসল। পুত্রগর্ব বলে একটা ব্যাপারও তো আছে! বলল, ছেলে তালেবর সে তার নিজের গুণে। আমার কোন গুণটা আছে বলো!

পুলিন প্রায় ঘরের লোক। সব খবরই জানে। তাছাড়া বিষ্টুপুরে সবাই সবাকার সব জানে। তালেবর ছেলে যে বাপ-মায়ের থেকে তফাত হয়েছে, তা কি আর গুহ্য কথা কোনও। পুলিন তার পেট টিপে দেখতে দেখতে বলল, টাকাপয়সা না হয় না-ই দিল, চোখের দেখা না হয় নাই দেখল, তবু তো ছেলে বটে হে! গত বিশ বছরে এ গাঁয়ে ওরকম ছেলে আর একটাও বেরিয়েছে? টাকাপয়সায় নও হে বাপু, তুমি অন্য দিকে বড়লোক।

একথাটা বিষ্ণুপদর খুব পছন্দ হল। মাথা নেড়ে বলল, সে খুব ঠিক কথা।

পুলিন পেটে আঙুলের খোঁচা দিচ্ছে বটে, কিন্তু সেটা অভ্যাসবশে। আসলে ডাক্তারি পরীক্ষা করছে না কিছুই। তাকে আজ কিছু কথায় পেয়েছে। বলতে লাগল, আমার দশাই কি কিছু ভাল? আগে তবু রুগী-পত্তর আসত, আজকাল ভোঁ ভাঁ। বটতলায় এক হাতুড়ে চেম্বার খুলেছে, হপ্তায় দুদিন বসছে এসে। শুধু এম বি বি এস ডিগ্রিটা ছিল বলে সেখানে পাকা কাঁঠালে মাছির মতো ভিড়, নাড়ীজ্ঞান নেই, মোট তেরোখানা ওষুধের

নাম জানে, লক্ষণ দেখে রোগ চিনতে পারে না, কিন্তু গাঁয়ের পয়সা বের করে নিয়ে যাচ্ছে। দু-দুটো ছেলেকে ডাক্তারি পড়াবো বলে ঠিক করে রেখেছিলুম, তা দুটো ষাঁড় ইস্কুল ডিঙোতেই হিমসিম খেয়ে গেল। কপাল! বুঝলে? কপাল! নাও, শুয়ে পড়ো দেখি।

বিষ্ণুপদ শুয়ে পড়ল।

পুলিন পেটে টোকা মেরে দেখল, বুকে পিঠে স্টেথোসকোপ দিল, নাড়ীও পরীক্ষা করল।

বিষ্ণুপদর খিদে পেয়ে রয়েছে। বলল, ওষুধের কথা থাক, পথ্যিটা কী হবে বলে তো! একটু ঝোলভাত খাবো নাকি?

তা খেতে পারো। পাঁচবার তো। ও কিছু নয়। বেশী করে জলটা খেও। ফুটিয়ে খেলেই ভাল। বর্ষাটা পেটের পক্ষে একেবারে যম। ওষুধটাও খেও। কয়েকটা ট্যাবলট দিয়ে যাচ্ছি।

নয়নতারার এতক্ষণে সময় হল আসবার। ঘরে ঢুকেই বলল, কেমন দেখলেন মানুষটাকে?

কিছু নয় তেমন। ক্ষীরের দেনা শোধ হচ্ছে। একদিক দিয়ে ভালই, কোষ্ঠটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

বড্ড নোলা হয়েছে ইদানীং। বারণ করলুম, তবু জোর করে ক্ষীর খেল।

আর বিশেষ খেও না হে বিষ্ণুপদ। কথা কি জানো! বুড়োরা যখন একে একে কেটে পড়তে থাকে তখন বেঁচে-থাকা বুড়োদের বড্ড একা লাগে। ভয়-ভয়ও করে। বুঝলে কথাটা?

বুঝেছি।

তুমি যদি এখন টিকিট কাটো, তাহলে আমার দশাটা কেমন হবে জানো? মনে হবে, এই রে, এবার আমার পালা বুঝি!

বিষ্ণুপদ খুব হাসল। বলল, এমনিতে যাবে না। পোক্ত শরীর। তবে কিনা ডাক এলে তো যেতেই হবে।

সেই কালঘড়ি না কোন গুষ্টির পিণ্ডি দেখেছিলেন, সেই থেকেই মাথা বিগড়েছে!

রামজীবন ফিরল সন্ধেবেলা। বাপের খবর শুনেই চলে এল বিষ্ণুপদর কাছে, বাবা! শেষে কি পিতৃঘাতক হলাম?

মুখ থেকে ভকভক করে কাঁচা মদের গন্ধ আসছে। বড্ড খারাপ গন্ধ। গা গুলোয়। বিষ্ণুপদ বলল, ওরে না! সে ব্যাপার নয়।

রামজীবন দুখানা পা সাপটে ধরল বিষ্ণুপদর। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমি কুলাঙ্গার! নেমকহারাম! একটু কষ্ট করে উঠে আমাকে জুতোপেটা করুন বাবা। দু গালে থাবড়া দিন।

মাতালের মনস্তাপও বড় সাঙ্ঘাতিক জিনিস! সহজে শেষ হতে চায় না। বিষ্ণুপদ দুখানা পা ছাড়ানোর একটা ক্ষীণ চেষ্টা করতে করতে বলল, আমার তেমন কিছু হয়নি। সকালে দুপুরে মিলিয়ে বার ছ-সাত হয়েছে। তাতে ভালই হয়েছে বাবা। পেটের গাদ নেমে গেছে। এ বেলা শরীর বেশ ঝরঝরে।

কিন্তু এত কথার পরও রামজীবনের কান্না থামে না, আমার মত পাপী কি আর আছে? শালার এই ভাঙা ঘরে আপনাকে ফেলে রেখেছি! পাকা ঘর তুলে তাতে রাখব বলে কতকাল ধরে চেষ্টা করছি। আপনি মরে গেলে পাকা ঘর দিয়ে আমার কী হবে!

মরার এখনই কি! পুলিন ডাক্তারও দেখে গেছে, বলেছে কিছুই হয়নি। অত ভাবছিস কেন?

কিন্তু রাঙা যে বলল, ক্ষীর খেয়েই নাকি আপনার ভেদবমি শুরু হয়েছে।

ওরে না। ক্ষীর বলে কথা নয়। বর্ষাকালটা এরকমই হয়। নতুন জল তো!

আজ যে আমি জ্যান্ত শোল মাছ এনেছি। সেটা খাবে কে?

শোল মাছের কথায় বিষ্ণুপদ চাঙ্গা হয়ে উঠল। তার অতি প্রিয় মাছ। তেজী গলায় বলল, এনেছিস? খুব ভাল করেছিস। আজ তো পেটটা ধরেই গেছে। সাঁতলে রাখুক, কাল খাবোখন।

নয়নতারা ঘরে ছিল না। কিন্তু শুনেছে ঠিক। বাইরে থেকেই উঁচু গলায় বলল, শোল মাছ খাবে! মাথাটা কি একেবারেই গেছে নাকি? তোমার ওই পেটে শোল মাছ সাক্ষাৎ বিষ।

রামজীবন হাহাকার করে উঠল, ও কথা বোলো না মা। শোল মাছ আমি বাবার নাম করে কিনে এনেছি।

তার চেয়ে বাপকে একটু সেঁকো বিষ এনে দে। ল্যাঠা চুকে যায়।

বিষ্ণুপদ গলাটা নামিয়ে রামজীবনকে বলল, অত সোরগোলের দরকার নেই। বউমাকে বলিস, তেলঝাল দিয়ে রেঁধে রাখতে। এক ফাঁকে কাল ঠিক খেয়ে নেবো। মুলো দিয়ে শোল অমৃত। তা এ তো মুলোর সময় নয়।

মুলো দিয়ে খাবেন বাবা! আজকাল সব সময়ে সব কিছু পাওয়া যায়। কাল ভোরে গিয়ে জাগুলিয়া থেকে নিয়ে আসব।

আধ ঘণ্টা বা চল্লিশ মিনিট—কতক্ষণ কে জানে—বিষ্ণুপদর আজকাল আর সময়ের হিসেব থাকে না—রামজীবন পা দুখানা বুকে চেপে ধরে রইল। তারপর নয়নতারা আর পটল মিলে প্রায় জোর করে তুলে নিয়ে গেল রামজীবনকে। তারপরও বিষ্ণুপদ শুনতে পেল, নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে রামজীবন মেলা কান্নাকাটি করছে। নানা দুঃখ উথলে উঠছে এখন তার। হঠাৎ বৃষ্টি নেমে সব শব্দ ডুবিয়ে লি।

সারা রাত ধরে তুমুল বৃষ্টির শব্দ শুনতে পেল বিষ্ণুপদ। আজকাল মাঝে মাঝে অসময়ে ঘুমিয়ে পড়ে, মাঝে মাঝে বায়ু চড়া হয়ে সময়েও ঘুম আসতে চায় না। আজ রাতে বায়ু চড়েছে।

খুব ভোরে, ভাল করে আলো ফোটবার আগেই বিষ্ণুপদ দাওয়ায় এসে বসল। একটু ধরেছে বৃষ্টিটা। তবে আকাশ মুখিয়ে রয়েছে এখনও। উঠোনে হাঁটুজল দাঁড়িয়ে গেছে। ঘরে জল, দাওয়ায় জল। এত জল বহুকাল হয়নি। আগে এই জলে গাঁ ভেসে যেত। আজকাল একটা নিকাশী খালের দরুন ততটা হচ্ছে না। কিন্তু তেমন ভারী জল হলে বিপদ।

রামজীবনের পাকা ঘরের অবস্থাও বড় করুণ। ইরফান সাতদিন ধরে কাজ বন্ধ রেখেছে। এই বাদলায় গাঁথনি থাকছে না, মশলা ধুয়ে যাচ্ছে। ঘরে কয়েক বস্তা সিমেন্ট পড়ে আছে। ভিজে ভিজে জমে না পাথর হয়ে যায়!

রোজকার মত আজও আধখ্যাঁচড়া ভূতুড়ে বাড়িটা বিষ্ণুপদকে মুখ ভ্যাঙচায় যেন, কী বুড়ো, থাকবি পাকা ঘরে? আয় থাকাচ্ছি! কালঘড়ি তো আয়ু খেয়ে ফেলল তোর। এরপর যখন ফুরুত হয়ে যাবি তখন ঘর কোথা পাবি বুড়ো? খুব ক্ষীর সাঁটাচ্ছিস, শোল গিলছিস, শরীরে আহুতি দিচ্ছিস, ক'দিন পর তো শরীরখানা পুড়িয়ে ছাই করে সেই ছাই জলে ভাসিয়ে দেবে? কে খাবে বাবা শোলমুলো, কে থাকবে বাবা পাকা ঘরে?

ঘরখানার সঙ্গে বিষ্ণুপদর একটা আড়াআড়ি আছে। তাকে সইতে পারে না ঘরটা। সেই জন্যই কি কাজ আটকে থাকে? এ বড় অলক্ষুণে ব্যাপার হল।

বর্ষাটা ছাড়লে বাড়ি ভাগ হবে। আমিন আসবে। মাপজোখ হবে। ছেলেমেয়েরা আসবে। গাঁয়ের মাতব্বররা সব সাক্ষী হবে। ছেলে কৃষ্ণজীবন আর দুই মেয়েকে চিঠি দিয়েছে বিষ্ণুপদ। কঠিন হল শিবচরণ। আজ বছর সাত-আট হল সে বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গেছে! তার কথা আজকাল আর মনেই পড়ে না বিশেষ। বরাবর কিছু ডাকাবুকো ছিল, লেখাপড়ায় মাথা ছিল না। কিন্তু বড় হওয়ার শখ ছিল খুব। গাঁয়ে থেকে কিছু হচ্ছে না, প্রায়ই বলত। তারপর একদিন নিজের জিনিসপত্র নিয়ে, বাড়ির কিছু পুরনো কাঁসার বাসন, নয়নতারার দুটি সোনার দুল, ঘটে জমানো পয়সা, রাঙার বিয়েতে পাওয়া রূপোর চুটকি, রামজীবনের ঘড়ি এইসব জিনিস চুরি করে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেল। খোঁজখবর করা হয়েছে, লাভ হয়নি।

এলেম থাকলে পালিয়ে গিয়ে কেউ কেউ ভাগ্য ফিরিয়ে আসতে পারে। শিবচরণ পারবে কিনা কে জানে! কিন্তু যদি হেরো হয়ে একদিন ফিরে আসে তবে এ বাড়িতে তিষ্ঠোনো মুশকিল হবে।

শিবচরণ সম্পর্কে আর একটা ভাবনাও আছে। মরে-টরে যায়নি তো! যদি গিয়ে থাকে তবে খবরটা জীবৎকালে পেতে চায় না বিষ্ণুপদ। নিরুদ্দেশ থাকাই ভাল। খারাপ খবর-টবর না এলে ধরে নেওয়া যাবে, ভালই আছে। হয়তো করে-কর্মে খাচ্ছে। কে জানে, হয়তো বিয়েও করেছে, ছেলেপুলে হয়েছে!

নয়নতারা আগে খুব কাঁদত শিবচরণের জন্য। আজকাল বোধহয় ভাটা পড়েছে একটু।

আজ বেহানবেলায় হারানো ছেলের কথা মনে হতে বিষ্ণুপদ ভাবল, এ বাড়িতে তো শিবচরণেরও ভাগ আছে। কথাটা মনে রাখতে হবে।

১৭

জানালা দুরকম হয়। কোনও জানালায় দৃশ্য থাকে, কোনওটায় থাকে না। চয়নের জানালায় কোনও দৃশ্য নেই। তার একতলার ঘরখানা খুবই অন্ধকার। একটাই দরজা ভিতরদিকে, একটাই জানালা বাইরের দিকে। জানালার ওপাশে একটা সংকীর্ণ গলি, তার ওপাশে দেয়াল। নিরেট দেয়াল, নোনাধরা। জানালার পুরনো শিক আর জং ধরা এক্সপাণ্ডেড মেটাল লাগানো। দিনেই আলো জ্বালতে হয়। তবে এ ঘরের ইলেকট্রিক লাইন কেটে দিয়েছে চয়নের দাদা। বাড়ির পিছন দিককার সবচেয়ে খারাপ, ড্যাম্প ধরা, অন্ধকার ঘরখানায় থাকে চয়ন আর তার মা। চয়ন এ ঘরে পড়াশুনো করতে হলে জানালার ধারে বসে করে। এ ঘরেই স্টোভ জ্বেলে তার আর মায়ের রান্না হয়। এক চিলতে উঠোনে চৌবাচ্চা আছে। তাতে করোরেশনের জল আসে। জল ব্যবহারের ওপর কড়া বিধিনিষেধ আছে। সকাল আটটার মধ্যে তাদের স্নান করে নিতে হয়। ছাদে যাওয়া বারণ বলে ভেজা কাপড় শুকোতে হয় ঘরের মধ্যেই। সাবান কাচা সম্পূর্ণ নিষেধ।

জানালায় দৃশ্য থাক বা না-থাক, ঘরে থাকলে চয়নের বেশীর ভাগ সময়ই কাটে জানালার ধারে বসে। এ ঘরের যেটুকু আলো তা ওই জানালার সুবাদেই পাওয়া যায়। এই পিছনের গলিটা সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য নয়। আগে খাটা পায়খানার আমলে মেথর আসবার রাস্তা ছিল, আজকাল খিড়কির রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করে অন্য বাড়ির লোক। মাঝখানে গলিতে ময়লা ফেলা শুরু হয়েছিল, সেটা চয়ন চেঁচামেচি করে পাড়ার হস্তক্ষেপে বন্ধ করেছে। তবু কিছু কিছু অশ্লীল জিনিস গলিতে নিক্ষিপ্ত হয়। কাকেরা টানা-হ্যাঁচড়া করে।

মলিন আলোটুকু বই পড়তে বা লিখতে কাজে লাগে চয়নের। দুপুরে জানালার খাঁজে বসে কোলে বই বা খাতা নিয়ে সে ডুবে যায় নিজের কাজে বা চিন্তায়। ওই গলিপথেই একদিন দুপুরে উদয় হল আশিস বর্ধন।

কি মশাই চিনতে পারছেন?

চয়নের স্মৃতিশক্তি চমৎকার। কোনও নাম বা মুখ সহজে ভোলে না। সে একটু অবাক হয়ে বলে, চিনতে পারছি। আপনি আশিসবাবু, এল আই সিতে কাজ করেন। মেশিন ডিপার্টমেন্ট। কিন্তু গলি দিয়ে এলেন কেন? এদিক দিয়ে তো এ বাড়িতে ঢোকার রাস্তা নেই।

সে জানি। তবে আপনার কথা থেকে আঁচ করেছিলাম যে, সদর দিয়ে ঢোকা একটু আনসেফ। ঢোকার দরকারও নেই। এখান থেকেই কথা বলে চলে যাই। বলে প্যান্টের পকেট থেকে একটা কাগজের পুরিয়া বের করে এক্সপাণ্ডেড মেটালের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিয়ে বলে, ধরুন। কালো তাগায় বেঁধে পরবেন।

কী এটা?

মাদুলি। হাবড়ার এক তান্ত্রিকের দেওয়া।

চয়ন মৃদু একটু হেসে বলে, তাবিজ-কবজ তো অনেক হয়ে গেল। কাজ হয়নি কিছু।

আশিসও হাসল, ওসবে আমারও বিশ্বাস নেই। তবে মানুষ তো সব রকম চেষ্টাই করবে। আমিও যে যা বলে করে যাই, বোনটার জন্য। মৃগী না সারলে বিয়ে দেওয়া যাবে না, আর বিয়ে না হলে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

আপনার বোনের কি মাদুলিতে কাজ হয়েছে?

মনে হয় হতেও পারে। গত পনেরো দিন তো অজ্ঞান হয়নি। দেখা যাক।

চয়ন কুণ্ঠিতভাবে বলে, আপনি এত কষ্ট করলেন! দাঁড়ান, আমি জামাটা পরে আসছি।

আশিস বর্ধন জানালার কাছে এসে ঘরের মধ্যে একটু উঁকি দিয়ে বলল, এইটাই বুঝি আপনার আর আপনার মার ঘর?

চয়ন মৃদু হেসে বলে, হ্যাঁ। বাদবাকি বাড়িটা আমাদের কাছে নিষিদ্ধ। সেইজন্য—

আরে ব্যস্ত হবেন না। এসব সিচুয়েশন আমার জানা আছে। মা বুঝি ঘুমোচ্ছেন! খুব রোগা তো!

সরু চৌকির ওপর পড়ে থাকা মায়ের দিকে একবার তাকায় চয়ন। বলে, হাড় ক'খানা অবশিষ্ট আছে। মায়ের অনেক রোগ, চিকিৎসা তো হয় না। পড়ে থাকে নির্জীব হয়ে। মাঝে মাঝে মনে হয়, মরে-টরে গেছে বুঝি।

রোগটা কী?

মার চোখে ছানি। প্রেশার খুব বেশী। হার্টও বোধ হয় ভাল নয়। বাত।

আপনাদের রান্না করে কে?

কিছুদিন আগেও মা পারত। আজকাল আমি করি। একটা কুকার ছিল বাবার আমলের। সেইটে কাজে লাগছে।

দাদা বউদির সঙ্গে সম্পর্কটা এখন কেমন?

সম্পর্ক নেই। দেখা হলেও কথাবার্তা হচ্ছে না।

বকাঝকা বা পরোক্ষ গালাগাল?

চয়ন মৃদু হেসে বলে, আগে হত। আজকাল সেদিক দিয়ে পিসফুল। আপনাকে তো এত কথা বলিনি, জানলেন কি করে?

বেশীর ভাগ অভাবের সংসারের ছবিটা একই রকম কিনা। আমি সেদিন আপনার বাড়ির ঠিকানা চাওয়ায় আপনি একটু দোনোমোনো করেছিলেন এবং অসময়ে আসতে বারণ করেছিলেন, তখনই আন্দাজ করে নিয়েছিলাম। কিছু মনে করলেন না তো!

বিবর্ণ একটু হেসে চয়ন বলে, না না, আপনি তো সিমপ্যাথাইজার।

একজ্যাক্টলি। কারণ আমার দাদা আমাকে আপনার চেয়েও একটু বেশী করেছিল। লাথি মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল।

চয়ন চেয়ে রইল লোকটার দিকে।

আশিস ম্লান হেসে বলল, অবশ্য দোষটা আমারই ছিল। দাদার জায়গায় আমি হলেও হয়তো তাই করতাম। যাকগে। তবে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়াতেই কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে যেতে পেরেছি। নইলে একদম

বখে গাড্ডায় চলে যেতাম।

দাদার সঙ্গে আপনার আর সম্পর্ক আছে?

পরে রিকনসিলিয়েশন হয়েছিল, তবে সংসার তো আর এক হয়নি। শত্রুতাও নেই।

কিন্তু আপনি গলিতে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন, আমার খুব অভদ্রতা হয়ে যাচ্ছে। দাঁড়ান, জামাটা গায়ে দিয়ে আসছি।

একবার বেরোলে ঢুকতে পারবেন তো! সদর বন্ধ বা খোলার ব্যবস্থা কি আপনার হাতে আছে?

চয়ন মলিন মুখে মাথা নেড়ে বলে, না। বউদি ওপরে ঘুমোচ্ছে। সদর খুলে বেরোলে দরজা টেনে দিলে লেগে যাবে। কিন্তু ফের ঢুকতে হলে ডোরবেল বাজাতে হবে। তবে অসময়ে ফিরলে আমি এই জানালায় এসে মাকে ডাকি। মা খুলে দেয়। তবে মার কষ্ট হয়।

তাহলে বেরোনোর দরকার নেই আপনার। আমি যাচ্ছি।

আরে না। আমার টিউশনিতে যাওয়ার সময় তো হয়ে এল।

তাহলে আসুন। আমি রাস্তায় অপেক্ষা করছি।

তার নতুন একজন বন্ধু হল কিনা তা বুঝতে পারছে না চয়ন। আগে ইস্কুল-কলেজে তার অনেক বন্ধু ছিল। আজকাল বিশেষ কেউ নেই। সে কোনওদিন চায়ের দোকানে বা পাড়ার ঠেক-এ আড্ডা দিতে যায়নি। তার শরীর দেয় না, তার সময়ও হয় না। প্রাণপাত বন্ধুত্ব তার সঙ্গে ছিলও না কারও। সে অনেকটাই একা, সঙ্গহীন। আশিস তার চেয়ে বেশ কয়েক বছরের বড়, তবু যদি বন্ধুত্ব হয় তাহলে খারাপ লাগবে না চয়নের। তার বোধ হয় এখন একজন বন্ধুই দরকার।

পোশাক বলতে প্যান্ট, জামা আর চপ্পল। পরতে দুমিনিট লাগে। বেরোনোর আগে একবার মাকে ডেকে বলে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু মা এত অকাতরে ঘুমোচ্ছ যে, ডাকতে ইচ্ছে হল না। এরকম ঘুমের মধ্যেই মা একদিন চলে যাবে বোধ হয়। সেদিন চয়ন আরও একটু একা হয়ে যাবে।

বাইরে মেঘলা আকাশ। ভ্যাপসা গরম।

আশিস বলল, আজ টিউশনি কোন দিকে? সাউথে কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। গোল পার্কের কাছে, সেদিন যেখানে যাচ্ছিলাম।

ছাত্র না ছাত্রী? ছাত্রীই যেন বলেছিলেন!

হ্যাঁ।

বড়লোক নাকি?

পয়সায় তেমন নয়। তবে ছাত্রীর বাবা বড় সায়েন্টিস্ট। নাম আছে।

কী নাম বলুন তো!

কৃষ্ণজীবন বিশ্বাস। কাগজে লেখেন-টেখেন। এনভিরনমেন্টের ওপর।

আশিস বর্ধন মাথা নেড়ে বলল, জানি। বিখ্যাত লোক। ইংরিজি কাগজে লেখা পড়েছি। কি রকম দেয় আপনাকে?

আড়াই।

কমই দিচ্ছে। বাসভাড়াটা বাদ দিন, কী থাকছে বলুন!

এর বেশী চাইতে ভয় করে। হয়তো টিউশনিই পাব না।

দুর মশাই! বরং উল্টো। যত দাম বাড়াবেন তত ডিমান্ড হবে। আমি তো এক গুজরাতির ছেলেকে পাঁচশো টাকাতেও পড়িয়েছি।

ও বাবা!

আজকাল আর ওই উঞ্ছবৃত্তি করি না। তবে আমার আর একটা সাইড বিজনেস আছে। শেয়ার বাজারের ব্রোকারি।

সেটা কী ব্যাপার?

সেটা খুব ভাল ব্যাপার। একটু মেধা আর ক্যালকুলেশনের দরকার হয়। কিছু টাকাও খাটাতে হয়। লেগে থাকলে অনেক পয়সা। করবেন?

চয়ন খুব লাজুক দৃষ্টিতে আশিস বর্ধনের দিকে একবার তাকায়। পৃথিবীর কত কিছুই সে পারে না। পারবেও না ইহজন্মে। সে স্মিত মুখে চুপ করে রইল।

আশিস বর্ধন তার মনের কথাটা যেন পড়ে নিল। বলল, পারবেন না তো! বাঙালির ছেলেরা ওসব রাস্তায় যেতে চায় না। তারা চায় সেফ প্রফেসন। যাকগে, মাদুলিটা পরবেন কিন্তু। একটু নিয়ম আছে। শনিবার সকালে একটু কাঁচা দুধে ধুয়ে নিয়ে কালো কার বেঁধে পরবেন। কাজ হলে হবে। না হলেও ক্ষতি নেই। তাই না?

এর দাম?

দুর মশাই! পাঁচ সিকে দক্ষিণা দিয়েছি। আপনাকে কিছু দিতে হবে না। তান্ত্রিকটার পয়সার লালচ নেই, সেইজন্যই ভরসা হল, কাজ হতেও পারে। চলুন, চা খাই কোথাও বসে।

সম্পর্ক জিনিসটা চয়ন কখনও রচনা করতে পারে না। আপনা থেকেই রচিত হয়ে যায়। বেশীরভাগ সময়েই সেটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক নয়। এই যে আশিস বর্ধন, এইমাত্র চয়ন বুঝতে পারছে, এর সঙ্গেও তার বন্ধুত্ব হবে না। লোকটি মেধাবী, করিৎকর্মা এবং শক্তিমান। এর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হবে কি করে? সম্পর্কটা উপকারী ও উপকৃতের। অনুগ্রহকারী ও অনুগৃহীতের, উপদেষ্টা ও উপদিষ্টের। এ লোকটা সেদিন তার কিছু উপকার করেছিল এবং আরও কিছু উপকার করতে চেয়েছিল। আজও বাড়ি বয়ে মাদুলি দিয়ে গেল। চয়নের কৃতজ্ঞতাবোধ বড়ই বেশী। কেউ তার জন্য সামান্য কিছু করলেও সে গলে যায়। এই মনোভাব নিয়ে কি বন্ধুত্ব হয়!

আশিসকে নিয়ে পাড়ার কালোর চায়ের দোকানে বসল চয়ন। এ দোকান তার ঠেক নয়। তবে অনেকদিন এ পাড়ায় থাকার সুবাদে চেনা। চা খুবই ভাল বানায় এরা। আশিসকে চা আর ওমলেট খাওয়াল চয়ন। খাওয়াল, কিন্তু দামটা দিতে পারল না। কারও সঙ্গে সে জোর জবরদস্তিতে পেরে ওঠে না। আশিস জোর করেই দামটা মেটাল। খুব হীনম্মন্যতা কষ্ট পেতে লাগল চয়ন।

আশিস বলল, আমি সাউথেই যাচ্ছি। চলুন নামিয়ে দিয়ে যাই। ট্যাক্সি নেবো।

চয়ন আবার আর একটা কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হয়ে পড়তে চাইল না। পৃথিবীর শক্তিমান লোকগুলোর ওপর ইদানীং তার খুব রাগ হয়।

চয়ন মৃদু হেসে বলে, এখনও ঢের দেরি। আমি একটু পরে যাবো।

চলুন, আগেই বেরোই। এই ফাঁকে আমার বাড়িতে ঘুরে আসবেন।

বাড়িতে! বলে চয়ন ভাবিত হয়। এত অল্প পরিচয়ে বাড়ি নিয়ে যেতে চায় কেউ?

আরে অত ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন! আমি দ্রুত বন্ধুত্বে বিশ্বাসী।

দ্রুত-বন্ধুত্ব!

এ যুগে যা করার তা চটপট সেরে ফেলতে হয়। আমাদের আয়ু কম, সময় কম, অবসর কম, বন্ধুত্ব করার জন্য বেশী ভ্যানতারার স্কোপ কোথায় বলুন! আমি তাই চটপট বন্ধুত্ব করে ফেলি। তাতে দু-চারটে সন্দেহজনক ক্যারেকটারও যে জোটে না তা নয়। তবে মোটের ওপর আমি ঠকিনি। আর আপনারও চিন্তার কিছু নেই। চলুন। সবসময়ে অত সংকুচিত হয়ে থাকবেন না। সবসময়ে যদি নিজের ডেফিসিয়েন্সিগুলোর কথাই ভাবতে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে, নিজের কাছেই নিজে বাতিল হয়ে বসে আছেন। তাহলে দুনিয়া আপনাকে পাত্তা দেবে কেন বলুন!

চয়ন লোকটার দিকে আর একবার চোরাচোখে তাকাল। লোকটি সদাশয়, সে আগের দিনই বুঝেছিল। কিন্তু এর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হবে দাতা ও গ্রহীতার। এ তার অনেক উপকার করবে এবং করতেই থাকবে। বন্ধুত্বের জন্য আর একটু সমানে সমানে হওয়া দরকার। তবু জীবনে যা আসে তাই নেওয়া ছাড়া কী আর করার আছে তার?

সে বলল, চলুন।

ট্যাক্সিতে চড়াটা চয়নের কাছে বেশ একটা অপব্যয় বলে মনে হয়। কলকাতায় এত বাস ট্রাম, তা সত্ত্বেও ট্যাক্সি চড়ে তারাই যাদের বিস্তর ফালতু পয়সা আছে! আশিস বর্ধনও মনে হচ্ছে, বিস্তর ফালতু পয়সার মালিক।

ধীরে ধীরে আশিস বর্ধনের ছবিটা পরিষ্কার হচ্ছে তার কাছে। আশিস বর্ধন চটপট বন্ধুত্বে বিশ্বাসী, চয়ন তা নয়। আসলে চয়ন তো বন্ধুত্ব গড়েই তুলতে পারে না আজকাল, হীনম্মন্যতা ভোগে বলে। কিন্তু মানুষকে সে খুব লক্ষ করে। তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ছাড়াও তার আর যেসব খামতি বা বাড়তি, খুঁটিনাটি সব কিছু। লোকে বুঝতেই পারে না, চয়নের চোখে গোয়েন্দার পর্যবেক্ষণ আছে।

ট্যাক্সিতে বসে আশিস বলল, চাকরি পেলে করবেন?

এখনই। হাতে আছে?

আরে না। বলে হাসল আশিস, চাকরি কি হাতে থাকে নাকি? তবে আমি শেয়ারের ব্রোকার তো, বিজনেসম্যানদের চিনি। আমারই খদ্দের সব। এদের কারও কম্পানিতে হয়ে যেতে পারে। তবে কিনা মাইনে খুব কম, খাটুনি বেদম। আসলে দেশে এত বেকার আর এই বাঙালি ছেলেগুলো চাকরি ছাড়া আর কিছু করতে চায় না বলে, এইসব লোকেরা সুযোগটা নেয়। তিনশো চারশো টাকায় বারো ঘণ্টা খাটিয়ে নিচ্ছে।

চয়ন মলিন মুখে বলে, জানি। আমি ওরকম পেরে উঠবো না।

চাকরির বাজার খারাপ। তবু আপনার বায়ো-ডাটাটা আজ লিখে দেবেন তো আমাকে।

চয়ন বলল, আপনি আমার জন্য অনেক কিছু করছেন। আমি তো কিছুই প্রতিদান দিতে পারছি না।

আপনি মশাই, খুব খারাপ লোক।

তাই বুঝি?

খারাপ ছাড়া কী! এখনও দূরত্বটাই ঘোচাতে পারলেন না। এইসব ছোটোখাটো পরিচয়গুলোকে উপেক্ষা করবেন না। এভাবেই ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, ভাব ভালবাসা আসে, আর এ থেকেই জাতীয় সংহতি। বুঝলেন?

বলেই আশিস হেসে ফেলল।

চয়ন সহজে কারও সঙ্গে ঠাট্টা রসিকতা করে না। কিন্তু এই সহজ লোকটাকে সে বলে ফেলল, আপনিও খারাপ লোক। আমাকে চা ওমলেটের দাম দিতে দেননি।

হবে হবে, বিস্তর চা ওমলেট খাওয়া যাবে। খাওয়ার এই তো শুরু।

যাদবপুরের একটু ভিতরদিকে কলোনির মধ্যে আশিস বর্ধনের দোতলা বাড়ি। একটু জমি আছে সামনে আর পিছনে। মেলা গাছ। যেটুকু জমি পেয়েছে ঘন বুনটে গাছগাছালি লাগিয়েছে। ফলন্ত কুমড়ো, লঙ্কা, ঢ্যাঁড়স দেখতে পেল চয়ন। আরও আছে।

বাড়িতে ঢোকার আগে বর্ধন তাকে বাগানটা দেখাল, এই এরাই আমার প্রাণ। এইসব গাছপালা, জীবনে এই একটাই আমার হবি, নিজের লাগানো গাছের সবজি বা ফল খাওয়া, নিজের গাছের ফুল দিয়ে ঠাকুরপুজো করা। জমি থাকলে আরও কত কী করতাম! আসুন ভিতরে।

একজন এপিলেপটিকের সঙ্গে আর একজন এপিলেপটিকের পরিচয় কি অন্যরকম কিছু ঘটনা? কোনও টেলিপ্যাথি হয়? বা বিশেষ ধরনের সমবেদনা? কে জানে কী! তবে আশিসের হাঁকডাকে যখন জনা তিনেক মহিলা আর দুটো বাচ্চা এসে বৈঠকখানায় জড়ো হল তখন লজ্জায় নতমুখ চয়নও টের পেল, তাকে সবচেয়ে নিবিড় ভাবে লক্ষ করছে যে মেয়েটি, সে হল আশিসের ওই এপিলেপটিক বোন, রোগা দাঁত-উঁচু ফ্যাকাশে মেয়েটিকে দেখলেই বোঝা যায়, অসুস্থ। একবারের বেশী তাকায়নি চয়ন। তবু দেখে নিয়েছে, মেয়েটির মাথায় অনেক চুল, আর চোখ দুখানা ভারি টানা টানা।

এরা বেশ ভাল পরিবার। বেশী এটিকেট নেই। ঝুপঝাপ সবাই বসে পড়ল। হই হই করে কথা বলতে লাগল।

চয়নের কথা আসে না। স্মিত মুখে চুপচাপ বসে থাকতেই সে ভালবাসে। একজন এপিলেপটিক কি আর একজন এপিলেপটিককে দেখে ভরসা পায়? জীবনের ওপর বিশ্বাস ফিরে পায়? আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে? এপিলেপটিকরা কি পরস্পরকে আশ্বস্ত এবং আরোগ্য করে তুলতে পারে! তার কেন যেন সন্দেহ হচ্ছে, নিজের মৃগী রোগী বোনের জন্যই তাকে বাড়িতে এনেছে আশিস। হয়তো তাকে দেখিয়ে বোনের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা।

আশিসের বউ চা আর খাবার করতে গেল। আশিসের মা গেল নাতি আর নাতনি সামলাতে? আশিস গেল বাথরুমে। রইল শুধু মেয়েটি।

আমার নাম রাকা। আপনার কথা দাদা খুব বলে।

বলার মতো কী? আজ তো দ্বিতীয় দিনের পরিচয় মাত্র।

কী জানি কেন বলে! ওর আবার যাকে ভাল লাগে, তাকে এক মিনিটেই লাগে।

ওঁর সঙ্গে একদিনের মাত্র আলাপ, তাও আমার পক্ষে লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে। আমি রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।

দাদা সব বলেছে। আমারও তো ওরকম হয়। ইস্কুলে কলেজে ক্লাস করতে করতে কতবার হয়েছে। একবার রাস্তায় আর একবার ট্রামেও হয়েছিল। দাদা কিন্তু তা বলে আমাকে বেরোতে বারণ করে না। বরং বলে, না বেরোলে কনফিডেন্স থাকবে না। ওর ভীষণ কনফিডেন্স জানেন তো!

জানলাম। উনি আমাকে আজ একটা মাদুলি দিয়ে আসতে গিয়েছিলেন।

মেয়েটি হাসল, তাও জানি। ও এমনিতে ভীষণ নাস্তিক, কিন্তু অসুখ-বিসুখের বেলায় কিছুই ছাড়ে না, সব বাজিয়ে দেখে। আপনি মাদুলিটা ধারণ করবেন কিন্তু। আমার মনে হচ্ছে একটু কাজ হয়েছে।

করব। তবে গত একমাস আমার অ্যাটাক হয়নি। একজন বড় হোমিওপ্যাথকে দেখাচ্ছি। বোধ হয় কাজ হচ্ছে তাতেও।

দুজনেই দুজনের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ নীরবে। তারপর দুজনেই একসঙ্গে হেসে ফেলল।

রাকা বলল, আসলে কিসে যে সত্যিকারের কাজ হবে কে জানে! ফ্রিকোয়েন্সিটা কমলেই যেন হাতে চাঁদ পাই। তাই না বলুন!

চয়ন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তা তো ঠিকই। কিন্তু যখন দীর্ঘ দিন গ্যাপ যায় তখন ভীষণ টেনশনও শুরু হয়, এই বুঝি হবে! এই বুঝি হবে!

উঃ, আপনার সঙ্গে আমার দারুণ মিল! আমারও ঠিক এরকমই হয়।

বিকেলটা হাসিতে গল্পে বেশ কেটে গেল চয়নের। অনেকদিন বাদে কিছুটা সময় এমন ভাল কাটল তার। আশিস তাকে বাসরাস্তা অবধি এগিয়ে দিয়ে বলল, দেখলেন তো, এসে ঠকেননি! এ যুগে চটপট বন্ধুত্ব করে নেওয়া ভাল, নইলে ভ্যানতাড়ায় আয়ুক্ষয় হয়ে যায়। চলে আসবেন যখন তখন, অলওয়েজ ওয়েলকাম।

অটোমেটিক লিফটে মোহিনীদের সাততলার ফ্ল্যাটে উঠবার সময় মনে মনে একটা ভারি উচ্চকোটির ভাব হচ্ছিল তার। মনটাও যেন লিফটে করে অনেক ওপরে উঠে বসে আছে আজ। নামতে চাইছে না।

চার বা পাঁচ তলায় কেউ লিফ্‌ট্‌টা থামাল। চয়ন চোখ বুজে তার আনন্দিত অভ্যন্তরটাকে অনুভব করার চেষ্টা করছিল। লিফ্‌ট্‌টা থামতেই চোখ খুলল। কিন্তু তাকে আপাদমস্তক শিহরিত করে চোখে ঘনিয়ে আছে কুয়াশা। একটা ট্রেনের শব্দ এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা থরথর করে কাঁপছে।

না, আজ কিছুতেই অজ্ঞান হওয়া চলবে না তার। কিছুতেই না। যেমন করেই হোক তাকে আজ জেগে থাকতেই হবে। দরজাটা খুলতেই তাই সে কুয়াশায় আবছা চোখেই দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কেউ উঠছিল, তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে এল সে করিডোরে। তারপর সিঁড়ি ধরে ছুটতে ছুটতে উঠতে লাগল সে, না আমার কিছু হয়নি! কিছু হয়নি! আমি ভাল আছি!.....ভাল আছি.....

একটা ল্যান্ডিং অবধি উঠতে পেরেছিল সে। তারপর দড়াম করে পড়ল। সিঁড়ি দিয়ে খানিক গড়িয়ে, তারপর টেরচা হয়ে রেলিং-এ লেগে স্থির হল তার শরীর। ওইভাবেই পড়ে রইল। প্রায় পনেরো মিনিট বাদে তাকে আবিষ্কার করলেন মিসেস মেহতা। তিনি খবর দেওয়াতে, মোহিনী আর রিয়া নেমে এল।

১৮

বীণাপাণির বিপদের কথা কেউ জানে না। কেউ না। কত বড় বিপদ নিয়ে যে সে বাস করছে আজকাল। সবসময়ে বুক এত ঢিবঢিব করে যে, বুকের ব্যামো না দাঁড়িয়ে যায়। সে ভাল করে ঘুমোতে পারে না, খেতে পারে না। মনটায় সবসময় অশান্তি। আজকাল রিহার্সালে তার পার্টও ভুল হয়।

সেদিন এক চুলের জন্য বেঁচে গেছে বীণাপাণি। শেষ রাত্তিরে যখন কাকা তার স্মাগলার কয়েকজন সাকরেদ নিয়ে এসে হাজির হল সেদিনই হয়ে গিয়েছিল বীণার। ভয়ে সে দরজা খুলবে কি, নিমাইয়ের হাত শক্ত করে চেপে ধরে বলে ফেলেছিল, আমার বড্ড ভয় করছে!

নিমাই অবাক হয়ে বলল, ভয়ের কী? ও তো কাকার গলা।

তবু করছে। তুমি দরজা খুলো না।

নিমাই ডবল অবাক হয়ে বলে, খুলবো না! বলো কী? কাকা আমাদের অন্নদাতা, কোন বিপদে পড়ে এসেছে, দরজা না খুললে কি হয়? বলে নিমাই সাড়া দিয়ে বলল, কাকা নাকি? এই খুলছি।

দরজার শব্দ বন্ধ হল।

নিমাই যখন মশারি তুলে বেরোচ্ছে, তখন বীণাও চৌকির অন্য পাশ দিয়ে নামল। তারপর নিচু হয়ে চৌকির তলা থেকে কাপড়ে বাঁধা একটা পুঁটলি টেনে নিয়ে পট করে পিছনের জানালা গলিয়ে কচুবনে ফেলে দিল।

কাজটা ভেবেচিন্তে করেনি বীণা। তবে খুব বিবেচনার কাজই হয়েছিল।

নিমাই দরজা খুলতেই কাকা বলল, কিছু মনে কোরো না ভাই, আমরা বড় জরুরি কাজে এসেছি। বীণাকে ডাকো। বীণার বুকের ঢিবঢিবি সেই থেকে শুরু। সে ঘুমকাতুরে মুখ নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল, কী কাকা? এত সকালে কী ব্যাপার গো? কোনও বিপদ নাকি?

কাকা গম্ভীর মুখে বলল, কিছু লুকিও না। পগা কি তোমার কাছে মাঝে মাঝে বিদেশী টাকা রেখে যেত?

বীণা একটু হাঁ করে চেয়ে বলল, বিদেশী টাকা? তা কি করে বলব? মাঝে মাঝে একটা প্যাকেটমতো কি যেন রাখতে দিত। খুলে তো দেখিনি। হেরোইন-টেরোইন ভেবে ভয়ে আধখানা হয়ে থেকেছি।

পগা যে রাতে মারা যায় সে রাতের কথা মনে করে দেখ তো!

মনে করার কি আছে?

সেই রাতে কিছু রেখে গিয়েছিল তোমার কাছে?

না তো! তার এক মাস আগে থেকেই তার সঙ্গে দেখা নেই।

ভাল করে ভেবে দেখ। ব্যাপারটা কিন্তু খুব সিরিয়াস।

বীণা মাথা নেড়ে বলে, ভাববার কিছু নেই। আমার স্মরণশক্তি খুব ভাল। তবে সে কিন্তু আরও দু-একজনের কাছেও প্যাকেট রাখত।

সব জানি। লক্ষ্মী আর সনাতন। তাদের কাছেও খোঁজ নিতে হবে। একটা কথা বলি, রাগ করতে পারবে না।

আবার কি কথা?

তোমার কথা আমি বিশ্বাস করছি। তবু তোমার ঘরখানা আমরা সার্চ করব। আমরা সিওর হতে চাই।

বীণার ঘর ছোটো, আসবাবপত্রও নেই। সার্চ করতে দশ মিনিটও লাগল না। কচুবন বা বাড়ির আঁদাড়-পাঁদাড় খোঁজার মতো ধৈর্য এদের নেই।

কিছু না পেয়ে কাকা যেন খুশিই হল। বীণাকে বলল, বাঁচালে! তোমার ঘরে চোরাই ডলার পাওয়া গেলে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যেত।

বীণা খুব অবাক হওয়ার ভান করে বলে, ওম্মা গো! পাওয়া গেলেই বা মাথা কেন কাটা যেত তোমার? আমি কি ছাই জানতুম যে, কী আছে ওই প্যাকেটে?

তা ঠিক। আমার বড় বিপদ যাচ্ছে বীণা, মাথাটা ঠিক নেই। নন্দী আর রহমান পালিয়ে গেছে। তাদেরও ধরতে পারছি না। খুনের দায়ে ওদের নামে বোধহয় হুলিয়া বেরোবে। আচ্ছা, ঘুমোও। যাই।

নিমাই ব্যাপারটা জানতে ওদের সঙ্গে একটু এগোলো। বীণা সেই ফাঁকে পুঁটুলিটা কুড়িয়ে এনে বাক্সবন্দী করল। সুযোগমত ঘটিতে পুরে সরা চাপা দিয়ে মাটির মধ্যে পুঁতে রাখতে হবে। থাক কিছুদিন। লোকে যখন সব ভুলে যাবে তখন বের করে অল্পে অল্পে বেচে দিলেই হবে।

কিন্তু ভয়ও একটা ছিল। বাজারে লটারির টিকিট বিক্রির স্টল আছে পল্টু নামে একটা ছেলের। বিশ্ববিজয় অপেরার লাইটমিস্ত্রির ভাই। তার কাছে দু'দফায় মোট পঞ্চাশ ডলার ভাঙিয়ে বেশ কিছু টাকা পেয়েছিল বীণা। সুতরাং তার কাছে যে ডলার আছে তা পল্টু জানে। বীণা অবশ্য বুদ্ধি করে বলেছিল তার বড়দা কৃষ্ণজীবন বছরে দু-তিনবার বিদেশে যায়, মস্ত মানুষ, সেই দাদাই তাকে ডলার দিয়েছে। কথাটা অবিশ্বাসের নয় হয়তো, কিন্তু তবু মানুষকে বিশ্বাস কি? পল্টু যদি বলে দেয় তা হলে কী হবে তা ভাবতেই পারে না বীণাপাণি। কাকা এমনিতে ভাল কিন্তু বেইমানি দেখলে কি করে কে জানে। পল্টুকে বলতে বারণ করতে গেলেও বিপদ আছে, তাতে সন্দেহ বাড়বে।

বীণাপাণি ভয় পেয়ে গেল। খুব ভয়।

কাকাকে এগিয়ে দিয়ে এসে নিমাই গম্ভীর মুখে বলল, হল তো! ওইসব আজেবাজে লোককে প্রশ্রয় দিয়ে কিরকম ঝঞ্ঝাট হচ্ছে!

বীণাপাণি তার পুরুষটার দিকে চেয়ে রইল। কপাল এমনি যে, জুটল এক ল্যাংটো সাধু। চালচুলো নেই, কিন্তু পাপ-তাপের নামে একেবারে মূর্ছা যায়। এ যদি ডলারের খবর জানতে পারে তা হলে এখনই পাপের ভয়ে বীণাকে ছেড়ে লম্বা দেবে। এর কাছে বুদ্ধি, পরামর্শ চেয়ে লাভ নেই। বরং নিজের পাপ নিজেই বইবে বীণা। সেই ভাল।

বীণা মৃদুস্বরে বলে, কিসের ঝঞ্ঝাট? আমরা তো কিছু করিনি।

করিনি, কিন্তু সকালের বাসটা তো ফেল হয়ে গেল। বিষ্টুপুরের বাস ফের সেই দুপুরে।

থাকগে, আর গিয়ে কাজ নেই। তুমি বরং বাজার-টাজার করে আনো, আমি ঘরের কাজ সারি।

যাবে না!

আজ নয়। একটা বাধা যখন পড়েইছে তখন দু'দিন পরেই যাবোখন।

নিমাই একটু ভেবে বলল, সেটা ভাল হবে। হঠাৎ করে চলে গেলে সন্দেহ বাড়ত হয়তো।

বীণা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নিমাইকে বাজারে রওনা করে দিয়ে সে চারদিকটা ভাল করে দেখে নিল। তার বাড়ির আশেপাশে বসতি নেই বললেই হয়। জংলা জায়গা, উঠোন ঘেঁষে চাষের জমি, ঝোপজঙ্গল। বীণা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। ঘরের ভিটের এক জায়গায় একটা ইঁদুরের গর্ত আছে। সেটাই খুঁড়ে ফেলল। একটা মা-ইঁদুর কিচমিচ করতে করতে পালাল। কয়েকটা বাচ্চা লালচে রঙের কুষি ইঁদুর জড়ামড়ি করে পড়েছিল। বীণা মায়া করল না। তুলে বাইরে ফেলে দিল। কাক নিয়ে যাবে।

পাপ হল? তা হোক। ওই ইঁদুরগুলো বড় হয়ে কি মানুষের কম সর্বনাশ করত? পাপের বিচার করে বীণার কাজ নেই। এ সংসারে দুটো মানুষের মধ্যে একটা পাপী, আর একটা সাধু। কিন্তু পাপীটাই সংসার চালায়, আর সাধুটার এক পয়সারও মুরোদ নেই।

গর্তটা বুজিয়ে দিয়ে ওপরটা দুরস্ত করে পুরো ঘরটাই গোবরমাটি দিয়ে লেপে ফেলল বীণাপাণি। গর্তের গহীনে রইল মাটির ঘটের ভিতরে ডলার আর পাউন্ডের প্যাকেট। ওপরে কাঠের তক্তা বসিয়ে তার ওপর চাল রাখার মাটির জালাটা বসিয়ে দিল সে। যতদূর সম্ভব নিখুঁত হল বটে কাজটা, কিন্তু ভয়টা রয়েই গেল।

সেই থেকে বীণাপাণির মনে শান্তি নেই। সবচেয়ে বড় অশান্তির কারণ হয়ে রইল পল্টু। যদি বলে দেয়? কিংবা যদি ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করে?

কয়েকদিন অপেক্ষা করল বীণাপাণি। তারপর একদিন নিজেই সন্ধের রিহার্সালের পর বাজারের দিকে গেল। দু-চারটে জিনিস কিনল। তারপর যেন এমনিতেই এসে পড়েছে এমন ভাব দেখিয়ে পল্টুর স্টলটার সামনে দাঁড়াল।

এই পল্টু, ভুটান লটারিতে নাকি অনেক প্রাইজ দিচ্ছে?

হ্যাজাকের আলোয় পল্টু বসে একটা বইগোছের কিছু পড়ছিল। লোকজন নেই। মুখ তুলে হাসল, হ্যাঁ। এবার ফার্স্ট প্রাইজ এক কোটি। নেবে নাকি টিকিট?

দূর! আমার লটারির কপাল নেই। শুধু পয়সা নষ্ট।

বহু লোকের পয়সা দিয়েই তো দু-চারজন লাখোপতি কোটিপতি হয়।

পল্টু বেশ ছেলে। বাইশ-তেইশ বছর বয়স, পাতলা ছিপছিপে চেহারা, রংটা ফর্সা, ওর মিস্ত্রী দাদার মতো নয়। চোখে-মুখে লেখাপড়ার ছাপ আছে।

বীণার বুক দুরদুর করছে তবু। কথা খুঁজে পাচ্ছে না। পল্টু কিন্তু সন্দেহ করছে কি না তাও বুঝতে পারছে না। বুকের এই ঢিবঢিবিনি নিয়ে কি বেঁচে থাকা যায়?

বীণা একটু উদাস গলায় বলে, কোটি টাকা প্রাইজ হলে টিকিটেরও তো দাম অনেক।

হ্যাঁ। একশো টাকা করে।

না ভাই, আমাকে বরং একটা লাখ টাকার প্রাইজের টিকিট দে। কেটে দেখি।

আগে তো খুব লটারির টিকিট কিনতে, আজকাল কেনো না তো!

কেটে কেটে হদ্দ হয়ে ছেড়েছি।

পল্টু তার পেতে রাখা টিকিটের সারি থেকে বেছে একখানা দিয়ে বলল, এটা পাঁচ টাকার টিকিট। কাল খেলা। ফার্স্ট প্রাইজ পাঁচ লাখ টাকা।

পাঁচটা টাকা জলে গেল। তবু নিল বীণা। পল্টু বোধহয় ডলারের কথা ভুলে গেছে। জয় মা কালী! ওর যেন ব্যাপারটা একদম মুছে যায় মাথা থেকে। কী বোকামির কাজই যে হয়েছিল বনগাঁয়ে ডলার ভাঙানো।

পল্টু বীণার পাঁচটা টাকা নিয়ে আবার বইটা খুলতে যাচ্ছে, বীণাও চলে আসার জন্য পা বাড়িয়েছে, হঠাৎ পল্টু একটু চাপা গলায় বলল, ডলার আর কত আছে?

বীণা এমন চমকে উঠল যে হৃৎপিণ্ড আর একটু হলেই থেমে যেত। সে ফ্যাকাসে মুখে বলল, কিসের ডলার?

পল্টু তেমনি চাপা গলায় বলে, থাকলে দিও। ন্যায্য দাম পাবে। কেউ জানতে পারবে না।

অভিনয় ছাড়া বীণা আর কি পারে? কিন্তু মাঝে মাঝে অভিনয় করার কথা ভুল হয়ে যায়। বিশেষ করে বিপদে পড়লে। কয়েক লহমার ভুল শুধরে নিল বীণা। একটু মিষ্টি করে হেসে বলল, দুর পাগলা! ডলার কোথায় পাবো? বড়দার সঙ্গে কি আর দেখা হয় নাকি আমার? সেই একবার দেখা, বিয়ে বাবদ আশীর্বাদ দেওয়া হয়নি, পঞ্চাশ ডলার দিয়ে বলেছিল, ভাঙিয়ে কিনে নিস কিছু। মানিব্যাগে টাকা তখন ছিল না, ডলার ছিল। সদ্য বিলেত থেকে ফিরেছে তখন।

ডায়ালগ যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল বীণা।

পল্টু বিশ্বাস করল কি না মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই। বলল, তোমার বড়দার কথা খুব শুনি। খুব নামকরা লোক নাকি?

কার কাছে শুনিস? বড়দা তো আর নেতা নয়।

শুনি নিমাইদার কাছে। মাঝে মাঝে নিমাইদা এসে আড্ডা দিয়ে যায়। তার মুখেই শুনেছি, তোমার বড়দা সাংঘাতিক লোক।

বীণা মলিন মুখে বলে, হ্যাঁ।

তা হলে তোমার এইখানে পচে মরার দরকার কি? বড়দাকে বললে নিমাইদার একটা কাজও তো হয়ে যায় বোধহয়।

কে বলবে বাবা! আর তোর নিমাইদারই বা কোন বিদ্যে আছে?

আর কিছু না হোক, নিমাইদা তো বিশ্বাসী লোক।

ওইটুকুই।

ওটা কি কিছু কম হল? আজকাল বিশ্বাসী মানুষ কোথায় পাবে?

এটা যে কলিকাল তা জানিস? এখন যত পাজি লোক তত তার কদর।

পল্টু একটু হাসল। তারপর বলল, ঠিক আছে, বড়দার কাছ থেকে ফের যদি ডলার পাও তো দিও।

তুই ডলার নিয়ে কী করিস?

পল্টু মৃদু মৃদু হাসছিল। বলল, যা সবাই করে। খদ্দের আছে গো। ডলার এখন দুনিয়াটাকে চালাচ্ছে।

বীণা এবার হঠাৎ খুব দুঃসাহসী একটা কাজ করে বসল। ভাবল, সন্দেহভঞ্জন করার এর চেয়ে বড় সুযোগ আর আসবে না। যা হওয়ার হবে। সে বুক ঠুকে বলল, ডলার নিয়ে যা কাণ্ড হয়ে গেল! ও বাবা, ওই নাম শুনলেই ভয় করে।

কী কাণ্ড?

কেন, পগা খুন হল না?

পল্টু মাথা নেড়ে বলে, সেটা মোটেই ডলারের জন্য নয়। ওদের জুয়ার আড্ডার পুরনো কাজিয়া। খুনটা আমার সামনেই হয়, ওই বটতলায়। দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাওয়ার আগে আমরা তিন বন্ধু বনমালীর দোকানে চা খাচ্ছিলাম।

দেখেছিস?

স্পষ্ট। তবে খুনিয়াদের নাম-টাম জানতে চেও না। ওসব বলতে পারব না।

না বাবা, জানতে চাইও না। তবে মাঝে মাঝে পগা আমার কাছে একটা প্যাকেট রেখে আসত তাতে কী থাকত কে জানে বাবা! ভয়ে তো কখনও খুলে দেখিনি। এখন শুনছি তাতে নাকি ডলার থাকত। তাই নিয়ে কত হাঙ্গামা, ঘর সার্চ হয়ে গেল।

তাই নাকি?

যা ভয় পেয়েছিলাম!

পল্টু হঠাৎ কেমন একটা গলায় বলল, তোমার কাছে ছিল না বুঝি?

আবার চমৎকার ভালমানুষের পার্ট করে গেল বীণা, কোথা থেকে থাকবে? তার এক মাস আগে থেকেই যে পগার সঙ্গে দেখা নেই।

পগা আমার খুব দোস্ত ছিল, জানো বীণাদি! যেদিন খুন হল সেদিনও সন্ধের পর কিছুক্ষণ আড্ডা মেরেছিল আমার দোকানে এসে। টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল বলে বেশিক্ষণ কথা হয়নি। তারপর খুব ঝমঝম করে নামল। আমি দোকান গুটিয়ে ফেলেছিলাম। চায়ের দোকানে গিয়ে আড্ডা দিতে লাগলাম, আর পগা গেল জুয়ার আড্ডায়।

বীণার বুকে তোলপাড় হচ্ছে। পগা কি ওকে কিছু বলেছিল? বলেছিল কি যে, বীণার বাড়ি গিয়েছিল? বীণার গলা যেন আটকে আসতে চাইছে। তবু অভিনয়ের জোরে পেরিয়ে যেতে চাইল বিপদটা, ইস্! যদি তোর সঙ্গে থাকত তা হলে হয়তো বেঁচে যেত!

পল্টু মাথা নেড়ে বলে, বাঁচত না। হয়তো সেদিন বেঁচে যেত, পরদিন মরত। ওকে দেগে রেখেছিল যে। তোমার সঙ্গে ওর কেমন ভাব ছিল?

ভাব! ভাব আবার কি? কী যে বলিস! মাঝে মাঝে যেত, চেনাজানা ছিল। সে তো কত লোকের সঙ্গে আছে।

পল্টু একটু বিরস মুখে বলল, সে দিন অনেক ডলার ছিল ওর কাছে।

কাঁপা বুকে বীণা বলে, কি করে জানলি?

কি করে আবার! ওই বলছিল।

বীণার চোখের সামনে একটা পর্দা নেমে এল যেন। আর অভিনয় করে কী হবে? পল্টু বোধহয় সব জানে।

কিন্তু সম্পূর্ণ বেহাল মাথা নিয়েও বীণা অভিনয় করে যেতে ছাড়ল না, আর বলিস না। এখন ডলার শুনলেই আমার ভয় করে।

পল্টু হাসল। কেমন যেন হাসিটা।

বীণার বুকের কাঁপন রয়ে গেল। ঘুম হতে চায় না। খেতে বসলে ভিতরটা কেমন যেন ঘুলিয়ে ওঠে। অম্বলের অসুখ তো ছিলই। সেটা যেন বাড়ল।

পরদিন রাতে পাশাপাশি শুয়ে একটু সোহাগের ভাব করল নিমাইয়ের সঙ্গে। তারপর বলল, জানো, আমি একটা লটারির টিকিট কিনেছি!

তাই নাকি? ও কিনে কী হয়?

যদি ফার্স্ট প্রাইজটা পেয়ে যাই তা হলে?

নিমাই বলে, ওই লোভানিই তো মানুষকে দিয়ে কত অকাজ করিয়ে নিচ্ছে।

আহা, আমি বুঝি লোভী?

আমরা সবাই কম-বেশি লোভী। সে কথা বলছি না। কেটেছো বেশ করেছো। তবে প্রাইজের আশায় বসে থেকো না।

পল্টু বলল তাই কিনলাম। আচ্ছা, পল্টু ছেলেটা কেমন বলো তো!

কেন, ভালই।

কতটা ভাল?

নিমাই হাই তুলে বলে, ওই যেরকম হয় আর কি! ভাল থাকতে চায়, পারে না। চারদিকে নানা লোভানি তো।

তোমার সঙ্গে খুব ভাব বুঝি?

আছে একটু।

কিছু বলে-টলে তোমাকে?

অবাক হয়ে নিমাই বলে, কী বলবে? কিসের কথা বলছো?

এই আমাদের কথা-টথা!

তা কত কথা হয়। সব আগড়ম-বাগড়ম কথা। এক-এক দিন এক-একটা বিষয় উঠে পড়ে। তাই নিয়ে খানিক কথা হয়।

লটারির টিকিট ছাড়া ওর আর কিসের ব্যবসা?

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, চোরাই কারবার আছে। যখন যেটা পারে করে। লটারির টিকিটে আর ক'পয়সা হয়?

হয় না?

হয়ও। মাঝে মাঝে এক-আধটা প্রাইজও লেগে যায়। সে কদাচিৎ। আজকাল লটারিওয়ালাও তো বড় কম নেই।

আচ্ছা আমরা যদি একটা কাজ করি তা হলে কেমন হয়?

কি কাজ?

ধরো যদি বনগাঁ ছেড়ে চলে যাই অন্য কোথাও?

কোথায় যাবে? পালপাড়া নাকি? না বিষ্টুপুর?

যদি ধরো তাই যাই? একেবারে?

সে কী! এখানকার বাস তুলে দিতে চাও?

কেন, এখানে আমাদের কে আছে?

তোমার যাত্রার দল, তোমার নিজের বাড়ি, এসব কষ্ট করে করলে সে কি ছেড়ে যাওয়ার জন্য?

আমার যে ভাল লাগছে না।

দূর পাগল! বলে নিমাই হাসে, আমাদের কি এত খামখেয়ালি করলে চলে?

বীণা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, তা হলে চলো, কোথা থেকে ঘুরে আসি।

কোথায় যাবে?

কাশী বৃন্দাবন নয় গো, কলকাতা যাবো।

কলকাতা! তা যেতে পারো। উঠবে কোথায়?

উঠব না। সকালে যাবো, বিকেলে চলে আসবো।

তা যেতে পারা যায়।

একটু বড়দার সঙ্গে দেখা করে আসব।

নিমাই একটু চুপ করে থেকে বলে, সে তো মস্ত কথা। শুনেছি কৃষ্ণজীবনবাবু এখন মস্ত লোক, সাততলায় ফ্ল্যাট।

ঠিকানা আছে।

সে তো আছে। চিনতে চাইবে কি?

মায়ের পেটের বোনকে চিনবে না?

হয়তো চিনবে। সে চেনার কথা বলছি না। বলছি পাত্তা দেবে কি না। একে তো অবস্থার তফাত, তার ওপর তোমরা সব ঝগড়া করে তাড়িয়েছিলে লোকটাকে।

সংসারে ওরকম কত হয়। আবার জোড়াও লাগে সম্পর্ক।

এটা লাগবে কি না কে জানে!

আমার দাদা কিন্তু মানুষটা বড় ভাল। অপমান আমিও করেছি বটে, সে বউদির জন্য। বউদি আমাদের এমন ছোটো নজরে দেখত।

এখনও কি তাই দেখবে না?

দাদা দেখবে না। দাদাকে আমি চিনি।

তা হলে যাই চলো একদিন, মানুষটাকে একবার দেখেছিলাম অনেক আগে। কাছ থেকে দেখে একটু পেন্নাম করে আসব। তুমি যে অত বড় একটা মানুষের বোন তা ভাবলে আমার গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যায়।

বীণা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, অত বড় মানুষ, তায় আপনজন, তবু আমাদের কপালে তাকে আর রাখতে পারলুম কই নিজের জন হিসেবে! ওই রাক্ষুসীই তো গাপ করে নিল!

আহা ওরকম বলতে নেই। সব দিক বিবেচনা করতে হয়। তোমার বউদিও তো আবার লেখাপড়া জানা মেয়ে।

ছাই!

দিন চারেক বাদে তারা সত্যিই গিয়েছিল কলকাতায়। মাটি খুঁড়ে ডলারের বান্ডিল বের করে হাতব্যাগে লুকিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বীণাপাণি। তার ইচ্ছে ছিল, বড়দাকে ডলারগুলো দেবে। বলবে, তুই বিদেশে যাস, তোর কাজে লাগবে। এর বদলে আমাকে টাকা দে।

দাদা নিরাপদ মানুষ।

ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে তারা যখন পৌঁছলো তখন বিকেল। লিফটে উঠতে ভরসাই হল না তাদের। এ যন্ত্র তারা চালাতে জানে না। দু'জনে সাততলায় উঠল হেঁটে, ঘেমে, হাপসে। ডোরবেলটা অবশ্য বাজাল, তবে ভয়ে ভয়ে।

বীণা যথাসাধ্য সেজে এসেছে, যথেষ্ট ফিটফাট করে এনেছে নিমাইকেও। তবু দরজা খুলে যে সুন্দরপানা মেয়েটা উঁকি দিলে সে যেন খুব অবাক হয়ে দেখল তাদের।

কাকে চাই?

কৃষ্ণজীবনবাবু কি আছেন? বীণা বলল। এই কি তার সেই ভাইঝি? চেনেও না তো বীণা।

বাবা! বাবা তো ইংল্যান্ডে।

বীণার প্রায় বসে পড়ার মতো অবস্থা। দাদা না থাকলে তো এ বাড়িতে তার কোনও অভ্যর্থনাই নেই।

বীণা মলিন হেসে বলল, তুমি বুঝি মোহিনী?

হ্যাঁ। আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

বনগাঁ। আমি তোমার পিসি হই। ছোটো পিসি।

পিসি? মাই গড! তা হলে আসুন ভিতরে, মাকে ডাকছি।

ব্যস্ত হয়ো না। আমরা বেশিক্ষণ থাকব না। বিকেলের গাড়ি ধরে ফিরে যাবো।

আসুন তো ভিতরে। মা আছে।

রিয়া ছিল। ওদের সাজানো গোছানো মস্ত লিভিং কাম ড্রয়িং রুমে উজবুকের মতো কিছুক্ষণ বসে থাকার পর রিয়া এল।

কে, তুমি বীণাপাণি না?

হ্যাঁ বউদি। বলে দু'জনে উঠে প্রণাম করল।

রিয়া যে খুব অপ্রসন্ন হল তা নয়। তবে একটু আলগোছ ভাব। বলল, ও তো নেই।

শুনলাম। আমরা এমনি দেখা করতে এসেছিলাম। তোমরা ভাল তো!

ভালই।

দু-চারটে কথাবার্তা, চা আর সন্দেশ খাওয়ার পর বাইরের লোকের মতোই চলে এল তারা। আর ফেরত এল সব দুশ্চিন্তার আকর সেই ডলারের বাণ্ডিলও।

১৯

ওয়াজ দেয়ার এনি সার্জারি অন মাই হার্ট, সিস্টার?

সার্জারি? ওঃ নো স্যার, দেয়ার ওয়াজ নো ওপেন হার্ট সার্জারি। ওনলি মেডিসিনস্।

আই ফিল এ সর্ট অফ নাম্বনেস ইন মাই হার্ট। ইজ দ্যাট ও. কে?

ইউ আর নাউ ও. কে স্যার।

মণীশ কিছু অবিশ্বাসের চোখে পবিত্র সাদা পোশাক পরা তরুণী নার্সটিকে দেখছিল। কেরলের মেয়ে। খ্রীষ্টান, কালো, হাস্যময়ী। ব্রেকফাস্টের ভুক্তাবশেষ ট্রে গুছিয়ে নিচ্ছে। ডানদিকের পর্দাটা সরানো। আজও মেঘলা বিষণ্ণ আকাশ। গোমড়া ভোর। মণীশের দিন কি ভাবে কাটছে কে তার হিসেব রেখেছে? গুনতির দিন একরকম। কিন্তু ব্যথার দিনগুলি? সংজ্ঞাহীনতার দিনগুলি? দুশ্চিন্তার দিনগুলি? সব কি একরকম? ব্যথাতুর দিন সবচেয়ে ধীরে কাটে। কাটতেই চায় না। এক একটা সেকেন্ড যেন একটি একটি ঘণ্টা। এক একটি ঘণ্টাই যেন এক একটি দিন বা মাস। আর দিন যেন বছর বা দশক বা কল্পান্ত।

অনেক ঘুমিয়েছে মণীশ। শুধু ঘুম আর ঘুম। জাগলেই ডাক্তার আবার সস্নেহে ঘুম পাড়িয়ে দিত। তার ধারণা হয়েছিল, ওইভাবে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেই তার হৃৎপিণ্ডে ছুরি চালিয়েছে ডাক্তার।

জ্ঞান ফেরার পর সে অবশ্য ভাল করে খুঁজে দেখেছে, তার বুকে কোনও কাটা দাগ নেই। তবে বুকের ভিতরটা অন্যরকম। মাঝে মাঝে খিল ধরে থাকে। মনে হয়, হার্ট থেমে আছে। ধুকপুক নেই।

পৃথিবী হারিয়ে গিয়েছিল কয়েকদিনের জন্য। হারিয়ে গিয়েছিল তার প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র-কন্যা। তার বউ। তার চাকরি। তার সুখ-দুঃখ-আনন্দ। ওই কটা দিন আর ফিরে পাবে না মণীশ। চিরকালের মতো হারিয়ে রইল।

মে আই হ্যাভ এ নিউজপেপার?

কেরলের মেয়েটি ছোটো করে মাথা নাড়ল, নো স্যার। সরি।

দি ওয়ার্ল্ড ইজ লস্ট টু মি। আই ওয়ান্ট টু বি আপডেটেড।

আস্ক দি ডক্টর স্যার, প্লীজ।

থ্যাংক ইউ।

পৃথিবীর কোনও খবরই রাখে না মণীশ। এই দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে কত কী না জানি ঘটে যাচ্ছে! ঘটে গেছে! অন্তহীন ঘুমের মধ্যে পৃথিবী কতবার পাশ ফিরল! খবরের কাগজে এমন কী থাকবে, যাতে

তার হৃৎপিণ্ডে চাপ পড়তে পারে?

মে আই হ্যাভ এ বুক?

এনি বুক স্যার? আই ক্যান গিভ ইউ এ বাইবেল। আই হ্যাভ ওয়ান উইথ মি।

ইউ ডু ক্যারি এ বাইবেল?

মেয়েটি লাজুক হাসে, আই ডু স্যার।

ইউ আর এ রিলিজিয়াস পারসন!

ইট ইজ এ গুড কম্পানি।

দেন, গিভ ইট টু মি। ইট উইল ডু।

মেয়েটি ব্রেকফাস্টের ট্রে নিয়ে চলে গেল। ফিরে এল একখানা কালো মলাটের বাইবেল নিয়ে। এরকম বাইবেল বড় বড় হোটেলের ঘরে ড্রয়ারে রেখে দেওয়া হয়। ইচ্ছে করলে যে-কেউ নিয়েও যেতে পারে। বাইবেল চুরি করলেও দোষ হয় না। পৃথিবীময় বাইবেল ছড়িয়ে দেওয়ার এ এক চমৎকার কায়দা।

মণীশ অবসন্ন হাতে বাইবেলখানা বালিশের পাশে রেখে দিল। একটু জল খেল।

মে আই টক নাউ ফ্রিলি?

নট টু মাচ স্যার। ইফ ইউ উইশ, আই মে রীড দি বাইবেল টু ইউ।

বাইবেল ইজ অ্যান ওল্ড বুক। আই ওয়ান্ট সামথিং নিউ। সামথিং মোর আপ-টু-ডেট।

বাইবেল ইজ নেভার ওল্ড স্যার। ইট ইজ অলওয়েজ নিউ।

অল রাইট। রীড ইট টু মি অ্যানাদার টাইম। ইজ দি সামার ওভার?

নো স্যার। দি মনসুন ইজ দেয়ার। ভেরি হেভী মনসুন।

ডু ইউ নো এনিথিং অ্যাবাউট দি ক্যালকাটা ফুটবল লীগ?

মেয়েটি হাসে, নো স্যার। আই অ্যাম নট স্পোর্টিং এনাফ।

টেল মি হোয়াট হ্যাপনড্ ইন দি ওয়ার্ল্ড হোয়েন আই ওয়াজ ইন স্লিপ।

নাথিং মাচ।

এনি গ্রেট লীডার ডেড অর কিলড্?

নো স্যার।

এনি বিগ প্লেন ক্র্যাশ?

নো স্যার।

এনি আর্থকোয়েক?

নো স্যার।

ইউ কেপ্ট দি ওয়ার্ল্ড ইন অর্ডার হোয়েন আই ওয়াজ অ্যাস্লিপ?

মেয়েটি খিলখিল করে হাসে, ইট ওয়াজ ইন অর্ডার।

ওনলি মি আউট অফ অর্ডার?

নট ভেরি মাচ। ইউ হ্যাড এ স্মল অ্যাটাক।

ইউ আর লাইং। আই হ্যাড এ ম্যাসিভ অ্যাটাক।

নো স্যার।

ডিড আই বিহেভ ওয়েল হোয়েন ইন পেইন?

ইউ ওয়্যার নাইস স্যার।

ওয়াজ আই ইন ডেলিরিয়াম?

নো স্যার।

আই হ্যাড ড্রিমস, ইউ নো। ব্যাড ড্রিমস।

ঘরটার দুটো ভাগ। একটা যেন বেডরুম, অন্যটা যেন বসবার। বসবার ঘরে তাজা ফুল সাজিয়ে রাখা, সোফা সেট পাতা। এয়ারকন্ডিশনড ঘরে কোনও শব্দ নেই। ভারি ঝকঝকে তকতকে। তার স্লিপিং স্যুটের বুকপকেটে একটা ভারী যন্ত্র রাখা। রিমোট কন্ট্রোলে চব্বিশ ঘন্টা ই সি জি হচ্ছে বোধ হয়। কে জানে কী!

চিরকালের অভ্যাস ছিল, সকালে ঘুম থেকে উঠেই সিগারেট ধরানো। তারপর চা। তারপর খবরের কাগজ। তারপর...

দয়ার দান হিসেবে আয়ু ফিরে পাওয়া গেল। কিন্তু কত দিন? কতদিনের এক্সটেনশন? আবার ব্যথা আসবে। অন্ধকার আসবে। হারিয়ে যাবে পৃথিবী। একদিন মণীশ আর এক্সটেনশন পাবে না।

জানালার গায়ে মৃদু টোকার মত শব্দে চোখ চায় মণীশ। ইস! বৃষ্টি হচ্ছে! ঝাপসা হয়ে গেল কলকাতার আকাশ-রেখা। এই বৃষ্টিতে ভিজিটিং আওয়ার্সে কেউ আসবে কি? বুবকা, ঝুমকি, অনু বা অপর্ণা? সবাই একসঙ্গে আসে না। একে একে, দুইয়ে দুইয়ে আসে। কিন্তু ওদের সবাইকে একসঙ্গে দেখতে বড় ইচ্ছে করে মণীশের।

সিস্টার, ক্যান ইউ টেল মি একজ্যাক্টলি হোয়েন আই উইল বি রিলিজড?

ভেরি সুন স্যার।

আই ওয়ান্ট এ ডেট।

প্লীজ আস্ক দি ডক্টর স্যার।

আজ সকালে কে আসবে? ভাবতে ভাবতে চোখ বুজল মণীশ।

অনেকদিন আগে এক মেঘলা দুপুরে এক ক্ষিপ্ত জনতার ওপর পুলিস লাঠি চার্জা করছিল। এসপ্ল্যানেড ইস্টে। কার্জন পার্কের ফেনসিং-এ উঠে একজন ফ্রি লান্স ফটোগ্রাফার দৃশ্যটা তুলছিল। একজন পুলিশ হঠাৎ তেড়ে এল তার দিকে। হাঁটুতে খটাং করে এসে পড়ল লাঠি। ফটোগ্রাফারটি ব্যথায় চিৎকার করে পড়ে গেল, তারপর অন্য পায়ে পুলিসটাকে একটা লাথি কষিয়ে দিল। খুবই সাহসের কাজ। পুলিসটা পিস্তলে হাত দিয়েছিল। হয়তো মেরে ফেলত। কিন্তু সেই সময়ে মার-খাওয়া কিছু লোক ছিটকে এল এদিকে। তাদের বেপরোয়া হতচকিত ধাক্কায় পুলিশটা সরে গেল। ফটোগ্রাফারটি উঠে দাঁড়াল। হাঁটুতে সাঙ্ঘাতিক ব্যথা, চোখে জল আসছে, ঠিক সেই সময়ে দুটো গুলির আওয়াজ। আর্ত চিৎকার।

সেই দুপুরে পুলিশ ঠিক দু রাউন্ড গুলিই চালিয়েছিল। তাতে চলন্ত ট্রামের মধ্যে বসে-থাকা একটি লোক মারা যায়। ফটোগ্রাফারটি তার জল-ভরা চোখেও দৃশ্যটা দেখতে পেয়েছিল। অন্য ফটোগ্রাফাররা দেখেছিল একটু দেরিতে।

ফটোগ্রাফারটি তার জখম পা নিয়েই কাছ-ঘেঁষা ট্রামটায় উঠে পড়ল। তখন হুড়োহুড়ি করে যাত্রীরা নেমে যাচ্ছে। আর জখম লোকটা গোঙাচ্ছে, জল! জল! তখনও পড়ে যায়নি। তবে রক্তে ভেসে যাচ্ছিল ট্রামগাড়ির সীট, মেঝে। চকাচক দু-তিনটে ফটো তুলে নিল সে। আর দেখতে পেল, লেডীজ সীটে সাদা মুখে একটি মেয়ে বসে আছে। এত ভয় পেয়েছে যে, পালাতে অবধি পারেনি।

আরে! পালান, পালান! আসুন শিগগির! বলে ফটোগ্রাফার গিয়ে মেয়েটির হাত ধরে টেনে নামিয়ে নিয়েছিল ট্রাম থেকে। বাইরে টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়া, লোকজন পালাচ্ছে, পুলিস তেড়ে যাচ্ছে যাকে পাচ্ছে সামনে তার দিকে। দমাস দমাস করে লাঠি পড়ছে।

অন্তত তিনজন পুলিশ লাঠি তুলেছিল। সঙ্গে মেয়েটি ছিল বলে বেঁচে গেল ফটোগ্রাফারটি। পুলিশ মেয়ে দেখে মারেনি।

তীব্র টিয়ার গ্যাসে প্রায় অন্ধ চোখে ছুটতে ছুটতে তারা রেড রোডের দিকে চলে যেতে পেরেছিল।

কোথায় থাকেন আপনি?

মেয়েটি কোনও জবাব দিতে পারেনি। শুধু কাঁপছিল। ভয়ে, অবিশ্বাসে।

নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে গিয়ে মেয়েটাকে ঘাসে বসাল ফটোগ্রাফারটি। জিরোতে দিল। দুজনেরই চোখ ফুলে ঢোল। দুজনেই হাঁফাচ্ছে।

অনেকক্ষণ বাদে মেয়েটি তার ঠিকানা বলতে পারল।

একা যেতে পারবেন?

না। ভীষণ ভয় করছে।

কিন্তু আমাকে যে পত্রিকা-অফিসে যেতে হবে। এই ফটো কাল কাগজে বেরোবে।

মেয়েটা কাঁদছিলও। কিছু বলল না।

ঠিক সেই সময়ে আকাশ ফুঁড়ে বৃষ্টি নেমেছিল। খুব বৃষ্টি। সাঙ্ঘাতিক বৃষ্টি।

আরে, ভিজবেন যে! উঠুন! দৌড়োন! ময়দানে কোনও ক্লাবের টেন্টে ঢুকে পড়তে হবে।

মেয়েটি ওঠেনি। ছোটেওনি। বসে রইল মুখ নিচু করে। ক্যামেরা ভিজছিল।

ফটোগ্রাফারটি চলে যেতে পারত। যায়নি শেষ পর্যন্ত। মেয়েটির সঙ্গে সেও ভিজেছিল ক্যামেরা সমেত।

সেই বিকেলে বৃষ্টি আর থামেনি। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে আন্দোলন থেমে গেল, পুলিসের হামলা বন্ধ হল, জনসাধারণ পালাল নিরাপদ আশ্রয়ে। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই মেয়েটিকে তার বাড়ি অবধি পৌঁছে দিল তরুণ ফটোগ্রাফার। খানিকটা বাসে, খানিকটা হেঁটে।

তার ফটো পরদিন বেরিয়েছিল কাগজে। নাম সমেত। আরো অনেকেই ফটো তুলেছিল সেদিনকার হাঙ্গামার। তবে গুলি-খাওয়া লোকটার অমন নিখুঁত ছবি আর কেউ পায়নি। বেশ নাম হয়েছিল তার। পায়ের জখম সারতে কয়েকদিন সময় লেগেছিল।

অফিসের ঠিকানায় প্রায় সাত দিন বাদে চিঠিটা এল। মেয়েলি হস্তাক্ষর, আমি সেই মেয়েটি, যে সেদিন চোখের সামনে লোকটাকে মরতে দেখে পাথর হয়ে গিয়েছিল। বোধ হয় আমার হার্টফেল হয়ে যেত, আপনি আমাকে জোর করে ট্রাম থেকে নামিয়ে না আনলে। আমার বোধ হয় জ্ঞানও ছিল না। কিরকম যে হয়ে গিয়েছিলাম! বৃষ্টিতে ভিজে আমার জ্বর হয়েছিল, জানেন? তবু ওই বৃষ্টিটাও বোধ হয় দরকার ছিল। ভিজে

ভিজে মাথা ঠাণ্ডা হয়েছিল, শরীরে সাড় ফিরে এসেছিল। আপনার সঙ্গে আর একবার দেখা হতে পারে কি? আমার যে মুখোমুখি একবার ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানানো দরকার আপনাকে! আর কী অভদ্র আমি। সেদিন তো এক কাপ চাও অফার করা হয়নি আপনাকে?

ফটোগ্রাফারের সময় হয়েছিল আরও সাত দিন বাদে। তারপর আর সময়ের অভাব হয়নি।

আজ সামান্য একটা উপস্থিতি টের পেয়ে চোখ খুলে মণীশ সেই মেয়েটিকে দেখতে পেল। সেই ভয় খাওয়া মুখ! সেরকমই সুন্দর আছে আজও।

কেমন আছো আজ?

মণীশ হাসল, এটা কিরকম থাকা বলো তো? ডাক্তার ছুটি দিচ্ছে না কেন?

এবার দেবে।

সেটাও তো চারদিন ধরে শুনছি। আর কবে?

অপর্ণা খুব কাছ ঘেঁষে চেয়ারে বসল। বড় ভালবাসায় কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। শান্তিনিকেতন থেকে সেবার একটা গাড়ি ভাড়া করে তাঁতিপাড়া গিয়েছিল তারা। এক জোড়া তসরের থান কিনেছিল অপর্ণা। পরে কাঁথাফোঁড়ের কাজ করিয়ে নেয়। সেই শাড়িরই একটা আজ পরে এসেছে। একটু সেজেও এসেছে।

মণীশ অপর্ণার হাতটা নিজের কপালে চেপে ধরে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, খুব ভয় পেয়েছিলে তোমরা?

পাবো না!

হোয়াট অ্যাবাউট দি ইয়ং রোগস্? ওদের কী অবস্থা হয়েছিল?

বুঝতেই তো পারো। বাবা ছাড়া ওদের কি আর অস্তিত্ব আছে?

বুবকা?

পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। নিশুত রাতে অবধি এসে বসে থাকত নিচে। রিসেপশনে খোঁজ নিয়ে জ্বালাতন করত ওদের।

বড্ড বাচ্চা রয়ে গেছে ছেলেটা। অ্যাডাল্ট হচ্ছে না কেন বলো তো!

তুমি ওকে অ্যাডাল্ট হতে দিচ্ছো কই? এখনও এমনভাবে আদর দাও যেন কোলের ছেলে। আঠারো বছর বয়স হল, এখন ওকে তোমার একটু ছেড়ে দেওয়া উচিত।

মণীশ একটা শ্বাস ফেলে বলে, ছেড়ে তো দিতেই হবে। বড় হচ্ছে, কত দিকে ইন্টারেস্ট দেখা দেবে, বাবা নিয়ে কি পড়ে থাকবে তখন?

মণীশের মনটা প্রশান্তিতে ভরে আছে। বুবকার জগৎ এখনও সে অনেকটা দখল করে আছে। যতদিন পারবে মণীশ ততদিন এই নোংরা পৃথিবীকে অনুপ্রবেশ করতে দেবে না ছেলে এবং মেয়েদের ভিতরে।

কিন্তু পারবে কি মণীশ? আর পারবে কি?

এখানে আমার বড্ড হাঁফ ধরে যাচ্ছে। ডাক্তার কিছু বলছে না এখনও! হয়তো আর দু-এক দিন।

মণীশ সবেগে মাথা নেড়ে বলে, অসম্ভব। আমি আর পারছি না। এখানে থাকলে আমার আবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে।

ডাক্তার যদি বারণ করে?

আমি সাবধানে থাকব। এখানে থেকেও তো কিছু হচ্ছে না। শুধু পড়ে থাকা। আমি পারছি না অপর্ণা। ছেলেমেয়ে ছাড়া আমি আর পারছি না।

অপণা নির্লজ্জের মতোই তার মাথাটা নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে। বলে, ওরকম করতে হয় নাকি? আমরাও তো তোমাকে ছাড়া যেন ডাঙার মাছ। ছেলেমেয়েগুলো অর্ধেক হয়ে গেছে দুশ্চিন্তায়।

ওরা কখন আসবে?

অনু আসছে। তুমি গতকাল খবরের কাগজ পড়তে চেয়েছিলে, এরা নাকি দেয়নি। ও চুরি করে খবরের কাগজ দিয়ে যাবে বলে কাগজ কিনতে গেছে।

মণীশ একটু হাসল, খুব বিচ্ছু না?

খুব।

সারাক্ষণ তোমরা কি আমার চিন্তা করো?

শুধু চিন্তা! ধ্যান বলতে পারো।

তাহলে মাঝে মাঝে অসুখ করা তো ভালই। না?

ভাল, তবে পালা করে। এবার আমার হার্ট অ্যাটাক হোক আর তোমরা আমাকে নিয়ে ভাবো, কেমন?

ও বাবা, দরকার নেই। আচ্ছা, মহিলাদের হার্ট অ্যাটাক খুব কম হয়, না? কই, বেশী শুনি না তো!

হয় মশাই, হয়। হার্ট অ্যাটাক হয়, ক্যানসার হয়, সব হয়।

অনু আসছে না কেন?

আসবে।

নার্সটা ঘরে নেই, না?

না তো!

উইল ইউ গিভ মি এ কিস?

এ মা!

ইট উইল বি এ লাইফ সেভিং কিস। প্লীজ!

অপর্ণা সামান্য ঝুঁকে হালকা করে ঠোঁট ছোঁয়াল তার ঠোঁটে। তারপর বলল, তাড়াতাড়ি ভাল হও তো। মনের জোর করে হও। তোমাকে ছাড়া আমিও আর পারছি না। এই পাগলকে ছাড়া আমি যে পাগল হতে বসেছি!

আজ এখনই কি ভাবছিলাম জানো?

কী?

সেই প্রথম দেখা হওয়ার ঘটনাটা। আমি তখন ফ্রি লান্স ফটোগ্রাফার, তুমি কলেজের ছাত্রী। সেই ট্রাম, গুলি, টিয়ার গ্যাস।

মাগো!

অথচ কত রোমান্টিক, তাই না?

অপর্ণা স্মিতমুখে হাসল, কী ভীষণ রোমান্টিক।

কতদিন ফটো তুলি না বলো তো! সেই যে বড় চাকরি পেয়ে গেলাম, ফটোর প্যাশনটা চলে গেল। ক্যামেরা তিনটে পড়েই আছে।

আর ফটো তুলে কাজ নেই। অনেক হয়েছে।

আচ্ছা, আমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে কারও ফটোগ্রাফিতে আগ্রহ নেই?

সে তো তুমিই জানো। তোমার ছেলেমেয়েকে তুমি ছাড়া আর বেশী কে চেনে?

মণীশ একটু চুপ করে ভাবে। তারপর বলে, বোধ হয় অনুটার হবে। যে ক'বার ফটো তুলেছে চমৎকার হয়েছে। দাঁড়াও ভাল হয়ে ফিরে ওদের তিনজনকে তিনটে ক্যামেরা দিয়ে বলব, ইচ্ছে মতো ছবি তুলে আনো। যারটা ভাল হবে তাকে প্রাইজ দেবো!

আচ্ছা, সে হবে'খন। ভাল হতে না হতেই পাগলামি শুরু হয়েছে তো!

পাগলামি নয়, এটা হল এক ধরনের ইনহেরিটেন্স। আমার প্যাশন, আমার হবি, আমার ট্রেন্ড অফ মাইন্ড সব কিছু ওদের দিয়ে যেতে না পারলে, ওদের ভিতরে আমি বেঁচে থাকব কি করে বলো? ওদের মধ্যে নিজেকে দেখতে না পেলে আমার যে সেটা মরে যাওয়াই হবে।

আমি তো একটুও আপত্তি করছি না। ওরা তোমার মতোই হোক। তুমি ভাল হও, তারপর সব হবে। ওরা তোমার কিছুই নষ্ট হতে দেবে না। বাবা যে ওদের কাছে কী তা তো জানোই!

মণীশ আবার অনুর খোঁজ নিতে মুখ খুলেছিল, অমনি একটা দুষ্টু হাসি মুখে নিয়ে দরজা ঠেলে অনু ঢুকল। একটু যেন পা টিপে। চারদিক চেয়ে দেখল। তারপর ঢোলা পোশাকের বুকের ভিতর থেকে একটা ইংরিজি কাগজ বের করে ছুটে এল মণীশের কাছে।

বাবা, কাগজ!

মণীশ তার দুর্বল দুটি হাতে মেয়েকে জাপটে নিল বুকের ভিতর। পরমুহূর্তেই ককিয়ে উঠল, উঃ!

অপর্ণা আতঙ্কের গলায় বলে, কী হল?

বুক পকেটে যন্ত্রটার কথা মনেই ছিল না।

লেগেছে?

একটু।

অপ্রস্তুত অনু বলল, এ মা, আমারও মনে ছিল না বাবা। কী হবে? যন্ত্রটা বিগড়ে যায় যদি?

আরে দুর! কিছু হবে না।

তোমার হার্টে তো চাপ পড়ল!

মোটেই না। তুই কাছে আয়।

অপর্ণা উদ্বেগের গলায় বলে, কী যে করো না! কিছু ঠিক থাকে না তোমার! আমি তো ভয় খেয়ে গিয়েছিলাম।

আরে না, ভয়ের ব্যাপার নয়। আর বকবে না কিন্তু।

তোমাকে বাড়ি নিয়ে গেলেও তো এরকমই হুড়ুম দুড়ুম কাণ্ড করবে সব। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হুড়োহুড়ি, লাফ ঝাঁপ, চেচাঁমেচি!

বেঁচে থাকা মানেই তো নিজেকে জানান দেওয়া। নইলে পাথর হয়ে, মমি হয়ে বেঁচে থেকে কী লাভ বলো!

আগেই বলে রাখছি, এখন কিন্তু কিছুদিন চুপটি করে শুয়ে থাকতে হবে বাড়িতে। ওসব হুড়োহুড়ি চলবে না।

মণীশ অপর্ণার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, ডাক্তারের বারণ?

হ্যাঁ।

তাহলে কি আমি চিরকালের মতো পঙ্গু হয়ে গেলাম?

উঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না। আচ্ছা বাবা, খুব হুড়োহুড়ি কোরো, কিন্তু একটু সামলে!

মণীশ মেয়ের দিকে ফিরে তাকাল। একটু অচেনা লাগছে কি?

মুখখানা দুহাতে ধরে তৃষিতের মতো চেয়ে থেকে বলল, তুই কি খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাচ্ছিস?

কেন বাবা? তুমি তো মোটে বাইশ দিন হাসপাতালে!

তবু যেন মনে হচ্ছে বাইশ দিনেই তুই আমার চোখের আড়ালে একটু বড় হয়ে গেছিস! কত বয়স হল তোর! তেরো না?

অনু হি হি করে হাসে, মেয়েরা বয়স কমায়, কিন্তু বাবারা মেয়েদের বয়স আরও কমিয়ে দেয়, না বাবা? আমি তো ফিফটিন কমপ্লিট করেছি, তুমি যেন জানো না!

উরে বাবা! ফিফটিন! তার মানে সিক্সটিন হতে তো আর দেরি নেই!

আই অ্যাম রানিং সিক্সটিন।

মাই গড!

ডান কানে অপর্ণা খুব আস্তে করে বলে, ঋতু হয়। বয়স বসে আছে কিনা!

ওঃ ইউ আর ইমপসিবল।

অপর্ণা হেসে ফেলল খিলখিল করে। মণীশের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে আস্তে করে বলল, তোমার কাছে ওরা কেউ কখনও বড় হবে না। ছেলেমেয়ে ছোটো নেই, শুধু তোমার কাছে এলেই সব ছোটো সাজে।

মণীশ গম্ভীর গলায় বলে, তার মানে কি অ্যাকটিং করে?

একটু করেও।

শুনে আমার বুকে ব্যথা হচ্ছে।

মাগো! বলে আর্তনাদ করে ওঠে অপর্ণা, সত্যি নাকি?

মণীশ হাসে, সে ব্যথা নয়। অন্য রকম ব্যথা। দুঃখের ব্যথা।

আচ্ছা বাবা, কান মলছি। আর বলব না।

অনু নিষ্পলক বাবার মুখের দিকে চেয়ে আছে। মণীশ নিবিষ্ট চোখে কচি মুখখানা দেখল। অনুরও পনেরো! কিংবা—গড ফরবিড—ষোলো! চোখে কি একটু প্রাপ্তবয়স্কার ছায়া?

মণীশ চোখ বুজল। অনেক বয়স হয়ে গেল বুঝি তার?

আবার চোখ চাইল।

অনু?

উঁ।

বড় হোসনি মা। এখনই বড় হোসনি। আর কিছুদিন শিশু থাক।

২০

নতুন আফটার শেভ লোশনটা মাখবার পর কিছুক্ষণ যেন আকাশে ভেসে রইল হেমাঙ্গ। এত হালকা লাগল মেজাজ, এত ফুরফুরে লাগল নিজেকে, যেন তার কোনও ভার নেই। সে আকাশে মেঘের মতো ভেসে আছে। গন্ধ যে মানুষকে এমন গ্যাস বেলুন করে দিতে পারে তার কোনও ধারণাই ছিল না হেমাঙ্গর। হল। সুগন্ধ সম্পর্কে তার বরাবরই আগ্রহ আছে। দেশ-বিদেশের কম সেন্ট তার সংগ্রহে নেই। সেগুলো মাখবার জন্য নয়, কারণ বেশী সুগন্ধ মাখলে তার অনেকটা এলার্জির মতো হয়। কিন্তু সে মাঝে মাঝে সাবধানে শিশি খুলে বা বাতাসে একটু স্প্রে করে নিয়ে গন্ধ শোঁকে। তাতে মনটা ভাল হয়ে যায়। কিন্তু এবার চারুশীলার পতিদেবতাটি এই যে আফটার শেভ লোশনটি এনেছে এটা সবাইকে জুতিয়ে দিয়েছে। এরকম দার্শনিক গন্ধ সে কখনও পায়নি।

সকাল দশটায় নিজের অফিসের চেম্বারে বসে হেমাঙ্গ একজন বিষয়ী লোকের সঙ্গে কথা বলছে। বিষয়ী লোকদের সে একদম পছন্দ করে না, কিন্তু এরাই তার অন্ন-বস্ত্রের যোগানদার। রোজই বিষয়ী লোকদের সঙ্গেই তার শতেক কথাবার্তা হয়। সে এদের আয় ও সম্পদকর বিষয়ক পরামর্শদাতা ও ছোটখাটো একজন ত্রাতা। তার সামনে বসে-থাকা লোকটির নাম বিরজু প্রসাদ সাহা। পদবীটি বাঙালী হলেও লোকটি আসলে ইউ পি-ওয়ালা। স্ক্র্যাপ আয়রন কেনাবেচার ব্যবসাতে কয়েকশো কোটি টাকা খাটছে। লোকটি মোটেই লালাজীদের মতো বুদ্ধিমান, বিদ্যাহীন, ধূর্ত বিনয়ী, মোটা এবং হাত কচলানো টাইপের নয়। এর বাপ-দাদা অবশ্য তাই ছিল। কিন্তু এ রীতিমতো লেখাপড়া জানা স্মার্ট, ট্রিম এবং আধুনিক। ম্যানেজমেন্টে বিলিতি ডিগ্রি আছে। কিন্তু এর মনোজগতে কোথাও কোনও ভাবাবেগ, অলস-চিন্তা, বাহুল্য আনন্দ নেই। এ হল আদ্যন্ত ব্যবসায়ী। বাণিজ্যিক রোবট। এর যা পয়সা আছে তাতে হেমাঙ্গদের গোটা পরিবারকে অন্তত ষাট সত্তর বার কেনাবেচা করতে পারে। এইসব লোকদের খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হয়। একটু বেচাল বেফাঁস কথা বললেই ধরে ফেলবে।

কিন্তু আজ হেমাঙ্গ কোনও কিছুতেই মন দিতে পারছে না। সকাল আটটায় সে দাড়ি কামিয়েছে। অবশ্য আফটার শেভটা সে দাড়ি কামানোর পরই মাখে না। স্নান করে খেয়ে বেরোনোর সময় মেখে নেয়। তাতে মদির গন্ধটা প্রায় সারাদিন তার মুখমণ্ডলে থেকে যায়। এয়ারকুলার লাগানো ঠাণ্ডা ঘরে গন্ধটা ঝিমঝিম করছে আর তাকে গ্যাস বেলুনের মতো ওপরে এক স্বপ্নরাজ্যে ঠেলে তুলে দিতে চাইছে। ওঃ, ফরাসীরা গন্ধ চেনে বটে। গন্ধও যে যুগপৎ, একটা বিজ্ঞান ও শিল্প সেটা যে এদেশের লোক কেন বোঝে না কে জানে! মিশরের

মমিদের কবরে যেসব সুগন্ধের পাত্র পাওয়া গেছে তাতে নাকি এখনও সুগন্ধ পাওয়া যায়! হাজার দু'হাজার বছরেও যা নষ্ট হয় না তা কী জিনিস দিয়ে তৈরি কে বলবে?

এ গন্ধটা ততদূর দীর্ঘস্থায়ী নয়। কিন্তু সকাল ন'টা থেকে লেগে আছে এবং দুপুর গড়িয়ে বেলা তিনটে সাড়ে তিনটে অবধি থেকে যায়।

বিরজু প্রসাদ সাহা আয়কর সংক্রান্ত একটি বদখত ঝামেলায় পড়েছে, যা প্রতি বছরই পড়ে। মিটেও যায়। এই ঝামেলা ও তার সমাধানের মাঝখানে কয়েক হাজার বা কখনও লক্ষ টাকাও হেমাঙ্গর কোম্পানি তুলে নেয়। ফলে এরা—অর্থাৎ বি পি সাহার মতো লোকেরা—তাকে অর্থাৎ হেমাঙ্গর মতো লোকদের নিজেদের চাকরবাকর মনে করে। একটু ভদ্রস্থ চাকর—যাদের চোখ রাঙানো যায় না বা চটানো যায় না। তবে আক্ষরিক অর্থে চাকরই।

একজন মহাপুরুষ বলেছেন, কর মানে হাত। কর দেওয়া মানে হাতে হাত মেলানো। রাজা ও প্রজার করমর্দন। সরকার ও জনসাধারণের সহযোগিতার শুরু। তার বদলে হেমাঙ্গ বা হেমাঙ্গর মতো লোকরা যা করছে তা হল অনেকটা বেড়াল-কুকুরের মল বা মূত্রের ওপর ছাই চাপা দিয়ে রাখা, যেমনটা তার মাকে সে ছেলেবেলায় করতে দেখেছে। গত বছর প্রায় দেড় কোটি টাকা ট্যাক্স বাঁচাতে বি পি সাহাকে সাহায্য করেছে হেমাঙ্গর কোম্পানি। এবং কাজটা করে যথেষ্ট আত্মগৌরব বোধ করেছে। বি পি সাহার মতো ক্লায়েন্টদের সর্বমোট কত ট্যাক্স বাঁচিয়ে দিয়েছে তার কোম্পানি তার হিসেব করলে যে-কারও মাথা ঘুরে যাবে। আর এই ছাই-চাপা দেওয়ার কাজ দেশ জুড়ে যারা করছে তারা মোট কত ট্যাক্স সরকারের ঘরে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে তার হিসেব করলে গোটা কয়েক পাঁচসালা পরিকল্পনার মূল বিনিয়োগ উঠে আসবে না কি? হিসেবটা করা হয় না, এই যা।

খুব মনোযোগের ভান করে বি পি সাহার কাগজপত্র দেখছে হেমাঙ্গ। আদতে দেখছে না। গন্ধের বেলুনে চড়ে এখনও সে অনেক ওপরে। ইনস্যাট বি-এর কাছাকাছি ঘুরপাক খাচ্ছে। মাঝে মাঝে সে সাহার বিষয়ী মুখটার দিকে তাকাচ্ছে। মুখখানা গোলপানা, গোঁফ আছে, নাকটা একটু মোটা, ভ্রূ ঘন, কপাল ছোট এবং চুল খুব ঘেঁষ। বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের মধ্যে। গত বছর তিন কোটি টাকার কাছাকাছি ট্যাক্স দিয়েছে। সাফল্য কি একেই বলে? অঘোষিত সাফল্য অবশ্য আরও অনেক বেশি।

বি পি সাহার মুখে হাসি নেই। আহা, এই লোকটা যদি এই আফটার শেভ লোশনটা একটু মাখত!

খানিকক্ষণ কাগজপত্র দেখার চেষ্টা করে হেমাঙ্গ বলল, ইটস্ ও. কে. মিস্টার সাহা।

বি পি সাহা একটা অস্পষ্ট থ্যাংক ইউ বলে উঠে গেল। দরজাটা বন্ধ হল। ঘরে হেমাঙ্গ একা।

মাঝে মাঝে কাজ করতে তার ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে তার অনেক দিনের ছুটি নিয়ে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে মনে হয়, যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়। কিছুক্ষণ চোখ বুজে চুপ করে বসে সে কোনও একটা সুন্দর বেড়ানোর জায়গার কথা ভাবল। কিন্তু তেমন আকর্ষক কিছুই মনে পড়ল না। পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্র সে কি অনেক দেখেনি? খুবই আশ্চর্যের বিষয় এবং লোকে শুনলে হয়তো হাসবেও—তার প্রিয় বেড়ানোর জায়গা হল বড় বড় দোকান, যেখানে অজস্র জিনিসের সম্ভার। নতুন নতুন জিনিস। গ্যাজেটস। ইলেকট্রনিকস্।

বেশীক্ষণ বিষয়কর্মকে প্রত্যাখ্যান করে থাকা গেল না। একটু বাদেই বেয়ারার চিরকুট। তার কিছুক্ষণ পরেই বি পি সাহার কার্বন কপি আর একজন বিষয়ী লোক। তারপর, আরও একজন। তারপর ইনকাম ট্যাক্স-এর একটা হিয়ারিং সেরে আসতে হল।

তিনটের পর কফি খাওয়ার সময় গন্ধটা সম্পূর্ণ লোপাট হয়ে গেল। অন্তত ততটা রইল না, যতটায় ইনস্যাট বি-এর কাছাকাছি উঠে থাকা যায়।

মেয়েটা এল বিকেলের দিকে। আর এক ঘণ্টা পরে এলেই হত। তখন থাকত না হেমাঙ্গ। দেখা না করেও উপায় নেই। তার এক জ্যাঠার চিঠি নিয়ে এসেছে। ভুনি জ্যাঠা তার বাবার খুড়তুতো দাদা। এক সময়ে কোলিয়ারি ছিল। এখন ব্যবসা না থাক, টাকা আছে।

মেয়েদের মুখের দিকে চট করে তাকায় না হেমাঙ্গ। তাকালেই নানা বখেরা। মুখটা নিচু রেখেই বলল, চাকরি চান? কোয়ালিফিকেশন কী?

আমি একটা অ্যাপ্লিকেশন এনেছি। বায়োডাটা দেওয়া আছে।

ভুনি জ্যাঠার ক্যান্ডিডেটকে খুব একটা হেলাফেলা করার উপায় নেই। এই জ্যাঠামশাইটি রাশভারী ব্যক্তিত্ববান মানুষ। তিন ছেলে পুলিশ ও প্রশাসনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি করে। এই তিন দাদাই হেমাঙ্গকে প্রয়োজনে প্রচুর সাহায্য করে থাকে। ভুনি জ্যাঠা কারও অনুগ্রহ নেয় না বড় একটা। আত্মমর্যাদাজ্ঞান খুব টনটনে। কিন্তু এই মেয়েটিকে নিশ্চয়ই বিশেষ কারণেই পাঠিয়েছেন হেমাঙ্গর কাছে। হেমাঙ্গ তাই দরখাস্তটা পড়ল। ইলেকট্রিক টাইপ রাইটারে দামী হ্যান্ডমেড কাগজে ছাপা দরখাস্তটা থেকে জানা গেল, মেয়েটির বয়স কুড়ি এখনও পূর্ণ হয়নি। আর্টস গ্র্যাজুয়েট এবং কমপিউটার ট্রেন্ড।

হেমাঙ্গর জীবনে একটা মস্ত বড় ঘাটতির ব্যাপার হল, সে চট করে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। বোধ হয় কতগুলো ব্যাপারে সে অত্যন্ত সতর্ক মানুষ বলেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে চারদিক বিচার বিবেচনা করে। মেয়েটির চেয়েও ভুনি জ্যাঠা তার কাছে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাকটর। তারা—অর্থাৎ হেমাঙ্গর গোটা পরিবারটিই আসলে পূর্ববঙ্গের। তবে দাদুর আমল থেকেই, অর্থাৎ দেশ ভাগের অনেক আগে থেকেই তারা কলকাতার বাসিন্দা বলে পূর্ববঙ্গের পরিচয়টা প্রায় মুছে যাওয়ার জোগাড়। কিন্তু কয়েকটা ব্যাপারে এখনও তারা বাঙাল। ঘোরতর বাঙাল। তার মধ্যে একটা হল, আত্মীয় বৎসলতা। লতায় পাতায় আত্মীয়দেরও উপেক্ষা করার জো নেই। এই ছোট পরিবারের যুগেও তাদের এই রীতিটি বজায় আছে। আত্মীয়দের উপেক্ষা করা যাবে না। সুতরাং এই মেয়েটির তাদের আত্মীয় হওয়ারই সম্ভাবনা।

হেমাঙ্গ মৃদু স্বরে বলল, কিছু মনে করবেন না, আপনি ভুনি জ্যাঠামশাইয়ের কোনও আত্মীয় নন তো!

এবারও হেমাঙ্গ মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল না। দরখাস্তর দিকে চোখ রেখেই বলল।

মেয়েটি জবাব দেওয়ার আগেই হঠাৎ পর পর দুটো হাঁচি দিল।

হেমাঙ্গ মুখ তুলে দেখল, মেয়েটা রুমালে মুখ চাপা দিয়ে ভীষণ লজ্জার ভঙ্গিতে বসে আছে। আর খুবই উদ্বেগের কথা যে, মেয়েটি আপাদমস্তক সপসপে ভেজা।

হেমাঙ্গ ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের কাচের শার্সির ভিতর দিয়ে দেখল, বাইরে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। বদ্ধ অফিসঘরে কৃত্রিম আলোয় এতক্ষণ বুঝতে পারেনি। ভেজা মেয়েটির নিশ্চয়ই ঘরের ঠাণ্ডাটা সহ্য হয়নি।

ইস, আপনি যে ভিজে গেছেন!

রোগা চেহারার মেয়েটি সলজ্জ মুখে মৃদু স্বরে বলল, হ্যাঁ। একটু ভিজেছি। ছাতাটা ভুল করে সঙ্গে আনিনি।

হেমাঙ্গ উঠে এয়ারকণ্ডিশনারটা বন্ধ করে দিল। বলল, সরি। আমি এতক্ষণ লক্ষ করিনি যে আপনি ভিজে গেছেন। তোয়ালে দেবো?

মেয়েটি মাথা নেড়ে ভীষণ লজ্জার সঙ্গে বলে, না, তার দরকার নেই।

মুখটা চেনা-চেনা লাগছে হেমাঙ্গর। কোথায় দেখেছে একে? তার স্মৃতিশক্তি চমৎকার। কিন্তু মনে করতে সময় লাগবে। মুখখানার মধ্যে একটা ধারাল সৌন্দর্য আছে। মাথায় মেঘের মতো চুল।

আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি বলুন তো!

দেখেছেন, তবে মনে থাকবার কথা নয়।

কোথায় বলুন তো!

নন্দনাদের বাড়িতে। সেদিন ওর ভাইয়ের জন্মদিন ছিল। আমি অবশ্য আপনাকে চিনি।

হেমাঙ্গর টক করে মনে পড়ল। এই মেয়েটি তাকে একটা কোল্ড ড্রিংক দিয়েছিল। সঙ্গে একটু হাসি। হেমাঙ্গর মাথায় একটা টিকটিকি ডাকছিল। সে বলল, ওদের বাড়িতে কি আপনার যাতায়াত আছে?

হ্যাঁ। আমরা প্রতিবেশী।

হেমাঙ্গ অবাক হয়ে বলে, কিন্তু ভুনি জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে আপনার পরিচয় হল কি করে? উনি তো সল্ট লেক-এ থাকেন।

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলে, পরিচয় নেই তো।

তাহলে এই চিঠিটা?

ওটা তো চারুমাসী এনে দিয়েছে।

মাই গড! তাহলে তো আপনি আসলে আমার ওই বিচ্ছু দিদিটির রেফারেন্সেই এসেছেন। কিন্তু ও নিজে চিঠি দিল না কেন? ফোনও করতে পারত।

মেয়েটি সলজ্জ একটু হেসে বলে, উনি বলছিলেন আপনি ওকে বেশী পাত্তা দেন না। তাই কোন এক আত্মীয়ের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসে দিলেন। আপনি কিছু মনে করেননি তো! কনস্‌পিরেসিটায় কিন্তু আমি ছিলাম না।

বুঝেছি। আমার ওই দিদিটিকে আমি ভালই চিনি। এনিওয়ে, আমি দরখাস্তটা রেখে দিচ্ছি। এই ভেজা অবস্থায় আপনার আর বেশীক্ষণ থাকা উচিত নয়। তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যান।

মেয়েটি দরজার কাছ অবধি চলে গিয়েছিল। হেমাঙ্গ আর একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, বাইরেটা বৃষ্টির তোড়ে সাদা হয়ে গেছে। এ বৃষ্টিতে এ মেয়েটি তো কোথাও যেতে পারবে না। নিশ্চয়ই গাড়ি কমে এসেছে রাস্তায়। আর বাসে এখন সাঙ্ঘাতিক ভিড় হবে।

শুনুন। আপনি বরং একটু অপেক্ষা করে যান। এই বৃষ্টিতে বেরোতে পারবেন না।

আমি ঠিক চলে যেতে পারব।

পারবেন না। রাস্তায় জল জমে গেছে। বেশী বৃষ্টি হলে কলকাতার অবস্থা কী হয় তা আমি জানি।

আমি জল ভেঙেই এসেছি।

এইরকম দুর্যোগের দিনে না আসাই ভাল ছিল। বসুন। সর্দি তো বোধ হয় লেগেই গেছে। আর নতুন করে লাগবে না।

মেয়েটি জড়সড় হয়ে বসল। খুব সংকোচ।

আপনি কি খুব নিডি? চাকরি খুঁজছেন কেন?

নিডি। তবে আমার বাবা খুব ভাল চাকরি করেন। কিন্তু বাবার একটা হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল। ম্যাসিভ অ্যাটাক। এখন আমাদের অবস্থা কিছুটা আনসার্টেন। চাকরিটা সেই জন্যই দরকার।

মেয়েটা আর একবার হাঁচল এবং ভীষণ লজ্জা পেল। রুমালে নাক মুখ চাপা দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করা সত্ত্বেও আরও তিনবার হাঁচতে হল তাকে।

বাবার ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকের কথা সেদিন আরও একটা মেয়ে বলছিল না? হেমাঙ্গ একটু ভাবতেই বছর পনেরোর কিশোরীটিকে মনে করতে পারল। কিশোরীটি বড্ড বেশী স্মার্ট।

মৃদু হাসি মুখে হেমাঙ্গ বলে, সেদিন পার্টিতে কি আপনার একটি ছোট বোনও ছিল? নিয়ার অ্যাবাউট ফিফটিন!

নাক থেকে রুমাল সরিয়ে মেয়েটা মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ, অনু। আপনার সঙ্গে নাকি তার খুব ভাব হয়ে গেছে বলছিল।

ওটি আর একটি বিচ্ছু, তাই না!

মেয়েটি হাসল। কিছু বলল না।

হেমাঙ্গ দরখাস্তটা তার ব্যক্তিগত ফাইলে রেখে দিয়ে বলে, আমাদের কোম্পানি ছোট, আমরা চারজন পার্টনার এটা চালাই। আমাদের এখানে স্টাফ খুব কম দরকার হয়। কম্পিউটারেও লোক আছে। আপনার জন্য অন্য কোনও ক্লায়েন্টকে বলে একটা কিছু করার চেষ্টা করব। কম্পিউটার ট্রেনিং থাকলে কাজ পাওয়া সহজ।

মেয়েটা আবার হাঁচি দিতেই খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে হেমাঙ্গ। এর তো ভালরকম ঠাণ্ডা লেগেছে দেখা যাচ্ছে। অথচ বাইরে প্রবল থেকে প্রবলতর বৃষ্টি হচ্ছে। অকালেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। রাস্তায় বোধ হয় এখন হাঁটুজল এবং প্রবল জ্যাম। বৃষ্টি হলেই একটা দুটো গাড়ি ব্রেকডাউন হয়ে রাস্তা আটকে রাখে। কলকাতা অচল হয়ে পড়ে।

মেয়েটা আর একবার উঠবার চেষ্টা করতেই হেমাঙ্গ একটু কড়া গলায় বলে, কোথায় যাচ্ছেন?

বাড়ি যেতে হবে যে।

যেতে তো সবাইকেই হবে। কিন্তু কলকাতায় কেউ কখনও সময়মতো কোথাও পৌঁছোতে পারে কি? আপনি বরং টেলিফোনে বাড়িতে খবর দিতে পারেন। বাড়িতে কি টেলিফোন আছে?

আছে।

তাহলে টেলিফোন করে দিন। বলে হেমাঙ্গ যন্ত্রটা এগিয়ে দিল।

মেয়েটা এই বদান্যতায় যেন মরমে মরে যাচ্ছে। খুব সংকোচের সঙ্গে বোম টিপল। বারতিনেকের চেষ্টায় লাইন পেয়ে মৃদুস্বরে বলল, মা, বৃষ্টিতে আটকে গেছি। ফিরতে দেরি হবে একটু।

সংলাপটা শুনবে না বলেই হেমাঙ্গ উঠে এসে জানালার একটা পাল্লা খুলে দিল। এয়ার কন্ডিশনারটা বন্ধ করায় ঘরটা একটু ভেপে উঠছে। জানালা দিয়ে অবশ্য প্রবল বৃষ্টির ছাঁট এল। তবু উঁকি মেরে নিচের অবস্থাটা

একটু দেখে নিল হেমাঙ্গ। পথঘাট দেখা যাচ্ছে না বৃষ্টিতে।

জানালাটা বন্ধ করে চেয়ারে এসে বসল হেমাঙ্গ।

মেয়েটা নিজের সর্দির নাক সামলাতে ব্যস্ত।

হেমাঙ্গর এবার মেয়েটির দিকে অকপটে তাকাতে বাধা হল না। সে বলল, আপনাদের সংসার কি বড়?

আমরা তিন ভাই বোন। মা আর বাবা।

ভাই কি করে?

পড়ছে।

আপনার বাবা এখন কেমন আছেন?

একটু ভাল। কাল বাবাকে বাড়িতে আনা হবে।

একটা কাজ করুন। রাস্তায় জল জমে আছে, আমার ছোট গাড়ি ফেঁসে যাবে। একটু যদি অপেক্ষা করেন তো আমি আপনাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আসতে পারি।

এই বদান্যতায় মেয়েটা ভীষণ হকচকিয়ে গিয়ে বলল, না না! তার দরকার নেই।

এই মধ্যবিত্ত সংকোচের কোনও মানেই হয় না। এটা হল সুযোগসন্ধানীদের যুগ। কোনও সুযোগ বা সুবিধা প্রত্যাখ্যান করতে নেই। কিন্তু এই মেয়েটির এখনও সেইসব কার্যকরী শিক্ষা হয়নি। কিংবা একা পুরুষের সঙ্গে গাড়িতে যাওয়া কি এর কাছে সতীত্ব বিরোধী ব্যাপার? কে জানে কি! মেয়েদের চরিত্র ভাল করে জানে না হেমাঙ্গ।

সে বলল, দরকার না থাকলেও বসুন। এই বৃষ্টিতে যেতে পারবেন না। বরং একটু গরম চা বা কফি খান। আপত্তি নেই তো?

মেয়েটি আবার হাঁচল। লজ্জা পেল। ফর্সা রংটা লালও হয়ে গেল একটু। বলল, দরকার নেই।

কেন যে এত সংকোচ করছেন! বলে বেল বাজিয়ে বেয়ারা ডেকে দু কাপ কফির কথা বলে দিল।

লজ্জায় মরে যাচ্ছে মেয়েটি। যেন চাকরির উমেদারিতে এসে এই আপ্যায়ন গ্রহণ করাটা অন্যায় হয়ে যাচ্ছে।

কফি এল। দেখা গেল মেয়েটি কফিটা খুব উপভোগ করছে। দু হাতে কাপটা ধরে আছে সাবধানে। লজ্জা পাচ্ছে। কিন্তু ওর মুখ বলছে, কফিটা ওর খুব দরকার ছিল।

বৃষ্টিটা ঝপ করে অনেকটা কমে গেল কফি খাওয়ার দশ মিনিট পর। ধরেনি অবশ্য। তবে ঝিরঝির করে পড়ছে। উদ্দাম নাগা-নৃত্যটা বন্ধ হয়েছে। আর একটু অপেক্ষা করতে পারলে রাস্তার জলও কিছুটা সরে যাবে। হেমাঙ্গর ভয় তার ছোট গাড়িটা নিয়ে। ইঞ্জিনে জল ঢুকে মোটর বন্ধ হয়ে গেলে ঠেলাঠেলির অনেক ঝামেলা।

কফি খেয়ে মেয়েটা সত্যিই উঠল, এবার আমি যাবো।

হেমাঙ্গ একটু হেসে বলল, ঠিক আছে। আসুন।

মেয়েটা চলে যাওয়ার পর হেমাঙ্গ তার কাজকর্মে একটু ব্যস্ত রইল। কয়েকটা বিষয়কর্মজনিত ফোন এল। পার্টনার চঞ্চল বোসের সঙ্গে একটু আড্ডা হল। ঘণ্টা দেড়েক বাদে বুঝতে পারল রাস্তার জল নেমেছে। যাওয়া যাবে।

গাড়ি স্টার্ট নিল একবারেই। রাস্তায় কোনও ঝঞ্ঝাট হল না।

ফোনটা এল রাত আটটার পর। বাইরে আবার বৃষ্টি পড়ছে। বিছানায় খুব আলস্যে এলিয়ে আধশোয়া হয়ে টি ভি-তে একটা সিরিয়াল দেখছিল হেমাঙ্গ।

ফোনটা কানে তুলতেই হ্যালোর বদলে মেয়েলী গলায় শোনা গেল, ছিঃ!

হেমাঙ্গ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, হাঁচলি নাকি?

ছিঃ ছিঃ! তোর লজ্জা করে না?

কিসের লজ্জা?

একটা মেয়েকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে না দিয়ে বৃষ্টিতে ওভাবে ছেড়ে দিলি? জানিস ওর এখন একশ এক ডিগ্রি টেম্পারেচার!

হেমাঙ্গ অপ্রতিভ হয়ে বলে, ওই ঝুমকি মেয়েটার কথা বলছিস নাকি?

তবে আর কার কথা বলছি! তোর মনুষ্যত্ব যে এত কমে গেছে, তুই যে এত হৃদয়হীন হয়ে গেছিস তা তো জানতুম না।

ঝুমকি কি তাই বলেছে তোকে?

বলার আর কী আছে?

আমি ওকে লিফট অফার করিনি একথা বলেছে?

মোটেই তা বলেনি।

তাহলে আমার দোষটা কোথায় বল তো!

ও লজ্জা পেয়েছিল, তাই বলে তুই ওকে জোর করে তো পৌঁছে দিতে পারতিস!

হেমাঙ্গ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, জোরও করা যায় নাকি? মেয়েটা অমন ভ্যাবাগঙ্গারাম আর লজ্জাবতী লতা হলে আমার কি করার আছে? আমি হিউম্যান পয়েন্টে যতটুকু করার করেছি।

বেচারার কোল্ড অ্যালার্জি আছে। বৃষ্টিতে ভিজে বুকে কনজেশন হয়ে কী অবস্থা! তার ওপর ওর বাবা এখন নার্সিং হোমে। তুই কী বল তো!

হেমাঙ্গ একটু চটে গিয়ে বলে, তখন থেকে কেন যে টিকটিক করছিস। বললাম তো, মেয়েটাকে পৌঁছে দিতে চেয়েছি, ও রাজি হয়নি।

একটা ছাতা তো দিতে পারতিস?

আমার ছাতা কোথায়?

কারও কাছ থেকে ধার করেও তো দিতে হয়। তোর মতো সকলের তো গাড়ি নেই। গরিবদের কথাও দিনের মধ্যে কিছুক্ষণ ভাবতে হয়। পৃথিবীতে কত পারসেন্ট গরিব তা জানিস?

লেকচার দিস না। মেয়েটা মোটেই গরিব নয়। ছাতাটা ভুলে ফেলে এসেছিল। ওরকম আনস্মার্ট, ভুলো মন আর বোকা মেয়েকে আমি কোনও চাকরি দিতে পারব না। সরি।

আহা, চটছিস কেন?

মেয়েটা তোর কাছে গিয়ে চুকলি কেটেছে তো! ঠিক আছে, ওরকম মেয়েকে চাকরি দেওয়ার কোনও দায়িত্বই আমার নেই।

মোটেই চুকলি কাটেনি। ও সেরকম মেয়েই নয়। বোকা হাঁদাও নয়, আনস্মার্টও নয়। তবে লাজুক সেকথা ঠিক। আর তোর মতো ইডিয়ট ছাড়া সবাই জানে যে, লজ্জাই ললনার ভূষণ।

ভূষণ মানে জানিস?

কেন জানব না? তোর মতো মূর্খ নাকি? ভূষণ মানে গয়না।

ঠিক কথা। গয়না হল বাহুল্য জিনিস, এ যুগে চলে না। ওয়ার্কিং গার্লরা যেমন গয়না অ্যাভয়েড করে তেমনি লজ্জাও অ্যাভয়েড করতে হয়। নাচতে নেমে ঘোমটা টানলে তো চলবে না। চাকরিও করব, আবার নববধূর মতো মাথা নিচু করে থাকব তা কি চলে রে? ও হল অচল মাল।

তোর কথাবার্তাগুলো এত জংলি টাইপের। যাক গে, ক্ষমা করে দিচ্ছি। তোকে যে কেন এত ক্ষমা করতে হয় তা বুঝি না বাবা।

ভুনি জ্যাঠামশাইকে এর মধ্যে টেনে নামিয়ে তুই যে কাণ্ডটা করলি সেটা কিন্তু ক্ষমার যোগ্য অপরাধই নয়। জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা হলে আমি জিজ্ঞেস করব ইদানীং তিনি কেন অন্যের কথায় অজ্ঞাতকুলশীল সম্পর্কে ফলস স্টেটমেন্ট এবং রেকমেন্ডেশন দিচ্ছেন।

মারব থাপ্পড়! কে অজ্ঞাতকুলশীল রে? ঝুমকিকে আমি খুব ভাল চিনি।

কিন্তু জ্যাঠামশাই চেনে না।

আমি চিনলেই হবে। ভুনি মামার চেনার তো দরকার নেই।

এইসব মিথ্যাচারের জন্য তোর নরকবাসের মেয়াদ কত বেড়ে যাচ্ছে তা জানিস? ভাল চাস তো এখনও অন্তরটা পরিষ্কার কর। ঝাঁটা বালতি নিয়ে লেগে যা। তোর মনে অনেক ময়লা জমে আছে।

২১

দাদুর কাছে পটল শুনেছে, পুলিন ডাক্তার সব বিদ্যেই জানে। হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি, কবরেজি, এমন কি চাঁদসী অবধি। অথচ পুলিন ডাক্তারের একটাও পাশ করা নেই। ধরা পড়লে ডাক্তারদাদুর জেল-জরিমানা সবই হতে পারে।

দুই বুড়ো মানুষে কথা হচ্ছিল একদিন, তখন পটল শুনেছে। ডাক্তারদাদু বড়াই করে বলল, আমি থাকলে বিষ্ণুপুর শীতলাতলা কবে ওলাবিবির গরাস হয়ে যেত তা জানো? ম্যালেরিয়া, মা শীতলার দয়া, সান্নিপাতিক, সন্ন্যাস মানুষের কোন রোগ-ভোগ সামাল দিইনি বলো। পাশ-করা ডাক্তার তখন কোথায় ছিল সব! আমি অ্যালোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি আলাদা করে ধরি না বাপু, রোগে পড়লে যার যা সয় দিই। গাঁ গঞ্জে সব রকমই লাগে। অনেকের অ্যালোপ্যাথি ওষুধ কেনার পয়সা থাকে না, অনেকের সহ্য হয় না, অনেকে আবার কবরেজির ভক্ত। সব বন্দোবস্ত রাখতে হয়েছিল সেইজন্যই।

পটল বিদ্যের ব্যাপারটা বোঝে না। তবে ডাক্তার দাদুকে তার বেশ লাগে। মজার মানুষ। বাইরের দিকে পাকা একখানা ঘরে ডিসপেনসারি। চারটে বড় বড় আলমারি ভর্তি ওষুধ। মদন কম্পাউন্ডার লোকটিও ভাল। সন্ধেবেলায় বটতলায় হারুর সাইকেলের দোকানে বসে গাঁজা খায় বটে, কিন্তু এমনিতে ভারি হাসিখুশি। কাউকে চটায় না, ঝগড়া করে না। ডিসপেনসারিতে নানা লোক আসে। রুগী তেমন কেউ না এলেও, গল্প করতে মেলা লোক আসে। বুড়ো মানুষই বেশী। তাদের কেউ কেউ ডাক্তার দাদুকে দিয়ে ব্লাড প্রেশার মাপিয়ে নেয়, কেউ বুকটা একটু এমনিই পরীক্ষা করিয়ে নেয়। বাদবাকি সময় গল্প হয়।

পটল মাঝে মাঝে গোপালকে নিয়ে এসে বসে থাকে এক ধারটায়, কাঠের বেঞ্চে। ডাক্তারদাদু অনেকদিন আগেই বলে দিয়েছে, ও হল জন্মের রোগ। ও কি সারে রে!

কত অসুখের তো কত ওষুধ বেরিয়ে গেছে দাদু। পেনিসিলিন, আরও সব কী যেন!

দুনিয়ায় কত বোবা-কালা আছে জানিস? ওষুধ থাকলে কবে সবাই ভাল হয়ে যেত।

তাহলে গোপালের কী হবে?

কি আর হবে! বোবা-কালাদেরও ব্যবস্থা আছে। ডিফ অ্যান্ড ডাম্বদের ইস্কুল আছে, লেখাপড়া শিখতে পারে।

হোমিওপ্যাথিতে তো কত মরো-মরো মানুষও বেঁচে ওঠে। নেই ওরকম কোনও ওষুধ?

থাকলে কি বসে থাকতুম রে! মানুষকে ভগবান অনেক বিদ্যে দিয়েছেন বটে, কিন্তু সবটুকু তো আর দেননি। মানুষ যে ভগবান নয়, এটা যাতে সর্বদা মনে রাখে, সেইজন্যই দেননি।

কথাটা পটলের বিশ্বাস হয় না। ডাক্তারদাদুকে ছেড়ে মাঝে মাঝে মদন কম্পাউন্ডারের কাছেও ব্যাপারটা বলেছে, দাও না একটা ওষুধ মদনকাকা। গোপালের জন্য একটা ওষুধ ঠিক পাওয়া যাবে। ভাল করে খুঁজে দেখ।

মদন অবশ্য সরাসরি না করে দেয় না। এক-আধটা পুরিয়া দিয়ে বলে, দেখ খাইয়ে। ঠাকুরের নাম করে খাওয়াস। শাস্ত্রে বলেছে, মূকং করোতি বাচালং। দেখ কী হয়।

হয়নি। গোপাল এখনও কানে শোনে না। কথাও বলে না।

বটতলায় আগে বুধবারে হাট বসত। হাটেই গাঁয়ের মানুষ হপ্তার বাজার করে রাখত। আজকাল আর সেই দুঃখ নেই। বটতলায় পাকা বাজার বসে গেছে। তবে বুধবারের হাট এখনও হয়। মেলা ব্যাপারী আসে। তাদের মধ্যে এক জড়িবুটিওলাও আছে। নানারকম হাড়গোড়, তেল, ভস্ম, গুঁড়ো, পাথর সব থাকে তার কাছে। ভিড়ও হয়। তার কাছ থেকেও ওষুধ নিয়েছিল পটল। একটা গাছের শেকড় মধু দিয়ে বেটে খাওয়াতে হয়েছিল। কাজ হয়নি।

কিসে কাজ হবে, পটল তা নিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবে। আকাশে এরোপ্লেন ওড়ে, চাঁদে মানুষ যায়, অ্যাটম বোমা, টেলিফোন কত কী তৈরি করেছে মানুষ, আর গোপালকে কথা কওয়াতে পারবে না? সে একবার তার বড় জ্যাঠাকে চিঠিতে লিখেছিল, আপনি তো বিলেত আমেরিকা যান। গোপালের জন্য ওষুধ এনে দেবেন? সে চিঠির জবাবে জ্যাঠামশাই লিখেছিল, এর কোনও চিকিৎসা নেই। তবে তুমি বড় হয়ে এটা নিয়ে গবেষণা কোরো। মানুষ চেষ্টা করলে সব পারে।

সাধু-সন্ন্যাসীরা হয়তো পারে। কিন্তু জটাজুটওলা লোক দেখলেই পটল ভয় খায়। তান্ত্রিক শুনলেই তার বুক হিম হয়ে যায়। গোপালের জন্য আজও সে কোনও সাধুকে ধরতে পারেন। তবে জলপড়া, চরণামৃত খাইয়েছে অনেক।

গোপাল যদি কথা বলতে পারত তাহলে তাকে দাদা বলে ডাকত। দুই ভাইয়ে কত প্রাণের কথা হত। সে যখন কথা বলে তখন গোপাল একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। চেয়ে থাকলে গোপাল খানিকটা তার কথা বুঝতেও পারে। পেনসিল, বই, এক গেলাস জল, মাদুর, ঘটি এসব আনতে বললে ঠিক এনে দেয়। কিন্তু না তাকালে বুঝতে পারে না।

পটল মনে মনে ঠিক করে রেখেছে বড় হয়ে সে ডাক্তার হবে। ডাক্তার হওয়া শক্ত। পড়াশুনো খুব কঠিন। তার আগে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় খুব ভাল ফল হওয়া চাই। তাই সে আজকাল খুব কষে পড়ে। কিন্তু পড়ার ঝোঁকটা বজায় রাখতে পারে না। দুদিন খুব পড়ল তো চারদিন আর রোখটা রইল না।

ডাক্তারদাদু যে পাশ করা ডাক্তার নয়, তা সে জানে। তবু আজ বৃষ্টি-ভেজা সকালে ভাইকে নিয়ে সে এসে বসেছে ডিসপেনসারিতে। ডাক্তারদাদু একবার চোখ তুলে তাকে দেখে বলল, কী ব্যাপার রে? তোর দাদুর কিছু হল নাকি আবার!

না, দাদু ঠিক আছে। তবে মায়ের বড় দাঁতের ব্যথা হচ্ছে।

কিরকম ব্যথা? নড়ছে নাকি?

তা জানি না, ব্যথা হচ্ছে খুব।

ব্যথার ওষুধ খাইয়ে চাপা দিয়ে রাখ। পরে দাঁতের ডাক্তার দেখিয়ে নিস। পেয়ারা পাতা সেদ্ধ করা জলে মুখ ধুতে বলিস।

ভেজা গায়ে পটল আর গোপাল বেঞ্চে বসে থাকে। ডাক্তারদাদু একটা মোটা বই পড়তে থাকে। মদন তার টুলে চুপ করে বসে থাকে। আজ আড্ডার লোক নেই, রুগী নেই।

ডাক্তার দাদু, একটা কথা বলব?

কি কথা?

ডাক্তার হতে গেলে কী করতে হয়?

কপাল লাগে। কপাল ছাড়া হয় না। আমার দু-দুটো দামড়াকে কত তৈরি করলুম, তা দুটোই ধ্যাড়াল।

খুব পড়তে হয়, না?

না পড়লে কি হয়! পড়াই তো আসল জিনিস। পড়তে হয়, বুঝতে হয়, মাথা খাটাতে হয়। শরীরের মধ্যে কি সোজা যন্ত্রপাতি রে!

একটু দমে যায় পটল। তার তো তেমন মাথা নেই, সে কি পারবে অত শক্ত জিনিস শিখতে? কিন্তু বোবা-কালা ভাইটার মায়ায় মাখানো করুণ মুখখানার দিকে চাইলে তার বুকে একটা জোর এসে পড়ে। তখন মনে হয়, গোপালের জন্যই তাকে ডাক্তার হতে হবে।

ডাক্তারদাদুর বাড়িতে বোধহয় ইলিশ মাছ ভাজা হচ্ছে। খুব গন্ধ আসছে। পাশে-বসা গোপাল একটু আনচান করে। তারপর দাদার দিকে মুখ তুলে তাকায়। পটল তার মুখখানার দিকে চেয়েই বুঝতে পারে, ওর খাওয়ার লোভ হয়েছে। তার ভাইটা একটু লোভী। খেতে ভালবাসে। কিন্তু চুরি করে খায় না, না দিলে খায় না। লোভ হলে শুধু পটলকে এসে ঝাঁকুনি দেয়।

পটল উঠে পড়ল। বাইরে এখনও বৃষ্টি হচ্ছে। তবে তারা দুজনেই ভিজে ঝুব্বুস হয়ে আছে, আর ভিজলেও ক্ষতি নেই।

কোথায় চললি রে বৃষ্টি-বাদলায়? মায়ের জন্য ওষুধ নিলি না?

দাও।

চারটে ট্যাবলেটের একটা রাংতার পাতা দিল মদনকাকা।

ডাক্তার দাদু বলল, তোদের ইলেকট্রিক লাইন এসেছে নাকি? পরশু দিন যেন তার টানতে দেখলাম।

হ্যাঁ। আর দু'চারদিনের মধ্যেই এসে যাবে।

হুঁঃ! খামোখা পয়সা জলে দিচ্ছে রামজীবন। আমার বাড়িতে তো কবে থেকে আছে, তা হপ্তায় জ্বলে ক'দিন? ভরসা তো সেই হ্যারিকেন লণ্ঠন। আদি সনাতন জিনিস। তা শখ হয়েছে যখন লাগিয়ে নে। রামজীবনের পয়সাটা যে কোত্থেকে আসছে!

আজকাল পটল বড়দের অনেক কথার ভিতরকার অর্থ বুঝতে পারে। আগে পারত না। তার বাবা রামজীবনের যে বাজারে কিছু বদনাম আছে তা সে খুব টের পায়। কিন্তু বাবা বলেই যে, সে গাল পাড়বে, এমন নয়। আসলে বাবাকেও তার বিশেষ পছন্দ হয় না। তার বাবা রামজীবন স্মাগলিং বা চুরি-ডাকাতি গোছরই কিছু করে বলে, সে আবছা শুনেছে। বটতলায় রামজীবনের যে আড্ডা আছে, সেখানে খুব খারাপ

খারাপ লোকের জমায়েত হয়। তবে বাবার ওপর তার রাগের কারণ সেসব নয়। রাগ হয়, কারণ মাঝে মাঝে মাতাল হয়ে এসে রামজীবন গোপালকে বড্ড মারে। মারার কোনও কারণই নেই। গোপাল কিছু দুষ্টুমি করে না, দোষঘাট করে না।

বৃষ্টিতে গোপালকে নিয়ে বেরোতেই সামনে ইস্কুলের মাঠে একটা বাজ পড়ল যেন! নীল চোখ-ধাঁধানো আলো দেখেই কুঁকড়ে গিয়েছিল পটল। শব্দটা এত জোরে হল যেন কেউ ঠাস করে গালে থাপ্পড় মারল। আর তারপরই কান দুটোয় যেন তালা লেগে গেল একেবারে।

গোপাল হাঁ করে চেয়ে ছিল পটলের দিকে। অত বড় বাজের শব্দটা ও শুনতেও পায়নি। সবাই বলে, কানে শুনতে পায় না বলেই গোপাল কথা বলতে পারে না। কানটা যদি ভাল হয়ে যায় তাহলেই কথাও কইতে পারবে।

আজ বাজ ঠাকুর ক্ষেপে আছে মনে হয়। বটতলার দিকে একটা আর ঘোষপাড়ার দিকে দুটো বাজ বাতাসে যেন আগুন ধরিয়ে দিল। ভয় হচ্ছে। এত বাজ তো কখনও পড়ে না! আকাশটা যেন আরও কালচে হয়ে এল। বাতাস বইছে রাবণরাজার মতো অট্টহাসি হেসে। বৃষ্টিতে তলোয়ারের ধার। কাদা-মাখা রাস্তায় গোপালকে নিয়ে ছুটতে থাকে পটল।

বাড়ি অবধি যেতে পারল না তারা। বৃষ্টি এত জোরে নামল, আর এত বাতাস যে পথঘাট সব গুলিয়ে গেল। বাজ পড়ছে খুব।

ইস্কুলবাড়ির পাকা দাওয়ায় উঠে পড়ল পটল। গোপাল খুব ঘেঁষ হয়ে দাঁড়ালো তার গায়ের সঙ্গে। ভয় পেলে পটলের সঙ্গে লেপটে থাকে গোপাল।

আজ রবিবার। ইস্কুল বন্ধ। চারদিকটা খাঁ খাঁ করছে। টানা লম্বা দুটো টিনের চালের ঘর নিয়ে ইস্কুল। একটা পাকা দোতলা বাড়ি উঠছিল, সেটার একতলার ছাদ ঢালাই হয়নি, তার আগেই টাকার জন্য কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। চার-পাঁচ বছর ধরে বন্ধ হয়ে আছে, মাঝখানে গাছ উঠেছে, দেয়ালগুলোয় শ্যাওলা।

ইস্কুলবাড়ির দরজা জানালা সব ভাঙা, বেশীর ভাগেরই পাল্লা নেই। তারা দুজনে একটা ঘরে ঢুকে দেখল, একটা ছাগল তার দুটো বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভিতরে। মেঝেয় ছাগলের নাদি। বৃষ্টির ঝাপটায় বেঞ্চগুলো সব ভেজা। পাগলা বাতাসে জানালার দু-তিনটে পাল্লা ঠকাস করে বন্ধ হচ্ছে, ফের মচাক করে খুলে যাচ্ছে।

পটল এই ইস্কুলেই পড়ে। এই ইস্কুল থেকে যারা পাশ করে গেছে তাদের মধ্যে একমাত্র বড় জ্যাঠামশাই ছাড়া আর কেউ বড় মানুষ হয়নি। সে কি পারবে ডাক্তার হতে? তবে বড় জ্যাঠামশাইয়ের কথা ভাবলে তার খুব অহংকার হয়। জ্যাঠামশাই ইস্কুলের শেষ পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করায়, ইস্কুল একদিন বন্ধ দিয়েছিল।

ব্ল্যাকবোর্ডে একটা আধখাওয়া অঙ্ক জ্বলজ্বল করছে। মোছা হয়নি। অঙ্কটার দিকে চেয়ে থাকে পটল। বড় ক্লাসের অঙ্ক। সে কিছুই বুঝতে পারে না। এখনও এই ইস্কুলেই তাকে অনেক ধাপ পেরোতে হবে। কত কী জানতে হবে, শিখতে হবে। তারপর পাশ করেও আবার নতুন করে অনেক পড়াশুনো। পড়াশুনোর কথা ভাবতে ভাবতে তার মনটা খারাপ হয়ে যায়। মাথাটা ঝিমঝিম করে।

বেলা অনেক হয়েছে। গোপাল নানারকম ঘোঁৎ ঘাঁৎ শব্দ করছে। তার খিদে পেয়েছে। খিদে পেলে অমন করে।

টিনের চালে একটা সুপুরির ডোঙা ভেঙে পড়ল। ছাগলটা ম্যা করে মিহি সুরে ডাকল। হঠাৎ তখন ইস্কুলবাড়ির ভূতের কথা মনে পড়ল পটলের। সবাই জানে। ভূতটা হল কমল ঘোষের। এই ইস্কুল তাঁরই তৈরি করা। মরার পরও মায়া ছাড়তে পারেননি বলে ছুটির দিনে নির্জন দুপুরে আর গভীর রাতে নাকি ঘুরে ঘুরে ক্লাসগুলো দেখেন। অনেকেই দেখেছে।

পটল আর দাঁড়াল না। গোপালকে টানতে টানতে বৃষ্টির মধ্যেই ফের বেরিয়ে পড়ল।

ঘোষপাড়ার রাস্তায় পড়ে একবার ফিরে তাকাল পটল। বৃষ্টিতে আবছা ইস্কুলবাড়ির বারান্দায় কি কমল ঘোষ দাঁড়িয়ে আছে। লক্ষ করছে তাদের? গোপালকে টানতে টানতে আরও জোরে দৌড়োতে থাকে পটল। ঘোষপাড়ার পুকুরে দুটো ছেলে গামছা দিয়ে মাছ ধরছে। অনেকক্ষণ বাদে মানুষ দেখে বুকে ফের সাহস ফিরে এল।

বাড়ির মধ্যে একমাত্র দাদুরই কোনও কাজ নেই। মানুষ বুড়ো হলে তাকে আর লেখাপড়া করতে হয় না, ডাক্তার বা মাস্টার হওয়ার চেষ্টা করতে হয় না, চুপচাপ বসে থাকতে হয়। দাদুকে দেখে তাই মনে হয় পটলের। কি করে যে দাদু শুধু বসে থাকে, তা ভেবে পায় না পটল। সে তো দু মিনিট চুপ করে থাকতে পারে না, কী যেন কুটকুট করে কামড়ায় তাকে, তাড়িয়ে বেড়ায়।

আজ সারাদিন বৃষ্টি হচ্ছে। বাজ পড়ছে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হতে চলল, বৃষ্টির থামবার লক্ষণ নেই। উঠোন, বাগান, মাঠঘাট সব একাকার হয়ে গেল জলে। আজ আর কোথাও বেরোনোর নেই পটলের। সারা দুপুর বই কোলে করে বসে থেকেছে পটল। পড়েনি একটা লাইনও। ভেবেছে। বড় হয়ে সে কত বড় ধন্বন্তরী ডাক্তার হবে, জ্যাঠামশাইয়ের মতো কেমন দুনিয়া চষে বেড়াবে, সেইসব ভেবে ভেবেই মাথাটা ভার হয়েছে খুব। বিকেলে একটু ফুটবল খেললে হত। কিন্তু ফিরিঙ্গির মাঠে আজ একহাঁটু জল। ফুটবল নামেইনি। আকাশ আরও ঘোরালো হয়েছে। এ বৃষ্টি সহজে ছাড়বার নয়।

ঘরময় জল। নানা ফুটোফাটা দিয়ে জল পড়ে। ব্যাঙ, পোকামাকড়, সাপখোপ অবধি ঢুকে পড়তে থাকে ঘরের মধ্যে। দেয়ালে বড় বড় কেঁচো বেয়ে বেড়ায়। ঘরের মধ্যে বড় হাঁফ ধরে যায় পটলের।

দুপুরের ঘুম থেকে উঠে দাদু দাওয়ায় বসেছে। গায়ে মোটা একখানা কাঁথা জড়ানো। চেয়ে আছে সুমুখের দিকে। কী যে দেখার আছে, তা বুঝতে পারে না পটল।

নিজেদের ঘরের দাওয়া থেকে দাদুর দাওয়ার তফাত তিন হাতের বেশী হবে না। পটল সেটা লাফ মেরে ডিঙিয়ে গেল।

ও দাদু।

দাদু গম্ভীর মুখখানা তার দিকে ফিরিয়ে বলে, কি রে? ইস্কুলে যাসনি?

আজ, রোববার না!

রোববার বুঝি!

দাদু ওইরকম। বার মাস কিছু খেয়াল থাকে না।

কি করছ বসে বসে?

এই বসে আছি। কি আর করব?

তোমার বসে থাকতে ভাল লাগে?

খারাপ লাগে না। শরীর নেড়ে কিছু তো করার নেই আমার। মনটা সচল রাখতে চেষ্টা করি।

মা যে বলে, অত বসে থাকলে বাত হয়।

তা হয় হয়তো। এখন ডঙ্কা বেজে গেছে, বাতকে আর ভয় কি?

ডঙ্কা বেজে গেছে কেন?

চলে যাওয়ার লগ্ন এসে গেছে রে ভাই।

তুমি কি মরে যাবে দাদু?

তা আর বলতে! পা বাড়িয়ে আছি।

মরে কোথায় যাবে?

বিষ্ণুপদ একটু হাসল, মানুষের বিদ্যেতে এত কিছু আছে, অথচ এ প্রশ্নটার জবাব নেই রে ভাই। কোথায় সে যায়। নাকি কিছুই থাকে না। কে জানে!

তুমি কমল ঘোষকে দেখেছো?

কোন কমল ঘোষ?

আমাদের ইস্কুলের হেড মাস্টার ছিল না?

ওঃ, সেই কমল ঘোষ! চিনবো না মানে? এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় এসে, সে-ই তো প্রথম ইস্কুল খোলার জন্য আদাজল খেয়ে লাগল। কত দৌড়-ঝাঁপ ধরা-করা করে, গাঁটগচ্ছা দিয়ে তাতে ইস্কুল খুলে একটা কাজের মতো কাজ করল। নইলে চার পাঁচ মাইল ঠেঙিয়ে এ গাঁয়ের ছেলেদের ইস্কুলে যেতে হত। প্রথম দিকে তো প্রায় ভিক্ষে করে ইস্কুল চালাতে হত, মাস্টারমশাইরা মাইনে-টাইনে যৎসামান্য পেত। খুব দুরবস্থা গেছে। তবে কমল ঘোষ ছাড়েনি, দমেওনি। আমার সঙ্গে তেমন বনিবনা হয়নি অবশ্য। আমার বিদ্যে বেশী নয় বলে ইস্কুলে চাকরি দিল না। আমি ভিন গাঁয়ে মাস্টারি করতে যেতাম।

কমল ঘোষ মরার পর তার ভূত দেখনি?

ভূত! না দাদা, সেরকম কিছু তো দেখিনি।

কমল ঘোষ এখন তো ভূত হয়ে ইস্কুলে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সবাই জানে।

বিষ্ণুপদ একটু হাসল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তাহলেও তো একটা সমাধান হয় রে!

কিসের সমাধান দাদু?

ভূত হয়েও যদি থাকা যায়, তো, সেটাও তো মস্ত কথা। থাকাটাই তো আসল কথা, ভূত হয়েই হোক, মানুষ হয়েই হোক।

তুমি কখনও ভূত দেখনি দাদু?

বিষ্ণুপদ একটু বিব্রত হয়ে বলে, লোকে তো দেখে বলে শুনেছি। আছে বোধহয়!

তুমি কখনও দেখনি?

বিষ্ণুপদ একটু চুপ করে থেকে বলে, ভূত কি না জানি না, তবে একবার একটা কাণ্ড হয়েছিল।

বলবে! বলে উজ্জ্বল মুখে দাদুর কাছ ঘেঁষে বসল পটল।

তখন এ জায়গায় আমরা সবে এসেছি। চালচুলোর কোনও ঠিক নেই। যে যেখানে পারছে ঘর বেঁধে মাথা গোঁজার জায়গা করছে। দাঙ্গা হাঙ্গামাও হচ্ছে, ঝগড়া কাজিয়াও হচ্ছে, সরকারী লোক, পুলিশও আসছে, চোর

ডাকাত আড়কাঠিরও অভাব নেই। সে একটা অরাজক অবস্থা। বনগাঁ ক্যাম্প থেকে আমাদের এখানকার ঠিকানা দিয়েছিল সরকারী লোকেরাই। সেই অশান্তির মধ্যে অতি কষ্টে একখানা ঘর খাড়া করে আমরা আট দশটি প্রাণী কোনওরকমে আছি। হাতের টাকা ফুরিয়ে আসছে। মা একখানা করে গয়না খুলে দেয়, আমি বা বাবা গিয়ে সেটা বেচে টাকা নিয়ে আসি, তবে দুটো ভাত জোটে। এক বছর খুব কষ্ট গেছে। মায়ের বিছেহার বেচে কিছু চাষের জমি কিনে বাবা চাষবাস শুরু করে দিল। কিন্তু বুড়ো বয়সে ধাক্কাটা সইল না। রোগে পড়ল। আমিও চাষ করতাম, কিন্তু সেইসময়ে মাস্টারির চাকরিটা পেয়ে যাই। জমিটা ভাগে বন্দোবস্ত করে চাকরিটা নিয়ে নিলাম। যাই হোক, বাঁধা একটা রোজগার তো। মাস গেলে ষাট সত্তরটা টাকা তো হাতে আসবে। একেবারে নির্জলা উপোস তো নয়! ইস্কুলটা দূরে। তখনও সাইকেল কেনা হয়নি। হেঁটেই যেতে আসতে হত। তখন শীতকাল। মাঘ মাসই হবে। প্রচণ্ড শীত পড়ত তখন এদিকটায়। মেলা গাছপালা ছিল তো! এত ঘন বসতিও হয়নি তখন। ইস্কুলের শেষ ক্লাস নিয়ে যখন ফিরতাম তখন অন্ধকার হয়ে যেত। জংলা রাস্তা, ফাঁকা মাঠঘাট দিয়ে একা ফিরতে একটু গা ছম্ ছম্ করত। হাঁক মারলে শোনার লোক নেই। একদিন সন্ধেবেলা ফিরছি। সেদিন কুয়াশাও হয়েছে খুব। রঘুনাথপুরের দহ বাঁয়ে রেখে বিষ্টুপুরের দিকে আসছি। সামনে একট জংলা জায়গা ছিল, আঁশফলের জঙ্গল। মাঝখান দিয়ে সরু পথ। একেবারে নিশুত রাতের মতো নিঃঝুম। শুধু ঝিঁঝি ডাকছে।

পটল আর একটু ঘেঁষে বসল।

বিষ্ণুপদ দূর অতীতের দিকে ধূসর চোখে চেয়ে থেকে ধরা গলায় বলে, জঙ্গলটার মাঝ বরাবর এসেছি, হঠাৎ শুনতে পেলাম খুব কাছ থেকে কে যেন বলে উঠল, বিষ্ণুপদ, একটু তাড়াতাড়ি যা বাবা। আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। গলাটা খুব চেনা। আমার বাবার গলা। কিন্তু বাবা এখানে এই জঙ্গলে আসবে কি করে? তার তো বিছানা ছেড়ে ওঠারই সামর্থ্য নেই। আমি চারদিকে চেয়ে দেখলাম, কোথাও কেউ নেই। চাপ অন্ধকার আর কুয়াশায় সব ঢাকা। বললুম, কে? কে আপনি? কেউ জবাব দিল না। শুধু একটা পেঁচা ডেকে উঠল আর হুড়ুস করে একটা বাদুড় উড়ে গেল আকাশে। গাঁয়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার। কথাটা স্পষ্ট শুনেছি। ভুল নেই। কিছুক্ষণ হাত পা সব কাঠ হয়ে রইল। তারপর হঠাৎ মনে হল, গলাটা বাবারই। হয়তো বাবা আর নেই। মনে হতেই প্রায় ছুটতে শুরু করলাম। মাইলটাক পথ পার হয়ে বাড়ির কাছাকাছি আসতেই কান্নার রোল শুনতে পেলাম। এসে দেখি, বাবা আর নেই।

তারপর কী করলে?

বিষ্ণুপদ গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, কী আর করব! যা সবাই করে, তাই করলাম সব। তবে ওই একবারই একটা ঘটনা ঘটেছিল। তাই মনে হয়, মরে গিয়েও মানুষের কিছু থাকে। সবটা শেষ হয় না। কিছু একটা থেকে যায়।

সেটাই কি ভূত দাদু?

তা হতেও পারে। তবে আমার আর কতটুকু জানা আছে বল ভাই! কত কী আছে চারদিকে। টের পাই, কিন্তু ধরতে পারি না।

২২

প্লেন চলেছে ভোরের দিকে। আলোর দিকে। পূর্বাচলে। নিচে অন্ধকার পৃথিবী। আলো ঝলমল রোম ছেড়ে একটু আগেই আবার কালো আকাশে উঠে এল তারা। লন্ডন থেকে অনেক ইতালিয়ান উঠেছিল, রোমে তারা নেমে যাওয়ায় প্লেন এখন ফাঁকা। আইল সীটের হ্যান্ডরেস্ট তুলে দিয়ে অনেকে লম্বা হয়ে ঘুমোচ্ছে। কৃষ্ণজীবন কখনও প্লেনে ঘুমোতে পারে না। বছরে দু তিনবার সে বিদেশে যায়, সারা বছর দেশের এ-শহর ও-শহর উড়ে বেড়ায়, অজস্র মিটিং সেমিনার, কনফারেন্স উপলক্ষে। তবু প্লেনে ঘুমোতে গেলেই এখনও তার একটা গ্রাম্য ভয় এসে বাধা দেয়। প্লেন যদি হঠাৎ ক্র্যাশ করে। প্লেন ক্র্যাশ করলে জাগা বা ঘুমোনো দুটোই যে সমান তা কি কৃষ্ণজীবন জানে না? তার ভয়টা বড়ই অযৌক্তিক, তাই গ্রাম্য। এত ওপরে ওঠার তো কথা ছিল না তার। বোধহয় তাই আজ পতনের ভয়।

আর একটা গ্রাম্যতা আছে তার। প্লেনের উইন্ডো সীটে বসবার লোভ। এই লোভে সে এয়ারপোর্টে চলে আসে খুব তাড়াতাড়ি। যদি জাম্বো জেট অনেক ওপর দিয়ে যায় এবং নিচে নির্মেঘ আকাশ ও দিনের আলোতেও তেমন কিছু দেখা যায় না, শুধু রিলিফ ম্যাপের মতো ভূমিখণ্ড বা নির্জীব সমুদ্র ছাড়া। তবু সে জানালার ধারে বসতে চায় এবং উদগ্র আগ্রহ নিয়ে বাইরে চেয়ে থাকে।

তার ভিতরে এখনও অনেক ছেলেমানুষী আছে, অনেক গ্রাম্যতা আছে, অপরিণামদর্শিতা আছে। বৃষ্টি দেখলে তার আজও ভিজতে ইচ্ছে করে। কোঁচড়ে মুড়ি নিয়ে খোসাসমেত শশা দিয়ে খেতে ইচ্ছে করে, মায়ের কাছে বসে শীতের সন্ধেয় আস্কে পিঠে বানানো দেখতে ইচ্ছে করে। নিজের ফ্ল্যাটে বা হোটেলের ঘরে যখন একা হয় তখন হঠাৎ হঠাৎ সে অর্থহীন আগডম বাগডম সব শব্দ দিয়ে বেসুরো গান বেঁধে গায় এবং নেচে ওঠে। নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলার একটা বদ অভ্যাস তার অনেক দিনের। এইসব নিয়েই সে কৃষ্ণজীবন। সমাজের এক ভারিক্কী মানুষ, গুরুতর মানুষ। অবাক হয়ে সে মাঝে মাঝে ভাবে—আমি কি করে এই সব হলাম?

তার ঘড়িতে এখনও লন্ডনের সময়। কিন্তু এই সময় অনুযায়ী মধ্যরাতেই দিল্লিতে ভোর হয়ে যাবে। ভোরের আর খুব বেশী দেরীও নেই। তারা চলেছে আলোর দিকে। ভোরের দিকে। এক উন্নত সভ্যতার সীমানা ছাড়িয়ে গরিব দেশের দিকে। দিল্লিগামী এই ফ্লাইটে সে আরও কয়েকবার এসেছে। মধ্য এশিয়ার ওপরেই ভোর হয়ে যায়। তখন এক উষর প্রান্তর আর রুক্ষ পাহাড়শ্রেণী দেখতে পায় সে। সবুজের লেশমাত্র নেই। পাথুরে নিরস সেই পর্বতমালার ভিতর দিয়ে একটি সর্পিল রেখার মতো একটিমাত্র পথ কোন দিগন্ত

থেকে দিগন্তে চলে গেছে বাঁক খেয়ে খেয়ে, পাকসাট মেরে। সমস্ত পৃথিবীও কি ওই ঊষরতার পথে? এক অদ্ভুত আংকিক নিয়মে জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। খাদ্য, অক্সিজেন, উৎপাদন, কর্মসংস্থান, বাসের স্থান, কর্ষণযোগ্য ভূমির সঙ্গে অনুপাত থাকছে সেই জনসংখ্যার। মানুষের বসতি এগিয়ে গিয়ে গ্রাস করে নিচ্ছে চাষের জমি, জঙ্গল, জলাভূমি। মানুষের কাছে তার সন্তান কতই না আদরের, অথচ পৃথিবীর চোখে সে সন্তান মস্ত বালাই।

প্রকৃতি শোধ নেবে? নির্মম সব রোগ, মহামারী, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস দিয়ে হ্রাস করবে জনসংখ্যা? নাকি মানুষই মারবে মানুষকে? বেড়ে যাবে গুপ্তহত্যা, উগ্রবাদ, দাঙ্গা, রাজনৈতিক খুন? মানুষ কি একদিন মানুষেরই মাংস খেয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে? নিজের তিনটি সন্তানকে কোন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতে রেখে যাবে কৃষ্ণজীবন?

ঝিমুনি এসেছিল। অস্বস্তিতে হঠাৎ চটকা ভেঙে সোজা হয়ে বসল সে।

প্লেনে ডিনারটি আজ চমৎকার হয়েছিল। বারবার ঝিমুনি আসছে তার। ঝিমুনির মধ্যেই সে স্বপ্ন দেখছিল, পৃথিবীতে জনসংখ্যা কমানোর জন্য নিয়ম হয়েছে, কারও দুটির বেশী সন্তান হলে বাড়তি সন্তানদের কেড়ে নিয়ে মেরে ফেলা হবে। খবরটা শুনেই ইউনিভার্সিটি ফেলে বাড়িতে ছুটে এসেছে কৃষ্ণজীবন, গলা ফাটিয়ে ডাকছে, রিয়া! রিয়া! শীগগির দোলনকে লুকিয়ে ফেল! লুকিয়ে ফেল। ওরা কেড়ে নিতে আসছে। আদিগন্ত বিশাল এক ফ্ল্যাটে কোথা থেকে যেন আলুথালু রিয়া ছুটে আসছে আর চেঁচিয়ে বলছে, দোলনকে যে সকাল থেকে খুঁজে পাচ্ছি না!

দুঃস্বপ্ন! চটকা ভেঙে গেল। একটু শিহরিত হল কৃষ্ণজীবন। অনেকদিন ধরেই একটি অপরাধবোধ কাজ করে তার মনের ভিতরে। তাদের তৃতীয় সন্তান দোলনকে পৃথিবীতে আনা তাদের উচিত হয়নি। পৃথিবীর জনসংখ্যার পক্ষে নিরপেক্ষ অংকের নিয়মে দোলন একটি বাড়তি মানুষ। বাহুল্য। এই একটি বাড়তি মানুষ থেকে জন্ম নেবে আরও কিছু বাড়তি মানুষ। না, দোলনকে আনা তাদের উচিত হয়নি। কিন্তু জন্মের পর কি দোলন ক্রমে তার নয়নের মণি হয়ে ওঠেনি? দোলনকে ছাড়া এই জীবনটার কথা কি ভাবতে পারে কৃষ্ণজীবন? সে মনে মনে শিউরে ওঠে আবার। কিন্তু এও নির্মম সত্য যে, ভাবাবেগ নয়, পরিসংখ্যানই আজ সবচেয়ে সত্য কথা বলে। দোলন বাড়তি, দোলন বাহুল্য। দোলনের জন্যই সে পৃথিবীর কাছে অপরাধী। দোলনের জন্য সে লন্ডনের এক বিখ্যাত দোকান থেকে অনেক দাম দিয়ে নিয়ে এসেছে একটা মস্ত মেকানো সেট, ছবি আঁকার রং, পেনসিল, ভিউ মাস্টার। ভবিষ্যতের পৃথিবী দোলনকে এত আদর করবে কি?

প্লেনের মস্ত পেটের মধ্যে লাগেজ হ্যাচ-এ তার সুটকেসে আরও অনেকের জন্য অনেক কিছু আছে। রিয়া এবং ছেলেমেয়েদের জন্য। কিন্তু সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, এবার সে বিস্মৃতপ্রায় চারটি মানুষের জন্যও কিছু জিনিস কিনেছে। কেন কিনল, কেনার কথা কেন মনে এল, সেটাই সে বুঝতে পারছে না। সম্ভবত লন্ডনের ওয়েম্বলিতে একটা দোকানের মস্ত অখণ্ড কাচে লাগানো একটি গ্রাম্য ছবির পোস্টারই তার জন্য দায়ী। শাড়ি পরা একটি মেয়ে কলসী কাঁখে ঘোর বৃষ্টির মধ্যে আবছা একটা পিছল পথ বেয়ে আগাছার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পুকুরঘাটে নেমে যাচ্ছে। ভারী আবছায়া মায়াভরা ছবি। পিছন ফেরা বলে মেয়েটার মুখ দেখা যায় না। কিন্তু সন্দেহ নেই, ছবিটা গ্রাম বাংলার। অথচ ওয়েম্বলি হল গুজরাতি পাড়া, বাঙালি ব্যবসাদার নেই।

নিরামিষ ডিনার খাওয়াবে বলে তার বন্ধু, লন্ডনের এক স্কুলের অংকের শিক্ষক ভানুভাই তাকে নিয়ে গিয়েছিল গতকাল। সেখানে ফুটপাথে অজস্র জাপানী শাড়ি সস্তায় বিক্রি হচ্ছে। ওসব দিকে নজর দেওয়ারও কথা নয় কৃষ্ণজীবনের। কিন্তু পোস্টারটা দেখে সে দাঁড়িয়ে গেল। মেয়েটার পায়ের চারধারে নির্ভুল কচুবন। সামনে তালের ডোঙায় বাঁধানো ঘাট। অজস্র বৃষ্টির জলধার বিষ্টুপুর যেন উড়ে এল লন্ডনে। দুটো বোনের কথা ভীষণ মনে পড়ল, যারা জন্মেও কখনও আসবে না বিদেশে, কখনও পরবে না জাপানী সামু সাটিন শাড়ি, অতীতের সব অপমানের ওপর কি বিস্মৃতি আজও পলির আস্তরণ ফেলে যায়নি? ওদের জন্য কখনও তো কিছু নিয়ে যায় না কৃষ্ণজীবন! সে সিদ্ধান্ত নেয় আচমকা, আবেগে।

শাড়িগুলো যেমন সুন্দর, তেমনি সস্তা। ওদের জন্য কিনলে কি রিয়া কিছু মনে করবে? তার ভয় শুধু রিয়াকে।

ভানুভাই তাড়না দিয়ে বলল, আরে লে লো ভাই, কুছ মেহেঙ্গা তো নেহি।

না, মোটেই মেহেঙ্গা নয়। তিন পাউন্ড মানে দেদার সস্তা। আর কৃষ্ণজীবনের তবিলে সদ্য অর্জিত প্রচুর বাড়তি পাউন্ড। তাদের কৌতূহল দেখে দোকানদারনি মাঝবয়সী গুজরাতি মহিলাও নেমে পড়লেন শাড়ি বাছতে। চমৎকার বিরল রঙের দুখানা শাড়ি মাত্র ছয় পাউন্ডে কিনে ফেলল কৃষ্ণজীবন। তারপরই হঠাৎ মনে পড়ল, রামজীবন আর বামাচরণের বউয়ের কথা। দুই বোনকে শুধু দিলে ভাল দেখাবে কি? সুতরাং আরও দুখানা কিনল সে। এখন দিল্লিগামী বিমানে ভোরের প্রত্যাশায় বসে পৃথিবীর দূষণজনিত দুশ্চিন্তার মতোই একটা মৃদু উদ্বেগ অনুভব করল সে। দেওয়াটা উচিত হচ্ছে কি? সংসারের নিয়ম এর কী ব্যাখ্যা করবে? কেমনভাবে নেবে রিয়া?

মনশ্চক্ষে সেই পোস্টারটা দেখতে পায় কৃষ্ণজীবন। দোকানদারনি বলতে পারেনি, ছবিটা কার আঁকা বা কোন প্রদেশের ছবি। কিন্তু মনটা ভারী স্নিগ্ধ হয়ে যায়। গাছপালা, বৃষ্টি, পুকুরঘাট আর সেই মেয়েটি। কী সুন্দর! যেন তার শৈশবের একটা জানালা খুলে গেল হঠাৎ।

একটা পোস্টারও কত কী করতে পারে!

আবার ঝিমুনি এল কৃষ্ণজীবনের।

হাই।

আরে অনু! কী খবর?

অনু তার সুন্দর ঠোঁটদুটি ভেঙে হাসির উৎস খুলে দিয়ে বলে, ভাল আর কই! ভালবাসা পেলে লোকে ভাল থাকে, তাই না? আমাকে তো কেউ ভালবাসে না!

তাই বুঝি? কেন তোমাকে কেউ ভালবাসে না? তুমি তো লাভেবল্‌!

মোটেই না। আমার বাবা আর মায়ের সব ভালবাসা নিয়ে নেয় আমার দাদা আর দিদি। আমি বাড়িতে থাকি অরফ্যানের মতো।

অত সহজ নয়। মা আর বাবার ভালবাসা কি অত সহজে মাপা যায়? সে ভালবাসা তো শুধু আবেগ নয়, তাতে শাসন, নিয়ন্ত্রণ, দায়িত্ব, উদ্বেগ সব মিশে থাকে। ওটা বুঝতে একটু সময় লাগে।

তাই বুঝি? আমার কি বুদ্ধি নেই? আমি কি বুঝি না?

আমার বড় দুই ছেলেমেয়েও বোধহয় তোমার মতোই ভাবে। তারা বোধহয় ভাবে, আমি তাদের ভালবাসি না। সেটা তাদের বোঝার ভুল এবং কমিউনিকেশনের অভাব।

ইউ আর নট ক্যাপেবল্ অফ লাভিং। সেইজন্যই তো আমি ফিলাডেলফিয়া চলে যাচ্ছি, সুমনের কাছে।

সুমন! সে কে বলো তো!

আপনি বুঝি আমার সব বয় ফ্রেন্ডকে চেনেন! সুমন সিং আমার বয়ফ্রেন্ড। দারুণ স্মার্ট। ইন দি মেকিং অফ এ বিগ ডক্টর।

বয়ফ্রেন্ডের কাছে যাচ্ছো! তার সঙ্গেই থাকবে নাকি?

হোয়াই নট! উই উইল লিভ টুগেদার।

সে কী?

অনু কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে বলে, সো হোয়াট! আমাদের সময়ে আমরা আদ্যিকালের সব নিয়ম আর ভ্যালুজ উড়িয়ে দেব। আমরা মানি না যে, ম্যারেজেস আর মেড ইন হেভেন। লিভ টুগেদার করলে কত সুবিধে বলুন তো!

কৃষ্ণজীবন অনুর দিকে চেয়ে বলে, যদি গিয়ে দেখতে পাও যে, সুমনও আর একটা মেয়ের সঙ্গে বসবাস করছে?

অনু ফের কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, সো হোয়াট? আমি তো আর জেলাস টাইপের নই। সুমন না চাইলে আমি আর একজন ফ্রেন্ডকে খুঁজে বের করে নেবো।

হতাশ মৃত কণ্ঠে কৃষ্ণজীবন বলে, তুমি এরকম কেন অনু? নর-নারীর সম্পর্কের মধ্যে কি কোনও রচনা নেই? কোনও নির্মাণ নেই?

অনু খিলখিল করে হেসে উঠে বলে, আপনি ভীষণ ওল্ড টাইমার।

তা হবে।

হঠাৎ অনু তার দিকে ঝুঁকে মুখের পানে সকৌতুকে চেয়ে থেকে বলে, রাগ করলেন?

কৃষ্ণজীবন মাথা নেড়ে বলে, রাগ নয়। মনটা খারাপ লাগছে।

আচ্ছা, আপনি কেন নিজেকে বদলাতে পারেন না বলুন তো!

বদলাবো! কেন বলো তো!

আপনি ভীষণ সেকেলে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন আর ইনস্টিটিউশন্যাল, তাই না!

তাই নাকি?

তাই-ই তো। নইলে কেন ম্যারেজটাকে এত ভ্যালুয়েবল মনে করেন?

ম্যারেজ থেকেই তো ফ্যামিলি, আর ফ্যামিলি থেকে ক্ল্যান। পরিবার হল মানুষের ভিড়। তার শিকড়। পরিবার না থাকলে মানুষ পরগাছার মতো হয়ে যায়, যাযাবরের মতো জীবনযাপন করে।

আপনার পরিবার কি আপনাকে শিকড় মেলতে দিয়েছে? তাহলে আপনি কেন আর গাঁয়ের বাড়িতে যান না? আপনার নিজের পরিবারের সঙ্গে কেন আপনার মাখামাখি নেই?

কৃষ্ণজীবন মাথা নেড়ে বলে, তোমার দেখার মধ্যে একটু ভুল আছে। বাইরে থেকে বোঝাও যায় না, কিন্তু পরিবার মানুষকে কিছু একটা দেয়ই। সেটা হয়তো তার একটা পরিচয়, একটা পদবী, একটা ঠিকানা। আর এই

আইডেন্টিটিই তাকে লক্ষ কোটি মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যেতে দেয় না।

আমি তো হারিয়েই যেতে চাই। কি হবে বাবা-মা ভাই-বোন আঁকড়ে থেকে বলুন তো! আমার তো একদম ভাল লাগে না। বাবা-মায়েরা ভীষণ ন্যাগিং টাইপের হয়, ইচ্ছেমতো চলতে দেয় না, এটা বারণ করে, সেটা বারণ করে। আমাকে আমার মতো হতে দেয় না কিছুতেই।

তুমি কিরকম হতে চাও?

আমি আমার মতো হতে চাই। আমার ইচ্ছেমতো যা-খুশি হব, যা-খুশি করব। কোনও প্রম্পটার চাই না। লাইফ ইজ নট এ গাইডেড টুর।

কৃষ্ণজীবন সামান্য ঘামতে থাকে দুশ্চিন্তায়। অনুর দিকে চেয়ে থেকে বলে, তাই তুমি ফিলাডেলফিয়া চলে যাচ্ছো?

আবার ঠোঁটের মনোরম একটা ভঙ্গি করে অনু বলে, যেতাম না তো, যদি এখানে কেউ আমাকে ভালবাসত।

তুমি জানো না, তোমাকে কতটা ভালবাসেন তোমার মা আর বাবা।

ওরকম ভালবাসার কথা বলছি না। আই অ্যাম টকিং অ্যাবাউট রোমান্টিক লাভ।

ওঃ, মাই গড! রোমান্টিক লাভ! তার জন্য তো বয়স পড়ে আছে তোমার সামনে।

এইটেই তো ঠিক বয়স। আর বেশী বয়স হলে আমার মন যে হিসেবী হয়ে যাবে। ভাঙচুর করতে পারব না যে।

ভাঙচুর করতেই হবে?

করুণ মুখ করে অনু বলে, নইলে যে কেউ আমাকে ইম্পর্ট্যান্স দিচ্ছে না। টিন এজার বলে ভীষণ নেগলেক্ট করছে!

ওটা তোমার ভুল ধারণা। কেউ তোমাকে নেগলেক্ট করছে না। কিন্তু বয়ঃসন্ধিতে মানুষ একটু বেশী সেন্টিমেন্টাল হয়, তাই সবাই নেগলেক্ট করছে বলে ভাবে।

অনু মাথা ঝামরে বলে, অন্তত একজন তো করছেই। আর তার জন্যই তো আমি সুমন সিং-এর কাছে চলে যাচ্ছি। রাগ করে।

কে নেগলেক্ট করছে তোমাকে?

আপনি।

আমি! বলে ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়ে কৃষ্ণজীবন, আমি তো কই তোমাকে লেগলেক্ট করি না। কত আড্ডা দিই তোমার সঙ্গে।

তাই বুঝি! আমি কিন্তু ঠিক টের পাই, আপনি আমাকে একদম পাত্তা দিতে চান না। ইউ আর ম্যারেড টু ইওর ওয়াইফ, ইউ আর ম্যারেড টু ইওর ওয়ার্ক, ইউ আর ম্যারেড টু ইওর ফ্যামিলি, আমার জন্য আপনার একটুও ভালবাসা নেই।

আচ্ছা বাবা আচ্ছা। কী করলে প্রমাণ হবে যে—বলে কৃষ্ণজীবন বাক্যটা সঙ্কোচবশে অসমাপ্ত রাখে।

অনু খিলখিল করে হাসে, আগে বলুন, আমার জন্য লন্ডন থেকে কী এনেছেন!

তোমার জন্য? ওঃ, তোমার জন্য.....শাড়ি—হ্যাঁ একটা দারুণ শাড়ি!

দুর! শাড়ি আমি পরি নাকি?

তাহলে?

এক বাক্স চকোলেট আনলেন না কেন?

চকোলেট! বলে হাঃ হাঃ করে হাসতে চেষ্টা করল কৃষ্ণজীবন। কী ছেলেমানুষ! বালিকা বললেই হয়।

একটা এয়ারপকেটে ঝপ করে কিছুটা নেমে গেল প্লেন।

চটকা ভেঙে চোখ চাইল কৃষ্ণজীবন। না, লজ্জার কিছু নেই। স্বপ্ন স্বপ্নই। তবু নিচে উষর এক পাথুরে ভূখণ্ডের উপর ভোরের অপরূপ আলোর দিকে চেয়ে নিজের কাছে নিজেকেই লুকোতে ইচ্ছে করে কৃষ্ণজীবনের। অনুকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার মধ্যে কোনও গোপন পাপ নেই তো মনে?

মন বড় বিচিত্র এক জিনিস। কিছুতেই তার টিকির নাগাল পাওয়া যায় না। মন কতভাবে যে নাকাল করে বেড়ায় মানুষকে। নইলে সে কেন তার অবচেতন মনেও অনুর চিন্তা পোষণ করবে? কোনও মানে হয় এর?

গাঁয়ের আর একটা জিনিস সঙ্গে করে এনেছে কৃষ্ণজীবন। খিদে। তার প্রেশার, ব্লাডসুগার, কোলেস্টোরেল নেই। সেজন্য বাঘের মতো খায়। তার খিদে প্রচণ্ড, ব্রেকফাস্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে গোটা ট্রে চোখের পলকে উড়িয়ে দিল।

দিল্লি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে সারাটা দিন পড়ে থাকতে হল কৃষ্ণজীবনকে। সে রিক্লাইনিং চেয়ারে পড়ে পড়ে ঘুমোলো। তারপর বিকেলে ধরল কলকাতার প্লেন।

উইসকনসিন ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা ও গবেষণার চাকরির একটা প্রস্তাব তার কাছে এসেছে। মনস্থির করতে পারে না কৃষ্ণজীবন। সে গাঁয়ের ছেলে। গরিব গ্রাম, গরিব দেশ। আমেরিকায় গেলে সে লোভনীয় চাকরি পাবে, থাকবে মহা আরামে। তার চেয়েও বড় কথা, তার কাজের পরিসর বেড়ে যাবে অনেক। খুব খুশি থাকবে রিয়া এবং তার তিন ছেলেমেয়ে। সবই ঠিক। তবু বিদেশে বসবাসের কথা ভাবলেই কেন যে তার ভিতরটা হাহাকার করে ওঠে। এই নোংরা, গরিব, জনাকীর্ণ অকৃতজ্ঞ স্বদেশ কেন যে তাকে সম্মোহিত করে রেখেছে কে জানে! না, কোনওদিনই দীর্ঘ প্রবাস তার সহ্য হবে না।

চারটে শাড়ি নিয়ে রাতে রিয়া তার বিষ ওগরাল।

কেন ওদের শাড়ি দেবে? ওরা কি তোমাকে চেনে? দাদা বলে খাতির করে? ঝগড়ার সময় তো পারলে গলাধাক্কা দিয়েছিল।

কৃষ্ণজীবন ব্যথাহত মুখে বলল, সংসারে তো ভুল বোঝাবুঝি হয়। তা বলে সম্পর্ক তো মিথ্যে হয়ে যায় না।

ও সম্পর্ক কোনও সম্পর্কই নয়। চুকেবুকে গেছে, ওদের নিয়ে ফের মাতামাতি শুরু করলে পেয়ে বসবে।

আমি ওদের কখনও কিছু দিই না। কখনও না। সব লেনদেনই তো বন্ধ। এটা কি ভাল?

লেনদেনের কথা বলছো। তাহলে বলি, সম্পর্ক থাকে দেওয়া আর নেওয়ার মধ্যে। তুমি তো দিলে, ওরাও কিছু দিক। এই তো সেদিন বীণা হঠাৎ করে এসে হাজির। হাতে দু'টাকার মিষ্টির বাক্সও তো ঘরে আনেনি ভাইপো-ভাইঝিদের জন্য!

অবাক হয়ে কৃষ্ণজীবন বলে, বীণা এসেছিল?

তুমি লন্ডন যাওয়ার তিন চারদিন পর।

কী বলল?

কী আবার বলবে! বোধহয় দাদার সংসারটা একটু দেখে গেল, গিয়ে কূটকচালি করবে। বরটা তো একটা হাঁদা গঙ্গারাম।

কিছু বলেনি? কোনও দরকারের কথা?

না। হয়তো তোমাকে পেলে বলত।

কৃষ্ণজীবন একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বলে, তোমাকে ভয় পায় ওরা। তাই কিছু বলেনি। হয়তো বিপদে পড়ে এসেছিল।

তার মানে তোমার মাথায় হাত বোলাতে। তোমার ওই বোনটি কিন্তু সোজা পাত্রী নয়। শুনতে পাই সে যাত্রা থিয়েটার করে বেড়ায়। চরিত্রের কোনও বালাই নেই। স্বামীটা তো মেনিমুখো। খুব সাবধান কিন্তু। পেয়ে বসবে। একবার সাহায্য করলে বরাবর করে যেতে হবে।

কৃষ্ণজীবন এখনও সংসারের সব প্যাঁচ বোঝে না। তবে সে বিমর্ষ বিবর্ণ মুখে বসে রইল। কথাটা মিথ্যে নয় যে, বীণাপাণি যাত্রায় নেমেছে।

রিয়া গম্ভীর মুখ করে বলে, কিছু মনে কোরো না, তোমার যা স্ট্যাটাস, যা নাম, তাতে এইসব সাব স্ট্যান্ডার্ড লোকজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাটা ভীষণ বেমানান। কথাটা যতই খারাপ শোনাক, কিন্তু খুব সত্যি।

কৃষ্ণজীবন একটাও কথা বলতে পারল না। হার মেনে নিল। রিয়া শাড়ি চারখানা তুলে রাখল তার নিজস্ব আলমারিতে। চিরকালের মতো।

রাতে ঘুম হল না কৃষ্ণজীবনের। কেন যে খুব মনে পড়ছে ওদের কথা! তার ভাইবোন যদি নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তবে তা কার দোষ? ওরা যদি সাব স্ট্যান্ডার্ড থেকে গিয়ে থাকে তবে তা কার দোষ? তার সঙ্গে যে ওদের যোজন যোজন তফাত হয়ে গেল সে কার দোষ? ছোট্ট বীণা তো তার হাত ধরে ধরে হাঁটতে শিখেছিল। সাইকেলের রডে পাখির মতো হ্যালে আঁকড়ে বসে থাকত আর তাকে নিয়ে নিয়ে পাড়ায় টহল দিত কৃষ্ণজীবন। ভাবলে কত কী মনে পড়ে! আর এক বোন সরো, তাকে কত কাল দেখেনি সে। রামজীবন, বামাচরণ, শিবচরণ এদের সবাই যে একদিন লতানে গাছের মতো উদ্বাহু হয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে উঠে আসতে চেয়েছিল অন্ধকার থেকে আলোয়। অশিক্ষা, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা, আত্মাবমাননার হাত থেকে আকাশের ঈশ্বর নয়, দাদাকেই তারা বেশী নির্ভর করত।

এগারোতলার ছাদে নিশুত রাতে ভূতগ্রস্তের মতো উঠে আসে কৃষ্ণজীবন। আকাশে কালো ঘন মেঘ। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। তুমুল হাওয়া। ফাঁকা ছাদে আলসের ধারে দাঁড়িয়ে বিপুল শহরের অন্ধকার দিগন্তের দিকে শূন্য চোখে চেয়ে থাকে সে। ভেজে। শীত করে।

উজানে যাবে কি নদী? আবার কি রচনা করা যাবে সব বিস্মৃত সম্পর্ক? নাকি ভুলে যাওয়া ভাল?

সে ঠিক বুঝতে পারে না। শুধু বুঝতে পারে, তার বুকের প্রকোষ্ঠে বড় গোপন একটা ব্যথা হয়। তার চোখে জল আসতে চায়। তার বুক ফাঁকা হয়ে যায় হাহাকারে।

অনেক রাত। বৃষ্টির তোড় বাড়ল সাঙ্ঘাতিক। হাওয়ায় প্রায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কৃষ্ণজীবনকে। তবু সে শান্ত ও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির অজস্র চাবুক খেল সারা শরীরে। এ যেন তার প্রায়শ্চিত্ত। এ যেন তার নানা অপরাধের গুণাগার। এ যেন মাটি ভুলে গিয়ে বৃক্ষের অনুতাপ।

একসময়ে তার শরীর ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল শীতে। হাত পা অসাড়, কান বধির, চোখ দৃষ্টিহীন হয়ে যাচ্ছিল প্রবল বৃষ্টিতে।

তারপর একসময় সিড়িতে শরীরের জল ছড়িয়ে ছড়িয়ে ধীর পায়ে নিজের ফ্ল্যাটে নেমে এল সে। দরজা খুলল। গা মুছল। তারপর নিজস্ব স্টাডিতে বসে রইল চুপ করে। বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়ল।

২৩

বনগাঁয়ের জমাটি অঞ্চলে নয়, খানিকটা দূরে, গরিব পাড়ায় তার দুঃখী ঘরখানা। উঠোন ছাপিয়ে বর্ষার জল ঘরে ঢুকতে চাইছে। কয়েক আঙুল মোটে বাকি। ঘরের মাটির ভিত গলে যাচ্ছে জলে। এখানে সেখানে গর্তের মুখ যাচ্ছে খুলে। সাপ, ইঁদুর, ব্যাঙ, উচ্চিংড়ে, বিছে ঢুকে পড়ছে ঘরে। সারা দিন একরকম জলবন্দী হয়ে আছে তারা। বীণাপাণি আর নিমাই। শুধু বীণা জানে, যতটা দেখায়, ততটা গরিব সে আর নয়। জালার নিচে, মাটির গভীরে প্লাস্টিকে মোড়া অনেক ডলার।

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। তাই বুঝি আজকাল তার অম্বল বেড়েছে তিনগুণ! হাতে পায়ে জোর নেই। অল্প পরিশ্রমেই হাঁফ ধরে। কড়ার নিচে ব্যথা হয়।

নিমাই আর সে কথা ফুরিয়ে ফেলেছে। ঘরে মাত্র দুটি প্রাণী, বাইরে দুর্যোগ, টানা বৃষ্টি, জল। যাত্রার রিহার্সাল বন্ধ, কোথাও যাওয়ার নেই। দুদিন তারা ঘর থেকে বেরোয়নি। আজ তৃতীয় দিনেও সকালবেলাটা ভেজা, স্যাঁতানো। বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। নিমাই বসে আছে দরজার কাছে। হাতে একটা কঞ্চি। জল মাপছে। চৌকাঠের নিচেই জল। বীণাপাণি বসে আছে তাদের স্যাঁতানো বিছানায়।

তিন দিন আগে রিহার্সালে গিয়ে সন্ধেবেলায় শুনল, রিহার্সাল হবে না। কাকার বাজারের ঘরখানা থমথমে। লোকজন নেই। কাকা বসে বসে লম্বা খাতায় পালা লিখছে।

এই শান্ত বিভোর চেহারাটা দেখে বোঝাও যাবে না যে, এর একটা অন্য চেহারাও আছে। সেই চেহারাটা কেমন তা অবশ্য বীণাপাণি জানে না। জেনে কাজও নেই। এই বিভোর চেহারাটাই সে মনে রাখতে চায়। অন্য চেহারাটার কথা ভাবলে তার ভয় করে। সেদিন ভোরবেলায় তার বাড়িতে গিয়ে যখন দলবল নিয়ে হাজির হয়েছিল কাকা, তখন সেই অন্য চেহারার একটা ছায়া দেখেছিল বীণা। ধরা পড়লে কাকা তাকে কী করত? মারত? তাড়িয়ে দিত? ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন সেদিন। কিন্তু তার পরও কয়েকটা দিন সে কাকার মুখখামুখি হলে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করেছে।

কাকার সামনে একটা বেঞ্চে বসে বীণা চুপ করে চেয়ে ছিল।

কাকা খাতা থেকে মুখ না তুলেই বলে, কি খবর বীণা?

খবর আর কি? পালা কবে নামবে তাই ভাবি। বসে বসে আর ভাল লাগছে না।

কাকা মৃদু গলায় বলে, সময় হোক। এই বাদলার সময়টায় আমাদের খুব আকাল।

তা জানি। এ সময়টায় অন্য কোনও কাজ পেলে হত।

কেন, তোমার কি ঘরসংসারের কাজ নেই?

বীণা একটু লজ্জা পেয়ে বলে, গরিবের সংসারে আর কত কাজ থাকবে বলো তো!

ছেলেপুলে হোক, তখন দেখবে কাজ করে কূল পাবে না।

বীণা মুখটা ঘেন্নায় ফিরিয়ে নিল। ছেলেপুলের কথা এখন সে ভাবতেই পারে না। ওসব ঝঞ্ঝাট আর পোষাবে না।

কাকা ভাঁড়ের চা আনাল।

বীণা চা খেতে খেতে বলল, অন্তত রিহার্সালটা হলেও একটু সময় কাটে।

জানি। সাত আটটা দিন বাদ দিয়ে রিহার্সাল ফের শুরু হবে। এখনও সেই ঝঞ্ঝাটটা যাচ্ছে। তাই বন্ধ রেখেছি।

কোন ঝঞ্ঝাট?

নতুন করে আর কী শুনবে! সবাই তো জানে। পগা খুন হওয়ার পর থেকে পাপা সিং নানা গণ্ডগোল পাকাচ্ছে, জানো না?

বীণার বুকটা ধক করে ওঠে। পগা নামটাই আজকাল তার শত্রু। সে আবছা শুনেছে বটে, পাপা সিং হল পগার মহাজন। বিরাট পয়সা, দুর্দান্ত মানুষ। পগা ছিল তার বিশ্বাসী লোক। তার ওপর অতগুলো ডলার আর পাউন্ড খোয়া যাওয়াতে লোকটা ক্ষেপে গেছে।

বীণা বিবর্ণ মুখে বলে, এখনও মেটেনি?

এগুলো মেটে কখন জানো? পাল্টি দু-একটা লাশ পড়ার পর। তার আগে নয়।

মা গো! বীণার ভিতরটা যেন অবশ হয়ে যায়। এ সবের জন্য কি সে-ই দায়ী?

বিবশ গলায় বীণা স্বগতোক্তির মতো বলে, খুন হবে!

কাকা চায়ের ভাঁড়টা জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে বলে, সেরকমই মনে হচ্ছে। মনটা তাই ভাল নেই।

বীণা সম্মোহিতের মতো কাকার দিকে চেয়ে থাকে অপলক। এ লোকটা তার অন্নদাতা, এ লোকটা তার শরীর চায়নি কখনও, এ লোকটা তাকে পাঁচজনের চোখের সামনে তুলে ধরেছে। আজ এর বিপদের সময় কি বীণার কিছু স্বার্থত্যাগ করা উচিত?

বীণা সামান্য হাঁফসানো গলায় বলে, পাপা সিং কী চায় বলো তো!

কাকা বাইরের দিকে চেয়ে থেকে মৃদু গলায় বলে, কি আর চায়। ডলার আর পাউন্ডগুলো ফেরত চায়, তার বিশ্বাসী লোকের খুনের বদলা চায়।

বনগাঁ তোমার এলাকা, এখানে ও লোকটা তোমার কী করতে পারে?

কাকা ম্লান হেসে বলে, ওসব বাইরে থেকে মনে হয়। হিসেবটা অত সহজ নয়। এই এলাকায় বহু লোক আছে যারা দু-চার হাজার টাকায় দু-তিনটে খুন হাসতে হাসতে করে যাবে। পাপা সিং-এর অনেক টাকা।

বীণার বুকটা হিম হয়ে গেল কথাটা শুনে। সে কাকার দিকে অর্থহীন চোখে চেয়ে থেকে স্খলিত গলায় বলে, আমার ভয় করছে কাকা। কী হবে তাহলে!

কাকা উদাস চোখে বীণার দিকে চেয়ে বলে, দুনিয়াটা বড় কঠিন ঠাঁই বীণা। আমার রাস্তায় সবসময়েই বিপদ।

বীণা দুর্বল গলায় বলে, মিটমাট করে নেওয়া যায় না?

কাকা বিষন্ন মুখে বলে, মিটমাট করতেই তো চেয়েছিলাম। খুনটা যারা করেছে, তারা দুজন আমার ডান হাত আর বাঁ হাত। তারা এখন ফেরার। ফলে কাজ-কারবার বন্ধ হওয়ার মুখে। আমাকে মুশকিলে পড়ে যেতে হয়েছে। তারা খুব কাজের ছেলে ছিল। মিটমাট করে ফেলতে পারলে দুজন ফিরে এসে কাজে হাত দিতে পারত। কিন্তু পাপা সিং বিগড়ে আছে। শুনছি এখানে অনেকের সঙ্গে কথাটথা বলছে, প্রায়ই আসছে, যাচ্ছে। কিন্তু আমার সঙ্গে আর দেখা করছে না। তাইতেই বুঝতে পারছি যে একটা কিছু করবে। ভয়টা পাপা সিংকে নয়, ভয় এখানকার ছেলে-ছোকরাদের। এদের মধ্যে অনেকেই পগার বন্ধু ছিল। তারা পাপার সঙ্গে গা ঘষাঘষি করছে।

এ কথায় আরও বিহুল হয়ে গেল বীণা। লটারিওয়ালা পল্টুও তো পগার বন্ধু ছিল। পল্টু কি জানে? পল্টুকে যেন আজকাল কেমন কেমন লাগছে বীণার। মুখে তেমন কিছু বলছে না, কিন্তু যেন একটু ইশারা ইঙ্গিত দিচ্ছে। পগা কি সেই রাতে ওকে কিছু বলে গিয়েছিল! পল্টু কি পাপা সিংকে বলে দেবে?

বুকের ভেতরটা এমন তোলপাড় করতে থাকে যে, একটা ব্যথাই চাগাড় দিয়ে ওঠে যেন। বীণা ‘উঃ’ বলে মুখে হাত-ঢাকা দিয়ে শক্ত হয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

কাকা একটু উদ্বেগের গলায় বলে, কি হল তোমার? অম্বলের ব্যথাটা নাকি?

বীণা একটু থম ধরে থেকে মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ।

তাহলে বাড়ি চলে যাও। চা না খেলেই পারতে। অম্বলের অসুখে চা-ফা খেতে নেই।

অম্বলের ব্যথার চেয়েও অনেক বড় ব্যথা ঘনিয়ে আসছে বীণার কপালে। ঠাকুর না করুন, কাকা যদি খুন হয়, তাহলে বীণার ভাত জুটবে না। আলেয়ার মতো মিলিয়ে যাবে যাত্রার মদির মায়াময় আলোর রোশনাই। দর্শকের হাততালি। এই একটা লোকের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তার অদৃস্ট। আষ্টেপৃষ্ঠে।

মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছিল তার। একথা ঠিক যে, যাত্রায় নেমে তার আরো দুটো হাত গজায়নি বা টাকাপয়সার ছড়াছড়িও হয়নি। তবে পায়ের নিচে একটু দাঁড়ানোর মতো জমি পেয়েছে, আর ভবিষ্যতের একটা রঙিন ছবি টাঙাতে পেরেছে চোখের সামনে। সব যাবে। কাকা যদি যায়, তো সব ভেসে যাবে বীণার। উঠে যাবে বিশ্ববিজয় অপেরা। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতো মানুষ এ যুগে তো বেশী নেই!

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে বীণা। মাথাটা এমন হয়ে আছে যে, পরিষ্কার করে কিছু ভাবতেই পারছে না। তার মন প্রম্পটারের মতো বলছে, কাজটা ঠিক হচ্ছে না। কাজটা ঠিক হচ্ছে না।

বীণা শুধু একটা কথাই জিজ্ঞেস করতে পারল, অনেক কষ্ট করে বলতে হল যেন। ধরা গলায় বলল, তাহলে কি হবে কাকা?

কাকা তার দিকেই চেয়ে ছিল। বলল, সেটা নিয়েই তো ভাবছি। তবে ঝঞ্ঝাট তো আর চিরকাল থাকবে না। এই দেখ, এবার নিজে পালা লিখছি। মনের মতো করে। খুব জাঁকজমক করে নামাবো। প্রথম শো করব কলকাতায়। কলকাতাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে, মফস্বলেও ভাল জিনিস হয়।

কথাগুলো বীণার কানে ঢোকে, কিন্তু তাকে চেতিয়ে তুলতে পারে না। সে বিহ্বলভাবে চেয়ে থাকে শুধু। কাজটা সে ভাল করছে না। তার জন্যই যদি খুনখারাপি হয় তবে সেই পাপ কি তাকেও অর্শাবে না? তার চেয়েও বড় কথা, পল্টু যদি বলে দেয়? পল্টু যদি শত্রুতা করে?

বীণা দুর্বল শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, আসি কাকা।

এসো। কয়েকদিন বিশ্রাম করে শরীরটা ঠিক করে নাও। আট দশ দিন বাদে রিহার্সাল শুরু হবে।

বীণা বেরিয়ে আসে। রাস্তায় পড়ে একটু এগিয়ে যেতেই পল্টুর লটারির দোকানটা চোখে পড়ে। লোডশেডিং-এ হ্যাজাক জ্বেলে বসে আছে। দু-তিনটে ছেলেছোকরা আড্ডা দিচ্ছে।

পা ভারী লাগছিল বীণার। পল্টু শত্রুপক্ষের লোক কিনা তা সে বুঝতে পারছে না। কিন্তু দিদি বলে ডাকে, ভদ্র ব্যবহারও করে। আবার এমনভাবে তাকায় যে, নানা সন্দেহে বুকটা দুরদুর করে ওঠে বীণার।

একটু দূর থেকেই বীণা অভিনয়ের গলায় বলল, এই পল্টু!

পল্টু হ্যাজাকের আলো থেকে অন্ধকারে ভাল দেখতে পেল না তাকে। চোখটা হাত দিয়ে আড়াল করে বলল, কে! বীণাদি?

হ্যাঁ।

কি খবর?

খবর তো তোর কাছে। আমার টিকিটে প্রাইজ উঠেছে কিনা দেখেছিস?

পল্টু হাসল, তোমার আর লটারির প্রাইজের দরকার কী?

বীণার কয়েক সেকেন্ড লাগল কথাটা বুঝতে, তারপর হঠাৎ তার মনে হল, এ-কথাটার দু'নম্বর একটা অর্থ আছে। বুকটা কেঁপে গেল। গলাটা শুকিয়ে গেল।

পল্টু খুব হালকা গলায় বলল, আর একটা টিকিট নেবে? এক কোটি টাকা প্রাইজ। খেলা পরশু!

না, আজ নয়।

ছেলেগুলো না থাকলে বীণা পল্টুর সঙ্গে একটু কথা বলত। আর কথা বাড়াল না সে, বাড়ি ফিরে এল। তখন নিমাই ঘরে ছিল না। বীণা ঘরে এসে আলো জ্বেলে ঠাকুরের আসনে একটু ধূপ দীপ জ্বেলে, জল বাতাসা দিয়ে চুপ করে বসল বিছানায়। অনেক ভাবতে হবে তাকে এখন। ভেবে একটা কিছু ঠিক করতে হবে।

বীণা চোখ বুজে সব ঘটনাটা মনে মনে ঝালিয়ে নিল। বৃষ্টির মধ্যে পগার আসা, চলে যাওয়া। তারপর তার খুনের খবর। তারপর অনেক কিছু। সেই থেকে বীণার জীবনে শান্তি নেই। বুকে শব্দ হয়, মনে সবসময়ে ভয়-ভয় ভাব। তার তেমন অন্তরঙ্গ আর বিশ্বাসী কেউ যদি থাকত, তাহলে তাকে সব বলে, পরামর্শ নিতে পারত বীণা। কিন্তু কেউ নেই তার। নিমাই আছে বটে। কিন্তু ও বড় বেশী সৎ আর বোকা। শুনলেই চেঁচামেচি করবে, ভয় খাবে, টাকা ফিরিয়ে দিতে বলবে। কে জানে, হয়তো পাঁচজনকে বলেও বেড়াবে।

সেদিন কলকাতায় গিয়ে বড়দাকে পেলে খুব ভাল হত। বিদেশী টাকা দিয়ে স্বদেশী টাকা নিয়ে আসতে পারত। তা হল না।

এখন তার কী করা উচিত? কাকাকে যদি বাঁচাতে হয় তবে বান্ডিলটা তার ফেরত দেওয়া উচিত। গল্প একটা বানিয়ে বললেই হবে। তাই কি করবে বীণা?

তার ততদূর হিসেবনিকেশ জানা নেই, যাতে কত ডলার আর পাউন্ডে কত টাকা হয়, তা হিসেব করে দেখবে। আসলে কত পাউন্ড আর ডলার বান্ডিলে আছে তাই সে আজ পর্যন্ত ভাল করে গুনে দেখেনি। তবে অনেক আছে। ভাঙালে যা হবে তাতে সারা জীবন চলে যাবে বীণার। শুধু চলেই যাবে না, আরও কিছু বেশীই

ভাল থাকতে পারবে তারা। কাকার হাত-তোলা হয়ে, অন্নদাস হয়ে থাকতে হবে না তাদের। উঞ্ছবৃত্তি শেষ হবে।

নিমাই একটু বেশী রাতেই ফিরল। হাবড়ায় গিয়েছিল কীর্তন করতে। ভাত খেতে বসে বলল, আজ তোমাকে খুব ভাবিত দেখাচ্ছে।

ভাবিত! তাহলে আমার মুখের দিক তাকাও মাঝে মাঝে?

নিমাই হেঁ হেঁ করে বিনয়ী হাসি হেসে বলে, শোনো কথা! তোমার চন্দ্রবদনটি ছাড়া আর কোনও মেয়েমানুষের মুখের দিকে তাকাই নাকি কখনও?

মাঝে মাঝে তাকালেই পারো। কেউ তো বারণ করবে না। তাতে একঘেয়েমিটাও কমবে।

খুব হাসল নিমাই। হেসে-টেসে বলল, এ মুখ কি একঘেয়ে হয় কখনও! নিত্যি নতুন লাগে যে।

ভালবাসারই কথা, তবু বীণার ভিতরটা যেন রি-রি করে কথাটা শুনে। বলে, আর মুখের গুণ গাইতে হবে না। খাও। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

নিমাই একবার বীণার মুখের দিকে চেয়ে বলে, খারাপ কথা নাকি? গুরুচরণ কিছু?

ধরো তাই।

নিমাই খেয়ে উঠল। আঁচিয়ে এসে বিছানায় মশারির মধ্যে বসল দুজন।

নিমাই মুখখানা খুব গম্ভীর করে বলল, বলো বীণাপাণি।

বীণা নিমাইয়ের দিকে চেয়ে রইল। হ্যারিকেনের আলোয় মুখটা খুব আবছা। কিন্তু ওই মুখ এবং ওই মুখের পিছনে চরিত্রটাকে বীণা খুব ভাল করে চেনে।

একটু আদুরে গলায় সে বলে, আচ্ছা, এটা যে কলিকাল তা তো জানো!

নিমাই হেসে বলে, শোনো কথা! এটা কোনও গুরুচরণ ব্যাপার হল?

দাঁড়াও, কথাটা তো এখনও ফেঁদে বসিনি। বলছি, তুমি কলির ধর্ম মানো কিনা!

কলির তো ধর্ম নেই। সবই অধর্ম। দু'চারজন যারা ধার্মিক, কলির শেষে তারাই টিকে থাকবে, বাদবাকি সব ফৌত হয়ে যাবে।

ফৌত একদিন সবাই হবে। সাধুও হবে, চোরও হবে। সত্য ত্রেতায় কি কেউ মরেনি নাকি?

তা অবশ্য ঠিক। তবে কিনা—

দাঁড়াও। তোমার মতো অতটা না জানলেও আমি কিন্তু রামায়ণ মহাভারত অনেক শিখেছি। পৌরাণিক পালার পার্ট করি। অনেক ভাল কথা জানা আছে। আমাকে যা খুশি বোঝাতে পারবে না।

নিমাই সঙ্গে সঙ্গে একমত হয়ে বলে, সে আর বলতে! তুমি অনেক শিখেছো এ ক'দিনে।

তাই বলছি, কলিযুগের ধর্মটা হল বেঁচে থাকা। তাই নয়?

নিমাই মাথা চুলকে বলে, প্রথমেই বড্ড পাঁয়তারায় ফেলে দিলে। আসল কথাটায় আসছো না।

আসল কথাটা তোমার মাথায় ঢোকাতেই আজ বাসর বসিয়েছি। বুঝলে?

বুঝেছি। এবার বলো।

বলি, ওরকম সাধু-সাধু ভাব করে থাকলে কি আমাদের পেট চলবে? নাকি টিকে থাকা যাবে?

টিকে তো আছি। চলেও যাবে। দোকানটা বসাতে পারলে আর চিন্তা নেই। এখানে সবাই আমাকে ভাল লোক বলে জানে।

বীণা একটু হেসে তরল গলায় বলে, তুমি কেমনতরো ভাল লোক? তোমার বউ তো যাত্রা থিয়েটার করে বেড়ায়। তাহলে তুমি ভাল লোক হলে কিভাবে? লোকে বলে, তুমি একজন যাত্রাওয়ালীর স্বামী। আর সবাই জানে যাত্রাওয়ালীর স্বামী মানেই একটা মেরুদণ্ডহীন লোক।

নিমাই একটু চুপ করে থেকে হতাশ গলায় বলে, কথাটা হয়তো মিথ্যে নয়। তবে বাজে লোকের কথায় কিই বা আসে যায় বলো।

বাজে লোক হোক, আর যাই হোক, লোকে বলে তো?

লোকের মুখ বন্ধ করতে চাও নাকি?

চাই। আমার অভিনয়ের নেশা আছে বটে, এরকমভাবে আর থাকতে ইচ্ছে করে না। একটু ভালভাবে থাকলে বেশ হত।

নিমাই মাথা চুলকে বলে, প্রসঙ্গটা ধরতে পারছি না। কলিযুগ নিয়ে শুরু করেছিলে। কথাটা কোথায় দাঁড়াল?

আমার মাথায়। আচ্ছা হাঁদারাম বাবা!

নিমাই ভারি কাঁচুমাচু হয়ে বলে, কথাটা যে বড্ড সাঁটে বলছো। ভাল করে বুঝতে পারছি না। জানোই তো, আমি বড় বোকাসোকা মানুষ।

অত বোকা হলে কি কাজ হয় বাপু? কলিযুগটা বোকাদের জন্য নয়।

তাই দেখছি।

শোননা, এ যুগে একটু পাপ-টাপ করলেও ভগবান ক্ষমা করে দেন। বুঝতে পারলে?

নিমাই পারল। উজ্জ্বল হয়ে বলল, তা ক্ষমা করবেন না কেন? তিনি যে পতিতপাবন! পাপীকে উদ্ধারের জন্যই আসেন। তবে কথাটা হল, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। পাপ করলে লোকে পথভ্রষ্ট হয়। প্রায়শ্চিত্ত হল পুনরায় চিত্তে গমন।

ও বাবা! প্রায়শ্চিত্তের কথা আসছে কেন?

আসবে না? পাপ করলে অনুতাপ, খ্যাপন এইসব করতে হয়।

তোমাকে নিয়ে আর পারি না। আচ্ছা, এই যে আমি যাত্রা-টাত্রা করি, এটাও তো পাপ! নাকি?

নিমাই একটু ধন্ধে পড়ে বলে, পাপ করলেই পাপ। নইলে নয়।

ধরো যদি আমি লটারিতে টাকা পাই, সেটা কি পাপ?

না তো! পেয়েছো নাকি?

না গো! তবে যদি ওরকমই কোনও পড়ে-যাওয়া টাকা কখনও পেয়ে যাই, তাহলে কি সেটা নেওয়া অধর্ম হবে? তোমার মন কি বলে?

নিমাই ফাঁপড়ে পড়ে বলে, এ তো গাছের মগডালে জল। টাকাটা পাচ্ছো কোথায়?

ধরো, যদি পাই?

আমি তো বাপু কিছু বুঝতে পারছি না। বড্ড গণ্ডগোলে ফেলে দিচ্ছো আমাকে!

আমি তোমার আপনজন তো!

একশোবার।

কথাটা মনে রেখো। পাপে-তাপে, দোষে-ঘাটে, আমি কিন্তু সর্বদাই তোমার আপনজন।

খুব ঠিক কথা।

আমাকে কখনো ঘেন্না কোরো না পাপী বলে।

শোনো কথা। বলে নিমাই খুব হাসল।

সে রাতে বেশ একটু ভালবাসাবাসি হয়েছিল তাদের মধ্যে। একটু বেশী মাখামাখি। কিন্তু বীণা তবু সাহস করে কবুল করতে পারেনি। নিমাইয়ের ওপর সে নির্ভর করতে পারে না। বড্ড ভয় হয়। লোকটা ধর্মভীরু, লোকটা বড় দুর্বল। এসব লোক ভাল হলে কি হয়, এরাই বিপদ ডেকে আনে।

আজ বর্ষাকাতর দিনে, তিন দিন বাদেও বীণা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। তার সামনে সবটাই ভারি আবছা, ভারি সন্দেহজর্জরিত। বুকে বুকজোড়া ভয়।

তার কি বুকের ব্যামো দাঁড়িয়ে যাবে?

নিমাই মুখ ফিরিয়ে বলল, ডুবল গো!

কী ডুবল?

আর এক আঙুল বাকি। জল ঢুকছে।

হাঁড়িকুড়ি, বাক্স-প্যাঁটরা যেটুকু আছে তাদের সব ওপরে তোলা, উনুন জ্বলেনি। বীণা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, ডুবুক। সব ভেসে যাক!

২৪

কাউকে কোনও উপলক্ষে ফুল দেওয়া একদম পছন্দ নয় আপার। একমাত্র পুজোর সময় ছাড়া। ঐ একটা ব্যাপারে তার দুর্বলতা আছে। তবে ঠাকুরপুজোয় ফুলও খুব বেশী দেওয়া উচিত বলে সে মনে করে না। সামাজিক অনুষ্ঠান বা শোকের সময় যে সব ফুল ও মালা দেওয়ার প্রথা আছে সেটা তার কাছে ফুলের অপমান বলে মনে হয়। তবু আজ আপা এক গোছা রজনীগন্ধা নিয়ে অনীশদের বাড়িতে এল সকালে।

কাকাবাবু, আপনি তো খুব ভাল আছেন দেখতে পাচ্ছি। একদম যুবক দেখাচ্ছে আপনাকে।

মণীশ হেসে বলে, থাক, আর তোমাকে বানিয়ে বানিয়ে বলতে হবে না।

আপা এ বাড়িতে আলো-হাওয়ার মতো অবারিত আসে যায়। একখানা চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসে বলল, আমি মিথ্যে কথা বলতে পারি না যে!

মণীশ এ মেয়েটিকে খুব পছন্দ করে। মমতা মাখানো চোখে মেয়েটির রোগা মুখখানার দিকে চেয়ে বলল, মিথ্যে বলো না তা জানি। তবে ভুল দেখছো। কয়েকদিনেই তো আমার মনে হচ্ছে বুড়িয়ে গেছি।

একদম নয়। শুনুন, শরীরবিজ্ঞানীরা বলছেন, মাছমাংস না খেলে এ রোগটা কম হয়। আপনি ননভেজ ছেড়ে আমার মতো পুরো ভেজ হয়ে যান।

মণীশ হাসল, সেটা পরে ভেবে দেখব। এখন ডাক্তার কড়া হুকুম দিয়েছে, রোজ একটা করে ছোট্ট মুর্গীর সুরুয়া খেতে হবে।

মুর্গীদের কপাল খারাপ।

আচ্ছা, তোমার হাতে ফুল কেন? কোথাও যাচ্ছ ফুল নিয়ে!

জিব কেটে আপা বলে, এ মা, এ তো আপনার জন্যই এনেছি। অভ্যাস নেই বলে দিতেই ভুলে গেছি। এই নিন।

মণীশ ফুলের গোছাটা নিয়ে একটু গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করে বলে, এসব ভদ্রতা আবার করতে গেলে কেন? তুমি তো আমার মেয়ের মতোই। আচ্ছা, কলকাতার রজনীগন্ধায় গন্ধ থাকে না কেন বলো তো! রজনীগন্ধায় তো বেশ চড়া গন্ধ হওয়ার কথা।

বাসী ফুলে কি গন্ধ থাকে বলুন! কলকাতায় ঢুকলেই সব জিনিসের গন্ধ হারিয়ে যায়, গুণ হারিয়ে যায়, চরিত্র হারিয়ে যায়।

মণীশ খুব হাসল, বলল, তুমি রীতিমতো ফিলজফার হয়ে উঠছো দিনকে দিন। তোমার নতুন অ্যাডভেঞ্চার এখন কী হচ্ছে বলো তো!

আপা একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, হল না তো। আমি এভারেস্ট এক্সপিডিশান যাওয়ার একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম। ওরা জবাবই দিল না।

কারা?

একটা দেশী দল।

তুমি কখনও পাহাড়ে উঠেছো?

না তো! কিন্তু সুযোগ দিলে প্রথম বারেই ঠিক উঠে যেতাম।

উঃ, কী পাগল তুমি!

আমি সবসময়ে বড় কিছু করার কথা ভাবি। আমার মনে হয় পৃথিবীর যে কোনও শক্ত কাজই আমি পেরে যাবো। কিন্তু বাড়ির আর সবাই কোথায়? কাকিমা, অনীশ, অনু, ঝুমকিদিদি! এখন সকাল আটটা বাজছে। বাড়ি চুপচাপ কেন?

বুবকা বোধ হয় সকালে জগিং করতে গেছে। ঝুমকির জ্বর। অনু একটু বেলা অবধি ঘুমোয়। আর কাকিমাকে বোধ হয় টয়লেট বা রান্নাঘরে পাওয়া যাবে।

বুবকা জগিং করছে শুনে খুশি লাগছে। ও আপনাকে এত ভালবাসে যে, আপনার অসুখের সময় ও একদম পাগলামতো হয়ে গিয়েছিল।

জানি। হি ইজ নট গ্রোয়িং টু অ্যাডাল্টহুড। একদম শিশুকাল থেকে আমার ন্যাওটা। আমি যদি হঠাৎ মারা-টারা যাই তাহলে যে ওর কী হবে!

আপনি ওকে কেন এত দখল করে আছেন কাকাবাবু? সেই জন্যই তো ও এত পলকা, টক করে ভেঙে যায়।

মণীশ এবার হাসল না। মাথাটা নেড়ে বলল, ঠিক বলেছো। ছেড়ে দিতে ইচ্ছেও করে, আবার ভয়ও পাই। সমাজটা কি রকম তা তো জানো। ড্রাগ, গার্লস, মদ, খারাপ লোক। তার ওপর পলিটিক্স আছে, গুণ্ডামি আছে, সন্ত্রাস আছে, অ্যাকসিডেন্ট আছে।

এবার আপা হাসে, ওই সব ভেবে ভেবেই বুঝি আপনার অসুখ হল! সমাজটা খারাপ বটে, কিন্তু আমাদের তো এর মধ্যেই ঝাঁটপাট দিয়ে, একটু সাফসুরত করে থাকতে হবে! নাকি!

তুমি খুব স্বাধীন, না?

আমাকে কে আটকে রাখবে বলুন! আমার বাবা সকাল থেকে রাত অবধি টাকা রোজগার করে। মার সারাদিন পুজোপাঠ। আমার দুটো দাদা ক্যারিয়ার নিয়ে দারুণ ব্যস্ত। আমি একটু একা, তাই স্বাধীন। সারা দিন শহর চষে বেড়াই, অবশ্য যখন স্কুলটুল থাকে না।

অত ঘুরে বেড়াও তাহলে এত ভাল রেজাল্ট করো কী করে?

হয়ে যায়। আমি বেশী পড়িও না। যখন পড়ি তখন গল্পের বই-ই বেশী পড়ি।

তুমি যে আমার কাছে একটা বিস্ময়, সেটা জানো?

আপা হাসল, বন্ধুরা অনেকে ওকথা বলে। আসলে আমি তো ক্যারিয়ারের কথা ভেবে পড়ি না। পড়ি প্যাশন থেকে। তাই একবার পড়লেই সব বুঝে যাই।

তোমার মাথা তাহলে খুবই পরিষ্কার।

খুব মাথা নেড়ে আপা বলে, মোটেই তা নয় কাকাবাবু। আমার মাথায় যে রাজ্যের আজেবাজে চিন্তা। আমি সব সময়ে ভাবি। আর ঘুরি। ঘুরি আর ভাবি।

এত ঘোরো কেন আপা?

আমি দেশটাকে বুঝবার চেষ্টা করি। এত দুঃখী মানুষ আর কোনও দেশে নেই। ভাতে দুঃখী, ভাবে দুঃখী, চিন্তায় দুঃখী, কল্পনায় দুঃখী, কাজে দুঃখী। আমি বুঝবার চেষ্টা করি।

তুমি দারুণ মেয়ে। একদিন কি তুমি দেশের প্রধানমন্ত্রী-টন্ত্রী হবে নাকি? হলে আমি অবাক হবো না কিন্তু।

দূর! প্রধানমন্ত্রী হয়ে কী হবে? মন্ত্রী-টন্ত্রীরা কি এসব লোকের কাছাকাছি আসতে পারে? তারা তো এসকর্ট নিয়ে ভি আই পি হয়ে ঘুরে বেড়ায়। প্রধানমন্ত্রী হলে আমি মরেই যাবো।

তাহলে কি মাদার টেরিজার মতো হতে চাও?

সবেগে মাথা নেড়ে আপা বলে, মা টেরিজার কথা মনে হলেই আমি ভারি লজ্জা পাই।

মণীশ অবাক হয়ে বলে, লজ্জা পাও! কেন বলো তো?

লজ্জা পাবো না? মা টেরিজা একজন মেমসাহেব। কতদূর থেকে এসে তিনি কলকাতায় দুঃখী আতুরের সেবা করছেন, তাই না? সাহেবদের সঙ্গে আমরা কোন ব্যাপারেই পারি না। অলিম্পিকে পারি না, বিজ্ঞানে পারি না, শিল্পে পারি না, সভ্যতায় পারি না, কিন্তু সেবাটুকু তো পারতে পারতাম! তাই না কাকাবাবু? সেবা তো সহজ কাজ ছিল, তার জন্য গায়ের জোর, কসরৎ বা মেধার দরকার হয় না। কিন্তু সেটাও একজন মেমাহেবের কাছ থেকে শিখতে হচ্ছে কেন? আসলে শিখছিও না, মা টেরিজা নিজের কাজ করে যাচ্ছেন, আর আমরা আমাদের মতো দিব্যি শুয়ে বসে আছি।

বিষন্ন মুখে মণীশ বলে, তুমি বোধ হয় ঠিকই বলছো আপা। এ দেশের জন্য কারও কিছু করার নেই।

ওটা কথা নয় কাকাবাবু। আসলে দেশটাকে বুঝে ওঠাই খুব শক্ত। কেউ তো সে কাজ করেনি। বুঝতে হলে গোটা দেশটা পায়ে হেঁটে ঘুরতে হবে। প্রত্যেক জায়গার লোকজনকে চিনতে হবে, শুনতে হবে অনেকের অনেক দুঃখ আর সমস্যার কথা। অনেক সময় লাগে, অনেক কষ্ট করতে হয়। কার মাথাব্যথা আছে বলুন!

মণীশ এই বাচ্চা মেয়েটার দিকে শ্রদ্ধাপ্লুত চোখে চেয়ে থেকে বলে, এর চেয়ে অবাক-করা কথা আমি বহুকাল শুনিনি। তোমার মধ্যে দারুণ প্যাশন আছে আপা। তুমি বোধ হয় একটা কিছু করবে। খুব বড় কিছু। অল মাই গুড উইশেস।

আপা লাজুক হেসে বলে, কাকাবাবু, শুভেচ্ছা খুব ভাল। আরও ভাল কী জানেন?

কী বলো তো! আবার বোধ হয় তুমি চমকে দেবে আমাকে। মনে রেখো, আমার হার্ট কিন্তু জখম। এমন কিছু বোলো না যাতে হার্ট ডিগবাজি খায়।

আপা খুব হাসল। বলল, না, সেরকম কিছুই নয়। আমি বলতে চাই শুভেচ্ছার চেয়ে বেশী দরকার সহযোগিতা। কো-অপারেশন। আমার সঙ্গে একদিন পায়ে হেঁটে ঘুরবেন?

ও বাবাঃ! মরে যাবো যে!

আপা মাথা নেড়ে বলে, কিচ্ছু হবে না। প্রত্যেকটা মানুষই আলাদা আলাদা গল্প। যত জানবেন তত মজা। মিন্টো পার্কের কাছে দেখবেন যখন ট্র্যাফিকে গাড়ি থামে তখন একটা লোক রেড ক্রসের কৌটো ঝাঁকিয়ে পয়সা চায়। আর একটা লোকও এ কাজ করে চৌরঙ্গীর মোড়ে। আমি দু'জনকেই পাকড়াও করেছিলাম। ওরা কেউ রেড ক্রসের লোক নয়। আসলে ওভাবেই ভিক্ষে করে। এ দেশে যার যা আছে বা নেই সবাই সেই আছে বা নেইকে একটা ব্যাপারেই লগ্নি করতে চায়। সেটা হল ভিক্ষে। যার একটা হাত নেই সে সেই নেইটাকে ভিক্ষের কাজে লাগায়। ভিক্ষে করতে কে আমাদের শেখাচ্ছে জানেন? আমাদের সরকার। সরকার নিজেই পৃথিবীতে সবচেয়ে নির্লজ্জ ভিখিরি। এ দেশে কত সম্পদ আছে, কোথায় কী পাওয়া যায়, আমাদের সত্যিকারের অভাব কতখানি তা কেউ খুঁজে দেখেনি আজ অবধি। খুঁজলে হয়তো দেখা যাবে, আমাদের দেশে রিসোর্সের অভাব নেই। শুধু খুঁজে দেখা হয়নি, এই যা।

মণীশ চোখ বুজে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর স্বগতোক্তির মতো বলল, অথচ তোমার তো আঠেরোর বেশী বয়স নয়, তাই না আপা?

আপা সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমি একটু বেশী পাকা, না কাকাবাবু? আমার মাও সেই কথাই বলেন।

এ বয়সে এতটা ভার মাথায় নিয়েছো, তোমার সাহস তো সাঙ্ঘাতিক।

আমি আরও অনেক বেশী ভার নিতে চাই।

তুমিই বোধ হয় আমাদের ভাবী প্রধানমন্ত্রী!

ঠাট্টা করছেন কাকাবাবু?

না আপা, ঠাট্টা করছি না। তুমি আমাকে সবসময়েই অবাক করে দাও। এইসব কথাগুলি তোমাকে কেউ শেখায়নি তো আপা? তুমি কি নিজে ফিল করো?

খুব ফিল করি কাকাবাবু। এত বেশী করি যে, আমার জীবনে একটুও শান্তি থাকে না। মাথা এত গরম হয়ে যায় যে, রাতে ঘুম আসতে চায় না।

মণীশ দুঃখিত মুখে বলল, তোমার তুলনায় আমার ছেলেমেয়েরা কত নাবালক আর নাবালিকা রয়ে গেছে।

আপা গম্ভীর মুখ করে বলে, আজকাল সব ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলারাই নিজেদের ছেলেমেয়েকে বোতলবন্দী করে রাখতে চায়। তাদের দোষও নেই। সমাজে নানারকম দূষণ বাড়ছে তো। কিন্তু মুশকিল হল, চারদিকে দূষণ বেড়ে গেলে তার কিছুটা ঘরের মধ্যেও ঢুকে পড়বেই। ঘরের পাশে বেড়াল মরে পড়ে থাকলে ঘরে পচা গন্ধ আসবে না? আবর্জনা জমে থাকলে মশা মাছি তো তার কিছুটা ঘরেও ছড়িয়ে দিয়ে যাবে। যাবে না, বলুন?

হ্যাঁ আপা।

আমাদের বাড়ির কাছেই একজন মাতাল থাকে। মদ খেলেই সে ভীষণ গালাগাল করে। কখনও একে, কখনও ওকে। আমাদেরও মাঝে মাঝে গালাগাল করেছে। আমরা নাকি তামিলনাড়ু থেকে এসে পশ্চিমবঙ্গকে লুটেপুটে খেয়ে নিচ্ছি। আমার মা আর বাবা ভয় পেয়ে ওদিককার জানালা বন্ধ রাখত। কিন্তু আমি বুঝলাম, ওটা কোনও প্রতিকার নয়। আমি সেই মাতালটার সঙ্গে আলাপ করে ফেললাম। সে বস্তির লোক, গরিব, চোর এবং রগচটা। প্রথমটায় ভাব করতে চায়নি, সন্দেহ করেছিল। তার বউ, ছেলে আর মেয়েরাও একটু কেমন যেন অ্যাগ্রেসিভ টাইপের। তবু আমি লেগে রইলাম। এক মাস ধরে রোজ গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করতাম,

জিজ্ঞেস করতাম তারা কেমন আছে। একটু একটু করে ভাব হয়েই গেল। আমি লোকটার কাছে অনেকবার জানতে চেয়েছি, সে কেন সবাইকে গালাগাল করে। লোকটা জবাব দিতে পারেনি। তখন বুঝতে পারলাম, ওর রাগটা বিশেষ কারও ওপর নয়। ওর মনটাই বিগড়ে গেছে। মদ খেলেই ভিতরের নানারকম জমে-থাকা বিষ গালাগাল হয়ে বেরিয়ে আসে। তখন আরাম পায়। খুব সহজ লোক, ওকে বুঝতে অসুবিধে হয় না। এখন সে আমার খুব বন্ধু।

তাকে মদ ছাড়াতে পেরেছো?

আপা মাথা নাড়ে, না কাকাবাবু। ওটা ছাড়া সোজা কথা নয়। চেষ্টা করছি। বিষ-মদে কত মানুষ মারা যায় সে সব বলেছি। কিন্তু ওরা তো বিষকে ভয় পায় না, মরে যাওয়াকেও নয়। কিভাবে ছাড়াবো বলুন তো!

তা বটে।

তবে এখন আর গালাগাল দেয় না। ঘরে বসে মাতাল অবস্থায় গজগজ করে খানিকক্ষণ, তারপর ঘুমোয়।

তোমার মতো বুকের পাটা কম মানুষেরই আছে। আমার বাসার পাশেই তো বস্তি, কই আমার তো কখনও ওখানে ঢোকার ইচ্ছেই হয়নি।

ওটাই তো আমাদের মুশকিল। আমরা সব জায়গা থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিই, প্রত্যাহার করে নিই। মনে ভাল-ভাল ইচ্ছে থাকে, কিন্তু সেগুলো করি না।

তুমি কি আমাকে বকছো?

না তো কাকাবাবু! ছিঃ, বকবো কেন? আপনি দারুণ মানুষ একজন।

বকলেও দোষ নেই আপা। তুমি যে খুব নতুন কথা বলছো তা নয়, কিন্তু যেটা বড় কথা তা হল, তুমি যা বলো তা প্র্যাকটিসও করো। আমরা করি না।

আমি আপনাকে অনেকক্ষণ যন্ত্রণা করছি।

না না, আমার খুব সেলফ্ পিটি হচ্ছে ঠিকই, তবে তোমার কম্পানি খুব ভালও লাগছে। ডোরবেল বাজল নাকি? ওই বোধ হয় বুবকা এল!

বুবকাই। সাদা টি শার্ট, কালো শর্টস, পায়ে দৌড়োনোর জুতো। ঘর্মাক্ত, হাঁফাচ্ছে। ঘরে ঢুকেই মণীশের দিকে চেয়ে বলে, কেমন লাগছে বাবা? আরে আপা! কখন এলে?

অনেকক্ষণ। বকে বকে কাকাবাবুর মাথা ধরিয়ে দিলুম।

অনীশ এসে সাবধানে তার বাবার বিছানায় একটু আলগোছে বসল। পাছে ধপ করে বসলে খাটের ঝাঁকুনিতে হার্টবিট বেড়ে যায় মণীশের। তারা সবাই এখন অত্যধিক বাবা-সচেতন। মণীশের হাতটা নিজের সবল হাতে ধরে নাড়ীটা একটু বুঝবার চেষ্টা করল সে। তারপর বলল, মনে হয় সবই ঠিক আছে, না বাবা?

মণীশ ছেলের মুখের দিকে তৃষ্ণার্ত চোখে চেয়ে থেকে বলে, ঠিকই আছে। ভাবছিস কেন? আপা কত ফুল নিয়ে এসেছে দেখ, তোর মাকে বল সামনের ঘরে সাজিয়ে রাখতে।

ফুল! বলে অবাক হয়ে অনীশ আপার দিকে তাকায়, তুমি ফুল এনেছো নাকি? এ তো ভাবা যায় না।

আপা সামান্য লজ্জা পেয়ে বলে, ফুলটা আজ পাগলামি করে কিনে ফেললাম। কাকাবাবুকে একটু ইমপ্রেস করব বলে।

আমি খুব ইমপ্রেসড আপা। থ্যাংক ইউ।

কাকাবাবু, আপনার কি হাঁটাচলা বারণ?

মণীশ মুখটা একটু বিকৃত করে বলল, ডাক্তারদের কথা আমি কিছু বুঝতে পারি না। বলেছে ফুল রেস্ট। তার মানে শুয়ে থাকা কিনা আমি জানি না। তবে আমার এইসব অফশুটরা আমাকে শুইয়েই রেখেছে। এমন কি পাশ ফিরতে অবধি দিচ্ছে না। সাতদিন এভাবে থাকলে আমাকে বোধ হয় পাগলাগারদে পাঠাতে হবে।

আপনার নিজের কেমন লাগছে?

খুব উইক, কিন্তু উঠতে বা একটু-আধটু চলাফেরা করতে কোনও অসুবিধে নেই।

তাহলে উঠে পড়ুন তো! চলুন ডাইনিং টেবিলে বসে একটু কালো কফি খাবেন।

বুবকা ভ্রূ কুঁচকে বলে, খুব ডাক্তার হয়েছো, না? মাথা-ফাতা ঘুরে গেলে কি হবে?

আপা একটা ছোট্ট ধমক দিয়ে বলে, চুপ করো তো! আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে মস্ত এক হার্ট স্পেশালিস্ট থাকেন। আমি প্রায়ই তাঁকে অ্যাসিস্ট করি। কত কিছু জানি, তুমি ধারণাও করতে পারবে না। রুগীকে রুগী বানিয়ে ফেলে রাখা মানে জানো? বিশেষ করে যারা হার্ট পেশেন্ট! একজারশান না করে যতদূর সম্ভব নরমাল রাখতে হয়। তোমরা কাকাবাবুকে জড়ভরত বানাতে চাও নাকি? আপনি উঠুন তো কাকাবাবু।

মণীশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে বলে, তোমার কাকিমারও একটু পারমিশান নিয়ে এসো। নইলে হয়তো রাগ করে কথা বন্ধ করে দেবে। বেশী শুয়ে থাকলে তো বেডসোরও হয়, না? কথাটা কাকিমাকে বোলো, যাও।

একটু বাদে যখন ডাইনিং টেবিলে তারা কফি ইত্যাদি নিয়ে বসল তখন অপর্ণা বেজার মুখে বলল, আমার বাড়িতে এত অসুখবিসুখ যে কেন হচ্ছে বুঝতে পারছি না। একজনকে বাড়ি নিয়ে আসতে পারলাম তো মেয়েটা জ্বরে পড়ল। বুকে সাঙ্ঘাতিক কনজেশন, জ্বর এখনও নামেনি। এত টেনশন যাচ্ছে।

তার কথাটাকে কেউ কোনও গুরুত্বই দিল না। হয়তো শুনতেই পেল না কেউ। অনু তার বাবার কানে কানে কী বলছে আর খুব হাসছে দুজনে। আপা আর অনীশ খুব নিবিষ্টভাবে ওদের পড়াশুনোর বিষয়ে কিছু বলছে। টেবিলে অপর্ণা আলাদা এবং একা। কিন্তু বরাবরই কি সে একা নয়? এ বাড়িতে তার তিন ছেলেমেয়ে আর ওদের বাবা যখন একসঙ্গে থাকে তখন অপর্ণা স্পষ্ট বুঝতে পারে, ওরা এক দলে। সে আলাদা। সে আউট অফ দি সার্কল। বর্জিত, অবহেলিত, উপেক্ষিত।

অথচ অপর্ণা কি প্রাণপাত করে দিচ্ছে না সংসারের পিছনে? সে কি খরচ হয়ে যাচ্ছে না, ক্ষয় হচ্ছে না এই তার আপনজনদের জন্য? ওরা কখনও কেউ কেন গুরুত্ব দেয় না তাকে? রান্নাঘরের বাইরে কি তার কোনও ভূমিকা নেই?

সে চারজনের দিকেই চাইল। না, তাকে কেউ লক্ষ করছে না। পাত্তা দিচ্ছে না। সে খামোখা বসে আছে এখানে। খুব হঠাৎ করে অভিমান হল অপর্ণার। নিঃশব্দে সে নিজের কাপটা নিয়ে রান্নাঘরে চলে এল।

হ্যাঁ, এইটেই তার সঠিক জায়গা। এখানেই তাকে মানায়। ভাবতে ভাবতে চোখে জল এল অপর্ণার। কত ভালবেসে সে বিয়ে করেছিল মণীশকে। কত ভালবাসার ভিতর দিয়েই না এল তাদের তিন সন্তান। টুকটুক করে বড় করে তোলা ওই তিনজন কেন তার দিকে ফিরেও চায় না? মণীশই কি আজকাল আগের মতো গুরুত্ব দেয় তাকে? খুব ভাল হয় এখন যদি অপর্ণা মরে যায়। তাহলে ওরা হাড়ে হাড়ে বুঝবে অপর্ণা কে ছিল, কী ছিল ওদের সংসারে।

কেন যে তার মতো বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন মহিলার আজকাল এত অভিমান হয়! কেন যে সহজেই চোখে জল চলে আসে! অপর্ণা তার টলটলে জলভরা চোখে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে তেতো পৃথিবীটার দিকে চেয়ে রইল। উথলানো ডালের জল পড়ে গ্যাস নিবে যাচ্ছে, তবু গা করল না।

ক্ষীণকণ্ঠে একটা ডাক বাতাসে পাখির ডাকের মতো ভেসে এল, মা!

রান্নাঘরের পাশেই ঝুমকির ঘর।

ডাকটা শুনল অপর্ণা। নড়ল না। ডাকুক গে।

আবার ডাকটা এল, মা! ও মা!

অপর্ণা চোখ মুছে গম্ভীর মুখে দরজায় এসে দাঁড়ায়, কী বলছিস?

ঝুমকি একেই রোগা। অসুখে যেন বিছানায় মিশে গেছে। নিজের মাথাটা চেপে ধরে বলে, একটু কাছে এসে বসবে?

কেন?

এসো না। কাছে একটু বোসো। আমার কাছে কেউ কেন কখনও আসো না বলো তো!

কাকে চাই? অপর্ণা গম্ভীর গলাতে বলে।

তোমাকে।

অভিমানটা এবার ফেটে পড়ল জল-বেলুনের মতো, আমাকে। আমাকে আর তোমাদের কী দরকার? আমি তো এ বাড়ির কাজের লোকের চাইতে বেশী কিছু নয়।

ঝুমকি রোগা মুখে এবার হাসল, ঝগড়া হয়েছে বুঝি!

মোটেই ঝগড়া হয়নি। কী দরকার বলো, গ্যাসে রান্না চড়ানো।

গ্যাস নিবিয়ে দিয়ে এসো।

অত সময় নেই। বরং তোমার বাবাকে ডেকে দিচ্ছি।

বাবা! বাবা কি উঠেছে?

বাইরের ঘরে বসে চা খাচ্ছে।

ঝুমকির মুখটা আলো হয়ে গেল, গুড নিউজ মা। তাহলে তোমার মুখ ওরকম ভার কেন?

মোটেই ভার নয়। কাজ আছে। তোমার বাবাকে ডাকছি।

বাবাকে আকণ্ঠ ভালবাসে ঝুমকি! বোধ হয় একবার ইচ্ছে হল, বাবাকে ডাকিয়ে আনার। কিন্তু ইচ্ছেটা সংবরণ করে বলে, না, বাবা নয়। তুমি এসো একটু।

বলছি না, রান্নাঘরে এখন আমি ভীষণ ব্যস্ত। ওই বোধ হয় ডালের জল পড়ে গ্যাস নিবে গেল। গ্যাসের গন্ধ আসছে।

রান্নাঘরে গিয়ে ছোট ঝামেলাটা সামলাতে সামলাতেই আরও দুবার ঝুমকির ডাক শোনা গেল।

আর পারে না অপর্ণা। ঝুমকির কাছে এসে কপালে হাত দিয়ে বলল, জ্বরটা কি আছে? আমার তো জল-হাত, বুঝতে পারছি না।

নেই মা। আজ সকালে ছেড়ে গেছে। তুমি বোসো একটু আমার কাছে।

গোমড়া মুখে অপর্ণা বিছানার একপাশে বসল।

তুমি কি কেঁদেছো মা? চোখ ছলছল করছে কেন?

কাঁদিনি।

কেঁদেছো। তোমাকে যে আমি ভীষণ চিনি।

লক্ষ করো নাকি? আমি যে একজন মানুষ এ সংসারের এক ধারে পড়ে আছি এটা কি মনে থাকে?

মাথাটা অপর্ণার কোলের দিকে নামিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা করে বলে, তুমি কি খুব অ্যাটেনশন চাও মা?

মোটেই সে কথা বলিনি। তোমরা ব্যস্ত মানুষ, আমার দিকে মনোযোগ দেওয়ার সময় কোথায় তোমাদের?

ঝুমকি হাসল, কিন্তু এটা তো জানো, সবাইকে ছাপিয়ে কিন্তু তুমি, তোমাকে কখন দরকার জানো? যখন মন খারাপ লাগে, একা লাগে, যখন ভয় পাই, তখন সারা পৃথিবীতে এই একজনকেই সবার আগে মনে পড়ে। তা জানো? বাইরের মনোযোগটা বড় কথা হল বুঝি? তুমি যে আমাদের মন সত্তা সব জুড়ে আছো!

অপর্ণার বাঁ হাতখানা আপনা থেকেই ঝুমকির মাথায় বিলি কাটতে লাগল। আর চোখের বাঁধ ভেঙে জল পড়তে লাগল ফোঁটায় ফোঁটায়। তারপর ধারায়।

২৫

খোঁচাখুঁচি করা হেমাঙ্গর একটা বদ অভ্যাস। এটা যে ভাল অভ্যাস নয়, তাও সে জানে। তবে মানুষ তো অভ্যাসেরই দাস। বিখ্যাত ডেন্টিস্ট অতীন নন্দীর চেম্বারে তাকে যেতে হয়েছিল রিটার্নের কিছু জরুরি কাগজপত্র আনতে। বিদেশ প্রত্যাগত নন্দী মস্ত ডাক্তার, তার কাছে সবসময়ে ভি আই পিদের ভিড়। এইসব লোককে কিছু কাগজপত্রের জন্য বা জিজ্ঞাসাবাদের কারণে নিজের অফিসে পারতপক্ষে টেনে আনে না সে। নিজেই চলে যায়। এটুকু পাবলিক সারভিস সে ইচ্ছে করেই দেয়। নন্দী হয়তো বড় বড় ব্যবসায়ীদের মতো মস্ত ক্লায়েন্ট নয়, কিন্তু গুরুতর ক্লায়েন্ট। এঁর মতো লোক হাতে থাকলে আরও অনেক লোক চলে আসে। সাধারণ মানুষদের স্বভাবই হল, জেনে বা অজান্তে ভি আই পিদের অনুসরণ করা।

উপরন্তু নন্দী তার অনেকটা বন্ধুর মতোই হয়ে গেছে।

বিকেলে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার দরুন নন্দীর চেম্বারে ভিড় ছিল না তেমন। নন্দী শেষ রুগীটিকে বিদায় দিয়ে ব্রিফকেস থেকে দরকারি কাগজপত্র বের করে দিল। তারপর বলল, আচ্ছা মশাই, আপনার দাঁতে কোনও কমপ্লেন নেই?

কমপ্লেন! না তো!

আছে কিনা তা আপনি জানেন?

হেমাঙ্গ অবাক হয়ে বলে, আমার দাঁত আর আমি জানবো না?

নন্দী হেসে বলে, অত সোজা নয়। দাঁতের কমপ্লেন তৈরি হয় খুব ধীর গতিতে। প্রথমটায় বোঝাও যায় না। যখন বোঝা যায় তখনও কেউ সহজে ডেন্টিস্টের কাছে আসতে চায় না। যখন ট্রাবল বাড়ে তখন আসে বটে, কিন্তু তখন আর দন্তোৎপাটন ছাড়া চিকিৎসা থাকে না। সাহেবরা কিন্তু নিয়মিত দাঁত চেক আপ করায়। ওটাই উচিত কাজ।

সাহেবদের কথা আলাদা। তারা মদ মাংস বেশী খায়। আমার সে অভ্যাস নেই। শোওয়ার আগে আমি রোজ দাঁত ব্রাশ করি।

মাঝে মাঝে একটু ক্লিনও তো করে নিতে পারেন। আমার খুব ভাল যন্ত্র আছে, ব্যথা দেবো না।

ক্লিন! তাই না করাবো কেন? আমি পান-টান খাই না, সিগারেটও নয়।

নন্দী হাসল, আচ্ছা, ঠিক আছে। তবু একবার দেখে দিলে আপত্তি নেই তো?

হেমাঙ্গ অবাকের ওপর অবাক হয়ে বলে, আরে কমপ্লেন হলে তো আপনার কাছেই আসবো!

নন্দী কথাটায় কান দিল না। একটু সহজাত কর্তৃত্বের ভাব আছে তার। বংশগত অভ্যাসই হবে। কারণ, নন্দীদের একসময়ে বিরাট জমিদারি ছিল। ওর দাদু ছিল রায়বাহাদুর।

রিক্লাইনিং চেয়ারে তাকে বসিয়ে আলো-টালো ফেলে হেমাঙ্গর দাঁত পরীক্ষা করে নন্দী অবশ্য বলল, আরে বাঃ, এ তো সত্যিই পারফেক্ট দাঁত! চমৎকার! শুধু বাঁ দিকে কষের দাঁতে একটা কেরিজ দেখা যাচ্ছে। ওটা সিল করে দিচ্ছি।

ঘুরন্ত উকো দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে নন্দী খানিকটা পুটিং-এর মতো জিনিস ঠেসে দিল।

তারপর বলল, আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?

কেন, আমার দাঁতের কি এতই খারাপ অবস্থা যে, ঈশ্বরবিশ্বাসের দরকার হবে!

আরে নাঃ, দাঁত ফার্স্টক্লাস আছে। তবে, এই যে চমৎকার দাঁতের সারি, এটা কি একটা কেমিক্যাল অ্যাকসিডেন্ট? মানুষের শরীর, গরু, মোষ, জীবজন্তু, গাছপালা এসবই অ্যাকসিডেন্টাল বলে আপনি বিশ্বাস করেন? নাকি সৃষ্টিকর্তা বলে কেউ আছে?

হঠাৎ একথা কেন?

ডারউইন থেকে শুরু করে বড় বড় সায়েন্টিস্টরা কেউই সৃষ্টিতত্ত্বকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছেন না। একটা র‍্যানডম অঘটন বলে জোড়াতাপ্পি দেওয়া এক্সপ্লানেশন দিচ্ছেন। আপনি কি সেটা বিশ্বাস করেন?

কি বললে আপনি খুশি হবেন?

আরে, আপনার কি নিজস্ব কোনও মতামত নেই!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেমাঙ্গ বলে, হিসেবের খাতা থেকে চোখ তোলার সময় পেলে তো ভগবান-টগবান নিয়ে ভাববো! সময়টা কোথায়?

নন্দী ভ্রূ কুঁচকে বলে, তার মানে কি আপনি আমার চেয়েও ব্যস্ত লোক? আমার দুটো চেম্বার, একটা হাসপাতাল আর তিনটে নার্সিং হোম অ্যাটেন্ড করতে হয়, তা জানেন? তবু আমি সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে ভাবার সময় পাই।

হেমাঙ্গ ফাঁপরে পড়ে বলল, ভগবানের কথা আমার মনেই হয় না যে!

কেন হয় না? এই যে আপনার চারদিকে জমজমাট পৃথিবী, চারদিকে প্রাণের প্রকাশ, এসব দেখে এর পিছনকার প্যাটার্নটার কথা আপনার জানতে ইচ্ছে করে না? এই জড় জগৎ থেকে দুম করে জীব সৃষ্টি হয়ে গেল আর সেটা সম্ভব করে তুলল মস্তিষ্কহীন, কল্পনাহীন জড়বস্তুই—এটা কি বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা!

তা তো মনে হচ্ছে না।

ওরকম জলে-পড়া ভাব করবেন না। ব্যাপারটা ভাবার মত কিনা বলুন তো!

খুবই ভাবার মতো কথা।

নন্দী হেসে ফেলল, আচ্ছা আজ আর আপনাকে বিব্রত করব না। বেশ বিপদে পড়েছেন দেখা যাচ্ছে।

বিপদটা অবশ্য সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে এল না। হেমাঙ্গ এক কৌটো স্টেরিলাইজড প্ল্যাস্টিকের টুথপিক কিনেছিল বড় একটা ওষুধের দোকান থেকে। সেই টুথপিক দিয়ে দাঁতের সিলিংটা একটু খুঁচিয়ে দেখতে ইচ্ছে হল তার, রাতের খাওয়ার পর। কারণ সবসময়েই দাঁতে একটা ফরেন জিনিস ঢুকে থাকার অস্বস্তি হচ্ছিল তার।

খোঁচাখুঁচির ধাক্কায় সিলটা হঠাৎ আলগা হয়ে গেল। আর তারপর থেকেই—ব্যথা নয়, একটা সিরসিরে ভাব ফুটো দাঁতটায় টের পেতে লাগল সে। ব্যাপারটা সাইকোলজিক্যাল না ফিজিকাল সেটা ভাবতে ভাবতে দুশ্চিন্তা নিয়েই সে ঘুমোলো। সে স্বপ্ন দেখল, একদিন সকালে উঠে সে দেখছে সে সম্পূর্ণ ফোকলা, আর তার দাঁতগুলো সব খসে ঝরা শিউলির মতো বালিশে আর বিছানায় ছড়িয়ে পড়ে আছে। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে নিজের চেঁচানিতেই ঘুম ভাঙল হেমাঙ্গর। ঘড়িতে দেখল, ভোর সাড়ে চারটে।

বেলা সাড়ে দশটায় হেমাঙ্গ একটা ছোট্ট রেল স্টেশনে নামল। গঞ্জ পার হয়ে জলকাদায় থকথকে একটা গেঁয়ো পথ রিকশায় ডিঙিয়ে একটা দীন বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে নামল। আজ রবিবার। রবিবারে রবিবারে সে মাঝে মাঝে এরকম শৌখিন অডিট করে বেড়ায়। টাকার জন্য নয়, এইসব আউটিং তাকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।

মাঝবয়সী কেরানিবাবু অপেক্ষা করছিলেন। রিকশা থেকে হেমাঙ্গ নামতেই, অফিসঘর থেকে বেরিয়ে এসে, বারান্দা থেকেই হাঁক মারলেন, আসুন স্যার, আসুন।

জলকাদায় ভরা উঠোনে পা ফেলার জন্য জোড়া জোড়া ইঁট পাতা। সাবধানে পা ফেলে হেমাঙ্গ বারান্দায় এসে উঠল। ব্যারাক বাড়ির মতো টিনের দীনদরিদ্র বাড়ি। চল্‌টা ওঠা মেঝে, নোনাধরা দেওয়াল, জীর্ণ দরজা-জানালা। কেমন একটা ভ্যাতভ্যাতে গন্ধ।

অফিসঘর আজ তার সম্মানে কিছুটা সাজানো হয়েছে। টেবিলের ওপর একটা এমব্রয়ডারি করা সবুজ টেবিলক্লথ পাতা। চেয়ারের পিছনে একটা তোয়ালে।

ডাব আনি স্যার?

দাঁতের ফুটোটায় বারবার জিব চলে যাচ্ছে। হেমাঙ্গ বলল, আনুন।

কোল্ড ড্রিংক্সও আছে স্যার।

না, ডাব হলেই চলবে।

তারপর একটু চা খাবেন তো!

সেটা পরে হবে। কাগজপত্র সব রেডি তো!

আজ্ঞে, সব রেডি। ম্যাডামও আজ এসেছেন। আপনি এলে খবর দিতে বলেছেন। ডাবটা খেয়ে নিন, ওঁকে ডাকছি।

ম্যাডাম মানে হেড মিস্ট্রেস। কেরানিবাবু পর্যন্ত হেমাঙ্গর কোনও অসুবিধে নেই। খাতাপত্রে কোনও অনিয়ম বা অসম্পূর্ণতা থাকলে মৃদু অসন্তোষ প্রকাশ করা যেতে পারে। কিন্তু মহিলারা এন্ট্রি নিলেই মুশকিল। তাঁদের সঙ্গে কখনও এঁটে ওঠে না হেমাঙ্গ। আর কে না জানে হেড মিস্ট্রেসরা সাধারণত রাশভারী, ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা হন, যাঁদের হেমাঙ্গ বরাবর ভয় পায়।

সে বলল, ঠিক আছে। তবে ওঁর একটু পরে এলেও হবে। আমরা বরং কাজটা শুরু করে দিই।

কিন্তু প্রধান শিক্ষিকা ডাবের পিছু পিছুই এলেন। তাঁকে দেখে নিজের অজান্তেই চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল হেমাঙ্গ। ছিপছিপে, ফর্সা, অল্পবয়সী, ধারোলো চেহারার এই মহিলাকে হেড মিস্ট্রেস বলে মনেই হয় না। খুবই শহুরে চেহারা। অত্যাধুনিক সাজপোশাক। উপরন্তু বিদেশী সুগন্ধী চারদিকটা মোহময় করে রেখেছে মেয়েটির।

লজ্জা পেয়ে মেয়েটি বলল, আরে! দাঁড়ালেন কেন? বসুন!

হেমাঙ্গ ধপ করে বসে পড়ল। সে গাঁয়ে গঞ্জে অনেক বালিকা বিদ্যালয়ে অডিট করতে গেছে, কিন্তু এরকম হেড মিস্ট্রেস কখনও দেখেনি। এ তে রূপালি পর্দা থেকে নেমে এসেছে! কিংবা তাও নয়। আরও একটা বেশী মাত্রা যোগ হয়েছে। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের নভেলের নায়িকা-টায়িকাদের মতো। তার মানে এ নয় যে, হেমাঙ্গ রবীন্দ্রনাথের সব নভেল পড়েছে বা পড়ে। কিন্তু একটা আন্দাজ আছে তো! সুচরিতা, লাবণ্য এদের কথা খামচা খামচা ভাবে যেটুকু জানে হেমাঙ্গ, তা হয়তো এরকমই। হেমাঙ্গ আধোবদন হল।

হেমাঙ্গ যে নার্ভাস বোধ করছে সেটা মেয়েটি স্পষ্ট বুঝতে পারল। সংকোচহীন চোখে হেমাঙ্গকে একটু মেপে নিয়ে বলল, আপনার তো মস্ত বড় ফার্ম, এ সব ছোটোখাটো অডিট আপনারা করতে এলে আমরা যে ভয় পেয়ে যাই!

হেমাঙ্গ জানে, কেন সে গাঁ-গঞ্জে অডিট করতে যায়, তা প্রায় কাউকেই বুঝিয়ে বলে লাভ নেই। কেউ বুঝবে না। এ মেয়েটি তো নিশ্চয়ই নয়। সে মৃদু মিষ্টি হাসি দিয়ে প্রসঙ্গটিকে পাশ কাটাল। নিবিষ্টভাবে প্ল্যাস্টিকের স্ট্র দিয়ে ডাবের জলটা ধীরে ধীরে টেনে নিতে লাগল ভিতরে। এবং টের পেল, তার সেই দাঁতটা সিরসির করছে। খুব মৃদু, খুব সামান্য, তবু করছে।

স্কুলের দফতরি গোটা চারেক মিষ্টি, দুটো সিঙাড়া, দুখানা নিমকি, কয়েক টুকরো আপেল, কয়েকটা আঙুর, দুটো সিঙ্গাপুরী কলা দিয়ে সাজানো দুটো প্লেট অতি সম্মানের সঙ্গে রেখে গেল সামনে, সঙ্গে পরিষ্কার কাচের গ্লাসে জল।

মেয়েটি বলল, খান।

হেমাঙ্গর অভিজ্ঞতা সর্বত্রই অল্পবিস্তর একইরকম। সর্বত্রই এরকম মিষ্টির প্লেট সাজিয়ে দেওয়া হয়, হেমাঙ্গ স্পর্শও করে না। সে মৃদু স্বরে বলল, আমি খেয়ে এসেছি। ওসব নিয়ে যেতে বলুন।

অন্যান্য জায়গায় এই মৃদু আপত্তিকে সম্মতির লক্ষণ বিবেচনা করে প্রচণ্ড চাপাচাপি করা হয়। এমনকি প্রবল আপত্তিকেও অগ্রাহ্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই শহুরে মেয়েটি মৃদু হেসে বলল, আমি নগেনবাবুকে আগেই বলেছিলাম, এত জলখাবারের আয়োজন করবেন না, বড়লোকেরা বেশী খান না। উনি শুনলেন না। নষ্ট হবে, জানাই ছিল।

হেমাঙ্গ মৃদু হেসে বলে, নষ্ট হবে না। কেউ খেয়ে নেবে, যাদের খিদে আছে।

মেয়েটি একটু মিষ্টি হেসে বলে, ঠিক আছে। কিন্তু দুপুরে খাবেন তো! অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে যে আপনার জন্য বিরাট রান্নাবান্না হচ্ছে।

খাবো। এই বলে নিঃশেষিত ডাবটা চেয়ারের পাশে নামিয়ে রেখে রুমালে মুখ মুছে সে বলল, আমি বড়লোক একথা আপনাকে কে বলল?

বুঝতে অসুবিধে হয় না।

কথাটা শুনে হেমাঙ্গ একটু খুশিই হল। মেয়েটির দিকে সে মোটেই তাকাচ্ছে না। সে জানালা দিয়ে কখনও মাঠের একটা লাল গরুকে দেখছে, কখনও দৃশ্যহীন সিলিং-এর দিকে চেয়ে গলাটা একটু চুলকে নিচ্ছে, কখনও দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের বাঁধানো ফটোর ওপর একটা ধৈর্যশীল মাকড়সাকে বসে থাকতে দেখছে, তবু কি করে যেন এর ফাঁকে ফাঁকে না তাকিয়েও মেয়েটাকে দেখতে পাচ্ছে সে। দুষ্টুমিতে ভরা বিচ্ছুর মতো মুখ, নিতান্তই

চব্বিশ পঁচিশ বয়সের এই মেয়েটা, কি করে হেড মিস্ট্রেস হল? বাপ-দাদার জোরে? নাকি রাজনীতির ব্যাকিং-এ?

প্রশ্নটা করতে অনেক সময় লাগল হেমাঙ্গর। ঘণ্টা দুয়েক বাদে যখন কাগজপত্র খাতা হিসেব ইত্যাদি নিয়ে তিনজনে খুবই ব্যস্ত, তখন হঠাৎ এক ফাঁকে হেমাঙ্গ বলল, আপনি বেশ অল্প বয়সেই হেড মিস্ট্রেস হয়েছেন, না?

মেয়েটি একটু অবাক হয়ে বলে, অল্প বয়স? মোটেই না। আমার আঠাশ চলছে।

আঠাশ কি অনেক বয়স?

অনেক। হেড মিস্ট্রেস হতে গেলে বয়সটা ফ্যাক্টর নাকি?

হেমাঙ্গ তটস্থ হয়ে বলে, না, তা অবশ্য নয়। তবে কিনা—

নগেনবাবু তাড়াতাড়ি হেমাঙ্গর কানের কাছে মুখ এনে বললেন, ম্যাডামের বিলিতি ডিগ্রি।

ওঃ, দ্যাট এক্সপ্লেনস্ ইট।

মেয়েটি ঠাণ্ডা গলায় বলে, হোয়াট এক্সপ্লেন হোয়াট?

আপনার বিলিতি ডিগ্রি, আর কে না জানে, আমরা মনে মনে এখনও সাহেবদের প্রতি দাস্যভাব পোষণ করি!

মেয়েটি অবাক হয়ে বলে, তাই নাকি? আমার তো সেরকম মনে হয় না।

কেরানি নগেনবাবু অতিশয় বিগলিত কণ্ঠে বললেন, ম্যাডামের জন্মই তো বিলেতে। লিভারপুলে।

শুনে হেমাঙ্গ প্রথা ভঙ্গ করে মেয়েটার মুখের দিকে এক ঝলক সোজাসুজি তাকাল। ভক্তি ভরে। তারপর মুখটা নামিয়ে নিয়ে বলল, তা হলে এই গাঁয়ের স্কুলে পড়ে থাকার দরকার কি?

মেয়েটি নগেনবাবুর দিকে একটু শাসনকরা দৃষ্টিক্ষেপ করে হেমাঙ্গর দিকে চেয়ে বলে, ওটাও কোনও নিয়ম নয়। বিলেতে জন্ম হলে বা বিলিতি ডিগ্রি থাকলে, এ দেশের গাঁয়ের স্কুলে চাকরি করা তো বেআইনী নয়।

ওটা তর্কের কথা। ঘটনা ওরকমভাবে ঘটে না।

মেয়েটি একটু চুপ করে থেকে বলে, সবাই ঠিক আপনার মতোই প্রশ্ন করে। বিলেতে জন্ম, বিলিতি ডিগ্রি, তা হলে গায়ের স্কুলে পড়ে আছো কেন? আমি তো মানেই বুঝতে পারি না।

হেমাঙ্গ মেয়েদের রাগকে সাঙ্ঘাতিক ভয় পায়। সে জানে, রেগে গেলে মেয়েরা অপ্রতিরোধ্য। সে তাড়াতাড়ি মোলায়েম গলায় বলে, এটা যদি আপনার একটা মিশন হয়ে থাকে তো ভাল কথা। প্রফেশন হলে কিন্তু লোকে অবাক হবেই। কারণ, ইচ্ছে করলেই আপনি যে-কোনও ভাল স্কুলে কলকাতাতেই চাকরি পেতে পারেন।

মেয়েটি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সেটা ঠিক কথা। এটা আমার একটা মিশন। আমি এ দেশের গাঁয়ের স্কুলে চাকরি করছি অবস্থাটা বুঝবার জন্য। ঠিক চাকরি করার জন্য নয়।

কেমন বুঝছেন?

খুব ভাল নয়।

দুজনেই একটু হাসল। তারপর আবার কাজ। কাজের মাঝখানে মাঝখানে হেমাঙ্গ মেয়েটির গা থেকে উড়ে আসা মাদক গন্ধটি পাচ্ছিল। বিলিতি ডিগ্রিধারী, বিলেতে জন্মগ্রহণকারী মেয়েটি তাকে আরও একটু তটস্থ

করেছে, অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। তার দাঁতটা কি একটু বেশি সুলসুল করছে?

বেঁটেখাটো টাক-মাথা অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার এলেন একটু বাদেই—এবার যে একটু উঠতে হবে। কিছু মুখে দিয়ে আসবেন চলুন। খাবার রেডি।

খেতে গিয়ে আর এক দফা বিপদে পড়তে হল হেমাঙ্গকে। তার আর মেয়েটির খাওয়ার আয়োজন হয়েছে একটা ছোটো টেবিলের দুধারে। মুখোমুখি। দুজনের বেশি বসার জায়গাও নেই। একখানা একটেরে ঘরে তারা দুজনই মাত্র। অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারমশাই বশংবদ দরজার কাছে একটু তফাতে দাঁড়ানো।

হেমাঙ্গর যত সংকোচ, যত আড় হয়ে থাকা। মেয়েটির সেসব নেই। খেতে বসে বলল, আপনার সঙ্গে কিন্তু আমার ফর্মাল পরিচয়টাই হয়নি। আমার নাম রশ্মি রায়। আপনার নাম অবশ্য আমি জানি।

হেমাঙ্গর দাগী দাঁতটা অকারণে সুলসুল করে ওঠে এ কথায়।

হেমাঙ্গ কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। একটু ভাবতে হল। তারপর সম্পূর্ণ অনাগ্রহে প্রশ্ন করল, আপনি কি আগাগোড়া বিদেশেই লেখাপড়া করেছেন?

না। আমার আড়াই বছর বয়সে আমরা দেশে চলে আসি। আমি পড়াশুনো করেছি কলকাতায়। বি এস-সি পাশ করে ফের বিলেতে চলে যাই। দুবছর হল ফিরেছি।

আবার যাবেন?

রশ্মি মৃদু হেসে বলে, বিলেত এখন আর অত সুখের দেশ নেই। তবে সামনের বছর হয়তো যাবো। পারমানেন্টলি।

পারমানেন্টলি কথাটায় আবার দাঁতটা সুলসুল করল কেন? দাঁতটার কি কোনও রি-অ্যাকশন হচ্ছে? দাঁতের কি কাতুকুতু আছে? দাঁতের কি মস্তিষ্ক বা হৃদয় থাকা সম্ভব?

পারমানেন্টলি কেন?

কিছু কাজ করার ইচ্ছে আছে। বিদেশ ছাড়া কাজ করার উপায়ও নেই। এই যে স্কুলটা দেখছেন, এর যে কত প্রবলেম, ভাবতেই পারবেন না। তার ওপর ফান্ড নেই, পলিটিক্যাল প্রেসার আছে, ইন ফাইটিং আছে, ভেস্টেড ইন্টারেস্ট আছে। এইটুকু একটু স্কুল নিয়েও কত কি হয়, না দেখলে বিশ্বাস হত না। আপনি আজ খুব আলগাভাবে অডিট করেছেন, ভাল করে হিসেব দেখেননি। দেখলে অনেক ভূতুড়ে এন্ট্রি খুঁজে পেতেন।

হেমাঙ্গ একটু হাসল, পেয়েছি। তবে গাঁয়ের স্কুল বলে, বড় ধরনের গণ্ডগোল না থাকলে আমি প্রশ্ন তুলি না।

সো কাইন্ড অফ ইউ। প্রশ্ন উঠলে আমাকে বিব্রত হতে হত। আমার ইচ্ছে ছিল, ছোট্ট একটা গাঁয়ের স্কুলকে ধীরে ধীরে একটা মডেল স্কুল তৈরি করব। একটা একজাম্পল, তৈরি করব।

পারলেন না?

একদম নয়। একটা বিল্ডিং গ্র্যান্ট বের করতে, একটা এইড বের করতে, একটা উইং খোলার জন্য পারমিশন পেতে যে কী ছোটাছুটি করতে হয়। তাও কাজটা হয় না। এতদিন বাদে বুঝতে পারছি, এখানে পণ্ডশ্রম করে কোনও লাভ নেই। ভারতবর্ষ তার নিজস্ব দর্শনে চলবে, তাকে চালানো যাবে না। যারা সে চেষ্টা করেছেন কেউ পারেনি।

হেমাঙ্গ সপ্রশংস চোখে এক ঝলক রশ্মিকে দেখে নিল। কিছু বলল না। মেয়েটা বুদ্ধিমতী, সময় থাকতে সার সত্যটা বুঝতে পেরেছে।

রশ্মি একটা বড় শ্বাস ফেলে বলল, একজন লোক স্কুলটাকে তিন বিঘা জমি দান করে গেছেন।

আপনি বিশ্বাস করবেন না, সেই জমিটা আজ অবধি আমরা দখল করতে পারিনি। আদালতের হুকুম পাওয়া সত্ত্বেও। কেন জানেন? কিছু পাওয়ারফুল লোক ওই জমিতে চাষ করায়। কোনও সভ্য দেশ হলে এটা হতে পারত না।

ভারতবর্ষের জন্য লজ্জাবোধ করেই যেন হেমাঙ্গ মুখ নামিয়ে নিল এবং বেগুন বড়ির পাতুরিটা সরিয়ে রাখল, খেল না।

রশ্মি বলল, আপনি কিছু খাচ্ছেন না! না খেলে মাস্টারমশাই দুঃখ পাবেন। এ আয়োজনটা ওঁর নিজের। স্কুলের টাকায় নয় কিন্তু।

হেমাঙ্গ ফের অস্বস্তিতে পড়ল।

রশ্মি মৃদু স্বরে আদেশ করল, খান। আপনার খিদে পেয়েছে।

হেমাঙ্গ মৃদু স্বরে বলে, আমি মেয়েদের সামনে খেতে পারি না।

সে কী বলে রশ্মি খিলখিল করে হেসে ফেলল, আপনার বউও তো একটি মেয়েই, তার সামনে খান তো! তখন?

সেই জন্যই তো বিয়ে করিনি।

রশ্মি খুব হাসল, প্রথমে আপনাকে খুব গোমড়ামুখো মনে হয়েছিল, তা তো নন! আচ্ছা বাবা, আমি উঠে যাচ্ছি।

আরে না, আপনি বসুন। আমি খাচ্ছি। কিন্তু তাকাবেন না।

রশ্মি খুব সস্নেহে চেয়ে থেকে বলল, ও লজ্জাটা তো মেয়েদের থাকে। আমার অবশ্য নেই।

এই ছোটোখাটো কথা অদৃশ্য মাকড়সার মতো একটা জাল বুনে যাচ্ছে কি? তৈরি হচ্ছে একটা প্যাটার্ন? হেমাঙ্গ এই প্যাটার্নটাকে ভয় পায়। কোথাকার জল কোথায় গড়ায় কে জানে? হয়তো তারা আজ একসঙ্গে এক গাড়িতেই ফিরবে। হয়তো তারপর দক্ষিণ কলকাতাতেও! হয়তো কাছাকাছিই তাদের বাড়ি।

আচ্ছা কলকাতায় আপনি কোথায় থাকেন? উদ্বিগ্ন হেমাঙ্গ হঠাৎ জিজ্ঞেস করে।

হাজরা।

হেমাঙ্গ হাঁ করে থাকে দু সেকেন্ড। তার দাগী দাঁতটা সুলসুল করে। হাজরা যে তার গা ঘেঁষে!

২৬

মেঘ দেখলে আজও তার একইরকম আনন্দ হয়, ছেলেবেলায় যেমন হত। বৃষ্টি তাকে এখনও সম্মোহিত করে। এ বছর তার সাধ মেটাতে বৃষ্টিও হচ্ছে বটে। একদিন দুদিন শুকনো যায় তো চারদিন ধরে নেমে থাকে।

আজ এক বৃষ্টি-ঝমাঝম দিন। মেঘলা আকাশ চারদিকে আঁধার ছড়িয়ে দিচ্ছে আজ সকালে। ছেদহীন বৃষ্টি নেমে আছে শেষরাত থেকে। ঝাঁঝালো বৃষ্টির ভিতর দিয়ে চলেছে রেলগাড়ি। দরজা খোলা, জানালার পাল্লা নেই। হুহু করে বৃষ্টির ছাট এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে কামরার ভিতরটা। কোনওরকমে একটা খাঁজের আড়ালে বেঞ্চে বসে আছে সে। বেঞ্চের কাঠ চুরি হয়ে যাওয়ায় বসাটাও ভীষণ কষ্টকর হচ্ছে। বেঞ্চের লোহার কাঠামোর ওপর কোনওক্রমে শরীরের ভারখানি রাখা। জলকণায় সে ভিজছেও। কিন্তু কোনও বিরক্তি বা রাগ নেই তার। বৃষ্টি-মুগ্ধ দু'খানি চোখ পেতে সে দেখছে মাঠঘাট, দরিদ্র শহরতলি, দোকানপাট, ছোট্ট স্টেশন। কয়েকটা ভেজা চড়াই বসে আছে ওপরের মাল রাখার র‍্যাকে। বিনা টিকিটে রেলগাড়ি চেপে তারা কোথায় যাচ্ছে তা তারাও জানে না। পাখির তো দেশ নেই। তবে বাসা আছে, বাসায় আছে ডিম, আছে ওম, ওরা সেই টানে ঠিক ফিরে যাবে যথাস্থানে।

এবার কি বন্যা হবে? যা বৃষ্টি! হতেও পারে। খবরের কাগজে আসাম আর বিহারের বন্যার খবর দিচ্ছে। বছরওয়ারি ঘটনা। এ দেশে নদীর কোনও সংস্কার নেই। সে সারা দেশ ঘুরে দেখে, অধিকাংশ নদীই শুখার মরসুমে খাঁ খাঁ করে শুকনো বালিয়াড়ি বুকে নিয়ে। কোথাও তিরতির করে একপাশ দিয়ে নর্দমার মতো একটি ধারা প্রবহমান থাকে, কোথাও তাও থাকে না। তখন চাষ মার খায়, নদীর নাব্যতা বলে কিছু থাকে না। অগভীর খাতে যখন বর্ষার ঢল নামে তখন দুকূল ছাপিয়ে গ্রামের পর গ্রাম আর শহর ভেসে যায়। কেন প্রতি বছরই হবে খরা বা বন্যা? নদী সংস্কার করা হলে, জায়গামতো পাহাড়ে বাঁধ দিয়ে জল সঞ্চয় করলে, নিয়মিত ড্রেজিং করা হলে, নিকাশী খাল কাটা হলে কত অনায়াসে কাজে লাগানো যেত জলের মতো মহার্ঘ সম্পদ। এখনও এ দেশের কত ঊষর ভূমি তেষ্টা নিয়ে চেয়ে আছে বুদ্ধিমান মানুষের দিকে। অথচ ধী-সম্পন্ন মানুষ কেন কিছুই করছে না? তার ধী খেয়ে নিল কে? পলিটিকস? না কি স্বার্থ? না কি আলস্য ও দূরদর্শিতার আদ্যন্ত অভাব? অস্ট্রেলিয়ায় নদীর সংখ্যা কত কম, সেখানে চাষীদের জল পয়সা দিয়ে কিনতে হয় তবু কখনও জলের অভাবে চাষ মার খায় না। এক ফোঁটা জলের কোনও অপচয় করে না ওরা। ভারতবাসী যেন জানেই না নদীকে কিরকমভাবে ব্যবহার করতে হয়। এরা যেন বুড়ো বয়সেও হামা-টানা শিশুর মতো অবোধ। এবং নির্বোধ। গোটা ভারতবর্ষকে জলপথে নানাভাবে জাল বদ্ধ করার একটি প্ল্যান সে কর্তাব্যক্তিদের কাছে পেশ

করেছিল। সেই প্ল্যান কার্যকর হলে, শুধু কৃষি নয়, পরিবহন ব্যবস্থাতেও একটা প্রভূত ওলটপালট ঘটতে পারত। এদেশে গরুর গাড়ি, জেট প্লেন, ভাঙা স্লেট, কম্পিউটার, বিজ্ঞান ও কুসংস্কারের এক অসাধারণ সহাবস্থান। জলপথ থাকলে দিশি নৌকো ডিজেল ট্রাকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাল পরিবহন করতে পারত। কর্তাব্যক্তিরা সবিনয়ে বলেছেন, প্ল্যান তো ভাল, কিন্তু আমাদের অত টাকা কোথায়? সে নিজের ভিতরে ভিতরে অসহায় রাগে মাথা কুটে মরে। এ সব নির্বোধরা কি জানে না, বৃক্ষপতনের ফলে ন্যাড়া প্রকৃতি একদিন আর বাদলমেঘ আকর্ষণ করতে পারবে না? খরার পর খরা আর অজন্মায় শুকোবে মাটি? বাড়বে সামুদ্রিক নোনা জলের স্তর এবং তা গ্রাস করবে নিচু সব ভূখণ্ড? আগামী শতাব্দীর মাঝামাঝি মানুষের অস্তিত্বে যে নাভিশ্বাস উঠবে সে তার শব্দটা অবধি আগাম শুনতে পায়। এরা কেন পায় না? খুব কি সময় আছে আর? মানুষের সর্বনাশের আগাম লক্ষণগুলি কি ধরা পড়ছে না এদের বোধবুদ্ধিতে?

একটা গল্পে সে পড়েছিল, পিঁপড়েদের চলন দেখে একটি গাঁয়ের লোক অনুমান করেছিল, বন্যা আসছে। বন্যা সত্যিই এসেছিল। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশে গাঁয়ের লোকেরা হাওয়ার চলন দেখে সঠিক নির্ধারণ করতে পারে, প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝড় আসছে। চীনের প্রাকৃত মানুষেরা বন্য প্রাণীর হাবভাব দেখে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস নির্ধারণ করতে পারে। অশিক্ষিত, প্রকৃতি-লালিত মানুষেরা অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির কথা জানে না বটে, কিন্তু তাদের জন্যও আছে এইসব প্রাকৃত বিজ্ঞান। মাঝে মাঝে যা যন্ত্রপাতিকেও হার মানায়। তার ইচ্ছে ছিল, সারা পৃথিবী ঘুরে আদিবাসী, উপজাতি, যাযাবরদের কাছ থেকে এই অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি ও ডিডাকশনের কৌশল শিখে নিয়ে তাকে আরও পরিশীলিত করে কাজে লাগাতে। পৃথিবীর জন্য কত কিছু করার ছিল তার, কত কী করতে সে আজও চায়! কিন্তু আজকাল তার কেবলই মনে হয় নানা আইন-কানুন, অবহেলা, ঔদাসীন্য, স্বার্থ আর রাজনীতি যেন তাকে হাত-পা বেঁধে একটা বাক্সে বন্দী করে ফেলেছে। তাকে কিছুই করতে দিচ্ছে না কেউ।

গাড়িতে লোকজন নেই বললেই চলে। একে ছুটির দিন, তাতে বৃষ্টি, কোনও স্টেশনে একটা দুটো লোক উঠছে, নেমে যাচ্ছে। ঠায় একা সে-ই বসে আছে ট্রেনে। তার যেন কোথাও যাওয়ার নেই, কোনও স্টেশনেই নামবার নেই। আজ বৃষ্টিভেজা দিনে ভাঙাচোরা ট্রেনের কামরায় সে একেবারে সম্পর্কহীন একা। বড় আনমনা। বাইরের আবছা দিগন্তের দিকে চেয়ে সে পৃথিবীর সঙ্গে তার ও মানুষের সম্পর্কের বুনটটা অবিষ্কারের চেষ্টা করছে। পারছে না। তার কেবলই মনে হয়, এতকাল পৃথিবীতে বাস করেও, পৃথিবীর সব ধনসম্পদ লুটপাট তছনছ করেও মানুষ—বোকা মানুষ ধরতেই পারেনি, এই পৃথিবীর সঙ্গে তার সম্পর্কটা কী। পৃথিবীর ভূখণ্ডকে সে স্বার্থপরের মতো ভাগজোখ করে নিয়েছে, সে তৈরি করছে নানা জটিলতার বেড়াজাল, সংকীর্ণ দেশাত্মবোধ। মানুষ কি কখনও দেখে না, পাখি যখন এক দেশ থেকে অন্য দেশে উড়ে যায় তখন তার পাসপোর্ট লাগে না, ভিসা লাগে না, কাস্টমস ডিঙোতে হয় না? পৃথিবীকে ভাগজোখ করার সে কে? সে কেন দেশ ভাগ করে নিজের ভিতরে সৃষ্টি করে আঁটন বাঁধন? সে কেন গোটা এই গ্রহটির কথা ভাবে না! কালো মহাশূন্যে সবুজাভ নীল প্রাণময় এই তুলনাহীন পৃথিবীকে সে কেন গোটাগুটি নিজের বলে ভাবতে পারে না? এ যেন পৃথিবীকে শরিকানায় ভাগ করে নিজের নিজের কোর্ট আঁকড়ে থাকা। আর এই শরিকানার কাজিয়ায় চলে যাচ্ছে মানুষের আয়ু ও শ্রম, এই কাজিয়ায় আহুতি হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর মহার্ঘ জলবায়ু, তার যতেক সম্পদ। তার খুব ইচ্ছে করে ভিখিরির মতো দেশে দেশে ঘুরে মানুষকে এইসব কথা বোঝাতে। সবাই

এক হয়ে এই পৃথিবীর কথা ভাবো, পৃথিবী ছোট একটি গ্রহ, তার অফুরন্ত সম্পদ নেই। যা আছে, যেটুকু আছে তাকে যত্ন করে সঞ্চিত রাখো। মেক্সিকোয় ভূমিকম্প হলে উদাসীন থেকো না চীন, ইথিওপিয়ায় দুর্ভিক্ষ হলে তার ক্ষুধা যেন স্পর্শ করে সুইডেনকেও, আফ্রিকায় মহামারী হলে তা যেন উদ্বিগ্ন করে আমেরিকাকেও।

সে ভারতবর্ষের এক সরল, গরিব, উদ্বিগ্ন মানুষ। সে একজন গ্রামবাসী হিসেবেই যাবে। রাষ্ট্রনায়কদের কাছে। বলবে আমি রাজনীতি জানি না, আমি জানি না অর্থনীতির কূট তত্ত্ব, আমি শুধু চাই পৃথিবীর গভীর অভ্যন্তরে তার হৃৎপিন্ডের যে স্পন্দনটুকু আজও ধুকপুক করছে তা অব্যাহত হোক। মানুষ তাকে বোকা বলবে, দুয়ো দেবে, প্রত্যাখ্যান করবে। করুক। সেই অপমান তার গায়ে লাগবে না।

একসময় বহুদিন ধরে যাতায়াত করেছে বলে স্টেশনটা ভুল হল না তার। ভুল হওয়ারই কথা ছিল। প্রবল বৃষ্টিতে বাইরেটা বড়ই আবছা এবং সে ছিল গভীরভাবে অন্যমনস্ক। তবু স্টেশনের বেড়ার গায়ে মস্ত কাঠচাঁপা গাছটাই বোধ হয় চেনা দিল তাকে। যেন বলে উঠল এই যে অনেকদিন বাদে! এসো এসো। সে উঠল স্বপ্নোত্থিতের মতো, বাঙ্ক থেকে নাইলনের ব্যাগটা নামিয়ে ছাতা খুলে প্ল্যাটফর্মে পা দিল। বৃষ্টির ঝরোখা ঘিরে ফেলল তাকে।

তখন ছাতা জুটত না। কচুপাতা বা টোকা আটকাতে পারত না বৃষ্টিকে। ভেজা গায়ে ট্রেনে উঠে কলকাতায় যেত সে। সারা দিন ভেজা জামা প্যান্ট গায়েই শুকোত। সর্দি লাগত না। গরিবের শরীর সব সয়ে নিত। এক জোড়া রবারের সস্তা জুতো থাকত তার। শীত গ্রীষ্মে পরত। ছিঁড়ে গেলে সেলাই করে নিত, সোল ক্ষয় হয়ে গেলে ভিতরে ভরে নিত পিচবোর্ড, যতদিন পারত সেই জুতোতেই চালিয়ে নিত। নিতান্ত অকেজো হয়ে গেলে, আর এক জোড়া কিনতে যে সময় লাগত, বাড়তি টাকা জোগাড়ের জন্য তখন খালি পায়ে হাঁটতে হত মাইলের পর মাইল। তবু সেই সব দিনের স্মৃতি কেন কেবলই আনন্দের শিহরণ বয়ে আনে আজও।

স্টেশনে পা দিয়ে ঠিক সেইরকমই মনে হল তার। সব পুরনো দিন ফিরে এল বুঝি!

স্টেশনে লোকজন নেই বললেই হয়। স্টেশনের শেড-এর তলায় সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। তাড়াহুড়ো নেই। সে কিছুক্ষণ শিউরানো রোমকূপ নিয়ে অনুভব করল তার হারিয়ে যাওয়া নিজেকে। শৈশবের সে এসে কি অলক্ষে হাত ধরেছে আজকের তার?

তাড়া নেই। কিছুমাত্র তাড়া নেই। খুব ধীরে ধীরে চুমুকে চুমুকে চা খাওয়ার মতো সে তার চারদিককার সব কিছুকে গ্রহণ করছে ভিতরে। উপভোগ করছে। ধীর পায়ে সে বেরিয়ে এল স্টেশনের বাইরে, যেখানে দোকানপাট, রিক্সা-ভ্যান গাড়ি, বাসের আড্ডা। আজ বড্ড ফাঁকা-ফাঁকা। আজকাল শীতলাতলা বিষ্ণুপুরের বাস হয়েছে। এক টানে নিয়ে যায়।

একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দোকানীকে জিজ্ঞেস করল সে, শীতলাতলা বিষ্টুপুরের বাস কোথা থেকে ছাড়ে?

এই চৌপথী থেকেই ছাড়ে। আজ কি আর বাস পাবেন। সকালের দিকে দু'খানা গেছে। ফেরেনি এখনও।

বাসের অনিশ্চয়তায় সে একটুও ঘাবড়ে গেল না। মনে হল এটাই যেন ঈশ্বরের অভিপ্রেত, সে বরাবর হেঁটে স্টেশনে এসেছে গেছে। আজও তাই যাবে।

স্টেশনের চৌহদ্দি পেরিয়ে যখন নির্জন ফাঁকা রাস্তায় এসে পড়ল তখন নিবিড় ঝিমঝিম, অনুত্তেজক বৃষ্টি ঘিরে ধরল তাকে। ঘিরে ধরল ভেজা মাটির গন্ধ। ঘিরে ধরল গাছপালা। এরা কি জানে যে, সে এদের বন্ধু?

সে পৃথিবীর প্রতিটি বৃক্ষের বন্ধু, কীটপতঙ্গের বন্ধু, তৃণভূমি, নদী, পশুপাখি সকলের বন্ধু সে। কিন্তু এরা কি টের পায় তা?

কবে পিচ হয়েছিল, তারপর গরুর গাড়ি, ট্রাক আর বাসের ধাক্কায় কবে উড়ে গেছে রাস্তার মসৃণতা। মাঝে মাঝে ডোবার মতো বড় বড় গর্ত। জলে ভরভরন্ত। সে জল বাঁচিয়ে চলার চেষ্টাই করল না। ছেলেবেলার মতো জল ভেঙে, খানাখন্দ ভেঙে, কাদা ঘেঁটে হাঁটতে লাগল। একদিন সে শহরের বাস ঘুচিয়ে চলে আসবে গাঁয়ে। মাটি মাখবে, ভাব করবে পৃথিবীর সঙ্গে।

আলপথ ধরে গেলে রাস্তা অনেক কম হত। কিন্তু সে দেখল, ক্ষেতগুলো জলে ডুবে আছে। পিছল আল ধরে যাওয়া ঠিক হবে না। ক্রমে নিবিড় থেকে নিবিড়তর গাঁয়ের মধ্যে চলে যেতে যেতে তার দু'খানা চোখ রূপমুগ্ধ সম্মোহিত হয়ে যেতে লাগল। ফ্রান্স বা ইংল্যান্ডের চমৎকার পরিচ্ছন্ন কান্ট্রিসাইড এ নয়। তবু এই দীনদরিদ্র, শতাব্দীকাল পিছিয়ে থাকা পল্লী বাংলার সঙ্গে তার এখনও নাড়ীর টান।

সে যখন গাঁয়ের কাছাকাছি হচ্ছিল, যখন দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল সুপুরি আর নারকেল গাছের জড়ামরি তখন শীতলাতলা বিষ্ণুপুরে বটতলার অনতিদূরে ঘোষপাড়ার নাবালের ধারে বহু মানুষ বৃষ্টির মধ্যেও জমা হয়েছে। নাবালে অনেক জল। তার মধ্যে উল্টো হয়ে অর্ধেক অন্তর্জলিতে পড়ে আছে একটা লাশ। মুণ্ডু সমেত মাজা অবধি ডুবে আছে জলে। পায়ের চটি আর কালো প্যান্টওলা দুখানা পা ছড়িয়ে আছে কাদামাখা ডাঙায়। গায়ের সবুজ জামাটা বাতাসে একটু ফুলে বেলুনের মতো ভেসে আছে জলের ওপর।

যারা দেখছিল তাদের কারও মুখে কথা নেই। তারা হয়তো কেউ জানে, কেউ হয়তো জানে না, কেউ জেনেও জানে না, এরা ভয় পেয়েছে। অস্তিত্বের ভয়ংকর অনিশ্চয়তার একটি দৃশ্য তাদের চোখের সামনে। কত আদরের শরীর, কত তাচ্ছিল্য ও অবহেলায় জলকাদায় পড়ে আছে মরা কুকুর-বেড়ালের মতো। এদের অনেকের আজ দুপুরের ভাত মুখে রুচবে না, রাতে ঘুম হবে না ভাল করে। এরা অনেকেই এখন কিছু দিন খুব ভয়ে ভয়ে থাকবে। চমকে উঠবে বাতাসের শব্দে। টিনের চালে বেড়াল লাফ দিলেও কেঁপে উঠবে ভয়ে।

একটু-আধটু ফিসফাস চলছে। কেউ কেউ বলছে খুন-হওয়া লোকটা রামজীবন বা ন'পাড়ার দুলু মণ্ডল। কেউ একজন বলল, মনে হচ্ছে গদাই।

গণার সাইকেলের দোকানের বাচ্চা ছেলে কালু অবশ্য জানে। কিন্তু মরে গেলেও সে মুখ খুলবে না। শেষ রাতে সে পেচ্ছাপ করতে উঠেছিল। ঝাঁপ খুলে বেরিয়েই সে বটতলায় একটা চেঁচানি শুনতে পায়, বাবা রে : তারপর কে একটা খিস্তি দিয়ে বলে উঠল, চোপ শুয়োরের বাচ্চা, মুখে ইয়ে ভরে দেবো...

কালুর পেচ্ছাপ পেটের মধ্যেই শুকিয়ে গেল ভয়ে, সে টপ করে দোকানে ঢুকে ঝাঁপ টেনে ফুটোয় চোখ রাখল। সাত আটজন লোকে একজনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের হাতে বড় বড় ল্যাজা, গজা, ভোজালি। এত জোরে লাথি মারছে, চাঁটি মারছে যে পটকা ফাটার মতো আওয়াজ হচ্ছে। লোকটা চেঁচাতে পারছে না, তার মুখে একটা নোংরা কাপড় গোঁজা। এত কিছু অন্ধকারে থেকেও দেখা যাচ্ছিল, বাদুর দোকানের হ্যাজাকবাতির আলোয়। বাদু ভোরবেলা গরু দুইতে ওঠে।

কালু লোকটাকে দেখেছে। তাকে সে চেনেও। যারা নিয়ে যাচ্ছিল তাদেরও। কিন্তু কালু জানে, তাকে এখানে বাস করতে হলে মুখে কোনও নাম উচ্চারণ করা চলবে না।

ঘোষপাড়ার নাবালে কি হল তা কালু আর জানে না। সে ভয়ে আর বেরোয়নি। ঘুমোতেও পারেনি। সকালে বেরিয়ে সে লাশটার কথা শুনল। কিন্তু খুব গম্ভীর হয়ে। দেখতে গেল না। সকাল থেকে সে মন দিয়ে সাইকেল মেরামতির কাজ করে যাচ্ছে।

যখন চা আর পাঁউরুটি খাচ্ছিল বাদুর দোকানের বেঞ্চে বসে তখন নাটা এসে কাছে দাঁড়াল। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেয়েছিল কালুর। পাঁউরুটির ডেলা আটকে গেল গলায়। বিষম খেল।

নাটা চাপা গলায় বলল, ঝাঁপ খুলে বেরিয়েছিলি কেন? মজা দেখতে?

কালু মাথা নেড়ে বলে, না তো! আমার পেচ্ছাপ পেয়েছিল, তাই।

মুখ দিয়ে যদি একটা কথাও বেরোয় তাহলে ফিনিস হয়ে যাবি।

কালু কথা কইতে পারেনি। শুধু মাথা নেড়ে বলেছিল, কিছু দেখিনি।

সাত আটজন খুনিয়ার মধ্যে নাটা ছিল। সবচেয়ে বেশীই ছিল। তার হাতে ছিল চকচকে মস্ত একটা ভোজালি। কালু সিঁটিয়ে আছে ভয়ে।

কাল রাত থেকে রামজীবন বাড়ি ফেরেনি। সকালে উঠে পটল শুনতে পেল, তার মা কান্নাকাটি করছে রান্নাঘরের দরজায় বসে। বারান্দায় দাদু মাথায় হাত দিয়ে বসা। ঠাকুমা ভ্যাবলা মুখে একটা কুলোয় চাল ঝাড়তে বসে থেমে আছে। বৃষ্টি পড়ছে অঝোরে।

রাঙা কাঁদতে কাঁদতে বলছিল, ওই বটতলাই ওকে খাবে। সেই কাল দুপুরে ইঁটের ভাঁটিতে যাবে বলে বেরিয়েছিল, সঙ্গে পাঁচশ টাকা। দুপুরে এসে খাওয়ার কথা, বিকেল গেল, রাত গেল, এখনও কোনও খোঁজ নেই!

বামাচরণ গামছা পরে নির্বিকারভাবে কাঠকয়লার গুঁড়ো আর নস্যি মেশানো মাজনে দাঁত মাজতে মাজতে ঘর থেকে বেরিয়ে খানিক দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি শুনল, তারপর ঘটি হাতে পুকুরের দিকে চলে গেল বৃষ্টির মধ্যে। যেন সে এ বাড়ির কেউ নয়।

শ্যামলী বেরোলো না, কিন্তু দরজার আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে শুনছিল। তার শাড়ির আঁচল দেখা যাচ্ছিল।

দৃশ্যটা, ঘটনাটা ঘুমের মাথায় বুঝতে অনেক সময় লাগল পটলের। তার বাবা ফেরে অনেক রাতে, যখন সে ঘুমিয়ে কাদা। বাবা যে রাতে ফেরেনি এটা তার জানা ছিল না।

সে মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, কাঁদছো কেন মা? কী হয়েছে?

সাইকেলটা নিয়ে যা তো বাবা। বটতলায় খুঁজে আয়। আমার বুক কাঁপছে, অম্বলের ব্যথায় মরে যাচ্ছি। একটু আগে বমি হয়েছে এক কাঁড়ি। সারা রাত ঘুম হয়নি তো!

পটল আর একটিও কথা বলেনি। মুখে চোখে একটু জল ছিটিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছে।

বটতলা অবধি যেতে হয়নি তাকে। তার আগেই মল্লিকদের বাড়ির সামনে একটা জটলা দেখে সে সাইকেল দাঁড় করাল।

দেবদাস মল্লিক জটলার দিকে চেয়ে বলছিল, কে খুন হয়েছে তা আগ বাড়িয়ে কি বলা যায়? পুলিশ আসবে, লাশ তুলবে, তারপর বোঝা যাবে। দিনকাল যা পড়েছে এ সব নিয়ে বেশী কথা না বলাই ভাল। বটতলাটা তো একটা বিভীষিকা হয়ে উঠছে দিনকে দিন।

খুন কথাটা শুনেই পটল পাঁই পাঁই করে সাইকেল চালিয়ে দিল। নামল এসে বটতলায় গণার সাইকেলের দোকানে। কালু অন্য দিনের চেয়ে বেশী মনোযোগ দিয়ে একটা টিউবের লিক সারাচ্ছিল।

কালুর সঙ্গে তার খুব ভাব। গণা না থাকলে কালু অনেক সময় বিনা পয়সাতেও তার চাকায় পাম্প দিয়ে দেয়।

এই কালু, কোথায় কে খুন হয়েছে রে?

খুন! বলে কালু আকাশ থেকে পড়ে, জানি না তো!

বটতলায় আজ দোকানপাট খোলেনি তেমন! লোকজন দেখা যাচ্ছে না। থমথমে ভাব।

এই যে শুনলাম কে খুন হয়েছে! আমার বাবা নয় তো!

কালু মাথা নেড়ে বলে, আমি কিছু শুনিনি।

কালু যে মিথ্যে কথা বলছে তা এক লহমায় বুঝে গেল পটল।

লোকজন সব কোন দিকে গেছে জানিস?

আমি কিছু জানি না। কাজ করছি এখন।

বাদুর দোকানে জিজ্ঞেস করতেই চা-ওলা ছেলেটা বলল, ঘোষপাড়ার নাবালে যাও। কেটে ফেলে রেখে গেছে রাতে।

কে খুন হল?

কে জানে!

আমার বাবা নয় তো!

ছেলেটা নির্বিকার মুখে নিষ্ঠুরের মতো বলল, হতে পারে। দেখগে, চিনতে পারো কিনা।

পটলের হাত পা থরথর করে কাঁপছিল। সাইকেলটা সে কালুর সামনে ফেলে রেখে বলল, এটা রইল। এখন চালাতে পারব না।

দৌড়তে দৌড়তে পটল যখন নাবালের ধারে পৌঁছোললা তখন ভিড়টা বেড়েছে। মেলা লোক, কিন্তু গণ্ডগোল নেই।

জীবনে খুন-হওয়া মানুষ কখনও দেখেনি পটল। মানুষকে যে এভাবে অনাদরে ফেলে রাখা যায়, মারা যায় তা তার কল্পনাতেও ছিল না কখনও। জলে আধ-ডোবা লোকটার নিথর পা দুখানার দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে ছিল সে। আমার বাবা নয় তো!

হতে পারে তার বাবা-ই ওটা। সবুজ জামা আর কালো প্যান্ট তো বাবার আছে।

কাছেই দশরথ সাহা দাঁড়িয়ে। সে মুখ তুলে লম্বা লোকটার দিকে চেয়ে করুণ গলায় বলল, দশরথ জ্যাঠা, এ আমার বাবা নয় তো!

দশরথ সাহা তার দিকে চেয়ে একটু যেন চমকে উঠল। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, কেন, তোর বাবা বাড়ি নেই?

না । কাল দুপুর থেকে আর ফেরেনি।

দশরথ সাহা কেমনধারা মুখ করে বলে, যা বাড়ি যা। পুলিশ এসে লাশ না তুললে কিছু বলা যাচ্ছে না। গিয়ে বামাচরণকে পাঠিয়ে দে।

সে আসবে না। কী হয়েছে বলুন না!

কে কি বলবে বাবা? দেখছিস তো কাণ্ডখানা! লোকে নানা কথা বলাবলি করছে। তুই আর থাকিস না এখানে।

কেন জ্যাঠা? আমি থাকলে কী হবে?

কী যে হবে তা দশরথও জানে না। দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, বাড়ির বড় কাউকে পাঠিয়ে দি গে যা।

পটল কি করবে বুঝতে পারছিল না। তাদের যে আর কেউ নেই। দাদু বুড়ো মানুষ, বসা মানুষ, দাদু কি আসতে পারবে এত দূরে?

পটল হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে ছুটতে লাগল বটতলার দিকে। জ্যাঠা এখনও বোধ হয় বেরোয়নি। সে গিয়ে হাতে পায়ে ধরে ঠিক নিয়ে আসবে।

সাইকেলের দোকানের কাছাকাছি আসতেই সে একজন নতুন মানুষকে দেখতে পেল। জলকাদা মাখা মানুষ, কিন্তু এ গাঁয়ের হেটো মানুষ নয়। লম্বা চওড়া চেহারা, বাবু মানুষ। মুখটা পটলের বড্ড চেনা।

কিন্তু লোকটাকে নিয়ে ভাববার সময় ছিল না তার। সাইকেলটা তুলে নিতে যাচ্ছিল, এমন সময় লোকটা ডাকল তাকে, এই, তুই পটল না?

উদ্‌ভ্রান্ত চোখে পটল লোকটার দিকে চাইল। চিনতে পারল। তারপর হঠাৎ ভ্যাঁ করে কেঁদে গিয়ে লোকটাকে জাপটে ধরল সে, বড়জ্যাঠা, আমার বাবা খুন হয়ে গেছে।

কৃষ্ণজীবন ভীষণ অবাক হয়ে বলল, খুন হয়ে গেছে! বলিস কী?

ঘোষপাড়ার নাবালে পড়ে আছে বাবা।

কৃষ্ণজীবন তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ওরকম করিস না। আয় তো, দেখে আসি।

পটল অঝোরে কাঁদছে। নাক দিয়ে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে তার। পৃথিবীতে এখন বড়জ্যাঠার চেয়ে বড় সম্বল আর সহায় তার কেউ নেই যেন, এমনভাবে আঁকড়ে ধরল সে কৃষ্ণজীবনকে।

নাবালের ভিড়ে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণজীবন লাশটাকে দেখল। তারপর পটলের দিকে চেয়ে বলল, কে বলেছে যে ও তোর বাবা?

সবাই জানে।

কৃষ্ণজীবন পটলকে শক্ত করে ধরে বলল, রামজীবনের বাঁ পায়ের গোড়ালিতে মস্ত কাটা দাগ আছে। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন মহাদেব ঘোষের বাড়িতে পেয়ারা চুরি করতে গিয়েছিল রামজীবন। মহাদেব ঘোষ একটা দা ছুঁড়ে মেরেছিল। দাগটা এখনও আছে। আরও বেশি করে আছে। এ লোকটির বাঁ পায়ের গোড়ালিতে কোনও দাগ নেই।

পটল হাঁ করে কিছুক্ষণ জ্যাঠার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, এ আমার বাবা নয়?

কখনোই নয়। চল, বাড়ি চল।

পটলের মনে হল, বড়জ্যাঠা যেন মানুষ নয়। যেন দেবদূত।

২৭

শরীর ছাড়া মানুষের আর কী আছে, আর কিসের প্রয়োজন তা বুঝতে পারে না চয়ন। কোনও দেবতা এসে যদি চয়নকে বলত, তোমাকে একটা মাত্র বর দেবো। যা খুশি চাইতে পারো। কী চাইবে চয়ন। করজোড়ে সমস্ত অন্তর দিয়ে সে বলবে, পৃথিবীর আর কোনও সম্পদ চাই না, শুধু আমার শরীরটাকে ভাল করে দাও। তাও ভাল বলতে সে পেশীফোলানো দেহশ্রী ব্যায়ামবীর হতে চায় না, সে লম্বাচওড়া জার্মান বা আফগানও হতে চায় না, সে শুধু চায় একটু সুস্থ থাকতে, যেখানে সেখানে যখন তখন অজ্ঞান না হয়ে যেতে। ব্যস এইটুকু মাত্র। কত সাধারণ হেটো মেঠো মানুষেরও তো এইটুকু আছে। এ কি খুব বেশী চাওয়া তার?

হয়তো-বা বেশীই। ডস্টয়েভস্কিই না জীবনের শেষ দিকে এসে বলেছিলেন, শরীর যে মানুষের কত বড় সম্পদ তা আজ আমি বুঝি। খ্যাতি, সফলতা সবকিছুর পরও কেন তার ওই বিলাপ যদি সেটা সত্যিই মহার্ঘ না হয়?

জাগা অবস্থায় সকাল থেকে রাত অবধি চয়নের কাছে পৃথিবীটা বিবর্ণতায় মোড়া, বিষণ্ণতায় মাখা। তার সঙ্গে পায়ে পায়ে পোষা বেড়ালের মতো ঘোরে শরীরের ভয়।

গতকাল রাতে চয়ন কেরোসিনের টেবিল বাতিটা জ্বালিয়ে বই পড়ছিল। চৌকিতে অস্থিসার মা ঘুমোচ্ছিল নিঃসাড়ে। হঠাৎ মায়ের শ্বাসের শব্দটা খেয়াল করল চয়ন। কেমন কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে। হাঁফধরা। সঙ্গে কি ক্ষীণ একটা কোঁকানির শব্দও?

চয়ন উঠল, যা দেখল তাতে তার হাত-পা হিম। চোখ ওল্টানো, হাঁ করা মুখ, শ্বাস নিতে কী কষ্টই যে হচ্ছে।

মা! মা! বলে চয়ন কয়েকবার ডাকল। সাড়া পেল না।

দরজা খুলে উঠোন পেরিয়ে সে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দরজাটায় ধাক্কা দিয়ে ডাকল, দাদা! বউদি। শিগগির এসো! মা কেমন করছে।

কয়েকবার ডাবার পর ওপরের জানালা দিয়ে অয়ন বিরক্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে, চেঁচাচ্ছিস কেন?

একটু এসো। মা কেমন করছে।

অয়ন নেমে এল। বউদি এল না। অয়নের হাবভাবে ব্যস্ততা নেই, উদ্বেগ নেই, উত্তেজনা নেই, এল, দেখল। তারপর চাবির গোছাটা চয়নের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ডাক্তার রাহাকে একটা খবর দে।

চয়ন এত ঘাবড়ে গেছে যে, একগোছ চাবির ভিতরে কোনটা সদরের চাবি তা খুঁজে পাচ্ছিল না। কাঁপা হাতে একটার পর একটা চাবি দিয়ে চেষ্টা করছিল খুলতে। হয়তো এক চাবিই দু'তিনবার লাগাল। অয়নকে জিজ্ঞেস করবে সে কথা মনেই হল না তার। কতদিন হল, তার কেবলই মনে হয় মা তার একার। এ মা অয়নের নয়। এ দায় তাকে একা বইতে হবে।

দরজা খুলে বেরোতেই সে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে গিয়েছিল। যখন দুটো মোড় পেরিয়ে রাহার বাড়ির দরজায় পৌঁছোলো তখন তার শরীরে আর একটুও জোর নেই, বুকে নেই দম।

দোতলা থেকে একটি পুরুষকণ্ঠ জিজ্ঞেস করল, কে?

চয়ন জবাব দিতে পারল না। তার গলায় শব্দ নেই। সে শুধু ক্লান্ত ঘাড়টা লটকে ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে রইল। খরার আকাশের দিকে এভাবেই বোধ হয় হতাশ চাষী তাকিয়ে থাকে।

তবে ল্যাম্পপোস্টের আলো পড়েছিল তার মুখে। ডাক্তারবাবু চিনতে পারলেন, কি রে চয়ন?

চয়ন তার প্রাণপণ শক্তিতে গলা ছিড়ে বলে উঠল, মা!

ডাক্তারবাবু নেমে এলেন। চয়ন তখন সিঁড়িতে বসে হাঁফাচ্ছে।

কী হয়েছে? স্ট্রোক নাকি?

চয়ন শুধু মাথা নেড়ে জানাল যে, সে জানে না।

সামান্য উত্তেজনা, সামান্য উদ্বেগ, একটু আচমকা দৌড়ঝাঁপ তাকে যেন রসাতলে ফেলে দেয়।

ডাক্তারবাবুর পিছু পিছু বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে সে নিজের ওপর ঘেন্নায় মরে যাচ্ছিল। ডাক্তারবাবুর কোনও কথারই সে স্পষ্ট জবাব দিতে পারেনি।

ডাক্তার এসে মাকে দেখলেন, তারপর অয়নের দিকে তাকিয়ে বললেন, কার্ডিয়াক অ্যাজমা ছিল নাকি?

অয়ন বলে, ঠিক জানি না।

হাসপাতালে নিতে পারবে?

হাসপাতাল! বলে অয়ন খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল।

ডাক্তার একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, অবশ্য সেখানে নিয়েও খুব লাভ হবে না। শরীরে তো কিছুই নেই দেখছি, ক'খানা হাড় মাত্র। এক কাজ করো, নন্দী ফার্মাসি থেকে একটা অকসিজেন সিলিন্ডার আনাও। আর ওষুধ। ওদের দোকানের ভিতরে লোক থাকে। ডাকলেই উঠে ওষুধ দেবে। তাড়াতাড়ি করো। আমি বসছি।

কাঁচা ঘুম থেকে উঠে আসা বিরক্ত অয়নের মুখ দেখে কেরোসিনের আলোতেও চয়নের মনে হয়েছিল, বিছানায় ওই যে ক'খানা হাড়ের অস্তিত্ব নিয়ে পড়ে আছে মা, আজও নির্লজ্জের মতো পৃথিবীতে মা হয়ে জন্মানোর গুনাগার দিচ্ছে, এ মা অয়নের নয়। অয়নরা মায়ের পেটে জন্মায় না।

অয়নদের মা বলে কেউ থাকে না।

অয়ন চয়নের দিকে চেয়ে বলল, দৌড়ে যা।

চয়ন জানত তাকেই যেতে হবে। দ্বিরুক্তি না করে সে তোশকের তলা থেকে প্লাস্টিকের ছোট ব্যাগটা বের করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এবং তারপরই বুঝতে পারল, শরীরময় অস্তিত্বের কত অসুবিধে। তার হাঁটু ভেঙে আসছে। তার হাঁফ ধরে যাচ্ছে।

তবু নন্দী ফার্মাসি অবধি গেল চয়ন। দরজা খোলালো। সিলিন্ডার আর ওষুধ নিল। তারপর তার পক্ষে গন্ধমাদন বওয়ার মতো ভারী সিলিন্ডার কাঁধে নিয়ে সে ফিরল।

উঠোনটা সে যে কী করে পেরোলো তা সে নিজেও জানে না। দরজার চৌকাঠটা কোনওক্রমে ডিঙিয়ে সে সিলিন্ডার সমেত পড়ে যাচ্ছিল মেঝেয়। ডাক্তারবাবু ধরলেন, আহা, ওরকম অস্থির হলে চলে? বিপদে মাথা ঠিক রাখতে হয়।

তখন কানে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে চয়নের। তবু পকেট থেকে ওষুধ, ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ আর অ্যাম্পুলের প্যাকেটটা বের করে দিল।

আর সময় ছিল না তার। দরজার বাইরে নিজেকে নিক্ষেপ করল সে। কয়েক পা টলোমলো করে হেঁটে চৌবাচ্চার দিকে সরে গেল, যেখানে বাসন মাজবার ছাইগাদা, নোংরা ফেলার বালতি। সেখানেই অন্ধকারে নিজেকে ঢেলে দিল সে। তারপর নিশ্চিন্তে অজ্ঞান হয়ে গেল।

কেউ একজন দেখেছিল তাকে। ওপর থেকে। সে জানত না।

কিন্তু চোখে মুখে জলের ঝাপটা খেয়ে যখন চোখ খুলে তাকাল তখনও খুব বেশী সময় যায়নি। হয়তো কয়েক মিনিট। সামনে বউদিদের কিশোরী ঝি রূপা দাঁড়ানো। হাতে মগ।

ওপর থেকে বউদি চাপা তীব্র স্বরে ডাকছিল, এই রূপা! কী করছিস ওখানে? চলে আয়!

রূপা অবশ্য পাত্তা দিল না। চয়নের দিকে চেয়ে ফ্রক পরা মেয়েটা বলল, আমার মায়েরও এ রোগ আছে। পীরবাবার জলপড়া দিলে সেরে যায়।

চয়ন ভেজা গায়ে উঠে বসল। শরীরে ভাঁটির টান। পরনির্ভর এই জীবনের ভার আর বইতে ইচ্ছে করে না।

মেয়েটা এগিয়ে এসে হাত ধরে বলল, ভর দিয়ে ওঠো, পারবে?

ওপর থেকে বউদি চেঁচাল, এরপর কিন্তু চুলের মুঠি ধরে হেঁচড়ে আনবো।

চয়ন বলল, তুই ওপরে যা রূপা। আমি পারব।

রূপা খুব একটা চাপা গলায় নয়, বরং একটু শুনিয়েই বলল, চেঁচাক না মাগী, সবসময়েই তো চেঁচায়। সামনের শনিবার খুড়ো এলে তার সঙ্গে চলে যাবো। মা গো! এ বাড়িতে মানুষ থাকতে পারে!

রূপার গলা নিশুত রাতে স্পষ্টই শুনতে পেল বউদি। তাই বোধ হয় আর একটাও কথা বলল না। জানালা বন্ধ করে দিল।

চয়ন ভয় পেল। সে জানে, জল অনেক দূর গড়াবে। বউদি সহজে ছাড়বে না। সে মৃদু গলায় বলে, ওপরে যা রূপা, নইলে হয়তো মারবে।

রূপা ফ্যাক করে হেসে বলে, অত সোজা নয়। প্রথম প্রথম চড়-চাপড় হজম করেছি, তারপর একদিন যেই মারতে এসেছে অমনি বেলনা তুলে আমিও তেড়ে গেছি। ব্যস মর্দানী সব ফুস করে উবে গেছে। আজকাল তো আমি গাল দিলেই উল্টে গাল দিই। ওঠো তো, ভর দিয়ে ওঠো।

ভর দিতেই হল চয়নকে। নইলে উঠতে পারত না।

তুমি যখন থাকো না তখন আমি এসে মাঝে মাঝে বুড়ি মাকে দেখে যাই। ইস, কেমন মড়ার মতো পড়ে থাকে। মনে হয় বুঝি শ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে।

চয়ন খুব বড় বড় করে শ্বাস নিতে লাগল।

বুড়ি মাকে নিয়ে আলাদা হয়ে যাও না কেন?

চয়ন এ কথার কীই-বা জবাব দেবে? সে একটু হাসবার চেষ্টা করল মাত্র।

রূপা ওপরে গেল না। তার পিছু পিছু ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

ডাক্তার ইঞ্জেকশন দিয়ে নাকে নল লাগিয়েছে। তারপর নাড়ী ধরে বসে আছে। পাশে বিরক্ত অয়ন।

ডাক্তার মায়ের হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলল, সবসময়ে অ্যালার্ট থেকো। অবস্থা খুব ভাল নয়। এ ঘরে আলো নেই কেন বলো তো!

অয়ন গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, লাইনটা খারাপ।

আলো থাকাটা দরকার। আর ঘরটা ভীষণ স্টাফি। সম্ভব হলে দোতলায় শিফট কোরো। এখানে তো কেরোসিনের গ্যাস জমে আছে। স্টোভ জ্বলে নাকি?

অয়ন বলল, মাঝে মাঝে জ্বালতে হয়।

রুগীর পক্ষে খারাপ।

প্লাস্টিকের ব্যাগটা কোথায় ফেলেছে তা অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছিল না চয়ন। ডাক্তারের ভিজিটটা দিতে হবে।

কী খুঁজছো?

ছোট একটা কালো প্লাস্টিকের ব্যাগ।

দাঁড়াও। বলে রূপা উপুর হয়ে এদিক ওদিক খুঁজে চৌকির পায়ার কাছ থেকে ব্যাগটা কুড়িয়ে এনে দিল।

ডাক্তারবাবু চলে যাওয়ার পর সদর বন্ধ হলে চয়ন এসে মায়ের কাছে বসল। আর সঙ্গে সঙ্গে ওপরে জানালা খুলে বউদি চেঁচিয়ে উঠল, অ্যাই রূপা হারামজাদী বজ্জাত, কতবার ওপরে আসতে বলেছি তোকে?

রূপা উঠোন থেকে সমান তেজে জবাব দিল, অমন ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছো কেন? বুড়ো মানুষটার অসুখ করেছে বলে দেখতে এসেছি সেই তখন থেকে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। কেন, কি কাজ তোমার?

ফের মুখে মুখে কথা! আমি হুকুম করেছি, তুই ওপরে আসবি। উল্টে চোপা করছিস।

যাবো না ওপরে, কী করবে? গলাটা কেটে ফেলবে? এঃ, হুকুম দেখাতে এসেছে!

এই শুনছো! ওকে কান ধরে নিয়ে এসো তো।

এ কথাটা অয়নকে উদ্দেশ করে বলা। অয়ন কিছু উপদেশ দেবে বলেই বোধ হয় দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু রূপা আর বউয়ের ঝগড়ায় বিব্রত হয়ে চুপ করে ছিল। এবারে মুখ ফিরিয়ে রূপার দিকে চেয়ে বলল, যা না ওপরে।

রূপা ঝাঁঝিয়ে উঠে বলে, কেন যাব? মাঝ রাত্তিরে তো আর ঘরের কাজ নেই। একটু দেখতে এসেছি, অমনি কেমন খ্যাঁকাচ্ছে দেখ। আচ্ছা মেয়েমানুষ বাবা!

ওপর থেকে বউদির গলায় একটা বিস্ফোরণ শোনা গেল, শুনলে! তুমি পুরুষমানুষ না কী। অ্যাঁ! চুলের ঝুঁটি ধরে ওকে দু ঘা দিতে পারছে না? মুখের সামনে দাঁড়িয়ে ঝি-চাকর যা-খুশি বলে যাবে। তোমার ব্যক্তিত্ব নেই?

অয়ন যে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তা চয়ন খুব বুঝতে পারছে। রূপার গায়ে হাত তোলার মতো সাহস তার নেই, বউয়ের অবাধ্য হওয়ার মতো বুকের জোরেরও অভাব।

বউদি চেঁচিয়ে বলল, মেনীমুখো পুরুষ বলেই তো কেউ মানে না, ভয়ও খায় না। দিব্যি বাড়ি দখল করে আপদেরা বসে আছে। পারলে তাড়াতে? একদিন এ বাড়ি ওই ছোট তরফের ভোগেই যাবে। ভাল মানুষটি সেজে থাকে বলে সোজা পাত্র ভেবো না। ভিরমি খায়, চোখ উল্টে পড়ে থাকে—ওসব ন্যাকামি ঢের জানা আছে। তলায় তলায় কী করছে জানো? নইলে ওই সোমত্থ মেয়েটা রাতবিরেতে গিয়ে ওরকম ঝাঁপ খেয়ে পড়ে নাকি? মুখের অত জোরই বা আসছে কোত্থেকে যদি না তোমার যুধিষ্ঠির ভাইয়ের উসকানি থাকত!

এই অ্যাঙ্গেলটা খুব নতুন। রূপার সঙ্গে কত অনায়াসে তাকে জড়িয়ে নোংরা ইঙ্গিত করে ফেলল বউদি! প্রতিবাদ করার মতো জোর বা ক্ষমতা নেই চয়নের। অবাধ্য হৃৎপিণ্ডের একটা প্রবল দুরদুরুনি নিয়ে সে মায়ের মৃতপ্রায় মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল।

জবাব দিল রূপা, বেশী কথা কইবে তো আমিও কথা কইতে জানি। যখন দেশ থেকে আনিয়েছিলে তখন তো কত ভাল ভাল কথা! ভাল হয়ে থাকবি, তোর বিয়ে অবধি আমরা দিয়ে দেবো। মেয়ের মতো ভালবাসবো। যাদের কথার ঠিক নেই তাদের সঙ্গে খানকীর তফাত নেই, বুঝলে!

খানকী আমি না তুই? মাঝরাতে উঠে একেবারে আলুথালু হয়ে গিয়ে বুকের ওপর পড়ল—যেন উত্তম-সুচিত্রা! ডুবে ডুবে জল খাস একাদশীর বাবাও টের পায় না, না? অত দরদ কিসের রে? ধুমসো মেয়ে, ফ্রক পরে কচি খুকি সেজে থাকলেই বুঝি লোকের চোখে ধুলো দেওয়া যায়? এই, তুমি এখনও দাঁড়িয়ে মজা দেখছো? পায়ের চটিটা খুলে ওর দু'গালে মারতে পারছো না?

অনেকক্ষণ বাদে অয়ন মানুষের মতো একটি আচরণ করল। ওপর দিকে চেয়ে বলল, কেন চিৎকার করছো বলো তো? মায়ের যে ভীষণ অসুখ।

আহা, মায়ের অসুখ! অসুখ তো নিত্যিদিন আছে। আর তোমার নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে যে মেয়েটা আমাকে যা খুশি বলছে! তোমার মতো পুরুষের ঘোমটা দিয়ে থাকা উচিত।

দ্বিধাবিভক্ত অয়ন নিজেকে জোড়া দিতে পারছে না। কেরোসিনের ম্লান আলোতেও তার অসহায় মুখখানা দেখতে পাচ্ছিল চয়ন। সে মৃদুস্বরে বলল, তুই ওপরে যা দাদা। আমি তো মায়ের কাছে আছিই।

অয়ন সামান্য দ্বিধার সঙ্গে বলল, তুই কি এর মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলি! কই, দেখিনি তো!

লজ্জিত চয়ন বলে, হঠাৎ মায়ের এরকম হওয়ায় বোধ হয় মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। চৌবাচ্চার কাছে পড়ে গিয়েছিলাম। রূপা এসে চোখে মুখে জল দিয়েছিল।

অয়ন একটা শ্বাস ফেলে বলে, এই তাহলে ব্যাপার!

উঠোনে রূপা হঠাৎ কি একটা কথার উত্তরে চেচিয়ে বলল, গলায় তুমি দড়ি দাও গে। সকাল হোক না, পাড়ার লোক যদি জড়ো না করি তাহলে আমার নামে কুকুরকে ভাত দিও। পাশের বাড়ির বিন্তি বলেছে, এ বাড়ির বউদিটা এক নম্বরের হারামি।

শুনলে! শুনলে তুমি?

অয়ন বিবর্ণ মুখে রূপার দিকে ফিরে বলল, কী করছিস তুই! কোন সাহসে এত কথা বলছিস?

কেন, আমি কি কাউকে ভয় পাই?

চুপ করবি কিনা!

আগে তোমার বউকে চুপ করাও!

অসহায় অয়ন একবার চয়নের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে ধীরে ধীরে ওপরে চলে গেল। চয়ন ঘর থেকে শুনতে পেল, ওপরে স্বামী-স্ত্রীতে প্রবল কথা কাটাকাটি হচ্ছে। তবু ভাল। পাড়া জানান দিয়ে যা হচ্ছিল তার চেয়ে এটা বরং ভাল। ওদের স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া খুব হয়। কিন্তু পরদিন আবার বেশ ভাবসাব, হাসি-হাসি মুখ, ওগো-হ্যাঁগা।

রূপা দরজায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। মুখখানা ফেটে পড়ছে রাগে।

চয়ন একবার তাকাল তার দিকে। বছর পনেরো-ষোলোর সতেজ মেয়ে। রংটা চাপা, মুখে একটা রুক্ষ উগ্র ভাব আছে। মাথায় একরাশ কোঁকড়া চুল। মাত্র মাসখানেক হল এসেছে। চয়নের সঙ্গে ভাল করে দেখাও হয় না। তবে এক মাসে সে এটা লক্ষ করেছে যে, দাদার অন্য সব ঝি তার সঙ্গে যেমন খারাপ ব্যবহার করে, এ মেয়েটা তেমন করে না।

চয়ন মৃদু স্বরে বলল, ঝগড়া করলি কেন?

বাঃ, ওই তো ঝগড়া করল। আমি কি লাগতে গেছি? ওপর থেকে দেখলাম তুমি চৌবাচ্চার ধারে দড়াম করে পড়ে গেলে, তাই ছুটে নেমেছি। তাতে কি দোষ ছিল? মৃগী যে কেমন খারাপ ব্যায়রাম তা আমি হাড়ে হাড়ে জানি।

এখন কী হবে? তোকে যদি তাড়িয়ে দেয়?

দিক না! জলে পড়ে যাবো না ঠিকই। সামনের চাটুজ্জে বাড়ি থেকে তো দুশো টাকায় সাধছে। বর-বউ চাকরিতে যায়, বাচ্চা রাখতে লোক চাই।

চয়ন একটু হাসল। এ বয়সের মেয়েদের আজকাল চাকরির অভাব হয় না ঠিকই। বরং প্রচণ্ড চাহিদা।

চয়ন পরিশ্রান্ত বোধ করছে, একটা গভীর মন খারাপের গহ্বর তৈরি হয়েছে বুকের মধ্যে। মা চলে যাচ্ছে। সে কিছুই করতে পারছে না। মায়ের নিবন্ত মুখের দিকে চেয়ে চয়ন বলল, আমার জন্যই তো অশান্তিটা হল তোর। কেন যে তুলতে এলি আমাকে। জানিস তো বউদি আমাকে পছন্দ করে না।

রূপা দরজার চৌকাঠে উবু হয়ে বসে তার দিকে চেয়ে বলে, শোনো দাদাবাবুর কথা! একটা লোক আঁস্তাকুড়ে পড়ে থাকবে, কিছু করব না বুঝি! মৃগী খুব খারাপ রোগ। মাকে সেজন্য আমরা পুকুরে বা নদীতে যেতে দিই না। উনুনের ধারেও যাওয়া উচিত নয়। একবার তো ভাতের হাঁড়িতে পড়ে গিয়ে মুখটুখ পুড়ে গিয়েছিল। তোমাকে দেখার তো কেউ নেই, না?

দরকারও হয় না। চলে যাচ্ছে।

তোমাকে ওই শয়তানটা দেখতে পারে না কেন বলো তো? সবসময়ে তোমাদের নিয়ে খারাপ খারাপ কথা বলে।

বলুক গে। কী যায় আসে!

তোমার গায়ের চামড়া বেশ পুরু আছে বাপু। অত ভয় খাও কেন? দেখলে তো চোটপাট করলুম বলে কেমন চুপসে গেল!

চয়ন মৃদু হেসে বলে, তোর খুব সাহস, না?

আমি কাউকে ভয় খাই না।

দেশে থাকতে লেখাপড়া করিসনি?

রূপা মুখটা একটু ঝামরে বলল, সবাই কেন ওকথা জিজ্ঞেস করে বলো তো! লেখাপড়া করে কি তোমাদের আর দুটো করে হাত-পা গজিয়েছে? তোমার বউদি তো শুনি বি এ পাশ, আহা, কী বি এ পাশের ছিরি! মুখ তো আমাদের মতোই আঁস্তাকুড়! না বাপু, আমি বেশী পড়িটড়িনি তবে বাংলা অক্ষর চিনি। সোজা বই হলে একটু-আধটু পড়তেও পারি। কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং করে লিখতেও পারি একটু।

বাড়িতে কে আছে?

যেমন সকলের থাকে। মা বাপ তিনটে ভাই আর চারটে বোন। রোজগারপাতি নেই। বাবার একটা ভটভটি আছে, ভাগের। আর ক্ষেতে কিছু ধান হয়। একটা ভাই মাছের ভেড়িতে সদ্য কাজে ঢুকেছে।

তুই একটা বেশ মেয়ে। তবে একটু ঝগড়াটি, তাই না?

ঝগড়াটি না হলে শেয়ালে শকুনে টেনে নিয়ে যেত এত দিনে, বুঝলে? মুখের জোর আর গলার জোর না থাকলে আমাদের মতো মেয়েদের খুব বিপদ।

চয়ন একটু অবাক হয়ে বলে, বেশ বলেছিস তো!

নিজের কানেই তো শুনলে, তোমার বউদি তোমাকে আমাকে নিয়ে কেমন খারাপ কথা বলছে। কিছু করিনি তাও। মুখ বুজে থাকলেই পেয়ে বসত। আরও বলত। এমন ঝামা ঘষে দিয়েছি যে, আর বলবে না কখনও।

চয়ন মৃদু ম্লান একটু হাসল। তারপর নরম গলায় বলল, যা, ঘুমো গে।

তুমি কী করবে? মাকে আগলে বসে থাকবে?

মাকে নিয়েই তো থাকি।

অবস্থা কি খুব খারাপ?

মায়ের শরীরে কি কিছু আছে বল! ক'খানা হাড় শুধু।

জানি। আমি এসে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখে যাই।

চয়ন কৃতজ্ঞতায় ভরে গিয়ে বলে, মাঝে মাঝে দেখিস। কেউ দেখে জানলে ভরসা পাই।

ভেবো না তুমি। এ বাড়িতে যে কদিন আছি, দেখব।

রূপা চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল চয়ন। মা সারা রাত নানারকম শব্দ করল। শ্বাসের শব্দ, কষ্টের শব্দ। ভোরবেলার দিকে শান্ত হল যেন। ডাক্তার বেলা আটটা নাগাদ এসে দেখে-টেখে বলল, ফাঁড়াটা এ যাত্রা কেটেছে। কিন্তু এ রোগে কিছু বলা যায় না।

সকালে আজ টিউশনিতে যায়নি চয়ন। সারাদিন মায়ের পাশে বসে রইল চুপ করে। কিছু ভাবল না। কিছু করল না। এমন কি খেতে অবধি ইচ্ছে হল না।

বিকেলের দিকে সামলে উঠল তার মা। দুটো একটা কথা বলল।

টিউশনিতে কি যাবো মা? একা থাকতে পারবে?

যা বাবা। কামাই হলে যদি ছাড়িয়ে দেয়! যা। একাই তো থাকি। পারব।

সারাদিন খায়নি বলে যে খিদে পেয়েছিল তাও নয়। শরীরটা অবসন্ন লাগছিল তার। এর বেশী কিছু নয়।

কিন্তু মোহিনী তাকে দেখেই বলল, মাস্টারমশাই, আপনার কী হয়েছে?

চয়ন অপ্রতিভ মুখে বলল, তেমন কিছু নয়। মার শরীরটা ভাল নয়। রাত জাগতে হয়েছিল।

তাহলে আজ না এলেই হত। একটা ফোন করলেই পারতেন।

সারাক্ষণ ঘরে থাকতে ভালও লাগছিল না।

মায়ের কী হয়েছে?

হার্ট ভাল নয়।

মোহিনীর চোখ একটু ছলছল করল বোধ হয়। মুখের দিকে তাকায় না বলে স্পষ্ট দেখতে পেল না চয়ন। তবে মেয়েটা বড্ড মায়াবী। মনটা খুব নরম।

মোহিনী হঠাৎ বলল, আপনি বোধ হয় কিছু খাননি আজ।

না না, খেয়েছি।

দাঁড়ান তো। আসছি।

মোহিনী উঠে গেল। লজ্জায় মরমে মরে যাচ্ছিল চয়ন। প্রাইভেট টিউটর হিসেবে সে কি বড্ড বেশী প্রশ্রয় পাচ্ছে না? এতটা কি তার পাওনা?

২৮

বিড়ির গন্ধটা নিমাইয়ের সহ্য হচ্ছিল না। বিড়ির মধ্যে যে কী মধু আছে কে জানে বাবা! লোকে সারাক্ষণ ফুসফুস করে টেনেই চলেছে, টেনেই চলেছে। বিটকেল ঝাঁজালো গন্ধটা নাকে এলেই নিমাইয়ের পেটে গোঁতলান মারতে চায় একটা অস্বস্তি। তবু সইতে হয়। না সয়ে উপায় কী? যার সঙ্গেই কথা কইতে যায় সেই দু'চার কথার পর ফস করে একটা বিড়ি বা সিগারেট ধরিয়ে ফেলে। বিড়িই বেশী। সিগারেট বিড়িতে চারদিকটা ছয়লাপ।

গণেশ সাহা মস্ত মানুষ। মণিমালা অপেরার মালিক। চিৎপুরে গদি। এরকম সব মানুষের সামনে এসে বসতে পারাটাই ভাগ্যের কথা। কত উমেদার আসে, দরজার বাইরে থেকেই খেদিয়ে দেওয়ার কথা। সেটা যে করেনি সেটাই সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করছে নিমাই।

গণেশের বিড়ির ধোঁয়া সুতরাং সইতে হচ্ছে নিমাইকে। নাক চেপে থাকবে, তারও উপায় নেই। নাক চেপে থাকলে গণেশ সাহার অপমান হতে পারে।

কথা অবশ্য বীণাই কইছে। বলে-কয় ভাল। আগে একটু আলাপও ছিল। কাঁচড়াপাড়া যাত্রা উৎসবে দল নিয়ে গিয়ে বছরটাক আগে বিশ্ববিজয় অপেরার পালা দেখেছিল গণেশ। তখনই আলাপ। বীণা পায়ের ধুলো নিয়েছিল, গণেশ আশীর্বাদ করেছিল। সেসব আজ আর মনে থাকার কথা নয়। ছিলও না গণেশের। আজও পায়ের ধুলো নেওয়ার চেষ্টা করেছিল বীণা। পেরে ওঠেনি। ঘরখানা বড্ড ছোট, তার মধ্যে রাজ্যের টেবিল চেয়ার পাতা। আর গণেশ একখানা হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে বসা। টেবিলের নিচে অতি দুর্গম জায়গায় তার পা। বীণা নিচু হয়ে যখন অন্ধকারে গণেশের পা খোঁজাখুঁজি করছিল তখন ঠাস করে কপাল ঠুকে গেল টেবিলের কানায়। গণেশ শশব্যস্ত হয়ে বলল, থাক থাক।

শিয়ালদায় নেমে চিৎপুর অবধি আসতেই তারা ঘেমে, হাপসে অস্থির। একখানা শহর বটে এই কলকাতা। কোনওদিকেই এগোনো যায় না। বাসে ট্রামে গন্ধমাদন ভিড়, রাস্তায় থিক থিক করছে মানুষ-পোকা, হকার, বাজার, রাগী আর তেড়িয়া সব বাঘ-ভালুকের মতো লোক। বাসে ট্রামে সুবিধে হল না বলে হেঁটেই আসতে হয়েছে। ঠিকানা খুঁজে বের করতে দম আরও বেরিয়ে গেছে। গলির গলি তস্য গলির মধ্যে এই ঘরখানা। বুকচাপা অন্ধকার। হাওয়া নেই। লোড শেডিং বলে দিনের বেলাতেও মোম জ্বলছে। হাতপাখা হাতে মোটা মানুষ গণেশ বসা। বদ্ধ ঘরে গণেশের বিড়ির ধোঁয়া একেবারে আঁট হয়ে বসে আছে। নড়ছে না।

বীণা বলল, আপনি তো আমার পার্ট দেখেছেন গণেশদা। একবার চান্স দিয়ে দেখুন, প্রাণ দিয়ে করব।

গণেশ ভারি বিমর্ষ গলায় বলল, আরে ভাই, বায়নাই হচ্ছে না তো পার্ট, গত বছর এসময়ে অন্তত গোটা কুড়ি আগাম বায়না হয়েছিল। এবার তো মাছিও বসছে না।

কেন, মণিমালা অপেরার তো খুব নাম।

সে ছিল। পৌরাণিক পালাগুলো একসময়ে রে রে করে আসর মাতিয়ে দিত। তা এখন একটু অন্যরকম করতে গিয়ে মার খাচ্ছি। দু'দুটো পালা বসে মার খেল। শাঁখা-সিঁদূর চলল না, সতীর জ্বালা তিন-চার জায়গায় হল, কিন্তু ক্ল্যাপই পেল না।

তা বলে তো আর দল বসে থাকবে না।

বসার মতোই অবস্থা। সিনেমার পাঁচু চাটুজ্জেকে সাতের দরে রাখলুম, তাতেও কিছু হল না। লোহার কারবারটা ছিল বলে রক্ষে, নইলে পেটের ভাতে টান পড়ত।

ওকথা বলবেন না। আপনার তো খুব নামডাক। এখন একটু পড়তি অবস্থা যাচ্ছে বলে কী, আবার বায়না হবে।

তা বিশ্ববিজয়ও তো ভালই করছিল। ছেড়ে আসতে চাও কেন?

বিশ্ববিজয় ভাল দল। কাকার মতোও মানুষ হয় না। কিন্তু বনগাঁয়ে চিরটা কালই কি পড়ে থাকব?

লাইম লাইটে আসতে চাও নাকি? সে বড় শক্ত কথা। রোজ কত ছেলে মেয়ে এসে ধরনা দিচ্ছে। অনেকে পয়সাকড়িও চায় না, শুধু একটা চান্স চায়। আমি বলি কি, বিশ্ববিজয় ছেড়ো না। এখানে তো খুব কম্পিটিশন, ওখানে তা নেই। বিশ্ববিজয় কম পয়সায় পালা করে, তাই বায়নাও হয়। আর আমাদের অবস্থা দেখ, হাতি পোষার খরচ। বছরে কতগুলো মাস আর্টিস্টদের বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দিতে হয়। আমরা কম পয়সায় করতে পারি না।

দেখবেন, বায়না ঠিকই হবে।

কোথায় আর হচ্ছে। শাঁখা-সিঁদুর আর সতীর জ্বালা এ দুটো পালায় কম পয়সা ঢেলেছিলাম? সবই কপাল। পালা দুটো চললে না হয় কথা ছিল।

আচ্ছা, আমার চেহারা তো খুব খারাপ নয়। পার্ট দেখেও তো লোকে ক্ল্যাপ দেয়। একেবারে কি ফেলনা ভাবছেন আমাকে?

গণেশ একথায় রাগ করল না। মাথা নেড়ে বলে, ওরে বাপু, চেহারা তো আমরা মেক-আপ আর আলো দিয়েই পেত্নীকে পরী বানিয়ে দিই। ওটা কোনও কথা নয়। চন্দ্রা মল্লিককে মেক-আপ ছাড়া দেখেছো কখনও? রাস্তায় হেঁটে গেলে কেউ ফিরেও তাকাবে না। সেই চন্দ্রা যখন স্টেজে নামে তখন লোকে পাগল হয়ে যায়।

সে জানি। চন্দ্রাদির সঙ্গে আমার আলাপও আছে একটু।

নাম করে ফেললে সব দোষই ঢেকে যায়।

আমাকেও একটু নাম করতে দিন না। দেখবেন, ঠকবেন না।

গণেশ বিড়িটা একটা অ্যাশট্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বলল, নতুন একটা পালা এবারে নামাচ্ছি। বাবু-বিবি। যদি এটা লাগে তাহলে তোমার কথা ভাবব'খন। এ সিজনটা যেতে দাও।

বীণা খুব আবদার মাখানো গলায় বলে, আমার কথা আপনার মনেই থাকবে না। এই তো বললেন, কত ছেলেমেয়ে আসছে পার্টের জন্য।

তা আসছে। মণিমালা অপেরার বুকের পাটা আছে বলেই নতুন আর্টিস্ট নামায়। সুনীতি বিশ্বাস, জয়ন্ত হালদার, যোগেন বোস এরা সবাই এই আমার হাতের তৈরি। সুনীতি নেমকহারামি করেনি, এখনও আছে। যদিও মেলা টাকা চাইছে আজকাল। আর যারা নাম করেছে সবাই বড় বড় দলে গিয়ে ভিড়েছে। তবু কি ভেঙে পড়েছি? আবার নতুনদের দিয়েই বছর চারেক আগে 'সাধক বামাক্ষ্যাপা' আর 'ঝড়ের রাত' নামিয়ে কেমন হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছিলুম!

সে আর বলতে! ঝড়ের রাত তো এই সেদিন অবধিও চলেছে।

সব নতুন মুখ ছিল। বুঝলে?

বাবু-বিবির কাস্টিং কি শেষ?

ও বাবা! শেষ কবে হয়েছে। রিহার্সালই তো চলছে পনেরো দিনের বেশি।

একটা ছোটখাটো রোলও কি পড়ে নেই?

তাই কি থাকে! আমাদের সব গোড়া বেঁধে কাজ করতে হয়। পুজোর সময় থেকেই পালা নামবে, আর কটা দিন হাতে আছে?

আর ক'টা দিন আগে এলে বোধ হয় ভাল করতুম, তাই না?

তা করতে। বড্ড দেরী করে ফেলেছো। তবে চিন্তা কিসের? বয়স কম, সুযোগ হয়তো পেয়ে যাবে। সঙ্গে এটি কে বলো তো!

বীণা একটু লজ্জা পেয়ে মুখ নামিয়ে বলল, আমার বর।

গণেশ পুরনো আমলের মানুষ। যাত্রাওয়ালির ঘর-সংসার আছে জেনে যেন খুশিই হল। বলল, বাঃ বেশ। তা তুমি কী করো হে বাপু?

নিমাই তটস্থ হয়ে বলল, এই টুকটাক।

বীণা তাড়াতাড়ি নিমাইয়ের আহাম্মকি ঢাকবার জন্য বলল, ফলের ব্যবসা আছে।

গণেশ প্রশান্ত মুখে বলল, খুব ভাল ব্যবসা। ফল শুদ্ধ জিনিস। তা গানটান জানো নাকি? একটু আগে যেন শুনছিলাম গুনগুন করে একটু গাইছিলে! কীর্তনের মতো!

ভারি লজ্জা পেয়ে গেল নিমাই। গান জানার ওই হল একটা মুশকিল। যখন তখন যেখানে সেখানে বে-খেয়ালে গলায় সুরটা খেলে ওঠে। মাথা নামিয়ে বলল, আজ্ঞে গানটান জানি না।

হেঁড়ে গলায় কি আর গান হয়? একটু কীর্তন-টির্তন করি আর কি!

খুব ভাল। গলায় সুরও আছে মনে হচ্ছে। তা ফলও ভাল, কীর্তনও ভাল, কিন্তু কচি বউটিকে এই লাইনে ঠেলছো কেন? সংসার যে রসাতলে যাবে।

নিমাই আতান্তরে পড়ে গেল। কথাটা ন্যায্য বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে কথাটার পোঁ ধরা যায় না। বীণাপাণি খর চোখে চেয়ে আছে। আমতা আমতা করে নিমাই যা বলল তারও কোনও মানে হয় না। সে বলল, আজ্ঞে, দিনকাল যা পড়েছে।

গণেশ সাহা আর একখানা বিড়ি ধরিয়ে বলল, আমার ছেলেরা সব লায়েক হয়েছে। বড়জনই এখন দলের কাজকর্ম দেখছে। আমাদের সেকেলে রুচি সে বেশী পছন্দ করছে না। তার ইচ্ছে সিনেমার লোকজনকে টেনে

আনে। কাস্টিং ভাল হলে, পালা যাই হোক, চলবে। আমার সঙ্গে মতে মেলে না, তবে মেনেও নিতে হচ্ছে। এদের আমলে তো নতুনদের দলে ঢোকাই কঠিন হবে।

বীণার মুখখানা একেবারে ফ্যাকাসে মেরে গেল। ঘামছেও খুব। রুমালে মুখ মুছতে গিয়ে ঘামের সঙ্গে রূপটানের সবটুকুই প্রায় পুঁছে ফেলল। কেমন ন্যাতানো গলায় বলল, আমিও তো গান গাই।

গণেশ সাহা বিড়ির ধোঁয়ায় ঘরটাকে একেবারে জতুগৃহ বানিয়ে বলল, বলছি তো, সিজনটা শেষ হোক। দেখব।

আমার নাম ঠিকানা লিখে রাখুন তাহলে। নইলে ভুলে যাবেন।

গণেশ বোধ হয় বীণার হাত থেকে বাঁচার জন্যই অনিচ্ছে সত্ত্বেও এদিক ওদিক খুঁজে একটা কাগজের টুকরো আর ডটপেন বের করে নাম ঠিকানা টুকে নিল। তারপর বলল, এবার এসো গিয়ে।

নিমাই তড়াক করে উঠে পড়ল। যত তাড়াতাড়ি ঘরটা থেকে বেরনো যায় ততই মঙ্গল। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

বাইরে বেরিয়ে এসে বীণার কাঁদো কাঁদো মুখটার দিকে চেয়ে খুব সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করল, এবার কোথায় যাবে?

বীণাপাণি ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, কেওড়াতলায়!

এ হল রাগের কথা। রাগের সময় লোককে ঘাঁটাতে নেই। বীণা একটা মস্ত বড় হাতব্যাগ বয়ে বেড়াচ্ছে। অত বড় ব্যাগ আনার দরকার ছিল না। ভারী জিনিস, ওর কষ্ট হচ্ছে। নিমাই হাত বাড়িয়ে বলল, ব্যাগটা বরং আমার হাতে দাও। তোমার কষ্ট হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে বীণাপাণি ব্যাগটা দ্বিগুণ জোরে পাঁজরে চেপে ধরে বলে, না। মেয়েদের ব্যাগ তুমি বাইবে কেন? খারাপ দেখাবে।

নিমাই একটু হাসল। মেয়েরা যেন কিছুতেই পুরুষদের বিশ্বাস করতে চায় না। নিমাই হাতটা গুটিয়ে নিয়ে বলল, তেষ্টা পায়নি?

কেন বলো তো!

একটা ডাব খাবে নাকি? এখানে বেশ সস্তা।

আমার আর কিছু হবে না জানো?

কী হবে না?

কেউ নেবে না আমাকে। বিশ্ববিজয় অপেরা উঠে যাবে। তখন না খেয়ে বনগাঁয় পড়ে মরতে হবে।

এর জবাবে নিমাইয়ের কিছু বলার ছিল। কিন্তু গরম ঘেমো দুপুরে চিৎপুরের পাগল-করা ভিড়ের গলিতে দাঁড়িয়ে কথাটা বলা যায় না। বললেও নেবে না বীণা। রেগে যাবে। মেজাজ বুঝে কথা না বললেই বিপদ। সে চুপ করে দাড়িয়ে রইল।

বীণা কোন দিকে যাবে তা যেন ঠিক করতে পারছে না। তার চোখে জল আসছে। ধরা গলায় বলল, এর পর বয়স হবে, রূপ যৌবন যাবে। কে পুঁছবে আমায় আর? মণিমালা অপেরার মতো ছোট দলই এত প্যাঁচ কষছে! বড় দল তো কথাই বলতে চাইবে না।

নিমাই জানে, এটা কোনও প্রশ্ন নয়। তাই জবাব দেওয়ার দরকার নেই। মুখে শুধু একটু কষ্টের ভাব ফুটিয়ে রাখা। যেন ওর দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছে তার। অভিনয় সেও একটু জানে। সবাই জানে। না জানলে কি জগৎসংসার চলত?

বীণাপাণি আরও কিছুক্ষণ ভিড়ের রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল। ওর মাথায় কেন যেন ভূত চেপেছে আজকাল, বিশ্ববিজয় ছেড়ে বড় দলে ঢুকবে, কলকাতায় বাসা করবে। আরও অনেক কিছু। বীণাপাণিকে কিছু বোঝানোর নেই নিমাইয়ের। যা ভাল বুঝবে তাই করুক। তার দুর্দিনে বীণাপাণি যে তার জন্য অনেক করেছে সেটা ভোলে কি করে নিমাই? খারাপ অসুখ থেকে সারিয়ে তুলেছে। দোকান করে দেবে বলে ভরসা দিয়েছে। বীণাপাণি তো আর খারাপ মেয়ে নয়।

বশংবদ নিমাই বীণার কাছ ঘেঁষেই চিন্তিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ বাদে বীণা বলে, চলো।

চলো। কোনদিকে যাবে?

এমনি হাঁটি চলল। মনটা ভাল নেই।

সে তো জানি।

লোকটার কথা শুনে তোমার কী মনে হল বলো তো! সত্যিই ডাকবে আমাকে?

নিমাই সাজিয়ে গুছিয়ে মিথ্যে কইতে পারে না। বলল, এরা সব ঘুঘু লোক। মনের কথা বুঝতেই দেয় না।

তার মানে ডাকবে না, এই তো!

মনে তো হয়, না। ব্যবসা খারাপ যাচ্ছে।

এদের কেউ পোঁছে না, জানো? বায়না হয় না। তবু কেমন ডাঁট দেখাচ্ছে। ফিল্ম স্টার নিচ্ছে না হাতি! পাঁচু চাটুজ্জের কোনও বাজার আছে নাকি? ফিল্মে চান্স পায় না বলে যাত্রায় এসে ঢুকেছে।

তাই হবে। সাতের দর না কী একটা বলছিল যেন।

সাতের দর মানেও জানো না? মাসে সাত হাজার টাকা মাইনে। মণিমালা অপেরা দেবে সাতের দর, হুঁ!

হাঁটতে হাঁটতে তারা চিৎপুরের ট্রাম রাস্তায় এসে ওঠে।

হ্যাঁ গো, তুমি ফোন করতে পারো?

ফোন! কাকে করবে?

বড়দার বাড়িতে।

জরুরী কথা আছে নাকি? দুপুরে কি বড়দাদা বাড়িতে থাকবেন? অফিস নেই?

তাই তো! মনে ছিল না। তাহলে চলো আর দু-একটা গদিতে যাই।

নিমাই একটু নিবে গিয়ে বলে, যাবে!

যাই না। বড় জোর ঘাড় ধাক্কা দেবে, তার বেশী তো আর নয়। তা আজকের দিনটা ঘাড় ধাক্কা খেয়েই যাক।

একটু চেনাজানা না থাকলে কি গিয়ে সুবিধে হবে?

একেবারে যে নেই তা নয়। পুষ্প অপেরার ম্যানেজার পানুবাবুর সঙ্গে তো কাকা একবার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।

নিমাই মিয়নো গলায় বলে, সে কি আর মনে রেখেছে?

চলোই না দেখা যাক। গদিটা কাছেই কোথাও হবে।

আবার খুঁজতে খুঁজতে দুজনে হয়রান হল। পুষ্প অপেরাও ছোট দল, বাজারে তেমন নাম নেই। তবে ধৈর্য ধরার একটা মূল্য তো আছেই। অবশেষে একটা গলির শেষে পুরনো একটা দোতলা বাড়ির ওপরের তলায় পুষ্প অপেরার একটা রংচটা সাইন বোর্ড দেখতে পাওয়া গেল।

পুরনো ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে উঠে একখানা টানা বারান্দার একেবারে শেষ ঘরখানায় পুষ্পর অফিস। দুজন লোক বসা। একজন বোধ হয় কোনও জ্যোতিষী। সেই বিষয়েই কথা হচ্ছিল।

অন্য জন পানুবাবুই। কাঁচা পাকা চুলের মাঝবয়সী মানুষ। বেশ শৌখিন পোশাক। আদ্দির পাঞ্জাবি, হাতে তিন রকম পাথরের আংটি, গলায় সোনার চেন। কালোর মধ্যে চেহারাটা মন্দ নয়।

বীণা এবার আর পা খুঁজল না। খুব শিক্ষা হয়েছে। তবে জোড় হাতে নমস্কার করে বলল, পানুবাবু, চিনতে পারছেন?

পানুবাবু চিনতে পারলেন না। বা চিনতে চাইলেন না। একটু চেয়ে থেকে বললেন, না তো! তুমি কোথা থেকে আসছো?

বনগাঁ। বিশ্ববিজয় অপেরায় পার্ট করি। কাকা আলাপ করিয়ে দিয়েছিল আপনার সঙ্গে। মনে নেই?

অ। বোসো, বোসো। কাকার খবর কী? ভাল আছে তো!

আছে। আমি একটা আবদার নিয়ে এসেছি।

এখানেও লোডশেডিং। তবে সুখের কথা হল, পানুবাবু বা জ্যোতিষী বিড়ি খাচ্ছে না, আর ঘরখানা দোতলায় বলে একটু আলো-হাওয়া আছে। নিমাই বসে মৃদু মৃদু ঠ্যাং নাচাতে লাগল। কথাবার্তা যা হবে সে যেন আগে থেকেই তা জানে।

বীণা গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, আমি যদি দলে আসতে চাই তাহলে নেবেন?

পানুবাবু মৃদু একটু হাসলেন। তারপর বললেন, সে তো খুব ভাল কথা। কিন্তু দল কোথায়?

কেন, দল উঠে গেছে নাকি?

এইবার তুলে দেবো। লোকে যা চায় তা দিতে পারছি কোথায়? পেরেও উঠব না।

তাহলে আমার কী হবে? অনেক আশা নিয়ে এসেছিলাম যে!

আমরাই মাইনে পাচ্ছি না ঠিকমতো। গত বিশটি বচ্ছর ম্যানেজারি করে এখন গুনাগার দিতে হচ্ছে। কর্তা আর টাকা-পয়সা ঢালবেন না। বড় বড় দলের চাপে আমাদের এখন নাভিশ্বাস উঠছে। কয়েক লাখ টাকা ঢাললে তবে একটু তোলা যায় হয়তো। টাকারই জোগাড় নেই।

বীণা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, এবার আপনাদের পালা নামছে না?

পানুবাবু একটা মাছিকে তাড়ানোর জন্য হাতের ঝাপটা মেরে বললেন, দুটো পুরনো প্লে নামবে। কয়েকটা বায়না হয়েছে। দেখা যাক।

তাতে হয় না?

পুরনো লোকরা সব রয়েছে যে! তাদের তো আর তাড়াতে পারি না।

নতুন মুখও তো দরকার হয়। হয় না?

দরকার হলেই বা উদ্যোগ কে নেবে বলো? স্বয়ং মালিকেরই গা নেই। তাঁর এখন নানা ব্যবসা। খুব ফলাও অবস্থা।

যাত্রার বাজার তো এখন খুব ভাল।

আরে ভাল তো বড় বড় নামকরা দলগুলোর কাছে। আমাদের নয়।

জ্যোতিষী লোকটার চেহারা বেশ পরিপাটি। গলায় রুদ্রাক্ষ আর কপালে একটা সিঁদুরের ফোঁটা আছে। মিটিমিটি দেখছিল দুজনকে।

নিমাইয়ের মাথাটা এই গরমে আর রোদে একটু গোলমালই হয়ে গিয়ে থাকবে। হঠাৎ জ্যোতিষীর দিকে চেয়ে বলে ফেলল, আজ্ঞে, হাত দেখাতে কত দক্ষিণা লাগে?

জ্যোতিষী লোকটা একটু অবাক হল যেন। একটু হাসল, তারপর বলল, কেন, হাত দেখাতে চান নাকি?

কখনও দেখাইনি কাউকে। ভাগ্যটা বিশেষ ভাল যাচ্ছে না।

জ্যোতিষী মিটিমিটি হেসে বলল, কেমন যাচ্ছে! কাজকর্ম নেই নাকি?

নেইই বলতে পারেন।

দেখি হাতটা।

নিমাই হাতটা লুকিয়ে ফেলে বলে, আজ্ঞে, দক্ষিণাটা না জেনে দেখাই কি করে? পরে পয়সা দিতে না পারলে?

পয়সা লাগবে না।

বলেন কি? বিনা পয়সায় কি কিছু হয়?

আমি ওরকম জ্যোতিষী নই।

নিমাই চেয়ার বদল করে জ্যোতিষীর পাশে এসে বসল। হাতখানা মেলে দিয়ে বলল, দেখাতে একটু ভয়-ভয়ও করে। কি জানি কী লেখা আছে হাতে! হয়তো অপঘাতে মৃত্যু।

পানুবাবু একটা দেশলাই কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছেন। আড় চোখে দেখছেন এদিকে। বীণা একটু অবাক চোখে চেয়ে আছে। নিমাই এমন অদ্ভুত কাণ্ড কখনও করে না।

জ্যোতিষী হাতটা মন দিয়ে মিনিট খানেক দেখল। তারপর ছেড়ে দিয়ে বলল, অপঘাতে মরবেন না।

নিজের এই হঠাৎ করে হাত দেখানোর কাণ্ডটা ঘটিয়ে নিমাইয়েরও এখন লজ্জা লজ্জা করছে একটু। বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলল, বাঁচা আর মরা সমানই হয়ে এসেছে। কেমন দেখলেন হাতখানা?

জ্যোতিষী একটু হাসল। বলল, সবটাই কি কারও ভাল বা মন্দ হয়? তবে আপনি লোক খারাপ নন।

একটা ব্যবসা করার খুব ইচ্ছে। হবে?

এ হাত ব্যবসাদারের হাতই নয়। তবু করুন।

এই রে, একেবারে জল ঢেলে দিলেন যে!

কত বয়স হল?

সে সব কি আর হিসেব আছে? ত্রিশের কাছাকাছি তো হবেই। বেশীও হতে পারে।

ত্রিশের পর একটু ভাল হতে পারে।

জীবনে হাত দেখায়নি নিমাই। জ্যোতিষীরা কিরকম বলে-কয় তার ধারণাও ছিল না। অবাক হয়ে বলল, কিরকম ভাল হবে?

জ্যোতিষী একটু হেসে বলে, দেখুন না কি হয়!

নিমাই ভাবল, বিনা পয়সায় যথেষ্ট হয়েছে। হাতটা সরিয়ে নিল সে।

বীণা উঠল। পানুবাবুকে বলল, আসি তাহলে।

এসো গিয়ে। কাকার দলে আছো এখনও?

আছি।

চলছে কেমন?

খারাপ নয়। তবে মফস্বলের দল তো।

তাতে কি? মফস্বল কি আর ভাল হয় না?

দুজনে ফের বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় এসে বীণা বলল, হ্যাঁ গো, তুমি হঠাৎ হাত দেখালে কেন?

নিমাই লজ্জা পেয়ে এক গাল হেসে বলে, সবাই দেখায়। শখ হল।

খুব বিদঘুটে লোক আছো তুমি! বলে হাসল।

তুমি কিছু মনে করোনি তো!

করেছি। পয়সার কথা বলছিলে কেন? পয়সা লাগলে কি দিতে পারি না আমরা?

ও বাবা! খামোখা হাত দেখিয়ে নষ্ট করার মতো পয়সা কি আমাদের আছে?

আচ্ছা, একটা সত্যি কথা বলবে আজ?

বলব না কেন? কী জানতে চাও?

আমি দেখতে কেমন?

নিমাই অবাক হয়ে হেসে ফেলল, কেন, হঠাৎ আবার সন্দেহ হচ্ছে নাকি? বনগাঁয়ে তো তোমার রূপের সুখ্যাতি সবাই করে।

ছাই করে। তুমি হচ্ছে এক নম্বরের মিথুক। যদি আমি সুন্দরীই হবো তাহলে লোকে পাত্তা দিচ্ছে না কেন?

পাত্তা দিচ্ছে না কে বলল? এদের অবস্থা টাইট। সব গরিব দল। তোমার উচিত বড় বড় দলের কাছে যাওয়া।

তারা আরও পাত্তা দেবে না। আমি দেখতে একটুও সুন্দর নই।

নিমাই যেন নতুন করে বউকে একটু দেখল ভাল করে। তারপর বলল, তাহলে তাদের চোখ নেই।

আচ্ছা, তুমি তো ভগবানের লোক। তুমি যখন বলছ তখন চলো একটা বড় দলের গদিতে যাই।

আজই?

আজই! আমাদের কি আর রোজ রোজ কলকাতায় আসা হয়? চলো।

নিমাই একটা শ্বাস ফেলে বলে, চলো।

২৯

ছেলেটাকে ধরেছিল আপা। তার নাম সঞ্জয় পাল। ক্লাসমেট।

একদিন সঞ্জয় আপার কাছে পঞ্চাশটা টাকা ধার চাইল, দেবে আপা? পরশু শুক্রবার দিয়ে দেবো। খুব লেট হলে সোমবার।

আপা একটু অবাক হল। সঞ্জয়দের খুব বড় ব্যবসা। ভাল অবস্থা। অবাক আপা বলেছিল, এ তো রাজ ভিখারির মতো সিচুয়েশন। তুমি ধার চাইছ!

সঞ্জয় লাজুক হয়ে গিয়ে বলল, জানো তো, বাবা একটু টাইট ভাবে রাখে আমাকে। পকেট মানিটা খুব হিসেব করে দেয়।

তোমার পকেট মানিরই বা দরকার কী সঞ্জয়? গাড়ি করে স্কুলে আসো, তোমার তো আমার মতো বাস-ভাড়াও লাগে না।

একটা জিনিস কিনবো। নাইক-এর টি শার্ট এসেছে একটা দোকানে। কিছু কম পড়ছে টাকায়।

তখনই আপা সন্দিহান হয়েছিল। তার একটা অ্যান্টেনা আছে। তাতে সবসময়ে অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে। টাকাটা দিয়ে আপা বলল তোমার টি শার্ট কোন দোকানে পাওয়া যাচ্ছে?

সঞ্জয় লিন্ডসে স্ট্রিটের একটা দোকানের নাম বলল।

সুজিতার সোনার বালাটা তার ব্যাগ থেকে চুরি গেল সাত দিন পর। মোটা ভারী বালা, তাতে ঘড়ি সেট করা। সুজিতার খুব শখের জিনিস। ভারী বলে লেখার সময় খুলে হাত ব্যাগে রেখে দেয়। সুজিতা একটু অগোছালো। সাবধানী নয়। রিসেস-এর সময় ব্যাগ টেবিলে রেখেই বেরিয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে, ব্যাগ আছে, বালা নেই। সেই সঙ্গে নেই দেড়শ টাকা! খুব খোঁজাখুঁজি হল, স্কুলের হেড মিসকে জানানো হল। কিছু লাভ হল না তাতে।

পরদিন আপা অনীশকে এসে ধরল, শোনো অনীশ, আমার মনটাই সন্দেহ-পিচাশ। সবসময়ে পচা ইঁদুরের গন্ধ পাই। তোমাদের মতো সরল নই। আমার মনে হচ্ছে, সুজিতার যা হল সেরকম আরও হবে।

অনীশ হেসে বলে, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। একটা বুড়ি শুচিবায়ুওলা মহিলা হয়ে যাচ্ছ। কিসের গন্ধ পেলে?

এটা কোনো ড্রাগ অ্যাডিক্টের কাজ।

অনীশ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল, তোমার মনটা সত্যিই সন্দেহ-পিচাশ। এই স্কুলে ড্রাগ অ্যাডিক্ট কেউ নেই। আমরা সবাই মাস-প্রমিজ করেছি, কেউ ড্রাগের পাল্লায় পড়ব না, মনে নেই? রেগুলার র‍্যালি হচ্ছে স্কুলে। পোস্টার সেঁটে রাখছি ঘরে। উই আর ভেরি সেনসিটিভ টু ড্রাগ।

তুমি হচ্ছ ভাল ছেলে। পারফেক্ট গুড বয়। আমি তো তা নই। তোমাকে একটা কথা বলি, একটু খেয়াল রেখো।

তোমার কাকে সন্দেহ হয়?

এখন বলব না।

সঞ্জয় নয়, এবার ধার চাইল অনয় লালা। খুবই মেধাবী ছেলে। তার বাবা আর মায়ের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে গেছে। মা থাকে প্যারিসে, অনয় বাবার সঙ্গে কলকাতায়। স্কুল শেষ করেই সে প্যারিসে চলে যাবে।

আপা খুব সাহায্যকারী মেয়ে। প্রত্যেকের দায়ে দফায় আপা সর্বদা প্রস্তুত। ক্লাসে সবাই আজকাল তাকে মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে আন্টি বলে ডাকে। এমন কি মিস-রাও।

অনয়কে টাকাটা দিয়ে আপা বলল, শোনো, আমাকে সত্যি করে বলবে টাকাটা কেন নিচ্ছ?

অনয় খুব উদাসভাবে বলল, ধার নিচ্ছি আপা। বাবা তিন দিন হল বাইরে। আমার হাতখরচ নেই। বাবা কাল ফিরবে। দিয়ে দেবো।

আপা আর কিছু বলল না। সঞ্জয় আর অনয় যথাসময়ে তার টাকা ফেরতও দিয়ে দিয়েছিল। তবু আপা কেমন যেন দুশ্চিন্তায় রয়ে গেল।

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটল তিন দিন বাদে। শ্যামশ্রী নামে একটা সরল সোজা মেয়ের কাছে একটা দামী আর্টের বই ছিল। দুষ্প্রাপ্য বই। অনেক বিশ্ববিখ্যাত আর্টিস্টের ছবির প্রিন্ট। রিসেসে সে বইটা হপিস হয়ে গেল। আবার স্কুলে একটা হৈ-চৈ হল। নাম-করা ইংলিশ মিডিয়ম স্কুল। এখানে পড়ে সব বিশিষ্ট পরিবারের ছেলে-মেয়ে। চুরির ঘটনা তাই স্কুল কর্তৃপক্ষকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। ছাত্রছাত্রীদের মিটিং ডাকা হল। গার্জিয়ানদেরও মিটিং হল।

ছাত্রছাত্রীদের যে মিটিং ডাকা হল তাতে প্রিনসিপাল উঠে বললেন, চুরির ব্যাপারে আপা কিছু বলবে।

আপা উঠে দাঁড়াল। এবং স্পষ্ট ভাষায় বলল, আমি কাউকে আঙুল তুলে দেখাব না। কিন্তু যারা চুরি করছে তাদের জানাতে চাই যে, আমি তাদের চিনি। আরও জানাতে চাই যে, আমি জানি তারা ড্রাগ অ্যাডিক্ট। আমি প্রিনসিপালকে কথা দিয়েছি আর একটাও চুরির ঘটনা ঘটলে আমি তাদের নাম প্রকাশ করে দেবো।

এর পর আপার ওপর অনেকেই অসন্তুষ্ট হল। শ্যামশ্রী বলল, তুই যদি জানিস তবে চোরকে ধরছিস না কেন আপা? বইটা না পেলে যে আমি ভীষণ মুশকিলে পড়ব! এটা তো অন্যায়।

আপা শ্যামশ্রীর কথার জবাবে খুব ভদ্র গলায় বলল, দেখ শ্যামশ্রী, বইটা তুই এনেছিলি বন্ধুদের ন্যুড ছবি দেখাবি বলে। বইটা আনার পর তোরা পিছনের বেঞ্চে বসে খুব হাসাহাসি করছিলি। কাজটা তোর ভাল হয়নি।

শ্যামশ্রী বলল, ন্যুড তো কী? ও তো ফাইন আর্ট, সব মাস্টারপীস।

ঠিক কথা। মাস্টারপীস দেখার চোখ কি তোর হয়েছে? চোরকে ধরে দিলেও বইটা তো পাবি না। চোর বই বেচে দিয়েছে।

সুজিতাও এসে ধরল আপাকে, চোরের নাম জানলে তোর বলে দেওয়া উচিত আপা। আমার বাবা তো পুলিশে ডায়েরি করেছে। আমি ততটা চাই না। বালা ফেরত পেলে পুলিশ কেস তুলে নেবে।

আপা গম্ভীরভাবে বলল, শোন, চোর আমাদের ক্লাসমেট। এত উঁচু ক্লাস অবধি আমরা সবাই একসঙ্গে এতদিন পড়ে এসেছি। অনেকটা আত্মীয়ের মতো। আমার পরিবারের কেউ এরকম করলে আমরা তো তাকে পুলিশে দিই না। আমি চোরদের আর একটা চান্স দিতে চাই।

আমার বালার কী হবে?

ওটা ডোনেশন বলে ভেবে নে।

তাহলে তুই বড় বড় কথা বললি কেন বক্তৃতায়?

বললাম আবার যাতে চুরি না হয় তার জন্য।

দুর! বলে রাগ করে চলে গেল সুজিতা।

পরদিন স্কুল ছুটির আগে আপা অনীশের কাছে এসে বলল, শোনো, তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে।

বলো।

তুমি একটা সাহসের কাজ করতে পারবে?

কেন পারব না? কাজটা কিসের?

তুমি একা পারবে না। সুমিত, পিটার আর গুরমিককে সঙ্গে নাও।

নিচ্ছি। ওরা একস্ট্রা ক্লাস করছে। কিন্তু কাজটা কী বলবে তো?

আমি পনেরো মিনিট পরে বেরোবো। হেঁটে যাবো বড় রাস্তা অবধি।

সে তো রোজই যাও।

আজ তোমরা আমাকে ফলো করবে।

ফলো? কেন?

একটু দূরে থেকে ফলো করতে হবে। যেন আমার সঙ্গে কেউ আছে তা বোঝা না যায়।

অনীশ ধৈর্য হারিয়ে বলে ওঠে, বাট হোয়াই আপা? হোয়াই?

আজ হয়তো একটা ঘটনা ঘটবে। কিন্তু তোমরা চট করে এগোবে না। দূরে থাকবে। শুধু লোকগুলোকে চিনে রাখবে, যাতে পরে দেখলেও চিনতে পারো।

অনীশ রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়ে বলে, তুমি গ্রীক ভাষায় কথা বললে আমি কি করে বুঝবো?

আপা শান্ত চোখে অনীশের দিকে চেয়ে বলে, কাল যখন স্টুডেন্টস মিটিঙে বক্তৃতা দিয়েছিলাম তখনও কি বুঝতে পারোনি যে, আমি মৌচাকে ঢিল মেরেছি?

না তো!

এই জন্যই তো তোমাকে গুড বয় বলি।

একটু খুলে বলবে?

আমার সন্দেহ হচ্ছে, আমাদের ক্লাসে এবং অন্য সব ক্লাসেও কয়েকজন করে ড্রাগ অ্যাডিক্ট আছে। আমাদের ক্লাসে দুজনকে আমার খুব সন্দেহ হয়। আরও দু একজন থাকতে পারে।

আমার বিশ্বাস হয় না আপা।

তা জানি। কিন্তু আমি যে পচা ইঁদুরের গন্ধ পাই।

বুঝলাম।

কাল আমি যেই বললাম যে, চোরদের আমি চিনি, সঙ্গে সঙ্গে আমি চোরদের একটা চ্যালেঞ্জও তো জানিয়ে রাখলাম। তাই না?

অনীশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে বলে, তাই তো! এটা আমার মাথায় আসেনি। এ কাজ কেন করলে আপা?

ইচ্ছে করেই করেছি। আমি ওদের চমকে দিয়েছি, ভয় পাইয়ে দিয়েছি।

অনীশ মাথা নেড়ে বলে, দ্যাটস রাইট।

ওরা যদি সাধারণ চোর হয় তাহলে কিছু করবে না। চুপচাপ থাকবে। বড় জোর আমার কাছে এসে অন্যায় স্বীকার করবে। কিন্তু ড্রাগ অ্যাডিক্ট হলে তা করবে না।

কী করবে আপা?

ওরা যাদের কাছ থেকে ড্রাগ কেনে তারা বাজে লোক। ব্যবসা মার খেলে তাদের চলবে না।

তারা এদের অনেক সময়ে প্রোটেকশন দেয়।

তুমি এত জানলে কী করে?

আমি পায়ে হেঁটে কলকাতা শহর ঘুড়ে বেড়াই, জানো তো!

তা আর জানি না!

অভিজ্ঞতায় আমি সত্যিই বুড়ি।

তারপর বলো। এ তো সাসপেন্স থ্রিলারের মতো ব্যাপার।

থ্রিলারই তো। আমার মনে হচ্ছে ওরা ড্রাগ পেডলারদের খবর দিয়েছে, তারা আজ হোক, কাল হোক আমাকে অ্যাটাক করবেই।

কি করে বুঝলে?

আমার অ্যান্টেনা আছে। ক্লাসে আজ আমার দিকে দুজন ছেলে খুনীর চোখে তাকাচ্ছিল। তাদের একজনকে আমি বলতে শুনেছি, শী উইল বি টট এ লেসন টু ডে।

তাদের নাম আমাকে বলছ না কেন?

সেটা পরে হবে। আমি আগে পেডলারদের চিনতে চাই।

অনীশ প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে বলে, এত রিস্ক নিচ্ছ কেন?

খারাপকে আটকাতে গেলে রিস্ক থাকেই।

আমরা তোমাকে গার্ড দিয়ে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেবো।

দূর বোকা। তাতে আসল কাজটাই হবে না।

আপা, তোমাকে আমি রিস্ক নিতে কিছুতেই দেব না।

তাহলে আমি আর একদিন তোমাদের না জানিয়ে বেরোবো। ওরা তো তক্কে তক্কে থাকবেই।

ওরা তোমাকে কী করবে? মারবে?

আপা হাসল, আমি রোগা মেয়ে, কুংফু কারাটে জানি না। ওরা তো ধরেই নিতে পারে যে একটু চোখ রাঙালে বা দুটো থাপ্পড় মারলেই আমি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলব। আর তার পর থেকে লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে যাবো। তাই না?

অনীশ মৃদু হেসে বলে, সে তোমাকে যারা চেনে না তারা তা ভাবতে পারে। কিন্তু ভাবলে ভুল করবে।

আমি চাইছি ওরা ভুলটা করুক।

তার মানে তুমি মার খাবে!

খাবো। কয়েকজন বন্ধুর ভালর জন্য মার খেতে আপত্তি নেই।

বাঃ, বেশ কথা আপা। চমৎকার প্রস্তাব। এতদিন তোমাকে বুদ্ধিমতী বলে জানতাম।

এখন আর তা মনে হচ্ছে না?

না। তুমি মেয়ে-গান্ধীজী হতে চাইছো। আজকাল ওরকম ভালমানুষীর কোনও দাম নেই।

ভালমানুষী কে বললে? এ হল স্ট্র্যাটেজি। তুমি কি ভাবছো চুপ করে মার খেয়ে যাবো? মোটেই তা নয়।

তা হলে কী করবে?

চিনে রাখবো। চাঁইদের ধরতে না পারলে ড্রাগ অ্যাডিক্টদের কাছে বক্তৃতা দিয়ে কোনও লাভ নেই। এত তো পাবলিসিটি হচ্ছে, তবু অ্যাডিকশন বাড়ছে তো?

তোমার ওপর মাঝে মাঝে আমার ভীষণ রাগ হয়। ইউ লাভ টু লিভ ডেনজারাস্‌লি।

না বাবা না। আমি ঠান্ডা মেয়ে। আমি শান্তিতে বেঁচে থাকতে চাই।

তোমার কাণ্ড দেখে তা মনে হয় না।

আমার কাজটা করবে কিনা বলো।

কী করতে হবে আবার বলে দাও।

একটু দূরে থেকে আমাকে ফলো করবে। বোকার মতো আমাকে বাঁচাতে যেও না। যদি কিছু হয় তো দূর থেকেই চিনে রাখবে। কথা দাও কিছু করবে না।

ঠিক আছে।

শোনো, কিছু ঘটতে পারে, নাও পারে। আগে থেকে খুব বেশী প্রত্যাশা রেখো না। অ্যান্টি ক্লাইমেক্সও হয়ে যেতে পারে।

অনীশ খুবই বিষাদ বোধ করল। কিন্তু আপা তার বন্ধু হলেও তার ওপর অনীশের প্রচণ্ড বিশ্বাস। তার আজকাল কেবলই মনে হয়, আপা কোনও ভুল করতে পারে না।

সে গিয়ে সুমিত, পিটার আর গুরমিককে ঘটনাটা বলল।

সুমিত বলল, গেম রুম থেকে কয়েকটা হকি স্টিক বের করে নিলেই তো হয়।

গুরমিক বলল, ঠিক কথা।

পিটার বক্সিং করে। সে বলল, নো প্রবলেম। আপার গায়ে হাত তুললে হাত ভেঙে দেবো, সে যতো বড় মস্তান হোক।

ছুটির পর আপা একটু অপেক্ষা করল। ছেলেমেয়েদের দঙ্গলটা কেটে যাক। গুণ্ডারা যদি তাকে মারে তাহলে এরা বিপদে পড়বে।

একটু পরে সে একা বেরোলো। রাস্তা ফাঁকা। নির্জনই বলা যায়। সে একবারও পিছন ফিরে তাকাল না। ভয় পেল না। স্বাভাবিকভাবে হেঁটে যেতে লাগল বড় রাস্তার দিকে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটার পর একটা প্রাইভেট গাড়ি গা ঘেঁষে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাদের স্কুল বাসও চলে গেল হুস করে।

সামনে ঝাউতলার নিচে তিনটে লোক দাঁড়িয়ে। কালো, বিচ্ছিরি চেহারা।

তাদের দিকে তাকালই না আপা। সোজা হেঁটে যেতে লাগল।

আচমকাই হোঁচটটা লাগল। আপা 'মা গো' বলে সম্পূর্ণ বেসামাল হয়ে উপুড় হয়ে পড়ল ফুটপাথের শানে। হাঁটুতে খটাং করে একটা শব্দ হল। কনুইটাতে এত লাগল যে মাথা ঝিমঝিম করে উঠল তার। হাতের বই-খাতা ছিটকে গেছে রাস্তায়। বৃষ্টিভেজা পথে জলকাদায় মাখামাখি হল তার বই-খাতা, সে নিজে।

বিহ্বলতা কাটিয়ে ওঠার আগেই একটা লাথি এসে তার রোগা কোমর প্রায় ভেঙে দিল।

একটা বিচ্ছিরি অসংস্কৃত গলা চাপা গলায় বলল, এই শালী কুত্তি, কার নাম বলবি তুই? অ্যাঁ! কার নাম বলবি?

বলতে বলতেই একজন কে যে তার চুল ধরে টেনে তুলল।

চটাস করে একটা চড় পড়ল তার গালে, বল শালী খানকী, কার নাম জানিস তুই?

আপার দু'চোখ বেয়ে জল পড়ছে টপ টপ করে। ঠোঁটের কষ বেয়ে লালা। জীবনে সে কারও কাছে কখনও মার খায়নি। কিন্তু নৃশংস পশু-মানুষদের ওপরেও তার রাগ নেই। তার মনে হয় এরা বড্ড বোকা, বড় দুর্বল, বড় অসহায়।

কথার জবাব দেওয়ার সাধ্য নেই তার। মার খেয়ে তার মাথা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। এখনই সে নির্বাপিত হবে। মারাও যেতে পারে।

ঠিক এই সময়ে তিন জোড়া পা দৌড়ে আসছিল। ওদের বারণ করেছিল আপা। তবে আসছে কেন? সে চায়নি ওরাও তার সঙ্গে মার খাক।

প্রথমে পৌঁছলো গুরমিক, তার পায়ে পায়ে পিটার, একটু পিছনে অনীশ। দুজনের হাতে হকি স্টিক।

অনীশের রাগ সবচেয়ে বেশী। তার হকি স্টিক এত জোরে একটা লোকের হাতে লাগল যে লোকটা 'বাপরে' বলে হাতটা চেপে ধরেই দৌড়ে পালাল।

দ্বিতীয় লোকটাকে গুরমিক মারল পায়ে। তারপর লোকটা পড়ে যেতেই সে দুমদাম মারতে লাগল দক্ষ হাতে।

তিন নম্বর লোকটাকে নেওয়ার কথা ছিল পিটারের। কিন্তু বেগতিক দেখে লোকটা দৌড় মেরে উল্টো দিকের একটা গলিতে ঢুকে গেল।

গুরমিকের মার খেয়েও ভূপাতিত লোকটা একটা ব্যাঙের মতো লাফ মেরে সরে গিয়ে পালাতে লাগল।

পথচারী লোকজন সব ছুটে আসছে চারপাশ থেকে। স্কুলের দরোয়ান, মিসরাও আসবে।

অনীশ আপাকে তুলল।

খুব লেগেছে তোমার আপা?

আপার মুখ দিয়ে টস টস করে রক্ত পড়ছে। চোখ ভরা জল। তবু সে বলল, বোকা।

কে বোকা?

তোমরা। বারণ করেছিলাম না?

করেছিলে। সেটা তুমিই বোকা বলে। খুব লেগেছে? রক্ত পড়ছে যে!

কিছু নয়; ঠিক আছি।

হাসপাতালে নেওয়ার দরকার।

না বাবা। মুখে জল দেবো। স্কুলে নিয়ে চলো।

চলো।

কাউকে ধরতে দিল না আপা। নিজে হেটে গেল স্কুল অবধি।

স্কুলের মিসরা বেরিয়ে এসেছিলেন ফটকে। ঘটনায় তারা হতবাক্।

আপাকেই একমাত্র নির্বিকার মনে হচ্ছিল। সে গিয়ে চোখে মুখে জল দিল। একটু বিশ্রাম নিল বসে।

তারপর প্রিনসিপাল এলেন, আপা, তুমি কিছু জানো?

কিছু নয় ম্যাডাম।

অনীশ বলেছে তুমি জানো কে এই ঘটনার পিছনে আছে। তাদের নামগুলো আমাদের দরকার।

ম্যাডাম, আমাকে আর দু-একটা দিন সময় দিন।

কী করবে তুমি?

আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলব।

কে বন্ধু?

যারা এই ঘটনার পিছনে আছে।

তারা কি তোমার বন্ধু! এটা কি বন্ধুর মতো কাজ?

মানুষ মাত্রই ভুল করে। তারা আমাকে শত্রু ভাবছে।

তুমি আর বিপদের মধ্যে থেকো না আপা। নাম বলে দাও। এটা আমার আদেশ।

নাম বলে দিলেই আমার এত প্ল্যান সব নষ্ট হয়ে যাবে। নাম তো আমি অনেক আগেই বলে দিতে পারতাম।

প্রিনসিপাল অসন্তুষ্ট হলেন। মুখটা গম্ভীর করে বললেন, এ স্কুলে এসব কী হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। তুমি গোঁ ধরে না থাকলেই ভাল করতে। যাকগে, আমি জোর করব না। ডাক্তার আসছে। ততক্ষণ অপেক্ষা করো। আমার গাড়ি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে।

ডাক্তার এল। হাত পায়ের ক্ষতে ওষুধ ব্যাণ্ডেজ লাগানো হল। প্রেসক্রিপশন নিয়ে ওষুধ কিনে আনল দারোয়ান। আপার বাড়িতে টেলিফোনে জানানো হল, আপা একটু কাজে আটকে আছে। ফিরতে দেরি হবে।

আপাকে পৌঁছোতে সঙ্গে গেল অনীশ, গুরমিক আর পিটার।

অনীশ বলল, কেমন লাগছে এখন আপা?

আপা হাসল, একটু ক্লান্ত। কিন্তু বেশ ভাল লাগছে।

গুরমিক বলল, একটাকে খুব পিটিয়েছি।

আপা বলল, মারাটাই তো ভুল। মারতে নেই।

তুমি একটি ইমপসিবল্ মেয়ে আপা। আরে বাবা, মানুষ বরাবর লড়াই করে বেঁচে আছে। উল্টে মার না দিয়ে কি বাঁচতে বলো!

আপা ক্লান্ত গলায় বলে, গুরমিক, তুমি গায়ের জোরে বিশ্বাস করো, আমি করি না। যারা আমাকে মেরেছে তাদেরও আমি ঘেন্না করতে পারি না।

গুরমিক ধমকে উঠল, হেট দেম আপা, হেট দেম। ঘেন্না না করলে এই দুনিয়াতে কি বেঁচে থাকা যায়? হ্যাঙ ইওর ফিলজফি আপা আন্টি। আজ যারা তোমাকে মেরেছে কাল তারা তোমাকে খুন করবে, যদি না তুমি উল্টে মারো।

ওরা ভীতু বলেই মেরেছে। ওদের অস্তিত্বে, রুজিরোজগারে যে আমি বিপদ ডেকে আনছিলাম।

ওসব ছাড়ো আপা।কেসটা আমাদের হাতে ছেড়ে দাও। ক্লাসমেটদের নাম বলে দাও আমাদের। আমরা দেখে নিচ্ছি।

জানি। তোমরা আমার ভালই চাও। আর আমি ওদেরও ভাল চাই। কয়েকদিন অপেক্ষা করো।

ইউ আর রিয়েলি ইমপসিবল্।

অনীশ মৃদু স্বরে বলল, আমি জীবনে কখনও মারপিট করিনি আপা। আজ প্রথম একজনকে হকি স্টিক দিয়ে মারলাম। খুব জোরে মেরেছি। লোকটার হাত ভেঙে যাওয়ার কথা।

আপা করুণ গলায় বলে, আহা রে! কেন যে ওরকম করলে!

অনীশ বলল, কিন্তু তুমি জানলে অবাক হবে, জীবনে প্রথম একটা বদমাশ লোককে মারতে পেরে আমার অদ্ভুত লাগছে। আই অ্যাম এনজয়িং ইট।

আপা সরু গলায় বলে, ওটাও একটা ড্রাগ অনীশ।

কোনটা?

মার দেওয়াটা। ওটাও নেশা। যারা একবার মারে এবং সেটা উপভোগ করে তারা আবার মারবে। হয়তো অকারণে মারবে। মারতে আনন্দ পাবে। পৃথিবী তো সেই কারণেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।

তোমাকে আমি বুঝতে পারি না আপা। হয় তুমি কোনও গডেস ইন ডিজগাইস অথবা একটু লুনাটিক।

আমি তোমাদের চোখে লুনাটিক হতেই পারি। কিন্তু আমার চোখ দিয়ে যদি তোমাকে পৃথিবীটা দেখাতে পারতাম!

পৃথিবীটাকে তুমি কিরকম দেখ আপা? ইজ’নট ইট এ হেল?

নোংরা, খারাপ, নিষ্ঠুর। তবু কী যে সুন্দর!

আপা, আজ রাতে ভাল করে ঘুমোও। আজ মাথা কাজ করছে না।

আমার মাথা তেমন কাজ কখনও করে না। কাজ করে আমার মন। আমার হৃদয়।

আপাকে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে চার বন্ধু হেঁটে হেঁটে খানিক দূর এক সঙ্গে এল। কেউ কোনও কথা বলছিল না। তারা বীরের মতোই একটা কাজ করেছে। তবু নিজেদের বীরত্বটাকে অনুভব করছিল না। তারা আপা সম্পর্কে কোনও মন্তব্যও করতে পারছিল না। তারা খানিকটা বিহ্বল।

তারা ভাবছিল। শুধু ভাবছিল।

৩০

সেদিন গাঁয়ের স্কুলের অডিট সেরে রশ্মি রায় আর সে একসঙ্গেই ফেরে। এক ট্রেনে, এক কম্পার্টমেন্টে পাশাপাশি বসে এবং একই ট্যাক্সির উষ্ণ, নরম অন্ধকার ও নিকট সান্নিধ্যে। যে কেউ শুনলে বলবে, তবে আর কি, হয়েই তো গেছে।

হয়ে যায়নি, তবে এই এতটা একসঙ্গে থাকার ধকল আজও সামলে উঠতে পারেনি হেমাঙ্গ। আর সেই মাদক গন্ধটা, সেই মারাত্মক বিদেশী সেন্ট মেয়েটার গা থেকে উড়ে এসে কুংফু কারাটে চালিয়ে হেমাঙ্গর হৃদয়কে প্রায় ধরাশায়ী করে ছেড়েছিল। প্রেমের মধ্যে কি গন্ধেরও একটা ভূমিকা আছে? কোনও কোনও সেন্ট কি হৃদয়-বিদারক? কই, সেসব সেন্টের প্রস্তুতকারকরা তো নোবেল প্রাইজ পায় না! তাদের অবশ্যই নোবেল-টোবেল দেওয়া উচিত।

রাস্তা কম নয়। মেয়েটাও কথা বলতে ভালবাসে। ফলে দুজনের মধ্যে একটা কথার জালও শক্তভাবে বোনা হয়েছিল। প্রথম স্কুল নিয়ে, তারপর ভারতবর্ষের এলানো কর্মবিমুখ জীবনদর্শন নিয়ে, প্রশাসনিক পরিকাঠামোর জটিলতা নিয়ে, মানুষের দুরারোগ্য দুর্নীতি নিয়ে, চিকিৎসার অতীত ধান্ধাবাজি নিয়ে। কথাবার্তা পার্সোনাল লেভেলে এল ট্যাক্সিতে, শিয়ালদা থেকে হাজরার মাঝখানে।

রশ্মি রায় জিজ্ঞেস করল, আমি একটু বেশি কথা বলি, তাই না? অ্যাম আই এ বোর?

না। আপনার কথা খুব ইন্টারেস্টিং। বোধ হয় জমেও ছিল অনেক কথা।

ঠিক বলেছেন তো! রশ্মি মিষ্টি করে হাসল, গত দু'বছরের অভিজ্ঞতা খুব খারাপ, একজসটিং। হাঁফিয়ে উঠছি। কাকে বলব? আজ আপনাকে পেয়ে ফ্লাড গেটটা খুলে দিলাম। কেন যে দিলাম বুঝতেই পারছি না। হয়তো আপনাকে খুব সিমপ্যাথেটিক মনে হয়েছিল।

হেমাঙ্গ মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে চিরকাল অদক্ষ শ্রমিক। সে অনেকটা ভেবে নিয়ে বলল, ঠিকই করেছেন। কথা জমিয়ে রাখলে খুব কষ্ট।

রশ্মি বিষন্ন গলায় বলে, বাবা মা আমার এইসব মিশন-টিশন পছন্দ করে না। বাবা তো বলেই দিয়েছিল, গাঁয়ের স্কুলে গিয়ে ত্যাগের মহিমা দেখাতে পারো, কিন্তু কেউ ওর কোনও দাম দেবে না। গান্ধীজী, বিনোবা ভাবে থেকে শুরু করে বেশ কয়েকজন ওসব করতে গিয়েছিল। কিছুই হয়নি। যে দেশের গ্রামীণ অর্থনীতির জোর নেই, সেখানে ত্যাগ-ট্যাগ দেখাতে গেলে কয়েকটা হাততালি আর অনেক টিটকিরি জুটবে। তার বেশি কিছুই হবে না।

আপনার কি মোহভঙ্গ হয়ে গেছে?

রশ্মি মৃদু হেসে বলে, একরকম তাই। তবে মেয়েগুলো বড্ড ভাল। এত ভালবাসে আমায়। প্রায়ই তরিতরকারি, গাছের ফল এনে দেয়, আর আদরের সেসব দান বয়ে আনতে হয় আমাকে। অন্তত জনা দুই খুব ভাল লোককেও পেয়েছিলাম। কিন্তু ভালদের তো আজকাল ভয়েস থাকে না। আচ্ছা, আপনাকে এত কথা বলছি কেন বলুন তো? ভীষণ টকেটিভ হয়ে গেছি তো আজ!

কথা বলা সরলতার লক্ষণ।

আমি কি সরল?

ওভাবে জিজ্ঞেস করলে বিপদে পড়ে যাই।

রশ্মি খুব হাসল। তারপর বলল, কিন্তু আপনি তো কিছু বললেন না নিজের সম্পর্কে। শুধু একটা জিনিস লক্ষ করলাম, মেয়েদের আপনি ভীষণ লজ্জা পান, আর কোনও মহিলার সামনে খেতে পারেন না!

হেমাঙ্গ লজ্জিত হয়ে বলে, আমি কখনও কো-এডুকেশনে পড়িনি, ছেলেবেলা থেকেই মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা বা বন্ধুত্ব রেস্ট্রিকটেড ছিল। বাবার ধারণা, বেশি মেলামেশা করলে নারীজাতির ওপর ছেলেদের শ্রদ্ধা কমে যায়।

রশ্মি অবাক হয়ে বলে, এ তো প্রায় মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা!

হয়তো আপনি ঠিকই বলছেন। কিন্তু অভ্যাসটা মজ্জাগত হয়ে গেছে।

রশ্মি খিলখিল করে ছেলেমানুষের মতো হেসে বলে, বেচারা!

এই 'বেচারা' শব্দটাই বুঝি আর এক পা এগিয়ে আসা।

রশ্মি বলল, আচ্ছা, নারীজাতিকে শ্রদ্ধাই বা কেন করতে হবে বলুন তো! শ্রদ্ধার চেয়ে অনেক বেশি দরকার বন্ধুত্ব, ভালবাসা। তাই নয়?

আপনি এসব বিষয়ে আমার চেয়ে বেশিই জানবেন। উন্নত সমাজব্যবস্থা দেখেছেন। আমরা তো কূপমণ্ডুক। কীই বা জানি!

রশ্মি তার চশমা, দুল ইত্যাদির একটা ঝিলিক তুলে অন্ধকার ট্যাক্সিতে তার দিকে ঘুরে তাকাল, ওটা কি বিনয়? নাকি একটু হুল?

কী যে বলেন। আমার পরিবারটা বেশ রক্ষণশীল। আমরা অ্যাডাল্ট হওয়ার পরও আমাদের ওপর খবরদারি বজায় রাখা হয়। আমি এখনও একটা পারিবারিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে আছি। অনভিপ্রেত কোনও কাজ করলে তার জন্য জবাবদিহি করতে হয়। স্বাধীনতা একদম নেই।

রশ্মি একটা দুঃখের শ্বাস ফেলে বলে, বুঝতে পেরেছি। আপনি সেই পরিবারে মানুষ যেখানে এখনও বর্ণশ্রম মানা হয়, লাভ ম্যারেজকে বরদাস্ত করা হয় না, এঁটোকাঁটা বিচার করা হয়, বউদের ঘোমটা দিতে হয়, এট্‌সেট্‌রা, এট্‌সেট্‌রা। তাই না?

অনেকটা তাই।

আপনি বোধ হয় বাড়ির পছন্দ করা মেয়েকেই বিয়ে করবেন!

বিয়ে করলে তো! ওই একটা ব্যাপারে এখনও ফ্যামিলি প্রেসারকে ঠেকিয়ে রাখা গেছে।

কিন্তু একদিন ভালমানুষের মতো টোপর পরে তো একটা অচেনা মেয়ের গলাতেই মালা দিতে হবে।

রশ্মির হাসিতে খুব সঙ্কুচিত হয়ে হেমাঙ্গ বলল, ব্যাপার কি জানেন? আমার অভিভাবকরা আমার ভিতরে নারীজাতির প্রতি এমনই বেশি শ্রদ্ধার সঞ্চার করে দিয়েছেন যে, কোনও নারীকে বিয়ে করার কথাই আমি ভাবতে পারি না। অতিরিক্ত শ্রদ্ধার ফলই হবে।

রশ্মি ভীষণ হাসছিল। মুখে রুমাল অবধি চাপা দিতে হল তাকে। তারপর বলল, আপনি কিন্তু খুব বিচ্ছু। মুখে ভালমানুষীর ভাব, কিন্তু ভিতরে ভিতরে দুষ্টু আছেন।

হেমাঙ্গ এ মেয়েটার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে মেশামেশি করছে, সুতরাং তার সঙ্কোচটা খানিকটা কেটেও গেছে। সে খুব সাহস করে বলল, আমার মতো প্রবলেম তো আপনার নেই। আপনি তো ইচ্ছে করলে ঘর-সংসার করতে পারেন।

রশ্মি মিষ্টি করেই বোধ হয় হাসল, অন্ধকারে ভাল বোঝা গেল না। তারপর বলল, মেয়েদের বুঝি ঘর-সংসার করা ছাড়া আর কিছু করার নেই? ঘর-সংসার ঘর-সংসার শুনে শুনে পাগল হওয়ার জোগাড়।

রাগ করলেন নাকি?

না, রাগ করলে বুঝতেই পারতেন। শুনুন, ছেলেদের বিয়ে করা আর মেয়েদের বিয়ে করা কিন্তু এক ব্যাপার নয়। ছেলেদের বিয়ে করা অনেকটা আনন্দের ব্যাপার, একটু ভারমুক্ত হওয়ার ব্যাপার। কারণ তাকে দেখাশোনা করার একজন আসছে। কিন্তু মেয়েদের বিয়ে করা মানেই হচ্ছে ভয়, উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা। নিজের পরিবার ছাড়তে হবে, সন্তানধারণ থেকে আরও অনেক কিছুর দায়দায়িত্ব নিতে হবে। এবং তার পরে সংসার ছাড়া তার আর কিছু করার থাকবে না।

হেমাঙ্গ অত্যন্ত সমবেদনার সঙ্গে বলল, ঠিক কথা। মেয়েদের বড়ই কষ্ট।

রশ্মি ফের তার দিকে চেয়ে বলল, মুখটা ভাল দেখতে পাচ্ছি না। খুব সম্ভব এটাও একটা বিচ্ছুমি, তাই না?

বিশ্বাস করুন, বাস্তবিকই মেয়েদের কষ্টটা আমি বুঝতে পারি।

রশ্মি সবেগে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে বলল, কোনও পুরুষই কখনও মেয়েদের সত্যিকারের কষ্ট বুঝতে পারে না। সিমপ্যাথাইজার হতে পারে, বন্ধু হতে পারে, কিন্তু মেয়েদের আসল সমস্যাটা শুধু মেয়েরাই টের পায়। আপনি কিছুতেই সেটা বুঝতে পারবেন না।

হেমাঙ্গ মৃদু স্বরে বলে, ছেলেদের প্রবলেম কি মেয়েরা বুঝতে পারে?

খুব পারে। ছেলেরা হল ডমিনেটিং, ইগোয়িস্ট আর কেয়ারলেস।

হেমাঙ্গ খুব মৃদুস্বরে বলল, আমারও তাই মনে হয়।

আপনি খুব বিচ্ছু। এমন ভাব করছেন যেন ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানেন না। মনে মনে হাসছেন তো!

হেমাঙ্গ কাঁচুমাচু হয়ে বলে, না, না, মোটেই হাসছি না। ইদানীং দেখছি মেয়েতে আর ছেলেতে একটা কেমন যেন আকচাআকচি শুরু হয়েছে, অনেকটা মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের মতো। খুব লেখালেখিও হচ্ছে কাগজে।

রশ্মি খুব হাসছিল, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল বুঝি? না মশাই, জীবনটা ফুটবল নয় মোটেই।

ট্যাক্সি হাজরায় ঢোকার পর রশ্মি বলল, মোটে তো সন্ধে। আসুন, এক কাপ কফি খেয়ে যান।

হেমাঙ্গর এর প্রতিবাদে কিছু বলার ছিল না। সে ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ল। তারপর রশ্মি রায়দের বাড়িখানা দেখে তাজ্জব হয়ে চেয়ে রইল। ফটক, ফটকের ওপাশে অনেকটা লন, ফুলের বাগান, আর চারদিকে

সবুজের সমারোহের মধ্যে তিনতলা বনেদী একখানা প্রকাণ্ড বাড়ি। না, তাদের বাড়ির চেয়ে বড় নয় ঠিকই, কিন্তু তবু বেশ বড়।

বাড়ির ভিতরটাও দেখবার মতো। মেহগনি, আবলুস বা বার্মা সেগুনের সেকেলে মজবুত সব চেয়ার-টেবিল-আলমারি-বুককেস। বিশাল বৈঠকখানার এক কোণে একটা মস্ত পিয়ানো অবধি রয়েছে। পেল্লায় বড়লোক, সন্দেহ নেই।

হেমাঙ্গ খুব উজবুকের মতো বলল, আপনি বোধ হয় রোজ গাড়ি করে শিয়ালদায় গিয়ে ট্রেন ধরেন, না?

রশ্মি একটু অবাক হয়ে বলে, কি করে বুঝলেন?

হাত গুনতে জানি যে!

রশ্মি আর অবাক না হয়ে হেসে ফেলে বলে, খুব চালাক, না? কিন্তু কি করব বলুন, এখনও কলকাতার ট্রাম-বাসে ওঠার অভ্যাস হল না। এত ভিড়, আর লোকজনও তো তেমন সভ্যভব্য নয়।

ফেরেনও তো গাড়িতেই?

হ্যাঁ। সন্ধে ছটা থেকে গাড়ি শিয়ালদায় গিয়ে থাকে। আজ ড্রাইভারের ছুটি বলে গাড়ি যায়নি।

আপনি চালাতে পারেন না?

ও বাবা! কলকাতায় গাড়ি চালাবো! ভয়েই মরে যাই যে। লন্ডনে চালাতাম।

রশ্মির বাবা বা মা কেউই বাড়িতে ছিলেন না। ফলে পরিচয়ের ঝামেলাটা ছিল না। হেমাঙ্গ নিশ্চিন্তে বসে এক কাপ কফি খেল। তারপর উঠল।

আজ যাই।

ঠিকানাটা দিয়ে যান তো। আর ফোন নম্বর।

এটা কি আরও এক পা এগিয়ে আসা! হেমাঙ্গ রশ্মির ডায়েরিতে নিজের ঠিকানা আর ফোন নম্বর লিখে দিল।

রশ্মি ঠিকানাটা দেখেই বলল, গরচা! ওমা, এ তো হাঁটাপথ!

হেমাঙ্গ মৃদু হেসে বলে, অনেক সময়ে সামান্য হাঁটা পথও লক্ষ বছরে পেরোতে পারে না মানুষ।

খুব কথা শিখেছেন!

হেমাঙ্গ দিন তিনেক রশ্মির মুখ মনশ্চক্ষে দেখতে পেত, রশ্মির গলার স্বর শুনতে পেত মনেরই কানে। কফির স্বাদ আর সেই সেন্টও তার জিব আর নাককে কয়েকদিন দখলে রেখেছিল।

দিন সাতেক বোধ হয় ক্রিয়াটা রইল। তারপর বিস্মৃতির জল মিশতে-মিশতে নেশার জিনিসটা ফিকে হতে লাগল। আর ঠিক সেই সময়েই একদিন একটা ফোন এল।

আমি রশ্মি বলছি। মনে আছে তো আমাকে!

মনে থাকবে না! যা পেল্লায় বাড়ি!

ইস্, কী বিচ্ছু লোক! বাড়িটাকে মনে রেখেছেন, আর বাড়ির জন্যই আমাকে?

ঠিক তা নয়। তবে বাড়ি জিনিসটাও কিন্তু একটা ফ্যাক্টর। উপেক্ষা করার জিনিস নয়।

বুঝলাম। বাড়িটা না দেখালে বোধ হয় আমাকে মনেও থাকত না!

তা নয়। আপনার বাড়ির সঙ্গে আপনার যদি একটা কনটেস্ট হয়, তাহলে আপনিই জিতবেন। বলুন, কেমন আছেন।

ভাল।

আপনার স্কুল কেমন আছে?

টিকে আছে এখনও। শুনুন, রবিবারে ফ্রি আছেন?

আমি তো সব সময়ে ফ্রি।

মোটেই নয়। রবিবারে রবিবারে তো আপনি অডিট করেন বলছিলেন।

সেটা সব রবিবারে নয়। এই রবিবারে আমার ছুটি। কেন বলুন তো?

আমাদের বাড়িতে আসবেন বিকেলে? ছটা সাড়ে ছটা নাগাদ?

যেতে পারি। কিন্তু কারণটা কি?

আপনি না সেদিন আমার বন্ধুত্ব মেনে নিয়েছিলেন! এমনিই আসুন।

খাওয়া-দাওয়া আছে?

রশ্মি খিলখিল করে হাসল, কিন্তু আপনি তো মেয়েদের সামনে খান না। কি করবেন তাহলে?

না তাকালে খেতে পারি।

রশ্মি খুব মায়াবী গলায় বলল, একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান আছে। আর আমি ফরাসী দেশে রান্না শিখেছি। রাঁধতে ভীষণ ভালবাসি। সেদিন কয়েকটা নতুন রেসিপি এক্সপেরিমেন্ট করব।

ও বাবা! আমি কি গিনিপিগ নাকি?

রশ্মি আবার খুব হাসল, না হয় তাই হলেন।

আচ্ছা। যাবো। মেয়েদের জন্য পুরুষদের কত স্বার্থই তো ত্যাগ করতে হয়।

রশ্মি হাসল, ছাড়ছি। বাই।

হেমাঙ্গ ফোনটা রেখে দিয়ে খুব গম্ভীর একাগ্রতা নিয়ে চিন্তা করতে বসল। মানুষের মন স্বভাবতই এলোমেলো। চিন্তাগুলোকে পর্যায়ক্রমে বা পরম্পরায় সাজাতে পারে না বলে তার সিদ্ধান্তে আসতে দেরি হয় বা কখনোই আসতে পারে না। কিন্তু প্রশ্নটা হল, এটা কী হচ্ছে? এটা কি কোনও সঙ্কেত? কোনও পূর্বলক্ষণ?

ফোনটা সে করল অগতির গতি চারুশীলাকে।

কি রে হাঁদারাম, কেমন আছিস?

শোন, আমার একটা প্রবলেম হয়েছে।

তোর তো বরাবরই প্রবলেম। এবার একটা বিয়ে কর। তাহলে আর প্রবলেমে পড়লেই আমাকে ফোন করতে হবে না।

তুই বড্ড সেকেলে।

বিয়ে করতে বললেই বুঝি সেকেলে হয়? তা তুই করতে চাস কী? লিভ টুগেদার করবি নাকি? তোর ভাবসাব আমি একটুও ভাল বুঝছি না।

দেখ, বিয়েটাও একটা লিভ টুগেদার ছাড়া কিছু নয়, সে হিন্দু, খ্রীস্টান, মুসলমানি মতে বা রেজিস্ট্রি করলেও হরেদরে কাশ্যপ গোত্র। বিয়ের সুবিধে এই যে, ছাড়াছাড়ি হলে অ্যালিমনি বা কমপেনসেশন পাওয়া

যায়।

ও বাবা, এ তো খুব অত্যাধুনিক মতামত হয়েছে দেখছি। জানিয়ে দেবো নাকি বাড়িতে?

তা জানাতে পারিস। কিন্তু তাতে সত্যটা তো বদলে যাবে না। বিয়েকে উদ্‌বন্ধন কেন বলে জানিস? ওর মানে হল বেঁধে মারা।

মোটেই তা নয়। উদ্‌বন্ধন মানে বিয়ে নয় মোটেই। বিয়ে হল উদ্বাহ বন্ধন। বাংলাটা তুই কিছু জানিস না।

ওই হল। উদ্বাহটাও এমন কিছু ভাল ব্যাপার নয়। খুঁজলে হয়তো দেখা যাবে ওটার মানেও খুব খারাপ।

তুই বরং ইংরিজিতে বল না, ভুল একটু কম হবে।

ইংরিজিতে বললে যে তুই কিছুই বুঝবি না। তোর কাছে ইংরিজি তো গ্রীক ভাষা।

তোর কাছে যেমন বাংলা? তোর জন্মদিন কবে যেন! এবার তোর জন্মদিনে একটা ভাল বাংলা ডিকশনারি প্রেজেন্ট করব তোকে।

দিস। ডিকশনারি দিয়েই শুরু কর। হাত আসুক।

ইস! আমি কেপ্পন না তুই কেপ্পন! বিয়ে তো করতে চাস না খরচের ভয়ে। বউ খাবে, পরবে, এটা ওটা চাইবে, তাতে তোর টাকা খরচ হবে। হ্যাঁ রে, তুই এত টাকা চিনলি কবে থেকে? হাড় কঞ্জুস হয়েছিস মাইরি!

রোজগার করলে তুইও টাকা চিনতিস। পরের ঘাড়ে পড়ে দিব্যি লাইফটা কাটিয়ে গেলি। সিন্দবাদের কাঁধে যে সেই বুড়োটা চেপে বসেছিল, কিছুতেই নামে না, তুই হলি তেমনি। শুধু চেপে বসা? লোকটাকে ছিবড়ে করে দিলি।

আচ্ছা, তুই না একটা গাঁয়ের মেয়ে বিয়ে করবি বলেছিলি! তাই না হয় কর না বাবা। গাঁয়ের মেয়েদের ডিম্যান্ড কম হয়। রুজ লিপস্টিক চাইবে না, ডুরে শাড়ি পেলেই খুশি, পার্টিটার্টি দেবে না, মোষের মতো খেটে তোর খরচ বাঁচিয়ে দেবে।

গাঁয়ের মেয়ে তুই খুব চিনেছিস দেখছি! গাঁয়ে যাস কখনও? গিয়ে দেখিস তোর মতো আধুনিকা গণ্ডায় গণ্ডায় ঘুরে বেড়ায় আজকাল। সেই দিন আর নাই রে নাতি, থাবা থাবা চিনি খাতি।

মোটেই নয়। এখন তোর প্রবলেমটার কথা বলবি?

বি সিরিয়াস। প্রবলেমটা কিন্তু সত্যিই প্রবলেম। নো হাসিঠাট্টা। প্লীজ!

আচ্ছা, মনে থাকবে।

প্রবলেমটা একটা মেয়েকে নিয়েই। টল, ফেয়ার, ইয়ং অ্যান্ড বিউটিফুল। হাইলি এডুকেটেড। বিলেতে লেখাপড়া করেছে। পেল্লায় বড়লোক।

বাড়িয়ে বলছিস না তো! প্রেমে পড়লে কিন্তু লোকের মাত্রাজ্ঞান থাকে না। কাণ্ডজ্ঞানও নয়। আগে বল জাতে কি?

ওঃ, তোকে নিয়ে আর পারি না। আমি প্রেমে পড়িনি।

পড়িসনি? এর পরও যদি প্রেমে না পড়ে থাকিস তাহলে এখুনি সাইকিয়াট্রিস্ট দেখা।

একটু শুনবি চারুদি? একটু পেশেন্স নিয়ে?

বল।

মেয়েটা আদর্শবাদী। একটু নারীমুক্তি ঘেঁষা, অর্থাৎ একটু অ্যাগ্রেসিভ টাইপের।

চারুশীলা ফোঁস করে ওঠে, নারীমুক্তিতে বিশ্বাস করলেই সে অ্যাগ্রেসিভ হয় বুঝি! বেশ কথা তো।

ফের ফোড়ন কাটছিস?

আচ্ছা বল।

পদবী রায়, জাতটাত জানি না।

জানিস না কেন? রায় মে বি এনিথিং।

তা হোক না এনি থিং। আমি তো আর ইন্টারেস্টেড নই।

নোস যদি তবে ফোন করে জ্বালাচ্ছিস কেন?

বলছি। মেয়েটা একটা গাঁয়ের স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। চাকরিটা শখের। তবে ওই স্কুলে অডিট করতে গিয়ে আলাপ। এক সঙ্গে ফিরলাম। ওর বাড়িতে কফিও খেয়েছি। দি ম্যাটার শুড এন্ড দেয়ার। কিন্তু মেয়েটা একটু আগে ফোন করে সামনের রবিবার ওর বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছে। আমি অ্যাকসেপ্ট করেছি।

বেশ তো। তারপর?

তারপরই তো তোকে ফোন করছি। কিছু বুঝতে পারছিস?

এ তো দুইয়ে দুইয়ে চার। সোজা অঙ্ক।

ভ্যাট। এ মেয়ের আমাকে পাত্তা দেওয়ার কথাই নয়।

তবে দিচ্ছে কেন?

সেটাই যদি জানবো তবে তোকে জিজ্ঞেস করছি কেন? আমি মেয়েদের সাইকোলজি কিচ্ছু জানি না। একটু অবাক লাগছে।

আগে জানতে হবে তুই যতটা বলছিস মেয়েটা ততটাই কিনা। তুই তো হাঁদারাম। বয়সটাও ভাল নয়। এ বয়সে যাকে চোখে পড়ে তাকেই উর্বশী বলে মনে হয়।

এ মেয়েটি গ্যারান্টিড সুন্দরী। ঠিকানা দিচ্ছি, দেখে আসিস গিয়ে।

দেখাশোনা তো করতেই হবে বাবা। সেটা না হয় পরেই হবে। কিন্তু তোর প্রবলেমটা কী?

এটাই তো প্রবলেম। মেয়েটা ডাকছে কেন?

তোকে পছন্দ করছে বলে! বিলেতে কতদিন ছিল?

জিজ্ঞেস করিনি। তবে লেখাপড়া যখন করেছে তখন বেশ কিছুদিন থেকেছে নিশ্চয়ই। সামনের বছর পারমানেন্টলি বিলেতে চলে যাবে।

তুই লন্ডনে কতদিন ছিলি যেন?

বছর খানেক। একটা শর্ট কোর্স করতে গিয়েছিলাম।

তোর তো সেখানে অনেক বন্ধু আছে!

আছে কয়েকজন।

তাদের কাছে চিঠি লিখে খোঁজ নে।

অতদূর করতে যাবো কেন?

খোঁজ নিয়ে দেখ, ওখানে কোনও অ্যাফেয়ার ছিল কিনা।

সেটা জেনেই কী হবে?

যা বলছিস তা যদি সত্যি হয় তাহলে ধরে নিতে হবে যে এতদিনে তোর মতো একটা হাবাগঙ্গারাম, অপদার্থ, গুড ফর নাথিংকে উদ্ধার করতে ভগবানই ওকে পাঠিয়েছেন।

তুই একদম বোকা। বলছি তো আমি ইন্টারেস্টেড নই।

ঠিক আছে, রোববার ওর বাড়ি থেকে ঘুরে আয়। একটু বুদ্ধি খাটিয়ে ওদের বর্ণটা জেনে নিবি। বুঝেছিস বোকচণ্ডী?

আমি ওসব পারব না। শুধু জানতে চাইছি, এত অল্প পরিচয়ে এতটা এগোনো কি স্বাভাবিক?

প্রেম জিনিসটা এরকমই হয়। তোর অভিজ্ঞতা নেই বলে জানিস না।

তুই বলতে চাস মেয়েটা আমার প্রেমে পড়েছে?

হাবুডুবু যাচ্ছে।

অসম্ভব। এ খুব ধারালো মেয়ে।

ধারালো মেয়েরা আজকাল ইচ্ছে করেই ব্যক্তিত্বহীন, ম্যাদাটে মার্কা, জো-হুজুর টাইপের পুরুষদের পছন্দ করছে। তাতে তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বজায় থাকে, যা খুশি করতে পারে, স্বামীকে ইচ্ছেমতো চালাতে পারে।

আমি ম্যাদাটে মাকা! ব্যক্তিত্বহীন!

তার ওপর পয়সাওলা ঘরের ছেলে, অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশনও ভাল। তোকে তো এ ধরনের মেয়েরা লুফে নেবে।

ক্যাচ উঠলে তো লুফবে! আমি তো ক্যাচ তুলিনি?

তুলেছিস, কিন্তু জানতি পারছি না।

ইয়ার্কি করিস না চারুদি। তোকে না আগেই বলেছি, বি ভেরি সিরিয়াস!

সরি। ভুলে গিয়েছিলাম। আর ইয়ার্কি করব না। বল।

যা বলার তা বলেছি। এবার ভেবে বল তো ব্যাপারটা কি!

সত্যি বলব?

সত্যি না তো কি বানিয়ে বলবি?

মেয়েটা তোকে একটু বাজিয়ে দেখতে চাইছে। তোর চেহারাটা খ্যাঁদা বোঁচার ওপর মন্দ নয়। মুখে একটা বোকা-বোকা ভালমানুষী আছে, যা থেকে তোকে অনেস্ট বলে মনে হতে পারে। তবে আমি এটাও বিশ্বাস করছি যে, তুই এখনও ওর প্রেমে পড়িসনি। পড়লে তোর গলা শুনেই আমি বুঝতে পারতাম।

পড়িনি। আর বেশিদূর এগোতেও চাই না। নেমন্তন্নটা কি কাটিয়ে দেবো?

তা কেন? যা না। তবে সব ইনফর্মেশন না নিয়ে কিছু করে বসিস না।

আমি কি সেরকম লোক?

তুই কিরকম লোক? বোকারা কত অকাজ করে ফেলে। মেয়েটার নাম কি?

রশ্মি রায়।

নামটা তো বেশ!

মেয়েটাও বেশ।

তবু তোর পছন্দ নয়?

পছন্দ নয় তো বলিনি! তবে আমি প্রেমে পড়িনি।

চারুশীলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তোর জন্য এই কারণেই আমার মাঝে মাঝে বড় দুঃখ হয়।

৩১

সেদিন জলকাদায় বৃষ্টিতে গাঁ-গঞ্জের কাঁচা-পাকা রাস্তায় এবং ক্ষেতে খামারে অনেক ঘুরতে হল কৃষ্ণজীবনকে। কারণটা হল নিরুদ্দেশ রামজীবন।

সে বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই কান্নার আওয়াজ পেয়েছিল। বাবা আর মা তাকে দেখে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল বটে, কিন্তু মুখে তেমন হাসিখুশি ভাবটা ছিল না। এটা হওয়ার কথা নয়। পথে আসতে আসতে সে পটলের কাছেই শুনে নিয়েছিল ঘটনাটা।

রাঙাকে ডেকে বলল, কেঁদো না বউমা। রেমো কি মাঝে মাঝে এরকম চলে-টলে যায় নাকি?

রাঙা মাথা নিচু করে বলে, গেলে আমাকে অন্তত বলে যায়। কাল কিছু বলেনি। বটতলায় ওর কিছু খারাপ বন্ধু আছে। মাঝে মাঝে এসে খুঁজে যায়। তাদেরই ভয়। মেরে-টেরে ফেলবে কিনা কে জানে?

যে লোকটা খুন হয়েছে সে রেমো নয়, নিশ্চিন্তে থাকো। ভেবো না, আমি খুঁজতে বেরোচ্ছি।

আপনি এতটা পথ এলেন, এখনই বেরোবেন কি? আগে একটু চা করে দিই।

আমি চা বিশেষ খাই না। তবে বৃষ্টির দিন, দাও একটু।

রাঙা দৌড়ে গেল। মুড়ি মেখে চা করে নিয়ে এল। বলল, দুপুরে কী খাবেন বলুন! একটু পোস্ত করি?

কৃষ্ণজীবন হাসল, খাওয়ার সময় হবে কিনা কে জানে! রেমো কোথায় কোথায় যেতে পারে একটা ধারণা দাও তো!

আমাদের কিছু বলে না তো। বটতলার বন্ধুরা জানে হয়তো। কিন্তু তারা যা লোক, কে জিজ্ঞেস করতে যাবে তাদের?

বন্ধুদের নাম জানো?

না, শুধু একজনের নাম শুনেছি, পঞ্চা।

পটল জ্যাঠার কাছ ঘেঁষেই আছে। সঙ্গে গোপাল। পটলের চোখে বিস্ময়ের ঘোর। এই তার জ্যাঠা! তার মস্ত জ্যাঠা! সে পঞ্চা নামটা শুনেই বলল, ওদের আমি চিনি জ্যাঠা। গণেশ, পঞ্চা, চিত্ত, রতন।

বামাচরণ বা শ্যামলী এতক্ষণ ঘর থেকে বেরোয়নি। তারা যে এ বাড়িতে আছে তাই মনে হচ্ছিল না কৃষ্ণজীবনের। হঠাৎ দরজা খুলে বামাচরণ বেরিয়ে এল। পরনে বাইরের পোশাক প্যান্ট আর জামা। মুখে একটু বিগলিত হাসি। জন্মে যা কখনও করেনি আজ হঠাৎ তাই করল বামাচরণ। দাওয়ায় উঠে ঢিপ করে একটা প্রণাম ঠুকে বসল কৃষ্ণজীবনকে।

কৃষ্ণজীবন একটু হাসল, কেমন আছিস রে বামা?

ওই আছি আর কি! তুই ভাল তো দাদা? বাড়ির খবর-টবর সব ভাল?

কৃষ্ণজীবন একটা অস্ফুট হ্যাঁ বলে তার চেয়ে তিন বছরের ছোটো ভাইকে দেখছিল। বামার গালে খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি। গাঁয়ের লোক অবশ্য নিয়মিত দাড়ি কামায় না। কিন্তু বামাচরণের মুখে বেশ বয়সের ছাপও পড়েছে, মাথার চুল বিরল হয়ে টাক প্রায় বেরিয়ে পড়েছে। চুল যা আছে তার বেশির ভাগই পাকা। জামা প্যান্ট যেমন ময়লা তেমনি ভাঁজহীন, চেহারা-ছবিতে ভদ্রলোকের ছাপটাই নেই। কৃষ্ণজীবনের ভারি কষ্ট হল দেখে। কেন যে শ্রীহীন হয়ে বুড়িয়ে যাচ্ছে এরা। বাইরের লোক তাকে আর বামাচরণকে পাশাপাশি দেখলে বিশ্বাসই করবে না যে, বামাচরণ কৃষ্ণজীবনের চেয়ে বয়সে ছোট। কিংবা সম্পর্কে ভাই।

সংসারে যে চাপা আড়াআড়ি তা বুঝতে কষ্ট হল না কৃষ্ণজীবনের। আড়াআড়ি না থাকলে এতক্ষণে বামাচরণের উচিত ছিল রামজীবনের খোঁজে বেরিয়ে পড়া। আড়াআড়িই শুধু নয়, হয়তো ভাগাভাগিও। এ সংসারের সঙ্গে বন্ধন কি ছিন্ন হয়েছে কৃষ্ণজীবনের? সে যে কোনও খোঁজই রাখে না।

বামাচরণের বউ শ্যামলীও এসে প্রণাম করে ঘোমটা টেনে দাঁড়াল। একে সে মুখ চেনে, এক-আধবার দেখেছে।

কেমন আছো বউমা?

ভাল দাদা।

কৃষ্ণজীবন একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করল। না, এরা ভাল নেই। একদম ভাল নেই।

প্লাস্টিকের প্যাকেটটা তুলে নিল কৃষ্ণজীবন। সে শাড়ি ভাল চেনে না। দোকানে গিয়ে বাঁশবনে ডোমকানা অবস্থা হয়েছিল তার। মস্ত দোকান, সেলসম্যান শাড়ির পর শাড়ি খুলে দেখাতে দেখাতে পাহাড় করে ফেলেছিল প্রায়। সে অবশেষে সেলসম্যানেরই সাহায্য চাইল অসহায়ভাবে। বহুকাল সে মাকে, বাবাকে, বোনদের, ভাইয়ের বউদের কিছুই দেয়নি। কাজেই মায়ের জন্য গরদ, বাবার জন্য খুব ভাল ধুতি আর বাফতার পাঞ্জাবির কাপড়, বোন আর ভাইয়ের বউদের জন্য পিওর সিল্ক কিনে এনেছে। ভাইপোদের কথা খেয়াল ছিল না। ওদের জন্য টাকা দিলেই হবে।

শাড়ি ধুতি গরদে মলিন বাড়িটা যেন ঝলমল করে উঠল। এমনকি দুশ্চিন্তায় সিঁটিয়ে থাকা রাঙার মুখে অবধি চওড়া হাসি দেখতে পেল কৃষ্ণজীবন। নির্বিকার বিষ্ণুপদ অবধি ধুতিটা পরখ করে দেখল খুব। বাড়িতে একটা হিল্লোল বয়ে গেল।

শাড়ি বুকে নিয়ে টিপ টিপ প্রণাম করল দুই বউ।

সরো আর বীণার শাড়িদুটো কী হবে মা? কৃষ্ণজীবন জিজ্ঞেস করে।

নয়নতারা বলে, রেখে যা। রেমো দিয়ে আসবেখন। বনগাঁয়ে অনেক লোক যায়। আর সরোর বর তো আসে-টাসে। ভাবিস না।

বামাচরণ খুশির গলায় বলল, ও আমিই পৌঁছে দিতে পারব।

কৃষ্ণজীবন মুড়ি আর চা খেয়ে উঠল। বলল, এখনও বেলা বিশেষ হয়নি। রেমোকে যদি কাছেপিঠে পেয়ে যাই তো নিয়ে আসছি। দেরি হলে তোমরা খেয়ে নিও।

রাঙা বলে উঠল, আপনি পটলকে সঙ্গে নিয়ে যান দাদা। ও চেনে সব।

পটল এক পায়ে খাড়া। জ্যাঠার সঙ্গ তার কাছে এক অলৌকিক অভিজ্ঞতা। জ্যাঠার সঙ্গে কথা কইলেই নাকি কত কী শেখা যায়।

বটতলা অবধি অবশ্য তেমন কথা হল না। জ্যাঠা হাঁটে যেন স্টিম ইঞ্জিনের মতো জোরে। তাল রাখতে পটলকে ছুটতে হচ্ছিল।

জ্যাঠা, তুমি কি ওইসব লোকের সঙ্গে কথা কইবে?

না বলে উপায় কি?

ওদের সবাই ভয় খায় কিন্তু।

কেন, কী করে ওরা?

খুন জখম করে, জুয়া খেলে, মদ খায়।

বাবাকে বারণ করতে পারিস না?

ও বাবা! যা মারবে তা হলে!

খুব মারে নাকি?

বম বম করে পেটায়! কিন্তু গোপাল তো দোষ করে না। গোপালকে কেন পেটায় বলো তো।

সত্যিই তো! ও তো বোবা মানুষ।

এমনিতে মারে না। কিন্তু মদ খেলে যেন খুন চাপে।

তুই এত রোগা হয়েছিস কেন?

আমি তো রোগাই।

বড্ড রোগা। স্বাস্থ্য ভাল করে ফেলতে পারিস না?

কিছুতেই হয় না। আমার অমনি চিমসে চেহারা, মা বলে!

বটতলা এখন বেশ জমজমাট জায়গা। দোকান-পাট, বাসের আড্ডা। এমন ছিল না। শীতলা মন্দিরটা ছিল। একটা বটগাছের তলায় হাট বসত সপ্তাহে দু'দিন। কত ফাঁকা ছিল। জঙ্গল ছিল।

আর কাউকে নয়, পঞ্চাকেই পাওয়া গেল চায়ের দোকানে। কালো বেঁটেমততা, দাড়িওলা একটা ছেলে। রাস্তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে একটা বেঞ্চে ঝুঁকে বসে আছে।

পটল চাপা গলায় বলে উঠল, জ্যাঠা, ওই পঞ্চা!

কৃষ্ণজীবন বলল, আয় তা হলে, ওকেই জিজ্ঞেস করি।

আশ্চর্যের বিষয় এই, কৃষ্ণজীবন কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই পঞ্চা টপ করে উঠে দাঁড়াল। মুখে বিগলিত হাসি, দাদা, কবে এলেন?

আজই সকালে।

অনেকদিন আসেননি বিষ্ণুপুরে!

না।

ভাল আছেন তো?

পটল নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। পঞ্চা হল এ অঞ্চলের ভয়ের লোক। কাউকে আমল দেয় না। জ্যাঠার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছে যেন গুরুদেব।

কৃষ্ণজীবন অবাক হল না। সে একে না চিনলেও এ গাঁয়ের সবাই তাকে চিনবে এটাই স্বাভাবিক। সে ছিল এ গাঁয়ের মুখ উজ্জ্বল-করা ছেলে। আজও তার কথা বলাবলি হয়। বিদ্যা সকলের থাকে না, কিন্তু বিদ্বানকে খাতির করে না এমন পাষণ্ডের সংখ্যা—ঈশ্বরের দয়ায়—এখনও কম।

একটা দুটো কথা বলে কৃষ্ণজীবন জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, রেমোটার খবর কিছু জানো? সে কাল থেকে বাড়ি ফেরেনি।

রামজীবন! কেন, সে তো কাল পিপুলপাতি গেছে।

পিপুলপাতি? এ দিকে বাড়িতে সবাই ভাবছে।

কী কাণ্ড দেখুন তো। খবর দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কার কাছ থেকে যেন টাকা আনতে যাওয়ার কথা বলছিল।

নাম বলেনি?

না। তবে পিপুলপাতি মাঝে মাঝে যায়।

এখন তো বাস পাবো না, না?

সকালের দিকে দুটো দক্ষিণে গিয়েছিল। তার মধ্যে একটা ফিরল একটু আগে। স্টেশনে যাবে, তারপর আবার ফিরবে। বর্ষার জন্য আরও তিনটে বাস বসে গেছে বলে এই অবস্থা।

বাসটা কখন ফিরবে?

ধরুন তা ঘণ্টাখানেক তো বটেই। বেশীও হতে পারে।

কৃষ্ণজীবন ঘড়ি দেখে নিল। সাড়ে দশটা বাজছে। হেঁটে গেলে সে চল্লিশ মিনিটে পিপুলপাতি পৌঁছে যাবে। অবশ্য গাঁয়ের লোকের দূরত্বের মাপ সম্পর্কে তার বিশ্বাস নেই। এ দেশের গাঁয়ের লোকের দুটি জিনিসের খুব অভাব। সময় আর দূরত্বের আন্দাজ।

পঞ্চা জিজ্ঞেস করল, যাবেন নাকি?

যাবো। ওর বউ খুব ভাবছে।

এসে যাবে ঠিক।

তবু একটু ঘুরেই আসি।

তা হলে এই মাঠ সোজাসুজি যান। রাস্তা আছে। পথ অনেক কম হবে। পাকা রাস্তায় গেলে সময় লেগে যাবে।

কৃষ্ণজীবনের আপত্তি হল না। সে পটলকে জিজ্ঞেস করল, যাবি?

মা তো তোমার সঙ্গে যেতেই বলেছে।

আসি হে পঞ্চা।

আসুন দাদা। আমার সঙ্গে দেখা হলে খবর দিয়ে দেবোখন যে আপনি এসেছেন।

তারপর খেতখামার আর কাদামাটির মধ্যে নেমে পড়ল কৃষ্ণজীবন।

বিষ্ণুপুর তোর কেমন লাগে রে পটল?

ভাল লাগে জ্যাঠা। খুব ভাল লাগে।

কেন ভাল লাগে বল তো! পটল ভাবিত হয়। কেন ভাল লাগে? সত্যিই তো! সে তো জানে বিষ্ণুপুরে তেমন কিছু নেই। এ নাকি গরিবদের জায়গা। কিন্তু তার তবু ভাল লাগে যে।

পটল বলল, এমনিতেই বেশ ভাল লাগে। মা আছে, ঠাকুমা আছে, গোপাল আছে, ইস্কুল আছে।

কলকাতায় ক'বার গেছিস?

দু-তিনবার হবে। তোমার বাড়িতেও তো গেছি জ্যাঠা, তোমার মনে নেই?

আমার সব মনে থাকে। সাততলার বারান্দায় রেলিং-এর ওপর উঠতে গিয়েছিলি বলে বকুনি দিয়েছিলাম।

হ্যাঁ গো! কী উঁচুতে তোমরা থাকো! ইচ্ছে করলে তো তোমরা উড়ন্ত ঘুড়ি ধরে ফেলতে পারো, না?

তা পারি।

ধরো না?

না। আমার কি আর তোর বয়স আছে?

আচ্ছা, ভূমিকম্প হলে বাড়িটা পড়ে যাবে না তো!

পড়তেও পারে। বিষ্ণুপুর ছেড়ে তোর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না?

খুব করে। যদি তোমার মতো লেখাপড়া শিখতে পারি তবে তো! শিখতে পারলে বিলেত যাবো।

এই যে বললি বিষ্ণুপুরকে ভালবাসিস, তা হলে বাইরে যাবি কেন?

এখানে কিছু নেই যে! কলেজ অবধি নেই।

একদিন হবে। গাঁয়ের দুঃখ কী জানিস? যারা ভাল কিছু করে তারা আর গাঁয়ে থাকে না। সবাই বলে, গাঁয়ে কিছু নেই।

তোমার কি বিষ্ণুপুর ভাল লাগে জ্যাঠা?

খুব লাগে। গাঁয়ে কিছু নেই, এ কথা ভাববি কেন? গাঁয়েই তো ভগবানের সম্পদ ছড়িয়ে আছে। গাছ আছে, মাটি আছে, মস্ত আকাশ আছে। আমি তো ভাবি, একদিন কলকাতা ছেড়ে গাঁয়ে চলে আসবো।

আসবে? বিস্মিত পটলের চোখ বিস্ফারিত হয়।

খুব ইচ্ছে করে।

তা হলে কী মজাই না হবে! তুমি এলে আর ছোট জ্যাঠায় আর বাবায় ঝগড়া হবে না, বাবাও মদ খেয়ে গোপালকে মারবে না, আমি তোমার কাছে কত কী শিখতে পারবো।

তুই আম্বেদকরের নাম শুনেছিস?

না তো! কে?

একজন পণ্ডিত লোক ছিল। সে বলেছে, আগে আমাদের গাঁগুলো ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বনির্ভর। মানে জানিস?

জানি।

ঠিক জানিস তো, নাকি ভয়ে বলছিস?

জানি জ্যাঠা। বইতে আছে।

ভাল। আগে আমাদের গ্রামগুলোতেই সব থাকত, কামার, কুমোর, তাঁতি, জোলা, জেলে, চাষা, কবিরাজ, সব।

গল্পের গন্ধ পেয়ে পটল বলল, হুঁ।

তারপর ইংরেজ এল, রাস্তাঘাট করল, আর বড় বড় কল বসাতে লাগল। গ্রামগুলো জুড়ে ছিল গোটা দেশটার অর্থনীতির সঙ্গে। কী হল তাতে জানিস?

না তো!

বড় বড় কলে কাপড় বোনা হতে লাগল, জিনিস তৈরী হতে লাগল, বিলেত থেকেও আসতে লাগল। তাতে কামারের ব্যবসা মার খেল, তাঁতি মাথায় হাত দিয়ে বসল। যে ছোট্ট গ্রামখানা একদিন ডগমগ করত তা হারিয়ে গেল বিরাট দেশের অর্থনীতির সঙ্গে একাকার হয়ে। তোর কি বুঝতে শক্ত লাগছে?

না। একটু একটু বুঝতে পারছি।

এখন একটুই বুঝে রাখ। বড় হয়ে ভাল করে বুঝবি। এই যে বিষ্ণুপুর, একে তো তুই ভালবাসিস!

খুব বাসি জ্যাঠা।

কী করলে বিষ্ণুপুরের ভাল হয় তা জানিস?

না তো!

ভাববি। খুব ভাববি। তোকে ভারতবর্ষ নিয়ে ভাবতে হবে না। শুধু বিষ্ণুপুরের যদি ভাল করতে পারিস তা হলেই হবে। ভাববি বিষ্ণুপুরের দারিদ্র ঘোচাবো, এখানে তাঁত বসাবো, কামারশালা বসাবো, বিষ্ণুপুরের মানুষের তৈরি জিনিসই শুধু বিষ্ণুপুরের মানুষ ব্যবহার করবে।

এখন যে সব মনোহারি জিনিস কলকাতা থেকে আসে!

আসবে। কিছু তো আসবেই। কিন্তু যা গাঁয়েই হয় তা বাইরে থেকে আনবি কেন?

তাতে ভাল হবে জ্যাঠা?

তাতেই ভাল হবে। কিন্তু হবে কিনা তা কে জানে! কিন্তু একবার যদি গাঁয়ের মানুষ সবাই মিলে ভাবে আর কাজে নেমে পড়ে তা হলে বেশ হত। পরের মুখ চেয়ে থাকতে হত না।

আম্বেদকর কি এই কথা বলেছেন?

বড় হয়ে পড়িস। বুঝবি। হ্যাঁ, আম্বেদকর বলেছেন। আরও সব বড় বড় লোক এখন বলছেন।

কী বলছেন জ্যাঠা?

বড় বড় কলকারখানা কমিয়ে দিতে। ধর যদি জাহাজও তৈরি করতে চাস তা হলে তার নানা অংশ তৈরি করার ভার দিয়ে দিলি ছোট ছোট সব কামারশালায়, ছোট ছোট কারিগরদের হাতে। সব যখন তৈরি হল তখন একটা জায়গায় এনে সেগুলো জুড়ে দিলি, এভাবে কত বড় কাজ হয়। কিন্তু এ দেশে তো সেরকম হল না। ইংরেজরা যন্ত্র আনল, আমরা আরও বড় যন্ত্র বানাতে লাগলাম। যন্ত্রে যন্ত্রে দুনিয়াটা ভরে গেল। বাতাস বিষিয়ে গেল। তেল ফুরিয়ে গেল, তোদের জন্য আর পৃথিবীটা তেমন সুন্দর রইল না। তুই বুঝতে পারছিস না, না?

পারছি জ্যাঠা। তুমি বলো না!

বিষ্ণুপুর খুব সুন্দর একটা গ্রাম। এটাকে খুব ভালবাসিস।

বাসিই তো জ্যাঠা।

শুধু ভালবাসলে হয় না। যাকে ভালবাসিস তার ভালর জন্য কিছু করতেও হয়। করবি?

করব জ্যাঠা। তুমি বলে দিও কি করতে হবে।

বলব। আমি সবাইকে শেখাতে চাই। সবাইকে বলতে চাই। কেউ শোনে না।

আমি শুনব।

পিপুলপাতিতে পৌঁছতে পাক্কা একটি ঘণ্টা লাগল তাদের।

ছোট গ্রাম। খোঁজখবর করতেই একজন চাষী বলল, রামজীবন? হ্যাঁ চিনি। ওই তো বিধুবাবুর বাড়িতে যাতায়াত। ওই সাদা পাকা বাড়ি।

বিধুবাবুর বাড়িতেই খোঁজ পাওয়া গেল। রামজীবন কাল রাতে থেকে গিয়েছিল। খুব জলঝড় হচ্ছিল বলে ফিরতে পারেনি। একটু আগে বেরিয়ে গেছে।

স্বস্তির শ্বাস ফেলল কৃষ্ণজীবন।

পটল!

কী জ্যাঠা?

হেঁটেই ফিরে যাই চল।

চলো না। আমি খুব হাঁটতে পারি।

সাইকেল চালাতে পারিস?

পটল সাইকেলের কথায় টগবগ করে ওঠে। আমি তো সাইকেলের রেস করি। বিষ্ণুপুরে কেউ আমার সঙ্গে পারে না।

সেই পুরনো সাইকেলটা?

হ্যাঁ। বড্ড পুরনো। ঝাঁ-কুরকুর শব্দ হয়।

তোর নতুন সাইকেল কিনতে ইচ্ছে করে।

করে তো।

তা হলে একটা কিনে নিস। আমি টাকা দিয়ে যাবো।

ইস্। না জ্যাঠা, তোমাকে দিতে হবে না।

লজ্জা পেলি নাকি?

পটল একগাল হেসে মাথা নামিয়ে বলে, তুমি কত দিলে সবাইকে, কত টাকা খরচ হয়ে গেল!

তোর বুঝি খুব টাকার হিসেব?

আমরা গরিব যে বড্ড।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কৃষ্ণজীবন বলে, তাও তুই ভাল আছিস। আমার মতো কষ্ট করতে হয়নি।

আমি শুনেছি জ্যাঠা, তুমি না খেয়ে স্কুলে যেতে।

রোজ নয়, মাঝে মাঝে। কষ্ট করা খুব ভাল। মানুষ কষ্ট করতে যত না চায় তত বেশী কষ্ট পায়। আমি একসময়ে পেট ভরে ভাত খেতে পেতাম না বলেই আজও ভাতে অমৃতের স্বাদ পাই। যারা রোজ ভালমন্দ খেয়ে বড় হয় তারা খাবারের স্বাদই পায় না। কথাটা বুঝলি?

তোমার কথা আমি সব বুঝতে পারি জ্যাঠা।

খুব ভাল। তুই ভাল ছেলে। পরীক্ষায় কিরকম নম্বর পাস?

মোটামুটি।

অঙ্কে?

পঞ্চাশ ষাট।

দূর বোকা। অঙ্কে পাবি নব্বই থেকে একশ। তবে না!

কেউ শেখায় না যে!

কারও দরকার নেই। শুধু ভাববি, আমি পারব। পারব পারব ভাবতে ভাবতে, বিশ্বাস করতে করতে পেরেও যাবি।

তুমি তাই করতে?

তাই তো। তবে যা পড়বি ভালবেসে পড়বি। যেন নিজের জন্য নয়, অন্যকে শেখানোর জন্য পড়ছিস। তাতে আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

জলে কাদায়, আঘাটা দিয়ে, নানা অচেনা পথে বিপথে এই যে ঘুরে বেড়াল কৃষ্ণজীবন এটা যেন তার ম্রিয়মাণ জীবনে সঞ্চার করে দিতে লাগল প্রাণশক্তি। সে একদিন ফিরে আসবেই প্রকৃতির কোলে।

তারা যখন ফিরল তখন দুপুর। রামজীবন ফিরে এসেছে। তবু বাড়িটা কেমন যেন হাসিখুশি নয়।

ক্লান্ত কৃষ্ণজীবন উঠোন পেরিয়ে দাওয়ায় উঠে মোড়ায় বসল। নয়নতারা একটা হাতপাখা নিয়ে কাছে বসে বাতাস করতে লাগল।

কত কী এনেছিস বাবা! এককাঁড়ি টাকা খরচ হল তো!

তাতে কি মা? কিছু তো দিই না।

দেওয়া তো আছেই। বেঁচে বর্তে থাক, তাতেই আমার হবে।

রেমোকে দেখছি না। কোথায় গেল?

আছে বাবা, দেখবি। আজকের দিনটা মায়ের কাছে থেকে যা না! মায়ে পোয়ে একসঙ্গে একটু গল্প করব। কেমন সাহেব-সাহেব চেহারা হয়ে গেছে তোর। চিনতে পারি না।

সাহেব-সাহেব! কী যে বলো মা!

সত্যি রে। অনেক ফর্সা আর কেমন যেন। আগে যেমন লালমুখো সাহেবদেব দেখতাম তেমনই।

রান্নাঘর থেকে খুব রান্নাবান্নার শব্দ আসছে। আয়োজন হচ্ছে বড় করেই বোধ হয়।

চানটা করে আয় বাবা।

পুকুরে যাবো।

না না, ও পুকুরের জল বড্ড পচে গেছে। কুয়োর জল তুলে দেবেখন পটল।

ঠিক এই সময়ে হঠাৎ ওপাশের ঘর থেকে রামজীবন বেরিয়ে এল। তারপর আর্তনাদ করে উঠল, দাদা!

কৃষ্ণজীবন রামজীবনের দিকে চেয়ে একটু হাসল, আয়।

রামজীবন দাওয়া থেকে লাফ দিয়ে পড়ে ছুটে এল। তারপর দড়াম করে পড়ল কৃষ্ণজীবনের পায়ে।

দাদা রে!

বলে পায়ে মাথা ঘষে কাঁদতে লাগল রামজীবন।

কৃষ্ণজীবন তুলতে গেল তাকে। শক্ত হাতেও পারল না।

করছিস কী রেমো?

আমাকে ক্ষমা কর দাদা। আমি কুলাঙ্গার। আমি মহাপাপী। আমি অচ্ছুৎ।

রামজীবন একবার মুখ তুলল। সত্যিকারের চোখের জলে তার মুখ ভেসে যাচ্ছে। তবে সেই চোখের জলের কতটা দাম তা কে বলবে? তার মুখ থেকে কাঁচা মদের গন্ধ আসছে ভকভক করে।

কৃষ্ণজীবন এইবার বোধ করল তার দীর্ঘ পথ যাওয়া আসার ব্যর্থ পরিশ্রম। আর ক্লান্তি। রামজীবন সম্পূর্ণ মাতাল।

৩২

মোহিনী অনেকদিন ধরে তাকে বলছে, চয়নদা আপনি বাবাকে একবার বলুন না, বাবা হয়তো আপনাকে একটা চাকরি দিতে পারে।

সে কখনও মোহিনীকে বা আর কাউকে মুখ ফুটে চাকরির কথা বলতে পারেনি আজও। কিন্তু তার দীনতা, দারিদ্র্য সবই বোধ হয় বিজ্ঞাপিত হয় তার পোশাকে, চেহারায়, আচরণে, চরিত্রে। তার খিদে পেলে মোহিনী ঠিক টের পায়, দৌড়ে গিয়ে মাকে বলে আসে। মোহিনীর মা এক মহান মহিলা। এ বাড়ি থেকে সে কদাচিৎ উপোসি ফিরে গেছে। এদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় সে নুয়ে থাকে।

মোহিনীর বাবা কৃষ্ণজীবনকে সামান্যমাত্র চেনে সে। ভদ্রলোক কলকাতায় কমই থাকেন। বছরে দু'বার তিনবার বিদেশে যান। তার ওপর আছে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় কনফারেন্স। সরকার এঁকে পরিবেশ বিষয়ক উপদেষ্টা নিয়োগ করেছেন। বিদেশে বড় চাকরির লোভনীয় প্রস্তাব আসছে। তিনি যেতে চাইছেন না। কিন্তু কতদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন বিদেশের আকর্ষণীয় আমন্ত্রণ? না, মোহিনীর বাবা হয়তো টাকার লোভে যাবেন না। কিন্তু মস্তিষ্কবান মানুষদের এদেশ ধরে রাখতে পারে কই? টাকার জন্য নয়, কাজের স্বাধীনতা, গবেষণার সুবিধা, অত্যাধুনিক সাজসরঞ্জাম ছাড়া উন্নত গবেষণা তো সম্ভব নয়। আর গবেষণার পিছনে অঢেল টাকা খরচ করার মতো তহবিলও তো এদেশের নেই। সুতরাং মোহিনীর বাবা কতদিন ঠেকিয়ে রাখবেন নিজেকে? চয়ন শুনেছে, তার বাবা সরকারকে যেসব প্রস্তাব দেন তার কোনওটাই কার্যকরী হয় না। কৃষ্ণজীবনবাবু সেই কারণেই কিছু ক্ষুব্ধ।

একদিন চয়ন মোহিনীকে বলেছিল, তোমার বাবা যদি বিদেশে চলে যান, তোমরাও তো তাঁর সঙ্গে চলে যাবে?

আমার তো যেতে একদম ইচ্ছে করে না। কিন্তু যেতে তো হবেই।

তোমাদের খুব মিস করব তাহলে। এত ভাল তোমরা!

মাস্টারমশাই, আপনার অঙ্কে যা মাথা, আর ইংরিজি যা ভাল জানেন, আপনি ইচ্ছে করলেই তো অনেক ডিগ্রি পেতে পারতেন।

মোহিনীর কিছু ঠিক নেই। কখনও ডাকে চয়নদা, কখনও মাস্টারমশাই। চয়ন ম্লান মুখ করে বলে, সকলের সব কিছু হয়ে ওঠে না। ওর জন্য দুঃখ করে লাভ নেই।

শরীরটা সারিয়ে নেন না কেন?

এপিলেপসি কি সারে?

তেমন করে চিকিৎসা করালে নিশ্চয়ই সারে।

তুমি জীবনের ভাল দিকগুলোকেই দেখতে পাও। এ খুব ভাল।

আপনি সবসময়ে কেন একটা হতাশার মধ্যে ডুবে থাকেন, মাস্টারমশাই?

চয়ন মাথা নেড়ে বলে, ঠিক হতাশা নয়। সম্পূর্ণ হতাশ হলে তো বেঁচে থাকাই কঠিন হত। মাঝে মাঝে মনে হয়, একটা কোনও অঘটন ঘটে আমার জীবনটা পাল্টে যাবে। বুঝেছো? অঘটনের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায় খুঁজে পাই না। কিন্তু মানুষের তো চান্স আর প্রোবাবিলিটি ফ্যাক্টরের ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। তার দাঁড়ানো উচিত পৌরুষ, আত্মবিশ্বাস আর কঠিন শ্রমের ওপর।

ওসব বড় শক্ত শক্ত কথা।

কাজটা আরও শক্ত। আমি পেরে উঠি না। যেন একটা গর্তের মধ্যে আছি, বেরোতে পারছি না। বেরোলেই পৃথিবীর আলো, হাওয়া, আনন্দকে ছোঁয়া যাবে। কেবল হাঁচোড়-পাঁচোড় করি।

হাঁচোড়-পাঁচোড় কথাটায় খুব হাসল মোহিনী। বলল, এমন ভাব করছেন যেন আপনি প্রতিবন্ধী।

অনেকটা তাই মোহিনী। হাত পা মগজ সব থেকেও কত মানুষ যে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছে এদেশে!

মাস্টারমশাই, আপনার কনফিডেন্স ভীষণ কম। একটা চাকরি-টাকরি যদি হয়, দেখবেন, আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে।

চাকরির ব্যাপারে মাঝে মাঝে তাকে খোঁচায় মোহিনী, বাবাকে বলুন। আমার বাবার অনেক ক্ষমতা।

কিন্তু ভয় পায় চয়ন। উনি যদি বিরক্ত হন। খুব গম্ভীর চিন্তাশীল মানুষ। ওসব মানুষের সঙ্গে আজেবাজে স্বার্থ নিয়ে কথা বলতে যাওয়া মানেই সিরিয়াস চিন্তার সূত্রকে ছিন্ন করে দেওয়া।

মোহিনী নিজেও তার বাবাকে একটু সমীহ করে চলে। তাই সে একদিন বোধ হয় তার মাকে বলেছিল। পরদিন মোহিনীর মা এসে বললেন, চয়ন, সত্যিই তো, তুমি একবার ওঁকে বললেই তো পারো।

চয়ন সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যে আজ্ঞে।

আমি ওঁকে একটু বুঝিয়ে বলে রাখবখন। এবার উনি বিদেশ থেকে ফিরলেই একবার বোলো। ওঁকে তো অনেক প্রোজেক্ট থেকে ডাকছে আজকাল। আর শোনো, সামনের মাস থেকে তুমি জিতুটাকেও পড়াও। এতদিন ওর স্কুল থেকে বলেছে যে, প্রাইভেট টিউশন যেন না নেয়। কিন্তু ক্লাস এইট থেকে এত পড়ার চাপ, অঙ্কে তেমন ভাল নম্বর পাচ্ছে না।

এই বদান্যতায় আরও বিনীত হয়ে পড়ে চয়ন। ভদ্রমহিলা অধ্যাপিকা, স্বামী অধ্যাপক। এঁদের ছেলেমেয়েদের ইচ্ছে করলে এঁরা নিজেরাই হয়তো পড়াতে পারেন। চয়নকে রাখা হয়েছে, চয়নের ধারণা, একজন গরীব মানুষকে সাহায্য করার জন্যই।

অবশেষে অবশ্য কৃষ্ণজীবনের মুখোমুখি একদিন হতেই হল তাকে। পড়াতে যেতেই মোহিনী বলল, চয়নদা আজ বাবার সঙ্গে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট। বাবা বেরিয়ে যাবেন, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। আসুন।

বিদ্বান ও যশস্বী মানুষটির মুখোমুখি হতে সঙ্কোচে মরে যাচ্ছিল চয়ন। গিয়ে দেখল, আদুর গা, লুঙ্গি পরা উদাসীন মুখের মানুষটি, যতটা না গম্ভীর, তার চেয়েও যেন বেশী বিষণ্ণ।

বোসো।

চয়ন সঙ্কোচে বসল। প্রাথমিক পরিচয়ের দরকার ছিল না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এই টিউশনির জন্য দরখাস্ত করেছিল চয়ন। তখন ইনি তার ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন।

তার দিকে একটু চেয়ে থেকে কৃষ্ণজীবন একটু হাসলেন, চাকরি চাও?

চমৎকার পেটানো স্বাস্থ্য আর সুদর্শন চেহারার মানুষটিকে হাসলে আরও চমৎকার দেখায়। বয়সের কোনও ছাপই পড়েনি চেহারায়।

চয়ন মৃদুস্বরে বলল, আপনাকে বিরক্ত করার ইচ্ছে ছিল না।

জানি। তুমি খুব লাজুক। আমিও তাই।

চয়ন মাথা নিচু করে থাকল।

কৃষ্ণজীবন তাঁর গম্ভীর গলায় বললেন, বাড়িতে কে কে আছে তোমার?

মা, দাদা আর বউদি।

বাবা নেই?

না।

মাকে কিরকম ভালবাসো? খুব?

একটু অবাক হয়ে চয়ন বলে, বাসি। ভালই বাসি।

কতটা ভালবাসো?

চয়ন অস্বস্তিতে পড়ে গিয়ে আমতা আমতা করে বলে, মা ছাড়া কেই বা আছে!

ওটা জবাব হল না। মা কারও কাছে বোঝা, কারও কাছে মাথার মণি। আজকাল মা-বাপকে ছেলেমেয়েরা তেমন ভালবাসতে পারে না। ফলে কাউকেই পারে না। এটা হল একটা পিকিউলিয়ার লাভলেসনেসের যুগ। লক্ষ করেছো ব্যাপারটা?

আজ্ঞে, আমি আর কতটুকু দেখেছি!

আজকাল মা বাপ মরলেও ছেলে তেমন কাঁদে না, কেন বলো তো!

চয়ন একটু ভেবে সংকোচের সঙ্গে বলল, আপনি বোধ হয় ঠিকই বলেছেন। আজকাল সেন্টিমেন্টটা যেন কিছু কমে গেছে।

সেটা কি ভাল?

না বোধ হয়। আমার মা কয়েকদিন আগে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। আমার তখন মনে হয়েছিল, মায়ের আর বেঁচে থাকার দরকার কী?

কেন ওরকম মনে হল তোমার?

মা বড্ড কষ্ট পাচ্ছে। শরীরে, মনে।

তোমার সংসারটা বোধ হয় সুখের নয়, না?

চয়ন মাথা নিচু করে রইল।

কৃষ্ণজীবন নামক জ্ঞানী মানুষটি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, সব সংসারই একটা অন্যটার কারবন কপি। কোনও সংসারই কেন পিসফুল নয় বলো তো! আন্ডারকারেন্ট, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ, ঘেন্না, জেলাসি। পরিবার থেকে ওটা ধীরে ধীরে সমাজেও সংক্রামিত হয়ে যায়, তাই না?

চয়ন চুপ করে থাকে। জ্ঞানী মানুষটি তাকে একটা চাকরি দিলেও দিতে পারেন, কিন্তু তার জন্য এই ভালবাসার ধাঁধা কেন? চয়ন বুঝে উঠতে পারল না।

তোমার দাদা মানুষটি কেমন?

ভাল।

বউদি?

ভাল।

জ্ঞানী মানুষটি হাসলেন। হেসে বললেন, ভাল হলে তো ভালই। কিন্তু তোমার মুখ দেখে মনে হয় তুমি খুব মানসিক প্রেশারে আছো। সত্যি বলছি?

চয়ন মৃদু মাথা নেড়ে জানাল, সত্যি।

কৃষ্ণজীবনবাবু আচমকা তাকে আর একটা বিপদে ফেলে দিয়ে বললেন, চাকরি চাও, না সাকসেসফুল হতে চাও?

চয়ন বুঝতে না পেরে বলে, আজ্ঞে?

অনেকে চাকরি পাওয়াটাকেই সাকসেস বলে মনে করে। তুমিও কি তাই মনে করো?

চয়ন খুব অপ্রতিভ হয়ে বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারি না। একটা চাকরি হলে আপাতত বেঁচে যাই।

সাকসেস কাকে বলে জানো?

ঠিক বুঝতে পারি না।

জ্ঞানী মানুষটি হঠাৎ যেন কেমন বিষণ্ণ আর গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, ইউনিভার্সিটির ভাল ভাল সব ছেলেও আজকাল চাকরির পরিধির বাইরে আর কিছু বুঝতে চায় না। চাকরি ছাড়াও যে সাকসেস বলে আর একটা ব্যাপার আছে, তা তারা বুঝতেই পারে না।

যে আজ্ঞে।

ধরো চাকরি হল না, খুব সামান্য আয়ে তোমার চলে, কিন্তু তোমার নৈতিক চরিত্র ভীষণ ভাল, চোর ছ্যাঁচোড় নও, নেশা ভাঙ করো না, পাঁচজনের দায়ে দফায় গিয়ে বুক দিয়ে সাহায্য করো এবং সবচেয়ে বড় কথা, যদি তুমি তোমার চারপাশের লোকজনকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতে পারো, সেটা কি সাকসেস নয়?

আজ্ঞে তা তো বটেই।

চাকরি করাটাও একটা কাজ। প্রয়োজনীয় কাজ। রুজি-রোজগারের জন্যই এর দরকার। কিন্তু আরও একধরনের কাজ আছে। সেটা হল ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। এমন কিছু লোককে দরকার, যারা রুজি-রোজগারের জন্য নয়, দুনিয়ার জন্য আদাজল খেয়ে লেগে যাবে। তুমি আরণ্যক উপন্যাসটা পড়েছো?

আজ্ঞে পড়েছিলাম।

ওতে কে যেন একটা মানুষের কথা ছিল, যে-লোকটা জঙ্গলে নতুন নতুন গাছ লাগিয়ে বেড়াত। জঙ্গলটা তার নিজের নয়, গাছ লাগালে তা থেকে কোনও লাভও হত না। তবু কেন লাগাত জানো? জঙ্গলটাকে সুন্দর দেখাবে বলে। ওইটেই হল ভালবাসা।

যে আজ্ঞে।

পারবে পৃথিবীটাকে ওরকম ভালবাসতে?

চয়ন এই জ্ঞানী মানুষটিকে কি করে বোঝাবে যে, পৃথিবীর সঙ্গে তার কোনও পরিচয়ই নেই। ভূগোলের ম্যাপ ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও চেহারা তার জানা নেই। কলকাতার বাইরে সে কদাচিৎ গেছে। তাও বাড়ি আর টিউশনির বাড়ি, নির্দিষ্ট প্রতিদিনকার যাতায়াতের পথের বাইরে এই কলকাতা শহরকেই বা সে কতটুকু চেনে? এই বিদ্বান, ভ্রমণশীল, বহুদর্শী মানুষটিকে সে কী করে বলবে যে, তার পরনির্ভর পরাবলম্বী জীবনে সে কেবলই গ্রহীতা মাত্র, দাতা নয়। প্রতিদিনকার লাঞ্ছনা, আত্মাবমাননা, নিজেকে নিয়ে হাজারো সমস্যায় জর্জরিত, তার পৃথিবীর জন্য কিছু করার সাধ্যই নেই। রাস্তার যে কোনও মানুষ, একজন ঠেলাওলা কি রিকশাওলাকেও সে হিংসে করে।

কিন্তু সে একথা বলতে পারল না। চুপ করে রইল।

জ্ঞানী মানুষটি তাঁর প্রগাঢ় কণ্ঠস্বরে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, কমপিউটার হ্যান্ডেল করতে পারো?

চয়ন সভয়ে বলল, আজ্ঞে না।

শিখে নিতে পারবে?

চয়ন দ্রুত মনে মনে হিসেব করে নিল। কমপিউটার শিখতে যে টাকা লাগে, তা কি তার টিউশনি থেকে বাঁচানো টাকায় সম্ভব? না। কোনও আশাই নেই।

দুঃখিতভাবে সে চুপ করে রইল।

জ্ঞানী মানুষটি বললেন, আমাকে একটা পি সি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কমপিউটারে ডাটা ভরবার জন্য একজন মানুষ চাই। একটু সায়েন্স জানা লোক। আমার তো সময় হয় না।

চয়ন ভাঙা বুক নিয়ে চোখ নামিয়ে রাখল। জবাব দিল না।

জ্ঞানী মানুষটি তার দিকে চেয়ে বললেন, শেখোনি, না?

আজ্ঞে না।

তোমার অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন কী তা জানি না। তবে শুনেছি তুমি অঙ্ক আর ইংরিজিতে খুবই ভাল। তাই কি?

কাজ চালিয়ে নিতে পারি।

যদি কলকাতা ছেড়ে বাইরে যেতে হয়, পারবে?

পারব।

মাকে কে দেখবে?

মা? বলে চয়ন চোখ তুলে জ্ঞানী মানুষটির দিকে তাকায়। উনি কিছু আন্দাজ করতে পারছেন? উনি কি তার সংসারের ভাগাভাগির কথা জানেন?

হ্যাঁ, মা। তাঁকে দাদা বউদি দেখবে?

হয়তো তা দেখবে।

হয়তো কেন? তুমি কি নিশ্চিত নও?

চয়ন আবার চুপ করে থাকে।

তোমাদের কি ভাগের মা?

চয়ন প্রমাদ গোনে।

জ্ঞানী মানুষটি হেসে ওঠেন, আরে লজ্জা কিসের? লজ্জা পাওয়ার দরকার নেই। গল্পটা মোটামুটি একই রকমের। তোমার মা, আমার মা, সব মা এখন ভাগের মা। এখন দেশও ভাগের মা, পৃথিবীও ভাগের মা। এ হল ভাগের যুগ।

যে আজ্ঞে।

টাইপ করতে পারো?

শিখেছিলাম। এখন বোধ হয় স্পীড কমে গেছে।

আর কী জানো?

আর! আর তো কিছু জানি না।

বয়স কত?

ঠিক হিসেব নেই। আঠাশ হতে পারে।

সার্টিফিকেট এজ কত? ওটাই দরকার।

ছাব্বিশ প্লাস।

টিউশনি করে কত পাও?

ছ'সাতশো টাকা হয়।

আরও বেশী হওয়ার কথা ছিল।

শরীরের জন্য বেশী পেরে উঠি না।

ওঃ, তোমার তো আবার ক্রনিক একটা ট্রাবল আছে।

যে আজ্ঞে।

তুমি আপাতত আমার মেয়েকে আর ছেলেকে পড়াতে থাকো। আমি শুনেছি তুমি ভাল টিউটর। কিন্তু আমার আরও কিন্তু জানবার আছে।

আজ্ঞে, বলুন।

জ্ঞানী মানুষটি হাসলেন। বললেন, প্রশ্ন করে সেটা হয়তো জানা যাবে না। কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই লুকোনো, অব্যবহৃত কিছু গুণ থেকে যায়। সে হয়তো সারা জীবন নিজের সেই গুণটার কথা জানতেই পারে না। গুণটা থেকেও নষ্ট হয়। তোমার ভিতর সেরকম কিছু আছে কিনা দেখতে হবে। তুমি জানো, তোমার সেরকম কিছু আছে কিনা?

আজ্ঞে না।

তুমি কি কথাটা বিশ্বাস করো?

আপনি যখন বলছেন তখন—

জ্ঞানী মানুষটি প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন, আমার একটা ছোট ভাই আছে, সে খুব মদ খায়, লেখাপড়া শেখেনি, খারাপ খারাপ কথা বলে। কিন্তু তার একটা সাঙ্ঘাতিক গুণ আছে। সে মা-বাবাকে ভীষণ ভালবাসে। বাবাকে পাকা বাড়িতে রাখবে বলে ধারকর্জ করে ঘর তুলছে। বাবা-মায়ের যা খেতে ইচ্ছে করে, এনে দেয়। তার অনেক বড় দোষ থাকলেও, ওই একটা গুণে এখনও সে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়নি। ওই ভালবাসা তাকে টগবগে চনমনে রাখে। ভালবাসার এই প্র্যাকটিক্যাল দিকটার কথা কেউ আজকাল ভাবে না, না?

চয়ন আবার চুপ।

জ্ঞানী মানুষটি তাঁর গ্রগাঢ় গলায় বললেন, লোকে কত ভালবাসার কথা বলে, কিন্তু ভালবাসা কাকে বলে তা তার জানাই নেই। প্রেমিক প্রেমিকারা কত ভালবাসার কথাটথা বলে ঘর বাঁধে, তারপর তাদের ঝগড়ার জ্বালায় বাড়িতে কাকপক্ষী বসতে পারে না। ভালবাসার গভীরতায় যেতেই পারে না তারা। বাবা-মা ছেলেমেয়েদের কত ভালবাসে বলো তো! ভাল করে অবজার্ভ কোরো, ওই ভালবাসার মধ্যে কতখানি স্বার্থপরতার ভেজাল মিশে আছে। ভালবাসতে গিয়ে সন্তানের মনুষ্যত্বটাকেই পঙ্গু করে দেয় তারা। যদি সত্যিই ছেলেকে কেউ ভালবাসে, তাহলে সেই ভালবাসার সূত্র ধরেই দুনিয়ার সব শিশুকেই সে ভালবাসতে বাধ্য।

যে আজ্ঞে।

শুধু আমাকে অন্ধভাবে সমর্থন করে যেও না। ব্যাপারটা আর একটু তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করো। ধরো, আমি আমার বাচ্চা ছেলেটাকে খুব ভালবাসি। সাধারণত আমরা সেই ভালবাসার জন্য কী করি? ছেলেকে এডুকেশন দিই, ক্যারিয়ার তৈরি করি, বিপদ-আপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করি, খারাপ সংসর্গে যাতে না পড়ে নজর রাখি, তাকে অঢেল খেলনা দিই, পোশাক দিই, প্রশ্রয় আর আদর দিই, তাই না?

ঠিকই তো!

অথচ ছেলেকে রেখে যাবো এমন একটা পৃথিবীতে যেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে ড্রাগ পেডলার, খুনে, ছিনতাইকারী থেকে শুরু করে আরও নানা বিপদ। ছেলেকে যদি সত্যিই ভালবাসি তাহলে দুনিয়াটাকেই সাফসুতরো করে রেখে যেতে পারলে নিশ্চিন্তে চোখ বোজা যেত। তাই না?

যে আজ্ঞে।

ছেলের মুখের হাসি অনাবিল করে তুলতে প্রকৃত ভালবাসে যে বাপ সে অন্য ছেলেদেরও মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলবে। নইলে কেবল আমার ছেলে, আমার ছেলে বলে হেঁদিয়ে মরলে তো হবে না।

যে আজ্ঞে।

জ্ঞানী মানুষটি মৃদু হেসে বললেন, আমি আগে খুব কম কথা বলতাম। অনেকে আমাকে বোবা বলে ভাবত। কিন্তু আজকাল এত কথা চলে আসে, যে মাঝে মাঝে আমি লজ্জিত হয়ে পড়ি।

চয়ন মৃদুস্বরে বলল, আপনি যা বলছেন তা অতি সত্য।

ব্যাপার কী, জানো, আজকাল আমার মনে হয়, কিছু কথা বলে না গেলে এগুলো অকথিতই থেকে যাবে। আমার কথা লোকে মানুক বা না-মানুক, উচ্চারণ করাটা দরকার ছিল।

যে আজ্ঞে।

তুমি ভালবাসার কথাটা মনে রেখো। যা কিছু দেখবে, যাকে দেখবে, তাকেই ভালবাসবার চেষ্টা কোরো। ভালবাসা মানেই কিন্তু ভাল করা। তার ভালর জন্য কিছু যদি না-ই করলে, তাহলে ভালবাসা বন্ধ্যা হয়ে গেল, মিথ্যে হয়ে গেল।

চয়ন জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ মানুষটির দিকে খানিকটা উদ্বেগ, খানিকটা বিস্ময় নিয়ে চেয়েছিল। ইনি বিজ্ঞানী, ইনি সারা দুনিয়ার বিশিষ্ট জ্ঞানীদের শ্রদ্ধার পাত্র, ইনি এসব নিয়ে ভাবেন কখন?

জ্ঞানী মানুষটি কিছু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, চাকরির জন্য ভেবো না। কিছু একটা হয়ে যাবে। তোমার ঘুমন্ত অভ্যন্তরে কী আছে তা খুঁজে দেখো। যদি কিছু পাও, আমাকে নিঃসঙ্কোচে বোলো। নিজেকে খুব কম

মানুষই বুঝতে পারে।

যে আজ্ঞে।

মানুষের একটা অনাবিষ্কৃত গুণ হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়ে তাকে চোখের পলকে বিশ্ববিখ্যাতও করে তুলতে পারে। কিন্তু আবিষ্কার হওয়াটাই হচ্ছে প্রথম কথা।

যে আজ্ঞে।

যখন টাকার দরকার হবে, আমাকে বা মোহিনীর মাকে বোলো। লজ্জা কোরো না। আমরা বড়লোক নই, কিন্তু তোমার কাছের মানুষ।

আজ্ঞে, মনে থাকবে।

জ্ঞানী মানুষটি একটি বড় শ্বাস ফেলে উঠলেন। উনি এখন বেরোবেন।

বিদায় নিয়ে মোহিনীকে এসে পড়াতে বসল সে।

মোহিনী চাপা গলায় বলল, কথা হল মাস্টারমশাই?

হল। মোহিনী, তোমার বাবা একজন গ্রেট ম্যান।

পিতৃগর্বে উজ্জ্বল হল মোহিনীর মুখ। সে বলল, কিসে বুঝলেন?

উনি একজন গভীর মানুষ। কত ভাবেন!

বাবাকে আমি খুব ভয় পাই। দূরের মানুষ তো! কিন্তু আমার বাবা যে ভীষণ ভাল তা আমি জানি।

ভাল বললে কিছুই বলা হয় না। ভালর চেয়েও অনেক বেশী কিছু।

চাকরির কথা কী হল?

চয়ন একটু হেসে বলে, ওঁর কথা শুনে আমার চাকরি করতেই আর ইচ্ছে হচ্ছে না।

ওমা! সে কী চয়নদা? এত বলে-কয়ে মাকে পটিয়ে বাবার সঙ্গে বসালাম যে আপনাকে!

চয়ন লজ্জার হাসি হেসে বলে, ভয় নেই। একটা চাকরি জুটিয়ে দেওয়া ওঁর পক্ষে শক্ত কাজ নয়। উনি সেটুকু করবেন। কিন্তু আমাকে উনি খুব প্রভাবিত করেছেন আজ।

তাই বলুন! বলে মোহিনী নিশ্চিন্ত হল।

তুমি তোমার বাবাকে কতটা চেনো মোহিনী?

সত্যি কথা বলব? মোহিনী মৃদু হেসে বলে।

বলো।

বাবাকে একদম চিনি না। বাবা এত ব্যস্ত! কাজে, চিন্তায় আর দুশ্চিন্তায় যে, বাবার কাছে ঘেঁষতেই পারি না। কখনো-সখনো একমাস দেড়মাসেও একটাও কথা হয় না।

বাবার কাছে চুপটি করে কখনও বসতে ইচ্ছে হয় না?

মাঝে মাঝে হয়। সাহস পাই না। সবসময়ে দেখি, বাবা কী নিয়ে যেন খুব টেনশনে আছেন। রাত জেগে বসে ভাবেন, পায়চারি করেন। মাঝে মাঝে ছাদে চলে যান। কখনও চুপ করে চোখ বুজে অনেকক্ষণ স্থির বসে থাকেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চয়ন বলে, ওরকমই হওয়ার কথা।

বাবা আমাদের কথা ভাবেন না। ভাবেন পৃথিবীর কথা, মহাকাশের কথা, ইনফিনিটির কথা।

তার মধ্যে তোমরাও আছো মোহিনী। সেই ভাবনার মধ্যে আমরা সবাই আছি।

৩৩

ছিনের মরার কথা ছিল না। রাতের শেষ বনগাঁ লোকাল চলে যাওয়ার পর স্টেশন চত্বরের একটু বাইরে তাকে রিকশা থেকে টেনে নামিয়ে চারটে লোক কচাকচ কেটে ফেলল। রক্তে ভাসাভাসি হয়ে গেল জায়গাটা। এটা হল মঙ্গলবারের কথা। শুক্রবার রাতে মরল দিলীপ। বীণাপাণির বাড়ির কাছাকাছিই ক্ষেতের মধ্যে শনিবার সকালে মাঠ-যাউন্তি লোকেরা তার লাশ দেখতে পায়। তিন টুকরো হয়ে পড়ে আছে। মাথাটা আলের ওপর আলগোছে বসানো। মুখে বীভৎস একখানা ভ্যাংচানি স্থির হয়ে আছে।

দুজনেই কাকার লোক। ছিনের বয়স উনিশ-কুড়ি। ডাকাবুকো। একটু বেশী মস্তানি করত। দিলীপের বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। কাকার টাকাপয়সার হিসেব রাখত। বিশ্বাসী। যেখানে খুন হল, তার একটু দূরেই তার বাড়ি। বাড়িতে বউ আর একটা বাচ্চা।

দুটো লাশই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখে এল নিমাই। এরা সব কাকার স্মাগলিং-এর লোক। যাত্রাদলের নয়। পাপা সিং-ই করাচ্ছে, সবাই জানে। পাপা সিং-এর একটা লোক খুন হয়েছিল, তার বদলে দুটো লাশ নামিয়ে দিল। কিন্তু এতেও শোধবোধ হল কিনা সেটাই বোঝা যাচ্ছে না।

নিমাই ভাবিত হয়ে পড়ল। তার চোখের সামনে সর্বদা দু-দুটো লাশের দৃশ্য ভাসে। খাওয়ায় বড় অরুচি হল। ঘুমটাও হতে চায় না। ছিনের লাশটা তাকে বেশী ঘাবড়ে দেয়। ছেলেটার গলা, পেট, বুক সব ফাঁক। আলো হাওয়া ঢুকে পড়ছে শরীরের ফুটো দিয়ে।

এ সব বুঝে উঠতে নিমাইয়ের ভারি কষ্ট হয়। মারকাট ব্যাপারটাই তার বুঝ-সমঝে আসতে চায় না। ঝগড়া কাজিয়া, দু' চার ঘা চড়-চাপড় অবধি ঠিক আছে। গালাগাল দাও, তাও না হয় সওয়া গেল। কিন্তু খুন জিনিসটা তার বোধবুদ্ধির চৌহদ্দিতে আসে না।

ছিনের বাবার একখানা ছোট দোকান আছে। বাজারের পিছন দিকটায়। ভাঙা কুঁড়ো ডাল, সস্তা চাল, খোল ভুসি, চিটে গুড়, নারকোলের দড়ি, তামাক, কিছু দশকর্মের জিনিস এইসব নিয়ে দোকান। গরিবগুর্বো সব খদ্দের তার। বিহারের লোক। নামটি রামপ্রসাদ। মাথায় একটু টাক আছে, রোগা পাকানো চেহারা। রামুর দোকানে মাঝে মাঝে গিয়ে বসে নিমাই। রামু বেশ খাতিরও করে তাকে। বসায়, নানারকম কথা হয় দু'জনে। বাড়ি থেকে ঠেকুয়া বা ছাতুর লাড়ু এনে খাওয়ায় ছট্ পরবে বা জন্মাষ্টমীতে। ভুট্টার খই খাইয়েছিল একদিন। কিন্তু আসল কথা হল, রামু লোকটা ভাল। নিমাইয়ের গান শুনে ভারি খুশি হয়, ভাবে বিভোর হয়ে যায়। বাঙালী না হলেও বাংলা ভালই জানে। ছিনে তার দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে। মাঝে মাঝে বলে, আমার এই তিন

নম্বর ছেলেটাই হারামি। ভক্ত গোছের, সরলসোজা রামুর সঙ্গে ইদানীং বড় ভাব হচ্ছিল নিমাইয়ের। বড় দুই ছেলের একজন দেশে, ক্ষেতি গেরস্থী দেখে, আর একজন তিনটে মোষ নিয়ে দুধের কারবার ফেঁদেছে এখানেই। এক বউ দেশে, আর একজন এখানে। ছিনেকে স্বভাবের জন্য কয়েকবার বাড়ি থেকে তাড়িয়েছে রামু। ইদানীং ছিনে আর বাড়ি আসছিল না। পয়সা হচ্ছিল, তালেবর হচ্ছিল। একটু-আধটু নেশাভাঙও শুরু করেছিল বোধ হয়। রামু দুশ্চিন্তা করত।

যা যুগটা পড়েছে, ছেলেপুলে হয়ে কোনও সুখ নেই। কোনটা পড়ল, কোনটা মরল, কোনটা গোল্লায় গেল এই নিয়ে সারাক্ষণ বুকের মধ্যে ডুগডুগি বাজে। তবু রামুর একটেরে দোকানটায় গিয়ে বসলে ছায়া-ছায়া অন্ধকার কাঁচা ঘরে নানা গন্ধের মিশেল দেওয়া বাতাস শ্বাসে টেনে একটা আরাম বোধ করে নিমাই। সব জায়গা সমান নয়। এক এক জায়গা যেন অন্যরকম। মনটা যেন বেশ স্থির হয়, ভাল হয়।

ছিনের জন্য বড় কেঁদেছে রামু। বড্ড কেঁদেছে। সেটা না হয় বোঝা গেল, বাপ হয়ে ছেলের জন্য কাঁদবে না তো কী! কিন্তু নিমাইয়ের নিজের ঘরেও কান্নার একটা ঢেউ উঠেছে। বীণাপাণি দুটো খবরেই কেঁদে ভাসাল। নিমাই যতদূর জানে, ছিনে বা দিলীপের সঙ্গে বীণার তেমন ভাবসাব থাকার কথাই নয়। মেয়েরা এমনিতেই একটু কাঁদে। কিন্তু সেটা একটুই। এতটা নয়।

দিলীপের খুন হওয়ার দিনটায় নিমাই বলে ফেলল, অত কাঁদছো কেন বলো তো! দিলীপের সঙ্গে মুখচেনা ছিল বই তো নয়! ছিনের বেলাতেও বড় কাঁদলে। হঠাৎ এত কান্নায় পেল কেন তোমায়?

বীণা গম্ভীর মুখে বলে, চেনা ছিল তো!

তা থাকলেই বা!

বীণা জবাব দিতে পারল না। গুম হয়ে বসে রইল।

আর কিছু বলতে তেমন সাহস হয়নি নিমাইয়ের। ইদানীং বীণার মেজাজটা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। কিন্তু কেন হচ্ছে, তা নিমাই শত ভেবেও বের করতে পারে না। সেই যে লালনের একখানা গান আছে, সে আর লালন একখানে রয় লক্ষ যোজন ফাঁক, এ হল সেই বৃত্তান্ত। এক ঘরে বসবাস, এক বিছানায় শোয়া, মন্ত্র-পড়া বউ, তবু যেন বনগাঁয়ে থেকেও বীণা বিলেতের মতো দূরে। সব সময়ে নয়। এক এক সময়ে তাকে বেশ চেনা মেয়ে বলে মনে হয়। হাসি-ঠাট্টাও করে, তরল কথাটথা হয়। আদর-সোহাগও যে হয় না, তা নয়।

খুন দুটো নিমাইয়ের মাথাতেও চেপে আছে গন্ধমাদন হয়ে। তবে তার শোক নয়, ভারি দুশ্চিন্তা হয়। ভয় হয়। অস্বস্তি হয়। সে খুনের ব্যাপারটা বোঝে না। ভগবানের দেওয়া মানুষের এই শরীরখানা, এখানার ওপর ছোরাছুরি চালায় আর একজন একইরকম শরীরওয়ালা লোক—এটা ভাবতেই তার ভারি অবাক লাগে।

সে বোকা বটে, কিন্তু যতটা লোকে তাকে ভাবে, ততটা নয়। এই যে খুনখারাপি হচ্ছে এতে কাকার পায়ের তলা থেকে মাটি সরছে। এটা সে বোঝে। সে বোঝে কাকা যদি দাঁড়িয়ে থাকতে না পারে তবে আর কারও না হোক, তাদের কপালে কষ্ট আছে। লোকটা দিলদরিয়া, টাকাকে খোলামকুচির সমান বিবেচনা করে। পালা যখন থাকে না তখনও দলের লোকদের দু'পাঁচশো করে মাইনে দেয়। টাকাটা বড় কম লাগে না তাতে। কলকাতার পেশাদার দলের মতোই বিশ্ববিজয়কে দাঁড় করানোর ইচ্ছে তার। কিন্তু এ যা শুরু হয়েছে, কাকার অবস্থা বিশেষ ভাল ঠেকছে না নিমাইয়ের।

কথাটা কাকাও বলে ফেলল রোববার বিকেলে। নিমাই গিয়ে বসেছিল কাকার বাজারের কাছের ঘরখানায়। ঘরে মেলা ভিড়, খুন দুটো নিয়েই নানা কথা হচ্ছিল। কাকা গুম মেরে ছিল সারাক্ষণ। বাজারে নানারকম কথা ওড়াউড়ি করছে। সবাই নানারকম বলে যাচ্ছে।

লোকজন সব গত হওয়ার পর কাকা আর সে রাত দশটা নাগাদ একসঙ্গে খানিকদূর এল। আর কেউ ছিল না সঙ্গে। কাকা হঠাৎ বলল, দলটা তুলে দিয়ে এবার বোধ হয় কলকাতাতেই সটকাতে হবে।

কাকার দুটো দল। একটা ষণ্ডা গুণ্ডাদের। আর একটা নটনটীদের। কোনটার কথা বলছে তা অবশ্য বুঝতে পারল না নিমাই। কলকাতায় সটকালে দুটো দলই উঠে যাবে। সে চুপ করে রইল।

কাকা বলল, শুধু নাটক আর পালা নিয়ে থাকব বলেই এখানে আসা। আর যত পাপতাপ সবই এর জন্য। কথাটা তুমি ভাল বুঝবে বলেই বলা।

নিমাই বলল, বুঝেছি।

একটা ভুল থেকে কত ফেঁসো বেরোলো দেখ। পগাকে খুন করাটাই মস্ত ভুল হয়েছে। তার পর থেকেই অশান্তি।

আপনার সময়টা খারাপ যাচ্ছে।

সময় ভাল আর পড়ল কবে? বরাবরই খারাপ।

নিমাই সন্তর্পণে বলল, পুলিশ কিছু করবে না?

পুলিশ! বলে কাকা একটু চুপ করে থেকে বলল, ওইজন্যই তো বলি, তুমি বড় ভালমানুষ। কোন রাজ্যে থাকো? পুলিশকে তো আমি এ বেলা কিনি তো ওরা ওবেলা কেনে। এ দেশে থানা পুলিশ নিলাম হয়, বুঝলে? যার দর যত বেশী ওঠে, পুলিশ গিয়ে তার কাছে স্বয়ংবরা হয়।

নিমাইকে যতটা বোকা ভাবে লোকে, সে ততটা নয়। পুলিশ সম্পর্কেও নিমাইয়ের কিছু জানা আছে। কথাটা এমনি বলার জন্যই বলে ফেলেছিল। এবার বলল, আপনি তাহলে কীই বা করতে পারেন।

বনগাঁ সেই আগের মতো তো আর নেই! পাল্টেছে। পাপা সিং টাকা ঢালছে। ছেলেছোকরাদের ভিড়িয়ে নিচ্ছে দলে। খুনটা যা দেখলে তার চেয়েও খারাপ জিনিস আছে। এরপর দলের ছেলেরা ভাগবে। তখন আরও বিপদ।

আপনি আর কিছু করতে পারেন না, না?

দুনিয়াতে আমি একটা জিনিসই পারি। তা হল যাত্রা-থিয়েটার আর অভিনয়। ওটাই আমার কাজ। আর যা করি তার খানিকটা পেটের দায়ে, খানিকটা যাত্রাদলের স্বার্থে।

এসব নিমাইয়ের শোনা। সে একখানা ভাওয়াইয়া গান শুনেছিল, ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে। কাকার অবস্থা এখন তাই। এ লোকটার জন্য মায়া হয় তার।

একখানা তত্ত্বকথা বলব কাকা?

বলো না! তোমার কথা আমার ভালই লাগে।

মনে রাখতে হয়, দুনিয়ার সবটুকুই আমার নয়, অন্যেরও ভাগ আছে। তেমনটাই ধরে নিন না।

ওটা কেমন কথা হল!

সোজা কথাই। এই যেমন আপনি আছেন, তেমনি পাপা সিংও আছে। সবাই ভাল হোক মন্দ হোক কিছু করে বাঁচবে। তাই না? তা ধরে নিন, সব লড়াইতে কিছু হার কিছু জিত আছেই। এক এক সময়ে হারটাকেও জিত বলে ধরতে হয়। নইলে কঠিন হবে।

কথাটা বড্ড ধোঁয়াটে হয়ে গেল।

আজ্ঞে, আমি কথাগুলোকে তেমন গুছিয়ে বলতে পারি না। ওইটেই আমার দোষ। থাক, ভেবেচিন্তে পরে একসময়ে বলবখন।

তা বোলো। তোমাকে বুদ্ধি পরামর্শ দিতে বলি না। সে সব বিষয়বুদ্ধি তোমার ঘটে নেই, জানি। তবে তোমার লাইনের কথাই যদি বলে যাও আমার খারাপ লাগবে না।

তা জানি। আপনিও ভাল লোক। কিছুদিন গা-ঢাকা দিলে হয় না!

হয়। সেইজন্যই কলকাতায় যাওয়ার কথা ভাবছি।

সেটা ভাল বিবেচনা করলে যাবেন।

আমাকে চিৎপুরের দল সবসময়েই ডাকে। মোটা মাইনে, খাতির-যত্ন সব পাই। কিন্তু তাতে আর মন লাগে না। আমি হলাম একটা যাত্রাদলের মালিক, এর স্বাদই আলাদা।

আজ্ঞে।

দিলীপের বিয়ে হল এই সেদিন। আমার ভরসায় বিয়ে করেছিল। সে ঠাণ্ডা লোক। নিজে কোনও বিপদের কাজে যেতে সাহস পেত না। তবে বিশ্বাসী ছিল খুব। দু' পাঁচ লাখ টাকা ফেলে দিয়েও নিশ্চিন্ত। দিলীপ গিয়ে আমার অনেক ক্ষতি হল। একটা কাজ করতে চাও?

কী বলুন না!

তুমি তো ধার্মিক মানুষ!

নিমাই লজ্জা পেয়ে বলে, কী যে বলেন আজ্ঞে। ধর্মটা করতে দেখলেন কখন!

দেখতে হয় না। মুখ দেখেই বোঝা যায়।

কাজটা কী?

দিলীপের কাজটা করবে?

বাপ রে!

ভয় পেলে নাকি?

ওটা পেরে উঠব না।

হাজার টাকা মাইনে পাবে। কাজ শুধু হিসেব রাখা আর বখরাটা গুনে ভাগ করে দেওয়া।

ওটি পারব না। মাপ করতে হচ্ছে।

পাপের টাকা বলে আপত্তি হচ্ছে তো! নিমাইচাঁদ, পাপের টাকাতেই জগৎসংসার চলছে।

নিমাই ভারি সংকুচিত হয়ে পড়ল। কথাটা বড় খাঁটি। কলিযুগে পাপের টাকার ছোঁয়াচ বাঁচানো শক্ত। ও শালা কলেরার মতো সবাইকে ধরে ফেলে। সে একটু সংকোচের সঙ্গে বলে, কথাটা কি জানেন! আমার ইচ্ছে হয় একটু আলগোছ হয়ে থাকি। সব কাজে মনটা সায় দেয় না। নইলে আমিই কি একটা খুব সাধু? আপনারা আমাকে ভাল দেখেন সে আপনাদের গুণ। আমার নয়।

বুঝেছি। তুমি ভাল।

নিমাই সবেগে মাথা নেড়ে বলে, ভাল কথাটা বলবেন না। বরং বলুন বোকা। আমি বোকা লোক। আজকাল ভাল হতে চাইলেই বোকা। বউয়ের পয়সায় খাই, বনের মোষ তাড়াই। মাঝে মধ্যে আবার ভাবি, বউ পয়সা পাচ্ছে কোত্থেকে? না যাত্রা থেকে। তা যাত্রায় পয়সা আসছে কোত্থেকে? না স্মাগলিং থেকে। তাহলে হরেদরে কাশ্যপ গোত্রই দাঁড়ায়। ও যদি পাপ হয়, তবে আমিও পাপের পয়সাতেই প্রতিপালন হচ্ছি। তাই না?

অন্ধকারে ভাল বোঝা গেল না, তবে কাকা বোধ হয় একটু হাসল। বলল, এই হচ্ছে তোমার লাইনের কথা। কাজের নয়, তবে শুনতে ভাল।

আজ্ঞে।

একটা কথা বলি নিমাই।

বলুন না!

তুমি না করো, কাজটা বীণা করুক। ওর হিসেব নিকেশের মাথা আছে। তোমার আপত্তি নেই তো?

বীণা কি আমার কথামতো চলে নাকি? তার ইচ্ছে হলে করবে।

তুমি একবার বলে দেখো।

আজ্ঞে বললেই রাজী হবে। তার অত শুচিবায়ু নেই।

ওকে আমার বেশ বিশ্বাস হয়। তেমন কিছু করতে হবে না। টাকাটা হেফাজতে রাখবে। প্রয়োজনমত দেবে একে ওকে। যেমন আমি বলব।

মেলা টাকা নাকি?

তা একটু বেশী তো বটেই।

আমার তো ভাঙা ঘর। চোরের লাথিতে বেড়া ভেঙে পড়বে।

টাকা আমার সিন্দুকে থাকবে। হিসেব রাখাটাই ওর কাজ।

বলব'খন।

কাকাকে বাড়ি অবধি এগিয়ে দিয়ে একা যখন আঁধার পথে বাড়ি ফিরছিল নিমাই তখনই ঠিক করেছিল, বীণাকে প্রস্তাবটা দিয়ে দরকার নেই। বীণার সব ভাল, কিন্তু দুর্বলচিত্ত। লোভ সামলাতে পারবে না।

বীণা সম্পর্কে কথাটা হঠাৎ কেন মনে হল, তা ঠিকঠাক বলতে পারবে না নিমাই। বীণাকে সে কখনও সেরকম কিছু করতে দেখেনি। তবু কথাটা মনে হল। সে প্রস্তাবটা বীণাকে না দিলেও কিছু নয়। কাকা হয়তো কালই বীণাকে নিজে থেকেই চাকরির প্রস্তাব দেবে। তখন?

বাড়ি ফিরে রাতে শোওয়ার সময় সে বলেই ফেলল, কাকা তোমাকে একটা কাজের কথা বলতে পারে। কাজটা নিও না।

কী কাজ?

যে কাজটা দিলীপ করত।

বলো কী! আমাকে কাকার অত বিশ্বাস হবে?

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কাজটা আমাকে দিতে চেয়েছিল। আমি রাজী হইনি। ও কাজ ভাল নয়।

কত মাইনে দেবে?

নিমাই নিস্তেজ গলায় বলে, তুমি কাজটা নেবে বলে ভাবছো নাকি?

তবে কি হাত-পা কোলে করে বসে থাকব? পুজোয় মোটে তিনটে না চারটে বায়না হয়েছে। অপেরার অবস্থা তো ভাল নয়। পেট চলবে কি করে?

তা বটে।

মাইনের কথা কিছু বলেনি?

বলেছে। হাজার টাকা।

ও বাবা! তা হলে তো চমৎকার প্রস্তাব। হ্যাঁ গো, এতেও তোমার গোমড়া মুখে হাসি ফুটছে না?

বড় ভয় পাই যে।

তুমি ধর্মভীরু মানুষ, বেশ কথা। কিন্তু ভেবে দেখ তো, আমি কি স্মাগলিং করতে যাচ্ছি? আমি তো শুধু হিসেব রাখব। টাকা পয়সা গুনে-গেঁথে তুলে রাখা এ তো আর কোনও পাপের কাজ নয়!

ও কথাটা ঠিক.হল না। যত সাদামাটা ভাবা যাচ্ছে ততটা সাদামাটা নয়। এতে করে তুমি কাকার স্মাগলিং-এর দলের লোক হয়ে যাচ্ছো। ওদের সঙ্গেই ওঠাবসা করতে হবে।

তা তো এমনিতেও হয়। কাকার দলের গুণ্ডারা কি আর ঘোমটা দিয়ে থাকে নাকি? পাগলু, বিশ্বনাথ, চারু ওরা তো স্মাগলিং করে আবার যাত্রাও করে।

তবু একটু ভেবে দেখো। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো।

শোনো গো যুধিষ্ঠির, আমাদের টাকার দরকার। টাকার গায়ে পাপ-পুণ্য ছাপ মারা থাকে না। আর যদি পাপ হয় তো আমার হবে, তোমার তো হবে না! তুমি আমার শালগ্রাম শিলাটি হয়ে থেকো। উঃ, হাজার টাকা মাইনে, শুনেই আমার গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

লোভে পড়লে বীণাপাণি! একটু ভাবো।

অনেক ভেবেছি। ভেবে ভেবে মাথা ঝাঁঝরা হয়ে গেল।

পাপ ছাড়াও কথা আছে। সেটা হল বিপদ-আপদ। পাপা সিং কাকার পিছনে লেগেছে দেখছো তো! দু-দুটো মার্ডার হয়ে গেল। এ সব মনে রেখে তবে কাজটা নেবে কিনা ঠিক কোরো।

বিপদের কথা বলছো! বিপদ তো আমাদের বন্ধু মানুষ। কবে বিপদ ছিল না আমাদের? তুমি এত ভগবান মানো আর এটা জানো না, আমাদের ভাল মন্দ যাই হোক ভগবান ভরসা। বিপদ হলে তিনি দেখবেন। জেনেশুনে তো আর পাপ করতে যাচ্ছি না।

তা বটে। তবে পাপের কাছ ঘেঁষেই বাস করতে হবে। আমার বড় ভয় করে।

বীণাপাণি তাকে জড়িয়ে ধরে একটু আদর করে বলে, তোমাকে আমার এইজন্যই মাঝে মাঝে বড় কতে ইচ্ছে হয়। তুমি এমনধারা কেন গো! সব সময়ে পাপের ভয়ে সিঁটিয়ে থাকো, জড়োসড়ো হয়ে থাকো! আচ্ছা একটু পাপ-টাপ না করলে পুণ্যির জোরটাই বুঝবে কি করে?

কত পাপ আপসে মাপ হয়ে যাচ্ছে। পায়ের তলায় পিঁপড়েও তো কত মরে। মশা মারতে ইচ্ছে যায় না, তবু দেখ, চুলকোতে গেলুম, আঙুলে লেগে পুচ করে একটা রক্তে টুপটুপে মশা মরে গেল। এরকম তো কত হয়।

উঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না আমি। পাপ-পাপ করতে করতে মাথাটা না খারাপ হয়ে যায়। ওগো, সেই কিসে যেন আছে না, একবার কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে, মানুষের সাধ্য নাই তত পাপ করে।

আছে। বোধহয় চৈতন্যচরিতামৃতে।

তাহলে? তুমি তো সারাদিনে কতবার হরির নাম করো, কৃষ্ণের নাম করো। তোমার কি আর পাপ থাকে? তুমি হলে গঙ্গাজল। যতই ময়লা ফেল গঙ্গাকে কি অপবিত্র করতে পারবে?

ও শুনলেও পাপ হয়। আমাকে সবাই সাধু ভাবে কেন বুঝি না! অত সাধু তো আমি নই।

নিমাইয়ের নাকটা আদর করে টিপে ধরে বীণাপাণি বলে, সাধু না, তুমি হলে একটি বিচ্ছু। তবে বিষ নেই।

তা বটে।

আমি যখন পাপ করব তখন তুমি কৃষ্ণনাম কোরো। তাহলে আমার পাপও কেটে যাবে। সাধুর বউয়ের পাপ হয় না।

নিমাই অন্ধকারে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বীণাপাণি বলল, ও কি? অত বড় দীর্ঘশ্বাসটা ফেললে কেন শুনি? কী এমন খারাপ কথাটা বললাম?

চাকরিটা কি সত্যিই নেবে বীণাপাণি?

তুমি ওরকম কোরো না তো। হাজারটা টাকা মাসে মাসে যদি হাতে আসে তাহলে কত কী করা যাবে! এবার তোমার দোকানটার কথাও ভাবতে হবে। একদিন যদি দোকানটা দাঁড়ায় তাহলে সব ছেড়েছুড়ে দেবো, দেখো।

কথাটা শুনতে সুন্দর, কিন্তু সত্য নয়। নিমাই জানে, বীণাপাণি ঘর গেরস্থালির মধ্যে নিজেকে আর আঁটিয়ে নিতে পারবে না। তা সেও সইবে নিমাইয়ের। কিন্তু কাকা যে চাকরির কথা বলছে তা যে বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে তাকে।

নিমাই খুব মৃদুস্বরে বলে, কি জানো বীণাপাণি, বেকার লোকদের কোনও মতামত থাকে না। সে হল খাঁচায় পোষা পাখি। যে দানাপানি দেয়, সে যা শেখাবে তাই বলতে হবে।

বীণাপাণি একটু চুপ করে থেকে ঝাঁঝালো গলায় বলে ওঠে, বলতে পারলে তুমি কথাটা? মুখে এল? তোমার জন্য এত করার পরও এই তার প্রতিদান?

নিমাই খুব করুণ গলায় বলে, রাগ কোরো না বীণাপাণি। তোমার রাগকে আমি বড় ভয় পাই। আমার অবস্থাটা কি তুমি বোঝো না?

খুব বুঝি। কিন্তু তুমি আহাম্মক বলেই তোমার সব কথা মেনে চলি না। কাকার তো স্যাঙাতের অভাব নেই। সবাইকে ছেড়ে কেন আমাকেই চাকরিটা দিতে চাইছে বলল! এটাকে ভগবানের আশীর্বাদ বলে ধরে নিতে পারছো না?

চাকরিটা কাকা আমাকেই দিতে চেয়েছিল প্রথমে। আমি রাজী হইনি বলে তোমার কথা তুলল।

ওই একই কথা।

কাকার ধারণা, আমি ধর্মভীরু লোক, টাকা এদিক ওদিক করব না।

আমিই কি তা করব?

তা বলিনি। আমি বলছি কাজটার বিপদ আছে, লোভ আছে, বিশ্বাস-অবিশ্বাস আছে।

থাকুক। বিপদের কাজগুলোও তো মানুষকেই করতে হয়, নাকি?

তা হয়। বলে নিমাই চুপ মেরে গেল।

দিন সাতেক বাদে এক সকালে নিমাই রামপ্রসাদের দোকানে বসে ছিল। দুনিয়াটা খুব অদ্ভুত। কত কী ঘটে যায়, কিন্তু জলে দাগ কাটার মতো মিলিয়েও যায়। রামপ্রসাদ একটু রোগা হয়েছে হয়তো, কিন্তু আর সবই ঠিক আছে। তাকে দেখে হাতজোড় করে বলল, রাম রাম নিমাইবাবু। বসুন।

মুখবাঁধা একটা ডালের বস্তার ওপর বসে পড়ল নিমাই। তেমনি ছায়া-ছায়া দোকানখানা, ভারি নিরিবিলি, তেমনই সব গন্ধের মিশেল দেওয়া বাতাস। নিমাই একখানা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কেমন আছেন রামপ্রসাদদাদা?

ছিনেটা চলে গিয়ে মনটা ভাল নেই দাদা। কাজ কারবারে মন ভি লাগে না।

সে তো ঠিক কথা। সময় লাগে। সময়ে সব ঠিক হয়ে যায়।

ওই শালা কাকা এক নম্বর বদমাশ লোক। কত ছেলেছোকরার সর্বনাশ করল। এখুন পাপা সিং যদি ওর কলিজাটা উখরে লেয় তো আমি খুশি হই।

নিমাই জানে বাজারে কাকার তত সুনাম নেই। সে মৃদুস্বরে বলে, পাপের ঠিকানা পাপই নিয়ে নেবে। আপনি আমি তো পেরে উঠব না।

ওটা ঠিক কথা। কিন্তু পাপা সিং কাকাকে ভি লিবে। দেখবেন।

নিমাই বসে বসে খানিকক্ষণ ভাবল। বীণাপাণি কাকার চাকরি এখনও শুরু করেনি। তবে এইবার করবে। কথা পাকা হয়ে গেছে। কাকা অবশ্য তাকে বলেছে, কাজটা তুমি নিলেই আমি বেশী খুশি হতাম নিমাই।

একটা লোক দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাল। তারপর রামপ্রসাদকে একটা ঠিকানা জিজ্ঞেস করল। নামটা শুনেই নিমাই একটু সচকিত হল। লোকটা তারই নাম বলছে যে!

নিমাই বস্তা থেকে নেমে এসে একটু আগু হতেই চিনতে পারল। মস্ত কুটুম। বীণাপাণির সেজদা রামজীবন।

আরে দাদা যে!

রামজীবন নিশ্চিন্তির শ্বাস ফেলে বলে, বাঁচা গেল। ভাবছিলাম কত না জানি খুঁজতে হবে!

চলুন, বাড়ি চলুন। রিকশা ডাকি।

বাড়ি আসতেই রামজীবনকে দেখে একদফা কেঁদে ভাসাল বীণা। এতদিনে মনে পড়ল আমাকে? আমি যে বেঁচে আছি তা জানিস তোরা?

রামজীবন যখন মদ খায় তখন একরকম, কিন্তু যখন খায় না তখন তার মতো ভালমানুষ নেই। বীণার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, কাঁদিস না! তোকে কি কেউ ভুলতে পারে? কত আদরের ছিলি। বড়দা এই কাপড় দিয়ে গেছে। দেখ খুলে।

বীণা হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা বুকে জড়িয়ে ধরল, বড়দা দিয়েছে?

এসেছিল হঠাৎ করে। সকলকে অনেক দিয়ে-থুয়ে গেল।

শাড়িটা খুলে মুখখানা আলো হয়ে গেল বীণাপাণির।

৩৪

স্কুলে এবং কলেজে বরাবর পরীক্ষায় সে একটা রচনার জন্য অপেক্ষা করেছে। তোমার প্রিয় ঋতু। রচনাটা কোনওকালেই আসেনি, এলে মণীশ যা লিখত তাতে নম্বর পাওয়া যেত কিনা তা সে জানে না, তবে একটা পুরো খাতা বোধ হয় শেষ করে ফেলত রচনা দিয়েই। শরৎকাল তাকে পাগল করে দেয়, যৌবন ফিরিয়ে আনে, শৈশব এসে হাত ধরে। লোকে বসন্তের গুণগান যে কেন করে তা বুঝে উঠতে পারে না সে। কালিদাসও করেছিল। আচ্ছা ছানিপড়া চোখ বাবা, এমন শরৎ ঋতুর কাছে কি বসন্ত লাগে? বসন্তের বিরুদ্ধে তার কোনও নালিশ নেই। কিন্তু শরৎ সবার উর্ধ্বে। চির শরতের কোনও দেশ থাকলে মণীশ সেখানকার সিটিজেনশীপ নিয়ে ফেলত।

আজ যখন তার দুই মেয়ে আর এক ছেলের মা অপর্ণা সকালবেলায় জানালা খুলে দিল তখন ঘুমচোখ বুজে থেকেই সে অনুভব করতে পারল শরৎ ঋতুকে।

অপু!

বলো।

আমি যেন শরৎ ঋতুতে মরি।

মা গো! সকালে উঠেই মরণের কথা মুখে এল? তুমি কী গো?

মণীশ উঠে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। ডাকল, অপু, আমার কাছে এসো, এখানে দাঁড়াও।

অপর্ণা বিছানাটা দ্রুত হাতে পাট করছিল। বলল, আসছি।

এক্ষুনি।

অপর্ণা এল। পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল, কী গো?

এই শরৎকালকে কেমন লাগে বলো তো তোমার?

আহা, কেমন আবার লাগবে! আমি কি তোমার মতো ভাবের মানুষ? ঋতু কোথা দিয়ে চলে যায় টেরই পাই না।

বেশ বেরসিক আছে কিন্তু। পৃথিবীটাকে কেন অনুভব করো না বলল তো?

আমাকে অনুভব করার মতো অবস্থায় রেখেছে কিনা! যা খেলা দেখালে কয়েকদিন। ভয়ে আধমরা হয়ে ছিলাম।

তুমি এখনও শকটা কাটিয়ে উঠতে পারোনি, না? কেন অপু? বিপদ-আপদ তো আসতেই পারে।

তুমি তো জানো না, তুমি কতখানি জুড়ে আছে আমার ভিতরটা। আমাদের তুমি ছাড়া আর কী আছে বলো।

মণীশ হাসল, বলল, এটা তো ভালবাসার কথাই অপু। কিন্তু একটু স্বার্থপরতার গন্ধ আছে তোমার জগতে মোট চারজন লোক। আমি, বুবকা, ঝুমকি আর অনু। তার বাইরে আর কেউ নেই, না?

একটু গম্ভীর হতে গিয়েও অপর্ণা হাসল, এই বুঝি আমাকে চিনেছো? তুমি কি ভাবো আমি আর কারও জন্য চিন্তা করি না?

করো? তাহলে তোমার ভালবাসার একটু কণা আজ এই শরৎ ঋতুকেও দাও। কলকাতায় প্রকৃতি নেই, তবু দেখ, রোদে কী এক অদ্ভুত সোনার মতো রং। আকাশ কী রকম অলৌকিক নীল!

অপর্ণা মুখ তুলে দীর্ঘকায় মণীশের দিকে চেয়ে বলে, প্রকৃতি দেখতে চাও? তাহলে চলো রবিবার আমাদের জমিটা দেখে আসি। কত গাছপালা আপনা থেকেই হয়েছে। আমার লাগানো গাছগুলো কুটিপাটি হচ্ছে ফুলে। চুরি হয়ে হয়েও রাশি রাশি শিউলি ফুল ছড়িয়ে থাকে ঘাসে।

ওঃ, তোমার সেই কৃপণের চার কাঠা জমি?

মোটেই কৃপণের জমি নয়। সস্তায় কিনেছি বলে কি দোষ হয়েছে? একদিন দেখো ওই চার কাঠার কী দাম হয়।

তোমাকে নিয়ে আর পারি না। সব জিনিসেরই দামটাই কেন তোমার মনে আসে? এই যে শরতের দারুণ মোহময় একটা সকাল এর কি কোনও দাম হয়?

তোমার হল ফটোগ্রাফারের চোখ। তোমার মতো করে কি সব কিছু আমি দেখতে পাই?

না অপু, এই যে আলোটা, এই যে চারদিকের বাতাবরণে একটা ম্যাজিক্যাল চেঞ্জ, কোনও ফটোগ্রাফারের সাধ্য নেই তা ছবিতে ফুটিয়ে তোলে। কোনও মহৎ শিল্পীও পারে না, কবিও পারে না, কেউ পারে না। যে পারে সে ওই প্রকৃতি। তার মতো আর্টিস্ট আর কে আছে বলো!

একটা পাগলকে নিয়ে আমার ঘর। উঃ, শরৎকাল আমারও ভাল লাগে বাপু, তা বলে তোমার মতো পাগল হয়ে যাই না।

কেন হও না অপু? কিছুতেই কেন কখনও তুমি পাগল হও না?

অপর্ণা হেসে ফেলল, বলল, বাড়িতে একটা পাগলই কি যথেষ্ট নয়? পাগল বাড়লে সংসারটা কি চলবে? তবে ভেবো না, তোমার পাগলামির অনেকটাই তোমার ছেলেমেয়েরাও পেয়েছে।

খুব ভাল অপু। সবাই মিলে তোমাকেও একটু পাগল করব এবার থেকে।

করতে হবে না। পাগল হতে আর বাকিই বা কী? শোনো, আজ অফিসে জয়েন করবে মনে রেখো, নটা পনেরোতে পুল কার চলে আসবে। তৈরি হতে থাকো। বাথরুমে ঢুকলে তো চল্লিশ মিনিট।

মণীশ হতাশায় মাথা নেড়ে বলে, নাঃ, তোমাকে পাগল করা যাবে না অপু। ইউ আর এ স্টাবোর্ন পারসন।

মণীশ বাথরুমে গেল।

অপর্ণা ধীর পায়ে মণীশের ঘর ছেড়ে ঢুকল বুবকার ঘরে। ছেলেটা পাশ-বালিশ আঁকড়ে ধরে গভীর ঘুমে ঢলে আছে। মাথাটা বালিশ থেকে পড়ে গেছে নিচে। অপর্ণা ছেলের ঘুমন্ত মুখের দিকে একটু চেয়ে থাকে। ওপরের ঠোঁটের সীমানায় কোমল গোঁফ। গালে সামান্য দাড়ি, এখনও শেভ করতে শুরু করেনি। এবার

করবে। আদরের কোলের ছেলেটা বড় হল। হোক। অপর্ণার চিন্তা অন্য জায়গায়। বোকা ছেলেটা স্কুলের বাইরে সেদিন মারপিট করে এসেছে। ড্রাগ বিক্রি করে যারা তাদের সঙ্গে। এ সব কি ভাল? আপাই বা কেন ওসব ষণ্ডাগুণ্ডাদের পিছনে লাগতে গিয়েছিল? যদি এবার তারা উল্টে মারে? যদি মেরেই ফেলে? অপর্ণার জীবনে এইসব কারণেই কোনও শান্তি নেই।

ঘটনাটা সে মণীশকে বলেনি। মণীশ আকণ্ঠ ভালবাসে ছেলেকে। শুনলে টেনশন হবে।

বুবকাকে খুব বকেছিল অপর্ণা সব শুনে। বুবকা তাকে এখনও সব কথা বলে। বকুনির পর বুবকা অবোধ শিশুর মতো জিজ্ঞেস করল, তাহলে কি করা উচিত ছিল মা? আপাকে ওরা যে মারছিল! আমার কি চুপচাপ চলে আসা ভাল হত?

অপর্ণা এ প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিতে পারেনি। শুধু বলেছিল, তোমাদের উচিত ছিল আপাকে জোর করে আটকানো, ওর এত সাহস কেন?

সাহসের জন্যই তো আপা হল আপা। আমরা কেউ আপার মতো নই কেন মা?

ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে অপর্ণা বলল, আজকাল দিন ভাল নয় বাবা, গুণ্ডারা বোমা মারে, পিস্তল চালায়, ছোরা বসিয়ে দেয়। আমি বড় ভয় পাই, তুই বরং ওই ইস্কুল ছেড়ে দে।

তুমি একদম পাগলী আছে। স্কুল ছাড়ব কেন? আমরাও পাল্টা গুণ্ডামি করব।

অপর্ণা অবাক হয়ে বলে, গুণ্ডামি করবি? ও কথা বলতে আছে?

ভেবে দেখেছি মা, গুণ্ডামি ছাড়া কিছু করার নেই। আমরা অলরেডি স্কুলে একটা প্রতিরোধ বাহিনী তৈরি করেছি।

আতঙ্কিত অপর্ণা বলল, না বাবা, না। তুমি ওসবের মধ্যে থেকো না। আমি আপাকেও বলব তো। ও কেন এই গণ্ডগোল পাকাল!

আপা কিছু খারাপ তো করেনি মা!

করেছে। ও তুমি বুঝবে না। ওকে আসতে বলিস তো!

বুবকা হাসল, আপা আমাদের সঙ্গে রাগ করে কথাই বলে না। ও বলছে আমরা নাকি ওর মিশনটাই নষ্ট করে দিয়েছি। আপাটা একটা ভূত।

কিছুক্ষণ বুবকার শান্ত মুখখানার দিকে চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে এল অপর্ণা। অনেক কাজ। মণীশ আজ প্রথম অফিসে যাচ্ছে দীর্ঘ ছুটির পর।

মণীশ স্নান করে যখন তৈরি হয়ে এসে টেবিলে বসল তখন তাকে খাবার বেড়ে দিতে দিতে অপর্ণা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, আপা মেয়েটাকে তোমার কেমন লাগে বলো তো!

আপা! শী ইজ এ ক্লাস বাই হারসেল্ফ্। কেন?

এমনিই। জানো, ও নাকি ওদের স্কুলে কয়েকজন ড্রাগ অ্যাডিক্টকে ধরেছে। তাদের বাঁচাতে ড্রাগ পেডলাররা এসে আপাকে অ্যাটাক করেছিল।

মণীশ বিস্মিত মুখে বলে, সর্বনাশ! কবে?

কয়েকদিন আগে।

তারপর?

স্কুলের ছেলেরা গিয়ে পেডলারদের মেরে তাড়ায়।

দ্যাটস গুড। তাড়াল কেন? মেরে আধমরা করে পুলিশে দেওয়া উচিত ছিল। এমন কি মেরে ফেললেও ক্ষতি ছিল না। দে ডিজার্ভ ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট।

ছেলেদের দলে যে বুকাটাও ছিল।

ছিল? আই ফিল প্রাউড ফর হিম। দরকার হলে আমাকেও দলে নিতে পারে।

তুমি মারপিট করবে?

আলবাৎ। এক সময়ে আমি সেন্ট্রাল ক্যালকাটায় অলিতে গলিতে মারপিট করতাম। সিনেমা হল-এ, বাসে, ময়দানের খেলার লাইনে।

ওঃ, তাই বললা। সেইজন্যই ছেলে সেটা পেয়েছে।

কেন, তুমি কি জাননা না নাকি?

জানি। তবে মনে ছিল না।

শান্ত গৃহস্থ হয়ে গেছি সখি, কিন্তু ভিতরে এখনও আগুনটা নিবে যায়নি। খুঁচিয়ে তুললে আবার গনগনে আঁচ উঠবে।

তুমি ছেলেকে সাপোর্ট করছো?

একটু করছি। তবে আহাম্মকি বা গোঁয়ার্তুমি ভাল নয়। ড্রাগ পেডলাররা অর্গানাইজড ক্রিমিন্যালস। ওদের সঙ্গে লাগতে গেলে নিজেদেরও অর্গানাইজড হতে হবে।

শোনো, আমি বলি কি, বুবকার স্কুলটা চেঞ্জ করে দাও।

কেন বলো তো! এত ভাল স্কুল!

বিপদ হতে কতক্ষণ?

শোনো অপু, আমি কিন্তু কোনওদিন ভয়টয় পাইনি। তোমাকে উদ্ধার করেছিলাম পুলিশের গুলির মুখে দাঁড়িয়ে। মনে আছে?

ওগো, ওসব কথা ভুলে যাও। বুবকা আমার একটা মাত্র ছেলে।

বুবকা আমারও একটা মাত্র ছেলে।

তাও ওকথা বলছ?

মণীশ শান্ত গলায় বলে, ভয় পেও না অপু। পুলিশের এক বড় কর্তা আমার বিশেষ বন্ধু। তাকে আজই একবার লালবাজারে ফোন করব। আমি যখন ফ্রিল্যান্স ফটো জার্নালিস্ট ছিলাম তখন থেকে বন্ধু।

কে বলল তো!

বিনয় মিত্র। তুমি চিনবে না। নর্থ বেঙ্গলের ছেলে। স্পোর্টসম্যান ছিল। সে অ্যাকসন ভালবাসে।

উঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না। পুলিশ কি আজকাল কিছু করতে পারে? অর্গানাইজড ক্রাইমের কথা তো তুমিই বললে। যারা অর্গানাইজড তারা কি পুলিশকে ভয় পায়? পুলিশ তো তাদেরই লোক হয়ে যায়।

এ লোকটা পারচেজেবল নয়। অন্তত তিনচার বছর আগেও ছিল না।

দোহাই তোমার, এর মধ্যে পুলিশকে টেনে এনো না। তাহলে ভিমরুলের চাকে ঢিল মারা হবে।

মণীশ একটু হাসল। বলল, মন্দ বলোনি। আমার চেয়ে তোমার প্র্যাকটিক্যাল বুদ্ধি বরাবর বেশি ছিল। আচ্ছা, বুবকাকে আমি একটু সাবধান করে দেবোখন।

এখনই দাও। আমি ওকে ডাকছি।

আচ্ছা বাবা, আচ্ছা।

বুবকা এল। ঘুম-চোখে বাবার কাছটিতে এসে দাঁড়িয়ে অনেকটা শিশুর মতোই বলল, কি বাবা?

বোস। কী হয়েছে, ব্রিফলি বল তো!

ইস্কুলের ব্যাপারটা? নাথিং মাচ।

মারপিট করেছিস?

একটা লোককে হকি স্টিক দিয়ে মেরেছি।

খুব জোরে মেরেছিস?

খুব জোরে। লোকটা খোঁড়াচ্ছিল।

আমি হলে মাথায় মারতাম। অজ্ঞান করে দিতাম।

আমি এই প্রথম একজনকে মারলাম বাবা, অ্যান্ড আই এনজয়েড ইট।

আই নো। কিন্তু একটা কথা।

কী কথা বাবা?

মারপিট একবার শুরু হলে সহজে থামে না। আজ মেরেছো, কাল কিন্তু মার খেতে হবে। আর ইউ রেডি ফর দ্যাট?

হ্যাঁ বাবা। আমরা এখন স্কুলের চারদিকে নজর রাখি। দল বেঁধে বেরোই।

কখনও একা বেরোবে না।

কিন্তু টিউটোরিয়াল থাকলে? তখন তো সব বন্ধুকে পাওয়া যাবে না।

তাহলে প্রবলেম। আমি কিন্তু ভয় পাই না। মা ভয় পায়।

ভয় পাওয়া ভাল নয়। তবে বিচক্ষণ হওয়া ভাল। স্কুলের অথরিটি কী করছে?

কি করবে? তারা তো আর মারপিট হলে ঠেকাতে পারবে না।

তুই আমাকে ভাবিয়ে তুললি। মুশকিল কি জানিস, এ দেশে বাস করে কয়েক কোটি ভেড়া আর কয়েকটা বাঘ। এক লক্ষ ভেড়াও একটা বাঘ দেখলে পালায়। তোকে রাস্তায় যদি গুণ্ডারা মারে রাস্তার অন্য লোকেরা মুখ ফিরিয়ে পালাবে।

বুবকা হাসল, আমি কিন্তু ভেড়া নই।

সেটা বুঝতে পারছি। কিন্তু তুই ভেড়ুয়া হলেই তোর মা বেশি নিশ্চিন্তে থাকতে পারত।

অপর্ণা চোখ বড় বড় করে দুজনের কথোপকথন শুনছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আচ্ছা, তুমি কী গো? কোথায় তোমাকে বললাম ওকে একটু বুঝিয়ে বলতে যাতে বিপদের মধ্যে না যায়, আর তুমি ওকে গুণ্ডামি করতেই উৎসাহ দিচ্ছো?

মণীশ অপর্ণার দিকে ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে বলল, দুনিয়াটা তো ওরও। বিপদ-আপদের মধ্যেই ওকে বেঁচে থাকতে হবে। আমরা যেমন করে শেখাবো সেরকম শিখলে ওর হয়তো চলবে না। দুনিয়াটা পাল্টে যাচ্ছে

অপু।

দুনিয়ার অনেক কিছু পাল্টায়, কিন্তু অনেক কিছু আবার কোনওদিনই পাল্টায় না। সেটা হল মা আর ছেলের সম্পর্ক। বুঝলে? আরও একটা জিনিস পাল্টায় না, সেটা হল গুণ্ডামি করাটা যে খারাপ সেই বোধটা।

মণীশ ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলে, ঠিক আছে বুকাবাবু, আপনি আর মারপিটের মধ্যে যাবেন না। লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকবেন।

বুবকা শিশুর মতো মুখ করে মায়ের দিকে চেয়ে বলে, মা, তুমি তো দেখনি যখন গুণ্ডারা আপাকে মারছিল। যদি দেখতে তাহলে তুমিও হকি স্টিক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে। আপা একটা রোগা ভাল মেয়ে, তাকে ওরকম মারতে পারে কোনও মানুষ? আর কী সব খারাপ গালাগাল করছিল!

অপর্ণা আদর মাখানো গলায় বলে, আচ্ছা, তুই বল তো, আমি কি গুণ্ডাদের সাপোর্ট করছি? আপাকে মারা তো খুবই খারাপ হয়েছে। কিন্তু তোরা ওদের সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠবি না। ওরা খুনে।

বুবকা ফের তার সরল মুখখানা তুলে বলল, মা, ব্যাপারটা আরও খারাপ। ওরা শুধু গুণ্ডা নয়, ওরা ছেলেদের ড্রাগ ধরিয়ে দিচ্ছে। আমাদের স্কুলের কত ছেলে ড্রাগ নিচ্ছে জানো? ওদের কি নন-ডায়োলেন্স দিয়ে ঠেকানো যায়?

অপর্ণা ঝাঁঝালো গলায় বলে, তার জন্য পুলিশ আছে। তোমাদের কী দরকার আইন হাতে নেওয়ার?

আমরা জাস্ট রেজিস্ট করছি। এটা আমাদের প্রোটেস্ট। পুলিশ যতক্ষণ না অ্যাকশন নিচ্ছে ততক্ষণ তো নিজেদের প্রোটেক্ট করতে হবে।

পুলিশ কি অ্যাকশন নেয়নি?

নিয়েছে। পরশু থেকে দেখছি, পুলিশ পোস্টিং হয়েছে। কয়েকজনকে আশপাশের গলি থেকে ধরে নিয়ে গেছে।

তাহলে?

তাহলে কী মা? প্রিন্সিপালকে কারা যেন ফোন করে ভয় দেখাচ্ছে, পুলিশ কেস উইথড্র করতে বলছে।

অপর্ণা কাঁদো কাঁদো হয়ে মণীশের দিকে চেয়ে বলল, শুনলে? হুমকি দিচ্ছে। এবার ঠিক বুবককে মারবে।

অত সোজা নয় মা। আমাদের অনেকের গার্জিয়ানই খুব ইনফ্লুয়েনসিয়াল মানুষ। তারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে অ্যালার্ট করেছে। ভয় পেও না মা, ওরা কিছু করতে পারবে না।

আপা যে কেন এসব করতে যায়! বলে অপর্ণা রাগ করে মুখ ফিরিয়ে নিল।

মণীশ খাওয়া শেষ করে উঠতে উঠতে বলল, আমার যদি আপার মতো একটা মেয়ে থাকত তাহলে বুক ফুলিয়ে বেড়াতাম। আপা ইজ এ জেম।

তোমরা আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না কোনদিন।

শান্তি একটা বোগাস জিনিস অপু। নার্সিংহোমে থেকে সেটা আমি বুঝেছি।

তুমি নিজেই তো একটা গুণ্ডা। সেইজন্যই তোমার শান্তি ভাল লাগে না।

তা নয় অপু। তোমরা যে শান্তির কথা ভাবো সেটা হল নিস্তরঙ্গতা, নিশ্চেষ্টতা, নিথরতা। আমি যখন কোমার মধ্যে ছিলাম তখন তো আমার ওইরকম শান্তিই ছিল! চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, ফ্রিকশন নেই, টেনশন নেই। মরে গেলে তো আরও চমৎকার শান্তি, একদম ঠাণ্ডা। বেঁচে থাকাটা কিন্তু নিছক শান্তি নয়। নিরন্তর সূক্ষ্ম

বা স্থূল কিছু-না-কিছু ফ্রিকশন হয়েই যাচ্ছে। তুমি ভার্সাস তোমার পারিপার্শ্বিক। তুমি ভার্সাস তোমার আইডিয়াজ। তুমি ভার্সাস তোমার অতীত ও বর্তমান। তুমি ভার্সাস ভাল অথবা মন্দ। যদি জীবন-বিমুখ হয়ে একটা কোটরের মধ্যে নিজেকে ভরে রাখতে পারো, তাহলে তুমি তোমার মতো শান্তি পেয়ে যাবে। আর যদি খোলা জীবনের মধ্যে এসে দাঁড়াতে চাও তাহলে সংঘর্ষ হবেই।

বড্ড লেকচার দাও তুমি। আমার কিছু ভাল লাগছে না।

দূর বোকা মেয়ে! বুবকার ঘটনাটাকে অত বড় করে দেখছো কেন? ও যাদের মেরেছে তারা স্মল টাইম ক্রুক্‌স। ওরা তেমন কিছু করবে বলে মনেও হয় না। আর যদি কিছু করেই তাহলেও বুবকরা তো তৈরি আছে। তাই না? বুবকা আছে, তার বন্ধুরাও আছে। সকলের কথাই ভাবো। শুধু বুবকাকে আড়াল করতে চাইছো কেন? ওকে কাপুরুষ হতে বোলো না। তাতে বন্ধুদের কাছে ওর সম্মান থাকবে না, ওর নিজের কাছেও না। ওর আত্মধিক্কার আসবে। বুঝেছো?

অপর্ণা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

বুবকা কোমল গলায় বলে, এবার একটু বাথরুমে যাবো, মা?

যাও। বলে অপর্ণা উঠে গেল।

পুল কার আসার সময় হয়নি। মণীশ একটু বাইরে এসে দাঁড়াল। আজকাল সিগারেট খাওয়া ছেড়েছে বলে অনেক সময় বড্ড ফাঁকা আর অর্থহীন লাগে। এখন লাগছিল। সিগারেট চিরকালের মতো ছেড়ে গেল তাকে। আর কী কী ছেড়ে গেল? হিসেব করতে হবে, ভাবতে হবে। মনে হয় আরও অনেক কিছু তাকে ছেড়ে গেছে।

কিন্তু শরতের এই সকালবেলাটা তার বড় ভাল লাগছিল। আজ তার অনেকদিন পর এই প্রথম বাইরে যাওয়া। যেন দীর্ঘ রাত্রির পর ভোর।

মণীশ কখন চলে গেছে তা আজ টের পেল না অপর্ণা। এ রকম কদাচিৎ হয়। মণীশের অফিসে যাওয়ার সময়টায় বরাবর কাছে থাকে অপর্ণা। কিছু কথা থাকে না, কোনও ভাবপ্রবণতাও নয়। হয়তো নিছক অভ্যাস। আজ অপর্ণা শূন্য শোওয়ার ঘরটায় চুপচাপ নিজের মনের মধ্যে ডুবে বসে আছে। খড়কুটোর মতো কত কী ভেসে যাচ্ছে মাথার ভিতর দিয়ে।

পৃথিবীটা কেন এত খারাপ? কেন এত নিষ্ঠুর? কেন চারদিকে সবসময়েই এত বিপদ আপদ? এত সব ঝামেলা আর গণ্ডগোলের মধ্যে কী করে বেঁচে থাকবে অপর্ণার ছেলে আর মেয়েরা? কই, অপর্ণার ছাত্রীজীবনে তো এরকম খারাপ ছিল না পৃথিবীটা!

মা!

অপর্ণা ধীরে মুখ ফেরাল। দরজায় দাঁড়িয়ে বুবকা। লম্বা, পুরুষালি চেহারা। আরও বাড়বে। লম্বা চওড়া হবে। এখনও নাবালকত্ব গভীরভাবে বসে আছে চোখে আর মুখে। এখনও শিশুর মতো সরল।

আয়। বলে হাত বাড়ায় অপর্ণা।

বুবকা তার কাছে এসে বসে, তোমার মনটা খারাপ মা? আর ইউ ইন টেনশন?

ভীষণ। বলে ছেলের মাথাটা কাঁধে চেপে ধরে সে।

বুবকা তার নিষ্পাপ গলায় বলে, তুমি এত ভাবো কেন মা? কত ছেলে দুনিয়া জুড়ে কত কী করছে! বারো বছরের ছেলে প্লেন চালাচ্ছে, যোলো বছরের ছেলে রাইফেল কাঁধে যুদ্ধে যাচ্ছে, কেউ আটলান্টিক পেরোচ্ছে নৌকোয়। আমি তো তেমন কিছুও করিনি। একটা বদমাশকে একটু মেরেছি।

তোমার আর বীর হয়ে কাজ নেই বাবা। আমার কোল জুড়ে থাকো।

কোল! হিঃ হিঃ, কী যে বলো মা!

তোর বাবা যে গুণ্ডা ছিল তা জানিস?

জানি। তুমি অনেকবার বলেছো। বাবা তোমাকে একটা অদ্ভুত সেমিকনশাস অবস্থা থেকে রেসকিউ করেছিল। তুমি পুলিশের গুলিতে চোখের সামনে একটা লোককে মরতে দেখে একদম বুরবক হয়ে গিয়েছিলে।

তা ছাড়াও আছে। তোর বাবা ট্যাক্সিওয়ালাদের ত্যাঁদড়ামি দেখলে মার লাগাত, পুলিশের গাড়িতে ইট ছুঁড়ত। এই তো এক বছর আগেও একজন দোকানদারকে কিসের দাম জিজ্ঞেস করায় সে একটা তেড়িয়া জবাব দিয়েছিল, তোর বাবা তাকে কলার ধরে এমন ঝাঁকুনি দিয়েছিল!

তারপর কী হল মা?

খুব হাঙ্গামা হল। অন্য দোকানদাররা ছুটে এল, জোট বাঁধল। তোর বাবা ভয় পেল না। এমন চেঁচামেচি বাঁধিয়ে দিল যে, ভয়ে মরি। তবে কথার তোড় আছে, গলার জোরও আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই খদ্দেরদের এককাট্টা করে ফেলল। তখন দু'দলে এই লাগে কি সেই লাগে।

বাবা তো ঠিক কাজই করে মা, তাহলে বাবাকে গুণ্ডা বলছো কেন?

একে গুণ্ডাই বলে। অত সাহস কি ভাল?

তুমি মা, এক নম্বরের ভীতু।

অপর্ণা মুখে কিছু বলল না। কিন্তু সকালটা আজ বড় ভারী হয়ে রইল বুকের মধ্যে। শরৎ ঋতু নাকি দারুণ সুন্দর! অন্তত মণীশ তো তাই বলে। কিন্তু আজ সকালের এত রোদেও যেন আলো খুঁজে পেল না অপর্ণা।

বিকেলে ডোরবেল বাজতেই অপর্ণা দরজা খুলল গিয়ে। সামনে বুবকা। তার পিছনে আপা। তার পিছনে আরও কয়েকটা ছেলে আর মেয়ে।

এসো, এসো। বলে অপর্ণা দরজা ছেড়ে দাঁড়ায়।

বুবকা একগাল হেসে বলে, ওদের নিয়ে এলাম মা। ওরা তোমার ভয় ভাঙাতে এসেছে।

৩৫

পোড়া মাংসের স্বাদটা আজও জিবে লেগে আছে হেমাঙ্গর। সঙ্গে একটা পাশ্চাত্য স্যালাড ছিল। ছিল ভেটকি মাছ, টমেটো আর ধনেপাতা দিয়ে রান্না একটা বিচিত্র পদ। তন্দুরী রুটিটা হয়েছিল টাটকা পাঁউরুটির চেয়ে নরম। সবই দারুণ। তবু পোড়ানো মাংসের ফরাসী আইটেমটা আজও হেমাঙ্গকে লোভাতুর করে রেখেছে। সঙ্গে ছিল রশ্মির চমৎকার দন্তপঙ্ক্তি আর আধ খোলা ঠোঁটের হাসিটিও।

খাওয়ার টেবিলে রশির কয়েকজন ভ্রূ উঁচু, উন্নাসিক, ইংরিজি মাধ্যম বন্ধু ও বান্ধবীও ছিল। ছিলেন রশ্মির সুপুরুষ, রাশভারী, সংলাপ-বিমুখ বাবা এবং একজন বেশ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও আধুনিকা মা। না, এঁরা কেউ হেমাঙ্গকে তাচ্ছিল্য করেননি। বরং তাকে বেশ একটু খাতিরই করা হচ্ছিল। একটু বেশীই যেন। তার কারণ বোধ হয় এই যে, হেমাঙ্গ ঠিক তাদের মতো নয়। একটু গেঁয়ো, একটু সংকুচিত।

হেমাঙ্গর বাঁ-পাশে-বসা রশ্মির মা একটু চাপা স্বরে বলে ফেললেন, জানেন তো, রশ্মি একরকম ইউ. কে-তেই মানুষ। এবার গিয়ে সিটিজেনশিপ নিয়ে নেবে।

তাতে হেমাঙ্গর কিছুই যায় আসে না। সে ভেটকি মাছের চমৎকার স্বাদে প্রায় সম্মোহিত অবস্থায় বলল, ইউ. কে. ভাল জায়গা। ভালই হবে।

আজকাল ওসব দেশে খুব রেসিস্ট মুভমেন্ট হচ্ছে। তাই ভয় পাই।

হেমাঙ্গ একটা তন্দুরী রুটি ছিঁড়ে মাছের ক্বাথটিতে ডুবিয়ে তুলে মুখে দেওয়ার আগে বলল, তা বটে।

এ দেশে থেকেই বা কী হল বলুন! ও দেশে বরং লেখাপড়াটা হবে। পি-এইচ ডি করে ওখানেই প্রফেসরশিপ নিয়ে নেবে। আমরা একা হয়ে যাবো।

সঙ্গে যান না!

যাবো? আমাদের যে এখানে অনেক বিষয়সম্পত্তি। রশ্মির বাবা বিদেশে থাকতে রাজি নন।

এক চামচ ফ্রায়েড রাইস নিল হেমাঙ্গ, তারপর বলল, আপনি?

সত্যি কথা বলতে কি আমার এ দেশ একটুও ভাল লাগে না। ও দেশে থাকলে একটুও বোর হই না।

হেমাঙ্গ ভদ্রমহিলার দিকে একবার তাকাল। দারুণ পেন্ট করা মুখ এবং প্রচুর রূপটানে বয়সটা বোঝা যায় না। মেয়েটি মায়ের উল্টো। রূপটানের বালাই-ই নেই। হেমাঙ্গ চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, সেটা ঠিক কথা। ওসব দেশে এন্টারটেনমেন্টের অভাব নেই।

আমার তো পায়ে হেঁটে হেঁটে লন্ডনে ঘুরে বেড়াতে বেশ লাগে। উইক এন্ডে কান্ট্রি সাইডে চলে যেতাম। কী যে ভাল লাগত!

হ্যাঁ। কান্ট্রি সাইডটা খুবই ভাল।

ভদ্রমহিলা সামান্য বিস্মিত হয়ে বলেন, আপনি গেছেন নাকি?

হেমাঙ্গ লজ্জিত হয়ে বলে, শর্ট একটা কোর্স করতে গিয়েছিলাম।

ওমা? কই, রশ্মি বলেনি তো আমাকে!

হেমাঙ্গ একটু থতমত খেয়ে বলে, ওটা কোনও ঘটনাই নয়। বিলেত, আমেরিকা আজকাল অনেকের কাছে জলভাত।

তাই বুঝি?

আমি একজন স্মাগলারকে জানি, প্রতি সপ্তাহে লন্ডন যায়।

যাঃ, বানিয়ে বলছেন!

ঠিক আছে, তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো।

ভদ্রমহিলা বিস্মিত হয়ে বললেন, সত্যিই যায়?

কখনো-সখনো হয়তো এক-আধটা সপ্তাহ ফাঁক থাকে। কিন্তু খুব ঘন ঘন যায় জানি। ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলার ছাড়াও যায় ব্যবসাদার, ট্র্যাভেল এজেন্টের লোক, কুরিয়ার সার্ভিসের লোক।

বোধ হয় ঠিকই বলছেন আপনি। এত আজেবাজে লোক যায় বলেই বোধ হয় ওরা আর বিদেশীদের পছন্দ করছে না।

যে আজ্ঞে।

রশ্মি একটু ঘুরে, তিনটে চেয়ারের দূরত্বে বসে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে খাচ্ছিল। একবার চোখাচোখি হতে একটু হাসল রশ্মি। বলল, কেমন খাচ্ছেন বুঝতে পারছি না। মা, ওঁকে একটু দেখেশুনে খাওয়াও।

হেমাঙ্গ মৃদু হেসে বলল, দারুণ!

রক্ষা এই যে, এ বাড়িতে ডিনারের আগে ককটেল ছিল না। সাধারণত এসব ঘ্যাম বাড়িতে ওটা থাকেই। তবে হেমাঙ্গকে একবার রশ্মি জিজ্ঞেস করে নিয়েছিল, আপনি কি ড্রিংক করবেন? আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে।

হেমাঙ্গর পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ডে মদের কোনও ভূমিকাই নেই। ফলে সে জিনিসটা কখনও উপভোগ করে না। দুর্ভাগ্যবশত তাকে অবশ্য বিভিন্ন পার্টিতে যেতে হয় এবং ভদ্রতা রক্ষার্থে হাতে গেলাসও ধারণ করতে হয়। এক বা দু চুমুক খেয়ে সে গেলাসটা গোপনে কোনও ফ্লাওয়ার ভাস-এর পিছনে বা টেবিলের তলায় বা পদার আড়ালে জানালার তাকে রেখে দেয়। সে বেশ উদ্বেগের গলায় বলে ফেলল, না, আমি ড্রিংক করি না। আপনাদের কি ককটেলও আছে না কি আজ?

রশ্মি হেসে ফেলল, বলল, না। বাবা একটু রক্ষণশীল মানুষ। বাড়িতে ওসব পছন্দ করেন না। তবে কেউ চাইলে দেওয়া হয়।

বাঁচা গেল।

ককটেল ছিল না বলেই বেশ নিশ্চিন্ত মনে ডিনারটাকে উপভোগ করতে পারছিল হেমাঙ্গ। এরকম ডিনার সে বহুকাল খায়নি। কিন্তু প্রশ্ন হল, খাওয়াটা আদৌ হচ্ছে কেন? একটা উপলক্ষ তো থাকবে? এই উপলক্ষটাই ধরতে পারছে না হেমাঙ্গ।

একবার সে আলগোছে রশ্মির মাকে জিজ্ঞেস করল, আজ কি আপনাদের কোনও অকেশন আছে?

অকেশন! না তো!

এই জন্মদিন-টন্মদিন!

রশ্মির মা তাঁর চড়া লিপস্টিক চিরে হাসলেন। মাথা নেড়ে বললেন, ওসব কিছু নয়। রশ্মি ফ্রান্সে রান্না শিখেছিল কিছুদিন। মাঝে মাঝে রাঁধে আর সবাইকে খাওয়ায়।

রান্না কি কোনও মেয়ের হবি হতে পারে?

কেন হবে না বলুন তো!

মেয়েরা রাঁধতে ভালই বাসে না।

সব মেয়ে কি সমান? রশ্মি একটু আলাদা ধরনের। এমন কি ওর সঙ্গে আমারও মেলে না।

রশ্মি যে একটু আলাদা তা ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারছে হেমাঙ্গ। এরকম দুর্দান্ত ব্যাকগ্রাউন্ড, এরকম দারুণ সুন্দরী, তবু কোনও দেমাক নেই। কিংবা থাকলেও সেটা ঠুনকো বা বোকা দেমাক নয়। রশ্মি বেশ একটু অন্যরকম। হেমাঙ্গর মেয়েদের সম্পর্কে অনীহার ভাবটা কি রশ্মি কাটিয়ে দিচ্ছে!

এসব সেই গত রবিবারের কথা। আজ বুধবার। পোড়া মাংসের আশ্চর্য স্বাদ আর গন্ধটা কেন আজও আবিষ্ট করে রেখেছে হেমাঙ্গর নাক আর জিবকে?

সেদিন ডিনারের পর বাড়ি ফিরতে না-ফিরতেই চারুশীলার ফোন, কি রে, কিরকম হল?

হেমাঙ্গ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, তোর রান্নার নাকি প্রশংসা করে সবাই! ছোঃ। রান্না কাকে বলে তা আজকের ডিনারটা খেলে বুঝতে পারতিস। অধোবদন হয়ে থাকতে হত।

নিজে বেঁধেছে?

আলবাৎ। ফরাসি দেশে গিয়ে পয়সা খরচ করে রান্না শিখে এসেছে। তোদের মতো গুচ্ছের মশলা দিয়ে টাগরায় জ্বালা-ধরানো রান্না নয়। এসব রান্না কিরকম জানিস, জিবে শান্তি, পেটে শান্তি, মনে শান্তি।

তোর তো দেখছি স্ট্রোক হয়েছে।

তার মানে?

লাভ-স্ট্রোক। শেষ অবধি একটা রাঁধুনীর প্রেমে পড়লি নাকি?

রান্না জিনিসটাকে মিনিমাইজ করছিস? রান্নাও যে একটা আর্ট তা জানিস? আজকাল সব ম্যাগাজিনে আর পেপারে কত রকম রান্নার রেসিপি ছাপা হয় দেখিস না? বড় বড় হোটেলের শেফরা কত মাইনে পায় জানিস? শুনলে মাথা ঘুরে যাবে। রান্না মোটেই ফেলনা জিনিস নয়।

চারুশীলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তুই পেটুক তা জানি। কিন্তু ওই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তোকে কেউ হাত করে ফেললে সেটা আমাদের পক্ষে খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে। তোকে যা বলে দিয়েছিলাম সেটা খোঁজ করেছিলি?

কী বলেছিলি?

ওরা বামুন না কায়েত?

ওই নিয়েই থাক। বামুন-কায়েত জেনে কী হবে? চোরের মন কেবল বোঁচকার দিকে। রশ্মি আমার একজন ভাল বন্ধু। আর কিছু নয়।

কবে দেখাবি?

দেখাবো মানে? দেখানোর কী আছে?

তোর যা অবস্থা দেখছি তাতে মনে হয়, গতিক সুবিধের নয়। ছাইক্লোন হতি পারে।

শ্রীকান্ত থেকে কোট করলি নাকি? একটু-আধটু বই-টই পড়ছিস তাহলে?

আমি তো পড়িই! তুই যে কিছুই পড়িস না। এই পিসটা বোধ হয় তোর পাঠ্য বইতে ছিল, তাই ধরতে পারলি।

গল্প উপন্যাস পড়ে অকাজের লোকেরা। আমার অত ফালতু সময় নেই। আর ওইসব গল্প উপন্যাস পড়েই তো তোর মাথাটা গেছে। সব জায়গায় প্রেমের গন্ধ পাচ্ছিস। তুই একটা যা-তা।

গল্প উপন্যাস পড়লে তোর নিরেট মগজেও বুঝতে পারতিস যে, তুই অলরেডি রশ্মি রায়ের জালে আটকা পড়ে গেছিস। গল্প উপন্যাস মানুষকে অনেক বেশী কনশাস করে তোলে। যাক গে, আসল কথাটা বল। মেয়েটাকে কবে দেখাবি?

দেখানোর কিছু নেই, বললাম তো।

আচ্ছা ছোটলোক বটে তুই, কেল্পনও ভীষণ। তোকে যে এত খাওয়াল, তোর কি উচিত নয় ওকেও নেমন্তন্ন করে একদিন খাওয়ানো?

এ কথায় হেমাঙ্গ একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলে, কেন, আমি খাওয়াতে যাবো কেন?

ওটাই যে ভদ্রতা। দুনিয়াটা চলছে লেনদেনের ওপর। শুধু একতরফা খেয়ে এলেই হল?

পার্টি দিতে হবে বলছিস?

হবে না? তুই কী রে!

ঠিক আছে, কোনও ভাল হোটেলে নিয়ে গিয়ে একদিন খাইয়ে দিলেই হবে।

এই না হলে তোকে দুনিয়ার পয়লা নম্বর গবেট বলা হয় কেন?

কেন, প্রস্তাবটা কি খারাপ?

ও তোকে বাড়িতে ডেকে যত্ন করে রেঁধে খাওয়াল, আর তুই ওকে হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়াবি? এটা কি বিলেত? না কি তুই মস্ত বড় সাহেব হয়েছিস?

হেমাঙ্গ অসহায়ভাবে বলল, তাহলে কি করব? বিডন স্ট্রিটের বাড়িতে নেমন্তন্ন করলে হাজারটা কথা উঠবে। কুমারী সুন্দরী মেয়ে বলে কথা! জবাবদিহি করতে জেরবার হবে আমার। আর এ বাড়ির রাঁধুনী হল ফটিক, সেই রান্না আমার মতো সহনশীল মানুষ খেতে পারে, কিন্তু রশ্মি পারবে কি?

তোকে আর বোকা বুদ্ধি খাটাতে হবে না। রশ্মিকে নেমন্তন্ন করবি আমার বাড়িতে।

তোর বাড়ি? অ, বুঝেছি। এই ফাঁকে দেখে নিতে চাস তো?

দেখলে কি তোর ভাগে কম পড়বে?

নেমন্তন্ন যদি নিতে না চায়? যদি না আসে?

তোর বলার ভাগ বলবি, তারপর আমি বুঝব। ওর ফোন নম্বরটা আমাকে দে। তুই আগে নেমন্তন্ন করবি, তারপর আমিও বলব।

তুই কিন্তু ব্যাপারটা পাকিয়ে তুলছিস। আমি ব্যাচেলর মানুষ, আমি ওকে নেমন্তন্ন না করলেও কিছু যায় আসে না। এই পাল্টা নেমন্তন্ন মানেই সম্পর্কটাকে আরও ঘুলিয়ে তোলা।

তোর মাথা! এ যুগে কেউ অত সহজে আছাড় খায় না। বিলেত-ঘোরা মেয়ে, খুব সোজা পাত্রী নয়। আর তুই বোকা হলেও সেয়ানা।

আরও একটা প্রবলেম আছে। তুই যা রাঁধিস তা কি ও খেতে পারবে?

চাটবে। তবে ভয় নেই, আমার রান্নার লোক আছে।

তা জানি। তার রান্না খাওয়াবি? তার হাতে হাজা নেই তো?

মুকুন্দ সদাচারী মানুষ, তোর মতো ম্লেচ্ছ নয়। সাহেবী রান্নাও জানে। আমিও ওকে হেল্‌প করব। তোর ভয় নেই।

এ পর্যন্ত হয়ে ছিল। কিন্তু কঠিন হল, রশ্মিকে নেমন্তন্ন করাটা। একটা আচমকা লজ্জা আর সংকোচ বাধা দিচ্ছিল হেমাঙ্গকে। পাল্টা নেমন্তন্নটা কি ঠিক হচ্ছে? চারুদি একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলছে না তো! শেষ অবধি অবশ্য সে দ্বিধা সংকোচ ঝেড়ে ফোনটা করে ফেলেছিল। আশ্চর্যের বিষয় রশ্মি এক কথাতেই রাজি হয়ে গেল। সামনের রবিবার সন্ধেবেলায় চারুশীলার বাড়িতে সে সানন্দে যাবে।

পৃথিবীর সব ঘটনার রাশ তার হাতে নেই। অনেক সময়ে ঘটনা ঘটে যায়, মানুষকে তা মেনে নিতে হয় মাত্র। পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী এবং অভ্যাসবশে হেমাঙ্গ ভগবান মানে, কিন্তু তার জীবনে কোনও ধর্মাচরণ নেই। মাঝেমধ্যে সে ভগবানের ওপর নির্ভর করে। এখনও তার জীবনে এক সংকটমুহূর্ত। ভগবানের ওপর ভর করা ছাড়া তার আর উপায় নেই। পোড়া মাংসের স্বাদ তাকে পেড়ে ফেলেছে বটে, কিন্তু সে সেই সম্মোহন কেটে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। ঘটনার গতিক তার সুবিধের ঠেকছে না।

আজ কিছু কেনাকাটা করলে কেমন হয়? জিনিসপত্র কিনলে তার মনটা ভাল হয়ে যায়।

অফিস থেকে বেরিয়ে বেশ খানিকটা ঘুরে সে প্রায় হাজার টাকা দামের এক জোড়া জুতো কিনল। জুতো কিনতে তার যে কেন এখনও এত ভাল লাগে! জুতোর মধ্যে কোন্ আনন্দ লুকিয়ে থাকে কে জানে বাবা!

দামটা একটু বেশী পড়ে গেল, কিন্তু জুতো জোড়া এতই ভাল যে পায়ে দিয়েই একটা চমৎকার আরাম বোধ করল সে। জুতো তৈরির কলাকৌশলও এত অত্যাধুনিক হয়ে যাচ্ছে যে, সূক্ষ্ম সাইকোলজির সঙ্গেও জুতোর যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে গেল বুঝি। পায়ে দিলেই মন অবধি ভাল হয়ে যায়।

নতুন জিনিস কিনে এনে সে সেটা প্রথম দেখায় ফটিককেই। ফটিক বুঝদার সমঝদার মানুষ নয়। তবে সে যা-ই দেখে তাতেই মুগ্ধ হয়, অবাক হয়। তারিফ করার ধরনটাও তার আলাদা রকমের।

আজ জুতো দেখে ফটিক বলল, এ খুব জম্পেশ জিনিস বলেই মনে হচ্ছে। হেসে-খেলে পাঁচ-সাতটা বছর চলে যাবে।

আহা, টেকার কথা হচ্ছে না, জিনিসটা কেমন বলল।

এ তো জুতো বলে চেনাই যায় না, যেন এক জোড়া জাহাজ। এতে কোনও কলকজা লাগানো নেই তো দাদাবাবু?

আরে না। জুতোয় কলকজা আসবে কোত্থেকে?

কি জানি, আজকাল সবকিছুতেই বড্ড কলকব্জা লাগানো থাকে। দই-ঘোঁটার কল, সরবতের কল, আটা-ময়দা মাখার কল। তার ওপর তোমার ওই বাক্স-উনুন—উঃ রে বাব্বা, কী অশৈলী কাণ্ডই যে হয় ওতে!

ফটিকের সঙ্গে কথা বলে একটা আরাম হয় হেমাঙ্গর। ফটিকের ভিতরে সভ্যতা ঢোকেনি, শহর ঢোকেনি, বিজ্ঞান বা সাহিত্য ঢোকেনি। ফটিক নিষ্কলুষ আছে। তাকে শিক্ষিত বা চালাক-চতুর করে তোলার বৃথা চেষ্টা কখনও করে না হেমাঙ্গ। বরং ফটিকের সরলতা আর বিস্ময় সে নিজেই শিখে নেওয়ার চেষ্টা করে।

ফটিকদা, জুতো জোড়া একটু পায়ে গলিয়ে দেখ, কী আরাম!

ফটিক শিহরিত হয়ে বলে, পায়ে দেবো! আমার কি মাথা খারাপ হল নাকি? শুনলেও পাপ!

আরে দূর! পাপ কিসের? জুতো তো পায়েরই জিনিস। পরে দেখই না একবার।

মরে গেলেও পারবো না। কী বলল না তুমি দাদাবাবু!

হেমাঙ্গ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তোমাকে আর মানুষ করা গেল না। আচ্ছা, তোমার জুতো নেই?

তা থাকবে না কেন? এক জোড়া রবারের জিনিস আছে। হাওয়াই চটি।

চটি! শীতকালেও?

খুব ভাল জিনিস। শীত গ্রীষ্মে সমান পরা যায়।

ফটিকের সঙ্গে তার যে একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠছে সেটাকে খুবই উপভোগ করে হেমাঙ্গ। সারা দিন তার মেলামেশা কিছু টাকার কুমিরের সঙ্গে। তারা হচ্ছে টাকা-সর্বস্ব মানুষ। সারা দিন টাকার কথা শুনতে শুনতে হেমাঙ্গর একটা মানসিক ক্লান্তি আসে। তার আত্মা ক্লিষ্ট হয়। টাকার হিসেব কষতে কষতে সে নিজেকে বুড়ো বলে ভাবতে শুরু করে। তাই বাড়িতে এসে যখন ফটিককে দেখে তখন একটা আনন্দিত বিস্ময় ঘটে তার। এই তো একটা মানুষ যার প্রয়োজন এত কম, এত অল্প নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে যা প্রায় অবিশ্বাস্য। বাঁচতে ফটিকেরও কিছু টাকার দরকার হয় বটে, কিন্তু ফটিকের মধ্যে টাকা-সর্বস্বতা নেই। এরকম লক্ষ লক্ষ মানুষ ছড়িয়ে আছে ভারতবর্ষে, যাদের অবস্থা ফটিকের চেয়েও খারাপ। কিন্তু ফটিকের চরিত্রে লোভ জিনিসটাই দেখতে পায় না হেমাঙ্গ। কাছাকাছি এরকম একটা লোক থাকলে অকারণেই ভাল লাগতে থাকে।

বুধবার রাত্রিটা ভাল ঘুম হল না হেমাঙ্গর। নানা সম্ভাবনা ও তজ্জনিত দুশ্চিন্তায় তার মাথাটা গরম। তার নিশ্চিন্ত একক জীবনে চোরাপথে কি সিঁদ কাটা হচ্ছে? রশ্মি রায় কি ঢুকে পড়ছে তার সংসারে? বিডন স্ট্রিটের বাড়ি ছেড়ে একা থাকতে এসে তবে কি লাভ হল তার?

বৃহস্পতিবার সকালে সে ফটিককেই জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, ফটিকদা, যদি হুট করে আমার একটা বিয়েটিয়ে হয়ে যায় তাহলে কেমন হয় বললা তো?

বিয়ে! সে তো খুব ভাল জিনিস। তখন বউদিদি রান্নাবান্না করে দেবেন, ঘরদোর সামলাবেন, বাড়িটা সরগরম রাখবেন।

বউ কি শুধু রান্না করে আর ঘর সামলায়?

আমাদের ঘরের বউ ওরকমই হয়। বউ এলে কাজ করে।

ধরো যদি কাজ করতে না হয়?

বউয়ের আর কোন উপযোগ আছে তা ভেবে পেল না ফটিক। সবেগে মাথা চুলকে বলল, বাবুদের বাড়িতে বউরা কাজ করে না বটে, কিন্তু তাতে আধিব্যাধি হয়। গতর তো পুষে রাখবার জিনিস নয়।

হেমাঙ্গ একটু হাসল, তুমি একটি বেশ লোক ফটিকদা। মনে মুখে ফাঁক নেই।

ঘটনাবিহীন বৃহস্পতি কাটল, শুক্র গেল। শনিবার চারুশীলা ফোন করল রাতে, এই কিম্ভূত, কালকের কথা মনে আছে তো?

আছে।

তুই রশ্মিকে নিয়ে আসবি।

না, রশ্মি নিজেই চলে যাবে বলেছে।

তুই আনলে ভাল হত না?

না, হত না।

তাহলে তুই সকাল সকাল আসবি। এ বাড়িতে ও তো কাউকে চেনে না। লজ্জা পাবে।

লজ্জা পাবে! সে জিনিস নয় রে। এ অন্য ধাতুতে গড়া।

তা হোক। তোর নিজেরই উচিত ওকে রিসিভ করা।

ঠিক আছে ভাই, যাবো।

বিকেল চারটের মধ্যে চলে আসবি।

বড্ড আর্লি হয়ে যাচ্ছে না?

হোক। শরৎকালে বেলা তাড়াতাড়ি শেষ হয়।

তোর সব ব্যাপারেই বড় বাড়াবাড়ি।

এ কথা খুবই ঠিক যে, সব ব্যাপারেই চারুশীলার কিছু বাড়াবাড়ি আছে। টাকা জিনিসটাকে সে ব্যবহার করে ইচ্ছেমতো লাগাম ছেড়ে। রবিবার দিন সে তার বিদঘুটে আর্কিটেকচারের বিশাল ঘরখানা নতুন করে সাজিয়েছে। ঝাড়পোঁছ পালিশে ঘরখানা আয়নার মতো ঝকঝক করছিল। পুরনো কিছু আসবাব হয়তো-বা জলের দরে নীলামঘরে বেচে দিয়ে সে কয়েকটা নতুন ধরনের আসবাব কিনেছে। একখানা গ্লাসটপ নতুন পেল্লায় সেন্টার টেবিলও লক্ষ করল হেমাঙ্গ। যথাযোগ্য জায়গায় প্রচুর পরিমাণে রজনীগন্ধার স্টিক সাজানো। একটি মনোরম সুগন্ধী স্প্রে করা হয়েছে সারা ঘরে।

হেমাঙ্গ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, এটাকেই বাড়াবাড়ি বলে, তা জানিস?

চারুশীলা গম্ভীর মুখে বলল, মোটেই বাড়াবাড়ি নয়। এটুকুর দরকার ছিল।

টুকু? হেমাঙ্গ চোখ কপালে তুলে বলে, এটাই যদি তোর কাছে টুকু হয়, তাহলে খানি হয় কিসে? সোফাসেট নতুন কিনলি বুঝি?

কিনলাম।

কত পড়ল?

তা দিয়ে তোর কী দরকার? তুই যে গুচ্ছের জিনিস কিনে ঘরটা জঙ্গল বানাচ্ছিস?

তোর কেনা আর আমার কেনায় তফাত আছে। আমি ডেকোরেশনে বিশ্বাস করি না।

এ যুগে ডেকোরেশনেরই দাম। ডেকোরেশন জীবনে নতুন মাত্রা যোগ করে।

তোর মাথা। খাওয়ার আয়োজনও বোধ হয় রয়্যাল স্টাইলেই হবে? একটা মেয়ের জন্য এত!

একটা মেয়ে কেন? আজ আমি কয়েকজনকে নেমন্তন্ন করেছি।

সভয়ে হেমাঙ্গ বলে, কাকে?

চারুশীলা মুখ টিপে হেসে বলে, ভয় নেই, বাড়ির কাউকে নয়। আমার বান্ধবী আর তাদের বরেরা। খাওয়ার ঘর দেখে যা।

খাওয়ার ঘরেও দেখা গেল, চারুশীলা টাকা ছড়িয়েছে। দেওয়ালে বিশাল প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর ওয়ালপেপার সদ্য লাগানো। বড় দেওয়াল বলে দৃশ্যটা খুলেছে চমৎকার। মাঠ, ঘাট, ক্ষেত, ধানের মড়াই, কুঁড়ে ঘর। প্রমাণ সাইজই বলা যায়। তবে গ্রামীণ দৃশ্যে কেন একটি আধুনিক মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তা হেমাঙ্গ বুঝতে পারছিল না। মেয়েটা একটু চেনা-চেনাও।

একে চিনিস? মনে পড়ে? এ হল ঝুমকি! এদের বাড়ির সবাই আজ আসবে।

হেমাঙ্গর ভুল ভাঙল। মেয়েটা ছবির নয়, রক্তমাংসের। একটু হেসে এগিয়ে এল, কেমন আছেন?

হেমাঙ্গ এই মেয়েটার মধ্যে সেই ভেজা, ভীতু মেয়েটার একটা আদল পেল মাত্র। শুধু আদলটুকুই। আজকের ঝুমকি অন্যরকম। তেজী চাবুকের মতো চেহারা। একটু রোগার দিকে। মুখখানা যেন খুব যত্ন করে কেটে কেটে তৈরি করা।

হেমাঙ্গ বলল, আপনি কেমন আছেন?

মেয়েটা জবাব দিল না। ঘাড় হেলিয়ে হাসল। হাসিটা খুবই ভাল। পৃথিবীতে ভালরও কি শেষ নেই? ভালর পরও আরও ভাল, আরও ভাল—এটা কি ভাল?

৩৬

আমার খুব ভূতের ভয় হয়েছে আজকাল, জানো?

ভূতের ভয়? সে কি! গাঁয়ে গঞ্জে কতদিন কাটালে, এ ভয় তো ছিল না তোমার!

তাই তো ভাবি। দেশের গাঁয়ে রাত-বিরেতে একা পুকুরঘাটে গেছি কত, ভয় বলে কিছু টের পাইনি। এখন হচ্ছে কেন বলো তো?

বিষ্ণুপদ একটু হাসে। বলে, আমি পাশে থাকলেও ভয় করে?

কি হয় জানো? হঠাৎ মাঝ রাত্তিরে ঝম করে ঘুমটা ভেঙে যায়। ভাঙা মসজিদে তক্ষক ডাকে। আর বাঁশবনে কেমন মড়মড় শব্দ হয়। একটা হাওয়া বয়ে যায় হঠাৎ করে। শেয়াল ডাকে। তখন বুকটা কেমন উথাল-পাথাল করে। মনে হয়, কারা সব যেন আনাগোনা করছে চারপাশে। ফিসফিস করে কথা কইছে। কী একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে যেন। শুনছো, না ঘুমিয়ে পড়লে?

শুনছি। ঘুম কি আর মাইনে-করা চাকর যে ডাকলেই এসে হাজির হবে! ভাঁটির বয়স, এখন সবই কমতে থাকে। তা তোমার ভূতের বৃত্তান্তটা বলল, শুনি।

তাই তো বলছি। হ্যাঁ গো, এরকম কি ভাল?

নিশুত রাতে কতরকম মনে হয়। মানুষ তখন একা। একা হওয়াটা মানুষ পছন্দ করতে পারে না। তার জন চাই।

নয়নতারা গালের পানটা একটু চিবিয়ে নিয়ে একটা হেঁচকির মতো শব্দ করে বলে, এই যে তুমি আমার কাছটিতে আছে, কাছেই আছে তো! তবু ভয়-ভয় ভাবটা বড্ড চেপে ধরে। মনে হয়, আমার বুঝি কেউ নেই। বড্ড অন্ধকার লাগে চারদিকটা। গাটা কেমন ছমছম করে। মনে হয়, কোন অজান দেশে চলে এলাম। চারদিকে অজান সব জিনিস।

এও বয়সেরই দোষ।

বেঁচে থাকলে বয়স তত বাড়েই। তাতে দোষের কি? কত বুড়ো মানুষ হেসে-খেলে বেড়াচ্ছে।

বিষ্ণুপদর দীর্ঘশ্বাসের শব্দটা নিশুত রাতে বেশ বড় হয়ে শোনা গেল। খাসটা ফেলে বলল, আমরা যে কেমন একা হয়ে যাচ্ছি তা টের পাও? আপনজন, রক্তের সম্পর্কের মানুষের অভাব নেই। তবু কেমন যেন সব ছেড়ে যাচ্ছে। দূরের মানুষ হয়ে যাচ্ছে। টের পাও না?

তা যদি বলো তবে বলতে হয়, ছেলেপুলে কি চিরকাল আগলে রাখা যায়? তাদের পাঁচটা কাজ আছে, রুজিরোজগার আছে।

ওইটেই তো পরিস্থিতি কঠিন করে দেয়। যত বুড়ো হবে তত একা!

অমন করে বোলো না তো। তোমার কথা শুনলে মাঝে মাঝে বুক কেঁপে ওঠে আমার।

বলি কি আর সাধে! কৃষ্ণ তফাত হল, বামা তফাত হল, একটা কোথায় নিরুদ্দেশ হল, মেয়ে দুটো কালেভদ্রেও আসে না। মাঝে মাঝে ভাবি, দুনিয়াটাই কেড়ে নিল সবাইকে। কেমন জানো? ছেলেবেলায় যখন গুলি খেলতাম, মাঝে মাঝে কোঁচড় বা পকেট থেকে পড়ে যেত। সব কটা কুড়িয়ে পেতাম না, কিছু হারিয়ে যেত।

এবার নয়নতারার দীর্ঘশ্বাসটা বেশ শব্দ করে হল। বলল, তা নয় গো। হারাবে কেন? সবাই-ই তো আছে। আমাদেরই আছে। শিবুটার কথা খুব মনে হয়। তুমি কি ভাবো বলল তো! বেঁচে আছে?

বিষ্ণুপদ একটা হাই তুলে বলে, না থাকার কি? আছে ঠিক। হয়তো জীবনে উন্নতিও করে ফেলেছে।

একদিন আসবে?

না এসে যাবে কোথায়?

আমি মরার আগে আসবে তো!

তুমি এখনই মরছে না। আগে আমার পালা।

তোমার একটা মরার বাই হয়েছে আজকাল।

কথাটা ভুল বললে। ইচ্ছে করে কেউ মরতে চায় না। এই যে আমাদের কথাই ধরো, কোন ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে পড়ে আছি, কেউ পোঁছেও না আমাদের, বেঁচে থাকার কষ্টও কত, তবু কিন্তু মরতে ঠিক ইচ্ছে যায় না। মরার কথা ভাবলেই কেমন যেন হাঁফ-ধরার মতো লাগে। সেই যে কালঘড়ি দেখেছিলাম, তার পর থেকেই একটা মরণের ভয় মাঝে মাঝে এসে ভালুকের মতো চেপে ধরে।

নয়নতারা অন্ধকারেই তার মানুষটার দিকে তাকায়, বলে, মরার মতো কিছুই তো হয়নি তোমার। বয়সও এমন কিছু নয়, ভগবানের দয়ায় তেমন কোনও অসুখ-বিসুখও নেই। তবে ভাবো কেন?

ভাবনার সঙ্গেই তো সারাদিন যুদ্ধ করি। হাতে কাজকর্ম নেই, মাথাটা বোঁদা হয়ে গেছে।

কাজকর্ম একটু একটু করলেই তো পারো!

সেটাও ইচ্ছে যায় না। কেবল মনে হয়, পণ্ডশ্রম করে হবেটা কি? যে কাজই করি, মনে হয়, ছাইভস্ম। জীবনে আমার আর যেন কিছুই করার নেই।

ওটাই তো তোমার দোষ। শরীরটা বড্ড বসিয়ে ফেলেছে। দাঁড়াও, কাল থেকে তোমাকে হাটেবাজারে পাঠাবো।

রক্ষে করো! বিকিকিনির মধ্যে আমি আর যেতে পারব না। পয়সার হিসেব গুলিয়ে ফেলব। ওসব কথা থাক, তোমার ভূতের বৃত্তান্ত বলো।

বললাম তো। নিশুত রাতে ওরকম সব হয়।

বিষ্ণুপদ উঠে একটু জল খেয়ে বলল, তোমার যেমনটি হয়, অনেকটা তেমনতর আমারও হয়। আমার যেন মনে হতে থাকে, দেহ ছাড়বার সময় যত কাছে এগিয়ে আসতে থাকে তত প্রেতলোকের ছায়া এসে পড়ে

চারধারে।

মা গো! তুমি কি বলছো আমার মরার সময় হয়েছে?

তা কি জানি! এটা বুঝি যে, বয়স ভাঁটির দিকে। এখন ওসব হলে বুঝতে হবে ঘাঁটি ছাড়ার সময় হয়েছে।

তুমি বাপু, একটু কেমন যেন আছো। বড্ড ঠোঁট-কাটা।

তোমাকে ছাড়া আর কাকে এসব বলব বলো তো!

আমি যে ভয় পাই। সংসার-টংসার নিয়ে জড়িয়ে মড়িয়ে আছি, এই বেশ আছি। ওসব কথা তুললে কেমন ঘাবড়ে যাই। হ্যাঁ গো, একটু তীর্থ করতে যাবে? মনটা ভাল করে আসি চলো।

ও বাবা, সে তো মস্ত খরচের ব্যাপার!

দূরে নয় গো। কাছেপিঠেই কোথাও যাই চলো। রামজীবনকে বললে খরচ দিয়ে দেবে।

বিষ্ণুপদ বলল, ওর এখন অনেক খরচ। ঘর শেষ করতে পারছে না বলে মাথাটাও গরম। বলতে যেও না।

গেলে ভাল হত কিন্তু। তারকেশ্বর বা ওরকম কাছেপিঠে গেলেও কি অনেক খরচ? কাশী-বৃন্দাবন তো যেতে চাইছি না। এক জায়গায় থেকে কেমন দম বন্ধ হয়ে আসে।

তীর্থেই বা কোন শ্বাস ফেলার জায়গা আছে বলল তো! সব জায়গাতেই ভিড়।

আচ্ছা, তোমার কি ভগবানে ভক্তি নেই? সত্যি করে বললা তো! এতকাল ধরে তোমাকে দেখছি, কোনওদিন মুখ ফুটে ভগবানের কথাটা বললে না। কত ব্রত করেছি, পুজো করেছি, তোমার তাতে কখনও যেন গা ছিল না। হ্যাঁ গো, তুমি কি নাস্তিক?

বিষ্ণুপদ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে করুণ গলায় বলে, তাও ঠিক বুঝতে পারি না।

সত্যি কথাটা বলেই ফেল না।

বিষ্ণুপদ দুর্বল গলায় বলে, যা ভাবছো তা নয়। কিন্তু তোমাদের মতো করে নয়।

তা হলে কার মতো করে?

আমার নিজের একটা রকম আছে। তোমরা যে পুজো-আচ্চা করো তার মধ্যে একটু ব্যবসা-বুদ্ধি আছে। ফুল বাতাসা দিয়ে ভগবানের কাছ থেকে কিছু আদায় করে নেওয়া। দমাদম বাজনা, ট্যাঙস ট্যাঙস কাঁসি বাজিয়ে দুর্গাপুজো হয়, ও আমার কেন যেন ভাল লাগে না। আমার মনে হয়, ভগবান ঠাণ্ডা সুস্থির একজন মানুষ। তাঁকে বুঝতে হলে নিজেকেও একটু ঠাণ্ডা বা সুস্থির হতে হয়।

তুমি কত জানো। আমার হল মেয়েলি বুদ্ধি।

আমি যে একটা জান-বুঝওলা মানুষ এ কেবল তোমার মতো বোকার কাছে। আমি কীই বা জানি? কতটুকুই বা বুঝি!

বিদ্যের জাহাজ না হলেও তুমি বাপু অনেক জিনিস স্পষ্ট টের পাও। অনেক বিদ্বানেরও সেই ক্ষমতা নেই।

এই না হলে নয়নতারা! তা ভাল, এরকমই বোকাসোকা থেকো। সংসারে বোকা আর ভালদের দাম না থাক, তাদের ওপর ভগবান সন্তুষ্ট থাকেন।

বাকি রাতটুকু আর দুজনের কারোই ঘুম হল না। কথা কয়ে, জল খেয়ে আর এপাশ ওপাশ করে কেটে গেল।

রোদ উঠবার অনেক আগেই তারা উঠে পড়ে। তখন অন্ধকার থাকে, চারদিকটা থাকে ঘুমন্ত। একটা দুটো পাখি সবে ডাকতে শুরু করে। একটা সময় আছে, ইরফানের মোরগটা যখন জানান দেয়।

সকালে নয়নতারার মেলা কাজ থাকে। ঘরদোর সারা, লেপাপোঁছা, আরও অনেক কিছু। বিষ্ণুপদর কোনও কাজ থাকে না। জলচৌকিতে বসে আজ সে শরতের একটু হিম মাখানো ভোরবেলাটিকে বড় ভালবাসল।

ডেকে বলল, কয়েকটা শিউলি তুলব নাকি গো? তোমার ঠাকুর পুজোয় লাগবে।

তা তোলো। বাসি কাপড় ছেড়ে হাত পা একটু ধুয়ে নাও।

বাঁশের সাজিটা নিয়ে বারান্দা থেকে নেমে পড়ল বিষ্ণুপদ। এই ফুল ভোলাটা তার একটা দৈনন্দিন কাজ করে নিলে কেমন হয়?

গাছ দুটো কেঁপে কী ফুল! কী ফুল! মাটিতে ঘাসে কোথাও পা রাখার জায়গা নেই। ফুলে ফুলে ছয়লাপ হয়ে আছে।

বিষ্ণুপদ হাঁক দিল, হ্যাঁ গো, মাটিতে পড়া ফুল কি পুজোয় লাগে?

নয়নতারা উঠোনের এক প্রান্ত ঝাঁট দিতে দিতে বলল, শিউলিতে দোষ হয় না, যেটা পায়ে লাগবে সেটা কুড়িও না।

গাছেও মেলা আছে।

তবে গাছেরগুলোও তোলো।

গাছের পাতায় পাতায় বোঁটা আলগা হয়ে কত শিউলি ঢলে পড়ে আছে। একটু নাড়া খেলেই টুপ করে খসে পড়ে। শিউলির বোঁটা কেন এরকম তা বুঝতে পারে না বিষ্ণুপদ। দুনিয়ায় একঢালা নিয়ম কিছু নেই। শিউলির ধর্ম শিউলির, বেল ফুলের ধর্ম কেবল বেল ফুলেরই। একই মাটির একই রস টেনে কত নানারকম হচ্ছে। বড়ই আশ্চর্য লাগে বিষ্ণুপদর।

সাজি ভরে উঠতে সময় লাগল না মোটেই। বিষ্ণুপদ ওপচানো সাজি নয়নতারার ঠাকুরের সিংহাসনের সামনে রেখে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলল, আরও কিছু কাজ দেবে নাকি?

ওমা! এ যে ভূতের মুখে রাম নাম!

কেন, কাল রাতেই তো বললে আজ থেকে আমাকে দিয়ে মেলা কাজ করাবে।

তাই লক্ষ্মী মানুষটির মতো কাজ চাইছো? মরে যাই!

দোষটা কি আমার? তুমিই তো কিছু করতে দাও না আমাকে।

একটা জীবন কম খেটেছো নাকি? কম কষ্ট করেছো? তখন এ জায়গার কী অবস্থা! হাট নেই, বাজার নেই, পথঘাট নেই! হেঁটে হেঁটে পায়ে কড়া পড়েছে। সাইকেলে কত মাইল যেতে হত যেন! উরেব্বাস, যখন ফিরে আসতে তখন মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে যেত।

আহা, তখন যৌবন-বয়স। ও বয়সে কষ্ট করাই ভাল। গায়ে লাগে না। বরং ভালই হয় তাতে।

সেই জন্যই বুড়ো বয়সে কষ্ট করতে দিই না। তা একটু-আধটু করতে চাও তো করো। এই তো বলছিলে, কাজ করতে গিয়ে মনে হয় ছাইভস্ম করছি। হঠাৎ মন পাল্টালে কেন?

এই দেখ, ওকালতি পাশ করে এলে নাকি? তখন বলেছিলাম, তখন একরকম মনে হয়েছিল বলে। এখন মনে হচ্ছে, তুমি কথাটা খারাপ বলনি।

তা হলে যাও, বাগানে বসে একটু গাছপালার সেবা দাও।

কাজটা বিষ্ণুপদর খুব পছন্দের। এবার ভারী বর্ষায় গাছ বেড়েছে খুব। বাগান দেখার কেউ নেই বলে আগাছায় একেবারে বনবিবির থান হয়ে আছে! দা আর কোদাল নিয়ে লেগে গেল বিষ্ণুপদ। লেগে গিয়ে বুঝল, শরীরের সেই ক্ষমতা আর নেই। হাত পায়ে যেন জরা একেবারে বাটখারার মতো চেপে বসে আছে। দমেও বেশ ঘাটতি হচ্ছে।

নয়নতারা বারান্দার কোণে কখন এসে দাঁড়িয়ে তার কাণ্ড দেখছিল। এবার চেঁচিয়ে বলল, ওগো, অত হুড়মাড় কোরো না। বয়স বসে নেই। ধীরে সুস্থে সইয়ে সইয়ে করো। কোদাল চালাতে হবে না, গাছের গোড়াগুলো একটু সাফ করে দাও, তাতেই হবে।

রোদ উঠল। বউরা উঠল। ছেলেরাও উঠে পড়ল। রামজীবন সকালে উঠে বাপ-মাকে প্রণাম করে রোজ। আজ বাপকে খুঁজে না পেয়ে বলল, ও মা, বাবা কোথায় গেল?

বাগানে কাজ করছে।

অ্যাঁ! বলো কি? বাবার কি আর সেই ক্ষমতা আছে? ছিঃ ছিঃ!

ওরে, কিছু হবে না। কাজে থাকলেই ভাল থাকবে।

খুঁজতে খুঁজতে যখন আতা গাছের তলায় বিষ্ণুপদকে খুঁজে পেল রামজীবন, তখন বিষ্ণুপদ মস্ত একখানা আতা ভেঙে মগ্ন হয়ে খাচ্ছে। আর মাখন লেগে আছে ঠোঁটের পাশে।

বাবা!

আয় রে, বোস। আতা খাবি?

বসবার মতো জায়গা এটা নয়। বর্ষা গেছে এবার খুব। মাটির পোরে পোরে এখনও জল ঢুকে আছে। ঠেসে বসলে পাছার কাপড় ভিজে যাবে।

এঃ হেঃ, এ যে ঠাণ্ডা লাগিয়ে ফেলবেন বাবা! বাগানের কাজ করতে গিয়ে হার্টের গড়বড় হয়ে গেলে? আপনি উঠুন, ঘরে যান। আতা পেড়ে ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বিষ্ণুপদ একটু হেসে বলে, অমন হুড়ো দিচ্ছিস কেন? বেশ লাগছে এখানটায়। বোস না ঘাসের ওপর!

রামজীবন বসল। বলল, মায়ের আক্কেল দেখে অবাক হই। সকালেই লাগাল বাগানের কাজে! কেন, গাঁয়ে কি কামলার অভাব।

তোর মা লাগায়নি। আজ এমনিতেই একটু ইচ্ছে হল। শরীর নাড়লে খিদেটাও পায়।

তা বটে। কিন্তু বেশি নাড়ানাড়ি কি ভাল এই বয়সে!

তোরা সবাই মিলে আমাকে এমন বুড়োই বানালি যে, নিজেকে বুড়ো ভাবতে ভাবতে অথর্ব হয়ে যাচ্ছি।

তা একটু হাঁটাহাঁটি করলেই তো পারেন। বসা শরীরকে হঠাৎ দুনো খাটালে হিতে বিপরীত হবে যে?

আচ্ছা, একটা কথা বলবি?

কি কথা বাবা?

তোর এত পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, তবু খারাপ অভ্যাসগুলো এল কোথা থেকে রে?

রামজীবন যেন একটু লজ্জা পেয়ে মাথা নামাল। কিন্তু কথাটা পাশ কাটাল না। একসময়ে রামজীবনই ছিল বিষ্ণুপদর ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে সুপুরুষ। কৃষ্ণজীবনও খুব সুপুরুষ আর জোয়ান সমর্থ বটে, কিন্তু তত

লম্বা-চওড়া না হলেও রামজীবনের রং আর মুখের গড়ন ছিল চমৎকার, ছেলেবেলায় যাত্রাপালায় বালক কৃষ্ণ সাজত। কিছু গুণ ছিল, কিন্তু অগুণগুলোই কেন যে বেড়ে উঠল কে জানে! আজকাল আর রামজীবনের চেহারায় কোনও জলুস নেই। চোঁয়াড়ে একখানা মুখ, গায়ের রঙ তামাটে, মাথার চুলে এই বয়সেই পাক ধরেছে। পোশাক-আশাকের তেমন কোনও চাকচিক্য নেই। মুখখানা যখন তুলল রামজীবন, তখন বড্ড বিমর্ষ একটা ভাব এসেছে মুখে। একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, কুসঙ্গে পড়েই তো ওসব হয় বাবা!

আর একখানা মস্ত আতা ভেঙে বিষ্ণুপদ তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, নে, খা।

হাত বাড়িয়ে নিল রামজীবন। কিন্তু খেল না। চুপ করে বসে রইল।

বিষ্ণুপদ বলল, এ গাছে যে এত আতা হয় জানতামই না। এইটুকু ছিল গাছটা।

গত বছর থেকে ফলন দিচ্ছে। বাগানটা জঙ্গল হয়ে থাকে বলে কেউ আসেও না, লক্ষও করে না। গত বছর অবশ্য বিশেষ ফলন হয়নি। দু-চারটে মাত্র। এ বছর ঢেলে দিয়েছে।

বিষ্ণুপদ আতার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে খেতে খেতে বলে, গাছ কত সয় বয়, ফল দেয়। গাছের কাছে শিখতে হয়। কত কী শেখার আছে!

রামজীবন মাথাটা নত করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, সংসারটা আমার জন্যই ছারেখারে যাচ্ছে বাবা।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, তুমিও কেউ নও, আমিও কেউ নই, নিজেকে নিমিত্ত ভাবিস কেন?

আমি মোদো মাতাল লোক, পয়সা ওড়াই, ঝগড়া বিবাদ করি।

আতার একখানা বিচি ফুড়ুক করে ফেলে বিষ্ণুপদ বলে, সবাই একরকম হয় না। কৃষ্ণজীবন তো অনেক ফারাকে। তুই আর বামা নিজেদের আর ছাড়িয়ে উঠতে পারলি না।

সেই কথাই তো বলছি।

বটতলার ওরা কারা বল তো! চিনতে পারছি না। মাঝে মাঝে আসে।

বন্ধুবান্ধবের মতোই। তবে চক্করটা ভাল নয়!

খুনখারাপি করে নাকি?

তা করে।

তোর সঙ্গে সম্পর্কটা কেমনধারা?

বিকেলের দিকে বসা হয় মাঝে মাঝে।

তোর কি ওদের কাছে কোনও দেনা আছে?

হয়ে যায় মাঝে মাঝে।

দেনা করিস কেন? আমরা যখন খুব গরিব ছিলাম তখনও বাবা শেখাত, দেনা করতে নেই। আমরা তো অল্পেস্বল্পে চালিয়ে নিতে শিখেছি। তুই পারিস না?

মদ আর জুয়াই আমাকে খেল।

আর কিছু নেই?

আছে বাবা। সেসব আপনার শুনে কাজ নেই।

চুরি-ডাকাতি?

ফের অধোবদন রামজীবন মুখখানা অনেকক্ষণ বাদে তুলে বলল, দুটো ডাকাতিতে ছিলাম।

ওইটেই খারাপ করেছিস। গেরস্তরা কত কষ্টে রোজগার করে, তা কেড়ে নিস কেন?

আতা খেতে খেতে এত সরলভাবে কথাটা বলল বিষ্ণুপদ যে, রামজীবনের বুকে কথাটা যেন দুটো টোকা মেরে উড়ে গেল। রামজীবন উদাস গলায় বলল, দিনকাল যা পড়েছে বাবা, এসব ছাড়া আর উপায় কি বলুন! গাঁ-গঞ্জের অবস্থা তো আরও খারাপ।

বিষ্ণুপদ ছেলের দিকে চেয়ে বলে, এই যে আতা দেখছিস, বিচিতে ভরা। গিজ গিজ করছে বিচি। বিচি ফেলে তবে আর মাখনটুকু খেতে হয়। তাই না? মানুষের জীবনটাও তেমনই। মেলা বিচি। ওসব বাদছাদ দিয়ে তবে খেতে হয়। বাঁকা পথ নিবি কেন? এ বংশের যা ধারা, তাতে ওসব কি তোর সইবে? কঠিন হয়ে পড়বে যে!

বাবাকে নিয়ে একটা বিস্ময় আছে রামজীবনের। বাবা তাকে কখনও বকেনি, মারা তো দূরের কথা! যখন বখে যাচ্ছিল সে, তখনও কিছু বলত না কখনও। সেই নিরীহ মানুষটি আজ যে সব বলছে তাও শাসন করার জন্য নয়। ভালবাসার জন্যই।

রামজীবন হাতের আধখানা আতার দিকে চেয়ে রইল। থাকতে থাকতে বুঝতে পারল তার চোখে জল আসছে। একটু স্খলিত গলায় বলল, আপনাদের কষ্ট আমি তো দেখতে পারি না।

কষ্ট কি? কষ্টের বোধ না থাকলে কষ্টও নেই। চিরটা কাল আমরা এই ভাবেই তো দিব্যি কাটিয়ে এসেছি। আরও কত লোক আছে! আমাদের বাড়িতে যারা ভিক্ষে চাইতে আসে তারা তো আমাদের চেয়েও কত খারাপ আছে।

রামজীবন মাথা নেড়ে বলে, ওসব আমার সহ্য হবে না বাবা। আমার কিছু একটা করাই চাই।

বিষ্ণুপদ হঠাৎ বলল, তুই কি কৃষ্ণকে হিংসে করিস?

হিংসে! বলে রামজীবন একটু থমকে গেল। একটু সময় নিয়ে গলাটা এক পর্দা নামিয়ে বলে, বড়দাদা বড় হয়েছে, আমরা তো হলাম না। বড় জ্বালাপোড়া হয় বাবা।

যখন জ্বালা হয় তখন খুন চাপে তোর মাথায়?

তা চাপে বাবা।

তা হলেই বোঝ মনের মধ্যে কেমন যম বসে আছে আসন পেতে! ঠাকুর বলেন, বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়।

বাবা, জ্বালাপোড়ারও একটু দরকার হয়। নইলে যে টগবগ করে না ভিতরটা। ওই হিংসেটাই তো আগুন!

রান্নার আগুন আর ঘরপোড়া আগুন কি এক?

তা নয় বটে।

বিষ্ণুপদ খুব হাসল, আতা খেয়ে আমার খুব কথা আসছে রে আজ।

আপনি আরও বলুন বাবা। আমার শুনতে ইচ্ছে যাচ্ছে।

দূর পাগল, আমি কি একটা পণ্ডিত লোক নাকি!

আমার কাছে আপনার চেয়ে বড় আর কে আছে?

ওই তো মায়ায় বাঁধিস!

মায়া ছাড়া সংসারে আর আছেটাই বা কি!

বিষ্ণুপদ বলল, মায়া আছে। আবার বৈরাগ্যও আছে।

বড়দাদা যদি আমাদের পিছনে থাকত বাবা, তা হলে কিন্তু এরকমটা হতে পারত না। আজ যে আমরা পতিত হলাম তার জন্য আপনার বড় খোকাই কিন্তু দায়ী।

ওরকম ভাবতে পারিস। আবার অন্যরকমও ভাবা যায়।

সে কি রকম?

কৃষ্ণও কিছু কম কষ্ট করেনি। জামা নেই, জুততা নেই, বই খাতা নেই, পেটে ভাত নেই, সে একটা দিনই গেছে! সেখান থেকে এত উপরে উঠেছে—সে তার নিজের জোরে।

তা না হয় হল। কিন্তু সে ডাঙায় উঠল বলে যারা ডুবছে তাদের টেনে তুলবে না? বউয়ের আঁচল ধরে বসে রইল গিয়ে, এরকম কি কথা ছিল? আমরা যে তাকে মাথায় করে রেখেছিলাম বাবা!

যেমনটি চাস তেমনটিই যদি সব পাওয়া যেত, তা হলে আর সংসারের মহিমা কি? ভগবানের তো ক্ষমতার অভাব নেই! লহমায় মানুষের সব দুঃখ ঘুচিয়ে দিতে পারেন। দেন না বলেই মানুষের কিছু মান-মর্যাদা এখনও আছে।

পয়সার দুঃখটাই দুঃখ নয় বাবা, সে যে আমাদের ছেড়ে চলে গেল।

পয়সার দুঃখকে দুঃখ বলে ভাবিস না, সে খুব ভাল। কিন্তু সংসারে আরও সব দুঃখ আছে। আমরা হচ্ছি শতচ্ছিন্ন কাপড়, রিপু দিয়ে, সেলাই দিয়ে চালাতে হয়। রেগে যাস কেন?

মাথাটা গোলমাল লাগে।

হিংসের চোটেই মদ খাস?

রামজীবন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে হঠাৎ বলল, আপনি কি অন্তর্যামী বাবা?

দুর বোকা! আমাকে ঠাওরালি কী তোরা?

আমি যে বড়দার ওপর রাগের চোটেই মদ খাওয়া ধরেছিলাম, এত জ্বালাপোড়া নেবাই কিসে?

মদে কি জ্বালা জুড়োয়?

না বাবা। একটু অন্যরকম লাগে।

তাই তো। বড্ড অন্যরকম হয়ে যাস তখন! রামজীবন বলে চিনতে পারি না।

রামজীবন হাসল, বড়দার ওপর আমার বড় রাগ বাবা। কিছুতেই রাগটাকে কমাতে পারি না।

আমার একটা কথা মনে হয়।

কী বাবা?

যখন ছোটো ছিলি, তখন তুই ছিলি কৃষ্ণজীবনের সবচেয়ে ন্যাওটা। ছায়ার মতো পিছু পিছু ঘুরতি। যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই রাম। মনে আছে?

থাকবে না? খুব মনে আছে।

আমার মনে হয় আজও তুই বড়দাদাকে মনে মনে সবচেয়ে বেশি ভালবাসিস। কিন্তু হিংসের চোটে, রাগের চোটে তা বুঝতে পারিস না। রাগ আর হিংসের চাপানে ভালবাসাটা ঢাকা পড়ে আছে। ঠিক যেমন পানায় ভর্তি পুকুর। ওপর থেকে মনে হয় ডাঙা, কিন্তু নিচে টলটল করছে জল।

কেমন সুন্দর কথা বলেন আপনি বাবা! রোজ এমন করে বলেন না কেন?

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, ওরে, আমার তো মনে হচ্ছে আতা খেয়ে আমার একটু নেশা হয়েছে। নইলে এত বলি কি করে?

রামজীবন খুব হাসতে লাগল। শরতের সকালটা যেন সোনা ঝরিয়ে দিতে লাগল চারদিকে।

৩৭

দেশে ও বিদেশে এত বেশি কনফারেন্স, সেমিনার এবং বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হয় তাকে যে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিটা ঠিকমতো করে উঠতে পারে না। এ ব্যাপারে কৃষ্ণজীবনের অপরাধবোধ প্রবল। চাকরি ছেড়ে দিলেও এখন তার বিশেষ ক্ষতি নেই। বিদেশে ভাল চাকরির প্রস্তাব তো আছেই, তা ছাড়া এমনিতেই বিদেশ থেকে বক্তৃতা বাবদ সে বিদেশী মুদ্রা যা পায় তাতে স্বচ্ছন্দে সংসার চালিয়ে দিতে পারে। স্ত্রীর রোজগারের টাকাটাও কম নয়। কিন্তু কলকাতার চাকরিটার ওপর তার একটা মায়াও আছে। বিজ্ঞানহীন, ঔৎসুক্যহীন, উৎসাহহীন এই দেশের নিরুদ্যম ছেলেমেয়েদের মধ্যে সে একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রবাহিত করতে চায়। সংসারে বা সমাজে তাকে যতই বাস্তববোধহীন, অন্যমনস্ক এবং প্রায় বোকা বলে মনে হোক না কেন, সে যখন ক্লাস নেয় তখন সমস্ত ক্লাস থাকে চিত্রার্পিত, সম্মোহিত। তার চেহারা ভাল, গলার স্বর ভাল, চমৎকার ইংরিজিও বলতে পারে, কিন্তু সে সবচেয়ে ভাল পারে নিজেকে উজার করে দিতে। ক্লাসে কে শুনছে বা শুনছে না, কে নোট নিচ্ছে বা নিচ্ছে না সেটা বড় কথা নয়। সে মগ্ন হয়ে যায় তার বিষয়বস্তুতে। এত ডুবে যায় যে, ক্লাস শেষ হওয়ার ঘণ্টা অবধি কানে যায় না।

এবার পুজোর আগে কয়েকটা দিন কৃষ্ণজীবন প্রাণ ঢেলে পড়াল। তার ছাত্রী ও ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই কৃতী হবে, যশস্বী হবে কৃষ্ণজীবন জানে। দেশে ও বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে এরা। কিন্তু শেষ অবধি এদের বেশির ভাগই মোটা বেতনের চাকরি করবে। চাকরিই করবে। প্রভূত ধনাগম হবে এদের। গাড়ি-বাড়ি হবে। নাম হবে। অহঙ্কার হবে। তাতে পৃথিবীর কিছু এসে যাবে না। কিছুই ইতরবিশেষ হবে না এই বিশাল গরিব ভারতবর্ষের। রুজি-রোজগারেই সীমাবদ্ধ থাকবে এদের জ্ঞান। গবেষণার ভিতর দিয়ে পৃথিবীর কিছু উপকারও করবে বটে এরা, তবু সীমাবদ্ধ থাকবে নিজেদের সীমাবদ্ধতায়। ওই খোলসটা ভাঙা দরকার। পৃথিবীতে জ্ঞানী ও কৃতীর কোনও অভাব নেই। অভাব নিজের সংসার, নিজের অভ্যাস ও চরিত্রের খোলে বন্দী নয় এমন মানুষের। কে কত বড় বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক হল, কে পেল কোন শিরোপা তা জেনে কোন লাভ হবে চব্বিশ পরগনার মূর্খ এক গরিব চাষীর?

নিজের সীমাবদ্ধতাকে বড় বেশি টের পায় বলেই কৃষ্ণজীবন আজকাল আরও একটু বেশি অস্থির। সে কিছুতেই অর্জিত জ্ঞান ও দার্শনিকতার সঙ্গে জনজীবনের যোগাযোগের রাস্তাটা খুঁজে পায় না।

তার এক প্রাক্তন ছাত্রের সঙ্গে ওয়াশিংটনে দেখা হয়েছিল তার। ধীরেশ। একটা বেসরকারি সংস্থায় বিশাল চাকরি করে। তাকে বাড়িতে নিয়ে গেল নিমন্ত্রণ করে। বেশ বড়সড় বাড়ি। ডলারের তেজে বাড়ি যেন ঝলমল

করছে। ঝলমল করছে সুন্দরী বাঙালী স্ত্রী এবং মেয়ে। অনেকক্ষণ ধীরেশের সফলতার চিহ্নগুলো লক্ষ করে মিতবাক্ কৃষ্ণজীবন বলেছিল, তুমি অল্প বয়সেই খুব উন্নতি করেছে।

ধীরেশ লজ্জার সঙ্গে বলল, এ কোম্পানিতে আমিই একমাত্র বাঙালী স্যার।

কৃষ্ণজীবন ধীরেশের দিকে চেয়ে বলে, এতে তুমি খুশি তো!

ধীরেশ উজ্জ্বল হাসি হেসেছিল।

কৃষ্ণজীবন তার ধীর, অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলল, এর পর যদি কখনও আসি আমি জানতে চাইবো পৃথিবীর ঋণ তুমি কতটা শোধ করেছে।

তার মানে স্যার?

আমাকে অনেকেই পাগল বলে জানে, অ্যাবনরমাল মনে করে। কিন্তু আমি মনে করি প্রত্যেকটা মানুষই এই পৃথিবীর কাছে নানাভাবে ঋণী। যে যেমনই হোক, যত বড় বা ছোট, তার উচিত সেই ঋণ একটু করে শোধ করা। রোজ শোধ করা। যে-মানুষ পৃথিবীর ঋণ শোধ করে না, কিন্তু সুখভোগ করে, ঐশ্বর্য সঞ্চয় করে, সে লুটেরা, তস্কর। আর যাই করো, শুধু নিজেকে নিয়ে থেকো না।

ধীরেশ অপ্রস্তুত। তার সুন্দরী বউয়ের মুখভার। কৃষ্ণজীবন তাদের ডিনারের আসরটি প্রায় মাটি করে দিয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে আরও সব অতিথিরা এসে যাওয়ায় আবহাওয়া পাল্টে গেল। রবীন্দ্রসঙ্গীত, সুরা, সুস্বাদু খাবার ও নানা প্রসঙ্গের আড্ডায় মাটি হতে হতেও ডিনারটা বেঁচে গিয়েছিল।

সেই থেকে কৃষ্ণজীবন কিছু সাবধান হয়েছে।

ইউনিভার্সিটির ঠিকানায় সেই ধীরেশের একটা চিঠি পেল কৃষ্ণজীবন। ধীরেশ চিঠির সঙ্গে পাঁচ হাজার ডলারের একটা চেক পাঠিয়েছে। লিখেছে, স্যার, অনেকদিন ধরে আপনার কথা ভাবছি। মনে হচ্ছে, আমি সত্যিই পৃথিবীর জন্য কিছু করছি না। হয়তো সেরকম কিছু করার কথা ভাবলেও কী করব তা স্থির করতে পারব না। কিন্তু আপনি কিছু করার চেষ্টা করছেন। আপনি যা করছেন তাতে আমার সমর্থন ও সহযোগিতা জানাতেই চেকটা পাঠাচ্ছি। আপনি টাকাটা কাজে লাগালে মনে করব আমিও পৃথিবীর খানিকটা কাজে লাগলাম। শুনলাম আপনি অক্টোবরে লস এঞ্জেলেসে আসছেন। আমার বাড়িতে যদি পায়ের ধুলো দেন তবে ধন্য হবো।

কৃষ্ণজীবন চেকটার দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ ভাবল। তাই তো! বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানো এবং ভাবনা-চিন্তা করা ছাড়া সে তো এমন কিছু করে না যাতে টাকাটা কাজে লাগানো যাবে! সে কি ধীরেশের চেয়ে কম স্বার্থপর?

চেকটা সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরল কৃষ্ণজীবন। তারপর ভাবতে বসল, কী করা যায়! কীভাবে কাজে লাগানো যায় টাকাটা? ধীরেশ তো তার পৃথিবীর ঋণ শোধ করতে লেগেছে। কিন্তু সে এখন কী করে?

বাড়িতে কেউ ছিল না। বিকেল পার হয়ে সন্ধে ঘনঘোর হল সাততলার ঘরে। একা ভূতগ্রস্ত কৃষ্ণজীবন বসে রইল তার চেয়ারে। কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারল না।

সন্ধের পর রিয়া ফিরল তার ছেলেমেয়ে নিয়ে।

কি গো, বসে বসে কী করছে অন্ধকারে?

একটা কথা ভাবছি।

কী কথা?

আমার একটি ছাত্র কিছু টাকা পাঠিয়েছে। তার ইচ্ছে, কোনও সৎ কাজে টাকাটা খরচ করা হোক।

ওমা, এ তো ভাল কথা! দুশ্চিন্তার কী আছে?

আমি ভেবে পাচ্ছি না। তুমি বলতে পারো টাকাটা কিভাবে খরচ করা যায়?

কত আশ্রম, মিশন আছে। দিয়ে দাও। দুর্গতের সেবা হবে।

কৃষ্ণজীবন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সেটাও ভেবেছি। কিন্তু সেটা তো ধীরেশ নিজেই করতে পারত। আমাকে টাকাটা পাঠাল কেন?

তুমি সব ব্যাপারই কেন জটিল করে নাও বলো তো!

কৃষ্ণজীবন ম্লান হেসে বলে, খুব বেশি সহজ আর শর্টকাট করাই কি ভাল? ধীরেশ তো আমেরিকাতেই টাকাটা কোনও সমাজসেবায় দিতে পারত। দেয়নি।

তা হলে যা ভাল বোঝো করো।

কৃষ্ণজীবন চুপ করে গেল। ধীরেশ তাকে একটু বিপাকে ফেলেছে।

দোলন কৃষ্ণজীবনের অন্ধ অনুকারী। বাবা যা বলে তাই তার কাছে বেদবাক্য। কৃষ্ণজীবন কবে তাকে শিখিয়ে দিয়েছিল, বাইরে থেকে ফিরে হাত পা মুখ ধুতে হবে, সে অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করে। আজও হাত মুখ ধুয়ে পোশাক পাল্টে তবে বাবার কাছে এল দোলন।

বাবা, আজ আকাশে মেঘ নেই, তারা দেখবে না?

চলো যাই।

টেলিস্কোপ আর দোলনকে নিয়ে ছাদে উঠে এল কৃষ্ণজীবন। দোলন তারা দেখতে লাগল, কৃষ্ণজীবন বসে রইল তার পাশে।

আচ্ছা বাবা, আকাশে কটা যেন নীহারিকা আছে!

আমাদের জানার মধ্যে কয়েক শো কোটি। জানার বাইরে কত আছে তার তো হিসেব নেই। গুনে শেষ করা যাবে না?

না। সংখ্যাকে হার মানতেই হয় এক সময়ে। সংখ্যা দিয়ে আকাশের তারার হিসেব অসম্ভব।

দোলন অসহায়ভাবে বাবার দিকে চেয়ে বলে, তা হলে?

কৃষ্ণজীবন মৃদু হেসে বলে, আকাশের দিকে চাইলে তুমিও যা আমিও তা। শিশুমাত্র।

তুমি তো কত জানো বাবা!

হ্যাঁ বাবা, যত জানছি, ততই বোকা হয়ে যাচ্ছি। থই পাই না।

আলোর গতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল তো, বাবা!

হ্যাঁ।

ওই স্পীডে যদি যাওয়া যায় তা হলেও কি আমরা কখনও আমাদের ছায়াপথের শেষে পৌঁছতে পারব না?

না। আলোর গতিতে কোনও বস্তু কখনও ছুটতে পারে না। যদি পারে তবে সে আর বস্তু থাকে না।

তা হলে?

আকাশের কথা আকাশের কাছেই থেকে যাবে। কিছু জানা যাবে, অজানা থেকে যাবে আরও অনেকটাই।

আমি তো গল্পের বইতে পড়ি, অনেক দূরের গ্রহ থেকে নানারকম মানুষ আসে। সত্যি বাবা?

না দোলন। আজ অবধি আকাশের কোথাও কেউ আছে বলে জানা যায়নি।

একদম না?

তা বলা যায় না। কিন্তু নক্ষত্রগুলো এত দূরে যে, তাদের গ্রহমণ্ডল আছে কি না তা ধরা যাচ্ছে না। আমরা যে সব নক্ষত্রের আলো দেখতে পাই সেগুলো হাজার, লক্ষ, কোটি বছর আগেকার পুরনো আলো, পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে অতটা সময় লেগেছে তাদের। এখন সেখানে কী হচ্ছে তা জানা যাবে ফের হাজার, লক্ষ, কোটি বছর পর।

উরেব্বাস!

সত্যিই উরেব্বাস। ওসব নিয়ে ভেব না, মন খারাপ হবে।

আমি যখন ইস্কুলে বন্ধুদের কাছে তোমার কথাগুলো বলি তখন সবাই খুব অবাক হয়। বিশ্বাস করতে চায় না।

কী বলে?

আমি আকাশ আর গ্রহ নক্ষত্রের কথা বলি। ওরা কেউ আমার মতো এত জানে না। বলে, ভ্যাট, গুল মারছিস।

জানে না বলেই বলে।

সুকান্ত নামে একটা ছেলে আছে, তার বাবা নাকি বলেছে মানুষ একদিন আকাশটা জয় করে নেবে। তাই বাবা? আমি কিন্তু বলেছি, পারবে না।

নেগেটিভ কথা না বলাই ভাল। তবে তুমি বোধ হয় ঠিকই বলেছে। মানুষের ক্ষমতা খুব সামান্যই।

কোনওদিন পারবে না বাবা?

না পারাটাই স্বাভাবিক।

বিজ্ঞান নাকি সব পারে বাবা?

কৃষ্ণজীবন স্তিমিত গলায় বলে, বিজ্ঞান আমি কতটুকু জানি দোলন? যতটুকু জানি তা দিয়ে কিছু অনুমানও করা যায় না। তোমরা বড় হয়ে তেমন বিজ্ঞানের সন্ধান কোরো। এখন অবধি মানুষের বিজ্ঞান বড় দুর্বল। বড় সামান্য।

বিভু বলে একটা ছেলে আছে, সে বলে, ভগবান-টগবান নেই। সব বাজে কথা। বিজ্ঞানের যুগে কি কেউ ভগবান মানে? সত্যি বাবা?

আমি জানি না দোলন। মানুষের অজানা কত কি আছে এখনও।

ভগবান নেই বাবা?

কৃষ্ণজীবন একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে, হয়তো আছেন। বিজ্ঞান কিন্তু বলেনি যে ভগবান নেই।

বিজ্ঞান তা হলে কী বলেছে, বাবা?

বিজ্ঞান বলে, যতদূর জানা যায় ততদূর পর্যন্ত ভগবান বলে কাউকে পাওয়া যায়নি।

ভগবান কি অনেক দূরে?

হয়ত খুব কাছেই। আমরা ভুল করে দূরে তাঁকে খুঁজি।

আচ্ছা, ভগবান তো দূরের তারাগুলোকে চেনে, না বাবা? ইচ্ছে করলেই চলে যেতে পারে?

যারা ভগবানকে মানে তারা ওরকমভাবে বলে না। তারা বলে ভগবানই এই সব গ্রহ-নক্ষত্র হয়ে আছেন, গাছপালা হয়ে আছেন, জীবজন্তু হয়ে আছেন, তুমি-আমি হয়ে আছেন।

সত্যি বাবা?

তাই তো শুনি।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তো!

তুমি তো খুব ছোট। এসব বুঝতে সময় লাগে।

আকাশের কথা ভাবতে ভাবতে আমার খুব মন খারাপ হয়ে যায়।

কেন যায় দোলন?

ওই যে তুমি বলো, মানুষ কখনও আকাশের অন্য সব নক্ষত্রে যেতে পারবে না।

কৃষ্ণজীবন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কিছু জিনিস আমাদের জানার বাইরেও থাক না দোলন।

কেন বাবা?

মানুষ চোখ দিয়ে দেখে, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে। কিন্তু চোখ আর বুদ্ধিই তো সব নয়। অনুভব করতে হয়। ভাবতে হয়। বিশ্বজগতের সঙ্গে নিজেকে একাকার করে দিতে হয়।

সেটা কেমন বাবা?

আমি কি সব কথার জবাব দিতে পারি? ওই যে বললাম, আমার আজকাল কেবলই মনে হয়, আমি কিছুই জানি না।

দোলন বাবার কাছ ঘেঁষে বসে মুখের দিকে চেয়ে বলে, তুমি যখন ফরেনে যাও তখন আমার খুব কান্না পায়। কেন যাও বাবা? এবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে?

তোমার যে ইস্কুল থাকে!

পুজোর ছুটিতে আর সামারে নিয়ে যাবে?

আর একটু বড় হও, তখন নিয়ে যাবো। এখন মাকে ছেড়ে বাইরে গেলে তোমার কষ্ট হবে।

মাকেও নিয়ে যাবো। দিদিকেও। দাদাকেও।

ও বাবা, অত পয়সা কোথায় পাবো দোলন? প্লেনের টিকিটের যে অনেক দাম!

তবে তুমি যে যাও!

আমার টিকিটের টাকা অন্যেরা দেয়। নইলে কি যেতে পারতাম?

কেন দেয় বাবা? তারা আমাদেরটা দেবে না?

আমি তাদের কাজ করে দিই বলে তারা আমার ভাড়া দেয়। তুমি বড় হয়ে যখন কাজ করবে তখন তোমারটাও দেবে।

ব্যাপারটা গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ ভাবল দোলন। তারপর হঠাৎ উঠে পড়ে বলল, চলো বাবা, রিমোট কন্ট্রোলের গাড়িটা চালাই দুজনে মিলে।

প্রস্তাবটা কৃষ্ণজীবনের খুবই পছন্দসই। বাচ্চাদের খেলনা নিয়ে খেলতে তার এখনও ভাল লাগে। ব্যাটারিচালিত ছোট ভিডিও গেম, রিমোট গাড়ি বা রুবিক কিউব নিয়ে মাঝে মাঝে সে দোলনের সঙ্গে মেতে যায়। তাতে তার মাথার ভার কমে যায়, মন হালকা হয়।

আজও দোলনের রিমোট গাড়ি নিয়ে খেলতে খেলতে মনটা ভালই লাগছিল তার। কিন্তু একটা পিন ফোটার মত ছোট্ট খোঁচা বিঁধেই রইল ভিতরে। ধীরেশ টাকাটা তাকেই কেন পাঠাল?

সামান্য সব চিন্তা ও উদ্বেগ কৃষ্ণজীবনকে বড্ড অন্যমনস্ক করে দেয়। গুরুতর চিন্তা-ভাবনায় ছেদ পড়ে। চেকটা সে কি ভাঙাবে, না কি ফেরত পাঠাবে? সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

রাত গভীর হল। রাতের খাওয়া শেষ করে সবাই শুতে চলে গেলে রোজই অধিক রাত অবধি কিছু পড়াশুনো করে কৃষ্ণজীবন। এটা তার প্রিয় অভ্যাস।

ফোনটা এল অনেক রাতে। বারোটা বাজবার দশ মিনিট পর।

কী করছেন?

কে বলছেন?

হিঃ হিঃ! আমি অনু।

অনু! ওঃ, এত রাতে জেগে আছো কেন?

আজ আমার ঘুম আসছে না। আমি তো জানি আপনি রাত জেগে পড়েন, তাই ফোন করছি। কেমন আছেন আপনি?

তুমি কেমন আছো?

ভাল নেই। মন খারাপ।

কেন মন খারাপ?

আমার মাঝে মাঝে ভীষণ মুড অফ্ হয়ে যায়।

তুমি খুব মুডি, তাই না?

খুব। আচ্ছা, আমি আপনাকে ডিস্টার্ব করছি না তো!

না। আমি ছেলেমানুষদের সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসি।

আমি মোটেই ছেলেমানুষ নই। আপনি আমার ফ্রেন্ড না? ফ্রেন্ডকে বিলিটল্ করতে নেই, জানেন না?

ওঃ, তাই তো। কিন্তু দোলনও তো আমার খুব বন্ধু।

দোলন আর আমি তো এক নই। আপনি বড্ড সেকেলে। এত ওল্ডি সেজে থাকেন কেন বলুন তো!

আমি একটু ওল্ডিই বটে।

মোটেই না। ইউ আর এ নাইস পারসোনেল ম্যান। আই লাইক ইউ ভেরি মাচ।

কৃষ্ণজীবন শঙ্কাজড়িত এক রকমের হাসি হাসল। তারপর বলল, তুমি একটি পাকা আর বিচ্ছু মেয়ে।

পাকা আর বিচ্ছু? তা হলে ছেলেমানুষ নই তো!

এত অ্যাডাল্ট হওয়ার ইচ্ছে কেন? যতদিন পারো শৈশবকেই ধরে রাখো। শৈশবের মতো সুন্দর সময় আর নেই। বড় হলে দেখবে পৃথিবীটা একদম বিচ্ছিরি।

কিন্তু আপনি তো পৃথিবীটাকে খুব ভালবাসেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কৃষ্ণজীবন বলে, তা বাসি। সেই ভালবাসার জ্বালায় জ্বলেপুড়ে মরছি।

কবে দেখা হবে বলুন তো! আপনাকে আমার ভীষণ দরকার।

তাই বুঝি? তবে আসো না কেন?

যদি হ্যাংলা ভাবেন সেই ভয়ে ঘন ঘন যাই না। যদিও খুব যেতে ইচ্ছে করে। আপনার কথা শুনতে শুনতে আমার কেমন একটা হিপনোটিক কন্ডিশন হয়।

এটা কি কমপ্লিমেন্ট?

না। স্টেটমেন্ট অফ এ ফ্যাক্ট।

শোনো অনু, তুমি রোজ এলেও তোমাকে হ্যাংলা ভাববো না। এতে হ্যাংলামির কি আছে?

আপনি বিরক্ত হবেন না?

একদম না।

আসলে আমার স্কুলেও পড়ার ভীষণ প্রেশার ছিল। সময় পাচ্ছিলাম না। বাবার হার্ট অ্যাটাক হওয়ায় আমার অনেক ব্যাক লগ জমে গেছে।

তোমার বাবা এখন কেমন আছেন?

অফিসে যাচ্ছে। নাউ হি ইজ ও-কে। কিন্তু হার্ট একটা ভীষণ আনপ্রেডিক্টেবল থিং। তাই না?

ঠিকই বলেছো।

অনু হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল।

হাসলে কেন?

হার্টের কথায়। আপনার হার্ট, আমার হার্ট, সব হার্ট-ই কিন্তু আনপ্রেডিক্টেবল।

কথাটার মানে কি অনু?

আমাদেরও তো হার্ট অ্যাটাক হতে পারে? পারে না?

তুমি খুব দুষ্টু মেয়ে।

আপনি মিনিংটা ধরতে পারলেন কি?

পারলাম।

আপনি কি জানেন যে, ইউ আর কোয়াইট অ্যাট্রাকটিভ?

জানি না। কেউ এরকমভাবে আমাকে বলেনি কখনও।

আমি বলছি বলে রাগ করবেন না তো!

এটা তো খুশি হওয়ার মতোই কথা অনু। এই বয়সে টিনএজারদের কাছ থেকে এরকম কমপ্লিমেন্ট তো রেয়ার জিনিস।

শুনুন, আমার কিন্তু খুব বকবক করতে ইচ্ছে করছে।

করো না!

আপনি যে হাই তুললেন এইমাত্র!

যাঃ, কোথায় হাই তুলেছি?

তোলেননি তো!

না। আমার হচ্ছে ইচ্ছে-ঘুম।

আমার আজ কেন ইনসোমনিয়া হচ্ছে, জানেন?

কি করে জানবো? শুনলাম তো মুড অফ্।

হ্যাঁ, তাই। আজ আমি সকাল থেকে অনেকের সঙ্গে ঝগড়া করেছি।

ও বাবা, ঝগড়াও করো নাকি?

আসলে ঝগড়া করে আমি সকলের কাছে হেরে যাই।

সেটা কিন্তু খুব ভাল। কি নিয়ে ঝগড়া হল?

তার কোনও মাথামুণ্ডু ছিল না। এটা সেটা নিয়ে। মুড অফ্ থাকলে যা হয়। আজ যেমন আমার একজন বন্ধুকে বলেছিলাম, তোর নাকটা কিন্তু বিচ্ছিরি। ব্যস লেগে গেল। তারপর মায়ের সঙ্গে লাগল, দিদির সঙ্গে লাগল। রাতে ঘুম আসছে না, শুয়ে শুয়ে মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ আপনার কথা মনে হল। মনে হল, আপনার মতো ভাল বন্ধু আমার আর কেউ নেই।

সত্যি?

সত্যি। ভীষণ সত্যি।

৩৮

নিমাইচরণ আছে নাকি? ও নিমাইচরণ!

নিমাই ঘরেই ছিল। মাটির মেঝেতে মেলা গর্ত হয়েছে, ধসে বসেও গেছে কিছু জায়গা। মাটি কুপিয়ে এনে ভরাট করছিল গলদ্‌ঘর্ম হয়ে। শাবলটা রেখে দরজার কাছে এসে দেখে, সনাতন দাঁড়িয়ে আছে। রোগা, কালো, ছোটখাটো সনাতনের সঙ্গে নিমাইয়ের নিজের একটা ভারি মিল আছে।

ক্ষেত কোপাচ্ছিলে নাকি হে! কাদামাটি মেখে বসে আছে যে!

নিমাই হাসল, না। বর্ষার পর দেখছি ঘরে মেলা গর্ত হয়ে আছে। পোকামাকড়ের তো অভাব নেই। মাটি ঠাসছি।

বীণাপাণি নেই বুঝি ঘরে?

না। এসো, ঘরে এসে বোসো।

দুনিয়াতে ভাল লোকের বড় অভাব যাচ্ছে। খুব টানাটানি। সনাতনকেও তাই তেমন ভাল লোক বলা যায় না। আজকাল পেটের দায়ে লোকে নানা ধান্দা আর ফিকিরে ঘোরে। টাকাটা সিকেটার জন্য জলের মতো মিছে কথা কয়। একসময়ে পগার সঙ্গে সাঁট ছিল সনাতনের। তবে ভাগীদার নয়, সঙ্গে সঙ্গে ফিকির নিয়ে ঘুরত। পগা খুন হওয়ার পর কাকার দল এর ওপরেও হামলা চালিয়েছিল, যদি চুরি-হওয়া ডলারের সন্ধান পাওয়া যায়। সনাতন ভাল লোক না হতে পারে, তবে নিমাইয়ের সঙ্গে বেশ বনিবনা আছে। একটা জায়গায় একটু অমিল। নিমাই এক বিয়ের বউ নিয়েই হিমসিম খায়, সনাতনের তিনখানা বিয়ে। সনাতন কিছু লাখোপতি লোক নয়, টানাটানির সংসারে তিনখানা বউ নিয়ে থাকতে বুকের পাটা লাগে। সনাতনের ওইটেই আছে। আর বিশেষ কিছু নেই।

রবারের চটিজোড়া বাইরে ছেড়ে সাবধানে ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক চেয়ে সনাতন বলল, বসার ব্যবস্থা নেই দেখছি।

নিমাই উদার গলায় বলে, বিছানাতেই বোসো না। জলচৌকি আর মোড়া উঠোনে, ডালের বড়ি রোদে দেওয়া হয়েছে। তা কি খবর-টবর বলো।

খবর বিশেষ কিছু নেই। দোকানখানা বেচে দিতে হল। চলছিল না তেমন।

নিমাই একটু অবাক হয়ে বলে, বেচে দিলে! এখন দোকানই হল বাঁধা লক্ষ্মী। আমি কতকাল ধরে চেষ্টা করেও দোকান দিতে পারলাম না আজও। আর তুমি বেচে দিলে!

বাজারে বা জমাটি জায়গায় দোকান হলে কি বেচতাম নাকি! তেমন আহাম্মক পাওনি। পাড়ার মধ্যে ছোট্টো কারবার। বাকি না দিলে দোকান চলে না, আদায় উসুল করতে নাভিশ্বাস ওঠে। ডিমসুতো থেকে জ্বর পেট-খারাপের অ্যালোপ্যাথি ওষুধ অবধি রাখতে হত। মাল কিনবার পয়সাটা কোত্থেকে আসবে বলো! তার ওপর ঘরে তিনখানা চামুণ্ডা খাঁড়া হাতে সর্বদা আমার মুণ্ডু খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাই দিলাম বেচে। যা দাম উঠল তা ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিয়ে দিয়েছি। এখন ঘরে খানিক শান্তি হয়েছে। মেয়েমানুষের মন্তর হল টাকা। যখনই লাফঝাঁপ করবে কিছু টাকা ফেলে দাও, মুখে কুলুপ।

তা নয় বুঝলুম, কিন্তু তোমার এখন চলবে কিসে?

আরে, সেই পরামর্শেই তো আসা তোমার কাছে। হাত পা ধুয়ে বোসো জুত করে। একটু বুদ্ধি বের করি দুজনায়।

নিমাইয়ের মনটা প্রসন্ন হল। তার সঙ্গে পরামর্শ খুব কম লোকই করে। সে হাতমুখ ধুয়ে গামছায় কষে হাত পা মুছে আলগোছে বিছানায় বসল। বলল, তারপর বলো।

সনাতন খুব নিবিষ্ট হয়ে ভাবছিল। বলল, দুনিয়ায় মেলা লোক করে-কর্মে খাচ্ছে, চোখের সামনে সব ধাঁ করে বড়লোক হয়ে যাচ্ছে, দেখছো তো! কিন্তু নিমাইচরণ, আমরা কমতিটা কিসে বলতে পারো? আমাদের কিছু হচ্ছে না কেন!

সকলের কি সব হয়? না সয়?

তুমি একটা সাধু-বোষ্টম মানুষ, ওকথা বলতে পারো। কিন্তু আমার অত বৈরাগ্য নেই। আমার দুটো পয়সার মুখ দেখতে ইচ্ছে যায়। তিনখানা সংসার বলে নয়, একটু মনের মতো থাকব—এ আমার অনেক দিনের ইচ্ছে। কিন্তু কি করলে যে হবে, তা বুঝতে পারি না।

এক আহাম্মক এলেন আর এক আহাম্মকের কাছে বিষয়বুদ্ধি নিতে। সে বুদ্ধি থাকলে আমিই কি বসে থাকতাম নাকি!

সেইটে ভাবি বলেই তো তোমার কথাই আমার মনে পড়ে সবসময়ে। ভাবি কি জানো, আমারও ভিতরে মাল আছে, তোমারও ভিতরে আছে। একবার তেড়েফুঁড়ে লাগলে আমরাও কম যাই না। কি বলো?

গামছাখানা কোল থেকে তুলে নিমাই নিজের মুখটা মুছে বলে, কী করতে চাও বলো তো!

দোকান-টোকান আর করে লাভ নেই ভায়া। বড় ভ্যাদভ্যাদে কাজ। পয়সাও নেই, তার ওপর রোজ লোকজনের সঙ্গে আদায় উসুল নিয়ে ঝগড়া-কাজিয়া হচ্ছে। ও আমার আর ভাল লাগে না। একটু বড় কিছু ফাঁদতে না পারলে জীবনটাই বৃথা।

নিমাই একটু চুপ করে থেকে বলে, বড়লোক হতে সাধ হয়েছে বুঝি? কাজটা শক্ত।

সনাতন তার সরু মুখখানা ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে এগিয়ে এনে বলে, শক্তটা কিসের? আমাদের কোন জিনিসটা নেই বলো তো!

আমার কথা বলতে পারি। আমার টাকা নেই, বড় হওয়ার তেমন তেজালো ইচ্ছেও নেই। সেইজন্যই বীণার হাতে-তোলা হয়ে বসে আছি। মনে হচ্ছে আমাকে দিয়ে তেমন কিছু হবে না।

সনাতন একথায় যেন বসে বসেই নেচে উঠল, কেন হবে না? বুদ্ধি করে, মাথা ঠাণ্ডা রেখে, ঠিকমতো টাকা খাটালে না হবে কেন? চারদিকে দুনিয়াটা ধাঁ-ধাঁ করে বেড়ে উঠছে, আমি যেন পিছিয়ে পড়ছি। অথচ ভেবে

দেখেছি, আমার কিছু কমতি নেই। তোমারও নেই।

বললাম যে, আমার টাকা নেই। টাকা হলে ভেবে দেখতাম।

তোমার বউয়ের কিন্তু টাকা আছে।

তোমার মাথা! বউ কত টাকা মাইনে পেত জানো? বড়লোকের কুকুরের পিছনেও তার চেয়ে ঢের বেশী খরচ হয়। এই সবে দুদিন হল কাকা অন্য একটা কাজে লাগিয়েছে, কিছু বেশী পাচ্ছে।

নুন-পান্তার জোগাড়টুকু তো আছে। তাই বা কম কিসে? আমি বলি কি এরকম জড়ভরত হয়ে থাকার চেয়ে কিছু একটাতে নেমে পড়ি চল।

কিসে নামবে? ভেবেছো কিছু?

না। তোমার সঙ্গে সেই নিয়েই কথা। কিছু একটা ঠিক করো তো! এভাবে আর পারা যায় না।

দোকান বেচে কত টাকা পেলে?

ও দোকানের দামই বা কী? মালের দাম সমেত দোকানঘরের জলেরই দাম ধরো।

কে কিনল?

লটারিওলা পন্টু। পাড়ার মধ্যে দোকান বলে দরটাও উঠল না।

না বেচলেই ভাল করতে।

ও কথা বোলো না। বাজারে চার হাজারেরও বেশী অনাদায়ী টাকা পড়ে আছে। মাল তুলতে পারছিলাম না। আদ্দেকের ওপর বাকির খদ্দের। পন্টু কিনল দোকান করবে বলে নয়। সে অন্য কারবার ফাঁদবে। এটাকে গুদামঘর করবে। তা তার যা-খুশি করুকগে। আমার আর ওসব ছোটখাটো কারবারের দিকে নজর নেই। তুমি কথাটা গ্রাহ্য করছে না কিন্তু!

করছি। কিন্তু মাথায় বুদ্ধি খেলছে না। সময় লাগবে।

সময় কি আর বসে থাকবে ভায়া! বয়সও বসে পান-তামাক খাবে না, জিরোবে না। কলঘড়ি টিকটিক করে খরচ হয়ে যাবে। আয়ুতে বেড় পাই এমন জিনিস করতে হবে।

আমার বিষয়বুদ্ধিতে মেলা ফাঁক। আমাকে দিয়ে বড় কিছু হওয়ার নয়। বীণা মনোহারি দোকানের কথা বলে, তাইতেই আমি ভয় খাই। ছোটখাটো একটা ফল-পাকুড়ের দোকান অবধিই আমার দৌড়।

ফলের দোকান থেকে ক' পয়সাই বা পাবে? একটু বড় কিছু ভাবো। ঠিকাদারি-টারি করলে হয় বা একটা কারখানা গোছের কিছু।

উরেব্বাস! তোমাকে নির্ঘাৎ ভূতে পেয়েছে।

কেন? কী এমন বললাম?

আমি এক ঠিকাদারের চৌকিদার ছিলাম, তাতে টাকার খেলা বড় কম দেখিনি। গোডাউনে দেড় দু'লাখ টাকার মাল সবসময়ে থাকত। পাঁচ-সাতটা ট্রাক রোজ খেপ মারত। পঞ্চাশটা কর্মচারী আর শ'খানেক কুলির বেতন, ইঁট, পাথর, সিমেন্ট, কাঠ কত কি জোগাড় করতে হত, হিসেব রাখতে হত! ও সে এক গন্ধমাদন ব্যাপার।

সনাতন একটু যেন দমে গেল। তারপর বলল, আচ্ছা, প্লাস্টিকের ব্যাগের কারবারটা কেমন? ধরো যদি নিজেরা তৈরি করে বেচি?

সব ব্যবসাই ভাল। সব কিছুরই বাজার আছে। তবে অন্ধিসন্ধি জানা চাই।

কে একজন বলছিল সেদিন, এ তল্লাটে দেশলাই তৈরির কারখানা নেই। সেটা করলেও তো হয়।

হয় তো বটেই। ফেল কড়ি, মাখো তেল। দেশলাই করতেও কম হাঙ্গামা নাকি?

তুমি সব কথাতেই জল ঢেলে দিচ্ছো! সকালবেলাটায় তোমার কাছ থেকে দুটো ভাল কথা শুনতে এলাম।

নিমাই হেসে বলে, ভাল কথা আজকাল আর পেটে আসতে চায় না। ভাল কথা মানেই মিছে কথা। মন-রাখা কথা। কথা দিয়ে কীই বা হয়! তা বাড়ির অবস্থা কী তোমার? ঝগড়াঝাঁটি হচ্ছে না তাহলে?

সনাতন একটা ভ্যাংচানি দেওয়ার মতো মুখ করে বলে, আমাদের সংসারে ঝগড়া দিয়ে দিন শুরু হয়, ঝগড়া দিয়েই শেষ হয়। ঘুম ভাঙল কি লেগে পড়ল। মানুষ যে মানুষের এত শত্রু হয়, তা না দেখলে বিশ্বাস হবে না। ভাবি, একটা কাজকারবার নিয়ে মেতে থাকলে সংসার থেকে একটু তফাতে থাকতে পারতাম।

সংসার মানেই ভেজাল। ও নিয়ে ভেবে কী হবে?

আজকাল আর ভাবি না। টাকাপয়সা দিয়ে দিয়েছি, এখন নিজের নিজের আখের দেখুক।

নিমাই হাসল, ওটা একটা কথা হল? সংসার যদি এত জঞ্জাল তবে তিন তিনটে বউ ঘাড়ে নিলে কেন?

সনাতন চুপ করে রইল। কৃতকর্মের জন্য দুঃখেই বোধ হয়। তারপর বলল, একটা বড় রকমের কিছু আমাকে করতেই হবে। তখন তোমাকেও সঙ্গে নেবো।

নিও। বেকার বসে আছি, কোনও কাজে লাগলে ভালই হবে। তবে হঠাৎ করে বড় লাফ দিও না। মাজা ভাঙবে।

তা ভাঙুক। তেমন বড় করে না ফাঁদতে পারলে বেঁচেই বা কী সুখ হচ্ছে বলো তো! তোমার কাছে দুদণ্ড বসলে মনে বেশ শান্তি পাই।

সনাতন আরও খানিক আগডুম বাগডুম বলে বিদায় নিল। দোকানে গিয়ে এখন সময় কাটছে না তার।

নিমাই হাতের কাজ সারতে ফের উঠে পড়ল। ঘরের পিছন দিকটার ভিত ক্ষয়ে গেছে অনেক। বেড়ার নিচে বেশ বড় গর্ত। চোর এলে আর সিঁদ কাটতে হবে না। সেখানটায় মাটি চেপে বসানো কঠিন কাজ। অনেকটা সময় লাগল নিমাইয়ের। ঘরে আর একটা গর্ত বেরোলো মাটির একটা জালার নিচে। সেটায় মাটি ঠাসতে গিয়ে ভিতরে সাদামতো কী একটা নজরে পড়ে গেল তার। প্লাস্টিকে মোড়া একটা টিফিন বাক্সের মতো।

নিমাই হাত ঢুকিয়ে জিনিসটা টেনে বের করল। তারপর অবাক হয়ে দেখল, সাদা রঙের খুব বড় একটা টিফিন বাক্সই। কিছুদিন আগে তাকে দিয়েই এটা কিনিয়ে এনেছিল বীণা। বাক্সটা খুলে সে আরও হাঁ হয়ে গেল। ভিতরে বেশ একটা মোটাসোটা প্যাকেট। ওজন আছে। প্যাকেটটা খুলে এত হতভম্ব হয়ে গেল নিমাই যে, পাক্কা দশ মিনিট চেয়ে বজ্রাহতের মতো বসে রইল। দরজা জানালা হাট করে খোলা। সেটা খেয়াল ছিল না নিমাইয়ের। তার মনে তো পাপ নেই। মৃদু একটা গলা খাঁকারির শব্দে একবার চেয়ে দেখল, সনাতন ফিরে এসেছে। দরজার বাইরে থেকে হাঁ করে দেখছে তাকে। কিন্তু হঠাৎ কি মনে করে সে পট করে ঘুরে পা চালিয়ে চলে গেল।

এই সেই জিনিস যার জন্য এত খুনখারাপি, এত অশান্তি! এল কোথা থেকে? না, বেশী বুদ্ধি খাটাতে হল না তাকে। দুইয়ে দুইয়ে যোগ করলে যে চার হয় এটা এ যুগে কে না জানে?

নিমাই প্যাকেটটা সাবধানে মুড়ে ফের গর্তের মধ্যেই রেখে দিল। ওপরে মাটি ঠেসে দিল ভাল করে। গোবর মাটি গুলে সারা ঘর নিকিয়ে দিল। আজ রোদ উঠেছে চড়চড়ে। তাড়াতাড়ি ঘর শুকিয়ে যাবে।

উঠোনে কলমের আমগাছটার তলায় বসে নিমাই আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগল। অনেক কথাই মনে পড়ল তার। বীণা তাকে একদিন বলেছিল, হঠাৎ লটারির টাকা পেলে সেটা অধর্ম হবে কিনা! আরও অনেক কিছু।

বীণার নতুন চাকরিটা হওয়ার পর থেকে দিনের বেলাটায় নিমাইকেই রাঁধতে হয়। বীণা সময় পায় না। কাকার কারবার দু'মাস ঝিমিয়েছিল, এখন আবার রমরম করে চলছে। বীণার এখন অনেক কাজ।

রান্না সামান্যই হয়। একটা ঝোল আর ভাত। বড় জোর তার সঙ্গে কিছু একটা সেদ্ধ। নিমাই সেটা করে ফেলল। স্নান করে চুপচাপ বসে রইল ফের গাছতলায়।

বীণা ফিরল দুপুর গড়িয়ে। মুখখানা বেশ হাসিখুশি। নতুন চাকরিতে নতুন রকমের সুখ আছে। শোনা যাচ্ছে স্মাগলিংটা ঠিকমতো চললে বিশ্ববিজয় অপেরার পালাও নামবে। সেটা পুজোর মধ্যেই।

খেতে বসে বীণা বলল, কী গো, মুখখানা আজ অমন কেলে হাঁড়ির মতো কেন? কী হল আবার?

বলতে সাহস হয় না।

বীণা একটু অবাক হয়ে বলে, কী এমন কথা!

জিজ্ঞেস করলে সত্যি কথা বলবে তো?

বলব না কেন? কী হয়েছে?

আজ ঘর মেরামত করতে গিয়ে জালার নিচের গর্তে একটা জিনিস পেলাম। একটা প্যাকেট। তাতে মেলা ডলার আর পাউন্ড।

বীণার মুখখানা হঠাৎ ছাইবর্ণ হয়ে গেল। চোখের পলক নেই।

এ কি পগার সেই জিনিস বীণা?

বীণা মাথাটা ধীরে নামিয়ে নিল। তারপর ক্ষীণ স্বরে বলল, হ্যাঁ।

সে রেখে গিয়েছিল তোমার কাছে?

হ্যাঁ।

বলোনি তো!

বললে তুমি রাখতে দিতে আমার কাছে?

না। কিন্তু সে পরের কথা। বললানি কেন?

বলিনি, তোমাকে বিপদে ফেলতে চাইনি বলে।

নিমাই দুঃখে ছলোছলো চোখে বলে, পরের জিনিস ফিরিয়ে দিলে না কেন? ওতে যে কত সর্বনাশ হয়ে গেল!

কাকে ফিরিয়ে দিতাম বলল তো! কার টাকা ওটা? পগা রেখে গিয়েছিল। সে খুন হল তো টাকার ওয়ারিশ কে? কাকে গিয়ে বলব যে, এই হল পগার টাকা, আপনি নিন?

কাকা যখন এল তখন দিলে না কেন?

ওকে দেব কেন? ও টাকা তো কাকার নয়, পাপা সিং-এর কিনা তাও ঠিকমতো জানি না। তবে পাপের টাকা, এটা ঠিক। তাই ভাবলাম, এ টাকা আসলে কারও নয়। যে পাবে তার। কাউকে বলিনি, লুকিয়ে রেখেছি। তবে তোমাকে বলতে চেয়েছি অনেক বার। কিন্তু তুমি অবুঝ মানুষ, সাধুসন্ত মানুষ, তুমি সংসারী মানুষের মাথা দিয়ে চিন্তা করবে না। তাই সাহস হয়নি।

টাকাটা আমাদের তো নয় বীণা।

তাই বা বলছো কি করে? টাকার গায়ে কি কারও নাম লেখা আছে? পগা তো আমাকে বলে যায়নি এ টাকা কাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। বলে গেলে দিতাম।

কিন্তু দুটো লোক যে খুন হল!

খুন হয়েছে তার আমি কী করব বলো? এক-আধবার ইচ্ছে হয়েছে কাকাকে গিয়ে টাকাটা দিয়ে আসি। পরে ভেবেছি, সময়মতো দিইনি, এখন দিলে হয়তো লোকটা রেগে যাবে, আমাকেও আর বিশ্বাস করবে না। সংসারে চলতে অনেক কূটবুদ্ধি চাই গো। শুধু ভালমানুষী নিয়ে চলা কঠিন।

নিমাই মাথা নেড়ে বলে, কথাটা মানতে পারি না। টাকাটা যখন আমাদের নয় তখন ওটা লুকিয়ে রেখে নিজের অশান্তি বাড়াতে গেলে কেন?

তোমাকে বলব বলে ভেবেছিলাম। তবে আরও পরে। আমাদের যা অবস্থা তাতে চলে না। ভেবেছিলাম তোমাকে সব খুলে বলে এ টাকা দিয়ে তোমাকে একটা ভাল দোকান করে দেবো। তারপর নাটক-ফাটক সব ছেড়ে দিয়ে সংসার করব।

এরকম ভাবতে পারলে বীণা!

জানি তো, তুমি মানবে না। তবু টাকাটা ঘরে আছে বলে একটু যেন জোর পাই। আগে বলো, টাকাটা কি সরিয়ে ফেলেছো?

না বীণা। সরাবো কেন? যেখানে ছিল সেখানেই আছে।

আমাকে তোমার ঘেন্না হচ্ছে?

নিমাই সবেগে মাথা নেড়ে বলে, তোমাকে ঘেন্না করার সাধ্যিই আমার নেই। কিন্তু বড় মায়া হয়, দুঃখ হয়। লোভের জালে পড়লে মানুষের বড় কষ্ট।

তোমার কেবল ওই কথা!

আমি যা বলি তা যদি মানতে না পারো মেনে না। কিন্তু কথাটা বড় খাঁটি। তবে কিনা আমার মুখে মানায় না।

আমি তো বলছি তুমি ভাল লোক। তোমাকে কোনও পাপ করতে হবে না। পাপ শুধু এই পাপীয়সীই করুক। তুমি বাধা না দিলেই হল।

তাহলে কি তুমি আমার কেউ নও? সম্পর্কটা কি এমন যে, তোমার মন্দ হলেও চুপ করে থাকব?

চুপ করে না থাকলে যে আমাদের উপায় নেই!

নিমাই কিছুক্ষণ দম ধরে থেকে বলে, টাকাটা নষ্ট করে ফেলবে বীণা?

বীণা চমকে উঠে বলে, বলো কী! লক্ষ্মী সেধে ঘরে এসেছেন, নষ্ট করে ফেলব কেন?

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, লক্ষ্মী চোরাপথে এলে আর লক্ষ্মী থাকে না কিনা। টাকাটা বড়ই অলক্ষুণে। পগা গেল, আর দু-দুটো তরতাজা লোক চলে গেল। সেই খুন-হওয়াদের একজনের চাকরিতেই তুমি ঢুকেছো। কেমন যেন অসোয়াস্তি হচ্ছে। লক্ষণ কিছু ভাল দেখছি না।

বীণা একটু নরম হয়ে বলল, টাকাটা নিয়ে তুমি যে অশান্তি করবে তা জানতাম। শোনো, ও টাকা যেমন আছে থাক, আমি ওটাতে হাত দেবো না। টাকাটা আমাদের ঘরে ঘুমিয়ে থাকবে। তাহলে তোমার আপত্তি নেই তো?

নিমাই কাহিল মুখে বীণার দিকে চেয়ে থেকে বলে, কিসে পাপ হয়, কোথা থেকে কোন ফুটো দিয়ে কর্মফল এসে ঢোকে, তা কে জানে! আমি বোকাবুদ্ধির মানুষ। সাদামাটা কী বুঝি জানো? ওসবের মধ্যে জড়াতে নেই! রাস্তায় পয়সা পড়ে থাকলেও আমি কখনও কুড়োই না। পয়সা বড় মারাত্মক জিনিস।

তুমি ভয়েই মরলে। ভয়-ভয় ভাব সবসময়ে থাকলে মনটা দুর্বল হয়ে যায়। অত ভয় পেয়ো না তো! আমরা গরিব মানুষ, আমাদের অত খুঁটিনাটি পাপ ভগবান ধরবেন না। গরিবের পাপ তাপ ভগবান মকুব করে দেন।

ওরকম বুদ্ধি ভাল নয় বীণা। পয়সা জিনিসটাই খারাপ। কত লোভী, পাপী, খুনী, কৃপণের হাত ফেরতা হয়ে তবে আমাদের হাতে আসে। আমার কী মনে হয় জানো? পয়সার মধ্যে ওসব মানুষের ছাপ থেকে যায়। এক একটা টাকা যেন অনেক লোভ পাপ দীর্ঘশ্বাস ধরে রাখে।

তোমাকে যে পাগলামিতে ধরেছে গো!

তা হবে। আমার মনটা বড় খারাপ। তার ওপর সনাতনটাও দেখে গেল।

বীণা ভয়ঙ্কর চমকে উঠে বলল, সনাতন দেখে গেল মানে?

আজ সকালে এসেছিল বুদ্ধি পরামর্শ করতে। নতুন কারবার খুলতে চায়। সে চলে যাওয়ার পর ঘর সারতে গিয়ে বাক্সটা পেলাম। পেয়ে যখন মাথায় হাত দিয়ে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছি, তখন কী মনে করে সনাতন ফিরে এসেছিল। দরজার বাইরে থেকেই নজর করেছে বোধ হয়। কিছু না বলে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

সর্বনাশ!

নিমাই মাথাটা বুঝদারের মতো নেড়ে বলে, সর্বনাশেরই কথা কিনা! টাকা বড় সর্বনেশে জিনিস। তার ওপর এ হল বেওয়ারিশ টাকা, অধর্মের জিনিস। যতক্ষণ ঘরে থাকবে ততক্ষণ তোমাকে ভয়ের বাঘে খাবে, লোভের ভালুক এসে সাপটে ধরবে। সনাতন জেনে গেল বলে ভয় পাচ্ছো, হক্কের টাকা হলে ভয়ের কিছু ছিল, বলো?

তুমি ভাষণটা একটু থামাবে? কত বড় বিপদ ডেকে আনলে বলল তো! আহাম্মকের মতো সব বের করে বসেই বা ছিলে কেন? এখন কী হবে!

নিমাই মুখ কাঁচুমাচু করে বলে, আমি তো জন্ম-আহাম্মক। আমার কথা বাদ দাও।

বীণা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, পল্টুও খানিকটা জানে। একবার ওকে কয়েকটা ডলার বেচে যে কী বোকামিই করেছি! নাঃ, বনগাঁয়ে আর থাকা যাবে না। হ্যাঁ গো, পালপাড়ায় যাবে?

পালপাড়া! সেখানে গিয়ে কী হবে?

হবে কিছু একটা।

পালাতে চাইছো নাকি? ওতে সুবিধে হবে না। পালপাড়া তো আর তেমন দূরের জায়গা নয়। এদের পাল্লার মধ্যেই।

বীণা কাঁদো কাঁদো মুখ করে বলল, তাহলে কী হবে? আমার যে সব গেল। কাকার কানে কথাটা গেলে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

নিমাই খুব শান্ত ঠাণ্ডা গলায় বলল, মানুষ ভয় পেলে নানা আগড়ম বাগড়ম ভাবতে থাকে, উল্টোপাল্টা সব চিন্তা আসে। বীণাপাণি, ভয়টাকে যে কেন ঘরে পুষে রেখেছো সেটা ভাল করে ভেবে দেখ।

সব নষ্টের গোড়া তো তুমি! কেন যে মাটি খুঁড়ে বের করলে লুকোনো জিনিসটা!

নিমাই মাথা নেড়ে বলে, সব ভবিতব্য। আমার তো ও বস্তুর খোঁজ পাওয়ার কথাই নয়। কিন্তু দেখ ভবিতব্য এমন যে, তুমিই আমাকে ক'দিন ধরে কেবলই বলে যাচ্ছো, ওগো, ঘরদোর যে গেল, গর্তগুলো. এবার বুজিয়ে ফেল। জানোই তো ঘর সারতে গেলে ওটা চোখে পড়ে যেতে পারে। মাটির নিচে যে তোমার প্রাণভোমরা রয়েছে সে তো আমার জানার কথা নয়! খুলে দেখে তো আমার ভিরমি খাওয়ার জোগাড়।

বড্ড বকো তুমি। অত কথা বললে মানুষের পেটে কথা থাকে না। তোমার জন্যই আমার একদিন মরণ লেখা আছে কপালে। কেবল নীতিকথা কইলে পেট চালাই কি করে? শোনো, ও টাকা কারও হক্কের টাকা নয়। কেউ ওর ওয়ারিশও নয়। আমার হাতে যখন আছে তখন ওটা আমার। কাউকে দানছত্তর করতে পারব না, মা-লক্ষ্মীকে তাড়াতেও পারব না। ওসব অলক্ষুণে চিন্তা মাথা থেকে তাড়াও। ও টাকাকে রক্ষা করতে হলে কী করতে হবে, সেইটে ভেবে দেখ পালপাড়ায় গেলে আপাতত হয়তো কথা উঠবে না।

উঠবে। কাকার চাকরি ছেড়ে পালপাড়ায় যেতে হলে জুতসই একটা অজুহাত চাই।

অত সব খুঁটিনাটি নিয়ে ভাববার সময় নেই। আমি টাকাটা এমন ভাবে লুকিয়ে ফেলতে চাই যাতে কেউ মাথা খুঁড়েও সন্ধান না পায়। কিন্তু এ বাড়িতে সেটা হবে না। বড্ড খোলামেলা বাড়ি।

নিমাই মৃদুস্বরে বলল, টাকাটার ফাঁদে ভাল করেই জড়িয়ে পড়লে বীণা!

আচ্ছা, তুমি কেমনধারা মানুষ বলো তো! জীবনে এত দুঃখকষ্ট সয়েছো, এত হেনস্থা হয়েছে, তবু তোমার একটুও লোভ হয় না কেন? হ্যাঁ গো, তোমার মাথার ব্যামো নয়তো এটা!

নিমাই এই গুরুতর পরিস্থিতিতেও এ কথা শুনে হাসল। বলল, পাগল বলতে চাইছো তো! সে তো অনেকবার শুনেছি।

সনাতন দেখে ফেলেছে, এখন আমার বড় ভয় হচ্ছে। সনাতনটা ভীষণ পাজি।

অত ঘাবড়ে যেও না। সনাতন দেখেছে বটে, কিন্তু বুঝেছে কিনা তা এখনও জানি না। কথা হোক তখন যদি টানেটোনে কিছু বলে তো বোঝা যাবে।

পল্টুও বুঝেছে। বনগাঁ আমার পক্ষে বিপদের হয়ে উঠছে।

পল্টু তেমন লোক নয়। সনাতনের দোকানটা কিনেছে, জানো তো! পল্টুর হাতে এখন মেলা টাকা। ও নিজের কারবার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, তোমাকে নিয়ে ভাবছে না।

কি করে বুঝলে?

আমার ভীষণ ভাব যে ওর সঙ্গে। খুব খাতির করে। সে পেট-পাতলা লোক নয়।

কাউকে বিশ্বাস নেই গো। বনগাঁয়ে যা সব লোক থাকে।

নিমাই ফের মাথা নেড়ে বলে, বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়।

আচ্ছা, আমি নয় খারাপ। পচে গেছি, নষ্ট হয়ে গেছি। তবু এই দুর্দিনে দয়া করে আর শত্রুতা কোরো না। আমি পাপ করি, তাপ করি, নরকবাস তো আমিই করব। তুমি তো করবে না!

শত্রুতা কিছু করলাম নাকি?

ওটাই শত্রুতা। ওই যে আমাকে ভয় দেখাচ্ছো, টাকা নষ্ট করে ফেলতে বলছে, ওটাই এক ধরনের শত্রুতা।

আমি সাত দিন সাত রাত ভেবেও ঠিক পাবো না, কথাটা বলায় শত্রুতা হল কি করে!

সে তুমি ভাবো গে। এখন শোনো, ওই সনাতন শয়তানটা কী দেখেছে আর কী আঁচ করেছে সেটা বুঝবার চেষ্টা করো। হুটপাট কোরো না। মাথা ঠাণ্ডা রেখে কথা বলে দেখো। হয়তো মুখ বন্ধ রাখতে ঘুষ চাইবে।

তাও দেবে?

না, দেবো না।

আমার মাথা গরম হওয়ার কারণ নেই বীণাপাণি। কিন্তু তুমি বড় উচাটন হয়ে পড়েছো। সনাতন আমার মতোই অপদার্থ লোক। বুদ্ধি নেই, চার চোরকো চালাকও নয়। সবচেয়ে বড় কথা ভীতু মানুষ। কিছু দেখে থাকলেও এখনই অস্থির হওয়ার কিছু নেই। শান্ত হও বীণাপাণি। খাও।

খাওয়া! তাই তো! দুজনে ভাত পাতে বসে আছি সেটাই যে খেয়াল ছিল না এতক্ষণ!

তাই দেখছিলাম। সব ঠাণ্ডা মেরে গেল। ঝোলটা কেমন হয়েছে?

তুমি তো সুন্দর রাঁধো।

আজ স্বাদ পাচ্ছো?

পাচ্ছি গো।

বীণাপাণি কয়েক গ্রাস ভাত খেল। কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল যে জোর করে খাচ্ছে। তার খিদে নেই বা রুচি হচ্ছে না।

নিমাই হঠাৎ বলল, তোমার সবচেয়ে বেশী ভয় কাকে বীণাপাণি? সবচেয়ে অবিশ্বাস করো কাকে? সে কি আমি?

বীণাপাণি অবাক হয়ে বলে, ওমা! সে কি কথা?

সেইজন্যই না ওসব কথা চেপে রেখেছিলে! আমাকে তুমি বিশ্বাসও করো না, না?

মোটেই তা নয়। আসলে তুমি দুর্বল লোক বলে তোমাকে সব কথা বলতে ভয় পাই।

বুঝেছি। ঠিকই করো। আমাকে বিশ্বাস করা বোধ হয় ঠিকও নয়।

আহা, আবার অভিমান করছে দেখ। আমার মন ভাল নেই, এখন অমন মুখ গোমড়া করে থেকো না তো! একটু বল-ভরসা দাও।

নিমাই বীণাপাণির দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, তোমার-আমার সম্পর্কটা ঠিক এরকম হওয়ার কথা নয় বীণাপাণি। এ যেন, সে আর লালন একখানে রয়, লক্ষ যোজন ফাঁক।

৩৯

অনেক চেষ্টা করেও ঝুমকি কল্পনায় শহরটাকে ঠিকমতো সাজিয়ে গুছিয়ে বানিয়ে নিতে পারে না। সে যায়নি, কখনও যাবে না হয়তো কোনও বিদেশে। সে বড় জোর যাবে কুলু-মানালি, দক্ষিণ ভারত বা ঘাটশীলা। কিংবা কে জানে। কিন্তু বিদেশ তার কপালে লেখা নেই। বাঙালী মেয়েরা সুন্দর মুখ, উচ্চ মেধা কিংবা দুর্দান্ত ভাগ্য থাকলেই মাত্র বিদেশ-টিদেশ যায়। তার কোনওটাই নেই। তবু কেন মনে মনে বারবার লন্ডন শহরটাকে তৈরি করতে চাইছে সে! কেন দেখতে চাইছে তার রাস্তাঘাট? বাড়ি ঘর? দোকানপাট? মিউজিয়াম? আন্ডারগ্রাউন্ড?

এক একদিন কথা বা প্রসঙ্গ একটা কিছুতে এমন মজে যায় যে আর অন্য প্রসঙ্গই উঠতে চায় না। চারুশীলামাসির বাড়িতে সেদিন নেমন্তন্ন করে আনা হয়েছিল রশ্মি রায় নামে একজন বিলেত-ফেরত মহিলাকে। দেখতে ফর্সা-টর্সা, ফিগারও ভাল, মুখখানা তেমন কিছু নয়। কিন্তু চেহারার চেয়েও যেটা বেশি ঝলমল করছিল সেটা হল মেয়েটির বিদ্যা, বুদ্ধি, স্মার্টনেস, পারসোনালিটি। এত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল ঝুমকি যে, জীবনে এই প্রথম তার দুঃখ হয়েছিল, যে পুরুষমানুষ নয় বলে। পুরুষ হলে সে নির্ঘাৎ রশ্মির প্রেমে পড়ে যেত। পুরুষ না হয়েও কিছু কম পড়েনি। আর সেই সঙ্গে রশ্মির মুখে সেদিন লন্ডনের গল্প শুনে শুনে সেই অচেনা শহরটারও প্রেমে পড়ে গেল সে। লন্ডন শব্দটাই যেন একটা দূরের ঘণ্টাধ্বনি। ওই নামটার মধ্যে কত শিহরণ, কত বিস্ময়।

এক ফাঁকে চারুশীলামাসি তাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল।

ঝুমকি, একটা সত্যি কথা বলবে?

কী হয়েছে মাসি?

তুমি তো এই আধুনিক যুগের মেয়ে, আমার চেয়ে অনেক মডার্ন। মেয়েটিকে তোমার কেমন লাগছে বলো তো!

মেয়েটা তো দারুণ মাসি।

দারুণ বলতে কি বলো তো! দেখতে ভাল, না বুদ্ধিমতী?

দেখতেও ভাল, বুদ্ধির তো কথাই নেই।

মুখের ডৌলটা দেখেছো ভাল করে?

দেখেছি। সারাক্ষণ তো চেয়েই আছি। বেশ ডৌল। ঢলঢলে।

বলছো? কিন্তু আমার যেন একটু রুক্ষ-রুক্ষ লাগছে। অবশ্য চটক আছে।

না মাসি, রুক্ষ কেন হবে? একটুও তো রুক্ষ নয়। বরং ভারি মিষ্টি। তবে সুন্দরী বলতে যা বোঝায় তা নয়। বড় টানা চোখ বা টিকোলো নাক তো নয়। এ হল আহ্লাদী চেহারা।

ঠিক বলেছো। বড় বেশী আহ্লাদী। একটু ন্যাকা নাকি? কি মনে হচ্ছে?

ঝুমকি খুব হাসল, তা একটু হতে পারে। বিলেতে থাকলে ওরকম হয়।

আচ্ছা, অহংকারী নয় তো! দেমাক থাকলে মুশকিল।

তা থাক না দেমাক। ওর দেমাক ওর কাছে। আমাদের কি?

আসলে হয়েছে কি জাননা, তোমাকে খুলেই বলি, আমার যে ওই একটা হাবাগঙ্গারাম ভাই আছে, হেমাঙ্গ, ওর সঙ্গে একটা বিয়ের চেষ্টা করছি। ওর তো উদ্যোগী হয়ে বিয়ে দেওয়ার লোক নেই। ব্যাচেলর থাকারই মতলব। তাই আমি রশ্মির সঙ্গে ওকে ট্যাগ করার চেষ্টা করছি। তোমার কি মনে হয়, দুজনকে মানাবে?

ঝুমকি একটু ভাবল। তার মনে হল, চারুমাসি একটু বাড়াবাড়ি করছে। হেমাঙ্গর মুখে কোনও বোকামির ছাপ নেই। দেখতেও বেশ ভাল। লম্বা, ছিপছিপে, ফর্সা এবং তীক্ষ্ণ চেহারা। তবে মুখে একটু কেবলু-কেবলু ভাব আছে ঠিকই। তবে সেটা ইচ্ছাকৃত বলেই মনে হয় ঝুমকির। সে বলল, বেশ মানাবে মাসি।

চেহারায় মানালেই হবে না, অন্য দিকগুলোও দেখতে হবে। সবার আগে জাত আর গোত্র! কী করে জানা যায় বলো তো!

জাত আর গোত্র কি কোনও বিরাট সমস্যা নাকি? ঝুমকি খুব ভাবল সেদিন। যদি জাত বা গোত্র না ঠিকঠাক হয়, আর যদি দুজনের মধ্যে প্রেম হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে কী হবে? ঝুমকি খুব সরলভাবে জিজ্ঞেস করল, ওদের মধ্যে কি লাভ অ্যাফেয়ার আছে মাসি?

চারুশীলা মুখখানা চোখা করে বলে, তাই তো থাকার কথা। কিন্তু আমার ভাইটাকে তো দেখছে, একদম আনস্মার্ট। প্রেম করতে ভয়ে মরে।

হি হি করে হাসল ঝুমকি, ভয়টা কিসের?

তা ও-ই জানে।

হেমাঙ্গ কাছাকাছি ছিল না। ভাগ্নে আর ভাগ্নীকে নিয়ে অন্য ঘরে গল্প করছিল। পাশাপাশি ওদের কেমন দেখাবে কে জানে। ঝুমকি বলল, আপনি বোধহয় ঠিকই বলেছেন। উনি পালিয়ে আছেন তখন থেকে।

কী অভদ্রতা হচ্ছে দেখ। ডাকো তো ওকে। ওপরে আছে বোধহয়।

বাড়িটা বিরাট এবং বাড়ির মধ্যে নানারকম খোপ, খোঁদল, বিচিত্র ঘর, বিচিত্রতর বারান্দা। একেই বোধহয় ভুলভুলাইয়া বলে। তিনতলাতেও সেই ধাঁধাঁ। ছেলের জন্য একখানা অদ্ভুত ঘর বানানো হয়েছে। দেয়ালে রঙের বদলে মজাদার সব ছবি। একটা দেয়ালে পুরো একটা কমিকস আঁকা রয়েছে। বিছানার ডিজাইন নৌকোর মতো, টেবিল চেয়ার সবই পশু-পাখির আকৃতির। রঙচঙে সিলিং। ঢুকলেই মনে হয়, বুঝি রূপকথার দেশ। সেই ঘরে দেখা গেল, ভাগ্নে-ভাগ্নীকে নিয়ে এয়ারগানে টার্গেট প্র্যাকটিস করছে হেমাঙ্গ।

ঝুমকি খুব মৃদুস্বরে বলল, শুনছেন, আপনাকে মাসি ডাকছেন।

হেমাঙ্গ তার ভ্রু কুঞ্চিত মুখ ফিরিয়ে বলল, ডাকছে? কেন বলুন তো!

আপনাদের অতিথি অপেক্ষা করছেন।

হেমাঙ্গ এয়ারগান রেখে উঠে পড়ল। বলল, চারুদিটা একদম যাচ্ছেতাই।

ঝুমকি লোকটাকে ভাল করে দেখল। প্রেমে-পড়া মানুষের মুখ কেমন দেখতে হয় তা ঝুমকি জানে না। এ লোকটার মুখে তেমন কোনও বিশেষ বিলক্ষণ দেখতে পাচ্ছে না সে। একে যত বোকা বলে জাহির করে মাসি, ততটা বোকাও বোধহয় হেমাঙ্গ নয়।

চলুন, বলে হেমাঙ্গ তার আগে আগে হাঁটতে লাগল। সিঁড়ির মুখে এসে হঠাৎ তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আপনি কি চাকরি পেয়ে গেছেন?

না তো।

চাকরি কেন করবেন? বাড়িতে খুব অভাব, না কি শখ?

না, শখ নয়। বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল। বাবা আর কদিন চাকরি করতে পারবেন কে জানে!

ওঃ হ্যাঁ, সেদিন তো বলছিলেন এসব কথা। খুব দরকার কি?

হলে ভাল হত।

অনেক মেয়ে স্বামীর অধীন থাকবে না, পরিবারের অধীন থাকবে না বলে চাকরি চায়।

আমি সেরকম নই।

না হলেই ভাল। যারা চাকরির মধ্যে স্বাধীনতা খোঁজে তারা কেন বোঝে না যে চাকরিটাও অধীনতা?

অধীনতা হলেও তার কতগুলো নিয়মকানুন আর সিকিউরিটি আছে। সংসারি মেয়েদের সেটা থাকে না।

সিকিউরিটি? প্রাইভেট কোম্পানিতে ওসব থাকে না। বিশেষ করে ছোটো ছোটো কনসার্নগুলোয়।

মেয়েরা শখ করে চাকরি করে না। বাধ্য হয়েই করে।

হেমাঙ্গ কথাটা মানতে চাইল না। ল্যান্ডিং-এ দাঁড়িয়ে হঠাৎ তার দিকে মুখোমুখি হয়ে বলল, একটা কথা বলি আপনাকে। চাকরি করতে হয় তো মাস্টারি করুন। অনেক সেফ, অনেক ভাল।

ঝুমকি মৃদু হেসে বলে, স্কুলের চাকরি আরও দুর্লভ। কলকাতায় বা আশে পাশে তো নয়ই, এমন কি আজকাল গাঁয়ের স্কুলে পর্যন্ত মেয়েদের চাকরিতে ভীষণ কম্পিটিশন।

আপনি বি-এড পড়েছেন?

না।

পড়ুন না! রশ্মি রায়ের স্কুলে হয়তো হয়ে যেতে পারে। নাহলেও ক্ষতি নেই। আমার সঙ্গে অনেক স্কুলের চেনাজানা আছে। কম্পিউটার শিখে কী করবেন?

আমার কম্পিউটার খুব ভাল লাগে।

মুশকিলে ফেললেন।

স্কুলের চাকরিতেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমি তো তার জন্য তৈরি হইনি।

হঠাৎ হেমাঙ্গ বলল, চাকরি করলে মেয়েদের অনেক কিছু হারিয়ে যায়, তা জানেন?

অবাক হয়ে ঝুমকি বলে, কী হারায়?

হেমাঙ্গ মাথা নেড়ে বলে, তা বলব না। বলতে গেলেই দেখি ঝগড়া লেগে যায়। মেয়েরা তো সহজে কিছুই মেনে নেয় না।

ঝুমকি মৃদু হেসে বলে, মানাতে পারলে মানবে না কেন?

হেমাঙ্গ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আপনার সঙ্গে প্রথম আলাপেই একটা বিবাদ হোক, আমি তা চাই না। আজ আমার নার্ভাসও লাগছে।

ঝুমকি হেসে বলে, নার্ভাস কেন?

আমার পাগলী দিদিটিকে কতদিন চেনেন?

খুব বেশিদিন নয়।

চিনলে বুঝতেন কেন নার্ভাস। ওই যে মেয়েটি এসেছে ওটির সঙ্গে দিদি আমার একটা মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে চাইছে। আমি সেটা টের পাচ্ছি আর ভিতরে ভিতরে রেগে যাচ্ছি। ও যে কেন এসব কাণ্ড করে কে জানে!

ঝুমকি খুব সাবধানে বলে, রশ্মিদি কিন্তু খুব ভাল মেয়ে।

সে তো বটেই। আমিও জানি। কিন্তু ভাল মেয়ে বলেই কি তার ওপর হামলা করতে হবে? চারুদি ভালই জানে ওর এসব চেষ্টায় কিছু হবে না।

ঝুমকির এ প্রসঙ্গে কথা বলা উচিত নয়। তাই সে চুপ করে রইল।

হেমাঙ্গ নিজেই বলল, আমি ঝামেলাহীন জীবন পছন্দ করি বলেই একা থাকি। ও যে কেন আমার শান্তিটা নষ্ট করতে চায়।

দুজনে এসে যখন দোতলার মেয়েলি বসার ঘরটায় ঢুকল তখন রশ্মি চা খাচ্ছে আর চারুশীলা তাকে নিজের বোকা ভাইটা সম্পর্কে নানাবিধ বড় বড় কথা বলছে।

রশ্মি হেমাঙ্গকে দেখে মুখ টিপে হেসে বলল, আপনি লন্ডনে কিছুদিন ছিলেন, বলেননি তো!

আজকাল বিলেত যাওয়াটা তো শক্ত ব্যাপার নয়। কে না যাচ্ছে বলুন!

তা অবশ্য ঠিক। আপনাকে এতক্ষণ দেখিনি কেন? কোথায় ছিলেন?

ভাগ্নে-ভাগ্নীদের একটু সঙ্গ দিচ্ছিলাম। এ বাড়িতে তো আপনি ঠিক আমার অতিথি নন, আমার দিদির অতিথি। ও একাই এত কথা বলে যে আমরা কিছু বলার চান্স পাই না।

চারুশীলা হেসে একটা ধমক দিল, অ্যাই মিথুক! কবে আমি বেশী কথা বলি রে?

যে বলে সে টের পায় না। আমরা পাই।

মারব থাপ্পড়! রশ্মি, খবরদার আমার ভাইটিকে বিশ্বাস কেরো না। ভীষণ ফাজিল।

রশ্মি হেসে বলে, আমি ওঁকে একটু জানি। উনি মেয়েদের সামনে খেতে লজ্জা পান, আর-নারী স্বাধীনতার পক্ষপাতী নন।

ঝুমকি মুখ লুকিয়ে হেসে ফেলল।

হেমাঙ্গ একটা চেয়ার টেনে বসে বলল, সংখ্যালঘুদের প্রোটেকশনের ব্যবস্থা সব সরকারের আছে। আমারও প্রোটেকশন দরকার। আপনারা তিন মহিলা, আমি একা।

সেইজন্যই পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন?

খানিকটা সেইজন্যও। আর আমার এ দিদিটির জন্যও। ছেলেবেলা থেকেই লোকের সামনে ও আমাকে নাকাল করে আসছে। জনসমক্ষে তাই ওর কাছাকাছি থাকি না।

তাই বুঝি! আচ্ছা, আপনাকে আমরা কেউ অ্যাটাক করব না। নিশ্চিন্ত হয়ে বসুন।

সন্ধেবেলাটা বেশ কাটছিল ঝুমকির। এক একটা বাড়ির এক এক রকম পরিবেশ। এ বাড়ির পরিবেশ তার বরাবর খুব ভাল লাগে। চারুমাসি হাসিখুশি মজার মানুষ। দারুণ সুন্দরী। সিনেমায় নায়িকার পার্ট করেছেন। সব মিলিয়ে একদম ঝলমল করছেন সবসময়। মন-খারাপ নিয়ে এলে মন ভাল হয়ে যায়। তার চেয়েও ভাল লাগছে রশ্মি রায়কে। ঠাণ্ডা মেজাজের বুদ্ধিমতী মেয়ে। কথা বলে কী সুন্দর! পাশাপাশি যদি নিজেকে তুলনা করে ঝুমকি তাহলে সে কিছুই নয়। না আছে বিচক্ষণতা, না এদের মতো বুদ্ধি, না তেমন ব্যক্তিত্ব।

কিছুক্ষণ কথা-টথা হওয়ার পর চারুমাসি হঠাৎ ঝুমকির দিকে চেয়ে বলে, এই মেয়েটা, তুমি না গান জানো?

গান! বলে ঝুমকি অবাক হয়, কে বলল?

আমি জানি, তুমি নাকি খালি গলায় দারুণ গান গাও।

না, না, বলে লজ্জায় মরে যাচ্ছিল ঝুমকি। এদের সামনে গান গাইবে কি, বসে থাকতেই তার সংকোচ হচ্ছিল।

শেষ অবধি অবশ্য আপত্তি টিকল না। গাইতে হল। খুব বেছে চিন্তা করে দুটি গান গাইল ঝুমকি। রবীন্দ্রসঙ্গীত। কেউ কিছু বলল না তাকে। কিন্তু গানের পর সবাই খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। অনেকক্ষণ বাদে রশ্মি বলল, গান জানি না বলে আজ আমার খুব দুঃখ হচ্ছে।

ব্যস, একটুকুই। হয়তো আরও কথা উঠত, তার গান নিয়ে তার আগেই ঝুমকি রশ্মির কাছ ঘেঁষে বসে বলল, আমাকে লন্ডনের কথা একটু বলবেন? আমার খুব বিদেশের কথা শুনতে ভাল লাগে।

রশ্মি একটু হাসল। বলল, বিদেশের কথা শুনতে সবারই ভাল লাগে। গরিব দেশের মানুষদের ওটা একটা এন্টারটেইনমেন্ট।

তারপর ধীরে ধীরে কথায় কথায় লন্ডন শহরটা যেন একটা কুয়াশা ভেদ করে জেগে উঠতে থাকল ঝুমকির চোখের সামনে। সে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিল। তারপর হেমাঙ্গ বলল। তারপর চারুশীলাও। এরা সবাই বিস্তর বিদেশে ঘুরেছেন। ঝুমকির ভারি দুঃখ হচ্ছিল নিজের জন্য। কত পিপাসা তার বুকে। কত ইচ্ছে। এই জীবনে কিছুই ঘটবে না তার।

গত চারদিন সে একটা ঘোরের মধ্যে আছে। সে কখনও রশ্মির কথা ভাবছে। কখনও লন্ডনের কথা। মাঝে-মধ্যে হু হু করছে বুকের ভিতরটা আত্মগ্লানিতে। কখনও খুব নির্জীব বোধ করছে সে। মাঝে মাঝে সে ভাবছে, আচ্ছা, এত ছোটো, এত সামান্য হয়ে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় নাকি? আমি তো একটু সুন্দর, একটু মেধাবীও হতে পারতাম! কিংবা আরও স্মার্ট!

অপর্ণা সকাল বেলায় ঝুমকির ঘরে এসে দাঁড়াল। মেয়ের দিকে চেয়ে বলল, তোর আজকাল কী হয়েছে বল তো! চা খেয়েছিস, এঁটো কাপটা পর্যন্ত বেসিনে রেখে আসিসনি। বাসি কাপড়টা ছেড়ে মেঝেময় ছড়িয়ে রেখেছিস, বাথরুমের বালতিতে রেখে না এলে ঝি ওটা কোনোদিন ধোবে? ঘুম থেকে উঠে বিছানাটা তুলিসনি। তোর হল কি?

মার সঙ্গে ঝুমকির সম্পর্কটা একটু আড়াআড়ির, আবার কখনও একটু ভালবাসাবাসিরও। হয়তো একেই লাভ-হেট রিলেশন বলে।

ঝুমকি তার রোগা করুণ মুখখানা তুলে বলে, আচ্ছা মা, আমি কেমন মেয়ে বলো তো!

ও আবার কি কথা? কেমন মেয়ে আবার কি।

মা, আমি তো একদম গোল্লামাটা একটা মেয়ে, তাই না?

গোল্লা আবার কিসে পেলি?

সব ব্যাপারে। চেহারায় গোল্লা, লেখাপড়ায় গোল্লা, কাজে কর্মে গোল্লা, স্মার্টনেসে গোল্লা। আমাকে নিয়ে কী করবে তুমি?

কম্পিউটারের পরীক্ষায় ফেল করেছিস নাকি?

সে না হয় করব। কিন্তু সে কথা বলছি না। আমি ভাবছি, আমার মতো একটা অপদার্থ মেয়েকে দিয়ে কি হবে! আমার বেঁচে থাকারই কোনও মানে হয় না।

হঠাৎ এত নিজেকে নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিস কেন?

আজকাল আমি মাঝে মাঝে নিজের একটা অ্যাসেসমেন্ট করি। করতে গিয়ে সব ব্যাপারেই দেখি, আমি ভীষণ বাজে। এমনকি বুবকা আর অনুও কত ভাল আমার চেয়ে।

পাঁচটা ছেলেমেয়ে কি সমান হয়?

তা তো হয় না মা। কিন্তু যে খারাপ তার তো নিজের একটু করুণা হবেই। সে তো জানতে চাইবেই যে, সে কেন আর পাঁচজনের মতো ভাল নয়!

অপর্ণা বিছানায় বসে মেয়ের দিকে চেয়ে বলল, তোর মাথায় মাঝে মাঝে পোকা ঘুরে বেড়ায়। কেন, তোকে কি কেউ খারাপ বলেছে?

মুখের ওপর কি কেউ বলে? বুঝে নিতে হয়।

কার কাছ থেকে কি বুঝলি?

সে আছে।

তুই এত চাপা কেন বল তো! মায়ের কাছে মেয়েরা তো সব খুলে বলে। তুই কখনও কিছু বলিস না। কেন রে? আমাকে মা বলে মনে হয় না তোর?

তুমি খুব ভাল-মা। একটু রাগী, তবু ভাল।

ভাল হয়েই তো মরেছি। ভাল বলেই তো তোরা কেউ গ্রাহ্য করিস না আমাকে।

তা নয় মা। আমার সবসময়ে কথা বলতে ভাল লাগে না।

সে জানি, তোমার বুক ফাটলেও মুখ ফোটে না। কিন্তু এরকম কি ভাল! মানুষ মনের ময়লা কথা দিয়েই তো কাটিয়ে দেয়। কি হয়েছে তোর?

অমনি তুমি দুশ্চিন্তা শুরু করলে নাকি?

মা হলে বুঝবি, সন্তানের জন্য মায়ের বুক কেমন সবসময়ে দুরুদুরু করে।

দুর! দুরুদুরু করার মতো কোনো ঘটনাই নয়।

তাহলে বলতে দোষ কি?

ঝুমকি হেসে ফেলে বলে, কি হয়েছে জানো? আমার একটু পরশ্রীকাতরতা এসেছে।

সেটা আবার কি?

সেদিন চারুশীলামাসির বাড়িতে একটা মেয়েকে দেখলাম, সে বিলেতে জন্মেছে, পড়াশুনা করেছে, এরপর আবার ওখানেই গিয়ে থাকবে।

তা ওরকম তো কতই আছে। আজকাল কত ছেলেমেয়ে বিদেশে থাকে।

তা তো থাকেই। মেয়েটা দেখতেও দারুণ ভাল, লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট, ব্যক্তিত্ব আছে। এত ভাল লাগল মেয়েটাকে। একটুও অহংকার নেই। সোশ্যাল ওয়ার্ক হিসেবে একটা গাঁয়ের স্কুলে পড়ায়। ওই মেয়েটার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকেই কেমন যেন নিজের কথা ভেবে মনটা খারাপ হয়ে যায়।

কেন রে ঝুমকি, তুই কিছু খারাপ আছিস?

তা নয় মা। খারাপ কেন থাকবো? বেশ তো আছি। কিন্তু মাঝে মাঝে ভীষণ মনে হয়, আমার আর কিছু গুণ থাকলে বেশ হত। অন্তত দেখতেও যদি সুন্দর হতাম!

তুই কি দেখতে খারাপ? একটু রোগা, এই যা। যার চোখে আছে সেই জানে, তোর মতো মুখচোখ খুব কম মেয়ের আছে।

মায়ের চোখ দিয়ে দেখো না মা। মায়ের চোখ সবসময়ই ভুল দেখে। কোন মায়ের কাছে তার মেয়ে অসুন্দরী বলো তো! আর একটু ক্রিটিক্যালি দেখ তো!

খুব ক্রিটিক্যালি দেখেই বলছি। আমার মতো খুঁটিয়ে তো কেউ কখনও তোকে দেখেনি! যখন আঁতুড়ে ছিলি তখন থেকে তোর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতাম।

জানি মা। তুমি তোমার প্রথম সন্তানকে দেখবে, এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু কী দেখলে মা? বেশী ভালবাসা, আদর আর আবেগ থাকলে কি আসল চেহারা চোখে পড়ে?

আচ্ছা, তোর চেহারার সেদিন কেউ কোনও নিন্দে করেছে?

না তো! তাই কেউ করে? চেহারাটাই তুমি ধরছো কেন, আর কোন দিক দিয়েই বা আমি কি হয়েছি বলল তো!

তোকে নিয়ে আর পারি না বাপু। হঠাৎ যে কেন এত শোকতাপ!

মা, আমার খুব ইচ্ছে করে একটা বিদেশী শহরে গিয়ে থাকি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুন্দর একটা শহর। শীতকালে বরফ পড়বে, বসন্তকালে গাছপালা ফুলে ভরে যাবে, খুব সবুজ হবে মাঠঘাট।

বিদেশে যেতে চাস? তোর বাবা কী বলে জানিস? বলে, আমার ছেলেমেয়েরা কেউ ইউরোপ বা আমেরিকায় গেলে আমার বোধহয় হার্ট অ্যাটাক হবে।

আমার জন্য বাবার হার্ট অ্যাটাক হবে না মা। আমি কোন গুণে বিদেশ যাবো বলো তো! কে আমাকে নেবে? কেন নেবে?

ও কথা বলিসনি। যদি বিয়ে হয় বিদেশে?

ঝুমকি হেসে ফেলল, তোমার কল্পনারও বলিহারি।

অপর্ণা একটু কাছে ঘেঁষে এল, শোন ঝুমকি, সবসময়ে অত নেগেটিভ চিন্তা করতে নেই। নিজেকে যদি সবসময়ে হ্যাক-ছি করতে থাকিস তাহলে অন্য সবাইও তোকে হ্যাক-ছি করতে শুরু করবে। আমি মনে করি, যে যার নিজের মতোই হয়। তুই কেন অন্যের মতো হতে যাবি। তুই যেমন আছিস তেমনই ভাল।

ভাল তো!

নিশ্চয়ই ভাল। অন্যের মতো হতে যাবি কেন?

তাহলে তুমি কেন সবসময়ে আমাকে বকো আর বলো, তুই অমুকের মতো নোস, তমুকের মতো হলি না, বলো না?

অপর্ণা হেসে বলল, রাগের মাথায় বলি।

রাগের মাথায় সত্যি কথাই তো বলো!

সত্যি হলেও হতে পারে। এই যে আপা বলে মেয়েটা, কী দস্যি বল তো। আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি ওর মতো সাহসী হলে বেশ হত। সব মেয়েরই এরকম হওয়া উচিত। আবার ভাবি, দুর! আপার মতো আপা হোক, সবাই কেন হতে যাবে!

আমি ক'দিন যাবৎ কী ভাবছি জানো? এই যে আমি, আমার যা আদর, যা ইম্পর্টান্স তা শুধু তোমার আর বাবার কাছে, বুবকা আর অনুর কাছে। আমার যদি খারাপ কিছু হয় তোমরা গুটিকয় লোক দুঃখ পাবে। যদি আমার ভাল কিছু হয় তাও আনন্দ করবে শুধু তোমরাই। কই, বাইরের জগতে তো আমার কোনও গুরুত্বই নেই। কেউ তো ফিরেও তাকায় না আমার দিকে।

দুর বোকা! কী সব বকছিস? বাইরের জগৎ হল বাইরেরই জগৎ। ভিতর আর বাইরের মধ্যে তফাৎ থাকবে না?

আমার কী মনে হয় জানো মা? শুনলে তুমি হাসবে। আমার মনে হয়, আমার যদি লক্ষ লক্ষ মা-বাবা থাকত, কোটি কোটি ভাই-বোন থাকত তাহলে বেশ হত।

অপর্ণা সত্যিই হেসে ফেলল। বলল, আচ্ছা, তোর মাথায় এমন অদ্ভুত সব কথা আসে কেন রে?

তাহলে আমি কত মানুষের আদরের ঝুমকি হতে পারতাম বলো তো!

আমি তো সাত দিন সাত রাত্তির ধরে বসে ভাবলেও এরকম অদ্ভুত কথা মাথায় আসত না।

আমার মাথায় এরকম অনেক কথা আসে মা। আচ্ছা আমি কি একটু ছিটিয়াল?

তোমরা সবাই একটু ছিটিয়াল। বিশেষ করে তোমার বাবাটি। বাবার কাছ থেকেই পেয়েছো তোমরা।

তুমি যে বাবাকে এত ভালবাসো তা তো বাবা একটু ছিটিয়াল বলেই! নরম্যাল গেরস্থ হলে এত ভালবাসতে পারতে?

অপর্ণা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ভালবাসার কথা তুই কী জানিস রে ঝুমকি? ভালবাসার মধ্যেও যে কত কাঁটা, কত জ্বলুনি তা যদি জানতিস!

৪০

গত সাত দিন ধরে হেমাঙ্গ ভাবছে। ভাবছে, একটা পারসোন্যাল কমপিউটার তার দরকার আছে কিনা। উইথ প্রিন্টার। সাদামাটাভাবে দেখতে গেলে, দরকার নেই। কারণ তার অফিসেই কমপিউটার রয়েছে। তার জীবিকার যাবতীয় তথ্য তার মধ্যেই স্টোর করা আছে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে তার পি-সি-র কোনও প্রয়োজনই নেই। কিন্তু উপর-উপর চিন্তা করে সমাধানে পৌঁছনো না গেলে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। অনেকটা তলিয়ে দেখলে হয়তো ব্যক্তিগত কমপিউটার কেনার একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ সে খুঁজে পাবে। লোকের কাছে জবাবদিহি বা অজুহাত খাড়া করাটাই তো সবচেয়ে বড় সমস্যা। তাই সাতদিন ধরে সে গভীরভাবে ভাবছে। ভাবতে গিয়ে চৌরঙ্গীর কাছে ট্র্যাফিক লাইট ভায়োলেট করে সে ট্র্যাফিক পুলিশের ধমক খেয়েছে। আনমনে আটকাতে গিয়ে একটা পুরনো আমলের পার্কার ডুয়োফোল্ড কলমের ক্যাপের প্যাঁচ কেটে ফেলেছে। এবং রশ্মি রায় একদিন ফোন করে 'আমি রশ্মি' বলায় সে গভীর অন্যমনস্কতার সঙ্গে প্রশ্ন করেছে, কে রশ্মি?

এইসব দুর্ঘটনার পরও সে অন্যমনস্কতা কাটাতে পারেনি। তার চেয়েও বড় কথা পি-সি কেনার ব্যাপারে এখনও কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। আসতে পারেনি আরও একটা গুরুতর কারণে। বন্ডেল রোডে তার সেজদি নীলা থাকে। তার দেওরের বিয়ের জন্য একখানা বাড়ি দরকার। গড়িয়াহাটের আশেপাশে এবং বন্ডেল রোডের গা ঘেঁষেই বিস্তর বিয়ে বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও সেজদি গর্চার বাড়িতেই বউভাত করার জন্য গোঁ ধরেছে বলে প্রায়ই যাতায়াত করছে। সেজদি আবার হিসেবী লোক। হেমাঙ্গর ঘরে জিনিসপত্রের বহর দেখে ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। প্রথম দিনই সব দেখেশুনে বলে দিল, দাঁড়া, তোর এই অপব্যয়ের কথা বাবাকে বলে দেবো। এভাবে পাগল ছাড়া কেউ টাকা নষ্ট করে?

তার ওপর দিদিদের খবরদারি এবং অত্যাচার কবে বন্ধ হবে তা ভাবতে ভাবতে হেমাঙ্গ বলল, সব জিনিসই কাজে লাগে। মডার্ন টেকনোলজির খবর রাখিস না, সংসার করিস কি করে?

সেজদি রাগে গরগর করতে করতে বলল, খবর রাখি না তোকে কে বলল? ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বি এসসি কি এমনি এমনি পাশ করেছি? কিন্তু খবর তুই-ই রাখিস না। ওই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে কী পরিষ্কার করিস তুই? ওতে ময়লা যায়? আমার ঘরেও একটা পড়ে আছে। গুচ্ছের টাকা নষ্ট। বিজ্ঞাপন দেখে কিনলেই হল?

হেমাঙ্গ তর্কের লাইনে না গিয়ে মোলায়েম গলায় বলল, তোর দেওরের কোথায় বিয়ে ঠিক হল রে? দেনা-পাওনা কি রকম?

বিয়ে এবং দেনা-পাওনা দুটো জিনিসকেই হেমাঙ্গ আদ্যন্ত ঘেন্না করে। কিন্তু সে এও জানে, মেয়েদের বিবাহ প্রসঙ্গে ডাইভার্ট করতে পারলে তারা আর অন্যান্য তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাবে না। হলও তাই। নীলা ডাইভার্টেড হয়ে গেল। দেওরের বিয়ের এবং দেনা-পাওনার একটা বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে হেমাঙ্গর অপব্যয়ের ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেল। আপাতত।

মুশকিল হল, সেজদি আজকাল মাঝে মাঝেই আসছে। একতলায় অনেক জায়গা। বিয়ে উতরে যাবে। সেখানে মজুর লাগিয়ে সারাই, ঝাড়পোঁচ এবং রং হচ্ছে। যতদিন বিয়েটা না পার হয় ততদিন পি-সি কেনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনও লাভ নেই। কেনা যাবে না। সেজদি তাহলে ফ্যাসাদে ফেলে দেবে। কারণ, রোজ দুপুরে সেজদি মিস্তিরিদের কাজ দেখতে এসে তার ঘরেই জিরোয়। ডুপ্লিকেট চাবি চেয়ে নিয়েছে।

মাইকেলের কয়েকটা লাইন আজকাল প্রায়ই মনে পড়ে হেমাঙ্গর। কী কুক্ষণে তুই রে অভাগী, কাল পঞ্চবটী বনে কালকূটে ভরা দেখেছিলি এ ভুজগে। ভুলভাল হতে পারে, সেই ইস্কুলের পর মাইকেল আর পড়া হয়নি। তবে ব্যাপারটা মোদ্দা এরকমই। এই ভুজগটি রশ্মি। কারণ চারুদি মারফত রশ্মি সম্পর্কে মেলা গুজব ছড়িয়ে গেছে তাকে জড়িয়ে। সেজদি—দেখা হলেই—নানাবিধ প্রশ্ন করছে। বিলিতি মেয়ে? মানিয়ে গুছিয়ে নিতে পারবে তো? সুন্দরী বলতে ঠিক কি রকম? রং ফর্সা না ফ্যাকাসে?

ব্যাপারটা জটিলতর করে তুলছে রশ্মি নিজেও। চারুশীলার সঙ্গে সে আজকাল প্রায় রোজ রাতে টেলিফোনে কথা কয় বলে খবর পেয়েছে হেমাঙ্গ। কি কথা হয় কে জানে! হেমাঙ্গর নিজের ফোন তিন চারদিন হল ডেড। চারুদির কাছ থেকে কোনও রানিং কমেন্টারি পাওয়া যায় না। কিন্তু উদ্বেগ রয়েছে। খুব উদ্বেগ। তার পায়ের তলায় কি ভূমিক্ষয় শুরু হল? দুটি মেয়ে যখন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে তখন কত কি হয়ে যেতে পারে। চারুদির সঙ্গে রশ্মির এত কিসের কথা? কেন কথা? তাকে নিয়েই কি কথা হয় ওদের?

এরকম অদ্ভুত ধরনের সমস্যায় পীড়িত হয়ে হেমাঙ্গর দিন কাটছে। না, সাদামাটাভাবে কাটছে না। তার মধ্যেই কাজ করতে হচ্ছে। বিস্তর ইনকাম ট্যাক্স থেকে বিপন্ন ক্লায়েন্টদের উজ্জ্বল উদ্ধার করতে হচ্ছে। আইন ও হিসেবের নানা জটিল, কুটিল এবং জটিলতর কুটিলতর ফন্দিফিকিরে মন দিতে হচ্ছে। দেঁতো হাসি হাসতে হচ্ছে এবং ফাঁকে ফাঁকে ভাবতে হচ্ছে, কেন তার একটা পারসোন্যাল কমপিউটার দরকার। শুধু অন্যদের বোঝালেই চলবে না, নিজেকেও বোঝাতে হবে। টেকনোলজি-মুগ্ধ, বেহিসাবী হেমাঙ্গর মধ্যে আবার একজন হিসাবী ও সতর্ক যুক্তিবাদী হেমাঙ্গও বাস করে। কিছু কিনলেই তার দ্বৈত সত্তায় একটা দ্বৈরথ উপস্থিত হয়। তখন হেমাঙ্গ একটু আত্মগ্লানিতে কষ্ট পায়।

গাঁয়ের নাম বিষ্টুপুর। স্কুলেরও একটা বড়সড় নাম আছে। বাসরাস্তায় নেমে মাইলটাক হাঁটতে হল হেমাঙ্গকে। তারপর যথারীতি খাতির যত্ন এবং বিশ্রী গরমিলে ভরা হিসেবের খাতা নিয়ে বসতে হল। ব্যাপারটা একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে। স্কুল অডিটের কাজটা এবার ছাড়তে হবে তাকে। ছেড়েই দিত, শুধু শহুরে গন্ধটা গা থেকে ঝেড়ে ফেলতেই মাঝে মাঝে গাঁয়ে আসা।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে হেডস্যার নানা গল্প ফেঁদে বসছিলেন। তার মধ্যেই হঠাৎ চেনা নামটা আচমকা জানালা দিয়ে উড়ে আসা একখানা পাটকেলের মতো পড়ল। কৃষ্ণজীবন। হেডস্যার বলছিলেন, এই স্কুল

থেকেই পাশ করে গেছে ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ নিয়ে। স্ট্যান্ডও করেছিল। এখন দুনিয়াজোড়া নাম। মস্ত এনভিরনমেন্টালিস্ট। চেনেন নাকি?

হেমাঙ্গ একটু অবাক হয়ে বলে, বিলক্ষণ চিনি। এই গাঁয়ে বাড়ি?

আজ্ঞে। তার মা বাপ ভাই সব এখানে। আমেরিকা থেকে শিগগির একটা বইও বেরোবে শুনছি। ডারলিং আর্থ।

অতটা আবার হেমাঙ্গ জানত না। বলল, পাবলিক না জানুক আমি তাঁকে জানি।

কাজ শেষ করে কৃষ্ণজীবনের গ্রামটা একটু ঘুরে দেখল হেমাঙ্গ। আর পাঁচটা গাঁয়ের মতোই গরিব সাধারণ গাঁ। গৌরব করার মতো কিছুই নেই। কৃষ্ণজীবনের মতো দু-চারজন লোকের জন্যই যা একটু অহংকার।

ফিরে এসে পরদিন অফিস থেকেই কৃষ্ণজীবনের বাড়িতে ফোন করল সে। এবং আশ্চর্যের বিষয়, কৃষ্ণজীবনকে বাড়িতেই পেয়ে গেল। অধ্যাপকদের ওই এক সুবিধে, সপ্তাহে একাধিক ডে অফ।

একটু উৎসাহিত গলায় হেমাঙ্গ বলল, আরে মশাই, আমি তো আপনার গাঁয়ে ঘুরে এলাম। একটা অডিটে গিয়েছিলাম।

কৃষ্ণজীবনের গলায় একটা আলাদা মাত্রা যোগ হল, গিয়েছিলেন? কী দেখলেন?

কী আর দেখব? দেয়ার ইজ নেচার, মাঠ ঘাট পুকুর অ্যান্ড এভরিথিং।

কৃষ্ণজীবন মৃদু শব্দে হাসল, দেখেননি।

কী দেখিনি?

কিছুই দেখেননি। বাইরে থেকে কি দেখা যায়?

তা অবশ্য ঠিক। আমার তো সেন্টিমেন্টটা নেই, আপনার মতো।

সেন্টিমেন্ট এক মস্ত জিনিস। খুব মূল্যবান। লোকে কেন যে আজকাল আর এর মূল্য দেয় না।

একটু দেয়। এখনও দেয়।

দেয় না হেমাঙ্গবাবু। লোকে শিকড় ভুলে যাচ্ছে।

জানি কৃষ্ণজীবনবাবু।

দুঃখের বিষয় কী জানেন? যারা ওই গাঁয়ে থাকে তারাও গ্রামটাকে ভাল করে চেনে না। কূটকচালি নিয়ে মেতে আছে।

সে কথাও ঠিক। কিন্তু আমার একটু হলেও সেন্টিমেন্ট আছে। আমি গাঁয়ে যাই শহরের গন্ধ গা থেকে মুছে ফেলতে। কিছুক্ষণের জন্য।

আজ অফিসের পর চলে আসুন, আড্ডা মারা যাবে।

আপনার সময় নষ্ট হবে না তো! শুনেছি আপনি খুব ব্যস্ত মানুষ।

তাতে কি? আপনার কাছে আমার গাঁয়ের গল্প শুনব সেটা কি কম লাভ?

আপনি সত্যিই বিষ্ণুপুরকে ভীষণ ভালবাসেন, না?

ভীষণ।

আপনার কি আমেরিকা থেকে বই বেরোচ্ছে একটা।

লাজুক কৃষ্ণজীবন সংকুচিত গলায় বলে, বেরোচ্ছে একটা। ওরকম কত বেরোয়।

বইটার নামও আমি শুনে এসেছি। ডারলিং আর্থ।

কৃষ্ণজীবন মৃদু স্বরে বলল, ওরা খবর রাখে বুঝি?

খুব রাখে। আপনার কথা বলতে তারা গর্ব অনুভব করে।

চলে আসুন, কথা হবে।

হেমাঙ্গর সময়ের অভাব নেই। অফিসের পর কোথাও যেতে তার খারাপও লাগে না। দুটো কথা শুনলে বা বললে সময়টা কাটে। অফিস থেকে বেরিয়ে একটা মিষ্টির প্যাকেট কিনে নিল হেমাঙ্গ। তারপর সোজা গাড়ি চালিয়ে চলে এল গোলপার্কের কাছে।

কৃষ্ণজীবন তাকে সোজা নিয়ে গেল নিজের ঘরে। বসাল। পাখা খুলে দিল। তারপর খাপ পেতে বসল তার মুখোমুখি। লোকটা পণ্ডিত মানুষ, কিন্তু চেহারাখানা গুলবাগের মতো। এখনও মাসকুলার, শক্তপোক্ত এবং দুর্দান্ত হ্যান্ডসাম। চোখ দুখানা ঝলমল করছে অভ্যন্তরী জীবনীশক্তি এবং উদ্দীপনায়।

বলুন কেমন দেখলেন বিটুপুর। ওই গাঁয়ে আমি বড় কষ্ট করে বড় হয়েছি। খাওয়া পরার কষ্ট, মানুষের ব্যবহার দেখে কষ্ট, দারিদ্র্য দেখে কষ্ট। কিন্তু সব সত্ত্বেও কিছু একটা ছিল। সেটা আজও অজানা থেকে গেছে। কিছুতেই বুঝতে পারি না বিষ্ণুপুরের ওপর কেন আমার এত মায়া।

সেটাই তো স্বাভাবিক।

সোৎসাহে ঘাড় নাড়ল কৃষ্ণজীবন, হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো ঠিকই। আপনি সেন্টিমেন্টের কথা বলছিলেন। এটা সেই সেন্টিমেন্টই হবে। কিন্তু সেন্টিমেন্টেরও একটা লজিক থাকে, রুট থাকে। আমি সেইটে খুঁজে পাই না। আপনার চোখ দিয়ে কী দেখলেন বলুন।

হেমাঙ্গ লোকটার ছেলেমানুষের মতো আবেগ দেখে একটু হাসল। অবাকও হল। বলল, আর পাঁচটা গাঁয়ের মতোই তো।

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে সায় দিল কৃষ্ণজীবন, সে তো ঠিক কথা। বরং আরো অনেক গ্রামের চেয়ে বিষ্ণুপুর আরও শ্রীহীন। আরও গরিব, আরও কম সবুজ। নাম বিষ্ণুপুর। লোকে তাচ্ছিল্য করে বলে বিষ্টুপুর। তবু বিষ্ণুপুর আমাকে শিখিয়েছে কি করে পৃথিবীকে ভালবাসতে হয়।

ভালবাসা কি বাইরের জিনিস কৃষ্ণজীবনবাবু? সেটা তো ভিতরের জিনিস। ভালবাসা আপনার ভিতরেই ছিল।

কৃষ্ণজীবন সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে সায় দেয়, ঠিক ঠিক। সব ঠিক কথা। একটা গ্রামের সঙ্গে সেই গ্রামের একটা ছেলের সম্পর্ক কোনও হাইলি ফিলজফিক্যাল জিনিস নয়। আমি জানি। বিষ্ণুপুর আমাদের দেশও নয়। আমরা উদ্বাস্তু ঢাকা জেলার আর একটা গ্রাম থেকে আমরা এখানে এসে ডেরা বাঁধি। আমার বাবা এখনও দাখিল্যা গ্রামের কথাই বলেন, তাঁর আজন্মকৈশোরের গ্রাম। কিন্তু বিষ্ণুপুর হ্যাজ সামথিং ফর মি। আমি কি হিপনোটাইজড? কে জানে! আমার মনে হয়, সব জায়গা ছেড়ে আমি একদিন ওখানে ফিরে যাবো।

তা কেন? আপনার ফিল্ড তো অনেক বড়।

জানি, জানি। আমার ফিল্ড তো সারা পৃথিবী। তবু আপনাকে বলছি, বিষ্ণুপুর আমাকে পৃথিবীকে চিনতে শিখিয়েছে। আমি তো অকৃতজ্ঞ নই।

মনে মনে হেমাঙ্গ বলল, আপনি একটি পাগল। মুখে বলল, ঠিক কথা। কেন বলল তা সে বুঝতে পারল না।

কৃষ্ণজীবন হঠাৎ খুব অন্যমনস্ক হয়ে গেল। ভাবালু গলায় বলল, দিনরাত লোকেরা ঝগড়া করত, দলাদলি করত, প্রায়ই দাঙ্গাহাঙ্গামা হত, খুব কূটকচালি হত, ইস্কুলে লেখাপড়া একদম হত না। বিষ্ণুপুরের সবই ছিল খারাপ। বিচার করে দেখলে, বিষ্ণুপুরের কোনও সৌন্দর্যও ছিল না। তবু যখন আমি নিজের হাতে চাষ করতাম তখনই মনে হত বিষ্ণুপুরের মাটির ভিতর থেকে একটা প্রাণের স্পন্দন লাঙল বেয়ে আমার শরীরে উঠে আসছে। বর্ষাকালে ভীষণ বাজ পড়ত, ঝড়-বাদল তো ছিলই। কিন্তু ভয় করত না। খোলা মাঠের মধ্যে, ঝড়-বাদলে, বজ্রপাতের মধ্যে খুব তুচ্ছ লাগত নিজেকে। মনে হত, এই তো এইটুকু মাত্র আমি। আমি মরে গেলেও তো কিছু নয়। ওই বিরাট আকাশ, ভীষণ বৃষ্টি, মস্ত নীল আগুনের ঝলক—এত ঘটনার মধ্যে আমার মৃত্যু এমন কীই বা! শুধু আমার মতো একটা পোকাকে মারার জন্য তো ভগবান এত আয়োজন করেননি। তিনি আমাকে দেখাচ্ছেন কত বড় তিনি, কত তাঁর ক্ষমতা। আমি কি বোঝাতে পারছি আপনাকে? আমি গুছিয়ে কথা বলতে পারি না।

আপনি বোঝাতে না পারলেও আমি কিন্তু বুঝতে পারছি। আপনি কি ঈশ্বর মানেন? কয়েকবার ভগবানের কথা বললেন, সায়েন্টিস্টরা তো নাস্তিক হয়।

কেউ কেউ হয়। আমি নাস্তিক কিনা তা কে বলবে? আসলে বিশ্বজগৎটা এত বিরাট, ইনফাইনিট যে, আমার ব্রেন ফেল করতে থাকে। একটা সময় আসে যখন আমরা সবাই স্তব্ধ ও মূক হয়ে যাই। আকাশটা কোথাও শেষ হচ্ছে না, আর সময় নিরবধি কেবলই বয়ে চলেছে। শুরু নেই, শেষ নেই। খুব গভীরভাবে ভাবলে আপনিও দেখবেন, স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়, কথা হারিয়ে যায়। ওই স্তব্ধতাই বোধ হয় ঈশ্বর। তাই না? নাকি আমি ফের গুলিয়ে ফেলছি সব?

হেমাঙ্গ মৃদু হেসে মাথা নাড়ল, গুলিয়ে ফেলেননি। তবে প্রসঙ্গ ছিল বিষ্ণুপুর।

হ্যাঁ হ্যাঁ, বিষ্ণুপুর। আমি বিষ্ণুপুরের কথাই তো বলছি। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন বিষ্ণুপুরের বাইরের জগৎটাকে তো জানতাম না। কিন্তু ওখানকার জল-হাওয়া-মাটি আমাকে কিছু বলতে চাইত। আমার বন্ধুর মতো ছিল সব। আপনি শুনলে হাসবেন, আমি গাছের সঙ্গে, পোকামাকড়ের সঙ্গে, কুকুর-বেড়াল-গরুর সঙ্গে, পাখির সঙ্গে কথা বলতাম। খাওয়ার কষ্ট, পরার কষ্ট, অত পরিশ্রম, তবু মন ভাল থাকত। সবসময়ে যেন আনন্দ একটা নদীর মতো কুলকুল করে বয়ে যেত বুকের ভিতর দিয়ে। আমি কি ভাবালু হয়ে যাচ্ছি?

না। বেশ তো বলছেন।

আসলে তখন খুব মনে হত, আমি কখনও একা নই। আমার সঙ্গে বিষ্ণুপুরের গাছপালা, পশুপাখি সবাই আছে। ওই যে ভালবাসা ওটাই আমাকে এখনও ধরে রাখে। বাঁচিয়ে রাখে। এখন তো বুড়ো হতে চললাম, কত বয়স হল, তবু মনে হয় এখনও এক যুক্তিহীন বাচ্চা ছেলে আমাকে হাত ধরে বিষ্ণুপুরের দিকে কেবলই টানে। খুব টানে।

হেমাঙ্গ মাথা নেড়ে বলে, এরকম হতেই পারে।

আচ্ছা, বসুন। আপনার সঙ্গে আমি খুব অভদ্রতা করছি। বাড়ির কারও সঙ্গে বোধ হয় আপনার পরিচয় নেই!

হেমাঙ্গ মৃদু হেসে বলে, কেন থাকবে না। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আমার তো পুরনো আলাপ। ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম, মনে নেই?

ওঃ, তা হবে। বলে কৃষ্ণজীবন খুব হাসল, আমার কিছু মনে থাকে না।

শুধু বিষ্ণুপুরের কথা খুব মনে থাকে, না?

কৃষ্ণজীবন যখন হাসে তখন তার মুখখানা সত্যিই শিশুর মতো হয়ে যায়। হাসিটা হেসে কৃষ্ণজীবন ঘর ছেড়ে চলে গেল এবং এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল রিয়াকে নিয়ে।

দেখ, কে এসেছেন।

রিয়া তটস্থ হয়ে বলে, আগে বলবে তো? ডোরবেল শুনেছিলাম, কিন্তু বুঝতে পারিনি কে এসেছে। ছি ছি, দেখুন তো, শুকনো মুখে এতক্ষণ বসে আছেন!

ব্যস্ত হবেন না। আমি এঁর কথা শুনছিলাম।

রিয়া হাসল, আজকাল খুব কথা বলে। আগে কিন্তু মুখ থেকে কথাই বেরোতো না। ভীষণ গম্ভীর আর মুখচোরা ছিল। তবে সব বিষয়ে নয়, মনের মতো বিষয় পেলে তবেই বলে।

কৃষ্ণজীবন লাজুক মুখে বসে রইল, যেন অপরাধ হয়েছে।

রিয়া জিজ্ঞেস করে, কী খাবেন বলুন তো! নোতা কিছু করে দিই?

বলতে নেই হেমাঙ্গ খেতে ভালবাসে। ফটিকের হাতের রান্না বা হোটেলে খেয়ে সেরকম তৃপ্তি নেই। বিশেষ করে ভোজনরসিকদের। সুতরাং কেউ খাওয়াতে চাইলে সে খুব একটা প্রতিবাদ করে না।

তবে পেটুক না ভাবে সেই জন্য নরম করে একটু আপত্তি করল, না না, ঝামেলা কেন করবেন?

ঝামেলা হবে কেন? আমার একজন ভাল রাঁধুনী আছে। কচুরি খাবেন তো? আর হিং দিয়ে আলুর দম?

কচুরির কথায় হেমাঙ্গর খিদে চাগিয়ে উঠল। বলল, ব্যাচেলর মানুষ সব খাই।

রিয়া চলে যাওয়ায় কৃষ্ণজীবন মৃদু স্বরে বলল, আমি সত্যিই আজকাল বোধ হয় একটু বেশী কথা বলে ফেলি। আপনি কিছু মনে করেননি তো!

হেমাঙ্গ মাথা নেড়ে বলে, আপনার গলার স্বর এত অ্যাট্রাকটিভ এবং যা বলেন তাতে এত কনভিকশন থাকে যে শুনতেই হয়। আমি শহুরে মানুষ, তার ওপর মডার্ন টেকনোলজির অন্ধ ভক্ত। তাই বোধ হয় আপনার সঙ্গে আমার চরিত্রের একটু পার্থক্য আছে।

কৃষ্ণজীবন যে অভ্যন্তরের একটা অস্থিরতা সবসময়ে ঢেকে রাখে বা রাখতে চেষ্টা করে তা বুঝতে খুব একটা কষ্ট হয় না।

সেই অস্থিরতায় হঠাৎ মাথা নেড়ে কৃষ্ণজীবন বলে উঠল, টেকনোলজি! নিশ্চয়ই টেকনোলজিরও দরকার। সেই টেকনোলজি আমাদের লোভ দেখাবে না, অলস করবে না, বস্তুর ভার বাড়িয়ে তুলবে না। টেকনোলজি হবে হেলপফুল। অতিরিক্ত টেকনোলজি প্রকৃতির নিয়মকে গুরুত্বহীন করে দিতে চায়। আমাদের জীবনে প্রকৃতিরও যে একটা ভূমিকা আছে সেটা কিছুতেই বুঝতে চায় না মানুষ। কিন্তু এবার তাকে বুঝতেই হবে। বুঝতেই হবে।

ডারলিং আর্থ বইটা আপনি কি এসব নিয়েই লিখেছেন?

হ্যাঁ, ওইসব, আরও অনেক কিছু। হয়তো পড়ে লোকে হাসবে। তবু আমার কথা তো আমাকেই বলতে হবে। তাই না?

তা তো বটেই। কবে বেরোচ্ছে বইটা?

হয়তো অক্টোবরের শেষে। আমাকে লস এঞ্জেলেসে যেতে হবে। ওরা যখন কোনও বই পাবলিশ করে তখন খুব একটা পাবলিসিটি দেয়। লেখককে সাংবাদিকদের মুখোমুখি বসিয়ে দেয়। অনেক রকম প্রশ্ন করা হয়। চোখা চোখা প্রশ্ন।

বলে খুব হাসল কৃষ্ণজীবন। যেন ব্যাপারটা খুব মজার।

হেমাঙ্গর কাছে মোটেই মজা বলে মনে হচ্ছিল না।

এই ক্ষ্যাপাটে লোকটা মার্কিন সাংবাদিকদের গোলমেলে, ক্ষুরধার সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে তো? পারবে হয়তো। কারণ কৃষ্ণজীবনকে যতই গ্রাম্য বা ক্ষ্যাপাটে মনে হোক, দুনিয়ার জ্ঞানীগুণীরা তো একে রাহাখরচ দিয়ে সম্মানের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে এর কথা শুনবার জন্যই!

কিন্তু আড্ডা মারার পক্ষে লোকটা ভাল কি? মোটেই নয়। সবসময়ে যেন অন্যমনস্ক, সবসময়ে মুখের ভাব পাল্টে যাচ্ছে। ভিতরকার একটা অস্থিরতার সঙ্গে যেন লোকটার নিরন্তর লড়াই। এ আড্ডাবাজ মানুষই নয়।

কৃষ্ণজীবন অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইল। একটাও কথা বলল না।

হেমাঙ্গও চুপ করে বসে রইল।

এক সময়ে কৃষ্ণজীবনই নীরবতা ভেঙে প্রশ্ন করল, আপনি টেকনোলজির এত ভক্ত কেন বলুন তো!

আমি টেকনোলজি বা প্রকৃতি সব কিছুরই ভক্ত। তবে আধুনিক যন্ত্রপাতি আমাকে খুব মজা দেয়। ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ, সোলার কুকার। হয়তো আমি নিজে টেকনিক্যাল লোক নই বলেই একটা বিস্ময় কাজ করে। আবার গাছপালা, সবুজ ক্ষেত, নদী এসবও ভাল লাগে। তা না হলে কি প্রায় প্রতি উইক-এন্ড এই গাঁয়ে যাই শখ করে?

কৃষ্ণজীবন একটু হাসল। বলল, নিশ্চয়ই। ভালবাসাটাই আসল জিনিস।

"নিশ্চয়ই" এবং "ভালবাসাটাই আসল জিনিস" এ দুটো কথাকে মেলাতে পারল না হেমাঙ্গ। কথাগুলো তার কথার প্রকৃত জবাবও নয়। কৃষ্ণজীবন কি তাহলে নিজের সঙ্গে কথা বলছে? তার সঙ্গে নয়? এ কি সলিলোকি? হেমাঙ্গ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কৃষ্ণজীবনের মতো লোকেরা একটা ভিন্ন স্তরে বাস করে। এরা ঠিক তার লেভেলের মানুষ নয়।

রিয়া যখন কচুরির থালা নিয়ে এল তখন ঘরের আবহাওয়াটাই গেল পাল্টে। নীরবতার বলয়টা ভেঙে স্বাভাবিক হল আবহ। খেতে খেতে আর একটা ব্যাপারও লক্ষ করল হেমাঙ্গ। কৃষ্ণজীবন খেতে ভালবাসে। খুব প্যাশন নিয়ে, আবেগ নিয়ে খায়। উপভোগ করে না, ক্ষুধার্তের মতো আক্রমণ করে খাদ্যবস্তুকে।

রিয়া বলল, আচ্ছা, আপনি কেন একা থাকেন বলুন তো! নিজের বাড়িঘর ছেড়ে একা একটা মস্ত বাড়িতে থাকেন, তাই না?

একা থাকার একটা আলাদা মজা আছে।

ভয়-ভয় করে না?

কিসের ভয়? ভূতের নাকি?

রিয়া খুব হাসল, বলল, আমার কিন্তু খুব ভূতের ভয়। এই যে ফ্ল্যাট দেখছেন এখানেই একা থাকতে হলে আমি ভয়ে মরে যাবো।

না, আমার ভূতের ভয় নেই।

চারুশীলা খুব আপনার কথা বলে। মুখে বাউণ্ডুলে লক্ষ্মীছাড়া বললেও ভীষণ ভালবাসে আপনাকে।

হ্যাঁ, তা বাসে। কিন্তু মাঝে মাঝে সেটা প্রায় আমার গলার ফাঁস হয়ে ওঠে।

বিয়েতে নেমন্তন্ন করবেন তো!

বিয়ে! বলে হেমাঙ্গ হাঁ করে রইল, কার বিয়ে?

আপনার।

আমার? এ খবর কে দিল আপনাকে?

কেন, চারুশীলাই তো বলছিল।

কী বলছিল?

একজন বিলেতফেরত সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আপনার বিয়ে। নামটাও জানি। রশ্মি রায়।

কী সর্বনাশ! দোষী জানিল না কী দোষ তাহার, বিচার হইয়া গেল!

ও মা, আপনি জানেন না নাকি?

না তো! রশ্মির সঙ্গে আমার একটুখানি মাত্র বন্ধুত্ব। তাও অডিট করতে গিয়ে। নাথিং সিরিয়াস।

কিন্তু চারুশীলা যে খুব জোর দিয়ে বলল।

ওর কথা একদম বিশ্বাস করবেন না। দিনকে রাত করতে পারে।

আচ্ছা যা হোক, আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম যে আপনার বিয়ে।

লোককে বোকা বানাতে চারুশীলার জুড়ি নেই।

রশ্মি কিন্তু ভীষণ ভাল মেয়ে। বিয়ে করলে বেশ মানাত আপনার সঙ্গে।

বিয়ের প্রশ্নই ওঠে না।

কেন বলুন তো!

এমনিই। রশ্মির মতো মেয়ে আমাকে বিয়ে করতে চাইবে কেন? চারুদির যত সব আকাশ-কুসুম চিন্তা।

এবার খুব অবাক হয়ে রিয়া বলল, ও মা, সে কি কথা! কে বলল আপনাকে যে রশ্মি আপনাকে বিয়ে করবে না?

আমি জানি।

এ মা! আপনি কিছুই জানেন না। রশ্মির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে যে।

পরিচয় হয়েছে? কি করে?

রশ্মি যে প্রায়ই আসে চারুশীলার বাড়িতে। গত কালও এসেছিল।

কচুরিটা মুখে বিস্বাদ ঠেকছিল হেমাঙ্গর।

সে বলল, আমি এত সব খবর জানি না।

খিলখিল করে হেসে রিয়া বলল, আপনি অনেক কিছুই তো জানেন না দেখছি। এমন কি একটা মেয়ে যে আপনার প্রেমে পড়েছে সেই খবরটা অবধি নয়। আপনি তো দেখছি আমার কর্তাটির মতোই আনমনা মানুষ।

আমি আনমনা নই, তবে লেস ইনফর্মড। আমাকে না জানিয়ে পৃথিবীর ঘটনাবলী অনেক এগিয়ে গেছে।

আপনার কিন্তু এ খবরটা জানার কথা।

কিন্তু প্রেমের কথা বলছেন কেন? আমরা তো প্রেমে পড়িনি!

কি জানি বাবা। আমার তো মনে হল মেয়েটির আপনাকে ভীষণ পছন্দ। আপনার প্রসঙ্গ উঠলেই এমন লজ্জা পাচ্ছে, ব্লাশ করছে আর মিষ্টি মিষ্টি হাসছে যে, ভুল হওয়ার কথাই নয়।

খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে হেমাঙ্গ বলল, এটা কি করে হল তা আমি একদম বুঝতে পারছি না।

এই ব্যক্তিগত ব্যাপার আমি প্রকাশ্যে বলে ফেললাম বলে কিছু মনে করবেন না। আমি তো জানতাম আপনাদের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

হেমাঙ্গ বেশীক্ষণ বসতে পারল না। কচুরিগুলো খানিক ফেলে খানিক গিলে উঠে পড়ল।

তার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। অস্বস্তিটা মানসিক, কিন্তু সেটা শরীরটাকেও চঞ্চল আর অস্থির করে তুলেছে।

কোনওরকমে বিদায় নিয়ে সে নিচে এসে গাড়ি ছাড়ল। প্রথমে ভেবেছিল, চারুশীলার কাছে গিয়ে একটা জবাবদিহি চাইবে। কিন্তু সেটাও বিপজ্জনক। কে জানে হয়তো রশ্মি সেখানে এসে বসে আছে।

এমন নয় যে, রশ্মিকে তার অপছন্দ। এমনও নয় যে, বিয়ে করা তার পক্ষে একটা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু যেটা বিস্ময়কর তা হল, রশ্মির পক্ষে তার প্রেমে পড়াটা। এরকমও হয় নাকি? এত অল্প পরিচয়ে?

৪১

হ্যাঁ গো, তর্পণের দিন কি এসে গেল নাকি?

নয়নতারা একখানা পুরোনো জং-ধরা কৌটো খুলবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে বলে, সে এখনও দেরি আছে।

পঞ্জিকাখানা দেখে রেখো।

পঞ্জিকা তো এ বছর আনাই হয়নি। রামজীবন প্রতিবার একখানা হাফ পঞ্জিকা এনে দেয়। এবারটায় বুঝি ভুলে গেছে।

তা হলে?

ও নিয়ে ভাবতে হবে না। ভুল তো কোনওদিন হয়নি। এবারও হবে না। বাংলা ক্যালেন্ডার আছে।

খেয়াল রেখো।

কৌটোটা একটু খুলে দেবে নাকি? বর্ষার পর কৌটো-বাউটোর মুখ জং ধরে বড় আঁট হয়ে বসে। দেখ তো পারে কিনা।

বিষ্ণুপদ কৌটোটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটু দেখল। চাড় দিয়ে খোলার জিনিস নয়, প্যাঁচের ঢাকনাও নয়। এ হচ্ছে বসানো ঢাকনা। ভিতরে মাল আছে, বেশ ভারী। নাড়লে ঝুম ঝুম শব্দ হচ্ছে।

বিষ্ণুপদ খোলার চেষ্টা করতে করতে বলল, কী আছে এর মধ্যে?

তা কি ছাই জানি? রাজ্যের কৌটো, কোনটার মধ্যে কী কে জানে। খুললে বুঝব। চাল, ডাল, তিল, পোস্ত কিছু একটা হবে। যা-ই থাক, ছাতা পড়ে আছে হয়তো। চনচনে রোদে একটু রেখে দিলে দোষ কাটে।

উঠোনের মাঝখানে চাটাই বিছিয়ে বিস্তর জিনিস রোদে দিয়েছে নয়নতারা। কিছু মশলাপাতি, ডাল, পুরোনো তেঁতুল অবধি।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, হাত পিছলে যাচ্ছে। আঁচলটা দাও তো, সেঁটে ধরে খুলে ফেলি।

থাক বাপু, বেশি কসরতে কাজ নেই। রেমো আসুক, খুলে দেবে।

বিষ্ণুপদ নিজের ধুতির খুঁট দিয়ে আরও কয়েকবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে বলে, এ একেবারে তোমার আমার মতো কৌটো আর ঢাকনা দুজনকে-দুজনায় সেঁটে ধরেছে। কেউ কাউকে ছাড়তে চাইছে না।

নয়নতারা বালিকার মতো একটু হাসল, শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে তাই যেন থেকো। কৌটো আর ঢাকনা— তোমার মাথায় খেলেও বাপু সব অদ্ভুত কথা!

চাটাইয়ের দিকে চোখ কুঁচকে চেয়ে ছিল বিষ্ণুপদ। বলল, সাদামতো ওটা কী দিয়েছে রোদে? সাও নাকি?

হ্যাঁ, গেলবার পটলের জ্বরের সময় আনানো হয়েছিল।

বড় দানা?

বড়ই।

ভিজিয়ে লেবুপাতা, চিনি আর নুন দিয়ে খেতে ভারী চমৎকার। একখানা পাকা কলা আর একটু কোরানো নারকোল হলে তো কথাই নেই।

বড্ড নোলা হয়েছে আজকাল, না গো?

তা বুড়ো বয়সে একটু হয়। সাগুতে কোনও দোষ নেই। খেলে পেট ঠাণ্ডা থাকে। কী বলে? দেরোখন ভিজিয়ে। কৌটোটা খুলতে পারলে?

না। বুড়ো হাড়ে কি আর সেই শক্তি আছে? আগে হলে এক মোচড়ে খুলে ফেলতাম।

না গো, কৌটোর মুখে মরচে পড়লে বড্ড এঁটে যায়। কথায় কথায় বুড়ো বয়স এনে ফেল কেন?

বিষ্ণুপদ ফর্সা রোদের উঠোনে চোখ দুখানা ফেলে রেখে বলে, দিনে পনেরো বিশ মাইল সাইকেল চালাতাম, নিজের হাতে চাষ করতাম। শরীরে তখন হাতির মতো জোর ছিল। এখন কেমন ঝিম মেরে গেছি। মনে হয় ভেজা কাঁথা জড়িয়ে বসে আছি।

জাঁতির কোণা দিয়ে মুখটা আলগা করে অবশেষে খুলে ফেলল নয়নতারাই।

কৌটোর ভিতরে চেয়ে বলল, সর্ষে গো!

শুনে বিষ্ণুপদ খুব হাসল, আর ভাল জিনিস কিছু বেরোলো না! সর্ষে? আমি তো ভাবছিলাম সোনাদানা হীরে-জহরত কিছু বেরোবে।

আমাদের কপালে কি তাই আছে গো! তা সর্ষেই খারাপ কি? রোদে মচমচে করে শুকিয়ে রাখলে ঝাঁঝ উঠে যাবে। কচুবাটা খাবে আজ? ছাইগাদা থেকে মানকচুটা তবে ভোলাই।

উদাসভাবে বিষ্ণুপদ বলে, বর্ষাকালটা তো কচুঘেঁচু খেয়েই কাটালাম। এ সময়ে নতুন ফুলকপি ওঠে, খুব স্বাদ।

এখানে কি আর ওঠে? সে কলকাতায়, দামও তেমনি।

বিষ্ণুপদ একটু খেদের সঙ্গে বলে, ওইটেই তো মুশকিল। ভাল জিনিসের দামটাও আবার ভাল। আজকাল শুনি, বড়লোকরা নাকি বেশী খায়-টায় না। বেশী খেলে নাকি কিসব হয়। প্রেসার, কোলেস্টোরাল, হার্টের ব্যামো। আর আমাদের দেখ, পেলাম তো খেলাম। মরি মরব, মরণ তো আর খণ্ডানো যাবে না, তা খেয়েই না হয় মরলাম। কী বলে?

মরবে কোন দুঃখে? বড়লোকদের ভাল খেয়ে খেয়ে অরুচি, তাই বেশী খায় না।

বিষ্ণুপদ যেন একটু অবাক হয়ে বলে, অরুচিটা হয় কি করে বললা তো! আমার তো অরুচি হয় না কখনও। তেলাপিয়া মাছ থেকে গমের খিচুড়ি কোনটাই তো এ পোড়া জিবে কখনও খারাপ লাগেনি। খিদের ভাবটারও কখনও মন্দা হল না।

নয়নতারা হাসে, বড়লোকদের জিব তুমি পাবে কোথায়? ওসব বড়লোকদেরই হয়। অরুচি, অখিদে।

একবার বলে দেখো তো রেমোটাকে। বললে একদিন ঠিক এনে দেবে।

ফুলকপি তো! বলে দেখব'খন।

আগে বাগানেই হত দু'চারটে। আজকাল আর বাগান কেউ করে না। করলে আর বাজার থেকে দুনো দামে কিনতে হত না।

কে করবে বলে! কার দায়? যতদিন তুমি করেছছ ততদিন হয়েছে। এখন বাগানে একখানা কুমড়োবিচিও কেউ পোঁতে না। আমি মরে মরে দু'চারটে যা গাছ লাগাই, গরু ছাগলেই খেয়ে যায় সব। ভাগের জমি বলেই বুঝি কারও গা নেই।

বিষ্ণুপদ হঠাৎ বলল, বুঝলে, সামনের বছর অবধি যদি বাঁচি, তাহলে আমি বাগানটায় হাত লাগাবো। জলটল না হয় পটলকে দিয়ে দেওয়াবো।

খুব বাঁচবে। হেসে-খেলে এখনও মেলা বাঁচবে।

বিষ্ণুপদর মেজাজটা আজ ভাল।

নয়নতারা সর্ষে রোদে দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই বলল, একখানা গরদ দিয়ে গেল না তোমাকে কৃষ্ণজীবন?

গরদ বলে গরদ! একেবারে আসল জিনিস।

কত দাম হবে মনে হয়?

তা কি আর জিজ্ঞেস করিনি! মিটিমিটি হাসল শুধু, বলল না। দাম ভালই হবে মনে হয়। জীবনে গরদ ক'টা চোখে দেখেছি যে, দাম জানব?

একদিনও তো পরতে দেখলাম না!

বাপরে! পরব কি গো? সারা দিন গোবর-ন্যাতা, জলকাদা ঘাঁটছি, গরদ পরে বসে থাকলে তো চলবে না। ওসব বড়মানুষদের ঘরে হয়।

ওইটে কৃষ্ণজীবন ভুল করল। সাধ করে গরদ এনে দিল, কিন্তু বুদ্ধি করে যদি ও-টাকায় কয়েকখানা আটপৌরে শাড়ি এনে দিত তাহলে কত সুবিধে হত বলো তো!

শখ করে দিয়েছে। কী করবে বলে!

গলাটা একটু নামিয়ে বিষ্ণুপদ বলে, ও গরদ তোমার গায়ে তো উঠবে না, ও পরে বেড়াবে বামার বা রেমোর বউ। তুমি পটলটি যেই তুলেছে সেই থাবা মারবে সব জিনিসে।

নয়নতারা একটু হেসে বলে, এতদিনে তাহলে সংসার চিনতে শিখলে!

আগেই চিনেছি, চুপ করে থাকি বলে বোকা ভেবো না।

বোকা তো তুমি নও, তবে বোকা ভাবব কেন?

তাই বলছি গরদটা দু'চারদিন পরে নাও। আমাদের তো বেশি কিছু নেই। তোমাকে সারা জীবন দিতে-থুতেও পারিনি কিছু। মনে ইচ্ছে অনেক হয়েছে। পারলাম কই?

নয়নতারা বলে, ওরকম বোলো না তো! দাওনি তো কী হয়েছে? পারলে কি দিতে না? ছেলের দেওয়াই তোমার দেওয়া। ছেলে তো তোমারই।

তাই ধরে নিচ্ছি। কিন্তু একটু পরো। না পরলে কি দেওয়ার দাম থাকে?

আচ্ছা পাগলামি শুরু করলে দেখছি। গরদটাকে একটু জুড়োতে দাও।

বিষ্ণুপদ মৃদু স্বরে বলে, আমাদের এখন ভাঁটির বয়স। কোনও কাজে দেরী করা ভাল নয়।

আজ বাড়ি ফাঁকা। রাঙা তার দুই ছেলে নিয়ে দিন কয়েকের জন্য বাপের বাড়ি গেছে। বামাচরণের বউ নিজের ঘর থেকে বড় একটা বেরোয় না আজকাল। তার হাঁড়িও আলাদা। তারা বুড়োবুড়ি একটু একা হয়েছে। সকালের দিকটায় দুজনে কথা হচ্ছে।

নয়নতারা আর একটা কৌটো খুলে কী যেন দেখছিল। বলল, ঠিক আছে, পরব না হয়। শীতলামন্দিরে গিয়ে একটু পুজোও দিয়ে আসব গরদ পরে। কতকাল যাই না ওদিকে।

আজ রাঁধবে-বাড়বে কি?

সেই তো ভাবছি। রেমো তো সকালে বেরিয়ে গেল। বাজার করলে হত একটু। তেমন কিছু নেই। তেলেরও টান রয়েছে।

বিষ্ণুপদ একটু হাসল, তাতে কি তোমার আটকায়? চিরটা কাল তো টানাটানির সংসারেই হাত পাকালে। সেদ্দ পোড়া ছ্যাঁচড়া দিয়ে দিব্যি খেয়ে গেলাম আমরা। কিছু লাগলে বলো, এনে দিই। কৃষ্ণজীবন তো কিছু টাকাপয়সা দিয়ে গেছে সেদিন।

নয়নতারা চোখ পাকিয়ে বলল, ওতে হাত দেবে কেন? আছে ক'টা টাকা থাক না। দুর্দিনে কাজে লাগবে।

বিষ্ণুপদ একটু দুঃখের হাসি হেসে বলে, তোমার বড় সরল মন। দুর্দিন আর আসবে কি? চিরটা কাল তো দুর্দিন মাথায় করেই কাটিয়ে এলে। তার চেয়ে খারাপ আর কী হবে? তাই তো বলি, চোখ ওল্টালে ছেলেরা বউরা সব হাঁটকে মাটকে নিয়ে নেবে। ভূতভুজিতে যাবে সব কিছু। তার চেয়ে ও টাকা নিজেরা খরচ করাই ভাল।

তোমার কেবল খরুচে বুদ্ধি। ও বুদ্ধি ভাল নয়। চলছে চলুক না।

আচ্ছা কেন মানুষ তুমি।

বিষ্ণুপদ আর কথা বাড়াল না। বসে বসে নয়নতারার কাজ দেখতে লাগল। জিনিসপত্রের কী যত্ন মানুষটার। একটা দানা অবধি নষ্ট হয় না। একটু তিল, একটু ধনে, একটু ডাল কি চাট্টি পোস্ত সব কুলোয় ঝেড়ে রোদে দিয়ে নির্দোষ করে যত্নে আবার কৌটোয় ভরে রেখে দেয়। গরিবের সংসারে কত অভাব থাকে। সাধ্যমতো নয়নতারা চিরকাল গতর খাটিয়ে ফুটো নৌকো সামাল দিয়েছে। অনুযোগ করেনি, ঝগড়া করেনি। এই একজনের কাছে নিজেকে বড় ঋণী লাগে বিষ্ণুপদর! বড্ড মায়াও হয়। এই মানুষটাকে কোনওদিন হাতে করে একখানা ভাল জিনিস এনে দেয়নি। কী খেতে ভালবাসে, কোন রঙের শাড়ি পছন্দ সেই খোঁজটাও নেয়নি কখনও।

তুমি বড় ভাল মানুষ গো!

বিষ্ণুপদর কথাটা শুনে কুলো থেকে মুখ তুলে নয়নতারা একটু হাসল, তুমি ভাল বলেই আমিও ভাল। মেয়েমানুষ জলের মতো, যে পাত্রে থাকে তার মতোই হয়।

সে তো তুমি বললে। একালের মেয়ে বউরা বলবে?

আমাদের আর একাল দিয়ে দরকার কি? ওরা ওদের মতো থাক।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, সে কথা তো আমিও তোমাকে বলি। তোমার মতো মানুষ হলে সংসারে অশান্তি হয় না। সব দিক বুঝে, ঠিক রেখে চলতে জানা চাই।

মেয়েদের কথা বলছো! পুরুষগুলোরও হাল একবার চেয়ে দেখ। তুমি যেমন মানুষ তেমনটা একালে পাবে খুঁজে? নেশা-ভাঙ নেই, বায়নাক্কা নেই, তর্জন গর্জন নেই, মেয়েমানুষের দোষ নেই। তা আমার ভাগ্য সেদিক দিয়ে বড্ড ভাল। খাওয়া-পরার কষ্ট সয়ে নিয়েছি শুধু তুমি ভাল বলে।

বিষ্ণুপদ খুব হাসল দুলে দুলে। তারপর বলল, সেই ভাল। তুমি ভাল, আমিও ভাল। দুজনেই দুজনের কাছে ভাল, কেমন তো?

নয়নতারাও হাসল, বলল, হ্যাঁ তো।

উঠোনের আগল ঠেলে এই সময় দুটি মানুষ ঢুকল উঠোনে। একটি বেশ ঝলমলে শাড়ি-পরা মেয়ে। সঙ্গে একজন পুরুষ। বিষ্ণুপদ চোখ কুঁচকে ঠাহর করে বলল, কে?

নয়নতারা কুলোটা নামিয়ে রেখে কলধ্বনি করে উঠল, ও মা! এ যে নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না! বীণাপাণি! আয় আয়।

বিষ্ণুপদ যে খুব খুশি হল তা নয়। এই মেয়েটি সম্পর্কে ভাল কথা শোনা যায় না। লোকে আজকাল খারাপ কথাই বলছে। তবু জলচৌকি ছেড়ে বিষ্ণুপদ উঠে দাঁড়াল।

বীণাপাণি দৌড়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল, কেমন আছো মা?

তোকে নিয়ে খারাপ স্বপ্ন দেখে যে কী মন খারাপ আমার! তোর বাবাকে নিয়ে বনগাঁয়ে যাবো বলে ঠিক করে ফেলেছিলাম। তারপর আর যাওয়া হল না।

বীণা আর নিমাই বিষ্ণুপদকে প্রণাম করে বারান্দায় মাদুর পেতে বসল। দুজনের কারও মুখেই সুখের ছাপ দেখতে পেল না বিষ্ণুপদ। নিমাইয়ের দিকে চেয়ে বলল, কেমন চলছে তোমার?

নিমাই শুকনো মুখ করে বলল, ওই টুকটাক করে চলছে।

জবাবটায় বিষ্ণুপদ খুশি হল না। ভ্রূটা কোঁচকানোই রইল। বলল, কেন বাবা, তুমি কাজকর্ম কিছু করো না?

একটা দোকান খুলবার ইচ্ছে আছে।

বিষ্ণুপদ দেখল, বীণাকে নিয়ে নয়নতারা গিয়ে ঘরে ঢুকল। মেয়েদের নানা কথাবার্তা থাকে।

বিষ্ণুপদ বলল, দোকান তো তোমার একখানা ছিল।

ছিল। সে তুলে দিতে হয়েছে।

তাহলে তোমাদের চলছে কিসে?

বীণা কিছু পায়।

কথাটা শুনেছি। শুনে আমার ভাল লাগেনি। বীণা যাত্রাদলে কেন নামল বলতে পারো?

আজ্ঞে, আমি বারণ করেছিলাম। শোনেনি।

কেন শোনেনি?

তখন আমার বুকের দোষ হয়েছিল। রোজগারপাতি বন্ধ। পেটের দায়ে আর আমাকে বাঁচাতেই নেমেছিল।

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ওসব ভাল ব্যাপার নয়। চারদিকে মেয়েদের যে কত বিপদ।

বীণা তো আমার কথা শোনে না। আপনারা বলে দেখুন।

আমি! বলে বিষ্ণুপদ আকাশ থেকে পড়ল, আমার কথায় কি কাজ হয় বাবা? বলিও না কাউকে কিছু। তোমাকে বললাম, ধর্মভীরু মানুষ বলে।

ধর্মভীরু মানুষদের এখন ভাত জোটে না।

তাই দেখছি। একটা ভারি উল্টোপাল্টা রকম চলছে এখন। কী বলো?

আজ্ঞে।

অনেকদিন এদিকে আসো-টাসোনি। দেখতে ইচ্ছে যায়। তোমার মুখখানাই তো ভলতে বসেছিলাম।

বড্ড আটকা পড়ে আছি ওদিকে। বীণা মন করল, তাই আসা।

যাত্রাদলে কি ও অনেক টাকা পায়?

না, তেমন কিছু নয়। আগের চেয়ে এখন একটু বেশি পাচ্ছে।

একটা কথা কি জানো? মেয়েদের রোজগার হঠাৎ খুব বেড়ে গেলে লক্ষণটা ভাল নয়। ওর মধ্যে একটা কিন্তু ঢুকে থাকে।

নিমাই সামান্য লজ্জিত হয়ে বলে, তেমন কিছু বাড়েনি।

বিষ্ণুপদ সামান্য চুপ করে থেকে বলে, দুনিয়াটায় এখন টাকা আর মেয়েমানুষ ছাড়া যেন কিছু নেই। আর একটা জিনিসও দেখি, খুব বেড়েছে। নেশা।

তা যা বলেছেন।

বনগাঁ কেমন জায়গা?

ভাল মন্দ মিশিয়ে।

দোকানটা কবে করবে বাবা?

খোঁজা হচ্ছে। সুবিধেমতো পেলেই খুলে ফেলব।

তখন বীণাকে যাত্রাদল থেকে ছাড়িয়ে নিও।

আজ্ঞে, চেষ্টা করব।

জামাটামা খুলে তেলটেল মাখো। কুয়োয় চান করবে, না কি পুকুরে?

নিমাই একবার আকাশের দিকে চেয়ে বলল, এখনও বেলা অনেক আছে। এগারোটার বেশি বাজেনি। হবে'খন সব।

বিষ্ণুপদর কথা ফুরিয়ে গেল। আজ দম ধরে অনেক কথা বলে ফেলল। এত বেশী কথার মানুষ নয় সে। কথা বেরিয়ে যাওয়ায় শরীরটাও একটু কাহিল লাগছে। ঘামও হচ্ছে যেন একটু।

নয়নতারা বেরিয়ে এসে বলল, ওগো, একটু এধারে শুনে যাও।

বিষ্ণুপদ উঠল। কাছে যেতেই নয়নতারা চাপা গলায় বলল, জামাইকে তো আর কচুঘেঁচু খাওয়াতে পারি না। একবার বাজারপানে যাবে নাকি?

বাজার! কতকাল যাইনি।

আজ যে রেমোটাও বাড়ি নেই। পারবে না?

পারব। টাকা দেবে নাকি?

দেবো।

বাজারের দরদাম কিছু জানি না। ঠকিয়ে দেবে হয়তো। কী কী আনতে হবে বলে দাও। বুদ্ধি খাটিয়ে কিন্তু আনতে পারব না।

একটু মাছ তো লাগবেই। একটু সর্ষের তেল। কয়েকটা আলু আর দুটো বেগুন।

নয়নতারা টাকা বের করে দিল। একখানা ব্যাগ ধরিয়ে দিল হাতে, তারপর বলল, ছাতাটাও নিয়ে যাও। রোদ বেশ চড়া লাগছে।

বাজার করতে ছাতায় সুবিধে হয় না। ও থাক। তেমন গরম নয়।

চটিজোড়া পরে রওনা দিতে যাবে এমন সময় নিমাই 'হাঁ হাঁ' করে ওঠে, আহা আপনি বাজারে যাচ্ছেন কেন? কিছু নেই নাকি বাড়িতে?

নয়নতারা বলল, সে যা আছে তাতে জামাইকে দুটি ভাত বেড়ে দেওয়া যায় না।

নিমাই মাথা নেড়ে হেসে বলে, আজ্ঞে, ওসব বলে লজ্জা দেবেন না। আমি তালেবর লোক নই। গরিবের ছেলে, দুটি ডালভাতই অমৃত। বুড়ো মানুষকে এই দুপুরে বাজারে পাঠাতে হবে না।

বিষ্ণুপদ না-যেতে পারলে বাঁচে। ঘটনাটা কী দাঁড়ায় তা দেখার জন্য দাঁড়িয়ে রইল।

নয়নতারা বলল, পাঠাতে হতই বাবা। দুচারটে জিনিস না হলেই চলবে না।

হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা বিষ্ণুপদর হাত থেকে নিয়ে নিমাই বলে, তাহলে দিন আমি এনে দিই।

সে কি হয়! তুমি জামাইমানুষ, ধুলোপায়ে বাজারে পাঠাবো?

নিমাই এক গাল হেসে বলে, দু'গ্রাস ভাত না হয় বেশী খাবো। দিন, আমার খেটে অভ্যাস আছে।

বীণাপাণি দরজায় এসে দাঁড়িয়ে বলে, ওকেই দাও মা। বাজার ভাল করে।

নিমাই বাজারে রওনা হয়ে যাওয়ার পর হাঁফ ছাড়ল বিষ্ণুপদ। জলচৌকিতে বসে ধুতির খুঁটে মুখের ঘাম মুছল, ফাঁড়াই কেটেছে বলা যায়। বাজারে যাওয়ার নামে যেন অকূল পাথারে পড়ে গিয়েছিল। বয়সকালে বাজারহাট এত ভাল লাগত যে সারাদিন বাজারেই পড়ে থাকতে ইচ্ছে যেত। আর মনে হত গোটা বাজারটাকেই গন্ধমাদনের মতো তুলে বাড়িতে নিয়ে আসে। কিন্তু এখন যেন কোথাও যাওয়ার নামে কে যেন ভেজা কম্বল জড়িয়ে দেয় গায়ে।

ও বাবা! তুমি যে চিনতেই চাইছে না আমাকে! কতকাল পর এলাম মুখে একটু হাসি অবধি দেখলাম না।

এই হাসছি মা। হাসতেই তো যাচ্ছিলাম, তোর মা কাজের কথা পেড়ে ফেলল যে!

বীণাপাণি তার দীর্ঘ বেণীটি খুলতে খুলতে কাছটিতে এসে ধপ করে বসে পড়ল মেঝের ওপর, কত বুড়ো হয়ে গেছ বাবা! কেমন যেন দেখাচ্ছে তোমাকে!

অপ্রতিভ বিষ্ণুপদ মেয়ের সামনে কেমন যেন স্বস্তি বোধ করছিল না। বড় অপ্রতিভ লাগছে। মাথায় কথা আসছে না।

বীণা বাপের দিকে চেয়ে বলল, চুল পেকে শনের নুড়ি হয়েছে, গালের চামড়া ঢলঢল করছে, রোগাও হয়েছে অনেক। কই, মা তো তোমার মতো এত বুড়িয়ে যায়নি।

বয়স তো হচ্ছে।

সে তো বুঝলাম, কিন্তু মুখখানা অত গম্ভীর কেন? আমাকে দেখে একটুও খুশি হওনি তুমি!

পাগল! কী যে বলিস! কতকাল পর এলি, খুশি হবো না কেন?

মাথা নেড়ে বীণাপাণি বলে, খুশি কেন হওনি তা জানি। তুমি ভাবো, তোমার বীণাপাণি যাত্রায় নেমে নষ্ট হয়ে গেছে! হ্যাঁ বাবা, তাই ভাবো তুমি?

বিব্রত বিষ্ণুপদ বলে, ওই দেখ, কী কথা! আরে দূর! তা ভাববো কেন?

বীণাপাণির চোখ দুটো ছলছল করতে থাকে, তাই ভাবো বাবা, আমি জানি। তোমার মতো ভাল একজন মানুষের মেয়ে হয়ে কি আমি নষ্ট হয়ে যেতে পারি বাবা?

বিষ্ণুপদ আমতা আমতা করে বলে, তাই কি বলেছি?

আমার তো খবরও তোমরা রাখো না। এই তো একটুখানি পথ পালপাড়া। একবার কেউ গিয়ে উকি মেরে দেখে আসত না আমাকে। ঠিক যেন বেড়াল পার করে দিলে! এক দুঃখী সংসার থেকে আর এক দুঃখী সংসারে গিয়ে পড়লাম। কীই বা আমার বয়স বললা! এক্কা দোক্কার কোট ছেড়ে গিয়ে একেবারে কুম্ভীপাকে। সংসারটা বড় নয় বলে রক্ষে। তার পর তোমার জামাইয়ের হল অসুখ। কী দিনই গেছে। পথ্যির জোগাড় নেই, ওষুধ আনতে সংসারের ভাতে টান পড়ে যায়, গায়ে কাঁথাকানি জোটে না। হ্যাঁ বাবা, এমন জামাইয়ের মধ্যে তুমি কোন কার্তিক ঠাকুরটি খুঁজে পেলে বলো তো!

বিয়ের সময় তো চাকরি করত।

আহা, কী চাকরি! ঠিকাদারের গুদামের দারোয়ান। তাও উপরি নিলে কিছু হত। তাও নয়, ইনি হলেন দড়কচা-মারা সাধুবাবা। এদিকে পেটে ছুঁচো বুকডন মারছে।

এহেন আক্রমণ জীবনে অনেক সয়েছে বলে বিষ্ণুপদ চুপ করে থাকতে পারল। মেয়ের এসব কথা বলার হক আছে। সত্যিই তো, নিমাইয়ের মধ্যে এমন কী দেখেছিল বিষ্ণুপদ? চেহারা নেই, চাকরি ভাল নয়, শুধু পাঁচজনে বলেছিল, ছেলেটি ভারি সৎ প্রকৃতির। দেখেও তাই মনে হয়েছিল বিষ্ণুপদর।

বীণার চোখের বাটি ছাপিয়ে গেল। টপ টপ করে গাল ভাসিয়ে জল আসছে। বিষ্ণুপদ অস্ফুট স্বরে বলে, কাঁদিস কেন?

কাঁদব না? অত অভাবের সংসারে দিলে বলেই তো আমার এত হেনস্থা হল। যাত্রায় নেমেটি বলে ঘেন্না করো? যাত্রায় নামলাম বলেই তো প্রাণে বাঁচলাম! নইলে মরতে হত যে!

বিষ্ণুপদ একবার হাঁ করল। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে নাকি? দমটা কম পড়ছে কেন হঠাৎ?

বীণা আঁচলে চোখ চেপে ধরে কাঁদছে। বিষ্ণুপদর বড় আত্মগ্লানি হচ্ছে তাতে। সে বড় নির্বোধ, বড় আহাম্মক। কত ভুলের জালে জড়িয়ে ফেলল নিজেকে আর সন্তানদেরও। সারাজীবন ধরে কত ভুল দেখল, ভুল বুঝল, ভুল করল। আজ তাই বেঁচে থাকতেই ভয় হয়। ভয় হয়, আরও বেঁচে থাকলে পরের পর আরও কত ভুলভাল হতে থাকবে!

এ গাঁয়ে হরিশ বলে একজন লোক থাকত। এখন সে আর এখানে থাকে না। তারই লতায়-পাতায় ভাই হল ওই নিমাই। হরিশের সঙ্গে তখন খুব দহরম মহরম চলছে বিষ্ণুপদর। এক একটা সময় আসে যখন এক একটা লোক এসে যেন ভর করে। তখন হরিশ যা বলে তাই ছিল বিষ্ণুপদর কাছে বেদবাক্য। হরিশই একদিন সম্বন্ধ আনল। বলল, পাত্র জজ ম্যাজিস্ট্রেট নয়, তবে এমন চরিত্রের ছেলে পাবেন না। সংসারটাও ছোটো। শুধু, বুড়োবুড়ি। হরিশের কথায় অন্য সকলের মত খানিকটা অগ্রাহ্যই করেছিল বিষ্ণুপদ। পাত্রপক্ষ এক পয়সা

পণ বা আর কিছু দাবি করেনি। পাত্রটিকে বিষ্ণুপদ দেখেছিল। লম্বা-চওড়া মিলিটারি নয়। কিন্তু ভারি কমনীয়, নরম-সরম মানুষ। বড্ড মিঠে কথাবার্তা। চোখের দৃষ্টিতে একটা দেবভাব ছিল। এখনও কি আছে? কে জানে।

বিষ্ণুপদ গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, ওরে, জামাই কি খারাপ ব্যবহার করে?

মুখঢাকা বীণাপাণি মাথা নাড়ল, না। সে মুরোদ আছে নাকি?

কোন দিক দিয়ে খারাপ বল তো! পয়সা নেই তা তো জানি। সে তো আমারও নেই। তা বলে তোর মা আমার নামে বলে বেড়ায় না।

বীণাপাণি আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মুখ তুলল। একটু ঠাণ্ডা হয়েছে। ধরা গলায় বলল, ওরকম সৎ মানুষ হয় না। কিন্তু সেটাই কি সব বাবা? পুরুষের আর কিছু গুণ থাকতে নেই? বড্ড ভীতু আর মুখচোরা। সাহস করে কোনও কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না। কিছু একটা ফলিয়ে তুলতে পারে না। সব সময়ে কেমন জলে-ডোবা ভাব। ওরকম মেনিমুখো মানুষের ঘর করতে গেলে একটু উল্টো রকমের না হলে চলে? বললা তো!

বিষ্ণুপদ অবাক হয়ে বলে, সৎ-এর উল্টো যে অসৎ! ভালর উল্টো যে খারাপ!

তাই বললাম বুঝি! আর কাকেই বা বলছি! তুমিও তো আর ভিন্ন রকমের নও!

বিষ্ণুপদ একটু হাসল, আমি নিমাইয়ের চেয়েও আর এক কাঠি সরেস রে।

হ্যাঁ বাবা, আমার একটা জিনিস গচ্ছিত রাখবে?

জিনিস! কী জিনিস রে?

একটা ছোট প্যাকেট।

দামী জিনিস নাকি?

দামীই। তবে কাউকে কিছু বলতে পারবে না। খুব লুকিয়ে রাখবে। তুমি জানবে, আর মা।

বিষ্ণুপদ আবার আতান্তরে পড়ে গিয়ে বলে, আমি গচ্ছিত রাখব কোথায় বল তো! বাক্স-প্যাঁটরা যা আছে সব খোলামেলা। তালাটালা নেই। চাবিও সব হারিয়ে গেছে।

রাখবে না?

রাখতে পারা যায়। তবে নিরাপদ হবে না। আমাদের তো সিন্দুক বা স্টিলের আলমারি নেই। তার ওপর বয়স হয়েছে। কবে চোখ বুজব আর সব ছেলেরা বউরা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেবে। আমাদের কাছে রাখা ঠিক হবে না রে মা।

তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু গচ্ছিত না রাখলেই যে নয়।

এমন কী জিনিস রে?

আছে বাবা। সব বলা যায় না।

কেন বলা যাবে না? চুরি তো আর করিসনি।

চুরি নয়। তবে জিনিসটার পিছনে অনেকে লেগেছে। রক্ষা করতে পারব না বোধহয়।

নিমাই জানে?

জানে বাবা। আর জেনেই তো বিপদ হল। এ মানুষটাকে নিয়ে চলা যে কী দায়!

৪২

ঘুমের মধ্যেই চয়ন একটা হেঁচকির শব্দ শুনতে পেয়েছিল। একটা বা দুটো। দু'দিন হল সে ঘন-ঘন অজ্ঞান হচ্ছে। শরীর বড্ড দুর্বল। হেঁচকির শব্দে তার একটু সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে সে উঠতে পারেনি। বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়ে ঘুমিয়ে ছিল অতল ঘুমে।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। মা চলে গেছে। পাখি ফুরুৎ। শুধু কয়েকখানা হাড়ের অবয়ব পড়ে আছে বিছানায়। মুখখানা হাঁ। তার সামনে মাছি উড়ছে।

চয়নের প্রথমে কোনও শোক হল না। বরং ভয় হল। এখন যে অনেক ঝামেলা। লোক ডাকো, সৎকার করো, শ্রাদ্ধ করা। চয়নের শরীর আজ এত কল সইতে পারবে কি? চয়ন মায়ের নাড়ি দেখল, খাস দেখল। এত বড় একটা ঘটনা ঘটল কত ঘটনাহীনভাবে।

চয়ন মায়ের মৃত্যু নিয়ে প্রথমেই কোনও হই-চই করল না। তার মনে হল, এক কাপ চা দ্রুত খেয়ে নেওয়া দরকার। নইলে সে কিছুতেই কিছু পেরে উঠবে না। কিন্তু চা করতে গিয়ে দেখল তার হাত পা থরথর করে কাঁপছে। চা করা অসম্ভব।

সে বেরোলো। গলির মধ্যে একটা দোকান আছে। সেখানে বসে শান্তভাবে পর পর দু কাপ আগুন-গরম চা খেয়ে নিল সে। তারপর বাড়ি ফিরে খুব সন্তর্পণে দোতলায় উঠল।

দাদা!

অয়ন দরদালানের এক চিলতে জায়গায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। কাগজটা সরিয়ে তাকে দেখে বলল, কী?

এবার নিচে আয়।

অয়ন তটস্থ হয়ে বলল, হয়ে গেছে নাকি?

মনে হচ্ছে।

কখন?

টের পাইনি। সকালে উঠে দেখছি মারা গেছে।

অয়ন একটু স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর বলল, যা, যাচ্ছি। ছুঁয়ে বসে থাক। সেটাই নাকি নিয়ম।

চয়ন নিচে নেমে এল। ঘরে ঢুকে মায়ের বিছানার একপাশে বসল। তাদের ঘরটা এমনিতেই চুপচাপ। এখন যেন পাথরের স্তব্ধতা। অয়ন এল, বউদি এল। নতুন আর একটি ঝি রেখেছে ওরা। সে গিয়ে ডাক্তার ডেকে

আনল।

তারপর এল পাড়া-প্রতিবেশী কয়েকজন। মৃত্যু একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নিত্যনৈমিত্তিক, তবু প্রতিটি মৃত্যুই মানুষকে কিছু বলতে চায়। কোনও একটি সত্যের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে চুপ করে থাকে। মৃত্যুর কোনও উচ্চারণ নেই, তবু অস্ফুট কিছু নীরবে বলেও যায়।

ডাক্তার একবার নাড়িটা ধরেই ছেড়ে দিয়ে ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিলেন। বললেন, এতদিন বাঁচবে বলে আশা করিনি। তোমাদের ভাগ্য ভাল। কিছুই তো ছিল না শরীরে!

তারা দুই ভাই নয়, কিন্তু বউদি বেশ কাঁদছিল। চোখভরা জল। একটু ফোঁপানি। খুবই সময়োপযোগী কান্না। তবে বিশ্বাসযোগ্য নয় একেবারেই। তা হোক, মায়ের জন্য একজন কেউ কাঁদছে—এটা চয়নের খারাপ লাগল না।

চয়ন কাঁদছে না, তার কারণ, তার কান্না আসছে না। জ্ঞানবয়সে সে কখনও কেঁদেছে বলে মনেই পড়ে না তার। বিরল সৌভাগ্যই বলতে হবে, বউদি একবার তার কাছাকাছি এসে কাঁধে হাত রাখল। কান্নাভেজা গলায় বলল, কী খারাপ লাগছে বলো তো!

চয়ন সন্তাপ মেশানো গলায় বলল, হ্যাঁ।

পাড়ার ছেলেদের ডাকতে হয় না। চলে আসে। গায়ে গেঞ্জি, কোমরে গামছা, মুখে একটা ক্যাজুয়াল ভাব।

মৃতদেহ ফেলে রাখার মানেই হয় না। তাদের আত্মীয়স্বজন কিছু আছে বটে, কিন্তু কে গিয়ে খবর দেবে? আর তারা আসবে কিনা তারই বা ঠিক কী?

চয়ন শুধু বলল, দিদিকে জানানো দরকার।

অয়ন বলে, আমাদের দরকার? না তার? গত বছরখানেকের মধ্যেও তো সে আসেনি।

চয়ন মুখ নামিয়ে নিল। বাস্তবিকই তাই। দিদির একটা ভয় ছিল, অয়ন চয়নের ঝগড়া পাকিয়ে উঠলে চয়ন আর মা গিয়ে তার ঘাড়ে ভর করতে পারে। ভয়টার কথা বলেছে দিদি নিজের মুখেই।

পন্টু পাড়ায় একটা ক্লাব করেছে। পরোপকারী ক্লাব। সে এসে বলল, কী দাদা, ঘাটখরচা দিতে পারবেন তো! না পারলে বলুন, আমাদের সৎকার ফান্ড থেকে দিয়ে দিচ্ছি।

এই পন্টুর সঙ্গে ফাটাফাটি ঝগড়ার কথা ভোলেনি অয়ন। সে গম্ভীর মুখে বলল, ঘাটখরচা আমরাই দেবো।

খাট এল, ফুল এল, ম্যাটাডর এল। মায়ের জন্য আজ কত আয়োজন!

বউদি জিজ্ঞেস করল, চা খাবে চয়ন?

চা?

খাও। তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে। শ্মশানবন্ধুদেরও দিতে হবে। সকালেই তো সব চলে এসেছে।

চয়ন চা খেল। এত ডামাডোলেও বুঝতে পারছিল, তার দাদা বেশ ভাল কোয়ালিটির চা খায়।

একটা কর্তব্যবোধ খোঁচা দিচ্ছিল চয়নকে। দিদিকে না জানানো ঠিক হবে না। তারা মোটে তিন ভাই-বোন। দিদি একটু গা বাঁচিয়ে থাকে বটে, কিন্তু খবর না দিলে পরে অশান্তি হবে। চয়ন অশান্তিকে ভয় পায়।

একটা পুরোনো ডায়েরিতে দিদির পাশের বাড়ির ফোন নম্বর পাওয়া গেল। খবরটা টেলিফোনেই দিয়ে দিল পন্টু। ফলে, অপেক্ষা করতে হল কিছুক্ষণ।

দিদি এল। আলুথালু হয়ে মায়ের বুকের ওপর পড়ে কাঁদল। সঙ্গে দুই ছেলেমেয়ে। তারা কিছু হতভম্ব। জামাইবাবু ভারিক্কী গম্ভীর মানুষ। মুখচোখে শোক ফুটিয়ে রাখছিলেন।

এ সবই কূট চোখে লক্ষ করছিল চয়ন। লক্ষ করাই তার স্বভাব। তার হবি।

চয়ন! এখন তোর কী হবে বল তো ভাই! বলে দিদি একদফা তাকেও জড়িয়ে ধরে কাঁদল।

চয়নের বড় অস্বস্তি হচ্ছিল। সে বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে।

দিদি অয়নের প্রতিও শোকপ্রকাশ করল। কাঁদল।

ফলে একটু দেরিতেই বেরোলো মা। ম্যাটাডর ভ্যানে একটি তুচ্ছ মৃতদেহ ভোঁ-ভোঁ করে শ্মশানমুখো যখন ছুটছে তখন কলকাতার রাস্তায় ঘাটে অফিসের ভিড়। মৃত্যুর মতো মহান ঘটনাও কলকাতার ব্যস্ততার কাছে তুচ্ছ। মৃত্যু কত অর্থহীন, কত গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে ডবলডেকার, বাস, ট্যাক্সির ব্যস্ত রাস্তায়।

মা একদম ঝামেলা করল না। শ্মশানে দাহ করার উনুন চট করে পাওয়া গেল। দাহ মিটে গেল মাত্র একঘণ্টায়। শুকনো শরীরটা নিজেই যেন ইন্ধন হয়ে উঠেছিল।

বাড়িতে ফেরার পর অয়ন ডেকে বলল, ক'টা দিন ওপরেই হবিষ্যি করিস।

কৃতজ্ঞতায় নুয়ে সে বলল, আচ্ছা।

ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক। তোর শরীর ভাল নয়। তোর বউদি সাগু ভিজিয়ে রেখেছে। খাওয়ার সময় ডাকবে।

আচ্ছা।

একা ঘরে ভয়-টয় পাবি না তো?

না। ভয় কিসের?

না, ভয় নয়। তবে ঘরে এসে এক সুগভীর ক্লান্তি ও শূন্যতাকে অনুভব করছিল চয়ন। এই শূন্যতাই কি শোক? শোক কেমন তা তো সে জানেও না ভাল করে। বিছানাটা এখনও পাতাই রয়েছে। শুধু চাদরটা নেই। আজ থেকে সে চৌকিতে শুতে পারবে। আজ থেকে তার আর কোনও বাড়তি কাজ রইল না। আজ থেকে নিশ্চিন্ত। এবং একা।

সে চুপ করে কিছুক্ষণ মায়ের বিছানাটায় নাঙ্গা তোশকের ওপরেই সটান হয়ে শুয়ে রইল। সে কি সুখী? না দুঃখী? না নির্বিকার? মাতৃবিয়োগের মতো বৃহৎ ঘটনার পরও কেন উথাল-পাথাল লাগছে না তার?

ওপর থেকে বউদি ডাকছিল।

চয়নের বিছানা ছেড়ে উঠতে কষ্ট হল। দরজার কাছে এসে ওপরের দিকে চেয়ে বলল, কী বলছো?

আগুন আর লোহা ছুঁয়ে ঘরে যেতে হয়। নিমু যাচ্ছে নিচে লোহা আর আগুন নিয়ে। তারপর চান করো। ধড়া পরতে হবে।

ধর্মের সঙ্গে, শাস্ত্রাচারের সঙ্গে কোনও যোগ নেই চয়নের। তবু সে যন্ত্রের মতো কাজগুলো করে গেল। স্নানের পর শরীরটা বেশ স্নিগ্ধ লাগছিল তার। সারাদিন কিছু খায়নি বলে শরীরটা বড্ড দুর্বল।

বউদি এক কাপ চা নিয়ে এল। ঘরে ঢুকে বলল, চা খেয়ে একটু বাদে ওপরে এসো।

সাগ্রহে চায়ের কাপ হাত বাড়িয়ে নিল চয়ন। এখন যেন ঠিক এই জিনিসটুকুরই প্রতীক্ষা ছিল তার। বলল, যাবো বউদি। একটু জিরিয়ে নিই।

নাও। তোমার তো রোগা শরীর, তার ওপর কত ধকল গেল আজ। একবার ভেবেছিলুম তোমাকে শ্মশানে যেতে বারণ করব। মুখাগ্নি তো তোমার দাদারই করার কথা।

তা হোক বউদি। মার জন্য তো আর কোনওদিন কিছু করতে হবে না। এই একটা দিন, কষ্ট কিছু নয়।

বউদি কোনওদিনই সুন্দরী ছিল না। এখনও নয়। তবে এখন কেন জানে না চয়নের কাছে বউদির মুখশ্রী খারাপ দেখাল না। এলো চুল পিঠময় ছড়িয়ে আছে। একটু শ্যামলা রং। মুখখানা গোলপানা। কোথাও বোধ হয় একটু শ্রী ছিল কখনও। এখনও রেশটা আছে।

বউদি জানালার তাকটায় একটু বসে বলল, বনুর কাণ্ডটা দেখলে? মা মারা গেছে, কিন্তু এল যেন পাড়া-প্রতিবেশীর মতো। হুশ করে এল, হাউমাউ করে একটু কাঁদল, শ্মশানযাত্রীরা রওনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে চলে গেল। বলল, ছেলেমেয়ের নাকি পড়া আছে।

বনু তার দিদির ডাকনাম। কারও কাছ থেকেই কোনও প্রত্যাশা নেই বলে মানুষকে একটু নিরপেক্ষভাবে বুঝতে পারে চয়ন। দিদি আসলে এ সংসারের সঙ্গে একদম জড়াতে চায় না নিজেকে। চয়ন যতদূর জানে, দিদির সংসারটি বেশ সুখের। টাকাকড়ি আছে, ভরা সংসার। ওইটুকুর মধ্যেই দিদি নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে চায়। মা বা ভাই তার কাছে দূরের ও বাইরের লোক।

চয়ন জবাব দিল না দেখে বউদি বলল, তোমাদের হবিষ্যির জন্য কত দিয়ে গেছে জানো? মাত্র দশটি টাকা।

চয়ন মাথা নত করে বলে, কীই-বা আর হবে বলে!

কথাটার কোনও মানে হয় না। বউদি অবশ্য কথাটার মানে খুঁজল না, নিজের মনেই বলল, টাকা তো ওর কাছে কেউ চায়নি। কিছু না দিলেও তো পারত। আরও একটা কাণ্ড করেছে। তোমরা রওনা হওয়ার পর এ ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র হাঁটকে দেখে গেছে।

কেন?

বোধ হয় সোনাদানার সন্ধানে ছিল।

আমাদের ঘরে সোনাদানা কোত্থেকে আসবে?

সে ও-ই জানে। কী খুঁজেছে জানি না। তবে ঢুকেছিল।

চয়ন ম্লান হেসে বলে, যা ছিল কবে বিক্রি হয়ে গেছে।

আমি তো তোমার চোখে খারাপই চয়ন, কিন্তু বোধ হয় বনুর মতো নই।

চয়ন সভয়ে বলল, খারাপ কেন হবে বউদি? খারাপ তো ভাবি না।

বউদি ধরাগলায় বলে, খারাপ তো আর এমনি হইনি। পরিস্থিতির চাপেই হয়েছি। আমাদের সংসারের ব্যাপারে বাইরের লোক নাক গলাতে এসেছিল বলেই তো এত অশান্তি। তুমিই বলল।

চয়ন ম্লান মুখে বসে রইল। সে তো আর বলতে পারে না, পাড়ার ছেলেদের নিয়ে পন্টু সেদিন। হামলা না করলে তাকে সেদিন মা-সহ এ বাড়ি থেকে বের করেই দিচ্ছিল দাদা আর বউদি।

বউদি বলল, চা খাও। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

চয়ন চায়ের তেমন স্বাদ পেল না। এই যে বউদি ঘরে এসেছে, তার মনে হচ্ছে এর পিছনেও একটা উদ্দেশ্য আছে। সে এখন একা। এবং অসহায়। মা থাকতে যে খুব একটা সহায় হত তা নয়। তবে মা ছিল বলেই দাদা

বউদির হয়তো একটু চক্ষুলজ্জা ছিল। পাড়ার ছেলেদের ভয়ও ছিল। কিন্তু এখন চয়নের আর কোনও আড়াল নেই, বর্ম নেই।

বউদি হঠাৎ খুব করুণ গলায় বলল, তুমি খুব একা হয়ে গেলে, না চয়ন?

চয়ন মুখ নিচু করে বলল, হ্যাঁ। খুব ফাঁকা লাগছে।

আমাদের তবু সংসার-টংসার আছে। তোমার তো তা নেই।

চয়ন মাথা নেড়ে কথাটা সমর্থন করল। কিন্তু তার বুক দুরদুর করছে। এ সব হল কোনও অপ্রিয় প্রস্তাবের ভূমিকা। এর পর কিছু একটা আসছে। আজ মা মারা গেছে, আজই হয়তো বলবে। না কিছু। কিন্তু গেয়ে রাখল। ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করার মতো ভুল আর দাদা-বউদি করবে না। তবে এখন প্রতিরোধহীন চয়নকে কথার ফাঁদে ভুলিয়ে ঠিকই বের করে দেবে একদিন।

বউদি বসেই রইল। গেল না। চয়ন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। একসময়ে, দাদার বিয়ের ঠিক পর পরই, বউদির সঙ্গে কত ভাব হয়ে গিয়েছিল চয়নের! একসঙ্গে বসে গল্প করা, সিনেমায় যাওয়া, বাপের বাড়ি যেতে সঙ্গী হওয়া, রেস্টুরেন্টে খাওয়া অবধি। তারপর ধীরে ধীরে সম্পর্কের নকশা পাল্টে গেল। সেটা হল, দাদা তার বাড়িওলার কাছ থেকে বাড়িটা কিনে নেওয়ার পর থেকেই।

চাকরি-বাকরির চেষ্টা করছো না চয়ন?

করছি।

তোমার তো শুনি অঙ্কে খুব মাথা।

চয়ন মৃদুস্বরে বলে, তাতে কিছু হয় না আজকাল।

শুধু টিউশানি করে কি চলবে?

খুব চেষ্টা করছি।

করো। তোমার জন্য আমরা সব সময়েই চিন্তা করি। একটু বিশ্রাম করে নাও। তারপর ওপরে এসো।

বউদি চলে যাওয়ার পর চয়ন চায়ের কাপ শেষ করে আবার চিৎপাত হয়ে শুল। ঘরটা আজ থেকে তার একার। সামনে বন্ধনহীন জীবন। তার কি ভাল লাগছে? না খারাপ? কামুর। আউটসাইডার উপন্যাসের নায়কেরও কি এরকম ভাবান্তরহীনতাই ছিল?

চূড়ান্ত ক্লান্তিতেই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল চয়ন। দাদাদের ঝি এসে ডেকে তুলল। চোখ চেয়ে চয়ন দেখল, ঘুমের মধ্যে সে খুব কেঁদেছে। চোখের কোলে জল। বুকটা ভার।

সে বলল, আমি খাবো না। বউদিকে বললা গিয়ে আমার বড্ড বমি-বমি করছে। খেতে পারব না।

ঝি মাথা নেড়ে চলে গেল।

সারা রাত অকাতরে ঘুমোলো চয়ন। যেন আজ একটা অনির্দিষ্ট ছুটি পেয়েছে। কিরকম ছুটি, কেন ছুটি, তা সে বুঝতে পারল না।

বউদি আবার চা নিয়ে এল সকালবেলায়, চয়ন, আজ তোমার শরীর কেমন?

বড় দুর্বল লাগছে।

আজ তাহলে আর বেরিও না। হবিষ্যি খাবে তো? রাঁধছি কিন্তু।

কিছু তো খেতেই হবে। রাঁধো।

তোমার দাদা বলছিল, এ ঘরটার অনেকদিন কলি ফেরানো হয়নি। একটু মেরামতিরও দরকার।

চয়ন চারদিকে তার শিথিল চোখ একবার ঘুরিয়ে দেখে নিল। ঘরটার অবস্থা চূড়ান্ত শ্রীহীন। প্রচুর ঝুল জমে সিলিংটা প্রায় কালো হয়ে এসেছে। দেয়ালের চাপড়া যে কত জায়গায় খসে পড়েছে তার হিসেব নেই। জানালা দরজার অবস্থাও খুব খারাপ। পাল্লাগুলোর কাঠ ক্ষয়ে গেছে অনেকটা করে।

চয়ন নিরাসক্ত গলায় বলে, মেরামত আর রং করলে ঘরটা ভালই হবে। বউদি, তোমরা কি আমাকে আর এখানে থাকতে দেবে?

বউদি একটু অবাক হয়ে বলে, কেন বলো তো!

চয়ন ভীষণ লজ্জা পেয়ে বলে, না, মানে, এখন তো মা নেই। একটা ঘর আটকে আমি পড়ে থাকব। তোমাদের অসুবিধে হবে না?

বউদি একটু চুপ করে থেকে বলল, আমরা ভাবছিলাম, নিচের তলাটা ভাড়া দিয়ে দেবো। যদি দিইও তুমি জলে পড়বে না। ছাদে একটা চিলেকোঠা তো আছেই। থাকতে পারবে না সেখানে?

চয়ন হাঁফ ছাড়ল। চিলেকোঠা! সেও তার কাছে স্বর্গ। চিলেকোঠার পাকা ছাদ নেই, অ্যাসবেস্টস। একটু গরম হবে। তা হোক, একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় তো। কলকাতার বাড়ি ভাড়া যেখানে উঠেছে চয়নের মতো লোকের পক্ষে তার নাগাল পাওয়া শক্ত। কৃতজ্ঞতায় ভরে গিয়ে চয়ন বলল, খুব পারব বউদি। খুব পারব।

আরও কয়েকবার আনমনে সে 'খুব পারব' কথাটা উচ্চারণ করল।

বউদি বলল, ওপরে অ্যাসবেস্টস হলেও ঘরটা কিন্তু ভালই।

জানি বউদি। একসময়ে ওই ঘরে আমি পড়তে যেতাম।

হ্যাঁ, তুমি তো জানোই। সংসারের খরচ যা বেড়েছে, নিচের তলাটা ভাড়া না দিলে চলছে না। তোমার দাদা অফিস থেকে অনেক টাকা লোন নিয়েছিল, মাইনে থেকে কেটে নিচ্ছে।

হ্যাঁ বউদি, ভাড়া দেওয়াই ভাল।

বউদি একটু হাসল, এর আগেও অনেকে ভাড়া নিতে এসেছে, কিন্তু এ ঘরটা দেওয়া হবে না জেনে ফিরে গেছে। পুরো একতলাটা হলে ভাড়াটাও ভাল পাওয়া যাবে। তুমি কিছু মনে কোরো না কিন্তু।

চয়ন কৃতজ্ঞতায় মরে যেতে যেতে বলল, না বউদি, কিছু মনে করার নেই। চিলেকোঠায় আলো-হাওয়া আছে। আমার ভালই হবে। তবে আর একটা কথা বলব?

বলো না কেন? লজ্জা কিসের?

টিউশানি করে আমি যা পাই তা খুব খারাপ নয়। মা চলে যাওয়ায় আমার খরচ কমেও গেল। আমার কাছ থেকে ভাড়া হিসেবে কিছু কিছু নেবে?

কী যে বলো!

কিন্তু বউদির গলায় একটা আনন্দের চাপা ভাবও শুনতে পায় চয়ন।

চয়ন মিনতির স্বরে বলল, না বউদি, আমার কোনও কষ্ট হবে না। সামান্য কিছু দিতে আমার কষ্ট হবে না।

আচ্ছা, সে পরে ভেবে দেখা যাবে। কাল থেকে খাওনি, তোমার শরীর ওইজন্যই দুর্বল লাগছে। কিন্তু এমন সব নিয়ম। এক কাজ করো, সাগু ভেজানো দু'গাল খেয়ে নাও। খাবে? তাহলে পাঠিয়ে দিই।

দাও। আমি একটু টিউশনির বাড়ি যাবো। খবর দেওয়া নেই তো!

পারবে?

পারব বউদি।

বউদি চলে গেল। একটু বাদে কলা, নারকেল কোরা আর চিনি দিয়ে মাখা বাটি ভরা সাগু দিয়ে গেল। চয়ন পেট ভরে খেল। তারপর বেরোলো। ঘরে বসে থেকে লাভ নেই। একজন লাগবে। তার চেয়ে পড়াতে বসলে মনটা ভাল থাকবে।

আজকের দিনটা কেমন যেন। রোদ হাওয়ায় হালকা একটা দিন। মনটা ফুরফুর করে পতাকার মতো। অনেক ওপরে উঠে নড়ে। মন থেকে একটা ভার নেমে গেছে আজ। দাদা-বউদি এখনই। তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে না। আপাতত সে রয়ে গেল। চিলেকোঠা তো কী হয়েছে?

সারাটা দিন আজ হালকা পায়ে নেচে নেচে বেরিয়ে গেল। বিকেলে মোহিনীদের বাড়ি।

মোহিনী অবাক হয়ে বলে, এ কী চয়নদা? কী হল?

মা চলে গেলেন।

ওমা! তা আপনি আজ এলেন কেন?

ঘরে ভাল লাগছিল না।

বসুন, বসুন। মাকে ডাকি।

মোহিনীর মা এসে দাঁড়ালেন।

ইস্, কবে হল চয়ন?

কাল সকালে।

এখন কী হবে?

চয়ন ম্লান হাসল, মা একরকম বেঁচেও মরেই ছিল।

তা হলেও তো মা!

চয়ন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কেন কে জানে, এখন তার মায়ের জন্য কষ্ট হচ্ছে। কান্না পাচ্ছে।

রিয়া বলল, দাদা-বউদির সঙ্গে তো তোমার সম্পর্ক ভাল নয়। মায়ের ব্যাপারে দাদা সাহায্য করেছে তো!

করেছে।

রিয়া একটা শ্বাস ফেলে বলল, যাক। কিন্তু এখন কী করবে চয়ন? ও বাড়িতে থাকতে পারবে?

পারব। বউদি বলেছে, থাকতে দেবে।

বলো কী! এ তো খুব ভাল কথা।

আজ্ঞে।

কিছু খাবে? তোমার তো অশৌচ, এখন অনেক রেস্ট্রিকশন। তোমাকে বরং এক গ্লাস ফ্রুট জুস দিই। মোহিনী বাবা বিলেত থেকে কমলালেবুর রস এনেছিল। খাও। আর কিছু খাবে? সন্দেশ?

না। আর কিছু নয়।

ঠিক আছে। পড়াবে নাকি?

পড়াতেই এসেছি। আমার কষ্ট হবে না।

পড়াও তাহলে।

রিয়া চলে যাওয়ার পর মোহিনী বলল, চয়নদা, আপনার কান্না পাচ্ছে না?

না। কী জানো, মা চলে যাওয়ায় কেমন যেন ভারমুক্ত লাগছে।

সে কী চয়নদা!

বলছি তো। আমার শোকের চেয়েও যেন বেশী মনে হচ্ছে ফ্রিডম। মায়ের জন্য সারাক্ষণ উদ্বেগ ছিল, অশান্তি ছিল। রাঁধতে হত, খাইয়ে দিতে হত। সব সময় মনটা পড়ে থাকত ঘরে। গিয়ে মাকে বাঁচা দেখতে পাবো তো!

আপনার খুব কষ্ট ছিল, চয়নদা, না?

খুব কষ্ট। যখন ভাবি, আমার জন্য তো মা এর চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট করেছে তখন নিজেকে খুব অকৃতজ্ঞ মনে হয়। আমি বোধহয় খুব হৃদয়হীন, না মোহিনী?

তা কেন চয়নদা? আপনি তো খুব নরম মনের মানুষ।

গরিবের মন বলে কিছু থাকে না। কতগুলো দারিদ্র্য আছে এতই খারাপ যে, মানুষকে নষ্ট করে দেয়।

আমার বাবাও খুব গরিব ছিল। ভীষণ গরিব। কিন্তু বাবা কখনও হার মানেনি।

তোমার বাবার কথা জানি মোহিনী। আমারও ওরকম হতে ইচ্ছে করে।

মোহিনী একটু হাসল। বলল, কিন্তু বাবা কখনও তার দারিদ্রের গল্প করে না।

৪৩

আজকাল বড্ড ভ্রম হয়ে যাচ্ছে সব কিছু। এই যে সে বাজারে যাচ্ছে এ-কথাটাই তার দু-চার পা গিয়ে খেয়াল থাকছে না। হঠাৎ অবাক হয়ে ভাবছে, আমি এ যাচ্ছি কোথায়? কী করতে যাচ্ছি? মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে নিতাই গৌর স্মরণ করে তবে মনে পড়ে। রাস্তাঘাটে চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হলে নিমাই পট করে লোকটাকে যেন চিনতে পারে না। হাঁ করে চেয়ে থাকে। তারপর ঠাহর করে স্মরণ করতে হয়। খেতে বসে খাবারের স্বাদ পায় না তেমন। ডাল মনে করে ঝোল দিয়ে খেয়ে যায়। বীণাপাণির লুকানো বিলেতি টাকার পুঁটুলিটি পাওয়ার আগে সে ছিল একরকম। আর ওই ঘটনাটির পর এখন নিমাই আর একরকম। মন কেবলই বলছে, বড্ড পাপ হয়ে গেল, বড্ড অন্যায় হয়ে গেল। এ কি আমাদের সইবে?

নিমাইয়ের মনের ভিতরটা কেউ দেখতে পায় না, নিমাই একা পায়। সেখানে সে এক জড়সড় মানুষ। মনের মধ্যে সর্বদা ভয়ের জুজুবুড়ি। ভগবানের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে ফল হয় কি? ভগবান তো সব দেখতে পান। বীণা কি সে কথা বিশ্বাস করে না? বীণার কি পাপের ভয় নেই? ও-টাকার জন্য অন্নদাতা কাকার কত ক্ষতি হল। গোটা তিনেক লাশ পড়ে গেল। ওই টাকার জন্য বীণা এখন বনগাঁ ছেড়ে পালাতে চাইছে। তবু টাকা সে ফেরত দেবে না।

ঝগড়া করে কোনও ফল হয় না। অনেক কথা ভেবে রাখে নিমাই, কিন্তু বীণা যখন মুখ ছোটায় তখন বেনো জলে সব কথা ভেসে যায় নিমাইয়ের। সে কি পারে বীণার সঙ্গে? ছেড়ে যাবে বলেও ভাবে নিমাই। কিন্তু যাবে-যাবে করেও কেন যেন যাওয়া হল না আজও।

বড় আনমনা হয়ে সে একটা মাঠ পেরোলো। তারপর বটতলার এলাকায় এসে উঠল। হ্যাঁ, বাজারের কথাই বলেছিলেন বটে শাশুড়ি ঠাকরুন। কিন্তু কী কী কিনতে হবে তা যে বেবাক ভুলে বসে আছে সে!

তবে বাজার-হাট খুব ভাল জায়গা। পাঁচজনের সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয়, শিক্ষালাভ হয়। নানা দুঃখের কথা একটুক্ষণ ভুলে থাকা যায়। বটতলা তেমন বড় জায়গা নয়। দোকানপাট আছে। সজী বাজার তেমন নেই। এখানে সেখানে আলু বেগুন কচু-উচু নিয়ে দু-চারজন বসে আছে। বেলা হয়েছে বেশ, এত বেলায় কি আর ব্যাপারীরা থাকে?

দরদস্তুর করে নিমাই পাঁচশ গ্রাম আলু আর সরু সরু বেগুন কিনল কয়েকটা। একটু কাঁচা লঙ্কাও। পটলের দামটা বেশী ঠেকল বলে নিতে সাহস পেল না। কয়েকটা উচ্ছে কিনে ফেলল। মাছের বাজার বলে কিছু নেই। একজনকে পেয়ে গেল, জিয়ল মাছের একটা কানা উঁচু গামলা নিয়ে বসে আছে। দু'খানা মাগুর মাছ কিনতে

শাশুড়ির দেওয়া পয়সা ফুরুৎ তো হলই, নিজের ট্যাকের পাঁচটা টাকাও বেরিয়ে গেল। তা যাক। শ্বশুরবাড়ি তো এসেছে একেবারে শুধু হাতে।

বটতলার তেমাথায় দাঁড়িয়ে নিমাই ভাবছিল, কিছু ভুল হল কিনা। আরও যেন কিছু বলে দিয়েছিলেন শাশুড়ি। মনে পড়ছে না। জরুরি জিনিসই যেন! কিন্তু আজকাল গবেট মাথাটায় নানারকম ভয় আর দুশ্চিন্তার বুজকুড়ি। কোনও কথাই মাথার মধ্যে ভাল করে বসে না।

বটতলা মানে আসল বটতলাই। পেল্লায় একখানা বটগাছ ঝুরিটুরি নামিয়ে মৌরসীপাট্টা গেড়েছে। তারই তলায় শীতলার থান। থানের গা ঘেঁষেই নানারকম দোকান-টোকান। বনগাঁর মতো জমজমাট নয়, তেমন ঝা-চকচকেও নয়। তবে এখানে কিছু লোকজন আছে। ওরকমই একটা দোকান থেকে একজন ফুলপ্যান্ট আর সবুজ হাওয়াই শার্ট পরা লোক হঠাৎ বেরিয়ে এসে তার দিকে চেয়ে বলে উঠল, নিমাই নাকি হে!

নিমাই হাঁ হয়ে গেল। কে লোকটা?

লোকটা কাছে এসে মুখখামুখি দাঁড়িয়ে বড় অবাক গলায় বলল, কখন এলে হে?

তবু নিমাইয়ের মনে পড়ছিল না যেন। তবে ভক্‌ করে কাঁচা মদের খানিক গন্ধ নাকে এসে লাগল। নিমাই দু'পা পিছিয়ে দাঁড়াল বটে, কিন্তু সেজো সম্বন্ধী রামজীবনকে চিনতেও পারল।

এই একটু আগেই এসেছি।

লোকটা মদ খেলেও মাতাল হয়নি। হাতের থলিটার দিকে চেয়ে বলল, তা থলি নিয়ে এখানে ঘোরাঘুরি করছ কেন? বাড়ি যাও।

নিমাই বিগলিত একটু হেসে বলল, গিয়েছিলাম। মা একটু বাজার করতে পাঠালেন।

রামজীবন অবাক হয়ে বলে, তোমাকে? মায়ের যে দিন দিন কী হচ্ছে! জামাই এসেছে, তাকে কেউ বাজারে পাঠায়?

জিব কেটে নিমাই বলে, আরে না। শ্বশুরমশাই নিজেই আসছিলেন, আমি তাঁকে আসতে দিইনি। বুড়ো মানুষ।

ছিঃ ছিঃ। বলে রামজীবন থলিটা প্রায় কেড়ে নিয়ে মুখটা ফাঁক করে দেখে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, এই কি জামাইভোগ নাকি? মাগুর মাছ তো রুগীর পথ্যি।

নিমাই শশব্যস্তে বলে, আজ্ঞে, জামাইয়ের যুগ আর নেই। আমিও কি আর তেমন জামাই?

রামজীবন বিরক্ত হয়ে বলে, নিজেকে সবসময়ে অত ছোট ভাব কেন বলল তো! তুমি কমটা কিসে? যত বৈষ্ণব-বিনয় দেখাবে তত লোকে পেয়ে বসবে। আর দাপে খাপে চলো, সবাই খাতির করবে।

নিমাই কি এই সার সত্য জানে না? খুব জানে। কিন্তু আরও যেটা জানে, তা হল, সকলের আর্য থাকে না। সকলে সবকিছুর অধিকারী নয়। সবাইকে মানায়ও না। তাহলে তো দুনিয়াটা অন্যরকম হত। সে মুখ নামিয়ে বলল, যে আজ্ঞে।

তোমার ওই মেনীমুখো স্বভাবের জন্যই তো বীণাটা বখে গেল। যাত্রাদলের নটী হয়ে যা খুশি করে বেড়াচ্ছে আর তুমি ঘর সামলে জেরবার হচ্ছ। বুক চিতিয়ে হাঁকডাক মারো দেখবে ভয়ে পেচ্ছাপ করে দেবে।

অভিজ্ঞতাবলে নিমাই জানে, নেশাখোরদের কিছু বোঝানোর চেষ্টা করতে নেই। যখন টং-এ চড়ে থাকে তখন তারা আর অন্যের কথা নিতে পারে না। নিজেরাই বকে যায়।

নিমাই তাই বিনীতভাবে বলল, চেষ্টা করব।

রামজীবনের অবশ্য নেশা হয়নি। সে এক পাত্র দু'পাত্রে কাত হওয়ার লোকও নয়। তবে সব সময়ে একটু চাপান দিয়ে রাখে। তাতে মনটা বেশ চনমনে থাকে। ফুর্তি-ফুর্তি ফুরফুরে খোসমেজাজী একটা ভাবও পেয়ে বসে তাঁকে। থলেটা একটু নাচিয়ে নিয়ে বলল, এসো, ওদিকটায় মুর্গি পাওয়া যাবে।

মুর্গি! বলে নিমাই যেন আঁতকে ওঠে।

কেন, খাও না নাকি? বৈষ্ণবপানা একটু ছাড়ো তো!

নিমাই মাথা নেড়ে বলে, সে কথা হচ্ছে না। গরিবের কি বাছাবাছি করলে চলে? সব খাই। কিন্তু মুর্গির বেজায় দাম পড়ে যাবে যে!

রামজীবন হেঃ হেঃ করে হেসে বলল, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না বাপু! শ্বশুরবাড়ি বলে কথা! পয়সা খরচ নিয়ে তুমি মাথা ঘামাবে কেন? এসো এসো। ডিম তো নিশ্চয় খাও?

খাই। তবে দরকার নেই।

দরকার নেই কেন?

অত হজম হবে না।

খুব হবে। ডালের মুখে একখানা ডিমভাজা কেমন ওতরাবে বলো। হজম নিয়ে মাথা ঘামায় পয়সাওলারা। এই তো তুমিই বললে যে গরিবের বাছাবাছি করলে চলে না। আমিও তাই বলি। হজম হলে হল, না হলে না-ই হল, সেঁটে তো দিই।

রামজীবন একরকম হাত ধরেই টেনে নিয়ে গেল তাকে। মুর্গিওলার কাছ থেকে দু'খানা মুর্গি কিনে ফেলল। দশটা দিশি ডিম। এক সবজিওলার ঘর থেকে কুশি কুশি গুটি চারেক ফুলকপি, বরবটি, কয়েকটা মুলো। বড্ড বেহিসেবী কেনাকাটা হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল নিমাইয়ের। কিন্তু কিছু বলতে সাহস হচ্ছিল না। তবে হঠাৎ তার মনে হল, শাশুড়ি যেন সর্ষের তেলের কথা বলেছিলেন।

গলা খাঁকারি দিয়ে নিমাই বলল, বোধ হয় একটু সর্ষের তেলও লাগবে।

আহা, আগে বলতে হয়! তা শিশি কোথায়? থলিতে তো দেখছি না।

বোধ হয় ভুলে গেছেন। অনেকদিন বাদে মেয়ে আসায় খুব বেসামাল হয়ে গিয়েছিলেন তো!

কথাটা মানল না রামজীবন। বলল, আরে না, মায়ের মাথাটাই গেছে। দাঁড়াও, একটা বোতল জোগাড় করি।

বলেই হাওয়া হয়ে গেল রামজীবন। কয়েক মিনিট বাদে যে বোতলটা নিয়ে ফিরে এল তার তলায় তখনও ধেনোর তলানি টলটল করছে। নিমাই কথাটা তুলতে সাহস পেল না, সকলের কি আর্ষ থাকে?

সেই বোতলেই মুদী যত্ন করে তেল ভরে দিল। রামজীবন তার পর পেঁয়াজ রসুন কিনল, আদা কিনল, গরমমশলাও বাদ দিল না।

একটু ঘি হলে হত, না?

এই গন্ধমাদন কেনাকাটা দেখে নিমাইয়ের বড় লজ্জা হচ্ছিল। সে একটা এমন কি মানুষ যার জন্য লোকে এত আয়োজন করবে? সে মাথা নেড়ে বলল, ঘি আমার লাগবে না।

দুর পাগল! ঘি না হলে মাংসে স্বাদ হয় নাকি?

মাতালের হাত খুব দরাজ হয়, নিমাই জানে। তবে অভিজ্ঞতা ছিল না। লোকটার মেলা পয়সা চলে যাচ্ছে দেখে তার মায়া হচ্ছে। তারা যেমন লোক, এত খরচাপাতি করাটা তাদের মানায় না। সে একটা বানানো কথা বলেই ফেলল, ঘিয়ের গন্ধ আমার ঠিক সহ্য হয় না।

রামজীবন তার পিঠে একটা থাবড়া মেরে বলে, আসল ঘি খাওনি তাই বলছ। এখানে গবা ময়রার দোকানে সরবাটা ঘি হয়। একবার খেলে বুঝবে।

অতএব ঘিও হল। তার পর বাড়িমুখো রওনা দেওয়ার আগে রামজীবন বলল, আর কিছু ভুল হল না তো?

আজ্ঞে না। বেলা হয়েছে, দেরি করাটা ঠিক হবে না।

তুমি একটু কেপ্পন আছে, না?

হিসেব করেই বরাবর চলে আসছি তো। হিসেবী না হলে কম পয়সায় সংসার চালানো শক্ত কাজ। মাথাও খাটাতে হয় বিস্তর; কোনটা আজ না হলেও চলে, কোনটা বাদ দিয়েও হয়।

ওসব হচ্ছে মেয়েলী বুদ্ধি। মেয়েমানুষরা বসে বসে কেবল হিসেব করে। আমি বাপু, ওরকম কঞ্জুসপনা সহ্য করতে পারি না। পুরুষমানুষের কি আর ওসব পোষায়?

রামজীবনের হাতে দড়িবাঁধা দু'দুটো মুর্গি মাঝে মাঝে ঝটপট করছে, কোঁক ছাড়ছে। নিমাই চমকে চমকে উঠছে। কেষ্টর জীব, একটু পরেই মারা পড়বে। মাছ-মাংস সে খায় বটে, তবে এ ব্যাপারটা সইতে পারে না।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে রামজীবন বলল, তা এখন রোজগারপাতি কী তোমার?

ম্লান মুখে নিমাই বলে, দোকানটা দেব-দেব করছিলাম। দেখি।

রামজীবন মুখটা একটু বিকৃত করে বলে, দোকান দিয়ে কী হবে শুনি? ক' পয়সা আসবে? অন্য লাইন ধরে ফেল হে।

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, লাইন তো কত ভাবছি। কিছু মাথায় আসছে না।

গাঁ-গঞ্জে লাইনও বড় একটা নেই। গুচ্ছের সেলামি দিয়ে দোকান যদি করেও ফেল, দেখতে পড়তায় ফেলতে পারবে না। যাদের ঘরে মেলা টাকা আছে, খাওয়া-পরার চিন্তা নেই, তারা দোকান খুলে বসে মাছি তাড়াতে পারে। আমি তো শুনি, বনগাঁয় দু'নম্বরীর খুব রবরবা।

দু'নম্বরী। সেটা কি রকম?

এই ধরো বাংলাদেশ থেকে মাল এনে বেচলে, নয়তো এদিক থেকেই ওদিকে মাল চালান দিলে। ওসব কারবারে বসে থাকতে হয় না।

নিমাই বিবর্ণ মুখে বলে, তা বটে।

আমি বলি কি, চোখ-কান বুজে আগে কিছু পয়সা পিটে নাও। তারপর ধর্মকর্ম করে পাপ কাটিয়ে নিতে পারবে।

নিমাই পাশ-চোখে একবার রামজীবনকে দেখে নিল। বেশ শক্তপোক্ত চেহারা। সে শুনেছে। রামজীবনের রোজগারটা সোজা পথে হয় না। কী করে না-করে তা বাড়ির লোকও জানে না। তবে যা করে তা নিশ্চয়ই ঢাক বাজিয়ে বলার মতো নয়। সে এসব মানুষের সঙ্গ করতে একটু ভয় পায়।

মাঠটা পার হচ্ছিল দু'জনে। হঠাৎ রামজীবন তার দিকে ফিরে বলল, না হে, কাজটা ঠিক হবে

নিমাই একটু আনমনা ছিল। চমকে উঠে বলল, কোন কাজটা?

তোমাকে যা করতে বললাম ও কাজ তোমাকে মানাবে না।

নিমাই তটস্থ হয়ে বলে, আজ্ঞে।

রামজীবন একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, দু-চারটে তোমার মতো লোকেরও দুনিয়ায় থাকা দরকার। এই যে আমার বাবাকে দেখ, এই বাবাকে দুনিয়াসুদু লোক আহাম্মক বুরবক বলে জানে। লোকটা জীবনে বাঁকা পথে যায়নি, তর্জন-গর্জন করেনি, চুরি-চামারি করেনি। গরিব থেকে গেছে। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে আহাম্মকই। কিন্তু বাবার কাছটিতে বসলে আমার যেন মনে হয় গঙ্গাস্নান হয়ে যাচ্ছে। কেন হয় বলো তো?

উনি বড় ভাল লোক।

রামজীবন মাথা নেড়ে বলে, ভাল বললে হয় না। ভাল মানে কি আহাম্মক? তা তো নয়। এই সেদিন সকালে বাবার কাছে বসেছিলাম। কথা হচ্ছিল, আমাকে আর বড়দাকে নিয়ে কথা। শুনে মনে হল, দেখতে বোকাসোকা হলে কি হয়, বাবা কিন্তু অনেক তলিয়ে দেখে। অনেক বোঝে।

নিমাই সায় দিয়ে গেল।

রামজীবনের গলাটা একটু উদাস হয়ে গেল হঠাৎ। বলল, বড়দা কত বড় মানুষ সে তো জানো আমার বড় হিংসে হয় বড়দাকে। বিদ্যেয় তো ছাড়াতে পারব না, তাই পয়সায় ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। আর এই দুনিয়ায় পয়সা করতে গেলে তো সাদা রাস্তায় হয় না।

যা বলেছেন।

কিন্তু কী হল জানো? জাতও গেল, পেটও ভরল না। জোচ্চুরি লাইনেও আজকাল জোর কম্পিটিশন। খারাপ লোকদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে করতে গা থেকে ভদ্রলোকের গন্ধটাই উবে গেল। কী হল বলো তো লাভটা?

প্রশ্নটা নিয়ে নিমাইও ভাবতে লাগল। সাদায়-কালোয় ভরা দুনিয়া। কোন রংটা গায়ে মাখবে। মানুষ? বিশেষ করে গরিব মানুষেরা? নিমাই মাথা নেড়ে বলে, আমিও তো তাই ভাবি।

আজ বুঝেছি, বড়দাকে হিংসে করতে যাওয়াটা আমার ঠিক হয়নি। সে আমাদের পাত্তা দেয়নি বটে, ভাইবোনকে মানুষ করারও চেষ্টা করেনি, কিন্তু সে দোষ তো তার একার নয়। আমরাই বা কোন মাথাওলা ছিলাম? বড়দার সময়ও ছিল না, পাস করেই চাকরি পেয়ে গেল। সময়টা দেবে কখন? উপরন্তু একটা দজ্জাল বউ জুটল। সে-ই খেয়ে ফেলল মানুষটাকে। আজকাল তাই ভাবি, বড়দাকে হিংসে করাটাই মস্ত ভুল।

নিমাই চুপ করে রইল। ব্যাপারটা সে তেমন কিছু জানে না। তবে শুনেছে, কৃষ্ণজীবনকে এরা ভাইবোন মিলে একবার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

বাড়ির ফটকে এসে পড়েছে দু'জন। রামজীবন হঠাৎ তার দিকে ফিরে বলল, না হে, পাপ পথে যেও না। একদিকে এক-আধজন রাশ টেনে না রাখলে চলে না।

বাড়িতে ঢুকে একটা হই-চই হাঁক-ডাক বাঁধিয়ে বসল রামজীবন। জামাকাপড় বদল করে একটা লুঙ্গি পরে নিয়ে কামিনী ঝোপের নিচে মুর্গি কাটতে বসে গেল। বীণাপাণি মশলা পিষতে বসে গেল। ব্যস্ত হয়ে পড়লেন শাশুড়ি ঠাকরুনও।

নিমাই তার ভার হয়ে থাকা মনটা নিয়ে বারান্দার এক ধারে মোড়ায় বসে রইল। শ্বশুরমশাই স্নান করতে গিয়েছিলেন কুয়োর ধারে। বারান্দায় উঠে এসে ভেজা কাপড় নিংড়োতে নিংড়োতে বললেন, আজ নাকি পেল্লায় সব বাজার হয়েছে! রেমো কেনাকাটা করল বুঝি?

নিমাই মাথা নেড়ে বলল, যে আজ্ঞে। বারণ শুনলেন না।

ওর হাতটা খুব দরাজ, বুঝলে!

সে আর বলতে!

শ্বশুরমশাই ভেজা কাপড়টা উঠোনের তারে টান-টান করে মেলে দিয়ে গায়ে একখানা জামা চড়িয়ে বারান্দায় এসে বসলেন ফের। বললেন, একটা কথা ছিল নিমাই।

আজ্ঞে, বলুন।

বীণা একটা জিনিস আমার কাছে গচ্ছিত রাখতে চায়।

জানি।

আমরা দুজনায় বুড়ো হয়েছি, বাক্স-প্যাঁটরাও তেমন নেই। তুমি কি জানো বাবা জিনিসটা কী?

নিমাই অধোবদন হল। তারপর ক্ষীণ গলায় বলল, জানি।

কী জিনিস বলল তো!

নিমাই খুব নিরীহ গলাতেই বলল, সে আপনার মেয়েই আপনাকে বলবে'খন।

স্পষ্ট করে বলছে না। তোমার ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, কোথায় একটা কিন্তু আছে। খোলসা করে না বললে জিনিসটা রাখি কি করে বলল তো!

নিমাইয়ের হঠাৎ কী যে হল কে জানে! মুখ নিচু ছিল। কোলের ওপর টপটপ করে চোখের জল খসে পড়তে লাগল।

বিষ্ণুপদ নিমাইয়ের দিকেই চেয়ে ছিল। হঠাৎ বলল, আমার চোখে ছানি আসছে বাবা। চারদিকটা কেমন অস্পষ্ট আর ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখি। মাঝে মাঝে ভাবি, ছানিটা বোধ হয় ভগবানেরই আশীবাদ। স্পষ্ট করে সব না দেখাই ভাল।

নিমাই উঠল। পায়ে পায়ে উঠোনের সীমানা ডিঙিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা যেন বড্ড উথাল-পাথাল করছে। নিজের খামতি, দুর্বলতা, নিজের অপদার্থতা আজ যেন আরও ঘুলিয়ে উঠল তার নিজের চোখে। মাথাটা কাজ করছে না।

সামনেই একটা নর্দমার মতো। পচা জল জমে আছে। কাঁচা রাস্তা গাছপালার ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেছে। ওপরে মস্ত আকাশটা যেন রোদের হাসি হাসছে তার দুর্দশা দেখে। নিমাই তার কাতর জলভরা দুখানা চোখ মেলে হাঁ করে চেয়ে রইল শুধু। বড় কষ্ট হচ্ছে তার। এরা আজ ভাল খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছে। তার মুখে কিছু রুচবে না আজ। তার খিদে মরে গেছে, বাঁচার ইচ্ছে মরে গেছে, বড্ড গ্লানি হচ্ছে মনে।

অনেকক্ষণ বাদে বীণা যখন এসে তাকে স্নান-খাওয়ার জন্য ডাকল তখন নিমাই একটা নিমগাছের গোড়ায় ঠেস দিয়ে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে। চোখের কোলে তখনও জল।

রাতে তারা যখন ঘরে দুজনায় হল তখন বীণা বলল, তুমি এরকম করছ কেন বলল তো!

নিমাই বোধহীনভাবে বীণার দিকে চেয়ে বলল, আমি আমার বশে নেই।

বীণা চাপা হিংস্র গলায় বলল, তোমাকে একটা কথা বলে দিই। তুমি যদি আমার টাকা নিয়ে বেশী মাথা ঘামাও তাহলে কিন্তু ভাল হবে না। তুমি ও-টাকার কথা ভুলে যাও। পাপ হোক কি আর যাই হোক, তোমার তাতে কী? এমন সব কাণ্ড করছ যে লোকে টের পেয়ে যাচ্ছে।

নিমাই ভয় পেল না। কিন্তু মেনেও নিল না। চুপ করে রইল।

বাবাকে কিছু বললানি তো!

নিমাই মৃদু স্বরে বলে, বলতে হয়নি। উনি নিজেই কিন্তু সন্দেহ করছেন।

বাবা কী বলেছে তোমাকে?

কী জিনিস গচ্ছিত রাখতে চাইছ তা জানতে চাইলেন।

তুমি কী বললে?

বললাম তুমিই ওঁকে বলবে।

বীণার ঝংকারে ভরা গলা হঠাৎ কয়েক পর্দা নেমে গেল। বলল, কী বলব তা আমি ভেবে পাচ্ছি না। বাবা তো আর এক আহাম্মক। তোমার মতোই।

নিমাই বিছানার একটি পাশে বসে রইল বজ্রাহতের মতো।

বীণাপাণি তার দিকে কূট চোখে চেয়ে থেকে বলল, তুমি এর পর এমন বেফাঁস কিছু হয়ত করে ফেলবে যাতে আমি ধরা পড়ে যাবো।

নিমাই আস্তে করে বীণার দিকে মুখ ফেরাল। তারপর বলল, আমাকে এবার বিদায় দাও বীণা। আমার মনে বড় কষ্ট।

বিদায় নেবে তা তার জন্য আমার অনুমতির কি দরকার? নিলে নেবে।

অনুমতিরও দরকার হয়। তুমি আমার ওপর অত রেগে না থাকলে বুঝতে পারতে।

বীণাপাণি বিষ-গলায় বলল, ঢং কোরো না। একে তো তোমার জন্যই বনগাঁয় আমার বসবাস করা বিপদের ব্যাপার হয়ে উঠল, তার ওপর এসব ন্যাকামি আমার সহ্য হচ্ছে না। তুমি কাছে থাকলেই বিপদ।

নিমাই মাথা নেড়ে বলল, সে কথাই ঠিক। ভেবে দেখলাম, আমি বড় অপদার্থ। আমি থাকলেই তোমার অসুবিধে।

ওই লোকটা সেদিন যদি প্যাকেটটা দেখে না যেত তাহলেও ভয়ের কিছু ছিল না। কী যে কাণ্ডটা করলে তুমি!

নিমাই কান্না সামলে ধরা গলায় বলল, কাল সকালে আমি বিদেয় হয়ে যাবো। কিন্তু একটা কথা বলে যাই। হঠাৎ করে উধাও হয়েছ এটা নিয়ে বনগাঁয় কথা হবে।

কেন হবে? আমি তো বাপের বাড়ি এসেছি। কাকাকে বলেওছি সে কথা।

চিরকাল তো এখানে থাকতে পারবে না। ফিরতে হবে।

আমি তোমার মতো বোকাও নই, আহাম্মকও নই। আমি মাথা উঁচু করেই ফিরব।

নিমাই ক্লিষ্ট মুখে বসে রইল।

কী চাও তুমি বলো তো! তুমি চাও টাকাটা আমি কাকার হাতে তুলে দিই? ও টাকার ওয়ারিশ কি কাকা?

আমি যা বলেছিলাম তা ভুলে যাওয়াই ভাল। ওসব আগড়ম বাগড়ম কথা। আমার মাথায়। ওরকম সব বোকা-কথাই আসে।

তার গেঞ্জিটা বুকের কাছে হঠাৎ খামচে ধরে বীণা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, ফের ন্যাকামি হচ্ছে!

নিমাই একটা অর্ধস্ফুট যন্ত্রণার আওয়াজ করল। সে দুর্বল মানুষ। বীণা বড় হিংস্র মুঠিতে তার বুকের লোম অবধি খিমচে ধরেছে। ঝাঁকুনিতে তার ঘাড়ে মট করে লাগল। নিমাই জলভরা চোখে বীণার দিকে চেয়ে বলল, আমাকে সত্যিই ছেড়ে দাও বীণা। আমি আর পারি না।

৪৪

বেলা দুটোর সময়ে চারুশীলা তার লিভিং রুমের ঠিক মাঝখানটায় কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বিরস মুখে চারদিকে চেয়ে দেখে নিয়ে ঘোষণা করল, বাড়িটার আর্কিটেকচারাল ডিজাইন। ভীষণ সেকেলে আর যাচ্ছেতাই। তোমারও নিশ্চয়ই তাই মনে হয় ঝুমকি? কী বিচ্ছিরি সব কোণ। আর খাঁজ! জানালাগুলো যথেষ্ট প্যানোর‍্যামিক নয়। ফ্লাশ ডোরের চেয়ে অনেক ভাল কি জানো? ডেকোরেটিভ ডাবল ডোর। আর ফ্লোরিংটাও দেখ। এ তো আর আসল মার্বেল নয়, অনেকটা মার্বেলের মতো দেখতে। নাঃ, আর একটা মডার্ন বাড়ি করতেই হবে মনের মতো।

চারুশীলার বরের একটা পারসোনাল কম্পিউটার আছে। সেটা বিশেষ ব্যবহার হয় না। ভদ্রলোক দেশ ও বিদেশে এত বনবন করে ঘুরে বেড়ায় যে, নিজের বাড়িতে থাকার বা জিনিসপত্র ব্যবহার করার সুযোগই হয় না বড় একটা। এই পিসি-তে প্রায়ই এসে প্র্যাকটিস করে ঝুমকি। চারুশীলাই বলেছে, রোজ দুপুরের দিকে চলে আসবে। তোমার প্র্যাকটিসও হবে আর আমিও কথা কয়ে বাঁচবো।

ঝুমকির আত্মসম্মানবোধ প্রবল। একটু অনাদর বা উপেক্ষা বুঝতে পারলেই সে হাজার হাত তফাত হয়ে যায়। হয়তো অভিমান আর হীনম্মন্যতা থেকেই সে এরকম। অন্তত তার বাবা একদিন এরকমই বলেছিল তাকে। তবু ঝুমকি তার নিজেরই মতো। চারুশীলার পাগলামি এবং অপচয় দেখে সে অবাক হয়। অনেক টাকা আছে চারুশীলাদের, কিন্তু টাকার অহংকার নেই। চারুশীলা পাগলের মতো টাকা খরচ করে। ঝুমকি আসছে যাচ্ছে মাত্র কয়েক মাস হল। তার মধ্যেই সে অন্তত বার পাঁচেক দেখল, চারুশীলা জলের দরে পুরনো আসবাব কিছু না কিছু বিক্রি করে নতুন আসবাব আনছে। পাল্টে ফেলছে সোফার কভার, জানালার পর্দা, বাসনপত্র। বাইরের ঘরের মেঝের পুরনো মার্বেল টালি তুলে ফেলে নতুন টালি পাতা হল এই তো সেদিন।

এখন বাড়িটাও পাল্টাতে চায় দেখে ঝুমকি একটু অবাক হয়ে বলল, কেন মাসি, এ বাড়ির ডিজাইন তো ভীষণ মডার্ন। সেকেলে বলছ কেন?

চারুশীলা চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখে নিতে নিতে বলল, আমার কাছে বড্ড পুরনো হয়ে গেছে। একরকম প্যাটার্ন কি রোজ দেখতে ভাল লাগে?

ঝুমকি একটু হাসল, তোমার অনেকগুলো বাড়ি থাকা উচিত ছিল। ঘুরে ঘুরে থাকতে পারতে।

চারুশীলা ঝুমকির দিকে চেয়ে ভ্রু ওপরে তুলে বলল, আরে, ঠিক তো! এজন্যই আগের দিনের লোকেরা অনেকগুলো করে বাড়ি করত। আসুক তোমার মেসো, কথাটা বলতে হবে তো! এত এত বাড়ি তৈরি করে

দিচ্ছে লোককে, নিজের কেন তবে একখানা মোটে বাড়ি?

ঝুমকি ঠাট্টা করে বলে, ক'টা বাড়ি চাও? গোটা দশেক?

আরে না। করপোরেশনের কী সব আইন-টাইন আছে বোধ হয়। অতগুলো করতে দেবে না।

দেবে। শুনেছি নিজেদের বাড়ি থাকলে সরকারি ফ্ল্যাট বা বাড়ি পাওয়া যায় না।

বেজার মুখ করে চারুশীলা বলে, সেই জন্যই তো সল্ট লেক-এর প্লটটা নিয়ে ভয়ে ভয়ে থাকি। ওটা আমার নামে। এটা তোমার মেসোর নামে। সবাই ভয় দেখাচ্ছে, টের পেলে নাকি জমি কেড়ে নেবে। আমি অবশ্য সল্ট লেকে যেতে চাই না।

কেন মাসি, ফ্যান্টাস্টিক জায়গা তো!

মোটেই নয়। ভাল ডিজাইনের বাড়ি করব, দেখবে কে বললা! ক'টা লোক ওখানে? তা ছাড়া ওখানে থাকলে কেউ যাবে না।

কেন, নির্জনতা তোমার ভাল লাগে না? আমার তো খুব ভাল লাগে।

ও বাবা, নির্জনতা আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। আমি চাই সবসময়ে হই-চইয়ের মধ্যে থাকতে। নির্জনে থাকলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে, কান্না পায়। আরও একটা ব্যাপার আছে। শুনলে তুমি হাসবে।

কী গো মাসি?

হাসবে না তো! নির্জনে আমার ভীষণ ভূতের ভয় হয়।

ঝুমকি হেসে ফেলল, কলকাতায় আর ভূত কোথায় মাসি? তারা সব আলো আর শব্দের ঠেলায় পালিয়ে গেছে।

ভয়ের জন্য কি ভূতের দরকার হয়? ভূত নেই তা জানি, কিন্তু তার ভয়টা তো আর নেই হয়ে যায়নি। ফাঁকা বাড়িতে একা থাকলে আমার দিনের বেলাতেও ভূতের ভয় করে। আমাকে কেমন একা থাকতে হয় জানো তো। কর্তা হিল্লি-দিল্লি-লন্ডন-নিউ ইয়র্ক করে বেড়াচ্ছেন। ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে, তখন কী রকম যে লাগে! এই, আমি তোমাকে ডিস্টার্ব করছি না তো!

না, না। আমি তো তোমার সঙ্গে গল্প করতেই আসি।

রোজ আসবে। আমি তো ভীষণ বকবক করতে ভালবাসি।

তুমি সিনেমা করা ছেড়ে দিলে কেন?

চারুশীলা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, বিয়ের পর আর করতে দিল কই? আর আমারও ভীষণ বোরিং লাগত। মোটিভেশন ছিল না তো! ভাল অভিনয় করব, টাকা রোজগার করব, সবাইকে অ্যাট্রাক্ট করব— একটা কোথাও অ্যাম্বিশন তো থাকবে! আমার কিছুই ছিল না। তার ওপর আমাদের বাড়িটাও তো খুব কনজারভেটিভ। আমার এক কাকা ডিরেক্টর ছিলেন, তিনিই নামিয়ে দিয়েছিলেন।

মোট ক'টা ছবি করেছিলে?

চারটে। দুটোয় নায়িকা। সে দুটোই ফ্লপ। আর দুটোতে সাইড রোল। সে দুটোও চলেনি।

এই বলে চারুশীলা খুব হাসল।

ঝুমকি বলল, আমি একটাও দেখিনি।

দেখবে কি করে? সুপার ফ্লপ যে। রি-রান তো হয় না।

তুমি যদি আজও সিনেমা করতে তাহলে একজন নায়িকার সঙ্গে পরিচয় আছে বলে গল্প করতে পারতাম বন্ধুদের কাছে।

আমার কিন্তু ভাই একদম ভাল লাগত না। বড্ড একঘেয়ে। শুটিং-এর মতো বোরিং জিনিস হয় না। তার ওপর আবার নায়িকাদের পাবলিক লাইফ নেই। দোকানে বাজারে যেতে পারে না, রাস্তায় বেরোতে পারে না।

তোমার হয়েছে সেরকম?

চারুশীলা মুচকি হেসে বলে, নায়িকা বলে নয়, তবে এককালে রাস্তায় বেরোলে সবাই তাকাত।

এখনও তাকায়। তুমি এখনও যা সুন্দর! কী ফিগার!

যাঃ। কত মুটিয়ে গেছি!

একটুও মুটিয়ে যাওনি।

তোমাকে আর মন-রাখা কথা বলতে হবে না। কত বয়স হল বলো তো!

তোমার বয়স বোঝাই যায় না।

খুব যায়। আয়নায় যখন নিজেকে দেখি তখন দেখতে পাই মুখের চামড়া কত লুজ হয়ে গেছে।

ওটা তোমার সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার। মোটেই চামড়া লুজ হয়নি। তুমি তো মোটে আর্লি থার্টিজ।

মিড থার্টিজ। এখন আর হিসেব করি না। ভয় করে। কর্তা কী বলে জানো? আমার একটা চুল পাকলেই নাকি ডিভোর্স করবে।

ওটা তো ঠাট্টা।

পুরুষমানুষদের বিশ্বাস নেই ভাই। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কত সুন্দরীদের দেখছে।

ঝুমকি লজ্জার হাসি হেসে বলে, যাঃ। মেসো তোমাকে যা ভালবাসে!

একটা জিনিস শিখে রাখো, পুরুষমানুষকে বেশী একা ছেড়ে দিতে নেই।

তুমিই-বা ছাড়ো কেন? সঙ্গে থাকলেই পারো!

আগে সঙ্গেই তো থাকতাম। সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবী ঘুরে বেরিয়েছি। এখন ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়ছে, আমার হাত-পা বাঁধা। বিয়ে হলে বুঝবে।

বিয়েতে আমার কাজ নেই বাবা।

চারুশীলার ভ্রূ হঠাৎ কুঁচকে গেল। চিন্তিত মুখে হঠাৎ একটা চেয়ার টেনে এনে ঝুমকির মুখোমুখি বসে বলল, আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় যে ওরা দুজনে দুজনের প্রেমে পড়েছে?

কারা মাসি?

আহা, আমার ভাই হেমাঙ্গ আর রশ্মি। কী মনে হচ্ছে?

অবাক হয়ে ঝুমকি বলে, কি করে বলব বলল তো!

কিছু মনে হয় না ওদের দেখে?

তোমার ভাই মেয়েদের বেশ ভয় পায়।

আর রশ্মি?

রশ্মি খুব চালাক।

একটু দমে গিয়ে চারুশীলা বলে, তাহলে কি ব্যাপারটা হয়ে ওঠেনি বলছ!

আমি বুঝতে পারি না মাসি। দুজনেই হাইলি এডুকেটেড, দুজনেই অ্যাডাল্ট, আন্ডারস্ট্যান্ডিং।

চারুশীলা হতাশ গলায় বলে, আমারও কি রকম মনে হয়, ওরা ঠিক প্রেমে পড়ছে না। দেয়ার ইজ এ সুইট রিলেশন, বাট নাথিং মোর দ্যান দ্যাট। কিন্তু কেন বলল তো? ওরা প্রেমে পড়ছে না-ই বা কেন?

এমনভাবে বলছ যেন প্রেমে পড়া আর জলে লাফিয়ে পড়া একই ধরনের ব্যাপার। লাফ দিয়ে পড়লেই হল!

চারুশীলা একটু হাসল, তোমরা এ-যুগের ছেলেমেয়েরা কিরকমভাবে প্রেমে পড়?

আমরা মোটেই সহজ পাত্রপাত্রী নই। কত টেনশন আমাদের! কেরিয়ার আছে, প্ল্যানিং আছে, তারপর অ্যাডজাস্টমেন্ট, টেম্পারামেন্ট এসব ফ্যাক্টর আছে।

দুর! অত ফ্যাঁকরা থাকলে কি প্রেম হয়?

হয়। তবে আবেগটা বেশী থাকে না।

প্রেম তো একটা আবেগই। তোমার নেই?

আছে হয়তো। তবে বুঝতে পারি না।

তুমি এ পর্যন্ত কারও প্রেমে পড়নি?

ঝুমকি ভীষণ লজ্জা পেয়ে বলে, প্রেমে পড়তে খুব ভয় পাই। আমি পড়লেও সে হয়তো পড়বে না। আমার তো চেহারা নেই!

কী নেই?

চেহারা।

তোমার মাথা। বলে চারুশীলা হেসে ফেলে, রোগা বলে বলছ? রোগা হওয়ার জন্য কত মেয়ে কত সাধ্যসাধনা করে তা জানো? গায়ে একটু মাংস লাগলেই তুমি তো ভীষণ সুন্দরী!

যাঃ!

তা হলে দেখবে?

কী দেখব?

আমি আজ থেকে তোমার খাওয়ার চার্ট করে রোজ তোমাকে খাওয়াবো। সাত দিনের মধ্যেই তুমি আর তোমাকে চিনতে পারবে না।

মুখটা বিষন্ন করে ঝুমকি বলল, আমি তো খেতেই পারি না। মায়ের সঙ্গে খাওয়া নিয়েই তো আমার রোজ ঝামেলা হয়। মা বলে আমার পাকস্থলীটা নাকি একটা হাঁসের ডিমের মতো ছোট্ট।

চারুশীলা বলে, তোমাদের বয়সী রোগা মেয়েদের তো ওইটেই ভীষণ দোষ। খেতে চাও না।

ঝুমকি মৃদু হেসে বলে, মোটাসোটা হলেও আমি মোটেই সুন্দরী হয়ে উঠবো না। আমার ফেস কাটিং ভাল নয়।

চারুশীলা হঠাৎ আনমনা হয়ে গেল। ঝুমকি সুন্দর কিনা সেই পয়েন্ট নিয়ে আর মাথা ঘামাল না। ঘটনাটা ঘটা উচিত ছিল?

কোন ঘটনা মাসি?

হেমাঙ্গ আর রশ্মির একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ওদের তো বেশ ভালই মানাত।

তা মানাত, একটু ধৈর্য ধরো, হয়েও যেতে পারে।

হবে? বলে চারুশীলা খুব হতাশা মাখানো মুখে খানিকক্ষণ বসে থেকে বলে, যদি না হয়? না হলে আমার একটা হার হয়ে গেল।

হার কেন মাসি?

মনে মনে যে আমি একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমার ওই হাঁদা ভাইটার একটা গতি করেই। ছাড়বো।

এমন কিছু বয়স তো আর হয়ে যায়নি।

চারুশীলা মাথা নেড়ে বলে, বয়সটা বড় কথা নয়। আসল কথা হল অ্যাটিচুড। ও মেয়েদের ভীষণ ভয় পায় এবং অপছন্দ করে। নরম্যালি বিয়ে দেওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু যদি প্রেমে-ট্রেমে। পড়ত তাহলে হয়ে যেত। রশ্মিকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, হয়তো হয়েই যাবে। রশ্মি কিন্তু ওর ওপর একটু উইকনেসও দেখাচ্ছে।

ভালই তো মাসি। এবার তুমি একটু ধৈর্য ধরো না!

কিন্তু হেমাঙ্গ যে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কিছুতেই রশ্মির সঙ্গে দেখা করাতে পারছি না।

ঝুমকি হি হি করে হেসে ফেলে বলে, তোমার যে কী সব অদ্ভুত প্রবলেম। কে কার প্রেমে পড়ছে না বলে তোমার চোখে ঘুম নেই! তুমি কিন্তু খুব অদ্ভুত।

চারুশীলা একটু লজ্জা পেয়ে বলে, ঠিকই বলেছ। আমার সব সামান্য সামান্য ব্যাপার নিয়ে অকারণে টেনশন হয়। কেন বলো তো! এটা কি কোনও নার্ভ ডিজিজ?

ডিজিজ নয়। আসলে তোমার হাতে অনেকটা ফাঁকা সময় থাকে। কিছু কাজ করতে হয় না। তাই আবোল-তাবোল ভাবনা আসে।

কী করব বলো তো!

বেরিয়ে পড়বে। খুব ঘুরে বেড়াবে। সিনেমা থিয়েটার দেখবে, গান শুনবে, এগজিবিশনে যাবে। ইচ্ছে করলে কোনও একটা ট্রেনিংও নিতে পারো।

সিনেমা থিয়েটার আমার বেশি ভাল লাগে না। তার চেয়ে জীবনে সিনেমা বা নাটকের মতো কিছু ঘটিয়ে তুলতেই আমার বেশি ভাল লাগে। ধরো একজনের সঙ্গে আর একজনের একটা প্রেম ঘটিয়ে দিলাম বা বন্ধুত্ব করে দিলাম বা বিয়ে— যা তোক একটা কিছু।

ও বাবা! তুমি তো সাংঘাতিক। ঝগড়া লাগিয়ে দাও না তো!

না রে মেয়ে। আমি বুঝি ততটাই খারাপ? আচ্ছা হ্যাঁ, তোমার প্রেমে সত্যিই কেউ পড়েনি?

ঝুমকি মুচকি হেসে বলে, তুমি ঘটাতে চাও নাকি একটা?

আগে বলো, কেউ পড়েছে কি না।

না, কেউ কখনও আমার প্রেমে পড়েনি।

চিঠি দেয়নি? পিছু নেয়নি? কথা বলার চেষ্টা করেনি?

না। একদম না।

বাজে কথা। সত্যি করে বলো তো!

সত্যিই বলছি।

হতেই পারে না।

কেন হতে পারে না মাসি? পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী আছে, সবাইকেই কি প্রেমে পড়তে হবে? ওটা ছাড়া বুঝি তাদের আর কাজ নেই?

যৌবনের একটা ধর্ম আছে তো!

যৌবনের ধর্ম অনেক বড়। প্রেমটা কোনও ফ্যাক্টরই নয়।

চারুশীলা ভ্রূ কুঁচকে ঝুমকির দিকে চেয়ে বলে, তাহলে যুগটা সত্যিই খুব পাল্টে যাচ্ছে।

যাচ্ছে নয়। গেছে। তা বলে প্রেম করা লোপাট হয়নি। আছে। তবে তোমাদের আমলের মতো নেই।

তুমি তাহলে বলছ যে আমি সেকেলে হয়ে গেছি?

ঝুমকি ফের মুচকি হাসল, চেহারায় বুড়ি হওনি, কিন্তু মনে মনে বড্ড প্রবীণা হয়েছ।

দাঁড়াও, তোমার ব্যবস্থাও হচ্ছে।

রক্ষে করো। আমার এখন সবচেয়ে বড় চিন্তা বাবার পাশে দাঁড়ানো

বাবাকে নিয়ে অত ভেব না। উনি ভাল হয়ে গেছেন।

গেছেন ঠিকই, তবে আমি চাই বাবাকে একটু নিশ্চিন্ত করতে। হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর থেকেই বাবার একটা দুশ্চিন্তা হয়েছে, যদি, দুম করে মরে যাই তাহলে আমার পরিবারটার কী হবে! আমি একটা চাকরি পেলে মনে হয় বাবা মনের দিক থেকে একটু রিলিফ পাবে।

চারুশীলা হঠাৎ সচকিত হয়ে বলে, আচ্ছা, তোমার চাকরির চেষ্টা হেমাঙ্গরই তো করার কথা ছিল? করেনি কিছু?

ঝুমকি চাপা হাসি হেসে বলে, পারলে করতেন নিশ্চয়ই, তুমি ব্যস্ত হয়ো না।

ছিঃ ছিঃ। ভীষণ পাজি তো! দাঁড়াও, এখনই টেলিফোন করছি।

না মাসি, না। ওসব করতে যেও না।

চারুশীলা বলল, কেন করব না? আমাদের একটা প্রেস্টিজ নেই? এত করে চিঠিপত্র দিয়ে, ষড়যন্ত্র করে তোমাকে পাঠালাম ওর কাছে, ও পাত্তা দেবে না কেন?

হয়তো পেরে উঠছেন না। চাকরি কি গায়ের জোরে হয়?

খুব হয়। ওর অনেক কানেকশন। দাঁড়াও তো।

এই বলে চারুশীলা উঠে গেল।

এই উজবুক, তুই এরকম কেন রে?

ওপাশ থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেমাঙ্গ বলে, কি রকম?

তুই এত গেঁতো, এত পাজি কেন?

দুনিয়ায় সবাই কি ভাল হয়?

ভাল না হোস, কথার দাম নেই কেন?

তোকে আবার কি কথা দিয়েছি?

আমাকে নয়। ঝুমকিকে।

ঝুমকিকে? তার আবার কী হল?

তুই ওকে বলিসনি ওর জন্য চাকরির চেষ্টা করবি?

চাকরি কি ছেলের হাতের মোয়া?

হ্যাঁ, মোয়া, তুই চেষ্টা করলেই হয়ে যেত। তুই চেষ্টাই করিসনি। আচ্ছা, একটা এত ভাল মেয়ে কম্পিউটার জানে, ভাল ছাত্রী, কী দারুণ সুন্দর স্বভাব, ওর একটা চাকরি হতে পারে না?

এগুলো কোনও কোয়ালিফিকেশন নয়। কম্পিউটার হাজার হাজার ছেলেমেয়ে জানে। চাকরির জন্য আরও কিছু শেখার দরকার ছিল।

তুই চেষ্টা করেছিস?

সেরকমভাবে করিনি। তবে করলেও লাভ হত না। ওই কোয়ালিফিকেশন নিয়ে ভদ্র মাইনের চাকরি পাবে না। হয়তো কোনও ফার্মে ঢুকিয়ে দিতে পারব, কিন্তু ওরা খাটিয়ে খাটিয়ে জান শেষ করে দেবে। যা খুশি মাইনে দেবে।

তাহলে তোর কিসের ক্ষমতা?

আমি খুব ক্ষমতাবান নাকি?

ওসব আমি শুনতে চাই না। এক মাসের মধ্যে ঝুমকির একটা চাকরি ঠিক করে দিতে হবে।

কেন, ওর হঠাৎ হল কি? এত জরুরি দরকার কেন?

দরকার আছে।

আচ্ছা, তাহলে কাল যেন অফিসে এসে দেখা করে।

কখন যাবে?

না থাক। অফিসে আসতে কষ্ট করতে হবে। তার চেয়ে বরং তোর বাড়িতে যেন আসে কাল সন্ধেবেলা। আমি তোর বাড়িতে যাবো।

উঃ, বাঁচালি! হবে তো!

তা বলতে পারি না।

এক কাজ কর না, এখনই চলে আয়। ঝুমকি এখানেই আছে।

এখনই!

কেন, তোর এমন কী কাজ? নিজেরই তো ফার্ম বাবা, চলে আয় না। বিকেলটা তাহলে তিনজনে মিলে কোথাও গিয়ে কাটিয়ে আসি। ডিনার সেরে ফেরা যাবে।

জ্বালালি!

আয় না লক্ষ্মী ভাই আমার! আসবি?

দেখছি।

দেখছি-টেখছি নয়। আধঘণ্টার মধ্যে চলে আয়। গাড়িতে বেশী করে তেল ভরে নিস।

আচ্ছা।

বাঁচালি। থ্যাঙ্ক ইউ।

ফোনটা রেখে উজ্জ্বল মুখে চারুশীলা বলল, আসছে।

কিন্তু খবরটায় যেন ভীষণ ঘাবড়ে গেল ঝুমকি। বলল, এত ঝামেলা করতে গেলে কেন মাসি? উনি আমাকে ন্যাগিং বলে ভাববেন। চাকরির জন্য বেশি উমেদারি করা কি ভাল?

যাঃ, ওর কাছে আবার অত ফর্মালিটি কিসের? হেমাঙ্গ এমনিতে বোকা হলেও, এ নাইস ম্যান।

আমার ভাল লাগছে না মাসি।

ভাল লাগবে। দাঁড়াও, তোমার মাকে একটা ফোন করে দিই। যেতে দেরি হবে।

না মাসি, ডিনারে তোমরা যাও। আমি যাবো না।

তাই কি হয়? তিনজন না জুটলে আনন্দই হবে না।

আমি খুব লজ্জা পাই মাসি।

অত লজ্জা কিসের? একটু স্মার্ট হও তো!

ব্যাপারটা ঝুমকির একদম ভাল লাগছিল না। কারও কাছে এভাবে চাকরির দরবার করতে তার বড় অপমান লাগছে। কিন্তু চারুমাসি একটু অবুঝ, খামখেয়ালী। মনে মনে ঝুমকি স্থির করল, হেমাঙ্গ চাকরি দিলেও সে নেবে না। বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করে দেবে।

হেমাঙ্গর এসে পৌঁছতে ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। এসেই বলল, আজ বেরোনো অসম্ভব। মিছিলে মিছিলে সব রাস্তা জ্যাম। গলিঘুঁজি দিয়ে অতি কষ্টে এসেছি।

চারুশীলা বলল, বেরোবি না! আমি যে সাজগোজ করলাম!

তুই তো সবসময়ই সেজে থাকিস। নিষ্কর্মাদের আর কীই বা কাজ।

মারব থাপ্পড়। বাড়ির অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নেই বুঝি?

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন! হাসালি। তোর সংসার তো চালায় চাকর ঠাকুররা। তাদের মোটা রোজগার আর উপরি হয়। কোথায় কোন জিনিসটা আছে তা জানিস?

চারুশীলা একটু থমকে হেসে ফেলল, বলল, জানি ঠিকই। তবে মনে থাকে না। আমি তো তোর মতো বস্তুবাদী নই।

আসল কথাটা হল প্র্যাকটিক্যাল নোস। তোর মতো বোকা সুন্দরী বড়লোক মেয়েরা হয়ও না। যাক গে, মেয়েটা কোথায়?

ওকে একটু সাজতে পাঠিয়েছি ভিতরের ঘরে। একদম সাজতে চায় না।

সাজের দরকারই বা কী? তুই সবাইকে নিজের মতো বানাতে চাস কেন?

কিন্তু সাজেরও যে রকমফের আছে, প্রয়োজন আছে, সেটা ঝুমকি ঘরে এসে দাঁড়াতেই হঠাৎ টের পেল হেমাঙ্গ। সাজেইনি বলতে গেলে, শুধু নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়েছে। তাতেই রোগ মেয়েটা যেন ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে।

৪৫

হেমাঙ্গর কোনও ওয়ারিশন থাকবে না। তার জিনিসপত্র বা টাকাপয়সা দশ ভূতে লুটেপুটে খাবে। তার মুখাগ্নি বা শ্রাদ্ধ হবে কি? ক'জন কাঁদবে তার জন্য? একজন ব্যাচেলর মারা গেলে কান্নাকাটি করার লোক পাওয়া কঠিন। তবে মরার পরের অবস্থাটা নিয়ে হেমাঙ্গ চিন্তিত নয়। বরং মরার আগেই কিছু সমস্যা ও জটিলতা দেখা দেবে। মাঝরাতে স্ট্রোক হলে ডাক্তার ডাকবে কে? বেডপ্যান এগিয়ে দেওয়ার দরকার হলে কি হবে? কিংবা মাথা ঘোয়ানো? কিংবা পাশে বসে একটু আহা-উহু করা? সুতরাং বুড়ো বয়সটাকে হেমাঙ্গ খুব ভয় পায়। ব্যাচেলরদের খুব বেশিদিন বেঁচে না থাকাই ভাল।

কিন্তু আজকাল বেঁচে থাকাটাকেই সে নানা প্রশ্নে কণ্টকিত করে তুলছে! এই বেঁচে থাকাটার মানেই বা কী? অধীত বিদ্যা ভাঙিয়ে উপার্জন। খাওয়া, ঘুম, কাজ। ব্যাঙ্কে টাকা জমছে নিয়মিত, প্রত্যেকটা দিনই যেন এক ছাঁচে ঢালা। ওঠা নেই, পড়া নেই, কিছু নেই। কপাল তার এমনই যে, জীবন-সংগ্রামটা অবধি করতে হয়নি। পয়সাওলা পরিবারে জন্ম হয়েছিল, নিজেও দিব্যি পাস-টাস করে গেল, পয়সা উপার্জন করতে লাগল। যারা বেঁচে থাকার লড়াই করে, প্রত্যেকটা পয়সার জন্য যাদের ঘাম ঝরাতে হয়, যারা ছপ্পড় খুঁড়ে পায় না তাদের কাছে বোধ হয় জীবন এমন আলুনি নয়। হেমাঙ্গর অনেকদিন ইচ্ছে হয়েছে একদিন সকালে ঠেলাওলা সেজে বেরিয়ে পড়ে, বা এক সপ্তাহের জন্য ট্যাক্সি চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে দেখে। ছেড়া জামাকাপড় পরে মাঝে মাঝে ভিক্ষে করতেও ইচ্ছে হয় তার।

আজ সকালে উঠে তার মনে হল, বার্ধক্যের একা এবং অসহায় দিনগুলির জন্য তার কিছু আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রাখা দরকার। তার বয়স যদিও ত্রিশের এদিক ওদিক, তবু প্রস্তুত হয়ে থাকা ভাল। অন্তত ভাবনাচিন্তা এখনই শুরু করা দরকার। জন্মাবধি এ পর্যন্ত তার জীবন অতীব মসৃণ এবং তৈল নিষিক্ত মেশিনের মতো ত্রুটিহীন। কিন্তু কিছু পরে সমস্যা সৃষ্টি হতে থাকবে।

পরমানন্দকে সে মাঝে মাঝে টাকা দেয়। পরমানন্দ চায় না, সে নিজে থেকেই দেয়। পরমানন্দ আসলে তথাগত। ইস্কুলে তার গলাগলি বন্ধু ছিল। তথাগত ছিল ফার্স্ট বয়। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছিল ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে। চাকরি করেছিল কিছুদিন। তারপর রামকৃষ্ণ মিশনে ব্রহ্মচারী হল, কিছু পরে সন্ন্যাসী। মিশন ছেড়ে সে এখন আলাদা আশ্রম করেছে কয়েকজন অনুগামী নিয়ে। আগাগোড়া তথাগতকে লক্ষ করে এসেছে হেমাঙ্গ। তথাগত ঈশ্বরের সমীপবর্তী হতে পারল কিনা, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে ফেলল কিনা এসব জানার কৌতূহল ছিল প্রবল। সেসব না হলেও পরমানন্দ একটা সন্তোষের ভাব নিয়ে থাকে। সোনারপুরের কাছেই সে

একটা অনাথ আশ্রম, একটা আশ্রমিক বিদ্যালয়, তাঁত সেন্টার আর মন্দির নিয়ে আছে। তাতে দেশের কতটা উপকার হচ্ছে তা জানে না হেমাঙ্গ। তবে জীবনের একটা অর্থ হয়তো পরমানন্দ পেয়েছে।

একদিন সে পরমানন্দকে জিজ্ঞেস করেছিল, যদি সন্ন্যাসীই হবি তা হলে এত লেখাপড়া শিখতে গেলি কেন? সময়টা নষ্ট হল।

পরমানন্দ স্মিত মুখে বলল, নষ্ট হয় না। কাজে লাগে। ঠাকুরেরই কাজে লাগে।

হেমাঙ্গর ঠাকুর নেই বলে কথাটা খুব গভীরে ঢোকে না তার।

আর একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, আগে তুই ক্রিকেটের খুব ভক্ত ছিলি। এখনও আছিস? ইন্ডিয়া-পাকিস্তান টেস্ট ম্যাচ হলে টিভিতে দেখিস?

পরমানন্দ অবাক হয়ে এবং পরে হেসে বলে, কেন দেখব না? খুব দেখি।

এর পরের প্রশ্নটা হঠাৎ মাথায় কি করে যে এল হেমাঙ্গর কে বলবে! সে জিজ্ঞেস করল, তুই তো সন্ন্যাসী, যখন খেলা দেখিস তখন সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য হয়ে দেখিস?

এ কথায় পরমানন্দ খুব হতবাক্ হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে ছিল হেমাঙ্গর দিকে। তারপর বলল, হেমাঙ্গ, তুই কিন্তু খুব অদ্ভুত!

কেন?

তুই আমাকে চমকে দিয়েছিস। বড় মারাত্মক প্রশ্ন। পক্ষপাতশূন্যতা।

ওটা তো জবাব হল না।

ওটাই জবাব। বোধ হয় ঈশ্বর স্বয়ং ছাড়া আর কেউ পক্ষপাতশূন্য হতে পারে না।

তা হলে সন্ন্যাসী হয়ে তোর কী লাভ হল?

লাভ হয়েছে কে বলল? লাভ লোকসান নয়। এটা একটা মোড অফ লাইফ। সন্ন্যাসও একটা রিসার্চ, এক ধরনের গবেষণা।

সেই সঙ্গে কি একটা স্যাটিসফ্যাকশনও? একটু ইগো? একটু সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সও?

পরমানন্দ খুব হাসল। বলল, তোকে নিয়ে পারা যায় না।

হেমাঙ্গ সামান্য উত্তেজিত হয়ে বলে, দেখ, সন্ন্যাসীদের বাইরে যতই বৈরাগ্য মাখা থাক, ভিতরে ভিতরে সে কিন্তু সংসারী মানুষদের চেয়ে নিজেকে উন্নত স্তরের মানুষ ভাবে। তুইও কি ভাবিস না? সত্যি করে বল তো, এই আমাকে দেখেই কি তোর মনে হয় না যে, ইস, হেমাঙ্গটা কোন অন্ধকারে লোভলালসার মধ্যে পড়ে আছে!

পরমানন্দ স্মিত মুখে বলে, অতটা হয় না। তবে ইগো একটা পাজি জিনিস। মৃতদেহের দাহ শেষ হওয়ার পরও একটা পিণ্ডাকার জিনিস থাকে। সেটা পুড়ে পুড়ে শেষ হতে চায় না। লোকে ওটাকে বলে অস্তি। অর্থাৎ যার লয়ক্ষয় নেই। ইগো ঠিক ওরকম। তবে সংসারী তার ইগোকে পুষে রাখে, তাকে যত্নআত্তি করে। যেন পোষা পাখি। আর সন্ন্যাসী তার ইগোকে তাড়ানোর একটা চেষ্টা অন্তত করে। সেটাই তার তপস্যা।

নইলে সংসারী আর সন্ন্যাসীতে তফাত নেই বলছিস?

তফাত সামান্যই। শুধু অ্যাটিচুড়ের তফাত। পারপাসের তফাত।

আমি পারপাসের তফাতটাই জানতে চাই। তুই কেন বেঁচে আছিস তা বুঝিস? বেঁচে থাকাটার পারপাস কী?

সেটাই তো বুঝবার চেষ্টা করছি। কেন জন্ম, কেন এই বেঁচে থাকা, কেন চৈতন্য, কেন অনুভূতি। শুধু পান, ভোজন, রমণ, অস্মিতা এর তো কোনও উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নেই।

আমাকে বুঝিয়ে দে। বুঝতে পারলে আমিও সব ছেড়েছুড়ে সন্ন্যাসী হব।

সন্ন্যাসী হবি! কোন্ দুঃখে। দুনিয়ায় সবাই সন্ন্যাসী হলে যে সৃষ্টি রসাতলে যাবে। চাষবাস, ব্যবসাবাণিজ্য, প্রোডাকশন সব লাটে উঠবে। সন্ন্যাসীরও তখন ট্যানা কমণ্ডলু বা ভিক্ষে জুটবে না।

তোর আশ্চর্য পাটোয়ারি বুদ্ধি। সংসারীরা কাজকর্ম করে দুনিয়ার ইকনমি আর প্রোডাকশন বহাল রাখুক, আর তোর মতো সন্ন্যাসীরা তাদের ঘাড় ভেঙে খেয়ে দিব্যি ঈশ্বর-সাধনা করে পরব্রহ্মে লীন হয়ে যাক। ভগবান যদি এতই বোকা লোক হয়ে থাকে তবে তার জন্য তপস্যা করার মানেই হয়। না।

সন্ন্যাসীরা কাজ করে না, কে বলল? ঠাকুর নিজেই তো সংসারী ছিলেন। সন্ন্যাসীরাও সংসারেরই কাজ করে, তবে বৃহৎ সংসার।

ওটা তত্ত্বকথা নয় তো রে?

পরমানন্দ মৃদু মৃদু হাসছিল। বলল, তত্ত্বকথা যখন ফলিত হয় তখনই ধর্ম। কিন্তু মুশকিল হল সব তত্ত্বকে ফলিয়ে তোলা কঠিন কাজ।

হেমাঙ্গ হতাশ হয়ে বলে, তোর ইস্কুল, অনাথ আশ্রম, তাঁত এসবও আমার কাছে ছেলেখেলা বলে মনে হয়। তুই তো রোজগার করে এর চেয়ে অনেক বেশি করতে পারতিস বৃহৎ সংসারের জন্য। তাই না? তুই কি এসকেপিস্ট?

তুই আজ আমার স্বরূপ না বের করে ক্ষান্ত হবি না নাকি?

স্বরূপ আবার কিছু আছে নাকি?

আছে বৈকি। ভণ্ড সন্ন্যাসীর স্বরূপ তো তার করুণ দুর্বল চেহারাটা।

তুই ভণ্ড বলে নিজেকে জানিস?

ভণ্ড ছাড়া আর কি? তবে অ্যাটিচুডটা মিথ্যে নয়। জীবনকে বুঝবার এটাও হয়তো একটা রাস্তা।

আমার পক্ষে সন্ন্যাসী হওয়ায় কোনও বাধা নেই। বিয়ে করব না, কোনও বাইন্ডিং নেই, বেঁচে থাকার অর্থও কিছু পাচ্ছি না। তোর আখড়ায় আমাকে থাকতে দিবি?

থাকবি? এ আর বেশি কথা কি? চলে আয়।

আমি ঝাঁটপাট দিতে পারব না, কষ্ট করতে পারব না, খারাপ রান্না খেতে পারব না আগেই বলে দিচ্ছি।

দুর পাগল! তোকে কি আমি চিনি না? আমরা কি খারাপ খাই?

আরও একটা শর্ত আছে। মোটা মোটা ধর্মের বইগুলো পড়তে ভীষণ খটোমটো। আমি ওবও পড়ব না।

তোকে কিছু করতে হবে না। চলে আয় তো! এ সপ্তাহেই আয়।

দুর বোকা! এত তাড়াতাড়ির কথা বলছি নাকি? আমি আসব বুড়ো বয়সে, যখন দেখাশোনার কেউ থাকবে না, কথা বলার কেউ থাকবে না, তখন আসব।

পরমানন্দ খুব হাসল, তাই বল। ওল্ড এজ হোম হিসেবে এসে থাকবি তো! কিন্তু বুড়ো বয়স অবধি ইচ্ছেটা থাকবে না হয়তো।

না থাকলে আসব না। তবু একটা ঠেক তো রইল। দায়ে দফায় আসা যাবে।

বাস্তবিকই তথাগত তথা পরমানন্দের আশ্রমের জন্য বেশ কিছু টাকা অযাচিতভাবেই দিয়ে রেখেছে হেমাঙ্গ। এমনকি একটা অ্যাটাচড্ বাথওলা পাকা ঘর তার টাকাতেই করা হয়েছে দোতলায়। হেমাঙ্গ বলে রেখেছে, ওই ঘরটাই আমাকে দিবি।

পরমানন্দ হেসে কুটিপাটি হয়ে বলেছে, এরকম শর্তাধীন দান কি আসলে দান? তুই টাকাই বা দিচ্ছিস কেন? এমনি আয়, তোর জন্য জায়গা থাকবে।

এটা প্রায় এক বছর আগেকার কথা। তখন কিছুদিন হেমাঙ্গর খুব মানসিক নিঃসঙ্গতা চলছিল। তারপর আবার কাজকর্ম ইত্যাদি নিয়ে জড়িয়ে পড়ায় পরমানন্দর কাছে যাওয়া হয়নি। পরমানন্দকে তার কোনওদিনই পুরোপুরি সন্ন্যাসী বৈরাগী বলে মনে হয় না। হতে পারে, সেও এক বিবাহভীত, সংসারভীত, ঝামেলাভীত, কম্পিটিশনভীত, পলায়নকামী মানুষ। সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশের ভিতরে, পরমানন্দের ভিতরে পালিয়ে আত্মগোপন করে আছে ভীরু তথাগত। রামকৃষ্ণ মিশন ছেড়ে কেন যে আলাদা আশ্রম খুলল তারও কোনও সদুত্তর কখনও দেয়নি পরমানন্দ। হতে পারে, মিশনকে নয়, সন্ন্যাসের ভাবটুকুই তার প্রয়োজন ছিল।

আজ সকালে আবার ডিপ্রেশনটা টের পাচ্ছে হেমাঙ্গ। ছুটির দিন। শরতের এক চমৎকার সকাল। অথচ এক বুক অন্ধকার নিয়ে সে বসে আছে ডিনার টেবিলে। সামনে ইলেকট্রিক কেটলিতে তৈরি করা পাইপিং হট চা।

আজ কোথাও নেমন্তন্ন নেই। আজ বাড়িতেই খাবে বলে ফটিককে বাজারে পাঠিয়েছিল। ফটিক বাজার করে ফিরে এল একটু আগে। আস্ত মুর্গি এনেছে। যেদিন হেমাঙ্গ বাড়িতে খায় সেদিন ফটিকের একটু আহ্লাদ হয়। কারণ সেও একটু ভালমন্দ খেতে পায় সেদিনটা। আজ ফটিকের আনন্দের দিন। কিন্তু হেমাঙ্গর নয়। এত অর্থহীন বেঁচে থাকার কোনও মানেই সে খুঁজে পাচ্ছে না।

আজ একবার পরমানন্দের কাছে গেলে কেমন হয়? তার সন্ন্যাসে ফাঁক থাকতে পারে, কিন্তু পরমানন্দ সব সময়ে একটা খুশির আবহাওয়ার মধ্যে থাকে। তাকে ঘিরে সব সময়েই কিছু লোক। বাচ্চা সন্ন্যাসী, অর্থ, প্রার্থী, নানা ধরনের মানুষ। সব সময়ে জীবনের একটা ধারার মধ্যে, নানা কাজের মধ্যে ডুবে থাকে পরমানন্দ। ব্যক্তিগত উন্নতি, সঞ্চয়, সম্মান নিয়ে কোনও বালাই নেই। টেনশন নেই। পরমানন্দের কাছে বসে থাকতেও ভাল লাগে হেমাঙ্গর।

ফটিক মুর্গি কাটতে নিচে গেছে। নিঃশব্দে পোশাক পরে নেয় হেমাঙ্গ। দরজায় তালা দিয়ে নিচে নেমে ফটিকের সামনে চাবিটা ফেলে দিয়ে বলে, আমার দেরি দেখলে খেয়ে নিও ফটিকদা, একটু বেরোচ্ছি।

ই বাবা! রাঁধতে বললে যে!

ফ্রিজে রেখে দিও।

এবেলা তবে খাবে না?

ঠিক নেই। একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে গেল।

বেরোবার মুখেই বাধা পেল হেমাঙ্গ। বেশ বড় বাধা। ফটক থেকে সিঁড়ি বেয়ে একতলা বারান্দায় উঠে আসছিল রশ্মি।

বেরোচ্ছিলেন। ইস! আর একটু হলেই আপনাকে মিস করতাম।

হেমাঙ্গ কেন যে থতমত খেয়ে গেল কে জানে! বলল, আসুন! আপনি তো কখনও আসেননি। এ বাড়িতে!

রশ্মি মৃদু হেসে বলে, আসতে বলেছেন কখনও? ব্যাচেলর্স ডেন বলে কথা, তাই না? মেয়েদের বোধ হয় আসতে নেই?

লজ্জা পেয়ে হেমাঙ্গ বলে, না, তা নয়। আসলে আপ্যায়ন করার মতো ব্যবস্থা নেই কিনা। ওপরে আসুন।

ও মা! আসব কি? আপনি যে বেরোচ্ছেন!

তেমন জরুরি কাজ কিছু নয়। এক বন্ধুর কাছে যাচ্ছিলাম।

তা হলে যান না! আমি এমনিই এসেছিলাম। আমার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিস করার দরকার নেই।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট কিছু নেই। আমার বন্ধুটি এক সন্ন্যাসী। যে কোনও সময়েই তার কাছে যাওয়া যায়।

সন্ন্যাসী! হঠাৎ সাধুসঙ্গ করছেন যে বড়!

সাধু বলে নয়। বাল্যবন্ধু। এক সঙ্গে পড়েছি।

তা হলে তিনিও তো ইয়ং ম্যান। এত অল্প বয়সে সন্ন্যাসী কেন?

তা কে বলবে? আমার তো মনে হয় এসকেপিস্ট।

বেশির ভাগ মানুষই তো তাই। কত দূরে থাকেন তিনি?

বেশি দূর নয়। সোনারপুর। যাবেন?

রশ্মি অবাক হয়ে বলে, আমি! সন্ন্যাসীরা তো নারীমুখ দেখেন না।

আমার বন্ধুর অত শুচিবায়ু নেই। ওর ইস্কুলে, তাঁতকলে কত মেয়ে পড়ে, শেখে।

ঢুকতে দেবেন তো, কিন্তু পাত্তা দেবেন না হয়তো।

চলুন না। আপনাকে পাত্তা না দিলে আমিও বসব না।

রিস্ক কিন্তু আপনার। চলুন। গাড়ি বের করতে হবে না, আমি গাড়ি এনেছি।

অস্টিন অফ ইংল্যান্ড গাড়ি আজকাল কলকাতায় দেখাই যায় না। কলকাতা ভরে আছে একঘেয়ে অ্যাম্বাসাডার, মারুতি আর প্রিমিয়ার গাড়িতে। গাড়ির ভিতরটা কিছু অন্ধকার এবং বিষন্ন। আজকালকার খোলামেলা ঝলমলে গাড়ি নয়। যেন একটা গর্তের মতো অভ্যন্তর। তার ওপর কালো বা কালচে ধরনের চামড়ায় মোড়া সীট।

এ গাড়ি কোথায় পেলেন?

রশ্মি মৃদু হেসে বলে, অনেক পুরনো। বড় একটা বের করা হয় না। বাবা ইংল্যান্ড থেকে এনেছিল। মেইনটেনেন্সের খরচ অনেক। একজন পুরনো মিস্ত্রি আছে, সে-ই সারিয়ে-টারিয়ে দেয়। তবে না চালালে ব্যাটারি ডাউন হয়ে যায়, যন্ত্রপাতিতে মরচে ধরে। আজ বেরোবার সময় বাবা বলল, গাড়িটা একটু চালিয়ে নিয়ে এসো। তাই আজ এটা বের করেছি। ভয় নেই, মাঝপথে ট্রাবল দেবে না। এটার নাম আমরা রেখেছি ‘দি ওল্ড রিলায়েবল’।

বেশ গাড়ি।

আধুনিক নয়, এই যা। আপনার কি আজ মুড একটু অফ?

কেন বলুন তো!

গম্ভীর মনে হচ্ছে।

মুড অফ বলাটা ঠিক হবে না। আসলে...

আসলে?

আমার মাঝে মাঝে কেমন যেন সব কিছু মিনিংলেস লাগে। ঠিক বোঝাতে পারব না কেমন।

মিনিংলেস না লাগাটাই তো আশ্চর্যের।

তার মানে?

মিনিংলেসের কি মানে থাকে?

বলে রশ্মি একটু হাসল। মেয়েটা হাসলে রূপ যেন ফুলঝুরির মতো উপচে পড়ে। মাথার ওপর ছোট কনভেক্স আয়নায় মুখখানা দেখছিল হেমাঙ্গ। চারুদি খবর নিয়েছে। এর সঙ্গে তার বর্ণে মিল, বয়সে মিল। যোটক বিচারটা এখনও হয়ে ওঠেনি। হাওয়া বুঝে ওটাও করা হবে। সম্ভবত মিলেও যাবে। কথাটা হেমাঙ্গর মা ও বাবার কাছে পৌঁছে দিয়েছে চারুদি। বাড়ি থেকে সবুজ সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, রশ্মির বাড়ি থেকেও আগ্রহ দেখা গেছে। আর রশ্মি? হেমাঙ্গ বুঝতে পারছে না বটে, কিন্তু অন্যেরা বলছে, রশ্মিও নাকি রাজি। খুব রাজি। কিন্তু ওর কোনও ব্রীড়া নেই কেন? ভাবী বর বলে যদি ধরে নিয়েও থাকে, তবে দেখা হলে কই লজ্জায় রাঙা হয় না তোর কিংবা চোখে একটা ঝলমলে ভাব ফুটে ওঠে না তো! সে কি বিলেতবাস এবং অনেক পুরুষসঙ্গ করার ফল? হবেও বা!

রশ্মিকে তার কেমন লাগে? অনেক ভেবেছে হেমাঙ্গ। রশ্মি এক অদ্ভুত ভাল মেয়ে। কাছে এলেই তার ভাল লাগে। কিন্তু এই মেয়েটির সঙ্গে তার নিরাবরণ ঘনিষ্ঠতা হবে, এই মেয়েটি তার সঙ্গে দিনরাত বসবাস করবে —ঠিক এরকমটা কেন সে ভাবতে পারে না!

আপনার ডিপ্রেশনের কথাটা এবার একটু বলবেন?

হেমাঙ্গ কুণ্ঠিত হয়ে বলে, বলার মতো কিছু নয়। হয়তো ছেলেমানুষী।

হয়তো তা নয়। কে জানে! বলুন তো একটু শুনি।

আপনি কি সাইকিয়াট্রিস্ট?

নয় কেন? আমি সাইকোলজি নিয়ে পড়াশুনো করেছি। কাজও করেছি। আমার প্রিয় সাবজেক্ট।

ও বাবা, তা হলে তো আপনাকে বলা ঠিক হবে না। হয়তো আমার ভিতর সূক্ষ্ম পাগলামি ধরে ফেলবেন।

সূক্ষ্ম কেন, আপনার চারুদিদি তো বলে, আপনি খুব পাগল।

হয়তো তাই। বলে ম্লান মুখে বসে থাকে হেমাঙ্গ।

মুখে একটু চুক চুক করে আফসোসের শব্দ করে রশ্মি। তারপর বলে, আহা রে, কেমন দুঃখী মুখ করে বসে আছে দেখ! পাগল তো আমরা সবাই। কিছু কম, কিছু বেশি। আমি ডিপ্রেশনের কথাটা জানতে চাইছি। ওটা পাগলামি নয়।

বললাম তো, একটা অর্থহীনতা। মনে হয়, জীবনের আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল। সেটা জানাই। হল না, কি ছাই শরীরসর্বস্ব হয়ে বেঁচে থাকা।

রশ্মি একটু চুপ করে থেকে বলল, শরীর ছাড়া তো বাঁচাও যায় না। শরীর কি উপেক্ষার বস্তু?

তা নয়। কিন্তু শরীর ছাড়াও, এই অস্তিত্ব ছাড়াও যেন আরও কিছু ছিল। জানা হল না।

ঈশ্বর কি?

হতে পারে। আমার ঠাকুর-দেবতার বায়ু কিন্তু নেই।

আমার আবার একটু আছে। সে যাক গে। আপনার যখন মন খারাপ হয় তখন কী করেন?

কিছু না। চুপচাপ একা বসে থাকি।

শুনেছি, মন খারাপ হলেই আপনি অকাজের জিনিস কেনেন!

কে বলল?

যেই বলুক, কথাটা কি মিথ্যে?

লজ্জিত হেমাঙ্গ বলে, আমার একটা বদ-অভ্যাস।

চারুদি আপনাকে খুব ভালবাসেন। আপনার সব কিছু ওঁর নখদর্পণে।

ও একটা স্পাই।

ভালবাসার জনের ওপর একটু গোয়েন্দাগিরি করতে হয় মাঝে মাঝে।

কেনাকাটা করা ছাড়া আর আমার কোনও বদ-অভ্যাস নেই। চারুদির অবশ্য নানা সন্দেহ। আছে।

ব্যাচেলরদের সকলেই একটু সন্দেহ করে। ওটাকে গুরুত্ব না দিলেই হয়। কিন্তু আপনি এত জিনিসপত্র কেনেন কেন? শুনেছি সেসব জিনিস আপনার কোনও কাজে লাগে না!

জিনিসপত্র কিনি সে কথা ঠিক। কিন্তু আমি খুব মেটেরিয়ালিস্ট নই।

সেটাও মনে হয়। ডিপ্রেশনটা আপনার কখন হয়?

তার কোনও ঠিক নেই। আজ ভোরবেলা হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে মনে হল, সব যেন শূন্যতায়। ভরা।

আপনি নাকি কনফার্মড ব্যাচেলর?

হ্যাঁ। বিয়ে করাটাও এক অর্থহীন রিচুয়াল।

মেয়েদের ভয় পান?

বোধ হয় আমিও এসকেপিস্ট।

আপনি আমাকেও ভয় পান না তো!

আপনাকে? না, আপনাকে নয়।

ঠিক বলছেন? প্রথম দিন কিন্তু খুব লজ্জা পাচ্ছিলেন আমার সামনে। খেতে অবধি পারেননি। লজ্জা আর ভয় কি একই জিনিস?

ঠিক এক নয়। তবে লজ্জা আর ভয়ের মধ্যে একটা মিলও আছে।

কি রকম?

লজ্জাও এক রকমের ভয়। লজ্জার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকে, ইনফিরিয়রিটি থাকে।

আর কিছু নয়?

থাকতে পারে। লজ্জা জিনিসটা ইউনিভার্সাল নয়। যেমন নয় অভিমান।

হেমাঙ্গ খানিকটা ভাবল। তারপর বলল, বোধ হয় ঠিকই বলেছেন। পশ্চিম দেশে ও দুটি অনুভূতির খুব অভাব। কিন্তু আজ আপনি বড্ড মাস্টারি করছেন। আমাকে নিয়ে ভাববেন না। আমার ডিপ্রেশন কয়েক দিনেই কেটে যায়।

কিন্তু আসে কেন? হাজার মানুষের হাজারো ডিপ্রেশন, তার আবার হাজার কারণ। আপনারটা কেন আসে? আপনার তো মানিটারি প্রবলেম নেই, ফ্যামিলি প্রবলেম নেই, জব স্ট্রেস নেই। তা হলে?

ওসব থাকলে বোধ হয় ডিপ্রেশনটা হত না। আমার মনে হয় জীবনে বাঁচার লড়াই করাটাও দরকার। তা হলে এইসব ফ্যান্সি জিনিসগুলো কেটে যায়।

তার কোনও মানে নেই। তবে আপনি সাইকোলজিক্যাল কেস নন।

তা হলে মনোরুগী নই?

রশ্মি হাসল। যাদবপুরের সরু রাস্তায় ঢুকে সে গাড়ির স্পীড কমিয়ে সাবধানে চালাতে চালাতে বলল, আর বেশি কথা বলবেন না কিন্তু। আমি খুব নার্ভস ড্রাইভার। কলকাতার রাস্তায় গাড়ি চালানো এক নাইটমেয়ার।

কষ্ট করে চালাচ্ছেন কেন? স্টিয়ারিং আমাকে দিন।

আপনার যে ডিপ্রেশন! বলে হাসে রশ্মি।

গাড়ি চালাতে ওটা বাধা নয়। গাড়ি চালিয়ে নেয় গাড়ি চালানোর অভ্যাস।

বেঁচে থাকাটাও কি ওরকমই এক অভ্যাস নয়?

রশ্মি গাড়ি দাঁড় করাল। সীট বদল করল। হেমাঙ্গ নিপুণ হাতে গাড়িটা চালু করে বলল, বেশ গাড়ি। চালিয়ে আরাম।

রশ্মি তার উড়োখুড়ো চুল দু'হাতে পাট করতে করতে বলল, জীবনটাও ঠিক ওরকম। চালাতে পারলে আরাম। শুধু স্টিয়ারিংটা আর কারও হাতে দিতে হয়।

রশ্মি খুব হাসছে। হেমাঙ্গ ততটা হাসতে পারছে না। সে হাসছে কৃত্রিম হাসি, সঙ্গ দিতে।

পরমানন্দের ঠেক-এ পৌঁছানোর পর সে হাঁফ ছাড়ল।

প্রায় বিঘা চারেক জমি আর একটা ছোটো পুকুর নিয়ে পরমানন্দ তার শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ গড়ে তুলেছে। একা হাতে। বিস্তর গাছপালা, ফুল আর সবুজ ঘাসে তৈরি করেছে এক মায়ার রাজ্য। তারই ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটা কুটির, একটা দোতলা বাড়ি আর একটা টিনের শেড-এ ল্যাবরেটরি।

পরমানন্দ রবিবার মঠে যায়। বেলুড়ে। সেটা খেয়াল রাখেনি হেমাঙ্গ। তবে পরমানন্দের অনুগত তরুণ আর এক সন্ন্যাসী প্রেমানন্দ এসে আদর করে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। পাখা খুলে দিল। বলল, চা না কফি?

আশ্রমে চা কফি অফার করা হয় বুঝি? ঠাকুরকেও চা বা কফি ভোগ দেন তো?

রশ্মির এই প্রশ্নে প্রেমানন্দ একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, না, তা দিই না। তবে খাওয়ার আগে নিবেদন করে নিই।

রশ্মি খুব হাসি-মুখে বলে, তবু ভাল যে চা কফির চেয়ে কড়া নেশা নেই। থাকলে ঠাকুরের বিপদ ছিল, তাই না?

প্রেমানন্দ একটু লজ্জা পেল। বলল, তা হলে খাবেন না?

খাবো না কেন?

প্রেমানন্দ তড়িঘড়ি চলে গেল সামনে থেকে। পালাতে পারলে বাঁচে।

হেমাঙ্গ রশ্মির দিকে চেয়ে বলল, পারেনও বটে আপনি। এসব ধর্মকর্ম বোধ হয় আপনার ভাল লাগে না?

লাগবে না কেন? আমি একটু ধর্মও করি। আমার খারাপ লাগছে না তো!

তা হলে ওভাবে বললেন যে!

একটু মজা করলাম। কিন্তু আপনি এখানে কেন আসেন বলুন তো! ধর্ম করতে?

না। তবে হয়তো একদিন এখানেই এসে পার্মানেন্টলি থাকব।

ওমা! কেন?

কোথায় আর যাবো?

এ জায়গাটা কি খুব ভাল?

খারাপ তো নয়!

রশ্মি খুব হাসতে লাগল। হাসলে মেয়েটাকে এত ভাল দেখায়। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে হেমাঙ্গর দিকে চেয়ে বলল, আপনার খুব মৃত্যুভয়? না?

৪৬

মাঝরাতে যখন সন্তর্পণে দরজাটি খুলল নিমাই তখন তার চোখভরা জল। এত জল যে, চোখে কিছু ঠাহর করার উপায় নেই। তার ওপর কুয়াশা বড় জমাট। তেমনি জমাট অন্ধকার। সব যেন গলাগলি করে এসে দাঁড়িয়েছে আজ এক সঙ্গে। ঘরে একটা লণ্ঠন জ্বলছে টিমিয়ে। বিছানায় বীণাপাণি কেমন একটু এলোমেলো হয়ে শুয়ে। নিমাই আজ ওই বিছানায় শোয়নি। জলচৌকিতে বসে রইল। কত মশা কামড়েছে তাকে সে টেরও পায়নি আজ। মনের জ্বালা প্রবল হলে শরীরের জ্বলা ডুবে যায়। এই যে বীণাপাণি তাকে বিদেয় দিল, আর কি কখনও ফিরে আসতে পারবে নিমাই? আর হয়তো দেখাই হবে না, কটা বিলিতি টাকার জন্য এতকালের একটা সম্পর্ক ভেঙে দিতে বীণার বাধল না! দুনিয়াটা এই রকম করেই একটু একটু চিনতে হবে তাকে।

এক ধাপ মোটে সিঁড়ি, তার পরই উঠোন। অন্ধের মতোই আন্দাজে সিঁড়িতে পা রাখল নিমাই। দু’ চোখে আজ যেন বান ডেকেছে। বুকটা বড় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে। বড্ড অভিমান হচ্ছে তার। বড় অপমানও লাগছে। বড় দুঃখ হচ্ছে। দরজাটা খুব চুপিসাড়ে, বিনা শব্দে ভেজিয়ে দিল নিমাই। ঘুমোও গো, মনের সুখে ঘুমোও। এইরকমধারা একদিন বিষ্ণুপ্রিয়াকে রেখে নিমাই সন্ন্যাস নিয়েছিল। সে কত সুখের ছেড়ে-যাওয়া। আর এ নিমাই যে যাচ্ছে তার বড় অনাদর। বড়। গঞ্জনা।

উঠোনে পা ফেলতেই পায়ের তলা থেকে কী যেন একটা হড়কে সরে গেল সড়াৎ করে। সাপখোপ নেই এখানে? থাকলে দিক না ঠুকে। ল্যাটা চুকে যাক। মরা মুখটা দেখুক বীণাপাণি। বুকে পড়ে কাঁদুক।

কিন্তু মানুষের মনের মতো করে কবে কি ঘটেছে? সাপও যদি হয়ে থাকে সে ব্যাটাচ্ছেলেও। কামড়াল না নিমাইকে। পালাল। চোখের জলটা গামছা দিয়ে চেপে মুছল নিমাই। সামনেটা বড় আঁধার। কুয়াশা এত চেপে বসেছে যে, হাতখানেকের বেশী নজর যায় না। কোন দিকে যে আগড়, রাস্তা যে কোন দিকে তা বুঝে ওঠা মুশকিল। রাত আর একটু কাবার করে বেরোলে হত।

একটা কুকুর হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল কোথা থেকে। বাড়ির কুকুরই হবে। কামড়ায় যদি তো কামড়াক। নিমাইয়ের আর ভয় কিসে?

কুয়াশা বটে তবে ঠাণ্ডা তেমন নেই। একটু সিরসিরে ভাব আছে। টপ টপ করে বেশ বড় বড় ফোঁটায় শিশির পড়ছে গাছপালায়। শিউলির গন্ধ ছেড়েছে খুব।

তাদের একখানা মাত্র টর্চ আছে। সেটা সঙ্গে নিলে নিমাইয়ের একটু সুবিধে হত। কিন্তু বীণাপাণির টর্চ বীণাপাণির জন্যই রেখে এসেছে সে। বনগাঁর বাড়িতে তার স্যুটকেসখানা আছে। টিনের সস্তা জিনিস।

কয়েকখানা মোটে জামাকাপড়। সেটারও আর কোনও দরকার নেই তার। মায়া বাড়িয়ে লাভ কি?

দোকান-টোকানের কথা ভেবে আর লাভ নেই। নিমাই জানে, এখন কিছুদিন তাকে গতর খাটিয়ে খেতে হবে। যোগালির কাজ হোক, মাটি কাটার কাজ হোক, ছুতোরের কাজ হোক, বেড়া বাঁধার কাজ হোক, কিছু না-কিছু জুটেই যায়। পরিশ্রমের কাজটা এখনও খুব একটা পেরে ওঠে না নিমাই। তবে গতর পুষে রাখলে তো আর চলবে না! পেটটা তার একার নয়, পালপাড়ায় দুটো অসহায় বুড়োবুড়ি আছে। বীণাপাণির কাছে নিমাই যদি ত্যাগ হয়ে থাকে তবে তারাও তো ত্যাগ হল!

মাঝ-উঠোনে দাঁড়িয়ে নিমাই দিক ঠাহর করার চেষ্টা করছে। আগু-পিছু, বাঁ-ডান সব সমান। কোন দিকে গেলে পথে পড়া যাবে বুঝতে পারছে না।

একটা ক্ষীণ ম্যাদাটে আলো হঠাৎ এসে নিমাইকে চমকে দিয়ে তার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। ব্যাটারি ক্ষীণ, তবু একটু আলো তো! কুয়াশা ফুঁড়ে আসতে খুব কষ্ট হয়েছে আলোটার। নির্জীব হয়ে পড়েছে এইটুকু ধকলেই।

খুব চাপা একটা গলা শোনা গেল, কে?

শ্বশুরমশাই। নিমাই একবার ভাবল, জবাব না দিয়ে চলে যাবে। আবার গুরুজন বলে। অবহেলাও করতে পারল না।

ক্ষীণ গলায় বলল, আমি নিমাই।

অ। পেচ্ছাপ করবে নাকি? ওই বাঁ দিকে কচুবনের দিকে গিয়ে সেরে এসো।

আজ্ঞে, ঘুম আসছিল না বলে এই একটু বেরিয়েছি।

বাতি নিয়ে বেরোতে হয়। ঘরে লণ্ঠন রাখেনি?

আজ্ঞে আছে।

ঘুম আসছে না কেন?

বায়ুটা চড়েছে বোধ হয়।

এ সময়টায় হিম পড়ে। এসসা, বারান্দায় উঠে এসো।

নিমাই ইতস্তত করল একটু। বসাটা ঠিক হবে কি? বেরোনোর মুখে এ একটা বাধাই পড়ল কি? কিন্তু বুড়ো মানুষটাকে এড়িয়ে যায়ই বা কি করে নিমাই? বরং একটু বসেই যাবে সে। রাতটা একটু পাতলা হোক।

নিমাই নিঃশব্দে বারান্দায় উঠলে বিষ্ণুপদ টর্চটা জ্বেলে একটা মোড়া দেখিয়ে দিয়ে বলল, বোস বাবা।

আপনি ঘুমোননি?

বুড়ো বয়সের ঘুমের কোনও ঠিক নেই। একদিন পেল্লায় ঘুম হল, তো আর একদিন একেবারেই হল না।

চারদিকে অন্ধকারে সাদা কুয়াশা। যেন দুধসাগরে ডুব দিয়ে আছে সব কিছু। নিমাই চুপ করে বসে রইল।

বিষ্ণুপদ মৃদু গলায় বলল, আজ আবার সেই স্বপ্নটা দেখলাম। সেই যে ঘুমটা চটকে গেল আর এল না।

দুঃস্বপ্ন নাকি?

খারাপই। তবে এই বয়সে আর কতই বা খারাপ হবে! কিন্তু বড় ভয় খাইয়ে দেয়। কালঘড়ি আমার ঠাকুদাও দেখেছিল কিনা!

কালঘড়ি? সে আবার কী জিনিস?

বিষ্ণুপদ ব্যথাতুর গলায় বলে, ঘড়ির বৃত্তান্তটাও অদ্ভুত। জন্মে ঘড়ি নিয়ে কারবার করিনি বাবা। গাঁ-গঞ্জের লোক আমরা, ঘড়ি লাগে কিসে? তবু যে কেন দেখি! সে তো ছোটখাটো জিনিস নয়। আকাশজোড়া মস্ত একটা ঘড়ি। যেন কূলকিনারা নেই তার। একটা বড় কাঁটা, আর একটা ছোট কাঁটা, তা তাও যেন আকাশে এ-মুড়ো ও-মুড়ো জুড়ে। কাঁটা দুটো এগুচ্ছে। বুঝলে! এগুচ্ছে।

নিমাই কিছু বুঝল না। তবে কিছু বলতে হয় বলে বলল, তা স্বপ্ন কত রকমেরই তো হয়।

তা হয়। তবে আমার ঠাকুর্দা এই স্বপ্নটা দেখার পর আর বাঁচেননি। এ বংশে ওটা একটা ব্যাপার বলতে পার। কালঘড়ি মানেই, হয়ে এল।

নিমাই এবার একটু ভাবিত হয়ে বলে, তবে তো মুশকিল।

মরতে তো তৈরিই আছি। তবে মরার আগেও কিছু ভাবনা-চিন্তা থাকে।

মরার কথা ভাবছেন কেন?

মরার কথা ভাবি না। ওটা ভাবনার বিষয়ই নয়। কথা কী জান? মরার সময় এলে মানুষের মনের মধ্যে একটা তাড়াহুড়ো পড়ে যায়। যেমন গাড়ি ধরার সময় মানুষের হয়, কোন্ পোঁটলাটা পড়ে রইল, কোনটা নেওয়া হল না, ছেলেপুলেগুলো সব উঠতে পারল কিনা, কুলির ভাড়া বেশী দেওয়া হল কিনা। বুঝেছে ব্যাপারটা? মরার সময়ও মানুষের ওরকমই হয়। কোনটা করা হল, কোনটা বাকি রইল। বুঝলে ব্যাপারখানা? এই মাঝরাত্তিরে বসে সেই সবই ভাবছি।

যে আজ্ঞে, বুঝেছি।

ঘুম আসছে না বলে ভাবনা নেই। সামনে লম্বা ঘুম। সে ঘুম এলে সব কুপিত বায়ু একেবারে ঠাণ্ডা। তাই জেগে বসে মশা তাড়াচ্ছি।

কথাটা ঠিকই বলেছেন। ভাবনারও যেন শেষ নেই। একটা যায় তো আর একটা আসে।

তুমি বুঝদার মানুষ। এই ভাবনা-চিন্তার কথাটা লোককে বোঝাতে পারি না। কত কি ভাববার আছে বলো তো দুনিয়ায়?

তা বটে।

ক'দিন আগেও এক রাত্তিরে কালঘড়ির স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই থেকে মাথাটা খুব বেগোছ হয়ে গেল। তোমার শাশুড়ি তো কাঁদাকাটাও শুরু করেছিলেন। কালঘড়ির লক্ষণটা সুবিধের নয় ঠিকই। তবে কী জাননা, ওই মরার ভাবনাটা আছে বলেই মানুষ ভাবনা-চিন্তাটা অন্তত করে।

কিন্তু আপনার আর চিন্তাটা কিসের বলুন! রামুদাদা বুক দিয়ে আগলে রেখেছে, অমন। পিতৃ-মাতৃভক্ত ছেলে দেখা যায় না। বড়দাদাও—বলতে নেই—মস্ত কেওকেটা মানুষ। ভাতকাপড়ের কষ্টটাও তেমন নয়। পালপাড়ায় আমার মা বাবার অবস্থাটা যদি এমন হত তা হলেও ভাবনার কিছু ছিল না।

বিষ্ণুপদ গলাটা আরও খাদে নামিয়ে বলল, তারা আছেন এখনও?

আছেন আজ্ঞে।

দু'জনেই?

দু'জনেই।

তুমি তো ভাগ্যবান বাবা। যত পারো বাঁচিয়ে রেখো। ওঁরা মহাগুরু।

দুধ-মাখানো অন্ধকারের দিকে চেয়ে নিমাই মিহিন গলায় বলল, ভাগ্য কি আর ওঁরা করে এসেছেন? বুড়ো বয়সটায় বড় কষ্ট যাচ্ছে। আমার অসুখের সময় ক'বিঘে জমি বিক্রি হয়ে গেল। এখন হাঁড়ির হাল। আমার যা হোক, ওঁরা কষ্ট পেলে বড় কষ্ট হয় আমার।

তোমরা কি কষ্টে আছ বাবা? কই, বীণার চেহারা দেখে তো মনে হয় না।

নিমাই একটু ফাঁপরে পড়ে যায়। আমতা আমতা করে বলে, কষ্টও বটে, আবার তেমন কষ্ট নয়ও বটে।

মানেটা কি হল?

আমাদের মতো মানুষের তো পায়ের নিচে ডাঙা জমি থাকে না। এর-ওর দয়ায় বেঁচে থাকা।

এ কথাটার মানে বুঝছি না। খোলসা হও বাবা। কাকা না কে যেন একটা লোকের কথা শুনেছি। সে কেমন লোক?

সেই আমাদের ভগবান। অসময়ে বড় দেখেছে আমাদের। আজও দেখে। কিন্তু কপালটাই আমাদের নিমকহারাম।

কেন বাবা, কপালের দোষটা কী হল?

নিমাই ফের ফাঁপরে পড়ল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, সে অনেক কথা। আপনাকে বলতে পারব না।

বিষ্ণুপদ একটা শ্বাস ছেড়ে কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে, আমি এখন গাছপালার মতো হয়ে গেছি। ইট-পাথরের মতো। যখন কওয়ার লোক পাবে না আমার কাছে বোলো। বুদ্ধি পাবে না বটে, কিন্তু বুক হালকা হবে।

যে আজ্ঞে। কথাটা মনে থাকবে।

তোমাকে আমি বীণার জন্য বেছেছিলাম কেন জানো?

নিমাই লজ্জা পেয়ে বলে, জানি।

বিষ্ণুপদ নিবিড় গলায় বলে, তোমার মুখে চোখে একটা কিছু ছিল। কত ভুল দেখি আমরা, ভুল বুঝি। তবু মনে হয়েছিল, নিমাইয়ের মধ্যে ভক্তি আছে। গরিব হোক কি যাই হোক, ভক্তি তো কম কথা নয়।

আমাকে আর লজ্জায় ফেলবেন না। ওসব শুনলেও পাপ হয়। এ যুগে ভক্তির কীই বা দাম বলুন!

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, দাম নেই। ভক্তি বিশ্বাস সব তামাদি টাকা। চলে না। তা আমার। দেখবার চোখটিও যে পুরনো, সেও তামাদি। এ যুগের চশমা ধার পেলে অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করতাম।

নিমাই বিনীতভাবে চুপ করে থাকে।

বিষ্ণুপদ বলে, গরিব মানুষ আমরা, বরাবর হা-ভাত জো-ভাত করে কেটেছে। তার ওপর ভিটেমাটি ছেড়ে এই ভিনদেশে এসে হাউড়ে পড়ে আরও খারাপ হাল হল। আমার ছেলেমেয়েরা সব দাঁতে কুটো দিয়ে বড় হয়েছে। কষ্ট করারই ধাত। তাই ভেবেছিলাম গরিবঘরে মেয়ে গেলে আর নতুন কষ্ট কিসের? পয়মন্ত হলে, ধার্মিক লোকের ঘর করলে ভালই থাকবে।

যে আজ্ঞে।

এখন দেখছি গোটা অঙ্কটাই ভুল হয়েছিল। কিন্তু এ অঙ্ক তো আর ফিরে কষা যায় না। দেখছি, তোমরা ভাল নেই। কেন নেই বাবা?

নিমাই গলাটা একটু সাফ করার চেষ্টা করে। কিন্তু ফের তার চোখ ভরে জল এসেছে। গলায় আটকে আছে শুকনো ভাতের ডেলার মতো কান্নার গিট। তার সময় লাগল।

আজ্ঞে, দোষটা তো আপনারও, আমারও। বীণা বোধ হয় আরও একটু ভাল পাত্র চেয়েছিল। আমাকে বাছা আপনার ঠিক হয়নি।

সে সবই তো ভাবি বাবা। ঠিক বেঠিক মিলেমিশে এমন গোলমালে ফেলে দেয়। বীণা আমার কাছে কী একটা গচ্ছিত রাখতে চায়, সেও বলে না কী, তুমিও কবুল করো না। মনে হয়, জিনিসটা খুব সাদা জিনিস নয়। একটু ভয়-ভীতির ব্যাপারও আছে।

আজ্ঞে আছে।

বিষ্ণুপদ একটু চুপ করে থেকে বলে, সেই জন্যই তোমাদের আসা?

বীণা জানে।

আমি জিনিসটা রাখব না বাবা। তোমার ভয় নেই। তোমার মুখ দেখেই বুঝেছি, জিনিসটা ধর্মের জিনিস নয়। হক্কেরও নয়।

আপনি বড় জ্ঞানী মানুষ।

বিষ্ণুপদ একটু হাসল, তোমার শাশুড়ি ঠাকরুণেরও তাই বিশ্বাস। আমি নাকি একটা জ্ঞানী। কী যে সব বলো তোমরা মাথামুণ্ডু!

বই-পড়া জ্ঞানের কথা বলিনি আজ্ঞে। কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানের কথা বলছিলাম।

তাহলে ধরেছি ঠিক?

যে আজ্ঞে।

বড্ড শীত করছে আমার। তুমি বরং একটু মুড়িসুড়ি দিয়ে বোসো। এ সময়টায় বড্ড ঠাণ্ডা লেগে যায়। তোমার বুকটা তো আবার কমজোরি।

ঠাণ্ডা লাগছে না তেমন। ঠিক আছে।

তোমরা থাকবে ক'দিন?

নিমাই ঘাড় হেঁট করল। মিনমিন করে বলল, বীণা বোধ হয় কয়েক দিন থাকবে।

তুমি?

আমি সকালেই যাচ্ছি।

কাজকর্ম যখন নেই, তখন যাবেই বা কোথায়?

ছোটখাটো কাজের আশা আছে। বসে থাকলে চলবে না।

বীণা কি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে?

তটস্থ হয়ে নিমাই বলে, আজ্ঞে না তো? ও কথা কেন বললেন?

বিষ্ণুপদ ফের একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বলে, বউ যখন রোজগার করে তখন তার দারোগার মেজাজ হয়।

নিমাই ফের মিনমিন করে বলে, সেরকম কিছু নয়।

বিষ্ণুপদ একটু হেসে বলে, কেন দারোগার মতো মেজাজ হয় জানো?

আজ্ঞে না।

মেয়েদের তো রোজগার করার কথা নয়। করেওনি কোনওদিন। হঠাৎ আজকাল তাদের আয় হতে শুরু করেছে। তাই বড্ড দেমাক হয়।

নিমাই শুকনো একটু হাসল। কিছু বলল না।

বিষ্ণুপদ খুব দূরের গলায় বলে, তার ওপর যাত্রাপার্টি। সে বড় খারাপ জিনিস। অন্য সব ধরছি না। ওই যে ক্ল্যাপ পায়, আলো-বাজনা, হাজার জনের চোখের সামনে নিজেকে জাহির করা, ওর একটা অহংকার আছে। বড্ড দেমাক হয়। তখন মাটিতে পা পড়তে চায় না, মানুষকে মানুষ বলে মনে করতে ইচ্ছে হয় না। যাত্রা তো একটা মিথ্যে মায়ার জগৎ।

যে আজ্ঞে।

বীণাপাণি নিজেও কষ্ট পাবে। তোমাকেও দেবে।

নিমাই আবার চুপ। বুকের মধ্যে কান্নাটা ধাক্কা দিচ্ছে, উথলে আসতে চাইছে বমির মতো।

শোনো বাবা, আমি চোখে ভাল দেখতে পাই না। কিন্তু কানে ভালই শুনি।

নিমাই শঙ্কিত হয়ে পড়ল। কথাটার মানে কি? কী শুনেছেন উনি?

বিষ্ণুপদ মৃদুস্বরে বলে, যখন দরজা খুলে তুমি বেরোচ্ছিলে তখন আমি একটা কান্নার মতো মা শুনেছিলাম। ভুল নয় তো!

নিমাই চুপ করে থাকে।

বিষ্ণুপদ অনেকক্ষণ কিছু বলল না। ঝুম হয়ে বসে রইল। তারপর বলল, কান্না জিনিসটা পুরুশ মানুষের বড় সহজে আসে না বাবা।

নিমাই বুড়ো মানুষটির দিকে অন্ধকারে জলভরা চোখে চেয়ে রইল। তারপর কাঁপা গলায় বলল, বীণার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল বাবা। আমি যাচ্ছি।

বিষ্ণুপদ একটু নড়ল। জলচৌকিতে অসমান পায়ায় একটা শব্দ হল, ঢক।

বিষ্ণুপদ র‍্যাপার জড়ানো মাথাটা নেড়ে বলে, বুঝেছি বাবা। ছেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু দিয়ে যাচ্ছে কাকে?

সে তো জানি না। বীণা বুঝবে।

ও কি বোঝে? বুঝলে আর কথা ছিল কি?

আমার বড় অপমান হচ্ছে। বীণা চাইছে না।

বিষ্ণুপদ আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, আমার নৌকো তো ঘাট ছাড়ার মুখে। ভাল মন্দ কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না। তবে বলি, তুমি বড় সচ্চরিত্রের ছেলে। সৎ থাকা বড় কঠিন।

নিমাই দু'হাতে মুখ ঢেকেছে। চোখ ভেসে যাচ্ছে জলে। অবরুদ্ধ ফোঁপানি উঠে আসছে গলায়। কুকুরটা হঠাৎ এ সময়ে খেকিয়ে উঠল দুবার।

দুনিয়া তার নিজের নিয়মে চলবে। কত লোক কত কী করে বেড়াচ্ছে। কে কার কড়ি ধারে? আমি কি পারি দুনিয়ার সব কিছু নিজের মতো ঘটিয়ে তুলতে? আমি তা করার কে?

এ কথার জবাব হয় না। জবাব দেওয়ার মতো অবস্থাও নয় নিমাইয়ের। সে কাঁদছে। বিষ্ণুপদ একটা হাত বাড়াল তার দিকে। কাঁপা-কাঁপা দুর্বল হাত। ছোঁওয়ার চেষ্টা করল তাকে। নাগাল পেল না। হাতটা ফের সরিয়ে নিল বিষ্ণুপদ।

নিমাইয়ের কান্না থামল হেঁচকি উঠে যাওয়ার পর। নিজেকে বড় ঘেন্না হতে থাকে নিমাইয়ের। সে বড় দুর্বল। তার মনের কিছুমাত্র জোর নেই। বীণাপাণি কি সাধে তাকে ম্যাদাটে পুরুষ বলে হ্যাটা করে? করাই উচিত।

বিষ্ণুপদ গলা খাঁকারি দিল খুব সন্তর্পণে। তারপর বলল, একটু জল খাবে বাবা?

আজ্ঞে না।

তোমার জন্য আমার যদি কিছু করার থাকত তো করতাম। কিন্তু আমি এখন দুনিয়ার বার। কিছু করতে পারি না, হাত পা কোলে নিয়ে বসে বসে দেখি। চোখের সামনে কত কী হয়ে যায়। আগে মনে হত এটা ভাল হল না, ওটা ঠিক হল না। আজকাল ভাবি, বিচার করার আমি কে? আমার কি। অত জ্ঞান বা বুদ্ধি আছে? দুনিয়াটা কি আমি চিনি? লোকে যা করছে করুক। ভাল মন্দ তারা। বুঝবে।

নিমাই কান্নার পর অবসাদ নিয়ে বসে আছে। শ্বশুরমশাইকে তার কোনওদিন খারাপ লাগে না। একটু আলগা মানুষ, কিন্তু বড় মিঠে মোলায়েম। কোনও উগ্রতা নেই। পৃথিবীতে চারদিকে বড় শক্ত শক্ত মানুষ। যেন তাদের কাঁটাওলা গা, জিবে দাঁতে ধার, চোখে যেন খুনির দৃষ্টি।

মাঝরাত্তিরে কোথায় যাচ্ছিলে বাবা?

আজ্ঞে, রওনা দিচ্ছিলাম।

এই মাঝরাতের অন্ধকারে?

মাঝরাতেই ভাল। সবাই জেগে গেলে নানা কথা উঠবে, জিজ্ঞাসাবাদ হবে, বাধা পড়বে।

তা ঠিক। তবে এখনও রাত মেলা আছে। একটু বসে যাও।

শ্বশুরমশাইয়ের দিকে চেয়ে দেখল নিমাই। অন্ধকারের মধ্যে কালো একটা অবয়ব মাত্র। মুখের ভাব তোবোঝা যায় না। লোকটার খুব মায়া আছে তার প্রতি। নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ঠিক আছে।

বিষ্ণুপদ আর একটু ঝিম মেরে থেকে বলে, বীণা বনগাঁয়ে থাকতে চায় না কেন বলো তো? সে কি ওই জিনিসটার জন্যই?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ওখানে কি ওর অনেক শত্রু?

কে জানে! ও ভয় পাচ্ছে।

তুমি পাও না?

না আজ্ঞে। আমার আর ভয় কিসের? পরের ধন নিয়ে তো বসে থাকিনি।

বীণার ভয় থাকলে তোমারও হয়তো আছে।

আজ্ঞে সেরকম ভয়ের কিছু আছে বলে তো মনে হয় না। আজকাল কে কি না করছে বলুন। চুরিধারি, খুনখারাপি সব করেই দিব্যি বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কে কার বিচার করবে?

তা বটে।

তাই বলছি, সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে বীণারও ভয় নেই। তবু যদি ভয় খায় তো কিছু করার নেই।

তোমাকে কি বীণা ত্যাগ দিয়েছে?

নিমাই লজ্জিত হয়ে বলে, একরকম তাই।

কি জন্য?

ও ভাবছে ওর টাকার বান্ডিলের কথা আমি চাউর করে দেব। দুর্বল মানুষ, আমার পেটে কথা থাকে না। তাই।

এ বড় অদ্ভুত কথা!

নিমাই চুপ করে থাকে।

বিষ্ণুপদ বলে, কত টাকা হবে? লাখো লাখো নয় তো!

আজ্ঞে আমি জানি না। বিলিতি টাকা, হিসেব বড় খটোমটো। তবে মনে হয় বেশ মোটা টাকাই হবে। কথাটা বলে ফেললাম, হয়তো বীণা শুনলে রাগ করবে। তা করুক, আপনাকে জানানো উচিত বলে মনে হল।

বিষ্ণুপদ একটু চুপ করে থেকে বলে, আমারও একটা আন্দাজ ছিল। তুমি কিছু গুহ্য কথা ফাঁস করোনি। কেউ গচ্ছিত রেখেছিল?

যে আজ্ঞে। সে খুন হয়েছে। ওয়ারিশান নেই। ওই টাকার জন্য পরে আরও খুনখারাপি হয়। অনেক কাণ্ড।

টাকার জন্য তোমাকে ছাড়ছে বীণা!

যে আজ্ঞে। আমিও আর পেরে উঠছি না। মনটা বড্ড ভার হয়ে আছে।

বিষ্ণুপদ হঠাৎ টর্চটা একটু জ্বালল। তারপর নিরাসক্ত গলায় বলে, চলল, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি একটু।

এগিয়ে দেবেন? বলে অবাক হয়ে নিমাই অবয়বটার দিকে চায়।

এগিয়ে দিই। পথটা অন্ধকার, তুমি হয়তো খুঁজেও পাবে না। চলো।

নিমাই উঠে পড়ে। বলে, আপনাকে যেতে হবে না। আমি পারব।

তুমি বুঝবে না বাবা। বীণার জীবনে তোমাকে তো আমিই এনেছিলাম। আজ ফের তোমাকে বিদায় দেওয়াও আমার একটা কর্তব্য। বোধন করলাম আর বিসর্জন দেবো না? চলল।

চোখে জল এল নিমাইয়ের। নিচু হয়ে সে হঠৎ একটা প্রণাম করল বিষ্ণুপদকে। তারপর বলল, চলুন তাহলে।

ম্লান টর্চের আলোয় কুয়াশা আর অন্ধকারে একটা অনির্দিষ্ট পথরেখা ধরে দু'জনে পাশাপাশি এগোতে লাগল। মন্থর পা। মুখে কথা নেই।

৪৭

প্রফেসর শর্মা তার কটেজের পলকা দরজাটা বারকয়েক টেনে এবং ঠেলে দেখে নিয়ে কৃষ্ণজীবনের দিকে চেয়ে বললেন, ইউ থিংক ইট ইজ সেফ?

কৃষ্ণজীবন মৃদু হেসেছিল। জবাবে বলেছিল, বাইরে একটা ফ্লাডলাইট সারা রাত জ্বলে। বন্যজন্তুরা আসে না আলো দেখলে।

শর্মা সন্তুষ্ট হননি। ভ্রূ কুঁচকেই ছিল।

এখানকার জঙ্গলমুখী নিরালা কটেজ মোটেই খুশি করেনি ডঃ পটেলকেও। লনে পাতা বেতের চেয়ারে বসে পাইপ টানতে টানতে বললেন, ইট সিমস্ এ হন্টেড প্লেস। ইট গিভস্ মি শিভারস।

ডঃ স্বামী ধার্মিক বিজ্ঞানী। তিনি কোনও মন্তব্য করেননি। কিন্তু এই প্রাচীন নির্জন জঙ্গলের মাঝমধ্যিখানে তৈরি হোয়াইট টাইগার লজকে তাঁরও বিশেষ পছন্দ হচ্ছিল না। তিনি বিরক্তিমাখা মুখে পায়চারি করছিলেন লনে।

মধ্যপ্রদেশ সরকারের যে-টুরিস্ট অফিসারটি তাঁদের সঙ্গে এসেছেন, তিনি কৃষ্ণজীবনকে একবার গাড়ির মধ্যেই বলেছিলেন, টোয়েন্টি সিক্স টাইগারস—ইয়েস, বাট নো ম্যান-ইটারস্।

জঙ্গলের নিবিড়তা আর নির্জনতা মুগ্ধ করেছে শুধু কৃষ্ণজীবনকেই। লোকালয় ছাড়িয়ে অনেকটা ভিতরে ঢুকে তবে এই লজ। ছড়ানো ছিটোনো ডিটাচড্ এক একটি কটেজ। পিঠোপিঠি দুটি করে ঘর। কৃষ্ণজীবনের ভাগ্যে জুটেছে সবচেয়ে দূরবর্তী ঘরখানা। মুখোমুখি জঙ্গল। তাতে সে খুব খুশি। যদিও সরকারি অফিসারটি তাকে চুপি চুপি বলেছিল যে বান্ধবগড় জঙ্গলের বাঘেরা প্রায়ই লজের ভিতর দিয়ে যাতায়াত করে।

জব্বলপুরে সরকার আয়োজিত সেমিনারটি ছিল পৃথিবী জুড়ে এরকম হাজার হাজার নিষ্কর্মা সেমিনারের একটি। আলোচনা হয়, কাজের কাজ কিছুই হয় না। যাতায়াত ভাড়া, ফি বাবদ কিছু টাকা আর ফাউয়ের মধ্যে একটু দেশভ্রমণ। কৃষ্ণজীবন এসব সেমিনারে যাওয়া একদিন ছেড়ে দেবে। আপাতত ছাড়েনি। কারণ সেমিনারগুলি কেন অসাড় ও নিস্ফলা সেটাও তার ভালভাবে জানা দরকার। মাঝবয়েসী বা বৃদ্ধ, সফল ও সুখী, প্রতিষ্ঠিত ও পরিবার-বৎসল বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে যে আর নতুন দিগন্তের তালা খোলা যাবে না সেটা সে যেমন বোঝে তেমন কি বোঝে সরকার বা প্রশাসন? এদের মাথা আছে কিন্তু দেশ বা পৃথিবীর জন্য তেমন মাথাব্যথা নেই। কিছু সুখসুবিধা ও প্রতিষ্ঠার মধ্যে এরা গুটি পাকিয়ে থাকতে চান। ডানা মেলতে চান না আর। বুঝে গেছেন, আর করার কিছু নেই।

বিকেলে তাঁরা বান্ধবগড় পৌছেছেন সরকারি বদান্যতায়। সেমিনারের পর ফাউ হিসেবে জঙ্গলে একটু বিশ্রাম। জব্বলপুর থেকে রাস্তা বড় কম নয়। স্বামী চেয়েছিলেন খাজুরাহো যেতে। সেটা মনঃপূত ছিল শর্মারও। তিনি একটু এরোটিকার ভক্ত। শুধু কৃষ্ণজীবন চেয়েছিল জঙ্গল। পটেল তাকে সমর্থন করেছিলেন বটে, কিন্তু লজটি দেখে তাঁর বিশেষ ভাল লাগছে না।

অথচ ভাল না লাগার কারণ নেই। সরকারি লজের সব ব্যবস্থাই এখানে রয়েছে। লাগোয়া বাথরুম, গরম-ঠাণ্ডা জল, রুম হিটার। এসব না হলেও কৃষ্ণজীবনের চলত।

কৃষ্ণজীবন যখন তার ঘরে পোশাক পাল্টে পায়জামার পর পাঞ্জাবি চড়িয়ে আলোয়ান জড়াচ্ছিল তখনই সরকারী অফিসার আনোয়ার বিনীতভাবে এসে দাঁড়াল দরজায়।

স্যার, একজনকে মীট করবেন?

কে বলুন তো?

লোকটা রাজবাড়িতে থাকে। পঁচিশ মাইল সারকামফারেন্সে জনমনিষ্যি নেই। রাজবাড়ি, এখন ভূতের বাড়ি।

বিস্মিত কৃষ্ণজীবন বলে, থাকে কেন? তান্ত্রিক নাকি?

না স্যার, ঠিক তান্ত্রিক নয়। তবে পুরোহিত। পরিত্যক্ত রাজবাড়িতে একটা বিগ্রহ আছে, তার পুজো করে রোজ। চল্লিশ টাকার মতো পায় মাসকাবারে। ব্যস, ওই জন্যই থাকে।

মাত্র ওই ক'টা টাকার জন্য?

সেইটাই তো আশ্চর্যের। বউ বাচ্চা সব গাঁয়ে থাকে, বিশ পঁচিশ মাইল দূরে। জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের ওপর কেল্লায় লোকটা একা থাকে। লোকে বলে জিন পরীরা ওকে খাওয়ায়।

লোকটা বেশ সাহসী বলতে হবে। তার সঙ্গে দেখা করা যায়?

নিশ্চয়ই। রোজই আসে এদিকে। কালকেই দেখতে পাবেন সকালবেলায়।

বাঘের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হেঁটে আসে রোজ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। হাতে লাঠিও থাকে না।

সাবাস!

সাধুবাদটা তার মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে এল। যে মানুষ জঙ্গল, শ্বাপদ, একাকিত্ব ও নির্জনতাকে ভয় পায় না তেমন মানুষকে তার খুব পছন্দ।

লোকটা কি খুব গরিব?

খুব। জঙ্গল থেকে আতা, বেল এইসব ফল-টল তুলে এনে বিক্রি করে। এখানে টুরিস্ট লজে যারা আসে তারাই কখনও কখনও কেনে। গাঁয়ের লোক তো পয়সা দিয়ে ফল কেনে না।

লোকটার কেমন করে চলে তা আর জিজ্ঞেস করল না কৃষ্ণজীবন। এ দেশের কোটি কোটি গরিবের কী করে চলে সে রহস্য ভেদ করতে কে পারবে? কেউ জানে না।

সন্ধের পর লজের ম্যানেজার সম্মানিত অতিথিদের জন্য ছোট্ট একটা ককটেলের আয়োজন করলেন লজের রিসেপশনে। কৃষ্ণজীবন জীবনে কখনও মদ খায়নি। সে একটা সফট ড্রিঙ্ক নিয়ে বসে রইল। সর্বদাই তার বিচরণ চিন্তার রাজ্যে। বাস্তবতার মধ্যে সে কমই থাকে। তার সামনে আস্তে আস্তে চারজন মানুষ নরমাল

থেকে হাই হয়ে যেতে লাগল। মদ খাওয়া মানে যেন বেলুনে চড়ে কিছুক্ষণের গগনবিহার। স্বাভাবিকতা থেকে কিছুক্ষণের ছুটি। অনেক পয়সা খরচ করে এই ছুটিটুকু কিনতে হয় মানুষকে। আবহমানকাল ধরে গরিব-দুঃখী থেকে রাজা-গজা অবধি এই জিনিসের নেশা করে আসছে। সস্তা বা দামী—যে যেমন পারে। সুরার বন্দনা কিছু কম হয়নি পৃথিবীতে। কিন্তু কেন, সেই কারণটা কৃষ্ণজীবন আজও খুঁজে পায়নি।

পটেল একটু বেশিই মাতাল হয়ে গেলেন। বোধহয় ইচ্ছে করেই। মদ খেতে খেতেই বলছিলেন, আমার ভীষণ ভূতের ভয়। আমার ঘরে আর কাউকে শুতে হবে রাতে।

কিন্তু পটেল এতই মাতাল হয়ে পড়লেন যে, ভূতের ভয় গৌণ হয়ে গেল। তাকে ধরাধরি করে নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল ঘরে।

এই নির্জন অরণ্যাবাসে নিশুত রাত্তির হয়ে গেল সন্ধের কিছু পরেই। ডিনারের পর যখন যে যার শশাওয়ার ঘরে গিয়ে দরজা দিলেন তখনও ন'টা বাজতে দু'এক মিনিট বাকি।

হেমন্তের শেষ। যথেষ্টই শীত পড়েছে এখানে। একটু রাতের দিকে যখন চাঁদ উঠল তখন বাইরের ফ্লাড লাইটটা নিবিয়ে দিয়ে কৃষ্ণজীবন একটি বেতের চেয়ার বাইরে টেনে এনে বসল। অল্প কুয়াশায় মাখা কী বন্য ভয়ংকর জ্যোৎস্না! জঙ্গলে নীল গাইয়ের ডাক, পাখির ডাক, হরিণের গলা খাঁকারি শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে পাতায় পাতায় শিশির পড়ার শব্দ। চারদিককার গাছপালা যেন কৃষ্ণজীবনকে একা দেখে একটু ঘন হয়ে সরে এল কাছাকাছি। যেন কৃষ্ণজীবনের কাছে তারা কিছু শুনতে চায়।

এইসব রাতের সৌন্দর্য দেখে গড়পড়তা বাঙালি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে ওঠে বা আহা উহু করে চাঁদের নানাবিধ প্রশংসা করে। কবিতাও মনে পড়ে কারও কারও। সৌন্দর্য ওভাবেও দেখা যায়। কিন্তু অরণ্যের জ্যোৎস্না বা অন্ধকার, গ্রীষ্ম বা শীত বরাবর অন্যভাবে মূক করে দেয় কৃষ্ণজীবনকে। সে যেন হাজার হাজার বছর পিছিয়ে চলে যায় মানুষের আদিম আরণ্যক একাকিত্বে। চারদিকে সভ্যতার নানা নির্মাণ মিথ্যে হয়ে যায়। মুগ্ধ, সম্মোহিত, ভূতগ্রস্ত কৃষ্ণজীবন তার অধীত সব বিদ্যা বিস্মৃত হয়। ভাষা অবধি ভুলে যায়, তার মন মাথা সব কিছু হয়ে যায় মূক ও বধির। না, কৃষ্ণজীবনের ভয় করে না। একটুও ভয় করে না। জঙ্গলের অনেক গভীরে পাহাড়ের ওপরকার পরিত্যক্ত কেল্লায় যে লোকটা একা থাকে কৃষ্ণজীবন তার চেয়ে কিছুমাত্র কম সাহসী নয়।

কত রাত অবধি বসে রইল কৃষ্ণজীবন তা তার নিজেরও খেয়াল ছিল না। সময় যেন এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হয়তো আড়াল থেকে বাঘের চোখ তাকে লক্ষ করে গেল লাভ দেখে গেল ভালুক ও নীল গাই, তাকে নজর করল রাতচরা পাখি।

যখন অবশেষে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বিছানায় ঢুকল সে, তখন তিনটে বাজতে সামান্যই। বাকি। সকালে হাতির পিঠে চড়ে এবং লানচের পর জীপ নিয়ে তাদের জঙ্গলে দু দফা ঘটে। বেড়ানোর কথা। সেসব বেড়ানোর মধ্যে শৌখিন বাবুয়ানা আছে। কৃষ্ণজীবনের ভাল লাগে পায়ে হেঁটে, একা গভীর গভীর জঙ্গলে দিশাহীন ঘুরে বেড়াতে, গাছপালার মধ্যে নিথর হয়ে চুপ করে বসে। থাকতে।

সকালে ব্রেকফাস্টের পরই শর্মা এবং স্বামী হাতির পিঠে চড়ে বাঘ দেখার জন্য কিছু উদ্বেল হলেন। পটেলের হ্যাংওভার, সম্ভবত প্রেশারটাও বেড়েছে। সুতরাং যাবেন না।

হাতির পিঠে যখন কাঠের মস্ত তক্তা পাতা হয়েছে এবং রওনা দেওয়ার তোড়জোড় চলছে ঠিক সেই সময়ে নোকটা এল। সাধারণ গ্রামবাসীর মতোই চেহারা। কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। হেঁটো ধুতি, গায়ে মোটা

আধময়লা সাদা একটা জামা, তার ওপর সুতির চাদর, পায়ে রবারের চটি। হাতের ব্যাগে কিছু কতবেল।

আনোয়ার তাকে ধরে এনে মান্য অতিথিদের সামনে দাঁড় করাল।

এই সেই লোকে স্যার, কেল্লায় থাকে।

লোকটাকে সবাই দেখল, বিশেষ গুরুত্ব দিল না। দু-চারটে মামুলি প্রশ্ন করে ছেড়ে দিল।

কৃষ্ণজীবন তাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করল, কেল্লাটা কেমন?

লোকটা কম কথার মানুষ। হয়তো বা লাজুক বা কথা ভালবাসে না। সামান্য মাথা নেড়ে বলল, ভালই।

দেখতে যাওয়া যায়?

অনেকেই যায়।

আপনি ওখানে একা থাকেন কেন?

এমনিই।

একা থাকতে ভালবাসেন?

হ্যাঁ।

কিরকম লাগে?

ভাল।

গাছপালা ভালবাসেন?

হ্যাঁ।

নির্জনতা ভাল লাগে?

হাঁ।

আমি যদি কেল্লায় যেতে চাই তাহলে নিয়ে যাবেন?

আপনাদের হাতি আছে, নিয়ে যাবে।

কৃষ্ণজীবন লোকটাকে দেখে খানিকটা হতাশই হল। এ ঠিক প্রাকৃত বিভূতিভূষণ নয়। হয়তো দজ্জাল বউয়ের ভয়ে পালিয়ে থাকে।

ভূতে বিশ্বাস করেন?

কেন করব না?

ভূত দেখতে পান?

না।

লোকে বলে জিন আর পরীরা আপনাকে খাবার দিয়ে যায়। না।

এ লোকের সঙ্গে কথা বলে কোনও উন্মোচন ঘটানো যাবে না। কৃষ্ণজীবন তাই ক্ষান্ত হল। জঙ্গলে নির্জন কেল্লায় দীর্ঘকাল একা বসবাস করেও এর মধ্যে কোনও কিছুর সঞ্চার হয়নি। লোকটা যেমন ভোঁতা ও কল্পনাহীন ছিল তেমনই রয়ে গেছে। বোকা মানুষেরা ওকে নিয়ে কিংবদন্তী বানিয়ে চলেছে। তবে হয়তো অরণ্যের কাছ থেকে ও একটা জিনিস শিখেছে। সেটা হল নিচুপ থাকা, কথা কম বলা।

কতবেল কেউ কিনল না, লোকটা একটু দাঁড়িয়ে থেকে গাঁয়ের দিকে চলে গেল।

হেলেদুলে সকালটা কাটল হাতির পিঠে। অজস্র প্রাচীন গুহা, সম্বর, নীল গাই, বহু পুরোনো এক শায়িত বিষ্ণুমূর্তির ওপর দিয়ে নেমে আসা ঝরনা ইত্যাদি দেখা হল বটে, কিন্তু যাকে দেখতে আসা সেই বাঘের দেখা পাওয়া গেল না কোথাও। বাঘ ছাড়াও যে জঙ্গলে আরও অনেক কিছু দেখার আছে সেটা বুঝতে চাইলেন না শমা বা ডঃ স্বামী। একটু খুঁতখুঁত করছিলেন, ছাব্বিশটা বাঘের একটারও তো দেখা মিলবে!

তবে "কিল" পাওয়া গেল। হরিণের সদ্যভুক্ত দেহাবশেষ। এক জায়গায় বাঘের পদচিহ্নেরও হদিশ মিলল। কিন্তু বাঘ নয়।

দুপুরে লানচের পর আর এক দফা বেরোনো হল। কিন্তু বাঘহীন ভ্রমণই সার হল শুধু। বেলা পড়বার আগেই খানিকটা ক্লান্ত হয়ে ফিরে এল তারা।

গাইডেড সরকারি ভ্রমণ শেষ হয়েছে। কাল সকালে তারা ফিরে যাবে। কৃষ্ণজীবন চায়ের টেবিলে বসল বটে, কিন্তু মনটা বড় চনমন করছিল তার। এভাবে নয়, এই অরণ্যকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও তার একা পাওয়া দরকার।

ক্লান্ত বিশেষজ্ঞরা ঘরে গেছেন। আনোয়ারকেও দেখা যাচ্ছে না কোথাও। শুধু বেয়ারা দুজন বিষন্ন গম্ভীর মুখে টেবিল পরিষ্কার করছে। এই সুযোগ।

কৃষ্ণজীবন উঠল এবং পায়ে পায়ে লজের সীমানা ডিঙিয়ে চলে এল মুক্ত জঙ্গলের ভিতরে। জীপ-রাস্তাটি সযত্নে এড়িয়ে সে ঘাসজঙ্গলের ভিতরে ঢুকে গেল একা। শেষবেলার রঙিন আলোয়। কী অপার্থিব যে দেখাচ্ছে চারদিক।

সে শব্দ করছিল না। শব্দ করছিল বিচিত্র পাখিরা। শব্দ করছিল দূরবর্তী নীল গাই। হরিণের পায়ের দ্রুত শব্দ।

একটা মস্ত গাছের বেড় পেরিয়ে পাথরের চাতাল। উচ্চাবচ একটা জায়গা। ক্ষয়া পাথরের একটা প্রাকৃতিক স্থাপত্য। যাকে সারাদিন এত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খোঁজা হল তার দেখা যে এত অপ্রত্যাশিত পাওয়া যাবে কে জানত?

সামনেই খোলা চাতালের ওপর নিজের বর্ণের আগুনে যেন দাউ দাউ করে জ্বলছিল বাঘ। পায়ের তলায় সদ্য শিকার করা হরিণ। বোধহয় তখনও হরিণের হৃৎপিণ্ড ধক ধক করছিল। বিশাল বাঘটা অবহেলায় একখানা পা হরিণের ওপর রেখে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো দম নিচ্ছে। ভঙ্গিটা তাচ্ছিল্যের। অবজ্ঞাভরে সে একবার কৃষ্ণজীবনের দিকে তাকাল।

চোখে চোখ। কৃষ্ণজীবন চোখ ফেরাতেই পারল না। বিস্ময়ে মুগ্ধতায় চেয়ে রইল।

পালানোর কথা বা লুকিয়ে পড়ার কথা মনেই হল না কৃষ্ণজীবনের। সে শুধু অরণ্যের পটভূমিতে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী রাজাকে দেখছিল। রাজা জ্বলে যাচ্ছে নিজের দাউদাউ গাত্রবর্ণে। শেষবেলার পড়ন্ত আলো যেন তাকে ঘিরে নেচে উঠছে উল্লাসে।

কৃষ্ণজীবন আরও কয়েক পা এগিয়ে গেল। মাত্র পনেরো বিশ ফুটের তফাতে বাঘ দাঁড়িয়ে। কৃষ্ণজীবনের কোনও আড়াল নেই, অস্ত্র নেই। কৃষ্ণজীবন পালাচ্ছেও না। চোখ অবধি সরাল না।

বাঘ চকিতে একবার পিছু ফিরে কী যেন দেখে নিল। তারপর ফের কৃষ্ণজীবনের দিকে তাকাল।

কৃষ্ণজীবন চাপা স্বরে বলল, নমস্কার।

বাঘ একটা হাই তুলল মাত্র।

আপনাকে বিরক্ত করলাম। মাপ করবেন।

বাঘ চেয়ে রইল তার দিকে।

আমি আপনার একজন বন্ধু।

আবেগে, আনন্দে কৃষ্ণজীবনের গলা বন্ধ হয়ে আসছিল। সে মৃদুস্বরে বলল, আসি।

সামান্য, খুব সামান্য একটা ভু-র-র শব্দ এল বাঘের গলা থেকে।

কৃষ্ণজীবন ধীরে ঘুরে গিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে লজে ফিরতে লাগল। একটু দূর থেকেই সে সোরগোল শুনতে পাচ্ছিল একটা। লজের এলাকায় ঢুকতেই দেখল, সবাই সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। উত্তেজিত কথাবার্তা হচ্ছে।

তাকে দেখেই ছুটে এল আনোয়ার, স্যার! আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

কৃষ্ণজীবন একটু অবাক হয়ে বলে, কাছেই! কেন?

বাঘ বেরিয়েছে স্যার! বাঘ। শিগগির ঘরে ঢুকে যান।

কৃষ্ণজীবন স্মিত মুখে বলল, তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, আনোয়ার সাহেব। হি ওয়াজ এ নাইস জেন্টলম্যান।

তিন দিন বাদে গল্পটা সে দোলনকে বলছিল রাতে, তার বিছানার পাশে বসে। দোলনের ঠাণ্ডা লেগে একটু জ্বর হয়েছে। অসুখ হলেই সে বাবাকে আরও বেশি করে চায়। দুটো হাতে সে। কৃষ্ণজীবনের একটা হাত শক্ত করে ধরে আছে। চোখ বড় বড়। মুখখানা হাঁ।

বাঘটা যদি তোমাকে খেয়ে ফেলত বাবা?

কৃষ্ণজীবন সামান্য উদাসভাবে বলল, ওরা মানুষখেকো বাঘ নয় বাবা।

যদি কামড়ে দিত?

কথাটা তো তখন আমার মনেই হয়নি। এত সুন্দর দেখাচ্ছিল বাঘটাকে, আগুনের মতো, আলোর মতো, আমি সব ভুলে গিয়েছিলাম। কী ভদ্র, কী সহবত! আর কী সাংঘাতিক অহঙ্কার!

দোলন ভয়ার্ত গলায় বলে, আর কখনও ওরকম করো না বাবা।

কৃষ্ণজীবন একটু হেসে তার প্রিয় পুত্রটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, বাঘ তো মানুষের করুণার পাত্র বাবা। সারা পৃথিবীতে কয়েকটাই মাত্র বেঁচে আছে। মানুষেরই দয়ায়। বাঘ-মারা বীরদের কত গল্প আছে, আমি যখন পড়ি তখন চোখে জল আসে। কেন জানো? বাঘের দাঁত, নখ আর খিদে ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু মানুষের কত কী আছে। বন্দুক, বুদ্ধি, অকারণ হিংস্রতা।

কিন্তু বাঘ যখন মানুষ মারে বাবা?

বাঘ যত মানুষ মেরেছে, মানুষের হাতে মারা পড়েছে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি। তুমি ভেবো না বাবা, বাঘের দেখা পাওয়া এখন ভাগ্যের কথা।

খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল দোলন। বাবার সব কথা সে আকণ্ঠ বিশ্বাস করে। তুমি খুব চিন্তিতভাবে সে বলল, বাঘটা কি তোমার বন্ধু হয়ে গেল বাবা? আবার যদি দেখা হয় কিছু করবে না তোমাকে?

চিন্তিত হল কৃষ্ণজীবনও। খানিকক্ষণ ভেবে বলল, বাঘ তত বুদ্ধিমান নয়। তার খিদেই তাকে চালায়। মানুষের নিষ্ঠুরতা তার চেয়ে ঢের বেশি।

তাহলে বাঘ কি মানুষের চেয়ে ভাল?

এ প্রশ্নের জবাব কলকাতার সাততলার ফ্ল্যাটে বসে খুঁজে পায় না কৃষ্ণজীবন। এ প্রশ্নের জবাব রয়েছে দূরের বান্ধবগড় জঙ্গলে, যেখানে এই রাতের অন্ধকারে এখন আদিম পৃথিবীর নিয়মে চলছে সব কিছু।

দোলন ঘুমিয়ে পড়লে কৃষ্ণজীবন উঠে আসে নিজের ঘরে। চুপচাপ বসে থাকে চেয়ারে। দুখানা বাঘের চোখ বহু দূর থেকে নিষ্পলক চেয়ে থাকে তার দিকে।

না, এ তার কোনও বীরত্বের গল্প নয়। বরং এ এক করুণ কাহিনী। লুপ্তপ্রায় ব্যাঘ্র-প্রজাতির একজনের সঙ্গে তারই স্বক্ষেত্রে দেখা হয়েছিল কৃষ্ণজীবনের। দুজনের মধ্যে একটু দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল মাত্র। তারা কেউ কাউকে আক্রমণ করেনি, এইমাত্র।

সাতদিন পর অনু নাগাল পেল তার। অনুরই জন্মদিনে, তার বাড়িতে। ইদানীং তারা কয়েকটি প্রতিবেশী পরিবার নিকটস্থ হয়েছে পরস্পরের। এর-ওর বাড়িতে ওর বা এর নিমন্ত্রণ হয় প্রায়ই। অনুর বাড়িতে কৃষ্ণজীবনের আসা এই প্রথম। রিয়া আসে, ছেলেমেয়েরা আসে। সে কখনও আসেনি। অনুর বাবা নিজে নিমন্ত্রণ করে এসেছিলেন বলে আসা।

আপনি কী বলুন তো?

কৃষ্ণজীবন বাচাল মেয়েটির দিকে চেয়ে হেসে বলে, কী হল?

শুনলাম আপনি বাঘের মুখে পড়েছিলেন ইচ্ছে করে?

গল্পটা খুব ছড়িয়েছে দেখছি।

গল্প নাকি? এটা তো ঘটনা।

ইচ্ছে করে পড়িনি। মুখেও পড়িনি।

তাহলে?

যেমন বন্ধুর সঙ্গে পথেঘাটে দেখা হয় ঠিক তেমনিই দেখা হয়ে গিয়েছিল।

অনু গোলাকার চোখে চেয়ে বলে, বাঘের সঙ্গে দেখা হয় নাকি? ওকে দেখা-হওয়া বলে? কী পাগল আপনি!

রিয়া শুনতে পেয়ে এগিয়ে এল, কাকাবাবুকে আচ্ছা করে শাসন করো তো! সত্যিই পাগল। আমাদের কাছে তোত এসব বলেন না, দোলনের কাছে শুনে ভয়ে মরি।

রিয়া সরে যেতেই অনু মুখ ভেংচে বলে, কাকাবাবু না হাতি! আপনি আমার বন্ধু না?

তাই তো।

আমি কাকাবাবুটাবু ডাকতে পারব না কিন্তু। বন্ধু বলে ডাকব। কাকাবাবু ডাকলে কি বন্ধুত্ব হয়?

আমি অত জটিল ব্যাপার বুঝতে পারি না।

কেন পারেন না? বাঘের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারেন আর আমার সঙ্গে পারেন না?

কে বলে পারি না!

কেমন এড়িয়ে চলেন আমাকে।

এড়িয়ে চলি না তো?

খুব অ্যাভয়েড করেন আমাকে। এই যে মধ্যপ্রদেশে গেলেন একবারও বলেননি তো!

বলা উচিত ছিল, না?

বন্ধুকে বলতে হয়। আমি কত খোঁজ করেছি আপনার। এবার থেকে যখন যাবেন আমাকে একটু খবর দেবেন।

অপর্ণা একটা খাবার ভরা প্লেট নিয়ে এগিয়ে আসে, আমার মেয়ে আপনাকে জ্বালাচ্ছে তো খুব? ও ভীষণ টকেটিভ?

বেশ ভাল মেয়েটি আপনার।

মাথা তো শার্প, কিন্তু পড়ে না একদম।

পড়বে। ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।

আপনি এত বিদ্বান মানুষ। আমার মেয়েটা বোধহয় আপনার সঙ্গে সমানে সমানে কথা বলে! আপনি নাকি ওর বন্ধু।

অপর্ণা হাসছিল। ভারী সুন্দর হাসিটি। একটু দুষ্টুমি মেশানো, কিন্তু সত্যিকারের হাসি। অনেকটা অনুর মতোই।

আসুন, একটা মেয়ের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই। ইউ উইল লাইক হার। এই আপা, এদিকে এসো।

রোগা, ক্ষয়া, কালো চেহারার একটি মেয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এসে বলল, ওকে আমি চিনি। উনি বিখ্যাত লোক। আর আমি তো সামান্য একটা মেয়ে, দেওয়ার মতো পরিচয়ই নেই।

অপর্ণা হেসে বলে, খুব সামান্য হলে আর ভাবনা ছিল কি? বুঝলেন, এ মেয়েটি কিন্তু সাংঘাতিক।

কৃষ্ণজীবন আপার দিকে চেয়ে ছিল। তার জহুরির চোখ নেই। কিন্তু অনেক দিন বাদে সে একটি পরিষ্কার ও স্পষ্ট মেয়েকে দেখল। লাবণ্য নেই, স্বাস্থ্য নেই, কিন্তু চোখে এক গহিন গভীরতা আছে যেন।

৪৮

দুনিয়াটা চারদিকে হাঁ-হাঁ করা খোলা। কিন্তু কোনদিকে যাওয়া যায় সেইটে মাঝে-মাঝে ঠিক করা বড় শক্ত হয়ে ওঠে। দুনিয়ায় এমন কেউ নেই যে তাকে দেখলে খুশি হয়। সে গেলে 'এসো বোসো' করার লোক নেই। পালপাড়ায় শুধু বুড়োবুড়ি আছে। কিন্তু তাদের মুখে হাসি ফোটানোর মতোই বা কোন্ সুসংবাদ নিয়ে যাচ্ছে সে?

ভোরবেলা শ্বশুরমশাই শীতলাতলার মোড় অবধি এগিয়ে দিয়ে গেলেন। বটতলায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথাও হল দুজনের।

কি করবে বাবা, এবার?

নিমাই বড় নীরস গলায় বলে, দেখি।

পুরুষমানুষ বসে গেলে তার আর জাত থাকে না। বসা-পুরুষের বড় কষ্ট। এই আমাকেই দেখ না। তবে বুড়ো হয়েছি বলে ক্ষ্যামা-ঘেন্না আছে। তোমার বয়সটা তো কিছু নয়। এই বয়সে বসা হলে কষ্ট বেশি।

আজ্ঞে, সে বড় ঠিক কথা। বসে থাকতে কে চায় বলুন! কিন্তু কিছু যে হয়ে ওঠে না। বীণা দানাপানি দেয়, তাই টিকে আছি। বড় লজ্জার ব্যাপার।

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তোমাকে দেওয়ার মতো বুদ্ধিও আমার নেই। দুনিয়ার হালচাল মাথায় সেঁধোয় না। নিজেই ভেবেটেবে ঠিক করে নিও। তারপর ভাগ্য।

আজ্ঞে। আমার জন্য ভাববেন না।

তোমার জন্য ভাবি না বাবা, মেয়েটার জন্য ভাবি। তার আর কোনও আড়াল রইল না। পুরুষ ছাড়া মেয়েরা হল লোভানী জিনিস। চারা গাছের চারদিকে বেড়া না থাকলে যা হয়।

আমাকে দিয়ে সেই কাজটাই কি ঠিকমতো হয় বাবা? আমি কি একটা তেমন পুরুষ?

কেন বাবা, বীণার কি চরিত্রের দোষ হয়েছে?

জিব কেটে নিমাই বলে, ছিঃ ছিঃ, বীণা সেরকম মেয়ে নয়। বলছিলাম বেড়ার কথা যা বললেন ওসব হল শক্ত-সমর্থ পুরুষের কাজ। আমার নয়।

নিজেকে অত ছোটো ভেবো না বাবা, তাতে আমার কষ্ট হয়। তোমার মুখে সুলক্ষণ আছে। কপালের ফেরে নানারকম হচ্ছে। লাগাম তো সবসময়ে মানুষের হাতে থাকে না। শুধু একটা কথা বলে দিই।

বলুন বাবা।

রাগ করে আবার আত্মঘাতী হয়ে বোসো না। খাস যতক্ষণ আশ ততক্ষণ। শেষ অবধি চেষ্টা কোরো বাবা। কথা মনে থাকবে?

যে আজ্ঞে। মাঝে মাঝে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে যায় না বটে। তবে কিনা শেষ অবধি ভগবানে মনটা ফেলে দিলে খানিক জুত পাই।

তাই কোরো বাবা। ভক্তরা চিরকাল কষ্ট পায়। নতুন কথা আর কি?

আসি তাহলে?

এসো গিয়ে। জবরদস্তি তোমাকে আটক করলাম না। তার কারণও একটা আছে। শুনে যাবে নাকি?

শুনেই যাই।

বীণার বছ থেকে পৃথক হলে তোমার নিজের ওপর ভরসা আসবে। রাগ-অভিমান তখন উল্টোপথে ধেয়ে গিয়ে গোঁ হয়ে দাঁড়াবে। যদি সেটা হয়ে ওঠে তবে মঙ্গলই হবে বাবা।

আপনার আশীবাদ। আসি তাহলে।

প্রণাম করে নিমাই অন্ধকারে পা বাড়াল। না, অন্ধকার আর ততটা ছিল না। আকাশ ম্যাদাটে আলোয় কিছু ফিকে হয়েছে। একা হয়েই নিমাইয়ের সমস্যা দেখা দিল, এখন সে কোথায় যাবে? কার কাছে?

যাওয়ার জায়গা বলতে আপাতত পালপাড়াই আছে। বুড়োবুড়ির সঙ্গে দেখাও হয় না অনেক দিন। ভাঙা হোক, ধসা হোক, নিমাইয়ের ভদ্রাসন বলতে ওই পালপাড়ার বাড়িখানাই। বাপ-মায়ের ভিটে।

স্টেশন অবধি হেঁটে গেলে ট্রেন পাওয়া যাবে। বাসও আছে। হাঁটা পথ ধরে কয়েক পা এগোনোর পরই হঠাৎ পিছুটানটা টের পেল নিমাই। বীণাপাণি এখনও ঘুমে অচেতন। জেগে কি কাঁদবে নিমাইয়ের জন্য? না কাঁদুক, একটু কি দাপাবেও না? তেমন দরের বর না হলেও এতকালের সম্পর্ক কি এমন ঠুনকো হয়ে ভেঙে যাবে?

পা ধীর হয়ে এল নিমাইয়ের। একবার ভাবল, দুর ছাই, মরুক গে আত্মসম্মান, বীণার কাছে ফিরেই যাই।

তারপর নিমাই আবার বিজ্ঞ হল। সংযম এল। না, চলে যাওয়াই ভাল। মেয়েমানুষের হাততোলা হয়ে বেঁচে থাকাকে কি বেঁচে থাকা বলা যায়? বড় অপমান হচ্ছিল তার। বড় গঞ্জনা সইতে হচ্ছিল। তার চেয়ে কষ্ট আর বেশী কী আছে?

কতবার চোখের জল মুছল নিমাই তার হিসেব নেই। কতবার বেভুল হয়ে থেমে গেল। কতবার ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে হল। ঘর-সংসার ভেসে গেল তার। ছিড়ল সুতোর বাঁধন। সামনে এক দিশাহারা ভবিষ্যৎ। কে জানে কী হবে?

ক্রমে রোদ উঠল। চারদিক স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠল সোনালি আলোয়। স্টেশন দেখা যেতে লাগল।

চা খাওয়ার বাতিক নেই নিমাইয়ের। কখনও খায়, কখনও খায় না। আজ স্টেশনের চত্বরে একটা দোকানে বসে এক ভাঁড় চা খেল সে। সঙ্গে দুখানা ময়দার বিস্কুট। খেয়ে বাইরের বেঞ্চে অনেকক্ষণ উদাস হয়ে বসে রইল।

এখান থেকেই বাস ধরে পালপাড়া যাওয়া যায়। অনেক বাস। নিমাই তাড়াহুড়ো করল না। পালপাড়া তার জন্য সোনার থালায় ভাত বেড়ে বসে নেই। দু মাস আগে একশটি টাকা পাঠানো হয়েছিল বুড়োবুড়ির কাছে।

সে টাকা কবে উড়ে গেছে। সংসারে এখন হাঁড়ির হাল। খুব দুঃখকষ্টের মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে তাকে। সেটা ধীরে সুস্থে হোক।

বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল নিমাই। সে বড় ভালবাসে বীণাপাণিকে। বীণা ছাড়া জীবন কি এখন থেকেই আলুনি লাগতে শুরু করল? তার হাতে-পায়ে যেন সাড় নেই, বুকে একটুও জোর পাচ্ছে না। বড় ন্যাতানো লাগে যে নিজেকে।

বেলা বাড়ছে বলে জোর করেই একসময়ে উঠে পড়ল নিমাই। বাস ধরল। বাসে বসেই হঠাৎ তার নদেরচাঁদের কথা কেন মনে হল কে জানে।

নদেরচাঁদই বীণাকে যাত্রা দলে নিয়ে এসেছিল। বোধহয় বীণার সঙ্গে একটু আশনাইও হয়ে থাকবে। নদেরচাঁদ মেয়েবাজ মানুষ। তবে কিনা শেষ অবধি নাগালে পায়নি। ফুঁসেছিল কিছু দিন। তারপর অন্য ধান্ধায় লেগে পড়ল। সম্পর্কে একটু দূরের ভাই হয় নিমাইয়ের। অবস্থা ভাল।

পালপাড়ায় বাস থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে ভরদুপুরে সে নিজের বাড়ি না গিয়ে নদের বাড়িতে হাজির হল গিয়ে। বেশ বড় পাকা বাড়ি, ফলন্ত গাছপালা আছে। গোয়াল আছে, গরু আছে। ধানের মরাই আছে। নদের মা সম্পর্কে তার কাকিমা। তার সঙ্গে প্রথমে দেখা।

নিমাই নাকি রে? কী খবর তোদের? অনেক দিন দেখি না।

নিমাই দাওয়ায় বসে একটু দম নিয়ে বলল, এবার থেকে দেখবে। খুব দেখবে। নদে কোথায়?

ছিল তো। দেখ গে ভিতরের ঘরে।

নদে ঘরেই ছিল। জানালার ধারে বসে গোঁফে কেয়ারি করছে। শৌখীন মানুষ।

নিমাইদা যে! খবরটবর কি?

আমি তোর কাছে একটু কাজে এসেছি।

কী বলল তো! বোসো না চেয়ারটায়। হল কী তোমার? মুখচোখ ওরকম দেখাচ্ছে কেন?

নিমাই সামলাতে পারল না নিজেকে। চেয়ারে বসে দু হাতে মুখ ঢাকা দিয়ে আচমকা কেঁদে ফেলল।

আরে দেখ দেখ! হল কি গো নিমাইদা?

নিমাই মাথা নাড়ল শুধু। কিছু বলতে পারল না। তার বুকে অনেক কান্না জমে আছে। টইটুম্বুর। টুসকি লাগলেই চলকে পড়ছে আজ।

ঝগড়া করে এসেছে নাকি বীণার সঙ্গে? না কি অন্য কিছু?

নিমাই জবাব দিল অনেকক্ষণ বাদে। ধরা ফোঁপানো গলায়। বলল, নদে, আমাকে একটা কাজ জোগাড় করে দে। যেমন-তেমন কাজ।

কাজ! বলে নদেরচাঁদ চুপ করে রইল। তারপর বলল, বুঝেছি।

কী বুঝলি?

ঝগড়াই করেছে।

ঝগড়া নয়।

তবে?

সে অনেক কথা। পরে শুনিস।

বাড়ি যাও নিমাইদা। মাথা ঠাণ্ডা করো। তোমার বউ কিন্তু খারাপ মেয়ে নয়।

খারাপ কি বলেছি? বীণা খারাপ নয় তা আমার চেয়ে ভাল কে জানে? খারাপ হল কপাল।

বাড়ি যাও। আমি একটু বেরোচ্ছি। বিকেলে যাবো'খন তোমার বাড়ি। শুনব সব।

ক্লান্ত শ্রান্ত নিমাই উঠল। বলল, যাই।

শ্রীহীন, পড়ো-পড়ো টিনের ঘরের বাড়িতে যখন এসে চুল নিমাই তখনই টের পেল, তার অভ্যাস কত পাল্টে গেছে। তারাও গরিব বটে, কিন্তু এখানে যেন আরও বড় অভাবের বাঘ হানা দিয়ে গেছে।

মায়ের সঙ্গে উঠোনেই দেখা। রোদে বসে কুলোয় করে খুদকুঁড়ো কিছু বাছছে। মাটির দাওয়ায় সিঁড়িতে চাদর মুড়ি দিয়ে বসা তার জরাজীর্ণ বাবা। দৃশ্যটা খানিক দাঁড়িয়ে আগে দেখল নিমাই।

নিমাইকে দেখে মা চোখ কপালে তুলে বলে, ওমা গো! তুই!

এই এলাম একটু।

মায়ের চোখে কি একটা প্রত্যাশা, একটু লোভ চকচক করে উঠল নাকি? বনগাঁ থেকে ছেলে। এসেছে, পকেটে হয়তো মেলা টাকা!

বাবা চোখে ভাল দেখে না। ঘড়ঘড়ে গলায় যেন একটু আহ্লাদ উথলে উঠল, নিমাই নাকি রে! উরেব্বাস, কী কাণ্ড!

কাণ্ডটা যে কী তা নিমাই এদের কাছে প্রকাশ করতে পারবে না। বীণাপাণি এ বাড়ির প্রাণভোমরা। সেই বীণার সঙ্গে ছাড়ান-কাটান হয়েছে শুনলে বুড়োবুড়ি মূর্ছা যাবে।

মা বলল, খাবি তো এবেলা? চালের জোগাড় দেখতে হয় তাহলে।

কেন, চাল নেই?

মা একটু দমিত গলায় বলল, আমরা তো খুদ সেদ্ধ করে জাউ-ভাত খাই। সঙ্গে শাকপাতা, পেঁপে, ধুঁধুঁল সেদ্ধ দিয়ে দিই। সে তুই খেতে পারবি না।

খুব পারব। ওতেই হবে।

বীণাকে আনলি না বাবা?

না মা, সে বাপের বাড়ি গেছে।

ঘরদোরের অবস্থা ভাল নয়। চালের টিন ঝুরঝুর করছে। আগে বেড়ার ঘর ছিল, পরে মেটে ঘর তুলেছিল তারা। মাটির ঘরের পিছনে খিদমত দিতে হয়। লেপা-পোঁছা, মাঝে মাঝে কাদামাটি চাপান দেওয়া। তা সেসব আর মা পেরে ওঠে না। মেলা গর্ত, খন্দ তৈরি হয়েছে দেয়ালে আর ভিটেতে। তাদের বনগাঁর ঘর এর চেয়ে আর একটু ভাল, পয়-পরিষ্কার। তফাতটা দেমাক করার মতো নয়, কিন্তু তফাত একটু আছে।

বেশি কথা কইলে বিপদ। নিমাই আবার পেটে কথা রাখতে পারে না। তাই সে ঘরে এসে ধুতি জামা ছেড়ে গামছা পরে নিল। তারপর লেগে পড়ল ঘরদোর সারতে। সকালের চা আর বিস্কুট পেট থেকে অনেকক্ষণ আগে উধাও হয়ে গেছে। খিদে আঁচড়া-আঁচড়ি করছে পেটে বনবেড়ালের মতো। নিমাই এক ঘটি জল খেয়ে নিল। তারপর লোহার বালতি নিয়ে পুকুরে নেমে পড়ল কাদামাটি তুলতে।

মা বলল, ওরে, করিস কি? হা-ক্লান্ত হয়ে এলি, একটু জিরিয়ে নে। কিছু তো দাঁতেও কাটিসনি বাবা।

দাঁতে কাটার মতো জিনিস যে ঘরে নেই তা নিমাই জানে। চাট্টি মুড়ি খেতে হলেও দোকান থেকে বাকিতে আনতে হবে। নিমাইয়ের পকেটে এখনও কয়েকটা টাকা আছে। কিন্তু বাবুগিরি করে। নষ্ট করা যাবে না। সে বলল, শ্বশুরবাড়ি থেকে আসছি, তারা কি আর খালি মুখে ছাড়ে?।

তোর রোগা শরীর।

শরীর কি বসিয়ে রাখার জন্য মা? ঘরদোরের যা ছিরি হয়েছে, না সারালে তোমরা দেয়ালচাপা পড়ে মরবে যে।

মা শুধু বলল, তা ঠিক। আমরা কি পারি আর ওসব?

নিমাই অবশ্য পারল। অনেক বেলা অবধি বালতি বালতি মাটি টেনে ঘর সারল, উঠোনের চারধার থেকে আগাছা সাফ করল, ঘরদোর উঠোন সব নিকিয়ে ফেলল। তারপর আগুনের মতো খিদে নিয়ে বসল জাউ-ভাত খেতে।

মনে হল, অমৃত কি এর চেয়ে ভাল?

এ সবের ফাঁকে ফাঁকে বুকের মধ্যে কি বিরহের কোকিলটা ডাকেনি? ডাকছে, থেকে থেকে ডাকছে। হু-হু করে জ্বলে যাচ্ছে বুকের ভিতর শুকনো পাতা। বড় মোলায়েম করে ডাকতে ইচ্ছে যাচ্ছে, বীণাপাণি! ও বীণাপাণি!

টপ করে এক ফোঁটা চোখের জল পড়ল হাতের গরাসে। সেটা খেয়ে ফেলল নিমাই। খিদের আগুনে বিরহের আহুতি হোক। জন্মের শোধ আহুতি হয়ে যাক।

বেলা পড়ার আগেই নদে এল।

চলো নিমাইদা, একটু কোথাও গিয়ে বসি।

পালপাড়ায় বসার জায়গা মেলা। তারা গিয়ে মাঠের ধারে ঘাসে বসল।

এবার বলল, বৃত্তান্তটা কী।

নিমাই কিছুক্ষণ থম ধরে থেকে বলে, তুই আমাদের মেলা উপকার করেছিস। তোর জন্যই বীণার একটা হিল্লে হল।

সে আর বেশি কথা কিসের? তোমাকে অত গদ হতে হবে না।

বলি কি, এবার আমারও একটা হিল্লে করে দে।

সে কি কথা গো! শুনলাম যে বনগাঁয়ে তুমি মনোহারী দোকান দেবে।

সে প্রস্তাব ভেসে গেছে। সে আর হবে না।

কেন, হলটা কী?

তোকে সব বলব'খন। তবে কথাগুলো একটু আগে গুছিয়ে নিই। আমি তো ভাল কইতে পারি। হড়হড় করে সব কথা যদি বেরিয়ে যায় তাতে ভাল হবে না। কিছু কথা চাপতে হয়, কিছু ছাড়তে হয়। না গুছিয়ে কি বলতে পারি। কয়েকটা দিন সময় দে।

তা বটে। সকালে কেঁদে ফেলেছিলে, তখনই বুঝেছি ব্যাপার গুরুচরণ।

আমার একটা কাজ না হলেই নয় রে নদে। চেষ্টা করবি?

নদে একটু চিন্তিত হয়ে বলে, কাজ তো মেলা নিমাইদা, কিন্তু সেসব তোমার জন্য নয়। তুমি হলে সাধ মানুষ। মিথ্যে কথা কইবে না, চুরি করবে না, অন্য পথে যাবে না। তোমার জন্য কি এই কলিকালে কোনও কাজ আছে? তবে একটা খবর দিতে পারি তোমায়। ভাল খবর।

কী খবর রে?

তোমার সেই পুরোনো ঠিকাদারবাবু আবার এ তল্লাটে কাজ করছে।

নিমাই অবাক হয়ে বলে, তাই?

কাঁচড়াপাড়ার দিকে কি সব সরকারী ভবন-টবন হচ্ছে। একবার গিয়ে দেখতে পারো।

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, বড় ভালবাসতেন আমায়। কিন্তু এখন কি আর চিনতে পারবেন। তাঁর মেলা লোক-লস্কর, কত জনকে মনে রাখবেন?

গিয়ে একবার পেন্নাম ঠুকে দাঁড়াও সামনে। কিছু হলে হল, নইলে মনে করে নেবে, চেষ্টা তো করেছিলাম, হয়নি তো কি করা যাবে?

খবরটা ভাল। খুবই ভাল। কিন্তু নিমাইকে মনে রাখা শক্ত। সে ছোটোখাটো, রোগাভোগা, ক্ষয়া মানুষ। মনে রাখার মতো চেহারাখানাও তো নয়।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, নিরঞ্জনবাবু তাকে মনে রেখেছেন। পরদিন সকালবেলায় যখন নিরঞ্জনবাবুর কাছে কাঁচড়াপাড়ায় গিয়ে হাজির হল নিমাই তখন নিজের নামধামও বলতে হল না। নিরঞ্জনবাবু তার দিকে চেয়েই বলে উঠলেন, নিমাই না?

নিমাই তাড়াতাড়ি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, যে আজ্ঞে।

বলেই তার চোখে জল এল কৃতজ্ঞতায়।

তা কি করছো এখন?

কিছু নয়। বসে আছি।

বিয়ে করেছিলে না?

আজ্ঞে।

তবে তো সংসার হয়েছে। চলছে কিসে?

নিমাই মাথা চুলকোলো। চোখে ফের জল আসছে।

দৈববাণীই যেন শোনা গেল নিরঞ্জনবাবুর গলায়, কাজ চাও নাকি?

নিমাই মরমে মরে গেল। উনি আসামে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, নিমাই যায়নি। সেই লজ্জা আজ তাকে অধোবদন রেখেছে।

নিরঞ্জনবাবু বললেন, তুমি ধর্মভীরু সৎ লোক। আমি এখানে আরও বছরখানেক কাজ করব। বেশিও হতে পারে। লেগে পড়তে পারো কাজে।

নিমাই নিরঞ্জনবাবুর দিকে চেয়ে জলভরা চোখে ধরা গলায় বলল, আপনার বড় দয়া।

কাঁদছো কেন? কী হয়েছে?

আজ্ঞে, কিছু হয়নি। আমার মনটা বড় দূর্বল। দয়া-মায়া দেখলে চোখে জল আসতে চায়।

পাগল আর কাকে বলে! তুমি একটা দোকান দিয়েছিলে না?

সে টেকেনি।

নিরঞ্জনবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন, চৌকিদারের চাকরি যেমন করার করবে, সঙ্গে আর একটা কাজও করতে পারো। গোডাউনের ধারেই কাজ হচ্ছে। সাইটে একটা চা-বিস্কুটের দোকানও খুলতে পারো। কাল থেকেই লেগে পড়ো কাজে। আগে যা দিতাম তার চেয়ে কিছু বেশিই পাবে। ঢাকার দাম কমছে।

নিজের কানকে, নিজের ভাগ্যকে যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না নিমাইয়ের! কলিকালে সৎ হওয়া হয়তো আহাম্মকি, কিন্তু সে বুকের মধ্যে ওইটুকু পুষে রেখেছিল বলেই নিরঞ্জনবাবুর তাকে চিনতে ভুল হল না। ওইটুকুর জন্যই ফের পুরোনো চাকরি ফিরে এল।

সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে নিমাই আজ কীর্তন করতে বসল। গাইতে গাইতে চোখ ভেসে গেল জলে। ভগবানের নামে কত জয়ধ্বনি দিল সে। এই যে মরতে মরতেও বেঁচে থাকা, এই যে প্রাণপাখি খাঁচা ছেড়ে গিয়েও ফের ফিরে আসে, এটুকুই তাঁর দয়া।

মা বলল, আহা, কী গলাখানা তোর। শুনলে বুক জুড়োয়। গা বাবা, খুব গা।

শোওয়ার আগে আজ ঠাকুরকে উদ্দেশ করে ভক্তিভরে প্রণাম করল নিমাই। বলল, বীণাকে ভাল রেখো ঠাকুর। তার সুমতি হোক।

রাতে তার ঘুমের মধ্যে বিরহের কত ঢেউ যে এসে ভাঙল তার ঠিকঠিকানা নেই। বীণাপাণিকে স্বপ্নে দেখল। কী যে দেখল তা জাগার পর আর মনে রইল না।

সকালে পকেটের টাকা বেশিরভাগই মায়ের হাতে দিয়ে বলল, এ দিয়ে কষ্ট করে কয়েকটা দিন চালাও। আমার কাজ হয়েছে। আর তেমন কষ্ট হবে না।

ওরে, বীণাপাণির খবর কি? তোকে যে কেমনধারা দেখছি।

বললাম তো বাপের বাড়ি গেছে।

সে তো শুনলাম। কিন্তু তুই লুকিয়ে কাঁদিস কেন?

অত খতেন নিও না তো মা। নিমাই রাগ করে বলে।

খতেন নেবো না? ঝগড়া করেছিস নাকি?

না গো, ঝগড়া করার মুরোদ কি আমার? তারটা খাই, তারটা পরি, ঝগড়া করলে চলবে?

তাহলে হল কী?

কিছু হয়নি।

বড় ভয় হয় যে বাবা।

ভয় পেয়ো না। ভগবান এখনও আছেন।

নিরঞ্জনবাবু কিছু আগাম দিলেন। চাকরির পাশাপাশি দিন তিনেকের মধ্যে দোকানটাও ঠুকে দিল নিমাই। চা, বিস্কুট, কোয়ার্টার পাঁউরুটি আর ঘুগনি। লেবারাররা খুব খেতে লাগল দোকানে।

এত সব ঘটে যেতে মাত্র দিন দশেক লাগল। মাত্র দিন দশেক আগেই না এক ভোরবেলা শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে তার মনে হয়েছিল দুনিয়ায় তার আর যাওয়ার জায়গা নেই? চোখের জলে দুনিয়াটাকে ডুবজল করে ফেলেনি নিমাই? ভগবান যে এখন টাকাটা-সিকেটার বৃষ্টি নামিয়ে দিলেন সে কি এমনি?

এগারো দিনের মাথায় পুরোনো খোলটা ভাল করে ছেয়ে নিল নিমাই। সন্ধের পর সেটা ডুগডুগ করে বাজিয়ে, কখনও করতাল নিয়ে কীর্তনে বসে যায়। আজকাল নাম গান করতে তার সহজেই চোখে জল আসে। বুকের মধ্যে বিরহের কোকিলটাও বড় ডাকে। আর বুকের মধ্যেই আরও একটা ব্যাপার হয়। উত্তরে বাতাসে নাড়াবন যেমন আগুনে হু হু করে পুড়ে যায় তেমনি একটা কিছু পোড়ে। বড় জ্বালা।

বীণাপাণি ত্যাগই দিল তাহলে? খবরটাও নিল না তো! নিমাইও খবর করল না। বুকের যেখানটায় সেই রাতে খামচে ধরেছিল বীণা, সেখানটায় যেন আজও ব্যথাটা থাবা গেড়ে আছে।

এই যে নিমাইদা, কেমন খবরটা দিয়েছিলাম তোমায়?

নদে! আয়, বোস।

দুপুরের টিফিনের সময়। দম ফেলার ফুরসত নেই নিমাইয়ের। তবু ভারি কৃতার্থ লাগে নদের কাছে। যত্ন করে এক প্লেট ঘুগনি তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, খা। কেমন হয়েছে বল দেখি।

আর একটু ঝাল দিয়ে কষা করলে খুব জমত।

ওরে, কষা করলে পাঁউরুটি ডোবাবে কিসে? ঝোল না হলে হয়? দেখ না কেমন ডুবিয়ে খাচ্ছে।

তা বটে। তা কেমন হচ্ছে তোমার?

তোর জন্যই হল।

আরও বড় কিছু ধরলে পারতে। ক'টা টাকাই বা হয়।

জিব কেটে নিমাই বলে, এর বেশি চাইতে নেই। আমার তো এতেই মনে হয় রাজা-গজা হলাম। বুঝি। বুড়োবুড়ি চাট্টি খেতে পাচ্ছে, আমারও দুবেলা জুটে যাচ্ছে। আমার মত মানুষ আর কী চায় রে? এটুকু জুটলেই হল।

তোমার দ্বারা কিছু হবে না নিমাইদা। তোমার মনটাই এইটুকুন।

তা বটে। আমিও যে এইটুকুন।

৪৯

তোমার বড় মেয়ের কত বয়স হল তা জানো?

কেন জানব না? উনিশ।

মোটেই নয়, কুড়ি পেরিয়ে একুশ।

বাড়াচ্ছে। কুড়ি পেরোলেও একুশ হয় না, একুশ পূর্ণ হলে একুশ হয়।

বাপদের একটা দোষ কি জানো? ছেলেমেয়েদের বয়স হলেও সেটা স্বীকার করতে চায় না। তুমি হলে সেইসব বাপদের মধ্যে আরও এক কাঠি। আচ্ছা না হয় কুড়িই হল, কুড়িও কি কম?

এসব হিসেব-নিকেশ উঠছে কেন অপু? বিয়ের কথা ভাবছো নাকি?

ভাববো না? তুমি ভাবো না বলেই আমাকে ভাবতে হয়। আমার তো আর তোমার মতো চোখ বুজে থাকার অভ্যাস নয়।

কী সর্বনাশ! তুমি ঝুমকির বিয়ের কথা ভাবছো! আজকাল কি মেয়েদের কুড়িটা কোনও বয়স? তুমি যে গৌরীদানের যুগে ব্যাক করে যাচ্ছো!

পাত্র বাছতে বাছতে কুড়িই বাইশ তেইশে গিয়ে দাঁড়াবে। মেয়ের বিয়ে বলে কথা, আগে থেকে চেষ্টাটা অন্তত শুরু করতে হয়।

মণীশ কিছুক্ষণ অপলক চোখে তার বউয়ের দিকে চেয়ে থেকে বলল, তোমার কথাবার্তা এত প্রবীণা গৃহিণীর মতো হয়ে যাচ্ছে কেন বলল তো! বুড়িয়ে যাচ্ছো নাকি?

অপর্ণা হেসে ফেলল। তারপর মুখটা একটু গম্ভীর করার চেষ্টা করে বলল, অস্বীকার করে লাভ নেই যে, আমাদেরও বয়স হল।

ওভাবে বোলো না অপু। কানে লাগে। এই তো সেদিনও তুমি যুবতীটি ছিলে, আজও আছো। অন্তত আমার চোখে তো অন্যরকম লাগছে না। তবে প্রবীণাটি হলে কবে?

প্রবীণা না হলেও মধ্যবয়স্কা।

তার মানে কি বিগতযৌবনা?

যৌবনের খবর কি আমার রাখার কথা! আমি শুধু জানি আমার ছেলেমেয়ের বয়স হচ্ছে, সংসারের দায়িত্ব বাড়ছে।

একটা কথা বললো অপু। সাজগোজ করে যদি বেরোও তাহলে কি আজকাল পুরুষের অ্যাডমিরেশন পাও না? দু-চার জোড়া মুগ্ধ চোখ কি তোমার দিকে চেয়ে থাকে না?

অপণা রাগ করতে চেষ্টা করল। ভ্রূকুটি করেও হেসে ফেলে বলে, আমি আজকাল সাজি নাকি? পুরুষদের লক্ষ করতেও আমার বয়ে গেছে।

একটু লক্ষ কোরো অপু। যদি দেখ যে, পুরুষের চোখ এখনও তোমাকে লক্ষ করছে তাহলে নিশ্চিতভাবে জেনো, তোমার যৌবন যায়নি।

যে-পুরুষটিকে নিয়ে আছি সে লক্ষ করলেই হল। আর আমার কাউকে চাই না।

আমার চোখ তো ভুল চোখ। সেই যে ট্রামগাড়িতে ভয়ে আধমরা যুবতীটিকে দেখেছিলাম, চারদিকে টিয়ার গ্যাস, গুলি আর ট্রামের মধ্যে পড়ে থাকা লাশের ভয়ংকর অবস্থায়, দেখেই আমার ভিতরে যে একটা উথাল-পাথাল হয়েছিল, আজও তোমাকে দেখলে ঠিক সেরকমটি হয়। কহ, পাল্টাওনি তো তুমি! আমার চোখে তোমার বয়স বাড়ে না, যৌবন যায় না। তাই বলছি আমার চোখ হল ভুল চোখ।

ভুল চোখই তো। তোমার চোখে আমার বয়স বাড়ে না, ছেলেমেয়ের বয়স বাড়ে না।

মেয়ের বিয়ের কথা উঠছে কেন বলো তো!

দেখতে থাকা ভাল। বয়স হয়ে গেলে আর ভাল পাত্র পাবে না।

না অপু, তুমি সেজন্য বলছে না।

তবে কেন বলছি?

রাত্রে শশাওয়ার আগে বিছানায় দুজন পাশাপাশি আধশোয়া। গায়ে পাতলা কম্বল। একটু বাদেই বেড সুইচ টিপে আলো নিবিয়ে দেবে অপর্ণা। তার আগে দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে আছে। নির্নিমেষ।

মণীশ হঠাৎ বলল, তুমি আমার হার্ট অ্যাটাকের কথা ভেবে বলছো না তো? হয়তো ভাবছো, আমার অনিশ্চিত আয়ু, তাই তাড়াতাড়ি ঝুমকির বিয়েটা দিয়ে দেওয়া ভাল। তাই ভাবছো অপু?

ভারি বিব্রত বোধ করে অপর্ণা। বলে, যাঃ! ওকথা কেন ভাববো? কী যে যা-তা বলল না!

কিন্তু অপর্ণা নিজের অপ্রস্তুত মুখটাকে লুকোতেও পারে না। মণীশের অনিশ্চিত হৃদযন্ত্রের কথা ভেবে ভেবেই যে আজকাল বেশীর ভাগ সিদ্ধান্ত নেয়। এটাও নিয়েছিল।

বাড়ি করার কথা বলবে না অপু?

বাড়ি! হঠাৎ বাড়ি কেন?

তোমার যে চার কাঠা জমি কেনা আছে। আমি বেঁচে থাকতে থাকতে সেখানে একটা বাড়ি করে ফেল। এখনই শুরু করলে আমি হয়তো বাড়িটা দেখেও যেতে পারি।

বেড় সুইচ টিপল না অপর্ণা। মণীশের দিকে খানিকক্ষণ অপলক চেয়ে থেকে বলল, আমাকে কাঁদাতে চাও? বউয়ের চোখের জল বুঝি খুব ভাল লাগে?

বলতে বলতেই অপর্ণার চোখ ভরে উঠল জলে। মণীশ সেদিকে চেয়ে রইল, কিন্তু একটুও উদ্বেল হল না। তার মুখখানা ক্লান্ত, বিমর্ষ, আনমনা। একটু ধরা গাঢ় স্বরে বলল, তুমি বাস্তববাদী অপু। ঠিকই ভাবো। কিন্তু তোমাকে আজ বলি, আমি কিন্তু তোমার চেয়েও বেশি ভাবি। আমার বউ আর তিনটে অপোগণ্ড বাচ্চাকে আমি কার জিম্মায় নিয়ে যাবো।

অপর্ণার ফোঁপানির শব্দ শুনতে পাচ্ছিল মণীশ। অন্য সময়ে হলে সে অস্থির হত। সে কারও কান্না সহ্য করতে পারে না। আজ বাধা দিল না। চিত হয়ে শুয়ে সিলিঙের দিকে চেয়ে বলল, আমি প্রভিডেন্ট ফান্ডের লোনের জন্য একটা দরখাস্ত দিয়েছি। বাড়ির প্ল্যান করার জন্য একজন আর্কিটেক্টের সঙ্গে একটু কথাও হয়েছে।

অপর্ণা কান্নার মধ্যেই বলল, চুপ করো।

কেঁদো না অপু। তোমার কথাটা আমি অন্যভাবে ধরিনি। নিজের মৃত্যুর কথা আমি তো সবসময়ে ভাবি।

অপর্ণা হঠাৎ তার গলা জড়িয়ে ধরে হেঁচকির মতো শব্দ করে বলে, কেন ভাববে? কত লোক তো হার্ট অ্যাটাকের পরও অনেকদিন বেঁচে থাকে। তুমি কেন থাকবে না?

বেঁচে থাকতে তো আমার আপত্তি নেই অপু। বাঁচলে তো ভালই। কিন্তু হার্ট যখন বিগড়ে বসেছে তখন তাকে বিশ্বাস করা কি ঠিক হবে? আমি বাড়িটাই আগে করে ফেলতে চাই। ঝুমকির বিয়ে নিয়ে তত মাথাব্যথা নেই। কিন্তু তোমাদের নিরাশ্রয় করে যাওয়াটা অপরাধ হবে।

আবার ওসব বলছো?

তোমার জমিটা আমার পছন্দ ছিল না। কিন্তু মনে হয় তুমি খুব বুদ্ধিমতীর কাজই করেছে।

আর বোলো না। চুপ করো, পায়ে পড়ি।

মণীশ নিজেই বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে বলে, ভাবাবেগ নিয়ে বসে থাকা তো ঠিক নয় অপু। তুমি কাঁদছো কেন? তুমি তো জানো আমি কিরকম ফুর্তিবাজ হুল্লোড়বাজ মানুষ। যতক্ষণ বেঁচে আছি হাসি-খুশি-মজা নিয়েই তো বাঁচতে চাই। কিন্তু সেটা ইদানীং হচ্ছে না। ভবিষ্যতের চিন্তা এসে পড়ছে। কেবল ভাবছি তোমাদের কী হবে। প্রিয়জন মারা গেলে প্রথমটায় শুধু তার অভাবের জন্য হাহাকার হতে থাকে। কিন্তু সেই কষ্টটা বেশীক্ষণ থাকে না। তারপরে আসে অবশ্যম্ভাবী হিসেব নিকেশ। আমাদের জন্য লোকটা কতখানি রেখে গেল, আমাদের কতটা নিয়ে গেল। তখন শুরু হয় লোকটার বিচার।

তোমার মুখের কি কোনও আগল নেই? তুমি কি জানো তোমার প্রত্যেকটা কথা আমার বুকে এসে লাগছে?

কেন জানব না? তবু তোমাকে শক্ত হতে বলি। আমি আগে পয়সা ওড়াতে ভালবাসতাম। একটু বড়লোকী করতে ভাল লাগত। আজকাল দেখ না কত হিসেবী হয়েছি? আমার অপরয় অ6 চিরকাল অপছন্দ করতে। আমি আজকাল ভাবি, তুমিই ঠিক।

অপর্ণা মণীশের বুকের মধ্যে নিজেকে এগিয়ে দিয়ে বলল, প্লীজ! ঘুমোও।

মণীশের শিথিল একখানা হাত আলতো জড়িয়ে রাখল অপর্ণাকে। আলিঙ্গন করল না। মণীশ চাপা স্বরে বলল, হার্টের একটা ধাক্কা আমার জীবন-দর্শনটাই পাল্টে দিয়ে গেল। মৃত্যটা কী জিনিস বলো ত অপু! তোমাদের ছেড়ে আমি কোথায় যাবো? তোমাদের ছাড়া আমি যে কিছু ভাবতে পারি না।

অপর্ণা মণীশকে প্রগাঢ়ভাবে চুমু খেল। চেষ্টা করল তাকে যৌন আবেগে অন্যমনস্ক করার। কিন্তু পারল না। মণীশ আজ বিষন্ন, আনমনা। মণীশকে আজ ভূতে পেয়েছে।

মণীশ অপর্ণাকে কোমলভাবে নিরস্ত করে বলে, আমার মৃত্যুর ঠিক পরের অবস্থাটা নিয়ে আমি খুব চিন্তা করি অপু। আমি মরে গেলে তোমরা খুব কাঁদবে, পাগলের মতো হয়ে যাবে শশাকে। আমার মৃতদেহ নিয়ে

যেতে দেবে না, খাট ধরে পড়ে থাকবে তুমি...

অপর্ণার হাত এসে মুখটা চাপা দিল মণীশের। অপর্ণা ফের নতুন করে কেঁদে উঠল, ও কথা কি করে বলছো তুমি? এমন করে কেউ বলে?

শোননই না। এ শুধু কথার কথা তো নয়। জীবনের সত্যগুলোর মুখখামুখি হবে না অপু? শুধু

ভয় পেলে, শুধু কাঁদলেই কি হবে?

চুপ করো! চুপ করো! আর বোললা না।

শোনো অপু, নিষ্ঠুর সত্যটার কথা শোনো। তোমাদের শোক খুব সত্য। আমার জন্য তুমি কাঁদবে, ঝুমকি-বুবক-অনু কাঁদবে। বাড়িটা ভীষণ ফাঁকা হয়ে যাবে। সব সত্য। কিন্তু শোকের পাথর বুকে চাপা দিয়ে কতদিন থাকবে তোমরা? একদিন চোখের জল মুছে উঠতে হবে তোমাদের। ঘর-গেরস্থালিতে চোখ ফেরাতে হবে। দিনের পর দিন কাটতে থাকবে। শশাক কমতে থাকবে। ধীরে ধীরে বাড়িটা আর তত ফাঁকা লাগবে না। সব সময়ে আমার কথা আর মনে পড়বে না। শোক তো পুকুরে ঢিল। ধীরে ধীরে ঢেউ মরে যায়। আবার নিথর হয়ে যায় জল। এ বাড়িতে, এ সংসারেও তেমনি ধীরে ধীরে আমার অভাবটাও তোমাদের অভ্যাস হয়ে যাবে। ছেলেমেয়েরা বড় হবে, ওদের সংসার-টংসার হবে, ছেলেমেয়ে হবে, তোমার হবে নাতি-নাতনী। আমি তখন নেই হয়ে যাবো। শুধু স্মৃতি। তাই না অপু?

অপর্ণা উঠে বসে খোঁপা ঠিক করতে করতে বলল, আমি ঝুমকির কাছে শুতে যাচ্ছি। তুমি একা। থাকো। এরকম অসভ্য লোকের সঙ্গে আমি থাকতে চাই না।

দু'হাতে অপর্ণাকে ধরে ফেলে মণীশ নিজের বুকে টেনে নেয় তাকে। বলে, শোনো, আমার কথা শেষ হয়নি এখনও।

তুমি ভীষণ খারাপ লোক। আগে জানলে তোমাকে আমি বিয়েই করতাম না।

মণীশ হেসে ফেলে। তারপর অপর্ণকে একটু আদর করে বলে, মরার কথা বলছি বলে রাগ করছো কেন? মৃত্যুচিন্তা তো খুবই স্বাভাবিক। এই চিন্তাই তো মানুষকে জীবনের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। ধরো আমাদের যদি মৃত না থাকত, যদি আমরা কেউ বুড়ো অথর্ব না হতাম, হাজার হাজার বছর যদি এরকমই থাকতাম তাহলে কি সেটা ভাল হত? বড় একঘেয়ে হয়ে যেত না কি? এহ থে আমাদের বাইশ বছরের বিবাহিত জীবনের সুখ, এটা কি বাইশ হাজার বছর টিকিয়ে রাখা সম্ভব হত অপু? আমরা দুজনে কি দুজনকে বাইশ হাজার বছর সহ্য করতে পারতাম!

ঘন হয়ে মণীশের বুকে লেপটে থেকে অপণা বলল, পারতাম। আমি পারতাম।

মণীশ একটু হেসে বলল, নিষ্ঠুর সত্য হল, পারতাম না। কেউ পারতাম না। জীবনটা ক্ষণস্থায় বলেই কিছুটা সুন্দর। মৃত্যটা কী তা আজ অবধি কেউ জানে না অপু। মৃত্যুর পরও কি আম একটু-নি থাকব? আত্মা হয়ে? তৃত হয়ে? যেমন ভাবেই হোক আমি একটু থাকতে চাই। যদি ভূত হই তাহলে এ বাড়িতে তোমাদের কাছাকাছিই এসে থাকব। নিশুত রাতে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে ঘুরে তোমাদের দেখব, আদর করব।

উঃ মা গো! তুমি বোধহয় মানুষ খুন করতেও পারো। আমার বুকের ভিতরটা কেমন করছে ওসব শুনে! ছাড়ো তো আমাকে, ছাড়ো! আমি কিছুতেই তোমার কাছে থাকব না।

তোমাকে ছাড়া কাকে এসব কথা বলব বলল তো! আর কে আমার এসব আবোল-তাবোল শোনার জন্য বসে আছে? এক বুক কথা জমে থাকে, একজন কাউকে তো বলতে হবে! তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার?

এসব বুঝি ভাল কথা?

ভাল নয়, কিন্তু আমার যে এখন এইসব কথাই মনে হয়। মরতে আমার একটুও ভয় নেই, কিন্তু কষ্ট আছে। মনের কষ্ট।

অপর্ণা দু'হাতে বেষ্টন করে মণীশকে। সোহাগে ভরা গলায় বলে, তুমি মরবে কেন? এসব ভেবো না। তোমাকে আমি ঠিক বাঁচিয়ে রাখব। আমার ইচ্ছের জোর আছে। আমার ভালবাসারও জোর আছে।

কী হয় জানো! আজকাল পৃথিবীকে বড় সুন্দর লাগে। তোমাদেরও যেন বেশী করে ভাল লাগে। এতকাল হেলাফেলা করে যখন বেঁচে থাকতাম তখন পৃথিবীর এত রূপ চোখেই পড়ত না।

প্লীজ! আর নয়। একদিনে অনেক বলেছো। রাত বাড়ছে। তোমার যে ঘুম দরকার।

ঘুমের কথাই তো হচ্ছে। টানা লম্বা চিরনিদ্রা। আমার ঘুমোতে ইচ্ছেই করে না আজকাল। ইচ্ছে করে যতক্ষণ পারি জেগে থেকে পৃথিবীটা ভাল করে দেখে নিই।

তোমার সঙ্গে আজ কথাই তো বলতে পারছি না। ঝুমকির বিয়ের কথা তুলেই মস্ত ভুল করে ফেলেছি।

না, ভুল করোনি। বিয়ে দেওয়া যে দরকার তা আমি জানি। কিন্তু কোনটা আগে, কোনটা পরে তা স্থির করাটাই এখন জরুরী।

কী বলছো?

বলছি, আমার হাতে কতটা সময় আছে তা যখন জানি না তখন দেখতে হবে কোন কাজটা আগে করা দরকার, কোনটা পরে হলেও চলবে। আমি প্রথমেই বাড়িটা করে ফেলতে চাই। বুঝলে?

আজ অনেক খারাপ খারাপ কথা বলেছে। তবু তার মধ্যে এই একটা কথা যা শুনতে ভাল লাগছে। আমাদের একটা বাড়ি দরকার। ভাড়ার বাড়িতে থাকতে আমার একটুও ভাল লাগে না। পার্মানেন্ট কিছু না হলে একটা টেনশন থাকেই।

মণীশ একটু হেসে বলে, শুনলে তুমি রাগ করবে। কিন্তু জমির দলিল কখনও মন দিয়ে পড়েছো?

কেন বলো তো!

দলিলে পরিষ্কার লেখা থাকে জমিটা তোমার নয়। সরকারের। তোমাকে কেবল ভোগ দখলের স্বত্ব দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর এক ছটাক জমিও তোমার নিজের নয়। আবার দেখ, জমিটা কি সরকারেরই! তাও নয়। কারণ, একদিন, অনেক অনেক বছর পরে পৃথিবীর সব সৃষ্টি যখন ধ্বংস হয়ে যাবে, পৃথিবী যখন একটা ঠাণ্ডা অন্ধকার গ্রহে পরিণত হবে তখন কোথায় সরকার, কোথায়ই বা তার অধিকার? পার্মানেন্ট কথাটাকে বিশ্বাস কোরো না অপু। আমরা কেউ কোথাও কখনোই পার্মানেন্ট নেই।

তুমি আজ বড় জ্বালাচ্ছো তো!

তোমার মনটা খুব খারাপ করে দিলাম তো!

তা তো দিয়েছোই। আমার কান্না দেখতে তুমি বরাবর ভালবাসো।

আচ্ছা, ক্ষমা করে দাও।

ক্ষমা কি এত সহজ? আমার মনটা এমন ভেঙে দিয়েছো যে আর কিছুতেই ভাল হবে না। শুধু যদি অনেক আদর করো আর অনেক ভাল ভাল কথা বলো তাহলে হয়তো একটু ভাল লাগবে।

মণীশ শুধু আর একটু জড়িয়ে নিল অপর্ণাকে। তার বেশী কিছু করল না। তেমনি বিমান মাখানো গলায় বলে, শুধু এইটুকুর জন্যই কি জীবন?

আবার মাথা গরম হল বুঝি?

না। আমার মাথা খুব ঠাণ্ডা। কিন্তু ভেবে দেখ তো, মানুষ জন্মায় কেন? এই জন্মের উদ্দেশ কী?

কিছু একটা তো আছেই।

একটা মানুষ জন্মায়, বড় হয়, লেখাপড়া শেখে, রোজগার করে, বিয়ে হয়, সন্তান হয়, টাকা জমায়। বাড়ি করে, তারপর বুড়ো হয়ে মরে যায় ব্যাপারটা অদ্ভুত না?

কেন, অদ্ভুত কিসের?

শুধু এসবের জন্য তার জন্মানোর দরকারটা কি? তার চৈতন্য, বুদ্ধি, বিচারবোধ, এক্সপ্রেশন এসব তো কাজেই লাগে না। তার অস্তিত্বটা একদম একটা ফালতু ব্যাপার বলে মনে হয় না তোমার?

আমি কি তোমার মতো ভাববার সময় পাই?

ভাবো না কেন অপু? ভাল করে ভেবে দেখো তো, এই সামান্য অর্থহীন ক্রিয়াকর্মের জন্য। আমাদের জন্মানোর সত্যিই কি জরুরী প্রয়োজন ছিল? জন্মটাকেই আমার আজকাল কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে ইচ্ছে করে। জন্মালাম কেন অপু? এই জীবনটা যে বড্ড অর্থহীন। সম্পূর্ণ মিনিংলেস। ভেবে দেখ তো, সত্যিই এর কোনও অর্থ আছে!

আমার কিন্তু আবার কান্না পাচ্ছে।

কান্নাটা কোনও সলিউশন নয়। আমি তোমার কাছে একটা সলিউশন চাইছি।

আমার কাছে সলিউশন চাইছো! আমি কি একটা সাঙ্ঘাতিক জ্ঞানী লোক।

মণীশ একটু হেসে বলে, জ্ঞানীরাই কি পারে? তারাও তো হাতড়ে মরছে। প্রাণের রহস্য ভেদ করা কি অত সোজা?

তারাই যদি না পারে তাহলে আমি পারব কি ভাবে?

কে যে জানে তাই তো জানি না। কার কাছে যাবো অপু? কে বুঝিয়ে দেবে এই অর্থহীন জীবনের প্রকৃত মানে?

আচ্ছা, আরও লক্ষ লক্ষ লোক তো আমাদেরই মতো বেঁচে আছে। আছে তো! তারা কি এত মাথা ঘামায় এ নিয়ে?

তাই কি আমাকেও মাথা না ঘামাতে বলছো?

বলছি। ওসব ভাবলে তোমার শরীর খারাপ হবে।

মানুষ যদি মাথা না ঘামাত তাহলে পৃথিবীর কোনও সত্যই আবিষ্কার হত না অপু। প্রশ্ন, কেবল প্রশ্ন করে করেই না মানুষ এত জেনেছে। কিন্তু জানা আরও কত বাকি। সবচেয়ে ভাইটাল প্রমথ হল, এই জন্ম কেন? কেন এই বেঁচে থাকা?

তোমাকে কি আজ রাতেই সব জানতে হবে?

প্রশ্নটা কত সিম্পল দেখ, কত প্রাসঙ্গিক। কিন্তু জবাবটা নিয়েই যত মুশকিল।

এবার ঘুমোও। পায়ে পড়ি।

আজ কি আমার ঘুম আসবে?

ও মা গো! ঘুম না হলে যে ভীষণ খারাপ হবে। তুমি তো ট্র্যাংকুইলাইজার খেয়েছো! ঘুমের ওষুধ খেয়ে না-ঘুমোনো ভীষণ খারাপ।

তাহলে আর একটা খাই। কিন্তু ঘুমটা চটে গেছে।

ইস্! আমার যে ভয় করছে!

ধুস! ভয়ের কিছু নেই। শরীরটা প্রকৃতির দান। তাতে সবরকম রক্ষাকবচ দেওয়া আছে। অত ভয় পেও না।

আমারই ভুল। আমার মাথা কুটতে ইচ্ছে করছে। কেন যে মেয়ের বয়সের কথা তুলতে গেলাম।

কথাটা তুমি না তুললেও কি আমি ভাবি না ভেবেছো? সবসময়ে ভাবি, আমার কত কী করার আছে, কত দায়িত্ব আমার মাথার ওপর। তার মধ্যে ঝুমকির বিয়ের কথাও যে মনে না হয় তা তো নয়। তুমি কথাটা তুলে কিছু ভুল করোনি অপু।

তোমাকে আর ঝুমকির বিয়ের কথা ভাবতে হবে না। ও মেয়ের বিয়ে দিলে তুমি থাকতে পারবে না। ছেলেমেয়ে তোমার চোখের মণি তা আমি জানি।

তবে কথাটা তুললে কেন?

ঝুমকির কি বিয়ের ইচ্ছে হতে নেই? আমাকে যখন বিয়ে করে এনেছিলে তখন তো শ্বশুরমশাইয়ের মনের খবর নাওনি।

তোমার আমার কথা আলাদা। এখন বলল তো, ঝুমকির কি বিয়ের ইচ্ছে হয়েছে?

তা আমি কি জানি?

তবে যে বলছো ঝুমকির ইচ্ছে হয়েছে!

মেয়েটা তো একটা আস্ত পাগল। বাবাকে সাহায্য করবে বলে হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজছে।

বিয়ের পর প্রথম প্রথম তাদের সারা রাত কেটে যেত গল্প আর ভালবাসার নানা প্রকাশে। আজ বহু দিন বাদে তারা প্রায় ভোর রাত অবধি জেগে রইল। তারপর ঘুমোলো। দুজনের বাহুপাশে বাঁধা হয়ে দুজনে। বহুদিন বাদে। মৃত্যুর ছায়া সাপের মতো দুলতে লাগল শিয়রে। অনিশ্চিত ওই আক্রমণকারী না থাকলে কি এত ভালবাসা হয়?

তিন দিন বাদে বাড়ির প্ল্যান নিয়ে এল মণীশ।

অপু! শীগগির এসো। বুবকা, ঝুমকি, অনুকে ডাকো। বাড়ির প্ল্যান এনেছি।

সে এত হাঁকডাক করতে লাগলেন যেন প্ল্যান নয়, বাড়িটাই বয়ে নিয়ে এসেছে। "দ্যাখো, দ্যাখো" বলে সে সবাইকে ডেকে বাড়ির প্ল্যান বোঝাতে লাগল। প্ল্যানটা বেশ বড়লোকী। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের জন্য আলাদা ঘর এবং আলাদা স্টাডি। মণীশ আর অপর্ণার শশাওয়ার ঘর যদিও একটাই, তবু তাদের আলাদা ড্রয়িং রুম আছে। মোট ছখানা বাথরুমের ব্যবস্থা করেছে মণীশ, তার একটা ঝি-চাকরদের জন্য। ইনডোর গেম এবং জিমন্যাসিয়াম, মিউজিক রুম ইত্যাদিও রয়েছে।

প্ল্যান দেখে অপর্ণা চোখ কপালে তুলে বলে, তুমি ভেবেছোটা কী? আমরা কি কোটিপতি?

আহা, নিজের বাড়ি বলে কথা। এটুকু না হলে আরামে থাকা যায় নাকি?

এটুকু? এটাকে এটুকু বলে? যা প্ল্যান করেছে তাতে আমার চার কাঠাই খেয়ে নেবে। লংকা গাছ, লাউ গাছ লাগাবো কোথায়?

মণীশ খুব দমে গেল; বলল, তাহলে! পছন্দ হয়নি তোমার?

আহা, কেমন বাচ্চাদের মতো অভিমান করছে দেখ। পছন্দ হবে না কেন? কিন্তু আমরা তো আর রাজাগজা শেঠিয়া নই। আমাদের এত বড় বাড়ির দরকার নেই তো! বড় বাড়ি মেনটেন করার খুব কষ্ট। ঘরদোর ঝাড়পোঁছ করবে কে বললা তো? ঝি তো পাঁচশো টাকা চাইবে।

কেন, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার কিনব।

উঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না। আমরা হচ্ছি বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবার। অত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে আমাদের ভালও লাগবে না। যে যার নিজের ঘরে একা একা থাকলে কি ভাল লাগে? আমরা আর একটু ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকব।

ঝুমকি, বুবকা, অনু তিনজনেই সমস্বরে বলে উঠল, তাদের আলাদা আলাদা ঘরই চাই। প্রাইভেসি চাই।

অপর্ণা রাগ করে বলে, এত বড় বাড়ি করতে কত টাকা লাগবে জানিস তোরা? বাপটাকে কি মারতে চাস?

৫০

ভাঙুনে নদীর ধারে বাড়িঘর করতে আছে বাবু? কাজটা ভাল হল না।

এ কি ভাঙুনে নদী?

আগে তো খুব ভাঙত। আজকাল আটবাঁধ দেওয়া হয়েছে। এখন ভাঙছে না বটে, তবে এ বিশ্বাস কি?

আমার যে এ জায়গাটাই পছন্দ!

পছন্দের কী আছে! গাঁ-গঞ্জ জায়গা, গরিব দেশ। শখে শখে কিনলেন বটে, কিন্তু টেকা দায়। হবে।

কেন, এখানকার লোকে কি খুব খারাপ?

বাঁকা মিঞা মাথা চুলকে বলল, খারাপ ভাল নিজেই বুঝে দেখুন। গগন দাস দামখানা কি কম। নিল? ঠারেঠোরে আপনাকে কত বললাম, বিশ হাজারের একটি পয়সাও ওপরে উঠবেন না। এ জমির দাম হাজার দশেক হলেই ঢের। তা আপনার তখন বাই চেপেছে, শুনলেন না। গগন দাস। চেপে বসে রইল। ত্রিশ হাজারটা বড় বাড়াবাড়ি দাম হয়ে গেল কিন্তু। একখানা মোটে ঘর আর তিন কাঠা জমির অত দাম হয়? গলাখানা বাড়িয়ে দিলেন বলেই না গগন কোপখানা দিল। খালধারে মহলের জমিটা কত সরেস ছিল, নিলেন না। দামটাও পড়তায় এসে যেত।

বাঁকা মিঞা বুঝবে না, কোনও কোনও জমির দাম শুধু টাকার নিরিখে হয় না। এইখানে নদী একখানা পেল্লায় বাঁক মেরেছে। বাঁকের একেবারে মুখে জমিখানা। আদিগন্ত থৈ থৈ করছে জল। নদীর দিকটায় একখানা দাওয়া ফুটিয়ে নিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাবে শুধু চেয়ে থেকে। নদী কখনও ক্লান্ত করে না, একঘেয়ে হয় না। হু হু করে পাগুলে হাওয়া বয় এইখানে। যদি ঝড় আসে তবে এইখানে বসে ঝড়ের আদিগন্ত রূপ দেখা যাবে। উথালপাথাল নদী, পাক খাওয়া মেঘ আর জলপ্রপাতের মতো বৃষ্টি। গগন দাস দু'পাঁচ হাজার টাকা বেশী নিয়ে থাকলেও হেমাঙ্গ সটাকে ক্ষতি বলে মানে না। টাকা তো কাগুজে ভড়ং, কী দাম তার?

হেমাঙ্গ বাঁকা মিঞার দিকে তাকিয়ে বলে, একখানা বাথরুম করে দিতে পারবে?

বাঁকা মিঞা একটু হাসল, চাইলে পারব না কেন? তবে কলের জল তো পাবেন না। সে বন্দোবস্ত নেই। ডিজেল পাম্প বসালে অবশ্য হয়। তাহলে আবার ওপরে জলের ট্যাংক করতে হয়। অতটা করবেন কি?

না না, অত শহুরে ব্যাপার করলে মজাটাই মাঠে মারা যাবে। বালতির জলেই চলে যাবে। তবে একটা ঘেরা জায়গা না হলে আমার অস্বস্তি হয়।

হয়ে যাবে। মেঝেটা বাঁধিয়ে নেবেন। নইলে এখানে মা মনসার বড় উৎপাত। মেটে ভিটি। হলেই গর্ত হবে। তেনারা সেঁধিয়ে বসে থাকবেন। পাকা মেঝে হলে খানিকটা নিশ্চিন্ত।

হেমাঙ্গ একটু বিবর্ণ হয়ে বলে, তাই করো।

বছরে ক'দিন থাকবেন?

মাঝে মাঝে চলে আসব। সারা বছর তুমিই দেখেশুনে রাখবে।

বাঁকা মিঞা একটা অসন্তোষের শ্বাস ছাড়ল। সে গাঁয়ের মাতব্বর লোক। গগন দাসের ঘরটা হেমাঙ্গ কেনায় সে খুশি হয়নি। না হওয়ারই কথা। জমি কতটা সরেস নিরেস তা বুঝবার মতো বিষয়ী বুদ্ধি তার হেমাঙ্গর চেয়ে কিছু বেশীই আছে। একটু আড়াআড়িও আছে গগন দাসের সঙ্গে।

কিন্তু হেমাঙ্গ খুশি। এইখানে সে এখন দু'দিন থাকবে। নদীর মুখোমুখি। একা। আপনমনে। কাজের জঞ্জাল থাকবে না, শহুরে সমস্যা থাকবে না। বেশ থাকবে সে।

গগন দাসের মাটির ঘরখানা যথেষ্ট মজবুত। চালে নতুন টিন লাগানো হয়েছে। একখানা চৌকি ও বিছানার ব্যবস্থাও হয়েছে। টাকায় কি না হয়? বেশ কয়েক বছর আগে হেমাঙ্গদের কয়েকটা ট্রাক ছিল। সেগুলো ক্যানিং অবধি ট্রিপ মারত। সেই ট্রাকগুলোর একটা চালাত বাঁকা মিঞা! ট্রাকের ব্যবসাটা ভাল চলেনি। পরে সেগুলো বিক্রি হয়ে যায়। কিন্তু বাঁকা মিঞার সঙ্গে সম্পর্কটা রয়ে গেছে। বাদা অঞ্চলের লোক। বিচক্ষণ এবং বিষয়ী। এখন ক্যানিং-এ তার একখানা দোকান আর। এই গাঁয়ে চাষবাস। দোকান ছেলেরা দেখছে। বাঁকা মিঞা গাঁয়ে মাতব্বর হয়ে বসে একটু-আধটু পলিটিক্স করছে। হেমাঙ্গর কেন এই গাঁয়ে একটা বাড়ি করার দরকার হল তা গত সাতদিন মাথা ঘামিয়েও বাঁকা মিঞা বুঝতে পারছে না। তবে সাহায্য করছে।

আজ রাতে হেমাঙ্গ এখানেই থাকবে জেনে নিজের লোক ডাকিয়ে এনে ঘরদোর সাফ করিয়ে নিকিয়ে দিয়েছে। জল তুলিয়েছে। দুপুরে মাছভাত খাইয়েছে, রাতেও খাওয়াবে।

বিকেলের আলো এখনও যথেষ্ট আছে। লালচে হয়ে এসেছে বটে, তবু আদিগন্ত ফটোগ্রাফের মতো দেখা যাচ্ছে। সামনেই ভটভটির ঘাট। বাঁ দিক থেকে একটা খাল এসে বড় গাঙে মিশেছে। ঘাটে গোটা দুই ভ্যান রিক্সা দাঁড়ানো, সওয়ারি নেই। ইটে বাঁধানো সরু রাস্তার দু'পাশে কয়েকটা দীন চেহারার দোকান ঘর। আর একটু ভিতরপানে এগোলে মানুষের অনাড়ম্বর ঘর-গেরস্থালি।

বাদায় কি মানুষ থাকে? আমরা হলাম জানোয়ার।

হেমাঙ্গ মুগ্ধ চোখে নদীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ওই খালটার ওপারে তার ফিয়াট গাড়িটা গঞ্জের ঘাটে এক দোকানের সামনে পার্ক করা আছে। দুটো দিন পেট্রল আর ডিজেলের গন্ধ নাকে আসবে না। শ্বসবায়ুর জন্য পরিষ্কার বাতাস পাওয়া যাবে। আর হয়তো বা পাওয়া যাবে শহুরে। নানা টানাপোড়েনে খণ্ডবিখণ্ড হেমাঙ্গর ছিন্ন অংশগুলি। নিজেকে জুড়ে নেওয়া খুবই জরুরী এখন।

জানোয়ার! না, জানোয়ার হতে যাবে কেন?

তা নয় তো কী বলুন! এখানে মনিষ্যির জীবন আছে আমাদের? বাদার লোকের জন্য কে ভাবে বলুন। সরকারের তো মাথাব্যথাই নেই।

পলিটিক্স বুঝুক না বুঝুক-বাঁকা মিঞা সবসময়ে অন্যায় অত্যাচার অবিচার ইত্যাদি নিয়ে কথা বলতে ভালবাসে। কথা শুরু হলে থামতে চায় না। হেমাঙ্গর এখন সে সবে দরকার নেই। সে এখন একা হতে চায়।

চুপচাপ হতে চায়।

সে বলল, তুমি এসো গিয়ে বাঁকা। আমি ঘরে বসে জিরোই।

তা জিরোন। চা খাবেন কখন?

না হলেও হয়।

না হবে কেন? ভূষণের দোকানে বলে দিয়ে যাচ্ছি, যখন হাঁক মারবেন ঘরে পৌঁছে দিয়ে যাবে। রাতের দিকে একটু সজাগ থাকবেন, চোর আসে।

আমার সঙ্গে দামী কিছু নেই।

প্যান্টখান শার্টখানা তো আছে। কম্বল আছে, ঘড়ি আছে। চোরের তো বাছবিচার নেই। যা পাবে নিয়ে যাবে। তার লাভ না হোক, আপনার তো ক্ষতি।

ঠিক আছে, সজাগ থাকব।

পাকা বাঁশের একখানা লাঠি পাঠিয়ে দেবোখন, পাশে রেখে ঘুমোবেন। টর্চ আছে তো!

আছে।

তাহলে আপনি জিরোন গিয়ে। রাতে খাওয়ার সময় ডেকে নিয়ে যাব।

বাঁকা বিদেয় হলে ঘরে এসে বিছানায় বসল হেমাঙ্গ। বড় নতুন আর অদ্ভুত এক অনুভূতি হচ্ছে। তার। নিঝুম সম্মোহনের মতো কিছু একটা ঘনিয়ে উঠছে তার চারদিকে। জলের অবিরল কলকল শব্দ সৃষ্টি করছে রোমাঞ্চ। কাঁপের জানালাটা খোলা। সেইটে দিয়ে তাকালে নদীর প্রসার চোখে পড়ে। এখানে বড় গাঙ খুব চওড়া। কিছুক্ষণ বিছানায় আসনপিড়ি হয়ে বসে নদীর দিকে চেয়ে থাকে হেমাঙ্গ। নদী তার বড় প্রিয়। নদীর দিকে চেয়ে থাকলে তার ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়।

বেলা আর একটু মরে এলে সে ঘরের বাইরে এসে তার তিন কাঠার সম্পত্তিটা ভাল করে আবার দেখল। চারদিকে বাঁশের নতুন বেড়া দেওয়া হয়েছে। গগন দাসের শখ আহ্লাদ বিশেষ ছিল না। কয়েকটা গাদা গাছ লাগিয়েছিল, তাতে মরকুটে ফুল ফুটেছে। একখানা নারকোল গাছ আছে। আর কিছু আগাছা। গগন দাস এখানকার বাস তুলে বসিরহাট চলে গেল গুড়ের ব্যবসা করতে।

হেমাঙ্গকে দেখছিল আরও কয়েকজন। গুটিকয়েক বাচ্চা ছেলেমেয়ে আর একটা বউ-মানুষ। বেড়া ঘেঁষে যে মেটে রাস্তাটা আছে তার ওপাশে একটু ঢাল। সেইখানে তারা দাঁড়িয়ে। কলকা এক বাবু এ গাঁয়ে ঘর কিনেছে —এটা একটা খবরের মতো খবর। হেমাঙ্গর একটু লজ্জা হল। মা ঘরে এসে ফের কিছুক্ষণ নদী দেখল। অনবরত ভটভটি, নৌকো আর লঞ্চের গতায়াত। কত কাজে কত মানুষ কত দিকে যায়, আসে।

এখানে শীত বেশ চড়া। হাওয়াটা কনকন করছে বড়। হেমাঙ্গ জানালার ঝাঁপ ফেলে দিল। কিছুক্ষণ শুয়ে রইল চুপচাপ। এমন কাজহীন, ব্যস্ততাহীন সময় কি করে কাটাতে হয় তা সে এখনও শেখেনি। সময় লাগবে।

গত একমাস তার মন ভাল নেই। সে উদ্বিগ্ন, অশান্ত। তার একা এবং সুখী জীবনে কিছু একটা হানা দিচ্ছে। যেন কড়া নাড়ার শব্দ পাচ্ছে হেমাঙ্গ। সে চাক না-চাক ঘটনাটা হয়তো ঘটেই যাবে।

এটা ঠিক যে, হেমাঙ্গ চায় না। অন্তত তার মস্তিষ্ক চায় না। তার বোধ-বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে সে। প্রত্যাখ্যান করতে চায়। কিন্তু বুকের ভিতর কেন তবু একটা দুর্বলতা-রপথও তৈরি হচ্ছে?

মাসখানেক আগে শনিবারের এক সকালে টেলিফোন এল, কী করছেন আজ?

কোনও প্রোগ্রাম করিনি তো!

আমি একটু এলে কি কিছু মনে করবেন? আমার একটা কথা আছে।

হেমাঙ্গর বুক নানা আশঙ্কায় একটু দুরুদুরু করে উঠল। কিন্তু বলতেই হল, আসুন।

রশ্মির আসতে ঘণ্টা খানেক লাগল। বোধহয় সাজগোজের জন্য। এমনিতে কখনও তাকে সাজতে দেখেনি হেমাঙ্গ। সেদিন খুব ঝলমলে রেশমী শাড়ি পরেছে, চোখে বোধহয় কাজল বা সূর্মা জাতীয় কিছু। কিন্তু ভাল করে তাকাতেই পারছিল না হেমাঙ্গ। তার বুক বিট্রে করছিল। একটু শ্বাসকষ্টও কি? কিছু একটা উথলে উঠছিল বুকের ভিতরে? ওই হেমাঙ্গকে তো সে চেনে না।

এ কী! পোশাক পরেননি যে এখনও? শীগগির করুন।

হেমাঙ্গ অবাক হয়ে বলে, আমার কি কোথাও যাওয়ার কথা?

ওঃ, বলিনি বুঝি? আজ যে আমাদের বাড়িতে আপনার ভীষণ নেমন্তন্ন।

আগে বলেননি তো!

মুখটা একটু করুণ করে রশ্মি বলল, সেটা আমার দোষ নয়। নেমন্তন্ন যিনি করেছেন দোষটা। তাঁর।

কে করছেন নেমন্তন্ন?

আমার মা। কিন্তু মা ভীষণ ভুলো মনের মানুষ। নেমন্তন্ন করবেন বলে ভেবেছেন, প্রিপ্যারেশনও নিচ্ছেন, কিন্তু আসল কাজটাই করতে ভুলে গেছেন। ভুলটা আজ সকালে ধরা পড়ল। মা ভীষণ লজ্জায় আছেন। আপনি কি কিছু মনে করবেন?

না। বলে হেমাঙ্গ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ব্যাচেলরদের তো মতামতের দাম নেই। আর নেমন্তন্ন খেতে আমি পছন্দও করি। কিন্তু এখন তো সকাল নটাও বাজেনি। এখনই কি?

নেমন্তন্নটা ব্রেকফাস্ট থেকে শুরু হবে যে। একদম সেই ডিনার অবধি।

ও বাবা!

সেইজন্যই তো বলছিলাম ভীষণ নেমন্তন্ন। সহ্যশক্তির পরীক্ষা। আর শুনুন, ব্যাচেলর বলে কেউ আপনাকে কিন্তু বেশী অপমান করছি না। মায়ের ভুলো মন বলেই এই বিপত্তি।

একটু কাহিল মুখে হেমাঙ্গ বলে, ব্রেকফাস্টটা স্কিপ করলে হয় না? আমার যে সকালে খাওয়ার অভ্যাস বিশেষ নেই।

তাই কি হয়? পারফেক্ট ইংলিশ ব্রেকফাস্ট তৈরি হচ্ছে দেখে এসেছি। শুধু আপনার জন্যই। ব্রেকফাস্টের পরই একটা আউটিং আছে। খাওয়া-দাওয়া সেখানেই।

কোথায় বলুন তো!

ডায়মন্ডহারবার রোডে। ঠাকুরপুকুর ছাড়িয়ে মাইল দুই গেলে একটা স্পট আছে। খুব সুন্দর একটা বাগানবাড়ি।

শুনে ভিতরটা অনিচ্ছেয় ভরে গেল। সেই বাগানবাড়ি, সেই ফিস্টির মতো বিচ্ছিরি ব্যাপার, হয়তো বা সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত বা তাস খেলার ব্যবস্থা, হয়তো মদের বোতল। সবচেয়ে বড় কথা নানা রঙের, হরেক চরিত্রের একগাদা লোক, দেঁতো হাসি, সাজানো সাজানো কথা।

শঙ্কিত হেমাঙ্গ জিজ্ঞেস করল, বনভোজন নয় তো!

কয়েকজন থাকবে। আপনার অসুবিধে হবে তাতে ?

না। অসুবিধে আর কি ?

আপনি যে বেশী হুল্লোড় পছন্দ করেন না তা আমি জানি। বেশী লোককে বলাও হয়নি। কিছু ক্লোজ রিলেটিভকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। দশ বারোজন। প্লীজ, তৈরি হয়ে নিন।

নিচ্ছি। কিন্তু আপনি একটু বসুন। এক কাপ কফি খান। এর আগে একদিন তো ধুলো-পায়ে বিদায় নিলেন।

রশ্মি বসল। মিষ্টি হেসে বলল, চা বা কফিতে আমি কিন্তু চিনি খাই না।

এই ছুটির দিনটায় এরকমভাবে হুল্লোড়ে বেরোতে একটুও ভাল লাগছিল না হেমাঙ্গর। কিন্তু রশ্মি—রশ্মিই তাকে টানছে। ভীষণ টানছে। কফি করতে করতে এই সত্যটা হঠাৎ টের পায় সে। সারা দিন ভিড়ের মধ্যেও রশ্মির সুন্দর মুখখানা মাঝে মাঝে দেখা যাবে—সেই লোভ ফণা তুলছে। ভিতরে। সে কি ব্রতভ্রষ্ট হচ্ছে? সে কি কামুক বা সংসারমুখী হয়ে যাচ্ছে? সে কি প্রেমে পড়েছে ?

এই চিন্তাই তাকে অস্থির করে তুলল।

কফি খেতে খেতে আচমকা রশ্মির আর একটা প্রশ্নও অগাধ জলের দিকে ঠেলে দিল তাকে। রশ্মি খুব মৃদু লাজুক গলায় হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, ইংল্যান্ড জায়গাটা আপনার কেমন লাগে?

ইংল্যান্ড! কেন, ভালই তো।

কতটা ভাল ?

খুব ভাল। জিনিসপত্রের দাম একটু বেশী এই যা।

আমি সে কথা জানতে চাইছি না। ইংল্যান্ডে যদি সেটল্ করতে হয় তাহলে কেমন লাগবে আপনার?

হেমাঙ্গ একটু শিহরিত হয়। তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে মাথা নেড়ে বলে, ভাল লাগবে না।

কেন?

নিজের দেশ ছাড়া আমার কোথাও ভাল লাগবে না। আমি একটু হোম-সিক।

ইংল্যান্ডে থাকারও একটা আলাদা চার্ম আছে। আপনি তো মাত্র কিছু দিন ছিলেন। বেশী দিন থাকলে বুঝতে পারতেন।

গলাটা সামান্য বিষন্ন শোনাল কি রশ্মির? কানের ভুলও হতে পারে। খুব সংকোচের সঙ্গে হেমাঙ্গ বলল, হঠাৎ ইংল্যান্ডের কথা বললেন কেন?

রশ্মিও খুব সংকুচিত হয়ে বলল, এমনিই।

অজানা আশংকায় বুকের মধ্যে অস্থিরতাটা একটু বেড়ে গেল হেমাঙ্গর।

রশ্মি কফির কাপটা রেখে বলল, কখনও তেমন দরকার হলেও ইংল্যান্ডে সেটল করতে পারবেন না?

বিস্ময়ের একটা ভান করতে হল হেমাঙ্গকে। বলল, ইংল্যান্ডে সেট করার কোনও দরকার হবে কেন তাই তো বুঝতে পারছি না। কেউ তো আমাকে ডাকাডাকি করছে না ইংল্যান্ড থেকে!

যদি করে ?

হেমাঙ্গ এ প্রশ্নটার কোনও নিষ্ঠুর জবাব দিতে পারল না। রশ্মির অসাধারণ মুখশ্রী অবলোকন করতে করতে স্তিমিত গলায় বলল, আগে তো ডাকুক। সেখানেই কত লোক বেকার বসে আছে।

আমি শুধু যদি-র কথা বলছি। যদি ডাক পান, যাবেন ?

হেমাঙ্গ বুঝতে পারছে, তার সঙ্গে রশ্মির যে খোলামেলা হাসি-ঠাট্টার সম্পর্কটা ছিল সেটা হঠাৎ বদলে গেছে। দুজনেই কিছু সংকোচ বোধ করছে। একটা সূক্ষ্ম লজ্জার পর্দা দুজনের মাঝখানে বার বার উড়ে আসছে। রশ্মি যে আর এক বছরের মধ্যেই স্থায়ীভাবে ইংল্যান্ডে চলে যাবে তা জানে হেমাঙ্গ। হেমাঙ্গকে কে ডাকবে তাও সে বুঝতে পারছে। চারুদিদি কী যে অঘটন ঘটিয়ে দিল!

নেমন্তন্নটাও ছিল খানিকটা অদ্ভুত। হেমাঙ্গর বুঝতে অসুবিধে ছিল না যে, নেমন্তন্নের মধ্যমণি সেদিন ছিল সে-ই। রশ্মির মা ব্রেকফাস্ট থেকেই তার ওপর অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে শুরু করলেন। রশ্মির রাশভারী বাবা অবধি তার সঙ্গে বেশ কয়েকটা প্রাসঙ্গিক কথা বলে ফেললেন।

বাগানবাড়িতে জড়ো-হওয়া আত্মীয়স্বজনরাও সেদিন সব ফেলে তার ওপর মনোযোগ দিতে লাগল। বহুকাল এরকম ভি আই পি ট্রিটমেন্ট পায়নি সে। সবাই যেন তটস্থ, অতি অমায়িক, অতি সতর্ক। আর চারদিক থেকে জোড়ায় জোড়ায় কৌতূহলী চোখ তাকে বিদ্ধ করল সেদিন।

এমন অস্বস্তির মধ্যে যে আর কখনও পড়েনি। ভাল খাদ্যবস্তু তার অতিশয় প্রিয়। কিন্তু সেদিন। সে খাবারের স্বাদগন্ধ বুঝতেই পারল না মানসিক উদ্বেগে। শুধু লক্ষ করল, লোকজনের সামনে রশি তার কাছে বেশী আসছে না, কথাও বলছে না। কিন্তু দূর থেকে মাঝে মাঝে তাকে চেয়ে দেখছে।। এক-আধবার তারা দুজনে দুজনের দিকে বেশ কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে চেয়েও রইল।

এক ফোঁটা মদও খায়নি হেমাঙ্গ, তবু যখন বাড়ি ফিরল তখন যেন টলোমলো অবস্থা। সে নয়, তার ভিতরটার অচেনা হেমাঙ্গ গলায় একটা ফাঁস আটকে বসে আছে।

সেই রাতেই ফোন করল চারুশীলা, এই গবেট, কেমন হল আজকের পিকনিক?

তোকে পিকনিকের কথা কে বলল?

আমার স্পাই আছে। বল না কেমন হল।

ভালই।

শুধু ভাল? আর কিছু নয়?

পিকনিকের মধ্যে আবার আর কিছু কি থাকবে?

তোকে কি সাধে গবেট বলি! তবু তরে গেছিস।

তার মানে?

যদিও তুই একটি আস্ত হাঁদারাম আর চূড়ান্ত অপদার্থ, তবু কি করে যে পার পেয়ে যাস সেটা। ভেবেই অবাক হই। বোকা আর অপদার্থদের জন্যই বোধহয় ভগবান খেটে মরেন।

হেমাঙ্গ গম্ভীর হয়ে বলে, ব্যাপারটা কী খুলে বলবি?

অনেকবার বলেছি। এরপরও না বুঝলে বুঝতে হবে তোর মাথা একদম নিরেট। কি করে সি এ। পাশ করলি রে? সি এ পড়তে বুঝি মগজ লাগে না?

বেশীই লাগে। সে কথা থাক। ব্যাপারটা কী ছিল?

ওদের সবারই তোকে দারুণ পছন্দ।

ওরা কারা?

রশ্মির মা বাবা আত্মীয়স্বজন। ওরাও আমাদের মতো একটু ক্ল্যানিশ। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে খুব ভাব-ভালবাসা।

আমাকে পছন্দ করার ওরা কে?

কেন, তুই-ই বা এমন কে যে পছন্দটাও করা যাবে না তোকে?

কথা ঘুরিয়ে দিস না। আসল কথাটা কী?

আহা, ন্যাকা! সবই তো বুঝিস, তবে অত বোকা সাজছিস কেন? রশ্মির মা বাবার আগেই পছন্দ। হয়েছিল। আজ আত্মীয়রাও দেখল। তাতে কি দোষ হয়েছে?

দোষী জানে না কী দোষ তাহার, বিচার হইয়া গেল? আমাকে পছন্দ করছে, কিন্তু আমার মতামতটাও তো নেওয়া দরকার।

তোর আবার অমতের কথা ওঠে কেন? ওরকম পাত্রী পাচ্ছিস সেই তোর ভাগ্য। তাই তো। বলছিলাম, বোকাদের জন্য ভগবান আছেন।

বিয়ে আমি করছি না।

অত তড়পাতে হবে না। রশ্মিকে দেখলে তো চোখ দিয়ে নাল গড়ায়। বিডন স্ট্রিটে খবর হয়ে গেছে। বিয়ে করবি কি না করবি সেটা মামা বুঝবে। তোর ইচ্ছেয় সব হবে নাকি?

ইয়ার্কি করিস না চারুদি। আমার ব্যাপারটা ভাল লাগছে না।

রশ্মিকে তোর পছন্দ নয়?

রশ্মির কথা উঠছে কেন?

উঠবারই কথা কিনা। ওরকম মেয়ে লাখে একটা পাওয়া যায় না, তা জানিস? অমন চেহারা, ফিগার, কোয়ালিফিকেশন একসঙ্গে পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা?

কথা এই পর্যন্তই হয়েছিল। সে রাতে হেমাঙ্গ ভাল করে ঘুমোতে পারল না।

পরের সপ্তাহের শনিবার রশ্মিই ফোন করল। রাত দশটার পর। প্রথম প্রশ্নটাই চমকে দিল তাকে।

কী করছো?

বিস্মিত হেমাঙ্গ আমতা আমতা করে বলে, টিভি দেখছি।

একটু কথা বলল আমার সঙ্গে।

কথা! বলে স্তব্ধ হয়ে গেল হেমাঙ্গ। ও তাকে ‘তুমি’ করে বলছে, তারও কি বলা উচিত? গলা ঝেড়ে হেমাঙ্গ বলল, তোমার বুঝি ঘুম আসছে না?

না। হঠাৎ তোমার কথা মনে হল। একটু কথা বলবে? প্লীজ!

কী বলব বলল তো!

যা খুশি। আবোল-তাবোল।

হেমাঙ্গর মন বার বার ব্রেক কষছে। এগোতে পারছে না। কথা হারিয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে, বুদ্ধি ও বিবেচনার বিরুদ্ধে এ সে কোন আবেগে ভেসে যাচ্ছে?

৫১

নিমকহারাম শব্দটাই বারবার মুখে উঠে আসতে চাইছে। এই লোককেই না বীণাপাণি মরণের। হাত থেকে উদ্ধার করে এনেছিল? তার পাঠানো টাকাতেই না আজও প্রতিপালন হয় ওর বাপ-মা? তার পয়সাতেই না ও দিনের পর দিন ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং তুলে বসে বসে খায়? মুখের একটা কথায় রাত না পোয়াতেই বিয়ে করা বউকে ছেড়ে চলে গেল! গেল তো যাক! বীণাপাণিও জীবনে আর ওর মুখ দেখবে না।

সকালে ঘুম ভেঙে বিছানাটা খালি দেখেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল তার। নিমাই রোজই খুব ভোরে উঠে পড়ে। বাইরে-টাইরে খুটখাট কাজ করে। তাই ঘর খালি দেখে চমকানোর কিছু ছিল না। কিন্তু কখনও কখনও মনটা যেন কু গেয়ে ওঠে। বীণাপাণি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারল না। বাপের বাড়ি বলে কথা, জামাই চলে গেছে জানলে একটা সোরগোল উঠবে হয়তো। একটু খুঁজে দেখল, নিমাই তার সামান্য জামা আর ধুতি নিয়ে যায়নি। পরনে যা ছিল, তাই নিয়েই গেছে। পয়সাকড়িও ছোঁয়নি। তবে সে যে বিদেয় হয়েছে তাতে সন্দেহ ছিল না বীণাপাণির। সে টের পাচ্ছিল। ঘরে একটা খাঁ-খাঁ ভাবই জানান দিচ্ছে সে কথা।

আজ বীণা কাঁদল না। তার জ্বলুনি হচ্ছিল বুকে। নিমকহারাম! নিমকহারাম! মুখচোখ স্বাভাবিক রেখে সে বেরোলো। পুকুরঘাট গেল। ফিরে এসে বাসি কাপড় ছাড়ল। তারপর রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে বসে বলল, মাথাটা ধরে আছে। একটু চা দাও তো মা।

নয়নতারা জামাইয়ের জন্য হালুয়া আর রুটি তৈরি করছিল। বলল, দিই। জামাইকে ডাক তো, রুটি ক'টা গরম গরম খেয়ে নিক।

বীণা ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবল। তাহলে মাও টের পায়নি! অবশ্য পাবেই বা কী করে? নিমাই কি কাউকে বলে গেছে? তেজ করে বোধ হয় রাত থাকতেই রওনা দিয়েছে। বে-আকেলে তোক, দরজা ভেজিয়ে রেখে গেছে। চোর-টোর আসতে পারত।

চোরের চিন্তাতেই হঠাৎ চমকে ওঠে বীণাপাণি। আসতে পারত কেন? এসেছিল কিনা তাই বা কে জানে! ডলার-পাউন্ডের প্যাকেটটা ছিল বালিশের তলায়। আছে তো?।

প্রায় পাখির মত উড়ে ঘরে এল বীণা। বালিশ উল্টে দেখল। প্যাকেট আছে। বুকটা হঠাৎ এত ধকধক করছিল যে বলার নয়।

আবার রান্নাঘরে এসে বসতেই নয়নতারা বলল, অমন হুড়ুম করে কোথায় গিয়েছিলি?

একটা জিনিস দেখে এলাম। হ্যাঁ মা, এখানে চোর-ছ্যাঁচড়ের উপদ্রব কেমন গো?

আছে মা, ভালই আছে। তবে আমাদের বাড়িতে আছেটাই বা কি? নেবেই বা কি? কিন্তু জামাই কোথায় গেল?

সকাল থেকে জামাই-জামাই করছো কেন? তাকে আমি একটা কাজে পাঠিয়েছি।

নয়নতারা অবাক হয়ে বলে, কোথায় পাঠালি আবার! আমি যে জলখাবার করে বসে আছি।

খাওয়ার লোক আছে মা। সে একটু বনগাঁয়ে গেছে।

বনগাঁ! বলে হাঁ করে থাকে নয়নতারা, হঠাৎ গেল কেন?

বললাম তো কাজ আছে।

তা কখন ফিরবে?

ফিরবে না।

দেখ কাণ্ড! কই, কালও তো কিছু বলিসনি!

বললাম তো, হঠাৎ একটা জরুরি দরকার পড়ে গেল।

জামাই নেই শুনে নয়নতারা ভারি হতাশ হয়েছে। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি সকাল থেকে রান্নাবান্নার জোগাড় করছি। নিমাই কচুর শাক খেতে ভালবাসে বলে এই ডাঁই কচুর শাক কেটে এনেছি। কী হবে এখন?

বীণা মুখ গোমড়া করে বলে, বলেছি তো, কিছুই ফেলা যাবে না। কচুর শাক ভারি তো একটা জিনিস!

সকালটা এভাবে পাশ কাটানো গেল। একটু বেলায় বারান্দায় যখন বাবাকে গম্ভীর আর দুঃখী মুখে বসে থাকতে দেখল, বীণা তখন কাছে গিয়ে ডাকল, বাবা!

বিষ্ণুপদ মেয়ের দিকে চোখ ফিরিয়ে একটু দেখল, তারপর বলল, আয়, বোস এসে এখানে। কিছু বলবি?

তুমি সারাক্ষণ একদৃষ্টে ওই ঘরখানার দিকে চেয়ে কী দেখ বাবা?

বিষ্ণুপদ ম্লান একটু হেসে বলে, ঘরখানা আর শেষ করতে পারল না রামজীবন। একটু করে হয়, আবার থেমে থাকে। তাই দেখি চেয়ে চেয়ে।

কাছটিতে এসে মাটির ওপরেই বসে পড়ল বীণা। বলল, তাই বা দেখার কী?

বিষ্ণুপদ মৃদু স্বরে বলল, ওটার মধ্যে মানুষের একটা লড়াই আছে যে। মানুষ কত চেষ্টা করে, সব কি হইয়ে তুলতে পারে? খানিকটা হয়, খানিকটা হয় না। চেয়ে চেয়ে দেখি। আমার আর কী। দেখার আছে বল!

বীণাও ঘরখানার দিকে চেয়ে ছিল। অনেকটা উঠেছে। ছাদ ঢালাই বাকি। ভারার বাঁশ এখনও বাঁধা আছে, তাতে শ্যাওলা ধরেছে, পচেও গেছে অনেকটা। বীণা জানে, মেজদা যদি মদ-টদ না খেত, তাহলে হয়তো হয়েও যেত ঘরখানা। এই ঘরখানা নিয়ে মেজদা আর সেজদায় তুমুল ঝগড়া বেঁধেছে, তার খবরও বীণা পেয়েছে মায়ের কাছে।

বীণা হঠাৎ বলল, এ বাড়িতে কি আমার ভাগ আছে বাবা?

বিষ্ণুপদ আনমনা ছিল। জবাবটা দিল একটু দেরিতে, আছে।

ভাগ হলে আমি কতটা জমি পাবো?

পাবি খানিকটা। কেন রে, থাকবি এখানে এসে?

থাকি না থাকি, একখানা ঘর তুলে রাখতে পারলে হয়।

কেন, বনগাঁ তোর ভাল লাগে না?

তাও লাগে।

আর পালপাড়া? সেখানে কেমন লাগে?

বীণা একটু মাথা নিচু করে থাকে। তারপর বলে, সেখানে অভাব ছাড়া আর কিছু নেই বাবা। সংসারটা যেন এক পেট খিদে নিয়ে বসে আছে।

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, মরে গেলে আর খিদেও থাকে না, তেষ্টাও থাকে না।

বীণা অবাক হয়ে বলে, হঠাৎ মরার কথা কেন বাবা?

বিষ্ণুপদ একটু যেন অপ্রস্তুত হল। বলল, বলছি কি, খিদেটা হল বেঁচে থাকার লক্ষণ। খিদে পায় মানে বেঁচে আছে।

তুমি মাঝে মাঝে বড় অদ্ভুত কথা বলো বাবা। ভয় করে।

ওরে না, ভয় পাওয়ার মতো কথা নয়। মাঝে মাঝে বেবাক ভুল হয়ে যায়। বেঁচে আছি, না মরে গেছি। মাঝরাতে স্বপ্ন-টপ্ন দেখলে ওরকম হয়। তখন খিদে পেলে বা বাহে পেচ্ছাপের বেগ হলে বুঝতে পারি—না, বেঁচেই আছি। তাই বলছিলাম।

বীণা ফিকে একটু হাসল, তোমার মাথায় সব উদ্ভট চিন্তা।

বিষ্ণুপদ নির্বিকারভাবে বলে, ওই ঘরখানার কাছে আমি কত কিছু শিখি!

ঘরের কাছে শেখো! সে কী গো বাবা! ঘরের কাছে আবার শিখবে কি? তোমার মাথাটাই গেছে।

তাও গেছে। মাথাটা চিরকালই গবেট। এ মাথা দিয়ে কিছু করতে পারলাম না মা।

দুঃখ পেলে বাবা? ওভাবে বলিনি।

ওরে না। দুঃখ-টুঃখ আজকাল আর তেমন হয় না। ওসব পার হয়ে এসেছি। এখন শুধু চারদিকটা চেয়ে চেয়ে দেখি। আগে যা সব দেখেও দেখতে পেতাম না, এখন তা পাই। সময় দিব্যি কেটে যায়।

বীণাপাণির ঘোর সন্দেহ হতে থাকে, তার বাবার মাথায় একটু ছিট দেখা দিয়েছে। বরাবরই একটু যেন ছিল, এখন বেড়েছে।

আমার কথা তোমার মনে হয় বাবা?

বিষ্ণুপদ ঘরখানার দিকে চেয়ে ছিল। বলল, হয়। সকলের কথাই মনে হয়। মনে-হওয়া নিয়েই তো আছি। এখন তোর কথা আরও বেশী মনে হয়।

কেন বাবা?

বিষ্ণুপদ চোখ না ফিরিয়েই বলে, নিমাইকে ধরে রাখতে পারলি না! মা!

বীণা একটু চমকে উঠল, ধরে রাখব মানে! তাকে তো একটা কাজে পাঠিয়েছি।

বিষ্ণুপদ নিরুত্তেজ গলায় বলে, তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। অন্ধকারেই বেরিয়ে যাচ্ছিল, ডেকে বসিয়ে কথা কইলাম। তারপর টর্চ ধরে এগিয়ে দিলাম বটতলা অবধি। বড় দাগা পেয়েছে।

বীণা কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বলল, কি কথা হল?

সব কি মনে আছে! নানা কথাই হচ্ছিল।

এড়িয়ে যেও না বাবা। কী বলে গেল তোমাকে?

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, নিমাই কাঁদছিল।

বীণা পুরুষের কান্না সহ্য করতে পারে না। কান্নার কথায় তার রাগ হল। ঝাঁঝের গলায় বলল, ভ্যাত-কাঁদুনে পুরুষ দু চোখে দেখতে পারি না। কী বলে গেল তোমাকে? ডেকে তুলেছিল নাকি ঘুম থেকে?

না। আমার মাঝে মাঝে বায়ু চড়ে যায়। তখন বারান্দায় এসে বসে থাকি। হঠাৎ শুনলাম তোদের ঘরে দরজা খোলার শব্দ। তারপরই নিমাইয়ের কান্নার শব্দটা পাই। ডেকে বসালাম।

আমার নামে অনেক কুচ্ছো গেয়ে গেছে, না?

বিষ্ণুপদ যেন শঙ্কিত চোখে একবার মেয়ের দিকে তাকিয়ে নিল। তারপর ফের চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, তোমার বিয়েটা যে ভাল হয়নি মা, তার জন্য আমিই দায়ী। তুমি যদি আজ আমাকে খুব বকাবকি করো, গালাগাল দাও, তাতে যদি তোমার বুকটা ঠাণ্ডা হয়, তো তাই করো মা।

ও কথা কেন বলছো বাবা! তোমাকে বকব কেন! আমারও কি কপালের লিখন বলে কিছু নেই?

কপালের কথা আজকাল আমার তেমন বিশ্বাস হয় না। কর্মফলে হয়। মানুষ মোটাবুদ্ধির হলে বড় ভয়ের কথা। সে যে কত অকাজ করে ফেলতে পারে! আমার মতো আহাম্মক নেই।

কথা ঘুরিয়ে ফেলছে কিন্তু বাবা। বলতে চাইছো না।

নিমাই তোর নামে বানিয়ে কিছু বলেনি। সে তেমন লোক নয়। সেও হয়তো আহাম্মক, কিন্তু পাজি নয়।

পাজি নানা রকমের হয়। তোমার জামাই আমার জন্য কী করেছে বলো তো! অন্য মেয়ে হলে কবে ছেড়ে চলে যেত। আমিই যে পেলে-পুষে রেখেছিলাম ওকে! শুধু ওকেই বা কেন, ওর। বাপ-মা কার পয়সায় খেয়ে-পরে আছে বলো! তার এই প্রতিদান?

বিষ্ণুপদ একটু ভেবে নিয়ে বলল, তুই কি যাত্রাদলে অনেক টাকা মাইনে পাস?

না বাবা। কিন্তু কষ্ট করে হলেও তো পাঠাই!

তোকে কত করে মাইনে দেয়?

তার কি কিছু ঠিক আছে! পালা যখন চলে তখন কিছু বেশী দেয়, যখন পালা থাকে না, তখন তিনশো-চারশো, যখন যেমন হয়। তবে কাকা লোকে ভীষণ ভাল। যাত্রা তার প্রাণ। আর আমাকেও খুব দেখে। তাই বেঁচে বর্তে আছি।

তুই কি এখন পালা ছাড়াও অন্য কাজ করে দিস?

দিই বাবা। কাকার টাকাপয়সার জিম্মা আর হিসেব রাখি। এ কাজটা তোমার জামাইয়ের করার কথা ছিল। সে পাপের টাকা বলে কাজটা নেয়নি। আমি নিয়েছি। কলিযুগে বেঁচে থাকা ছাড়া আর কোন ধর্ম আছে বলল! ধর্ম ধুয়ে কি জল খাবো?

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, ঠিকই কথা।

ধর্ম ধরে বসে থাকলে কোথায় তলিয়ে যেতাম তার ঠিক নেই। তোমার জামাই কথাটা বুঝতে চায় না। কেবল কোনটায় ধর্ম হল, কোনটায় অধর্ম হল, তাই বিচার করে মরছে। অথচ ফুটো পয়সার মুরোদ নেই।

তাই কি কাল ওকে বকেছিলি?

না বাবা। সব তুমি জানো না। তোমার জামাই তোমাকে কী বলেছে কে জানে! তবে তার জবানিতে শুনেছো, এবার আমারটাও শোননা। আমার কাছে কিছু বিদেশি টাকা আছে। চুরিও করিনি, জোচ্চুরিও করিনি।

একজন গচ্ছিত রেখেছিল। সে খুন হয়ে যায়। তার কোনও ওয়ারিশ নেই। এখন বলো টাকাটা আমি কাকে ফেরত দেবো? যারা টাকাটা চায় তাদের কারোই ওটা হকের টাকা নয়। তাহলে কি আমার অধর্ম হল নাকি? টাকার গায়ে কি কারও নাম লেখা আছে?

তা বটে।

তুমি আমার কথাটা বুঝতে পারছো বাবা?

পারছি। টাকা কি অনেক?

তা, খারাপ হবে না। ডলারের দাম ওঠে পড়ে। রোজ একরকম থাকে না।

কাঁচা ঘরে থাকিস, তোর চোর-বাটপাড়ের ভয় নেই?

নেই আবার! খুব আছে! সেইজন্যই তো তোমার কাছে গচ্ছিত রাখতে চেয়েছিলাম। রাখবে বাবা?

রাখলে তোর সুবিধে হবে?

হবে বাবা। বনগাঁয়েই তো বেশী ভয়। সেখানে ওই টাকা নিয়ে ধুন্ধুমার হচ্ছে। একটা পাজি লোক জেনেও গেছে। সেটা তোমার জামাইয়ের দোষেই। যদি বলে দেয় তো আমার ওপর হামলা হতে পারে।

বিষ্ণুপদ একটু হাসল।

হাসছো কেন বাবা?

টাকাটা কত হতে পারে তাই ভাবছি।

হিসেব করিনি। তবে আমাদের কাছে অনেক।

আরও খুন হয়েছে নাকি?

হয়েছে। কিন্তু কোনওটাই তো আমার দোষে হয়নি। আমি তো টাকাটা চুরি করিনি। তোমার জামাই তোমাকে উল্টো বোঝায়নি তো!

না। এরকমই যেন বলছিল।

তাহলে বাবা? টাকাটা রাখবে তোমার কাছে?

গচ্ছিত থাকলেই কি হয়? টাকা রক্ষা করার সাধ্যি কি আছে?

তার মানে?

টাকা রক্ষা করা এক মস্ত দায়। আমার বয়স চলে গেছে, মাথা কাজ করে না, চারদিকে সব লোভী চোখ। আমার কাছে কি রাখতে আছে? মোটাবুদ্ধির কাজ হবে না!

তাহলে কী হবে বাবা?

মাথা ঠাণ্ডা করে খানিক ভাব। টাকার সঙ্গে অনেক বিপদ-আপদ লেগে থাকে। ওগুলোই টাকার ময়লা।

আমার যে বনগাঁয়ে ওই টাকা নিয়ে যেতে ভরসা হয় না।

বনগাঁ থেকে তাহলে বাস উঠিয়ে দে। পালপাড়ায় গিয়ে থাক।

তুমি যে কী বলো না, তার ঠিক নেই। বনগাঁ ছাড়লে মাসকাবারি মাইনে কে দেবে শুনি?

সেটাই তো কঠিন প্রশ্ন।

কয়েকটা দিন বাবা। তারপর বিপদ কাটলে এসে নিয়ে যাবো।

কাটবে?

কাটবে বাবা। ক'দিন পর আর লোকে ও টাকার খোঁজও করবে না।

এই হুট করে বাপের বাড়ি এলি, এতে লোকের সন্দেহ হবে না?

অত কে ভাবছে বলে?

তুই কবে যাবি?

দিন সাতেকের কথা কাকাকে বলে এসেছিলাম। দু-চারদিন বেশী থাকলে দোষ হবে না।

তাহলে একটা দিন টাকার কথাটা ভুলে যা। ভাল করে খা, ঘুমো। আর কষে ভাবতে থাক।

আমার মাথায় অত ভাবনা আসে না। কী ভাববো?

টাকার কথাই ভাব। টাকাটা দিয়ে কী হবে, কী করতে চাস, এসবই ভাবতে থাক। টাকাটা পেয়ে তোর লাভ হল, না লোকসান হল, তাও ভাব।

লোকসান কেন হবে বাবা?

লোকসান নানারকম আছে। ভেবে দেখ।

তোমার জামাই কোথায় গেছে, কিছু বলে গেছে?

স্পষ্ট করে নয়। তবে মনে হয় বাপ-মায়ের কাছেই যাবে প্রথমে। ওদিকে খুব টান।

সেটাই হয়েছে আমার আর এক জ্বালা।

বিষ্ণুপদ ভ্রূ কুঁচকে বলে, তোর শ্বশুর শাশুড়ি কি ভাল নয়?

ভাল হবে না কেন? ভালই। তবে তারা সব কাঙাল ধরনের লোক। সবসময়ে হাতজোড় করে আছে যেন।

সেটা তোর ভাল লাগে না?

কেন লাগবে? একটু লোভীও।

পয়সা না থাকলে মানুষ কি আর মানুষ থাকে? কিরকম ধারা হয়ে যায় যেন। এখন যা, পুরনো খেলুড়ি আর বন্ধুদের সঙ্গে বেশ করে কয়েকটা দিন গল্প-টল্প কর। অত ভাবিস না।

তোমার জামাই যে নতুন চিন্তায় ফেলে গেল।

জামাই তোকে বিপদে ফেলবে না ইচ্ছে করে। সে তেমন লোক নয় বোধ হয়।

তার আহাম্মকিকেই যে ভয় পাই।

বিষ্ণুপদ একটু হাসল। বলল, আহাম্মক ছাড়া আর কী? খুব আহাম্মক। এ যুগে অচল।

বাপের বাড়ি সাতটা দিনই কাটাল বীণা। তবে খুব আনন্দে নয়। নিমাইয়ের কোনও খবর নেই। বনগাঁয়ে কী হচ্ছে কে জানে। ঘরে পাশের বাড়ির একটা ছেলের রাতে এসে শোওয়ার কথা সে শুচ্ছে তো! নানা চিন্তা।

বনগাঁ যাওয়ার দুদিন আগে রাঙা ফিরে এল।

মেজদা মেজবৌদি কথাই বলে না বীণার সঙ্গে। আলাদা ঘরে তারা নিজেদের মতো থাকে। এসে একবার গিয়ে প্রণাম করে এসেছিল তাদের। দায়সারা একটু কুশল প্রশ্ন করেছিল। দেখে খনি হয়েছে বলে মনেও হল না। কেমন আলগা ভাব।

সেই তুলনায় সেজো রাঙা কিছু মিশুকে। বীণাকে দেখে জড়িয়ে ধরে বলল, ইস! কত দিন। আসেনি!

বেশ গল্প হল রাঙার সঙ্গে। তার চেয়েও বেশী ভাল লাগল দুটো ভাইপোকে। তারা পিসির সঙ্গে সারাদিন লেগে থাকে। গোপাল কথা কইতে পারে না, কিন্তু তারও বুকে কথা আছে নিশ্চয়ই। সে চোখ দিয়ে সেই কথা

বলে। তাই গোপালের চোখদুটো অমন মায়াবী বোধ হয়।

ও সেজবউদি, তোমার তো দু-দুটো আছে, গোপালকে দাও না আমায়। আমি পুষ্যি নেবো।

নাও না ঠাকুরঝি, নিলে তো বাঁচি। ওটার জন্য ভেবে ভেবেই তো আমার বুকের দোষ হওয়ার জোগাড়।

তুমি মুখে বলছে, সত্যিই কি আর দেবে?

রাঙা হেসে বলে, যার সম্পত্তি তাকে একবার জিজ্ঞেস করে নাও। ওর বাপকে।

সেজদা! সেজদা আপত্তি করবে না।

তাহলে তো ভালই। কিন্তু পুষ্যির কথা বলছো কেন গো? তোমার কি হতে নেই?

লজ্জা পেয়ে বীণা বলে, কই আর হল?

সে তুমি যাত্রা-থিয়েটার করে বলে হওয়াচ্ছো না। বাচ্চা হলে ফিগার নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে, তাই না বলো!

না গো, বাচ্চার ঝক্কি আছে। দেখবে কে?

লোক রাখবে। পয়সার তো আর অভাব নেই!

না নেই! তোমাকে বলেছে। আমি কি সিনেমায় পার্ট করি যে, পয়সা থাকবে?

শুনি যে!

কী শোনো?

তোমার নাকি অনেক পয়সা!

ছাই শুনেছো। দাও না গো এটাকে। খুব আদর করে রাখব, দেখো।

নিমাইবাবুর অনুমতি নিয়েছো?

নিমাইবাবুর অনুমতি! কেন বলো তো! এতে তার অনুমতির আবার কী দরকার?

পুরুষ মানুষরা ভাই, অন্যের ছেলেপুলে ঘরে ঢোকানো পছন্দ করে না।

তোমার সব অদ্ভুত ভাবনা! সে লোক খারাপ নয়। বাচ্চা-কাচ্চা ভালও বাসে।

দেখো বাপু।

সে দেখব। আগে বলে দেবে কিনা।

রাঙা ফাঁপরে পড়ে বলে, দিতে আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি সামলাতে পারলে হয়! বোবা বটে, কিন্তু ভীষণ দুষ্ট।

হোক গে। একটাকে ঠিক সামলে রাখব।

খুব বুঝে চলতে হবে কিন্তু। খিদে পেলে রেগে যায়।

তুমি এবার ফাঁড়া কাটছো।

না গো। বোবা ছেলের মনের কথা না বুঝলে বিপদ। এখানে সবাই মিলে দেখে রাখি। ওখানে তুমি আর নিমাইবাবু।

তা বটে।

তাই বলছিলাম, নিতে চাচ্ছো নাও, কিন্তু কঠিন হবে। আরও একটা কথা আছে। ও সবচেয়ে বেশী ভালবাসে কাকে জানো? পটলকে। সারাদিন পটল ওকে বুকেবুকে করে আগলে রাখে। দাদা ছাড়া গোপাল

অচল।

তাহলে আমাকে দুটোই দাও।

রাঙা খুব হাসল, তাহলে তো আমি হালকা হই। এর পর পটলের বাপ বা ঠাকুমা দাদু সবাইকেই। নিয়ে যাওয়ার বায়না করবে না তো! সে ভাই পেরে উঠব না।

গোপালকে ঘুরে ঘুরে দেখে বীণা। একা ঘরে তাকে আদর করে, আর ভাবে, আহা! আমার এরকম একটা হল না?

সাত দিন পেরোনোর পর বীণাকে বনগাঁয়ে যেতেই হল। শেষ অবধি গোপালকে নেওয়া হল না। দোনোমোনো করে টাকাটাও সঙ্গেই রাখল! গচ্ছিত রেখে যেতে ভরসা হল না।

বনগাঁয়ে ফিরল সন্ধেবেলা। ঘর খুলল। হ্যারিকেন জ্বালল। চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখল। সবই এক আছে। তবু ফাঁকা। বড় ফাঁকা। নিমাই নেই।

রাতে আর রান্না করল না বীণা। কয়েকখান রুটি আর আলুর ঘ্যাঁট রাস্তায় খাওয়ার জন্য করে দিয়েছিল মা। সেটা খাওয়া হয়েছিল না। রাতে সেই ঠাণ্ডা রুটি তরকারি খেয়ে শুয়ে রইল।

শ্যামল তার ফেরার কথা জানত না। রাতে শুতে এসে বলল, ওঃ তুমি এসে গেছ? ভালই হয়েছে। কাকা তোমার খোঁজ করতে এসেছিল কাল।

ওঃ, কিছু দরকার আছে?

তা বলেনি। তবে মুখটা খুব গম্ভীর দেখছিলাম।

বীণা একটু ভয় পেয়ে গেল কি? মুখে কিছু বলল না। কিন্তু গভীর রাতে সে একটা নতুন গর্ত খুঁড়ে একটা মেটে হাঁড়ির মধ্যে সরা চাপা দিয়ে প্যাকেটটা রাখল। গর্ত ভরাট করে লেপে পুঁছে দিল। তারপর দুশ্চিন্তার পাথর বুকে নিয়ে শুয়ে রইল।

৫২

চিলেকোঠাটা এত ছোটো যে একটা চৌকিও ভাল করে আঁটে না। টেবিল চেয়ার বা আলনা গোছের কোনও আসবাব চয়নের নেই, তাই রক্ষা। চৌকিটা এঁটে গেল কোনওরকমে। একদিকের দেয়ালে সাঁটিয়ে দেওয়ার পর অন্য দিকের দেয়ালের সঙ্গে দু বিঘৎ পরিমাণ ফাঁক রইল। লম্বালম্বির দিকটায় ফাঁক পাওয়া গেল ফুট দেড়েক। চয়নের মনে হল, এই ঢের। এর চেয়ে বেশি সে আর কী চায়? আঁটিয়ে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টাই তো সে করে এসেছে এতদিন। তার জীবন-সংগ্রাম তো এটুকুই। অল্পের মধ্যে, কমের মধ্যে নিজেকে সন্তর্পণে আঁটিয়ে নেওয়া। ঘরে জায়গা না থাক, ছাদটা আছে। খুব বড় নয়, তবু সেইটাই ঢের বেশি বলে মনে হয় তার। হু-হু করে হাওয়া বয়, বুক ভরে দম নিতে কোনও অসুবিধে নেই। চিলেকোঠার ছাদ নেই, অ্যাসবেস্টস। দু-একটা ফুটো-ফাটা আছে, বর্ষায় জল পড়বে। তা পড়লেও খুব একটা ক্ষতি নেই। বিছানাটা গুটিয়ে রাখলেই হবে। অসুবিধে রান্না নিয়ে। রাঁধবার জায়গা ওই ফুট দেড়েক জায়গা। তারও একটা সমাধান মাথা খাটিয়ে বের করে ফেলেছে সে। চৌকাঠে বসলে ঘরের দিকে মুখ করে ফুট দেড়েক জায়গায় স্টোভ জ্বেলে দুটি ডাভাত ফুটিয়ে নেওয়া শক্ত কাজ নয়। বাথরুমটা অবশ্য একতলায়। নতুন ভাড়াটে এলে সেটা ব্যবহার করতে দেবে কি না সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। দাদা-বউদি এখন তেমন খারাপ ব্যবহার করছে না। হয়তো এই সমস্যারও একটা সমাধান হয়ে যাবে। আপাতত অত ভেবে মনকে ভারাক্রান্ত করে লাভ নেই। খোলা ছাদ ও এক চিলতে ঘর এখন তার কাছে লটারির ফার্স্ট প্রাইজ বলে মনে হচ্ছে। একতলার এঁদো ঘরের চেয়ে এ তো স্বর্গবাস। আরও একটা নিশ্চিন্দির কথা হল, বউদি একশ টাকা করে ভাড়া নিতে রাজি হয়েছে। প্রথমটায় রাজি হচ্ছিল না। বলেছিল, ভাড়া কেন? তুমি বরং এ পাড়াতেই একখানা ভাল ঘর দেখ। এ বাড়িতে তো তোমার অসুবিধেই হচ্ছে!

চয়ন বলেছে, তা নয় বউদি, অসুবিধে আমার নেই। বরং তোমাদেরই হচ্ছে, যতদিন ঘর না পাই ততদিন সামান্য কিছু নাও। ইলেকট্রিক বিল, বাড়ির ট্যাক্স বাবদও তো খরচ আছে।

তোমার সামান্য আয়।

চলে যাবে বউদি। আমার অল্পেই চলে। মা নেই বলে বরং খরচ বেঁচে গেছে খানিকটা।

বউদি দোনোমোনো করল। তারপর বলল, ঠিক আছে, একশ টাকা করে দিও। কিন্তু ঘরেরও খোঁজ রেখো। চিলেকোঠায় আমাদের সব পুরোনো জিনিসপত্র থাকে! তোমার জন্য সব সরাতে। হয়েছে। দোতলায় আর কতটুকুই বা জায়গা বলো একতলায় ভাড়াটে আসছে, সেটাও খালি করে দিতে হবে।

এ ঘরের মেয়াদ কতদিন চয়ন তা জানে না। একটা অনিশ্চয়তা থেকেই গেল। সম্পর্কটা হয়তো এই ঘরের দখলদারি নিয়েই ফের খারাপ হতে থাকবে।

এক রবিবারের সকালে ভাড়াটেরা এল। টেম্পো থেকে যখন তাদের তৈজসপত্র নামানো হচ্ছিল। তখন ছাদ থেকে দেখছিল চয়ন। জিনিসপত্র দেখে অনুমান হল, এরাও নিছক মধ্যবিত্তই। এ বাড়িতে অবশ্য খুব পয়সাওলা লোকের ভাড়া আসবার কথা নয়। তবু প্রত্যাশা তো নানারকম থাকে।

লোকগুলোর চেহারাও মধ্যবিত্ত ধরনেরই। মাঝবয়সী একজন রোগা খেঁকুরে ধরনের লোক, তার সাধারণ চেহারার গিন্নি আর একটি যুবতী মেয়ে। মেয়েটিও কালো, রোগা এবং শ্রীহীন। তবে সে-ই সর্দারি করছিল। কুলিদের ধমক-ধামক দিল, মা-বাবাকেও শাসন করছিল রাস্তায় দাঁড়িয়েই। বেশ ডাকাবুকো এবং মুখরা মেয়ে। চয়ন যুবক হিসেবে কিছুই নয়। তার যৌবন বয়ে যাচ্ছে সে টেরও পায় না। কোনও যুবতীকে দেখলেও তার চাঞ্চল্য হয় না।

এ যুবতীটিকে দেখে অবশ্য চাঞ্চল্যের কারণও নেই।

সামান্য জিনিসপত্র। আধঘন্টার মধ্যেই জিনিস উঠে গেল ঘরে। নিচের তলায় তেমন সোরগোল উঠল না। নিচের তলার বাথরুম এদের সঙ্গেই ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে হবে তাকে—এই দুশ্চিন্তাটা রোববারের সকালটায় তাকে কিছু বিমর্ষ রাখল। এরা যদি আপত্তি করে? যদি অপমান করে তাকে?

ভিতরের উঠোনটা ছাদ থেকে দেখা যায়। চয়ন উঠোনের দিকে চেয়ে লোকগুলিকে অনুধাবন করার চেষ্টা করল। বউদিদের নতুন ঝি তিন কাপ চা আর কয়েকখানা বিস্কুট একটা ট্রেতে সাজিয়ে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিল ঘরে। তারও কিছুক্ষণ পর বউদিও গেল। অনেকক্ষণ বাদে ভদ্রলোককে দেখা গেল, উঠোনে বেরিয়ে চৌবাচ্চার কাছে এসে এক মগ জল তুলে হাত ধুচ্ছে। ধুতির ওপর গেঞ্জি, তার ওপর একটা ফুলহাতা সোয়েটার। লোকটা ভাল না মন্দ, রাগী না শান্ত তা অনুমান করা শক্ত। চয়ন শুনেছে, ভদ্রলোক বউদির দূর-সম্পর্কের পিসেমশাই এবং রাইটার্সে কাজ করেন। শেয়ালদা নর্থ লাইনে সোদপুর বা কোথাও ভদ্রলোকের একটু জমি কেনা আছে, সেখানেই বাড়ি করে রিটায়ার করার পর চলে যাবেন। এইটুকু তথ্য একজনের চরিত্র সম্পর্কে অনুমান করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

কিন্তু চয়ন এত উদ্বিগ্ন কেন? চয়ন নিজেই নিজের এইসব উদ্ভট উৎকণ্ঠায় ভীষণ অবাক হয়। পরে যখন উদ্বেগটা প্রশমিত হয় তখন তার নিজের এইসব ছেলেমানুষি উৎকণ্ঠার জন্য সে লজ্জিত হয়। সে আসলে অচেনা লোকদের সম্পর্কে ভীষণ অস্বস্তিতে থাকে। চেনা হয়ে গেলে আর ভয় তত থাকে না।

চেনা হল আরও সাতদিন বাদে।

সকালে টিউশনিতে বেরোবার সময়ে দরজায় তালা লাগাচ্ছিল চয়ন, ঠিক এই সময়ে মেয়েটা এক রাশ ভেজা জামাকাপড় নিয়ে ওপরে এল। একেবারে মুখোমুখি দেখা।

মেয়েটা নিঃসঙ্কোচে বলে উঠল, আপনিই চয়ন তো! অয়নদার ভাই?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমরা নিচে নতুন ভাড়া এলাম।

জানি।

আমার নাম অনিন্দিতা। আপনি তো টিউশনি করেন, না?

হ্যাঁ।

আমিও করতাম। সবে একটা চাকরি পেয়েছি।

ওঃ।

মেয়েটি হাসল। রোগা মুখখানায় শ্রী বলতে ওই হাসিটি। দাঁতগুলির সেটিং খুব ভাল। এবং ঝকঝকে। বলল, তা বলে সাঙ্ঘাতিক কিছু নয়। একটা নার্সিং হোম-এর রিসেপশনিস্ট। কেমন হবে কে জানে! নিয়ে তো নিলাম।

ভালই করেছেন।

টিউশনি আর ভাল লাগছিল না। এ বাড়ি ও বাড়ি দৌড়োদৌড়ি করা কি সোজা? বাস-ট্রামের অবস্থাও তো ভাল নয়। সবসময়ে ভিড়।

ঠিক কথাই তো।

প্রথম পরিচয়ে এরকম নিঃসঙ্কোচ কথাবার্তা বলতে পারাটা আধুনিক যুগের মেয়েদের একটি ভাল লক্ষণ। অকারণ লজ্জা-সংকোচের বালাই নেই। একটু প্রসন্নতার সঙ্গেই চয়ন মেয়েটির দিকে চেয়ে রইল।

আপনার তো শুনেছি শরীর ভাল নয়।

শরীরের কথায় নিবে গেল চয়ন। দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, না, শরীর ভাল নয়। আমি এপিলেপটিক।

তাহলে তো টিউশনি করতে আপনার কষ্ট হয়!

কষ্ট! বলে চয়ন যেন একটু ভেবে বলল, অভ্যাস হয়ে গেছে।

আমাদের ঘরে আসবেন। গল্প করা যাবে।

যাবো।

মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করে মনটা বেশ ভাল লাগছিল চয়নের। আলাপ হওয়াটাই ছিল দরকার। অচেনা থাকলে তার ভয় আর উদ্বেগটা যেত না। এরা বোধহয় তেমন খারাপ লোক নয়। গত সাতদিন ধরে সে নিচের বাথরুমটা ব্যবহার করে আসছে। একটু ভয়ে ভয়েই। কিন্তু কেউ কিছু বলেনি। না, সে অবশ্য ওদের ঘরে গিয়ে গল্প করতে বসবে না। বউদি তাতে বিগড়ে যেতে পারে। এই আলাপ-পরিচয়-ঘনিষ্ঠতা জিনিসটার মেয়ে-মহলে অন্যরকমের ব্যাখ্যা হয়, সে জানে।

মেয়েটির বাবা এবং মায়ের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে চেনা হয়ে গেল তার। আরও দিন চারেকের মধ্যে। সত্যেশবাবু হিসেবি লোক। বাড়ি করার জন্য প্রস্তুতি হিসেবে টাকা জমাচ্ছেন। প্রথম আলাপের পাঁচ মিনিটের মধ্যে বলে ফেললেন, এখন ইঁটের দর কত করে যাচ্ছে জানো? আট আনা করে। আমি যখন বাড়ি শুরু করব তখন কোথায় ঠেলে উঠবে তাই ভাবছি। আচ্ছা, ফ্লাই অ্যাশ দিয়ে কোথায় ইঁট তৈরি হয় জানো?

চয়ন জানে না। তাই মাথা নেড়ে বলল, আজ্ঞে না।

বাপ আর মেয়ের মুখশ্রীতে খুব মিল। হনু উঁচু, রোগা, ভাঙা মুখ। তবে মেয়ের মতো বাপেরও দাঁতের সেটিং খুব ভাল। এবং ঝকঝকে।

সত্যেশবাবু বললেন, বাড়ি করতে গেলে মেয়ের বিয়ের টাকা থাকে না। মেয়ের বিয়ে দিলে বাড়ির টাকা থাকে না। অথচ দুটোই দরকার।

চয়নকে কথাটা স্বীকার করতে হল।

সত্যেশবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এইজন্যই লোকে ঘুষ খায়। বুঝলে? কিন্তু সরকারকে কথাটা কে বোঝাবে বলল তো! আমি অবশ্য ওসব টাকা ছুঁই না। কিন্তু তাতে লাভটা কী হল?

চয়নকে একথাটাও মানতে হয় যে, সততার কোনও দামই নেই।

ভদ্রমহিলা পরদিন তাকে চা খাওয়ালেন। সত্যেশবাবু ছিলেন না। অনিন্দিতা আর তার মা ছিল। চা খুব খারাপ কোয়ালিটির। সঙ্গে বিস্কুট ছিল, সেটা খেতে ইচ্ছে করল না চয়নের।

তোমার মায়ের কথা শুনলাম। তুমি নাকি মায়ের খুব ন্যাওটা ছিলে!

চয়ন কী বলবে। না ভেবেচিন্তেই বলল, আমি রোগা বলে মায়ের একটু টান ছিল হয়তো।

ওটাই তো হয়। কমজোরি সন্তানের ওপর মায়ের মায়া বেশি। দাদা-বউদির সঙ্গে তোমার বনিবনা কেমন?

চয়ন সতর্ক হল। সে জানে, চায়ের নেমন্তন্নের সময়টা ওরা বেশ ভালই বেছেছে। আর দাদা-বউদি সিনেমায় গেছে। বাড়ির ঝি শুধু আছে ওপরে। কূটকচালির প্রকৃষ্ট সময়। সে উদাসভাবে বলে, আমার সঙ্গে সম্পর্ক তো খুবই ভাল।

ভাল হলে বুঝি তোমাকে রেঁধে খেতে হত!

অনিন্দিতা মৃদু ধমক দিল, আঃ মা। ওসব কথা থাক।

ভদ্রমহিলা থেমে গেলেন।

মাকে সরিয়ে মেয়ে তার ভূমিকা নিল, আপনি তো গ্র্যাজুয়েট, না?

হ্যাঁ।

দিদি বলছিল, আপনি ইংরিজি আর অঙ্কে খুব স্ট্রং! তাহলে কম্পিটিটিভ দেননি কেন?

চয়ন মৃদু হেসে বলল, দেওয়া হয়নি নানা কারণে।

সংসারের অশান্তি বুঝি?

পোড়-খাওয়া চয়ন শুধু একটু হাসল। কিছু বলল না। এরা তার কাছ থেকে কথা আদায় করতে চায় নাকি? তাহলে এদের সম্পর্কে তাকে আরও সজাগ থাকতে হবে।

সতর্কই ছিল চয়ন। তবু সম্পূর্ণ এড়ানো যায় না। নার্সিং হোমে মেয়েটির শিফট ডিউটি। চয়ন যখন সকালের টিউশনি সেরে এসে দুপুরের ভাত রাঁধতে বসে তখন ডিউটি অফ থাকলে মেয়েটি ছাদে শাড়িটাড়ি মেলতে এসে পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে গল্প করে।

কী রাঁধছেন? আচ্ছা, রোজ ওই খিচুড়ির মতো কী একটা করেন বলুন তো!

চয়ন বলে, এটা খুব স্বাস্থ্যকর। চালডাল সবজি সব একসঙ্গে চাপিয়ে দিই। একবারেই হয়ে। যায়।

এমা! রোজ একরকম খান কী করে?

আমার তো খারাপ লাগে না।

একটু ঘি দিলেও না হয় হত!

ওসব আমার সহ্য হয় না।

মশলা লাগে না?

না, তাও লাগে না।

আপনাকে নিয়ে পারা গেল না। আচ্ছা, একটু শুকতো খাবেন? আমাদের আজ শুকতো হয়েছে।

চয়ন সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার পদ্ধতি নিয়ে বলে, না! আমি আবার ওসব খাই না। এটাই বেশ লাগে।

আপনি বোধ হয় আপনার বউদিকে ভয় পাচ্ছেন। যদি কিছু বলে, তাই না?

চয়ন মৃদু হাসল। তারপর বলল, যতদূর নির্দোস থাকা যায় ততই ভাল।

আপনি খুব সাবধানী মানুষ।

না। আমি খুব ভিতু।

মেয়েটা তার পিঠের খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো। এ ব্যাপারটাও তার পছন্দ হচ্ছে না। এ কি বড্ড গায়ে-পড়া? তাহলে তো ঝক্কিই হল একটা। রোজ জ্বালাবে।

ভদ্রতা বজায় রাখতে সে বলে, নতুন চাকরি কেমন?

খুব ভাল মনে হচ্ছে না। কাল একজন পেশেন্ট মারা যাওয়ায় খুব হামলা হল। পেশেন্টর হয়ে কিছু লোক ইট পাটকেল ছুঁড়ে ভাঙচুর করে গেছে। পুলিশ এসেছিল।

ও বাবা!

নার্সিং হোমে এসব অবশ্য হয়। পেশেন্টের ডেলিভারি হতে সময় লাগছিল। তারপর কী সব কমপ্লিকেশন দেখা দেয়। দোষটা ডাক্তারের নয়। আজকাল লোকেরা বড্ড অল্পে রেগে যায়। তাই না?

কথাটা বোধ হয় ঠিক।

খুব ঠিক। কারও ধৈর্য নেই। মা তো শুনে খুব ভয় পেয়ে গেছে। বলছে, চাকরি ছেড়ে দে। আমি বললাম, দেখি আরও কয়েকটা দিন। আটশোটা টাকা হুট করে ছাড়ব কেন?

আটশো!

ট্রেনিং পিরিয়ড বলে কম দিচ্ছে। বারোশো স্টার্টিং। কিছুদিন তো করে দেখি।

এইভাবে কথা গড়ায়। কোথাও পৌঁছোয় না। তবে চয়নের পুঁজিতে একটা অভিজ্ঞতা যোগ হতে থাকে।

নতুন আরও অভিজ্ঞতা যোগ হচ্ছিল অন্য দিক থেকেও। মোহিনীর মা তাকে আর একটা মোটা মাইনের টিউশনিতে নিয়োগ করেছেন। শুধু অঙ্ক এবং মাসে চারশো টাকা। বাড়িটা চয়নের একেবারে অচেনা নয়। মোহিনীদেরই প্রতিবেশী। ছাত্রের মা চারুশীলার সঙ্গে সে একবার হেমাঙ্গবাবুর গাড়িতে চেপে হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। টিউশনিতে নিয়োগের আগে চারুশীলা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, শুধু অঙ্ক করাতে আপনি কত নেবেন বলুন তো!

চয়ন বিনীতভাবে বলল, একটা তো মোটে সাবজেক্ট। দেড়শ দিতে কি আপনার অসুবিধে হবে?

চারুশীলা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, দেড়শ? ওটা তো মেড সারভেন্টের চেয়েও কম মাইনে। আপনার সেলফ্ রেসপেক্ট বলে কিছু নেই দেখছি! ছিঃ, ওই জন্যই তো বাঙালীর উন্নতি হয় না।

চয়ন থতমত খেয়ে বলল, না, ভুল বুঝবেন না। আমি তো মোহিনীকে পড়াতে এদিকে আসিই। এক্সট্রা কোনও পরিশ্রম তো নয়।

চারুশীলা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল, মেধার সঙ্গে পরিশ্রম এক করে ফেলবেন না। যাকগে, পাঁচশো টাকার নিচে আমি দিতে পারব না। দিতে আমার লজ্জা হবে।

চয়ন অত্যন্ত বিপাকে পড়ে বলল, এতটা যে রেট নয়। নিতে আমার ভীষণ লজ্জা হবে।

ওই জন্যই তো আপনার জীবনেও উন্নতি হবে না। ঠিক আছে, চারশো টাকা করে নেবেন। রাজি তো!

তাও বেশি হয়ে যাচ্ছে।

আমি কিন্তু মোটেই আপনাকে দয়া দেখাচ্ছি না। রেট এরকমই হওয়া উচিত বলে মনে করি।

বাচ্চা একটা ছেলেকে শুধুমাত্র অঙ্ক করানোর জন্য এত টাকা নিলে অন্যায় হবে না?

তাহলে আপনি ওকে ইংরেজি বা অন্য সাবজেক্টও একটু দেখাবেন। ইংরিজির টিউটর ওর দরকার হয় না। ইংলিশ মিডিয়মেই পড়ে। তবু দেখাবেন। শুনেছি আপনার বেসিক গ্রামারের নলেজ খুব ভাল।

প্রথম দর্শনেই পিন্টুকে ভীষণ পছন্দ করে ফেলল চয়ন। দেবশিশুর মতো নিষ্পাপ চেহারা। বুদ্ধিমান এবং মনোযোগী। একটু দুষ্টুও আছে। তবে সেটাও উপভোগ্য।

মুশকিল হল পিন্টুকে পড়ানোর সময় চারুশীলা প্রায়ই এসে হাজির হন। ভদ্রমহিলার নানারকমের খেয়াল। এসে বললেন, আচ্ছা, আপনার তো বোধহয় সোয়েটার নেই! সোয়েটার গায়ে দেন না কেন?

কলকাতার শীতে লাগে না। র‍্যাপারেই চলে যায়।

আপনার র‍্যাপারটা ভাল নয়। চলুন তো, গড়িয়াহাটা থেকে আপনাকে একটা পুলওভার কিনে দিই।

চয়ন প্রমাদ গোনে। কোনও জিনিসের বাড়াবাড়ি ভাল নয়, সে জানে। পরে এই ভালবাসা বা করুণা উলটো রূপ নিতে পারে।

পুলওভার অবশেষে সত্যিই কিনে দিয়েছে চারুশীলা। এবং আজকাল রাতের খাবারও তাকে খেয়ে আসতে হচ্ছে সপ্তাহে তিনদিন।

চারুশীলা অত্যন্ত ছটফটে চঞ্চল মহিলা। এ-ঘর ও-ঘর সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছেন, মুহুর্মুহু টেলিফোন করছেন, যখন তখন কেনাকাটা করতে বেরিয়ে পড়ছেন। কিসের যে অতৃপ্তি কেন যে এই অস্থিরতা তা অনুমান করতে পারে না চয়ন। তবু এই স্বাভাবিকতার অভাবের জন্যই বোধ হয় চারুশীলাকে তার খুবই ভাল লাগে। মনে হয়, আমার বউদি যদি এরকম হত!

শুনুন, সামনের শনিবার আপনি একটু তৈরি হয়ে আসবেন। আমরা এক জায়গায় যাবো। সকালে।

চয়ন অবাক হয়ে বলে, কোথায়?

ব্যাণ্ডেল। রিয়া আর ছেলেমেয়েরাও যাবে। আর আমার একটা ভাই আছে, হেমাঙ্গ—চেনেন তো! দারুণ আউটিং।

চয়ন মৃদুস্বরে বলে, কিন্তু আমি!

চারুশীলা হেসে বলে, কেন, আপনি কি অচ্ছ্যুৎ!

তা নয়। তবে—

ওসব শুনছি না। সবসময় অত দুঃখ-দুঃখ মুখ করে থাকবেন না তো! মুখে হাসি নেই কেন? জোর করে হাসবেন। হাসতে হাসতে ওটা অভ্যাস হয়ে যাবে। গোমড়া মুখ আমার একদম সয় না।

সুতরাং ব্যান্ডেলেও যেতে হয়েছিল তাকে। চারুশীলা আরও লোক জুটিয়েছিলেন। ঝুমকি আর অনু নামের দুই বোন। রশ্মি রায় নামে একজন প্রায়-মেমসাহেব মেয়ে। পুরুষ বলতে সে, হেমাঙ্গ আর দুইজন ড্রাইভার।

এই ব্যান্ডেলে যাওয়াটা চয়নের কাছে এক বিশাল উন্মোচন। সে জীবনে ব্যান্ডেলে আসেনি, চন্দননগর দেখেনি। কলকাতার বাইরে যাওয়ার সুযোগ তার হয়ই না। তার ওপর গাড়িতে চড়ে, এত আরামে।

চারুশীলা মাসখানেকের মধ্যে তাকে একটা নতুন টেরিকটনের জামা, একজোড়া জুতো এবং একটা দামী জাপানী ফাউন্টেন পেন উপহার দিয়ে ফেললেন। চয়নের হাঁফ ধরে যাচ্ছিল। রিয়া এবং মোহিনীরাও ভাল। তবে তাদের সংযম আছে। চারুশীলা অনেকটাই উদ্দাম।

প্রায় বছরখানেক বিদেশবাসের পর চারুশীলার স্বামী ফিরলেন দেশে। ভদ্রলোক বিদেশে একটা বিরাট কনস্ট্রাকশনের কাজ করছিলেন। প্রচুর টাকার কাজ। তাঁর দেশে ফেরাটাকে চারুশীলা একটা উৎসব দিয়ে সেলিব্রেট করলেন। বিরাট পার্টি হল বাড়িতে। এবং এ্যান্ড হোটেলে হল আর একটা রিসেপশন। দুই জায়গাতেই হাজির ছিল চয়ন। পার্টি এবং গ্র্যান্ড হোটেলের অভ্যন্তর দুটোই যোগ হল তার অভিজ্ঞতায়।

আর যোগ হলেন সুব্রত। চারুশীলার স্বামী। এমন তদ্‌গত, কর্মপ্রাণ মানুষ সে বড় একটা দেখেনি। মানুষটি খুব লম্বা চওড়া নন, বরং মাঝারি বা ছোটখাটো মাপেরই। কিন্তু মুখের আদলটি মায়ায় মাখানো। সর্বদাই মুখে হাসি। ইনি কয়েক কোটি টাকার মালিক এবং প্রতি বছরই কোটির কাছাকাছি আয় করেন তা চেহারা দেখে ধরাই যায় না।

চয়ন জীবনের অন্যান্য দিক দেখছে আর অবাক হচ্ছে। সে শুনেছে সুব্রত নকশাল আন্দোলন করতেন, একবার জেলও খেটেছেন। তাঁর এই রূপান্তর কিছু বিস্ময়কর।

সুব্রত দেশে ফেরার পর চয়নের ওপর থেকে চারুশীলার মনোযোগ একটু অপসৃত হল। চারুশীলা স্বামীর সঙ্গে নানা আউটিং ও নিমন্ত্রণে যেতে লাগলেন। চয়ন হাঁফ ছাড়ল।

তারপর চারুশীলা একদিন সব্রতকে ডেকে আনল পড়ার ঘরে, একে তুমি একটা চাকরি দাও।

সুব্রত হাসছিলেন, বললেন, আচ্ছা আচ্ছা, হবে।

হবে-টবে নয়। এখনই দাও। এ ছেলেটা হাসতে ভুলে গেছে। ভীষণ দুঃখী হয়ে থাকতে ভালবাসে।

চয়ন লজ্জায় পড়ে গেল।

সুব্রত বললেন, একটু সময় দেবে তো।

সময় দিলে চলবে কি করে? ছেলেটা খুব ভাল, জানো? আমি পাঁচশো টাকা মাইনে দিতে চেয়েছিলাম, নেয়নি। কারটেল করে চারশোতে নামালো।

সুব্রত হাসতেই লাগলেন। কিছু বললেন না।

এর দিন সাতেক বাদে চারুশীলা আবার পড়ার ঘরে হানা দিয়ে বললেন, শুনুন, সামনের রবিবার আমরা ফের আউটিং-এ যাচ্ছি। সাঙ্ঘাতিক জায়গায়।

কোথায়?

তা কে জানে! আমার পাগলা ভাই কোথায় অজ্ঞাতবাস করবে বলে জঙ্গলের মধ্যে একটা মাটির বাড়ি কিনেছে। কাউকে ঠিকানা বলছে না। আমি গোয়েন্দা লাগিয়ে ঠিকানা জোগাড় করেছি। ও শুক্রবার শুক্রবার সেখানে পালায়। আমরা রবিবার গিয়ে ওকে সারপ্রাইজ দেবো। আপনিও যাচ্ছেন কিন্তু।

৫৩

কাকা ডেকে পাঠিয়েছিল বটে, কিন্তু ভয়ের কিছু ছিল না। বিকেলের দিকে ভয়ে আধমরা বীণাপাণি যখন গিয়ে তার সামনে দাঁড়াল তখন কাকা হেসে-টেসে বলল, ভাল খবর আছে বীণা। নতুন পালার তিনটে আগাম বায়না পেয়েছি। আদাজল খেয়ে লাগতেই হবে। বাপের বাড়ি গিয়ে অনেক সময় নষ্ট করে এলে।

বুক থেকে যেন ভারী পাথর গড়িয়ে নেমে গেল। শ্বাস সহজ হল। বীণা বলল, পালা নামবে! উঃ, কতদিন পর।

কাকা বিষন্ন মুখে বলে, হ্যাঁ, এবারটা অনেকদিন ফাঁক পড়ে গেল। কত ঝামেলা হচ্ছিল! এবার আর চিন্তা নেই।

নায়িকার পার্ট নয়, তবে খুব বড় পার্টই দেওয়া হল বীণাকে। হাতে হাতে সবাইকে জেরক্স করা কাগজ বিলি করছিল কাকা। বলল, আগে নিজের নিজের পার্ট মুখস্থ করো, তারপর রিহার্সাল। সাত দিন সময় দিচ্ছি। তার মধ্যে কণ্ঠস্থ হওয়া চাই।

রাত্রিবেলা লণ্ঠনের আলোয় পালাটা পড়ল বীণা, তার একাকী ঘরে বসে। পড়তে পড়তে চোখে জল এসে গেল। এক দুঃখী মেয়েকে নিয়ে সামাজিক নাটক। কাকার নিজের লেখা। এ পালা জমে যাবে খুব।

অনেক রাত অবধি জেগে পালাটা শেষ করে লণ্ঠন কমিয়ে যখন বিছানায় শুয়ে পড়ল বীণা তখন তার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। বড্ড ফাঁকা লাগল বিছানাটা। পাশে লোকটা ছিল এতদিন। এবার থেকে কি ফাঁকাই থাকবে জায়গাটা? সারা জীবন?

থাকলে থাকবে। বীণা প্রথম প্রথম ভয় পাবে, মন খারাপ হবে। তার পর ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে। একটা নিষ্কর্মা লোকের ঘর-সংসার করে সুন্দর জীবনটা নষ্ট করবে নাকি সে? তার জায়গা তো হাজারটা লোকের চোখের সামনে, মঞ্চের ওপর। নাটক ছাড়া বাঁচবে না সে। লোকটা থেকে বরং বাধা হচ্ছিল। নানা বায়নাক্কা। মূর্তিমান বিবেক। এই-ই ভাল হয়েছে।

সারাটা রাত খানিক ঘুমে, খানিক জাগরণে, আর ভয়-ভয় একটা ভাব নিয়ে কেটে গেল বীণার। পরদিন সকাল থেকে আর নাওয়া-খাওয়ার সময় রইল না। দিন-রাত মুখস্থ করতে লাগল পার্ট। প্রায় সব সিনেই ঘুরে ফিরে সে আছে। বলতে গেলে নায়িকার চেয়েও তার পার্ট বড়। গুরুতরও বটে। ধরতাইগুলো বুঝে নিতে আগুপিছু অন্য পার্টগুলোও প্রায় ঠোঁটস্থ করে ফেলতে লাগল। তার গলায় দু'খানা গান আছে। সুর পরে

বসবে। গানগুলোও সে মুখস্থ করে নিজের সুরে গুনগুন করে নিতে লাগল। নিমাইয়ের কথা বিস্মরণ হতে সাত দিনও লাগল না।

শুধু নিমাই কেন, বাবা-মা, ভাই-বোন, ডলার-পাউন্ড কিছুই আর মনে পড়ে না। কাকা ইচ্ছে করেই তার পার্টের মেয়েটার নামও রেখেছে বীণাপাণি। খুব তেজী মেয়ে। সব সময়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার লড়াই। নায়িকাটা একটু ছিঁচ-কাঁদুনে, আদুরি-আদুরি, ন্যাকা ধরনের পার্ট। দু' নম্বর মেয়েটা ঠিক তার উল্টো এবং সেই নায়িকাকে প্রায় ঠেকা দিয়ে পাতে দেওয়ার যোগ্য করে। তুলেছে।

বীণা নিজে তেজী ধরনের মেয়ে নয়। বরং ভিতু আর নরম ধরনের। কিন্তু নাটকের বীণাপানির পার্ট মুখস্থ করতে করতে তার যেন তেজ-বীর্য এসে যেতে লাগল।

সাত দিন পর যখন রিহার্সাল শুরু হল তখন তার পার্ট করা দেখে কাকা অবধি বলে ফেলল, নাঃ, বীণাটার হবে। খুব ওপরে উঠবে মেয়েটা। পালা প্রায় একাই জমিয়ে দিয়েছে।

এই প্রশংসাটুকুই বীণাপাণির মেডেল। আর সে কী চায়?

তাদের পালায় প্রম্পটারের বালাই থাকে না। নিতান্তই কেউ পার্ট ভুলে গেলে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য একটা লোক থাকে। সে বাজনদারদের মধ্যে বসে থাকে ঘাপটি মেরে। কাজেই মুখস্থ রাখাই সবচেয়ে ভাল।

দিন কুড়ির মধ্যেই রানাঘাটে প্রথম পালা হবে। তার পর আরও দু'-তিন জায়গায়। জমলে বায়না আসবে হু-হু করে। কলকাতার অপেরার খাঁই বেশি। বিশ্ববিজয়ের খাঁই কম, আন্তরিকতা বেশি।

একা ঘরে কেমন লাগছে বীণার? নিমাইকে ছাড়া কেমন হচ্ছে এই থাকাটা? এসব নিজেকেই জিজ্ঞেস করে সে। কিছু খারাপ তো লাগছে না তার! একা বলেও বোধ হয় না। দিনরাত নাটকের চরিত্ররাই তার আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় যেন, কথাও কয়। একটুও একা লাগে না তার।

তবে কেউ কেউ নিমাইয়ের খোঁজ করে। একদিন কাকাও জিজ্ঞেস করে বসল, আচ্ছা, নিমাইকে তো দেখি না আজকাল! গেল কোথায়?

গেল কোথায় সে খোঁজ বীণাপাণিও রাখে না। তবে অনুমানের ওপর বলে, পালপাড়ায়। জমিজমা দেখতে গেছে।

একা আছে নাকি? ভয়টয় নেই তো ওখানে?

একা থাকতে ভয় কি?

কাকা জবাবটায় খুশি হল না। বলল, মেয়েদের ভয় থাকেই। নিমাই কবে ফিরবে?

বললাম তো চাষবাস দেখতে গেছে। ফিরতে দেরি হবে হয়তো।

কাকা একটু ভেবে বলে, চাও তো একটি মেয়েকে তোমার কাছে রাতে রাখতে পারো। পুটুকে তো জানো! ওর বর ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

পুটুকে ভালই চেনে বীণা। মাথা নেড়ে বলল, কাউকে দরকার নেই। একা আমি বেশ আছি। সারা দিন পালাটা নিয়ে ভাবি, মুখস্থ করি, একা একা রিহার্সাল করি। অন্য লোক থাকলে বকবক করবে, গল্প হবে, আমার তাতে অসুবিধেই হবে বরং।

সঙ্গে সঙ্গে কাকা বলল, তা হলে থাক।

বীণা বলল, ভয়ের কিছু নেই। চারদিকে প্রতিবেশী রয়েছে। তারা তোক ভাল।

একা থাকার ভয়টা কাটিয়ে উঠছে বীণা। একা থাকতে সে এখন মজা পাচ্ছে। সময়মতো রান্নাবান্না করতে হবে, কাচাকুচি করতে হবে, কথা শুনে চলতে হবে, মতামতের দাম দিতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা আর নেই। কেমন অবাধ স্বাধীনতা! যা খুশি তাই করতে পারে বীণা।

রানাঘাটে যাওয়ার দিনটা যত এগিয়ে এল ততই বুকের ঢিবঢিব বাড়তে লাগল তার। একা ঘরে অতগুলো ডলার আর পাউন্ড রেখে যাওয়া কি ঠিক হবে? রাতে কাউকে শুতে রাজি করানো যাবে ঠিকই, কিন্তু সারা দিন ঘরখানা ফাঁকা পড়ে থাকবে যে!

নতুন দুশ্চিন্তাটা যুক্ত হওয়ায় একা থাকার আনন্দটা অনেকটাই মাটি হয়ে গেল তার। লুকিয়ে রাখার মতো জায়গা তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সঙ্গে নিলে হয়। তবে পালা করতে গেলে জিনিসপত্র বড় ঘাঁটা পড়ে যায়। এক সঙ্গে থাকা, কখন কার চোখে পড়ে যাবে। চুরিও যে যেতে পারে না তা তো নয়!

বীণা খুব ভাবতে লাগল। রানাঘাটে দুই রাতের পালা। দুটো রাত কোনওরকমে কাটিয়ে দিতে পারবে সে। কিন্তু তার পর? আরও নানা জায়গায় একের পর এক পালা নামবে। তখন কী হবে? এই জন্যই না আর একবার নিমাইকে হাতে পায়ে ধরে রেখে দিয়েছিল সে। যত অপদার্থই হোক, তবু তো পাহারাদার!

এখন কী করে বীণা?

যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ডলারগুলো ভাঙানো দরকার। দেশি টাকা হলে ব্যাঙ্কে বা পোস্ট অফিসে রেখে দিতে পারবে। কেউ টেরও পাবে না। কিন্তু ভাঙানোতেই যে বারবার বাধা পড়ছে।

বীণা একবার ভাবল, পল্টুর কাছে যাবে। আবার ভাবল, থাকগে। পল্টু ছেলেটাকে তার মোটেই বিশ্বাস হয় না। বনগাঁয়ে ডলার ভাঙানোর বিপদ আছে। চাউর হয়ে যাবে।

রানাঘাটে যাওয়ার জন্য বাক্স গোছাতে গিয়ে সে ডলারের প্যাকেটটা একটা পুরনো ব্লাউজে জড়িয়ে বাক্সের তলায় রেখে ওপরে অন্য সব জিনিস চাপিয়ে নিল। যা হওয়ার হবে। প্যাকেটটা সঙ্গে না থাকলে সে মন দিয়ে পার্টও করতে পারবে না।

একখানা পুরনো বাস ভাড়া হল। তাইতে পিকনিক পার্টির মতো একদিন সকালে চেপে বসল সবাই। ভারি হাসাহাসি, কথা চালাচালি করতে করতে এক বুক উত্তেজনা নিয়ে তারা পৌছে গেল দুপুরের আগেই। যে ক্লাব তাদের বায়না করে এনেছে তারা বেশ বড়সড় আয়োজন করেছে। বিশাল প্যান্ডেল। শোনা গেল টিকিট ভালই বিক্রি হয়েছে। দুপুরে খাওয়াল চমৎকার। খাণ্ডা খাণ্ডা মাছের টুকরো পড়ল পাতে, বড় বড় চটিজুতোর সাইজের বেগুনী, ঘন মুগডালে মাছের মাথা, টমেটোর চাটনি আর দই। কাকার বারণ আছে, পালার দিনে বেশি খেতে নেই। তাতে আইঢাই হয়, পার্ট করে জুত হয় না। বীণা তাই সাবধানে খেল। অম্বলের ব্যামোটাও বড্ড ভোগাচ্ছে।

একটু রাতের দিকে যখন ভরাভর্তি আসরে নামল বীণা তখন মনে হল, এই তো তার জগৎ। এ ছাড়া সে আর কী চায়? প্রাণ ঢেলে অভিনয় করল সে। কত যে ক্ল্যাপ পেল তার ইয়ত্তা নেই। পালা জমেছে। লোকে নিচ্ছে।

পালার এক ফাঁকে কাকা বলে গেল, কালকেও এই আসরেই পালা বসবে বীণা। সুপারহিট। কাকার মুখে তৃপ্তির হাসি দেখে বীণার বুকখান জুড়িয়ে গেল। কাকা তার জন্য যা করেছে তা তার বাবাও করেনি, স্বামীও নয়। এ লোকটার জন্যই বেঁচে আছে বীণা। কৃতজ্ঞতায় তার চোখে জল আসতে চাইছিল।

যে হাজার খানেক লোক পালা দেখছিল তাদের মধ্যে রোগাভোগা ছোটখাটো নিমাইও ছিল। সঙ্গে নদেরচাঁদ। নিমাই মোটেই পালা দেখতে আসেনি। সে দেখতে এসেছিল বীণাপাণিকে। না, তেমন পরিবর্তন হয়নি। একই রকম আছে। তবে সাজগোজ করায় দেখাচ্ছিল ভারি সুন্দর। যেন এ তার বউ নয়, সিনেমার মেয়েছেলে। বেশ ভরা লাগছিল বুকখানা তার।

নদেরচাঁদ কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে বলে, কথা বলবে পালার পর?

ও বাবা, না।

বিয়ে-করা বউ, কথা কইবে না কেন?

ওরে না না। কথাই নেই।

পার্ট কেমন লাগল?

ভালই বোধ হয়, আমি কি অত বুঝি?

কেমন ক্ল্যাপ পাচ্ছিল দেখলে?

দেখলাম।

তোমার বউ কিন্তু জাতে উঠে গেল। আরও নাম হবে।

হোক। ওর ভাল হোক। কত কষ্ট করেছে। ভগবান এবার ওকে সুখশান্তি দিলে বড় ভাল হয়।

একবার দেখা করে গেলে ভাল করতে নিমাইদা।

ওরে দেখা করাটা একতরফা হলে হয় না। দু' তরফেরই গরজ চাই। ওর গরজ নেই যে।

গরজ তোমারও নেই বোধ হয়?

আমি কি একটা মনিষ্যি রে? আমার কত কি মনে হয়। গরজ আছে, তবে ভয় লাগে। দেখা করে কাজ নেই। বীণা পছন্দ করবে না।

নদে মাথা নেড়ে বলে, কাজটা ঠিক হল না নিমাইদা।

নিমাইয়ের চোখে জল আসছিল! বীণাপাণি বড় অবহেলা করল তাকে। বড় দাগা দিল। এত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কি পাওনা ছিল তার? কিছু বিলিতি টাকাই যেন দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল মাঝখানে।

পালা শেষ হওয়ার পর আর কাঁচরাপাড়া ফেরার বাস নেই। রাত গভীর। চেনাজানা মেলা লোকের বাড়ি আছে রানাঘাটে। থাকার অসুবিধে নেই। নদে বলল, চলো, সুখরঞ্জনের বাড়ি যাই। তাকে বলা আছে।

নিমাই আনমনে বলল, তুই যা।

আর তুমি?

আমি! আমি একটু কোথাও বসে থাকব। আর ঘণ্টাটাক পরেই তো বাস।

তোমার অত তাড়াহুড়োর কী আছে?

আছে। সকাল পাঁচটা ছ'টার মধ্যে গিয়ে দোকান না খুললে অতগুলো লেবার খাবে কোথায়? ঘুগনির মটরদানা ভেজানো রয়েছে, পাঁউরুটির সাপ্লায়ার আসবে, দুধওলা আসবে।

তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ছোঁড়াটা তো আছে।

ওরে না, ওকে দিয়ে কি কাজ হয়? আমি না থাকলে কাজে গা লাগাবে না।

ভারি তো দোকান। দিলেই না হয় একদিন লোকসান।

লোকসান বলে নয়, পাঁচজন নির্ভর করে তো। ব্যবসা মানে কি শুধু পয়সা উপার্জন? একটু সেবাও তত দিই।

তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।

যা না তুই সুখরঞ্জনের বাড়ি। আমি ঠিক চলে যাবোখন।

নদে মুখ ব্যাজার করে বলে, তা হয় নাকি? এক সঙ্গে এসেছি, একসঙ্গেই ফিরব। চলো তা হলে কোথাও বসে মশা তাড়াই।

বড় রাস্তায় বাস রুটের ধারে একটা দোকানের বারান্দা পেয়ে গেল তারা। ফাঁকা নয়, বারান্দাতেও জনাকয়েক শুয়ে আছে মুড়িসুড়ি দিয়ে। সন্তর্পণেই বসল তারা।

নদে বলল, বীণাপাণি আজ কিন্তু ফাটিয়ে দিয়েছে।

নিমাই বলল, হ্যাঁ।

অমন মিয়োনো গলায় বলছো কেন? তোমার ভাল লাগেনি?

লেগেছে। তবে বড় উগ্র পার্ট।

তার মানে?

যে পার্টটা করল সে মেয়েটা যেন হান্টারওয়ালি। কী তেজ বাবা! সব যেন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে চায়।

ওরকমই তো চাই।

কেন চাস?

ওরকম না হলে এত অন্যায়ের সঙ্গে লড়াই করা যায়?

তোর বউ যদি ওরকমটি হয় তবে তোর কেমন লাগবে?

কেন বলো তো! আমার তো ভালই লাগবে।

একটু ভেবে বলিস। কথায় কথায় ফোঁস করা কি ভাল?

নদে একটু হাসল। বলল, তোমার মতো মাটির মানুষ হলে অবশ্য ওরকম তেজী মেয়েকে সামাল দেওয়া মুশকিল।

নিমাই মাথা নেড়ে বলে, তেজ অন্য জিনিস। এ ঠিক তেজ নয়, এ হল ঝাঁঝ। ভেতর থেকে যেন সবসময়ে হল্কা বেরোচ্ছে।

একটু ভেবে নদে বলল, হ্যাঁ, নিমাইদা, তুমি কি সত্যিই বীণাপাণিকে ত্যাগ দেওয়ার কথা ভাবছো?

আমি ত্যাগ দেওয়ার কে? ত্যাগ যদি দিতে চায় তো সে দেবে। আমি ওরকম পাপ-কথা ভাবি না।

তোমার রকমসকম আমার তো সেরকমই ঠেকছে। কী হয়েছিল সেটাও বললানি আমাকে।

স্বামী-স্ত্রীর ভিতরকার কথা বলিই বা কী করে? একদিন যদি গুছিয়ে বলতে পারি তো বলব। তবে এটুকু মনে হয়, বীণাপাণি বিপদের মধ্যে বাস করছে।

তা বিপদে তাকে একা রেখে চলে এলে কেন?

সে তো ইচ্ছে করলেই বিপদ কাটাতে পারে। কিন্তু চাইল না। তাই নিয়েই ঝগড়া।

অন্য কোনও ছেলে-ছোকরা জুটেছে নাকি?

ওরে না। বীণার এখনও সে দোষটা নেই। বড় ভাল মেয়ে।

ভালও বলছে আবার এক সঙ্গে থাকছে না এটা কীরকম ব্যাপার হচ্ছে বলল তো?

সে অনেক কথা। তোকে তো আমি বলেইছি, দোষটা আমারই বোধ হয়। আমি দুর্বল মানুষ, তেজ-টেজ নেই, খেটে খাওয়ার ক্ষমতা নেই। বীণাপাণির হাত-তোলা হয়ে বসে খেতাম। পোষা প্রাণী যেমনটা হয়।

আর নিজেকে আসামী বানিয়ে ভালমানুষ সেজো না তো। তোমাকে আমি জন্ম ইস্তক চিনি। তা এখানে যা করছে সেটা তো বনগাঁয়েও করতে পারতে। ব্যবসাই যদি করবে তো বনগাঁয়ে করতে কে মাথার দিব্যি দিয়ে নিষেধ করেছিল?

রাগিস না ভাই। বীণাপাণি দোকান দিয়ে দেবে বলেছিল। সেই আশায় ছিলাম। কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠেনি।

হল না কেন?

তার বড় নজর। মনোহারি দোকান দেবে বলে ঠিক করেছিল। অনেক টাকার ধাক্কা।

শুধু এইটেই কারণ নাকি?

আরও আছে।

যাকগে, তোমাকে আর বলতে হবে না। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। চোখ দুটো একটু বুজে নেই। বাস এলে ডেকে দিও।

ঘুমো।

বসে বসেই নদে ঘুমিয়ে পড়ল। এমনকি নাকও ডাকতে লাগল ঘড়ঘড় করে। নিমাই চুপ করে বসে রইল। অন্ধকার ঠাণ্ডা রাত। একটু কুয়াশা হয়েছে। চারদিকটা ভারি নিঝুম। বসে বসে সে একটাই কথা ভাবতে লাগল। বীণাপাণি। আজকাল তার শয়নে, স্বপনে, জাগরণে কেবল বীণাপাণির কথা মনে হয়।

পাঁচজন বীণাপাণিকে বাহবা দিচ্ছে বলে তার একটুও হিংসে হয় না। বরং তার মনে হয়, বীণাপাণির মতো মেয়ের যোগ্যই সে নয়। সে অনেকটাই ছোটলোক। বীণাপাণি গরিব হলেও বড় ঘরের মেয়ে। তার সঙ্গে খাপ খায় না। বীণাপাণিকে বিয়ে করেই যেন অপরাধ হয়েছে তার। আজ যদি বীণা নিজের ভাগ্য নিজে গড়ে নেয় তা হলে নিমাইয়ের হিংসে হবে কেন? তবে সে বড় ভালবেসেছিল বীণাপাণিকে। অনেকটা ভালবাসা। সেইটে বড় মনে হয়। ফাঁকা লাগে, উদাস লাগে।

দুটো জ্বলন্ত চোখে অন্ধকার ফুটো করে পয়লা বাসটা এসে পড়ছিল। নদেকে ঠেলা দিয়ে উঠে পড়ল নিমাই, ওরে, এসে গেছে।

যখন ভোরবেলা এসে নিজের ঠেকটিতে পৌঁছলো নিমাই তখন তার অ্যাসিস্ট্যান্ট বিশে উনুনে আগুন দিয়েছে। কয়লার ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে মিষ্টি গন্ধ ছাড়তে ছাড়তে। ধোঁয়ার গন্ধ কারও মিষ্টি লাগে না, একমাত্র নিমাইয়েরই লাগে।

উনুন ধরতে না ধরতেই ঘুগনি বসিয়ে দিল নিমাই। পাঁউরুটি এসে গেল। তারপর কাজ আর কাজ। দম ফেলার ফুরসত নেই। আজকাল কুলিকামিনরা ছাড়াও বাইরের লোক আসছে তার ঘুগনি খেতে। দু-চারজন বাবু মানুষও বসে যাচ্ছে সকালে এক কি দু' ভাঁড় চা সেঁটে নিতে। খদ্দেরে থই থই করছে।

একজন সেদিন বলছিল, নিমাইবাবু, দুপুরে আর একটু ভারী টিফিন হলে সুবিধে হয়। পাঁউরুটি ফেনানো জিনিস, ওতে সুবিধে হয় না। হাতরুটি চালু করে দিন, দেখবেন কেমন চলে।

কথাটা ভাবছে নিমাই। হাতকটি বেচলে লাভও বেশি হয়। কিন্তু খাটুনি বেশি। তবে ছাতুটা সে চালু করে দিয়েছে। পরিশ্রমও কম। কয়েকটা পেতলের কানা-উঁচু থালা কিনেছে। ছাতু, নুন, চাটনি, পেঁয়াজ আর লঙ্কা। পশ্চিমের মানুষেরা পেট ভরে খায়।

সারা দিন হাজারো কাজের মধ্যে বারবারই বীণাপাণি এসে হানা দিল আজ। কয়েকটা দিন চোখের আড়ালে থাকায় একটু ভুল পড়েছিল। কাল যাত্রায় তাকে দেখে আবার যেন একটা ছ্যাঁদা দিয়ে বেনো জলের মতো স্মৃতি ঢুকে পড়ছে।

দুপুরের পর একটু নিরালা হল নিমাই। নিবন্ত উনুনের পাশে বেঞ্চে বসে হাঁ করে ভাবতে লাগল। তার অনেক দোষ, অনেক খামতি। এত খামতি দিয়ে ভগবান যে কেন পাঠাল তাকে দুনিয়ায়! চারদিকে বড় বড় সব মানুষ। সে কেন একরত্তি? সে কেন এত ভিতু? এত দুর্বল?

সন্ধের পর সারা রাত গুদাম চৌকি দিতে হবে। গতকাল যাত্রায় যাবে বলে অন্য লোককে টাকা দিয়ে মোতায়েন করে যেতে হয়েছে। আজ ফের তার পালা। দুপুরে একটু ঘুমনো দরকার। তা ঘুমটা আজ আর এল না। সন্ধের পর মাথায় কানে একটা কম্ফর্টার জড়িয়ে হাতে খেঁটে লাঠি নিয়ে গুদামের বাইরে ছোট ছাউনিতে বসে রইল নিমাই। হাতে টর্চ। এ দিকে আজকাল খুব চুরি হচ্ছে। হওয়ারই কথা। বেকার বাড়ছে, রোজগার নেই মানুষের, করবেটা কী?

আজ বসে বসে অন্য চুরির কথা ভাবছিল নিমাই। বীণাকে চুরি করল কে? বিলিতি টাকা, নাটক, হাততালি? এই বীণাই তাকে না মরন্ত অবস্থা থেকে বুকে আগলে ফিরিয়ে এনেছিল! তখন ভালবাসত, এখন আর বাসে না নাকি? বীণার কি কখনও মনে পড়ে তার কথা?

ভাবতে ভাবতে রাত কেটে গেল। ঘুম এল না। মাথাটা বড্ড গরম। সকালবেলাতেই ঠাণ্ডা জলে চান করে কাজে লেগে পড়ল নিমাই।

একদিন নিরঞ্জনবাবু এসে তার ব্যবসা দেখলেন। বললেন, কেমন লাভ হচ্ছে?

নিমাই অপ্রস্তুত হয়েই বলে, আজ্ঞে হিসেব তো করি না।

তোমাকে নিয়ে বড় মুশকিল দেখছি। হিসেব ছাড়া ব্যবসা হয়? হিসেব করেই করতে হয় সব। কত যাচ্ছে কত আসছে কত পড়তা হল দেখবে না? একখানা খাতা করো।

যে আজ্ঞে।

নিমাই খাতা করল। তারপর হিসেব কষতে বসল। একখানা পুরনো প্লাস্টিকের ভেতর তার টাকা থাকে। সেখানা খুলে সব টাকা-পয়সা বের করে যখন গুনে-গেঁথে তুলল তখন তার মাথাটা ঘুরেই গেল একটু। কম করেও মাসে হাজার খানেক টাকা তার আয় হচ্ছে যে! সত্যি না স্বপ্ন? হাজার টাকা যে অনেক টাকা।

আরও তিন দিন বাদে নদে এল। সব শুনে-টুনে বলল, ফুঃ! হাজার টাকা আবার এ বাজারে একটা টাকা নাকি?

ওরে, আমার যে এ-ই ঢের।

তোমার ঢের নিয়ে তুমি থাকো। ভাল করে ঘুগনি খাওয়াও তো!

বড় একটা প্লেটে ঘুগনি ঢেলে যত্ন করে দিল নিমাই। বলল, ব্যবসাটা আরও বাড়াবো, বুঝলি?

বুঝলাম। তোমাকে দেখে আমার হিংসে হয়। অল্পেই বেশ খুশি হয়ে যাও।

অনেকে যে বেশিতেও খুশি হয় না। তেষ্টা আরও বেড়ে যায়। অল্পে খুশি হই—এটাই আমার ভগবানের আশীর্বাদ।

এই ব্যবসাই যদি করবে তা হলে একটা দোকান দাও নিমাইদা। আর চৌকিদারের চাকরিটাও ছাড়ো।

ওরে না। চৌকিদারের চাকরি আমার লক্ষ্মী। এই চাকরি করতে করতেই বিয়ে হয়েছিল।

নদে হেসে বলল, তা হলে তো চাকরিটা অপয়াই। বিয়েটা তোমার ভাঙার মুখে।

ও কথা বলিসনি। নিরঞ্জনবাবু বড় ভাল লোক।

শোনো, আমি বনগাঁ গিয়েছিলাম। বিশ্ববিজয় অপেরার এখন তুঙ্গে বৃহস্পতি। মেলা বায়না পাচ্ছে।

তা হোক। কাকা নাটকের জন্য প্রাণ দিতে পারে। ওর অপেরার ভাল হোক।

কিন্তু একটা খবর একটু খারাপ। বীণাপাণির সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

নিমাইয়ের বুকটা একটু কেঁপে উঠল, তাই নাকি?

হ্যাঁ, সে তোমার নাম শুনলেই রেগে যাচ্ছে।

নিমাই মলিন একটু হাসল, নামটা তুললি কেন?

তোমার অবস্থা দেখে মায়া হচ্ছিল বলে। তা সে কোনও কথাই কানে তুলল না। বলল, ওর হয়ে দূতিয়ালি করতে হবে না। ওই নিমকহারামকে আমি ভুলে গেছি।

নিমাই ফ্যাকাসে মুখে হাসবার আর একটা চেষ্টা করে বলল, কথাটা তো মিথ্যেও নয়। তার নুন অনেক খেয়েছি।

৫৪

তুমি আজকাল স্কুল-টুলেও বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছো! হল কি তোমার? প্রেস্টিজ বলে কি কিছু নেই নাকি? ডাকলেই যেতে হবে?

একটু থতমত খেয়ে গেল কৃষ্ণজীবন। অপ্রস্তুত হয়ে বলল, প্রেস্টিজ! না, প্রেস্টিজের কি আছে? ওরা ডাকল, গেলাম।

সেটাই তো আমার আপত্তির কারণ। যাকে দেশ-বিদেশ থেকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে, যার ঘর-সংসারের দিকে মন দেওয়ার সময় নেই, সে যদি এখন এসব ছোটখাটো ব্যাপারেও তু বললেই ছুটে যায় তা হলে সেটা কেমন দেখায় বলো তো!

গণ্ডগোলটা কোথায় হল তা বুঝতে পারছিল না কৃষ্ণজীবন। একটা মিশনারি স্কুলের কর্তৃপক্ষ তাকে ডেকেছিল সেমিনারে। কৃষ্ণজীবন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সামনে তার কথা বলার সুযোগ কমই পায়। এই সুযোগটা পেয়ে সে খুশিই হয়েছিল।

অবাক হয়ে কৃষ্ণজীবন খুব সরলভাবে বলল, কোনও দোষ হয়েছে নাকি? বাচ্চাদের শেখানো তো ভালই। ওরাই তো ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে দেখবে।

ছাই দেখবে! তোমার বকবকানি এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বের করে দিয়েছে এতক্ষণে। এসব আজেবাজে অনুষ্ঠানে যাচ্ছো, অথচ ইতুর বিয়ের নেমন্তন্নে গেলে না! কত দুঃখ পেল ওরা বলল তো! মেলোমশাই নিজে এসে নিমন্ত্রণ করে গিয়েছিলেন। তোমার জন্য আমাদেরও যাওয়া হল না।

কৃষ্ণজীবন সংসারী নয় বটে, কিন্তু খুব বোকাও নয়। ইতু হল রিয়ার এক মাসতুতো বোন। ব্যান্ডেলে ওদের বাড়ি। সম্পর্ক খুব একটা নেই। নেমন্তন্নে যাওয়ার ব্যাপারটা খুব জরুরী কিছু ছিল না। কিন্তু রিয়া হঠাৎ ব্যাপারটাকে ভীষণ গুরুত্ব দিতে যে কেন শুরু করল কে জানে! ব্যান্ডেল যেতে হলে পুরো দিনটা বরবাদ হত। সেমিনারে যাবে বলে কথা দেওয়া ছিল, কথার খেলাপ হত।

কৃষ্ণজীবন অপরাধীর মতো মুখ করে বলল, তুমি গেলে না কেন? তোমাকে তো যেতে বলে গিয়েছিলাম!

এত দূরের রাস্তা বাচ্চাদের নিয়ে আমি একা যাবো? সেটা কি ভাল দেখাত?

তারা কি বুঝত না যে, কথার খেলাপ করাটা ঠিক নয়? তেমন হলে গাড়িটা নিয়েও যেতে পারতে। ড্রাইভার রতন থাকত।

গাড়ি অতদূর নিয়ে গেলে তুমি কি খুশি হতে?

না, গাড়ি নিয়ে বেরোনোর ব্যাপারে কৃষ্ণজীবনের আপত্তি আছে। পৃথিবীর ভারাক্রান্ত আবহাওয়ায় সে নিজের অবদান যোগ করতে চায় না। তবু গাড়িটা কেনা হয়েছে স্ট্যাটাস সিম্বল হিসেবে। কিনিয়েছে রিয়াই। ওরাই ঘোরে বেড়ায়। কৃষ্ণজীবন কখনও আপত্তি করে না। তবে তেল পোড়ানো যে তার পছন্দ নয় এটা তার পরিবারের সবাই জানে।

কৃষ্ণজীবন কাঁচমাচু হয়ে বলে, খুশিই হতাম। তোমার তো প্রয়োজনটা জরুরীই ছিল।

সামান্য একটা স্কুলের সেমিনারে না-গেলেও তোমার চলত। ওই ক্যাংলাপানা, কালো সাউথ ইন্ডিয়ান মেয়েটা যে তোমাকে কী মন্ত্র করল কে জানে!

কৃষ্ণজীবন একটু ব্যাকুল হয়ে বলে, সে বড় ভাল মেয়ে।

ভাল হোক না, কিন্তু স্কুলে-পড়া মেয়ে তো! তার কথাটারই গুরুত্ব বেশি হল?

মেয়েটার গুরুত্ব যাই হোক, বিষয়টার গুরুত্ব ছিল।

দেখ, ওসব বোলো না। পৃথিবীর ভাল-মন্দ নিয়ে ভাববার জন্য অনেক বড় বড় মাথা আছে। তোমার জন্য কিছুই ঠেকে থাকবে না। একটি দিনের জন্য পৃথিবী ক্ষয় হয়েও যাচ্ছিল না।

কৃষ্ণজীবনের মুশকিল হল, সে ভাল অভিনেতা নয়। এ সময়ে তার হয়তো খুব নরম গলায় বলা উচিত ছিল, আই অ্যাম সরি রিয়া। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। কাম অন, লেট আস ফরগেট দি হোল থিং। কিন্তু সেটা ঠিক পেরে ওঠে না সে। ওসব কৃত্রিম কথা বলতে গেলে সে মনে মনে হোঁচট খায়। রিয়ার এখন তাকে অপমান করার দরকার, তাই করছে। অপমানটা সে বরাবর মেনে এবং সয়েও নেয়। এসব ছোটখাটো ব্যাপার তাকে দমিত করে না।

ক্যাংলা কালো সাউথ ইন্ডিয়ান বাচ্চা মেয়েটার নাম আপা। অনুদের বাড়িতে পরিচয় হয়েছিল। এ বাড়িতে আজকাল প্রায়ই আসে। তারই জন্য তাদের স্কুলে যেতে রাজি হয়েছিল কৃষ্ণজীবন। সে জানে, রিয়া যতটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করল ততটা তুচ্ছ আপা নয়। আপার ধাত অন্য। কৃষ্ণজীবন মানুষকে খানিকটা চেনে। অধ্যাপিকা রিয়া বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা, সম্প্রতি ডক্টরেটও পেয়েছে। তবু আপার পাশে তাকে দাঁড় করানোই যাবে না। আপার যা আছে তা খুব কম মেয়েরই আছে। সাধারণ মেয়েদের মতো কোনও দুর্বলতা তার নেই। এইটুকু বয়সেই সে অনেক বিস্তার লাভ করেছে হৃদয়বত্তায়।

তোমার সস্তা হাততালি পাওয়ার লোভ খুব বাড়ছে। বুঝলে! অহংকারও বেড়েছে।

কৃষ্ণজীবন একটা দীর্ঘশ্বাস খুব সন্তর্পণে ছাড়ল। তারপর হেলানো চেয়ারে এলিয়ে চোখ বুজে বাক্য-বুলেটে ঝাঁঝরা হতে লাগল নীরবে। তার মূক-বধিরতা আজকাল এইসব পরিস্থিতিতে কাজে লাগে।

আজ সে স্কুলের একরাশি ফুলের মতো ছেলেমেয়ের সামনে এক ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিয়েছে চোস্ত ইংরিজিতে। বিষয় ছিল, "সেভ দি আর্থ"। তার প্রিয় বিষয়। বক্তৃতাও নয় ঠিক। একজন ব্যথিত মানুষের মুখ থেকে পৃথিবীর অন্তর্নিহিত যন্ত্রণাই যেন মথিত হয়ে বেরিয়ে এল। তার সঙ্গে মিশে গেল অবিমৃশ্যকারী মানুষের কৃতকর্মের জন্য মনস্তাপ। হল ফেটে পড়ল হাততালিতে।

বক্তৃতার পর আধ ঘণ্টা ছিল প্রশ্নোত্তরের পালা। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরাও আজকাল পৃথিবার সমস্যা নিয়ে কত ভাবছে। নানা সুন্দর ও প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করেছিল তারা। দিনটা অনেক দিন মনে থাকবে তার।

আপা সেমিনারের শেষে সোজা এসে তার হাত ধরল, আপনি আজ আমার কথাই যেন বললেন। আমিও কত ভাবি, কিন্তু এলোমেলোভাবে। আপনার চিন্তাগুলি খুব বিন্যস্ত।

কৃষ্ণজীবন হেসে বলেছিল, তুমি এরকম বাংলা শিখলে কোথা থেকে?

কিছু ভুল বললাম?

না তো! তবে এরকম বাংলায় কেউ কথা বলে না।

আমি মনে করি একটা ভাষায় যত শব্দ আছে তার সব কিছুই মুখের ভাষায় প্রয়োগ করলে একঘেয়েমি কেটে যায়। ভাষা তো ব্যবহারের জন্যই, না?

তা বটে।

প্রিন্সিপালের ঘরে যখন চা কেক দিয়ে আপ্যায়িত করা হচ্ছিল তাকে তখন স্বয়ং প্রিন্সিপাল হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, আপাকে আপনি কত দিন চেনেন?

খুব সম্প্রতি। কেন বলুন তো!

আপা আমাদের সব চেয়ে ভাল ছাত্রী। কিন্তু খুব একরোখা। ওকে নিয়ে ওইটেই প্রবলেম।

একরোখা হওয়াই তো ভাল।

প্রিন্সিপাল একটু চিন্তিতভাবে শুধু বললেন, হুঁ।

তাকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে গেল যে-দুটি ছেলেমেয়ে তাদের মধ্যে একজন আপা, অন্যজন অনুর দাদা বুবকা।

বুবকা বলল, আপা আমাকে খুব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে, যেগুলো পসিবল্ নয়।

কি কথা বলে?

বলে যে, গড়ের মাঠে যত ঘাস আছে তার ওপর যেসব গঙ্গাফড়িং লাফিয়ে বেড়ায়, আকাশে যে মেঘ ভাসছে বা টু মিলিয়ন লাইট ইয়ার দূরে যে স্টারটা মিটমিট করছে, এসবের সঙ্গে নাকি আমার রিলেশন আছে। এটা কি সত্যি হতে পারে?

কৃষ্ণজীবন একটু হাসল। তারপর বলল, আপা হয়তো খুব মিথ্যেও বলে না। কে জানে, হয়তো আছে।

কিরকমভাবে আছে? হোয়ার ইজ দি লজিক?

লজিক! না, লজিক নেই। তবে খুব সূক্ষ্ম জিনিস বুঝতে গেলে শুধু যুক্তি দিয়ে বোঝা যায় না। অনুভূতি চাই।

আপা বোঝে, আমি বুঝি না কেন? আমার কি ফাইনার ফিলিং নেই?

তা নয়। তবে সৃষ্টি জিনিসটাই তো অদ্ভুত। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে এর কোনও মানেই হয় না। এই যে আমরা জন্মেছি, সভ্যতা তৈরি করছি, কথা কইছি—এসবের মানে কি বলো তো? কেন এই প্রাণ, এই শরীর, এই অনুভব, এইসব পারসেপশন? জড় বিশ্বে হঠাৎ এসব কোথা থেকে এল? কেনই বা এল?

কেমিক্যাল রি-অ্যাকশনস। ডায়ালেকটিক···

যদি তাই হয় তাও স্পষ্ট হল না। আবছা থেকে গেল।

কিন্তু স্টার বা ঘাসফড়িং-এর সঙ্গে আমার রিলেশন কি?

আমি তা জানি না। তবে এটা জানি, সারা পৃথিবীতে যে প্রাণের প্রকাশ দেখতে পাই তার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম টিউনিং আছে। আছে প্রাণ ও জড়ের মধ্যেও একটা অদৃশ্য আত্মীয়তা। তুমি, আমি, গাছ, পাখি আলাদা ঠিকই, আবার খুব একটা অনাত্মীয়ও নই। গোটা দুনিয়াটাই যেন একটা ছক, একটা সুরে বাঁধা।

তবে আমি তা টের পাই না কেন?

চেষ্টা করলে হয়তো পাবে।

আপা পায়?

আপা হাসল না। গম্ভীর হয়ে বলল, শোনো বৃদ্ধরাম, ভালবাসা ছাড়া ওসব টের পাওয়া যায় না।

কি বোগাস কথা দেখুন। হচ্ছে সায়েন্সের কথা, ও ভালবাসা এনে ফেলল!

কৃষ্ণজীবন তার দু'পাশে বসা দুটি প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করল না। কে জানে, হয়তো এই বিবাদই ওদের বন্ধুত্বে আটকে রেখেছে।

কৃষ্ণজীবন খানিকক্ষণ ওদের তর্ক শোনার পর বলল, আপা যে ভালবাসার কথা বলছে সেটা অলৌকিক কিছু নয়। আমার মনে হয় ভালবাসা একটা এমন জিনিস যা সব জ্ঞানকে গ্রাস করে নিতে পারে।

বুবকা উত্তেজিত গলায় বলে, হোয়াট ইজ দি মিনিং অফ দিস? আমি তো বুঝতে পারছি না।

কৃষ্ণজীবন বলে, আমিও বুঝতে পারি না। কিন্তু এটা জানি ভালবাসাই মানুষকে শেখায়, জানায়, ভালবাসাই মানুষকে মানুষ করে।

সেটা কিরকম ভালবাসা?

আপা অন্য পাশ থেকে বলে উঠল, তুমি বুঝবে না।

কেন বুঝব না?

তার কারণ আছে। তুমি আজ সেমিনারে বক্তৃতা শুনে বেশ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলে তো!

বুবকা বলল, ইট ওয়াজ ইমপ্রেসিভ, ইয়েস।

কিন্তু পৃথিবীর জন্য তুমি কিছু করবে কি?

কেন করব না?

করবে না। কারণ, তুমি কয়েকদিন পরেই সব ব্যাপারটা ভুলে যাবে। আমরা যে যার কেরিয়ার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ব। চাকরি বা কিছু করব। আমাদের সব ফ্যামিলি হবে। তারপর পৃথিবী একদিকে থাকবে আর আমরা থাকব নিজেদের ধান্ধা নিয়ে। তাই না!

আমি অত সেলফিস নই।

মানছি বুবকা। তুমি অন্তত তোমার বাবাকে ভীষণ ভালবাসো।

যাঃ, ওর সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?

আছে। বাবাকে যখন ভালবাসো তখন তুমি সেলফিস নও। তাই না?

তা তো নই-ই।

এবার বুঝতে চেষ্টা করো, বাবা তোমার কাছে যেমন, এই পৃথিবীটা তোমার কাছে যদি তেমন হয়, তা হলে কেমন হবে? বাবার অসুখ হওয়ায় তুমি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলে, রাতে গিয়ে বসে থাকতে নার্সিংহোমের ফটকের বাইরে। মনে নেই?

থাকবে না কেন?

যখন পৃথিবীর গভীর, গভীরতর অসুখ টের পাও তখন কি ওরকম অস্থির হও?

মাথা নেড়ে বুবকা বলে, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। দিস ইজ গ্রীক টু মি।

আপা বলল, সেইটেই তো সমস্যা। ইট ইজ গ্রীক টু এভরিবডি।

কৃষ্ণজীবন একখানা হাত বুবকার পিঠে রেখে ধীর গলায় বলল, অত ভেবো না। রাগ করারও কিছু নেই। আপার মতো সূক্ষ্ম অনুভূতি আমারও নেই। কিন্তু আপা যা বলছে তার মধ্যে একটা সত্য থাকলেও থাকতে পারে। ব্যাপারটা তুমি হাইপথেটিক্যালি নাও।

নিতেই হবে? যদি না মানি?

তা হলেও ক্ষতি কিছু নেই।

বুবকা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, আপা খুব বিচ্ছু মেয়ে, জানেন? একটুও পড়াশোনা করে না, কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারিতে ঠিক আমাদের বিট করবে। কি করে যে পারে কিছু বুঝতে পারি না। ও ব্ল্যাক আর্ট জানে বোধ হয়!

আপা বলল, তুমি একটি বোকারাম।

কৃষ্ণজীবন আবার নীরবে বসে ওদের ঝগড়া শুনল কিছুক্ষণ। বুঝতে পারল, আপার কাছে তার বন্ধুরা নানাভাবে হেরে যাচ্ছে, রেগে যাচ্ছে। অথচ কিছু করতে পারছে না।

আজ রাতেও আপাকে নিয়ে খানিকক্ষণ ভাবল কৃষ্ণজীবন। তারপর বাড়ি নিঝুম হল। সে বসল তার বইপত্র নিয়ে।

ফোনটা এল গভীর রাত্রে। বারোটার পর।

ফচকে গলায় মেয়েটা বলল, কী করছেন?

তটস্থ হয়ে কৃষ্ণজীবন বলে, আরে! তুমি এখনও জেগে আছে নাকি?

আমার একটা পরীক্ষা আছে সামনে। তাই পড়ছি।

ওঃ।

আচ্ছা, আপনি দাদাদের স্কুলে নাকি আজ একটা দারুণ বক্তৃতা দিয়েছেন?

কে বলল তোমাকে?

কী যে আপনি! দাদাই তো বলল!

ওঃ, তাও তো বটে!

আপনি খুব বক্তৃতা দেন, না?

এটা কে বলল?

মোহিনী। শি ইজ মাই বুজুম ফ্রেন্ড।

সে তো জানি।

আপনি কিন্তু ভীষণ আনসোশ্যাল।

কেন বলো তো!

বন্ধুর সঙ্গে রিলেশন রাখেন না। আমি কতবার ফোন করি আপনাকে। কই, আপনি তো করেন না!

কৃষ্ণজীবন একটু হেসে বলে, আমি ভাল কথা কইতে পারি না যে! তোমাকে ফোন করে কী বলব বলো তো!

খবর নেবেন। কথা বলতে পারেন না, তা হলে অত ভাল বক্তৃতা করেন কি করে?

বক্তৃতা তো সাজানো ব্যাপার। কথা তো তা নয়। কথা একটা আলাদা জিনিস। আমি ভাল পারি না।

মোহিনীও তাই বলে।

তোমার কী মত?

আমার মত হল, আপনি যা আছেন তাই ভাল।

তার মানে কি?

আপনাকে আমার বেশ পছন্দ। একটু চালাকও আছেন, একটু বোকাও আছেন।

দু'রকম থাকাই ভাল বলছো?

হ্যাঁ। পুরুষদের ওরকমই আমার ভাল লাগে।

তুমি বেশ পাকা মেয়ে।

গাল দিচ্ছেন না তো!

না। পাকা মানে ম্যাচিওরড।

আজকাল সবাই ম্যাচিওরড বাবা। সবাই সব বোঝে।

তাই নাকি?

আমাদের জেনারেশনকে তো আপনি চেনেন না। চিনলে বুঝতেন। কবে দেখা হবে বলুন তো!

তোমার সময় হলেই হবে।

মোটেই না মশাই। পরীক্ষার পর হয়তো গিয়ে শুনবো, আপনি কামস্কাটকা না হয় আজারবাইজান চলে গেছেন। যা গ্লোব-ট্রটার আপনি!

মোহিনীর কাছে খোঁজ নিয়ে এসো।

হঠাৎ কৃষ্ণজীবনের মনে হল, বাইরের ঘরের এক্সটেনশন লাইনটা কেউ ধরে আছে। শুনছে তাদের কথা। একটা তৃতীয় শ্বাসের শব্দ আসছে টেলিফোনে।

সে অভিনয় জানে না। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার উপায় তার নেই। কয়েক মাস আগে কর্ডলেস টেলিফোনটা সে এনে লাগিয়েছিল বাইরের ঘরে। খুব ভুল হয়েছিল বোধ হয়।

সে বলল, আজ ছাড়ছি অনু।

ওমা, এত তাড়া কিসের? এখনই তো কথা বলতে মজা, আর একটু জেগে থাকুন না প্লীজ! একটু আড্ডা মারি।

অসহায় কৃষ্ণজীবন বলে, কিন্তু, রাত জাগা কি তোমার পক্ষে ভাল?

আমার যে আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

কি কথা?

আচ্ছা, আপনারা নাকি আজ খুব ভালবাসার কথা বলেছেন?

ভালবাসার কথা? ওঃ হ্যাঁ। কিন্তু সেটা তো—

দাদা কিছুই বুঝতে পারেনি। খুব অ্যাজিটেটেড।

ওটা অন্য ধরনের ব্যাপার।

আমাকে একদিন ভালবাসার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবেন?

তৃতীয় পক্ষ শুনছে। শঙ্কিত কৃষ্ণজীবন বলে, ওঃ, ওটা কোনও ব্যাপার নয়। আসলে ওটা হল...

কৃষ্ণজীবন এত নার্ভাস হয়ে গেল যে, কথাই খুঁজে পেল না আর। অনু খুব হাসছিল।

ফোনটা তৃতীয় পক্ষ নামিয়ে রাখল। তারপর দরজায় আচমকা দেখা দিল রিয়া। চোখ জ্বলছে। মুখখানা টকটক করছে লাল।

৫৫

প্রথম দিন সারা রাত ঘরের কাছে জলের ঢেউ-ভাঙার অবিরল শব্দ শুনতে পেল সে। শুনল নিশুত রাতে বিচিত্র পাখির ডাক। শুনল ওস্তাদি গানের ঝালার মতো তীব্র ঝিঁঝির শব্দ। কানে বিস্মৃতপ্রায় শেয়ালের দলবদ্ধ চিৎকার। আর বাতাস নানা বিচিত্র হুতাশে কত ফাঁক-ফোকর দিয়ে বাঁশির শব্দ তুলে বয়ে গেল নিরন্তর। চালের টিনে খটাং খটাং কত যে শব্দ উঠল!

ভাল ঘুম হল না হেমাঙ্গর। বারবার উঠে বসল। বারবার জানালার ঝাঁপ তুলে কুয়াশায় আবছা অন্ধকার নদীকে দেখার চেষ্টা করল। টর্চ জ্বেলে ঘরে সাপ বা বিছে ঢুকেছে কিনা তা তদারক করল। তারপর ফের শুল। উঠল। জল খেল। মাঝে মাঝে একটু একটু ভয়ও করল তার। এই বেড়ার ঘরের নিরপত্তা কতটুকু? বেড়া কেটে ঘরে ঢুকে পড়তে পারে দুষ্টু লোক, চোর। দামাল নদী যদি হঠাৎ পাড় ভেঙে গ্রাস করে নেয় ঘরসুদ্ধু তাকে? যদি ঝড় এসে উড়িয়ে নেয় ঘরের চাল?

সকালবেলা অন্ধকার থাকতেই উঠে পড়ল হেমাঙ্গ। জানালা খুলে সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় বসে রইল। কালো আকাশে প্রথম দু'খানা আবছা দিগন্তজোড়া পাখনার বিস্তার ফুটে উঠল। আলোর দুটি ডানা। সেই ডানা আকাশের অন্ধকারময়তায় রাতের তারাকে মুছে নিল। একেই কি ভোর বলে—যেমনটা সে কলকাতায় কখনও দেখতে পায় না? এত অপরূপ! দিগন্ত থেকে দিগন্তে হালকা কুয়াশার মায়জালে জড়িয়ে অস্ফুট ভোরের আলো কত ম্যাজিক দেখাতে থাকে। দু'খানা চোখ আজ দৃশ্যের ঐশ্বর্যে ডুবে গেল তার। প্রকৃতির এত অলঙ্কার আছে জানত না সে। কালো নদীর ওপর সোনালি আলপনা এঁকে উঠে আসছে সূর্য। পলক ফেলতে পারে না হেমাঙ্গ। আবেগে তার শ্বাসকষ্ট হতে থাকে।

তারপর আলোয় আলো হয়ে যেতে লাগল চারদিক। রবীন্দ্রনাথ রোজ কেন সূর্যোদয় দেখতেন তা হেমাঙ্গ যেন একটুখানি বুঝতে পারে।

এখানকার মানুষ রাত থাকতেই উঠে পড়ে। আলো ফুটতে না ফুটতেই বাঁকা মিঞা হাজির। সঙ্গে ছোট ছেলে ফজল। ফজলের হাতে কেটলি। তাতে গরম দুধ। একটা ঠোঙায় বেশ কয়েকটা দিশি নিমকি বিস্কুট।

খেয়ে নিন। এ আমার রাঙা গাইয়ের দুধ।

হেমাঙ্গ আতঙ্কিত স্বরে বলল, দুধ! ও তো আমি কখনও খাই না।

তা বললে চলবে কেন? এ দুধের স্বাদ একটু চেখেই দেখুন। হরিয়ানার গাই বা জার্সি গরু নয় যে, দশ-বিশ সের করে সাদা জল দেবে। এ দিশি গাই, দুধের স্বাদই আলাদা।

হেমাঙ্গ বিরস মুখে বলে, আচ্ছা রাখো। মুখটুখ আগে ধুই, চা খেয়ে নিই, তারপর খাবো।

ফজলকে বলতে হল না। সে বালতির বাসি জল ফেলে টাটকা জল এনে দিল টিপকল থেকে। হেমাঙ্গ দাঁত ব্রাশ করল, মুখ ধুল। ফজলই এনে দিল চা। চায়ের পর দুধটাও খেতে হল তাকে।

কেমন বুঝছেন এ জায়গা?

রাতে খুব শব্দ হয়, না?

কিসের শব্দ?

জলের, বাতাসের, পাখির, ঝিঁঝির—অনেক শব্দ।

বাঁকা মিঞা খুব হাসল। বলল, ওসব সয়ে যায়। থাকুন, দেখবেন ওসব আর কানে আসছে না। তবে থাকতে পারবেন কিনা তাই ভাবছি।

কেন বাঁকা মিঞা, পারব না কেন?

আপনার হল শখের থাকা। শখ তো দু-চার দিনের। তারপর আর গাঁ ভাল লাগে না।

হেমাঙ্গ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, দেখা যাক।

দেখুন। আপনারা এরকম মাঝে-মধ্যে এসে থাকলেও এদিককার লোকের ভাল হয়। তারা বল-ভরসা পায়। বাবুরা আসে না বলেই তো আমাদের দুঃখ।

বাবুরা এসে কি করবে?

কিছু করতে হবে না। আমাদের কোন্ তেপান্তরে বাস দেখছেন তো! এখানকার লোক ভাবে, আমরা বুঝি জন্তুই, মনিষ্যি নয়। এ গাঁয়ে গত পাঁচসাত বছরের মধ্যেও কোনও এম এল এ আসেনি, মন্ত্রী তো দূরস্থান। এখানকার সবচেয়ে বড় ভি আই পি হলেন পাশের গাঁয়ের হাই স্কুলের কয়েকজন মাস্টারমশাই। তাঁরাও তেমন কেষ্টবিষ্টু নন, এখানকারই লোক সব। আপনাদের আনাগোনা হলে আমাদের একটু কেমন যেন ভরসা হতে থাকে। সেটা যে কেমন তা বোঝানো যায় না।

দুধটা সত্যিই ভাল। অভ্যাস নেই বটে, কিন্তু খেতে বেশ লাগল।

বাঁকা মিঞা বলে, গেলাসটায় একটু জল ঢেলে তলানিটা খেয়ে নিন।

কেন?

দুধের পাত্র-ধোওয়া জল খেলে খুব পোস্টাই।

হেমাঙ্গ এই গ্রাম্য সংস্কারের কথা শুনে হাসল। তবে খেলও। হোয়েন ইন রোম, বিহেভ লাইক রোমানস্।

দুপুরে কী খাবেন?

বেশি আয়োজন কোরো না। তোমরা যা খাও তা হলেই আমার হবে।

চালটা কি একটু মোটা ঠেকছে?

খারাপ লাগছে না।

মোটা চালের ভাত খেতে আপনাদের অসুবিধে হয়, কিন্তু এখানে মোটা চাল ছাড়া পাওয়া যায় না। সরু চাল খেতে হলে সেই সন্দেশখালি বা সোনাখালি যেতে হবে।

না না, তার দরকার নেই। আমার খেতে কোনও কষ্ট হচ্ছে না।

বাঁকা মিঞা একটু হাসল, আপনার দেখছি এ জায়গার ভূতে পেয়েছে। সবই ভাল লাগছে। এখানেই আমার হাড়ে ঘুণ ধরল, কিন্তু কই ভাল কিছু তো দেখলাম না। এ হল মরা জায়গা। যা ছিল তাই আছে। এ জায়গার কোনও উন্নতিও নেই, অধোগতিও নেই। অধোগতির আর আছেটাই বা কী বলুন, তলানিতে এসে ঠেকেছি, পাছবেড়ায় পিঠ।

তবু তো আগেকার মতো কলেরা বসন্তে গাঁ কে গাঁ সাফ হয়ে যাচ্ছে না। সেটাও তো একটা ভাল লক্ষণ।

তা যা বলেছেন। কলেরা-টলেরা হয় না আজকাল। টিপকল হয়ে ইস্তক হচ্ছে না। কিন্তু বেঁচে থাকাটাও যে মরার মতোই হচ্ছে। ধুঁকতে ধুঁকতে টিকে থাকাকে কি আর বেঁচে থাকা বলে? বেড়াতে বেরোবেন নাকি?

নদীর ধার দিয়ে একটু হেঁটে এলে হয়।

তাহলে বেরিয়ে পড়ুন। ডান ধারে যাবেন না, ওদিকটায় লোকে হাগে। বাঁ ধারে একখানা মেটে বাঁধ আছে, অনেক দূর অবধি গেছে। ওদিকটা তত অপরিষ্কার নয়। তবু সাবধানে যাবেন। বাঁধের ওপর রাস্তা আছে। লোক চলাচল আছে।

ঘরে তালা দিতে হবে নাকি?

না দিলেও হয়। তবে ভেজিয়ে রেখে শেকলটা তুলে দিয়ে যাবেন। কুকুর-টুকুর ঢুকে পড়তে পারে।

এই বলে বাঁকা মিঞা চলে গেল। হেমাঙ্গ পোশাক পরে ঘরে শেকল দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। রোদ উঠেছে বটে, কিন্তু নদীর ওপর দিয়ে কনকনে বাতাসও আসছে। বাঁধটি চমৎকার। উঠে দাঁড়ালে নদীর বাঁকটা বহু দূর অবধি দেখা যায়। জলে রুপোলি রোদুর খেলা করছে। উজান-ভাটেনে ভটভটি, নৌকো চলছে মন্থর গতিতে।

বাঁধের ধারেও মানুষ প্রাকৃতিক কাজ সারে। দমকা হাওয়ায় মাঝে মাঝে দুর্গন্ধ আসছে। নাকে রুমাল চাপা দিতে ইচ্ছে হল তার। আবার ভাবল, এসব সয়ে নেওয়াই ভাল। অত শুচিবাই হলে চলবে না।

এই অজ্ঞাতবাসের কথাও যে জানাজানি হয়ে যাবে তা হেমাঙ্গ জানে। হয়তো জানাজানি হয়েও গেছে এতক্ষণে।

এক রবিবার রাত্রে রশ্মির সঙ্গে তার যে প্রগাঢ় সংলাপ হয়েছিল টেলিফোনে সেটাই হেমাঙ্গকে এত দূর ছুট করিয়েছে। উইক ডে-গুলো তত ভয়ের নয়। ভয় হল শুক্রবার বিকেল থেকে রবিবারের রাত অবধি। রশ্মির বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণের পর নিমন্ত্রণ আসছে আজকাল। পার্টি হচ্ছে ঘন ঘন। বিয়ের কথাটা খুব স্পষ্টভাবে ওরা উচ্চারণ করছে না হেমাঙ্গর সামনে।

কিন্তু বিডন স্ট্রিটের বাড়িতে প্রস্তাব গেছে এবং গৃহীত হয়েছে।

স্বয়ং বাবাই ডেকে পাঠালেন এক রবিবারে। অতি ব্যস্ত ও অন্যমনস্ক মানুষ। অনেক কথা খেয়াল রাখতে পারেন না। সেদিনও তাঁর কোথায় যেন একটা জরুরি মিটিং ছিল। হেমাঙ্গকে দেখে বেশ ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন, ওরা এসেছিল। তা ভালই তো। সবই তো ঠিক আছে। তুমি কি বলো?

বিনা ভূমিকায় এরকম কথা বললে যে তার কোনও মানেই দাঁড়ায় না সেটা দুর্গানাথবাবুর মাথাতেই ছিল না। তিনি বোধ হয় মিটিঙের জরুরিতর বিষয়টি নিয়েই ভাবছিলেন।

হেমাঙ্গ অবাক হয়ে বলে, কিসের কি ঠিক আছে বাবা?

দুর্গানাথবাবু ছেলের প্রশ্নটি অনুধাবন করতে পারলেন না। অত্যন্ত উদারভাবে বললেন, আমি অবশ্য আমার ছেলেমেয়েদের কেউ বিদেশে বসবাস করুক চাই না। কিন্তু কী আর করা যাবে! তবে আমি মনে করি

ছেলেমেয়ে হলে তাদের আর বিলেতে রেখো না। অন্তত স্কুলিংটা এদেশে হলে ভাল হয়। মাতৃভাষাটাও শেখা হয়ে যাবে। তারপর মাধ্যমিক পাস করলে না হয় আবার ফিরে গিয়ে হায়ার এডুকেশন ওখানে নেবে। কি বলো?

হেমাঙ্গ একেবারেই বুঝতে পারছিল না তা নয়। সে অন্তত এটা বুঝতে পারছিল যে, তার ব্যস্ত বাবা ডিটেলসে না গিয়ে, ভূমিকা না করে শুধু স্যালিয়েন্ট পয়েন্টগুলো বলে যাচ্ছেন। বেশি কথায় সময় নষ্ট হয়।

হেমাঙ্গ অবাক হওয়ার ভান করে বলল, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

দুর্গানাথবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, সেরকমই তো সব ঠিক হয়েছে শুনলাম। আমরাও তো মত দিয়েছি।

ঠিক এই সময়ে মা এসে ঘরে ঢুকল। মুখে বেশ একটু হাসি-খুশি ভাব। উজ্জ্বলতাও দেখা যাচ্ছে। জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন, ওঃ, ঠাকুরের কাছে কত মানত করেছি। ছেলের এতদিনে মতি হল।

হেমাঙ্গ গম্ভীর হল। কিংবা গাম্ভীর্যের মুখোস পরল। বলল, তোমরা কি বিয়ের কথা বলছো মা? কিন্তু আমি তো এখনও মনস্থির করিনি।

দুর্গানাথবাবু একটু অবাক হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালেন।

মা বলল, ওরে, অত লজ্জা পেতে হবে না। লাভ ম্যারেজ বলে কি আমরা কেউ কিছু আপত্তি করেছি? দিনকাল পাল্টেছে, এখন যুগের হাওয়া মেনে নিতে হবে বৈকি। মেয়েটাও ভারি চমৎকার।

হেমাঙ্গ দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, মা, আমি কিন্তু মতামত এখনও দিইনি। আমাকে ভাববার সময় দাও।

দুর্গানাথবাবু অবাক হয়ে বললেন, ভাববে! ভাববে কি? তাঁরা যে প্রস্তাব দিয়ে ফেলেছেন! চারু তো বলে গেছে, তোমার নাকি খুবই মত আছে।

চারুদিদি ঠিক কথা বলেনি।

দুর্গানাথবাবু ফের স্ত্রীর দিকে তাকালেন, কী বলছে এ?

মা বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি মিটিঙে যাও তো। আমি সব বুঝে দেখছি।

দুর্গানাথবাবু একটু তাড়াহুড়ো করেই বেরিয়ে গেলেন। সংসারের সাতপাঁচের মধ্যে তিনি বিশেষ থাকতে চান না কখনও।

তারপর মা ধরে পড়ল তাকে, কী হয়েছে বল তো! চারু বলছে তার নাকি ও মেয়ের সঙ্গে খুব ভাব। পাত্রীর বাড়ির লোকেও বলছে তোদের নাকি বোঝাপড়া হয়ে গেছে। তাহলে আবার ওসব বলছিস কেন?

মা, বাঙালি ছেলেদের তো বিয়ে করা ছাড়া আর কোনও অ্যাচিভমেন্ট নেই। তা আমার সেটা হয়ে গেলে জীবনে আর কী থাকবে বলো!

বিয়ে করা ছাড়া আর কিছু থাকবে না কেন?

আর কী বলল তো! বাঙালিদের প্রেম হল সবচেয়ে বড় অ্যাডভেঞ্চার আর বিয়ে হল মস্ত কীর্তি। ব্যস জীবনের সব সার্থকতা হয়ে গেল।

কথা ঘোরাচ্ছিস! কী হয়েছে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বল তো। মেয়েটার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস নাকি? সে যে বড় ভাল মেয়ে। বিলেত-ফেরত বলে মনেই হয় না। সহবত জানে খুব।

একটু অধৈর্য হয়ে হেমাঙ্গ বলে, রশ্মি খুব ভাল মেয়ে। তাকে বিয়ে করতেও আমার আপত্তি থাকা উচিত নয়। তবে আমার একটু সময় চাই।

সময়? সে মেয়ে যে আর ক'মাস পর বিলেত চলে যাবে। তার নাকি সেখানে আরও কী সব পড়াশুনো করার আছে, চাকরিও পাকা। ওর বাপ-মা এবার ওকে একা ছাড়বে না, বিয়ে দিয়ে বরের সঙ্গে পাঠাবে।

সেটা ওদের দিককার কথা। ওরা যা বলবে তা-ই আমাকে করতে হবে নাকি? আর এখন আমি বিলেত গেলে তোমার মন খারাপ হবে না বুঝি? যখন গিয়েছিলাম তখন তো প্রতিটি চিঠিতে 'ফিরে আয়, ফিরে আয়।'

মা হাসল, সে তখন একা ছিলি বলে। এখন তো তা নয়। বউ সঙ্গে থাকবে।

হেমাঙ্গ কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। শুধু বলল, আমাকে বিলেত যেতে হবে কেন তা-ই তো বুঝতে পারছি না। বিলেতে থাকা আমার পছন্দ নয়। ওদের সেটা ভাল করে বুঝিয়ে দাও।

মা চোখ কপালে তুলে বলে, বোঝাপড়া তো তোরাই করেছিস। আমরা এর মধ্যে মতামত দিতে গেলে কি ভাল দেখায়? যা বলার সে তো তুই-ই ওদের বলতে পারিস। কে কোথায় থাকবি না-থাকবি তা কি আমরা জানি?

হেমাঙ্গ এত অসহায় বোধ করতে লাগল যে আর কোনও কথাই বলতে পারল না। রশ্মির সঙ্গে তার একটা ভাবপ্রবণ সম্পর্ক গড়ে উঠতে না-উঠতেই যে সেটা বিয়ের দিকে এত তাড়াতাড়ি গড়িয়ে যাবে এ তো সে স্বপ্নেও ভাবেনি। সবাই কেন ধরেই নিল যে, সে বিয়েতে রাজি? একটা মতামত জিজ্ঞেস করারও কেন কেউ প্রয়োজন বোধ করল না? কেন রশ্মিও নয়?

বিডন স্ট্রিট থেকে সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো গরচায় ফিরে এল। বুঝতে পারল, তার মাথা কাজ করছে না। তার মন অত্যন্ত চঞ্চল। সে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

রাত্রিবেলা সে নিজেই চারুশীলাকে ফোন করে বলল, তুই কী কাণ্ড করলি বল দেখি!

কি করেছি?

রশ্মির আর আমার মধ্যে কেবলমাত্র বন্ধুত্ব ছিল। সেটাকে রোমান্টিক করে তুললি কেন বল তো! শোন, ইয়ার্কি করিস না। ইয়ার্কির সময় এটা নয়।

চারুশীলা সাবধানী গলায় বলল, কেন, কি হয়েছে?

আজ বিডন স্ট্রিটে গিয়েছিলাম। বাবা ডেকে পাঠিয়েছিল। ওখানে ফর্মাল বিয়ের প্রস্তাব গেছে। আর সেটা আমাকে না জানিয়েই।

তাতে দোষটা কি হয়েছে? অমন সিরিয়াস হচ্ছিস কেন?

হবো না? বিয়ে করব আমি, আমাকে সেটা জানানোই হল না। বিয়ের পর আমি কোথায় থাকব না-থাকব, ভারতে না বিলেতে তাও সব আমাকে না জানিয়েই ঠিক হয়ে যাচ্ছে! আমাকে কি পেয়েছিস তোরা?

সরি। কিন্তু তোকে নেগলেক্ট করে এসব করা হয়নি রে। আসলে সবাই ধরে নিয়েছে যে, বিলেতে থাকতে তোর আপত্তি হবে না।

সেটা কে ধরে নিল?

চারুশীলা একটু চুপ করে থেকে বলল, রশ্মি আমাকে বলেছিল, বিলেতে থাকা তোর পছন্দ নয়। তখন আমি বলেছিলাম যে, তোকে আমিই রাজি করাব।

বিলেতে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। তারও আগে প্রশ্ন আছে। আমি বিয়ে করতে রাজি একথা আমি এখনও বলিনি।

সব কথা কি বলতে হয়? বোঝা যায় না?

ভুল বুঝেছিস।

মোটই ভুল বুঝিনি। রশ্মি অত সস্তা মেয়ে নয় যে নিজেই বানিয়ে ওসব কথা বলবে।

রশ্মি কি বলেছে?

বলেছে, তোদের মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে।

ওটাকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং বলে না। আমাদের সম্পর্কটা এখনও ভাল করে শুরুই হয়নি। উই আর স্টিল ওনলি ফ্রেন্ডস্।

শোন লক্ষ্মী ভাই আমার, তোর ইগোতে একটু লেগেছে বুঝতে পারছি। কিন্তু ওটুকু ক্ষমা-ঘেন্না করে নে। রশ্মি যে ভীষণ ভাল মেয়ে তা তো জানিস। এ মেয়েটাকে কিন্তু ডিচ করিস না। প্লীজ!

ডিচ করব কেন? আমি তো কোনও কথা দিইনি। আমাকে কি জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল না। একবার?

ছিল। একশবার ছিল। কিন্তু তোর হয়ে আমিই যে সব বলে দিয়েছি।

সেটা বুঝতে পারছি। তুই সাঙ্ঘাতিক ভুল করেছিস।

ওরে শোন, তোদর হয়তো আরও একটু সময় দেওয়া উচিত ছিল। মানছি। তবে কী জানিস, রশ্মি তো কিছুদিনের মধ্যেই বিলেত চলে যাবে। ওর হাতে সময় নেই। মেয়েটাকে আমি হাতছাড়া করতে চাইনি। এত ভাল একটা মেয়েকে হাতছাড়া করা কি উচিত? মাথা ঠাণ্ডা করে একটু ভাব তো!

আমার হয়ে সব ভাবনা তো তোরাই ভেবেছিস। আমার জন্য তো ভাববার মতো আর কিছু রাখিসনি।

রাগ করিস না। একটু ভাববার চেষ্টা কর। তোদের সম্পর্কটা হয়তো এখনও ততটা ম্যাচিওর করেনি। কিন্তু একদিন তো করবেই। সিচুয়েশনটা এমন হল যে, ম্যাচিওর করার জন্য অপেক্ষা করা চলে না। রশ্মির মা-বাবাও ওকে প্রেশার দিচ্ছে তাড়াতাড়ি ডিসিসন নেওয়ার জন্য। ওরা বিয়ে না দিয়ে রশ্মিকে ছাড়বে না।

সেটা ওদের ব্যাপার। তার জন্য আমাকে স্কেপগোট করছিস কেন?

স্কেপগোট! সে কী রে! তুই স্কেপগোট হতে যাবি কেন? তোর সেন্টিমেন্ট না-থাক, রশ্মির যে ভীষণ আছে। ও যে তোকে ভালবাসে সেটা বুঝতে পারিস না বুদ্ধ কোথাকার? ওর ভালবাসার দাম দিবি না?

হেমাঙ্গ ফের অথৈ জলে পড়ে গেল। ভালবাসার ব্যাপারটা সে খুব জোরের সঙ্গে অস্বীকারও করতে পারছে না।

তখনই সে বুঝতে পারল, তার কিছুদিন একটু তফাত হওয়া দরকার। গর-ঠিকানিয়া হওয়া দরকার। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া দরকার। কলকাতার সিস্টেমের মধ্যে থেকে নিজেকে ঠিকমতো বুঝতে পারে না সে।

আজ সকালে বাঁধের ওপর দিয়ে ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে সে গোটা ব্যাপারটাকে বারবার ভাবছিল। সপ্তাহের শেষে দুটি দিন, শনি আর রবি তার পক্ষে একটু বিপজ্জনক। প্রায় প্রতি শনি আর রবিতেই রশ্মিদের বাড়িতে তার নিমন্ত্রণ হচ্ছে। সে এড়াতেও পারে না।

কিন্তু তার মন ভরে যায় বিস্বাদে। রশ্মিকে তার অপছন্দ নয়, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ধরে-বেঁধে তাকে রশ্মির সঙ্গে যুতে দেওয়া হচ্ছে বলেই তার ভিতরটা শক্ত হয়ে উঠছে। উপরন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিলেত-বাস।

হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর গেল হেমাঙ্গ। চারদিকে নিস্তরঙ্গ জীবন-যাপন, উত্তেজনাহীন প্রকৃতি, ধীর নৌকা, স্থির আকাশ ক্রমে মাথা থেকে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগকে উড়িয়ে দিল।

বাঁ দিকের নাবালে ক্ষেতখামার আছে বটে কিন্তু বুজের তেমন সমারোহ নেই। গাছপালা তেমন ঘনবদ্ধ নয়। এসব জায়গায় আগে হয়তো ঘন বন ছিল। বসত হয়ে জঙ্গল পিছু হটে গেছে।

অনেকটা হেঁটে বেশ খিদে পেয়ে গেল তার। ফিরে এল।

ফজল তার জন্য নাস্তা নিয়ে এল সকাল আটটা নাগাদ। রুটি আর আলুর তরকারি। ছেলেটা লাজুক এবং স্বল্পভাষী। কিন্তু মুখে একটি মিষ্টি হাসি লেগেই আছে। পরনে লুঙ্গি আর একটা পাঞ্জাবি। নিতান্তই কিশোরবয়স্ক।

কোন ক্লাসে পড়িস রে ফজল?

ক্লাস সিক্সে।

বয়স কত হল?

পনেরো ষোলো হবে।

পাস করিস ঠিকমতো?

ফজল খুব লজ্জাটজ্জা পেয়ে বলে, দু'বছর ফেল মেরেছি।

ফেল মারিস কেন?

ফজল নিরুত্তর।

খাওয়া শেষ করে হেমাঙ্গ বলল, যখন আমি এখানে আসব তখন আমার কাছে বই নিয়ে চলে আসবি। পড়া তৈরি করিয়ে দেবো। বুঝেছিস?

জী।

বাসন নিয়ে ফজল চলে গেল। জানালা খুলে ফের নদী দেখতে বসে গেল হেমাঙ্গ। ভাবল, কি দরকার তার কলকাতায় পড়ে থাকার? এই যে সভ্যতাবর্জিত, বিজ্ঞানরহিত, প্রগতিবিহীন একটি গরিব গ্রাম, সে তো বাকি জীবনটা এখানেই কাটাতে পারে। এখানে সে আবার পুরনো দিনের মতো অরণ্য সৃষ্টি করবে, খামার করবে, চারদিকে গাছপালা নিয়ে তার মধ্যে বসবাস করবে। খারাপ কি? যদি বিয়ে করতেই হয় সে তো এখানকার একটি গেঁয়ো মেয়েকেই বিয়ে করতে পারে। বেশ তো হবে তা হলে। শহরের কত লোক পালাচ্ছে প্রকৃতির কোলে।

দুপুরে খাওয়ার সময় সে বাঁকা মিঞাকে বলল, শোনো বাঁকা, আমি যদি এখানে আরও জমি নিতে চাই ব্যবস্থা করে দেবে?

আরও জমি? বাবুর দেখি মাথাটাই খারাপ হল। এখানে জমি নিয়ে করবেনটা কী!

চাষবাস করব, জঙ্গল তৈরি করব, ডেয়ারি করব।

বাঁকা খুব হাসল, সে তো ভাল কথা। কিন্তু শহরে থাকবেন আর এখানে জমিদারি পত্তন করবেন তা কি হয়? দিনকাল খারাপ। বেদখল হয়ে যাবে, লোকে পিছনে লাগবে।

তার জন্য তুমি আছো। ঠেকাবে।

এ গাঁ আপনার মাথাটা খেয়েছে।

এ গাঁ বলে নয়। আমার আর শহরে থাকতে ইচ্ছে হয় না।

কলকাতা এখন একটা নরককুণ্ড তা ঠিক। তবে এখানে চট করে একগাদা টাকা ঢেলে বসবেন না। ভাল করে ভাবুন। বাবুর সঙ্গেও পরামর্শ করুন। আপনার হল ছেলেমানুষী বুদ্ধি।

আমার ওপর তোমার বিশ্বাস নেই?

বাঁকা হেসে ফেলল, শোনো কথা! আপনারা কত বিদ্যে ধরেন, কত মাথা খাটান, দেশটা তো আপনার মতো লোকেরাই চালায়। তবে কিনা আপনার ক্ষতি হয়ে গেলে এই বাঁকার ঘাড়েই দোষ চাপবে। লোকে বলবে, আমিই আপনাকে এইসব বুদ্ধি দিয়েছি।

সেটা আমি বুঝব। তোমাকে কেউ দোষ দেবে না।

এ হল নোনা মাটির জায়গা। ফসল ভাল হয় না।

ফসলের জন্য মাথাব্যথা নেই। বড় গাছ তো হয়।

সব গাছ হবে না। তবে কয়েক ধরনের গাছ হয়।

আমি বড় গাছ করতে চাই। জঙ্গল।

সে তো মেলা জমি লাগবে। জঙ্গল রক্ষা করা কঠিন কাজ।

তবু তুমি জমি দেখ। সস্তা যেন হয়। এক লপ্তে অনেকটা।

৫৬

এক-একটা দিন আসে সকাল থেকে রাত অবধি যেন ভাল জিনিসে ঠাসা। সেদিন যেন সুখ একেবারে উপচে পড়তে থাকে। সকালে সূর্যটা যেন অন্য রকম করে ওঠে, পাখি যেন অন্য রকম করে ডাকে, সেদিন মা সকালের জলখাবারে দুটোর বদলে তিনখানা রুটি দিয়ে ফেলে, এক চিমটির বদলে এক ডেলা গুড়, সেদিন ইস্কুলে মাস্টারমশাইরা একবারও বেত মারেন না, সেদিন গোপাল সারাক্ষণ আনন্দের নানা রকম শব্দ করে, বাবা সেদিন একটুও মাতাল হয় না, ন'পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে সেদিন হঠাৎ ভাবসাব হয়ে যায়, সন্ধের পর আধখানা চাঁদ ঠিক যেন সোনার নৌকোর মতো আকাশে ভেসে ভেসে বেড়ায়, বারান্দায় বসে দাদুর কাছে সেদিন ভারি চমৎকার একখানা রূপকথার গল্প পেয়ে যায় সে।

সেরকম দিন অবশ্য কমই আসে। অনেক সময় দিনটা অর্ধেক তার মনের মতো হল, বাকি অর্ধেকটা হল অন্য রকম। কিংবা সকালটা ভাল গেল, বিকেলটা মনমরা।

আজকের দিনটা কেমন যাবে তা বুঝতে পারছিল না পটল। লক্ষণ মোটেই ভাল নয়। সকালে মায়ের হাতে চড়চাপড় খেয়ে ঘুম থেকে উঠেছে। উঠতেই মা ধাক্কা দিয়ে তাকে আর গোপালকে নামিয়ে দিয়েছে চৌকি থেকে, যা, যা, বেরো।

রাতে খুব ঝগড়া হচ্ছিল মা আর বাবাতে। প্রায়ই হয়। কাল লাগল কমলালেবু আর আঙুর নিয়ে। এ বাড়িতে ভাল জিনিস যা আসে তা দাদুকেই সবটা দেওয়া হয়। দাদু ইচ্ছেমতো খেয়ে কিছু বাঁচলে তারা ভাগজোখ করে প্রসাদ পায়। কাল সন্ধেবেলা বাবা কয়েকটা কমলালেবু আর এক থোলো আঙুর নিয়ে এসেছিল দাদুর জন্য।

রাতে ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার পর মা ফোঁস করল, অতগুলো লেবু আর আঙুর শ্বশুরমশাইয়ের হাতে দিলে, আমার ছেলে দুটো জুলজুল করে চেয়ে দেখল। খুব ভাল করলে সেটা? উনি তো অনেক খেয়েছেন, খাচ্ছেন, আমার ছেলে দুটো কি খায়? সময়ের জিনিস একটু দিতে হয় না ওদের?

চুপ করো তো! ওদের সামনে অনেক খাওয়া পড়ে আছে। বাবা-মা'র তা নেই। বাপ-মায়ের আশীর্বাদের একটা দাম আছে।

ছাই আছে! উনি তো খান আর হাগেন। কী লোভী লোক বাবা। যা আনা হচ্ছে পেটে সইবে না জেনেও হামলে পড়ে রাক্ষসের মতো খাবেন। পরদিন থেকেই হাগা ছোটে। আশাবাদ না হাতি! নজরও ছোট বাবা, দুটো অবোধ শিশু চেয়ে থাকে, কখনও বলেন না, ওরে পটল, ওরে গোপাল, নে একটু খা।

মিথ্যে কথা বোলো না। বাবা-মা কখনও ওদের না দিয়ে খায়?

দিয়ে মোটেই খায় না। আগে খায়, তারপর তলানি কিছু পড়ে থাকলে দয়া করে দেয়। তা অমন অচ্ছেদ্দার জিনিস আমার ছেলেরা খাবে কেন? ওরা কি ভিখিরি? ওদের বাপের পয়সাতেই তো ভালমন্দ জুটছে!

পটল সভয়ে বুঝতে পারছিল, আবহাওয়া গরম হচ্ছে। তার বাবা যেদিন মদ না খায় সেদিন মাটির মানুষ। খেলেই টং। কপাল খারাপ, মাতাল না হলেও বাবা একটু নেশা করে এসেছিল। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, চুপরও বেয়াদব, বাপ-মাকে খাওয়াই নিজের পয়সায়, তোমার বাপের পয়সায় নয়। বেশি কথা কইলে মুখ ভেঙে দেবো।

মাও ছাড়বার পাত্রী নয়। বলল, মুখ ভাঙবে! ইস কত মুরোদ, বটতলার গুণ্ডারা তো কান ধরে ওঠবোস করায়। তখন বীরত্ব কোথায় থাকে?

কে ওঠবোস করায়, বল মাগী। কে ওঠবোস করায়? কোন সুমুন্দির পুত?

জানি, সব জানি। ভগবান সইবে না বুঝলে, ভগবান সইবে না। দুটো দুধের শিশুকে বঞ্চিত করে রোজ তাদের চোখের সামনে গপ গপ করে খাওয়া— এরও বিচার আছে।

আলবাৎ খাবে। একশবার খাবে।

তারপর ঝগড়া কতদূর গড়িয়েছিল তা আর পটল জানে না। সে ঝগড়া শুনতে শুনতেই ঘুমিয়ে গিয়েছিল। সারাদিন মাঠ-ঘাট চষে, সাইকেল চালিয়ে, বাজারহাট করে, সাঁতার কেটে তার শরীর সন্ধের পরই ভেঙে আসে ঘুমে।

সকালে পিঠে পটাপট চাঁটি খেয়ে ঘুম ভাঙতেই বুঝতে পেরেছিল, ঝগড়াটা সারা রাত ধরেই চলেছে বোধ হয়। মারধরও হয়ে থাকবে, সে টের পায়নি।

কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে সে আর গোপাল কাঠকয়লার গুঁড়ো দিয়ে দাঁত মাজছিল। ফটকিরি আর কাঠকয়লা পিষে মাজনটা মা-ই বানিয়ে দেয়।

দাঁত মাজতে মাজতে অবোধ ভাইটার দিকে চেয়ে পটল বলল, আজ দিনটা খারাপ যাবে রে গোপাল। বউনি ভাল হয়নি।

গোপাল খুব গম্ভীর হয়ে দাদার দিকে চেয়ে থাকে। শুনতে পায় না, বলতেও পারে না। কিন্তু গোপাল বুঝতে পারে। সব বুঝতে পারে।

কুয়ো থেকে জল তুলে আগে গোপালের মুখ ধুইয়ে দেয় পটল। তারপর নিজে মুখ ধোয়। সকালে জলখাবারের পাট আছে কিনা তা বুঝতে পারে না। মা রেগে গেলে রান্নাঘরের দিক মাড়ায় না। বেলা অবধি দেখে ঠাকুমা উনুন ধরাতে বসে। তখন আর জলখাবারের আশা থাকে না।

রান্নাঘর থেকে উনুনের ধোঁয়া বেরোচ্ছে না দেখে পটল নিরাশ হয়ে দাওয়ায় মাদুর পেতে পড়তে বসে গেল। বাড়িতে গোলমাল বাঁধলে বরাবর সে বই নিয়ে বসে যায়। তাতে তার ওপর হামলা কম হয়। পড়ার সময় গোপাল তার গা ঘেঁষে চুপটি করে বসে থাকে। রোজ। পটল পড়ে, গোপাল কি তা বুঝতে পারে?

হ্যাঁ রে গোপাল, তুই কিছু বুঝতে পারিস? এই খাতা নে তো, একটা অ লেখ দিকিনি।

গোপাল খাতা নেয়, পেনসিলও নেয়। কিন্তু কী করতে হবে তা বুঝতে পারে না। পটলের দিকে চেয়ে থাকে শুধু।

পটলের বিশ্বাস, গোপাল একদিন ভাল হয়ে যাবে। লেখাপড়া করবে। তার আশা, একদিন এক সন্ন্যাসী এসে হাজির হবেন। লম্বা জটাজুট, হাতে ত্রিশূল। গোপালকে শিকড়বাকড় বা মাদুলি দিয়ে ভাল করে দিয়ে যাবেন।

গোপালকে আরও কাছে টেনে নিয়ে একটু আদর করে পটল। যে যাই করুক, সে কখনও গোপালকে মারে না, বকে না, অবহেলা করে না। নিজের ভাগ থেকে ওকে খাবার দেয় পটল। পয়সা থাকলে মারবেল, ঘুড়ি বা লাট্টু এনে দেয়।

খিদের চোট সামলানো মুশকিল। পেটে চনচন করছে খিদে, কিন্তু রান্নাঘরে কোনও নড়াচড়া নেই। ওপাশের ঘরের দাওয়ায় দাদু বসে আছে রোদে পা মেলে। ঠাকুমা এখনও ওঠেনি। ঠাকুমা উঠে দাঁত মাজবে, কাপড় ছাড়বে, ঠাকুর পুজো করবে, তারপর রান্নাঘরে গিয়ে বউমার খোঁজ নেবে। উনুন ধরবে তারও পর।

পটল চাপা গলায় বলে, তোর খিদে পায়নি গোপাল?

একথাটা যেন গোপাল বুঝতে পারল। একটা অদ্ভুত ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করল হঠাৎ। এ শব্দের মানে শুধু পটল জানে। তার মানে, গোপালের খিদে পেয়েছে।

বাবা বাড়ি নেই। মা বোধ হয় ঘুমোচ্ছ। কী যে হবে!

খিদে পেলে সবসময়েই ভাল ভাল খাবারের কথা মনে পড়ে। এই যে কিছুদিন আগে মামাবাড়ি গিয়েছিল তখন একদিন ছোটমামা তাকে আর গোপালকে নিয়ে গিয়ে হিং-এর কচুরি খাইয়েছিল একটা দোকানে। সেই স্বাদটা যেন এখনও জিবে লেগে রয়েছে, নাকে গন্ধটাও আসছে যেন। এখন সেই কচুরি পেলে ক'খানা খাবে পটল? গোটা কুড়ি উড়িয়ে দিতে পারবে না? খুব পারবে।

একমুঠো মুড়ি পেলেও এখন হত। কিন্তু মা নিয়ম বেঁধে দিয়েছে জিজ্ঞেস না করে কোনও খাবার জিনিসে হাত দেওয়া যাবে না। কিন্তু জিজ্ঞেস করাটাই এখন সমস্যা। মা আর বাবায় যেদিন খুব ঝগড়া হয় তার পর দিন দুই সময়টা ভাল যায় না তাদের।

ও দাদু!

বিষ্ণুপদ ওপাশের দাওয়ায় বসে হাঁ করে পেঁপেগাছের ডগার দিকেই চেয়ে ছিল বুঝি। দাদু যে সারাদিন কি করে এত বসে থাকতে পারে সেটাই পটল বুঝতে পারে না। বসে থাকে আর চেয়ে থাকে। এ গাঁয়ের অন্য সব দাদুরা তার দাদুর মতো নয়। তারা নাতিপুতির সঙ্গে খুব মেলামেশা করে, গল্প করে, বেড়াতে নিয়ে যায়, লাঠিপেটাও করে। তার দাদু যেন বড্ড দূরের মানুষ। কোথা থেকে বেড়াতে এসেছে, আবার চলে যাবে। দাদু এ বাড়ির একমাত্র লোক যার সঙ্গে কারও ঝগড়া নেই, তর্ক নেই। দাদুকে যে যা বলে মুখ বুজে সয়ে যায়।

দাদু সাড়া দিল না দেখে পটল ফের চাঁপা গলায় ডাকে, ও দাদু!

সাড়া নেই। বেশি জোরে ডাকাও যাচ্ছে না। মার হয়তো ঘুম ভেঙে যাবে। দাদু বা ঠাকুমার ওপর মা মোটেই খুশি নয়। আড়ালে সবসময়ে রাগে গরগর করে। কেন যে রাগ তা বুঝতে পারে না পটল। দাদু ভালমন্দ খায় বলেই কি? এই যে তার বাবা সবসময়ে দাদু আর ঠাকুমার জন্য ভালটা মন্দটা নিয়ে আসে এটা কি খারাপ কাজ? দাদু আর ঠাকুমাকে একটুও খারাপ লাগে না পটলের।

পটল আর দাদুকে ডাকল না। সন্তর্পণে দাওয়া থেকে নামল, তারপর উঠোন পেরিয়ে সোজা ঠাকুমার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ও ঠাকুমা, এখনও ঘুমোচ্ছো যে?

নয়নতারা পাশ ফিরে বলল, এই উঠছি। কেন রে?

মা ওঠেনি। বড্ড খিদে পেয়েছে যে।

তোর মা ওঠেনি কেন?

মনে হয় উঠবে না। বাবার সঙ্গে রাতে ঝগড়া হয়েছে।

নয়নতারা একটু যেন কষ্ট করে উঠে বসল, কোমরটায় রস নেমে এমন অবস্থা যে, শোয়া থেকে উঠতে গেলে প্রাণটা বেরিয়ে যায়। তা কি নিয়ে ঝগড়া হল আবার?

চালাক পটল সেটা ভাঙল না। বলল, তা জানি না।

ঝগড়ায় ঝগড়ায় সংসারটাই ঝাঁঝরা হয়ে গেল। গোপালটার মুখ তো দেখছি শুকিয়ে গেছে। আহা, অবোলা ছেলে। ওই ওখানে দেখ তো, তাকের ওপর কমলালেবু রাখা আছে, দুটো নিয়ে গিয়ে দু'জনে খা। আমি ঠাকুর পুজো সেরে রুটি করে দিচ্ছি।

কমলালেবুর ছিড়ে কখনও ফেলে না তারা। সবটা গিলে ফেলে। জোটে অবশ্য খুবই কম। দু'ভাই গপাগপ কমলালেবু খেয়ে ফেলল। কিন্তু একটু ভুল করে ফেলল পটল। খোসাগুলো সময়মতো ফেলে দিয়ে আসেনি। মাদুরের ওপরেই রেখে দিয়েছিল জড়ো করে, পরে ফেলবে বলে। কিন্তু সময় পাওয়া গেল না।

হঠাৎ রাঙা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল, এসব কি?

এ মা তার রোজকার চেনা মা নয়। রেগে থাকলে তার মা একদম অন্য রকম। সবসময়ে ফুঁসছে, দাঁত কিড়মিড় করছে সামান্য কারণেই, ফেটে পড়ছে রাগে। এ মাকে পটল ভীষণ ভয় পায়।

সে ভয়ে ভয়ে বলল, আমি চাইনি, ঠাকুমা দিল।

দিল! বলে মা মুখ ভেঙচে হঠাৎ নিচু হয়ে তার চুলের মুঠি ধরে মাথাটা নামিয়ে ঠাস ঠাস করে কয়েকটা থাপ্পড় বসাল পিঠে। পিঠ জ্বলে গেল পটলের।

লজ্জা করল না ওই লেবু হাত পেতে নিতে? কাঙালী না ভিখিরি? কতকালের উপোসী তুই যে হ্যাংলার মত নিলি? যাদের জন্য সোহাগ করে এনে দিয়েছে তারাই গিলুক, তোদের অত নোলা কিসের?

পটলকে ছেড়ে গুম গুম করে গোপালের পিঠেও কয়েকটা কিল বসাল রাঙা। গোপাল কাঁদতে পারে না। শুধু বু বু করে কয়েকটা শব্দ করল মুখ দিয়ে।

দাওয়া থেকে নেমেই রাঙা কুয়োতলার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, খবরদার আপনি কখনও আমার ছেলেদের হাতে কোনও কিছু দেবেন না। কালীর দিব্যি রইল। আমার ছেলেরা ভিখিরি নয় যে দয়া করে তাদের এঁটোকাঁটা খাওয়াবেন। নিজেরা ঘরে বসে যেমন গিলছেন তেমনই গিলুন, আমাদের ভাগবাঁটোয়ারার দরকার নেই।

নয়নতারা বড় হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর মুখ কুলকুচো করে বলল, কি হল হঠাৎ? দুটো কমলালেবু দিয়েছি, তাতে দোষটা কি হল?

আপনাদের দোষ হবে কেন? আপনারা তো গৃহদেবতা। আর আমরা সব বানের জলে ভেসে এসেছি। খবরদার বলে দিলাম, আর কখনও ওদের দয়া দেখাতে আসবেন না।

পটল দেখতে পেল তার দাদুর চোখ। পেঁপেগাছ থেকে নেমে এসেছে। চেয়ে আছে তার দিকে। চোখ দুটো বড় করুণ।

এ বাড়ি ছেড়ে পটল একদিন পালাবে। গোপালকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। এ বাড়িতে বড় অশান্তি। কখন যে কার সঙ্গে কার লেগে যায় তার কিছু ঠিক নেই। জ্যাঠার মতো লেখাপড়া জানা থাকলে কত ভাল হত। জ্যাঠা এ বাড়ি ছেড়ে কবে চলে গেছে। ছোটকাকা গেছে। একদিন তাকেও যেতে হবে।

ঘণ্টা খানেক বাদে উনুনে আগুন ধরল। ভাত চাপল। কিন্তু তখন আর সময় নেই পটলের। ইস্কুল বসে যাবে। সে নিঃশব্দে উঠে পোশাক পরে বেরিয়ে পড়ল। কেউ পিছু ডাকল না, কেউ ডেকে বলল না, ওরে, দুটো খেয়ে যা।

ইস্কুলে যেতে যেতে কত কী ভাবল পটল। সে একটা জিনিস টের পায়, তাদের বড় পয়সার অভাব। অনেক টাকাপয়সা থাকলে তাদের এত অশান্তি হত না।

ইস্কুলে হেঁটেই যায় পটল। সাইকেল নিলে বন্ধুরা চড়তে চায়। চড়তে গিয়ে সাইকেল এখানে ওখানে ফেলে দেয় বা এবড়োখেবড়ো মাঠে চালাতে গিয়ে টায়ারের:বারোটা বাজায়। কিন্তু হাঁটতে গিয়ে খিদেটা আজ চড়ে যাচ্ছে।

ইস্কুলে ঢুকেই সে পেট পুরে টিউবওয়েল থেকে জল খেয়ে নিল। তারপর জামায় মুখ মুছে ক্লাসে গিয়ে ঢুকল। মাথা ঝিমঝিম করছে। একটা বমি-বমি ভাব হচ্ছে।

সে শুনেছে, বড় জ্যাঠাও না খেয়ে বহু দিন ইস্কুলে গেছে। তখন এমন অবস্থা যে, রোজ ভাত রান্নাই হত না। জ্যাঠা শুধু পড়তই না, নিজের হাতে জমিতে লাঙল দিত, টিউশনি করত; জুতো জামারও জোগাড় ছিল না। জ্যাঠা পারলে সে পারবে না কেন? তবে একটা কথা, জ্যাঠা প্রতি পরীক্ষায় ফার্স্ট হত, সে টেনেমেনে পাস করে মাত্র। জ্যাঠার মাথা ছিল, তার নেই।

পড়াশুনোয় কেন যে সে মন দিতে পারে না তা বোঝে না পটল। যতবার কোমর বেঁধে জোর করে মন দিতে গেছে, কিছুক্ষণ পরেই টের পেয়েছে, তার মনে নানা আজেবাজে চিন্তা চলে আসছে। আনমনা হয়ে যাচ্ছে সে। এক পড়া চৌদ্দবার পড়েও মুখস্থ হচ্ছে না।

আজও ইংরিজি কবিতা মুখস্থ বলতে গিয়ে ঠেকে গেল পটল। বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হল। অঙ্ক ক্লাসে একটা গাঁট্টা খেতে হল মাথায়।

শেষ ক্লাসটা ছিল ড্রিলের। ড্রিল স্যার নেই বলে ছুটি হয়ে গেল আজ। বাড়িতে যখন ফিরল তখন শরীরটা বেশ কাহিল লাগছে।

রান্নাঘরে গিয়ে ভয়ে ভয়ে দেখল, না, ভাত ঢাকা রয়েছে। উপোস থাকতে হবে না। হাতমুখ ধুয়ে এসে ভাত ক'টা গোগ্রাসে খেল সে। ঘরে গিয়ে দেখল আর গোপাল জড়াজরি করে ঘুমোচ্ছ। দৃশ্যটা বড় ভাল লাগে তার। মাকে সে ভালবাসে বড়। মাও তাকে বাসে। তবু মাঝে কী যে সব ঘটে যায়! গোপালটা তো অবোধ, ও যখন মার খায় তখন বড় কষ্ট হয় তার।

বিকেলে আজকাল বড্ড তাড়াতাড়ি সন্ধে হয়ে যায়। শীত পড়েছে খুব, কিছুক্ষণ মাঠে ফুটবল খেলে যখন ঘরে ফিরল পটল, তখন বাড়ির উঠোনে অন্ধকার জমে উঠেছে। বারান্দায় মুড়িসুড়ি দিয়ে দাদু বসে আছে। ঘর থেকে ঠাকুমার পাঁচালি পড়ার আওয়াজ আসছে যেন।

হাতমুখ ধুয়ে কুয়োতলা থেকে আসার পথে দাদুর কাছে একটু দাঁড়াল পটল, দাদু, কী করো?

এই তো বসে আছি। কী আর করব?

একটা গল্প বলবে?

দাদু একটু হাসে, আমার কোন্ গল্পটা তোর শোনা নেই। আমার স্টক ফুরিয়ে গেছে।

পুরনো গল্পই বলো না!

পড়তে বসবি না এখন?

বসব'খন। গল্পটা আগে শুনে নিই?

তোর মা রাগ করবে যে! আজ রেগে আছে।

কথাটা মানতে হল পটলকে। মা রেগে থাকলে সামান্য কারণেই বিরাট চেঁচামেচি লাগিয়ে দেবে।

তা হলে গল্প থাক। তোমার কাছে এসে পড়ব?

বিষ্ণুপদ একটু অসহায় গলায় বলে, সেও বুঝেসুঝে আসতে পারিস।

মা খুব রেগে আছে? দুপুরে কি ঝগড়া হয়েছে ফের?

বিষ্ণুপদ একটু হেসে বলে, ওসব শুনে তোর কি হবে?

মা দুপুরে খেয়েছে?

বোধ হয় না।

বাবা দুপুরে বাড়ি এসেছিল?

এসেছিল।

তখন কি ফের ঝগড়া হয়েছে দাদু?

সেসব শুনে কি করবি?

পটলের বুক কাঁপছিল। সভয়ে বলল, খুব ঝগড়া হয়েছে নাকি? ফাটাফাটি?

ওই একটু কথা কাটাকাটি।

তুমি বাবাকে বকো না কেন দাদু?

বকব? আমি তো কখনও কাউকে বকিনি।

কখনও না?

না।

তোমার রাগ হয় না দাদু?

বিষ্ণুপদ খুব হাসল, আমার বোধ হয় ওটাই একটা রোগ। কত কী রাগ করার মতো ঘটে কিন্তু আমার কেন যেন রাগ হয় না। আমার রক্তটাই ঠাণ্ডা। তোর বাপ কাকা জ্যাঠাকে আমি কখনও শাসন-টাশন করিনি। যে যার মতো মানুষ হয়েছে।

পটল একটু চাপা গলায় বলে, বাবা যে মদ খায় দাদু, তুমি বারণ করো না কেন?

বারণ করলে কি শোনে? তবে বারণ করিনি তা নয়। এক-আধবার বলেছি। কিন্তু শোনেনি। রোখ চড়ে গিয়েছিল তো। দাদার সঙ্গে হিংসে করত। কিন্তু কৃষ্ণজীবনের সঙ্গে লেখাপড়ায় তো এঁটে উঠত না। তাই রাগে আক্রোশে নানা রকম করত। একবার রাগের চোটে ব্লেড দিয়ে নিজের হাত কেটে ফালা ফালা করেছিল।

বাবা ভীষণ রাগী, না দাদু?

পুরুষের রাগ নানা রকম হয়। রাগে কেউ নিজেকে মারে, কেউ আবার রাগের ঠেলায় কেষ্টবিষ্টু হয়ে পড়ে। রাগেরও নানা রকম আছে।

তোমার রাগ হয় না কেন দাদু?

তা কি জানি! আমার ভেতরটা সবসময়ে কেমন যেন ঠাণ্ডা। দেখ না, সবসময়ে নিষ্কর্মার মতো কেমন বসে থাকি। ভাবি এ সময়ে কত কাজও তো করতে পারতাম। ইচ্ছেই যায় না, আমি হলাম জড়ভরত। আমার মতো কখনও হোসনি দাদা, আমাকে দেখে শিখতে হয় কেমনটি হতে নেই।

পটল দাদুর কথায় হি হি করে হাসল।

বিষ্ণুপদ নিজেও হাসল, তোর কি মা বাবাকে খুব ভয়?

রেগে গেলে ভয় করে। নইলে নয়। আর বাবা মদ খেলে কেমন যেন হয়ে যায়। কী সব খারাপ খারাপ কথা বলে।

ভাবিস না। তাড়াতাড়ি বড় হ। মা বাপকে জুড়িয়ে দেওয়ার মতো কিছু কর, তা হলেই হবে। আমি আমার মা-বাপকে খুব ভালবাসতাম।

আমিও বাসি দাদু।

বাসবিই তো। বাসবারই কথা কিনা। তোর বাবাও বাসে। এত ভালবাসে যে তার জন্য কথা শুনতে হয়, তাও বাসে। দুনিয়ার ভাল-মন্দ আমি তেমন বুঝি না রে দাদু, তবে মনে হয়, মা-বাপকে ভালবাসলে মানুষের ভালই হয়।

জ্যাঠা তোমাকে কেমন বাসে দাদু?

কৃষ্ণ! সে তো ভালইবাসত। কিন্তু থাকতে পারল না তো কাছে। দূরের মানুষ হয়ে গেল।

আমার খুব জ্যাঠার মতো হতে ইচ্ছে যায়।

সে তো খুব ভাল কথা।

জ্যাঠা কি তোমার কাছে পড়ত?

তা পড়ত। প্রথম প্রথম আমি পড়া দেখিয়ে দিতাম। তারপর নিজেই পড়ত। মাথাটাই এত ভাল ছিল যে, পড়াতে হত না।

তা হলে তোমার কাছে আমিও পড়ি না কেন দাদু?

বিষ্ণুপদ একটু হাসল, আমি যে একসময়ে পড়াতাম তা আজকাল কারও মনেই নেই। আমিও সব ভুলে গেছি।

মাকে জিজ্ঞেস করে আমি এবার থেকে তোমার কাছেই পড়ব দাদু। তাতে বোধ হয় ভালই হবে।

হ্যাঁ, মাকে আগে জিজ্ঞেস করে নিস। নইলে হিতে বিপরীত হয়ে বসবে।

পরদিন মায়ের মেজাজ ঠাণ্ডা বলে পটল কথাটা বলল, মা, দাদুর কাছে পড়া বুঝে নেবো?

রাঙা প্রথমটায় ভ্রূ কোঁচকাল, তোর দাদু আবার কি পড়াবে?

বাঃ, দাদু যে ইস্কুলে মাস্টারি করত।

রাঙা একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, ওঃ ভারি তো মাস্টারি! গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুল। তা তোর ইচ্ছে হলে পড়িস।

পটল সোৎসাহে বইখাতা নিয়ে দাদুর কাছে হাজির হল, দাদু, পড়াও, মা বলেছে।

দিন সাতেক যেতে না যেতেই পটল বুঝতে পারল তার মাথায় পড়া ঢুকছে। সে বুঝতে পারছে। অঙ্ক কষে যাচ্ছে, ভুল হচ্ছে না, কয়েকটা বাক্যরচনা লিখে স্কুলে বাংলা স্যারের তারিফ পেয়ে গেল।

দাদুর পড়ানোটা এত ভাল যে পটল ভারি উৎসাহ পায়। দাদু কখনও বকে না, বা একথা বলে না যে, তোর দ্বারা হওয়ার নয়। দাদু কেবলই বলে, বাঃ, এই তত পারছিস, এই তো হচ্ছে। এমন কি ভুল অঙ্ক করলেও দাদু রাইট দিয়ে দেয়। তারপর খুব আদর করে ভুলটা ধরিয়ে আবার অঙ্কটা কষায়। তার যে হবে, তার যে হচ্ছে একথাটা দাদু ছাড়া কেউ এতকাল বলেনি।

একদিন অঙ্কের স্যার অবধি বাহবা দিয়ে বলল, বাঃ, আজ যে সবক'টা অঙ্ক রাইট করেছিস!

৫৭

চয়ন যখন পড়ায় তখন বিভোর হয়ে পড়ায়। পড়ানোর মধ্যেই এক মাদকতা পেয়ে যায় সে। বিশেষ করে ছাত্র বা ছাত্রীটি ভাল পেলে। চারুশীলার দেবশিশুর মতো ছেলেটি সেদিক দিয়ে তার অতিশয় প্রিয়।

সন্ধেবেলা যখন ছাত্র আর মাস্টারমশাই মগ্ন হয়ে আছে ঠিক সেই সময়ে চারুশীলা অনেকটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে অবিন্যস্ত পায়ে ঘরে এসে ঢুকল। এবং অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বেশ কষ্ট করেই যেন চয়নকে চিনতে পারল। তারপর ভ্রূ কুঁচকে হঠাৎ বলল, আচ্ছা, মেয়েটা কেমন বলুন তো?

চয়নকেও তার ঘোর থেকে বেরিয়ে আসতে হল। খুব অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, কোন্ মেয়ের কথা বলছেন?

যেন একটু বিরক্তি বা ধৈর্যহীনতা স্পর্শ করল কণ্ঠস্বরকে, আপনি কিছু মনে রাখতে পারেন না। আমি রশ্মির কথা বলছি।

চয়নের স্মৃতিশক্তি চমৎকার। তার মনে পড়ল। বাস্তবিক এদের বিরাট দলের সঙ্গে বনভোজনে গিয়ে সে এতই কৃতজ্ঞতা বোধ করেছিল যে বলার নয়। চারদিকে যেন মানুষ-বনস্পতি, আর সে যেন সামান্য তৃণ, তাই এইসব মহা মহা পুরুষ ও মহিলার প্রত্যেককে লক্ষ করেছিল সে। রশ্মিকে তার খুব মনে আছে। দলের মধ্যে সে ছিল সবচেয়ে কম কথা আর বেশি হাসির মেয়ে। দেখতে ভীষণ সুন্দর। তবে সে সৌন্দর্য উত্তেজক বা উত্তপ্ত নয়। একটু যেন শীতলতা মাখানো। হয়তো ক্লাসিক, কিন্তু এরোটিক কিছুতেই নয়।

খুব বিনয়ের সঙ্গে চয়ন বলল, দেখতে কেমন জিজ্ঞেস করছেন? দেখতে তো সুন্দরীই উনি। তবে উনি কেমন মানুষ তা তো জানি না।

আচ্ছা, আপনি কী বলুন তো! সিক্সথ্ সেনস্ নেই? মানুষকে দেখে কি কিছু বোঝা যায় না? মুখ নাকি মানুষের চরিত্রের দর্পণ!

চয়ন এই ছিটিয়াল, খামখেয়ালী ও অত্যন্ত উদার অর্থাৎ নানা বিপরীত গুণান্বিতা মহিলার সামনে খুবই কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। সে এক প্রায়-অচেনা মহিলা সম্পর্কে কী মতামত দেবে! কিন্তু না দিলেও কি ছাড়বেন চারুশীলা? সে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বলে, উনি তো মনে হয় অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, রিজার্ভড্ আর অত্যন্ত ভদ্র।

তা হলে?

এ প্রশ্নে আবার বাক্যহারা হওয়ার কথা চয়নের। তবু সে কেবল মাত্র প্রতিধ্বনি করল, তা হলে?

তা হলে ওর সঙ্গে হেমাঙ্গর বিয়ের বাধা কিসের? কোথায় আটকায় বলুন তো! নিশ্চয়ই ওকে হেমাঙ্গর পছন্দ, তাই না?

এরকম একটা ক্ষীণ আভাস চয়নও পেয়েছে। সে অত্যন্ত উদারতার সঙ্গে বলল, হওয়ারই তো কথা।

আপনার কি মনে হয় না যে, ওরা মেড ফর ইচ আদার?

হয়।

চারুশীলা উজ্জ্বল হয়ে বলে, হয়? তাহলে আমি নিশ্চয়ই ভুল করিনি! আচ্ছা, আপনি কথা চেপে রাখতে পারেন?

চয়ন উদ্বেগের সঙ্গে বলে, এসব কি গোপনীয় কথা?

না, এসব নয়। আপনি বোধ হয় জানেন না, হেমাঙ্গ বিয়ের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। উইক এন্ডে কোথায় চলে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, আপনি হেমাঙ্গবাবুর হাইড আউটের কথা আমাকে বলেছেন। সামনের শনিবার সেখানে আপনার যাওয়ার কথা।

হ্যাঁ, বাঁকা মিঞার গ্রামে। সেখানে ও একটা বাড়ি কিনেছে। শুধু তাই নয়, বনসৃজন করবে বলে অনেকটা জমি কেনার চেষ্টাও করছে। বাঁকা মিঞা হেমাঙ্গর এসব কাণ্ড দেখে ভয় পেয়ে মামাকে জানিয়ে গেছে। তখনই ওর হাইড আউটের কথা আমরা জানতে পারি। হেমাঙ্গকে কি আপনার পাগলাটে বলে মনে হয়?

না তো! উনি তো বেশ স্মার্ট আর ড্যাসিং।

ছাই জানেন। আসলে একটা হাঁদারাম। ওকে আমার মতো কেউ চেনে না। যখন এইটুকু ছিল তখন আমার সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরত। সারাদিন কেবল চারুদি আর চারুদি।

সেকথাও বোধ হয় একদিন বলেছেন।

বলেছি? ওটাই আমার দোষ। বলে ভুলে যাই। ডোন্ট মাইন্ড। এসব কথা কিন্তু খুব গোপন রাখবেন।

খুব বিনয়ের সঙ্গে চয়ন বলে, গোপনই থাকবে। বলার মতো আমার কেউ নেইও।

আচ্ছা, হেমাঙ্গ কেন পালাচ্ছে বলুন তো! ব্যাপারটা খুব পাজ্‌লিং এবং অস্বস্তিকরও। একটা মেয়ের সঙ্গে ওর একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে, গার্জিয়ানরা সবাই মত দিয়েছে, তা হলে ও পালাচ্ছে কেন বলতে পারেন?

না, চয়ন তা বলতে পারে না। কিন্তু সে কথা কবুল করাটা যে ঠিক হবে না এ কাণ্ডজ্ঞান তার আছে। সুতরাং অত্যন্ত গভীরভাবে ব্যাপারটা যেন ভেবে দেখার একটা ভান করল সে। তারপর বলল, তাই তো!

আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

চয়ন সময়োচিত গাম্ভীর্য এবং একটা দুঃখের ভাব মুখে ফুটিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগল। কে কাকে বিয়ে করতে চায় বা চায় না এটা নিয়ে এত মাথা ঘামানোর কী আছে সেটা সে জানে না। এদের সমস্যাও এত শৌখিন ও ফিনফিনে যে, সে অবাক না হয়ে পারে না। তার মতো সমস্যা তো এরা কখনও ভোগ করবে না। বিশ্বাসঘাতক এক শরীর নিয়ে সে যে টিকে আছে, প্রতি মুহূর্তে যার আশ্রয় হারানোর ভয়, যাকে প্রতিদিন হাজারো অভাবের সঙ্গে লড়াই করতে হয়, যে কখনও তার যৌবনকে টেরই পায় না, উপভোগ তো দূরস্থান। সুতরাং তার কাছে এসব সমস্যা অবান্তর ও বাহুল্য। মানুষ তার সঙ্গে হেসে কথা বললে, ভাল ব্যবহার করলে, সমবেদনা প্রকাশ করলেই সে ভীষণ খুশি হয়ে যায়, তার বুকে যেন পূর্ণিমার জ্যোৎস্না এসে পড়ে।

আচ্ছা, আপনার সিক্স্থ্ সেন্স নেই?

চয়ন দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, আজ্ঞে না।

আপনি জ্যোতিষী জানেন?

আজ্ঞে না।

কিন্তু আমার যে এখন এরকম একটা কিছু দরকার।

চয়ন ঢোঁক গিলে বলে, জ্যোতিষী তো অনেক আছে।

চারুশীলা বিরক্তির সঙ্গে বলে, সে আমিও জানি। একজন বিখ্যাত জ্যোতিষীকে আমি হাত দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আচ্ছা আমার হাজব্যান্ড কবে চাকরি পাবে বলুন তো, আর কি চাকরি পাবে? জ্যোতিষী অনেকক্ষণ দেখে-টেখে বলল, আর দেড় বছরের মাথায় পাবে। কী চাকরি সেটা আর বলেনি। তখন আমার হাজব্যান্ড দু'হাতে পয়সা রোজগার করছে।

চয়ন জ্যোতিষীদের ব্যর্থতার কাহিনী শুনে দুঃখিতভাবে বলল, তাহলে কি করা যায়?

চারুশীলা হঠাৎ তার মুখখামুখি একটা চেয়ারে ধপ করে বসে বলল, আচ্ছা আমার কেন কেবলই মনে হয় বলুন তো, যে, আপনার বোধ হয় সত্যিই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে।

চয়নের একবার বলতে ইচ্ছে হল, সিক্সথ সেন্স আপনারই আছে, তাই বোধ হয় আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় টের পান। কিন্তু সেটা বলে ফেললে স্পর্ধার প্রকাশ হয়ে যেত। তাই সে আপাদমস্তক লজ্জিত হয়ে বলে, আজ্ঞে, আমি অতি সামান্য মানুষ। আমার কোনও ক্ষমতা নেই।

চারুশীলা তার এলো চুল অবিন্যস্ত হাতে পাট করতে করতে বলল, আপনার বিনয় ব্যাপারটা আমার একদম সহ্য হয় না। ওরকম বিনয় করবেন না তো! মেরুদণ্ডটা নুয়ে যাবে যে! একটু অহঙ্কারী হতে পারেন না?

কী বলবে তা ভেবেই পেল না চয়ন। অসহায়ভাবে শুধু বলল, অহঙ্কার!

অহঙ্কার না থাকলে পুরুষমানুষকে কি মানায়? মেয়েদেরও মানায় না। একট অহঙ্কার থাকলে দেখবেন লোকে আর অবহেলা করতে সাহস পায় না। তবে অহঙ্কার করতে হলে বুদ্ধি চাই। অনেকে বোকার মতো নিজের গল্প নিজেই করে বেড়ায়। তাদের নিয়ে লোকে হাসাহাসি করে। ওরকম নয়, একটু মাথা উঁচু করে, নিজের ওপর বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা রেখে এবং কাউকেই— সে যত বড়ই হোক না কেন, বেশি মাথায় উঠতে না দিয়ে যদি চলেন তা হলে দেখবেন সবাই আপনার ওপর মনোযোগ দিচ্ছে।

প্রকাশ্যে নয়, তবে সংগোপনে চয়ন একটি হতাশার শ্বাস মোচন করল।

আর শুনুন, আমরা কিন্তু আপনার বস নই, বন্ধু। আমার হাজব্যান্ড লেফটিস্ট, একটু কমিউনিস্ট মাইন্ডেড। উনি শ্রমের মর্যাদা জানেন। আমি অবশ্য ওঁর মতো নই, তবু আমি কোনও মানুষকেই সাফারিং আর বন্ডেড দেখতে ভালবাসি না।

চয়ন বিব্রত হয়ে বলে, তা জানি। আপনারা খুবই মহৎ।

ফের? ওরকম বললে আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে কি করে?

আজ্ঞে, আর একটু সময় দিন।

চারুশীলা হেসে ফেলল, বলল, সময় দিলে আরও বাজে লোক হয়ে যাবেন। মনোভাবটা শুধু পালটে ফেলুন। আপনি আমার বাড়িতে এসে আপনার শ্রম ও মেধা দান করছেন। প্রাপ্য দক্ষিণা নিচ্ছেন। এর বেশি তো কিছু নয়।

যে আজ্ঞে।

এবার আমার সমস্যাটার কথা একটু বলুন। এভাবে তো বসে থাকলে হবে না। হেমাঙ্গ আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। আপনি পুরুষমানুষ বলেই জানতে চাইছি, ও আসলে কী চায়! আমি মেয়ে বলেই হয়তো ওর ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।

চয়ন একটু সতর্কতামূলক নীরব থেকে বলল, হেমাঙ্গবাবুর সঙ্গে আমার এতই সামান্য পরিচয় যে, ওঁকে ঠিক বুঝবার মতো সময় পাইনি।

তাই তো বলছি, আপনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কি বলে?

বিপন্ন চয়ন বলল, বরং আমাকে ওঁর ঠিকানাটা দিন, একবার গিয়ে ভাল করে আলাপ করে আসি।

চারুশীলা মাথা নেড়ে বলে, তাতে লাভ নেই। ও একজন অপরিচিতের কাছে কি মনের কথা খুলে বলবে?

তা হলে কি করব?

সামনের শনিবার ওর হাইড আউটে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কী হয়েছে জানেন! আমার হাজব্যান্ড অনেকদিন বাদে দেশে এলেন তো। এখন বড় বড় ক্লায়েন্টরা ঘন ঘন পার্টি দিচ্ছে। এমন সব ক্লায়েন্ট যাদের অ্যাভয়েড করা যায় না। আমার হাজব্যান্ডের অনারেই সব পার্টি। শনি রবি দুটো দিনই আমরা ভীষণ এনগেজড্। পরের উইক এন্ডেও।

প্রবলেমটা আমি অবশ্য ঠিক ধরতে পারিনি। হেমাঙ্গবাবু কি বিয়ে করতে চাইছেন না?

সে তো কোনও পুরুষমানুষই প্রথমে চায় না। পরে সুড়সুড় করে গিয়ে পিঁড়িতে বসে। এটা একটু অন্য ব্যাপার। প্রেম, কিন্তু বিয়ে নয়।

এ সমস্যার সঙ্গেও চয়নের পরিচয় নেই। সে তবু অত্যন্ত সমঝদারের মতো মাথা নাড়ল।

চারুশীলা বলল, দেখুন, এটা একটা প্রেস্টিজ ইসু। যদি হেমাঙ্গ বিয়ে না করে তা হলে আমাদের মাথা কাটা যাবে। রশ্মির মতো মেয়েকে বিয়ে না করতে চাওয়াটাই একটা অবাক কাণ্ড।

চয়ন যদিও এ ব্যাপারে কিছুই জানে না, তবু হঠাৎ বলে ফেলল, হেমাঙ্গবাবু আর কাউকে ভালবাসেন না তো!

বিস্মিত চারুশীলা কিছুক্ষণ চয়নের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, আর কাউকে? পাগল নাকি? ওর ভিতরে ভালবাসা জিনিসটাই নেই। মেয়েদের ভয় পায়, এড়িয়ে চলে। রশ্মির সঙ্গেও তো কিছু ছিল না। আমিই বলে-কয়ে ব্যাপারটা প্রায় ঘটিয়ে তুলেছিলাম। এখন কী হবে বলুন তো! আমার যে ভীষণ বিপদ!

চয়নের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নেই ঠিকই, কিন্তু সে ন্যালাখ্যাপাও নয়। দুইয়ে দুইয়ে যে চার হয় এই কাণ্ডজ্ঞান তার আছে। সে বুঝতে পারছিল এই আবেগতাড়িত মহিলা হেমাঙ্গকে বোধ হয় আদৌ অনুধাবন করেননি। একটি সুন্দরী ও শিক্ষিতা মেয়েকে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছেন মাত্র এবং তাতে যে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে চাইছেন তার মধ্যে একটু অহংবোধ কাজ করছে। আমি যা বলব হেমাঙ্গ তাই শুনবে এরকম একটা কর্তৃত্বের

ভাবও হয়ত আছে। চারুশীলা অত্যন্ত ভাল মহিলা। কিন্তু তিনি নিজের চশমায় দুনিয়াকে দেখেন। অন্যকে কমই অনুধাবন করার ক্ষমতা আছে ওঁর।

চয়ন খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল, বিপদ কেন বলছেন?

চারুশীলা চোখ বড় বড় করে বলে, বিপদ নয়? বিয়ে যদি ভণ্ডুল হয় তা হলে সব দোষ যে আমার ঘাড়ে এসে পড়বে!

চয়ন খুব সমবেদনার গলায় বলল, তা-ই বা কেন? এই যে বললেন ওঁদের মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংও হয়েছে!

তা তো হয়েছে।

একটু মাথা চুলকে চয়ন বলে, তা হলে ওঁরাই দুজনে ওঁদের সম্পর্কটা সর্ট আউট করবেন।

চারুশীলা বিস্মিত হয়ে বলে, মধ্যস্থের বিপদ নেই বলছেন?

থাকার কথা নয়। ওঁরা তো অ্যাডাল্ট।

কিন্তু আমি যে ভীষণভাবে চাই, বিয়েটা হোক।

যদি হয় তো ওঁরাই সেটা ঘটাবেন। না ঘটলেও আপনাকে দোষ দেওয়ার কিছু নেই।

আপনি ভীষণ নেগেটিভ কথা বলেন। আচ্ছা, আপনাকে ঠিকানা দিলে আপনি হেমাঙ্গর হাইড আউটটা খুঁজে বের করতে পারবেন?

আমি!

কেন, আপনার কি ভয় করবে?

চয়ন মহা ফাঁপরে পড়ে বলল, উনি যখন লুকিয়েই থাকছেন তখন সেখানে গিয়ে হাজির হওয়াটা কি ভাল হবে? উনি হয়তো রাগ করবেন।

হেমাঙ্গ তেমন রাগী মানুষ নয়। তা ছাড়া একটু রিস্ক তো নিতেই হবে!

উনি কি কলকাতায় থাকছেন না?

কবে আসছে, কবে চলে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না। টেলিফোনে ধরতে পারলেও বেশি কথা বলতে চাইছে না।

আর রশ্মিদেবী কি ওঁর মনোভাব জানেন?

এখনও নয়। রশ্মি একটা রিসার্চ পেপার নিয়ে খুব ব্যস্ত। তবে মাঝে মাঝে হেমাঙ্গর সঙ্গে ফোনে কথা হয়।

চয়ন একটু হেসে বলে, তা হলে ভাবছেন কেন? ওঁরা তো সম্পর্ক রেখেই চলেছেন।

চারুশীলা খুব বিরক্তির গলায় বলে, তা রাখলেই বা লাভটা কি? হেমাঙ্গ যে আরও সময় চাইছে। অথচ রশ্মির হাতে যে মোটেই সময় নেই। বিয়েটা হয়ে গেলেই ও বিলেত চলে যাবে। এদিকে এই হাঁদারামটা বিলেত যেতে চাইছে না। আচ্ছা, এদেশে আছেটা কী বলুন তো! আইন নেই, শৃঙ্খলা নেই, ভিখিরি আর রোগভোগে ভরা, চারদিকে বিচ্ছিরি সব লোকজন, ধুলো, ধোঁয়া, এদেশে কিসের মধু? বিলেতে গেলে কত ভাল থাকতে পারবে। অথচ কিছুতেই যেতে রাজি হচ্ছে না। কী করে যে ওর মত করাই ভেবে পাচ্ছি না। ওকে যে গিয়ে একদিন ধরব তাও সময় পাচ্ছি না। আমার হাজব্যান্ড আসায় এখন বড্ড ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। তিন চার মাস বাদে আমরা ওর সঙ্গেই আবার কিছুদিনের জন্য বিদেশ চলে যাব। সেসব নিয়েও আলোচনা হচ্ছে। আর

ওই হাঁদারামটা আমার জন্য আর একটা প্রবলেম তৈরি করে রেখেছে। আপনি প্লিজ, আমাকে একটু হেল্প করুন না।

চয়ন বিপন্ন বোধ করতে লাগল। সে বুঝতে পারছে, ভদ্রমহিলা পৃথিবীকে তাঁর নিজের মতো করে চালাতে চান। সে নিজে এঁর আজ্ঞাবহ হতে রাজি আছে। কিন্তু তাতে যে কী লাভ হবে তা বোঝবার সাধ্যই তার নেই। সে তবু বিনীতভাবে বলল, যে আজ্ঞে। হাইড আউটটায় গিয়ে আমার কী কাজ হবে তা যদি বলেন তো ভাল হয়।

আমি জানতে চাই ওখানে ও কী করছে। কেনই-বা ও-জায়গাটা ও পছন্দ করল। আরও জানতে চাই, ও বিলেত যেতে চাইছে না কেন এবং বিয়েটাই বা কেন পিছোতে চাইছে। পারবেন না জেনে আসতে?

চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু আমাকে উনি হয়তো গুরুত্বই দেবেন না।

আপনাকে ও খুব ভালমানুষ বলে জানে। তা ছাড়া আপনি ইনোসেন্ট থার্ড পার্টি। আপনাকে বলতে ওর আপত্তি হবে না। শুধু মনে রাখবেন, আমি পাঠিয়েছি বলে যেন টের না পায়।

মানুষ তো আত্মহত্যাও করে, চয়নের এই অভিযান না হয় সেরকমই একটা কিছু হবে। মরিয়া হয়ে সে ঘাড় কাত করে দিয়ে বলল, ঠিক আছে।

চারুশীলা উজ্জ্বল হয়ে বলল, বাঁচালেন। কি ভাবে যাবেন বলুন তো? আপনি বরং আমাদের গাড়িটা নিয়ে শনিবার সকালে ক্যানিং চলে যান। সেখান থেকে বোধ হয় লঞ্চ ছাড়ে। জিজ্ঞেস করে করে চলে যাবেন। গাড়িটা ওখানেই থাকবে। কাজ সেরে ফিরে আসবেন।

চয়ন ম্লান একটু হেসে বলে, গাড়ি! গাড়ির কোনও দরকার নেই। ক্যানিং-এ অজস্র ট্রেন যায়।

ভ্রূ কুঁচকে চারুশীলা বলে, আপনি আমার কাজে যাচ্ছেন। আমার দায়িত্ব।

চয়ন বিনীতভাবে বলল, গাড়িতে সময় বেশি লাগবে। অকারণ অপচয়। কোনও দরকার নেই।

ঠিক আছে, তা হলে যাতায়াতের জন্য আমি আপনাকে এক হাজার টাকা দিয়ে দিচ্ছি।

চয়ন আতঙ্কিত হয়ে বলে, দশ বিশ টাকার বেশি লাগবে না।

আপনি কি ভিখিরির মতো যাবেন নাকি? রাস্তায় খেতেও তো হবে।

খেতে ধরুন আর দশ টাকা লাগতে পারে।

তবু রাখুন। পথে বেরোতে সব সময়ে বেশি টাকা সঙ্গে রাখতে হয়।

আপত্তি করা সত্ত্বেও চারুশীলা হাজার টাকাই গছিয়ে ছাড়ল। বলল, সবটাই খরচ করবেন। কৃপণের মতো হিসেব করবেন না। ট্রেনে অবশ্যই ফার্স্ট ক্লাসে যাবেন।

লোকাল ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাস নেই যে।

ট্যাক্সি করে যাবেন তা হলে। যা খুশি করবেন, কিন্তু কিছু ফেরত দিতে পারবেন না।

শনিবারের তো এখনও দেরি আছে।

দেরি! কোথায় দেরি? মাঝখানে তো মোটে দুটো দিন!

চয়ন উদ্বেগের সঙ্গে একটা শ্বাস ছাড়ল।

চারুশীলা আরও কিছু একটা গুরুতর এবং পাগুলে প্রস্তাব করতে যাচ্ছিল, ঠিক এমন সময় একটা মেয়ে ঘরে ঢুকে বলল, মাসি, আমি তোমাকে সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি যে! এখানে বসে আছ!

ওঃ ঝুমকি! আমার যে কী বিপদ যাচ্ছে! চলো, ও ঘরে গিয়ে বসি।

ঝুমকিকেও চেনে চয়ন। তার দিকে চেয়ে চমৎকার দাঁতে ঝলমল করে হেসে বলল, ভাল আছেন চয়নবাবু?

চয়ন তটস্থ হয়ে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

ওরা উঠে যাওয়ার পর খানিকটা স্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। এই খ্যাপাটে মহিলার সঙ্গ যদিও উদ্বেগজনক, তবু চারুশীলাকে কখনও অপছন্দও করতে পারে না চয়ন। অনেকটা এক ঝলক টাটকা হাওয়ার মতোই এসে সব ওলটপালট করে দিয়ে যান।

শনিবার সকালে খুব উদ্বেগের সঙ্গেই রওনা হল চয়ন। কলকাতার বাইরে সে কমই গেছে। সুন্দরবন তার সম্পূর্ণ অচেনা রাজ্য। প্রথম প্রথম ভয়-ভয় করছিল। তারপর ট্রেনে হাজারো রকমের লোক দেখে তার মনে হল, মানুষ কত কাজে কত দিকে যায়, ভয়ের কী!

ভয় শুধু একটা। যদি হঠাৎ মাঝপথে অজ্ঞান হয়ে যায়। তার মৃগী রোগের তো কোনও সৌজন্যবোধ বা লজ্জা নেই। যেখানে সেখানে প্রকাশ ঘটে। এবারে অনেকদিন ঘাপটি মেরে আছে। হঠাৎ কখন যে লাফিয়ে পড়বে ঘাড়ে তার ঠিক নেই।

ক্যানিং পৌঁছে সে খোঁজ নিল। তারপর মজার নৌকো ভটভটিতে চেপে বসল। সাঁতার জানে না, তবু খুব একটা ভয় হচ্ছিল না তার। ভয় আসলে বসে আছে সামনের কোনও তীরবর্তী গ্রামে, হেমাঙ্গ সেজে। লোকটা এমনিতে ভদ্র ও সুজন। কিন্তু আজকের পর থেকে হেমাঙ্গ আর সুজন থাকবে না তার কাছে। একটা লোকের সঙ্গে তার চিরবিচ্ছেদ ঘটবেই ঘটবে।

খুবই সাফল্যের সঙ্গে সে উদ্দিষ্ট গাঁয়ের ঘাটে ভটভটি থেকে নামল। তারপর সামান্য খোঁজ নিতেই হেমাঙ্গর ঘরখানা খুঁজে পেল। নদীর ধারেই ঘর। একটু গাছপালা আছে। ফাঁকা ও সুন্দর জায়গায় ঘরখানা দেখেই ভাল লাগল তার। বাঃ, বেশ তো! এরকম জায়গায় এসে থাকতে ভালই লাগার কথা।

উঠোনে ঢুকে চয়ন একটু গলাখাঁকারি দিয়ে মৃদু স্বরে ডাকল, হেমাঙ্গবাবু!

কেউ সাড়া দিল না। ঘরের দরজা বন্ধ।

হেমাঙ্গবাবু কি আছেন?

আরও কয়েকবার ডাকার পর দরজাটা খুলে হেমাঙ্গ বেরিয়ে এল। তবে প্রথম দর্শনেই যেন চিনতে পারল না। কিছুক্ষণ অবাক চোখে চেয়ে থেকে বলল, আরে!

চয়নের পালানোর বা পিছোনোর উপায় নেই। সুতরাং সে দু'পা এগিয়ে বলল, আমি চয়ন।

হেমাঙ্গ হঠাৎ হাসল। সমস্ত মুখটা উদ্ভাসিত হল সেই হাসিতে। বলল, ইটস্ এ প্লেজান্ট সারপ্রাইজ! আপনি এখানে কি করে এলেন?

চয়ন আমতা আমতা করে বলল, এদিকটা দেখা ছিল না। তাই—

সে তো বটেই। এটা বেড়ানোর মত জায়গাও নয় শহুরে মানুষের কাছে। কিন্তু আমি এখানে থাকি কে বলল আপনাকে?

শুনলাম।

আসুন, আসুন।

ঘরে তেমন আসবাব কিছু নেই। বেশ ন্যাড়া। একখানা তক্তপোশ, একখানা মোড়া এবং খুবই পলকা ধরনের একখানা টেবিল আর চেয়ার। চেয়ারে তাকে বসতে দিয়ে হেমাঙ্গ বিছানায় বসল। বলল, কিছু খাবেন?

না। একটু জল খেলেই হবে।

জলটা দিয়ে হেমাঙ্গ খুব স্বাভাবিক গলায় বলে, চারুদি আপনাকে পাঠিয়েছে, না?

বিষম খেয়ে সামলে নিয়ে চয়ন বলে, কথাটা কবুল করা বারণ।

হেমাঙ্গ হাসল, কবুল করতে হবে না। আমি জানি।

চয়ন গেলাসটা রেখে বলল, আমি আসতে চাইনি। উনি জোর করে—

বুঝতে পারছি। তবু মন্দের ভাল। আপনার বদলে চারদি এলে অবস্থাটা খারাপ হত।

উনি কিছু জানতে চান।

হেমাঙ্গ একটু মাথা নেড়ে বলে, তাও জানি। চারুদি অনেক কিছু জানতে চায়। কিন্তু কি জানাবো তাই যে আমি জানি না!

চয়ন সভয়ে বলল, উনি খুব ইনসিস্ট্যান্ট।

আপনি বিয়ে করেছেন?

আজ্ঞে না।

হেমাঙ্গ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, বিয়ে ছাড়া মানুষের আর কিছু করার আছে কিনা তাইই আমি জানতে চাই। আপনি কী বলেন!

আমি! চয়ন একটু হাসল, আমি কিছু জানি না।

আপনি আজ আমার কাছেই থাকুন।

থাকব? কিন্তু—

থাকবেন। আপনাকে দেখে কেন যেন আমার ভাল লাগছে। কাল থেকে মনটা ভীষণ খারাপ ছিল।

৫৮

ঘটনাটা ঘটল সন্ধেবেলায়। খুব দূরেও নয়। পারুল বলতে গেলে বীণাপাণির খুব নিকট পড়শী, মহেন্দ্রবাবুর মেজো মেয়ে। একটু কেমনধারা যেন মেয়েটা। বড় খোলামেলা, সবসময়ে বোকার মতো হিহি হাসি। যখন তখন সিনেমায় যাবে। যাত্রা, জলসা কিছু বাকি রাখবে না। একটু ঢলানিও আছে।

পারুল ম্যাটিনি শো দেখে ফিরছিল। বড় রাস্তা থেকে মাঠের পথে নেমে বাড়ি ফিরছে, এমন সময় চারটে ছোকরা তাকে ধরে টেনে নিয়ে যায়। বেশি দূরেও নয়। মৈনুদ্দিনের বাঁশঝাড়ের পিছনে একটা পতিত জমিতে নিয়ে কাপড়জামা টেনে ছিঁড়ে খুলে ফেলে পারুলকে ছিবড়ে করে ফেলে রেখে গিয়েছিল তারা। মেয়েটার জ্ঞান ছিল না।

একটু রাতের দিকে চেঁচামেচি ডাক খোঁজ শুরু হল। বীণাপাণির বাড়িতেও খোঁজ করতে এলেন মহেন্দ্রবাবু।

পারুলকে দেখেছ বীণা? শুনছি সিনেমায় গিয়েছিল, এখনও ফেরেনি।

না তো কাকাবাবু দেখিনি।

বড় ভয়ের কথা হল। রাত প্রায় দশটা বাজে।

বীণা তার টর্চ বাতিটা নিয়ে ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে এল, চলুন তো দেখি।

দাঁড়াও। খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজা হবে। পাড়ার ছেলেদের জানাবো না ভেবেছিলাম। এখন ভাবছি জানানোই ভাল। বড় ভয় হচ্ছে।

কিছু বলে যায়নি? দেরি হবে বলে কিছু বলেনি?

না। ম্যাটিনি শোয়ে গিয়েছিল। দেরি হওয়ার কথা নয়।

তা হলে ক্লাবের ছেলেদের খবর দেওয়াই ভাল।

মহেন্দ্রবাবু চলে গেলেন, কিন্তু বীণা ঘরে গেল না। মেয়েদের যে কত বিপদ, কত লোভ-লালসার নজরবন্দী হয়ে যে তাদের থাকতে হয় সে কথাই সে ভাবছিল টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে।

আধ ঘণ্টাও পার হল না, একটা শোরগোল উঠল। টর্চ হাতে এগিয়ে গেল বীণা। একটু এগোতেই দেখল, ছেলেরা ধরাধরি করে মাঠ থেকে তুলে আনছে পারুলকে।

ধর্ষিতা কোনও মেয়েকে এর আগে কখনও দেখেনি বীণা। আজ দেখল। খোলা দাওয়ায় শোওয়ানো ঠাণ্ডা, রক্তাক্ত জ্ঞানহীন দেহ। কম্বল দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয়েছে। মুখে গ্যাঁজলা কাটছে। পারুলের মা, দিদি, ঠাকুমা কাঁদছে, ক্লাবের ছেলেরা তড়পাচ্ছে, মহেন্দ্রবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসা। কিছু স্পর্শ করল না বীণাকে। সে শুধু

পারুলকে দেখছিল। তার শরীরের ভিতর থেকে একটা হলকা যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। রাগে, বিদ্বেষে, ঘেন্নায় যেন পাগল হয়ে যাচ্ছে মাথা। রাত এগারোটার পরও পাড়াসুদ্ধ লোক এসে জুটেছে মহেন্দ্রবাবুর বাড়িতে। যেন একটা মস্ত পরব।

বীণার পিছন দিকেই একটা জটলা। মাঝবয়েসি কয়েকজন লোক চাপা গলায় কথা বলছিল। তাদের মধ্যে একজন বলল, মেয়েটাও সুবিধের ছিল না মশাই। রেপ কি আর অমনি হয়। এক হাতে তালি বাজলেই হল!

বীণা ঘুরে লোকটার মুখে টর্চের আলো ফেলল অভদ্রের মতো। বলল, আপনি কিছু দেখেছেন?

লোকটা চমকে উঠে বলল, কি দেখব?

আপনি পারুলকে দেখেছেন রেপ হওয়ার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিল?

নিজের কণ্ঠস্বরের তীব্রতা বীণাকেও চমকে দিল।

লোকটা একটু তেরিয়া হয়ে বলে, দেখার কী আছে। সবাই জানে।

বীণা এক পা এগিয়ে গিয়ে বলল, কি জানে?

সেটা কি আপনাকে বলতে হবে নাকি?

বীণা সটান লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁ। আমাকেই বলতে হবে। মেয়েটা খারাপ কি ভাল সে কথা পরে হবে, তার আগে বলুন রেপ করাটা ভাল না খারাপ?

লোকটা একটু ভড়কে গিয়ে বলে, রেপ ভাল তো বলিনি।

আপনি তো রেপ করাটাকেই সাপোর্ট করছেন। এই যে বললেন, এক হাতে তালি বাজে না। যেন মেয়েটাও রেপ হওয়ার জন্য মুখিয়ে ছিল। তাই বুঝি!

অন্য লোকেরা তাড়াতাড়ি মধ্যস্থ হয়ে 'যেতে দাও, যেতে দাও' বলে লোকটাকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। বীণার ইচ্ছে হচ্ছিল লোকটাকে জুতোপেটা করে।

ডাক্তার এল। কী একটু দেখেটেখে বলল, পুলিশে খবর দিয়েছেন? না দিয়ে থাকলে দেওয়া উচিত। আর হাসপাতালে রিমুভ করুন। থরোলি পরীক্ষা হওয়া দরকার।

পারুলকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন বীণা ঘরে ফিরে এল। দরজা বন্ধ করে বিছানায় বসে অনেকক্ষণ ধরে গরম শ্বাস ফেলল ফোঁস ফোঁস করে। বুক জ্বালা করছে। পারুলের সঙ্গে যে তার খুব একটা ভাব ছিল তা নয়। পাড়ার মেয়ে বলে চিনত। কিন্তু আজ পারুলের এই সর্বনাশ যেন পারুলের বন্ধু করে তুলল তাকে। দুনিয়ার যত ধর্ষিতা নারীর জ্বালা যেন সে পেতে লাগল আজ রাতে।

কেন রেপ হবে মেয়েরা? কেন হবে? কেন তারা পুরুষের হাতে এরকম বেমক্কা লাঞ্ছিত হবে দুনিয়ার সব জায়গায়? কেন ফাঁসি দেওয়া হয় না ধর্ষণকারীদের?

খানিকক্ষণ ঘরের মধ্যেই উদ্‌ভ্রান্তভাবে ঘুরে বেড়াল বীণা। বড় অস্থির লাগছিল তার। তারপর হঠাৎ জ্বালা, রাগ, বিদ্বেষ উড়ে গেল। একা ঘরে তার হঠাৎ ভীষণ ভয় করতে লাগল। তার নিরাপত্তা বলতে তো কিছুই নেই। সামান্য এই ঘরখানা কত পলকা। ধর্ষণকারী তো ইচ্ছে করলে ঘরেই এসে তাকে আক্রমণ করতে পারে। যে-মাঠের রাস্তায় আজ রেপ হল সেখান দিয়ে তো তাকেও একা ফিরতে হয় মাঝে মাঝে। তা হলে সেও কি একদিন পারুলের মতো শিকার হয়ে যেতে পারে?

এই ভয় এমন ঠাণ্ডা করে দিল তাকে যে, বীণা সারা রাত ঘুমোতে পারল না। শীত পড়েছে, কিন্তু শরীরের এই ঠাণ্ডা ভাবেই সে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

পরদিন সকালে সে কাকার ঠেক-এ হাজির হল গিয়ে।

কাকা, একটা ব্যবস্থা করো।

কিসের ব্যবস্থা বীণা?

শোনোনি কাল রাতে পারুল রেপ হয়েছে?

কে পারুল?

মহেন্দ্রবাবুর মেয়ে।

কী মুশকিল! মহেন্দ্রবাবুটাই বা কে?

আমাদের পাড়ার।

তিনি তো বিখ্যাত লোক নন যে চিনব।

বিখ্যাত না-ই বা হল। আমি তো চিনি।

রেপ হল কি করে?

ম্যাটিনি শো দেখে সন্ধেবেলায় ফিরছিল, তখন হয়েছে।

তার আমি কী ব্যবস্থা করব?

তার ব্যবস্থার কথা বলিনি। পারুলের ব্যবস্থা যা করার ডাক্তার আর পুলিশ করবে। ব্যবস্থা আসলে কিছুই হবে না। রেপিস্টদের চিনলেও পুলিশ ধরবে না। ধরলেও কেস ঝুলে থাকবে। আমি আমার ব্যবস্থার কথা বলছি। আমার আর ও-পাড়ায় থাকতে সাহস হচ্ছে না।

কাকা একটু হেসে বলে, অত ভয় পেলে চলবে কেন? রেপ তো হয়েই থাকে। তা বলে মেয়েরা তো আর ঘরে বসে নেই।

ওটা কথা নয় কাকা। তুমি এমনভাবে বলছ যেন রেপটা জলভাত।

আরে, রাগ করছ কেন? শেফালি রেপ হয়েছে বলেই যে আর সবাই হবে তার কোনও নেই।

শেফালি নয়, পারুল।

ওই হল। খোঁজ নিয়ে দেখ, হয়তো মেয়েটা ছেলেগুলোর সঙ্গে মিশত-টিশত। হয়তো একটু অ্যাডভেনচারাস টাইপের ছিল। সেই সব মেয়েই রেপ হয় যারা ওটা ইনভাইট করে।

বীণা ফুঁসে উঠল, কাল ঠিক এরকমই একটা কথা বলছিল একটা লোক। তোমরা পুরুষমানুষেরা আসলে সবাই একরকম। তোমার কেন ধারণা হল যে, মেয়েটাই খারাপ?

আচ্ছা মানছি, মেয়েটা ভাল। কিন্তু রেপ হওয়ার মতো একটা পরিস্থিতি তে চাই। নইলে সব মেয়েই তো হত। তা যখন হচ্ছে না তখন ধরতে হবে—

দয়া করে চুপ করবে?

কেন, কী হল?

তুমিও ওই লোকটার মতোই খারাপ। শোনো কাকা, মেয়েরা সবাই জানে, পুরুষেরা কী রকম। সুযোগ পেলেই যে তারা মেয়েদের হরির লুটের বাতাসা মনে করে তা আমি জানি।

তুমি বড় রেগে যাচ্ছ।

এর পরও রাগ না হয়ে পারে, বলো!

আচ্ছা আমি ক্ষমা চাইছি। এখন বলো তো কী হয়েছে!

বলেছি তো। আর শুনতে চেও না। আমার একটা ব্যবস্থা করবে?

কি ব্যবস্থা? তোমার সঙ্গে একটা মেয়েকে রাখতে বললাম, তা তো রাখলে না?

ওটা মোটেই কোনও ভাল ব্যবস্থা নয়।

তা হলে নিমাইকে ফিরিয়ে আনো।

নিমাই! সে কেন ফিরবে! ইয়ার্কি করছ? এসব নিয়ে ইয়ার্কি করা ভাল নয় কাকা।

দেখ, ফের রেগে যাচ্ছে! ইয়ার্কি মোটেই করিনি।

আগে আমাকে বলল তো, মেয়েদের আর কতদিন এরকম পাহারা দিয়ে রাখতে হবে?

কাকা গম্ভীর হয়ে বলে, যতদিন রেপিস্ট থাকবে ততদিন।

রেপিস্টদের ফাঁসি দাও না কেন? যাকগে, সেই মেয়েটা কোথায় আছে?

নেই। সে একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছে।

বাঁচা গেছে।

তুমি বরং ঘরটা ছেড়ে শহরের দিকে চলে এসো।

নিজের ঘর ছেড়ে দেবো?

উপায় কি?

বীণা কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে হঠাৎ বলল, আমার মনটা একদম বিগড়ে গেছে।

ব্যাপারটা তুমি বড্ড বড় করে দেখছ। পচা-গলা একটা সমাজে থাকো। কত পাপ হচ্ছে চারদিকে। গা বাঁচিয়ে এর মধ্যেই তো থাকতে হবে আমাদের। আর লড়াই করতে হবে।

তুমি কি লড়াই করছ শুনি?

আমিও লড়ছি বীণা। সামাজিক পাপের সঙ্গে আমার লড়াইয়ের হাতিয়ার নাটক। যার যা আছে সে তো তাই দিয়েই লড়বে, নাকি? আমাদের আর কোন হাতিয়ার আছে বলো!

বীণা গোঁজ হয়ে বসে থেকে কিছুক্ষণ পরে বলল, আমার বড় ভয় করছে। পারুলের মুখখানা দেখে এত কষ্ট হচ্ছিল কাল।

হওয়ারই কথা। ভেবো না, দলের কোনও মেয়েকে সঙ্গে কয়েকটা দিন রাখো। তারপর দেখা যাবে।

বীণা উঠল।

হাসপাতালে গিয়ে যখন পারুলকে ফের দেখল বীণা তখন তার জ্ঞান ফিরেছে। তার মা বসে আছে পাশে। তাকে দেখে পারুল ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

কী হয়ে গেল বীণাদি!

কী হয়েছিল বলবে?

পুলিশকে বলেছি। পুলিশ আরও উল্টে এমন সব প্রশ্ন করতে লাগল যেন দোষটা আমারই।

পুলিশও যে পুরুষমানুষ। কি হয়েছিল?

যা হয়। একা ফিরছিলাম। চারটে ছেলে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল।

চারজন?

হ্যাঁ।

ফলো করে এসেছিল?

কী জানি। কাউকে লক্ষ করিনি আগে।

হঠাৎ এসে ধরল?

হ্যাঁ। চারজনকে দেখলাম রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে। পাশ কাটাতে যেতেই একজন হাত ধরে ফেলল। বলল, আমাদের সঙ্গে যাবে? মেলা টাকা দেব।

এত সাহস?

ওরা আমাদের বেশ্যা বলেই বোধ হয় ভাবে। আমি ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে চেঁচাতে যাচ্ছি, অমনি একজন মুখ চেপে ধরল।

তারপর?

আরও শুনতে চাও? টেনে নিয়ে গিয়ে পতিত জমিটায় ফেলে দিল। তারপর মনে হচ্ছিল যেন, মানুষ নয়, চারটে কুকুর আমাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আমার কী হবে বীণাদি?

কী আবার হবে? এ সমাজে কিছু হয় নাকি? সব মেনে নিতে হয়।

আমার যে বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিল। পাকা কথা হয়ে গেছে। ওরা কি আর নেবে আমাকে?

বীণা থমকে গেল। তারপর বলল, কেন নেবে না?

ধ্যুৎ। রেপ হওয়া মেয়েকে কেউ নেয়?

বীণা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ।

পারুল কাঁদতে কাঁদতে বলে, কিছুই গোপন থাকবে না বীণাদি। এতক্ষণে তাদের কাছে বোধ হয় খবর পৌঁছে গেছে। কী হবে বলো তো?

বীণা পারুলের হাতটা শক্ত করে ধরে বলল, শোননা, ওরকম কথা বোলো না। বিয়েটাই মেয়েদের সব নয়। বিয়ে না হলেও জীবনটা নষ্ট হয়ে যায় না। মেয়েরা এত সহজে ভেঙে পড়ে বলেই তো লড়াই করতে পারে না। শক্ত হও তো। কয়েকটা কুকুর তোমার জীবন নষ্ট করে দেবে— তা কি হয়?

দিল তো।

মোটেই দিল না। আমি মনে করি, মেয়েরা পুরুষের তুলনায় অনেক উন্নত মানুষ। তাদের অনেক কিছু করার আছে।

এমনকি বাবা অবধি আজ সকালে আমাকে বকাবকি করে গেছে, জানো?

কী বলেছেন উনি?

বলেছে, আমারই নাকি দোষ। কেন সন্ধেবেলা আমি একা ফিরছিলাম, কেন আমি এত স্বাধীনচেতা, এইসব।

একা ছাড়া উপায় কি? আমাকেও কত রাতে একা ফিরতে হয়।

তোমার সম্পর্কে পাড়ার লোক তো কত কথাই বলে!

তুমি বলো না তো!

না, বীণাদি। আমি জানি, তুমি কত কষ্ট করে সংসার করছ। নিমাইদার সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। নিমাইদা তোমার কথা কত বলেছে আমাকে।

কী বলেছে?

বলত তমি নাকি বেহুলার মতো অনেক সাধ্যসাধনা করে তবে নিমাইদাকে শক্ত অসুখ থেকে ভাল করেছ। শ্বশুর-শাশুড়িকে খাইয়ে পরিয়ে রেখেছ। তোমার খুব প্রশংসা করত।

পারুলের ঘোমটা টানা মা এবার বীণার দিকে চেয়ে বলল, নিমাই আমার ছেলের মতো। কী সুন্দর গলা। কত কীর্তন শুনিয়েছে আমাদের। তাকে দেখছি না কেন?

আছে।

তোমার কথা সত্যিই খুব বলত বাছা। এখন এ মেয়েকে নিয়ে কী করব বলো তো! সারা রাত কেঁদেছি। চোখের জল বোধ হয় ফুরিয়ে গেল। একটা পরামর্শ দাও তো মা।

বিয়ে যদি ভেঙে যায় তো যাক। ও নিয়ে ভাববেন না। পারুল গান গাইতে পারে?

খালি গলায় গায়। ভালই গায়।

ও সুস্থ হয়ে উঠুক, আমি কাকাকে বলে ওকে যাত্রায় ঢুকিয়ে দেবো।

যাত্রা! যাত্রা করলে কী হবে! বিয়েটার কথা ভাবছি।

বিয়ের কথায় বিরক্ত হল বীণা। বলল, দেখুন মাসিমা, এদেশে এখনও মেয়েরা নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করতে পারে না। তাদের কেউ পছন্দ করলে, দরাদরিতে বনিবনা হলে তবেই বিয়ে।

তাই তো বটে।

লটারি খেলার মতো। বিয়ের জন্য বসে থাকলে মেয়েদের কিছু হবে? দেশভর্তি ছেলেগুলো সব বেকার, বিয়েটা করবে কে? তারপর এই ঘটনা। বিয়ে নিয়ে ভাবছেন কেন?

তাহলে?

ওসব পরে ভাবা যাবে মাসিমা। আচ্ছা, পারুল, ওরা কারা ছিল জানো? কাউকে চিনতে পেরেছিলে?

পারুলের চোখের পাতা যেন একটু কাঁপল। একটা মেয়ে মিথ্যে কথা বললে অন্য মেয়ে তা যেন বুঝতে পারে। পারুল স্তিমিত গলায় বলল, না তো!

একটুও চেনা লাগল না কাউকে?

না বীণাদি। বোধ হয় বাইরের ছেলে।

কত বয়স হবে?

পঁচিশ-ছাব্বিশ বলে মনে হয়।

প্যান্ট-শার্ট পরা?

একজনের পরনে পায়জামা ছিল।

আবার দেখলে চিনতে পারবে?

জানি না। এত ভয় পেয়েছিলাম যে, কিছু মনে পড়ছে না।

বীণা ভ্রূ কুঁচকে পারুলের দিকে চেয়ে রইল। তার মনে হল, পারুল মিথ্যে কথা বলছে। ধর্ষণকারীদের কাউকে হয়তো সে চেনে।

তবে বীণা আর আকচাআকচি করল না। বলল, ডাক্তাররা কী বলছে! কবে ছাড়বে তোমাকে?

দু-তিন দিন লাগবে।

পুলিশ কী বলে গেল?

আরও নাকি জানতে আসবে। তুমি আমার কাছে একটু বসবে বীণাদি? বসলে আমার একটু সাহস হয়।

আমি নিজেই তো ভীতু।

তুমি মোটেই ভীতু নও। একা একা কেমন ডাকাবুকোর মতো থাকো, তোমাকে সবাই ভয় খায়।

আমি বুঝি দেবী চৌধুরানী?

তোমার বেশ তেজ আছে। আমাদের নেই। আমার জায়গায় তুমি হলে ওরা পারত না।

বীণা বিছানার একধারে একটু বসল। তারপর বলল, তোমার প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করে না?

খুব করে।

কি ভাবে নেবে?

তা তো জানি না। ইচ্ছে করে ওদের ধরতে পারলে জলবিছুটি দিই। আমার ভবিষ্যৎটাই তো নষ্ট হয়ে গেল।

বীণা মাথা নেড়ে বলে, নষ্ট হবে কেন? নতুন ভবিষ্যৎ তৈরি হবে। যারা রেপ হয় তারা পচে যায় না।

তুমি বেশ বলল। ঠিক যেন সিনেমার ডায়ালগ।

নাটক করি বলে বলছ?

না, ছিঃ। তা নয়। কথাগুলো সুন্দর। সাহস হয় শুনলে।

তোমার এখন সাহসই তো দরকার। অনেকে যা হয়েছে তা মেনে নেয়। তুমি মেনে নিও না।

কী করব তা বলে দেবে?

ভেবে বলব। এখন নয়। আমারও অনেক লড়াই আছে। অনেক পথ যেতে বাকি।

কিন্তু তুমি তো রেপ হওনি বীণাদি। হলে বুঝতে।

পারুল হঠাৎ ফের ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে লাগল।

বীণা চুপ করে বসে রইল। সে ডায়ালগ দেয় বটে। কিন্তু তার ভিতরটা বড় শূন্য।

৫৯

বাড়ির প্ল্যান পাল্টাতে হল মণীশকে, অপর্ণা পরিষ্কার বলল, তুমি যাকে দিয়ে প্ল্যান করিয়েছো সে বড়লোকদের প্ল্যানার। আমাদের মতো মধ্যবিত্তের জন্য নয়। নিশ্চয়ই একগাদা টাকা নিয়েছে!

মণীশ খুব অস্বস্তিতে পড়ে গিয়ে বলল, না, তেমন কিছু নয়।

অপর্ণা ম্লান একটু হেসে বলল, শুনতে চাই না। শুনলে আমার মন খারাপ হবে। শোনো, তোমার রক্ত জল-করা টাকা ওভাবে ওড়াতে নেই। টাকা আমাদের কাছে সস্তা নয়। আমি অন্য প্ল্যানারকে দিয়ে প্ল্যান করিয়ে নিচ্ছি। তুমি আর বাড়ি নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

মণীশ লজ্জার সঙ্গে বলল, লোকটা আমার বন্ধু। ও আবার প্ল্যান করে দেবে। আর ফি দিতে হবে না। কথা হয়ে আছে, প্ল্যান অলটার করলে আর বাড়তি কিছু লাগবে না।

তাহলে শোনো, আমি অনেকদিন আগে থেকেই বাড়ির একটা রাফ স্কেচ করে রেখেছি। খুব ভেবেচিন্তে, আমাদের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই করেছি। সেটা ওই ভদ্রলোককে দিও। উনি ওটা দেখে প্ল্যান করে দেবেন।

অপর্ণা বাস্তবিকই তার কাঁচা হাতে সাদা কাগজে প্ল্যান করেছে। একটা নয়, একাধিক। দুপুরে বা বিনিদ্র রাতে সে ভেবে ভেবে ঘর বারান্দা সিঁড়ি এঁকেছে। এ তার স্বপ্নের বাড়ি। খুব বড় নয়। ছোট মিষ্টি একখানা দোতলা, বাগানঘেরা, চটকদার নয়, কিন্তু ছিমছাম। কী রঙ হবে তাও ভেবে রেখেছে। সেই আঁকা কাগজ সে মণীশের হাতে দিয়ে বলল, ঠিক এরকম হবে। মনে রেখো। ঘর আর বারান্দার মাপও দিয়ে দিয়েছি।

মণীশ একটু কাঁচুমাচু হয়ে বলে, দত্ত একটা কথা বলছিল। আধুনিক কনসেপশন হচ্ছে ছাদে সোলার প্যানেল লাগিয়ে নেওয়া।

সোলার প্যানেল! বলে চোখ কপালে তোলে অপর্ণা, কী হবে সোলার প্যানেল দিয়ে?

ঘরদোর শীতকালে গরম করা যাবে, গরম জলের অভাব হবে না।

অপর্ণা আকুল হয়ে বলে, কী মানুষ বলো তো তুমি! বাচ্চা ছেলে নাকি? এটা কি সাহেবদের দেশ যে ঘর গরম করতে হবে? এ শহরে বছরের মধ্যে নয় মাসই তো গরম। আর গরম জল আমাদের কোন কাজে লাগবে? তোমাকে নিয়ে যে আর পারি না।

মণীশ একটু গম্ভীরভাবে কাগজগুলো দেখে নিয়ে তার অ্যাটাচি কেসে ভরে যখন রওনা হচ্ছিল তখন অপর্ণার বড় কষ্ট হল মণীশের জন্য। বাচ্চা ছেলের হাত থেকে খেলনা কেড়ে নিলে তার যেমন অভিমানী মুখ

হয় মণীশের মুখের অবস্থা ঠিক তেমনি। অপর্ণা আর নিজেকে রাখতে পারল না। দুহাতে মণীশকে জড়িয়ে ধরে বলল, রাগ করোনি তো!

মণীশ হাসল, বলল, না। তুমি প্র্যাকটিক্যাল আর আমি ড্রিমার। তুমিই ঠিক কথা বলছো। আমি শুধু ভাবি, ড্রিমারদের দিয়ে দুনিয়ার কিছুই বোধ হয় হয় না।

ওভাবে বোলো না। স্বপ্ন কি আমিও দেখি না! তোমার মতোই দেখি। কিন্তু মাটিতে পা রেখে। তুমি যে পাখনা মেলে উড়ে যাও কল্পনার রাজ্যে! দুঃখ পাওনি তো!

না। তোমার কথায় দুঃখ পাবো কেন অপু? তুমি তো বরাবর আমাকে তোমার সবটুকু দিয়ে আড়াল করে রাখতে চেয়েছো।

আজকাল তোমাকে বড্ড ভয় পাই। একটুতেই অভিমান করো যে!

মণীশ খুব ফ্যাকাসে একটু হেসে বলে, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি তাহলে ফর্মাল হয়ে যাচ্ছে অপু? যদি বেশী মন বুঝে চলতে শুরু করো তাহলে যে আমি আর আমার আগের পাগলি, সোহাগী, ডমিনেটিং অপুকে খুঁজে পাবো না।

অপর্ণা দুহাতে মণীশের গলা জড়িয়ে ধরে বলে, আমি বুঝি বদলেছি? তুমিই তো বড্ড গোমড়া মুখ করে থাকো।

আমার মুখ গোমড়া করে দাও কেন? আমি তো হাসিখুশিই থাকতে চাই।

অপর্ণা অবাক হয়ে বলে, আমি মুখ গোমড়া করে দিই? ওমা! বলে কী রে?

মণীশ তার অ্যাটাচি খুলে অপণার আঁকা স্কেচগুলো বের করে বলল, দেখ অপু, একতলার ডিজাইনে তুমি একটা হলঘর এঁকেছো। এক কোণে ছোট্ট করে লিখেছো "ব্যাঙ্ক অর অফিস।" কেন লিখেছো অপু? একতলাটা ভাড়া দিতে চাও?

অপর্ণার দুটি হাতই মণীশের গলা জড়িয়ে ধরে ছিল। হাত দুটি এ কথায় হঠাৎ শিথিল হয়ে গেল। একটু বিবর্ণ হয়ে সে বলল, ওঃ, ওটা এমনিই লিখেছিলাম। ভাবছিলাম একটু বড়ই তো হচ্ছে বাড়িটা। আমরা ক'জনই বা লোক বলো! মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাবে, বুবকা কোথায় চাকরি করতে চলে যাবে হয়তো। তখন বুড়োবুড়ি কি করে থাকব? বরং একতলায় একটা ব্যাংক বা অফিস থাকলে ততটা ফাঁকা লাগবে না।

মণীশ হাসল না। মৃদু স্বরে বলল, তাই বুঝি অপু?

হ্যাঁ গো, বিশ্বাস করো।

তুমি কিন্তু বরাবর বলে এসেছো, বাড়ি করলে কখনও সে বাড়িতে ভাড়াটে রাখবে না।

আহা, এ তো আর ফ্যামিলি ভাড়াটে নয়। অফিস বা ব্যাংক তো দশটা-পাঁচটা। তারপর তো আর ঝামেলা থাকবে না। কন্ট্রাক্ট থাকবে। দু'চার বছর পর তুলেও দিতে পারা যাবে।

জিব দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে মণীশ খুব মৃদু স্বরে বলল, আমি ভাবলাম বুঝি তুমি ভবিষ্যতে একটা আয়ের পথ খোলা রাখলে। হয়তো ধরেই নিয়েছো, আমি আর বেশী দিন নয়। তাই কি এইসব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, অপু?

অপর্ণা এত কঠোর ও নগ্ন সত্যকে স্বীকার করে কি করে? সে কৃতকর্মকে চাপা দেওয়ার জন্যই যেন আরও আবেগে জড়িয়ে ধরে মণীশকে। মণীশের ইস্ত্রি করা শার্টের কলার দুমড়ে যায়। অপর্ণা বলে, কি করে এমন

কথা ভাবতে পারো তুমি? কি করে ভাবো?

আমি তোমার দূরদৃষ্টির প্রশংসাই তো করছি অপু!

না, তুমি সন্দেহ-বাতিকে ভুগছো। সবসময়ে সন্দেহ করছো যে, আমরা তোমাকে খরচের খাতায় ধরে নিয়েছি।

মণীশ একটু হাঁফিয়ে পড়ছিল। ধীরে সে অপর্ণার বাহুপাশ আলগা করে চেয়ারে বসল অবসন্নের মতো। বলল, একটু জল দাও। ঠাণ্ডা জল।

উদ্বিগ্ন অপর্ণা দৌড়ে গিয়ে ফ্রিজের জল নিয়ে এল, তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?

মণীশ মাথা নেড়ে বলে, না। মাঝে মাঝে একটু হাঁফ ধরে যায়। হার্ট একটা ভীষণ জরুরি জিনিস। তাকে বেশী উত্তেজিত করতে নেই।

দাও, প্ল্যানটা আমি এখনই ছিঁড়ে ফেলছি।

না অপু, থাক। আমার মনে হচ্ছে, তুমি ঠিকই করেছো। ও বাড়িতে আমাদের ফাঁকাই লাগবে।

আচ্ছা, আর এত রাগ করতে হবে না। নিচের তলাটা আমরা একটা হলঘরই রাখব। আমার অনেকদিনের ইচ্ছে, পাড়ার ওয়ার্কিং মায়েদের বাচ্চাদের জন্য একটা ক্রেশ করি। কলকাতায় ভাল ক্রেশ নেই। আমি একটা কিছু নিয়ে থাকতে চাই। দেবে করতে?

মণীশ একটা গভীর শ্বাস ছেড়ে বলে, কোরো অপু।

হ্যাঁ গো, সত্যিই শরীর খারাপ লাগছে না তো! আজ তাহলে অফিস গিয়ে কাজ নেই।

মণীশ বলল, আজ জরুরি কাজ আছে অফিসে। যেতে হবে। শরীর ঠিক আছে অপু। তবে মনে হয়, আমার একটু চেঞ্জ দরকার ছিল।

তাহলে চলো না, পুরী থেকে কয়েকদিন ঘুরে আসবে।

মণীশ ম্লান হেসে মাথা নেড়ে বলে, অনেক কামাই হয়েছে অপু। আর ছুটি নেওয়া যায় না। কাজও অনেক জমে গেছে।

এই বলে মুখের বিবর্ণতাটুকু নিয়েই বেরিয়ে গেল মণীশ। পিছনে একা ঘরে কেমন বিকল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল অপর্ণা। চোখ ভরে আসছে জলে। এ কান্নাকে থামানো যাবে না কিছুতেই। তার এখন কান্নাই দরকার। মণীশ কেন সব বুঝতে পারে? তার মনের কথা, তার ভবিষ্যতের গোপন চিন্তা, সবই যে ধরা পড়ে যাচ্ছে মণীশের কাছে! অথচ সে তো চায় মণীশ আরও একশো বা হাজার বছর বেঁচে থাকুক। সে কি তা চায় না? অবশ্যই চায়। আবার এও সত্য, সে বাস্তববাদী, সে কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্না। ভাবাবেগে ভেসে যেতে নেই, বেশী বিস্তার করা উচিত নয় কল্পনার পাখা। সে তাই একতলাটা ভাড়া দেওয়ার কথা ভেবে রেখেছিল। কোনও দোষ হয়নি তাতে। অথচ মণীশ কত কী ভেবে নিল হয়তো।

এক একটা দিন যেন পাষাণভার নিয়ে আসে। সারাটা দিন যেন দমচাপা, পাগল-পাগল, বিচ্ছিরি। আজকের দিনটা কিরকম যে যাবে, কে জানে! এরকম সব বিচ্ছিরি দিনে মাঝে মাঝে অপর্ণার ইচ্ছে করে কেরোসিনে স্নান করে একটা দেশলাই কাঠি ঘষে দেয় শরীরে।

এক বুক ভালবাসা আছে বলেই না এত জ্বালা! যাদের সে ভালবাসে না, তাদের জন্য তো জ্বালা-যন্ত্রণা নেই, উদ্বেগ নেই, অশান্তি নেই। কিন্তু যাদের ভালবাসে তাদের জন্যই সবসময়ে বুক দুরু-দুরু, তাদের মুখ

একটুখানি হাস্যহীন দেখলেই বুক ফাঁকা লাগে। তাহলে ভালবাসার এত গুণগান করে কেন লোকে? ওই যে ফ্যাকাসে মুখখানা নিয়ে বেরিয়ে গেল মণীশ, এখন সেই মুখখানা সারাদিন চোখের সামনে ভাসবে, আর জ্বালাতন হবে সে। তার পাগল স্বামী তাকে একদিন বলেছে, পঁচিশ হাজার বছর বেঁচে থাকলে তারা নাকি আর পরস্পরকে ভালবাসতে পারত না। মণীশ পারত কিনা কে জানে! কিন্তু অপর্ণা পারত। খুব পারত। ভাগ্যিস পঁচিশ হাজার বছর তাদের বাঁচতে হবে না। হলে পঁচিশ হাজার বছর ধরে সহ্য করতে হত এই উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা। এই কয়েক বছরেই পঁচিশ হাজার বছরের অভিজ্ঞতা হয়ে গেল বোধ হয় তার।

বিকেলে শুকনো মুখে মেয়েটা ফিরল।

অপর্ণা বলল, কি রে, মুখ শুকনো কেন?

ঝুমকি বড় শান্ত বিবেচক মেয়ে। একটু চুপচাপ আপনমনে থাকতে ভালবাসে। বলল, দেখ না মা, ওরা মোটে তিন শো টাকা মাইনে দেবে বলছে।

অপর্ণা উৎকণ্ঠ হয়ে বলল, ওরা কারা? অমন অর্ধেক করে কথা বলিস কেন?

একটা কম্পিউটর ফার্ম।

তিনশো টাকা মাত্র।

তিনশো টাকাতেই তোক পেয়ে যাবে।

অপর্ণা মেয়ের দিকে চেয়ে থেকে বলল, তুই ও চাকরি করবি?

ভাবছিলাম চাকরিটা ভাল না হলেও এক্সপেরিয়েন্স তো হবে।

চারুশীলার ভাই যে তোকে চাকরি দেবে বলেছিল, তার কী হল?

ঝুমকি মায়ের দিকে চেয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ওসব কথার কোনও দাম নেই। লোকটার বোধ হয় আমার কথা মনেই নেই। তাছাড়া হেমাঙ্গবাবুর এখন রোমান্টিক পিরিয়ড চলছে। এসব ছোটখাটো প্রবলেম নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই।

অপর্ণা সামান্য স্ক্যান্ডালের আভাস পেয়ে বলল, রোমান্টিক পিরিয়ড? কার সঙ্গে?

বিলেত-ফেরত দারুণ সুন্দরী একটা মেয়ের সঙ্গে। রশ্মি রায়। শুনতে পাচ্ছি বিয়ের পর দুজনেই বিলেতে চলে যাবে।

শোনো ঝুমকি, তোমাকে আর চাকরি চাকরি করে হন্যে হতে হবে না। চেহারাটা দিন-দিন যা হচ্ছে! কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গেছে, মুখ শুকিয়ে এতটুকু। এখন কয়েকদিন বাড়িতে বসে বিশ্রাম নাও। তোমার রেস্ট দরকার। যদি ভাল কোনও চাকরি পাও তখন দেখা যাবে।

ঝুমকি মায়ের দিকে একটা আনমনা দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বলল, আচ্ছা মা, পৃথিবীতে কিছু মানুষ খুব অন্যায় রকমের সুখে আছে, না?

কী বলছিস?

দেখ না, কিছু মানুষ এমন ভাগ্য করে এসেছে যে, তাদের কিছুই করতে হয় না। তাদের অনেক টাকা, গাড়ি বাড়ি, ব্যবসা বা চাকরি, যখন তখন বিদেশে চলে যাচ্ছে, আসছে। ভাবলে কেমন লাগে বলো তো? আমার তো ভীষণ রাগ হয়।

অপর্ণা একটু হাসল, ওভাবে বিচার করলে রাগ হওয়ারই কথা। আবার আমাদের চেয়েও কত দুঃখে কষ্টে মানুষ আছে।

সেটা ভাবলে তো আরও রাগ হয় মা। মানুষে মানুষে এত তফাত যে, সেটাকে লজিক্যাল বলেই মনে হয় না। কেন পৃথিবীটা এরকম বলো তো!

অপর্ণা মেয়ের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে মাথাটা নিজের কাঁধে চেপে ধরে। ঝুমকি তার চেয়ে এক ইঞ্চি লম্বা। একটু হেসে বলে, বড়লোকদের হিংসে করে কী করবি? যার যেমন কপাল।

কপালে আমার বিশ্বাস ছিল না। ভাবতাম, সবাই সবকিছু হতে পারে। যদি চেষ্টা করে। কিন্তু এখন দেখছি, চেষ্টাতে কিছু হয় না। একটা সামান্য ভদ্র মাইনের চাকরি পাওয়াই যে কি কঠিন!

ইদানীং ঝুমকির মুখে যে প্রগাঢ় ক্লান্তির ছাপ দেখতে পায় অপর্ণা, তা তার একটুও ভাল লাগে শুধু একটা চাকরির জন্যই কি এত আকাঙ্ক্ষা আর এত হতাশা? চাকরির ওর এমন কি দরকার? মেয়েদের একটু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকা যে ভাল, তা অপর্ণাও বিশ্বাস করে। কিন্তু তার জন্য এত তাড়াহুড়োর কি আছে? ঝুমকির বাবা তার সন্তানদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মুক্তহস্ত। দশ টাকা চাইলে বিশ টাকা দিয়ে দেয়। কিন্তু বুকা বা অপু যেমন টাকা-পয়সা খরচ করতে ভালবাসে, ঝুমকি সেরকম নয়। সে বাবার কাছ থেকে ততটুকুই নেয়, যতটুকু না হলেই নয়। সেই হিসেবে ঝুমকি অনেকটা অপর্ণার মতো টাকা-পয়সা ওড়াতে পছন্দ করে না। একটু হিসেবী। ইদানীং বাই চেপেছে বাবাকে সাহায্য করতে হবে। কিন্তু সেটা এখনই না হলেও হয়। অপর্ণার সন্দেহ হয়, চাকরি নয়, অন্য কোনও গুঢ় কারণে মেয়েটা শুকিয়ে যাচ্ছে। এমনিতেই এই বয়সের মেয়েদের ভিতরের কথা টেনে বার করা কঠিন। তার ওপর ঝুমকি ভীষণ চাপা। অন্য সব কথা দূরে থাক, ঝুমকি কী খেতে ভালবাসে কোন রং পছন্দ করে সেটা অবধি অপর্ণা ধরতে পারে না। তার তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে ঝুমকিই সবচেয়ে বেশী আবছা তার কাছে।

অপর্ণা মেয়ের দিকে নির্নিমেষ চেয়ে থেকে ওর মনের কথা বুঝবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। বলল, তোর বুঝি চাকরি ছাড়া আর কিছুতে মন নেই? হ্যাঁ রে, তোর কি একটাও ছেলে-বন্ধু নেই?

ঝুমকি যেন সামান্য অবাক হল। তারপর ভ্রূ কুঁচকে বলল, খুব পাকা হয়েছো তো মা! মেয়ের বয়ফ্রেন্ডের খবর নেওয়া হচ্ছে?

আহা, আছে কি নেই, বল না!

আমার আবার বয়ফ্রেন্ড! কী যে বলো না! এই তো তুমিই বললে আমার চেহারাটা হাড়গিলের মতো।

মিথ্যুক! আমি কক্ষনো তোকে হাড়গিলে বলিনি।

হাড়গিলে কথাটা হয়তো উচ্চারণ করোনি, কিন্তু যা বিবরণ দিয়েছে, তাতে তাই দাঁড়ায়।

মোটেই না। চেহারা খারাপ হয়েছে তাই বলছিলাম। গায়ে মাংস লাগলে তোর পাশে কেউ দাঁড়াতে পারে?

খুব পারে। নিজের মেয়েকে অত বাখনাতে হবে না। আমার চেহারা কেমন, তা আমি জানি।

খুব জানিস। ক'টা দিন রেস্ট নে, আর ভাল করে খা। তারপর দেখিস আয়না অন্য কথা বলবে।

ঝুমকি একটু হাসল।

অপর্ণা বলল, তোর একটা কিছু হয়েছে। কী হয়েছে বলবি আমাকে?

কী হয়েছে? বলে ঝুমকি অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

তুই বলছিস না। কিন্তু আমি যেন টের পাচ্ছি।

ঝুমকি শান্ত গলায় বলে, তুমি সব সময়ে এত টেনশনে থাকো কেন মা? আমার আবার কী হবে? চাকরি পাচ্ছি না, তাই মনটা ভাল লাগে না।

চাকরি তো তোর তত দরকার নেই। এমন নয় যে, তুই চাকরি না করলে আমরা খেতে পাবো না।

চাকরি পাওয়াটা শুধু খাওয়ার জন্য দরকার নয় মা। একটা প্রেস্টিজেরও ব্যাপার। চাকরি না-পাওয়া মানে আমাকে কেউ যোগ্য মনে করছে না। কম্পিটিশনে আমি হেরে যাচ্ছি।

আহা, ওসব ভাববার কি আছে? সবাই কি একবারেই পায়? সকলকেই চেষ্টা করতে হয়।

ঝুমকি একটু মাথা নেড়ে বলে, আমার কিছু হবে না মা। কিছুই হবে না।

অপর্ণার সন্দেহটা গেল না। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় হয়তো নেই, কিন্তু মায়ের মন বলে কথা! তার মনের মধ্যে একটু চিমটি থেকে গেল। মেয়েটা তাকে বন্ধু বলে ভাবে না, হয়তো বিশ্বাসও করে না, হয়তো ভাবে মা বুঝবে না। কিন্তু বললে অপর্ণা হাঁফ ছেড়ে বাঁচত।

অনু ফিরল বিকেলের মুখে। এ মেয়েটা ঝুমকির মতো নয়। খুব হাসি-খুশি আর ইয়ারবাজ হচ্ছে দিনকে দিন। চেহারাটা ভরন্ত। এখনই যৌবন ডাক দিয়েছে যেন। অনুর খুবই সুন্দরী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা।

বই-খাতা ফেলে এসেই অপর্ণাকে জড়িয়ে ধরল, হাই মাম্মি, হোয়াটস্ দি নিউজ?

অপর্ণা তার মাথায় হাত দিয়ে বলে, রোজ কি আর নিউজ থাকে? আমাদের আবার নিউজ কিসের?

হোয়াট অ্যাবাউট দি হাউস?

হবে, তোমার বাবা আবার নতুন করে প্ল্যান করতে দিয়েছে।

তুমি এক নম্বরের মাইজার। আগের প্ল্যানটা কত বেটার ছিল। কত বড় আর কী সুন্দর ব্যাপারটা হত বলো তো!

আর টাকাটা আসত কোত্থেকে? তোর শ্বশুর দিত?

ইউ আর ইমপসিবল। আমার বাবা কি বেকার? বাবা ঠিক পারত।

তোদের বুদ্ধি নিয়ে চললে সংসার একদিন ভেসে যাবে। আমরা যেমন, আমাদের বাড়িও ঠিক তেমনি হবে।

মজা থাকবে না মা।

খুব থাকবে। মজা তো জিনিসে থাকে না, থাকে মনে।

আমাকে সেপারেট রুম দেবে তো?

দেখব।

প্ল্যান হয়ে গেলে আর কি করে দেখবে?

দেখব নয়, দেখেছি। তোমাদের আলাদা আলাদা ঘরই হবে।

দ্যাটস্ মাই মাম্মি। বলে অনু তাকে একটু আদর করল।

এই মেয়েকে নিয়ে চিন্তা আছে অপর্ণার। বড় ইংরিজিয়ানা শিখছে। ট্যাঁশ স্কুলে পড়ে বলে নয়। সে তো বুবকাও পড়ে। ওর মধ্যে একটু বিলিতি নকলের ঝোঁক আছে। একটু ছেলে-ঘেঁষা। ওর অনেক বয়ফ্রেন্ড। মেয়েটার একটু ডোন্ট কেয়ার ভাবও আছে। তবে পড়াশুনোয় অনু বেশ ভাল।

স্কুলের পোশাক না ছেড়েই অনু টেলিফোনের সামনে বসে গেল। রোজ গাদা গাদা ফোন করে। কাজের কথা হয় কিনা কে জানে, বন্ধুদের সঙ্গে বিস্তর হা-হা হি-হি হয়।

এই, না খেয়েই যে বড় টেলিফোন করতে বসলি?

খিদে নেই মা। আজ ফেট ছিল। স্কুলে খাইয়েছে।

টেলিফোনের বিল কত আসছে জানিস?

উঃ, তুমি না দারুণ মাইজার।

মোটেই মাইজার নই। ফ্রি কল-এর ওপরে আগের বারে অন্তত একশো কল হয়েছে, তা জানিস?

তিনটে ফোন করব মা। মাত্র তিনটে।

কাকে করবি?

ফ্রেন্ডদের।

তাদের কাছ থেকেই তো এলি এইমাত্র।

একটু দাও না। কত কথা থাকে জানো না তো। এণাক্ষী একটা দারুণ স্টোরি বলছিল। কিন্তু শেষ হওয়ার আগেই ওর স্টপ এসে গেল যে।

অপর্ণা চোখ কপালে তুলে বলে, এখন ফোনে স্টোরি শুনবি?

একটা করি না মা, মাত্র একটা।

না। এখন নয়। ও মেয়েটাও বাড়িতে গিয়ে এখন একটু হাঁফ ছাড়ছে। ওকে একটু সময় দাও। সন্ধের পর করিস।

উঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না।

এক একদিন অপর্ণা টের পায়, মাঝরাতেও অনু কাকে যেন টেলিফোন করে। বন্ধুদেরই করে কি? নাকি—? সেসব কথা এখনই ভাবতে চায় না অপর্ণা। অনু এখনও ছেলেমানুষ। তবে আজকালকার মেয়ে, তাদের সম্পর্কে কিছু ধারণা করে রেখে লাভ নেই। তার কাছে ছেলেমানুষ, লোভী যুবকদের কাছে তো তা নয়। তাদের কাছে লোভনীয় সামগ্রী।

বুবকা আসে সবার পরে। স্কুলে আজকাল টিউটোরিয়াল ক্লাস হচ্ছে। তার পরেও ক্রিকেট প্র্যাকটিস থাকে প্রায়ই।

বুবকা এলে বুকটা ভরে যায় অপর্ণার। ভিতরে ভিতরে একটু পক্ষপাত তার হয়তো আছে। এ জন্মে সেটা কাটবে না। ছেলের জন্য একটা বাড়তি তেষ্টা তার থাকেই। একটু চিন্তাও। বুবকা বড্ড ভাল ছেলে। তার মধ্যে কোনও কমপ্লেক্স নেই। একটু বেশী সাদা আর সরল। উনিশে পা দিয়েছে, কিন্তু এখনও শিশুর মতো। কিন্তু এ সমাজে শিশুদেরই বিপদ বেশী। কে কোথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে ভুল পথে নিয়ে যাবে।

বুবকা সম্পর্কে একটু দুঃখের বোধও আছে অপর্ণার। বুবকা মাকে ভালবাসে খুব, কিন্তু বাপকে একটু বেশী। খুব শিশুকাল থেকেই ছেলেটা বাপ-ঝোঁকা, কি করে যে হল কে জানে। বুবকা তার বাবাকে যত ভালবাসে, যত বিশ্বাস করে, বাপের ওপর যত নির্ভর করে, তত আর কাউকে নয়, কারও ওপর নয়।

মা! বলে এক গাল হাসল বুবকা।

ইস ঘেমেছিস কেন? শীতে কেউ ঘামে?

আমার যে ফ্যাট আছে।

ফ্যাট! কে আবার ওকথা বলল?

তুমি খাইয়ে খাইয়ে রোজ আমার ফ্যাট বাড়িয়ে দিচ্ছো।

বলিস কি রে? কোথায় আবার ফ্যাট?

আছে মা। রোজ এত এত খাচ্ছি, সেগুলো যাচ্ছে কোথায়?

মোটেই তোর ফ্যাট নেই।

স্কুলে আমাকে আজকাল কেউ কেউ ফ্যাটসো বলে ডাকে।

তারা অন্ধ।

বুবকা নিঃশব্দে হাসল, তারপর বলল, কী টিফিন খাওয়াবে বলো তো! আই অ্যাম হাংরি।

হাত-মুখ ধুয়ে আয়। নুডলস্ করে রেখেছি, চিংড়ি দিয়ে।

দ্যাটস্ ফাইন।

সন্ধে অনেকটা গড়িয়ে মণীশ ফেরে। মুখখানা গম্ভীর। ছেলেমেয়েরা যে যার ঘরে পড়ছে। একা অপর্ণাই রিসিভ করে তাকে।

গম্ভীর কেন গো?

গম্ভীর! না তো!

অপর্ণার আবার চোখে জল আসতে চায়। সে তো মণীশকে দুহাতে আগলে রেখেছে। তবু কোথায় যে ব্যবধান রচিত হয়ে যায়। সে কিছু করতে পারে না।

৬০

নদীর ধারে বাস করতে হেমাঙ্গর কি নেশা ধরে গেল? গত শুক্রবার এসেছে। কলকাতায় বিস্তর বকেয়া কাজ পড়ে থাকা সত্ত্বেও আজ আর এক শুক্রবার অবধি রয়ে গেছে এখানে। কোনও খবরও দেয়নি কোথাও। না বাড়িতে, না অফিসে, না রশ্মিকে। দায়হীন জীবন কি এরকমই হয়? গত সাত দিন সে নৌকোয় নৌকোয়, হেঁটে হেঁটে নানা গাঁয়ে ঘুরেছে, বাঁকা মিঞার সঙ্গে বাঘের জঙ্গল অবধি। দাড়ি কামায়নি, শহুরে পোশাক পারেনি। ধুতি আর শার্ট। তাও ময়লা হয়েছে যথেষ্ট।

বাঁকা মিঞা না বলে পারল না, বাবু, কাণ্ডটা কী? এসব হচ্ছেটা কি? আপনি যে আর বাড়িমুখো হচ্ছেন না!

একটু হেসে হেমাঙ্গ বলে, কী হবে বাড়িমুখো হয়ে? কী আছে বলো তো সেখানে!

এখানেই বা কোন মধুটা পাচ্ছেন আপনি? এখানে কী আছে?

এখানে আর যাই হোক, দায় তো নেই। এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে বলে তো আর কেউ শাসাচ্ছে না।

সেদিন যে লোকটা এসেছিল কী বলে গেল আপনাকে?

চয়ন! সে তো চারুদিদির গুপ্তচর। ছেলেটা ভাল। জানতে এসেছিল।

বাঁকা মিঞা মাথা নেড়ে বলে, কিছু একটা পাকিয়ে তুলেছেন বলে মনে হচ্ছে। একটু খোলসা হবেন কি?

হেমাঙ্গ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, খোলসা হতে বলছো? কিন্তু নিজেই তো জানি না তোমাকে কী বলব!

মাঝে মাঝে এমন এক একটা সংকটের সময় আসে যখন মানুষ সত্যিই বুঝতে পারে না, সে কী চায়। যেটা চায় না, সেটাই হয়তো চায়, যেটা চায় সেটা হয়তো তার সত্যিই প্রয়োজন নেই। এরকম সব সংকটের মুহূর্তে একজন প্রম্পটারের অভাব বড় বেশী বোধ করে হেমাঙ্গ। কে বুঝিয়ে দেবে, কে বলে দেবে?

বাঁধ ধরে সকালে অনেক দূর হাঁটে হেমাঙ্গ। সূর্যোদয় দেখে। মাঠঘাট, নদী নিয়ে বিশাল বিস্তার জেগে ওঠে চোখের সামনে। মনে হয়, কোনও পিছুটান আর নেই। নোঙর ছেড়ে সে এখন অনির্দিষ্ট বার দরিয়ায়। যেন সে আর চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট নয়, যেন তাকে আর পয়সা রোজগার করতে হবে না, আর বিষয়-চিন্তা করতে হবে না, যেন তার কোনও দায়ভারই নেই পৃথিবীতে।

কিন্তু তিষ্ঠোতে দেয় না বাঁকা মিঞা। প্রায়ই এসে তাড়া দেয়, একবার কলকাতা ঘুরে আসেন গিয়ে। কাজকর্ম যে সব রসাতলে যাবে।

আমাকে চাষবাস শেখাবে বাঁকা?

সে সব হবে'খন। শখের শেখা শিখতে বেশী সময় লাগবে না। কিন্তু আপনার যা বিদ্যে তা তো এ কাজের জন্য নয়, সবাই চাষ করলে দুনিয়াটা চলবে কি করে?

দিন দুয়েক আগে সে রশ্মিকে একটা চিঠি দিয়েছে। তাতে লিখেছে, নিজের সঙ্গে কিছু বোঝাপড়া আছে। তাই ক'দিনের ছুটি নিয়েছি। তুমি কিছু মনে কোরো না। এই ছুটিটার বড় দরকার ছিল আমার। বোধ হয় মানসিক ক্লান্তিই হবে। আমার ঠিকানা চারুদি জানে। সুতরাং নিরুদ্দেশ হইনি। তুমি বোধ হয় দিল্লি গেছ। সেরকমই শুনেছিলাম তোমার মুখে। এসে এ চিঠি পাবে। পাওয়ার পর একটু অপেক্ষা কোরো। আমি গিয়ে বুঝিয়ে বলব। এমনই কপাল, বাংলায় গুছিয়ে একটা চিঠিও লিখতে পারি না। লেখার দোষে ভুল বুঝো না।

চিঠিটা পৌঁছে থাকবে। নাও পৌঁছোতে পারে। চিঠিটা দেওয়া উচিত হল কিনা তা বুঝতে পারে না হেমাঙ্গ। উচিত হল কি? এই অজ্ঞাতবাসের জবাবদিহিই বা সে কেন করল?

গত চার দিন বাঁকা মিঞার ঘাড়ে আর খাচ্ছে না হেমাঙ্গ। সে আজকাল রান্না করছে। প্রথম প্রথম পুড়ে বা গলে যেত তরকারি বা ভাত। আজকাল মোটামুটি হয়। তবে এত খারাপ রান্না জীবনে খায়নি হেমাঙ্গ। খিদের মুখে খাওয়া যায়, এই মাত্র।

বাঁকা মিঞা যথেষ্ট আপত্তি তুলে বলেছে, আমি যতদিন আছি ততদিন রাঁধবেন কেন? আমি মরলে না হয় —

হেমাঙ্গ বলে, না বাঁকা, তোমার ঘাড়ে বসে খেলে আমার এই অজ্ঞাতবাসটাই অর্থহীন হয়ে যাবে। কোনও মানে থাকবে না। নিজের ওপর নির্ভর না করলে মজাও থাকে না।

সাত দিনে সে বুঝতে পারছে, ব্যাপারটা একটু বোরিং। সাতটা দিন কাটছে খুব ঢিমে তেতালে। সে হিসেব করে দেখেছে এখানে এক ঘণ্টা কাটে কলকাতার আড়াই ঘণ্টার মাপে। এখানে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তে অনেক বেশী সময় লেগে যায়। গত সাত দিনে এখানে সে যত হেঁটেছে, গত দশ বছরেও সে এত হাঁটেনি। হাঁটা জিনিসটাও তার কাছে ক্লান্তিকর। কারণ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পথ যেন ফুরোয় না।

এসব না ধরলে তার কিছু খারাপ লাগছে না। গাঁয়ের অনেক মানুষজনের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। দু-চারজন ডেকে নিয়ে চা-টা খাইয়েছে তাদের বাড়িতে। কিন্তু এটাও ঠিক জীবন নয়। অনেক ফাঁক, অনেক ফোকর।

শীত এসেছে। এখানে জাঁকিয়ে শীত পড়ে গেছে। নদীর ধারে তার আড়ালহীন ঘরখানা সারা রাত হিমেল হাওয়ার ঝাপটা খায়। এত শীত করে ভোরের দিকে যে ঘুম ভেঙে সে উঠে বসে থাকে। অন্ধকার রাতে বাতাসের হু-হু বিরহের শব্দে এসে মেশে নদীর অবিরল ঢেউ ভাঙার ছলাৎছল। শেষ যামের শেয়াল ডাক দিয়ে যায়। শেষ রাতে সে মাঝে মাঝে বাইরে এসে দাঁড়ায়। কখনও বড্ড কুয়াশায় সব আবছা হয়ে থাকে। কখনও পাতলা কুয়াশার ভিতর দিয়ে জ্যোৎস্নারাতে এক অপার্থিব প্রেক্ষাপট দেখে সে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকে।

না, সে কোনও বোঝাপড়াই করে উঠতে পারেনি নিজের সঙ্গে। সে নিজের মনকে বুঝতে পারছে না। সে নিজেকে চিনে উঠতে পারছে না। নদী বা প্রকৃতি তাকে কোনও পথের সন্ধান দিল না। শুধু মুক্ত বায়ু তার ময়লা ফুসফুস পরিষ্কার করে দিল, একটু নেশা ধরিয়ে দিল।

বাঁকা, ভাবছি রোববারে কলকাতায় ফিরে যাবো।

যাবেন! তাই যান। এ বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। খবরও তো দিয়ে আসেননি।

কিন্তু আমি আবার শিগগিরই এসে কিছুদিন থাকব।

থাকবেন। তবে ওদিকটা সামাল দিয়ে আসবেন।

বিষয়ী বাঁকা তার সমস্যা বোঝে না। কিন্তু বাঁকা যা বলে তা বাস্তববাদীর কথাই। বাঁকা তার এই একাকী বাস করাটা পছন্দ করছে না। কিছু একটা সন্দেহ করছে। সেটা অমূলকও নয়।

দাড়িতে আমাকে কেমন লাগছে বাঁকা?

বাঁকা হাসল। বলল, কিছু খারাপ লাগছে না। তবে রাখার দরকারটাই বা কী?

দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে হেমাঙ্গ বলল, রেখে দেখাই যাক না। শুনেছি দাড়িতে রেডিয়েশন আটকায়, চোখ ভাল থাকে। তাছাড়া কেন কে জানে, দাড়ি কামাতে আমার বড্ড আলিস্যি।

কী যে বলেন!

শনিবার দুপুরে রান্না চাপানোর আয়োজন করছিল হেমাঙ্গ। উনুন ধরাতে, বাসন মাজতে, ঘর ঝাঁটপাট দিতে একটা মেয়ে আসে। তার নাম বাসন্তী। বয়স সতেরো-আঠারো এবং ভীষণ ফচকে। মোটেই লজ্জাবতী লতা নয়। বয়সটা বিপজ্জনক, তবে বাঁকা সার্টিফিকেট দিয়েছে, মেয়েটা ভাল। ঢলাঢলি করার মতো মেয়ে নয়।

বাসন্তী একটু বেশী কথা কয় বটে, কিন্তু সময়টা খারাপ কাটে না হেমাঙ্গর। আগে বাবু বলে ডাকত, আজকাল দাদা ডাকে।

ও দাদা, আজ কী রাঁধবে গো? যজ্ঞিবাড়ির আয়োজন দেখছি।

এটা অবশ্য ঠাট্টা। যজ্ঞিবাড়ির আয়োজন কিছুই নেই। কিছু আলু, কয়েকটা মূলো আর একটু বেগুন মাত্র আছে। হেমাঙ্গ একটা ঝোল আর ভাত রাঁধে। কখনও একটু সেদ্ধ। এই-ই যথেষ্ট।

হেমাঙ্গ মৃদু একটু হেসে বলে, এতেই হবে।

তোমার তো সবতাতেই হয়। ঝোল রাঁধবে তো? এই ঝোলে কী দিতে হয় জানো? ডালের বড়ি।

ওসব লাগবে না।

বলো তো এনে দিই। শম্ভুর মা বড়ি বিক্রি করে, এই তো কাছেই বাড়ি।

বড়িফড়ির অনেক ঝামেলা।

তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। সারাদিন হাঁ করে গালে হাত দিয়ে কী ভাবছো আর সেদ্ধপোড়া অখাদ্য সব সোনামুখ করে খেয়ে নিচ্ছে। আমার হাতে খাবে? বলো তো রেঁধে দিয়ে যাই।

তোর হাতে খেলে আমার মজাটাই মাটি।

উঃ, খুব তত মজা। কাল না গরম তেলের ছিটে লেগেছিল হাতে!

রাঁধতে গেলে ওরকম হয়।

তোমাকে বলেছে! আমরা বুঝি রাঁধি না? তুমি যে কড়াইতে তরকারি ছাড়ার সময় ভয়ে সিঁটিয়ে থাকো, আর দূর থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দাও। ওতেই তো ছিটে লাগে।

হেমাঙ্গ লজ্জার হাসি হেসে বলে, কি জানিস, গরম তেলে তরকারি দিলেই যে প্রথমে ঝম করে ওঠে বা চিড়বিড় করে ওটাকে আমি একটু ভয় পাই।

বাসন্তী হি-হি করে হাসল। বলল, তাহলেই বোঝে কেমন রাঁধুনী হয়েছো। আমার হাতে যদি খাও তো কম তেল কম মশলায় ভাল করে বেঁধে দেবো। আমাদের গরিব ঘরে ওসব শিখতে হয়। তুমি গুচ্ছের তেল মশলা নষ্ট করছে রোজ। অত লাগে না।

শিখব রে, আস্তে আস্তে শিখব সব।

তোমার শেখারই বা কি দরকার? বাঁকা চাচা বলে, তুমি নাকি বড় বড়লোক। তাহলে শিখবে কেন? রাঁধার তো লোক আছে।

তবু শেখা ভাল। সব শেখা ভাল। তাতে অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয় না।

ই বাবা, সব যদি তুমিই করে নাও তবে আমাদের কে আর ঘরের কাজ করতে ডাকবে? খাবো কি তবে?

তুই বরের জন্য রাঁধবি।

আহা, আমাদের আবার বিয়ে, তার আবার বর। তোমাদের মতো নাকি? বর তো আজ আছে, কাল নেই। ছেড়ে চলে যায়।

তোরটা গেছে নাকি?

একবার নয় গো, এই নিয়ে দুবার হল। আমাদের তো আর তোমাদের মতো বিয়ে রেজিস্টারি হয় না, ডিভোর্স করতে কেউ আদালতেও যায় না। ধরলেই হল, ছাড়লেই হল।

সেটা তো ভালই। সম্পর্কে ধরাবাঁধা ব্যাপার নেই।

তোমার এরকম ভাল লাগে বুঝি? পেটের চিন্তা থাকলে বুঝতে। তার ওপর যদি বাচ্চাকাচ্চা হয়। মরদের তো দায় নেই, যত দায় আমাদের। মরদ তোত ছেড়ে দিয়ে আর একটাকে ধরে।

আর মেয়েগুলো বুঝি বরকে ছাড়ে না?

বাসন্তী হি-হি করে হেসে বলে, তাও ছাড়ে। তবে কম।

তোর বয়স কত?

ঠোঁট উল্টে বাসন্তী বলে, কে জানে কত! তবে খুব কম নয়।

সতেরো-আঠেরোর বেশী হবে না।

তাই ধরে নাও, হি-হি।

এই বয়সে দু-দুটো মরদ তোকে ছাড়ল? হ্যাঁ রে বাসন্তী, তুই যে তাজ্জব করলি!

আমার দোষ বুঝি! দেখ গে আমাকে ছেড়ে আর একজনকে নিয়ে ঘর করছে। ফের তাকেও ছাড়বে। সবই আমাদের কপাল।

তা ভাল দেখে একটা মানুষকে বিয়ে করতে পারিস না?

বিয়ে কি আর খোলামকুচি? ইচ্ছে করলেই ভাল পাব কোথায়? কপালে যা জোটে। আমাদের ওরকমই সব হয়।

এ তো অরাজকতা রে!

তা যা বলল। তুমিই তো এক্ষুনি প্রশংসা করছিলে। বললে তো যে, ব্যাপারটা বেশ, ধরাবাঁধা থাকে না কেউ।

হেমাঙ্গ একটু হাসল, একদিক দিয়ে তো ভালই। কিন্তু সমাজবন্ধন বলে একটা কথা আছে, সেটা তুই বুঝবি না। তবে সমাজটাকে একটা খুঁটে বেঁধে না রাখলে মুশকিল। এরকম ভেসে বেড়ালে সমাজটাই তো গড়ে ওঠে না। পরিবার একটা মস্ত কথা। সমাজের নিউক্লিয়াস।

বড্ড শক্ত শক্ত কথা বললা তুমি। হ্যাঁ দাদা, আজ মশলাটা কী হবে বল তো! জিরে হলুদ বেটে দিই?

দে। আমার একটা হলেই হল।

শোনো, জিরে ফোড়ন দিও, একটা তেজপাতা দিও তার সঙ্গে। তুমি মাছ-টাছ খাও না?

ক'দিন খাচ্ছি না।

কেন খাচ্ছো না? ঝামেলার ভয়ে? আমি কেটেকুটে দিয়ে যাবোখন।

হেমাঙ্গ একটু ম্লান হেসে বলে, আসলে, আমি মাছ রাঁধলে কেমন একটা আঁশটে গন্ধ থেকে যায়। খেতে পারি না।

হি-হি করে খুব হাসে বাসন্তী। বলে, সাঁতলাও না?

সবই করি। তবু হয় না।

হি-হি। তুমি কিছু পারো না। শুধু লেখাপড়া আর বসে বসে ভাবা।

এরকমই ভাল। বেশী হাঙ্গামা করতে নেই। যত সহজ সরল থাকা যায়।

আমি মাছ বেঁধে দিয়ে যাবো কাল থেকে।

না রে। নিরামিষ তত খারাপ লাগছে না। ভাবছি এবার থেকে এখানে এলে নিরামিষই খাবো।

তোমার যে কী বুদ্ধি! এখানে তো একটা জিনিসই ভাল। মাছ। এত টাটকা মাছ কি কলকাতায় পাবে? নগেনকে বলে দিলে সে একেবারে জ্যান্ত মাছ ঘরে পৌঁছে দিয়ে যাবে। কানকো উল্টে দেখার দরকার নেই। দাপানো মাছ।

হোক গে। আমার মাছ ভাল লাগছে না।

ধনেপাতা খাও?

খাই। কেন?

আমাদের উঠোনে হয়েছে। কাল নিয়ে আসবো। ঝোলে একটু দিও। স্বাদ হবে।

আচ্ছা।

এইভাবেই সম্পর্ক রচিত হয় বুঝি। কোথায় ছিল সে, কোথায় বাসন্তী বা বাঁকা মিঞা বা এ গাঁয়ের আর সবাই। কত তফাত তাদের জীবনযাত্রায়। এ গাঁয়ে এই অজ্ঞাতবাস করতে এসেই না চেনা হল! এটা কি কম! মানুষের যা আয়ু তাতে জীবৎকালে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের প্রত্যেককে একবার হ্যালো বলে যাওয়ারও সময় নেই। কত দূর দূরান্তে শহরে গাঁয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে ছড়িয়ে রয়েছে মানুষ। এত মানুষের কত জনকে চেনে হেমাঙ্গ? এই যে চেনাজানা হচ্ছে, পরিচয় বিস্তারলাভ করছে, এটাই হেমাঙ্গর মস্ত প্রাপ্তি বলে মনে হয়।

উঠোন ঝাড় দিতে দিতে হঠাৎ বাসন্তী চেঁচাল, উঃ মা গো!

সাপে কামড়েছে ভেবে ভয় খেয়ে হেমাঙ্গ ঘর থেকে তার কোম্পানি ট্যাক্সের বইখানা হাতে নিয়েই দৌড়ে বেরিয়ে এল, কী হল রে? কী কামড়েছে?

ওমা, কী সুন্দরমতো একটা মেয়ে ঘাটে নেমেছে দেখ? এ হয় তোমার কাছে এসেছে, নয়তো ফিল্ম স্টার। শুটিং করতে এসেছে। সঙ্গে লোক আছে। দেখবে এসো না!

হেমাঙ্গর বুকটা ধক করে উঠল।

এক সেকেন্ড বাদেই বাসন্তী আর একটা আর্তনাদ করল, ওমা গো, আর একটা সুন্দরমতো মেয়ে যে গো! কী শাড়িটা! ওঃ, ময়ূরের মতো দেখাচ্ছে দুজনকে।

হেমাঙ্গ উঠোনে নামল এবং দেখল। চারুদি, রশ্মি, চয়ন। আর কে আছে দেখল না হেমাঙ্গ। হঠাৎ তার এত লজ্জা করতে লাগল যে, পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হল।

বাসন্তী সম্মোহিতের মতো চেয়ে থেকে বলে, ও দাদা, এসব কি তোমার লোক? নাকি শুটিং?

হেমাঙ্গ আস্তে করে বলে, আমারই লোক। তুই নগেনের কাছে যা। মাছ নিয়ে আয়।

তোমার লোক! বলে খুশিতে হি-হি করে হাসল বাসন্তী, কী মজা বলো তো!

তোর কথা মিথ্যেও নয়। সামনের জন আমার এক দিদি। একসময়ে ফিল্ম স্টার ছিল।

চোখ গোল করে বাসন্তী বলে, সত্যি? যাবো? গিয়ে নিয়ে আসবো ওদের?

আনতে হবে না। নিজেরাই চিনে আসবে। ওরা আমাকে খুঁজতেই এসেছে।

পিছনের মেয়েটা কে বলল তো?

ও আর একজন। বলে হেমাঙ্গ অপ্রস্তুত ভাবে চুপ করে গেল।

হি-হি করে বাসন্তী হাসল।

হাসছিস কেন?

ও তোমার কে হয় বলব?

বলতে হবে না। নগেনের কাছে যা।

যাচ্ছি। আসুক না, একটু দেখে যাই। আর, মাছটা কিন্তু আমি রাঁধব।

রাঁধিস। আজ সবই তোকেই রাঁধতে হবে বোধ হয়।

সত্যি?

আমার রান্না আমি ছাড়া আর কেউ খেতে পারবে বলে মনে হয় না।

তুমি যে বড় দাঁড়িয়ে আছে? ফটক পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াও। ওঁরা তোমাকে দেখতে পেলে তো ইদিকে আসবে। তুমি যেন বাপু কেমনধারা!

বাসন্তীর দিকে চেয়ে হঠাৎ মনে মনে একটু প্রমাদ গুনল হেমাঙ্গ। টগবগে সপ্তদশী গেঁয়ো যুবতীটিকে তার বাড়িতে দেখে ওদের কিছু সন্দেহ হবে না তো! বিশেষ করে চারুদিদি একটু সন্দেহবাতিকগ্রস্ত। তার একবার ইচ্ছে হল, বাসন্তীকে গা-ঢাকা দিতে বলে। তারপর ভাবল, থাকগে, যা হওয়ার হবে।

আশ্চর্যের বিষয়, ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এল বাঁকা মিঞা। মুখে একটু পাজি হাসি লেগে আছে। হঠাৎ এ সময়ে সে কেন ঘাটে হাজির ছিল, তা বুঝল না হেমাঙ্গ। কিন্তু সন্দেহ হতে লাগল, এ ব্যাপারে বাঁকা মিঞার কিছু যোগসাজস থাকতেও পারে।

আগড় ঠেলে যখন উঠোনে ঢুকছিল ওরা তখন হেমাঙ্গ একটু আড়ালে সরে ছিল ইচ্ছে করেই। চট করে মুখখামুখি হতে বড্ড সংকোচ হচ্ছে। বুকটা টিপটিপ করছে বড়। দরজার আড়াল থেকেই দেখতে পেল, শুধু

চারুশীলা, চয়ন, রশ্মিই নয়, পিছনে আরও দুজন। চারুশীলার বর সুব্রত আর...আশ্চর্যের বিষয় আর একজন হল ঝুমকি।

চারুশীলা উঠোনে পা দেওয়ার আগে থেকেই বকবক করছিল, এই নাকি হাইড আউট বাঁকা মিঞা? এ তো ভীষণ বিচ্ছিরি অ্যারেঞ্জমেন্ট! ও বাঁকা, ভূতটা এখানে থাকে কি করে? ও যে বরাবর ভীষণ শৌখিন।

বাঁকা হাসি-হাসি মুখ করে বলে, সেটাই তো বুঝে উঠতে পারি না। কেন যে আছেন পড়ে এখানে। জমি জায়গাও কিনতে চাইছেন। ঘোরতর পাগলামি।

কী যে মুশকিলে পড়েছি ওকে নিয়ে! এরকম বিচ্ছিরি জায়গায় লোকে থাকে?

সুব্রত একটু পিছনে ছিল। সে মৃদুভাষী। কখনও অন্যের ওপর নিজের মত চাপানোর চেষ্টা করে না। কিন্তু এখন হঠাৎ অনুচ্চ স্বরে সে বলে উঠলো, না চারু, জায়গাটা খারাপ নয় তো।

চারু স্বামীর দিকে এক ঝলক চেয়ে বলল, ভাল বলতে তো সিনিক বিউটি! সেটা তো বড় কথা নয়। আর কী আছে এখানে বলো! কিন্তু হাঁদা গঙ্গারামটা কোথায় গেল?

ধারেকাছেই আছেন। যাবেন আর কোথায়? এখানে যাওয়ার জায়গাটাই বা কই? বাঁকা মিঞা হেসে হেসে বলে।

চারু আচমকাই বাসন্তীকে দেখে থমকে যায়, ওমা! এ মেয়েটা কে বাঁকা?

এ হল বাসন্তী। খুব ভাল মেয়ে, দুঃখী মেয়ে। ঘরের কাজটাজ করে দিয়ে যায়।

বাসন্তী হঠাৎ গিয়ে ঢিপ করে একটা প্রণাম করে ফেলল চারুশীলাকে। তারপর পাইকারি হারে সবাইকে। সুন্দরী মেয়েদের দেখে তার চোখে পলক পড়ছে না। মুখ ফেটে পড়ছে খুশিতে।

যতখানি ক্যাজুয়াল হওয়া সম্ভব ততখানি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দরজা দিয়ে খুব ধীরে নিজেকে প্রকাশ করল হেমাঙ্গ। খুব বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, আরে তোরা!

এই অলম্বুশ! বাঃ বাঃ, চেহারার কী ছিরি হয়েছে।

হেমাঙ্গ অপ্রতিভ একটু হাসল।

চারুশীলা বেশ চেচিয়েই বলল, ‘রশ্মি, দেখে নাও, এর গলায় মালা দিতে তোমার ইচ্ছে হবে তো!

রশ্মি একটু পিছনে। তার মুখে হাসি নেই, কিন্তু যেন একটা হাসির আভাস রয়েছে। এই সেটআপকে সে হয়তো অপছন্দ করছে না। চারদিকে চেয়ে দেখছিল। সবার শেষে তাকাল তার দিকে।

এসো রশ্মি। এসো, আসুন, আপনারা।

চারু বলল, থাক আর আহ্বান করতে হবে না। আমরা আসবো বলেই এসেছি।

ঘরে ঢুকে চারদিকটা খুব ক্রিটিক্যাল চোখে দেখছিল চারুশীলা। বলল, তোর টয়লেট নেই? না থাকলে তো সর্বনাশ!

হেমাঙ্গ হাসে, আছে। ভয় নেই।

তাড়াতাড়ি সে বসবার জন্য জায়গা তৈরি করছিল। জায়গা অবশ্য বিশেষ নেই। বিছানা, একটা চেয়ার, গোটা দুই মোড়া সম্বল।

বাঁকা মিঞা বলল, থাক থাক। কষ্ট করতে হবে না। ফজল চেয়ার নিয়ে এসে গেছে। আর খাবার বন্দোবস্তও আজ আমিই করেছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না।

বাস্তবিকই ফজল আর তার কয়েক বন্ধু গুটিকয়েক চেয়ার নিয়ে এসে ফেলল। একটা ফোল্ডিং টেবিলও এনে রাখল বারান্দায়। বোধ হয় খাওয়ার সময় লাগবে।

হেমাঙ্গ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বাঁকা, এসব তুমিই তাহলে করেছো!

বাঁকা হাসল, আপনার ভাবগতিক ভাল বুঝছিলাম না, তাই।

সবাই বসল।

মুখোমুখি একা হেমাঙ্গ। যেন সামনে জুরিরা। সে আসামীর কাঠগড়ায়।

৬১

তোকে পড়াতে পড়াতে সব মনে পড়ে যাচ্ছে। কত কী ভুলে গিয়েছিলাম।

বিষ্ণুপদ খুব আহ্লাদের সঙ্গে হাসল। সামনে মাদুরে বসা পটল, তার পাশে শান্ত বোবা গোপাল।

পটল খাতা খুলে দেখছিল। গাঁয়ের স্কুলে পরীক্ষা মোটে দুটো। হাফ ইয়ার্লি আর অ্যানুয়াল। কলকাতার ভাল ভাল ইংরিজি স্কুলে নাকি সপ্তাহে সপ্তাহে নানারকম পরীক্ষা হয়। পটলের এখন পরীক্ষার একটা ঝোঁক এসেছে। আজকাল দাদুই তার পরীক্ষা নিচ্ছে, নম্বরও দিচ্ছে। একখানা প্রশ্নের উত্তরে দাদু দিয়েছে দশে ছয়। উরিব্বাস! ইংরিজিতে শতকরা ষাট নম্বর তো সে ভাবতেই পারে না।

ও দাদু, তুমি আমাকে বেশি বেশি নম্বর দাওনি তো!

বিষ্ণুপদ হাসল, প্রথম প্রথম তাই দিতুম। যাতে তোর নিজের ওপর ভরসা আসে। এখন বুঝেসুঝেই দিচ্ছি।

কিন্তু এ তো অনেক নম্বর।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, যখন ইস্কুলে পড়াতাম তখনও অবশ্য আমার নম্বর দেওয়ার হাতটা দরাজই ছিল। হেডমাস্টারমশাই ডেকে বলতেন, বিষ্টুবাবু, নম্বরটা বড্ড বাড়াবাড়ি রকমের দিচ্ছেন। আমি ভাবতাম কি জানিস! নম্বর তো আর ঘরের গোলার ধান নয়, ক্যাশবাক্সের টাকাও নয়, তা হলে কেপ্পনের মতো দেবো কেন?

ও দাদু, তুমি কি আমাকে ওরকমভাবেই নম্বর দিয়েছে নাকি? আমার সে নম্বর চাই না। জ্যাঠার মতো লেখাপড়ায় ভাল হতে হবে যে।

ওরে না, তোকে ওরকমভাবে নম্বর দিইনি। তোর আজকাল দিব্যি ভাল হচ্ছে। মাথা খুলছে। বিশ্বাস না হয় ইস্কুলের মাস্টারমশাইকে দেখাস।

বিষ্ণুপদ খুব হাসতে লাগল। দাদুর ওপর পটলের খুব একটা নির্ভরতা নেই। তবে দাদুকে তার বড় ভাল লাগে। সবসময়ে ঠাণ্ডা, সুস্থির। রাগারাগি, চেঁচামেচি নেই। এ বাড়িতে দাদু আর ঠাকুমা ছাড়া বাকি সকলেরই মাথা গরম। ঠাকুমার চেয়েও দাদু ঠাণ্ডা। আর দাদু যে ভালই পড়ায় এটা আজকাল পটল বুঝতে পারছে খুব। দাদু পড়ালে মাথায় খুব বসে যায় পড়া।

বিষ্ণুপদ গলাটা নামিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, তুই জ্যাঠার মতো হতে চাস?

খুব চাই দাদু। অনেক লেখাপড়া শিখব, দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াব।

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, খুব ভাল। রোখ থাকা চাই। খুব গোঁ ধরে যদি থাকিস তবে পারবি।

পারব দাদু?

মানুষ তো সবই পারে। কত কী কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলছে। মানুষের বুদ্ধির বহর দেখে তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি।

আমাকে জ্যাঠার কথা বলবে দাদু? জ্যাঠার গল্প শুনতে খুব ভাল লাগে।

বিষ্ণুপদ কৌতুকের দৃষ্টিতে নাতির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, সে তো অনেক বলেছি তোকে।

আবার শুনতে ইচ্ছে করে।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, শোনা অবশ্য ভাল। শুনলে ভিতরটা চাঙ্গা হয়। কৃষ্ণর কষ্টের জীবন ছিল, আমাদের সকলেরই ছিল। কষ্টের ভিতর দিয়েই যা হওয়ার হয়েছে। আমিও তার কথা খুব ভাবি। যত ভাবি তত অবাক হই। কেন জানিস?

কেন দাদু?

তার ধারাটা এ বাড়িতে নেই।

তার মানে কী দাদু?

কৃষ্ণ যেমনটা হল ঠিক তেমনটা আর কেউ তো হল না। বংশের একটা ধারা তো থাকবে। তাই অবাক হই। তুই যদি কৃষ্ণর মতো হয়ে উঠিস, তা হলে একখানা কাণ্ডই হয়।

পারব না দাদু?

বললাম যে, মানুষের পারার যেন শেষ নেই। মানুষই তো পারে।

মাঝে মাঝে মনে হয় কি জাননা? উরিব্বাস, কত বই পড়তে হবে, কত কি শিখতে হবে, কত বুদ্ধি লাগবে, স্মৃতিশক্তি লাগবে, তবে না জ্যাঠার মতো হওয়া যাবে।

খুব গোঁ ধরে থাক। কচ্ছপের কামড়ের মতো ধরে থাক।

আমি আজকাল কত মন দিয়ে পড়ছি না দাদু?

হ্যাঁ। তোর খুব মন হয়েছে পড়ায়।

শুধু বাবা মাঝে মাঝে সব ভণ্ডুল করে দেয় যে! এমন চেঁচামেচি ঝগড়া করে যে মাথাটা তখন গুলিয়ে যায়।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, তারও রোখ ছিল। দাদাকে খুব ভক্তি করত। সেই ভক্তি থেকেই আবার ফ্যাকড়া বেরোলো যে। তোর বাবা যা করে তাও একটা রাগ থেকে করে। দাদার সঙ্গে পাল্লা টানতে গেল যে! এ তো আর পাঞ্জার লড়াই নয়। তোকেও বলি, রোখ রাখিস, কিন্তু রাগ নয়, পাল্লা টানতে যাস না।

না, রাগ পটলের নেই, সে কারও সঙ্গে পাল্লাও টানতে চায় না। সে কিছু একটা হতে চায়। জ্যাঠা বড় ওপরে উঠে গেছে। অত ওপরে কি উঠতে পারবে সে? নাও যদি পারে, কাছাকাছিও যদি ওঠা যায় তবে তাই ঢের। আজ কোন বেহানবেলা থেকে পড়তে লেগে গেছে সে। ভোরের আলো ফোটেনি তখনও। নিবু নিবু হ্যারিকেন উস্কে বইপত্র নিয়ে বসেছে। একটু একটু আলো ফুটতেই বারান্দায় দাদুর কাছে এসে মাদুর পেতে সেই থেকে পড়া করছে, টাস্ক করছে। গোপাল ঘুম থেকে উঠে গুটিগুটি এসে কোন ফাঁকে বসেছে তার পাশটিতে। গোপাল দাদা ছাড়া থাকতেই পারে না।

ও দাদু, গোপালের কি পড়া হবে?

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কে জানে দাদা। বোবার মুখেও একদিন হয়তো মানুষ কথা ফোটাবে। কানে শুনতে পায় না তো, তাই বোল ফোটে না। কানের ব্যবস্থা হলে কথা ফুটতে কতক্ষণ?

বোবাদের ইস্কুলে যদি দেওয়া যায়?

সেখানে কী শেখায়?

আমি জানি না।

খোঁজ নিস।

গোপাল যদি কথা কইতে পারত তা হলে একটা কাণ্ডই হত, না দাদু?

বিষ্ণুপদ একটু হাসল।

পটল বলল, আমি প্রায় রাতেই স্বপ্ন দেখি, গোপাল হঠাৎ আমাকে দাদা বলে ডেকে উঠল। আচ্ছা স্বপ্ন কি সত্য হয় দাদু?

বিষ্ণুপদ হাসল, সত্য হওয়াই কি ভাল? সব স্বপ্ন সত্য হলে ভারী বিপদ হত। ওই যে কালঘড়ি দেখেছিলাম দু' রাত্তির, তখন থেকে কথাটা মনে হয়।

হয় না, না দাদু?

কে জানে ভাই। তবে সব স্বপ্ন যে হয় না তা জানি।

আমি লেখাপড়া করে যখন অনেক টাকা রোজগার করব তখন গোপালকে বিলেতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাব।

কিসের চিকিৎসা?

বিলেতে তো ভাল ডাক্তার আছে, তারা হয়তো অপারেশন করে গোপালের মুখে কথা ফুটিয়ে দিতে পারবে।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, পারলে তো খুব ভাল হবে।

গোপাল কিন্তু বোকা নয় দাদু, সব বুঝতে পারে। বুদ্ধিও খুব। শুধু কানে শুনতে পায় না আর কথা কইতে পারে না।

বিষ্ণুপদ মাথা নাড়ল, জানি।

বইখাতা গুছিয়ে মাদুর গুটিয়ে পটল ভাইকে নিয়ে চলে গেল।

বিষ্ণুপদ বারান্দায় বসে রইল। আজ হঠাৎ ছেলেবেলার কথা খুব মনে পড়ছে তার। খুব মনে পড়ছে। কী ছিল ছেলেবেলায়? এই এমনিই ভাঙা ঘরদোর, অনেকটা এরকমই দারিদ্র্য ছিল। ময়মনসিংহ জেলার এক অখ্যাত পাড়াগাঁয়ে বাস ছিল। গাছে গাছে প্রকৃতিদত্ত ফল ছিল বলে রক্ষে। নইলে উপোসে উপোসে প্রাণ বেরিয়ে যেত। সে-সব জাতের ফল নয়। কামরাঙা, করমচা, ডেউয়া, বেল কিংবা কাঁচা আম বা বরই। আর ছিল লটকা, পানিয়ল, খেতের আখ। কিন্তু দারিদ্র্য ছিল গায়ের ধুলো, ভিতরে ঢুকত না। না, ভিতরে কোনও দারিদ্র ছিল না তখন। বড় আনন্দ ছিল। গায়ের জামা খুলে ফেলে পুকুর বা নদীতে অনায়াসে ঝাঁপিয়ে পড়া যেত। গাছ বাইতে, ফুটবল খেলতে তখন কী ভালই লাগত। বাবা ছিল, মা ছিল, দাদু-ঠাকুমা ছিল, পিসি-কাকা-জ্যাঠা ছিল, ভাইবোন ছিল মেলা। কোথায় যে কালের বাতাসে সব উড়ে গেল! চিহ্নও নেই। এখানে সেখানে আছে কেউ কেউ, এখন আর খোঁজও রাখে না। যে যার নিজেরটা নিয়ে আছে। সকলে হয়তো নেইও। কে জানে বাবা!

ও বাবা, কী করছেন?

বামাচরণ নাকি? কিছু বলবি?

বামাচরণ বেরোবে বোধহয়। গায়ে হাওয়াই শার্টের ওপর সোয়েটার চাপাননা, পরনে পাতলুন। গালে কয়েকদিনের দাড়ি। বিষ্ণুপদ লক্ষ করল।

বামাচরণ কিন্তু-কিন্তু করে বলে ফেলল, ভাগজোখের কিছু হল?

কিসের ভাগজোখ?

জমিজমার একটা বিলিব্যবস্থার কথা হয়েছিল, আপনার মনে নেই?

বিষ্ণুপদ ঝম করে অতীত থেকে বর্তমানের কঠিন মাটিতে এসে পড়ল। বলল, তোরা যা করিস, আমার তো আপত্তি নেই।

কিন্তু হচ্ছে কোথায়? আপনি তো হাত গুটিয়ে রইলেন। গাঁয়ের মাতব্বরদের ডেকে সালিশি বসিয়ে সব বাঁটোয়ারা করে দেওয়ার কথা হয়েছিল যে!

বিষ্ণুপদ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে, তা হয়েছিল বটে। তা হলে সেরকম কিছু করলেই তো হয়।

করবেন তো আপনি। জমিজমা তো আপনার। আপনি করছেন না, এদিকে রামজীবন তো গাপ করতে লেগে গেছে। আমার ঘরের পিছনের জমিটায় তো দেখছি রামজীবন সর্ষে বুনেছে। এরকম অরাজকতা তো চলতে পারে না। জমির কতটা কার, কোনটায় কে চাষ করবে তার একটা বন্দোবস্ত না হলে তো বড়ই কঠিন হচ্ছে।

বিষ্ণুপদ প্রবল অস্বস্তিতে পড়ে গিয়ে বলে, সবাইকে ডেকে একদিন বসে তোরাই ঠিক করে নে না। আমার মতামত দিয়ে কী হবে? আমার একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই হলেই হয়।

আপনি তো বলেই খালাস। কিন্তু মধ্যস্থ কে হবে? মধ্যস্থ একজন না থাকলে তো ফের লাঠালাঠি লেগে যাবে।

কৃষ্ণজীবনকে একটা খবর পাঠা না হয়। সরস্বতী আসুক, বীণাপাণি আসুক।

আপনি কি জমির ভাগ মেয়েদেরও দেবেন নাকি?

বিষ্ণুপদ আতান্তরে পড়ে বলে, আজকাল নাকি কি সব আইন-টাইন হয়েছে। মেয়েদেরও পাওনা হয়।

বামাচরণ রূঢ় গলায় বলে, মোট তত দেড় দুই বিঘের ওপর আমাদের বসত। তা এতগুলো ভাগ হলে আর থাকবে কী?

তা হলে কী করতে চাস?

মেয়েদের বাদ দিন। বিয়ে দেওয়া হয়েছে, এখন তারা নিজেদের আখের বুঝুক। জমি তিন ভাগ হবে। চাষের জমি রামজীবন নিতে পারে, কিন্তু আমাদের ন্যায্য দাম দিয়ে নিতে হবে। যা হয় দু'-চার দিনের মধ্যেই ঠিক করে ফেলুন।

গলা খাঁকারি দিয়ে বিষ্ণুপদ বলল, সবাই মানলে আমার আর আপত্তি কিসের?

আপনার জন্যই ব্যাপারটা ঝুলে আছে। সরকারী দলিল তো আপনার হাতে। উদ্যোগ তো আপনাকেই নিতে হবে। চুপ করে বসে থাকলে তো হবে না। আমি দাদাকে চিঠি দিয়েছি। জবাবও এসে গেছে।

বিষ্ণুপদ ফের গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, কী লিখেছে সে?

আসছে। আজই আসার কথা।

আজই! বলে চোখ কপালে তোলে বিষ্ণুপদ।

নিজের ভাগ নিয়ে কি করবে, তা আপনাকে জানিয়ে দিয়ে যাবে। যদি ছেড়ে দেয় তো ভালই। জমি বাড়ি দু' ভাগ হবে। রামজীবন পাকা যে ঘরখানা তুলেছে সেটাও বে-আইনি। পঞ্চায়েতের একটা পারমিশন নেওয়া উচিত ছিল। তবে আমি গোলমাল করব না ও নিয়ে। আপনি আর মা ও-ঘরে উঠে যান, আমরা আপনার ঘরের দখল নেবো।

এ ঘরের?

তা ছাড়া আর ঘর কোথায়? আমি যে ঘরে আছি সেটার অবস্থা দেখেছেন? টিন ঝুরঝুর করছে, বেড়া ভাঙা। মেঝেটাও সারানো দরকার। আমি সারাচ্ছি না, তার কারণ ঘর কার দখলে পড়ে তার তো ঠিক নেই।

বিষ্ণুপদ কুণ্ঠিত গলায় বলে, কৃষ্ণ যদি তার ভাগ ছেড়ে দেয় আর মেয়েরা যদি ভাগ না বসায় তা হলে তো আর ঝামেলাই নেই।

হ্যাঁ। সেক্ষেত্রে বাড়ি দু' ভাগ হবে। ভাগ-বাঁটোয়ারা না হলে এ বাড়িতে থাকা কঠিন হচ্ছে। আমার বউকে তো শোওয়ার ঘরেই রান্না করতে হচ্ছে। দেখছেন তো!

তা অবিশ্যি ঠিক।

ঠিক তো বলছেন, কিন্তু আমার কথা ভেবেছেন কখনও? আপনার হাবভাব দেখে তো মনে হয় আমি বানের জলে ভেসে এসেছি। ভাগ করে দিলে আমি আর কথা কইতে আসব না। ও ল্যাঠা চুকিয়ে ফেলুন।

কৃষ্ণজীবন তা হলে আসুক।

আমি অফিসে বেরোচ্ছি। আজ তাড়াতাড়িই ফিরব। ফেরার সময় পঞ্চায়েতের বাঞ্ছারামকেও নিয়ে আসব। তার সঙ্গে কথা হয়েছে। দাদার সঙ্গে যা কথা হবে তার একজন সাক্ষী থাকা ভাল। রামজীবনকেও থাকতে বলবেন।

কৃষ্ণজীবন তার ভাগ নেবে না? তোকে তাই লিখেছে?

নিয়ে করবেটা কি? এ বাড়িতে তো সে থাকতে আসবে না!

বিষ্ণুপদ একটু অসহায়ভাবে চারদিকে চাইল। তারপর খুব মিয়োনো গলায় বলল, সে কিন্তু অন্যরকম বলেছিল।

কিরকম?

কৃষ্ণজীবন বলেছিল, সে ফিরে আসবে। চাষবাস করবে। গাছপালা করবে।

তার চিঠি আমার কাছে আছে। সে লিখেছে বাড়ির ভাগ তার চাই না।

দুই হাত উল্টে বিষ্ণুপদ বলল, কি জানি কেন লিখল!

শহরের লোকেরা ওরকম বলে। গাঁয়ে এসে থাকবেই বা কেন? কোন মধু আছে এখানে?

তা তো জানি না। তবে বলেছিল কিন্তু।

সে তো আসছে। কথা কয়ে পরিষ্কার করে নেবেন সব।

তাই হবে বাবা। তুই গিয়ে তাড়াতাড়ি আয়।

ভাগজোখ মিটিয়ে ফেললে আমিও পাকা বাড়ি তুলব। অফিস থেকে লোন দেবে। কিন্তু জমির দলিল জমা না দিলে হবে না। কত অসুবিধে করে আছি দেখছেন তো!

বামাচরণ নতুন সাইকেল কিনেছে। বেশ বাহারী জিনিস। সেইটে চালিয়ে চলে গেল। তার বউ দরজার আড়াল থেকে সব শুনছিল বোধ হয়। এইবার বেরোলো। হাতে হাঁড়িকুড়ি। পুকুরে যাবে।

উনুন ধরানোর কাঠকুটো কুড়িয়ে আনতে বাগানে গিয়েছিল নয়নতারা। এক বোঝা ডালপালা নিয়ে এসে বারান্দার কোণে ফেলে বলল, ওগো, করছোটা কী?

বিষ্ণুপদ একবার নয়নতারার দিকে চেয়ে দেখল। বলল, কিছু করছি না।

আমার শরীরগতিক ভাল বুঝছি না। বড্ড হাঁফ ধরে যাচ্ছে আজকাল।

হাঁফ ধরছে!

একটুতেই আজকাল হাঁফিয়ে যাচ্ছি। ঘাম হচ্ছে এই শীতেও।

ডাক্তারকে একটা খবর দেবো নাকি?

দুটো দিন দেখি। বয়সের দোষই হবে। বামা কী বলছিল তোমাকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে?

বাড়ির ভাগ চাইছে। পাকা বাড়ি তুলবে।

তা তুলুক না। কে ঠেকাচ্ছে?

জমির দলিল না হলে নাকি টাকা ধার পাবে না।

ওসব কথায় কান দিও না।

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, কান না দিয়েও উপায় নেই। বামা কৃষ্ণজীবনকে চিঠি দিয়েছিল। কৃষ্ণ নাকি আজই আসছে।

আসছে! বলে নয়নতারা ঝটিতি খাড়া হল, কখন আসবে? খাবে তো এসে! জোগাড়যন্তর করতে হবে যে!

ব্যস্ত হয়ো না। আগে আসুক। সে কাজের মানুষ। কখন ফুরসত পাবে তার ঠিক নেই। তুমি জিরোও। বরং একটা পান খাও বসে।

পান খাচ্ছি, কিন্তু জিরোনোর উপায় নেই। রাঙার মাজায় ব্যথা। সে আজ আর রান্নাঘরে যেতে পারবে না। আমাকেই করতে হবে সব।

বিষ্ণুপদ একটু হাসল। তারপর বলল, একটা কথা কইব?

কি কথা?

আজ আমাকে তোমার যোগালি করে নাও।

সে আবার কি?

যোগালি বোঝে না? জল তোলে, মশলা করে, এটা-ওটা এগিয়ে দেয়।

যোগালি বুঝি। তা তোমার আবার এ ভীমরতি কেন হল?

তোমার শরীরটা যখন যুতের নেই, করলামই না হয় একটু কাজ।

সে কাজের দরকার নেই। আরও ভণ্ডুল লাগাবে। তার চেয়ে বাজারে যাও বরং কিছু নিয়ে-টিয়ে এসো। রেমো তো কাল রাত থেকে নেই। কেষ্টনগর না কোথায় যেন গেছে।

যাচ্ছি।

একটু মাছ-টাছ এনো। শীতের সবজি। একটু তেলও লাগবে।

বিষ্ণুপদ উঠল।

একসময় বাজার করতে বড় ভালবাসত বিষ্ণুপদ। যথেষ্ট পয়সা ছিল না বটে, কিন্তু বাজারে ঘুরে বেড়ানোরও একটা আনন্দ আছে। ঘুরে ঘুরে দেখত। কিনতে পারত সামান্যই। দরাদরি করা, জিনিস পরখ করা এসবই করত বেশি। দোকানীদের সঙ্গে আলাপ-সালাপও হত। আজকাল বাজারের নামে গায়ে জ্বর আসে যেন।

বটতলায় আগে বাজার বসত সপ্তাহে দু' দিন। আজকাল নিত্যি রমরমে বাজার। কিন্তু জায়গাটা আর ভাল নেই। গায়ে একখানা জামা চাপিয়ে থলি আর তেলের শিশি নিয়ে বেরিয়ে পড়ার পর বিষ্ণুপদ টের পেল, বাইরের দুনিয়াটা এখন অনেক অচেনা হয়ে গেছে। সরু একটা রাস্তার শেষে একটু মাঠ, তারপর আবার মেটে রাস্তা। বরাবর গেলে পাকা রাস্তায় উঠেই বাজার। এটুকু পথ তার তো মুখস্থ। কিন্তু না-বেরোনোর অভ্যাস এমন হয়েছে যে, এটুকু পথকেই মনে হয় যেন তেপান্তর পেরোতে হচ্ছে।

কী নিতে হবে বলে দেয়নি নয়নতারা। বিষ্ণুপদ একটু পালং কিনতে গেল। দর শুনে ভিরমি খেতে হয়। ফুলকপি বাঁধাকপির দরও অবিশ্বাস্য। আজকাল এত দাম দিয়ে নাকি এসব কেনে লোকে? এ তো পয়সা চিবিয়ে খাওয়া।

মাছ কিনতে গিয়ে বিষ্ণুপদ বড্ড বেচাল হয়ে পড়ল। কী দাম বলছে! সর্বনেশে ব্যাপার।

আনমনা ছিল বড়। একখানা বিশাল বাস এসে বটতলায় দাঁড়ানোর পর বেশ কিছু লোক নামল। আজকাল শীতলাতলা-বিষ্টুপুরে লোকের আনাগোনা বেড়েছে। অতি সুলক্ষণ। আনাগোনা মানেই জায়গাটা বর্ধিষ্ণু হচ্ছে। আগে লোকজন এদিকে মাড়াতই না।

সাহেবী পোশাক পরা একটা লোক হঠাৎ বিষ্ণুপদর সামনে দাঁড়াল এসে। বিষ্ণুপদ তটস্থ হয়ে পড়তেই লোকটা বলল, বাবা! আপনি কী করছেন এখানে?

বিষ্ণুপদ একগাল হাসল, কৃষ্ণজীবন! এই এলি?

হ্যাঁ। কী করছেন? বাজার নাকি?

তোর মা পাঠাল।

কৃষ্ণজীবন একটু হাসল। বলল, বাজার করতে হবে না। কলকাতা থেকে আমি এক ঝুড়ি সবজি এনেছি। ওই নামাচ্ছে বাসের মাথা থেকে।

বিষ্ণুপদ ফের হাসল। বলল, ভাল। তা হ্যাঁ রে, তোর যে গাঁয়ে ফিরে আসার কথা ছিল, তুই নাকি আসবি না?

কে বলল বাবা?

বামাচরণকে নাকি চিঠিতে লিখেছিস!

আসব না লিখিনি। বামাচরণ চায় আমি আমার ভাগটা ছেড়ে দিই। আমি রাজি হয়েছি। তা বলে গাঁয়ে ফিরে আসব না কেন? নতুন করে জমি-জায়গা কিনব, চাষবাস করব।

বিষ্ণুপদ সামান্য লজ্জাতুর গলায় বলে, বাপেরটা নিবি না তো!

তা নয় বাবা। ওরা আমাকে চায় না।

তা বটে। কে যে কাকে চায় আর কে যে কাকে চায় না, আজকাল আর বুঝতে পারি না।

বাড়ি চলুন বাবা।

চল। বলে বিষ্ণুপদ হাঁটতে থাকে।

৬২

একটা নদী কত কী করতে পারে! পালটে দেয় ভূ-চিত্র, পালটে দেয় জীবনের দর্শন, বদলে দেয় মনের অবস্থা। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে চয়ন যে আদিগন্ত বিস্তারকে দেখছিল তেমনটি কলকাতার গলিতে বন্ধ তার আশৈশব জীবনে সে দেখেনি। তার রোগক্লিষ্ট, অভাবতাড়িত জীবনে প্রকৃতির শোভার কোনও স্থানই ছিল না। এক থালা ভাতের শোভা অনেক বেশী প্রয়োজন ছিল তার। একখানা বাড়তি টিউশনি পাওয়াই ছিল জীবনদর্শন। চারুশীলার কল্যাণে এই আঘাটায় এসে বুক ভরে শ্বাস নিয়ে পৃথিবীর মহত্ত্ব উপলব্ধি করে সে বুঝল, কলকাতায় এতকাল ধরে যে জীবন সে যাপন করে এসেছে তা হল এক পশুর জীবন।

হেমাঙ্গর ঘরে একটা পারিবারিক মিটিং বসেছে। তার সেখানে থাকা উচিত নয় মনে করে সে এক ফাঁকে বেরিয়ে এসেছে। নদীর ধারে আত্মবিস্মৃত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যদি রুজিরোজগার, জীবন ধারণের সমস্যা ইত্যাদি না থাকত, যদি মাত্র দুটি ভাতের ব্যবস্থা থাকত দু'বেলা, তাহলে সেও এরকম একটা জায়গায় বাস করত এসে।

খুব নরম গলায় কে যেন ডাকল, চয়নবাবু!

চয়ন ফিরে তাকিয়ে ঝুমকিকে দেখে তটস্থ হয়ে বলল, আজ্ঞে।

বেরিয়ে এলেন যে!

চয়ন লজ্জিত হয়ে বলে, ওঁদের সব পারিবারিক কথা হচ্ছে, তাই বেরিয়ে এলাম। আমি বাইরের লোক।

ঝুমকি ঠোঁটের একটি ভঙ্গিমা করল, বোধহয় তাচ্ছিল্যের। বলল, বাইরের লোক তো আমিও। চারুমাসি জোর করে নিয়ে এল বলে এলাম। ওদের কী ব্যাপার বলুন তো! প্রবলেমটা কী?

চয়ন সতর্ক হয়ে নিস্পৃহ গলায় বলে, আমি ঠিক জানি না।

ঝুমকির মুখে যথেষ্ট বিরক্তি ফুটে আছে। সে হঠাৎ বলল, আমার কিন্তু খুব খিদে পেয়েছে। আপনার পায়নি?

চয়ন একটু হাসল। তার কত খিদে পায় এবং খিদে মরে যায়। সে মাথা নেড়ে বলল, আজ্ঞে না।

ঝুমকি খিদে ভুলে হঠাৎ নদীর দিকে, পরপারের দিকে চেয়ে থেকে বলল, কী সুন্দর জায়গা, না?

যে আজ্ঞে। খুবই সুন্দর।

হেমাঙ্গবাবু বেশ জায়গাটি খুঁজে বের করেছেন। কিন্তু এখানে খুব শীত।

ঝুমকি তার টমেটো রঙের মাফলারটা গলায় ফের ভাল করে পেঁচিয়ে নিল। বলল, আমার খুব ব্রংকাইটিসের ধাত। জোলো বাতাসকে ভীষণ ভয় করে।

চয়ন ব্যস্ত হয়ে বলে, আপনি তাহলে ঘরে গিয়ে বসুন না!

ঝুমকি ঠোঁটটা তেমনি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে উল্টে বলল, ঘরে যা সব ন্যাকামি চলছে। অসহ্য, দুজনেরই যদি দুজনকে পছন্দ তো বিয়ে করে ফেললেই হয়।

চয়ন সতর্কভাবেই চুপ করে রইল।

উঁচু পাড় থেকে ঘাটে নামবার পথটা খুবই ভাঙাচোরা। অনবরত লোজন উঠে আসছে নৌকো বা ভটভটি থেকে। আবার যাচ্ছেও।

চুপচাপ কিছুক্ষণ লোক চলাচল দেখার পর ঝুমকি হঠাৎ স্বগতোক্তির মতো বলল, অথচ দুজনেই ম্যাচিওরড্ শিক্ষিত মানুষ। কিন্তু বিহেভ করছে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মতো।

চয়ন এ কথাটারও জবাব দেওয়া সমীচীন মনে করল না।

চয়নবাবু, আপনার খিদে পেলে খেয়ে নিতে পারেন কিন্তু। দেখলাম, মুড়ি, শশা, নারকোল, চানাচুর সব এসেছে। বাইরের টেবিলে সব সাজানো।

চয়ন বলল, আপনি খাবেন না? খিদে পেয়েছে বললেন তো।

ঝুমকি একটু রাগের সঙ্গে বলল, কেউ না খেলে খাওয়া যায়? ওরা কথায় এত ব্যস্ত যে কেউ খাচ্ছে না। তাছাড়া মুড়ি চিবোতে আমার একদম ভাল লাগে না।

চয়ন একটু ব্যস্ত হয়ে বলে, তাহলে কি হবে?

কিছু হবে না। ভাবছি ব্রেকফাস্টটা আজ স্কিপ করব। আচ্ছা, আপনি সাঁতার জানেন?

আজ্ঞে না।

আমিও জানি না। নৌকো না ভটভটি কি যেন, ওটাতে উঠতে খুব ভয় করছিল। কিন্তু বেশ মজাও আছে, না?

আজ্ঞে তা আছে।

ঝুমকি একটু হেসে বলল, আচ্ছা আপনি আমাকে অত আপনি-আজ্ঞে করছেন কেন বলুন তো! আমি কি আপনার খুব সম্মানের পাত্রী?

চয়ন লজ্জা পেল। আপনি-আজ্ঞে সে করে অভ্যাসবশে। পৃথিবীর সব মানুষকেই সে অল্প-বিস্তর সমীহ করে। কেন যে করে তা সে ঠিকমতো ব্যাখ্যা করতে পারবে না। মাথা নিচু করে সে বলল, আমার ওটা একটা অভ্যাস।

ঝুমকি বলল, আচ্ছা নৌকো করে একটু বেড়িয়ে আসা যায় না? যাবেন?

চয়ন আবার তটস্থ হয়, বেড়াবেন?

চলুন না! ততক্ষণে ঘরের নাটক শেষ হোক।

একটু দোনোমোনো করল চয়ন। ঝুমকিকে সে সামান্যই চেনে। এই শ্রীময়ী মেয়েটি চারুশীলার খুবই প্রিয়পাত্রী। ওদের বাড়িতে প্রায়ই আসে। শান্ত স্বভাবের রিজার্ভ মেয়ে। এ যখন বেড়াতে চাইছে তখন তারও সঙ্গ দেওয়া উচিত বলেই তার মনে হল।

চয়ন বলল, একবার বলে এলে ভাল হয়। ওরা যদি খোঁজেন?

আমি বাঁকা মিঞাকে বলে এসেছি। ভয় নেই, খুঁজবে না। চারুমাসি এখন নায়ক-নায়িকাদের নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। চলুন তো, অত ভাবতে হবে না।

চয়ন ফের লজ্জা পেল। তার অভ্যন্তরে এক জন্ম-কৃতদাস বাস করে। যে যা বলে, সে তৎক্ষণাৎ তাতে সায় বা সম্মতি দেয়। যে যা হুকুম করে, সে প্রায়শই তা তামিল করতে রাজি থাকে। এই বশংবদ স্বভাবকে সে কিছুতেই টিট করতে পারেনি।

ঘাটে কয়েকটা ডিঙি নৌকো আছে। খেপ মারবে কি না কে জানে!

সামনে যেটা পেল তাতে একটা সতেরো-আঠারো বছরের ছেলে বৈঠা নিয়ে বসে আছে। ঢেউয়ে টগবগ করছে তার ছোটো নৌকো। সে আধঘণ্টা ঘুরিয়ে আনতে পাঁচটা টাকা চাইল।

টাকাটা কি তারই দেওয়া উচিত? একটু ভাবল চয়ন। আগের বার চারুশীলা তাকে হেমাঙ্গর কাছে আসার বাবদে হাজার টাকা দিয়েছিল। চয়নের খরচ হয়েছিল কুড়ি টাকার মতো। বাকি টাকা ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করেছিল সে, চারুশীলা নেয়নি। সুতরাং এ টাকাটা সে দিতে পারবে।

নৌকোয় ওঠার পর্বটা বেশ ঝামেলার হল। ঝুমকি যত বার উঠতে যায় ততবার দুষ্টু নৌকো একটু টাল খায় এবং সরে যায়। আতঙ্কে ঝুমকি চেঁচায় আবার হাসেও, অবশেষে মাঝি ছেলেটা নেমে নৌকো টেনে ধরে রইল, তারপর ঝুমকি উঠল। কিন্তু ওঠাটাও আর এক পর্ব। ছোটো নৌকো, একটুতেই টাল খায়।

মাঝি ছেলেটা অবশ্য বেশ চালাক-চতুর। ঝুমকি যতক্ষণ না বসল ততক্ষণ নৌকো ধরে রইল। চয়নের অবশ্য তেমন অসুবিধে হল না। সব অবস্থায় মানিয়ে নেওয়াই তার অভ্যাস।

ডিঙিতে পাটাতন বলে কিছু নেই। প্রায় সবটাই খোল। দুটো আড় কাঠ পাতা আছে। দুটোতে মুখোমুখি বসল তারা। ঝুমকির মুখে আতঙ্ক মেশানো হাসি।

কী রিস্কি জিনিস, তাই না?

চয়ন মৃদু স্বরে বলে, তা বটে। তবে সহজে ডোবে না। ভয় পাবেন না।

ঝুমকি হিহি করে হেসে বলে, একটু ভয় না করলে মজাই হয় না।

নৌকোটা বড় গাঙের দিকে গেল না। খালের ভিতরে ঢুকে এগোতে লাগল। চওড়া নয়, বেশী ঢেউও নেই। মাঝি ছেলেটা চালাক। আনাড়ি দেখে বড় গাঙের দিকে নেয়নি।

ঝুমকি কিছুক্ষণ এই জলযাত্রাকে উপভোগ করল বটে, কিন্তু কেমন যেন শান্ত হতে পারছে না মেয়েটা। হঠাৎ চয়নের দিকে চেয়ে বলল, মেয়েটা একটু কেমন যেন, না?

চয়ন অবাক হয়ে বলে, কোন মেয়েটা?

রশ্মির কথা বলছি।

ও। বলে চয়ন সতর্কতা অবলম্বন করল। বলল, আমি ওঁকে সামান্যই চিনি।

বড্ড গায়ে-পড়া।

তাই নাকি?

হেমাঙ্গবাবু যখন বিয়ে করতে রাজি হচ্ছেন না তখন হামলে পড়ার কী আছে বলুন! তাই না?

তা তো বটেই। সঙ্গে সঙ্গে চয়ন একমত হয়।

মেয়েদের আর একটু সেলফ্ রেসপেক্ট থাকা উচিত।

তা তো ঠিকই।

ঝুমকি আবার কিছুক্ষণ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখল। খালের ভিতরে অবশ্য দৃশ্য বিশেষ নেই। দুদিকে উঁচু পাড়। দীন-দরিদ্র চেহারার কুটির, কিছু বাড়িঘর আর অজস্র আগাছার জঙ্গল।

ঝুমকি হঠাৎ বলল, আপনার কি মনে হয় ওদের বিয়ে হবে?

চয়ন কঠিন সমস্যায় পড়ে গেল। বিয়ে হবে কি হবে না, তা সে জানে না। কিন্তু কোনটা বললে ঝুমকি খুশি হবে সেটা নির্ধারণ করাই কঠিন।

সে বলল, কিছু বলা যায় না।

আমার মনে হয়, হবে না।

সেটাও সম্ভব।

সম্ভব নয়। হবেই না। যদি হয় তাহলে ডিভোর্স হয়ে যাবে।

তাই নাকি?

ঝুমকি বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, লোকটা যে বিয়ের ভয়ে পালিয়ে আছে সেটা তো আর বুঝতে কারও বাকি নেই। না?

চয়ন একটু ভীত হয়ে বলে, আমি অত ভেবে দেখিনি।

ঝুমকি তার মস্ত খোঁপা ঠিক করল। তারপর হঠাৎ একটু হাসল। ভারী সুন্দর দাঁতের পাটি তার। বলল, রংটাই যা ফর্সা। মুখখানা এমন কিছু নয়।

চয়ন সভয়ে চুপ করে থাকে। তার কিছু বলার নেই।

ঝুমকি এর পর সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। নৌকাযাত্রা বা প্রকৃতি কোনওটাই তাকে আর স্পর্শ করল না অনেকক্ষণ। কথা যত না বলে ততই বোধহয় চয়নের পক্ষে ভাল। কারণ সে এসব বিপজ্জনক কথাবার্তার শরিক হয়ে থাকতে চায় না।

ঝুমকি দেবী, ঘাট এসে গেছে।

ঝুমকি ঘোর অন্যমনস্কতা থেকে জেগে উঠে বলল, ও মা!

যখন তারা ফিরল তখন ঘরে পারিবারিক মিটিং শেষ হয়েছে। বারান্দায় চারুশীলা আর সুব্রত বসে চা খাচ্ছে। তাদের দেখে চারুশীলা বলল, একি, তোমরা আবার কোথায় গিয়েছিলে?

ঝুমকি বলল, একটু ঘুরে এলাম মাসি। তোমরা যা ব্যস্ত ছিলে!

চারুশীলা অসহায় মুখ করে বলল, যা একখানা পাগল ভাই আমার। ওকে নিয়ে আমিও পাগল হয়ে গেলাম। এই তো দুটিকে পাঠালাম একটু ঘুরে আসতে। কী কাণ্ড বলো তো! সব ঠিক আছে, তবু কোথায় যেন আটকাচ্ছে।

মৃদুভাষী সুব্রত কথার চেয়ে হাসে বেশী। মুখখানা সবসময়েই হাসিতে মাখানো। চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে বলল, ওদের আর একটু সময় দেওয়া উচিত ছিল। তুমি বড্ড তাড়া দিচ্ছো ওদের।

চারুশীলা কেন কে জানে, তার মৃদুভাষী স্বামীটিকে একটু সমীহ করে। অন্য কেউ কথাটা বললে চারুশীলা পাত্তাই দিত না। কিন্তু সুব্রত বলায় চারুশীলা তার দিকে চেয়ে বলল, কী করব বলো তো! আমাদের হাতে কি

সময় আছে?

সুব্রত একটু মাথা নেড়ে বলল, ওরা খুব ভাল বন্ধু। কিন্তু বন্ধুত্বকে ম্যাট্রিমনিতে কনভার্ট করাটাই প্রবলেম হচ্ছে বলে আমার ধারণা। মানসিক চেঞ্জটার জন্য সময় দরকার ছিল।

না সুব্রত। ও প্রবলেমটা শুধু হেমাঙ্গর। রশ্মির কিন্তু ওটা নেই। ও বিয়ের কথা ভেবেছে, মনকেও তৈরি করেছে। হেমাঙ্গর আরও একটা প্রবলেম হল, ও ইংল্যান্ডে থাকতে চাইছে না।

ওয়াইজ অফ হিম।

তার মানে?

ইংল্যান্ডে থাকতে যাবে কেন?

করুণ গলায় চারুশীলা বলে, তাহলে বিয়ে হবে কি করে?

কেন, তোমরা রশ্মিকেই এদেশে থাকতে রাজি করাও।

তাই কি হয়? ওর কত প্রসপেক্ট ওখানে।

সুব্রত মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। তারপর বলল, তাহলে চালমাত।

তার মানে?

কোনও হেডওয়ে হওয়া মুশকিল।

চারুশীলা বলল, আহা, দেখলে তো, দুজনেই দুজনের প্রতি বেশ ইন্টারেস্টেড। ওদের মধ্যে ভাব ভালবাসা খুব আছে।

তাহলে ঘটকালির দরকার হচ্ছে কেন?

কি করব বলো, হেমাঙ্গটা যে পাগল।

সুব্রত মৃদু মাথা নেড়ে বলে, একটুও পাগল নয়। মেন্টালি হয়তো স্ট্রং নয়। বাট হি ইজ এ পারফেক্ট জেন্টেলম্যান।

চারুশীলা হতাশা মাখা মুখে ঝুমকির দিকে চেয়ে বলল, কি যে হবে!

কেন ভাবছে মাসি? সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার কিন্তু খুব খিদে পেয়েছে।

ওমা! খাবারের অভাব নাকি? কত মুড়ি রয়েছে, শশা, নারকোল। এসো, বসে যাও। চয়ন, আপনিও আসুন তো! আমার মনের যা অবস্থা, কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।

ঝুমকি এক মুঠো মুড়ি-মাখা আর শশার টুকরো নিয়ে চিবোতে চিবোতে বলল, একটা লোক ব্যাচেলর থাকলে কী এমন ক্ষতি হত বলো তো!

ব্যাচেলর থাকবে? তাই কি হয়!

কেন হয় না?

দূর পাগল! এখন আমার তর্ক করতে ইচ্ছেই করছে না। তবে ব্যাচেলর থাকা ভাল নয়।

এ সবই অনুধাবন করে চয়ন, কিন্তু অংশ নেয় না। কত মানুষের কত বড় বড় সমস্যা থাকে, কত অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে। তার তো তা নয়। তার সমস্যা সবই সাদামাটা। টিকে থাকা, শুধুমাত্র বেঁচে থাকা ছাড়া আর তো কোনও সমস্যার কথা মনে হয় না তার।

অনেকক্ষণ বাদে যখন রশ্মি আর হেমাঙ্গ ফিরল তখন দুজনকে অনুধাবন করল চয়ন। এদের সমস্যাটা কী? একজন সুদর্শন পুরুষ, আর একজন সুন্দরী রমণী। দুজনের কারোই ভাত-কাপড়ের অভাব নেই। প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশীই হয়তো আছে। এদের সমস্যা কি এদের এই প্রাচুর্যই?

দুজনের মুখই বেশ হাসিখুশি। দেখে মনে হয় যেন, দুজনের সমস্যা কিছুই আর নেই। সব মিটে গেছে। কিন্তু চয়ন তার মধ্যেও একটু ছায়া দেখতে পায়। মুখে হাসি, কিন্তু হেমাঙ্গর চোখে যেন ক্লান্তি!

দুপুরে বাঁকা মিঞা গন্ধমাদন এনে ফেলল। ভাত, ডাল, তরকারির সঙ্গে দুরকম মাছ আর মুরগি। এলাহি ব্যবস্থা। "গরম গরম খেয়ে নিন, গরম গরম খেয়ে নিন" বলে তাড়া দিতে লাগল সবাইকে। সেই তাড়া খেয়ে ঝুপঝাপ বসেও পড়ল সবাই। টেবিল সরিয়ে বারান্দায় টানা শতরঞ্চি পাতা হল। শাল পাতার ওপর কলাপাতা বিছিয়ে দিব্যি ব্যবস্থা।

চয়ন এমন সুখাদ্য জীবনে খুব কমই খেয়েছে।

খাওয়ার পরই ফেরার পালা। তাড়াতাড়ি না ফিরলে অন্ধকার হয়ে যাবে। প্রচণ্ড শীত পড়বে। কলকাতায় চারুশীলার বাচ্চারা অস্থির হবে, ঝুমকির বাবা-মা চিন্তা করবে।

হেমাঙ্গও ফিরল তাদের সঙ্গে। একটু চুপচাপ, একটু লজ্জিত।

এদিকের ঘাটে দুটো গাড়ি ছিল। দ্বিতীয় গাড়িটায় উঠল হেমাঙ্গ আর রশ্মি। ওদের বাড়ি কাছাকাছি। কি কারণে কে জানে হেমাঙ্গ হঠাৎ বলল, চয়ন, আপনি এ গাড়িতেই উঠুন। ও গাড়িটা একটু ক্রাউডেড।

সংকোচে চয়ন এতটুকু হয়ে গেল। সে উঠলে ওদের প্রাইভেসি থাকবে না।

চারুশীলাও বলল, না না, এ গাড়িতে অনেক জায়গা। আমরা তো মোটে তিনজন। আমি ঝুমকি আর সুব্রত। তোরা যা না।

না, আমি চয়নকে ওর বাড়িতেই ছেড়ে দিয়ে আসব। উঠুন তো।

চয়ন বলল, আমি বরং বাসে বা ট্রেনে—

দুর পাগল! উঠুন।

চয়ন উঠে ড্রাইভারের পাশে সসঙ্কোচে বসল। তার মতামতের কোনও দাম নেই। সে আর কীই বা করবে?

গাড়ি হু হু করে যখন কলকাতার দিকে এগোচ্ছিল তখনও ফটফটে দিনের আলো। চয়ন নিবিষ্ট মনে সামনের দিকে চেয়ে প্রকৃতি এবং দৃশ্যে শতকরা একশ'ভাগ মনোযোগী থাকতে চেষ্টা করছিল। তবু দু'একটা কথা উড়ে আসছিল কানে। পিছন থেকে।

কথাটা জানতে পারলে চারুদি শকড্ হবেন।

হেমাঙ্গ হাসল, তা হবে।

তুমিও একটু অদ্ভুত। কেন যে সহজ হতে পারো না।

হেমাঙ্গ ফের হাসল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ রইল ওরা।

তারপর রশ্মি হঠাৎ বলল, সামারে এসো কিন্তু। আমি গ্রীনফোর্ডের বাড়িটা কিনে ফেলছি। আমার ওখানেই উঠবে। মা তো থাকবেই এখন কিছুদিন।

ঠিক আছে।

এলে পরে একটা প্যারিস ট্রিপ করা যাবে।

হু হু করে বাতাস আসছে বলে জানালার কাচ তুলে দিতে হয়েছে। তাই কথাগুলো স্পষ্ট কানে আসছে চয়নের। সে এমন কিছু জেনে যাচ্ছে যা আর কেউ জানে না।

সারা রাস্তা ওরা আরও নানা বিষয়ে কথা বলল। তার মধ্যে পেইন্টিং, মিউজিক, সিনেমা এবং সাহিত্যও ছিল। কিন্তু আর বিশেষ কিছু নয়।

কলকাতায় পৌছোনোর আগেই অন্ধকার হয়ে গেল। কুয়াশা জমল। মনটা কেমন নির্বিকার হয়ে গেল তার।

রশ্মিকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিজের বাড়িতে এসে গাড়িটাকে ছেড়ে দিল হেমাঙ্গ। বলল, চলুন আপনাকে আমার গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে আসি।

চয়ন আতঙ্কিত হয়ে বলল, এখন মোটে সন্ধে। কলকাতায় গাড়িঘোড়া চলছে। আমি ঠিক চলে যাবো।

আমার যে কথার খেলাপ হবে।

একটুও না। তাছাড়া আমি এখনই বাড়ি ফিরব না। ভাবছি, এক ছাত্রকে একটু পড়িয়ে যাবো।

তা হলে আসুন, এক কাপ চা খেয়ে যান।

চয়ন রাজি হল।

গরম চা নিয়ে দোতলার ঘরে মুখখামুখি বসে হেমাঙ্গ বলল, আপনার নিশ্চয়ই আমার সম্পর্কে কৌতূহল হচ্ছে?

চয়ন সংকুচিত হয়ে চুপ করে রইল।

হেমাঙ্গ একটু হেসে বলল, যেটা হওয়ার নয় সেটা আঁকড়ে থেকে লাভ নেই। আমি যে বনবাসে গিয়েছিলাম তার কারণ ছিল ওই একটাই। ভাল করে ভাবলাম। ভেবে দেখলাম, আমি কারও প্রেমে পড়িনি। কাজেই আজ রশ্মির সঙ্গে একটা মীমাংসা হয়ে গেল। আমরা বিয়েটা করছি না।

ও।

তবে আমরা বন্ধু থাকব, যেমন ছিলাম। আমি রশ্মিকে নানা কারণে পছন্দ করি। শী ইজ এ নাইস পারসন।

চয়ন মাথা নেড়ে জানাল, সে বুঝেছে।

হেমাঙ্গ হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আজ খুব রিলিভড্ বোধ করছি। কিন্তু একটা কথা।

বলুন।

এখনই চারুদিকে ব্যাপারটা জানাবেন না। প্লীজ।

আচ্ছা।

ও কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞেস করবে।

কী বলব তাহলে?

বলবেন আমরা গাড়িতে খুব গল্প করছিলাম। বেশ ঘনিষ্ঠভাবে। ওকে এখনই হার্ট করতে চাইছি না। রশ্মি চলে যাক, তারপর জানতে পারবে।

ও। বলে চুপ করে থাকল চয়ন। এ তার গল্প নয়। এ তার জীবনের ঘটনা নয়। এ বড় দূরের কাহিনী। হৃদয় বিনিময়ের দুরূহ কথা। এ সবের সঙ্গে তার সম্পর্কই নেই। তবু সে চুপ করে গম্ভীর মুখে বসে রইল।

৬৩

এরা মাটি ভাগ করতে চায়, ভিটে ভাগ করতে চায়, বাড়ি ভাগ করতে চায়। ভাগাভাগির একটা হাওয়াই এখন বইছে পৃথিবী জুড়ে। দুনিয়াকে যে কত ভাবে, কত ভাগে ভাগ করতে চায় মানুষ! এভাবে কি ভাগ হয়? গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন কৃষ্ণজীবন তার দুটি ভাইপোকে নিয়ে ক্ষেতের ধারে ধারে মন্থর পায়ে হাঁটছে। শীতের বাতাস আর রোদে মাখামাখি আজকের এই সকাল তাকে কোন শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে আজ। সামনের ক্ষেতটুকু তাদের। আজ এর অনেক ভাগীদার। এই ক্ষেতটুকু আর ভিটেটুকু আঁকড়ে ধরে তার বাবাকে সে কঠিন বেঁচে থাকার লড়াই করতে দেখেছে। ঘাড়ে তখন অনেক পুষ্যি। দেশ ভাগের পর আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতি কত মানুষ একে একে এসে তাদের আশ্রয় নিয়েছিল। একখানা বড় খোড় ঘরে তখন গাদাগাদি করে থাকা হত। ক্ষেত থেকে ছ'মাসের খোরাকির ধানও উঠত না। তার বাবা বিষ্ণুপদ বিস্তর ঘোরাঘুরি করে অনেক দূরের এক গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারি জুটিয়ে নিয়েছিল। বেতন লজ্জাজনক। এই ক্ষেত আর ওই চাকরি যেন ফুটো নৌকোয় দরিয়া পাড়ি দেওয়া। অসুখ হলে ডাক্তার-বদ্যি ছিল না, ওষুধও না। টোটকা সম্বল। বিনা চিকিৎসায় কৃষ্ণজীবনের একটা ভাই আর দুটো বোন মারা যায়। আগ্রাসী দারিদ্রের সেই নগ্ন চেহারাটা বামাচরণ বা রামজীবন তেমন দেখেনি। ওরা তখন খুব ছোট।

একটা সজনে গাছের তলায় তিনজন দাঁড়াল পাশাপাশি।

পটল, এই ক্ষেত এখন কে চাষ করে জানিস?

জানি জ্যাঠা। বদরুদ্দিন চাচা।

সে ধানটান ঠিকমতো দেয়?

বেশী দেয় না।

বর্গা রেজিস্ট্রি হয়েছে কিনা জানিস?

না জ্যাঠা। ওসব বাবা জানে।

বহুকাল কৃষ্ণজীবন আর খবর রাখে না। এ জমি সে নিজে চাষ করেছে। তার বড় মায়া।

আয়, এখানে একটু বসি।

ঘাসের ওপর, সজনের ঝিরঝিরে ছায়ায় বসল তিনজন। গোপাল কথা কইতে পারে না বটে, কিন্তু সে যে তার জ্যাঠাকে পছন্দ করে এটা সে নানাভাবে বুঝিয়ে দেয়। খুব ঘেঁষ হয়ে সে জ্যাঠার সঙ্গে লেগে বসে রইল।

কৃষ্ণজীবনের বাঁ ধারে পটল। আজকাল কৃষ্ণজীবন যখনই আসে এ দুটি তার সঙ্গে এঁটুলির মতো সেঁটে থাকে। তার তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে একমাত্র দোলনই যা তার ন্যাওটা, অন্য দুজন নয়।

গোপালকে এক হাত দিয়ে নিজের বুকের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে কৃষ্ণজীবন বলল, পটল, তুই কখনও লাঙল চালিয়েছিস?

না জ্যাঠা।

কেন চালাসনি? ইচ্ছে হয় না?

ক্ষেত তো বদরুদ্দিন চাচা চাষ করে।

সে করে, কিন্তু তোর ইচ্ছে হয় না?

পটল কি বলবে ভেবে পেল না।

কৃষ্ণজীবন মৃদু তদ্‌গত গলায় বলে, লাঙল চালালে কি হয় জানিস? মাটির ওপর মায়া হয়, ভালবাসা হয়। ওই মাটির মধ্যে, চাষবাসের মধ্যেই আছে মানুষের প্রাণভোমরা।

পটল একটু উত্তেজিত হল। জ্যাঠার সব কথাই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, সে বলল, সত্যি জ্যাঠা?

সত্যি।

তুমি নিজে চাষ করেছে, না জ্যাঠা?

হ্যাঁ। তোর মতো বয়সেই শুরু করেছিলাম। লাঙল চেপে রাখা খুব শক্ত। এবড়োখেবড়ো মাটিতে লাঙল যখন চলত, আমি লাঙলের মুঠ ধরে ঝুলে থাকতাম। কতবার পড়ে গেছি। হাতে ফোসকা পড়ত। তবে হাল ছাড়িনি। রোজ অভ্যাস করতে করতে দিব্যি পারতাম।

আমাদের যে হাল-বলদ নেই জ্যাঠা।

তখনও ছিল না। হাল বলদ ধার করে আনতে হত। সেও বড় কষ্ট। যার হাল বলদ সে তো আর আমার সুবিধেমতো দেবে না, তাই হাঁ করে তার দয়ার জন্য বসে থাকতে হত। অপমানও হতে হত খুব। তবে গায়ে মাখতাম না।

দাদু বলে, তোমার নাকি খুব রোখ ছিল।

কৃষ্ণজীবন একটু উদাস হাসি হাসল। বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, রোখ ছিল, সাহস ছিল।

আমার সাহস নেই জ্যাঠা। আমি খুব ভীতু। ন'পাড়ার একটা ছেলে এই সেদিন আমাকে রথতলায় একা পেয়ে মেরে দিল। আমি কিছু করতেই পারিনি।

মারল কেন?

ওদের সঙ্গে পাড়ার ঝগড়া। একদিন গোপালকে সাইকেলে বসিয়ে আসছিলাম, একটা ছেলে এমন ঢিল মারল, আর একটু হলে আমার চোখ কানা হয়ে যেত। আর ঢিলটা গোপালের লাগলে মরেই যেত বোধ হয়। ইয়া বড় একটা পাথর।

ন'পাড়ার ছেলেরা বরাবরই একটু গুণ্ডা।

তুমি কখনও মারপিট করেছো জ্যাঠা?

কৃষ্ণজীবন একটু হেসে বলল, সে অনেক করেছি। রিলিফ নিয়ে, ডোল নিয়ে, জমির দখল নিয়ে কত হাঙ্গামা হত তখন। গাঁয়ের কয়েকটা খারাপ লোকও আমাদের পিছনে লেগেছিল। সে একটা বিশৃঙ্খলার সময়।

তখন মার খেতাম, আবার উঠে মারতামও। নইলে দখল থাকত না। দখল রাখাটাই অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় কথা। দখল রাখতে মানুষ সব করতে পারে। এই যে জমিটুকু, বাড়িটুকু, এটুকু রাখতেই আমাদের প্রাণান্ত হওয়ার জোগাড়। তার মধ্যে আবার আমাদের ঘাড়ে বসে যারা খেত, সেইসব আত্মীয় আর জ্ঞাতিরাও এসবের ভাগ চাইতে শুরু করেছিল। সে খুব জটিল কাহিনী। আজ সেই জমি আর বাড়ি ভাগ হচ্ছে।

ভাগ হলে কী হবে জ্যাঠা?

কিছুই হবে না। বামাচরণ তো চাষ করবে না, তার ভাগের জমি বেচে দেবে। রামজীবনও বোধ হয় তাই করবে। সরস্বতী আর বীণাপাণি কি করবে কে জানে! বোধ হয় দাদাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভাগ ছেড়ে দেবে। ওরা তো জানে না, এই সম্পত্তি আসলে একটা ইতিহাস। ওরা টাকাটাই চেনে।

পটল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমার খুব ইচ্ছে করে, গোপালকে নিয়ে এ বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই।

পালাবি! কেন রে, পালাবি কেন?

আমার এখানে ভাল লাগে না, বড্ড ঝগড়া, অশান্তি।

তাই বলে পালাবি কেন? নিজের কাজ নিয়ে ডুবে থাকবি। দুনিয়াতে পালিয়ে যাওয়ার আর জায়গা নেই। পালাতে হলে নিজের মধ্যে পালাবি।

সেটা কেমন জ্যাঠা?

মানুষের পালানোর সবচেয়ে ভাল জায়গা হল তার মন। যদি সেখানে ঢুকে কপাট বন্ধ করে দিতে পারিস তা হলে আর কেউ তোর নাগাল পাবে না।

সত্যি জ্যাঠা?

খুব সত্যি। আমি যখন দিনের পর দিন খিদেয় কষ্ট পেতাম, তখন খিদে ভুলতেও মনের মধ্যে ডুবে যেতাম। খিদের কথাও আর মনে পড়ত না। এরকম কতদিন গেছে। মনটাই হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড় শক্তি। যে মনটাকে সই করে নিতে পারে তার মার নেই। চারদিকে যা খুশি হোক, তুই নিজের কাজ নিয়ে, নিজের ভাবনা নিয়ে থাক, দেখবি কিছুই তোকে ছুঁতে পারবে না।

তুমি কাছে থাকলে আমার খুব ভাল হয় জ্যাঠা।

কৃষ্ণজীবন মৃদু হেসে বলে, আমি কাছে থাকলে তোর সবসময়ে আমাকে নকল করতে ইচ্ছে হবে। সেটা ভাল না। আমি দূরে থাকি বলেই আমার ওপর তোর টানটাও আছে। আমার মতো হওয়ার ইচ্ছাটাও আছে। এরকমই ভাল। আর একটু বড় হ', তখন দেখতে পাবি, পৃথিবীতে নিজের মতো হয়ে ওঠাটাই সবচেয়ে বড় কথা।

পটল গম্ভীর হয়ে বসে জ্যাঠার কথাগুলি বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল। আজকাল সে সব কিছু বুঝবার চেষ্টা করে।

তুই ইংরিজিতে কেমন?

গত পরীক্ষায় একটু ভাল পেয়েছি। তাও বেশী নয়। দাদুর কাছে পড়ছি বলে একটু ভাল হচ্ছে।

বাবা তোকে পড়ায় নাকি? খুব ভাল। বাবা তোর গোড়াটা বেঁধে দিতে পারবে। ইংরিজি আর অঙ্কটা খুব দরকার। আর দরকার শক্ত মন। খুব কঠিন হবি, সাহসী হবি। হিংস্র নয়, কিন্তু সাহসী। বুঝেছিস?

তিনজন আরও কিছুক্ষণ বসে রইল সজনে গাছের নিচে। ঝিরঝিরে ছায়া। শীতের বাতাস। কী ভাল চারদিকটা আজ!

তারপর ভাইপো দুটিকে নিয়ে উঠে পড়ল কৃষ্ণজীবন। আজই ভাগাভাগির কাগজপত্রে সই করে ফিরে যাবে সে। দুদিন বাদেই রওনা হবে আমস্টারডাম। অনেক কাজ বাকি।

বাড়ি ফিরে সে তার বাবার কাছে বসল একটু। একজন উকিল আসবার কথা। এখনও আসেনি।

বিষ্ণুপদ দাওয়ায় রোদে পিঠ দিয়ে বসে নিজের হাত দু'খানার দিকে চেয়ে থেকে বলে, এ ভালই হল, কি বলিস বাবা?

অশান্তির চেয়ে তো ভাল।

আমিও তাই বলি। ভাগজোখ হয়ে গেলে যদি ভাব হয়।

আপনি কি তাই ভাবেন?

না বাবা, তা ভাবি না। আশা করি। একটা দুঃখ, তোর কোনও ভাগ থাকল না।

কি করব বাবা ভাগ দিয়ে? আমার তো লাগবে না।

তা জানি। কিন্তু আমার সম্পত্তিতে তোর একটু ভাগ থাকলে তোকে আমার ছেলে বলে ভাবতে সুবিধে হয়।

কৃষ্ণজীবন মৃদু হেসে বলে, ও কি কথা বাবা, ছেলে বলে এমনিতে ভাবতে অসুবিধে কিসের?

তুই যে বড় ওপরে উঠে গেছিস বাবা, আমি যে তোকে আর নাগালে পাই না। নিজের ছেলে তো ঠিকই, কিন্তু ছেলে যখন বড্ড বেশী কৃতী হয়ে ওঠে তখন যেন ছেলে বলে মনে করতে ভরসা হয় না। যদি এক কাঠা জমিও নিজের নামে রাখতি তবে বুকটা ঠাণ্ডা হত। ভাবতাম, ও তো আমার ওয়ারিশ।

আপনি যে কত অদ্ভুত কথা ভাবেন বাবা!

ওটাই তো আমার মস্ত দোষ। অকাজের মাথায় কত উদ্ভট চিন্তাই যে আসে। কি করি জানিস? পটলের ভূগোল বইখানা খুলে ম্যাপ দেখি আর ভাবি, আমার কৃষ্ণজীবন এখন আমেরিকায় আছে। এই ইংলন্ডে আছে, এই অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছে। তোর সঙ্গে সঙ্গে আমিও যেন চলে যাই ওসব জায়গায়। ভাবি, কৃষ্ণ তো আমার সত্তারই অংশ, আমিই তো কৃষ্ণজীবন হয়ে জন্মেছি। তাই না?

তাই তো বাবা।

বিষ্ণুপদ খুব হাসে আর মাথা নাড়ে। বলে, এইসব ভাবি আর কি!

বাবা, আপনার কি বিদেশ দেখতে ইচ্ছে করে?

বিষ্ণুপদ সভয়ে বলে, ও বাবা, না।

কৃষ্ণজীবন মৃদু হেসে বলে, আজকাল যাওয়া কিছু শক্ত নয়। আমি বোধ হয় বছরখানেকের জন্য আমেরিকায় যাবো। আপনি যদি যেতে চান সব ব্যবস্থা হবে।

বিষ্ণুপদ হাঁ করে চেয়ে থেকে বলে, তুই যে বলেছিস এটাই ঢের। আমার অত চাই না।

আজকাল সবাই যায়।

তারা যাক। আমার সইবে না।

কৃষ্ণজীবন চুপ করে রইল। তার বাবা বিষ্ণুপদর পক্ষে যে আমেরিকা যাওয়া ঘটে উঠবে না তা সেও জানে। অত সৌভাগ্য করে আসেনি তার বাবা। কিন্তু বিষ্ণুপদ কি দুর্ভাগা? তাও মনে হয় না কৃষ্ণজীবনের। বিষ্ণুপদ বরাবর নিজের দুর্ভাগ্যগুলিকে হাসিমুখে মেনে নিয়েছে। শান্ত সমাধিস্থ থেকেছে। মনের মধ্যে ডুব দেওয়ার কৌশল কি উত্তরাধিকার সূত্রে বিষ্ণুপদর কাছ থেকেই পায়নি কৃষ্ণজীবন?

বাবা, কয়েকদিন কলকাতায় গিয়ে থাকবেন?

বিষ্ণুপদ আবার খুব হাসল। বলল, আজকাল শরীরে নাড়া দিতে ইচ্ছে যায় না। মনে হয়, যত নাড়াচাড়া কম হয় ততই ভাল।

কেন বাবা?

কেমন যেন মনে হয়, শরীরেরও কিছু নালিশ আছে। ছুটি চাইছে। বায়ুপুরাণ পড়িসনি?

পড়িনি, কিন্তু আপনার কাছে শুনেছি।

বইখানা পড়িস। অনেক জ্ঞান হয়।

জ্ঞান তো সব বই থেকেই হয় বাবা।

তা হয়। তবে বায়ুপুরাণ একখানা বেশ বই। অনেক লক্ষণ চিনিয়ে দেয়।

বাংলাদেশে নিজের গাঁয়ে একবার যাবেন?

কেন, সেখানে কী আছে?

দেশের গাঁ, পিতৃপুরুষের ভিটে দেখতে ইচ্ছে হয় না?

বিষ্ণুপদ হাসে আর মাথা নাড়ে, চোখে দেখে কি সুখ? বরং ভাবলে সুখ হয় একটু। সবই ভাবের জিনিস। নইলে কার মাটি, কার জমি, কার বসত? এগুলো কিছু না। দেশে কি খুব সুখে ছিলাম রে বাবা? খেয়েছি তো সেই কচু ঘেঁচু, বাস করেছি মাটির ভিটির ঘরে। তবু লোকের কেবল মনে হয় দেশে কত সুখে ছিলাম। ওটা হল ভাবের সুখ।

কৃষ্ণজীবন এই সত্যবাদিতায় মুগ্ধ হল। বাবার দিকে মায়াভরে চেয়ে থেকে বলল, বাবা, আপনি বড় ভাল বোঝেন।

বিষ্ণুপদ ঘন ঘন মাথা নাড়া দিয়ে বলে, কিছু না, কিছু না। বুঝি কোথায়? এই শেষ বয়সে এসে যেন ফের হামা দিচ্ছি। এই দুনিয়াটা, আর এই আমি, কিছুতেই যেন এই দুইয়ে যোগটা খুঁজে পাই না।

আমিও পাই না বাবা। বোধ হয় কেউই পায় না।

বিষ্ণুপদ তার জ্যেষ্ঠ পুত্রটির দিকে উজ্জ্বল চোখে হাসিমুখ করে চেয়ে থেকে বলল, আমার কী তোকে দিই বল তো! জমি টমি কিছু নিলি না, ওয়ারিশ হলি না।

কৃষ্ণজীবন মৃদু হেসে বলে, ওগুলো তো বাইরের জিনিস বাবা। আপনার কাছ থেকেই তো সব পেয়েছি। আজই ভাবছিলাম, আপনি যেমন নিজের মনের মধ্যে ডুব দিয়ে বসে থাকেন, আমারও ঠিক অমনি স্বভাব। আপনার কাছ থেকে অনেক পেয়েছি।

বিষ্ণুপদ খুশি হয়ে মাথা নাড়ে খুব। বলে, তা অবশ্য ঠিক। স্ত্রীকে জায়া বলে, তার কারণ স্ত্রীর ভিতর দিয়েই তো পুরুষ আবার জন্মায় তার সন্তান হয়ে। এ তত্ত্বটা বড় ভাল, ভাবলে একটা বলভরসা হয়।

তাই তো বাবা।

তোর কথা ভেবে খুব তাজ্জব হয়ে যাই মাঝে মাঝে। তোর মাকেও বলি, এই আমরা যেমন, তুই ঠিক সেরকম তো নোস। আমি ভাবি কি, আমার মতো মোটাবুদ্ধি মানুষের ছেলে হয়ে তোর এত বুদ্ধি কেমন করে হল?

কৃষ্ণজীবন খুব হাসল। বলল, বাবা, আপনার মোটাবুদ্ধি কে বলে? দেশের গাঁয়ে লেখাপড়ার চাড় ছিল না, চর্চা ছিল না, আপনারও তেমন উৎসাহ ছিল না। নইলে হয়তো দেখা যেত আপনি মস্ত মেধারই মানুষ। গাঁয়ে গঞ্জে কত মেধা তো অনুশীলনেরই অভাবে নষ্ট হয়ে যায়।

তা বটে। বলে বিষ্ণুপদ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, কিন্তু কিছু টের পাইনি কখনও। সারাজীবন একটা কাজই করেছি। ভেবেছি। মেলা ভেবেছি। সবই হাবিজাবি। আর তেমন কিছু করিনি। অবিন্যস্ত চিন্তা। মনে হয় গুছিয়ে ভাবতে পারলে, ভাবনার পরম্পরা ঠিক থাকলেও মানুষ ভেবেই কত কী করতে পারে।

কৃষ্ণজীবন হাসতে হাসতে বলল, এই যে বলছিলেন আপনার মোটাবুদ্ধি! মোটাবুদ্ধির মগজ থেকে কি এসব কথা বেরোয়?

শোন, আমার তো বিশেষ কিছু নেই। একটা মাদুলি আছে। তামার মাদুলি। তোর ঠাকুমা কোথা থেকে এনে পরিয়েছিল আমায়। কোনও কাজ হয়েছিল কি না জানি না। তবে অনেকদিন আমার হাতে বাঁধা ছিল। এই বছরখানেক হল তাগা ছিঁড়ে যাওয়ায় আর পরিনি। আমার খুব ইচ্ছে হয়, ওটা তোকে দিই।

মাদুলি দিয়ে কী করব বাবা?

বিষ্ণুপদ সলজ্জভাবে মাথা নেড়ে বলে, কিছু করবি না, তোর কাছে রাখবি। ওইটেই তোকে দিলাম ওয়ারিশ হিসেবে।

কেন বাবা?

মাদুলি সামান্য জিনিস, ওর সঙ্গে স্বার্থ বা লোভের সম্পর্ক নেই। একটা কিছু দেওয়াও হল, পাঁচজনের চোখও টাটাল না, নিবি কৃষ্ণ?

কৃষ্ণজীবন দুটি হাত পেতে বলল, দিন বাবা। তাই দিন।

বিষ্ণুপদ উঠে ঘরে গেল। বাক্স খুলে একটা কৌটো বের করে আনল। কৌটোর ভিতর থেকে কালপ্রাচীন মাদুলিটি বেরোলো। মাদুলির তাম্রাভ বর্ণ কালচে হয়ে গেছে, ছেঁড়া তাগাটা তেলচিটে।

অপ্রতিভ বিষ্ণুপদ দ্বিধান্বিত করতলে মাদুলিটা নিয়ে বলল, এটাই। নিবি বাবা? ঘেন্না করবে না তো!

কৃষ্ণজীবনের চোখে জল এল। মাথা নেড়ে বলল, না বাবা। ঘেন্না কেন করবে?

বড্ড নোংরা হয়ে আছে। পুরোনো তো?

ওইরকমই থাক বাবা। ওতে একজন সৎ মানুষের স্পর্শ আছে। দিন।

বিষ্ণুপদ মাদুলিটা তার হাতে দিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসল, মনে মনে ভাবছিলাম, তোকে কী দিই! কাল রাতে হঠাৎ স্বপ্ন দেখলাম, তোকে এই মাদুলিটা দিচ্ছি। স্বপ্নের তো মাথামুণ্ডু থাকে না। তবু ভাবলাম, তা হলে দেওয়াই ভাল।

মাদুলিটা পকেটে রেখে কৃষ্ণজীবন বলল, এটা কি পরতে হবে বাবা?

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, না না। পরতে হবে না। তোর বাড়িতে রেখে দিস কোথাও। ওর কোনও ক্রিয়া নেই। শুধু একটা চিহ্ন।

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ।

বিষ্ণুপদ হঠাৎ বলল, হ্যাঁ রে, ইনঅ্যানিমেট যা সব আছে, সেগুলো কি সত্যিই ইনঅ্যানিমেট? তুই তো অনেক জানিস, তোর কি মনে হয়?

কৃষ্ণজীবন একটু অবাক হয়ে বলে, ইনঅ্যানিমেট তে জড়বস্তু।

বিষ্ণুপদ খুব লজ্জার হাসি হেসে শিশুর মতোই বলে, কি জানিস, যখন ছোট ছিলাম তখন কিন্তু মনে হত, সব জড়বস্তুই যেন জীয়ন্ত। প্রাণ কি না জানি না, কিন্তু আমাদের সবই ওরা দেখে, বুঝতে পারে, টের পায়। এখনও ঠিক সেরকম মনে হয়।

কৃষ্ণজীবন মৃদু হেসে বলে, তাতে দোষ কি বাবা? সেরকম হতেও পারে। বিজ্ঞান দিয়ে আমরা আর কতটুকু জানতে পেরেছি?

তোর ওরকম মনে হয় না, না?

না বাবা।

ওই যে মাদুলিটা নিলি, কত আদর করে নিলি, ওটা তো ইনঅ্যানিমেট। তাই না? আমার কেন যে মনে হয়, ওই মাদুলিটার মধ্যে আমার একটু তরঙ্গ, একটু স্পন্দন রয়ে গেল। জড় বটে, কিন্তু তবু যেন পুরোপুরি জড় নয়।

কৃষ্ণজীবন স্মিত মুখে চুপ করে রইল।

বিষ্ণুপদ বলল, কত কী মনে হয়। গরুটা, কুকুরটা, ছাগলটা, গাছটা সব কিছুকেই যেন মনে হয়, মানুষের মতোই। হয়তো তেমন বুদ্ধি নেই, ক্রিয়া নেই, তবু যেন সবই মানুষ। সবই আমাদেরই ভিন্ন রূপ।

এরকম হলে তো ভালই বাবা।

বিষ্ণুপদ খুশি হল। খুব হাসল। দুলে দুলে।

উকিল এল একটু বেলায়। বামাচরণই নিয়ে এল। রামজীবন, বামাচরণ, বিষ্ণুপদ আর কৃষ্ণজীবন মিলে একটা ভাগাভাগির বৈঠক বসল। ঝগড়া-কাজিয়া হল না। শান্তভাবে একটা মুসাবিদা করা হল। নিজের ভাগের সম্পত্তি দানপত্র করে দিল কৃষ্ণজীবন। সবই কাঁচা চুক্তি। পরে আদালত থেকে পাকা হয়ে আসবে। সাক্ষী সাবুদও জুটে গেল কয়েকজন।

বিকেলে অবসন্ন মনে ফেরার ট্রেন ধরল কৃষ্ণজীবন। একা। বড্ডই ফাঁকা ট্রেন। এই একাকিত্ব কৃষ্ণজীবনের আশৈশব সঙ্গী। বাইরে বন্ধুবান্ধব ছিল, আত্মীয়স্বজন ছিল, তবু সকলের মাঝখানে থেকেও কৃষ্ণজীবন মনে মনে ছিল একা, সঙ্গীহীন। বরাবর। বিয়ের পরও। আজ অবধি সেই একাকিত্ব কখনও ঘোচেনি তার। কিন্তু ঘুচবেই বা কেন? সে তো এই একাকিত্বকে আদ্যন্ত উপভোগ করে।

ঠিক একাও নয়। সে যখন একা হয় তখন গোটা বিশ্বজগৎ নিয়ে তার প্রিয় চিন্তা এক রূপকথার জগৎকে উন্মোচিত করে দেয়। সীমাহীনতা, সময়হীনতা পরিব্যাপ্ত হয়ে যে চরাচর, তার রূপ ও অরূপ, তার আলো ও অন্ধকার ভরে রাখে তার মাথা।

একা প্রায়ান্ধকার ট্রেনের কামরায় জানালার পাশে বসে সে আজ উপভোগ করছিল এই একাকিত্বকে। বিশাল বিশ্বজগতের কথা যখনই সে ভাবতে শুরু করে তখনই তুচ্ছ হয়ে যায় তার সব প্রিয়জন, তার চাকরি,

সাফল্য, প্রতিষ্ঠা। এক দিশাহীন অতল অন্ধকারে আচ্ছন্ন অসীম আর মহাকাল—যার শুরু নেই, শেষও নেই—তাকে এসে সম্মোহিত করে দেয়।

পকেট থেকে আনমনে বাবার দেওয়া মাদুলিটা বের করল সে। চেয়ে রইল। কেন বাবা মাদুলিটা তাকে দিল তা অন্যে হয়তো বুঝবে না। কিন্তু সে বোঝে। সে বুঝেছে। বাবা এই সামান্য মাদুলিটি হয়ে তার সঙ্গে লেগে থাকতে চায়। বিষ্ণুপদ এর বেশী আর কিছুই চায়নি তার কাছে।

৬৪

নিরঞ্জনবাবুর কাছে বসে থাকলেও কত জ্ঞান হয়। পাকা মানুষ, কত অভিজ্ঞতা। আসাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, কাছাড় থেকে বিহার অবধি কত ঠিকাদারি যে করেছেন একটা জীবনে তার হিসেব নেই। টাকা কামাতেই বটে, কিন্তু কাজটাও বড্ড ভালবাসেন।

একটু রাতের দিকে নিরঞ্জনবাবুর কাছে এসে বসে নিমাই। কখনও গান শোনায়, কখনও বসে বসে কথা শোনে। আগে সন্ধের পর একটু-আধটু মদ খেতেন, সিগারেটেরও নেশা ছিল। ডাক্তারের বারণ বলে ছেড়েছেন। এত খাটুনিও ডাক্তারের বারণ। এ বারণটা শোনেননি।

সেই কথাই বলছিলেন, এখন কাজকর্ম ছেড়ে যদি ঘর-বসা হয়ে যাই তাহলে আর ক'দিন বাঁচবো? ডাক্তাররা বুঝতে চায় না, কাজই হল মানুষের আসল ওষুধ। কাজ বন্ধ করলেই আদি-ব্যাধি এসে ধরে।

নিরঞ্জনবাবু চৌকিতে বিছানায় চাদরমুড়ি দিয়ে বসা। মুখোমুখি একখানা টুলে নিমাই। নিমাই মাথা নেড়ে বলে, ডাক্তাররা শরীর চেনে, রোগ চেনে, গোটাগুটি মানুষটাকে তো বুঝে উঠতে পারে না। মনটায় যদি অশান্তি হয়, যদি ছটফট করে তবে কি দেহে শান্তি হয়?

তবেই বোঝো। আমার দুই ছেলে, ছেলেদের মা, বউমারা, মেয়েরা সবাই এমন গাজি গাজি করে ধরল, কিছুতেই কাজে বেরোতে দেবে না। তাদের ধারণা, টাকা রোজগার তো মেলা হল, এবার ঘরের সুখ ভোগ করলেই হয়। ঘরের যে কী সুখ তা তো আমি জানি। ছেলেদের দুটো দোকান করে দিয়েছি। একখানা রং আর হার্ডওয়্যারের, অন্যখানা পাম্পসেট আর ইনজিনিয়ারিং। চলছেও ভাল। টাকার অভাব নেই। কিন্তু বাড়ির মধ্যে দেখবে দিনরাত মাথা গরম, দিনরাত ঝগড়া-কাজিয়া। ছোটোখাটো ব্যাপার থেকে কুরুক্ষেত্র হয়ে যায়। আমার যখন প্রথম স্ট্রোকের মতো হল ক'দিন বাড়িতে থাকতে হয়েছিল। বাড়ির আবহাওয়ায় আমার ফের স্ট্রোক হওয়ার জোগাড়। শেষে একটা নার্সিংহোম-এ গিয়ে পালিয়ে বাঁচি। এই বেশ আছি বাবা। কাজ করতে করতেই একদিন ফুটুস করে মরে যাবো, সেই ভাল।

মরার কথা বলেন কেন? সে যখন আসার আসবে। বেঁচে থাকার কথা ভাবাই তো ভাল। বাঁচার ইচ্ছেটা জোরদার থাকলে তার জোরে আয়ুও খানিকটা বেড়ে যায়।

আমিও তাই বলি। চিরকাল মাঠে-ঘাটে কাজ করে করে আমার মনটা কেমন সবসময়ে উড়ু উড়ু থাকে। ঘর-সংসারে বাঁধা পড়লেই যেন ওসব মরুনে চিন্তা পেয়ে বসতে থাকে। এই যে শ'খানেক লোকের গ্রাসাচ্ছাদন হচ্ছে, একটা কিছু তৈরি করছি— এ সবের কি আনন্দ নেই?

দু'জনেই খানিক চুপ করে থাকে।

নিরঞ্জনবাবু হঠাৎ বলেন, তোমার কথা তো কিছুই খুলে বললে না আমায়? এ ক'বছর করলেটা কী?

নিমাই একটু হেসে মাথা নিচু করে বলে, সে এক লজ্জার কথা।

কেন, লজ্জার কী?

বিয়ে বসে প্রায় ঘরজামাই হয়েছিলুম। ক'টা বছর নষ্ট করলুম। না হল সংসার, না কাজকর্ম।

ঘরজামাই ছিলে! সে আবার কেমন?

ঘরজামাই যাকে বলে তা নয় অবিশ্যি। তবে বউয়ের পয়সায় দিন গুজরান হত।

বউ কোথায়?

সে আমাকে ত্যাগ দিয়েছে।

বউকে ত্যাগ করা মহা পাপ, তা জানো?

আমি ত্যাগ করার কে? বউই আমাকে একরকম ঘাড় ধাক্কা দিল যে।

বলো কি! এ তো ঘোর অন্যায়। কেন, তোমাকে তার পছন্দ নয়?

সে জানি না। ছিলুম তো একই সঙ্গে। তবে অন্য একটা বখেরা জুটল, সেটাই কাল হল।

অন্য কোনও ছেলেছোকরা নাকি?

না। সেটা বলা যাবে না।

যাত্রাদলে নেমেছে সেটাও ভাল কথা নয়। যাত্রা-থিয়েটার বাইরে থেকেই ভাল, ভিতরে নালী ঘা।

তা বটে।

তুমি চেপে বসে থাকো। ব্যবসাটা বাড়াও। বউ যদি কখনও নিজের ভুল বুঝতে পারে তাহলে নিজেই ফিরবে। জীবনের ভুলগুলো মানুষ যতদিন নিজে না বুঝতে পারে ততদিন তাকে ফেরাতে চেষ্টা করে লাভ হয় না। ওটা হল নিশির ডাকের মতো।

তা বটে।

ব্যবসার কথা কিছু ভাবছো?

ক্যাটারিংটা ভালই চলছে।

দুর বোকা! ওটুকুতে আটকে থাকলে চলবে কেন? একখানা দোকানঘর দেখ। তোমার ব্যবসার মাথা আছে, রান্নার হাতও খুব ভাল। তার ওপর তোমার স্বভাবখানা নরম। তোমার হবে। শুধু দেখো, বাকিবকেয়ার ফেরে পড়ে যেও না। ধারবাকির পাল্লায় পড়েই অধিকাংশ দোকান লাটে ওঠে।

যে আজ্ঞে।

দু'পাঁচ হাজার টাকা আমার কাছে সব সময়েই পাবে। তোমার কাছে আমার টাকা কখনও মার যাবে না। দু'চারটে লোককে যদি মরার আগে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যেতে পারি তাহলেই আমার সুখ।

নিরঞ্জনবাবুর দিকে চেয়ে চোখে জল আসতে চায় নিমাইয়ের। সে মাথা নেড়ে বলে, দোকানই দেবো।

দাও। বেশ গোড়া বেঁধে লেগে যাও। ব্যবসার পিছনে যেন একটু সেবাবুদ্ধি থাকে। বেশির ভাগ ব্যবসাদাররাই চায় লোকের ঘাড় ভেঙে পয়সা লুটতে। ওরকম মন থাকলে হয়ও না ভাল। তোমার মনটা হবে

অন্যরকম। ব্যবসার পিছনে লোককে সেবা করার মতলব যদি থাকে, তাহলে দেখো কি থেকে কি হয়ে যাবে। একটু কম লাভ রেখো, আর লাভের অর্ধেক ব্যবসাতেই লাগাবে। তাতে ব্যবসা বাড়বে।

নিমাই এ সব কথা রাত জেগে জেগে বসে ভাবে। নিরঞ্জনবাবু বড় খাঁটি লোক।

নন্দর বউটা ইদানীং বড্ড ঘুর ঘুর করছে। লক্ষণ সব চেনে নিমাই। নন্দ বেশি পাত্তা দিচ্ছে না বউকে। ইদানীং ভাত কাপড়ও বন্ধ করেছে। বউটা এখন আতান্তরে। তার এখন একজন পুরুষ চাই। এমন পুরুষ যে রাখবে। রাতের দিকে এসে আজকাল পাশটিতে বসে পড়ে, তারপর রাজ্যের কথা ফাঁদে।

ও নিমাইদাদা, অমন গোমড়া মুখ করে থাকো কেন গো?

মেয়েটার জন্য নিমাইয়ের কষ্ট হয়। সে তো জানে, মনো শরীরের টানে তার কাছে আসে না। আসে পেটের টানে। দু'মুঠো ভাত, মাথার ওপর চাল, দুচারখানা কাপড়, কয়েকটা টাকা এই হলেই বাঁধা মেয়েমানুষ।

নিমাই বলে, ঘরে যা মনো, শুয়ে থাক গে।

ঘুম আসে না বলেই তো আসি। রাতটা যে কাটতে চায় না।

এত রাতে এই যে আসিস, এটা ভাল দেখায় না।

খারাপেরই বা কি বলো? আমাদের তো দু'কান কাটা। লজ্জা কাকে? তোমার বউ তোমাকে কাঁচকলা দেখিয়েছে আর আমার বর আমাকে নেয় না। তো কাকে আর পরোয়া?

ওরকমভাবে বলতে নেই, ভাবতেও নেই।

তুমি বড় ভিতু মানুষ গো।

খুব ভিতু। আমাকে দিয়ে তোর কিছু হবে না।

কেন হবে না শুনি? নন্দ নেয় না বলে তো আর পচে যাইনি।

পচতে চাইছিস কেন?

মনো চুপ করে ইটের ওপর বসে থাকে। মাথা নিচু করে কাঁদেও কিছুক্ষণ। ঘর বলতে সামান্যই একখানা খুপরি। সেখানে তার ছোট্টো একটা মেয়ে ঘুমোচ্ছ। ঘরে তালা দিয়ে মনো চলে আসে রোজ।

দেখ মনো, তোর জন্য আমাকে না এ জায়গা ছাড়তে হয়। যদি জ্বালাতন করিস তবে আমি এখানকার পাট তুলে চলে যাবো কিন্তু।

পাঁচটা টাকা দেবে?

পরশু তত দিয়েছি।

পরশুর টাকা আজ অবধি থাকে? পাঁচ টাকায় কী হয় বলো!

এরকম করে যদি রোজ চাস তাহলে আমার চলে কি করে?

তোমার আবার অভাব! দিব্যি তো লুটেপুটে খাচ্ছো। দাও না পাঁচটা টাকা। দোকানে যে আর ধার দেয় না।

কাজে লেগে যা-না।

কাজ কি করি না নাকি? তিন বাড়ি ঝি খাটি। তাতে হয়? নন্দ ঘরভাড়া দেওয়া বন্ধ করেছে, হাতে একটা পয়সা দিচ্ছে না।

ও কি কাউকে পুষছে?

তা আবার নয়? পরশু তো তাই নিয়ে কুরুক্ষেত্র হল। আর আসবে না।

সেবা-টেবা ঠিকমতো করতি?

কম করিনি গো। মদের পয়সা কম জুগিয়েছি? নিজের রোজগারের পয়সা ভাঙত নাকি? শুধু ঘরভাড়া দিত আর বাজারটা করত আর মেয়ের খরচটা।

তবে তো মেলাই দিত।

ছাই।

শোন মনো, পুরুষ মানুষকে একটু ভোয়াজে রাখলে সে তো পাপোশ। নন্দ লোক খারাপ নয়। ইলেকট্রিকের ভাল কারিগর। একা হাতে নিরঞ্জনবাবুর দুটো গোডাউনের লাইন করেছিল।

তাতে কী হল বলো তো! ভাল কারিগর মানেই কি ভাল মানুষ নাকি?

তা নয়, তবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার মতো তো নয়।

তুমি আর ধান ভানতে শিবের গীত গেও না তো! বলতে আসি এক কথা, উনি শোনান আর এক কথা।

কী শুনতে আসিস মনো? যা শুনতে চাস সেই বাক্য তো আমার মুখ দিয়ে বেরোবে না।

তুমি খুব সাধুপুরুষ!

তা নই। তবে ভিতু।

ভয়টা কাকে? আমাকে? না সমাজকে?

সবাইকেই।

ওটা কোনও কথা হল? আমি কি তোমার ক্ষতি করব বলে আসি?

নিমাই চুপ করে থাকে। এ কথার জবাব দিতে গেলে মনো খুব দুঃখ পাবে।

মনো নিজের মনেই বলে, তোমার হোটেলেও তো ঝি লাগে। সেই কাজটাই না হয় দাও আমাকে। তোমার দুটো ভাতও ফুটিয়ে দেব। আমার ঘরভাড়া আর খোরাকিটা দিয়ে দিও।

মনো, তুই আর কাউকে দেখ।

ইস, আমি যেন ওরকম। একটা না একটা ধরলেই হল বুঝি? তোমার কাছে আসি কি এমনি? ভাল লাগে বলেই না।

আমাকে তোর ভাল লাগে কেন?

লাগলে কি করব?

তোর মাথাটাই গেছে। আমি হলাম একেবারে অপদার্থ লোক। কড়ে আঙুলের মতো মানুষ।

ওই ডাইনি তোমার মাথাটা চিবিয়ে রেখেছে গো! কিছুতেই আর তোমার অন্য দিকে নজর পড়ছে না। তা হ্যাঁ গো, নিমাইদাদা, পুরুষ মানুষের কি একজন নিয়ে চলে? কত পুরুষ দেখলাম।

দেখেছিস? ভাল।

অমন ফাঁকা গলায় কথা কইছো কেন? ওই যে নিরঞ্জনবাবু, কতটা চেনো ওঁকে? যখন আগেরবার এখানে ঠিকাদারি নিয়ে এলেন তখন দেখেছি, রাতে ফুলিয়া বলে একটা কামিনকে রোজ ঘরে নিত।

জানি।

জানো?

জানব না কেন? সবাই জানে। ওটা হল দু’পক্ষের বন্দোবস্ত। এরও দরকার, ওরও দরকার।

তোমার বুঝি দরকার নেই?

নিমাই মাথা নাড়ে, না। তুই ঘরে যা।

ঘরে যায় বটে মনো, কিন্তু দু'তিন রাত্তির পর ফের আসে।

কয়েকটা টাকা দাও নিমাইদাদা, শোধ দিতে পারব না। অন্য দিকে পুষিয়ে দেবো।

ও সব বলতে নেই রে।

তুমি কী বলো তো!

আমি একটা কিচ্ছু না। বুঝতে তোর দেরি হচ্ছে কেন?

তোমার বদনামের ভয় তো! এখানে কে তোমার বদনাম করবে? সবকটাই তো বদমাশ।

সবাই বদমাশ হলে কি চন্দ্র সূর্য উঠত? সবাই বদমাশ যদি বা হয় তাতেই কি আমাদেরও সব বাঁধ ভেঙে দিতে হবে?

আচ্ছা লোক তুমি মাইরি।

শুয়ে থাকগে মনো। মাথা ঠাণ্ডা কর গে।

টাকা দেবে না?

শুধবি কি করে?

ঠিক শুধবো।

ও হয় না রে। আমাকে টাকার ফেরে ফেলিস না। আমি বড় গরিব।

মনো কাঁদে। হার মানে। শেষে বলে, মোটে বিশ-বাইশ বছর বয়স আমার, এই বয়সেই সব চলে গেল। তোমার মায়া হয় না?

দুর পাগল! মায়া হবে না কেন? মায়া হলেই কি ঘর করতে হয় নাকি?

মনো চুপ করে বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, মেয়ে হয়ে জন্মালে বুঝতে পারতে কেমন ঘেন্নার জীবন আমাদের। একটা পুরুষ মানুষ না হলে আমাদের সব নেতিয়ে পড়ে। সেই পুরুষ আমাকে পছন্দ করবে কিনা, আমাকে রাখবে কিনা তাই নিয়েই সারাক্ষণ বুকের মধ্যে ধুকুপুকু। মেয়েমানুষের বেঁচে থাকাটাই কত ঘেন্নার কথা।

তুই অমন অস্থির হচ্ছিস কেন? ধৈর্য ধরে দেখ কী হয়।

উপদেশ দিও না গো। সব জানি। আমাদের আবার কী হবে। লেখাপড়া জানি না, রূপ নেই, টাকা নেই। আমাদের মত মেয়েদের গতি কি হয় জানো না? শেষ অবধি গিয়ে ভাগাড়ে পড়তে হবে। শেয়াল-শকুনে ছিড়ে খাবে। মা গো!

উঃ! ও সব কথা বলিস না মনো।

বলব না? চোখের সামনে যা সব দেখছি।

ব্যথিত, দুঃখিত নিমাই চুপ করে বসে থাকে। সে তো আর অন্ধ নয়। মেয়েমানুষের মাংস নিয়ে ব্যবসা সে কিছু কম দেখেনি।

তুমি লোক বড় ভাল গো, নিমাইদাদা। আমার একটা গতি করে দাও। নইলে কিন্তু কপালে আমার লাইনে নামাই আছে।

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মনোর গতি সে কি করে করবে বুঝতে পারে না। তার ছোট্টো কারবারে তো বেশি লোক লাগে না। তার চেয়ে বড় কথা, মনো কাছাকাছি থাকলে তার বিপদের ভয়টাও থেকে যাবে।

মনো চলে যাওয়ার পরও নিমাই বসে বসে অনেকক্ষণ মেয়েমানুষ নিয়ে ভাবে। বীণাপাণিও মেয়েমানুষ। যখন বিয়ে হয়ে কিশোরী বীণাপাণি এল তখন ভিতু, ছোটোখাটো, অভিমানী, সোহাগী মেয়েটা যেন নিমাইয়ের অন্ধকার জীবনটাই আলোয় ভরে দিয়েছিল। বীণাপাণি আজও নিমাইয়ের কাছে পুরোনো হয়নি। আজও রোজ, সর্বদা মনের মধ্যে বীণাপাণির যাতায়াত। কিন্তু বীণাপাণি নিমাইয়ের কাছে যা, অন্যের কাছে তো তা নয়। সে যাত্রার নটী, একা, অভিভাবকহীন। সেও তো লোভী পুরুষের চোখে নারীমাংস ছাড়া আর কিছু নয়।

বুকটা বড় ব্যথিয়ে ওঠে নিমাইয়ের। বুকের মধ্যে যেন এক শূন্য প্রান্তরে শুকনো বাতাস হু হু করে বয়ে যায়। আজও বীণা তার খোঁজ নেয়নি। বছর ঘুরতে চলল।

পতিতপাবন দত্ত মশাইয়ের তুলো আর তোশক বালিশের কারবার উঠে যাচ্ছে। দোকানখানা বন্দোবস্তে নিয়ে ফেলল নিমাই। নিজের টাকাতেই কুলিয়ে গেল। তবে দোকান নিলেই তো হল না। চেয়ার টেবিল, বেসিন, কল, বাসনপত্র নিয়ে মেলা খরচ।

নিরঞ্জনবাবু বললেন, টাকা দিচ্ছি। সব দিক সামলে ভাল করে দোকান দাও। হিসেবটা ঠিকমতো রেখো। হিসেবের ব্যাপারে তোমার গাফিলতি আছে। আর চৌকিদারের চাকরিটাও তোমাকে করতে হবে না। আমি অন্য লোক দেখে নিচ্ছি।

নিমাই হাতজোড় করে বলে, আজ্ঞে না। ওটা ছাড়ব না। বেতন দিতে হবে না, ওটা আমি বেগার খেটে দেবো।

কোন দুঃখে?

ওটা আমার পয়া চাকরি।

নিরঞ্জনবাবু হাসেন, পাগল আর কাকে বলে! রাত জাগলে দোকান করবে কি করে?

আজ্ঞে পারব!

এত খাটলে শরীর ঠিক রাখতে পারবে?

শরীরের কথা ভাবলেই শরীর বেগড়বাঁই করে। ভগবান শরীর দিয়েছেন খাটানোর জন্য, বসিয়ে রাখার জন্য তো নয়।

তাহলে করো। বেতনও পাবে। কলিকালে সৎ আর সাধুদের তো কলকে নেই। তা তোমার যদি এই ঘোর কলিকালে কিছু উন্নতি হয় তবে বুকে বল ভরসা পাবো। সাধু সজ্জনদের আজকাল বড়ই দুর্গতি।

আমাকে সাধু বলবেন না। তাতে সাধুদের অপমান।

খুব খাটুনি গেল দিন কতক। দোকান ঝাড়পোঁছ করা, রং লাগানো, সবই নিজের হাতে করতে হল তাকে। মিস্ত্রি মেলা পয়সা চায়। আর নিজের হাতে করলে যে সুখটা হয় তা মিস্ত্রিকে দিয়ে করালে হয় না।

দোকানটা দাঁড়াল মন্দ নয়। সাইনবোর্ডের কথা একবার ভেবেছিল সে। তারপর ভাবল, চেনা বামুনের পৈতে লাগে না।

পালপাড়া থেকে মা-বাপকে আনাল নিমাই। নদেরচাঁদ এল সঙ্গে। পূজো-টুজো দেওয়া হল দোকানে। খাওয়া-দাওয়া হল।

ও নিমাই, এ কি আমাদের হোটেল? সত্যি?

হ্যাঁ মা, এ নির্যস আমাদেরই হোটেল।

সোনার চাঁদ রে, কি করে করলি বাবা? এ যে বিশ্বাসই হয় না। চেয়ার টেবিল আলো দিয়ে এ যে অশৈলী কাণ্ডকারখানা!

মা-বাপের মুখে হাসি ফোটাতে পারা সৌভাগ্যের কথা। কটা ছেলে করতে পারে তা? নিমাইয়ের বুক ভরে উঠল। একখানা লড়াইতে সে হেরে গেছে বটে, কিন্তু ভগবান তাকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেননি।

মাকে বলল, আর পালপাড়ায় পড়ে থাকার দরকার কী মা? হোটেলের পিছন দিকে ঘর আছে। সেখানেই থাকতে পারবে।

মা বলে, তা তুই যা বলিস। তবে সেটা নিজেদের বাড়ি তো। এ হল ভাড়ার ঘর।

নদে মাথা নেড়ে বলে, ও কাজ করতে যেও না নিমাইদা। পালপাড়ার ঠেকটা রেখো। আমি বলি কি একটু চাষের জমিও কিনে রাখো গাঁয়ে। জমির মতো জিনিস নেই।

নিমাই দোনামোনা করে বলল, তাহলে তাই হোক।

দিন যায়। ভালই যায়। হোটেল চলছে রমরম করে। সারাটা দিন শ্বাস ফেলার সময় থাকছে না নিমাইয়ের। নানারকম নতুন নতুন খাবারের কথা মাথায় ঘোরে তার। গোটা কয়েক রন্ধনপ্রণালী কিনে ফেলল সে। দুটো বিয়েবাড়ির অর্ডার পেয়ে মোটা লাভ হল তার। নিরঞ্জনবাবুর টাকা শোধ করতে তিন-চার মাসও লাগল না।

কিন্তু মাঝে মাঝে দুপুরের সামান্য ফাঁকে যখন একটু ঘুমিয়ে নিতে যায় নিমাই বা রাত জেগে গুদাম পাহারা দেয় তখন মনে হয়, এই যে তার এত হচ্ছেটচ্ছে, এ সব তো বীণা দেখছেও না, জানছেও না। আহা বীণা যদি একবার দেখত! তার মুখে যদি একটু অবাক-হাসি আর সোহাগের ভাব ফুটত দেখে। এত পরিশ্রম সার্থক হত তাহলে।

কী নিমাইদা। চিনতে পারছো?

নিমাই অবাক হয়ে দেখে ছেলেটাকে। তারপর আহ্লাদের গলায় বলে, পল্টু! আরে এসো এসো।

পল্টুর বনগাঁয়ের লটারির দোকানে অনেক বসে থেকেছে নিমাই। ভাল ছেলে।

তোমার দোকানের কথা শুনেছিলাম। এদিকে এসেছিলাম একটা কাজে। বোনের জন্য সম্বন্ধ দেখতে। তাই এখানে একটা টুঁ মারলাম।

ভাল করেছ। বোস।

বসব! কোথায় বসব? তোমার দোকানে তো দেখছি গিজগিজ করছে খদ্দের!

তা একটু হয়। ওরে, এখানে কাউন্টারের পাশে একটা চেয়ার দে তো।

পল্টুর জন্য এক প্লেট মাংস আর পরোটার অর্ডার দিয়ে নিমাই বলল, তারপর ওদিককার খবর কী বলো!

বীণাদির খবর চাও নাকি?

বীণা ভাল আছে?

ভালই তো। বিশ্ববিজয় অপেরার তো এখন খুব নাম। বীণাদিরও হাল ফিরেছে।

থাক। ভাল থাকলেই ভাল। ঘরখানা কি পাকা করেছে?

তা জানি না। তবে পথে-ঘাটে দেখি, চেহারা ভাল হয়েছে।

নিমাই চুপ করে থাকে। বীণা ভালই আছে। তার মানে তাকে ভুলেছে বীণা। মুছে ফেলেছে জীবন থেকে।

কাকা কেমন আছে পল্টু?

আছে, ভালই আছে। সব ঠিক আছে। একবার যেও বনগাঁয়ে। তোমার কথা খুব মনে হয়। এখানে এসে খুব ভাল করেছ নিমাইদা। তোমার অবস্থা তো দেখছি ফিরে গেছে।

ভগবানের দয়া।

গিয়ে বীণাদিকে সব বলব'খন। অবশ্য বীণাদিও খবর রাখে।

রাখে?

খুব রাখে। আমাকে একদিন বলছিল, জানো তো সেই নেমকহারাম লোকটা আমাকে ছেড়ে গিয়ে হোটেল খুলেছে।

বলছিল?

কী বলছিল সেটা বড় কথা নয়। বলছিল যে সেটাই বড় কথা।

৬৫

জ্যোৎস্না রাতে ছাদের রেলিং-এর ধারে পাশাপাশি দুজন দাঁড়ানো। দৃশ্যটা আপাতদৃষ্টিতে বেশ রোমান্টিক। চয়ন তত বয়সে একজন যুবকই। এবং অনিন্দিতাও কি যুবতী নয়?

যদিও এটা শীতকাল। তবু আজ কলকাতায় শীত একদম নেই। একটু আগে চয়ন ফিরেছে। নিচে গিয়ে চৌবাচ্চায় হাতমুখ ধুয়ে যখন ওপরে আসছে তখন অনিন্দিতা পিছু পিছু এল।

ছাদে পা দিয়েই বলল, কাল একটা থিয়েটার দেখবেন?

থিয়েটার।

কেন, থিয়েটার দেখেন না?

চয়ন খুবই বিব্রত বোধ করল। সিনেমা থিয়েটার জলসায় সে কখনও যায় না, যাওয়ার কথা মনেই হয় না। এন্টারটেনমেন্ট জিনিসটাই তার মধ্যে নেই।

সে মাথা নেড়ে বলল, না। সময়ই হয় না।

কেন, আপনার এত সময়ের টানাটানি কেন হয়? টিউশনি আর এমন কী একটা কাজ?

চয়ন মৃদু একটু হাসল। কিছু বলল না। সত্যি কথাটা বললে মেয়েটা খুব অবাক হবে। সে মৃদু। স্বরে বলে, অনেকদিন আগে মাঝে মাঝে সিনেমা দেখেছি। এখন কেন যে ইচ্ছে হয় না।

আপনি অদ্ভুত মানুষ। বাঁচতেই জানেন না। বড্ড শুকনো।

চয়ন মাথা নেড়ে বলে, তা ঠিক।

কেন এরকম আপনি? আমার তো থিয়েটারের ভীষণ নেশা। কিছু বাদ দিই না। কাল যাবেন? আমার কাছে দুটো কমপ্লিমেন্টারি টিকিট আছে।

এইসব প্রস্তাব মোটেই সুখাবহ নয় চয়নের কাছে। সর্বদাই তার একটা ত্রাস, বউদি বা দাদা যদি রেগে যায়? এ মেয়েটা ইদানীং প্রায়ই ছাদে আসে আড্ডা মারতে, মাঝে মাঝে ওদের ঘরে ডেকেও চা খাওয়ায়। ওদের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতাটা চয়ন বজায় রাখতে চায় না। বউদি হয়তো ভাল চোখে দেখছে না। সে চিলেকোঠায় উঠে আসায় এবং ঘরের ভাড়া বাবদ মাসে মাসে বউদিকে কিছু টাকা দিতে শুরু করায় সম্পর্কটা ভাল আছে। কতদিন থাকবে তা বলা কঠিন।

চয়ন একটু অস্বস্তির সঙ্গে বলে, কাল তো সময় হবে না। ছাত্রীর পরীক্ষা চলছে।

অনিন্দিতা গম্ভীর হয়ে বলে, আসলে আপনি আমাকে অ্যাভয়েড করতে চান।

তা নয়। বিশ্বাস করুন।

অনিন্দিতা বিশ্বাস করল না। একটু ম্লান হেসে বলল, এ যুগে এত লজ্জা সংকোচ আর ভয় থাকলে চলে না। ওসব ঝেড়ে না ফেললে বাঁচবেন কি করে?

চয়ন চুপ করে রইল।

অনিন্দিতা কি একটু সেজে এসেছে? ঘরের আলোর আভায় তাই যেন মনে হল চয়নের। চুল পরিপাটি করে বাঁধা, মুখে একটু পাউডার এবং হয়তো বা কাজলও। কপালে একটা বড় আর একটা ছোট টিপ। কে জানে কেন, ব্যাপারটা লক্ষ করে সে অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করল।

আসুন, একটু গল্প করি।

এ প্রস্তাবের মধ্যে প্রত্যাখ্যানের কিছু নেই। অনিচ্ছুক চয়ন তাই বাধ্য হয়ে রেলিঙের ধারে অনিন্দিতার পাশে দাঁড়াল। বেশ একটা সুগন্ধ আসছে অনিন্দিতার গা থেকে।

খুব দুঃখ পেলাম জানেন, একটু ইনসাল্টেড ফিল করছি।

তটস্থ হয়ে চয়ন বলল, কেন?

আপনি রিফিউজ করলেন বলে। ইচ্ছে করলেই যেতে পারতেন। কী এমন টিউশনি করেন শুনি! তারা তো আর মাথা কিনে নেয়নি।

চয়ন কি বলবে তা ভেবেই পেল না। সে কাউকে তোয়াজটাও করতে শেখেনি।

অনিন্দিতা একটু বিষণ্ণ গলায় বলল, আপনার কথা ভেবেই দুটো টিকিট চেয়েছিলাম। অবশ্য আপনার মতটা আগেই জেনে নেওয়া উচিত ছিল।

চয়ন মেয়েটাকে খুশি করতেই বলল, আচ্ছা, আর একদিন যাবো।

অনিন্দিতা মাথা নেড়ে বলে, আপনি যে কখনও যাবেন না তা আমি জানি। আপনার অনেক অজুহাত বেরোবে। আমি ভেবেছিলাম, আপনাকে তো কোনওদিন টিউশনি ছাড়া আর কিছু করতে দেখি না। বড্ড ড্রাই জীবন কাটাচ্ছেন। তাই ভাবলাম, একটা নাটক দেখাই আপনাকে। হয়তো ভাল লাগবে।

চয়ন এ কথায় যথেষ্ট কৃতজ্ঞ বোধ করল। একটা মেয়ের সঙ্গে থিয়েটার দেখতে যাওয়া দোষেরও কিছু নয়। কিন্তু এই ঘটনা থেকে নানা রকম ব্যাখ্যা বেরোতে পারে। ভয়ের সেইটাই।

একটা কথা বলবেন? আপনি সব ব্যাপারেই এত ভয় পান কেন?

আমি ভীষণ ভিতু।

থিয়েটারে যাওয়ার মধ্যে ভয়ের কী আছে? কেউ খারাপ ভাববে? আজকাল আর ওসব কেউ ভাবে নাকি?

সে কথা নয়।

অথচ আপনার কত ফ্রিডম দেখুন। একে তো আপনি পুরুষমানুষ। মেয়েদের তুলনায় পুরুষদের ফ্রিডম অনেক বেশী। আপনার মাথার ওপর কোনও গার্জিয়ান নেই, কেউ শাসন করবে না। এত ফ্রিডম থাকা সত্ত্বেও কেন যে লজ্জা সংকোচ ভয়ে এমন কুঁকড়ে থাকেন।

খুব নিঃশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল চয়ন। তারপর বলল, আমার জীবনটা ঠিক আর পাঁচজনের মতো স্বাভাবিক নয়।

অনিন্দিতা তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। বলল, কেন বলুন তো! আপনার এপিলেপসি আছে। বলে? ওটা তো অনেকের থাকে। তা বলে সব বিসর্জন দিয়ে বিধবার মতো থাকতে হবে নাকি?

চয়ন বিষণ্ণ নরম গলায় বলল, এই অসুখটা আমার মনের জোর নষ্ট করে দিয়েছে। সব সময়ে একটা অস্বস্তি থাকে মনে।

তাই নিজেকে গুটিয়ে রাখেন?

চয়ন মাথা নেড়ে বলল, তাই। হয়তো ওটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স।

অসুখের চিন্তা করেন কেন? এপিলেপসি একটা পাজি অসুখ। কিন্তু ফ্যাটাল তো নয়। আপনার কতদিন পর পর ওটা হয়?

তার কিছু ঠিক নেই। গত তিন মাস হয়নি। আবার হয়তো পর পর তিন চারদিন হবে। দিনে দু-তিনবারও হয়েছে। রাস্তাঘাটে বিপদে পড়তে হয় মাঝে মাঝে।

গত তিন মাস হয়নি বলছেন। এটা তো ভাল লক্ষণ। হয়তো সেরেই গেছে।

চয়ন হঠাৎ একটু যেন সচকিত হয়ে বলল, সারেনি।

কি করে বুঝলেন?

চয়ন হঠাৎ নাটকীয়ভাবে টের পেল তার চারদিকে একটা কুয়াশার ঘেরাটোপ তৈরি হচ্ছে। চোখে একটা অস্পষ্ট সিগন্যাল দেখতে পায় সে। কুয়াশা ভেদ করে একটা রেলগাড়ি ঝিকঝিক করে এগিয়ে আসছে। তার বুড়ো আঙুল কেঁপে উঠল হঠাৎ।

অস্ফুট গলায় চয়ন বলল, ওই যে!

কী ওই যে! কী হল আপনার?

প্লিজ! বলেই চয়ন দৌড়ে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে কোনওরকমে ছুঁড়ে দিল নিজেকে বিছানায়।

অনিন্দিতা ঘাবড়ে গেল না। দ্রুত পায়ে এসে তার কাছে দাঁড়াল। চয়নের হাত কাঁপছে। শরীর কাঁপছে। ধীরে ধীরে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে আঙুল। সে প্রাণপণে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করতে করতে বলল, কাউকে ডাকবেন না কিন্তু, প্লিজ!

অনিন্দিতা ঘরে রাখা ছোটো প্লাস্টিকের বালতিটা থেকে আঁজলায় জল তুলে নিয়ে চয়নের চোখে ঝাপটা দিল একবার। এটুকু চয়ন টের পেল। তারপরই তলিয়ে গেল তার নিজের ভিতরে এক অন্ধকারে।

যখন চোখ মেলল তখন তার বুক, মুখ, জামা সব জলে ভেজা। খুব শীত করছে। শরীর অসম্ভব দুর্বল। বিছানার পাশে অনিন্দিতা দাঁড়িয়ে, কিন্তু তাকে সে কয়েক সেকেন্ড চিনতেই পারল না।

কেমন লাগছে এখন?

চয়ন শুধু চেয়ে রইল। মাথা এত সাদা যে কথাটা ভাল করে বুঝতেই পারল না। জবাব দেওয়ার ভাষাটাও খুঁজে পেল না কিছুক্ষণ। অবোধ চোখে শুধু চেয়ে থাকল।

চয়নবাবু! কেমন লাগছে?

চয়নের মাথার অস্পষ্টতা সরছে। মনে পড়ছে। সৌজন্যবোধ তার বড়ই বেশী। মৃদু একটু হাসার চেষ্টা করে সে বলল, ভাল।

করুণা আর মায়ায় নরম হয়ে আছে অনিন্দিতার মুখখানা। ছলোছলে চোখে সে বলল, খুব কষ্ট হচ্ছে?

চয়ন তার ঠাণ্ডা দুর্বল শরীর আর ভারী মাথা নিয়ে পাথরের মতো শুয়ে থেকেও মৃদু একটু হেসে বলল, আমার অভ্যাস আছে। এ তো আমার পুরনো বন্ধু।

একটু দুধ এনে দিই? গরম দুধ?

চয়ন আত্মধিক্কার এবং নিজের ওপর ঘেন্নায় মুখখানা সামান্য বিকৃত করল। তারপর খুব মদস্বরে বলল, না। দুধ আমার সহ্য হয় না।

অনিন্দিতা তার মুখের ওপর একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, এ সময়ে দুধ খেতে হয়। আমি নিয়ে আসছি।

অনিন্দিতা চলে গেল। আবার আসবে। চয়ন তার ঘরের সিলিঙের দিকে চেয়ে চুপ করে শুয়ে থাকে। উঠবার সাধ্যই নেই এখন। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে সে উঠতে পারবে। কিন্তু শরীরটা অনেকক্ষণ দুর্বল আর অবশ থাকবে। অনেকক্ষণ ধরে তার শরীরের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বাজবে ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ। এই শরীর নিয়ে কি বাঁচা যায়?

হাঁ করে খুব বড় বড় শ্বাস নিচ্ছিল চয়ন। ভীষণ শীত করছে তার। গায়ের ভেজা জামাটা বদলানো দরকার। মুখ মাথা আর ভেজা বুক ভাল করে মোছা দরকার। খুব ধীরে ধীরে সে উঠবার চেষ্টা করল। এই চেষ্টাই তার যাবতীয় জীবনসংগ্রাম। লোকে কিছুতেই বুঝবে না, তার শুধুমাত্র বেঁচে থাকা আর শরীরটাকে টেনে শেষ অবধি নিয়ে যাওয়াটাই সবচেয়ে বড় কথা।

সে উঠে বসল। দেখল, জলের ঝাপটায় তার বালিশ আর বিছানাটাও অনেকটা ভিজে গেছে। চাদরটা পালটালে ভাল হয়। চৌকির নিচে একটা পুরনো সুটকেসে চাদর আছে। কিন্তু উবু হয়ে বসে সুটকেস খুলতে এই ছোট ঘরে যে কসরত করতে হয় তা করার সাধ্যই তার নেই। শুধু বালিশটা উল্টে দিল সে। এতেই আপাতত হবে। জামা বদলানো থেকে গা মোছা প্রত্যেকটা কাজই মনে হচ্ছে বেদম পরিশ্রমের ব্যাপার। তার বড় ঘুম পাচ্ছে। আজ রাতে রান্না বা খাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। কিন্তু অনিন্দিতা আসবে বলে সে ঘুমোতেও পারবে না এখন। অপেক্ষা করতেই হবে।

শুয়ে গায়ে কম্বলটা টেনে জেগে থাকার একটা অক্ষম চেষ্টা করছিল সে। কিন্তু অনিন্দিতা আসতে দেরি করছে। ঘুম তাকে টেনে নিল চুম্বকের মতো।

মাথায় হাতের স্পর্শে ফের জাগল চয়ন। পাশাপাশি অনিন্দিতা আর তার মা দাঁড়ানো।

অনিন্দিতার মা জিজ্ঞেস করল, ঘুমিয়ে পড়েছিলে বাবা? নাকি আবার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে?

চয়ন মৃদু হেসে উঠে বসবার চেষ্টা করতেই উনি বাধা দিয়ে বললেন, শুয়ে থাকো। উঠতে হবে না।

সে দুধ খায় না। কারণ দুধটুধ খাওয়ার কথা তার মনেও হয় না। তবে প্রতিবাদ করতে গেলে যে শক্তি ক্ষয় হবে তার চেয়ে বিনা প্রতিবাদে খেয়ে নিলে ধকলটা হবে কম। অনিন্দিতার হাতে কাচের গেলাসে দুধটা দেখে ভিতরের অনিচ্ছা চেপে সে ফের উঠতে গেল।

অনিন্দিতা বলল, উঠবেন না। হাঁ করুন, আমি খাইয়ে দিচ্ছি।

চয়ন হাঁ করে এক ঢোক দুধ খেল। সামান্য একটু ঝাঁঝ টের পেল সে।

অনিন্দিতা মৃদু স্বরে বলল, একটু ব্র্যান্ডি মেশানো আছে। তাতে দুর্বলতা কেটে যাবে।

দুধটা খাওয়ার পর সত্যিই তার শরীরটা একটু গরম হল। সে মৃদু স্বরে বলল, আপনাদের কষ্ট দিলাম। এত কিছুর দরকার ছিল না। খানিকটা ঘুমোলেই উইকনেসটা কেটে যায়।

অনিন্দিতার মা তার মাথার কাছটিতে একটু কষ্ট করেই বসলেন। বললেন, কষ্ট কিসের? এটুকু আবার কষ্ট নাকি? তোমাকে তো দেখার কেউ নেই। অসুখ নিয়ে পড়ে থাকো। তোমার তো দেখছি বড় কষ্ট।

এই সহানুভূতি চয়নকে একেবারে কাদামাটির মতো নরম করে ফেলে। সে কৃতজ্ঞ গলায় বলে, কষ্ট করাই যে আমার অভ্যাস। আমার কোনও অসুবিধে হয় না।

তার চারদিকে কত দয়ালু লোক। রাস্তায় ঘাটে কতবার অজ্ঞান হয়ে পড়েছে সে। প্রতিবারই। অচেনা মানুষেরা তাকে সেবা দিয়েছে। কেউ কেউ নিজের পয়সায় ট্যাক্সি ভাড়া করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে। সে তাই সকলের প্রতিই একটা বিশ্বজনীন কৃতজ্ঞতা বোধ করে।

অনিন্দিতার মা তার কপালে হাত রেখে বললেন, আমাদের পর ভেবো না বাবা, তোমার বয়সী আমার একটা ছেলেও তো থাকতে পারত!

এধরনের কথা চয়ন শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেই হয়তো পড়েছে। হয়তো এধরনের কথা বাংলা সিনেমাতেও ব্যবহৃত হয়। কথাটা অর্ধসত্য। ছেলের সঙ্গে ছেলের মতো মনে করেও একটা পার্থক্য থাকেই। পরত্বটা ঘুচতে চায় না। তবু চয়নের বড় ভাল লাগল কথাটা।

তুমি রাতে কী খাও বাবা? ভাত না রুটি?

চয়ন সসংকোচে বলে, ভাতই খাই। কেন জিজ্ঞেস করছেন?

আমি আজ তোমার জন্য ভাত রাঁধবো।

চয়ন খুবই বিব্রত হয়ে বলল, না না, আমি আজ আর কিছু খাবো না।

পাগল! তাই কি হয়? না খেলে আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। তুমি ভাল করে খাও না বলেই তো এরকম হয়।

চয়ন বড়ই অস্বস্তিতে পড়ে গেল। তার প্রতি এত সহানুভূতি, এই যত্নআত্তি কিছুই বউদির কাছে গোপন থাকবে না। ব্যাপারটা বউদি ভাল চোখে দেখবে না কিছুতেই। সে বউদিকে চেনে।

মাথা নেড়ে সে বলল, আমার আর খিদে নেই যে। দুধ খেয়ে পেট ভরে গেছে।

ও মা! খিদের জন্য তো গোটা রাত পড়ে আছে। এখন তো মোটে সাড়ে আটটা বাজে। অনিন্দিতা রইল এখানে, গল্পটল্প করো। সাড়ে নটায় খেও।

গোটা ঘটনাটা ঘটছে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। সে উদ্বেগে, অস্বস্তিতে কাঁটা হয়ে আছে। অথচ প্রতিরোধের কোনও ক্ষমতাও তার নেই।

অনিন্দিতার মা চলে যাওয়ার পর জায়গাটা নিল অনিন্দিতা নিজেই। বলল, ডাক্তার দেখাবেন?

চয়ন মৃদু হেসে বলে, অনেক দেখিয়েছি। এর তো কোনও চিকিৎসা নেই।

তা জানি। কিন্তু আপনার শরীরটা যদি এমনিতে ভাল হয়ে ওঠে তা হলে অ্যাটাকটা হয়তো কম হবে। আপনাকে এক ফাইল ভিটামিন ক্যাপসুল দেব, রোজ একটা করে খাবেন তো।

তার দরকার নেই।

অত সংকোচ করছেন কেন? আমাকে তো কিনতে হয় না। নার্সিংহোম-এ দেদার ফিজিসিয়ানস্ স্যাম্পল আসে। আমরা ফ্রি পাই।

ও, ভিটামিন খেলে কিছু হয়?

হয়। জীবন থেকে নিজেকে অত সরিয়ে রাখবেন না। নিজের ওপর বিশ্বাস এত কম কেন?

চয়ন চুপ করে রইল। ঘরে একটা ষাট পাওয়ারের বাল জ্বলছে। সেই আলোয় অনিন্দিতাকে তার এখন হঠাৎ দেবী বলে ভ্রম হচ্ছে। শোয়া অবস্থায় এই অ্যাঙ্গেল থেকে সে আগে তো কখনও অনিন্দিতাকে দেখেনি।

কী ভাবছেন?

চয়ন সলজ্জ একটু হেসে বলল, আপনারা আমার জন্য এত করছেন বলে আমার ভীষণ লজ্জা করছে। অভ্যাস নেই তো। যতদিন মা ছিল ততদিন—

কথাটা শেষ করতে পারল না চয়ন। মা যতদিন ছিল ততদিন কি সে মায়ের কাছ থেকে অনেক পেয়েছে? না। শেষদিকে মা তো কিছুই পারত না। শুধু শুয়ে থাকত। স্ট্রোকের পর তো সে মনে মনে চাইত, মা তাড়াতাড়ি মরে যাক। এত কষ্ট পাওয়ার চেয়ে সেটাই ভাল। তবু মা যে ছিল সেই থাকাটাই যেন অনেক ফাঁকফোকর, অনেক শূন্যতাকে ভরে রাখত। তখন টের পেত না চয়ন। এখন পায়।

মাকে খুব ভালবাসতেন বুঝি?

চয়ন বলল, সেটা বড় কথা নয়। মা ছাড়া আর কেউ তো ছিল না আমার।

আপনার এক দিদি আছেন না?

আছে। সংসার নিয়ে ব্যস্ত।

দাদা বউদিকে তো দেখছি। ছিঃ ছিঃ।

চয়ন সতর্কভাবে চুপ করে থাকে।

অনিন্দিতা তার মাথায় হাত রেখে নরম গলায় বলে, বাতিটা নিবিয়ে দেব? চোখে লাগছে না তো।

চয়ন আতঙ্কিত বোধ করে বলল, না না, থাক। আমার কোনও কষ্ট হচ্ছে না।

ও তাই তো! আপনার তো শুচিবায়ু আছে। ভুলেই গিয়েছিলাম।

বলেই হাসল অনিন্দিতা। সেই সুন্দর দাঁতের চমৎকার হাসি। মেয়েটা সুন্দরী নয়, কিন্তু ওই হাসিটা যেন অন্য জায়গা থেকে আসে। একটা শুকনো, শ্রীহীন মুখকে ক্ষণিক সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত করে দিয়ে কোথায় চলে যায়।

চয়ন লজ্জা পেয়ে চোখ বুজে ফেলে বলে, আপনি আমার সম্পর্কে খুব খারাপ ভাবেন, না?

ভাবলে কি বসে আছি এভাবে?

চয়ন করুণ গলায় বলল, আমাকে নিয়েই আমার যত সমস্যা। আর কেউ নয়, নিজেকে সামলাতেই আমার সমস্যা হয়।

তাই তো বলছিলাম, আপনার মনের জোর নেই।

তা তো নেই-ই।

কেন নেই?

কখনও ভেবে পাই না।

আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? কিছু মনে করবেন না?

না না, আমার মনে করার কিছুই নেই।

আপনার আর্নিং কত?

চয়ন একটু হাসল, তারপর একটু হিসেব করে বলল, হাজার দেড়েক হবে।

খুব খারাপ তো নয়!

না। তেমন খারাপ নয়।

তা হলে এখানে পড়ে আছেন কেন? একটা ছোট ঘর ভাড়া করলেই তো হয়।

চয়ন মাথা নেড়ে বলল, হয়। কিন্তু ইচ্ছে করে না। এখানে অনেকদিন ধরে আছি তো।

মায়ের স্মৃতি?

তাও হবে হয়তো। আর বউদিকে আমি সামান্য টাকাই তো দিই ভাড়া হিসেবে।

অনিন্দিতা হঠাৎ চোখ বিস্ফারিত করে বলে, ভাড়া দেন?

হঠাৎ চয়ন বুঝতে পারল, ভাড়ার কথাটা বলা তার ঠিক হয়নি। সে তাড়াতাড়ি বলল, বউদি বা দাদা ভাড়া চায়নি কখনও। আমি ইচ্ছে করেই দিই। বউদি নিতে চায়নি।

অনিন্দিতা অবাক হয়ে বলল, নেবেই বা কেন? নেওয়ার তো কথাই নয়।

প্লিজ! আপনি কথাটা ভুলে যান। কাউকে বলবেন না।

অনিন্দিতা আবার হাসল। তারপর বলল, অত ভিতু বলেই আপনার কিছু হয় না। এত ভয় পান কেন?

আমার সব কিছুকেই ভয়।

তার কপালে একটা হাত রেখে অনিন্দিতা বলল, ভাড়ার একটা রসিদ চেয়ে নেবেন এবার থেকে।

রসিদ! রসিদ দিয়ে কী হবে?

ওটা তো আপনার পাওনা।

চয়ন একটু হাসল। বলল, ওরকম সম্পর্ক তো নয়! আমি দাদার সংসারে একটু সাহায্য করি মাত্র।

অনিন্দিতা মাথাটা হেলিয়ে তাকে মায়াভরা চোখে একটু দেখে নিয়ে বলল, আপনি পারবেন না।

কী পারব না?

আপনি কোনও লড়াই জিততে পারবেন না। বড় বোকা।

এটা আদুরে গলায় বলা। চয়ন আদরটা টের পেল। খারাপ লাগল না। কিন্তু তার কেন যেন মনে হল, সে ছোট্ট একটা পোকার মতো একটা মাকড়সার জালের মধ্যবিন্দুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

অনিন্দিতা একটু বাদে নিচে গিয়ে তার জন্য ভাত নিয়ে এল। এবং আশ্চর্যের বিষয় ভাতের থালা দেখে চয়নের ভীষণ খিদে জেগে উঠল। চেটেপুটে খেল সে। রান্না চমৎকার।

অনিন্দিতা খুশি হয়ে বলে, এবার দরজা বন্ধ করে ঘুমোন।

ঘর অন্ধকার করে ঘুমোবার চেষ্টা করতে গিয়ে চয়ন টের পেল, তার মাথাটা গরম। কেমন একটা অস্থিরতা আর উদ্বেগ। অনিন্দিতা কি কিছু বলতে চাইছে? তাও কি সম্ভব? সে যুবক বটে, কিন্তু যুবকের মতো তো নয়।

৬৬

আমি নিশ্চয়ই একটা গুণ্ডার দল খুলব। যত অন্যায় আর অবিচার আছে আর হচ্ছে সব কিছুকে তন্দরুস্থ করতে হবে।

আপার এই ঘোষণা শুনে খুবই অবাক হয়ে গেল বুকা আর অভিজিৎ। বুবকা বলল, গুণ্ডার দল খুলবে? আপা, তোমার মাথাটাই গেছে।

আপা একটু উষ্মার সঙ্গে বলল, তোমাদেরও মাথা আমার মতোই খারাপ হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু তোমাদের কোনও ইনভলভমেন্ট নেই বলে হচ্ছে না। তোমরা আছ নিজের ধান্ধায়। নিজের উন্নতি, নিজের ভবিষ্যৎ। আমার মতো যদি দুনিয়াটাকে দেখতে তো বুঝতে।

তা বলে গুণ্ডার দল!

আমাদের পিছনের বস্তি থেকে একটা লোক তার বউ আর তিনটে বাচ্চাকে রেখে আর একজনের বউ নিয়ে পালিয়ে গেছে। সেই লোকটাকে আমি অন্তত দশ জায়গায় খুঁজেছি। তারপর ধরেছি গোবিন্দপুর বস্তিতে। লোকটা আমার চেনা, পাম্প আর পাইপ সারাত। নাম গোপাল। যখন ধরলাম তখন আমাকে তেড়ে এল, জানো? সঙ্গে আরও দশ-বারোটা নোক আর সেই ভেগে আসা মেয়েটা! আমাকে হয়তো মারধরও করত! কী গালাগাল!

অভিজিৎ অবাক হয়ে বলে, তুমি গেলে কেন? লোয়ার ক্লাসের লোকদের তো ওরকম কত হয়।

আপা অভিজিতের দিকে ভৎসনার চোখে চেয়ে বলল, লোয়ার ক্লাস বলে উপেক্ষা করলে চলবে? ওই লোকটার বউ ডলি আমাদের বাড়িতে এক সময়ে ঘরের কাজ করত। গোপাল পালিয়ে যাওয়ার পর তিনটে বাচ্চা নিয়ে ভীষণ বিপদে পড়েছে। দুবেলা খাওয়া জুটছে না।

অভিজিৎ বলল, তুমি পুলিশকে জানালে পারতে। ইটস্ এ কেস অফ বাইগ্যামি। পুলিশ যা করার করত।

তুমি বড্ডই ভাল ছেলে অভিজিৎ। বাইগ্যামি হল ভদ্রলোকদের টার্ম, নিচুতলার লোকদের কাছে ওসব শব্দ অচেনা। পুলিশের কথাও আর বলল না। আমাদের পাড়ার একটা ফ্ল্যাটবাড়ির পাম্পসেট চুরি গিয়েছিল। থানায় কি বলল জানো? বলল, কারা চুরি করেছে তা আমরা জানি, কিন্তু কিছুই করার নেই। করলেই এক ঘণ্টার মধ্যে পাঁচশো লোক এসে থানা ঘিরে ফেলবে। তাই আমি পুলিশের কাছে যাইনি। নিজেই গিয়েছিলাম, যদি লোকটাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করাতে পারি।

বুবকা বলল, অ্যান্ড ইউ ওয়্যার টট এ লেসন।

আপা একটু হেসে বলল, আমাকে অত সহজে শিক্ষা দেওয়া যায় বলে তুমি বিশ্বাস করো?

তা হলে তুমি এখন কী করবে?

আমি লোকটাকে জোর করে ধরে আনব। বউটাকেও। ওদের এরকম কাজ করার অধিকার নেই।

জোর করবে? তার জন্যই তোমার গুণ্ডা দরকার?

আপা মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ। তবে প্রফেশনাল গুণ্ডা নয়। তারা লোভী, অন্যায়কারী। আমার গুণ্ডারা হবে অন্যরকম। সমাজের ভালোর জন্য তারা সব করতে প্রস্তুত থাকবে। ঘাড় ধরে লোককে দিয়ে যেটা ভাল তা করিয়ে নেবে। কোনওভাবেই তাদের চরিত্র কেউ নষ্ট করতে পারবে না।

বুবকা খুব গম্ভীর গলায় বলল, আপা, তুমি যে একটু পাগল তা কি তুমি জানো?

জানি। আমার মতো পাগলই এখন দরকার। প্লিজ অনীশ, তুমিও একটু পাগল হও।

দেখ আপা, তোমার জন্য একবার আমিও পাগলামি করেছি। ড্রাগ পেডলাররা যখন তোমাকে অ্যাটাক করেছিল—তখন জীবনে আমি যা করিনি—তাও করেছি। একজনকে ধরে বেধড়ক ঠেঙিয়েছি। মনে আছে?

আছে। সেই জন্য আমি তোমাদের ওপর রেগেও গিয়েছিলাম। ওদের মারাটা আমার প্রোগ্রামে ছিল না। কাজটা মোটেই ভাল করনি।

অ্যান্ড ইউ আর নট ইভন গ্রেটফুল।

কেন হব? তোমাদের বলেছিলাম লোকগুলোকে চিনে রাখতে। তোমরা ওদের মেরে তাড়িয়ে দিলে। ওদের আর পাত্তাই পাওয়া গেল না।

তা হলে ওরা তোমাকে মেরে ফেললেই ভাল হত নাকি?

মারলে মারত। কত লোক তো রোজ কত কারণে মারা যাচ্ছে। ওটা কোনও ঘটনাই নয়। আমি চাইছি এসব জিনিসকে একদম উপড়ে ফেলতে। তার জন্য এখন আমার সত্যিই একটা গুণ্ডাবাহিনী দরকার।

অভিজিৎ ওয়েট লিটার। সে রীতিমতো ব্যায়াম করে এবং বিভিন্ন কম্পিটিশনে নামে। বিস্তর প্রাইজও পেয়েছে। সে বলল, আমি তোমার দলে নাম লেখাতে রাজি আছি। কিন্তু এটা তো জানো, এ যুগে শুধু গায়ের জোরে গুণ্ডামি চলে না, ইউ মাস্ট হ্যাভ আর্মস্। তোমাকে পিস্তল জোগাড় করতে হবে, সাব মেশিনগান, চপার।

আপা হতাশভাবে বলল, ওঃ! বুদ্ধ আর কাকে বলে। ওসব দরকার হয় মানুষকে মারার জন্য। আমি তো তা করব না। আমি শুধু ফোর্স করব। ফোর্স করে লোককে অন্যায় কাজ থেকে সরিয়ে আনব।

অভিজিৎ মাথা নেড়ে বলে, তুমি ইমপ্র্যাকটিক্যাল। শুধু ঘুষি দেখে আজকাল খুব কম লোকই ভয় পায়।

টিফিন পিরিয়ড চলছে। স্কুলের কম্পাউন্ডে অনেক ছেলেমেয়ে। তারা একটু তফাতে, একটা গাছের তলায় বসে।

আপা ঠোঁট উল্টে বলে, যাদের হাতে আর্মস থাকে তাদের কিন্তু নৈতিক জোর থাকে না।

তার মানে?

আপা একটু হেসে বলে, তোমরা আমাকে পাগল বলো। তা আমি একটু তো পাগলই। আমার মনে হয় মানুষ যখন হাতে কোনও মারণাস্ত্র পায় তখন তার নৈতিক সাহস আর দৃঢ়তা খানিকটা চলে যায়। ওই অস্ত্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে সে। অস্ত্রটা ব্যবহারের একটা অজুহাত খোঁজে সে।

বুবকা হেসে বলে, ওঃ, ইউ আর রিয়েলি ইমপসিবল্।

আপা করুণাভরে বুকার দিকে চেয়ে বলে, শোনো বুদ্ধ, আমি যে গুণ্ডাদের কথা বলছি তাদের। সবচেয়ে বড় অস্ত্র হবে নৈতিক চরিত্র আর ব্যক্তিত্ব। সেটাই মানুষের সবচেয়ে বড় অস্ত্র।

ওসব কথা বইতে লেখা থাকে আপা। প্র্যাকটিক্যাল কথা ওটা নয়। আজকাল মর‍্যাল কারেজের কোনও দামই নেই। একটা বোমা মেরে সব কারেজ-ফারেজ উড়িয়ে দেবে।

দিক না। একবার দু'বার পাঁচবার দেবে। তারপর দেখো, চাকা ঘুরে যাবে উল্টোদিকে। মানুষের হাতে বরাবরই তো অস্ত্র ছিল, তাই বলে কি সাহসী লোকেরা নিরস্ত্র অবস্থায় ভাল কাজ করেনি কখনও?

যুগ পাল্টে গেছে আপা।

যুগ আবার পাল্টে দেওয়া যায়।

বুবকা বলল, তোমার নিরামিষ গুণ্ডার দলে আমি নেই আপা।

তোমাকে আমি আমার তালিকার বাইরেই রেখেছি বুবকা।

বুবকা হেসে ফেলল, তোমার কি লিস্ট তৈরি হয়ে গেছে?

আপা হাসল না। গভীর হয়ে বলল, হচ্ছে।

কী করবে তারা? মারপিট?

দরকার হলে করবে। কিন্তু মারপিটের চেয়েও বড় কথা, দেশে যে সব অন্যায়, পাপ আর খারাপ ঘটনা ঘটছে তার একটা ছক আছে। ইংরিজিতে যাকে বলে প্যাটার্ন।

ইউ মিন নকশা?

হ্যাঁ। এই নকশাটাকে ধরাই সবচেয়ে বেশী দরকার। মানুষ তো যা খুশি করছে। কেন করছে তা না জানলে কিছু করা যাবে না। এই যে গোপালের কথা বলোম, এ কোন সাহসে এরকম কাজ করল? এর পিছনেও একটা নকশা আছে। ও জানে, এরকম একটা অন্যায় করলেও কিছু হবে না। ওর বউ কয়েক দিন কান্নাকাটি করবে, দু-চার দিন হয়তো ওকে একটু বকাঝকা করবে। তারপর মেনে নেবে। তাই না?

বুবকা গম্ভীর হয়ে বলে, এটা হল একটা পারমিসিভনেস। তুমি এটাকে আটকাতেও পারবে না। আপার ক্লাসেও কি ওরকম হয় না? কত ডিভোর্স হচ্ছে।

সেটা হোক। কিন্তু বউটার মাসোহারা গোপালের কাছ থেকে আদায় করে দাও তা হলে। উঁচু সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ হলে মাসোহারার ব্যবস্থা থাকে।

বুবকা মাথা নেড়ে বলে, তুমি বেসরকারি গোয়েন্দা আর সৈন্যবাহিনী গড়তে চাইছ কেন? ওকে পুলিশে ধরিয়ে দাও।

চেষ্টা করেছি। হয়নি। আইনে অনেক ফাঁক থাকে অনীশ। সেই ফাঁক দিয়ে অপরাধীরা গলে যায়। তুমি কি জানো শতকরা সত্তর-আশিটা রেপ কেস-এ আসামীর কোনও সাজা হয় না?

আমি অত জানি না।

আমি জানি। পুলিশ কেস সাজায় না, সাক্ষীরা ঠিকমতো সাক্ষী দেয় না, আরও নানারকম ব্যাপার আছে। আইনের ফাঁক দিয়ে যেসব অপরাধী বেরিয়ে আসবে আমার গুণ্ডারা তাকেও ধরবে।

ধরে কি করবে আপা?

তাকে দিয়ে অপরাধ স্কুল করাবে, ক্ষতিপূরণ আদায় করবে, কৃতকর্মের জন্য তাকে অনুতপ্ত হতেই হবে।

তুমি একটা প্যারালাল গভর্নমেন্ট তৈরি করতে চাও?

ঠিক তাই চাই।

বুবকা আর অভিজিৎ হাসল।

অভিজিৎ বলল, আইডিয়া ইজ গুড।

বুবকা বলে, বাট ইমপ্র্যাক্টিকেবল্। আপা রবিন হুড হতে চাইছে।

অভিজিৎ বলে, চম্বলের ডাকাতরাও নাকি এরকম সব কী করত। কমন লোকাল পিপল লাইকড্ দেম।

আপা বিরক্তির সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, ডাকাতের কথা উঠছে কেন?

প্ল্যানটা অনেকটা ওরকম বলেই।

তোমরা আমাকে সমর্থন করছে না তা হলে?

অভিজিৎ বলে, করছি।

বুবকা মাথা নেড়ে বলে, আমি করছি না।

টিফিন শেষ হওয়ায় ক্লাসে ফিরে যেতে হল তাদের। কিন্তু বুবকার মাথায় সারাক্ষণ আপার অদ্ভুত প্ল্যানটা ঘুরতে লাগল। আপা গুণ্ডাবাহিনী তৈরি করতে চায়, এটা কোনও অদ্ভুত কল্পনা নয়। আপা হয়তো ওরকম কিছু একটা করবেও।

রাত্রিবেলা সে তার সবচেয়ে প্রিয় ও বিশ্বস্ত বন্ধু তার বাবাকে কথাটা বলে ফেলল, জানো বাবা, আপা একটা গুণ্ডার দল তৈরি করছে!

গুণ্ডার দল! বলিস কী?

এরা সব ডু-গুডার গুণ্ডা। সোস্যাল ইনজাসটিস আর করাপশনের এগেনস্টে লড়বে। শী ইজ অলরেডি ডুয়িং ইট। রিক্রুটমেন্ট শুরু হয়ে গেছে। অভিজিৎ পাণ্ডা আজ আপার গুণ্ডার দলে জয়েন করেছে।

মণীশ একটু হাসল, আইডিয়াটা খারাপ নয়। কী করতে চায় আপা?

বললাম তো, সব অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চায়।

তোকে রিক্রুট করেনি?

না, আমি বললাম, আমি ওসব পাগলামিতে নেই।

আপাকে বলিস ওর লিস্টে যেন আমার নামটা ঢুকিয়ে নেয়।

বুবকা অবাক হয়ে বলে, তুমি! তুমি আপার দলে জয়েন করবে?

আমার অনেক দিনের ইচ্ছে, পৃথিবীতে যত গুণ্ডামি আর শয়তানি হয় তার বিরুদ্ধে আর একটা গুণ্ডামি গড়ে তুলতে।

তুমি আপাকে সাপোর্ট করছ বাবা?

খুব। হাড্রেড পারসেন্ট।

বুবকা খুব হাসল। বলল, আইডিয়াটা আমারও খুব খারাপ লাগছিল না। কিন্তু ও বলছে, ওর গুণ্ডাদের কাছে আর্মস্ থাকবে না। শুধু মর‍্যাল ক্যারেকটার আর কারেজ।

আপা হয়তো একটু গান্ধীবাদী। কিংবা হয়তো ভাবে আর্মস্ হাতে পেলে এইসব ধর্মগুণ্ডারা আসল গুণ্ডা হয়ে যাবে।

আপা আরও গোলমেলে কথা বলছে। ওর ধারণা, আর্মস্ পেলে মানুষের নাকি মর‍্যাল ক্যারেকটার নষ্ট হয়ে যায়।

মণীশ হাসল, আর্মসের সঙ্গে লড়তে হলে আর্মও দরকার। অন্তত প্রাথমিকভাবে। তারপর অস্ত্র সংবরণ করা যেতে পারে।

বুবকা একটু চিন্তিত হল। বলল, হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার আগে আপা এসব করে বেড়াচ্ছে, পড়ছে না। কিন্তু পরীক্ষায় দেখো, সবাইকে বিট করবে। এটা আপা কিভাবে পারে বাবা?

শী ইজ সারহ্যাপস্ এ জিনিয়াস!

আমার ধারণা কী জানো? আপা হায়ার সেকেন্ডারিতে ইচ্ছে করলেই ফাস্টও হতে পারে। কিন্তু পড়েই না। কেবল সোস্যাল ওয়ার্ক করে বেড়াচ্ছে। আমরা ক্যারিয়ারিস্ট বলে ঠাট্টাও করে।

মণীশ বলল, সেটাও হয়তো ওর দিক থেকে ঠিকই করে। কিন্তু তা বলে তুই আবার ক্যারিয়ারের চিন্তা ত্যাগ করিস না। সেটা ঠিক হবে না।

বুবকার ঘুম সাঙ্ঘাতিক। বালিশে মাথা রাখলেই ঘুমিয়ে পড়ে। আজ রাতে ঘুম আসতে পনেরো মিনিট সময় লাগল। কারণ, ওই সময়টায় সে আপার কথা ভাবল। আপা কি ঠিক বলছে? আর সে নিজে কি মস্ত ভুল করছে জীবনে? তার কি ক্যারিয়ারিস্ট হওয়া উচিত নয়? তার কি দরকার আরও সোস্যাল ইনভলভমেন্ট?

পরদিন সে আপাকে ফের ধরল টিফিন পিরিয়ডে, এই যে লেডি রবিন হুড!

আপা তার দিকে তাকিয়ে বলল, বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরানী পড়নি অনীশ! কী বোকা তুমি! আমাকে দেবী চৌধুরানীও তো বলতে পারতে।

অনীশ দেবী চৌধুরানী পড়েনি। বইটার নাম অবশ্য শুনেছে। সে লজ্জা পেল। আপাকে ঘিরে এক গাদা ছেলেমেয়ে দাঁড়ানো। তাদের যেন কী একটা বোঝাচ্ছিল আপা। সবাই আপার কথা মন দিয়ে শুনছিল। পাগলী আপার কথা যতই অসম্ভব হোক, সবাই শোনে। এমন কি মিসরা পর্যন্ত।

বুবকা বলল, বাবা তোমাকে সাপোর্ট করেছে, জানো তো!

কাকাবাবু সমঝদার মানুষ, তোমার মতো নয়।

ইট সিমস্ সো। এমন কি, বাবা তোমার গ্রুপে নামও লেখাতে চেয়েছে। হি ওয়ান্টস্ টু জয়েন ইওর গ্রুপ অফ থাগস্।

আপা হাসল, কাকাবাবু খুব ভাল লোক। বলল, আমি তাঁর নাম টুকে নিয়েছি।

ছুটির পর আজ আপার সঙ্গেই বেরলো বুবকা। আর কেউ ছিল না সঙ্গে।

বুবকা বলল, তুমি কোথায় থামবে আপা? ইউ আর লিডিং এ ডেনজারাস লাইফ।

আমার বাঁধা জীবনে বিশ্বাস নেই অনীশ। আমি ওরকম ভাবে বেঁচে থাকতেও পারব না। তা বলে ভেবো না আমি হিংস্রতা পছন্দ করি বা মারধর খেতে ভালবাসি।

তুমি একটি রোগা দুর্বল মেয়ে। তুমি ঠিক বিপদে পড়বে।

বোকারাম, দুর্বল আর রোগা আর মেয়ে এই তিনটে কোনও শর্তই নয়। জোর কি শুধু গায়ের? এই যে অভিজিৎ বা অরোরা, ওদের গায়ে তো অনেক জোর। তা বলে কি ওরা সবাইকে হারিয়ে দিতে পারবে? না কি পারবে সমাজব্যবস্থা পাল্টে দিতে? মনের জোরই হল আসল জোর। আমি তো শরীরের শক্তির ওপর ভরসা করিনি।

বুবকা বিবর্ণ মুখে বলল, আই অ্যাডমিট দ্যাট। তোমার খুব সাহস। কিন্তু ইউ আর লিভিং এ ডেনজারাস লাইফ আপা। কেউ কেউ তোমার ওপর রেগে যাচ্ছে নিশ্চয়ই।

আমি জানি। আমার যেমন অনেক শত্রু আছে, তেমন আবার অনেক বন্ধুও আছে।

বন্ধুরা কি তোমাকে সবসময়ে বাঁচাতে পারবে?

আপা অবাক হয়ে বলে, বাঁচাবে! বাঁচাবে কি করে, তারা তো সবসময়ে আমার সঙ্গে থাকে না। বাঁচানোর দরকারই নেই। আমি যা করতে চাইছি সেটা তারা বুঝতে পারলে আর সমর্থন করলেই যথেষ্ট।

তুমি এই বয়সে এত পাকা হলে কি করে?

আপা হাসল। বলল, আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর। মনে আছে?

বুবকা অবাক হয়ে বলে, তোমারও মনে আছে?

তোমার আঠারো বছর বয়স পেরিয়ে গেল অনীশ, কিন্তু তুমি তো ভয়ংকর হতে পারলে না! কাকাবাবু মিথ্যেই চিন্তা করলেন।

ভয়ংকর হব আপা? সেটা কিভাবে হওয়া যায়? আমি তো পোয়েট্রিটা কখনও পড়িনি।

কেন পড়নি?

কোথায় পাব?

আপা হাসল, থাকগে, তোমার ওসব পড়ার দরকারও নেই।

তার মানে আমাকে তুমি পাত্তাই দিচ্ছ না?

আপা হাসল। বলল, হি-ম্যান-এর মতো চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়ালে আর পরীক্ষায় গাদা গাদা নম্বর পেলেই কি পাত্তা পাওয়া যায়? তোমার গায়ে কতটা জোর বা লেখাপড়ায় তুমি কতটা ভাল তা নিয়ে দুনিয়ার মানুষের তো মাথাব্যথা নেই।

তা হলে কী করব? ভয়ংকর কিভাবে হওয়া যায়?

তোমাকে কেউ ভয়ংকর হতে তো বলেনি। বলেছে, আঠারো বছর বয়সটাই ভয়ংকর। এই বয়সে এসে মানুষ সব কিছু ভাঙচুর তছনছ করে দেয়। এই বয়সে যুবক-যুবতীদের বাঁধ ভাঙার সময়।

আমি ওসব একদম বুঝি না আপা।

অথচ কবিতাটা তোমাকে এক সময়ে খুব ভাবিয়ে তুলেছিল।

বুবকা একটু হাসল, কবিতাটা আমাকে একবার পড়াবে?

পড়াব। এখন বাড়ি যাও, ভাল ছেলে।

শেষ কথাটা বোধ হয় অপমান। আপা তাকে মাঝে মাঝে মৃদু অপমান করে। করতেই পারে। বুবকা এখনও কত কী জানে না, কত কিছুর খবর রাখে না। এমন কি দক্ষিণ ভারতীয় আপার কাছে বাংলা নলেজেও সে কত পিছিয়ে আছে!

সন্ধেবেলা আজ মাকে বাড়িতে একা পেল বুবক। বাবা ফেরেনি। দিদি বা অনুও নেই।

খাওয়ার টেবিলে বসে পায়েস দিয়ে লুচি খেতে খেতে বুবকা বলল, আচ্ছা মা, তোমরা আমাকে অ্যাডাল্ট হতে দিচ্ছ না কেন বলল তো!

অপর্ণা একটু অবাক হয়ে বলে, ও মা! সে কি কথা?

কথাটা কি ঠিক নয়?

তোকে অ্যাডাল্ট হতে দেব না কেন?

তোমরা যে আমার ওপর অনেক রেস্ট্রিকশন চাপাও, এটা করিস না, ওটা করিস না, এর সঙ্গে মিশিস না।

আহা, ছেলের ভালোর জন্য সব মা-বাবাই বলে। তাতে তোর অ্যাডাল্ট হওয়া আটকাচ্ছে কিসে?

আপাকে তার বাড়ি থেকে অনেক ফ্রিডম দেয়, তা জানো?

আপা! ওই তোদের সকলের মাথাটা খাচ্ছে। এবার আসুক, খুব বকব। কী বলছে আপা এখন শুনি!

শুনলে তুমি রেগে যাবে।

তবু শুনব।

আচ্ছা মা, আমি তো কখনও দুষ্টু ছেলে ছিলাম না, না?

না। দুষ্টু কেন হতে যাবি?

আমি খুব ভাল ছেলে?

অপর্ণা হাসল, ভালই তো। খুব ভাল।

কেন আমি ভাল ছেলে মা? কেন দুষ্টু নই?

এসব আজ কী বলছিস? কী পোকা ঢুকেছে মাথায়?

ভাল ছেলেগুলো ভীষণ ভ্যাতভ্যাতে টাইপের হয়, না মা?

কে বলল ও কথা?

ভাল ছেলেরা খুব আন-ইন্টারেস্টিংও।

তোকে বলেছে!

দেখ মা, সেই ছোট্টো বেলা থেকে আমি ভীষণ শান্ত, সব কথা শুনে চলি, পড়াশুনো করি, ভাল নম্বর পাই, জিনিসপত্র ভাঙি না, মারপিট করি না। সব সময়ে গুড বুক-এ আছি।

ডানপিটে হওয়া কি খুব ভাল নাকি? তোর বাবা অবশ্য খুব ডানপিটে ছিল। খুব সাহসীও। বিয়ের পরও মারপিট করেছে।

ওয়াজ হি ইন্টারেস্টিং?

অপর্ণার চোখে একটু রোমান্টিক ছায়া পড়ল। সামান্য হাসল সে। বলল, সবাই কি একই রকম হবে?

আমি বাবার মতো হলে কেমন হত?

তুই তোর মতো হয়েছিস।

বুবকা মাথা নেড়ে বলে, না মা, আই অ্যাম নট হ্যাপি উইথ মিসেলফ্। আমার নিজেকে ভাল লাগছে না। একদম ভাল লাগছে না।

৬৭

হেমাঙ্গর দাড়ি ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। গোঁফের আড়ালে ঢেকে যাচ্ছে ঠোঁট। মুখময় দাড়ির একটা রাগী ও সতেজ প্রকাশ। কিন্তু দাড়ি-গোঁফে কিছুই ঢাকতে পারে না হেমাঙ্গ। ঢাকা পড়ে না তার বিষাদ, তার নিঃসঙ্গতা। কাজটা কিরকম হল? হতে পারত। অথচ হল না। রশ্মি আর কয়েকদিনের মধ্যেই চলে যাবে ইংলন্ডে। ভীষণ ব্যস্ত সে। এবার তার পাকাপাকি যাওয়া।

বিচ্ছেদটা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না হেমাঙ্গ। সে রশ্মিকে প্রত্যাখ্যান করেনি। সেই সাধ্যই ছিল না তার। সে প্রত্যাখ্যান করেছিল স্থায়ী বিলাত-বাসকে। রশ্মিকে বলেছিল, আমি পারব না রশ্মি। আমি বড় হোম-সিক, এই দেশে, এই কলকাতায় আমার বড় মায়া। আমি পারব না।

রশ্মি নরম প্রকৃতির মেয়ে, কিন্তু ভাবপ্রবণ নয়, তার আবেগও তাই বেশি নয়। একটু ভেবে বলেছিল, আমি তা জানি হেমাঙ্গ। মানুষকে ট্রানস্প্ল্যান্ট করা বেশ কঠিন, যদি তার নস্টালজিয়া স্ট্রং হয়। আমি হয়তো স্বার্থপরের মতো তোমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। যাকগে।

হেমাঙ্গ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করেছে, তাহলে?

রশ্মি একটু সাদা, একটু উদ্‌ভ্রান্ত মুখে বলেছিল, তুমি ভেব না, আমি এটা সয়ে নেবো।

আমি কি তোমাকে অপমান করছি রশ্মি? আমি— আমি সত্যিই তোমাকে এত ভালবাসি, থাকতেই পারব না।

রশ্মি কিছুক্ষণ তার বিষাদমাখা মুখখানা আকাশের দিকে তুলে রেখেছিল। নৌকো দুলছিল। ঢেউ ভাঙার গভীর শব্দ হচ্ছিল নৌকোর গায়ে। রশ্মি চোখ নামিয়ে বলেছিল, আমাকে তুমি এ দেশে থাকতে বলছো?

প্লিজ, রশ্মি! প্লিজ। থাকো।

রশ্মি দাঁতে ঠোঁট চেপে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, দেখ হেমাঙ্গ, শুধু বিয়ের জন্য যদি থাকি সেটা আমাকে আর তোমাকে পরে যন্ত্রণা দেবে। কোনও সময় হয়তো মনে হবে, আমরা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমার এখনও অনেক কাজ পড়ে আছে ওখানে। এ দেশে কিছু হওয়ার নয়, তুমিও তো জানো।

খানিকটা জানি। কিন্তু কেন তুমি ফিরে আসবে না?

ফিরে আসব না, বলিনি। কিন্তু ততদিনে হয়তো বয়স থাকবে না, মনটা অন্যরকম হয়ে যাবে। বাঁধাবাঁধির দরকার কি বলো? মা-বাবা এবার চেয়েছিলেন আমি বিয়ে করে স্বামীর সঙ্গে বিলেত যাই। সেটা সম্ভব হত,

তুমি রাজি থাকলে। তুমি যেতে চাইলে না, আমাকে একাই যেতে হবে। কিন্তু তোমাকে কেন কতগুলো কন্ডিশনে বেঁধে যাবো? সহ্য করা কঠিন হবে, কিন্তু তবু কন্ডিশন না থাকাই ভাল।

কেন ভাল?

রশ্মি খুব গম্ভীর মুখ করে বলল, এটা তো সেই আগের যুগ নয়, হৃদয়ের ব্যাপারটা নিয়ে যখন বাড়াবাড়ি হত। এখন আরও কত দিক আছে জীবনের।

যদি আমি অপেক্ষা করি?

কেন করবে?

তুমি রাগ করেছে রশ্মি?

রশ্মি মাথা নেড়ে বলে, রাগ নয়, অভিমান নয়, অপমানও নয়। আমার বরং একটু একা লাগছে। তুমি কেন যেতে চাও না, তা আমি বুঝেছি। আমি ইনকনসিডারেট নই।

শোনো রশ্মি, আমার বিয়ে করার কোনও ইচ্ছেই ছিল না। তোমাকে দেখে সেটা হয়েছিল। কিন্তু আর নয়। এবার আমি একাই থাকব। অপেক্ষা করব।

রশ্মি একটু চুপ করে থেকে বলল, নিজেকে মুক্ত রাখো হেমাঙ্গ। ওরকম শর্ত নিয়ে থেকো না। আমরা অ্যাডোলেসেন্স-এর সময়টা পার হয়ে এসেছি। তাই না?

হেমাঙ্গ চুপ করে থাকে।

রশ্মি খুব নরম করে বলে, এ-দেশে কেউই কেন যে সময়মতো অ্যাডাল্ট হয় না, বহুদিন অবধি ছেলেমানুষ থেকে যায়! তুমিও ছেলেমানুষ।

হেমাঙ্গ মাথা নেড়ে বলে, তা নয় রশ্মি। আমি হয়তো একটু আবেগপ্রবণ। কিন্তু তোমাকে যে মনেপ্রাণে চাই।

রশ্মি তার দিকে একটু মায়াভরে চেয়ে থেকে বলেছে, আমিও তো তোমাকে চাই। কিন্তু আমি অন্য সব ব্যাপারগুলোকেও উপেক্ষা করতে পারি না। সেন্টিমেন্টাল হলে কি লাভ বলো! বিয়ের পরই পুরুষ আর মহিলাদের প্রেম একটু একটু করে নেমে আসে। দেখছে না, জোয়ারের জল সরে গেলে কেমন থিক থিক করে কাদা।

যাঃ, কী বিচ্ছিরি উপমা!

রশ্মি হাসল না, গম্ভীর মুখেই বলল, বিয়ের পর হয়তো আমাদের নানারকম ক্যালকুলেশন আসত। তার চেয়ে বরং লেট আস কুইট অ্যাজ ফ্রেন্ডস্।

যেরকম সাহেবদের দেশে হয়?

সাহেবরা খারাপ লোক নয় হেমাঙ্গ। অনেক প্র্যাকটিক্যাল যে।

এইভাবেই এক দেশী নৌকোয় দোল খেতে খেতে মাঝদরিয়ায় তাদের সম্পর্ক শেষ হল।

আবার হলও না। হেমাঙ্গর কোনও কাজে মন নেই। পার্টনারদের হাতে অফিস ছেড়ে দিয়ে সে এই শীতে চলে গেল রানিক্ষেত। সেখানে চুপচাপ হোটেলে বসে রইল কিছুদিন। তাতে শান্ত হল না। ফিরে এল।

কিন্তু নদীর ধারের কুটিরটি তাকে আকর্ষণ করতে লাগল ভীষণভাবে। টানা প্রায় একমাস হেমাঙ্গ রয়েছে এখানে। ঘুরে বেড়ায়, নৌকোয় চেপে বেড়িয়ে পড়ে, বইয়ে ডুব দিয়ে বসে থাকে। কেউ তার খোঁজ করে না।

সে বাড়িতে জানিয়েই এসেছে।

বাঁকা মিঞা রোজ হাজিরা দেয়। টেনে নিয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে দাওয়াত খাওয়ায়।

হেমাঙ্গর কাছে পৃথিবীটা অনেকটাই বিবর্ণ এবং জীবন অর্থহীন হয়ে গেছে। সেটা প্রেমের চেয়েও বেশি পাপবোধে। সে কি আঘাত করল রশ্মিকে? সে কি ভুল করল ওর প্রস্তাবে রাজি না হয়ে?

আজকাল নিজের বিছানায় একটানা অনেকক্ষণ ধ্যানস্থের মতো বসে থাকে সে। বাইরেটা স্থির, কিন্তু মনের মধ্যে ঝড়ের বাতাস বয়ে যায়।

বাঁকা মিঞা এক সকালে এসে তাকে ধরল, কী হয়েছে বলুন তো! না বললে ছাড়ছি না। আমার তো ভয় হচ্ছে, মনে কথা চেপে রাখতে রাখতে আপনি না পাগল হয়ে যান।

হেমাঙ্গ একটু হেসে বলে, পাগল বলেই ধরে নাও না কেন?

ধরে নিলেই হল নাকি? আমরা চাষাভুষো যাই হই, তবু অনেকটা পথ তো পার হয়েছি জীবনে। বোকা নই। একটু খুলে বলুন তো। খুন-খারাপি তো করে আসেননি। ব্যাপারটা কী?

এক রকম খুনই।

এই তো হেঁয়ালি হয়ে যাচ্ছে!

হেঁয়ালি একটু রাখতে হচ্ছে। সব কথা খুলে বলা যায় না।

বাঁকা মিঞা একটু লজ্জা-লজ্জা ভাব করে বলে, সেই বিয়ের ব্যাপারটা নাকি?

হেমাঙ্গ মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

জিজ্ঞেস করতে লজ্জা হয়। তবু বলি, ব্যাপারটা কেঁচিয়ে দিলেন কেন? মেয়েটা দেখতে তো পরীর মতো। তার ওপর কত লেখাপড়া জানে। অবশ্য আমাদের মতো গেরস্তর ঘরে ওসব মেয়ে অচল। কিন্তু আপনার তো তা নয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হেমাঙ্গ বলল, ঠিকই বলেছো। বড় ভাল মেয়ে। অত ভাল আমার সইল না।

তাই ঘরে বসে বসে কেবল বড় বড় শ্বাস ছাড়ছেন? আপনার মতো ছেলের কি মেয়ের অভাব হবে?

তা নয় বাঁকা, মনটা খারাপ।

এখন উঠুন তো। চলুন একটু ঘুরেটুরে আসবেন।

আমার যে একটু চুপচাপ থাকতে ইচ্ছে করছে। নড়তে চড়তে ভালই লাগছে না।

পাগল নাকি? শরীর বসিয়ে রাখলে নানা আধিব্যাধি হয়। মনটাও একটু ফুর্তিতে রাখা দরকার।

কোথায় যাবো?

চলুন আজ গোসাবার দিকে যাওয়া যাক। একটা মোচ্ছব আছে। কীর্তন-টির্তন হবে। বড় গানাদাররা আসছে।

হই-চই ভাল লাগবে না বাঁকা। বরং জঙ্গলের দিকে যাই চলো।

তাই চলুন।

গেল হেমাঙ্গ, নৌকোয় করে নদী আর খাল ধরে বিস্তর ঘুরল। বাঘা-জঙ্গলের ধারেকাছেও ঘোরাফেরা হল। কিন্তু মনের মেঘ কাটল না। এত বিবর্ণ এত নিস্তেজ তার কখনও লাগেনি চারপাশটাকে। তবু এ জায়গা বলে রক্ষা। কলকাতা হলে সে পাগল হয়ে যাবে বোধহয়।

অনেক রাত অবধি বাঁকা আজ রইল তার কাছে। বেশি কথা বলল না। তবে একবার বলল, বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়।

হেমাঙ্গ জবাব দিল না। নদীর ঢেউ আর বাতাসের শব্দ শোনে। একঘেয়ে, একটানা, ছেদহীন। ধ্যানস্থের মতো বসে থাকে। রুজি-রোজগার, উন্নতি, সাফল্য, প্রতিষ্ঠা সব বৃথা মনে হয়। বেঁচে থাকাটাও কত দুর্বহ, কত অর্থহীন!

বাবু, মেয়েটাকে কি আপনার খুব পছন্দ ছিল?

হেমাঙ্গ একটু হাসল, অপছন্দের কিছু আছে?

তবে হল না কেন?

সে অনেক কথা বাঁকা।

কথা বলে খোলসা হচ্ছেন না কেন? বাঁকা মিঞা তো পাঁচকান করবে না।

হেমাঙ্গ আবার একটু হাসল, তুমি সাদা লোক। কিন্তু দুষ্টুবুদ্ধিতে কিছু কম নও। চারদিকে খবর দিয়ে আনিয়েছিলে।

সে আপনার অবস্থা দেখে। এখন তো অবস্থা আরও খারাপ দেখছি।

হেমাঙ্গ মাথা নেড়ে বলে, এ সমস্যার সমাধান বাইরের কেউ করতে পারবে না বাঁকা।

তা হলে আপনিই করুন না কেন?

কী করব?

একটা ভাল দেখে বিয়ে করে ফেলুন।

হেমাঙ্গ হাসিমুখে বাঁকার দিকে চেয়ে রইল। বাঁকার কোনও হৃদয়ঘটিত সমস্যা হয়নি কখনও। হবেও না। বাঁকা সব সমস্যার সহজ সমাধান করে ফেলতে পারে। হেমাঙ্গ পারে না। দুজনের এই ব্যবধানটাকে সে কিছুক্ষণ মেপে দেখতে চেষ্টা করল।

বাঁকাও তার দিকে চেয়ে ছিল। বলল, মেয়েমানুষ নিয়ে অত ভাববার কী আছে? আমরা তো অত ভাবিটাবি না।

হেমাঙ্গ মাথা নেড়ে বলে, তা নয় বাঁকা, মেয়েটার বোধহয় অপমান হল।

বাঁকা একটু শব্দ করেই হাসল, তাহলে বিয়েটা করলেই তো পারতেন। আপনি নিজেই তো গিঁট পাকিয়ে তুলছেন। সেইজন্যই তো ভাবনা।

তুমি বুঝবে না বাঁকা। আমার মনটা বড় খারাপ।

কাল রাতে একটা যাত্রা দেখতে যাবেন? নতুন দল। বনগাঁ থেকে এসেছে।

হেমাঙ্গ মাথা নাড়ল, ইচ্ছে করে না যে!

দেখুন না, ভালও লেগে যেতে পারে। কোরাকাঠিতে হচ্ছে। বেশী দূরও নয়। বিশ্ববিজয় অপেরার এখন বেশ নাম।

হেমাঙ্গ চুপ করে রইল। কোনও আমোদ-প্রমোদই তার ভাল লাগছে না। কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। এমনকি সকালের বেড়ানোটা পর্যন্ত ক্লান্তিকর মনে হয়।

বাঁকা চলে যাওয়ার পর অনেক রাত অবধি জানালার কাছে বসে রইল সে। অসহ্য শীত। জল-ছোঁয়া বাতাসে হাড় অবধি অবশ হয়ে যেতে চায়। তবু বসে রইল। ঘুম আসতে চায় না।

শোওয়ার আগে তার হঠাৎ মনে হল, আজ কী বার? ঘরে কোনও ক্যালেন্ডার নেই। পত্রিকা আসে না। রেডিও বা টেলিভিশন নেই। অটোমেটিক ঘড়িটা হাতে দেয় না বলে বন্ধ হয়ে আছে। শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ভাবল সে। আজ কী বার? কত তারিখ? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হল, কী হবে জেনে? একটা দিন গেল—এই মাত্র।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল মেঘলা আকাশের ছায়ায়। আজকের দিনটা ভাল যাবে না— মনে হল হেমাঙ্গর। খুব হাওয়া দিচ্ছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। শীত আরও বাড়বে। নিজে এক কাপ কফি করে নিয়ে ঘরে বসল হেমাঙ্গ। আজ কিছু করার নেই।

একটু বেলার দিকে বৃষ্টিটা রইল না। তবে মেঘলা ছাড়েনি। হেমাঙ্গ বাইরে বেরিয়ে দূরের আকাশের দিকে চেয়ে রইল। কাজের মেয়েটা কদিন আসছে না। জ্বরে পড়ে আছে। তাতে কোনও অসুবিধে নেই হেমাঙ্গর। সে ঘর ঝাঁট দেয় না। সামান্য কয়েকখানা বাসন নিজেই মেজে নেয়। বাঁকা মিঞা টের না পেলে না-বেঁধে এবং না-খেয়েও কেটে যায় এক-আধ বেলা।

আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘাটের দিকে চোখ নেমে এল তার। একখানা ভটভটি এসে ঘাটে লাগল। লোক নামছে। তাদের মধ্যে একজনকে দেখে চমকে উঠল সে। যার কথা আজকাল দিন-রাত ভাবে সে। ভেবে মন খারাপ হয়। সে-ই। পিছনে চারুশীলার বর সুব্রত।

খুব আস্তে আস্তে উঠে এল রশ্মি। একটু রোগা হয়েছে কি? একটু উসকোখুসকো?

ফটকের কাছে এগিয়ে দাঁড়াল হেমাঙ্গ। বুকটা থরথর করছে। হতাশা আর বিহ্বলতায় নিজের বশে থাকছে না সে।

ঘাট থেকে ওপরে উঠে ডানদিকে তার বাড়িমুখো মোড় নিতেই একটু দূর থেকেই তাকে দেখতে পেল রশ্মি। একটু হাসল। হাসিটা কি খুব বিষণ্ণ! অন্তত প্রাণহীন।

ফটকটা খুলে দিয়ে হেমাঙ্গ বলল, এসো।

কী চেহারা হয়েছে তোমার! চেনাই যায় না যে!

দাড়িটা কাটছি না।

চুলও আঁচড়াও না বোধহয়! বাবরি রাখছো?

একটু তফাতে সুব্রত। ধীরে হাঁটছে। তাদের একটু সুযোগ দিতে চাইছে হয়তো।

আসুন সুব্রতদা।

তুমিই হেমাঙ্গ নাকি? আমি তো ভেবেছিলাম কোনও চাষীর বাড়িতে ভুল করে ঢুকে পড়ছি।

চাষীই তো! চাষী হওয়ারই চেষ্টা করছি।

সুব্রত ঘরে ঢুকতে চাইল না। বলল, তোমরা ভিতরে গিয়ে একটু কথা বলে নাও। আমি বাইরে বসছি।

হেমাঙ্গর বুকটা কাঁপছিলই। কাঁপন দ্রুততর হল মাত্র। রশ্মিকে নিয়ে ঘরে ঢুকে সে অপ্রতিভ বোধ করতে লাগল। একটা প্রত্যাশা জাগছিল মনে। হয়তো—

রশ্মি মৃদু স্বরে বলল, কাল চলে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে দেখা করে যেতে এলাম।

বোসো রশ্মি। একটু বোসো।

রশ্মি বসল। বলল, তোমার বাড়িতে ফোন বেজে যায়, কেউ ধরে না। চারুদি বললেন, তুমি কলকাতায় যাচ্ছোই না আজকাল। শুনে ভীষণ খারাপ লাগল।

তাই এলে?

আর দেখা হবে কি না কে জানে! আমি জানতে এলাম, এরকম করছো কেন? কী হয়েছে তোমার?

স্পষ্ট করে বলব?

কেন বলবে না?

আমার কেবল মনে হচ্ছে, তোমার প্রতি বড় অন্যায় করেছি।

রশ্মি হাসল, একটু ফ্যাকাশে হাসি। মৃদুস্বরে বলল, আমি তা মনে করি না।

তোমাকে আমি অজান্তে অপমানও করেছি হয়তো।

এসব ভেবেই সন্ন্যাস নেওয়ার চেষ্টা করছো?

না রশ্মি, আমি তোমাকে ভুলতে পারছি না। কেবল মনে হচ্ছে, ভুল করলাম।

শোনো, ভুল করলে তার সংশোধনের উপায় আছে। ইচ্ছে করলেই তুমি সাতদিনের মধ্যে ইংল্যান্ডে গিয়ে হাজির হতে পারো। তাই না?

গেলে তুমি খুশি হবে?

হবো না? কিন্তু সেটা করার আগে একটু ভেবো। তুমি ভীষণ ভদ্রলোক, তাই তোমার কেবল মনে হচ্ছে আমার প্রতি অন্যায় করেছে, তা তো নয়। অকপট হওয়াই তো ভাল।

হেমাঙ্গ লজ্জায় রশ্মির মুখের দিকে তাকাতে পারল না। নতমুখ হয়ে বলল, আমার একটা আত্মগ্লানি হচ্ছে। আমি তোমাকে ভালবাসি রশ্মি।

আমি জানি। কিন্তু এরকমভাবে নিজেকে শাস্তি দিচ্ছো কেন? তোমার আপনজনদেরও কষ্ট দিচ্ছো। আমাকেও।

হেমাঙ্গ মৃদু হেসে বলে, এখনও অ্যাডাল্ট হইনি যে!

সেটা বুঝতে পারছি। তুমি এরকম করলে আমারও খুব মনটা খারাপ লাগবে। এমনিতেই লাগছে।

বিয়েটা হচ্ছে না বলে তোমার বাড়িতেও নিশ্চয়ই কথা হচ্ছে।

আমার বাড়িতে কেউ অবুঝ নয়। প্রবলেমটা সবাই বুঝতে পারছে, তাই সিচুয়েশনটা মেনেও নিয়েছে। যদিও তোমাকে সকলেরই খুব পছন্দ ছিল। কিন্তু প্রাকটিক্যাল বাধাগুলোকে তো অস্বীকার করা যাবে না।

হঠাৎ হেমাঙ্গ একটু ঝুঁকে রশ্মির একখানা হাত স্পর্শ করে বলল, কেন যাচ্ছো রশ্মি? কেন যাচ্ছো? আরও বড় হয়ে কী করবে?

রশ্মির চোখ দুটো এ-কথায় ছলছল করে উঠল। সামান্য বিষাদ-মাখা গলায় বলল, আমি কিভাবে বড় হয়েছি তা তো তুমি জানো। আমার ধারাটাই যে অন্যরকম। কাজ আর পড়াশুনো ছাড়া আমার কাছে অন্য সবকিছুই আনইম্পর্টেন্ট। তুমি বিশ্বাস করবে না, আজ অবধি তুমি ছাড়া আমার জীবনে কোনও পুরুষই ওয়েলকাম ছিল না। দো দেয়ার ওয়্যার অফারস্ অ্যান্ড প্রোপোজালস্। কিন্তু ভেবে দেখেছি, এটা আমি সয়ে

নিতে পারব। কোনও অসুবিধে হবে না। তুমিও এরকম ভেঙে পড়ো না। বলছি তো, যদি তোমার মন বদলায়, সত্যিকারের বদলায়, তাহলে চলে যেও।

হেমাঙ্গ করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রশ্মির দিকে।

রশ্মি মৃদু গলায় বলল, এবার ওঠো! আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। কলকাতায়।

যাবো! কিন্তু ইচ্ছে করছে না যে!

প্লিজ। কাল এয়ারপোর্টে আমাকে সি-অফ করতে হবে। আমি তোমার হাসিমুখ দেখে চলে যেতে চাই।

হেমাঙ্গ তবু ঝুম হয়ে বসে রইল।

একটু গলা খাঁকারি দিয়ে সুব্রত ঘরে এল। বলল, চলো হেমাঙ্গ। তোমার চারুদি দিনরাত তোমার কথা বলছে। ইন ফ্যাক্ট সে-ও খুব আপসেট।

কেন?

তোমাদের ঘটকালি তো চারুই করেছিল। চলো।

চারুদির কোনও দোষ নেই।

সেটা তাকে তুমিই বুঝিয়ে বলো। বিডন স্ট্রিটেও খুব ঝামেলা হচ্ছে। তোমার ওল্ড ম্যান আর ওল্ড লেডি দুজনেই খুব আপসেট। তাদের ধারণা, তোমার আইবুড়ো অপবাদ আর ঘুচবে না।

যেতেই হবে?

রশ্মি বলল, হ্যাঁ। একা থাকছো বলেই তোমার মন ভার হয়ে থাকছে। নরম্যাল জীবনে ফিরলেই দেখবে, সব ঠিক হয়ে যাবে। ওঠো। আজ ওয়েদার ভাল নয়। আমরা তাড়াতাড়ি ফিরব।

একটা কথা জিজ্ঞেস করবো রশ্মি?

বলো।

তুমি নিজের গরজে এসেছে, না চারুদি পাঠিয়েছে?

রশ্মি অবাক হয়ে বলে, কেন বলো তো!

এমনি।

কোনটা শুনলে খুশি হবে?

যেটা সত্যি, সেটা।

রশ্মি একটু হাসল। বলল, বড্ড সেন্টিমেন্টাল হয়েছে তো তুমি! সত্যি কথা হল, চাকদির কাছে শুনে আমি নিজেই এসেছি। চারুদি বরং আসতে বারণ করেছিল। বিশ্বাস হল?

একটা গভীর স্বস্তির শ্বাস ফেলে হেমাঙ্গ বলল, হল। মন থেকে একটা ভার নেমে গেল।

সেটাই বা কেন?

তুমি নিজের টানে এসেছে, এটা কত ভাল লাগবে ভাবতে। তাই না, বলো!

তবে কি ভেবেছিলে টান সব ছিড়ে ফেলেছি?

তোমার কথা দিনরাত ভাবছি, তুমিও যে একটু ভাবো এটা জেনে এত ভাল লাগছে!

একটু! কী অদ্ভুত লোক তুমি বলো তো!

এই সময়ে সুব্রত নিঃশব্দে ফের বাইরে গেল।

রশ্মি বলল, তোমার কথা ছাড়া কিছুই ভাবিনি ক'দিন। অন্তত বিশ বার ফোন করেছি। হাতে সময় থাকলে আরও কয়েকদিন আগেই চলে আসতাম। আজও কত কাজ ফেলে এসেছি।

হেমাঙ্গ উঠল। চারদিকে চেয়ে বলল, আমার কিছু গোছানোর নেই। শুধু পোশাকটা পাল্টানো দরকার। লুঙ্গি পরে তো যাওয়া যায় না।

রশ্মি একটু হেসে উঠে বাইরে গেল।

খুব ধীরে ধীরে পোশাক বদলায় হেমাঙ্গ। যদি এই পোশাক বদলের মতো মনটাকেও বদলে ফেলা যেত!

ভটভটিতে রশ্মির কাছাকাছি বসে রইল সে। কিন্তু কথা আসছিল না। কথা হারিয়ে বসে আছে সে। মেঘলা ময়লা আকাশের নিচে ম্লান চরাচর, জল আর ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস। এ সবের মধ্যে একটা শীতল সমাপ্তির আভাস রয়েছে।

সে একবার জিজ্ঞেস করল, মনে থাকবে রশ্মি, আমাকে?

সে কথা তার ঠোঁট থেকে কেড়ে নিয়ে গেল লুঠেরা বাতাস। রশ্মির কানে পৌঁছলো না।

আপনমনে একটু মাথা নাড়ে হেমাঙ্গ। মনে রাখার দবকার কী? কেন বন্ধন? কেন মনের বাঁধনে আটকে থাকা? কোনও দরকার নেই তো!

৬৮

নিজেকে মুক্ত রাখা কি সোজা কথা? অনেক কষ্টে কচ্ছপের মতো নিজের ভিতরে গুটিয়ে থাকা শিখেছি।

নয়নতারা পান মুখে দিয়ে বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে বসে বলল, তোমার মতো কি আমি পারি? আমি হলাম মেয়েমানুষ।

বিষ্ণুপদ নয়নতারার দিকে চেয়ে একটু হেসে বলে, আজকাল মেয়েরা কিছু কম পারছে নাকি? তোমাতে আমাতে তফাত করো কেন? তফাতটা কম বয়সে ছিল। বুড়ো হলে আর তফাতটাই বা কি?

নয়নতারা কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, ও পাপের কথা, মেয়েমানুষে আর পুরুষমানুষে তফাত থাকবে না, তাই কি হয় গো?

বিষ্ণুপদ উঠোনে পড়ে থাকা শীতের রোদের দিকে চেয়ে থেকে বলে, তফাত আছে, প্রকৃতির তফাত। কিন্তু ক্ষমতার নয়।

ওসব কি আমি বুঝি! পুরুষমানুষ চালায়, মেয়েমানুষ চলে— এই তো দেখে আসছি চিরকাল।

তুমি আর দেখলে কতটুকু? ঘরে মুখ গুঁজে পড়ে আছো। আসল কথাটা আমার কি মনে হয়। জানো? পুরুষমানুষের মধ্যে যা আছে, মেয়েমানুষের মধ্যে তা নেই। আবার মেয়েমানুষের মধ্যেও এমন কিছু আছে যা পুরুষের নেই। হরেদরে দু'পক্ষই সমান। যিনি মানুষ তৈরি করেছেন তিনি তো আর আহাম্মক নন, একচোখোও নন। সমান সমানই দিয়েছেন দুজনকে, তবে রকমটা আলাদা।

তোমার সব অলক্ষুণে কথা।

আমি যেমনটা বুঝেছি বলোম। তবে কি জাননা, মেয়েমানুষ যদি পুরুষের সঙ্গে গায়ের জোরে পাল্লা দেয় বা পুরুষের যা জন্মগত গুণ সেইটে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে, তাহলে তো হেরেই যাবে। আবার মেয়েমানুষের যা বিশেষ গুণ সেখানে পুরুষ ভেড়া। বুঝলে? সৃষ্টিকর্তা দুজনকে দু'রকমভাবে গড়েছেন— এইটে বুঝতে লাগবে। নইলে হবে না। তাই বলছিলাম, তোমার সঙ্গে আমার যা তফাত সেটা প্রকৃতিগত।

ও বাবা, ওসব বুঝে আমার কাজ নেই। এ জন্মে আমার যা বুঝ হয়েছে তাই নিয়েই কাটিয়ে যাই।

বিষ্ণুপদ একটু হেসে বলে, পরের জন্মে যদি আমেরিকায় মেম হয়ে জন্মাও তখন কি হবে?

ও বাবা! ওসব খারাপ কথা বলছো যে! তোমার মুখের কথা ভীষণ ফলে যায়, তা জানো?

কেন, আমি কোন বাকসিদ্ধাইটা?

আছো একটু। দেখেছি তো, যা বলল তাই হয়।

তাহলে এটাও হোক।

নয়নতারা হেসে ফেলল, বাব্বা, রক্ষে করো, ফ্রক পরে, গা দেখিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারব না মরে গেলেও। কথা ফিরিয়ে নাও বলছি।

বিষ্ণুপদ খুব মজার হাসি হেসে বলে, খারাপ কি? তুমি মেম হয়ে জন্মালে আমিও না হয় সাহেব হয়ে জন্মাবো।

নয়নতারা চোখ কপালে তুলে বলে, তোমারও জন্মানোর দরকার নেই বাপু। গরুটরু খায় ওরা। কত অনাচার করে।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, তা বললে চলবে কেন? সাহেবরা যদি খারাপই হবে তবে দুনিয়াটা জানাচ্ছে কি করে?

আমার দুনিয়ার খবরে কাজ নেই বাপু।

বিষ্ণুপদ খুব হাসল। মাথা নেড়ে বলল, কাজ নেই বললেই হয়? তোমার বড় ছেলে সারা দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছে, তুমি তার মা হয়ে একটু ভূগোল না জানলে লোকে বলবে কি?

নয়নতারা হেসে ফেলে বলে, এই বুড়ো বয়সে কি আমার ওপর মাস্টারি করবে নাকি? ভূগোল শিখে এখন আর কী হবে?

দুনিয়ার হালচাল একটু জানা ভাল। চাল ডাল তেল নুন ছেলেমেয়ে স্বামী এসব নিয়ে তো কম ভাবো না। আর একটু বড় করে ভাবলে দেখো ভালই লাগবে।

নয়নতারা একটু দোক্তাপাতা ছিড়ে মুখে দিয়ে বলে, এই চিন্তাতেই বলে সময় পাই না। বামা আর রেমোতে কেমন লেগে যাচ্ছে দেখছো তো! কুরুক্ষেত্র হবে এইবার। ভয়ে মরি।

বিষ্ণুপদ হাসি-হাসি মুখ করে বলে, সেইজন্যই তো কচ্ছপের মতো হতে বলি।

তুমি পারো। আমি পারি না। বাড়ি ভাগ বাটোয়ারা হবে, তার আগেই কিরকম লেগে যাচ্ছে দু'ভাইয়ে। বামা তো রোজ আমাকে ঘর ছেড়ে দিতে বলছে।

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, আমাকেও বলছে। ভাগের কাগজপত্র তৈরি হবে, আদালতে যাবে, তারপর তো! তাছাড়া বামা ভুলেই যাচ্ছে যে, বাড়ি জমি আমার নামে, আর আমি এখনও বেঁচে আছি। বামাকে নিয়ে ওইটেই মুশকিল। ওর তর সয় না।

নয়নতারা একটু চারদিকে চেয়ে দেখে নিল। রামজীবন বা বামাচরণ বাড়িতে নেই। বউরা যে যার নিজের ঘরে। গোপালকে নিয়ে পটল গেছে খেলতে। পটলের বইখাতা এখনও বিষ্ণুপদর সামনে পাতা মাদুরে ছড়ানো। নয়নতারা হামাগুড়ি দিয়ে একটু কাছে এসে বসল। তামাকপাতার হেঁচকি তুলে বলল, আর জন্মে সাহেবদের দেশেই জন্মাবো দুজনে চলো। যদি তাতে একটু শান্তি পাই।

বিষ্ণুপদ হাসিমুখে বলে, শান্তি কি ভাল জিনিস?

নয়নতারা অবাক হয়ে বলে, নয়?

সবসময় নয়। শান্তিতে থাকলে মানুষের চনমনে টগবগে ভাবটা থাকে না। পান্তা ভাতের মতো হয়। এই যে সংসারে নানা উপসর্গ নিয়ে আছো, এসবও জীবনের ঝাল-নুন। সবই দরকার হয়। সাহেবরাও যে শান্তিতে থাকে এমন নয়। ও জিনিস দুনিয়ার কোথাও নেই।

ভয় কি জানো? এরপর বামা না আমাদের জোর করে ঘর থেকে বের করে। তাহলে রেমোর সঙ্গে ওর লাগবে। রেমো তো ঘরখানা শেষ করতে পারল না। আমাদের রাখবেই বা কোথায়?

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, ওসব নিয়ে ভেবো না।

সবসময়ে যে মাথায় দুশ্চিন্তা, ভাবতে ভাবতে মাথাটা এমন করতে থাকে।

বিষ্ণুপদ ঢ্রি হয়ে খুঁজে পটলের ভূগোল বই আর অ্যাটলাস তুলে নিয়ে বলল, কৃষ্ণ কোথায় আছে এখন জানো?

না তো! কোথায়?

বিষ্ণুপদ অ্যাটলাস খুলে ইউরোপের ম্যাপখানা বের করে দেখাল নয়নতারাকে, এই দেখ, এ হল হল্যান্ড। সমুদ্রে বাঁধ দিয়ে জল সরিয়ে জমি বের করে করে তবে দেশটা হয়েছে।

ও বাবা!

বিষ্ণুপদ হাসল খুব। বলল, ময়দানবের কাণ্ডকারখানা। বিশ্বকর্মার সঙ্গে পাল্লা টানছে। এই জায়গাটা হল আমস্টারডাম। কৃষ্ণ এখন এইখানে।

এখান থেকে কত দূর হবে?

পাঁচ হাজার মাইলের কাছাকাছি হবে।

বাবা গো! ভাবলেই কেমন করে, না?

আজকাল আর দূর বলে কিছু নেই। কলকাতা থেকে উড়ে দিনকে দিন পৌঁছে যাচ্ছে।

এরোপ্লেন এক আজব জিনিস। এ জীবনে আর চড়া হল না।

আমাকে মেরে ফেললেও আমি এরোপ্লেনে চড়তে পারব না। হ্যাঁ গো, কৃষ্ণ নাকি তোমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল আমেরিকায়।

তা চেয়েছিল। খুব ইচ্ছে, আমাকে একটু দুনিয়াটা দেখায়।

তুমি কী বললে?

বিষ্ণুপদ হেসে বলল, কী আর বলব? ছেলে হিসেবে সে চায় বাপকে একটু ঘুরিয়ে আনে। কিন্তু বড্ড খরচ। কৃষ্ণ হয়তো পিছপা নয় তাতে। কিন্তু ভাবি, বউমা রয়েছে, বাচ্চা-কাচ্চা রয়েছে, আমার জন্য এত খরচ করলে তাদের হয়তো ভাল ঠেকবে না। কি দরকার শেষ বয়সে অত খরচপত্র করে বাইরে যাওয়ার!

নয়নতারা বলল, সে ভাল করেছো। বড় বউমা লোকও খুব সুবিধের নয়। আর তোমাকে আমি যেতে দিতাম নাকি?

বিষ্ণুপদ নয়নতারার দিকে চেয়ে বলে, আটকে রাখতে নাকি? নয়নতারা চোখ বড় বড় করে বলে, তোমাকে অতদূরে ছেড়ে দেবো? পাগল হয়েছে নাকি!

বিষ্ণুপদ খুব হাসতে লাগল, দুলে দুলে।

হাসছো কেন গো? হাসির কথা কী বললাম?

ভাবলাম, কতদিন আটকাবে! না ছেড়ে উপায় আছে! একদিন এরোপ্লেন ছাড়াই তো ফুরুৎ করে উড়ে যাবো। কত দূরে যাবো তার ঠিকানাই নেই।

নয়নতারা আজ একটু হাসল। বলল, অত সোজা নয়। বোকেনবাবু সেদিন কী বলল জানো? বলেছে, আমি সধবা মরব।

বিষ্ণুপদও হাসল, সধবা মরে যে কী সুখ কে জানে! তবে বলি কি মরামরি নিয়ে ভেবে লাভ নেই। ও কেউ দুদিন এগিয়েও আনতে পারবে না, পেছিয়েও দিতে পারবে না। দিনটা ঠিক করাই আছে। তবে আমাদের জানা নেই, এই যা। অদৃষ্ট মানে যা দৃষ্ট নয়, গোচর নয়। তা সে-ই ভাল। জানা থাকলে কি ভাল লাগত?

নয়নতারা আর একটু তামাকপাতা মুখে পুরে বলল, হ্যাঁ গো, তোমাকে যে কৃষ্ণ কত জিনিস এনে দিয়েছে, সেগুলো ব্যবহার করো না কেন? খেউড়ি হওয়ার কি সব এনে দিল না?

ওঃ, সে আর এক কাণ্ড। কৌটোর মধ্যে সাবানের ফেনা পোরা আছে। ওপরে একটা জায়গায় চাপ দিলেই ভস ভস করে এত বেরিয়ে আসে। কৃষ্ণ শিখিয়ে পড়িয়েও দিয়ে গিয়েছিল সব। হল কি জানো, টিপতেই সে এমন ফেনা বেরুলো যে গালের ওপর গন্ধমাদন দাড়িয়ে গেল। এই এত ফেনা। তার মধ্যে নিজের গালখানাই খুঁজে পাই না। তারপর থেকে আর ব্যবহার করি না। চাকা সাবানই ভাল।

নয়নতারা হেসে ফেলল। বলল, হাসাতেও পারো বাপু। আর ওই সুন্দর গন্ধওলা জিনিসটা!

ওটা কামানোর পর লাগায়। আফটার শেভ লোশন। কেটেকুটে গেলে ওটা লাগালে আর বিষিয়ে যায় না।

তা লাগাও না কেন?

গন্ধ মেখে হবেটা কি? ফিটকিরিতেই কাজ হয়ে যায়। আছে জিনিসটা থাক।

বড্ড হিসেব করো তুমি। এনে দিয়েছে, ব্যবহার করলেই তো হয়।

বিষ্ণুপদ নয়নতারার দিকে চেয়ে বলল, আর তোমাকে যে ফোল্ডিং ছাতা, ব্যাগ, শাড়ি এনে দিয়েছে তা ব্যবহার করো কি?

রেখে দিয়েছি। পটলের বউ এসে ব্যবহার করবে।

আমারটাও পটলকেই দিয়ে যাবো।

ম্যাপটা খুলে বিষ্ণুপদ দেখছিল, বলল, তোমার একদম মনোযোগ নেই। আমস্টারডামটা কোথায় এবার দেখাও তো। ভুলে গেছ?

নয়নতারা আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল, এইখানে তো!

ওঃ, পেরেছে তো, দশে দশ।

নয়নতারা হাসল, আর আমার ওপর মাস্টারি ফলাতে হবে না।

বিষ্ণুপদ একটু আনমনা হয়ে বলল, কৃষ্ণ এখন এইখানে। বুঝলে! হল্যান্ড। সমুদ্রে বাঁধ দিয়ে, জল ঘেঁচে তবে মাটি বার করা হয়েছে। সেখানে চাষবাস হয়, বাড়ি ঘর করে লোকে থাকে, গাড়ি চলে। বাঁধ ভেঙে গেলে দেশ ভেসে যাবে চোখের পলকে। কিন্তু ভাঙে না। শয়ে শয়ে বছর ধরে দিব্যি আছে।

হ্যাঁ গো, এই যে সমুদ্রকে হটিয়ে দিচ্ছে, এতে মানুষের পাপ হয় না? এ যে খোদার ওপর খোদকারি।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, তা কেন? মানুষকে যে এত বুদ্ধি, এত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা কাজে লাগাতে হবে না। আমার মতো ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকবে সবাই? সে দেশে মাটির অভাব। সেই অভাব পুষিয়ে না নিলে চলবে কেন? মাটির জন্যই দেখ না, এত ঝগড়া-কাজিয়া, মারপিট, ভাইয়ে ভাইয়ে মুখদর্শন বন্ধ।

নয়নতারা ফের সাদা পাতা ছিঁড়ছিল।

বিষ্ণুপদ একটু লক্ষ করে বলল, ডোজটা যেন বেশ বেড়েছে মনে হয়?

নয়নতারা লজ্জা পেয়ে বলল, এবারের পাতাটায় ধকটা যেন কম।

তা নয়, তোমার নেশাও বাড়ছে। অত খেও না। অম্বল হবে।

আর অম্বল! মনটাই ভাল নেই।

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ম্যাপ দেখতে লাগল। কৃষ্ণ এখন আমস্টারডামে। কবচখানা সঙ্গে নিয়ে গেছে কি? না নিক, তাতে কিছু নয়। কৃষ্ণ তো তারই ছেলে। ছেলের মধ্যে বাপের অস্তিত্ব থাকেই। কৃষ্ণের মধ্যে বিষ্ণুপদও কি একটু নেই? আছে বোধহয়।

কী ভাবছো?

এই নানা কথা। উল্টো-পাল্টা। ঠিক থাকে না।

ভূগোল বইটা একটু আমাকে পড়ে শুনিও তো।

তুমি নিজেও তো পড়তে পারো।

অক্ষর চিনবো কি? ভুলে-টুলে গেছি বোধ হয়।

ভোলোনি। চেষ্টা করলেই পারবে।

তুমিই শুনিও।

বিষ্ণুপদ হল্যান্ডের বিবরণ একটু পড়ে শোনাল নয়নতারাকে। বলল, বুঝতে পারছো?

তা পারছি।

এসব জায়গায় যেতে ইচ্ছে করে না তোমার?

করলেই বা লাভ কি?

বিষ্ণুপদ হাসিমুখে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, আমারও ইচ্ছে হয়। আমি কি ভাবি জানো? কৃষ্ণর সঙ্গে সঙ্গে আমার সত্তাটাও ঘুরে বেড়াচ্ছে নানা দেশ।

তুমি বেশ ভাবতে পারো। আমি পারি না।

ওই জন্যই তো কচ্ছপ হওয়া তোমার আর হল না। ওইটে যদি পারতে তবে অনেক অশান্তি থেকে বেঁচে যেতে।

নয়নতারা স্বামীর দিকে চেয়ে বলে, ওইটেই তো তফাত।

বিষ্ণুপদ হাসিমুখে উঠোনের দিকে চেয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, নতুন গুড় ওঠেনি?

না বোধ হয়। উঠলে রেমো ঠিক আনত। কেন, পায়েস খেতে ইচ্ছে যায় নাকি?

তা যায়।

এখানকার বাজারে বোধ হয় ওঠেনি। বলব'খন রেমোকে। বললেই এনে দেবে।

বিষ্ণুপদ একটু চুপ থেকে বলল, থাক। বলো না। নিজে থেকে আনলে সেটাই ভাল হবে।

ও মা! ছেলের কাছে সংকোচ কিসের? সে তো ভক্ত হনুমানের মতো তৈরীই আছে।

তা জানি। তবু থাক।

কেন গো?

বিষ্ণুপদ সামান্য সংকোচের সঙ্গে বলল, নোলা জিনিসটা ভাল নয়। ভাবছি জিভকে একটু শাসনে রাখব।

আমার বাপু ওটা সহ্য হবে না। তোমার কিছু খেতে ইচ্ছে গেলে না খাইয়ে আমার শান্তি নেই।

আবার বেশী খেলে তো টিক টিক করো।

তাও করি। আমি বলেই করি। তোমাকে নিয়ে আর কে ভাববে বলো তো, আমার মতো?

তা বটে।

আজই আনাবো।

বিষ্ণুপদ তবু মাথা নাড়ে, থাকগে। নবুর বাড়িতে অনেক খেজুর গাছ। তারা রস জাল দেয়। করেও ভাল। বললেই দিয়ে যাবে। এখন থাক।

নয়নতারা উঠে গেল। রান্নাঘরের দিকে। যেতে যেতে বলল, রাঙা বউমা আজ রাঁধবে না। অশুচি হয়েছে। কী রাঁধবো বলো তো?

কচু ঘেঁচু যা হয়।

ফুলকপির ঝোল রাঁধি?

রাঁধো। মাছ নেই বুঝি?

না। ডিম আছে। বাড়ির হাঁসের ডিম।

একটা ভেজে দিতে পারবে? ডালের মুখে খাবো।

দেবো'খন।

বিষ্ণুপদ ফের একা হয়ে যায়। একা হয়ে চেয়ে থাকে।

এই বাড়িঘর, বাগান নিয়ে যে এলাকাটুকু, এটার দলিল তার নামে। বামাচরণ সব ভাগজোখ করাল। দখল চাইছে। বাড়িতে বড় অশান্তি হচ্ছে তাই নিয়ে। হোক, যা খুশি হোক। বিষ্ণুপদ আর ভাবে না। সে বরং আমস্টারডামের কথা ভাবে। কৃষ্ণর কথা ভাবে।

এই অন্যমনস্কতার মধ্যেই দুটো সাইকেল এসে থামল উঠোনে। কালো চেহারার দুটো লোক।

একজন একটু হেঁকেই বিষ্ণুপদকে বলে, কোন ঘরে বামাচরণ থাকে বলুন তো!

বিষ্ণুপদ তটস্থ হল। বলল, বামা? বামা তো বাড়ি নেই।

সে আমরা জানি। তার বউ আছে তো!

আছে বোধ হয়। কী দরকার?

ডেকে দিন। দরকার আছে।

বিষ্ণুপদ একটু অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। এরা বোধ হয় রামজীবনের বন্ধুবান্ধবই হবে। কিন্তু মতলব ভাল নয়।

বিষ্ণুপদ গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, তার বোধ হয় শরীর ভাল নয়।

একজন সাইকেল থেকে নেমে চারধারে চেয়ে দেখে নিয়ে বলল, ওই ঘরটা।

বিষ্ণুপদ সভয়ে দেখল, লোকটা এগিয়ে গিয়ে বন্ধ দরজায় দমাস করে একটা লাথি কষাল।

এই, বেরিয়ে আয়।

বামার বউ দরজা খুলল না। কিন্তু ঝাঁপের জানালা তুলে সভয়ে বলল, কে? কী চাই?

তোকেই চাই। বেরিয়ে আয় তো!

জানালার ঝাঁপটা ফেলে দিয়ে বউটা চেঁচাল, বাবা! বাবা! শুনছেন! এরা সব গুণ্ডা। লোকজন ডাকুন...

বিষ্ণুপদ উঠল। হাতপায়ের জড়তা উঠতে দিচ্ছিল না তাকে। তবু উঠল।

কী হয়েছে? আপনারা কারা?

আপনি ঘরে যান। এর সঙ্গে কথা আছে।

গোলমাল শুনে নয়নতারা বেরিয়ে এসেছে রান্নাঘর থেকে। বলল, কী হয়েছে? তোমরা কারা?

আপনারা ঘরে যান।

বিষ্ণুপদ উঠোনে নামতে নামতে বলল, এটা ঠিক হচ্ছে না। এ কাজটা ভাল হচ্ছে না।

লোকটা দমাদম কয়েকটা লাথি দিল দরজায়। সঙ্গে যে সব কথা বলল তা শুনে কানে আঙুল দিতে হয়।

বিষ্ণুপদ এত ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল যে, বাক্য সরল না।

লোকটা বলল, এ গাঁয়ের পাট চুকিয়ে তিনদিনের মধ্যে যদি চলে না যাস তা হলে জোড়া লাশ ফেলে দিয়ে যাবো।

শ্যামলী ঘর থেকে চিৎকার করছে, বাবা! আপনি লোক ডাকুন। মেরে ফেলবে যে!

লোকটা আর একটা লাথি কষাল দরজায়, কেন, বুড়ো শ্বশুরকে যখন ভিটেছাড়া করতে চাও তখন বাবা ডাক কোথায় থাকে রে মাগী? আঁ! এখন নাকী কান্না কাঁদছে, বাবা—বাবা। শালী, যত নষ্টের গোড়া।

শ্যামলী বোধ হয় ভয়ে চুপ করে গেল।

লোকটা ফের সাইকেলে চেপে বলল, বামা আসুক, তার ব্যবস্থা হচ্ছে। শালাকে জানে মেরে দিয়ে যাবো আজ।

লোক দুটো যেমন এসেছিল, তেমনি হুস করে চলে গেল।

বিষ্ণুপদ বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল উঠোনের মাঝখানে। রাঙা ঘর থেকে বেরোলো না। পিছনে দাওয়ায় বসে কাঁদছে নয়নতারা।

দরজা খুলে শ্যামলী বেরিয়ে এল। আতঙ্কিত মুখচোখ।

শুনলেন! শুনলেন আপনি? কী বলবেন এখন? রামজীবনের সঙ্গে সাট নেই আপনার?

আমার!

আপনারা সবাই সমান। সব এক দলে। আমি আজই পুলিশের কাছে যাবো। কোমরে দড়ি পরাবো আপনাদের সবাইকে।

নয়নতারা বলল, ওঁকে কেন বলছো? উনি তো ওদের চেনেনও না।

শ্যামলী মুখ ভেঙিয়ে বলে, চেনেন না! আহা, কী ন্যাকা রে। চেনেন না! ঠিক আছে, চেনেন কিনা তা পুলিশ এলেই বোঝা যাবে। কিনা তা পুলিশ এলেই বোঝা যাবে।

নয়নতারা বলল, তাই যাও। আমাদের বরং বেঁধে নিয়ে যাক। তাই ভাল।

৬৯

চারুশীলা যে কেন তাকে এয়ারপোর্টে ধরে এনেছে তা চয়ন জানে না। চারুশীলার কোনও সিদ্ধান্ত বা কাজেরই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করা মুশকিল। তবে তাতে চয়নের একটা লাভ হয়েছে। কস্মিনকালেও সে এয়ারপোর্ট দেখেনি। দেখা হয়ে গেল আজ।

চারুশীলা হুকুম করতে ভালবাসে এবং সেটা তামিল না হলে যে চারুশীলা মানসিক দিক দিয়ে ভেঙে পড়ে এই সূক্ষ্ম ব্যাপারটা চয়ন বোঝে। তাই সে পারতপক্ষে চারুশীলার মতের বিরুদ্ধে কিছু করে না, সামান্য গৃহশিক্ষক হলেও—কে জানে কেন—তাকে ভদ্রমহিলা নানাভাবে নানা বিষয়ে জড়িয়ে দেন। হয়তো ভাবেন, এরকম নানা ব্যাপারে জড়িয়ে থাকলে চয়নের উপকার হবে। উপকার কিছু হয় না, বরং চয়নের অস্বস্তি বাড়ে।

আজকের ঘটনাটাই যেমন, পড়াতে গিয়েছিল চয়ন। চারুশীলা তাকে দেখেই ঘোষণা করল, আজ আর পড়াতে হবে না। রশ্মি আজ লন্ডন চলে যাচ্ছে। সি-অফ করতে আমরা সবাই যাচ্ছি। আপনাকেও যেতে হবে।

বিস্মিত চয়ন বলে, আমি!

হ্যাঁ, আপনিও। ফিরতে অনেক রাত হবে। ডিনার এখানেই করে নিন, আর আমাদের সঙ্গেই ফিরে আসবেন। এখানেই রাতে থাকবেন।

এগুলো কোনও প্রস্তাব বা অনুরোধ নয়, সিদ্ধান্ত এবং ঘোষণা।

চয়ন ভেবেচিন্তে কিছু বলতে পারল না। কেবল চারুশীলার কথারই শেষাংশ পুনরাবৃত্তি করল মাত্র, রাত্রে থাকব?

কেন, আপনার জন্য কেউ চিন্তা করবে নাকি?

চয়ন লাজুক মুখে বলে, না, তা কেউ করবে না।

বলেই চয়নের মনে হল, কথাটার মধ্যে একটু মিথ্যে রয়ে গেল। তার জন্য চিন্তা করার লোক এতদিন কেউ ছিল না। আজকাল হয়েছে। অনিন্দিতা আর তার মা। যদিও ওদের উৎকণ্ঠা বা উদ্বেগ চয়ন এখনও পছন্দ করে উঠতে পারেনি। রাতে না ফিরলে ওরা অবশ্যই টের পাবে। দাদা-বউদিকেও বলতে পারে।

চারুশীলা বলল, তা হলে আর কী?

চয়ন মৃদু একটু হাসল। ব্যক্তিত্বহীন হওয়ার অসুবিধে অনেক আছে, আবার সুবিধেও কি আর কিছু নেই! ব্যক্তিত্বহীন মানুষদের সঙ্গ বেশিরভাগ মানুষই পছন্দ করে। কেননা, তারা সব কথাতেই সায় দেয়, অকারণে অন্যায্য প্রশংসা করে এবং হাবিজাবি কথাও মন দিয়ে শোনে। মানুষ নিজের ইচ্ছেমতো চালানোর জন্য এসব

লোককে সবসময়েই সঙ্গী হিসেবে চায়। মানুষের ইচ্ছাপূরণে সাহায্য করে বলেই কিছু দয়া ও দাক্ষিণ্য তারা পেয়ে থাকে।

লোক বড় কম জোটায়নি চারুশীলা। সন্ধের পর একে একে এল রিয়া আর মোহিনী, এল ঝুমকি, এল দাড়িওলা এবং বিষণ্ণ হেমাঙ্গ। আরও জনা তিনেককে চেনে না চয়ন। দেখা গেল, সকলেরই ডিনারের নেমন্তন্ন। খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনও বেশ বিরাট।

সেদ্ধ ভাত খেয়ে খেয়ে চয়নের পেট মরে গেছে। আজকাল সে একদম বেশি খেতে পারে না। বিশেষ করে ঝাল-মশলার খাবার খেলেই তার পেটের গোলমাল হয়। কিন্তু বোধ হয় তার স্বল্লাহারে চারুশীলা খুশি নয়। তাই ডিনার টেবিলে তাকে নিয়েই পড়ল চারুশীলা, ও কী চয়নবাবু, ওটুকু মাছ নিলেন যে! ভাতটা আরও নিন তো! ...আর একটা মুরগির টুকরো নিতে হবে। ...হাত গুটিয়ে রয়েছেন যে, পুডিংটা নিন!

হেমাঙ্গ বিরক্ত হয়ে বলল, মানুষকে খাইয়ে মারতে চাস নাকি? এটা বেশি ফুড ইনটেকের যুগ নয়। মানুষ যত কম খাবে তত বেশিদিন বাঁচবে।

চারুশীলা ঈষৎ রাগের গলায় বলে, আহা, বন থেকে বেরোলো টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে। এসব ফিলজফি কি সুন্দরবন থেকে শিখে এলি নাকি? নিজের চেহারাটা তো চিমসে তালপাতার সেপাই বানিয়েছিস।

সুন্দরবনে শিখবো কেন? তুই মডার্ন ওয়ার্ল্ডের খবরই রাখিস না। বরং সুব্রতদাকে জিজ্ঞেস কর ঠিক বলছি কি না।

সুব্রত শান্ত মানুষ, বেশি কথা বলে না। তর্কবিতর্ক একেবারেই করে না। শান্ত হেসে বলল, তোমার লাইফ স্টাইলটা খুবই স্পার্টান হয়ে গেছে।

সেটাই কি ভাল নয়?

সুব্রত মাথা নেড়ে বলে, ভালই।

আমাকে ও চিমসে বলছে সুব্রতদা, শুনলেন?

শুনেছি। আমার তো মনে হয় তুমি অনেক লিন হয়েছে, আর চটপটে। রংটাও বেশ ট্যান হয়েছে।

চারুশীলা একটু অবাক হয়ে বলে, তুমি ওর প্রশংসা করছো? ধন্যি তোমাকে। ওকে চাষা ছাড়া আর কিছু মনে হয় এখন? কী কালো হয়েছে, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গেছে, মুখে জঙ্গল।

সুব্রত মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। হেমাঙ্গ একটু মাথা তুলে বলল, টুকটুকে ফসা নাদুসনুদুস ন্যাদসমার্কা চেহারা বুঝি ভাল?

হাসতে গিয়ে ঝুমকি বিষম খেল। একটু জল চলকে গেল মোহিনীর হাতের গেলাস থেকে।

কিন্তু এইসব হাসিঠাট্টার মধ্যেও চয়ন লক্ষ করছিল, হেমাঙ্গর চোখ হাসছে না। একটা গভীর ক্লান্তি, হতাশা এবং হয়তোবা একটা অপরাধবোধে ছেয়ে আছে তার চোখ। হেমাঙ্গ আর রশ্মির ব্যাপারটা চয়ন জানে বলেই আরও ভাল বোঝা গেল।

দুখানা গাড়ি হলেই হয়ে যেত। কিন্তু বন্দোবস্ত হয়েছে তিনখানা গাড়ির। চারুশীলার দুটো, হেমাঙ্গর একটা। চয়ন পড়ল হেমাঙ্গর ভাগে। সামনের সিটে পাশাপাশি বসে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে হেমাঙ্গ বলে, চয়নবাবু গান জানেন?

আজ্ঞে না।

জানলে আপনাকে আজ একটা গান শোনাতে বলতাম।

কী গান?

যখন ভাঙল মিলনমেলা ভাঙল। কাল রাতেও স্টিরিওতে শুনলাম।

আপনার মনটা খুব খারাপ, না?

একটা হাত স্টিয়ারিং থেকে তুলে দাড়ি আঁচড়াল হেমাঙ্গ। তারপর বলল, আমি বোধ হয় একটা ইমবেসাইল। কিন্তু কিছু করার ছিল না।

চয়ন চুপ করে থাকে। এ ব্যাপারে সে কথা বলার অধিকারী নয়।

হেমাঙ্গ বাইপাসের দিকে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে আয়নায় একবার পিছনের গাড়িগুলো ঠিকঠাক আসছে কি না দেখে নিল। তারপর বলল, অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না? উই আর বোথ ইন লাভ উইথ ইচ আদার। কিন্তু কতগুলো মেটেরিয়াল কারণে, মাইনর পয়েন্টে আটকে রইলাম। দিস ইজ দা জোক অফ এ লাইফটাইম!

চয়ন মৃদু অস্বস্তি বোধ করছে। এই কথার মধ্যে সে একটা ভুল ধরতে পারছে। স্পষ্ট নয়, কিন্তু আবছা হলেও সত্যি। সে মৃদু স্বরে বলল, দুঃখের ব্যাপার।

আপনিও তাই মনে করেন?

চয়ন সোজা সামনের দিকে চেয়ে থেকে বলে, তাই তো।

দোষটা কার বলুন তো? আমারই, না?

চয়ন মাথা নেড়ে বলল, না।

তবে কার?

বোধ হয় ঘটনাচক্রের। আপনি তো রাজি ছিলেন।

আমার যে কেবলই মনে হয় আমি ওকে অপমান করেছি।

চয়ন খুব ভয়ে ভয়ে বলে, অপমান! কই, মনে হয় না তো!

কিন্তু প্রত্যাখ্যান মানেই তো অপমান।

চয়ন সংকোচের সঙ্গে বলে, প্রত্যাখ্যান! এটা কি তাই?

নয় তো?

হেমাঙ্গ কী শুনতে চাইছে তা চয়ন বুঝতে পারল। বলল, না, প্রত্যাখ্যান কেন হবে?

অন্তত লোকে তো তাই ভাববে?

চয়ন একটু ভাববার ভান করল। তারপর একটু সরল গলায় বলে, আমার তা মনে হয় না।

হেমাঙ্গ সামনের হেডলাইটে উজ্জ্বল রাস্তার দিকে চেয়ে বলে, কি জানি, আমার তো সন্দেহ ছিল। সবাই আমাকেই দায়ী করবে। ছি ছি করবে, খানিকটা সেই ভয়েই তো গাঁয়ে পালিয়ে ছিলাম।

চয়ন মৃদু হেসে বলে, আপনার গাঁয়ের বাড়িটা খুব সুন্দর।

আপনার ভাল লেগেছে? যাদের চোখ আর রুচি আছে তাদের ভালই লাগবে। বসবাস করার পক্ষে শহর একদম বাজে জায়গা। বুক ভরে দমটা অবধি নেওয়ার উপায় নেই। কৃষ্ণজীবনবাবু কি আর সাধে পরিবেশ-পরিবেশ করে এত অস্থির হন! আমার তো ইচ্ছে করছে কালকেই আবার গাঁয়ে চলে যাই। যাবেন আমার সঙ্গে?

চয়ন একটু শঙ্কিত হয়ে বলে, আমার তো উপায় নেই।

টিউশনি?

আজ্ঞে।

আমারও তো কত কাজ কলকাতায়। কিন্তু জীবনের আনন্দটাই যদি না থাকে তা হলে পয়সা দিয়ে কী হবে?

তা তো বটেই।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ গাড়ি চালাল হেমাঙ্গ। তারপর বলল, তা হলে আপনি বলছেন রশ্মির সঙ্গে আমি বিট্রে করিনি।

না তো!

একটা যেন স্বস্তির শ্বাস মোচন করে হেমাঙ্গ বলে, রশ্মি খুব ভাল স্বভাবের মেয়ে। কাল নিজে গিয়ে আমাকে কলকাতায় টেনে আনল। একটুও রাগ করল না আমার ওপর।

চয়ন মাথা নেড়ে বলে, হ্যা, ওঁর মতো মেয়ে কমই দেখা যায়। যেমন ব্রিলিয়ান্ট, তেমনি বিনয়ী।

রশ্মির প্রশংসা শুনে খুশি হল হেমাঙ্গ। বলল, বিয়ে করলে ওরকম মেয়েকেই করতে হয়। আমার কপালটাই হয়তো খারাপ।

চয়ন সতর্কভাবে একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, আপনিও তো কম যান না!

আমি! হাসালেন মশাই। রশ্মির তুলনায় আমি নিতান্তই এলেবেলে।

চয়ন মাথা নেড়ে বলে, না না, তা কি হয়? আপনারা দুজনেই সমান ভাল।

বলছেন?

হ্যাঁ। আর তাই আমার মনে হয়, বিয়েটা না হয়ে আপনার কোনও ক্ষতি হয়নি।

অ্যাঁ! ক্ষতি হয়নি মানে?

চয়ন ব্যস্ত হয়ে বলল, সমান ভাল দুজনের জোড় হয়তো মিলত না।

কথাটা শুনে এত অবাক হয়ে গেল হেমাঙ্গ যে, আর একটু হলে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলত। সামলে নিয়ে বলে, কী বলছেন চয়ন?

চয়ন ভীষণ সংকুচিত হয়ে বলল, বিজ্ঞানের নিয়মেই সগোত্র হওয়া ভাল নয়।

হেমাঙ্গ গাড়ির গতি কমিয়ে চয়নের দিকে অবাক একটি চাউনি হেনে বলল, আপনি তো ডেঞ্জারাস লোক মশাই!

চয়ন একটু ভয় পেয়ে গিয়ে বলল, আপনি রাগ করলেন?

হেমাঙ্গ আরও কিছুক্ষণ ধীর গতিতে গাড়ি চালাল। ততক্ষণে ডান পাশ দিয়ে সাদা মারুতিটা বেরিয়ে গেল। জানালা দিয়ে চারুশীলা মুখ বাড়িয়ে বলল, এই হাঁদারাম, গাড়ি খারাপ হয়েছে নাকি?

না। সব ঠিক আছে।

গাড়িটা বেরিয়ে গেলে হেমাঙ্গ বলল, রাগ করাই বোধ হয় উচিত। কিন্তু রাগ হচ্ছে না। সগোত্র কথাটা খুব ইন্টেলিজেন্টলি লুট করেছেন তো! একজ্যাক্টলি যেন এই শব্দটাই আমি খুঁজছিলাম।

আমি কিন্তু ভেবেচিন্তে বলিনি।

তা না বললেও এ কথাটা যে আপনার মাথায় এসেছে এটা কম কথা নয়। আমার কখনও কখনও মনে হয়েছে আমাদের মধ্যে স্বভাবের একটা বড্ড মিল আছে। আবার নেইও। কিন্তু মিলটাই বোধ হয় বেশি।

চয়ন করুণ একটু হাসল। সে জানে হেমাঙ্গ এখন যা বলছে সেটাও সত্যি নয়। কারণ বাস্তবিক পক্ষে হেমাঙ্গর সঙ্গে রশ্মির মিলের চেয়ে অমিলই ঢের বেশি। চয়ন সগোত্র শব্দটা ব্যবহার করেছে অনিচ্ছে সত্ত্বেও। স্রেফ আত্মরক্ষার জন্য।

হেমাঙ্গ একটু সময়ের ফাঁক দিয়ে বলল, আমি ওকে খুব ভালবাসি বটে, কিন্তু মনে হল আমাদের বিয়েটা যেন একটা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করার মতো হয়ে যাবে। এরকম হওয়া উচিত নয়। কী বলেন? বিয়ে করলে ইংল্যান্ডে যেতে হবে, আমার শিকড় উপড়ে নিতে হবে। আমার পক্ষে এতটা কি সম্ভব?

চয়ন মাথা নেড়ে বলে, ঠিকই তো।

ঠিক নয়?

চয়ন একটু চুপ করে থেকে বলে, লোকে ভালবাসার জন্য কত কী করে! কোনও মানে হয় না। প্র্যাক্টিক্যাল হওয়াই ভাল।

গাড়িটা আর একবার যেন টাল খেল। হেমাঙ্গ অস্ফুট স্বরে বলল, আপনি খুব ডেঞ্জারাস লোক মশাই।

আজ্ঞে তা নয়।

একটু বিচ্ছু টাইপের কি আপনি! বাইরে থেকে মনে হয়, ভাজা মাছ উলটে খেতে জানেন না! কিন্তু ভিতরে ভিতরে গভীর জলের মাছ।

চয়ন সভয়ে বলে, না না, আমি আসলে—

হেমাঙ্গ ভোলা গলায় হাসল, আপনি কি বলতে চান যে, রশ্মি আর আমার মধ্যে সত্যিকারের ভালবাসা হয়নি?

তা তো বলিনি!

না, তা বলেননি। বিচ্ছুরা অত খোলাখুলি বলেও না।

আপনি ভুল বুঝেছেন।

ঠিক বুঝেছি। কিন্তু তা বলে রাগ করিনি। ভয় পাবেন না। আপনার আই. কিউ. কত?

জানি না তো!

একবার মেপে দেখবেন।

কেন বলুন তো?

মনে হচ্ছে আপনার আই. কিউ. রেটিং বেশ হাই।

চয়ন লজ্জা পেয়ে বলে, আপনি রাগ করেছেন।

হেমাঙ্গ মাথা নেড়ে বলে, করিনি। রশ্মি আর আমার ব্যাপারটার মধ্যে রোমান্টিক জিনিসটা ছিল। আমরা দুজনেই পাক্কা প্রফেশনাল। কী জীবনে, কী কেরিয়ারে। বাট শী ইজ সাচ এ সফট্ বিউটিফুল উওম্যান।

চয়ন চুপ করে থাকে।

হেমাঙ্গ নিজেই আবার হঠাৎ বলল, কেন বলুন তো আমি ওর জন্য ঠিক পাগল হতে পারলাম না? পাগল হতে পারলে ও যা চাইছে তা করা শক্ত ছিল না। কেন পারলাম না? কোথায় একটা ক্যালকুলেশন ঢুকে পড়ল

আমাদের রিলেশনে?

চয়ন একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, ক্যালকুলেশন কেন ঢুকবে?

হেমাঙ্গ গম্ভীর হয়ে বলে, ক্যালকুলেশনই। আমি নানাভাবে নিজেকে পরীক্ষা করেছি, প্রশ্ন করেছি। গাঁয়ে বসে রাতের পর রাত জেগে বসে ভেবে দেখেছি। দেয়ার ইজ এ ফ্লাই ইন দি অয়েন্টমেন্ট। মনে হচ্ছে, ওই মাছিটা হল আমার ভিতরকার চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টটা।

চয়ন ব্যস্ত হয়ে বলে, না না। তা নয়।

তা হলে?

আমার মনে হয় আপনি ঠিক ততটা আগ্রহী ছিলেন না।

অত ভদ্রতা করে বলছেন কেন? বী এ ফ্রেন্ড অ্যান্ড বী ফ্র্যাংক।

চয়ন লজ্জা পেয়ে বলে, আমি তো অত বুঝি না।

খুব অবুঝও আপনি নন। ঠিক আছে। এ নিয়ে পরে কথা হবে। দুটো গাড়িই আমাদের পেরিয়ে গেছে। ওদের ধরা যাক।

গাড়িটা আচমকা দারুণ জোরে চলতে শুরু করল। আর সিটে সিঁটিয়ে বসে রইল চয়ন।

এয়ারপোর্ট দেখে চয়ন মুগ্ধ। এত বড়, এত সাজানো, এত ঝকঝকে ব্যাপার সে আগে বড় বিশেষ দেখেনি। লাউঞ্জে রশ্মিকে ঘিরে তার মেলা আত্মীয়স্বজন।

দুটো গাড়িকে পিছনে ফেলে হেমাঙ্গই পৌঁছেছে আগে। লাউঞ্জে ঢোকার মুখে সামান্য প্রোটোকল ছিল। সেটা ডিঙিয়ে চয়নকে নিয়ে ভিতরে ঢুকেই সে বেশ নাটকীয়ভাবে ডাকল, রশ্মি!

রশ্মি হাসিমুখে একটু এগিয়ে এল, এসেছো?

দুজনেরই হাসিমুখ। দুটো মুখই মেঘমুক্ত। কোনও টেনশন নেই। একটু দূর থেকে দুটো মুখকে এরকমই মনে হল চয়নের। এরা কি পরস্পরের খপ্পর থেকে বেঁচে গেল? এরা কি পরস্পরের গ্রাস হতে হতেও হল না?

চয়নের অবশ্যম্ভাবী অনিন্দিতার কথা মনে হল। অনিন্দিতা একটা কিছু ঘটিয়ে তুলতে চাইছে কি? গতকালও থিয়েটারের টিকিট এনেছিল এবং তাকে অনিন্দিতার সঙ্গে যেতেও হয়েছিল থিয়েটারে। নাটকটা কেমন তা ভাল বোঝেনি চয়ন। তবে তার ভাল লাগছিল না। কিন্তু অনিন্দিতা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখছিল। ফেরার সময় একসঙ্গে কিছুক্ষণ। না, বিশেষ ইঙ্গিতবহ কোনও কথা হয়নি। শুধু অনিন্দিতা একবার জিজ্ঞেস করেছিল, ভাল লাগল?

ভালই তো!

কোনটা ভাল?

কেন, নাটকটা!

আর আমি! বলে খুব হেসে ফেলেছিল অনিন্দিতা।

চয়ন একটু দূর থেকে দেখছে, রশ্মি কথা বলছে হেমাঙ্গর সঙ্গে। একটা ডোরাকাটা জামা আর জিনসের প্যান্ট পরে আছে হেমাঙ্গ। দাড়িতে তার মুখে একটা আলাদা সৌন্দর্য এসেছে। আর রশ্মি তো দারুণ সুন্দরীই। তার পরনে সবুজ আর সাদায় মেশানো চুড়িদার। দুজনকে মুখোমুখি বেশ মানিয়েছে। যেন মেড ফর ইচ আদার। কিন্তু ব্যাপারটা যেমন দেখাচ্ছে তেমন নয়। পৃথিবীতে এরকম কত ভুল দৃশ্য আছে।

লাউঞ্জে ঢুকল এসে চারুশীলা অ্যান্ড পার্টি। হইহই ব্যাপার। এই ডামাডোলে কেউ লক্ষই করল না চয়নকে। এরকমই ভাল। সে কারও লক্ষ্যবস্তু হয়ে থাকলে অস্বস্তি বোধ করে। ভয় একটাই, ফেরার সময় তাকে আবার ভুলে ফেলে না চলে যায়।

দল থেকে কিছুক্ষণ পর একটি মেয়ে গুটগুট করে এসে তার পাশে দাঁড়াল।

একা দাঁড়িয়ে যে!

চয়ন লাজুক গলায় বলে, এমনি।

আপনি ভীষণ মুখচোরা, না?

চয়ন মৃদু হেসে বলে, না, তা নয়। রশ্মি আর হেমাঙ্গবাবু কথা বলছিলেন তো, তাই একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

ঝুমকি হেসে বলল, বিদায়-দৃশ্যটা কেমন হল? খুব ট্র্যাজিক?

চয়ন মাথা নেড়ে বলে, কি জানি। ঠিক বুঝতে পারিনি।

ঝুমকি দলটার দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, চারুমাসি আমাকে ভীষণ ভালবাসে। সব জায়গায় নিয়ে যায় জোর করে। নইলে আমার কিন্তু একদম আসার ইচ্ছে ছিল না।

চয়ন হঠাৎ প্রশ্ন করল, কেন?

এরা সবাই বড়লোক। অনেক টাকা। আমার কেন যেন বড়লোকদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করতে অস্বস্তি হয়। আপনার হয় না?

চয়ন একটু অবাক হয়ে বলে, আমার! আমি তো সামান্য পড়ার মাস্টার।

আপনি এলেন কেন?

উনি জোর করে নিয়ে এলেন।

দূর থেকে চারুশীলা হাতছানি দিয়ে ডাকল বুমকিকে।

চয়ন বলল, আপনি যান। ডাকছে।

ঝুমকি চলে গেল। চয়ন একদৃষ্টে চেয়ে রইল। সে এই মেয়েটিকে নিয়ে ভাবছে। ভাবতে হচ্ছে। এই মেয়েটারও একটা চাপা বক্তব্য আছে। সেটা ঠিক বোঝা যায় না।

বিদায় পর্ব শেষ হয়ে গেল। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এনক্লোজারে ঢুকে গেল রশ্মি। সে ফিরে যাচ্ছে নিজের ক্ষেত্রে। নিজের জায়গায়। মুখে হাসি। কোনও বিষণ্ণতা নেই। বিন্দুমাত্র নেই।

চারুশীলা সবাইকে কফি খাওয়াল। তারপর তারা উঠল ওপরে। যেখান থেকে প্লেনটা দেখা যায়। নানা আলো বিকীরণ করে প্লেনটা দাঁড়িয়ে গোঁ গোঁ করছে। আকাশজোড়া অন্ধকার। ওই অন্ধকারে একটু পরেই আকাশে উধাও হবে বিমান। তার ছোট্টো খোলের মধ্যে কয়েকটি মানুষ। হাজার হাজার মাইল পেরোবে। কী সাঙ্ঘাতিক।

চয়নের পাশেই দাঁড়ালো হেমাঙ্গ। বলল, কুইটস্।

চয়ন চমকে উঠে বলে, কিছু বলছেন?

দাড়ি-গোঁফের ভিতর দিয়ে একটু হাসল হেমাঙ্গ। বলল, বললাম।

আজ্ঞে আমি বুঝতে পারিনি।

বললাম হিয়ার এন্ডস্ দি ড্রামা। ড্রপসিন।

ওঃ।

আমি আবার মুক্ত, ভারহীন, স্বাধীন।

চয়ন মৃদু একটু হাসল।

হাসলেন যে!

ভালই তো।

কাল গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছি।

কালকেই?

নয় কেন? দিন সাতেক বিরহের জ্বালাটা জুড়িয়ে আসি।

ও।

বিশ্বাস করলেন না?

কেন করব না?

মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনি বিরহে বিশ্বাসী নন।

চয়ন বিব্রত হয়ে বলে, তা নয়। আমি সব ঠিকমতো বোঝাতে পারি না।

আপনার কাছে অনেক কিছু শেখার আছে মশাই।

কী যে বলেন!

হেমাঙ্গ অন্যমনস্কভাবে প্লেনটার দিকে চেয়ে রইল।

চয়ন হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, প্লেনে চড়তে ভয় করে না?

হেমাঙ্গ তার দিকে ফিরে চেয়ে বলে, করে। আমার তো খুব করে। কেন যে এসব বিপজ্জনক জিনিস বানায় মানুষ। এ সবের চেয়ে নৌকো ভাল, পালকি ভাল, পায়ে হাঁটা ভাল বা ঘোড়ায় চড়া। বুঝলেন, পৃথিবী আবার একদিন সেই সব যুগে ফিরে যাবে।

চয়ন মৃদু হাসল।

প্লেনটা উড়ল আরও আধঘন্টা বাদে। জীবনে প্রথম প্লেন উড়তে দেখল চয়ন। অনেকটা গড়িয়ে গিয়ে রানওয়েতে ঘুরল। তারপর একটা প্রচণ্ড গতি। একটা ঢেউ। তারপর জানালার পিদিমের সারি নিয়ে অন্ধকার আকাশে কী সুন্দর একটা ক্ষণিকের দৃশ্য হয়ে মিলিয়ে গেল।

চারুশীলার গাড়িতে ফিরেএল চয়ন। অনভ্যস্ত রাত্রিবাস।

সে অবাক হয়ে দেখল, তার জন্য চমৎকার বিছানা তো হয়েছেই, বিছানার পাশে একটা টুলের ওপর নতুন পায়জামা, গেঞ্জি আর তোয়ালে। সঙ্গে নতুন টুথব্রাশ আর টুথপেস্ট।

শুয়ে পড়ুন। আমি বাতি নিবিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। বাথরুমটা চিনে রেখেছেন তো? পায়ের দিকে। ঘরে ডিমলাইট জ্বলবে। বালিশের পাশে টর্চও আছে। আর কিছু চাই?

চারুশীলার দিকে অবাক চোখে চেয়ে চয়ন বলে, আরও?

চারুশীলা হাসল না। বলল, দরকার হলে বাঁ দিকের বেড সুইচটা টিপবেন। ওটা কলিং বেল। বাজালে চাকরদের মধ্যে কেউ চলে আসবে।

চয়ন মাথা নেড়ে বলল, ঠিক আছে।

৭০

টাকা আসছে। খুব ধীরে আসছে। কিন্তু আসছে ঠিকই। বড়লোকদের যেমনধারা আসে তেমন নয়। কিন্তু গরিবদের মতো করেও তো টাকার আনাগোনা আছে। কাকার কাছ থেকে বাড়তি এক হাজার টাকা পাচ্ছিল বীণা। গত মাসে কাকা সেটা একশো টাকা বাড়িয়ে দিল। বলতে নেই, কাকারও দিনকাল ভাল। চোরাপথে ব্যবসার টাকা তো আছেই, বিশ্ববিজয় অপেরার বুকিংও বড় কম হচ্ছে না। খুব নামডাক চারদিকে। বীণার মাইনে সেখানেও কিছু বেড়েছে। টাকা বেশ কিছু জমে গিয়েছিল বীণার হাতে। শ্বশুরবাড়িতে টাকা দেওয়া বন্ধ করেছে অনেকদিন। নিমাইকে আর টানতে হচ্ছে না। এই টাকা দিয়ে সে ঘরের মেঝেটা বাঁধিয়ে নিয়েছে। খুব পোক্ত একটা স্টেনলেস স্টিলের বাক্সের মধ্যে প্লাস্টিকে নিচ্ছিদ্র করে ডলার আর পাউন্ডগুলো বেঁধে সে মেঝের অনেক গভীরে পুঁতে দিয়েছে। মেঝে বাঁধানোর পর হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে সে। পাকা বন্দোবস্ত হয়ে রইল—ব্যাঙ্কের ভল্টের মতো। পাকা মেঝের তলা থেকে তো আর কেউ বের করতে পারবে না সহসা, না জানলে। বীণা ভেবে দেখেছে, ওই ডলার আর পাউন্ড এখন তার কাজে লাগবে না। দরকারও নেই। ওটা ভবিষ্যতের জন্য থাক।

এই ভবিষ্যৎ কথাটা নিয়ে বীণা আজকাল খুব ভাবে। তার ভবিষ্যৎ কী? নিমাইয়ের সঙ্গে যুতে থেকে তার জীবনটা একরকম নষ্ট হচ্ছিল। আর ওই অলস লোকটাও হয়ে যাচ্ছিল অকেজো। বিদেয় হয়ে ভালই হয়েছে। এখন বীণাও স্বাধীন নিমাইও স্বাধীন। কিন্তু তবু বীণা একটা ভবিষ্যৎ দেখতে চায়। কলকাতার বড় দল বা সিনেমায় সে কি কখনও ডাক পাবে? তার মুখ কি কখনও দেখা যাবে দেওয়ালে সাঁটা পোস্টারে? নাম বেরোবে কি কাগজে? ভবিষ্যৎ বলতে সে এসবই বোঝে। ঘরসংসার নয়, ছেলেপুলে নয়, তার ভবিষ্যৎ হবে ওরকমই কিছু। যদি ততটা নাও হয়, ক্ষতি নেই। খানিকটা সে এগিয়েছে, আরও অনেকটা নিশ্চয়ই এগোবে। বয়স এসে ধরার আগেই সে আরও একটু এগোতে চায়।

সুন্দরবনে এক জায়গায় পালা ছিল। মেলা লোক হল আসরে। পালা জমেও গেল খুব। বীণাপাণির ওপর সেদিন যেন কিসের ভর হয়েছিল। এত ভাল পার্ট করল আর এমন গান গাইল যে আসর মাত।

সেই রাতে পালার শেষে কাকা অবধি মুগ্ধ। আঙুল থেকে আংটি খুলে তাকে দিয়ে বলল, নাও বীণা, আজকের জন্য তোমার প্রাইজ।

বীণার সেদিন হাসি আর কান্না একসঙ্গে পাচ্ছিল। এত আনন্দও আছে জীবনে! আংটিটা দু-হাতের অঞ্জলিতে নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে কাকাকে বলল, তোমার মুখ থেকে যা শুনলাম সেইটাই আমার সবচেয়ে বড়

প্রাইজ। আংটিটা ফেরত নাও কাকা।

দেওয়া জিনিস কেউ ফেরত নেয়?

নাও, এটা তোমার কোন গ্রহবৈগুণ্যের জন্য তোমার বউ বানিয়ে দিয়েছিল। এ আমি নিতে পারব না। এটা পরার পর থেকেই তোমার উন্নতি হচ্ছে।

আরে, তাতে কি? আবার একটা বানিয়ে নেবোখন।

না কাকা, আংটিটা পরে থাকো। তুমি বেঁচে থাকলেই আমরা অনেকে বাঁচবো।

দোনোমোনো করে কাকা আংটি ফেরত নিল, কিন্তু তার বদলে কড়কড়ে দুশো টাকা দিল তাকে। বলল, এটাই রাখো তা হলে। প্রাইজ।

বীণার সঙ্গে কাকার সম্পর্কটা খুব ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। তবে খারাপ কিছু নয় এখনও। একবার দলের পাপিয়া নামে একটা মেয়ে তাকে বলেছিল, ও বীণাদি, তুমি কাকাকে বিয়ে করো না কেন?

বীণা অবাক হয়ে বলে, বিয়ে! কী বলছিস? তোর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

আলটপকা বলে ফেললাম বলে রাগ কোরো না। কিন্তু হলে কি খারাপ?

আমার একজন বর আছে। অপদার্থ হলেও আছে। কাকারও বউ আছে। তার চেয়ে বড় কথা আমাদের সম্পর্ক ওরকম নয় মোটেই। তোরা বুঝি এসব নিয়ে আড়ালে আলোচনা করিস?

পাপিয়ার মুখ একটু শুকিয়ে গেল। সে জানে, বিশ্ববিজয় অপেরায় এখন ক্ষমতার দিক দিয়ে কাকার পরেই বীণাপাণি। বীণাপাণি ইচ্ছে করলেই তাকে দলছাড়া করতে পারে। সে কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, কী জানো, আমি ভাবি তোমার আর কাকার জোড় হলে খুব ভাল হত। দুজনে যেন দুজনের জন্যেই জন্মেছে।

বীণাপাণি রাগ করেনি। সে জানে, পুরুষদের সঙ্গে গা ঘষাঘষি করে এই যাত্রা করে বেড়ানো, এর জন্য কানাঘুষো হয়েই থাকে। ওসব গায়ে মাখতে নেই। সে একটু হেসে বলল, মেয়েরাই মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু, জানিস তো? একটু মেলামেশা হলেই কত কী ভেবে নেয় মেয়েরা। হ্যাঁ রে, মেয়েদের স্বাধীনতার কথা যে এত শোনা যায় সেটা কি তবে একটা হুজুগমাত্র? কাকার সঙ্গে আমার মেলামেশাটা কি বন্ধুর মতো হতে পারে না?

তা তো পারেই।

তা হলে হঠাৎ বিয়ের কথা ওঠে কেন? বিয়েটা কোন্ স্বর্গবাস বল ত! বিয়ে ছাড়া মেয়েদের বুঝি আর কাজ নেই?

আমার ভুল হয়েছে বীণাদি। রাগ কোরো না।

বীণাপাণি বিষণ্ণ গলায় বলল, এইটুকু বয়সে, ভাল করে জ্ঞান হওয়ার আগেই আমার বাবা কোথা থেকে একটা লোক ধরে এনে বিয়ে দিয়ে দিল। তার ফলটা কী হল বল তো! ক'টা হাত-পা গজাল আমার? কোন্ আনন্দে ছিলাম? বিয়ের কথা শুনলেই তাই আমার পিত্তি জ্বলে যায়। আর তোরাও হয়েছিস তেমনি, বিয়ের জন্য ল্যাল্যা করে বেড়াস। যেন বিয়ে হওয়া মানেই মোক্ষলাভ।

ভুল হয়েছে বীণাদি। মাপ করে দাও।

এ কথা ঠিক যে বীণা সত্যিই আর ঘরসংসারের কথা ভাবে না। নিমাইকে ছেড়েছে বলে যে আর একজন পুরুষের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে হবে এমনটাতেও সে বিশ্বাস করে না। কিন্তু আবার এ কথাও ঠিক যে, তার

আজকাল এক এক সময়ে বড় ফাঁকা আর একা লাগে। মাঝে মাঝে অম্বলের ব্যথায় সে ঘুমোতে পারে না বলে রাতে জেগে শুয়ে শুয়ে বড় নিঝুম বোধ করে। মনে হয়, তার বুকের ভিতরেও যেন অন্ধকার, ঝিঝি ডাকছে, হাহা করে পাগলা বাতাস বয়ে যাচ্ছে।

বর্ষার শুরুতেই জ্বর হল বীণার। শুরুতেই একশো দুই। পরদিন জ্বর ঠেলে উঠল চারে। সঙ্গে কয়েকবার বমি আর দাস্ত। দুদিন জ্বর নিয়েও সে উঠে সব পরিষ্কার করতে পারল। তৃতীয় দিনে বড্ড কাহিল হয়ে পড়ল শরীর। পড়শী এক ডাকের মাসি এসে দেখে-টেখে বলল, এ জ্বর কিন্তু ভোগাবে।

কী করি বলল তো!

ডাক্তার ডাকিনি?

না, কে ডাকবে? দুদিন তো কাউকে খবরও দিতে পারিনি। আজ তুমি এলে।

ডাক্তার ডাকা তো আর শক্ত কাজ নয়। অধীরকে গিয়ে পাঠাচ্ছি বৃন্দাবন ডাক্তারকে ডেকে আনতে। কিন্তু তোর যে এখন কাছে থাকার লোক চাই।

কাকাকে একটা খবর পাঠাবে? তা হলে দলের কোনও মেয়েকে পাঠিয়ে দেবেন। কুসুমের কথা বোলো। কুসুম এলে ভাল হবে।

তাই হবে মা। মাথাটা ধুইয়ে দিয়ে যাই। উঃ, এ যে অনেক জ্বর।

বৃন্দাবন ডাক্তার এল। দেখেটেখে বলল, টাইফয়েড বলেই তো মনে হচ্ছে। কয়েকদিন দেখা যাক, তারপর ক্লোরোমাইসিটিন দেওয়া যাবে।

বীণা একটু অস্থির হয়ে বলল, এখনই সারিয়ে দিন ডাক্তারবাবু। আমার যে অনেক কাজ।

কাজ বললেই শুনছে কে? প্রধানমন্ত্রীর তো তোমার চেয়েও অনেক বেশি কাজ, তাই বলে কি অসুখ হলে তাঁকে শুয়ে থাকতে হয় না?

আমি যে একা। কে সামলাবে সব?

সেটা তো বলতে পারি না। আর একাই-বা কেন? নিমাই কোথায় গেছে?

সে এখন এখানে থাকে না।

অ। তাই তাকে দেখি না আজকাল। কোথায় থাকে এখন সে!

কাঁচড়াপাড়ায়, দোকান দিয়েছে।

যাক, একটা হিল্লে হয়েছে তা হলে! শুকনো মুখে ঘুরে বেড়াত, দেখে ভারি কষ্ট হত। দোকান দেওয়ার ভারি শখ ছিল।

কুসুম এল বিকেলের দিকে।

কী হল বীণাদি?

ডাক্তার বলছে টাইফয়েড।

ও বাবা!

ভয় পেলি নাকি?

কুসুম একগাল হাসল, আমার আবার ভয়! বাবার ক্যান্সার হয়েছিল, টানা ন'মাস সেবা করেছি। গু-মুত ঘেঁটে আমার অভ্যাস আছে।

সেইজন্যই তো তোকে ডাকা। শোন, বাড়িতে বলে আয়। কয়েকটা দিন আমার কাছেই থাকবি। পারবি তো?

বলেই এসেছি। তোমার চিন্তা নেই।

পারুলদের বাড়িতে একটা তক্তাপোশ পড়ে আছে, ব্যবহার হয় না। ওটা আজই ওরা পৌঁছে দেবে। ওটাতেই শুবি।

তক্তাপোশের কী দরকার ছিল? তোমার তো পাকা মেঝে। এখানেই শুতে পারতাম।

পাকা মেঝে মানে কি আর তেমন কিছু? ড্যাম্প আছে।

জ্বরটা দুপুরের পর এত বাড়ল যে বীণাপাণি একটা ঘোরের মধ্যে ডুবে গেল। ডুবে গিয়ে একটা স্বপ্নের মতো কিছু দেখল। দেখল, বিশাল একটা রেস্টুরেন্টে বসে সে খুব চপ কাটলেট যাচ্ছে। টেবিলে অনেক খাবার। এত খেয়ে শেষ করতে পারবে না।

কে যেন পিছন থেকে বলে উঠল, খাও খাও। খুব খেয়ে নাও, পয়সা লাগবে না। আমাকেও তো অনেক খাইয়েছে।

মুখ ঘুরিয়ে সে নিমাইকে দেখতে পেল। কিন্তু স্বপ্নের চেহারাও অনেক বদলে যায়। এ নিমাই বেশ লম্বা, ভাল স্বাস্থ্য, ফসাও। তবু নিমাই বলে ঠিকই চিনল সে। বলল, শোধ দিচ্ছো নাকি?

জিব কেটে নিমাই বলে, আরে ছি ছি। তোমার ঋণ কি শশাধ করা যায়? তবে আমি নিমকহারাম নই।

তুমি পয়লা নম্বরের নিমকহারাম।

হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই নিমাই এক কাপ আইসক্রিম তার মাথায় উপুড় করে দিল।

বীণা চমকে উঠে বলে, করলে কি? চুলে যে আঠা হয়ে যাবে! আমাকে পালায় নামতে হবে না?

মাথাটা গরম হয়েছে তোমার। ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি।

মাথায় সত্যিই ঠাণ্ডা টের পেয়ে চটকা ভাঙল বীণার। টের পেল কুসুম তার মাথায় জল ঢালছে।

কী করছিস রে কুসুম?

মাথা ধুইয়ে দিচ্ছি। জ্বরটা যে বড্ড উঠেছে। ভুল বকছো।

ভুল বকছি? কী বলছিলাম?

কি সব হাবিজাবি। কাকে যেন নিমকহারাম বলে গাল দিচ্ছিলে।

প্রচণ্ড মাথা ধরা, শরীরের প্রগাঢ় দুর্বলতা সত্ত্বেও একটু হাসল বীণাপাণি। বলল, কাকে গাল দিচ্ছিলাম রে? জ্বরের ঘোরে মুখ ফসকে কত কথা বেরিয়ে যায়।

কী খাবে বলল তো!

খাওয়া! ও নামও উচ্চারণ করিসনি। বমি পায়।

ডাক্তার কী বলে গেছে জানো? ঠেসে খাওয়াতে। ভাত অবধি। জন্মে শুনিনি জ্বর হলে কাউকে ভাত দেওয়া হয়। আজকাল সব নিয়ম উলটে যাচ্ছে।

স্নিগ্ধ জলের ধারায় বড় আরাম পাচ্ছিল বীণাপাণি। চোখ বুজল। ঘুম পাচ্ছে।...

ওমা, এ কি তোমার বউ নাকি?

নিমাই খুব লাজুক হাসি হেসে বলল, ওই আর কি।

তার মানে?

করে ফেললাম বিয়ে। করতেই হত তো : আমার বিরাট ব্যবসা, ওদিকেই পড়ে থাকতে হয়, যত্নআত্তি কে করে বলো!

জ্বলে গেল বীণাপাণি। তবু বলল, খুব বীরত্বের কাজ করেছে তো! তা অমন একগলা ঘোমটা কেন? ঘঘামটা সরিয়ে মুখখানা একটু দেখাও।

নিমাই শশব্যস্তে বলল, দেখর মতো নয়। খেঁদিবুঁচি চেহারা। একেবারেই সাদামাঠা। তোমার ধারেকাছে নয়।

আমাকে কি কোনওকালে সুন্দর দেখেছো তুমি?

ও বাবা! তুমি সুন্দর নও? অমন মুখচোখ, অমন শরীর ক'টা মেয়ের আছে?

থাক, আর খোসামোদ করতে হবে না। ঘোমটাটা খোলো, মুখটা দেখি।

দেখলে তোমার খারাপ লাগবে। ট্যারা, দাঁত উঁচু, কালো।

তাই তো হওয়ার কথা। তোমার কি আর ভাল জুটবে? দোজবরে, তার ওপর অপদার্থ।

ঠিকই বলেছে। আমার মতো মানুষের তত তোমার মতো বউ হওয়ার কথা ছিল না। এ তোমাকে বরং একটা প্রণাম করুক। শত হলেও তুমি সম্পর্কে বড়।

বউটা টিপ করে একটা প্রণাম করেও ফেলল।

একটু পিছিয়ে গেল বীণাপাণি। বউটা যখন উঠে দাঁড়াল, তখন ঘোমটা সরে গেছে। বীণাপাণি অবাক হয়ে দেখছিল, টুকটুকে ফসা ভরাট লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো একখানা মুখ। দুখানা বড় বড় চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।

বীণাপাণি অবাক হয়েই বলে, এ তো ভীষণ সুন্দর! একে পেলে কোথায়?

চারশো বিশটা অমায়িক গলায় বলল, তুমি নিজে সুন্দর বলেই ওকে সুন্দর দেখছে।

তোমার কাছে সত্যি কথা শুনব না এ তো জানিই। কিন্তু কাঁদছে কেন?

ওকেই জিজ্ঞেস করো।

বীণাপাণি মেয়েটার দিকে চেয়ে রইল। মুখটা চেনা ঠেকছে কেন? খুব যেন চেনা।

ও মেয়ে, কাঁদছো কেন?

মেয়েটা বলল, আপনি আমাকে মাপ করুন।

গলার শব্দটাও যেন কোথাও শুনেছে বীণা! চেনা, অথচ ধরা যাচ্ছে না।

আমি মাপ করলুম, কিন্তু যার গলায় ঝুললে টের পাবে কেমন মানুষ।

বউটা আরও কেঁদে উঠে বলে, ও কথা বলবেন না। ওঁর মতো মানুষ হয় না। সাক্ষাৎ দেবতা।

বীণা ফুঁসে ওঠে, দেবতা! দেবতা! পুরুষকে দেবতা বানিয়ে বানিয়েই তো নিজেদের বারোটা বাজালে। ওরা দেবতা নয়, হনুমান। তুমি একটি হনুমানের গলায় মুক্তোর মালা। বুঝলে! কিন্তু হনুমান তো মুক্তোর মর্ম বুঝবে না, চিবিয়ে দেখবে, টানাহ্যাচড়া করবে, তারপর ছিঁড়ে ফেলে দেবে একদিন। অমন দেবতার মুখে আগুন।

আপনি কেন পুরুষদের ওপর এত রেগে আছেন দিদি?

দিদি! খবরদার আমাকে দিদি ডাকবে না। এমনি ডাকতে পারো, কিন্তু বড় সতীনকে ছোট সতীন যেমন দিদি ডাকে তেমন ভেবে নয়। বুঝলে? বরং বীণাদি ডাকবে। আচ্ছা, তোমাকে কোথায় দেখেছি, বলো তো?

আমাকে।

ভীষণ চেনা চেনা লাগছে। একেই বা জোটালে কী করে?

মেয়েটা জবাব দিল না, মুখ নিচু করে পায়ের নখে মাটি খুঁড়ছে।

খুব লাজুক বুঝি তুমি?

মেয়েটা বিষণ্ণ মুখখানা তুলে বলে, লজ্জাই তো ললনার ভূষণ!

তাই বুঝি? তবে আমি তো একদম ভূষণহীনা। আমার একটুও হায়া লজ্জা নেই। কেন, ও বলেনি তোমাকে?

না, তেমন কিছু বলেনি।

ওর যে একটা বউ আছে বা ছিল সেটা বলেছে তো! নাকি সেটা চেপে রেখে বিয়ে করেছে তোমাকে?

সব বলেছেন। কিছু লুকোননি।

যাক, তা হলে একটু সৎ সাহস এখনও আছে। তবে ভাজা ভাজা করে ছাড়বে, দেখো।

নিমাই মিটি মিটি হাসছে। রাগটাগ কিছু নেই মুখে।

আসল শয়তান কারা হয় জানো? যাদের মাথা সবসময়ে ঠাণ্ডা, হাসি-হাসি মুখ, আর মনে জিলিপির প্যাঁচ। ওকে বাইরে থেকে দেখ, কেমন ভালমানুষটি!

দিদি, পায়ে ধরি, ওঁকে নিয়ে ওরকম বলবেন না।

কেন বলব না?

শুনলেও যে আমার পাপ হবে।

আহা ন্যাকা, তোমার পাপ হতে যাবে কোন দুঃখে? শয়তানকে শয়তান বলাই তো ভাল।

উনি যে ভীষণ ভাল লোক।

ছাই ভাল। কতদিন ঘর করেছে?

বেশি দিন নয়। কিন্তু বোঝা যায়।

সজোরে মাথা নেড়ে বীণা বলে, কিছু বোঝা যায় না। আমারই বুঝতে কতদিন সময় লাগল। আচ্ছা, তোমার গলার স্বরটা কোথায় আগে শুনেছি বলো তো!

জানি না তো!

তোমাকে দেখেছি বলেও যে মনে হচ্ছে।

নিমাই হঠাৎ খুব হাসতে লাগল।

তুমি হঠাৎ হাসছো কেন?

চিনতে পারলে না?

না, কে ও?

ভাল করে দেখ।

দেখলাম তো!

তবু পারছে না!

না তো!

তোমার চোখ নেই। নইলে চিনতে দেরি হয়?

বলেই ফেল না।

এ তো বীণা।

তার মানে?

বীণাপাণি। বিষ্ণুপদ বিশ্বাসের মেয়ে। গাঁ শীতলাতলা বিষ্ণুপুর।

বীণা স্তম্ভিত হয়ে বলে, কী যা তা বলছে? মাথা খারাপ হল নাকি?

খুব হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে নিমাই।...

বীণা চোখ মেলে চায়। কপাল ভেজা। বোধ হয় জলপটি দেওয়া হচ্ছে। ঘর একটু আবছা অন্ধকার। বিছানার পাশে দুজন লোক দাঁড়ানো।

কে?

আমি—আমি কাকা।

ও। কখন এলে?

একটু আগে। জ্বরটা কি করে বাঁধালে?

ডাক্তার বলছে টাইফয়েড। কী হবে বলো তো!

কিসের কী হবে? জ্বরজারি তো মানুষেরই হয়।

আমার যে রিহার্সাল চলছে।

কাকা আবার হাসল, প্রাণটা তো আগে। তারপর নাটক। কয়েকটা দিন রিহার্সাল বাদ দিলে কোনও ক্ষতি হবে না।

আমার ভীষণ খারাপ লাগছে।

নাটক-নাটক করে আমিই পাগল বলে সবাই জানে। তুমি তো দেখছি আমার চেয়েও আরও এক ডিগ্রি বেশি পাগল।

এ পাশ থেকে কুসুম বলে উঠল, জ্বরের ঘোরে অনেক ডায়লগও ছাড়ছে।

তাই? বলে কাকা আবার হাসল।

অমন হেসো না তো। আমি জ্বলছি নিজের জ্বালায়।

তোমার আবার জ্বালা কিসের? ঝাড়া হাত-পা।

কাকা, তোমাকে একটা কথা বলব?

বলো না!

আমার একটা কাজ করে দেবে?

নিশ্চয়ই।

কাঁচড়াপাড়ায় কাউকে পাঠিয়ে একটা খোঁজ নেবে?

কার খোঁজ? নিমাইয়ের?

হ্যাঁ।

খবর দিতে হবে তো!

না না।

কাকা ফের হাসল। বলল, মেয়েদের তেজ বেশিক্ষণ থাকে না। তাই না? যেই জ্বর হল অমনি সব বাঁধ ভেঙে গেল?

ভ্রূকুটি করে বীণা বলে, একটুও না। আমি মোটেই ওকে খবর দিতে বলিনি।

তবে কী বলছো?

আমি শুধু জানতে চাই—বলে বীণা থেমে গেল। কী জানতে চায় সে? কী জানতে চায়? নিমাই সত্যিই আবার বিয়ে করেছে কি না? করলেই কি? তার কি যায় আসে?

বীণা বলল, থাকগে।

আহা, লজ্জা পাচ্ছো কেন? বলেই ফেল না।

তুমি হাসছো? খুব মজা, না?

মজারই ব্যাপার। তবে আনন্দও হচ্ছে।

কিসের আনন্দ?

কাকা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে, নিমাই বড় ভাল লোক ছিল বীণা।

হঠাৎ এ কথার মানে?

কি করে মানে বলি? মানেটানে জানি না। কথাটা হঠাৎ মনে এল। তোমার যে এখনও নিমাইয়ের ওপর টান আছে এটাতেই আমার আনন্দ।

মোটেই টান নেই।

আচ্ছা, তাই হল। অত উত্তেজিত হয়ো না। নিমাইকে তা হলে খবর পাঠাতে হবে না তো! এখনও ভেবে দেখ।

না, কিছুতেই না।

তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো বীণা। রিহার্সালের জন্য মন খারাপ কোরো না। বর্ষাকালে তো আর বায়না নেই। পালা নামতে দেরি আছে।

আমার তো আরও কাজ আছে।

সেসব আমি সামলে নেবো। ঘরটা বাঁধালে বুঝি? ভাল কাজ করেছে।

কাকা চলে যাওয়ার পর বীণা খানিকক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থেকে বলল, হ্যাঁ রে, কুসুম, তোরা কি আমাকে আর কাকাকে নিয়ে আড়ালে কিছু বলিস?

হঠাৎ ওকথা কেন?

সেদিন পাপিয়া হঠাৎ কেন আমাকে বলল, বীণাদি তুমি কাকাকে বিয়ে করো!

ওসব কথা রাখো তো এখন।

বল না কুসুম, কেন বলল?

কুসুম একটু হেসে বলে, ওই যে সুন্দরবনে কেরোকাঠি না কোথায় পালার পর কাকা তোমাকে হাত থেকে আংটি খুলে দিয়েছিল, সেই থেকে চাউর হয়েছে।

আংটি খুলে দিলে কী হয়?

আহা, আংটি দিয়েই তো শকুন্তলা আর দুষ্মন্তের বিয়ে হয়েছিল, মনে নেই!

বীণা হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বুজে বলে, ভগবান!

৭১

অপর্ণার ইদানীংকালের জীবনে সবচেয়ে বড় ঘটনাটা ঘটল পরশুদিন, শুক্রবার। একজন ঠাকুরমশাইকে ধরে পাঁজি দেখিয়ে তবেই দিনটা স্থির করে রেখেছিল সে। সঠিক লগ্নটি অবধি বয়ে যেতে দেয়নি। করপোরেশনে সে বাড়ির প্ল্যান জমা দিয়ে এল।

কিন্তু এত বড় ঘটনাটা শুধু তার কাছেই বড়। বাড়ির আর কারও কাছে নয়। ছেলেমেয়েরা কেউ ব্যাপারটাকে পাত্তাই দিল না, এমন কি মণীশ পর্যন্ত নিরুত্তাপ। কিন্তু একটা আনন্দকে সবাই মিলে অনুভব না করলে কি হয়?

আনন্দটা অপণার একার এবং নিজস্বই রয়ে গেল। সারা দিন নানা কাজের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ তার ভাবী বাড়িটার কথা মনে হয়। সুড়কি রংয়ের মিষ্টি একটা দোতলা। গেরুয়া বর্ডার থাকবে তাতে। চারদিকে গাছ-গাছালি থাকবে। দক্ষিণে একটা নিম গাছ, পাশে রাধাচূড়া আর কৃষ্ণচূড়া। একটা পলাশ গাছও থাকবে কোথাও।

কিন্তু বাড়ি হওয়ার আগে কত কি করার থাকবে অপর্ণার? ইট আসবে, সিমেন্ট আসবে, বালি আর পাথরকুঁচি আসবে। মাটি খুঁড়ে ভিত গাঁথা হবে। পিলার উঠবে। ধীরে ধীরে দেওয়াল, গাঁথনি, ছাদ ঢালাই। একটা শূন্য স্থানে স্বপ্নের মতো, ম্যাজিকের মতো তৈরি হবে একখানা বাড়ি। আর কেউ না হোক অপর্ণা প্রথম থেকেই সাক্ষী থাকবে ঘটনাটার। সারা দিন সে ছাতা মাথায় দিয়ে বসে থাকবে একটি কোণে। কাজ দেখবে, পাহারা দেবে, কাজের ফাঁকি ধরবে। আর এইসব করতে করতে ওই বাড়ির প্রতিটি ইটে, কাঠে, খাঁজে, কোণে সঞ্চারিত হতে থাকবে তার মায়া আর ভালবাসা। একখানা বাড়ি এমনিতেই কিছুই নয়। কিন্তু অপর্ণার বাড়ির মধ্যে সে নিজেও মিশে থাকবে ইট কাঠ সিমেন্টের মধ্যে।

আজ রবিবার। কিন্তু সব রবিবারই ঠিক রবিবারের মতো হয় না। আজকের রবিবারটা কেমন যেন গোমড়ামুখো, নীরব, নীরস আর ঘটনাহীন। ফি রবিবারের মতোই আজও কিছু ভালমন্দ রান্না হচ্ছে। মুর্গির মাংস আর ফ্রায়েড রাইস। এসব আজকাল খুব সাবধানে রাঁধতে হয় অপর্ণাকে। মণীশের রিচ খাওয়া বারণ। অপর্ণা তাই মাংসটা রাঁধে অনেকটা স্টু-এর মতো করে। ফ্রায়েড রাইস রাঁধে স্যালাড অয়েল দিয়ে। যাতে মণীশও খেতে পারে।

সকাল থেকে মণীশ আজ গোটা চারেক খবরের কাগজ নিয়ে বসেছে নিজের ঘরে। ব্রেকফাস্টের সময় রবিবার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হইহই করে। এমনই কপাল যে, আজ সেটাও ঘটেনি। বুবকা সকালে জগিং করে এসেই চলে গেল স্কুলের ফেট-এ। অনু গেল ওয়েস্টার্ন মিউজিকের ক্লাস করতে। ঝুমকি আছে বটে, কিন্তু না

থাকার মতোই। টনসিল ফুলে কষ্ট পাচ্ছে খুব। অনেক বেলা অবধি শুয়ে ছিল। একটু আগে উঠেছে। চা খেয়ে আবার শুয়েছে, জ্বর জ্বর ভাব।

বাসমতী দেরাদুন চালের ভাতটা চড়িয়ে একটু হাঁফ ছাড়ল অপর্ণা। হোক। মাংস হয়ে গেছে। কাজের মেয়েটা স্যালাড কাটছে, খাওয়ার মুখে একটু ভাজাভুজি করে দিলেই হবে।

প্রথমেই মেয়ের ঘরে হানা দিল সে।

কী করছিস, এই মেয়ে?

ঝুমকি করুণ চোখ মেলে তাকাল, শুয়ে আছি, দেখছ তো!

কেমন লাগছে?

ভাল না। ঢোঁক গিলতে গলায় লাগছে।

কতবার করে বলি, বাইরে বেরনোর সময় গলাটা মাফলার দিয়ে জড়িয়ে নে! কখনও কথা শুনিস?

মাফলার গলায় দিয়ে বেরনো যায় বুঝি?

কেন যাবে না? রোগ হলে সব করতে হয়।

এ মা, মাফলার যে বিচ্ছিরি জিনিস।

অন্তত একটা স্কার্ফ তো গলায় বাঁধতে পারিস! যার টনসিলের অসুখ তার কি স্টাইল করলে চলে?

উঃ, অত জোরে কথা বোলো না তো মা। মাথা ধরেছে, জোরে শব্দ হলে মাথা দপদপ করে।

সকালে তো কিছু খেলি না। এখন একটু দুধ খা।

ইচ্ছে করছে না। একটু শুয়ে থাকতে দাও চুপ করে।

খুব রেগে যাচ্ছিল অপর্ণা। রাগটা সামাল দিল। মেয়ের কপালে হাত দিয়ে দেখল, একটু টেম্পারেচার আছে।

ডাক্তার ডাকব রে?

না মা, টনসিল তো আমার পুরনো বন্ধু। চিন্তা কিসের?

বন্ধু না শত্রু? ওরকম বন্ধুর সঙ্গে ভাব না রাখলেই হয়।

ডাক্তার ডেকো না মা। গুচ্ছের অ্যান্টিবায়োটিক গেলাবে। ওসব খেলে আমার আরও শরীর খারাপ হয়।

আচ্ছা, বাড়িতে একজন শুয়ে থাকলে কি ভাল লাগে, বল তো!

ইচ্ছে করে শুয়ে আছি নাকি?

একটু উঠে রোদে গিয়ে বোস না।

না মা, এই বেশ আছি। বাবাকে একটু আমার কাছে এসে বসতে বলল।

অপর্ণা স্থির চোখে মেয়ের দিকে চেয়ে বলে, আমি যে তোর কাছে বসে আছি সেটা বুঝি কিছু নয়? আমি কি তোদের কেউ নই?

ঝুমকি একটু হেসে মায়ের একখানা হাত ধরে বলল, কে বলে তুমি কেউ নও? বাবা কাছে এলে ভাল লাগে, তাই বলছিলাম।

আর আমি কাছে এলে ভাল লাগে না, না?

খুব লাগে মা। তুমিও থাকো। কিন্তু তোমাকে তো ডেকে পাই না। কত কাজ তোমার! একটু বসেই উঠে যাও।

আর তোর বাবা বুঝি সারা দিন বসে থাকে তোদের কাছে?

খুব হিংসুটি হয়েছে তো মা!

অপর্ণা ঠাট্টা করছিল না। তার দু' চোখ ভরে জল আসছিল। তার তিনটে ছেলেমেয়েই কোন এক আশ্চর্য কার্যকারণে মণীশের ভক্ত। বাবা ওদের প্রাণ। সেটা মোটেই অপর্ণার খারাপ লাগে না। হিংসেও হয় না। কিন্তু তার মাঝে মাঝেই মনে হয়, ওরা তাকে ততটা ভালবাসে না যতটা ভালবাসা উচিত ছিল।

মায়ের মুখ দেখে দুঃখে করুণ হয়ে গেল ঝুমকি, ও মা, তোমার চোখ ছলছল করছে কেন? আমি কী বলেছি বলো ত! শুধু তো বলেছি বাবাকে একটু আমার কাছে এসে বসতে বলল। তাতে কি দোষ হল মা?

না, দোষ হবে কেন?

এ কথায় তো কিছু নেই মা।

সে আমি জানি আর ভগবান জানে। তোরা যে কেন আমাকে সহ্য করতে পারিস না!

ঝুমকি দু' হাতে অপর্ণার কোমরটা জড়িয়ে ধরে বলল, মা গো, রাগ কোরো না, লক্ষ্মী মেয়ে।

রান্নাঘর থেকে কাজের মেয়েটা হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল, ই মা! গ্যাস যে ফুরিয়ে গেল!

অপর্ণা তড়িৎগতিতে উঠে দাঁড়াল, কী হয়েছে রে?

তোমার গ্যাস নিবে গেছে।

ফ্যান পড়ে নেবেনি তো?

না গো, ফ্যান পড়বে কি, ওথলায়নি তো এখনও।

ছোটখাটো দুশ্চিন্তাগুলোই কুরে খায় অপর্ণাকে। এই যে গ্যাস ফুরোলো এটা কোনও সমস্যাই হয়তো নয়। কিন্তু তার কাছে এখন এটাই মস্ত সমস্যা। ভরা সিলিন্ডার রয়েছে তিনটে ঘর পেরিয়ে সেই বারান্দায়। দুর্ঘটনার ভয়ে তারা বারান্দায় সিলিন্ডার রাখে। রান্নাঘর থেকে যেটা অনেকটাই দূর। এখন ওই ভারী সিলিন্ডার টেনে আনবে কে? আগে মণীশ আনত, ইদানীং বুবকা। কিন্তু মণীশের পক্ষে অসম্ভব, কোনও ভারী কাজ করা তার একদম বারণ, বুবকা বাড়ি নেই। কী হবে এখন?

দেখলি তো কপালটা আমার! এখন কী করি?

ঝুমকি বলল, ভাবছো কেন? বুবকা এসে যাবে। তুমি বসে থাকো।

পাগল! আধসেদ্ধ ভাত ফেলে রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে। কত দামী চাল!

তোমার যে কত প্রবলেম মা!

অপর্ণা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, সংসারটা তো আমাকেই চালাতে হয় কিনা, তাই প্রবলেমগুলোও যে আমারই। যাই দেখি গে!

রান্নাঘরে এসে অপর্ণা সিলিন্ডার ঝাঁকিয়ে বুঝল, গ্যাসই ফুরিয়েছে বটে। এবং ভাত খুব বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। এখনই আগুনে না বসালে নষ্ট হয়ে যাবে।

স্যালাড কুটতে কুটতে কাজের মেয়েটা বলল, বাবাকে বলল না, সিলিন্ডার লাগিয়ে দেবে।

তোর যেমন বুদ্ধি! বাবা কত বড় অসুখ থেকে উঠেছে জানিস? যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

একটু উঁচুগ্রামেই কথা হয়ে থাকবে। মণীশ শোওয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রান্নাঘরের সামনে দাঁড়াল। চোখে চশমা, হাতে খবরের কাগজ।

কী হল বলল তো! এনি প্রবলেম?

আর বোলো না। গ্যাসটা ফস করে ফুরিয়ে গেল।

ওঃ, তাতে কি হল? এখনই লাগিয়ে দিচ্ছি।

তুমি? বলে একটা আর্ত চিৎকার করে ওঠে অপর্ণা।

মণীশ যাওয়ার জন্য ঘুরেছিল খানিকটা, থমকে গিয়ে বলে, কী হল?

তুমি সিলিন্ডার টানতে যাচ্ছ?

বরাবর তো আমিই লাগিয়েছি।

অপর্ণা দুখানা বড় বড় চোখে তার দিকে চেয়ে বলল, সত্যিই তুমি বোধ হয় মানুষও খুন করতে পারো। ওই ভারী সিলিন্ডার টানলে তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে? যাও, চুপচাপ ঘরে গিয়ে বসে থাকো। রান্নাঘরের প্রবলেম আমি সামলাব।

মণীশের খেয়ালই ছিল না যে, তার হার্টের অসুখ। এ কথায় হঠাৎ সে আনমনে বাঁ হাতটা তুলে নিজের বাঁ পাঁজরে রাখল। তারপর বলল, আমি কি ততটা আনফিট?

অপর্ণা মেঘগর্জনের মতো বলল, ডাক্তারের বারণ, মনে থাকে যেন।

হার্ট অ্যাটাক হলে আর কি কোনওদিনই নর্মাল লাইফে ফিরে আসা যায় না অপু? সামান্য একটা সিলিন্ডার লাগানো এমন কি শক্ত কাজ?

খবরদার বলছি। আর একটাও কথা নয়।

ঝুমকি ঘর থেকে উঠে এল। বাবার পাশে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে দু' হাত দিয়ে একটু ভর রেখে বলল, না বাবা, তুমি এসব করবে না।

মণীশ একটু হেসে বলে, দেখ না একদিন এক্সপেরিমেন্ট করে। আমি শক্ত মালে তৈরি।

অপর্ণা চোখ পাকিয়ে বলে, তুমি কী দিয়ে তৈরি তা আমার জানা আছে। খুব বীরপুরুষ। কিন্তু বয়সটাও বসে নেই আর শরীরটাও লোহা দিয়ে তৈরি নয় এটা মনে রেখো।

ঝুমকি বলল, আচ্ছা মা, এক কাজ করলে হয় না? আমি আর বাবা ধরাধরি করে নিয়ে আসি না কেন?

অপর্ণা দৃঢ় গলায় বলে, না কখনও না। মেয়েদের ভারী জিনিস টানা একদম ভাল নয়।

বাঃ রে, আজকাল তো মেয়েরা ওয়েট লিফটিংও করে।

যে করে করুক। তোমাকে করতে হবে না।

মণীশ ঝুমকির মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, দ্যাটস্ এ গুড প্রোপোজাল। তবু তোমার যদি আপত্তি থাকে তবে তুমিও চলো হাত লাগাবে। তিনজনে মিলে আনলে সিলিন্ডার ব্যাটা খুব জব্দ হবে। চলো।

বাসমতী অত্যন্ত সুখী চাল। একটুতেই গলে যাবে বা আঠা হয়ে যেতে পারে। চালটা নতুনও বটে। বুবকার জন্য আর অপেক্ষা করলে সমস্যা দেখা দিতে পারে। অগত্যা বেজার মুখে অপর্ণা বলল, তোমাকে ধরতে হবে না। আমি আর ঝুমকি বরং গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে আসি।

মণীশ মাথা নেড়ে বলে, তাতে মেঝেতে দাগ পড়বে। সরো, ফাঁকা সিলিন্ডারটা সরিয়ে নিয়ে যাই।

না না, তুমি না।

মণীশ কথাটা কানে তুলল না। সিলিন্ডারটা গিয়ে খুলে ফেলল। ঝুমকি গিয়ে ধরল। তাড়াতাড়ি।

ছেড়ে দে। এটা হালকা, আমি পারব।

অপর্ণা ফের চেঁচাল, তুমি তো সবই পারো। আমার গলাটা টিপে ধরতে পারো না?

আরে বাবা, এটা সত্যিই হালকা। ধরেই দেখ না।

আমি জানি। বলে অপর্ণা ঝুমকির দিকে চেয়ে বলল, হ্যাঁ রে, বাপের গন্ধে উঠে এলি বুঝি? এখন বুঝি আর শরীর খারাপ লাগে না?

দুজনে ধরাধরি করে যখন সিলিন্ডার বারান্দায় নিয়ে যাচ্ছিল তখন অপর্ণাও গেল সঙ্গে সঙ্গে। মণীশ সব পারে। ওকে বিশ্বাস নেই। হয়তো ঝুমকিকে ফাঁকি দিয়ে নিজেই আনবে টেনে জগদ্দল জিনিসটা। অপর্ণা আগেভাগেই গিয়ে সিলিন্ডারের হাতল চেপে ধরল।

একটু হাসল মণীশ। ভরা সিলিন্ডারটা তিনজনে মিলে তুলল বটে কিন্তু ঝুমকি বা অপর্ণার গায়ে তেমন জোর নেই। কার্যত মণীশই ওজনের সিংহভাগ বহন করল। সেটা টের পাচ্ছিল অপর্ণা, বলল, তুমি অমন ঝাঁকুনি দিলে কেন? ...ওই দেখ, তুমিই তো দেখছি বেশি ভার নিচ্ছ... আহা, অত তাড়াতাড়ি কোরো না...

সামান্য কাজ, তবু কত অসামান্য হয়ে গেছে আজকাল। মণীশের হাঁফ ধরে গিয়েছিল রান্নাঘর অবধি আসতেই। কিন্তু জোর করে হাঁফধরা খাস গোপন করল সে। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক শ্বাস ছাড়ার চেষ্টা করতে করতে সিলিন্ডারটা লাগিয়ে দিল সে।

বাবা!

কী রে!

আমার কাছে এসে একটু বসবে?

কেন, তোর কী হয়েছে?

শরীরটা ভাল নেই। জ্বর।

দেখি। বলে নিজের গালটা মেয়ের কপালে ঠেকিয়ে বলল, টেম্পারেচার তো আছে দেখছি।

বাবা, তোমার বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে কেন?

কোথায়! না তো।

করছে কিন্তু বাবা।

সামান্য। ওটা কিছু নয়।

অপর্ণা গ্যাস জ্বালাতে ব্যস্ত ছিল বলে এই ডায়লগটা শুনতে পেল না। পেলে বিপদ ছিল।

ঝুমকির ঘরে ঢুকে চারদিকে চেয়ে মণীশ বলে, বাঃ, ঘরটা তো বেশ গুছিয়ে রাখিস তুই?

মা রোজ বকে, জানো? বলে আমি নাকি ভীষণ অগোছালো।

কই, আমার চোখে তো অগোছালো ঠেকছে না।

বোস না বাবা, একটু গল্প করি।

তোর শরীর খারাপ, শুয়ে পড়। আমি বসছি।

শোবো না। এখন ঘাম হচ্ছে। একটু ভাল লাগছে। বাবা, তোমার অফিসে আমার একটা চাকরি কি কিছুতেই হয় না?

চাকরি করবি কেন? তোর কিসের অভাব?

অভাব! অভাব তো কিছু নেই। কিন্তু বসে থাকব কেন?

তোর চাকরি করা উচিত নয়। যার চাকরির প্রয়োজন নেই সে যদি চাকরি করে তা হলে আর একজন নিডিকে সে বঞ্চিত করে।

আমার যে দরকার বাবা।

কিসের দরকার সেটা বলবি তো!

আমার নিজের পায়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে।

তোর মা তো চায় তোর বিয়ে দিতে।

বিয়ে? কক্ষনও না।

না কেন?

ওসব আমার ভাল লাগে না।

মণীশ একটু হাসল। চেয়ারে বসে দেওয়ালে একটা টিকটিকির কিছু কেরামতি দেখতে দেখতে বলল, ভাল। খুব ভাল।

কি ভাল?

স্বাধীন থাকার ইচ্ছাটা।

তুমি আমাকে সাপোর্ট করছ তো?

করছি। তোর বিয়ে হলে আমি অনেকটা একা হয়ে যাব। হার্ট দুর্বল, হয়তো আর একটা অ্যাটাকও হয়ে যাবে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে, বেশ ভাল। আবার অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে মোটেই ভাল নয়।

ভাল নয় কেন বাবা?

এককথায় কি এর জবাব হয়? আমরা কেউ কোনও অবস্থাতেই স্বাধীন নই। স্বাধীনতা একটা রিলেটিভ ধারণামাত্র। এক ধরনের আই ওয়াশ। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা মানেই চাকরির অধীনতা, সেখানেও হুকুম করার লোক আছে, বাধ্যবাধকতা আছে। পুরো স্বাধীনতা কোথাও নেই।

তবু বিয়ের চেয়ে অনেক সম্মানজনক!

তাই কি?

সিস্টেমের অধীনতা মানা যায়, কিন্তু বিশেষ একজন পুরুষের বাঁদী হয়ে থাকব কেন?

তোর মা কি আমার বাঁদী?

তোমাদের কথা আলাদা। তোমাদের মতো কাপল ক'টা আছে?

বিয়ে হলে দেখবি, তুইও তোর মায়ের মতোই। স্বাধীনতার ব্যাপারটা কেমন জানিস? দুধ ফেলে পিটুলিগোলা খাওয়ার মতো। যে সব মেয়েরা সব সময়ে স্বাধীনতা স্বাধীনতা করে তারা একটু সাইকিক কেস।

বাবা! তুমিও একথা বলছ?

মণীশ একটু ক্লান্ত হাসি হেসে বলে, ভালবাসার অভাব হলেই মানুষ একটা অলটারনেটিভ খোঁজে। স্বাধীনতা হল সেই জিনিস। স্বাধীনতা ব্যাপারটাই আমি বুঝতে পারি না।

সকাল থেকে দুপুর অবধি স্তিমিত রবিবারটা আবার একটু চাঙ্গা হল বুবকা আর অনু ফেরার পর। মুর্গি আর ফ্রায়েড রাইস দুটোই জমে গেল খুব। হইহই হল।

ক্লান্ত মণীশ দুপুরে বেশ কিছুক্ষণ ঘুমল। বুকে একটা অস্বস্তি তার আছেই। ব্যথা নয়, ধড়ফড়ানি নয়, শুধু মনে হয় কে যেন একটা আঙুলের ডগা তার বুকের বাঁ ধারে ছুঁইয়ে রেখেছে। এই অস্বস্তিটা সে প্রায় সবসময় টের পায়।

ঘুম থেকে উঠে যখন ঘড়ি দেখল মণীশ তখন পৌনে চারটে। তার পাশেই ঘুমোচ্ছে অপর্ণা। ইদানীং একটু মোটা হয়েছে। চুলগুলো কিছু ফাঁকা। দু-একটা সাদার ঝিলিক।

মনটা খারাপ লাগল তার। বয়স হচ্ছে।

পত্রিকার পাতা নাড়াচাড়া করল আরও কিছুক্ষণ। আধঘণ্টা পর উঠল অপর্ণা।

উঠেই বলল, এই তোমাকে অমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন?

ফ্যাকাসে? যাঃ, আমি তো ভাল আছি।

কিন্তু কেমন দেখাচ্ছে বলো তো! টায়ার্ড ফিল করছ?

না তো।

কতদিন চেক-আপ হয়নি! কাল চলো তো, চেক আপ করাবো।

মাসখানেক আগেই হয়েছে। অকারণ ভয় পেও না।

একটু চুপ করে থেকে অপর্ণা বলে, একটা কথা বলবো?

বলো।

আমি যে বাড়ির প্ল্যান জমা দিলাম তাতে তুমি খুশি হওনি?

মণীশ একটু অবাক হয়ে বলে, আলাদা করে খুশি হওয়ার মত ঘটনা কি সেটা?

আমাদের বাড়ি হবে এটা ভাবতে তোমার ভাল লাগছে না?

বাড়ি! বলে মণীশ কিছুক্ষণ যেন ভাবল। তারপর বলল, বাড়ি।

তার মানে কি হল?

মণীশ একটু হাসে, বাড়ি তো ভাল জিনিস। নিজেদের বাড়ি।

ঠেস দিচ্ছ কেন?

মণীশ হঠাৎ খুব অন্যমনস্ক হয়ে গেল। শূন্য চোখে চেয়ে থেকে খুব ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, কোথায় বাড়ি কে জানে?

ওটা আবার কেমন কথা?

ওটাই কথা অপু। বাড়ি যে কোথায় তা কি জানি! কে জানে সেই বাড়ির চেহারা কেমন?

ফের ওসব বলছ?

তোমার আনন্দ দেখে আমারও একরকম আনন্দ হচ্ছে। একটা খেলনা পেয়ে বাচ্চা যেমন ভুলে থাকে তুমিও তেমনি।

বাড়ি কি খেলনা?

একটু সিরিয়াস খেলনা। একটু দামী। এই যা।

তোমার ফিলজফির জ্বালায় কি আমি পাগল হয়ে যাবো?

মণীশ নড়েচড়ে বসে বলল, আচ্ছা, ভেবে দেখি আর একটু। এক কাপ চা করে আনো। ততক্ষণ ভেবে ফেলি।

থাক, তোমাকে আর ভাবতে হবে না।

অপর্ণা চা করে এনে দেখে, মণীশ জানালার ধারে চেয়ারে এলিয়ে বসে আছে। মুখচোখ ভাল নয়। দুর্বল। একটু জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে।

কী হল তোমার?

মণীশ অবাক হওয়ার ভান করে বলে, কী হবে? তোমার যে রজ্জুতে সর্পভ্রম হচ্ছে।

শরীর খারাপ নয় তো?

না। শরীর ঠিক আছে।

শোনো। হার্ট এইলমেন্টে মনেরও একটা ভূমিকা আছে। তুমি আবার আগের মতো একটু ফুর্তিবাজ হয়ে ওঠো তো!

মণীশ চায়ে চুমুক দিয়ে ভ্রূ কুঁচকে কী ভেবে নিয়ে বলে, অপু, তুমি বরং ঝুমকির বিয়ের চেষ্টা করো।

হঠাৎ একথা কেন?

বিয়েটা দিয়ে যাই।

দিয়ে যাই কথাটার অর্থ জানো?

জানি। জেনেই বলছি।

হ্যাঁ গো, তোমার তবে সত্যিই শরীর ভাল নেই। ডাক্তার ডাকবো?

না। এখনও ডাক্তারের দরকার নেই। কিন্তু যা বলছি শোনো।

কী শুনবো?

ঝুমকির বিয়েটা এবার দেওয়া দরকার।

মেয়ে কি আমার কথা শুনবে? তুমি বুঝিয়ে বলল।

একটু খোঁজ নাও। হতে পারে, শী ইজ ইন লাভ উইথ সামওয়ান। কিন্তু হয়তো প্রেমটা একতরফা। একটু খোঁজ নাও।

কার কাছে খোঁজ নেবো? ও মেয়েকে কেটে ফেললেও একটি কথা বের করা যাবে না।

মণীশ চুপ করে রইল। অনেকক্ষণ বাদে বলল, তা হলে বাড়িটাই হোক।

৭২

রশ্মি চলে যাওয়ার দিন চারেক পর ফের গাঁয়ের কুটিরে ফিরে গেল বটে হেমাঙ্গ। কিন্তু বেশি দিন থাকা হল না। তার পার্টনাররা তাগাদা দিচ্ছে, কাজকর্মে মন দাও। বিস্তর কাজ পেন্ডিং।

অস্বাভাবিকতাটা হেমাঙ্গও বুঝতে পারছে। সে যদি কাজ না-ই করে তা হলে ফার্ম থেকে তার শেয়ার তুলে নিয়ে বেকার হয়ে যেতে হবে। তার চেয়েও বড় কথা, নিজের কেসগুলি যদি সে না করে তা হলে ক্লায়েন্টরা অন্য ফার্মের কাছে চলে যাবে। তাতে বিস্তর ক্ষতি। শুধু তার নয়, পার্টনারদেরও।

সুতরাং হেমাঙ্গ তার কুটির ছেড়ে কলকাতায় ফিরল। দাড়িটা কাটল না। রয়ে গেল। কলকাতায় ফিরেই আকণ্ঠ কাজে ডুবে গেল সে। তার ফাঁকে ফাঁকেই ক্লায়েন্টের ডাকে যেতে হল বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, কানপুর। গাঁয়ে থেকে থেকে একটা জড়তা আসছিল শরীর আর মনে। কাজের জাঁতাকলে পড়ে সেটা কেটে গেল।

দীর্ঘদিন আলস্যজড়িত সময় কাটানোর পর হঠাৎ এত কাজের চাপে প্রথমটা হাঁফ ধরে যাচ্ছিল হেমাঙ্গর। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে সয়ে গেল। রশ্মির ফাঁকা জায়গাটা কি কাজ দিয়েই ভরাট করে নেওয়া যাবে!

প্রায় দু' মাস বাদে এক রাতে রশ্মির টেলিফোন এল লন্ডন থেকে।

কোথায় থাকো বলো তো! অন্তত তিনবার ফোন করেছি গত দু' মাসে। ফের কি গাঁয়ে ফিরে গেছ নাকি?

না রশ্মি। অনেক দিনের কাজকর্ম জমে ছিল, বাইরে যেতে হল কয়েকবার। কেমন আছ?

খুব ভাল। প্রথমটায় এসে এক বান্ধবীর কাছে ছিলাম কয়েকদিন। তারপর কাউনসিলের ফ্ল্যাটে। এক সপ্তাহ হল গ্রিনফোর্ডে একটা বাড়ি কিনেছি।

বাড়ি কিনেছ?

ছোট সুন্দর বাড়ি। বেশ অনেকটা জায়গা আছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে অগোছালো হয়ে দিব্যি আছি। এবার এখানে ভীষণ ঠাণ্ডা। তুমি কেমন আছ?

এই একরকম। একটু ফাঁকা লাগছে। তুমি নেই।

রশ্মি হাসল, বোকা। আমি তো হাতের নাগালেই। কলকাতা থেকে কেউ কেউ আজকাল উইক-এন্ডেও লন্ডনে আসে, তা জানো?

সে যারা পারে তারা যায়।

সামারে চলে এসো না! ওই সময়ে আমার মাও আসবে আমার কাছে। ইউরোপে একটা ট্রিপ দিয়ে আসব। আর শোনো, আমরা কিন্তু এখন অ্যাডাল্ট। কথাটা মনে রেখো।

একটু বিষণ্ণ হাসল হেমাঙ্গ। রশ্মি তাকে ডাকছে। সে গিয়ে রশ্মির সঙ্গেই থাকবে? তার সঙ্গেই ইউরোপ ঘুরবে? না, সেটা পেরে উঠবে না হেমাঙ্গ।

মুখে সে বলল, আচ্ছা, দেখা যাবে। গাড়ি কিনেছ?

হ্যাঁ। একটা সেকেন্ড হ্যান্ড মার্সিডিস। দাড়িটা কি কেটে ফেলেছ?

না। আছে।

তা হলে কেটো না। দাড়িতে তোমাকে বেশ রোমান্টিক দেখাচ্ছিল।

তোমার নিশ্চয়ই লন্ডনে গিয়ে ভাল লাগছে?

দারুণ। তুমি তো জানোই এটাই আমার দেশ। এখানে আমি যত নিশ্চিন্ত বোধ করি ততটা আর কোথাও নয়। দিস ইজ মাই হোম। এখানেই জন্মেছিলাম, হয়তো এখানেই মরব।

জানি। তুমি এখানে একদমই স্বচ্ছন্দে ছিলে না।

না। আমার হাঁফ ধরে যেত।

বরফ পড়ছে?

আমি আসার পর একদিন পড়েছিল। সবুজ একটু মরে গেছে, কিন্তু তবু লন্ডন এই সিজনেও কলকাতার চেয়ে অনেক বেশি গ্রিন।

কোনও অশান্তি নেই তো?

লন্ডনে বরাবর কিছু অশান্তি থাকেই। তবে এখনও তো লন্ডন পুলিশ আর্মস ক্যারি করে না। ভয় পাওয়ার মতো কিছু নয়। গ্রিনফোর্ড খুব পিসফুল এলাকা। সামারে আসবে? কথা দাও।

চেষ্টা করব।

তোমার সেই শপিং-এর নেশাটা এখনও আছে? নতুন কী কিনলে?

হেমাঙ্গ মৃদুস্বরে বলল, কিছু না। অনেক দিন কিছু কিনিনি। আজকাল খুব গেঁয়ো হয়ে গেছি।

তাই বুঝি? এটা তো খুব ভাল খবর।

রশ্মি, তুমি কাকে সবচেয়ে বেশি মিস করছ?

জানো না বুঝি? বলে রশ্মি একটু শব্দ করে হাসল, তোমাকেই মিস করছি।

ওখানে তোমার এখন নিশ্চয়ই অনেক কাজ!

ওঃ ভীষণ। চাকরির পর বাড়ি এসে অনেক রাত অবধি পড়াশুনো করি। তার ওপর রান্নাটান্নাও করতে হচ্ছে। সময় একদম পাই না।

এইরকম আরও কিছুক্ষণ আলগা কথা হল। তারপর ফোন ছেড়ে দিল তারা। হেমাঙ্গ ভাবতে বসল, রশ্মির সঙ্গে কথা বলে তার কোনও ভাবান্তর হল কি? বুকে দামাল রক্ত ছুটল কি পাগলা ঘোড়ার মতো? আলো হয়ে গেল কি অন্ধকার মন?

না, ঠিক তা হল না। কিন্তু ভাল লাগল। সেই মৃদু ভাললাগা যেন আফটার শেভ লোশনের মৃদু গন্ধের মতো লেগে রইল অনেকক্ষণ তার মনে।

আজকাল চারুশীলা ফোন করে না। একটু রাগ করেছে। করতেই পারে। চারুশীলা খুব চেয়েছিল, বিয়েটা হোক। চেষ্টাও করেছিল যথাসাধ্য। অপমানটা ভুলতে পারছে না।

রশ্মির ফোন আসার দু' দিন বাদে সে চাকুশীলাকে ফোন করল এক রাত্রে।

কেমন আছিস চারুদি?

এই একরকম। তোর কি খবর?

আমারও ওই একরকম। রেগে আছিস নাকি?

রাগব কেন?

আজকাল খোঁজ নিচ্ছিস না।

শুনতে পাচ্ছি তুই নাকি ভীষণ ব্যস্ত। দিল্লি-বোম্বাই করে বেড়াচ্ছিস।

ব্যস্ত ছিলাম।

রশ্মির কোনও খবর পেয়েছিস?

দু' দিন আগে ফোন করেছিল।

কী বলে?

ভাল আছে। ওটা তো ওর দেশ, জন্মভূমি।

আমাকেও ফোন করেছিল।

তাই নাকি? কী বলছে তোকে?

ভালই। তোর কথাও হল। তোকে মিস করছে।

জানি।

কী যে করলি তুই-ই জানিস।

প্রসঙ্গটা ভুলতে পারছিস না কেন?

ভুলব? রশ্মিকে কি ভোলা যায়?

রশ্মিকে ভুলবি কেন? কী বোকা তুই! বিয়ের প্রসঙ্গটার কথা বলছি। ওটা তো এখন ইতিহাস।

ইতিহাস ভুলতে হয় বুঝি?

ভুলে যা চারুদি। প্লিজ! ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।

এখন ভগবানকে টেনে এনে নিজের দোষ ঢাকছিস? বেশ ছেলে!

আচ্ছা চারুদি, তুই কেন আমার জীবনটায় অশান্তি ঢোকাতে চাস বল তো! আমার বহুকালের একটা মাত্র শখ, সেটা হল একা থাকা। অনেক কষ্টে বাবা-মাকে বুঝিয়ে বিডন স্ট্রিটের বাড়ি ছেড়ে এখানে এসে দিব্যি ছিলাম। তোরা তার মধ্যে একগাদা জটিলতা এনে ফেললি।

রশ্মিকে কি আমি এনেছিলাম ধরে?

আমিও আনিনি, রশ্মি একটা আকস্মিকতা, আমরা বন্ধুর মতোই তো ছিলাম। বিয়ের আইডিয়াটা তোর মাথায় খেলেছিল বোধ হয়।

সেটা তোর ভালর জন্যই। পরে পস্তাবি।

প্রসঙ্গটা থাক চারুদি। অনেক দিন আমাকে নেমন্তন্ন খাওয়াসনি। একদিন খাওয়াবি।

যেদিন খুশি চলে আয়।

সুব্রতদা বাইরে চলে যায়নি তো?

না। এখন কিছুদিন থাকবে। ইউ পি-তে একটা বড় প্রোজেক্টের কাজ পেয়েছে। এখন তার বেস ওয়ার্ক চলছে।

কলকাতায় আছে তো?

আছে। কালকেই আয়।

সন্ধের পর যাব।

চারুশীলা খুশি হল। বলল, তোর মস্ত সাপোর্টার হল তোর সুব্রতদা। কেন রে?

আমি লোকটা যে ভাল।

ছাই ভাল। ও কেবল বলে, হেমাঙ্গ ইজ এ গুড ডিসিশন মেকার। আমি শুনে হেসে বাঁচি না। শালুক চিনেছে গোপালঠাকুর।

সুব্রতদা ইজ এ ওয়াইজ ম্যান।

দু'জনে দু'জনের পিঠ চুলকে গেলেই তো হবে না। তোরা দু'জনেই চূড়ান্ত ইমপ্র্যাক্টিক্যাল।

কাল যাচ্ছি তা হলে।

ফোন ছেড়ে দিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল হেমাঙ্গ। আজকাল টি ভি বা ভি সি আর ছাড়তে ইচ্ছে হয় না। গান শুনতে ইচ্ছে হয় না। বই পড়তে ইচ্ছে হয় না। শুধু চুপচাপ বসে থাকতে ইচ্ছে করে। বসে বসে যে কিছু একটা ভাবে তাও নয়। এলোমেলো নানা চিন্তা উড়ে যায় মাথার ভিতর দিয়ে ছেড়া মেঘের মতো।

তাকে কি আলসেমিতে ধরেছে?

পরদিন সন্ধের পর হেমাঙ্গ গাড়ি চালিয়ে হাজির হয়ে গেল চারুশীলার বাড়িতে। ঢুকেই নানা সুখাদ্য রান্নার গন্ধ পেল বাতাসে। দেখল, তাকে উপলক্ষ করে আরও কয়েক জনকে নিমন্ত্রণ করে এনেছে চারুদি। তার একটা ঘনিষ্ঠ মহল আছে। অবশ্যম্ভাবী তাতে থাকবেই কৃষ্ণজীবন সস্ত্রীক, থাকবে অনু আর ঝুমকিরা, ইদানীং থাকছে চয়নও। তারাই আছে। না, ঝুমকি নেই, অনু আছে।

এত লোকের ভিড় আজকাল ভাল লাগে না হেমাঙ্গর। কথা বলতে ক্লান্ত লাগে।

তাকে দেখে অনুই প্রথম লাফিয়ে উঠল, হ্যাল্লো!

হেমাঙ্গ মৃদু হেসে বলল, হ্যাল্লো। আরে! তুমি যে বেশ বড় হয়ে গেছ।

ছাই হয়েছি। একদম লম্বা হচ্ছি না যে!

তুমি কত?

পাঁচ ফুটের একটু বেশি।

তা হলে খুব লম্বা হবে। এটাই তো বাড়ের বয়স।

অনু মাথা নেড়ে বলে, কোনও চান্স নেই। ষোলোতেও মাত্র এতটুকু হাইট! ষোলোর পর কি আর মেয়েরা লম্বা হয়?

তা বলতে পারব না। তবে শুনেছি আঠারো পর্যন্ত সবাই বাড়তে থাকে।

উঃ, তা হলে বেঁচে যাই। পাঁচ চার বা পাঁচ হলে মোটামুটি চলে যাবে। পাঁচ সাত বা আট হলে তো কথাই নেই।

তুমি বুঝি খুব হাইট ভালবাস?

কে না বাসে বলুন, আপনি কিন্তু বেশ লম্বা। কত বলুন তো!

পাঁচ এগারো।

ওঃ, সুপার্ব।

একটু ইতস্তত করে হেমাঙ্গ জিজ্ঞেস করল, ঝুমকি আসেনি বুঝি?

দিদির জ্বর হয়েছিল। উইক।

চাকরি পেয়েছে?

না তো!

একটু গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে কৃষ্ণজীবন বসেছিল এক ধারে। হেমাঙ্গকে দেখে একটু হাসল।

হেমাঙ্গ পাশের সোফাটায় বসে বলল, কেমন আছেন?

কৃষ্ণজীবন বিনীতভাবে বলল, ভালই। আপনার কি খবর?

ভাল।

দাড়ি রাখলেন বুঝি?

ঠিক রাখা নয়। রোজ শেভ করতে ইচ্ছে হয় না।

দাড়ির একটা প্লাস পয়েন্ট আছে। র‍্যাডিয়েশন থেকে বাঁচায়।

তাই নাকি? আমি অবশ্য সেটা ভেবে রাখিনি।

শুনলাম কোথায় এক গ্রামে নদীর ধারে একটা বাড়ি কিনেছেন।

কে বলল?

চারুশীলা বলছিলেন।

হ্যাঁ।

বেশ করেছেন। শহরের মানুষেরা আজকাল একটু দূরে কোথাও ফার্ম হাউস বা খামারবাড়ি করছে। উইক এন্ডে চলে যায়। একটু বিশুদ্ধ বাতাসে দম নিয়ে আসে।

কাজটা তা হলে ঠিকই করেছি বলছেন? সবাই তো আমাকে পাগল বলছে।

কৃষ্ণজীবন মাথা নেড়ে বলল, মোটেই নয়। আমার তো মনে হয়, শহরের বাইরে একটা শেলটার করে রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আপনি খুব শহর-বিরোধী, তাই না?

কৃষ্ণজীবন ম্লান হেসে বলে, তাও ঠিক নয়। শহর তৈরি করতে হলে তাতে লোকবসতির সঙ্গে সমানুপাতে প্রাকৃতিক পরিবেশও রাখা দরকার ছিল। মানুষের অস্তিত্বের জন্যই দরকার ছিল। ছেলেবেলার কলকাতার আকাশে চিল দেখেছেন?

অনেক দেখেছি।

আমরাও দেখেছি। দোকান থেকে খাবার আনার সময় প্রায়ই ছোঁ মেরে নিয়ে যেত। আজকাল আর দেখতে পান?

না।

তার মানে, কাছাকাছি চিল বসতে পারে এমন যে-সব গাছপালা ছিল সব লোপাট হয়ে গেছে। পাখি কমছে, জীবজন্তু কমছে। বাড়ছে শুধু ঘরবাড়ি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল হেমাঙ্গ। কৃষ্ণজীবন খুব বলিয়ে কইয়ে মানুষ নয়। নিজের বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে কথা বলতে পারেই না।

হেমাঙ্গ বলল, কোথায় যেন গিয়েছিলেন আপনি?

আমস্টারডাম। বলে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎ কৃষ্ণজীবন বলল, ওরা আমাদের একটা জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। একটা অয়েল ট্যাঙ্কার ক্যাপসাইজ করে অনেকটা এলাকা জুড়ে সমুদ্র বিষিয়ে গেছে। মাছ মরছে, পাখি মরছে। সেইসব দেখাল ঘুরিয়ে।

হ্যাঁ। আমরা টেলিভিশনেও দেখতে পাই।।

কী অপচয় বলুন তো! অত তেল নষ্ট হল, সমুদ্রের কত প্রাণী মারা গেল।

তা তো ঠিকই।

আমার মনে হয় কি জানেন? আজকাল প্রায়ই অয়েল ট্যাঙ্কার লিক করে যে তেল পড়ে যাচ্ছে। এর জন্য ওয়ার ফুটিং-এ একটা ব্যবস্থা করা উচিত। এমন যন্ত্র তৈরি করা দরকার যা দিয়ে জল থেকে তেল ফের তুলে নেওয়া যাবে। কাজটা খুব শক্ত হওয়ার কথা নয়। কারণ, তেল জিনিসটা জলে ভাসে। এটা সম্ভব হলে তেলটাও বাঁচে, সমুদ্রটাও বাঁচে।

ঠিকই বলেছেন।

কিন্তু এইসব জরুরি যন্ত্র তৈরি হচ্ছে না। হচ্ছে অকাজের জিনিস। তাই না? ট্যাঙ্কারগুলোও যে কোন স্ট্যান্ডার্ডে তৈরি হয় কে জানে। আপনারা এটাকে বিজ্ঞানের যুগ বলে চিহ্নিত করেন, কিন্তু এসব দেখে মনে হয় মানুষ বিজ্ঞানের সঠিক ব্যবহার করছে না।

হেমাঙ্গ এই তগত লোকটার দিকে চেয়েছিল। বেশ আছে কৃষ্ণজীবন। বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্করহিত, ভাবনার ডুবজলে এর দিন কাটে। বেশ আছে কৃষ্ণজীবন। এর জীবনে একটা দুরন্ত ভালবাসা আছে। সে ভালবাসা পৃথিবীর প্রতি।

নিঃশব্দে কৃষ্ণজীবনের ডান পাশে এসে বসল অনু।

হেমাঙ্গর কেমন যেন মনে হল, আর বসে থাকার মানে হয় না। এদের দু'জনকে আগেও দেখেছে হেমাঙ্গ। অসম বয়সী এই দুটি নারী ও পুরুষ—এদের একজনের চোখে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সম্মোহিত দৃষ্টি, অন্য জনের চোখে অনুকম্পা মেশানো প্রশ্রয়। এখানে হেমাঙ্গ বহিরাগত। মানুষে মানুষে সম্পর্কের যে কতরকম কম্বিনেশন হয়, কত জটিল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তার কোনও শেষ নেই।

এক নির্জন কোণে একা বসে ছিল চয়ন।

এই যে, কেমন আছেন?

চয়ন তটস্থ হয়ে বলে, ভাল।

বসতে পারি?

আরে কী যে বলেন! বসুন না।

হেমাঙ্গ বসল এবং হাসতে লাগল। বলল, আপনার কথা যতবার মনে হয় ততবার হাসি পায়।

চয়ন কাঁচুমাচু হয়ে রইল। প্রশ্ন করল না।

সেদিন এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময়ে আপনার কথাগুলো নিয়ে আমি আজও ভাবি আর আপনমনে হাসি।

চয়ন ক্ষীণ একটু স্মিতভাব মুখে ফুটিয়ে তুলে বলে, আমি খুব গুছিয়ে কথা বলতে জানি না। আপনার কোনও অসম্মান করিনি তো!

আরে না মশাই, না। আপনি আমাকে নিজেকে বুঝতে সাহায্যই করেছেন। অনেক সময়ে নিজের আবেগগুলোকে ঠিক চেনা যায় না কিনা!

যে আজ্ঞে।

প্রেম-ট্রেম করেছেন কখনও?

চয়ন একটু সচকিত হয়ে বলে, আজ্ঞে না।

কখনও পড়েননি?

চয়ন মাথা নেড়ে বলে, না। আমার জীবন ঠিক আর পাঁচজনের মতো নয়।

আপনি গরিব আর এপিলেপটিক বলে?

চয়ন নিবে গিয়ে বলে, আমি ওসব ভাবতেই পারি না। সবসময়ে আমার অস্তিত্বের সংকট।

হেমাঙ্গ তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, আপনার কোনও সংকট নেই।

আজ্ঞে, আপনি আমার সব খবর তো জানেন না।

কিছুটা জানি। বাকিটা অনুমান করে নিতে পারি। আপনি একটা কমপ্লেক্সে ভুগছেন। নিজেকে নিয়েই আপনার বেশি ভাবনা। ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স নয় তো!

চয়ন মৃদু হাসে, যে ইনফিরিয়র সে নিজেকে ইনফিরিয়র ভাবলে তা আর কমপ্লেক্স থাকে না।

কথা তো বেশ জানেন দেখছি। আমি বলি কি, আপনি কয়েক দিনের জন্য আমার বাড়িতে চলে আসুন। স্পেয়ার রুম, একস্ট্রা বেড সব আছে। কয়েক দিন আপনার সঙ্গে আড্ডা দেওয়া যাক। আপনার প্রবলেমগুলো সলভ করা যায় কি না দেখব।

চয়ন করুণ হেসে বলে, যে আজ্ঞে।

বিশাল হলঘরের অন্য প্রান্তে মহিলামহল বসে গেছে। সেখান থেকে একবার হেমাঙ্গর উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল চারুশীলা। হেমাঙ্গও হাতটা তুলল।

হঠাৎ চয়ন বলল, আপনার জন্য আজ একটা নতুন রান্না হচ্ছে।

হেমাঙ্গ অবাক হয়ে বলল, আমার জন্য?

যে আজ্ঞে।

কি রান্না হচ্ছে?

তা জানি না। শুনেছি আপনাকে সারপ্রাইজ দেওয়া হবে।

নাঃ, তা হলে তো সারপ্রাইজটা থাকল না।

তা হয়ত থাকল না। কিন্তু কে জানে?

তার মানেটা কী হল?

চয়ন একটু লজ্জা পেয়ে বলল, না, মানে কিছু নেই। শুনলাম আপনার জন্য একটা স্পেশাল মেনু হচ্ছে।

হেমাঙ্গ একটু চুপ করে রইল। কিছু বলল না। বুঝলও না।

বুঝল আর ঘণ্টাখানেক বাদে। খাওয়ার সময়। সর্ষে শাক দিয়ে একটা দারুণ মুখরোচক তরকারি। এত সুন্দর জিনিস কখনও খায়নি হেমাঙ্গ।

কে রাঁধল রে?

তাকে লুকিয়ে রেখেছি।

তার মানে?

মুখ টিপে হেসে চারুশীলা বলল, এই, ডাক তো অঞ্জলিকে।

অঞ্জলি এসে খাওয়ার ঘরে দাঁড়াল। মুখে এক রাশ লজ্জা। ছিপছিপে, লম্বা, ফর্সা, চাবুকের মতো চেহারার এই তরুণীকে আগে কখনও দেখেনি হেমাঙ্গ। মুখখানাও ভারি সুন্দর।

হেমাঙ্গ চাপা গলায় বলে, কে রে?

এ পাড়ায় নতুন এসেছে। ওরা পাক্কা নিরামিষাশী। সেই জন্য আমাদের সঙ্গে খেতে বসেনি।

ওঃ

দেখতে সুন্দর নয়?

হ্যাঁ। রাঁধেও ভাল।

অরিজিন্যালি গুজরাতি। তবে বাঙালি হয়ে গেছে। পছন্দ?

৭৩

যেদিন ছেলেগুলো এসে বামাচরণের বউ শ্যামলীকে শাসিয়ে গেল, সেদিনকার ঘটনা গড়িয়েছিল অনেক দূর। রাতে দুই ভাইয়ে প্রথমে তুমুল ঝগড়া। তারপর বেদম মারপিট। বামাচরণ একটা দা নিয়ে এসেছিল অবশেষে। মাতাল রামজীবন হয়তো সেদিনই মারা পড়ত। শ্যামলী প্রায় উড়ে এসে কোমর জড়িয়ে ধরে বামাকে আটকায়। তবু দায়ের ডগাটা লেগেছিল রামজীবনের কপালে। ধারের দা, কপালের চামড়া আড়াআড়ি ইঞ্চি তিনেক ফাঁক হয়ে গলগল করে রক্ত গড়াতে লাগল। অনেকদিন ঠাণ্ডা মেরে ছিল বিষ্ণুপদ, মিইয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেদিন নতুন আনা বিজলি বাতিতে ছানিওলা চোখেও এই রক্তপাত দেখতে পেল। দেখে শরীরে একটা এমন কাঁপুনি উঠেছিল যে, তখনই দম বন্ধ হয়ে মরার দাখিল। নয়নতারা দৌড়ে গিয়ে রামজীবনকে জাপটে ধরে হাউমাউ করে চেঁচাতে লাগল। সঙ্গে রাঙাও। সেই চিৎকারে পাড়াপড়শীরা দৌড়ে এল। বাড়ির মধ্যে তুমুল হই-হট্টগোল। এদিকে বারান্দায় বিষ্ণুপদ ধীরে ধীরে ঢলে পড়ছিল। কেউ লক্ষ করেনি তাকে। মূর্ছা কাকে বলে তা জানেই না বিষ্ণুপদ। সেদিন বোধ হয় কয়েক মিনিট তার মূর্ছাই হয়েছিল। আবার সেটা আপনা থেকেই কেটেও গেল। যখন চোখ চাইল তখন রামজীবন উঠে দাঁড়িয়েছে। কপালে একটা ন্যাড়া বাঁধা, পুলিন ডাক্তার এসেছে, নিতাই এসেছে। আরও মেঁলা ভিড়। বামাচরণকে ঘরে টেনে নিয়ে দোর দিয়েছে শ্যামলী।

উঠতে গিয়ে বিষ্ণুপদ দেখল, শরীরটা থরথর করে কাঁপছে, মাথাটা চক্কর দিচ্ছে। কিন্তু এ তো সুখের শরীর নয়। ইদানীং জরাব হয়েছে বটে, কিন্তু একটা জীবন তত রোদে জলে, মাইল-মাইল হাঁটাপথে, মজুরের অধিক পরিশ্রমে শরীর পোক্ত হয়েছে। বিষ্ণুপদ তাই পারি না-পারি করেও সিঁড়ি ভেঙে উঠোনে নামল।

পুলিন ডাক্তার তার দিকে চেয়ে পেঁকিয়ে উঠল, এইসব দেখার জন্য বেঁচে আছে? মরতে পারো না? না পারো তো কাশী, গয়া কোথাও গিয়ে ভিক্ষে করে খাও গে, তবু পাপচক্ষে এসব দেখতে হবে না।।

বিষ্ণুপদর গলাটা বড্ড ধরা ছিল। মাথাটা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, মরার আগে এ সব হল প্রায়শ্চিত্ত। বুঝলে? প্রায়শ্চিত্ত।

পুলিন কঠিন মুখ করে বলল, পরিষ্কার পুলিশ-কেস। সংসার আঁকড়ে আর পড়ে থেকো না হে বিষ্ণুপদ। বয়স হলে মানুষের যে কী জ্বালা, আজ হাড়ে হাড়ে টের পাই।

মাঝখানে দাঁড়ানো রামজীবন, তাকে ধরে তখনও কাঁদছে নয়নতারা। রাঙা নিজেদের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বামাচরণের বাপান্ত করছে চেঁচিয়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রামজীবন একেবারে চুপ। একবার শুধু বিষ্ণুপদর

দিকে তাকিয়ে বলল, আমার কিছু হয়নি বাবা। সামান্য একটু রক্ত গেছে। ও কিছু নয়। আপনি গিয়ে শুয়ে থাকুন।

শোবো? হঠাৎ শোবো কেন? কতটা কেটেছে?

সামান্যই।

নিতাই মাতব্বর লোক। এ গাঁয়ের গান্ধীবাবা। লোকের উপকার করে বেড়ায়। এম এল এ হওয়ার ইচ্ছেও আছে। ইদানীং কী সব রাজনীতির কারণে কিছুদিন গ্রামছাড়া হয়ে ছিল। আবার ফিরেছে।

নিতাই বলল, জ্যাঠা, আপনার অনুমতি থাকলে পুলিশ ডাকবো। আজ যা হল এরপর তার চেয়ে অনেক গুরুতর ব্যাপার ঘটতে পারে।

রামজীবন ঠাণ্ডা গলায় বলল, না, পুলিশ ডাকার দরকার নেই। বাড়ির কেচ্ছা বাড়ির মধ্যেই থাকা ভাল।

যেটা তোদের ইচ্ছে। তবে পুলিশ ডাকলে ঘটনার একটা লিগ্যাল রেকর্ড থাকত।

বোঝা যাচ্ছিল, রামজীবনের নেশাটা কেটে গেছে। দার্শনিকের মতো একটু হেসে সে বলল, আমার বাপ-মা এখনও বেঁচে আছে রে নিতাই। তাদের সামনে তাদের ছেলেকে ধরে নিয়ে যাবে—এটা কি হয়? ছেড়ে দে। যা হওয়ার হয়ে গেছে।

নিতাই মাথাটা নেড়ে বলল, ঠিক আছে। কিন্তু শ্যামলী বলছিল, কারা সেদিন এসে ওকে শাসিয়ে গেছে। কারা জানিস?

রামজীবন একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, জানি। বটতলার কাশী আর বিশে।

কেন শাসিয়েছিল?

সে অনেক কথা। আজ থাক। পরে একসময় শুনিস।

এরপর রামজীবন পাড়াপড়শীদের উদ্দেশ্যে হাতজোড় করে বলল, আজ আপনারা ফিরে যান। রাত হয়েছে। ঝগড়া কাজিয়া সব সংসারেই হয়ে থাকে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই বাড়ি ফাঁকা হয়ে গেল।

বিষ্ণুপদ বারান্দায় এসে বসল। শরীর জুতের নেই। রামজীবনকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে নয়নতারাও এল। পানের বাটাখানা নিয়ে বসল কাছেই। নিঃশব্দে একখানা পান বানিয়ে মুখে দিয়ে বসে রইল।

বিষ্ণুপদ আড়চোখে দেখল নয়নতারাকে। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, সংসারে যখন এসব হয় তখন মৃত্যুভয় কেটে যায়, না? তখন মনে হয়, মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যামসমান।

নয়নতারার কান্নার একটা রেশ এখনও রয়েছে। হেঁচকি তুলতে গিয়ে সেটা প্রকাশ হল।

আর কেঁদো না। আজ অনেক কেঁদেছো।

মেয়ে হয়ে জন্মেছি, আর কাঁদব না, তাই কি হয়? কাঁদতেই তো জন্মায় মেয়েরা।

সে তোমরা। আজকালকার মেয়েদের তা নয়।

আমি তো আর আজকালকার নই।

দেখে শেখো।

আর শেখা! কত শিখছি গো।

কথা আর এগোয় না। দুজনে বসে থাকে। রাত বাড়ে। মশা কামড়ায়।

অনেকক্ষণ বাদে বিষ্ণুপদ বলল, রেমোটা কিরকম ধারা হয়ে গেল, দেখেছো? কেমন ঠাণ্ডা মেরে গেল।

নয়নতারা বলল, দেখেছি। রেমো তো ছেলে খারাপ নয়। মদ খেলেই যা একটু তড়পায়।

বন্ধুগুলো খারাপ। মেজো বউমাকে ওরকম অপমান করে গেল সেদিন, কাজটা উচিত হয়নি।

তা বলে ভাইকে কাটতে যাবে?

একটু আস্তে বলল। রাত হয়েছে, শুনতে পাবে।

পাক গে। বলে নয়নতারা আবার পান খায়।

বিষ্ণুপদ চুপ করে থাকে। একটা হাই তুলে বলে, আজ শরীরটা বড় খারাপ লাগছে। শুয়ে পড়ি?

শোও গে।

তুমি?

আমি! আমার কি আজ ঘুম হবে?

তবু শুয়ে থাকবে চলো।

চলো।

দুজনে পাশাপাশি শুয়ে রইল। কিন্তু ঘুম হল না কারোই। বুকের মধ্যে নানা অশান্তি আর ভয় আজ নাড়াঘাঁটা খেয়ে ঘুলিয়ে উঠেছে।

ঘটনার তিন দিন বাদে এক সন্ধেবেলা বামাচরণকে ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে এল কয়েকজন। মাথা ফাটা, ঠোঁট দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, কপালে একটা টিবি ফুলে আছে, সর্বাঙ্গে আরও নানা ক্ষত। বামাচরণ কথা কইতে পারছে না। গোঙাচ্ছে।

সারা বাড়িতে তুমুল কান্নাকাটি আর চেঁচামেচি উঠল। শ্যামলী চেঁচাচ্ছিল, চেঁচিয়ে কাঁদছিল নয়নতারা।

আবার নিজের শরীরের কাঁপুনি আর মাথার অন্ধকার টের পেয়ে বিষ্ণুপদ কিছুক্ষণ স্থবিরের মতো বসে রইল। যারা ধরাধরি করে এনে দাওয়ায় শুইয়ে দিয়েছে বামাচরণকে, তাদের একজন বলল, মাঠের ধারে পড়েছিল।

আবার পুলিন এল। পাড়াপড়শীরা এল। শুধু রামজীবনের কোনও পাত্তা নেই।

বিষ্ণুপদ কোনওক্রমে শুধু পুলিনকে জিজ্ঞেস করতে পারল, বাঁচবে?

পুলিন মাথা নেড়ে বলল, বাঁচবে। হাসপাতালে নিলে ভাল হত। অনেক রক্ত গেছে। কলির শেষ হে, বিষ্ণুপদ। এ হচ্ছে সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই। দেখে যাও, পাপস্খলন হোক।

শ্যামলী চিৎকার করে রামজীবনকে গালাগাল দিচ্ছিল। সেইসব গালাগালের মধ্যে শুয়োরের বাচ্চা, কুকুরের বাচ্চা, বেশ্যার ছেলে, বেজন্মা ইত্যাদির সঙ্গে, মুখে রক্ত উঠে মরার অভিশাপও ছিল। পুলিন একটু বিরক্ত হয়ে বলল, চেঁচামেচি করে কী লাভ হচ্ছে বলো তো! একে বরং ঘরে নিয়ে শোওয়াও গে। আর কাউকে পাঠিয়ে কয়েকটা ওষুধ আনিয়ে নাও। তুলো আর ব্যান্ডেজও লাগবে। তাড়াতাড়ি করো, আমি বেশিক্ষণ বসতে পারব না।

তাই হল। শ্যামলীর চেঁচানি একটু কম হল। বামাচরণকে ঘরে নিয়ে শোওয়ানোর পর সেটা আরও কমে গেল।

কাণ্ডটা যে রামজীবনের পরম বান্ধবরাই করেছে, এটা বুঝতে কারও বাকি নেই। পুলিন ডাক্তার বিষ্ণুপদর পাশেই একখানা টিনের চেয়ারে বসে বলল, মরতে কি তোমাকে সাধে বলি? এর জন্যই বলি। আগের দিনে যে পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ নিয়ম ছিল, তারও কারণ হল এইসব।

বিষ্ণুপদ নীরবে শুধু মাথা নাড়ল। কথা কওয়ার মতো অবস্থা নয়।

পুলিন কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলে, শুনেছো তো, আমার ছোটো পুত্রটির কাণ্ড। কথা নেই, বার্তা নেই, কোথা থেকে একটা গোদা মেয়েছেলে ধরে এনে বুক ফুলিয়ে বলল, এ আমার বউ। বরণ করো। বোঝো কাণ্ড! আমরা তো হাঁ হয়ে গেছি। তখন সে একখানা লেকচার ঝাড়ল। পুরনো বিয়ের নিয়ম-কানুন সে মানে না, এর সঙ্গে তার আশনাই হয়েছে, তাই একেবারে বিয়ে করে, শাঁখা সিঁদুর পরিয়ে এনে হাজির করেছে। জুততাপেটা করে তাড়াতে যাচ্ছিলাম, তা গিন্নি আড় হয়ে পড়লেন। মায়েরা তো সব ক্ষমার অবতার। আর মায়ের প্রশ্রয়েই যত কুলাঙ্গার তৈরি হয়। কী বলো?

বিষ্ণুপদ সামনের দিকে চেয়েছিল। বুকটা বড় হু-হু করছে। তার বড় ভরসা ছিল, রামজীবন উল্টে কিছু করবে না। সেদিন দায়ের কোপ খেয়েও যেমন ঠাণ্ডা হয়ে রইল, রাগ দেখাল না, তাতেই মনে হয়েছিল, রেমোর বোধহয় একটা পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু সে যে ঠাণ্ডা মাথায় অন্য হিসেব কষেছিল, তা কি বিষ্ণুপদ জানত?

কী ভাবছো হে বিষ্ণুপদ? সংসারের কথা হলে, ও আর ভেবো না। ঘটিবাটি বেচে হলেও অন্য কোথাও গিয়ে থাকো। আমিও তাই ঠিক করেছি। হুগলিতে আমার মেজো ভাই আছে, সেখানে জমির একটু বন্দোবস্ত হয়েছে।

বিষ্ণুপদ গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, আমি বড় নিষ্কর্মা।

বলেই বুঝল, কথাটার কোনও মানে হয় না। তাই ফের বলল, তুমি হলে করিৎকর্মা লোক। আমার মতো হাবাগোবা নও।

দেখ বিষ্ণুপদ, বহু বছর তোমাকে দেখছি। এই গাঁয়ে উদ্বাস্তু পত্তনের সময় থেকে সুখে দুঃখে একসঙ্গেই আছি। তোমাকে কি কিছু কম চিনি? সাতে-পাঁচে থাকো না, সে ঠিক কথা। কিন্তু তা বলে বসে বসে এইসব দেখবে নাকি?

কোথায় পালাবো বলো? আমার যে যাওয়ার জায়গা নেই।

ওইটেই তো ভুল করেছে। একটা যাওয়ার জায়গা করে রাখতে হয়।

বিষ্ণুপদ চোখ বুজে খুব বুক ভরে গভীর শ্বাস টানল। মাথার চক্করটা টের পাচ্ছে সে। পুলিন আরও কিছুক্ষণ বকবক করল বসে। সে সব কথা তার কানেই ঢুকল না। তারপর পুলিন উঠে গেল বামাচরণের ঘরে। ব্যান্ডেজ বাঁধবে, টেডভ্যাক ইনজেকশন দেবে।

কিছুক্ষণ বাদে শ্যামলী হঠাৎ দরজা খুলে বেরিয়ে এসে নাটকীয় ভাবে চেঁচিয়ে বলল, আপনারা পুলিশে খবর দিন, পুলিশে খবর দিন। তারাই এসে দেখুক, এ বাড়িতে রোজ কী হচ্ছে!

পুলিন ডাক্তার ভিতর থেকেই বলে উঠল, চেঁচিও না বউমা, এ রুগীর ঘর। মাথা ঠাণ্ডা রাখো।

বিষ্ণুপদর কাছে সামনের সব দৃশ্যই কেমন যেন কাচের ওপারের দৃশ্যের মতো হয়ে গেছে। যেন এসব অন্য এক জগতের ছবি। সব মিথ্যে, সব মায়া।

বাড়িটা নিস্তব্ধ হল প্রায় রাত বারোটা নাগাদ। সকলেই শুতে গেল। বিষ্ণুপদও। শুয়ে নয়নতারা বলল, হ্যাঁ গো, কৃষ্ণর কত বড় বাড়ি?

বড়ই। তবে জায়গা-বাসা বিশেষ নেই। কেন বলল তো!

আমরা গিয়ে যদি থাকি তো জায়গা হবে?

বলো কি, সেখানে গিয়ে থাকবে।

কেন, ফেলে দেবে নাকি?

বিষ্ণুপদ একটু হাসল, তা হয়তো ফেলবে না। কৃষ্ণ তো রাখতেই চায়। কিন্তু আবার কিন্তুও তো আছে! বউমা।

তা একটু গালমন্দ করবে, অচ্ছেদ্দা অবহেলা করবে। তা করুক না। খুনোখুনি তো দেখতে হবে না।

শেষ বয়সটায় এই যে কষ্ট পাচ্ছো, এও হয়তো ভালই। পাপ কাটছে।

অত পাপ কি করেছি? তুমি কী বলে?

আমার চোখে তো পড়েনি।

তা'হলে!

এই তা'হলের জবাব কি আর আমি জানি।

আমরা তো আর কাশী-বৃন্দাবন যেতে পারব না। ট্যাঁকের জোর নেই। হ্যাঁ গো, মেজো বউমা নালিশ করলে কি আমাদের পুলিশে ধরবে?

বিষ্ণুপদ একটু ভেবে বলে, তা ধরতে পারে।

এও কি কপালে লেখা আছে, শেষ অবধি?

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মাত্র।

নয়নতারা বলল, আমাকে ধরে ধরুক, সে সইবে। কিন্তু তোমাকে ধরলে যে আমাকে গলায় দড়ি দিতে হবে।

বিষ্ণুপদ মৃদু স্বরে বলল, একটু পান খেয়ে ঘুমোও। কাল কি হবে তা নিয়ে ভাবতে নেই। যা হওয়ার হবে।

ঘুম কি হবে?

একটু পান মুখে দাও। হবে।

বাস্তবিকই পান মুখে দিয়ে নয়নতারা ঘুমোললা। তখন বিষ্ণুপদ টর্চটা হাতে নিয়ে এসে বাইরে বসল। বুকের মধ্যে বড় উচাটন। বড় উথাল-পাথাল। একটা আশার আলো যেন বিদ্যুচ্চমকের মতো ঝলসে উঠে মিলিয়ে গেছে।

বামাচরণের ঘর থেকে নানাবিধ শব্দ হচ্ছে। কখনও শ্যামলীর গলা, কখনও বামাচরণের "উঃ আঃ"।

অপমান করবে? তা করুক। বিষ্ণুপদ উঠোন পেরিয়ে বামাচরণের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

বউমা, আমি বিষ্ণুপদ।

শ্যামলীর কঠিন জবাব এল, কী চান? শেষ তো করে ফেলেছেন মানুষটাকে।

বউমা, বামার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

কষ্ট হলে কী করবেন?

আমি বাইরেই বসা আছি। দরকার হলে ডেকো।

আপনাকে বসে থাকতে হবে না। নাকে তেল দিয়ে ঘুমোন গিয়ে। উঃ, কত দরদ!

বিপদের সময়ে বিচলিত হতে নেই। হিতে বিপরীত হয়।

আপনি ঘরে যান। আমার উপদেশের দরকার নেই।

বিষ্ণুপদ একটু চুপ করে থেকে বলল, আমি বড় অপদার্থ, মা। আমাকে মাপ করে দাও।

একথাটার কোনও জবাব এল না। বামাচরণ শুধু একবার বলে উঠল, কে গো? বাবা নাকি?

তুমি ঘুমোও তো।

বাইরে কী বাবা? ঘরে আসতে বলল।

শ্যামলী কঠিন গলায় বলল, না। তুমি ঘুমোও।

বামাচরণ একবার উঃ বলে কাতর আর্তনাদ করল। তারপর বলল, বাবা গায়ে হাত বোলালে ব্যথা সেরে যায় জানো? ছেলেবেলায়...

আর বলতে পারল না বামা। বোধহয় ঝিমুনি এল।

শ্যামলী চাপা গলায় বলল, আমি বসে সেবা করছি আর উনি বাবা-বাবা করছেন!

বিষ্ণুপদ মাথাটা দুধারে নাড়ল। তারপর বড় ধীর পায়ে ফিরে এল দাওয়ায়।

ধীরে ধীরে বামাচরণের ঘরের শব্দটব্দ সব বন্ধ হয়ে গেল। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়ল দুজনেই।

বিষ্ণুপদর আজ দুচোখ বড় জ্বালা করছে। দু-এক ফোঁটা জলও পড়ল বোধহয়। আজ তার বড় মরে যেতে ইচ্ছে করছে। যদি এই মুহূর্তেই বুকের শব্দ থেমে যায়, তাহলে বেশ হয়।

একটা ছায়ামূর্তি চোর পায়ে উঠোনে ঢুকল। চারদিকটা আন্দাজ করছে।

বিষ্ণুপদ টর্চটা একবার পট করে জ্বালিয়েই নিবিয়ে দিয়ে খুব চাপা গলায় বলল, আয়।

ছায়ামূর্তি কাছে এসে দাওয়ায় বসল।

তোর জন্যই বসে আছি।

রামজীবন একটা শ্বাস ফেলল। বিষ্ণুপদ বাতাসটা শুকে বুঝল, রামজীবন আজ মদ খায়নি।

কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

মনটা ভাল নেই বলে একটু কলকাতায় ঘুরে এলাম। ফিরেছি অনেকক্ষণ, বটতলায় বসেছিলাম।

কী হয়েছে তা জানিস?

জানি। শুনেছি।

এ কাজ করলি কেন? সেদিন মার খেয়েও কেমন ঠাণ্ডা ছিলি, বুকটা আমার ভরে গিয়েছিল। আজ বড় অস্থির লাগছে। কেন করলি বাপ?

নিজের জন্য করিনি বাবা।

কার জন্য করলি?

ও যে আপনাকে আর মাকে উচ্ছেদ করতে চায়।

তা আর বেশী কথা কী? চাইতেই পারে।

রোজ ঝুটঝামেলা ভাল লাগে না বাবা। একদিন একটু শিক্ষা হওয়া ভাল।

বিষ্ণুপদ মাথা নাড়ল, ও ভাবে কি হয় বাপ? গুণ্ডা লাগিয়ে কি শিক্ষা হয়? বামা যা চায়, তাতে তার হক আছে। লোভী বলে ওর তর সয় না।

বাবা, বামাচরণ কখনও এ সংসারের জন্য কিছু করেছে? আপনাদের সেবা দূরে থাক, কোনওদিন শরীর খারাপ হলে এসে জিজ্ঞেস করেছে, কেমন আছেন? কোনওদিন একটা ফল হাতে করে এনেছে আপনার জন্য? কিছুই করেনি, তবু ভাগ চায় কেন? ভাগে ওর কী অধিকার?

অন্যে কেমন তা দেখে তোর দরকার কী? তুই কেমন সেটা নিয়ে ভাবিস না কেন?

আমি কেমন, বাবা?

তোর অনেক গুণ বাপ। অনেক গুণ। কিন্তু বাপকে মাকে ভালটা মন্দটা খাওয়ালে আর ভক্তি শ্রদ্ধা করলেই কি হয়? বুকটা যে ভেঙে দিলি! দায়ের কোপ খেয়েও রেগে গেলি না, সেইটে দেখে যে বড় ভরসা হয়েছিল।

রামজীবন মাথাটা নিচু করে রইল। তারপর বলল, আমি তো খারাপই বাবা। আপনি আমার মধ্যে ভাল দেখেন কেন?

মার খেয়ে যদি উল্টে মারলি, তবে শোধবোধ হয়ে গেল। যদি মার খেয়েও না-মারলি, তবে তোর তবিলে কিছু জমা হল। আমি আহাম্মক, এরকমই বুঝি।

বামা যখন আপনাকে ঘরছাড়া করতে চায়, তখন আমার মাথার ঠিক থাকে না।

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, কাল হয়তো পুলিশ আসবে। আজ অবধি এ জীবনে কখনও পুলিশের সঙ্গে বোঝাপড়া হয়নি আমার। এবার হবে।

পুলিশে খবর দিয়েছে, আমি জানি বাবা। তবে এফ আই আর করেছে আমার নামে। থানা থেকেই জেনে এসেছি।

থানায় গিয়েছিলি?

প্রায়ই যাই। কিছু হবে না। সাক্ষী নেই।

ঘরে যা।

যাই। মাঝরাত অবধি বসে আছেন, আপনার শরীর খারাপ হবে না?

শরীর আর কিসের খারাপ হবে? এখনও আছে, এই যথেষ্ট।

ওরকম বলবেন না বাবা।

আমার কখনও মরার ইচ্ছে হয় না। প্রাণটা যতদিন থাকে ততই যেন ভাল। কিন্তু আজ আমার বড় মরার ইচ্ছে হচ্ছিল।

কেন বাবা?

দুনিয়ার সঙ্গে আর লটকে থাকতে পারছি না। আলগা হয়ে গেছি যেন!

রামজীবন হাত বাড়িয়ে বিষ্ণুপদর পা দুটো ছুঁয়ে বলল, এই পা ছুঁয়ে যা প্রতিজ্ঞা করতে বলবেন আজ, তাই করব। বলেন বাবা।

বিষ্ণুপদ নড়ল না। চুপ করে বসে রইল।

বলেন বাবা, যা খুশি। আজ যা প্রতিজ্ঞা করাবেন, তাই করব।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, না।

না কেন বাবা? যা বলবেন।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, আমি বিচক্ষণ মানুষ হলে তোকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিতাম। কিন্তু আমার ভরসা হয় না বাপ। কী করতে কী করে ফেলি! আমাকে মাপ কর।

বলছি তো, আপনি যেমন চান আমাকে তেমন হতে বলুন। প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিন।

তাই কি হয় বাপ? আমি যেমন চাই, তুই তেমনটাই বা হবি কেন? আমি চাইবার কে? দুনিয়ার সব ভালমন্দ কি আমি বুঝি? তুই নিজে বুঝে দেখ বাপ।

আমি যে বুঝতে পারি না বাবা!

আমিও পারি না। এই তো দেখি, বামা মদ-বিড়ি খায় না, অন্য দোষও কিছু নেই বোধহয়, তবু তাকে কি ভাল দেখি? আর এই যে তুই নেশাভাঙ করিস, গুণ্ডার দল নিয়ে বেড়াস, তুই কি ততটা খারাপ? মানুষের ভাল-মন্দর বিচারটাও তত গোলমেলে। আমার কাছে ভাল হলেই কি ভাল, খারাপ হলেই খারাপ? গান্ধীবাবার মধ্যেও তো লোকে খারাপ দেখেছে, নইলে মারে?

রামজীবন আর একটু কাছ ঘেঁষে বসল। বিষ্ণুপদর পা দুখানা কোলে তুলে নিয়ে বলল, আপনি ক্ষমা করলেই আমার সব পাপ মুছে যাবে বাবা।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, ওরকম বলিস না। আমি কি তোর মালিক, না সৃষ্টিকর্তা? ওরকম বালসনি, বাপ-মা তো ক্ষমা করার জন্য মুখিয়েই থাকে। তাদের ক্ষমায় কি ক্ষমা হয়? আরও বড় জজ আছে।

আমার কাছে আপনারা দুজনেই ভগবান।

বিষ্ণুপদ একটু হাসল। বলল, বামা যা চায় দিয়ে দিতে পারবি?

তা কেন পারব না? আপনি বললেই পারব।

দিতে বলিনি। দিতে পারবি কিনা জিজ্ঞেস করলাম।

পারব বাবা।

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, ওতেই হবে।

আপনি আমাকে কখনও মদ ছাড়তে বলেননি বাবা। কেন বলেননি?

বলে কি লাভ?

পা দুখানা বুকের কাছে চেপে ধরে ঝুম হয়ে বসে থাকে রামজীবন। তারপর বিষ্ণুপদ টের পায়, রামজীবন কাঁদছে। ফুলে ফুলে কাঁদছে। সেই কান্না বিষ্ণুপদ নিঃশব্দে বসে শুনতে লাগল। নড়ল না। একটা কথাও বলল না। রামজীবনের কান্নাই যেন আকাশ থেকে অন্ধকার মুছে দিচ্ছে। বিষ্ণুপদর বুক থেকেও। বিষ্ণুপদ বহুকাল এত বুকভরা আনন্দকে টের পায়নি।

৭৪

যারা টিউশনি করে তাদের কিন্তু টিউশনির একটা নেশা ধরে যায়, তা জানেন? তখন আর চাকরিবাকরি করতেই চায় না। আমার মনে হয় আপনারও নেশা ধরে গেছে।

কথা হচ্ছিল ছাদে। দুপুরবেলা। আজ অনিন্দিতার ছুটি। চয়ন আরও পরে বিকেলের টিউশনিতে বেরবে। শীতের রোদ ছাদময় ছড়িয়ে রয়েছে। কিছু লেপ, কম্বল, বালিশ রোদে দিয়েছে অনিন্দিতা। এ সময়টায় নিজের দুর্বল শরীরটাকে রোদে একটু সেঁকে নেয় চয়ন। মুখখামুখি দুজন একটা তোশকের ওপর বসে আছে।

যে যা বলে চয়ন তা মোটামুটি মেনে নেয়। তর্ক করে না, তেমন আপত্তিকর কথা হলেও আপত্তি তোলে না। ফলে সকলের সঙ্গেই তার সম্পর্কটা বজায় থাকে। সে অনিন্দিতার কথায় সায় দিয়ে বলে, বোধ হয় ঠিকই বলেছেন। তবে টিউশনিতে ছোটাছুটির পরিশ্রম বেশি।

ছোটাছুটিই তো ভাল। ইন্টারেস্টিং। একঘেয়েমি থাকে না।

চয়ন একটু হাসল, তা হলে কি আপনি টিউশনির পক্ষে?

অনিন্দিতা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, মোটেই তা নই। টিউশনি দু-একটা করা খারাপ নয়। কিন্তু সারাক্ষণ ছেলেমেয়ে পড়িয়ে বেড়ানো মোটেই ভাল নয়।

চয়ন কথাটায় সায় দিয়ে বলল, অনেকটা বাড়ির কাজের লোকের মতো, তাই না? প্রাইভেট টিউটরের তেমন সম্মানও নেই।

অনিন্দিতা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, সে তো হল, কিন্তু টিউশনি করেই কি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন ভেবেছেন? আচ্ছা কুঁড়ে লোক আপনি!

চয়ন একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার কি কোনও ক্যারিয়ার থাকার কথা? মা কী বলত জানেন? বলত, শুধু বেঁচে থাক বাবা, তোর কাছে আমি আর কিছু চাই না। আমি ছেলেবেলা থেকেই তাই জেনে এসেছি, আমাকে শুধু কোনওরকমে বেঁচে থাকতে হবে।

এটা পুরুষমানুষের মতো কথা হল?

পুরুষমানুষ কথাটা একটা মস্ত কথা। সবাই তো সমান হয় না, হয় বলুন!

অনিন্দিতা তার দিকে স্পষ্ট চোখে চেয়ে বলল, নিজের সম্পর্কে আপনার ধারণা এত খারাপ কেন বলুন তো! আত্মবিশ্বাস নেই একটুও?

আজ্ঞে না।

কী যে করি আপনাকে নিয়ে! সবসময়ে যেন জুজুর ভয়ে জড়সড় হয়ে আছেন।

চয়ন একটু হাসল। তারপর মৃদু গলায় বলল, সত্যিই, আমার মতো ভীতু বোধ হয় দুটো নেই।

আমি রোজ আপনাকে একটু একটু করে ইনস্পিরেশন দেওয়ার চেষ্টা করি সেটা কি বুঝতে পারেন?

চয়ন লজ্জিত হয়ে বলল, আজ্ঞে, তা পারি।

কিন্তু আপনি একটুও ইনস্পায়ার্ড হন না। তাই না?

চয়ন মাথা নিচু করে হাসতে লাগল। তারপর বলল, কেউ আমার জন্য ভাবছে এটা জেনে আমার একটু উৎসাহ হয়।

আহা, কী কথা! একটু উৎসাহ হয়! কেন, গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সব ওলটপালট করতে ইচ্ছে হয় না?

ও বাবা! কী ওলটপালট করব?

সব কিছু।

চয়ন হাসতে লাগল।

হাসছেন কেন? আমি কিন্তু সিরিয়াসলি বলছি।

আপনি অত সিরিয়াস হবেন না।

কেন হব না? আমি আপনার জন্য ভাবি, কষ্ট পাই, তা জানেন?

অপ্রতিভ হয়ে চয়ন বলল, কেন ভাবেন? ভেবে কিছু তো লাভ নেই। আমার ভিতরে কোনও ঘুমন্ত বীরপুরুষ নেই যে তাকে জাগিয়ে তোলা যাবে। এমন ছাইচাপা আগুনও নেই যাকে আবার খুঁচিয়ে গনগনে করে তোলা যাবে।

নিজের সম্পর্কে কারোই পরিষ্কার ধারণা থাকে না। আপনারও নেই।

চয়ন লাজুক হেসে বলল, আপনার কথা খুব ঠিক। কিন্তু আমি অনেক দিন ধরে নিজেকে লক্ষ করছি। কখনও বন্ধুর মতো, কখনও শত্রুর মতো। কিন্তু নিজের মধ্যে আমি কিছু খুঁজে পাই না। মনে হয় ধ্বংসাবশেষে বৃথা গুপ্তধন খুঁজে লাভ নেই।

আপনি আজকাল অঙ্ক ছেড়ে কবিতা ধরেছেন দেখছি। কথায় কথায় উপমা আসছে কেন?

চয়ন ভীষণ লজ্জা পায়। একটু হেসে বলে, তাই তো! আজ যেন কেন আমার খুব উপমা চলে আসছে মাথায়।

আপনার ভিতরে যে এত উপমা আছে, তা কি এতদিন জানতেন?

না। আজ কিসব হচ্ছে।

তেমনি আপনার ভিতরে আরও কি আছে তাও আপনি জানেন না।

ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মতো? হঠাৎ জেগে উঠব?

এবার অনিন্দিতা হেসে ফেলল, না, আপনি সত্যিই এর পর হয়তো কবিতা লিখতে শুরু করবেন।

একটু তটস্থ হয়ে চয়ন বলে, আর হবে না।

অনিন্দিতা স্মিত মুখে বলে, হচ্ছে হোক না। বোল ফুটছে, এ তো ভাল লক্ষণ। এমনিতে তো কথা বলতেই কাঁটা হয়ে থাকেন।

আমি এরকমভাবে কখনওই কথা বলি না। আজ একটু প্রগল্‌ভতায় পেয়েছে আমাকে।

প্রগল্‌ভতা? আপনি কি আজকাল গোপনে ডিকশনারি পড়েন নাকি?

চয়ন একটু ম্লান হাসল। বলল, না।

রাগ করলেন?

রাগ করার মতো কিছু তো হয়নি। আমার রাগই নেই।

একটু রাগ থাকা কিন্তু ভাল।

আমার কখনও রাগ হয় না।

শুধু ভয় আর লজ্জা?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

অনিন্দিতা চোখ বড় করে তার দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, আজ একটা সাহসের কাজ করবেন?

নাটক দেখতে যাওয়া? না, আজ কিন্তু সত্যিই সময় নেই।

না, নাটক নয়।

আর কী সাহসের কাজ?

আমাকে আজ থেকে তুমি করে বলবেন?

চয়ন প্রায় আঁতকে উঠে বলে, আপনাকে?

কেন, আমি তো আর গুরুজন নই। বাধা কিসের?

তুমি করে?

হ্যাঁ। আমিও তোমাকে তুমি করে বলতে চাই। বলো।

চয়ন খুব অপ্রস্তুত হল। একটু লালও হয়ে গেল। তারপর বলল, আচ্ছা। চেষ্টা করব।

ওটা আবার কী হল? এখনই বলতে হবে। চেষ্টা করব বললে ছাড়ছি না। বলো শিগগির!

বলছি। তুমি।

অনিন্দিতা খিলখিল করে হাসল। তার শাঁখ-সাজা চমৎকার দাঁতের সারি ঝিকিয়ে উঠল রোদে। বলল, বাঃ, এই তো বেশ হয়েছে।

একটা মস্ত পরিশ্রমের কাজ করে যেমন অবসাদের মতো হয়, অনিন্দিতাকে এই তুমি বলার পরিশ্রমে তেমনই অবসাদ বোধ করল চয়ন। মুখে হাসি টেনে বলল, এটা খুব সাহসের কাজ বুঝি?

তোমার পক্ষে। আমাকে তুমি বলতে গিয়ে তোমার মুখ-চোখের যা অবস্থা হল! উঃ কি একটা মানুষ তুমি! মধ্যযুগে বাস করছ এখনও?

চয়ন ধাতস্থ হতে একটু সময় নিল। তারপর বলল, মেয়েদের সঙ্গে আমার বেশি মেলামেশা হয়নি তো। তাই একটু দূরত্ব ছিল।

তোমার কবে ছুটি বলল তো! রবিবার, না?

মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে চয়ন বলল, সব রবিবার ছুটি নয়। মানিকতলায় একটি ছাত্র শুধু শনি আর রবিবারই পড়ে।

তোমাকে নিয়ে আর পারি না। রবিবারটা ফাঁকা রাখতে পার না? তোমার বোধ হয় ছুটি ভাল লাগে না, না?

চয়ন বলে, এ টিউশনিটা নতুন হল। আগে তো রবিবারটা ছুটিই থাকত।

টিউশনিটা কখন?

সন্ধেবেলায়।

সকালটা তো ফ্রি?

হ্যাঁ।

তা হলে সকালে যদি একটা প্রোগ্রাম করি?

কিসের প্রোগ্রাম?

দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার?

দক্ষিণেশ্বর! বলে অকূলপাথারে পড়ে গেল যেন চয়ন। সে কেন দক্ষিণেশ্বর যাবে? তার তো ইচ্ছে করছে না! কেন অন্যেরাই তাকে সবসময়ে চালাবে? কেন সে কঠিনভাবে কাউকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না?

ও কি, একদম স্পিকটি নট হয়ে গেলে কেন? মাকে নিয়ে যাচ্ছি সঙ্গে। দক্ষিণেশ্বর তোমার ভাল লাগে না?

চয়ন মাথা নেড়ে বলে, ভালই। তবে ইচ্ছে করে না।

আচ্ছা, তা হলে থাক। তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি, এটা তোমার পছন্দ হচ্ছে না। যদি অন্য কোনও প্ল্যান করি?

কি রকম প্ল্যান?

ধরো, যদি একটা গানের অনুষ্ঠানে যাই? কিংবা একটা নৃত্যনাট্য?

চয়ন একটু হেসে বলে, ওসব আমি ভাল বুঝি না।

তবে তোমার কী ইচ্ছে?

ইচ্ছে? বলে চয়ন চুপ করে থাকে।

আবার চুপ করে আছ? এবার কিন্তু চিমটি দেব।

আমার যে কিছুই ইচ্ছে করে না।

কিছুই না?

কিছুই না।

ধীরে ধীরে অনিন্দিতা একটু গম্ভীর আর বিষণ্ণ হয়ে গেল। তারপর বলল, তোমাকে এসব বলাই আমার ভুল হয়েছে। তুমি আমাকে পাত্তাই দাও না।

না না। বলে চয়ন একটা অস্পষ্ট আপত্তি করল।

অনিন্দিতা বলল, তুমি আমাকে ভয় পাও না তো? না কি ঘেন্না?

হতভম্ব চয়ন বলে ওঠে, কী যে বলেন তার ঠিক নেই!

আবার আপনি?

ওঃ, তুমি! কী সব বলছ! ভয়! ঘেন্না! পাগল নাকি?

তা হলে অ্যাভয়েড করতে চাও কেন?

চয়ন কিছুতেই বলতে পারবে না একে যে, মানুষ যে তাকে উদ্বুদ্ধ করতে চায়, তাকে প্রেরণা দিতে চায়, তাকে টগবগে করে তুলতে চায়, সেটা চায় তাদের নিজেদের তাগিদেই। তারা তাকে ব্যবহার করে গিনিপিগের মতো। সে যে নিজের মতো করে একটা গুটিপোকার খোল বানিয়ে নিয়ে তার মধ্যে বাস করছে সেখানে এসবের কোনও দাম নেই। সে নিজের মতো করে বেঁচে আছে, অন্যের পছন্দমতো সে বাঁচতে যাবে কেন? তার তো দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার হতে ইচ্ছে করে না। মানুষকে এটা যদি সে বোঝানোর চেষ্টা করে তা হলে মানুষ অবধারিত অপমান বোধ করবে।

চয়ন বলল, অ্যাভয়েড করতে চাই না তো। তবে আমার কোথাও না যেতে যেতে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, কোথাও যাওয়ার কথা উঠলেই অস্বস্তি হয়।

তুমি কিন্তু সুন্দরবনেও গেছ। এবং একা।

ওঃ, হ্যাঁ।

সেটা কি করে পারলে?

দায়ে পড়ে।

মোটেই নয়। একা যেতে তোমার অস্বস্তি হয় না, কিন্তু কারও সঙ্গে যেতে হয়। তাই না? যদি সেই কেউটা হয় অনিন্দিতা।

তুমি রাগ করছ?

না। তবে আমার একটু অভিমান হয়েছে। যদিও সেটার কোনও দাম নেই তোমার কাছে।

কথাবার্তার হাওয়া কোন দিকে ঘুরছে তা বুঝতে পারছিল না চয়ন। কিন্তু তার বুক একটু কাঁপছিল। অস্বস্তি হচ্ছিল।

সে বলল, আমি গুছিয়ে কথাটাও বলতে পারি না। ঠিক আছে, রবিবার কোথাও একটা যাওয়া যাবে।

অনিন্দিতা মাথা নাড়ল, তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। আমি একটু মজা করছিলাম।

তার মানে?

মানে হল, তোমাকে আমার মতো কেউ জানেও না, বোঝেও না। তুমি যে একা একা আপনমনে নিজের ছোট গণ্ডির মধ্যে থাকতে ভালবাসো তা আমি বুঝি। দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার কথা বলে তোমাকে একটু চমকে দিলাম। কিছু মনে কোরো না।

চয়ন একটু হাসল।

কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ হল না। সকালে, দুপুরে বা বিকেলে অনিন্দিতার সঙ্গে তার রোজই দেখা হয়। কথা হয়। আর এসবের ভিতর দিয়ে অনিন্দিতা তার খুব কাছাকাছি এসে পড়তে থাকে। যেন বন্ধ দরজায় ঘা দিচ্ছে এক আগন্তুক।

বাস্তবিকই ভয় পেয়ে যেতে থাকে চয়ন।

একদিন টিউশনি সেরে বেশ একটু রাতের দিকেই ফিরে সবে স্টোভ ধরানোর চেষ্টা করছিল চয়ন। এমন সময় ছাদে উঠে এল তার দাদা অয়ন। দাদার সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎ হয়ই না। দেখে একটু অবাক হল সে।

অয়ন বলল, তোর সঙ্গে একটু কথা আছে।

চয়ন সভয়ে দাঁড়িয়ে বলল, বলো।

অয়ন একটু রুক্ষ গলায় বলল, কী সব কাণ্ড হচ্ছে বল তো! ব্যাপারটা কী তোর?

চয়ন অবাক হয়ে বলল, কিসের ব্যাপার?

কী সব শুরু করেছিস ওই মেয়েটার সঙ্গে?

চয়ন হাঁ করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কোনও কথা খুঁজেই পেল না।

শুনছি নাকি প্রায়ই ছাদে আসে। খুব মাখামাখি তোর সঙ্গে!

চয়ন এত ভয় পেল যে কথা বলতে গিয়ে তার গলা কাঁপতে লাগল। কোনওরকমে বলল, আসে তো, কিন্তু আমি কী করব?

বাড়িতে একটা নোংরা ব্যাপার হচ্ছে, এটা কি ভাল? আশপাশের বাড়ি থেকেও শোনা যাচ্ছে তোরা নাকি রীতিমতো মাখামাখি শুরু করেছিস!

চয়ন কাঁপা গলাতেই বলে, না না, সেরকম তো কিছু নয়।

তা হলে কি বানিয়ে বলছি নাকি? তোর তো এসব দোষ আগে ছিল না। হঠাৎ পাখা গজাল নাকি?

চয়ন আত্মপক্ষ সমর্থনের মত উপযুক্ত কথা খুঁজে না পেয়ে বলল, আমাকে কী করতে বলছ?

সে কথা পরে। আগে জানতে চাই, ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে?

চয়ন শুধু বোবার মতো মাথা নেড়ে জানাতে চেষ্টা করল যে ব্যাপারটা এগোয়নি।

অয়ন সেটা বিশ্বাস করল না। বলল, ওই ধুমসি মেয়েটাও তো কম নয়। অত্যন্ত ঝগড়াটে টাইপের, বারমুখো। তুই ওর পাল্লায় পড়লি কেন?

চয়ন তোতলাতে তোতলাতে বলল, আমি তো কিছু করিনি।

ও আসে কেন? ছাদে কাপড় শুকোতে আসে বা চুল শুকোতে আসে, ঠিক আছে। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে, তোর বউদি পর্যন্ত ছাদে আসতে গিয়ে কতদিন দরজা থেকে ফিরে গেছে! ঝি-মেয়েটা অবধি নালিশ করে যে তোরা ছাদে থাকলে ওর আসতে নাকি লজ্জা করে।

চয়নের মাথা চক্কর দিচ্ছিল। কিছুক্ষণ হাত মুঠো করে, দাঁতে দাঁত চেপে সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, দাদা, আমার কোনও দোষ নেই। তুমি বিশ্বাস করো।

দোষ নেই! বেশ কথা তো! দোষ নেই মানে? একটা বয়সের মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছিস আর বলছিস দোষ নেই? মেয়েটা তোর ঘরেটরে যায় না?

না তো!

মিথ্যে কথা। শুধু যায় তাই নয়, সেবা-টেবাও করে বলে শুনলাম। এসব নোংরামি তো এখানে চলবে না!

চয়ন বিমূঢ় হয়ে বলল, আমি কি করব?

বাড়ি ছেড়ে দে। দু' মাস সময় দিচ্ছি, অন্য ঘর দেখে উঠে যা।

উঠে যাব?

আমরা ওদেরও উঠবার নোটিস দিয়েছি। এসব এ বাড়িতে চলবে না। বুঝেছিস?

অয়নের দিকে চেয়ে ছিল চয়ন। এই দাদা তাকে চ্যাঙাব্যাঙা করে মেরেছে, মাকে সুদ্ধু তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছে, এবং এ বাড়িতে তাকে আর মাকে একঘরে করে ফেলে রেখেছে। সত্যি কথা, বাড়িটা

ওর। কিন্তু মানুষগুলোও কি ওর নয়? মা বা ভাই? একটা বাড়ির অধিকারের জন্য মা বা ভাইকে এতটা অবহেলা অনাদর করা যায়?

চয়ন হঠাৎ দাদার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আমাকে বাড়ি ছাড়ার নোটিস দিচ্ছ?

হ্যাঁ।

যে কারণে বাড়ি ছাড়তে বলছ সেটা সত্যি কিনা তা যাচাই করে দেখবে না?

যাচাই! যাচাই করার কী আছে? সবাই দেখছে, বলাবলি করছে।

অনিন্দিতাকেও কি কথাটা বলেছ?

অয়ন কখনও চয়নকে মুখে মুখে কথা বলতে দেখেনি। আজ বোধ হয় এইসব কথা শুনে অবাক এবং বিরক্ত হল। বলল, সেটা আমরা যা ভাল বুঝব করব। অনিন্দিতা পরের মেয়ে, তাকে এসব কথা বলা যায় না।

চয়ন হঠাৎ বলল, আর আমি?

তুই কী?

আমিও তো পরের ছেলে।

পরের ছেলে? তার মানে?

আমি তোমার কে?

তার মানে? এসব কথার অর্থ কী?

আমি কি তোমার ভাই? ভাই বলে মনে করো?

অয়ন এত রেগে গেল যে মুখখানা আচমকা রক্তাভ হয়ে গেল তার। কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। তারপর একেবারেই আচমকা ঠাস করে একটা চড় কষাল চয়নের গালে, অসভ্য! ইতর। জানোয়ার! দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষেছি এতদিন!

এসব কথা অবশ্য চয়নের কানেই গেল না। চড়টা খেয়ে সে নিজের শরীরটা একটা বোঝার মতো নিয়ে পড়ে গেল শানের ওপর। রিমঝিম করছে মাথা। কানে কোনও শব্দ আসছে না।

কিন্তু তবু অজ্ঞান হল না চয়ন। ঝিম ধরে পড়ে রইল।

অয়ন কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ চলে গেল।

সামলে নিয়ে উঠে বসতে অনেকটা সময় লাগল চয়নের। কিছুক্ষণ বোকা-মাথায় সে বসে রইল শানের ওপর। দুটো চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। চড়ের জায়গাটা ভালা করছে। ঘাড়টা যেন শক্ত হয়ে উঠছে ক্রমে।

আরও কিছুক্ষণ পর চয়ন উঠল। স্টোভটা নিবিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

এ বাড়ি ছেড়ে সে কোথায় যাবে? বুকের মধ্যে অচেনা ভয় যেন পাকিয়ে উঠছে তার। অচেনাকে তার বড় ভয়।

চোখের জলে বালিশ ভিজে গেল তার। অথচ সে কাঁদছে না তো! কাঁদছে না। আপনা থেকেই তার চোখ তবে কেঁদে যাচ্ছে কেন? এর কোনও মানেই যে হয় না।

একটু রাতে সে শুনতে পেল, নিচে অয়নের সঙ্গে অনিন্দিতার বাবার একটা কথা কাটাকাটি হচ্ছে যেন! সঙ্গে বউদির গলা। তবে অনিন্দিতা বাড়িতে নেই। তার ইভনিং ডিউটি, চয়ন জানে।

শরীরটা এত দুর্বল লাগল চয়নের যে, সে রাতে কিছু খেল না। দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ল।

অনিন্দিতা এল সকালে। খুব সকালেই।

কী হয়েছে তোমার বলো তো!

চয়ন মাথা নেড়ে বলল, বলার কিছু নেই।

আমি সব শুনেছি।

চয়ন একটা শ্বাস ফেলে বলল, সব ভুলে যাও।

তোমাকে কি অয়নদা মেরেছে?

চয়ন চুপ করে থাকে।

অনিন্দিতা শান্ত গলায় বলে, তোমাকে মারা তো সোজা। মারলেও তুমি কিছু করবে না, সবাই জানে।।

ভুলে যাও অনিন্দিতা। আমার কিছু হয়নি।

তোমার হয়নি। আমার হয়েছে।

তোমার কী হয়েছে?

তোমার জন্য দুঃখ হয়েছে। আমার জন্যই তোমাকে এত অপমান সহ্য করতে হল তো!

আমার অভ্যাস আছে।

একটা কথা বলবে? দুর্বলকে সবাই কেন এমন করে মারে, অপমান করে? মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় কি করে?

চয়ন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিছু বলল না।

অনিন্দিতা বলল, পাল্টে যেও না চয়ন। তুমি তোমার মতোই থেকো। তুমি খুব ভাল। আমি বলছি, তুমি খুব ভাল।

বলতে বলতে অনিন্দিতার ঠোঁট কাঁপল। গলা বুজে এল কান্নায়।

৭৫

পনেরো দিন জ্বরে পড়েছিল বীণা। মনে হচ্ছিল জীবন থেকে একটা বিশাল কিছু হারিয়ে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে আয়ু, যৌবন, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রতিভা।

আগাগোড়া কুসুম তার কাছে থেকেছে। মাথা বোয়ানো, গা স্পঞ্জ করা, রান্না করে খাইয়ে দেওয়া। বেডপ্যানও দিতে চেয়েছিল। বীণা ওটা পারেনি। মরে মরেও উঠে উঠোনের ওধারে গেছে।

সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল একজন সঙ্গীর। সেই অভাব কুসুম খুব পূরণ করেছে।

জ্বরের শেষ দিকটায় বীণা একদিন সন্ধেবেলা বলল, হ্যাঁ রে কুসুম, আর জন্মে কি তুই আমার মা ছিলি? মাও তো এত করে না!

কী যে বলো বীণাদি! কী আর করলুম। এটুকু সবাই পারে।

বীণা মাথা নেড়ে বলে, না রে, পারে না। পারলেও করে না। আমি শুধু ভাবি, তোর যদি অসুখ করত আমি কি যেতাম তোর সেবা করতে? নাকি পারতাম এতটা? তুই বড্ড ভাল। এই যে এত সেবা করলি, আমার টাকা থাকলে তোকে একছড়া হার গড়িয়ে দিতাম।

কুসুম মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসল। বলল, হার দিলে তো শোধবোধ হয়ে যেত। তা হলে আর সেবাটার অন্য কোনও দাম থাকত না।

হ্যাঁ রে, জ্বরের ঘোরে তো মেলা ভুলভাল বকেছি। বেফাঁস কিছু বলে ফেলিনি তো!

কুসুম ভ্রূ কুঁচকে একটু ভেবে বলে, একটা জিনিস হল, নিমাইদাদাকে খুব গালমন্দ করেছে। প্রায় রোজ। আর একটা যেন ডলার আর পাউন্ড নিয়ে কী একটা কথা।

বীণার মুখ শুকিয়ে গেল, ডলার আর পাউন্ড! সে আবার কী রে?

কুসুম ঠোঁট উল্টে বলে, কী জানি কী! ডলার, পাউন্ড, খুন, পল্টু এইসব মাঝে মাঝে বলেছে।

বীণার বুক ধকধক করতে লাগল। চোখ বুজে নিজেকে শক্ত করে সে বলল, কত কী মাথায় আসে, কে জানে বাবা! যখন ভুলভাল বকেছি তখন বাইরের কেউ সামনে ছিল না তো!

না। তোমার লজ্জার কিছু নেই।

জ্বর হলেই আমি ভীষণ ভুলভাল বকি। ছেলেবেলায় আমার তড়কা হত।

কুসুম খুব হাসছিল। বলল, হ্যাঁ গো বীণাদি, নিমাইদাদার ওপর তোমার খুব রাগ, না?

কেন বল তো!

যখন ভুল বকেছে তখন বুঝতে পারতাম তোমার ভিতরটা খুব জ্বলছে।

বীণা একটু চুপ করে থেকে বলল, বাইরে থেকে তো কিছুতেই বুঝবি না, লোকটা আমার সঙ্গে কত প্রবঞ্চনা করছে।

কিন্তু নিমাইদাদাকে তুমি এখনও মন থেকে মুছে ফেলতে পারোনি।

মুছে ফেলব কি করে? দাগা দিলে কি ভোলা যায়?

ভুলতে কি চাও?

খুব চাই।

কুসুম কি একটা কাজে উঠে গেল। ঘণ্টাখানেক বাদে যখন এল তখন বীণা বিছানায় বসে আছে।

বীণা বলল, দেখ কুসুম, জ্বরের মধ্যে আমি একটা অলক্ষুণে স্বপ্ন দেখেছি। একবার নয়, কয়েকবার। স্বপ্ন কি সত্যি হয়?

হতে পারে। অনেক সময়ে হয় বলেও তো শুনি। কী দেখেছো?

সে খুব খারাপ স্বপ্ন।

খারাপ স্বপ্ন বলে দিতে হয়। তা হলে আর ফলে না।

সত্যি?

সত্যি কি না কে জানে বাবা! মা খুড়িমার কাছে শুনেছি।

তা হলে তোকে বলে দিই। আমি দেখেছি, ও আবার বিয়ে করেছে। বউটা দেখতে বেশ সুন্দর।

কুসুম একটুও হাসল না। বলল, যাঃ, নিমাইদা সেরকম লোক নয়।

বীণা গম্ভীর হয়ে বলল, পুরুষমানুষকে তুই বিশ্বাস করতে পারিস, আমি একটুও করি না। ওরা সব পারে।

সব পুরুষ কি খারাপ হয় বীণাদি? নিমাইদাদা তো কখনোই খারাপ লোক নয়। ওর ওপর তোমার রাগ বলে বলছো।

বীণা কাহিল গলায় বলে, একটা কাজ করবি কুসুম? কাউকে কাঁচড়াপাড়ায় পাঠিয়ে একটু খবরটা নিবি?

এবার কুসুম হেসে ফেলল। বলল, পারোও তুমি বটে। কাঁচড়াপাড়া তো আর বিলেত-বিদেশ নয়, হরবখত লোক যাচ্ছে আসছে। খোঁজ নিলেই হবে। আমার দিদির শ্বশুরবাড়ি তো কাঁচড়াপাড়ায়। আমারই যাওয়ার কথা ছিল। তোমার অসুখের জন্য আটকে পড়লাম।

খবরটা আমাকে তাড়াতাড়ি আনিয়ে দিতে পারবি?

কবে চাই?

আজ পারলে আজই।

কুসুম হেসে ফেলে বলে, আজ যে রাত হয়ে গেছে সে খেয়াল আছে?

তা হলে কালই। পারবি না? আমার মনটা বড় অস্থির।

কুসুম বলে, নিমাইদাদাকে নিয়ে অত ভাবছো কেন? সে তোমাকে বড্ড ভালবাসত। হুট করে কিছুতেই বিয়ে করবে না। সে তেমন লোক নয়।

নিমাই একটা ছেড়ে দশটা বিয়ে করলেও আমার কিছু যায় আসে না। আমি শুধু ভাবি, আমার মতো আর কোনও মেয়ের যেন সর্বনাশ না হয়।

কুসুম তার মাথায় হাত রেখে বলে, এখন শুয়ে একটু চোখ বুজে থাকো। জানো তো, অসুখের মধ্যে মনের উত্তেজনা ভাল নয়, বেশি ভাবলে অসুখ বেড়ে যায়।

আচ্ছা।

কিন্তু বিশ্রাম হল না বীণার। মনের মধ্যে জ্বালা আর জ্বালা। বারবার একই স্বপ্ন দেখছে কেন সে, যদি স্বপ্নের মধ্যে কোনও মানেই না থাকে?

আরও তিন-চারদিন বীণা বিছানায় পড়ে রইল। তার মধ্যে কোনও খবর আনিয়ে দিতে পারল না কুসুম। ষোলো দিনের দিন সকালবেলা জ্বর ছেড়ে গা ঠাণ্ডা হল। শরীর তখন চুপসে গেছে। উঠে বসবার ক্ষমতা নেই। ভীষণ দুর্বল।

আরও দু'দিন পর কুসুম বলল, একটা খবর আছে বীণাদি।

কি খবর?

নিমাইদাদা বিয়ে করেনি।

বীণা কুসুমের দিকে একটু চেয়ে থেকে বলে, ঠিক খবর তো!

খুব ঠিক খবর। তবে খুব রমরম করে ব্যবসা করছে।

বীণা চুপ করে রইল। লোকটা ছোট্ট একখানা দোকান করতে চেয়েছিল। হয়-হচ্ছে করে হল না। কেন হল না? তখন বড় বীণার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত লোকটাকে। বীণার অন্য দিকে তাকানোর সময় ছিল না। লোকটা যে ভিতরে ভিতরে বড় হতাশ হচ্ছে, মনমরা হয়ে যাচ্ছে, এটা দেখেও দেখেনি বীণা। শেষ অবধি ভেবেছিল ডলার আর পাউন্ড বেচে একখানা দোকান করে দেবে। তাও হল না। সব ফাঁস হয়ে গেল। ধর্মপুর নিমাই তো ও পাপের টাকা ছোঁবেও না। আজ যে লোকটা বীণার সাহায্য ছাড়াই দাঁড়িয়ে গেল সেটাও বীণার ঠিক সহ্য হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না, তা বুঝতে পারছে না বীণা। তার ইচ্ছে করে একদিন গিয়ে দোকানটা ভাঙচুর করে দিয়ে আসে।

হ্যাঁ রে কুসুম, আমি কি খুব স্বার্থপর?

ওকথা কেন বলো বীণাদি?

তোর নিমাইদাদার জন্য কি আমার কিছু করা উচিত ছিল?

ও বাবা, ওসব আমি জানি না। তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার।

ওভাবে পাশ কাটাস কেন? তোর কাছে ভাল ভেবেই জানতে চাইছি। মানুষ তো সব সময়ে নিজেকে বুঝতে পারে না!

আমিও বুঝি না গো বীণাদি। শুধু এইটুকু বলতে পারি, নিমাইদাদা লোক খারাপ ছিল না।

সবাই তাই বলে।

বীণা চুপ করে ভাবতে লাগল। তার ভাবনা-চিন্তাগুলো কিছু নিমাইয়ের পক্ষে গেল, কিছু বিপক্ষে গেল। তারপর কাটাকুটি হয়ে গেল। শুধু রইল বীণার বুকের জ্বালাটা।

আরও দু'দিন পর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল বীণা। সোজা হাজির হল রিহার্সালে।

কাকা অবাক হয়ে বলে, টাইফয়েড খারাপ রোগ বীণা। অনেক সময়ে রিলান্স করে। তুমি এখনও কমজোরি। আরও সাত দিন বিশ্রাম নাও। তারপর রিহার্সাল।

ও বাবা, তা হলে আমি মরেই যাবো। রিহার্সাল ছাড়া আর আমার বাঁচা অসম্ভব। দম আটকে আসছে।

কাজটা ভাল করছে না বীণা।

খুব ভাল করছি। পার্ট করতে করতে যদি মরেও যাই তাতেও সুখ আছে।

তা হলে করো! অনেক সময়ে মানুষ যা ভালবাসে তা করতে করতে চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

শরীর দুর্বল, মাথা ঝিম ঝিম, তা সত্ত্বেও বীণা কাজে নেমে গেল। প্রাণ ঢেলে অভিনয় করতে লাগল।

রিহার্সাল করতে রাত হয়ে গেলে দলের কেউ বীণাকে এগিয়ে দিয়ে আসে। অনেক সময়ে রিকশাতেও ফেরে। আজ কাকা তার সঙ্গে সজলকে দিল। সজল নতুন এসেছে। ছিপছিপে, লম্বা, শ্যামলা চেহারা। মুখচোখ খুব সুন্দর। দারুণ গাইতেও পারে।

সজল পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, তুমি এত ভাল পার্ট করে কি করে বলো তো বীণা! তোমার কাছে অনেক কিছু শেখার আছে।

বীণা মৃদু একটু হাসল। কিছু বলল না।

এ দলে থেকে তোমার কী হবে? সিনেমায় নামার চেষ্টা করো না কেন?

কে চান্স দেবে? সিনেমাওলারা কি গুণের দাম দেয়? কাকা আমার জন্য অনেক করেছে। এখানেই ভাল আছি।

ওটা কোনও কথা হল না বীণা। পৃথিবীটা যে কত বড় তা এই বনগাঁয়ে পড়ে থেকে কোনও দিন বুঝতে পারবে না। তোমার অনেক ক্ষমতা, তা কি টের পাও?

আগে স্তোকবাক্য শুনলে, প্রশস্তি শুনলে বীণা যত খুশি হত, আজকাল আর তা হয় না। কিন্তু খুশি না হলেও, একটু যেন ভাল লাগে ভিতরটা।

সজল বলল, তোমার হাজব্যান্ডের সঙ্গে কি ডিভোর্স হয়ে গেছে?

বীণা গম্ভীর হয়ে বলল, না তো!

হবে নাকি?

না, ডিভোর্স হওয়ার মতো অবস্থা এখনও হয়নি। কেন বলো তো!

এমনিই। তোমার জীবনে একটা দুঃখ আছে বলেই বোধ হয় এত ভাল অভিনয় করতে পারো! নইলে এই নাটকটা তো পুরো ঝুল। এ নাটক যদি দাঁড়ায় তবে তোমার জোরেই দাঁড়াবে।

অত প্রশংসা করতে হবে না। যদি আমি অত গুণের মেয়েই হতাম, তা হলে এত দিনে বড় জায়গায় চান্স পেতাম। কলকাতার যাত্রাপাড়ায় ঘুরে এসেছি, কেউ পাত্তা দেয়নি।

আমি বলি কি, তোমার সিনেমায় একটু চেষ্টা করা উচিত। কখনও চেষ্টা করেছে?

না। সিনেমায় কে চান্স দেবে? আমার চেহারা মোটেই সিনেমায় নামার মতো নয়।

সজল অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে বলে, সে কি? তুমি তো রীতিমতো সুন্দরী। খুব ফটোজেনিক ফেস! কে বলল সিনেমার মতো নও?

আমি জানি।

ভুল জানো। সিনেমায় নামার খুব শখ ছিল আমারও। কিন্তু হল না।

ও মা! তোমার হল না কেন? বেশ তো চেহারাটি।

হল না কারণ, সিনেমার লাইনে ছেলেদের ভিড় বেশি, তাই চাহিদা কম। একজন ডিরেক্টর আমাকে বলেছিল, ভাই, তোমাকে চান্স দিতে পারব না, কিন্তু বোন-টোন যদি থাকে, নিয়ে এসো, তাকে চান্স দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি।

বীণা হেসে ফেলল। তারপর বলল, মেয়েরাই বা কম যাচ্ছে নাকি? সিনেমায় চান্স পেতে কত মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে স্টুডিওপাড়ায়।

সেসব হেঁজিপেঁজি। তোমার মতো গুণী মেয়ে ক'জন বলো?

বীণা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কি জানো, আমাদের এত পেটের টান যে, কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু থাকে না। এই আমার কথাই ধরো। যদি অভাব না থাকত তা হলে যাত্রাদলে আসার কথা কি ভাবতে পারতাম? আমাদের বংশে কখনও কেউ এসব করেনি।

ওটা আবার কুসংস্কার। অভিনয় একটা বড় ব্যাপার।

তা জানি। কিন্তু অধিকাংশই তো আসে পেটের টানে। শিল্প-টিল্প নয়। খানিকটা টাকা, খানিকটা হাততালি আর খ্যাতি, খানিকটা গ্ল্যামার। একটা গুজব আছে, সিনেমালাইনে অনেক পয়সা। কিন্তু পয়সার যে গুনোগার দিতে হয় তা বুঝছে ক'জন?

আহা, তুমি তো আর অত বোকা নও।

আমিও আমার মতো করে বোকাই।

সত্যি করে বলো তো, তুমি কি অভিনয় করে নাম কিনতে চাও না?

বীণাপাণি মৃদু হেসে বলল, তাও চাই। কিন্তু তার চেয়েও বেশি চাই, প্রাণভরে অভিনয় করতে।

বীণাকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে এক কাপ চা খেয়ে চলে গেল সজল। কিন্তু দু'দিন পর আবার বীণাপাণিকে এগিয়ে দিতে এল।

বীণা, তোমার একা লাগে না?

লাগে। মাঝে মাঝে লাগে। তবে স্বামীর জন্য নয়। এমনি।

আমি তোমার কথা খুব ভাবি, জানো?

কেন ভাবো?

তা কি করে বলবো? তোমার অভিনয়, হাঁটা-চলা, ফিগার, গলার স্বর, গান সব কিছুই এত ইমপ্রেসিভ।

বানিয়ে বানিয়ে আর মিথ্যে কথাগুলো বোলো না তো!

মিথ্যে? তাও কি হয়?

মিথ্যেই তো।

সজল খুব চিন্তান্বিত হয়ে বলে, আমার মনে হওয়াটা ভুল হতে পারে, হয়তো আমি তোমাকে যতটা মনে করছি, তুমি ততটা নও। কিন্তু তা বলে আমাকে মিথ্যেবাদী ভেবো না।

দু'দিন পর আবার দুজনে একা হল। নির্জনতা ছিল, পথ অন্ধকার ছিল, সজল তার একখানা হাত ধরে বলল, বীণা, আমার মাথায় একটা পাগলামি এসেছে। প্রশ্রয় দেবে?

নাটক করছো?

আমি একদম বাজে অ্যাকটর। অভিনয় জানিই না।

হয়তো, স্টেজের অভিনয় জানো না। অনেকে স্টেজে পারে না, কিন্তু জীবনে পারে, বাস্তবে পারে।

সজল হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলে, তা হলে থাক।

বীণা একটু মুচকি হাসল। কতদিনের জন্য থাকল, তা কে জানে? সজল যে সহজে হাল ছাড়বে এমনটা তার মনে হল না। অখুশিও হল না সে। পুরুষহীন জীবন একটু আলুনি তো বটেই। এ পর্যন্ত বীণা নিজেকে অনেক আঁটবাঁধ দিয়ে ধরে রেখেছে। কিন্তু এই যৌবন জলতরঙ্গ রুধিবে কে? টাইফয়েডের পর তার শরীর সেরেছে। একটু কি মোটাও হয়েছে সে? পুরনো অম্বলের অসুখটা আর নেই। এখন তার খুব খিদে পায়। ভাল ঘুম হয়। শরীর এখন অনেক কিছু চায়। মনটা বড় দোল খায় দিনরাত।

কাঁচড়াপাড়ায় নিমাইয়ের দম ফেলার ফুরসত নেই। তার দোকান বড় খদ্দেরদের জন্য নয়। ব্যাপারী, মুটে-মজুর, ঠিকাদারদের লোক, ট্রাকওয়ালা এদেরই ভিড় বেশি। দামে সস্তা, খেতে ভাল এমন খাবারের দোকান হলে ভিড় হবেই।

দুপুরবেলাটায় দুটো-আড়াইটের পর একটু ফাঁকা যায়। সে সময়টায় নিমাই একটু খেয়ে জিরিয়ে নেয়। রাতের চৌকিদারি এখনও ছাড়েনি বলে দুপুরের তন্দ্রাটুকু দরকার।

সেই তন্দ্রার মধ্যেই দোকানের ছোকরা এসে ডাল, একজন আপনাকে খুঁজছেন।

নিমাই বলে, কী চায়?

বনগাঁ থেকে এসেছেন।

বনগাঁ! নিমাই একটু চনমনে হল। উঠে বলল, যা, যাচ্ছি।

চোখে জল-টল দিয়ে এসে যাকে দেখল, তাকে সে চেনে না। ছেলেটা বসে বসে মাংস পরোটা খাচ্ছে।

কিছু বলবেন আমাকে?

ছেলেটা তার দিকে চেয়ে হাসল। বলল, আপনার দোকানের খুব নাম শুনেছি। বেশ রান্না তো এখানে!

ভগবানের দয়া। আপনি কি বনগাঁর লোক?

আজ্ঞে হ্যাঁ। একটু কথা ছিল।

নিমাই উল্টোদিকের চেয়ারে বসে বলল, খবর আছে কিছু?

আছে। আমি কাকার দলে অ্যাকটিং করি।

কাকার দল শুনে বুকটা একটু চলকে গেল নিমাইয়ের। তার মানে বীণাকেও চেনে। ছেলেটার চেহারা ভাল। শক্তসমর্থ আছে। মুখখানাও বেশ।

নিমাই বলল, ও।

সজল হাত-মুখ ধুয়ে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে এসে ফের চেয়ারে বসল।

একটা কথা বলবেন?

বলুন না!

বীণার সঙ্গে কি আপনার আবার মিল হতে পারে?

এ কথার কি জবাব হয়? নিমাই তো হাত গুনতে জানে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বীণা চাইলে হয়তো হয়। কিন্তু, বীণা আর চাইবে না।

কেন, বলুন তো।

সে অনেক কথা। সব বলা যাবে না।

বীণা না চাইলে হয় না?

না।

আপনি কি চান?

নিমাই মাথা নেড়ে দুঃখিতভাবে বলল, আমার চাওয়ায় কি এসে যায় বলুন! আমি তার চোখে পোকামাকড় বই তো নয়!

ছেলেটা কিছুক্ষণ বাইরের দিকে আনমনে চেয়ে থাকে। তারপর বলে, ডিভোর্সের কথা ভাবছেন কি?

ডিভোর্স! না, সেসব ভাবব কেন? আমাদের মধ্যে একটা গণ্ডগোল আছে ঠিকই, কিন্তু ডিভোর্সের মতো নয়।

এভাবে আলাদা আলাদাই থাকবেন দু'জনে?

উপায় কি?

উপায়! উপায় নিশ্চয়ই আছে। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বাস না করলে বিয়ে জিনিসটাই তো মিথ্যে হয়ে যায়।

নিমাই হাসল, স্বামী মরে গেলে স্ত্রী বিধবা হয়। বিয়ে মিথ্যে হবে কেন?

আপনি শাস্ত্রের কথা বলছেন, আমি আইনের কথা বলছি।

আইন! আমি তো আইন-টাইন জানি না। শাস্ত্রও জানি না। শুনে যা বুঝেছি। ভুলও বুঝে থাকতে পারি। আপনার নামটা কী আজ্ঞে?

সজল রায়। আমি নতুন এসেছি।

হ্যাঁ। পুরনোদের আমি চিনি।

ছেলেটা মাথা নিচু করে কি যেন ভাবল।

আপনি কিছু একটা বলতে এসেছেন। সেইটে বলুন।

সজল মুখ তুলে একটু হাসল। বলল, কি ভাবে বলব, তা ভেবে পাচ্ছি না।

সোজা বলে ফেলুন।

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলে, আপনি রাগ করবেন।

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, রাগ করব কেন? আমার তার ওপর কোনও রাগ নেই। সে যা ভাল বোঝে করতে পারে, আমার কিছু আপত্তির কারণ দেখি না।

ছেলেটা ফের অধোবদন হল। মুখ না তুলেই বলল, বীণারও কিছু সংস্কার আছে।

নিমাইয়ের বুকে কোনও তোলপাড় হল না। ছেলেটা কী বলতে চাইছে তা সে স্পষ্টই বুঝতে পারছে। তবু বুকে ঝড় উঠছে না তার। শুধু যেন তার মনের মধ্যে সব আলো নিবে গেল হঠাৎ। সামান্য ধরাগলায় নিমাই বলল, ডিভোর্স চায় পাবে। কোনও বাধা নেই। তাকে বলবেন।

আপনি কী দাবি ছেড়ে দিচ্ছেন তা হলে?

নিমাই হাসল, দাবির কী আছে? দাবি-দাওয়া অনেক বড় ব্যাপার। আমি তার উপযুক্ত ছিলাম না কখনও। তাকে বলবেন আমার দিক থেকে বাধা হবে না।

ছেলেটা মাথা নিচু করেই বসে রইল।

নিমাই বলল, খাবারের দামটা দিতে হবে না। আপনি বীণার লোক, কুটুমই একরকম। দামটা দেবেন না।

ছেলেটা উঠে দাঁড়াল। খুব মৃদুস্বরে বলল, তা হলে আসি?

৭৬

পার্কের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে ছিল লোকটা। পার্কের গায়েই বাস স্টপ। বেলা ন'টায় যখন আপা এসে বাস স্টপে দাঁড়াল তখন লোকটা তাকে ডাকল।

আপা, শোনো। জরুরি কথা আছে।

লোকটা মধ্যপ্রদেশের। নাম যশবীর সিং। ট্রান্সপোর্টের বিশাল চেন আছে। প্রচুর পয়সা। বিদেশি পারফিউম মাখে, দারুণ পোশাক পরে। মুখখানা একটু কর্কশ ধরনের হলেও ফর্সা, সুন্দর, লম্বা চেহারা। সন্ধের দিকে একটু মদ খায় রোজ। ওর বউ বিমলার সঙ্গে খুব ভাব ছিল আপার। সেই ভাবসাব যশবীর ইদানীং পছন্দ করছে না। বিমলা মেলামেশা কমিয়ে দিয়েছে।

আপা ঘড়ি দেখল। হাতে বিশেষ সময় নেই। স্কুল শুরু হবে সাড়ে ন'টায়। তবু সব মানুষের প্রতি সদ্ব্যবহারের যে নীতি সে অনুসরণ করে সেটাকে ভাঙল না। পার্কের ভাঙা গেট দিয়ে ঢুকে সামনে দাঁড়িয়ে বাংলায় বলল, বলুন।

যশবীর ভালই বাংলা বলে। আপা যশবীরের মুখ দেখে বুঝতে পারল, লোকটা স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। পরনে চমৎকার পোশাক, গা থেকে সুগন্ধ আসছে, দাড়ি পরিপাটি কামানো, গোঁফে কেয়ারি, সবই ঠিক আছে। তবু লোকটার চোখে একটা বিভ্রান্তি আছে। যশবীরের মুখে একটু হাসিও আছে, আপার সেটাও পছন্দ হল না। তাদের পাশের বাড়িতেই যশবীর থাকে, অনেক দিনের চেনা। আবার তেমন চেনাই বা বলা যায় কি করে? লোকটা উদয়াস্ত খাটে, সারা ভারতবর্ষে দৌড়ে বেড়ায় আর দু'হাতে টাকা রোজগার করে। টাকাই ওর নেশা। এ ধরনের রোবটকে চেনা মুশকিল হয় আপার পক্ষে। মনুষ্যত্বের শতকরা ভাগ কার মধ্যে কতটা আপা সেটা সবসময়েই নিজের মেধা ও বোধ দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করে। সেই হিসেবে এই লোকটাকে তার বোঝবার কথা নয়।

যশবীর প্রথমেই একটা অদ্ভুত কথা বলল, তুমি বাংলা বলো কেন? বাংলা কি তোমার মাদার ল্যাংগুয়েজ?

একটু অবাক হয়ে আপা বলল, ভারতবর্ষের যে কোনও ভাষাই আমার মাদার ল্যাংগুয়েজ, যদিও আমি সব ভাষা জানি না।

বাট ইউ সাউথ ইন্ডিয়ানস্ আর অ্যান্টি-হিন্দি।

আপা বুঝল না লোকটা তার সঙ্গে খামোখা ঝগড়া করতে চাইছে কি না। সে ঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল, আমার তো বেশি সময় নেই হাতে। কিছু বলবেন?

ইউ ক্যান স্পিক ইংলিশ।

আপা মাথা নেড়ে বলে, ইংরেজদের সঙ্গে ছাড়া আমি ইংরিজি বলতে ভালবাসি না।

হোয়াই নট হিন্দি?

আমি হিন্দি জানি না।

ইউ হেট হিন্দি।

না। কিন্তু আপনি কী বলতে চাইছেন?

রিগার্ডিং মাই ফ্যামিলি লাইফ।

ওঃ। কিন্তু এখন তো আমার সময় নেই।

স্পেয়ার মি ফাইভ মিনিটস্। কথাটা জরুরি।

বলুন না!

বিমলা ইজ ট্রায়িং টু ডেজার্ট মি।

আপা অবাক হয়ে বলে, তাই নাকি?

বাট আই ওন্ট অ্যালাউ হার।

ওঃ। তা আমি কী করব?

যশবীরের ফর্সা মুখ আচমকা একটু লাল হল। সে একটু গরম গলায় বলে, আপা, ইউ আর বিহাইন্ড অল দিস।

আমি! আমি তো কিছু জানি না।

শী ওয়াজ এ ভেরি ওবিডিয়েন্ট অ্যান্ড সার্ভিং ওয়াইফ। তোমার সঙ্গে মিক্স করার পর শী হ্যাজ বিকাম ডিফারেন্ট। ও গড়িয়াহাটে একটা লেডিজ গ্রুপের মেম্বার হয়েছে। তুমি ওকে নিয়ে গিয়েছিলে। শী হ্যাজ কনফেসড।

গলাটা বেশ চড়ে যাচ্ছিল যশবীরের।

আপা ঠাণ্ডা গলাতেই বলল, বিমলা ভাল মেয়ে। একটু একা। আপনি ওকে বুঝবার চেষ্টা করেন কেন? ওকে আর একটু সঙ্গ দিন।

আই অ্যাম নট গোয়িং টু টেক অ্যাডভাইস ফ্রম ইউ।

আপা ফের বিনীতভাবেই বলল, আপনি বিমলার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন। ওকে মারেন, পা টেপান, রাগ হলে জিনিসপত্র ভাঙেন। বিমলা আপনাকে ভয় পায়।

বিমলা আর আমার ব্যাপারটা আমাদের পারসোনাল। তুমি কেন এর মধ্যে আসছ? তুমি কে?

বিমলা আমার বন্ধু।

শী ইজ ওল্ডার দ্যান ইউ। তুমি ওকে উইমেন্স লিব শেখাচ্ছ? জানো তার কনসিকোয়েন্স কী হতে পারে? আই শ্যাল কিক হার আউট অব দি হাউস। তারপর কি তুমি ওকে খাওয়াবে?

আপনি চিৎকার করছেন কেন? ভিড় জমাতে চান?

ভিড় না হলেও চেঁচামেচি শুনে রাস্তা থেকে কয়েকজন উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে।

কিন্তু যশবীর ক্রমশ রেগে যাচ্ছে। গলা আরও এক পা ওপরে তুলে বলে, আলবাৎ চেঁচাবো। বিমলা ওয়াজ এ গুড গার্ল। তুমি ওকে স্পয়েল করছ। ইন ফ্যাক্ট, শী হ্যাড এ কোয়ারল উইথ মি দিস মর্নিং। বিমলার কখনও আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার সাহস ছিল না। ওকে কে সাহস দিচ্ছে? হু? ইউ আর দি কালপ্রিট।

লোকটার রাগ দেখে আপার মায়া হল। এই সেই আবহমানকালের পুরুষ যে স্ত্রীর কাছে কেবলই আশা করে বশ্যতা, মুগ্ধতা, নতশির দাসত্ব, প্রত্যুত্তরহীন অপমানের পাত্রী। এই সেই পুরুষ যারা গুহামানবের উত্তরাধিকার এখনও রক্তে বহন করে। যারা শয্যাসঙ্গিনী ছাড়া স্ত্রীকে আর কিছুই ভাবতে পারে না। এদের চাই একটি সুন্দরী জ্যান্ত রক্তমাংসের পুতুল।

আপা বলল, এসব কথা রাস্তায় না বললেই আপনার চলত না? আপনি তো আমাকে আমাদের বাড়িতে গিয়েই বলতে পারতেন বা আমিও যেতে পারতাম আপনাদের বাড়িতে।

নেভার! তুমি কখনও আমার বাড়িতে আসবে না। আই শ্যাল কিক ইউ আউট।

আপার হঠাৎ কেমন খটকা লাগল। লোকটা স্বাভাবিক নেই। লোকটা পাগলের মতো ব্যবহার করছে। এরকম করছে কেন?

আপা শান্ত গলায় বলল, আপনার কী হয়েছে বলুন তো? আপনি তো পাগল হয়ে গেছেন দেখছি!

এ কথায় যশবীর লাফিয়ে উঠে গলার শিরা ফুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, পাগল হয়ে গেছি! তুমি জানো বিমলাকে আমি কত ভালবাসতাম! অ্যান্ড আই হ্যাভ লস্ট হার ফর এভার! ফর এভার!

ফর এভার শুনে আপার মাথা একটা চক্কর দিল। যশবীর কি বিমলাকে খুন-টুন কিছু করে এসেছে? তারপর প্রলাপ বকছে?

যশবীর চেঁচাচ্ছিল, ইফ শী কমিটস্ সুইসাইড ইউ উইল বি রেসপনসিবল। ইফ শী ডাইজ ইউ উইল বি দি কজ।

আপা হঠাৎ 'হায় ভগবান' বলে ঘুরে ছুট দিল। রাস্তাটা হরিণের মতো চকিতে পেরিয়ে সে গিয়ে ঢুকল পাশের বাড়িতে। ডোরবেল বাজাতে বাজাতে ডাকতে লাগল, বিমলা! বিমলা!

বিমলা জবাব দিল না। দরজাও খুলল না।

আপা জানালার কাছে গিয়ে দেখল, কাচের শার্শি বন্ধ, পর্দা টানা।

হঠাৎ যশবীর হাঁফাতে হাঁফাতে এসে কর্কশ হাতে একটা ধাক্কা দিল আপাকে, হোয়াট ডু ইয়া ওয়ান্ট? হোয়াট ডু ইয়া ওয়ান্ট? গেট আউট ফ্রম হিয়ার।

ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়েছিল আপা। রোগা কনুইটা ঠকাস করে ঠুকে গিয়েছিল শানে। পড়ে-থাকা অবস্থাতেই বলল, আপনি বিমলাকে কী করেছেন? ও দরজা খুলছে না কেন?

শী হ্যাজ লেফট। নাউ ইউ গেট আউট।

আপা উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি না। বিমলা ঘরে আছে।

যশবীর ধমকে ওঠে, ইউ বিচ! ইউ রেচেড গার্ল! গেট আউট! গেট আউট!

আপার চোখে জল আসছিল। বিমলা একটি ভারি সরল সোজা নরম প্রকতির মেয়ে। একটু অন্যমনস্ক ধরনের। কিন্তু হাসিখুশি, প্রাণময়। প্রায়ই আসত তাদের বাড়িতে। আপাও যেত। বিমলার সারা দিন সময়

কাটে না। স্বামী বাড়ি না থাকলে সে শুধু ঘর গোছায়, টিভি দেখে আর টুকটাক মার্কেটিং করে। যশবীরের মা-বাবা থাকে ইউ পি-তে। মাঝে মাঝে তারা এসে থেকে যায় কয়েক মাস। তখন বিমলার খুব কাজ বেড়ে যায়। অবশ্য বিমলাদের কাজের লোক আছে। একজন রান্না করে, একজন ঠিকে ঝি অন্য কাজ করে দিয়ে যায়। সুখী পরিবার বলেই মনে হয় বাইরে থেকে। কিন্তু বছরখানেক আগে বিমলা এসে একদিন অনেক কথা বলল আপাকে। নিঃসঙ্গতার কথা, স্বামীর অন্যান্য মেয়ে-বন্ধুর কথা, একঘেয়ে জীবনের কথা, শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে অবনিবনার কথা। সব মেয়েদেরই অভিযোগ মোটামুটি একইরকম। বিমলারও আলাদা কিছু নয়। কথা হল, বিয়েতে বিমলার বাবাকে দু' লক্ষ টাকা নগদ বরপণ দিতে হয়েছিল।

ভালবাসা কি কেনা যায় আপা? যদি যায় তাহলে আমি দু' লাখ টাকার ভালবাসা কিনেছি।

খুব অবাক হওয়ার কিছু নেই। আপা জানে কোনও কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে এর চেয়েও অনেক বেশি পণ নেওয়া হয়। কিন্তু ছেলেমানুষ বিমলা স্বামীর কাছ থেকে একটু ভালবাসা চাইত। যশবীর অবশ্য কৃপণ নয়। বউকে বিস্তর প্রেজেন্টেশন দিয়েছে। ভালবাসা দিয়েছে কি না কে জানে!

বিমলাকে একটু চার-চৌখোস বানানোর জন্যই আপা তাকে মাঝে-মধ্যে একটু মেয়েদের অধিকার, তাদের সত্তা, তাদের ভবিষ্যতের কথা শোনাত। বিমলা বলত, তুমি ঠিক বাঙালি মেয়েদের মতো কথা বলো! বাঙালী মেয়েরা কত ভাল আছে দেখ। আমাদের মতো মাথা নিচু করে থাকতে হয় না। অনেক স্বাধীন।

আপা বলেছে, তুমি তাহলে বাঙালিদের সঙ্গে আরও একটু মেশো। ভাল হবে।

লেডিজ গ্রুপটায় আপাই নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দেয় বিমলাকে। তারপর কি বিমলার খুব কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল? যতদূর আপা জানে, না। তেমন কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। রক্তের গভীর সংস্কার আর অভ্যাস কি সহজে পাল্টায়?

আপা যশবীরের দিকে চেয়ে বলল, আপনি খুব বীরপুরুষ, না? আমি পুলিশের কাছে যাচ্ছি।

গো টু হেল।

আপা শেষ অবধি পুলিশের কাছে যায়নি। কারণ, বিমলাকে খুন করা হয়েছে এমন কোনও কথা হুট করে পুলিশকে গিয়ে বলাটা ঠিক হবে না। হয়তো বিমলাকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। কে জানে? সে স্কুলে দেরিতে পৌঁছলো, টিচারের বকুনি খেল এবং তারপর টিফিনের সময় বন্ধুদের জড়ো করে ঘটনাটা সবিস্তারে শোনাল।

পারগত বলল, হোয়াইল দেয়ার ইজ আপা, দেয়ার অলওয়েজ ইজ ট্রাবল। আপা অ্যাট্রাক্টস্ ট্রাবল।

বুবকা একটু গরম হয়ে বলল, উই হ্যাভ টু পাই অন দি ম্যান। আপা, তুমি ওর ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি জোগাড় করতে পারবে?

পারব।

পরমা বলে উঠল, আরে লক তো পিক করাই যায়। আমরা সবাই মিলে আজ সন্ধেবেলাতেই যাই চলো। লোকটাকে চেপে ধরি।

আপা মাথা নেড়ে বলে, না, সেটা বুদ্ধির কাজ হবে না। আমি আজ নজর রাখব। যশবীরের বাড়িতে টেলিফোন আছে। টেলিফোনেও খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করব। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, লোকটা পালিয়ে যাবে। মাথার ঠিক নেই এখন।

রাজেশ বলে, খুন করলেও বডি যে ঘরে আছে তার তো মানে নেই। যদি গাড়ি থাকে তো বডি নিয়ে গিয়ে ধাপা বা গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসতে পারে।

আপা বলল, ওদের গাড়ি আছে। কন্টেসা।

রাজেশ বলে, তাহলে? উই হ্যাভ টু অ্যালার্ট দি অথরিটি।

বুবকা একটু হেসে বলল, পুলিশের দরকার কী? আপার তো গুণ্ডার দল আছে। বলল আপা, এসব ঝামেলা মেটানোর জন্যই না তুমি গুণ্ডার দল খুলতে চেয়েছিলে?

আপা মৃদু হেসে বলল, তাহলে তুমিও তো মানো যে কেন একটা গুণ্ডার দল খোলা দরকার?

কিন্তু তোমার গুণ্ডারা তো অহিংসা গুণ্ডা। অহিংসা দিয়ে কি যশবীরের মতো লোককে টিট করা যাবে?

অঞ্জলি এতক্ষণ কথা বলেনি। এবার বেজার মুখে বলল, আপাটার সব কিছুতেই বেশি বেশি। তুই পুলিশে জানিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাক না। অত মাথা ঘামাচ্ছিস কেন?

আপা আস্তে করে বলল, মাথা থাকলে একটু ঘামাতেও হয়। বিমলা আমার বন্ধু ছিল।

অঞ্জলি একটু ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, বন্ধু ছিল তো ছিল। তুই আবার ওকে উইমেনস লিভ দেখাতে গেলি কেন? সেইজন্যই তো এসব হল। সাধে কি বলি আপাটার বড্ড বাড় বেড়েছে!

পারগত বাধা দিয়ে বলে, আরে বাবা, এসব না হলে লাইফটার কোনও ইন্টারেস্ট থাকত আমাদের? আপা, নাউ ইউ সে হোয়াট উই শুড ডু। আমি বলি কি আমরা কয়েকজন এখন তোমার সঙ্গে যাই। বাড়িটা ওয়াচ করি। ইফ যশবীর ইজ দেয়ার তাহলে তাকেও একটু দেখে রাখি।

না, সন্দেহ করবে।

করুক না, কী আছে?

সন্দেহ করলে ও সাবধান হয়ে যাবে।

পারগত হেসে বলল, দূর বোকা! সন্দেহ করলে ও একটু ঘাবড়েও যাবে। ঘাবড়ে গেলে ব্লান্ডার করবে।

আপার মনটা খুব খারাপ। বিমলা কি সত্যিই খুন হল? হয়ে থাকলে খুব খারাপ ব্যাপার। সে পারগতের দিকে চেয়ে বলল, আজ আমি একাই ওকে ওয়াচ করি। কাল তোমরা যেও।

বুবকা সামান্য রেগে গিয়ে বলে, আপা, সব ব্যাপারেই তুমি একা এগিয়ে যেতে চাও কেন? ড্রাগ পেডলারদের সঙ্গে যখন লেগেছিল তখনও তুমি একা গিয়েছিলে। ফলে মার খেতে হয়েছিল, মনে আছে?

বাংলায় একটা কথা আছে, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

পারগত বলে, আরে বাবা, ওসব কথা ছাড়া। আমি বলি, যশবীর ইজ নাউ এ উন্ডেড টাইগার। তোমার যা স্বভাব হয়তো একাই ওকে ফেস করতে যাবে। তাহলেই বিপদ।

আপা একটু ভাবল। তারপর বলল, আমি তাতে ভয় পাই না। কিন্তু লোকটাকে ধরা দরকার। আমি আজ তেমন কিছু করব না। শুধু লক্ষ রাখব। দরকার হলে কাল তোমরা যেও। বিপদের ভয় নেই। আমি আজ বাবা আর মাকেও বলব।

তাই হল। স্কুলের পর আপার বন্ধুরা একটু উদ্বেগ নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

আপা বাস থেকে নেমে নিজেদের বাড়িতে ঢোকার আগে যশবীরের ঘরখানা আবার ভাল করে দেখল। ঘর অন্ধকার, তালা বন্ধ। কেউ নেই। আপা কিছুক্ষণ বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। চোখে জল আসছিল

তার। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে ডানদিকে তাকাল আপা। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে কেউ নেমে আসছে। ওপরে বাড়িওলা থাকেন একা। বুড়ো মানুষ। নিচের তলার ভাড়াটে হল যশবীর।

চোখের জলের ভিতর দিয়েও আপা বাড়িওলাকে দেখতে পেল। চেনা মানুষ।

এই যে আপা, কেমন আছ?

আপা হাসল, ভাল।

বিমলার কাছে এসেছ নাকি? ওরা কি বাড়ি আছে?

আপা একটু আকুল হয়ে বলল, কাকাবাবু, আপনাকে একটা জরুরি কথা জানানো দরকার। বিমলার কিছু একটা হয়েছে।

বুড়ো মানুষটি ভয় পেয়ে গেলেন। উদ্বেগের সঙ্গে বললেন, কী হয়েছে?

ঠিক বুঝতে পারছি না। আজ যশবীরের ভাবসাব দেখে কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছে।

কী সন্দেহ বলো তো?

ওদের মধ্যে কি কাল বা আজ ঝগড়া হয়েছে কাকাবাবু?

ঝগড়া! সে তো কিছুদিন যাবৎ রোজই হয়। হ্যাঁ, কাল রাতেও তো কথা কাটাকাটি হচ্ছিল।

আর কিছু শুনতে পাননি!

বাড়িওলার মুখ শুকিয়ে গেল। বললেন, কিছু মনে তো পড়ছে না। কী ব্যাপার একটু খুলে বলবে?

আমিও যে জানি না। শুধু ভয় হচ্ছে। আপনার কাছে কি এই ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি আছে কাকাবাবু? ফ্ল্যাটটা একবার দেখা দরকার।

বাড়িওলা একটু চিন্তিত মুখে বললেন, কাজটা কি ঠিক হবে আপা? ট্রেসপাসিং।

কাকাবাবু, আমার যে জানা দরকার। বিমলার যদি কিছু হয়ে থাকে তবে ঢুকে দেখলে দোষ নেই। আমি আজ সকালে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু যশবীর আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল।

বলো কি? আচ্ছা তুমি দাঁড়াও। চাবি আনছি।

আপা নিচে দাঁড়িয়ে রইল। বাড়িওলা চাবি আনতে অনেক সময় নিচ্ছিলেন। আপা ধৈর্য হারাচ্ছে।

চটিজুতোর শব্দটা শোনা গেল যেন এক যুগ পর।

এই নাও চাবি। কিন্তু সাবধান!

আপা দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকল। সন্ধের অন্ধকার হয়ে এসেছে। সে বাতি জ্বালল। প্রথম ঘরটা লিভিং কাম ডাইনিং। দারুণ সাজানো। টিভি, ভি সি আর, ফ্রিজ সব এই ঘরে। আপা পরের ঘরটায় উঁকি দিল। স্পেয়ার বেডরুম। ওপাশে আর একটা বেডরুম। তার দরজাটা বন্ধ। আপা দরজায় একটা টোকা দিল। তারপর হাতল ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে বাতি জ্বালতেই বিমলাকে দেখতে পেল। দেয়ালের গা ঘেঁষে কার্পেটে পড়ে আছে বিমলা। হাত পা পিছমোড়া করে বাঁধা। মুখে একটা চওড়া লিউকোপ্লাস্ট আটকানো।

একটা শ্বাস ফেলল আপা। নিশ্চিন্তের খাস। হাত পা যখন বাঁধা তখন হয়তো খুন হয়নি এখনও।

কিন্তু দেখা গেল, খুনের খুব কাছাকাছিই ঘটে আছে। অভুক্ত, দুর্বল, ক্লান্ত, মার-খাওয়া বিমলা অজ্ঞান হয়ে গেছে। হয়তো অনেকক্ষণ। হাত পা সাদা হয়ে গেছে রক্ত চলাচলের অভাবে। শ্বাস চলছে ধীরে।

আপা তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে একটু ছুরি এনে বাঁধন কাটল। লিউকোপ্লাস্টটা বড্ড সেঁটে বসে গিয়েছিল। খুলতে কষ্ট হল আপার।

কাকাবাবু! একটু আসুন।

বাড়িওলা এলেন। নার্ভাস, ভীত।

এসব কী আপা?

দেখুন কী অবস্থা করে রেখে গেছে। মরেই যেত।

লোকটা তো খুব অমানুষ দেখছি!

আপনি, একজন ডাক্তার ডাকবেন কাকাবাবু? বিমলার অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি না।

পুলিশেও কি খবর দেওয়া দরকার আপা?

না কাকাবাবু, পুলিশ ডেকে লাভ নেই। মেয়েদের কেউ বুঝবে না। ডাক্তারই ডাকুন।

চোখে-মুখে জল দেওয়ার পরই অবশ্য বিমলা চোখ খুলল। অনেকক্ষণ সেই চোখ রইল শূন্য, ভাষাহীন। এত দুর্বল যে একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারল না বিমলা।

ফ্রিজ থেকে দুধ বের করে গ্যাস জ্বেলে গরম করে এনে তাকে একটু খাওয়াল আপা।

অনেকক্ষণ বাদে বিমলা বলতে পারল, আপা, আমি তো মরবই। কেন কষ্ট করছ?

না, মরবে না। মরলে লড়বে কে? উঠতে পারবে?

পারব।

তাহলে আমাদের বাড়ি চলো। এ বাড়ি তোমার পক্ষে নিরাপদ নয়।

কেন কষ্ট করবে আপা? ছেড়ে দাও।

না। চলো।

৭৭

ডারলিং আর্থ বইটা হাতে এসেছিল কয়েকদিন আগে। চারুশীলার বাড়িতে ঝকমকে বইটা দেখে নিয়ে এসেছিল। লেখক ডঃ কৃষ্ণজীবন বিসোয়াস। প্রকাশক লস এঞ্জেলেসের একটা বই কোম্পানি। সাড়ে তিনশো পৃষ্ঠার শক্ত মলাটের বই। ভিতরে কিছু আর্ট প্লেট আর লাইন ড্রয়িং আছে। ত্রিশ ডলার দামটা বড্ড বেশি। লোকে কি কিনবে?

বইটা আনলেও পড়ার সময় পায়নি প্রথমে। অফিসের বকেয়া কাজ নিয়ে হিমসিম খেতে হচ্ছিল! এক শুক্রবার রাতে খাওয়ার পর বইটা নিয়ে শুয়ে পড়ল। খটোমটো টেকনিক্যাল বই নয়। যেন এক দার্শনিকের লেখা প্রবন্ধ-উপন্যাস। প্রথম পরিচ্ছেদের শুরুতেই এলিয়টের একটা উদ্ধৃতি, দিস ইজ দি ওয়ে দি ওয়ার্ল্ড এন্ড্স, নট উইথ এ ব্যাং, বাট এ হুইম্পার। প্রথম পরিচ্ছেদেই প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত এক মানুষ বেরিয়েছে তার সঙ্গে পৃথিবী ও বিশ্বজগতের সম্পর্ক অনুসন্ধানে। রোমান্টিক এক কবির মতো। কিন্তু রোমান্টিক কবি কখনও চায় না তার অনুসন্ধান চরিতার্থ হোক মীমাংসায়, সমাধানে, প্রত্যুত্তরে। শুধু ওই অনুসন্ধানই তার কাম্য, তার প্রার্থিত হল ওই রহস্যময়তার ঘেরাটোপ। কিন্তু কৃষ্ণজীবন চায় স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ সত্যকে। জড় থেকে চৈতন্যের স্তরে ক্রম অভিগমনকে নানা জ্বলন্ত প্রশ্নে, জরিপে, এষণায় উল্টেপাল্টে দেখছে পাগল কৃষ্ণজীবন। খ্যাপার হাহাকার শুরু হল দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, যার শুরুতেই কৃষ্ণজীবন উদ্ধৃতি দিয়েছে, কুয়ো ভেদিস? এক মহাকাশযাত্রীর চোখ দিয়ে দেখা পৃথিবীর দৃশ্য দিয়ে শুরু। আর তারপর এই উন্মাদ বৈজ্ঞানিক মানুষের সব ধ্যানধারণার ওপর যেন উপর্যুপরি আঘাত করতে চেয়েছে। কোথায় যাচ্ছো? কোথায় চলেছে তোমরা? এইভাবে এই গ্রন্থ এগিয়ে গেছে চূড়ান্ত রোমান্টিক পাগলামি আর বৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যানে গাঁটছড়া বেঁধে। পড়তে পড়তে ঘুম কোথায় পালাল হেমাঙ্গর। শোয়া থেকে উত্তেজনায় উঠে বসল। সাড়ে তিনশো পাতার বই শেষ হয়ে গেল লহমায়। তখন হেমাঙ্গর দু'চোখে টলটল করছে জল। বুক ভার। গলায় ঠেলাঠেলি করছে কান্নার ডেলা।

রাত সাড়ে তিনটে। লন্ডনে রাত দশটাও বোধহয় নয়। হেমাঙ্গ থাকতে পারছিল না। কাউকে এই বইটার কথা তাকে বলতেই হবে। দ্রুত রশ্মির নম্বর ডায়াল করল সে।

আমি তোমাকে একটা বইয়ের কথা বলতে চাই রশ্মি।

তুমি এখনও জেগে আছো? কী করছিলে?

একটা বই পড়ছিলাম। সেই বইটার কথাই বলতে চাই। বইটা তুমি পড়ো। অবশ্যই পড়ো।

কী বই বলো তো!

ডারলিং আর্থ।

ও! বলে একটু হাসল রশ্মি। তারপর বলল, এতদিনে পড়লে? আমার কয়েকবার পড়া হয়ে গেছে।

সে কী! তুমি বইটা পেলে কোথায়?

কেন, এখানে তো খুব বিক্রি হচ্ছে। সাত-আটটা রিপ্রিন্ট হয়েছে। আমারটাই বোধহয় সেভেনথ্ ইমপ্রেশন।

মাই গড! কৃষ্ণজীবন তা হলে এখন ওয়ার্ল্ড ফেমাস!

তাও বলতে পারো। তবে তুমি তো জানোই এসব দেশে বই এমনিতেই বেশি বিক্রি হয়। আর ওয়ার্ল্ড ফেমাস হতে বেশি দেরিও লাগে না। কিন্তু ওয়ার্ল্ড ফেমাসদের সংখ্যাও যে বড্ড বেশি।

তা বটে। বই পড়ে তোমার কেমন লেগেছে বলো তো!

এত প্যাশনেট লেখা অনেকদিন পড়িনি। তুমি ভীষণ ইমপ্রেসড মনে হচ্ছে!

আমার মাথাটা একটু বিভ্রান্ত। ঠিক অ্যাসেস করতে পারছি না।

তুমি তো ভাল অ্যাসেসর নও। অনেক কিছুই অ্যাসেস করতে পারোনি।

রশ্মির হাসির শব্দটা শুনে একটু লজ্জা পেল হেমাঙ্গ। বলল, তোমার বোধহয় ততটা ভাল লাগেনি, না?

আমি ভদ্রলোককে চিনি। চারুদির বাড়িতে কয়েকবার দেখা হয়েছে। আমি ওঁর প্যাশনের কথা জানি। ডারলিং আর্থ-এ ইমোশন একটু বেশি। কিন্তু তবু ভাল। এখানকার কাগজে ভাল রিভিউ হয়েছে। এশিয়াবাসী বলে একটু ক্ষমাঘেন্নার ভাবও আছে। সাহেবরা যেমনটা হয় আর কি।

বলছো, এ বই সাহেব লিখলে নোবেল প্রাইজ পেত?

ও বাবা, তা জানি না। নোবেল প্রাইজ অনেক বড় ব্যাপার।

আমার ক্ষমতা থাকলে দিতাম।

ভাগ্যিস তোমার ক্ষমতা নেই! রোজ এত রাত অবধি জেগে থাকো নাকি?

না। আজ বইটা পড়তে গিয়ে ঘুম চটে গেল। কৃষ্ণজীবনকেই ফোন করতাম। কিন্তু আন্‌গডলি আওয়ার্সে ফোন করলে হয়তো প্রশংসাও ভাল মনে নেবেন না। কিন্তু কাউকে তো বলা দরকার, তাই তোমাকে বলতে হল।

বেশ করেছে। ডারলিং আর্থকে ধন্যবাদ। বইটার সুবাদে অন্তত তোমার গলা শোনা গেল।

কেন, আমি কি তোমাকে প্রায়ই ফোন করি না?

রশ্মি হাসল, মাসে দু'বার। আমি কতবার করি বলল তো! চারবার।

আমাকে কৃপণ বলার চেষ্টা করছে নাকি?

একটু আছে। সব ব্যাপারেই তুমি একটু কৃপণ। এমন কি হৃদয়ের ব্যাপারেও।

তাই বুঝি?

শুধু এই ডারলিং আর্থের ব্যাপারে দেখছি খুব অকৃপণ।

বইটা তোমাকে কেন ইমপ্রেস করল না ভাবছি।

রশ্মি একটু চুপ করে থেকে আস্তে করে বলল, দেখ, পৃথিবীকে নিয়ে কৃষ্ণজীবনের কিছু উদ্ভট ভয় আছে। তাই উনি কল-কারখানা বন্ধ করতে বলছেন, মোটরগাড়ির ব্যবহার কমিয়ে সাইকেল, ঘোড়া এইসব ব্যবহার

করতে বলছেন। তা করলে যে আন্‌এমপ্লয়মেন্টের সৃষ্টি হবে তার সমাধান কে করবে? আরও অনেক কথা আছে যা খুব লজিক্যাল নয়।

একটু দমে গেল হেমাঙ্গ। তারপর বলল, জনসংখ্যা কমে গেলে আন্‌এমপ্লয়মেন্টও কমবে।

জনসংখ্যা কি করে কমবে? একটা থিওরি অব মাল্টিপ্লিকেশন আছে। সেটা অপটিমামে না গেলে রিভার্স ট্রেন্ডটা শুরু হয় না।

তার মানে তুমি কি বলতে চাইছে পৃথিবীর জনসংখ্যা একটা চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছে তারপর কমবে?

সেরকমই তো মনে হয়।

ডারলিং আর্থ তুমি আর একবার পড়ো।

কেন বলো তো!

পড়লে দেখবে, পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে তৃতীয় বিশ্বে। উন্নত দেশগুলোতে নয়। আমাদের এই তৃতীয় বিশ্ব জনসংখ্যার চাপে গোল্লায় যাক, পশ্চিমি দেশগুলো তাই চায়।

সব ব্যাপারেই বুঝি আজকাল আমেরিকা ইউরোপের দোষ? থার্ড ওয়ার্ল্ডের পপুলেশন বাড়লে এদের কী করার আছে?

আছে রশ্মি, আছে। থার্ড ওয়ার্ল্ড, ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড বলে এখন আর কিছু থাকা উচিত নয়। থার্ড ওয়ার্ল্ডও ওয়ার্ল্ড। সেখানে ঘা হলে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডও সাফার করবে।

ওটা ফিলজফি।

ফিলজফি মানে কি ফ্যাক্ট নয়? আমার তো মনে হয় সমস্যার সমাধানে গোটা দুনিয়ার এগিয়ে আসা উচিত।

রশ্মি মৃদু হেসে বলে, থার্ড ওয়ার্ল্ড চাইলে এরা জাহাজ ভর্তি কন্ট্রাসেপটিভ পাঠিয়ে দেবে। তাতেই কি হবে?

না, তুমি বুঝলে না রশ্মি। কন্ট্রাসেপটিভ নয়, থার্ড ওয়ার্ল্ডের দরকার প্র্যাকটিকাল ইডিওলজির। কিন্তু তুমি কি খেতে বসেছিলে? চিবোনোর শব্দ পাচ্ছি যেন।

রশ্মি হেসে ফেলল। বলল, রাতে আমি কি খাই জানো? মাত্র চারখানা ক্র্যাকার আর দুধ। তুমি যখন ফোন করলে তখন আমি সবে বিস্কুটে কামড় দিয়েছি।

ইস! ডিস্টার্ব করলাম। তুমি বরং খাও, আমি ছাড়ছি।

ছেড়ো না। আমি বরং পরে খাবো। বেশি রাত তো হয়নি।

এদিকে যে ভোর হতে চলেছে!

তুমি যা উত্তেজিত হয়ে রয়েছে, এখন তো ঘুমোতেও পারবে না।

ঘুমটা কি খুব প্রয়োজন? বরং বাকি রাতটা এইসব প্রবলেম নিয়ে ভাববো। কৃষ্ণজীবন অন্তত আমাকে ভাবতে শেখাচ্ছেন।

তা ঠিক। বইটা পড়ে আমিও কিন্তু ক'দিন খুব ট্রান্স-এর মধ্যে ছিলাম। ঠিক আছে, তুমি বরং ভাবো।

বইটার ক'টা এডিশন হয়েছে বললে?

সাত-আটটা তো বটেই। বেশিও হতে পারে।

সেটা কি বেশ বেশি বিক্রি?

খুব না হলেও মন্দ নয়।

সাত-আট এডিশনে কত কপি হয় বলল তো।

মিনিমাম সাত-আট লাখ। অলমোস্ট এ মিলিয়ন। কৃষ্ণজীবনবাবু ইজ নাউ এ ভেরি রিচ ম্যান।

রিচ ম্যান! দূর, সেটা কোনও কথা নয়। হি ইজ রিচ ইন আদার ম্যাটারস্। ছাড়ছি রশ্মি।

বাই।

আরও খানিকক্ষণ জেগে রইল হেমাঙ্গ। ক্যাসেট চালিয়ে স্টিরিওতে আমির খাঁ সাহেবের হংসধ্বনি শুনল। তারপর শুলো এবং ঘুমোলো।

শনিবার আজকাল অফিস ছুটি থাকে। সকালেই সে ফোন করল কৃষ্ণজীবনকে।

ডারলিং আর্থ পড়লাম। অভিনন্দন।

কৃষ্ণজীবন শিশুর মতো শব্দ করে হেসে উঠল। বলল, কী আশ্চর্য! পড়েছেন? ইটস্ এ গুড নিউজ!

আপনার বইটা যে দারুণ বিক্রি হচ্ছে তা কি আপনি জানেন?

কৃষ্ণজীবন আর হাসল না। বলল, বিক্রি! তা জানি। কিন্তু লোকে ব্যাপারটা বুঝতে পারছে কি?

আমি বোধহয় বুঝেছি।

কিন্তু অন্যরা? অনেকে বই পড়ে, কিন্তু বইয়ের কথাকে ভিতরে নেয় না। অনেক পণ্ডিত আছে বইয়ের মধ্যে প্রতিবাদযোগ্য অংশগুলি খোঁজে। ডারলিং আর্থ হয়তো খুব কমপিটেন্ট রাইটিং নয়, কিন্তু কাঁচাহাতে আমি যা লিখেছি তার উদ্দেশ্য হল, মানুষ আর একটু চিন্তিত হোক, একটু বিষণ্ণ হোক, একটু ভাল করে চারদিকটাকে লক্ষ করুক।

আমি বইটা পড়ার পর থেকে ঘুমোতে পারিনি। একটা কথা আছে। আপনি সামনের উইক এন্ডে আমার গাঁয়ের বাড়িতে যাবেন?

সামনের উইক এন্ড? বোধহয় আমি ম্যানিলায় যাব।

তা হলে আজই চলুন।

আজ? আজ!

ভাববেন না। ভাবলে আর যাওয়া হবে না।

একটা অসুবিধে আছে। রিয়া আজ কয়েকজনকে নেমন্তন্ন করেছে। তারা সব আসবে।

কখন?

আজ বিকেলে। যদি কিছু মনে না করেন, আপনিও আসুন। খুব ইনফর্মাল ব্যাপার।

না, সেটা ভাল দেখাবে না। আমি বাইরের লোক।

বোধহয় ইনভাইটিদের কাউকে কাউকে আপনার অপছন্দ হবে না। কারণ তাঁদের একজন আপনার দিদি চারুশীলা।

মাই গড। চারুদি হলে তো আমি আরও যাবো না।

কেন বলুন তো!

ওঃ সে অনেক কথা। বিয়ে বিয়ে করে ও আমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। রিসেন্টলি ও আর একটি মেয়েকে আমদানি করেছে। ওকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না যে বিয়েটা একজন মানুষের জীবনে সবচেয়ে

ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার নয়।

একটা বয়সের পর কিন্তু বিয়েটা ইম্পর্ট্যান্ট। ইভন এ রং ম্যারেজ ইজ ওয়েলকাম দ্যান নো। ম্যারেজ।

আপনি একজন বুদ্ধিমান লোক হয়ে এ কথা বলছেন? রং ম্যারেজ যে মানুষকে নষ্ট করে দিতে পারে। ডিভোর্স, সুইসাইড কত কী হয়!

শিরঃপীড়া হলে কি মাথাটা কেটে বাদ দিতে হবে?

বুঝেছি। কিন্তু আমি বলতে চাইছি, বিয়ে জিনিসটা সবাইকে স্যুট করে না।

আচ্ছা, ঠিক আছে। ইনভাইটিদের সঙ্গে আপনাকে মিট করাবো না। আমি আর আপনি সামনের বারান্দায় বসব। হবে? একটু ধরুন, রিয়া নিজে আপনাকে নেমন্তন্ন করবে।

আহা, তার দরকার কি?

আছে। ও আপনাকে খুব পছন্দ করে। খুশি হবে।

রিয়া এল এবং ফোন ধরেই বলল, আমার কি এমন ভাগ্যি হবে যে আপনি আসবেন?

কেন, আমি কে এমন খাঞ্জা খাঁয়ের নাতি?

সত্যি আসবেন?

আসতে বলেই দেখুন না! সেই যে হিং-এর কচুরি খাইয়েছিলেন আজও ভুলিনি।

ইস, ছিঃ ছিঃ, কচুরি কি একটা খাবার!

আমি খুব ভালবাসি।

আজ কিন্তু কচুরি নয়। ফুল ডিনার।

আপনি কি ডারলিং আর্থ বইটা পড়েছেন?

ডারলিং আর্থ? না। সময় পাই কোথায় বলুন!

আপনি কি জানেন যে কৃষ্ণজীবনবাবু এখন একজন ওয়ার্ল্ড ফেমাস লোক?

রিয়া হাসল, অতটা জানি না।

ইটস্ এ ফ্যাক্ট।

আসছেন কিন্তু।

যাবো।

ফোনটা রেখে দিল হেমাঙ্গ। এইজন্যই সে বিয়ে করতে চায় না। ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীর বইটা অবধি পড়েননি!

সারাদিন ধরে বইটা আবার পড়ল হেমাঙ্গ। এবার ধীরে ধীরে। ক্রিটিকের মতো। সজাগ ও সতর্ক। কিন্তু কৃষ্ণজীবন তার বইয়ের সম্মোহক অভ্যন্তরে ঠিকই টেনে নিল তাকে। শেষ অধ্যায়ের শুরুতে জীবনানন্দ দাশের একটি উদ্ধৃতি রয়েছে। হে নাবিক, হে নাবিক, জীবন অপরিমেয় নাকি—ও সেইলার, সেইলার, ইজ দি লাইফ স্টিল ইনফিনিট। ক্ষ্যাপা বৈজ্ঞানিক তার বলগাছাড়া কলমে লিখে গেছে, তোমাকে কে বলে দেবে, একটি প্রস্ফুটিত শিউলি ফুলের সৌন্দর্যে কেন তোমার এত আনন্দ? দূরের নক্ষত্রের দিকে চেয়ে শুয়ে আছছ ছাদে, চিৎপাত! তোমার সর্বস্ব হারিয়ে যাচ্ছে অনন্ত নক্ষত্রবীথির রহস্যময়তায়—তখন কে তুমি মনে পড়ে? ওই নক্ষত্ররা কি তোমার সঙ্গে কথা বলে? বলতে চায়? বিজ্ঞান কি ব্যাখ্যা করে এক মহৎ কবিতার অন্তলোককে?

সুন্দর গানের মধ্যে কোথায় হারিয়ে যায় তোমার লজিক? হে মানুষ, কোন জড়বস্তু থেকে এল এত চৈতন্যের প্লাবন? ভালবাসা? মুগ্ধতা! কে ব্যাখ্যা করবে তা? বিজ্ঞান তো অন্ধের যষ্টি মাত্র। পথের ঠাহর দেয়, কিন্তু সে তো নয় চোখ! বীজের ভিতরে বটবৃক্ষের সম্ভাবনা—এ কি ভাবতে পারা যায়? একটু ভাবো। ভাল করে ভাবো। ঈশ্বরীয় বা নিরীশ্বর যাই হও তুমি, দাঁড়াও। দুই হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে প্রার্থনা করো, জ্ঞানবান করো আমাকে। সৃষ্টির দুর্জ্ঞেয় অবগুণ্ঠন সরিয়ে দাও। বুঝতে দাও, আমি কে। বুঝতে দাও, তুমি কে!

আপনি কি খুব কবিতা পড়েন?

কবিতা! বলে কৃষ্ণজীবন লাজুক একটু হাসল, একটু-আধটু।

নিজে লেখেনও নাকি?

না, না, কী যে বলেন!

হেমাঙ্গ একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার মনে হচ্ছিল, কবিতার প্রতি আপনার কিছু আনগত্য আছে।

কৃষ্ণজীবন চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, অ্যাফ্লুয়েন্ট দেশগুলোতে কবিতা লোপাট হয়ে যাচ্ছে। টেকনোলজি খেয়ে ফেলছে সাহিত্যকে। এইসব কবিতা-টবিতা যা কিছু সব আজকাল থার্ড ওয়ার্ল্ডের নিষ্কর্মাদের পাসটাইম। জানেন?

কিছুটা জানি।

বাঁচোয়া। আর সব দিকে এগিয়ে গেলেও ওরা, ওইসব টেকনোলজিক্যালি হাই সোসাইটি, বোধহয় কবিতাকে আমাদের হাতে ছেড়ে দেবে।

তাই হোক।

বিকেল মরে সন্ধে হয়ে আসছে। কৃষ্ণজীবনের সাততলার ঝুল-বারান্দা থেকে সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি মিলিয়ে যেতে দেখেছে হেমাঙ্গ। অতিথিদের সমাগম এখনও হয়নি। কৃষ্ণজীবনকে একা পাওয়ার জন্য একটু আগেই এসেছে হেমাঙ্গ।

রেলিঙে থুতনির ভর হাতের পাতায় রেখে কৃষ্ণজীবন সামনের দিকে চেয়ে দূরাবলোকন করছিল। কেমন এক দূর গলায় বলল, আমার ছোটো দুটো ভাই সামান্য বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারপিট করে এ ওকে জখম করেছে। আমার একটা বোন যাত্রা করে বেড়ায়। আমার বাবা-মা কাঁচাঘরে বাস করে। আর আমি? সাততলায় থাকি। মোটা মাইনে পাই। আমেরিকা থেকে আমার বই বেরোয়। হেমাঙ্গবাবু, আমাকে যা দেখছেন, যতটুকু দেখা যাচ্ছে আমার, এটুকুই সব নয়। আমি যেমন বাইরের দূষণের কথা বলি, তেমনি ভিতরের দূষণের কথাও বলি। মানুষের জীবনযাপনের মধ্যে, তার মনের মধ্যে, মস্তিষ্কের মধ্যে কি কম পলিউশন?

হেমাঙ্গ চুপ করে কৃষ্ণজীবনের দিকে চেয়ে রইল।

কৃষ্ণজীবন মৃদু স্বরে বলল, মাঝে মাঝে আমি কেমন যেন মূক-বধির হয়ে যাই। এমন সব সিঁচুয়েশন তৈরি হয় যাতে আমি ভীষণ অসহায় হয়ে পড়ি, কিছুই করতে পারি না। তখন কি ভাবি জানেন? ভাবি, তোর ওপরে নেই ভুবনের ভার। মাঝে মাঝে ভাবি, আমি বৃথা চিৎকার করে মরছি, পৃথিবীর কেউ আমার কথা শুনছে না, গুরুত্ব দিচ্ছে না, হয়তো আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে।

আপনার কেন এরকম মনে হয়?

কৃষ্ণজীবন যখন মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল তখন হেমাঙ্গ লক্ষ করল কৃষ্ণজীবনের মুখে বিষণ্ণতার ছাই মাখানো। চোখের দীপ্তি হঠাৎ নিবে গেছে। মৃদু স্বরে বলল, ডারলিং আর্থ বইটা প্রকাশের আগে পাবলিশারের অনেক দ্বিধা ছিল। রিভিউয়াররা সবাই ফেবারেবল ছিল না। অনেক আগু-পিছু, অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর ওরা ডিসিশন নেয় যে, বইটা শেষ অবধি ছাপা হবে। যখন বইটা নিয়ে ইনডিসিশন চলছে তখন আমার প্রায়ই মনে হত, ওই বইয়ের মধ্যে বোধহয় আমার পাগলামিই রয়েছে। কিন্তু এই পাগলামি ছাড়া আর যে আমি কিছুই পারি না।

কোনও কোনও পাগলামি হয়তো প্রতিভার লক্ষণ।

প্রতিভা! না না, ওসব আমার নেই। আপনি ঠিক বুঝবেন না, আমি খুব আনসাকসেসফুল ম্যান।

তার মানেটা কি হল?

সাকসেস তাকেই বলে যখন মানুষ নিজের সঙ্গে এই গোটা বিশ্বজগতের প্রকৃত সম্পর্কটা আবিষ্কার করতে পারে। সারাজীবন আমি সেই চেষ্টাই তো করেছি। কিন্তু হল না। মনে হচ্ছে, একটা নিরেট দেয়ালে মাথা ঠুকে মরছি। কিছুতেই বুঝতে পারছি না, আমি কি। সত্যিই আমি কে। এই যন্ত্রণা আমাকে মাঝে মাঝে পাগলের মতো করে দেয়। এই গাড়ি বাড়ি টাকা ডক্টরেট সব যেন একমুঠো ধুলোর মতো অর্থহীন হয়ে যায়।

হেমাঙ্গ স্মিতমুখে বলল, অ্যান্ড দ্যাট ইজ সাকসেস। আপনার যন্ত্রণাটাও যদি আমার থাকত তা হলে নিজের পিঠ চাপড়ে বলে উঠতাম, সাবাস।

এ বই কি মানুষকে ভাবাবে হেমাঙ্গবাবু?

কাঁদাবে।

আপনি ঠাট্টা করছেন না তো!

এই বুঝলেন এতক্ষণে?

না না। ইউ আর সো কাইন্ড।

ডোরবেল বাজতেই উঠে গেল কৃষ্ণজীবন। অতিথি সমাগম শুরু হল বোধহয়। ভিড় হয়ে যাবে। কত অর্থহীন কথার গ্যাঁজলা উঠবে। বিষণ্ণ, মন্থর, গভীর যে সময়টুকু এই বারান্দায় ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল তা ডানা মেলে পালিয়ে যাবে।

কী রে কিম্ভূত?

হেমাঙ্গ ঘোর অন্যমনস্কতা থেকে মুখ তুলে কয়েক পলক মহিলাটিকে চিনতেই পারল না। মনে মনে অনেকটা দূরে সরে গিয়েছিল সে। এক মহাকাশচারীর মতো সে কালো আকাশে সবুজাভ নীল পৃথিবীর গোলকটিকে অবলোকন করছিল। সেও ভাবছিল, কেন জন্ম? কেন এই চৈতন্য? কেন এই বিশাল সৃষ্টির আয়োজন? এর কি কোনও মানে হয় না?

চারুশীলাকে চিনতে তাই সময় লাগল। সে একটু হাসল। নিজেই টের পেল, হাসিটা ফুটল না। হাসিটা হাসির মতো হল না। অস্ফুট স্বরে সে বলল, চারুদি!

তোরও নেমন্তন্ন ছিল বলিসনি তো! কৃষ্ণজীবনবাবুর কাছে শুনে তো আমি অবাক।

হেমাঙ্গ বেশ কষ্ট করেই নিজেকে বাস্তবে নামিয়ে আনল। বলল, নেমন্তন্ন? ও হ্যাঁ, নেমন্তন্নটা আজ সকালেই হয়েছে। তোকে বলবার সময় পাইনি।

এত অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে কেন তোকে? কী হয়েছে?

না, কিছু নয়।

ভেতরে আয় না! মুখ গোমড়া করে বসে আছিস কেন? আয়।

হেমাঙ্গ উঠল।

মস্ত হলঘরটায় অতিথি সমাগম হচ্ছে। বেশির ভাগই চেনা মুখ। সুব্রত, অনু, চারুদির ছেলেমেয়েরা।

আপনি কিন্তু রোগা হয়ে গেছেন।

হেমাঙ্গ ফিরে তাকাল। যাকে দেখল তাকে চিনতেও একটু সময় লাগল তার।

রোগা হয়ে গেছি!

অনেক। কেন রোগা হলেন? বিরহে নয় তো!

হেমাঙ্গর কান দুটো হঠাৎ একটু গরম হয়ে গেল। বিড় বিড় করে সে কয়েকবার আওড়াল, বিরহ? বিরহ? কেন বলুন তো!

ঝুমকি একটুও হাসছে না। মুখটা থমথমে গম্ভীর। বলল, এমনি জিজ্ঞেস করলাম। কিছু মনে করবেন না।

হেমাঙ্গ ছিপছিপে সুন্দর মেয়েটার দিকে চেয়ে ভাবতে লাগল, একে কী বলা যায়! মেয়েটা কি তাকে নিয়ে মজা করছে?

একটু সময় নিয়ে সে গম্ভীর গলায় বলল, বিরহের কোনও কারণ তো দেখতে পাচ্ছি না।

ঝুমকি একটু হাসল। বলল, তা হলে বোধহয় ডায়েটিং করছেন।

ফাজিল মেয়েটির কাছ থেকে সরে যাওয়ার জন্য সে 'এই যে, চয়নবাবু' বলে এগিয়ে গেল।

কিন্তু সারাক্ষণ সে মাঝে মাঝেই টের পেতে লাগল, একজোড়া চোখ তাকে কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ করছে, অনুসরণ করছে। কিছু বলতেও চাইছে কি? গেরো।

৭৮

স্ট্রোক জিনিসটা কি বলো তো! ডিকশনারিতে যা লেখা আছে ডাক্তারি মতে তো তা নয়! ব্যাপারটা কি বলল তো!

পুলিন ডাক্তার একটু হেসে বলে, কেন, ওসব জেনে হবেটা কি?

বিষ্ণুপদ অপ্রতিভ হেসে বলে, জেনে রাখা ভাল, মানুষের স্ট্রোক হয় শুনেছি, মারাও যায়। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।

ওসব অলক্ষুণে ব্যাপার জানার দরকারটা কি? দুনিয়ায় জানার আরও অনেক জিনিস আছে। তোমাকে তো চিনি। ভেঙে বললেই ওসব নিয়ে ভাবতে শুরু করে আবার একটা রোগ বাধিয়ে বসবে।

বিষ্ণুপদ ফের একটু হেসে বলে, মানুষ তো মরেই। বয়স হলে, সময় ফুরোলে একটা না একটা ছলছুতোয় প্রাণপাখি ফুরুৎ হয়ে যায়। তা বলে বাঁচার ইচ্ছেটা কি মরে? এই যে এত আতান্তরে আছি, তাও মরতে কেমন ইচ্ছে যায় না। আরও কথা কি জানো, সংসারের যা অবস্থা দেখছি তাতে ভুগে মরতে ভয় হয়। স্ট্রোক হলে শুনেছি, ফুরুৎ হতে এক লহমা লাগে।

এই বলছে মরতে ইচ্ছে যায় না আবার বলছো ফুরুৎ হতে চাও, তোমাকে নিয়ে তো মুশকিল দেখছি। এক নিশ্বাসে দুটো উল্টো কথা বলে ফেললে।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে খুব হেসে বলে, উল্টোপাল্টা ভাবি আর বলি বলেই তো আমি মনিষ্যির মধ্যে পড়ি না। ভাবছিলাম কি জানো, মরতে ইচ্ছে যায় না সে কথা ঠিক। তা বলে কি মরণ-বাবাজী আমাকে ছাড়বে? বুকে হাঁটু দিয়ে পাওনা-গণ্ডা আদায় করে নেবে না একদিন? তা মরাটা যদি ওই স্ট্রোকে হয় তাহলে ল্যাটা একটু কম, তাই না?

তোমাকে বলেছে! যারা হুট বলতে মরে তারা ভাগ্যবান। ভোগে না, ভোগায় না। স্ট্রোক হলেই যে তেমনধারা হবে তার মানে নেই। অনেক সময় জড়ভরত হয়ে বেঁচে থাকে। পক্ষাঘাত হয়, আরও নানা জটিল জিনিস হয়। ফুরুৎ হতে চাইলে বরং গলায় দড়ি দেওয়া ভাল, নয়তো ঢকাঢক ফলিডল মেরে দাও, হাতের কাছেই রয়েছে।

তাতে পাপ হবে না?

তা হবে। সব দিক সামলে চলতে গেলে কি হয়?

আত্মহত্যা করলে নাকি আত্মা আকাশের সব অন্ধকার গ্রহে ঘুরে বেড়ায়। মুক্তি হয় না।

তা হবে। তোমার মতো শাস্ত্রজ্ঞান আমার নেই। তবে একটা কথা জেনো, আত্মহত্যা হচ্ছে জোয়ান বয়সের ব্যাপার। বুড়ো বয়সে আর ওসব করার মতো বুকের পাটা থাকে না। তখন লাথি ঝাঁটা খেয়েও প্রাণটুকু নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় মানুষ। আজকাল খুব মরার কথা ভাবছো নাকি?

দু'রকমই ভাবি। মরার কথাও, বাঁচার কথাও।

পুলিন ডাক্তার তার প্রেশার দেখার যন্ত্র আর স্টেথসকোপ বের করে বলে, দেখি প্রেশারটা।

বিষ্ণুপদ হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে একটু হেসে বলে, তোমার ওই যন্ত্রখানার বয়স কত হল বলো তো! চল্লিশ পঞ্চাশ বছর হবে না?

তাতে কি? বিলিতি জিনিস!

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, আমার মনে হয়, যন্ত্রটা এবার পুরোনো লোহার দরে বেচে দিলে ভাল। যেমন তুমি, তেমন তোমার যন্ত্র।

বেশি বোকো না হে, ত্রিশ বছর ধরে প্রেশার দেখে আসছি। এক চুল এদিক-ওদিক হয়নি।

হলেই বা ধরছে কে? তুমি হলে মোত্রাবনে খাটাস বাঘ।

পুলিন গম্ভীর হয়ে প্রেশার দেখে বলল, একটু বেড়েছে। মার্জিনাল। ওষুধ খাবে নাকি?

বিষ্ণুপদ ভ্রূ কুঁচকে বলে, কে যেন বলছিল থোড়ের রস খেলে প্রেশার কমে যায়।

তাও যায়। খেয়ে দেখতে পারো। তবে প্রেশারটা বেড়ে থাকলে কষ্ট। যা দিয়ে পারো বেঁধে রাখো। নইলে সামান্য উত্তেজনায় চড়াক করে উঠে পড়বে। তখনই বিপদ।

যন্ত্রখানা দেখছিল বিষ্ণুপদ। লম্বাটে সরু একখানা বাক্স, তার ডালায় বিরাট একখানা থার্মোমিটারের মতো জিনিস, নিচের খোঁদলে রবারের পটি আর পাম্প দেওয়ার জিনিসটা গুছিয়ে রাখার জায়গা। বাক্সটা কট করে বন্ধ করল পুলিন। মানুষ কত যন্ত্রই না বের করেছে! যত ভাবে তত অবাক হয়।

বিষ্ণুপদ বলল, একই শরীর, তবু কত তফাত দেখ। এই শরীরেই তো নৌকোয় বৈঠা মেরেছি, লাঙল ঠেলেছি, বোঝা টেনেছি, দশ-বিশ মাইল সাইকেল চালিয়েছি, দু-তিন ক্রোশ এক চোপাটে হেঁটে মেরে দিয়েছি। আবার সেই শরীরটাই এখন কেমন লাতন হয়ে পড়েছে দেখ।

আহা, কালধর্ম নেই?

সে যে আছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি। আমার কি মনে হয় জানো, মানুষের মরতে তত অনিচ্ছে নেই। কিন্তু বুড়ো হয়ে যেতে ভাল লাগে না। বুড়ো হওয়া মানে যেন ভেজা কাঁথা জড়িয়ে বসে থাকা। তোমরা ডাক্তাররা বাপু এর একটা বিহিত করতে পার না? যে ক'বছর বাঁচব বেশ ডেঁড়েমুশে বগল বাজিয়ে বাঁচব। তারপর ফুরুৎ হওয়ার সময় হলে পট করে নেই হয়ে যাবো।

তোমার আমার ইচ্ছেমতো যদি সব হত তাহলে তো কথাই ছিল না। তবে কথাটা তুমি খুব আজগুবি বললেও মিথ্যে বলোনি। মাঝে মাঝে মনে হয়, বুড়ো বয়সটা যেন এক পাপ।

পাপও বলতে পারো, প্রায়শ্চিত্তও বলতে পারো। জীবনটা হেলাফেলা করে কাটিয়ে বুড়ো বয়সে তার গুনোগার দেওয়া।

তোমার আর গুনোগারটা কি? একটা ছেলে তো মানুষের মতো মানুষ হয়েছে। সেই ঢের। এত লোক তো এত ছেলে পয়দা করছে, ক'টা মানুষ হচ্ছে বলো তো! গরু ছাগলের মতো নম্বরে বাড়ছে। একখানা যে সোনার

টুকরো হয়েছে তাই মহা ভাগ্য বলে জেনো।

বিষ্ণুপদ মৃদু একটু হেসে বলে, সোনার টুকরো তো বটে, কিন্তু সে যে এখন পরের সিন্দুকে।

তা হোক। ছেলে তো আর ট্যাঁকে গুঁজে রাখতে পারবে না। বাঙালি মা-বাপ তাই চায় বটে, কিন্তু তোমার ছেলের ওপর দুনিয়াটারও কিছু হক তো আছে।

তা যা বলেছে। মাঝে মাঝে তোমার মুখ দিয়ে একেবারে নির্ঘাত কথাটা বেরিয়ে আসে।

বামা তাহলে পাততাড়ি গুটোলো?

বিষ্ণুপদ একটা শ্বাস ফেলে বলে, তাই তো দেখছি। বলেও গেল না একবার।

পুলিন একটু হেসে বলে, বলে গেল না মানে? বামার বউ চলে যাওয়ার সময় চেঁচিয়ে তোমাদের যে বাপান্ত করছিল তা তো গাঁ-সুদ্ধু লোক শুনেছে!

বিষ্ণুপদ কাহিল হেসে বলে, হ্যাঁ, সে একরকম বলে যাওয়াই বটে।

তাহলে আর দুঃখ কি? শ্বশুরবাড়িতেই গিয়ে উঠেছে তো?

সেরকমই কথা।

আজকাল শ্বশুরদেরই কপাল। বেলা হল, চলি হে বিষ্ণুপদ। কাঁচা নুনটা খাচ্ছে না তো? না!

না। তেমন আলুনি লাগলে ওই একটু খাই আর কি।

ওই রোগেই তো ঘোড়া মরে। নুন-টুন খেও না বাপু।

নুন না খেলে ক' দিন এক্সটেনশন পাবো বলল তো! তোমরা তো নিদান দিয়েই খালাস। কিন্তু গিলতে তো হবে আমাকেই। না কি?

তবে খাও। মনের আনন্দে খাও। নিজের শ্রাদ্ধের চিঠিটা নিজের হাতেই মুসাবিদা করে বসে বসে। নুন এমন কোন অমৃতটা শুনি! কয়েকটা দিন একটু আলুনি লাগে, তারপর দেখবে বিস্বাদটা চলে গেছে।

পুলিন চলে গেলে বিষ্ণুপদ ফাঁকা বাড়ি বুকে নিয়ে বসে রইল। বামাচরণ সস্ত্রীক বিদেয় নিয়েছে। এ বাড়িতে তারা প্রাণের ভয়ে আর থাকতে নারাজ। তা বলে বাড়ির অধিকার ছেড়ে দিয়ে যায়নি। শ্যামলীর কোন কাকা পুলিশের লোক, তাকে বলে রামজীবনকে টিট করবে বলে শাসিয়ে গেছে। বাড়ির দখলও তারা নেবে, তবে সবাইকে ঝেঁটিয়ে তাড়িয়ে। কথাগুলোর কিছু ফাঁকা আওয়াজ, কিন্তু কিছু আবার তত ফাঁকা নয়। একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠবেই। যাওয়ার সময় বামা রা কাড়েনি। কিন্তু বিষ্ণুপদর ধারণা, বউ সামনে না থাকলে বামা তার বাপ-মাকে কিছু একটা বলে যেত। বামার ঘর ফাঁকা পড়ে আছে তালাবন্ধ হয়ে। রাঙা বউমাও কদিনের জন্য বাপের বাড়ি গেল কাল। বাড়িতে শুধু বুড়োবুড়ি। আর রামজীবন। রামজীবন বেহানে বেরোয়। দুপুরে কখনও খেতে আসে, কখনও আসে না। ফেরে রাতে। তার থাকা না-থাকা সমান।

বাগানে শাক তুলতে গিয়েছিল নয়নতারা। চুপড়ি কোলে নিয়ে ফিরল।

শাক পেলে?

হ্যাঁ। অনেক পেয়েছি। হ্যাঁগো, ব্যাঙের ছাতাও এনেছি কয়েকটা। খাবে?

বিষ্ণুপদ একটু দ্বিধায় পড়ে বলে, দেশের বাড়িতে তো কখনও খাইনি। তবে এদেশে সবাই খায় শুনি। চেখে দেখতে দোষ কি?

তাহলে রাঁধি? আমিও কখনও খাইনি। সেদিন কুসুমের মা বলছিল, মাসিমা, কী ভাল ছাতু হয়েছে আপনাদের বাগানে, খান না কেন? না খেলে আমাদের দেবেন।

বিষ্ণুপদ নড়েচড়ে বসে একটু হেসে বলে, তাহলে বেঁধেই ফেল। খেয়েই দেখি এমন কি জিনিস। সাহেবরাও খুব খায় জানি।

পুলিন ডাক্তার কী বলে গেল?

ডাক্তারদের কথা আর বোলো না। মান্ধাতার আমলের যন্ত্র দিয়ে কী দেখল ও-ই জানে। তবে তেমন কিছু নয়। কাঁচা নুন খেতে বারণ করে গেল আবার।

তাহলে আজ থেকে আর নুনটা পাতে নিও না।

না নিলাম। কিন্তু আমার তো চিকিৎসা হচ্ছে। তোমার ব্যবস্থা কী হবে? কোনওদিন ডাক্তার দেখাও না, এ ভাল নয়।

রক্ষে করো। পুরুষ ডাক্তার বুক দেখবে, পেট দেখবে, ও আমার পোষাবে না বাপু। আমি বেশ আছি। শয্যা নিলে তখন দেখা যাবে।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, এ বয়সে আর লজ্জার কী?

আমার আছে বাপু।

বিষ্ণুপদ খুব হাসল। সবকিছু পাল্টায়, কিন্তু নয়নতারারা আর পাল্টায় না। হাসি থামিয়ে বলল, শরীর এক জটিল যন্ত্র, বুঝলে? হাসসা, কাঁদো, কাজ করো, ঘুমোও, যা কিছু করো না কেন, সবই করছ শরীরের ভিতরকার নানা সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির জন্য। এ এক আশ্চর্য জিনিস। বাইরে থেকে বোঝাই যায় না যে ভিতরে এত সব কাণ্ডকারখানা।

তা হোক গে। আমার অত জেনে দরকার নেই।

আমিও যে জানি তা নয়। তবে তোমার চেয়ে একটু বেশি জানি, এই যা। জম্পেশ একখানা যন্ত্র বটে।

নয়নতারা রান্নাঘরে গেল। কথাটা আর এগোলো না।

আর একটু বেলা গড়ালে একখানা ঘটনা ঘটল। এমনটা অনেক আগে ঘটত বটে, ইদানীং ঘটছিল না। পিওন এসে পাঁচশো টাকার একখানা মানি অর্ডার দিয়ে গেল। ফর্মের টোকেনে কৃষ্ণজীবনের একটু লেখা, বাবা, অনেকদিন কিছু পাঠাইনি। গিয়ে থোক কিছু টাকা আপনার হাতে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল। সময়াভাবে হয়ে উঠছে না। রামজীবনকে বলুন, আপনার আর মায়ের ঘরটা পাকা করতে। খরচ আমি দেবো। মা ও আপনি, প্রণাম নেবেন। সেবকাধম কৃষ্ণ।

টাকাটা হাতেই থর থর করে কাঁপছিল। পাঁচশো টাকা এখনও তার কাছে অনেক টাকা।

টাকাটা নিয়ে উঠে রান্নাঘরের দরজায় এল বিষ্ণুপদ, কী গো, কানে কম শুনছে নাকি আজকাল?

নয়নতারা মুখ তুলে হাসল, কেন, ডাকছিলে নাকি? উনুনটা ধরাতে আজ দেরি হল, এক হাতে সব কাজ। কোটা, বাটা, রাঁধা।

না, ডাকিনি। তবে পিওন এসেছিল, শুনতে পাওনি!

পিওন! ও মা, তোমার হাতে একগোছা নোট যে! কে দিল?

কৃষ্ণ পাঠিয়েছে। এই পিওন এসে মানি অর্ডার দিয়ে গেল। পাঁচশো টাকা।

ওম্মা গো। পাঁচশো!

ভাল-মন্দ খাওয়া যাবে ক’দিন। আরও কথা আছে। আমাদের ঘরখানা পাকা করে দিতে চাইছে।

এতদিনে বুঝি মা-বাবার দুঃখ বুঝতে পারছে সে!

ইংরিজিতে একটা কথা আছে, বেটার লেট দ্যান নেভার। তা দেরি করেছে বটে, কিন্তু সে এককথার মানুষ।

নয়নতারার চোখে জল এসেছিল। আঁচলে চোখ দুটো মুছে নিয়ে বলল, বলেছে সেই ঢের। বললেও তো বুকটা ঠাণ্ডা হয় গো। ছেলেমেয়েরা তো বোঝে না ওরা আদর করে এক ঢেলা মাটি এনে দিলেও মা-বাপের বুক ভরে ওঠে!

কেঁদো না। কান্নার মতো কিছু হয়েছে নাকি?

কৃষ্ণ আমার তো খারাপ ছেলে নয়। তার বুকে মায়া-দয়া কিছু কম নয়। কিন্তু ওই গেছে মাগীটাই যে খেল ওকে।

ওভাবে বলতে নেই। তাদের জীবনের ধারা আলাদা, আমাদের সঙ্গে কি বনে? এসব কথা এখন তুললে আনন্দটা মাটি হবে।

আচ্ছা, আর বলব না।

টাকাটা তোমার কাছে রাখো।

নয়নতারা হাসল, কেন, তোমার কাছেই থাক না!

ও বাবা! আমি লক্ষ্মীছাড়া মানুষ, আমি টাকা রাখব কি? কোনোদিন রেখেছি নাকি? যতদিন মা বেঁচে ছিল, টাকা এনে মায়ের হাতে দিয়েছি। মা চলে যাওয়ার পর থেকে তোমার হাতে। টাকা আমার সয় না।

নয়নতারা হেসে বলল, আচ্ছা গো আচ্ছা। কিছুক্ষণ রাখো, রান্নাটা সেরে গিয়ে নিচ্ছি।

এ ঘর যদি কৃষ্ণ পাকা করে দেয় তাহলে আর রেমোর পাকা ঘরে আমাদের না যাওয়াই ভাল। বউমা, বাচ্চারা সব থাকবে’খন ওখানে।

সেই বুদ্ধিই ভাল। কিন্তু হুট করে আবার রেমোকে এসব কথা বোলো না। হয়ত মান হবে।

বিষ্ণুপদ মাথাটা একটু নেড়ে বলল, এই তো বুদ্ধি! কিন্তু কেন যে সবসময় বলে বেড়াও যে তোমার নাকি বুদ্ধি নেই।

আহা, এ আবার কী এমন বুদ্ধির কথা হল শুনি!

আমার মাথায় তো আসেনি।

এসব ছোটো কথা তোমার মাথায় না আসাই ভাল। তুমি, আমার ভোলানাথ শিবঠাকুরটি হয়েই থেকো।

শোনো, আমার মাথাতেও ছোটো কথা আসে। কৃষ্ণ তো রেমোকে দিয়ে ঘর করাতে চাইছে। কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে? সে নেশাখোর মানুষ, টাকা হাতে পেলে কি করে না-করে তার ঠিক নেই।

নয়নতারার মুখ শুকোলো, ও বাবা! এ কথাটা ভাবিনি তো। ঠিকই বলেছে। কৃষ্ণকে লিখে দাও যেন টাকা আমাদের কাছেই দেয়। তাহলে রাশ থাকবে।

হ্যাঁ। তাকে বাড়ির ঠিকানায় চিঠি দেওয়া বারণ। ইউনিভার্সিটির ঠিকানায় দিতে হবে। নইলে বৌমা আবার —

নয়নতারা একটু হাসল। বলল, ওসব পরে হবে। এখন স্নান করতে যাও। শাক আর ঝোল। হবে না?

খুব হবে।

কাল বাজারে গিয়ে মাছ এনো। অনেকদিন খাও না। ইদানীং রেমোটার হাতে বোধহয় পয়সা নেই। বাজার-টাজার দেখে মনে হয় টানাটানিতে আছে।

বিষ্ণুপদ স্নানে গেল। শীত শেষ হয়ে আসছে। গায়ে জল ঢালতে আর কষ্ট নেই।

খেতে বসে বড় চমৎকৃত হল বিষ্ণুপদ। ব্যাঙের ছাতার ঝোল দিয়ে ভাত মেখে দু'গ্রাস খেয়ে বলল, এ তো অমৃত! একেবারে মাংসের মতো খেতে লাগে!

নয়নতারা চোখ বড় বড় করে বলে, তাই!

একটু খেয়ে দেখ না।

আচ্ছা। তুমি খাও তোত। সত্যিই ভাল?

অপূর্ব জিনিস। এতদিন খাইনি বলে আফসোস হচ্ছে।

অজান জিনিস তো, রাঁধতে ভয় হত। কেমন লাগবে তোমার কে জানে।

খুবই ভাল জিনিস। সাহেবরা খায়। দামও নাকি খুব।

এবার থেকে তাহলে প্রায়ই রাঁধব।

খুব বেঁধে। অতি চমৎকার।

বিষ্ণুপদর উদ্ভাসিত মুখ দেখে নয়নতারা মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। এই তার স্বর্গসুখ। আর বেশি সে কিছু চায় না।

দুপুরে দুজনে পাঁচশো টাকা নিয়ে বসল খরচের আগাম হিসেব কষতে। অনেক দিন এক সঙ্গে এত টাকা হাতে পায়নি তারা। কী করবে তা পরামর্শ করতে বসে একটু ছেলেমানুষ হয়ে গেল দুজনেই।

বিষ্ণুপদ বলল, কিছু তেল কিনে রাখো। তেল প্রায়ই ফুরিয়ে যায়।

না না। তেল খেয়ে শরীর খারাপ করবে নাকি? তোমার লুঙ্গি দুটো তো ছিঁড়েছে। একজোড়া ভাল দেখে কিনতে হবে। একখানা গেঞ্জিও।

আরে পাঁচশো টাকা তো মেলা টাকা। লুঙ্গি ছাড়াও অন্য জিনিস কেনা যাবে। আমার পুরোনো লুঙ্গিতেই চলে যাচ্ছে।

শোনো, আমাদের বালিশ তোশকের অবস্থা দেখেছো? তুলো জমে জমে আর তেলচিটে হয়ে একেবারে ছোটোলোকি চেহারা। বালিশ দুটো তো ইটের মতো শক্ত। এসব করালে একটু আরাম করে শোয়া যায়।

বিছানা! পুরোনো বিছানায় শোয়া অভ্যাস। বেশি নরম হলে আবার হয়তো ঘুম হবে না।

তাহলে টাকাটা দিয়ে করবোটা কী?

দুজনেই খানিক ভাবল। তারপর বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বরং মাঝে মাঝে একটু ভাল-মন্দ খাওয়া-দাওয়া হোক। বাকি টাকাটা রেখে দাও।

নয়নতারা একটু ম্লান হেসে বলে, তাই হবে। কিন্তু টাকা পুষে রেখে আমাদের কী লাভ বলো তো! কে কবে আছি, কবে নেই, টাকাগুলো বেহাত হয়ে যাবে।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, তা খুব ঠিক কথা। কিন্তু এই বয়সে টাকা-পয়সার দরকারটাও অনেক কমে যায় কিনা। দেখ না, টাকাটা পেয়ে দুজনেই কেমন দিশাহারা হয়ে বসে আছি। তাই ভাবছি, আমাদের টাকা-পয়সার

দরকারটাও ফুরিয়েছে।

নয়নতারা মাথা নেড়ে বলে, তা ঠিক। কিন্তু তবু হাতে টাকা থাকলে মনে একটু বল ভরসা হয়। এখন রেমো যদি বাজার-হাট না করতে পারে তাহলেও আমরা চালিয়ে নিতে পারব।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ।

ঘরটা যদি সত্যিই পাকা করে দেয় কৃষ্ণ তাহলে কত ভাল হবে বলো তো!

খুব ভাল। বর্ষায় জল পড়ে ঘর ভেসে যায়। শীতে ফুটো ফাটা দিয়ে হাওয়া ঢোকে। দরজা জানালার অবস্থাও তো ঝুরঝুরে।

দুজনের চোখেই একটা আশার আলো। একটা আনন্দের অনুভূতি আজ দুপুরটাকে বড্ড ফুরফুরে করে দিয়েছে।

নয়নতারা বলল, হ্যাঁ গো, বামা আর শ্যামলী যে এত ঝগড়া করে গেল, ওদের ফিরিয়ে আনা যায় না?

আনতে চাও?

কি জানো, কেমন একটা কষ্ট হচ্ছে। বামাটা তো ষণ্ডা গুণ্ডা নয়। সে এমনিতে নিরীহ। সেদিন রেগে গিয়ে দা নিয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু সে অত খারাপ নয়। মারধর খেল। বউমা গালমন্দ করলেও বামা কিন্তু শেষতক কিছু বলেনি। চুপটি করে ছিল।

তোমার হল মায়ের মন।

একটা ভয় খাই, জানো? শ্যামলী বাপের বাড়ি গিয়ে তো ঘোঁট পাকাবে। তারপর রেমোর পিছনে পুলিশ লাগাবে। গুণ্ডাদেরও লেলিয়ে দিতে পারে। শেষ অবধি খুনোখুনি না হয়। তার চেয়ে আপসে মিটে গেলে হয় না?

বিষ্ণুপদ একটু চুপ করে থেকে বলল, দুনিয়াসুদ্ধ যত ঝগড়া-কাজিয়া তার ক'টা আপসে মিটছে বলো তো! এ ঝগড়া মিটলেও বাইরে বাইরে মিটবে, ভিতরে ভিতরে শত্রুতা থেকে যাবে। তবে লোভ দেখালে বামা ফিরতেও পারে। সে আমাদের ঘরখানা চেয়েছিল। এখন ঘরখানা পাকা হবে শুনলে সে লোভে পড়তে পারে।

নয়নতারা চুপ করে রইল। মুখখানা মলিন। কিছুক্ষণ পর বলল, শ্যামলী যে-সব কথা বলে গেল তা কি কেউ উচ্চারণ করতে পারে, বলো! আমাকে বেশ্যাও বলেছে, তোমাকে...উঃ, সে কথা ভাবলে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে।

কথাই তো! কথার আর কী দাম বলল। এ যুগে সব দূষিত কথা লোকের মুখে মুখে এত ফিরছে যে কথাগুলোর ধার কমে গেছে। কেউ গায়ে মাখে না।

আমি তো কখনও এ সংসারে এইসব কথা কারও মুখে শুনিনি। এক রেমো মাতাল হয়ে এসে যখন চেঁচামেচি করে। তা সে মাতালের কথা। সে তো ধরতে নেই।

ভোলো, নয়নতারা, সব ভোলো। এই বয়সে আর কিছু শোধবোধ করতে পারবে না। লাথি খেলেও হজম করে যেতে হবে। ভুলে যাওয়াই ভাল। দশটা টাকা দেবে?

কী করবে?

নিতাইয়ের দোকানে বিকেলে রসগোল্লা হয়। গরম রসগোল্লা নিয়ে আসি গে। তারপর বুড়োবুড়ি বসে বসে খাই।

নয়নতারা একশ টাকার একখানা নোট এগিয়ে দিয়ে বলে, ভাঙিয়ে নিয়ে এসো। টাকা ফেরত নিতে ভুল কোরো না।

বিষ্ণুপদ হাসে, ছেলেমানুষ পেলে নাকি?

ছেলেমানুষ ছাড়া কি? ভোলানাথ শিবঠাকুর।

৭৯

দাদার সঙ্গে সম্পর্কটা কি খারাপ হয়ে গেল? অয়ন তার চরিত্র নিয়ে তাকে আর অনিন্দিতাকে জড়িয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত করেছে, চড় মেরেছে—এ সবই যেন এই চিলেকোঠায় বাস করার বিনিময়ে সে ভুলে যেতে পারে। চয়নের মনে হয় এ বাসা থেকে উৎখাত হলে তার আর আশ্রয় বলে কিছু থাকবে না।

অনিন্দিতাদের সঙ্গে বউদির আজকাল একটু-আধটু ঝগড়া হচ্ছে প্রায়ই। জল নিয়ে, ময়লা ফেলা নিয়ে, ছাদে যাওয়া নিয়ে। ঝগড়ার জন্য খুব গুরুতর কারণের দরকারও হয় না। ঝগড়াটাই যখন আসল তখন কারণ একটা বের করে নিলেই হয়।

অনিন্দিতা আজকাল ছাদে আসে না। চয়নের সঙ্গে দেখাও হচ্ছে না গত কয়েকদিন। একদিক থেকে ভালই। সম্পর্কটা এইভাবে শেষ হয়ে যাক। সম্পর্ক ছিলও না তেমন, একটা ক্ষীণ বন্ধুত্ব গড়ে উঠছিল মাত্র। তার মধ্যে একটু বৈদ্যুতিক ঘটনা ঘটেছিল তাকে দিয়ে অনিন্দিতার 'তুমি' বলানো, কিন্তু সেটাও গুরুতর কিছু নয়। অনিন্দিতা তো পাগল নয় যে, তার সঙ্গে প্রেম করতে চাইবে।

তবু অবস্থাটা একটু অনিশ্চিত, অয়ন তাকে বাসা ছাড়তে বলেছে। কিন্তু রাগের মাথায় বলা, সেটাকে গুরুত্ব দেওয়ার মানে হয় না। ছাদের এই চিলেকোঠা নিশ্চয়ই ভাড়া দেবে না ওরা। হয়তো রাগ পড়ে গেলে কথাটা মনেও থাকবে না অয়নের। তবু এতসব ভেবেও নিশ্চিত হতে পারে না চয়ন। দুশ্চিন্তার একটা কাঁটা সর্বদা খচখচ করে।

একদিন বিকেলে টিউশনিতে বেরোচ্ছিল চয়ন, সদর দরজার বাইরে গলির মধ্যে অনিন্দিতার বাবার সঙ্গে দেখা।

ভারাক্রান্ত মুখ, হাসি নেই। ওর মধ্যেই জোর করে একটু হেসে বললেন, বেরোচ্ছ নাকি?

চয়ন বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

বড় অশান্তি চলছে, বুঝলে?

অশান্তি যে চলছে তা চয়ন জানে। কিন্তু তার তো কিছু বলার নেই।

ভদ্রলোক চয়নের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল চয়ন। সময় হবে?

চয়ন মৃদুস্বরে বলল, হবে। বলুন না!

কোথায় বেরোচ্ছিলে যেন, দেরি হয়ে যাবে না তো!

তাড়া নেই। টিউশনিতে যাচ্ছিলাম।

অনিন্দিতার বাবা গলির মুখ অবধি কথাটা ভাঙলেন না। বড় রাস্তায় অসংখ্য লোক চলাচল ও ট্রামবাসের শব্দের মধ্যে এসে নিশ্চিন্ত মনে বললেন, এখানে বলা যায়।

বাস্তবিকই তাই, কলকাতার রাজপথই গোপন কথা বলার সবচেয়ে ভাল জায়গা। চয়ন দাঁড়িয়ে বলল, বলুন।

কথাটা জিজ্ঞেস করতে একটু সঙ্কোচ হচ্ছে। অনিন্দিতার কাছ থেকে কথা বের করার উপায় নেই। বড্ড ভয় পাই ওকে।

কি কথা?

তোমার দাদা-বউদি আকারে ইঙ্গিতে বলতে চাইছে যে, তোমার সঙ্গে অনিন্দিতার একটা সম্পর্ক হয়েছে। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

চয়ন মৃদু হেসে বলল, না মেসোমশাই। ওসব কথা মিথ্যে করে রটানো হচ্ছে। সত্যি নয়।

ভদ্রলোক তার মুখের দিকে স্তিমিত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, আজকাল ছেলেরা আর মেয়েরা তো আখছার মেলামেশা করে। এটাকে একটা ইসু করে তোলাটা কি ঠিক? তোমার দাদা এই কারণ দেখিয়ে আমাদের তুলে দিতে চাইছে।

চয়নের মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভদ্রলোকের অবস্থা সে জানে। বাসা বদলানো এঁর পক্ষে শক্ত ব্যাপার। সে মৃদু স্বরে বলল, আপনারা বুঝিয়ে বলুন যে ওঁদের সন্দেহটা সত্যি নয়।

মাথা নেড়ে অনিন্দিতার বাবা বললেন, মানুষ যখন গোঁ ধরে তখন কিছুই বুঝতে চায় না। তোমাকে নাকি একদিন চড়ও মেরেছে শুনলাম। অত্যন্ত অন্যায়। ছিঃ।

চয়ন বলে, আমার জন্য ভাববেন না। আমি তো ভুলেই গেছি।

ভদ্রলোক ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললেন, অনিন্দিতারও উচিত হয়নি তোমাকে বিপন্ন করা। তোমার অসুখের সময় যখন মা-মেয়ে সেবা করতে এল তখনও আমি বারণ করেছিলাম। বলেছিলাম, চয়নের দাদা-বউদি থাকতে তোমরা আগ বাড়িয়ে ওদের ডিঙিয়ে এসব করছ কেন? কিন্তু ফ্যামিলিতে আমার তো ভয়েস নেই। আমার মতামত বুদ্ধি পরামর্শকে ওরা গ্রাহ্যই করে না।

যা হওয়ার হয়ে গেছে, ও নিয়ে ভেবে আর কী করবেন?

ভাবনা কি ছাড়ে? দুখানা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরের জন্য মাসে আটশো টাকা ভাড়া দিচ্ছি। তাও সস্তাই। এর কমে ভদ্রস্থ বাসা তো পাওয়া যাবে না। আমার হার্ড আর্নড মানি। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সামান্য টাকা আর নামমাত্র পেনশন ভরসা। তা ভেঙেই চলছে। দিন দিন ব্যাঙ্কের টাকা কমছে। বড় ভয় হয়।

আপনি অত ভাববেন না, বরং বাড়িটা করে ফেলুন।

বাড়ি। বাড়ি করতে সব টাকা বেরিয়ে যাবে। খাবো কি? আমি তো তোমার মাসিমাকে বলেছিলাম, টিনের ঘর তুলে থাকি চলল। তা তাতে মা-মেয়ের ঘোর আপত্তি। পাকা বাড়ি ছাড়া নাকি তাদের হবে না। মেয়েটার বিয়েরও তো খরচ আছে?

চয়ন ভেবে পেল না, এই ভদ্রলোককে সে এবার কী পরামর্শ দেবে। সে মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

উনি বললেন, তোমার মাসিমা বা আমার শরীরও ভাল নয়। টুকটাক ডাক্তার বদ্যি ওষুধবিসুধের জন্যও টাকা বেরিয়ে যায়। আয় কমেছে, কিন্তু ব্যয় তো আর কমছে না।

চয়ন চুপ করে রইল, স্বগতোক্তির তো জবাব দেওয়ার দরকার হয় না।

ভদ্রলোক চশমাজোড়া চয়নের দিকে তাক করে মিয়োনো গলায় বললেন, সব সমস্যার সমাধান হয় না জানি। তবু যখন যেটা দেখা দেয় সেটাই যেন আজকাল বড় কাহিল করে ফেলে আমাকে। এই যে বাড়ি ছাড়ার জন্য হুড়ো দিচ্ছে, আমার রাতে ভাল ঘুম হচ্ছে না, প্রেসার বেড়ে গেছে, খাওয়ায় রুচি নেই। অথচ কত ভাড়াটে তো বাড়িওলার সঙ্গে যুঝে আছে। আমি কাঁটা হয়ে আছি।

চয়ন এ কথার জবাব খুঁজে পেল না।

শুনলাম, তোমাকেও নাকি তাড়াবে। সত্যি নাকি?

চয়ন অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে বলল, বলেছিল একবার।

তাহলে এখন তুমি কি করবে?

কী করব তা তো জানি না, ঠিক করিনি।

তোমার মাসিমা আর অনিন্দিতা তো বলছে, তারা ছেড়ে দেবে না। দরকার হলে মামলা-মোকদ্দমা অবধি করবে। আমি এসব শুনে বড় ভয় পাচ্ছি। স্ত্রী-বুদ্ধি বড় ভয়াবহ।

এবার চয়ন খুব সাবধানে বলল, অনিন্দিতা কিন্তু বেশ সাহসী মেয়ে। আপনি ওর ওপর নির্ভর করতে পারেন।

নির্ভর করব? বলল কি? এ যুগে সাহসের কোনও দাম আছে?

চয়ন একটা শ্বাস ফেলে বলে, আমি বড় ভীতু মেসোমশাই, আপনার চেয়েও ভীতু। কিন্তু কারও সাহস দেখলে আমার বড় ভাল লাগে।

ভদ্রলোক কথাটা শুনে সন্তুষ্ট হলেন না। মাথা নেড়ে বললেন, মেয়েদের সাহস ভাল জিনিস নয়। অনিন্দিতার সাহসের কথা বলছ! ওকে সাহস বলে না, অনিন্দিতা বেপরোয়া। ওতেই তো অশান্তি হয়। কাউকে মান্যগণ্য না করা কি ভাল?

চয়ন ফের সতর্কভাবে বলল, মেলোমশাই, আপনাদের যা অবস্থা আমারও তো তাই, ভেবে কী হবে? আপনারাও শুনেছি বউদির আত্মীয়।

ভদ্রলোক মুখটা একটু বিকৃত করে বললেন, আত্মীয়তা যেটুকু সেটুকু না ধরলেও হয়। আজকাল কেউ আত্মীয়তা মানে নাকি? তোমাকে আর একটা কথা বলার ছিল, বলতে একটু লজ্জা পাচ্ছি।

বলুন না, আমাকে লজ্জা কিসের?

ভদ্রলোক একটু কাছে এগিয়ে এসে চাপা গলায় বললেন, আমার একটা কথা মনে হয়, বলব?

চয়নের বুকটা এবার একটু কেঁপে উঠল, মৃদু একটা শ্বাসকষ্টও টের পেতে লাগল সে। বোধ হয় এ কথাটা বলার জন্যই এত ভূমিকা, হঠাৎ চয়নের মাথার ভিতর একঝলক আলোর উদ্ভাস যেন তাকে জানিয়ে দিল, কথাটা কী। তবু সে অপেক্ষা করল, বিনয় এবং ধৈর্যের সঙ্গে।

ভদ্রলোক মুখটা তার কানের খুব কাছাকাছি এনে বললেন, আমার মনে হয় তোমাকে অনিন্দিতার খুব পছন্দ।

চয়নের কান গরম হল, শ্বাসকষ্ট বাড়ল। তবু সে নিপাট ভালমানুষের মতো বলল, হ্যাঁ। অনিন্দিতা আমাকে বন্ধু বলে মনে করে।

ভদ্রলোক এ জবাবে খুশি হলেন না। ঘন ঘন মাথা নাড়া দিয়ে বললেন, সে ব্যাপার নয়। ওর ছেলে বন্ধু তো আরও ছিল। তোমার প্রতি ওর মনোভাব আর একটু ডিপ। বুঝছ না?

না তো! চয়ন খুবই বিস্ময় প্রকাশ করে।

ওর বোধ হয় ইচ্ছে তোমার সঙ্গেই ঘর বাঁধে।

চয়ন জোর করে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে, কিছুটা সফলও হয়, মৃদু হেসে বলে, অনিন্দিতা বুদ্ধিমতী, এরকম চিন্তা সে স্বপ্নেও করবে না।

কেন বলল তো! দোষটা কোথায়?

ঘর বাঁধা তো বিলাসিতা নয় মেলোমশাই। তার পেছনেও অনেক ব্যাপার থাকে। আপনি তো নিজেই জানেন কত সমস্যায় আমরা দিন কাটাই। আমার চালচুলো নেই, টিউশনি সম্বল, আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন নিতান্ত আহাম্মকেও দেখবে না। আপনি ভুল বুঝেছেন মেসোমশাই।

ভদ্রলোক কথাটা স্বীকার করতে চাইলেন না, বললেন, এটা কোনও কথা নয়। তোমার মধ্যে গুণও কিছু কম নেই, একদিন দাঁড়িয়ে যাবে। আর ফিটের ব্যামো? ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা বলে, ওতে বিয়ে সাদী চলতে পারে।

আপনারা অনেক দূর ভেবে ফেলেছেন, কিন্তু ওসব ভাবতেই আমার সংকোচ হয়, লজ্জাও হয়।

অনিন্দিতার বাবা মুখখানা কানের কাছ বরাবর রেখেই বললেন, আমি তো এর মধ্যে লজ্জার কিছু দেখছি না। অনিন্দিতার ভাবগতিক দেখে মনে হয়, ওর আগ্রহ আছে। তোমার শুধু একটু আত্মবিশ্বাসের দরকার।

চয়ন একটা হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আপনি বাড়ি যান মেসোমশাই, এ নিয়ে আর ভাববেন না। আমি বড় অপদার্থ!

দাঁড়াও। কথাটা এখনও শেষ হয়নি। আমার পরিবার তো দেখেছ। তিন জনের সংসার। আমার ছেলেও নেই। আমার খুব মনে হয়, সংসারটা যেন অসম্পূর্ণ, আর একজন কাউকে যেন দরকার ছিল ফাঁকাটা ভরাট করতে। এদিকে তোমারও তো আসলে কেউ নেই। তোমারও একটা স্থায়ী এবং নিরাপদ আশ্রয় দরকার। যদি অনিন্দিতাকে বিয়ে করো তাহলে আমরা চার জন মিলেমিশে বেশ থাকতে পারব। আমাদের বড় জনের অভাব। যদি এর মধ্যে ঘরজামাই প্রথার কথা মনে হয় তাহলে সেটা ভুল হবে। অস্তিত্বের সংকটেই আমাদের একসঙ্গে থাকাটা দরকার। তোমাকেও দেখাশোনা করার লোক হবে। যদি রাজি থাকো তাহলে আমি হাতের পাতের যা আছে সব দিয়ে জমিতে একখানা বাড়ি তুলি। তারপর চার জন নিশ্চিন্তে গিয়ে সেখানে থাকি।

চয়ন ম্লান একটু হেসে বলল, আপনি কি অনিন্দিতার সঙ্গে কথা বলেছেন?

সরাসরি নয়। তবে হাবেভাবে বুঝেছি।

আপনি আরও একটু ভাবুন। অনিন্দিতার সঙ্গে কথাও বলুন।

সে না হয় বলব, কিন্তু তোমার মনোভাবটা আগে জানা দরকার।

আমাকেও একটু সময় দিন।

আমার মনে হয় কি জানো? তোমাদের বিয়ে হলে সব সমস্যার সুষ্ঠু একটা সমাধান হয়ে যায়।

সমস্যার সমাধান! কি জানি, হয়তো নতুন সমস্যাই হবে একটা।

না না, কোথাও সমস্যা হবে না। তুমি একটু পজিটিভলি ভাবো। নেগেটিভ ভাবলে কিছুই হতে চায় না।

ভাবব, এখন তবে আমি যাই?

এসো গিয়ে।

একা হতে পেরে চয়ন হাঁফ ছাড়ল। তারপর গভীরভাবে চিন্তিত হয়ে পড়ল।

তার চিন্তান্বিত মুখ দেখে আজ মোহিনীও জিজ্ঞেস করল, চয়নদা, আপনার শরীর আবার খারাপ করেনি তো!

না, ঠিক আছে।

তবে মুখ অত শুকনো কেন?

চয়ন একটু হেসে বলল, দুনিয়াটা একটা পাগলা, না?

বাঃ রে, তার মানে কী হল?

মানে! না, এর কোনও মানে নেই।

আপনি ঠিক আমার বাবার মতো হয়ে যাচ্ছেন। বাবাও মাঝে মাঝে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা বলে।

চয়ন একটু লজ্জা পেয়ে বলে, তাই নাকি?

মোহিনী হেসে ফেলে বলল, কাল রাতেই তো, খাওয়ার টেবিলে সবাই চুপচাপ বসে খাচ্ছি, বাবা হঠাৎ বলে উঠল, আজকে আমার মনের মাঝে ধাঁই ধপাধপ তবলা বাজে। আমরা তো অবাক!

চয়ন লজ্জিত মুখে চুপ করে রইল। কিন্তু পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে তার বুক কেঁপে কেঁপে ওঠে মাঝে মাঝে। একটু যেন শ্বাসকষ্ট হয়। বারবার আনমনা হয়ে যায় সে। তাকে নিয়ে এসব কী হচ্ছে?

পড়ানোর এক ফাঁকে চয়ন হঠাৎ বলল, ভীতু আর দুর্বলদের একটা অসুবিধে কি জানো? তারা ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তাদের দিয়ে যে যা-খুশি করিয়ে নেয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ওরে ভীরু, তোর ওপরে নেই ভুবনের ভার।

মোহিনী হেসে ফেলল, চয়নদা, আজ নিশ্চয়ই একটা সিরিয়াস ঘটনা ঘটেছে, তাই না? আজ আপনি ভীষণ আনমাইণ্ডফুল, কী হয়েছে?

চয়ন মাথা নেড়ে বলল, বলা যায় না।

তাহলে বলবেন না, কিন্তু রাস্তায়-ঘাটে আজ একটু সাবধান থাকবেন। অত আনমাইণ্ডফুল হলে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে।

না, তা হবে না। তবে আজ আমি একটু চঞ্চল ঠিকই।

চয়ন উঠতে যাচ্ছিল, মোহিনী বলে উঠল, দাঁড়ান চয়নদা, আপনাকে যে চা দেওয়া হয়নি।

তাতে কি? আজ থাক।

না না, বসুন, আজ মা বাড়ি নেই, বাবার সঙ্গে একটা রিসেপশনে গেছে। আমাকে বলে গেছে যেন আপনাকে চা-টা দিই। দেওয়া হয়নি শুনলে মা ভীষণ বকবে। বসুন।

মোহিনী উঠে গেলে চয়ন চুপ করে বসে রইল। মনের ভিতরে একটা উথালপাথাল হচ্ছে। ভয় হচ্ছে, তার ভয়, সে প্রতিরোধহীন, বিয়ে করার প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু অনিন্দিতার বাবা যদি জোরজবরদস্তি শুরু করে, যদি নানারকম কৌশলের আশ্রয় নেয়, তাহলে? যদি প্রতিরোধ ভেঙে যায় তার?

ডোরবেল বাজল। দরজা খুলল। করিডোরে পায়ের শব্দ আর একঝলক বিদেশি পারফিউমের সুবাস ভেসে এল। পড়ার ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল। রিয়া উঁকি দিয়ে বলল, চয়ন একা বসে কেন?

তটস্থ হয়ে চয়ন বলে, মোহিনী বসিয়ে রেখে গেল।

রিয়ার পিছনে কৃষ্ণজীবন, হাতে মস্ত ফুলের তোড়া আর একটা বড়সড় ঝলমলে সোনালি রঙের বাক্স। বলল, চয়ন নাকি? কী খবর তোমার? অনেকদিন দেখা নেই।

চয়ন শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল, আজ্ঞে ভালই।

কৃষ্ণজীবন আর রিয়া ঘরে ঢুকল, কৃষ্ণজীবন চারদিকটা চেয়ে দেখে অকারণেই বলে উঠল, বাঃ।

কেন বাঃ, কিসের বাঃ, তা বুঝতে পারল না চয়ন। কৃষ্ণজীবন হঠাৎ ফুলের তোড়া আর বাক্সটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, নাও, এগুলো তোমার।

চয়ন প্রচণ্ড অবাক হয়ে বলে, আমার!

নাও নাও।

আজ্ঞে আমি! বলে সঙ্কুচিত হাতে ফুলের তোড়া আর প্যাকেটটা নিল চয়ন। রীতিমতো ভারী দুটোই।

কৃষ্ণজীবন উদার হাসি হেসে বলল, উপহারে উপহারে আমি জর্জরিত। আর উপহার রাখার জায়গা নেই। ওটা তুমি নিয়ে যাও। কোনও সুইটহার্ট থাকলে ফুলের তোড়াটা তাকে দিও। আর বাক্সের মধ্যে কী আছে তা আমিও জানি না। বাড়িতে গিয়ে খুলে দেখো, উইস ইউ এ গুড লাক।

রিয়া বলল, নাও চয়ন। লজ্জার কিছু নেই। চা-টা কিছু খাওনি এখনও?

মোহিনী চা করতেই গেল।

তাহলে বোসো একটু। ওগো তুমি একটু চয়নের সঙ্গে কথা বলল, আমি একটু দেখে আসি মেয়েটা কী করছে।

কৃষ্ণজীবন বসল। এই সুপুরুষ, মহাপণ্ডিত এবং বিখ্যাত মানুষটির সামনে চয়ন বরাবরই অস্বস্তি বোধ করে। সে শুনেছে, এঁর একখানা বই ডারলিং আর্থ খুব হইচই ফেলে দিয়েছে বিদেশে। তাতে সে আরও সংকুচিত বোধ করে। নিজের সামান্যতা নিয়ে সে সর্বদাই বিব্রত।

কৃষ্ণজীবন বলল, তোমার একটা পারিবারিক অশান্তি ছিল না? ডিটেলস্ ভুলে গেছি, বোধ হয় তোমার দাদার সঙ্গে গণ্ডগোল। সেটা কি এখনও আছে?

চয়ন লজ্জায় মরে গিয়ে বলল, মা মারা যাওয়ার পর থেকে সম্পর্কটা ততটা খারাপ নেই।

ভাল। খুব ভাল। তাহলে মা ছিল দি স্টাম্বলিং ব্লক? বলে খুব হাঃ হাঃ করে হাসল। হাসি থামিয়ে বলল, চারদিকে খুব ভাগাভাগির হুজুগ পড়েছে, দেখেছ? সবাই ভাগ হতে চায়। স্বামী স্ত্রী চায়, মা-বাপের সঙ্গে সন্তান ভাগ হতে চায়, ভাইয়ে বোনে ভাগ হতে চায়। এমন কি দেশের নানা মানবগোষ্ঠীও চায় ভাগাভাগি করে আলাদা রাষ্ট্র তৈরি করতে। হাওয়ায় এ এক নতুন জীবাণু ঢুকেছে। সম্প্রীতি সংহতির কথা বলে আর কী লাভ

বলল তো! ওসব কথায় কেউ কানই দিচ্ছে না। মেয়েরাও বোধ হয় ভাগ হতে চাইছে। নারী স্বাধীনতা নিয়ে কী বিরাট হইচই!

চয়ন মাথা নেড়ে বলে, যে আজ্ঞে।

কৃষ্ণজীবন খানিকক্ষণ আনমনে একটা ক্যাবিনেটের দিকে চেয়ে থেকে বিড়বিড় করে বলল, মানুষ ধীরে ধীরে বড় চিন্তা করতে ভুলে যাবে। চিন্তারাজ্যও খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে তার। সে ছোট করে ভাবতে শুরু করবে। ছোট ছোট কথা ভাববে। মানুষ কি খুব স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে চয়ন?

চয়ন একটু বিব্রত হয়ে বলে, যে আজ্ঞে।

কৃষ্ণজীবন হতাশায় একটু মাথা নাড়া দিয়ে বলে, আমার সংসারেও অনেক অশান্তি, আমার মা-বাবা এখনও বেঁচে আছেন। কিন্তু সে এক অদ্ভুত বেঁচে থাকা। দু' ভাইয়ে প্রচণ্ড ঝগড়া। এক ভাই আলাদা হয়ে গেছে—কেন এসব হয় বলো তো!

কঠিন প্রশ্ন। চয়ন বিনীতভাবে চুপ করে থাকে।

কৃষ্ণজীবন মাথা নেড়ে বলে, কি মনে হয় জানো? মানুষের কোনও গন্তব্য নেই, শুধু গতি আছে। সে কোথায় চলেছে তা সে জানেই না।

যে আজ্ঞে।

এরপর এক গভীর অন্যমনস্কতায় ডুবে বইল কৃষ্ণজীবন। চয়নকে ভুলেই গেল বোধ হয়। মিনিট পাঁচেক এই মানসিক অনুপস্থিতির পর স্বপ্নোত্থিতের মতো মাথা তুলে কৃষ্ণজীবন তার দিকে চেয়ে বলল, ওঃ হো, তোমাকে একটা কথা বলাই হয়নি। আমার এক ছাত্র মস্ত এক কোম্পানির বড় কর্তা, তাকে তোমার কথা বলেছিলাম। সে তোমাকে দেখা করতে বলেছে। কিন্তু সে তো বোধ হয় মাস দুই আগের কথা। ভুলেই গিয়েছিলাম।

চয়নের বুক দুরুদুরু করে উঠল। কিছু বলল না।

কৃষ্ণজীবন একটা শ্বাস ফেলে বলল, দেখ, আমার কাছে তোমার চাকরিটা এতই সামান্য ব্যাপার যে মনেই ছিল না। অথচ তোমার কাছে ব্যাপারটা বড় গুরুতর। কেন যে আজকাল আমার এমন সব ভুল হয়!

চয়ন বিনয়ের সঙ্গে বলল, তাতে কি? আমি না হয় তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করব।

হ্যাঁ হ্যাঁ, বোধ হয় খুব দেরি হয়ে যায়নি। খুব বড় কোম্পানি! সবসময়ে লোক দরকার হয়। তুমি বোসো, আমি একটা চিঠি দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। কালই দেখা কোরো।

যে আজ্ঞে।

বিশাল উপহারের বাক্স, ফুলের তোড়া এবং পকেটে কৃষ্ণজীবনের চিঠি নিয়ে চয়ন যখন বাড়ি ফিরল তখনও সে বুঝতে পারছিল না, আজকের দিনটা তার ভাল গেল না খারাপ! এক দিনে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে যাওয়ায় সে একটু বেসামাল বোধ করছে। মাতালের মতো।

তালা খুলে ঘরে ঢুকে সে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। ঘটনাগুলো বাস্তব কি না একটু সন্দেহ হচ্ছিল তার।

স্টোভ জ্বেলে যখন রান্না করতে বসেছে চয়ন, তখনই হঠাৎ মনে হল, অন্ধকার ছাদে জলের ট্যাঙ্কের পাশে কেউ দাঁড়িয়ে, তার দিকেই মুখ।

চয়ন তাকাতেই অনিন্দিতা চাপা গলায় বলল, অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি।

চয়নের হাত পা হিম হয়ে গেল আজ। অনিন্দিতাকে তার তো ভয় পাওয়ার কথা নয়।

অনিন্দিতা এগিয়ে এল কাছে। বলল, বাবা তোমাকে আজ কী বলেছে বলো তো?

চয়ন লজ্জায় গুটিয়ে গিয়ে বলল, ও কিছু নয়।

বাবার মাথাটাই গেছে। কী সব আবোল-তাবোল ভাবে, প্ল্যান করে, তার ঠিক নেই। তুমি বাবাকে সিরিয়াসলি নিও না।

চয়ন চুপ করে রইল।

এ কথাটা বলার জন্যই আজ রিস্ক নিয়েও ছাদে এসেছি। তোমার দাদা বউদি আমাদের ছাদে আসা বন্ধ করেছে, জানো তো?

জানি।

তবু বাবার জন্যই আসতে হল। বাবাকে নিয়ে আমাদের অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। কিছু মনে কোরো না।

চয়ন হঠাৎ বলল, অনিন্দিতা, একটা জিনিস নেবে? বলেই ফুলের তোড়া আর উপহারের বাক্সটা ঘর থেকে এনে তাকে দিয়ে বলল, নিয়ে যাও।

এ কী? এ দিয়ে কি হবে?

নাও। নিলে আমার ভাল লাগবে।

অনিন্দিতা তার সুন্দর দাঁতে চমৎকার হাসল, আচ্ছা নিলাম।

৮০

চিঠিটা এল দুপুরে। মুখ আঁটা একটা খাম। হাতের লেখা অচেনা। বীণার ঠিকানায় চিঠি আসেও না বড় একটা। ন' মাসে ছ মাসে বিষ্ণুপুর থেকে মা কিংবা বাবা লেখে।

চিঠিটা খুলে বীণা খানিকক্ষণ বজ্রাহতের মতো বসে রইল।

নিমাই লিখেছে : কল্যাণীয়াসু, শ্রীভগবানের পাদপদ্মে তোমার কুশল কামনা করি। হয়তো পত্র পাইয়া অবাক হইবে। তোমার নাটকের দলের একটি ছেলের নাম সজল রায় দিনকতক আগে আসিয়াছিল। তোমার সম্পর্কে আমার দাবি-দাওয়া কতটুকু তাহা জানিতে চায়। সে তৃতীয় ব্যক্তি, তাহার কাছে কী বলিব? কিন্তু তাহার আগ্রহ ও ব্যস্ততা দেখিয়া মনে হইল, ইহার পিছনে অন্য কারণ আছে। বীণা, সজলকে পাঠাইলে কেন? তোমাকে তো আমার অধীনস্থ কখনও থাকিতে হয় নাই। আমিই তো তোমার অন্নদাস ছিলাম। কোন বাঁধনে তোমাকে বাঁধিব? আমার না আছে জোর, না যোগ্যতা। তোমার বন্ধন তো কখনও ছিল না। বহুকাল আগেই তোমাকে বলিয়াছি, আমাকে ছাড়িয়া যদি অন্য কাহাকেও বিবাহ কর তাহাতে আমার অপমান হইবে না। আমার কোনও স্বত্ব-স্বামীত্ব নাই। তবু যদি আদালতের রায় প্রয়োজন হয় তবে পত্রপাঠ সেই ব্যবস্থা করিও। আমি আইনের বন্ধনটুকু খুলিয়া দিতে সাহায্য করিব। আমরা যে স্তরের মানুষ সেই স্তরের মানুষের কাছে আইন আদালতের প্রয়োজন হয় না। মোটা অপরাধ না করিলে দেশের আইন আমাদের স্পর্শ করিবে না। তোমার ও আমার বিবাহের কোনও দলিল নাই, সাক্ষীসাবুদও নগণ্য। তাহার চেয়েও বড় কথা আমার দিক হইতে তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত। নিমাই অপদার্থ হইলেও, মিথ্যাবাদী নহে। নিশ্চিন্ত থাকিও। সজলবাবুর আগ্রহ দেখিয়া নিজেই তোমাকে সব জানাইয়া দিলাম। সর্বদাই তোমার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করি। শুভকামনা জানাইয়া রাখিলাম। অনর্থক আমাকে বাধা কল্পনা করিয়া বিব্রত হইও না। ইতি নিমাইচরণ রায়।

বীণা চিঠিটা বার কয়েক পড়ল। কেন পড়ল এবং বারবার পড়েও যেন একটা সংকেতবাক্য কেন উদ্ধার করতে পারল না তা নিজেও বুঝতে পারল না। ভরদুপুরে বন্ধ ঘরের মধ্যে বিছানায় অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। সজল গিয়েছিল তা সে জানে। এসে বলেছিল, বীণা, তোমার হাজব্যান্ডের সঙ্গে আলাপ করে এলাম।

বীণা একটু অবাক হয়ে বলল, কেন?

এমনিই। মানুষটা কেমন তা একটু জরিপ করে এলাম।

তার কোনও দরকার ছিল কি?

আমার ছিল।

কেন, সেটা বলবে তো?

সজল একটু হেসে বলল, কেন বোকা সাজছ? কেন গিয়েছিলাম তা তুমি জানো।

বীণা একটু চুপ করে থেকে বলল, কী বলেছে ও?

তেমন কিছু নয়। তবে সে তোমাকে মনে মনে ত্যাগ করেছে। ডিভোর্স দিতে রাজি।

সেটা আমি জানি।

তুমি কি মন থেকে ওকে ছাড়তে পারোনি এখনও?

বীণা একটু ভেবে বলল, তা হয়তো পেরেছি। কিন্তু বাড়াবাড়িটার দরকার ছিল না। আমার কোনও কাজে বাধা দেওয়ার সাহস ওর নেই। আমি যখন যা খুশি করব, ওর অনুমতি বা মতামতের দরকার আমার হয় না। তুমি ওর কাছে গিয়ে বরং আমাকেই অপমান করেছ।

যাঃ, এ তো উল্টো কথা শুনছি!

উল্টো নয় সজল। আমি তো কারও ক্রীতদাসী নই।

তা তো নও জানি।

না, জানো না। জানলে ওর কাছে দৌড়ে যেতে না। এ কথা কেন ভুলে যাও যে, আমার ভবিষ্যৎ আমারই হাতে! আমার জীবনটা আমারই! সেখানে কোনও পুরুষের কোনও ভূমিকাই নেই। আমি ওকে মানি না। তোমার যা কিছু বলার তা আমাকেই বলতে পারতে। ওর কাছে কেন গেলে?

সজল একটু যেন ভয় পেল। বলল, ভুল হয়ে গেছে বীণা। মাপ করে দাও।

সজলের সঙ্গে তার সম্পর্ক এর পর আরও একটু গাঢ় হয়েছে। সজল মেয়েদের ব্যাপারে সাহসী পুরুষ। অনেক পুরুষের শুধু এই একটা ব্যাপারে খুব সাহস আর আত্মবিশ্বাস থাকে। কিন্তু বীণাও কম পুরুষের সঙ্গে মেশে না। সে সজলকে একটু লাগাম পরিয়ে রাখল। খুব কাছাকাছি হতে দিল না।

সম্পর্কটা একটা জায়গায় থেমে আছে। বীণা শরীরের সম্পর্কে যেতে চায় না। ওটা ঘটে গেলে বেইমান পুরুষ ওইটেই চাইবে। দায়িত্ব নিতে পিছপা হবে।

সজল প্রায়ই আসে। চা খায়। রাত নটা দশটা অবধি গল্প করে। তারপর নানা ইশারা ইঙ্গিতের ব্যর্থ চেষ্টা করে চলে যায়। একদিন বলেই ফেলল, আজ জ্যোৎস্না রাত ছিল বীণা, দুজনে যদি সারা রাত একসঙ্গে জেগে থাকতে পারতাম!

বীণা তাকে একটা ধমক দিয়ে বলল, বাড়ি যাও।

তাড়িয়ে দিচ্ছ?

মেয়েদের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করা ছাড়া যে-সব পুরুষের আর কোনও বড় কাজ থাকে না তাদের মেয়েরা পছন্দ করে না সজল।

আমাদের মতো ছেলের আর কী বড় কাজ থাকবে বলো তো বীণা? আমি ইস্কুল-কেরানির ছেলে, কষ্টেসৃষ্টে বড় হয়েছি। লেখাপড়াও করেছি। কিন্তু ওসব লেখাপড়ায় তো কিছু হয় না। বাংলায় এম এ হয়েও একটা মাস্টারির চাকরিও জোটাতে পারিনি। অনেক টাকা দিতে হয়, তবে মাস্টারি মেলে। বড় কিছু করতেই তো সিনেমায় নামার জন্য ঘোরাঘুরি করতাম। হয়নি। ঘুরতে ঘুরতে কাকার দলে। কী বড় হবো বলো তো! কি

ভাবে বড় হওয়া যায়? এ দেশে আমাদের মতো ছেলের জন্য ওপরে ওঠার কোনও সিঁড়ি নেই। এ তো তুমিও জানো বীণা।

জানি। কিন্তু তোমার মধ্যে চেষ্টাও নেই।

চেষ্টা নেই? না, কথাটা ঠিক হল না। এ কথা ঠিক যে, অভিনয়ে আমি খুব পাকা নই। কিন্তু শেখার চেষ্টা করেছি। হয়নি, কি করবো বলো?

নাটক লিখতে পারো না? বাংলায় এম এ, তোমার তো লেখার হাত থাকা উচিত।

ছিল একসময়ে। নাটক নয়, কবিতা লিখতাম। কিন্তু ওসব পোষাল না। কবিতার লাইনেও বেজায় ভিড়। সব লাইনেই দারুণ কমপিটিশন।

বীণা হেসে ফেলে বলেছিল, আজ বাড়ি যাও। জ্যোৎস্না রাতে আমার খুব ঘুম পায়।

তুমি যখন বলছ, নাটক লেখার চেষ্টা করব। কিন্তু তাতেও কিছু হবে না। আমি জানি।

তোমাকে বাড়িতে টাকা দিতে হয় না?

দিতে পারলে তো ভালই হত। টাকা কোথায়? তবে আমার এক ভাই স্টেট ট্রান্সপোর্টে চাকরি করে। কন্ডাক্টর। সংসার সে চালিয়ে নেয়।

সজল সে রাতে চলে গেল। কিন্তু তা বলে সঙ্গ ছাড়ল না। সঙ্গ ছাড়ুক এটা তো বীণাও চায় না। কিন্তু তার কপাল এমনই যে, এক হাড়হাভাতের বদলে এসে জুটল আর এক হাড়হাভাতে। তফাতের মধ্যে এর চেহারাটা বড় সুন্দর। আর গানের মোহময় গলা।

তুমি তো গায়ক হতে পারতে সজল?

চেষ্টা কি করিনি ভাবছ? আগে ফাংশনে গাইতাম। রেডিওতে তিনবার অডিশন দিয়েছি, হয়নি। বড় ওস্তাদের কাছেও তালিম নিতে গেছি। আমার গলায় নাকি ওসব সুর আসে না।

রিহার্সাল থেকে ফিরতে ফিরতে দুজনে কথা হচ্ছিল। বীণা টর্চ জ্বেলে রাস্তা দেখতে দেখতে বলল, সেরকম চেষ্টা করোনি। আমার গানের কান আছে। তোমার গলা বেশ ভাল।

বেশ ভাল, জানি। সবাই বলে, বেশ ভাল। কিন্তু গলারও একটা ক্যারেক্টার আছে। সেটা থাকলে লোকে গান শুনেই বলে উঠত, দারুশ ভাল, ইউনিক। তা কিন্তু কেউ বলেনি।

তোমার এই জিনিসটা আমার খুব ভাল লাগে।

কোন জিনিসটা?

এই যে, নিজের সম্পর্কে তোমার চাঁছাছোলা মতামত। তোমার অহংকার নেই।

তাও ছিল। একেবারে নেই বোলো না। তবে ছেলেবেলা থেকে বাস্তবের ঘষটানি খেয়ে খেয়ে অহংটা ভোঁতা হয়ে গেছে।

তুমি এম-এ পাশ, চেহারা সুন্দর, গানের গলা ভাল, তোমার যে কোথায় আটকাচ্ছে বুঝতে পারি না।

সজল হাসল, আমার চেয়ে ঢের বেশি শুণী ছেলেরাও ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে বীণা। চান্স পাওয়া— কথাটা তো তুমি ভালই জানো। ওই চান্স পাওয়া যে কত শক্ত!

ঘরে এসে সজলকে চা করে খাওয়াল বীণা। তারপর বলল, শোনো সজল, বনগাঁয়ে পড়ে থেকে নিজেকে নষ্ট কোরো না। আরও চেষ্টা করো, খুব চেষ্টা করো।

সজল মাথা নেড়ে বলল, ইচ্ছেটাই মরে যাচ্ছে।

কেন মরে যাচ্ছে?

নিজেকে খুঁচিয়ে তুলবার আর উপায় নেই। তাই তোমার কাছে আমার একটা নিবেদন আছে। বলব?

বলো। আমাকে যদি কেউ সবসময়ে তাড়না করে, ভালবেসে, উৎসাহ দিয়ে চালাতে পারে তাহলে হয়তো কিছু এখনও হয়। বীণা, তুমিই একমাত্র যে পারো।

আমি! সর্বনেশে কথা।

আমি জানি তুমি বিবাহিতা, তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এখনও মুছে যায়নি। তবু তোমাকে প্রথম দেখেই মনে হয়েছিল, তুমি ভীষণ তেজী, জেদী, একরোখা। তোমার মতো কাউকে পাশে পেলে হয়তো হয়।

বীণা হেসে ফেলল। বলল, এখন বাড়ি যাও। মাথা ঠাণ্ডা করো গে।

তুমি কি একটু নিষ্ঠুর বীণা?

না। আমি প্র্যাকটিক্যাল।

সজল চলে গেল বটে কিন্তু রেখে গেল তার ছায়াকে, তার মায়াকে। অনেক রাত অবধি তাকে নিয়ে এক মোহময় চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল বীণা। সে কি এই চালচুলোহীন সুন্দর ছেলেটির প্রেমে পড়ে গেল! কিন্তু এই কি প্রেমে পড়ার সময়! এখনও জীবনটা তো গুছিয়ে তুলতে পারেনি, সবে একটা সম্পর্ক ছিঁড়ে স্বাধীন হয়েছে। এখনই কি আবার গলায় ফাঁস পড়ার দরকার হল?

প্রেমে পড়েছে কিনা সেটা ভাল করে বুঝে ওঠার আগেই কিন্তু তাদের নিয়ে গুজব ছড়িয়ে গেল। কাকা একদিন তাকে ডেকে আড়ালে বলল, বীণা, কি সব শুনছি! সত্যি নাকি?

কী শুনছ?

তোমাকে আর সজলকে নিয়ে।

বীণা ঠোঁট উল্টে বলল, গুজবে কান দাও কেন?

তাহলে সত্যি নয়?

না।

কাকা একটু ভেবে বলল, তোমার পারসোনাল ব্যাপারে আমার নাক গলানো উচিত নয়। কিন্তু একটু ভেবে দেখো। সজল সবে কিছুদিন হয় দলে এসেছে, এখানকার ছেলেও নয়। ওর সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নিয়ে তারপর এগোনো ভাল।

বীণা একটু অবাক হওয়ার ভান করে বলল, তার মানে তুমি আমার মুখের কথাটা বিশ্বাস করলে না? ধরেই নিচ্ছ যে সজলের সঙ্গে আমার প্রেম হয়েছে?

তোমার মুখে আরও কিছু কথা ফুটে উঠছে বীণা। সেগুলো তুমি উচ্চারণ করছ না বটে, কিন্তু গোপনও থাকছে না। আমার কাছে অস্বীকার করে কি লাভ? সজলকেও তো দেখছি, বড্ড উড়ু-উড়ু ভাব। ওসব কি গোপন করা যায় বীণা?

বীণা একটু রেগে গিয়ে বলল, সজলকে নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামাচ্ছি না। আমার মাথায় অনেক চিন্তা, অনেক সমস্যা।

কাকা গম্ভীর মুখে বলল, রাগ কোরো না। যা করবে তা ভেবেচিন্তে করতে বলেছি। তোমার ভাল চাই বলেই বলেছি, অন্য কারও ব্যাপার হলে মাথাই ঘামাতাম না। যাত্রা থিয়েটার সিনেমায় এসব তো হয়েই থাকে। কেউ গায়ে মাখে না। আমারও শুচিবায়ু নেই। কিন্তু নিমাই চলে যাওয়ার পর থেকে তোমার ভালমন্দ নিয়ে আমার একটা উদ্বেগ থাকে।

সেটা তোমার দয়া কাকা, তুমি আমার জন্য অনেক করেছ।

ওটা কথা নয়। আমি গুণের দাম দিই। তোমার গুণের কদর আমি আর কতটুকু করতে পারি? কিন্তু কথাটা অন্য দিকে চলে যাচ্ছে। আসল কথাটা হল, যা করবে ভেবেচিন্তে কোরো।

ঠিক আছে কাকা।

সেদিন সজলকে এড়িয়ে একা ফিরল বীণা। কিন্তু পরদিনই সজল তাকে ধরল, বীণা, কী হয়েছে? অমন গম্ভীর হয়ে আছ কেন?

তোমার জন্য আমাকে অনেক কথা শুনতে হচ্ছে।

সজল একটু হাসল, কথায় কি যায় আসে? কে তোমাকে কী বলেছে বীণা?

সেসব শুনে তোমার লাভ নেই। আমার মন খুব খারাপ।

সজল অসহায় মুখ করে বলল, তোমাকে কিছু বলতে আমার ভয় হয়। যা রেগে যাও! কিন্তু বীণা, আমার অপরাধটা কি?

তোমার অপরাধ কি কে জানে! কিন্তু আমাদের নিয়ে কথা হচ্ছে।

হোক না।

তুমি যত সহজে হোক না বলতে পারলে আমি তত সহজে বলতে পারব না। পুরুষমানুষদের অনেক সুবিধে, মেয়েদের তা নেই। সমাজের যত খবরদারি তো মেয়েদের ওপরেই। সেইজন্য আজকাল পুরুষ জাতটার ওপরেই আমার ঘেন্না হয়।

সজল লজ্জা পেয়ে বলে, আমার জন্য তোমার কোনও ক্ষতি হচ্ছে না তো বীণা? কিন্তু তোমার সঙ্গে মেলামেশা ছাড়া, চা খাওয়া ছাড়া আমি তো আর কিছু করিনি! তোমার সঙ্গ আমার ভাল লাগে, তোমাকে আমার ভীষণ প্রয়োজন বলে মনে হয়। কি করে এই ভাল লাগাটাকে, প্রয়োজনটাকে অস্বীকার করি বলো!

বীণা একটু ভিজল। নরম গলায় বলল, কিছুদিন আমার সঙ্গে মিশো না। একটু দূরে থাকো।

ও বাবা! তোমাকে একদিন না দেখলে যে ভীষণ অস্থির লাগে!

বীণা হেসে ফেলল। তারপর বলল, তাহলে আড়াল থেকে দেখো। কাছে বেশি এসো না।

সজল মৃদু হেসে মাথা নেড়ে বলল, বীণা, তুমি এত তেজী, এত স্বাধীনচেতা, ব্যক্তিত্বময়ী তবু মাঝে মাঝে এমন মধ্যযুগীয় মহিলার মতো হয়ে যাও কেন? লোকে কথা রটাচ্ছে বলে ভয় পেয়ে গেলে? আজকাল মেলামেশা নিয়ে কেউ কি মাথা ঘামায়? সিরিয়াসলি ঘামায় না। তবে পাসটাইম হিসেবে কূটকচালি করতে পারে। তা করুক না, কি যায় আসে তাতে?

বীণা এই সুপুরুষ তরুণটির মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তুমি যদি মেয়ে হতে তো বুঝতে। স্বাধীনচেতা, তেজী হয়েও মেয়েদের কত বাধা থাকে।

জানি, সব জানি। কিন্তু আমি তোমাকে কখনও ঠকাব না, কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করব না তোমার সঙ্গে। আজ অবধি আমি তোমার মতো আর কাউকে খুঁজে পাইনি।

সজলের আবেগ প্রায় কণ্ঠরুদ্ধ করে দিচ্ছিল তার। বীণা তাই খুব কোমল কণ্ঠে বলল, তোমাকে আমারও খুব ভাল লাগে। কিন্তু জানো তো, একটা সম্পর্কের জ্বালা আমার এখনও যায়নি। আমার আর একটু সময় লাগবে। তুমি যেমন অস্থির হয়ে পড়ছ, আমি তেমনটা হতে পারছি না। ঘরপোড়া গরু তো!

সে ঠিক আছে, কিন্তু দূরে সরে থাকতে বলছ কেন? আমি তো শুধু সঙ্গটুকুই চাই, তার বেশি এখন কিছু চাই না।

এই পাগলকে নিয়ে আর পারল না বীণা। তার প্রতিরোধ ভাঙল। তবুবলল, খুব বেশি নয় কিন্তু।

কিন্তু সেটা কথার কথা হয়ে রইল। রিহার্সালের পর একসঙ্গে ফেরা, চা খাওয়া এবং গল্পগুজব যথারীতি হতে লাগল। কথাবার্তায় অনেক ফেরতা, অনেক ইশারা ইঙ্গিত, চোখে চোখ রেখে মুগ্ধমূক হয়ে বসে থাকা। স্রোতে ভেসে যাচ্ছে দুজন। টের পাচ্ছে, তবু ঠেকাতে চেষ্টা করছে না।

ঠিক এই অবস্থায় এল নিমাইয়ের এই চিঠি। হতবাক বীণা চিঠিটার দিকে চেয়ে রইল। নিমাইয়ের হাতের লেখা সে চিনত না, কেনো নিমাই এর আগে কোনওদিন তাকে চিঠি লেখেনি, তার দরকারও হয়নি। হাতের লেখাটা খুবই সুন্দর, ভাষা গোছানো। বীণা চিঠিটা বালিশের তলায় রেখে দিল। বক্তব্য নতুন নয়, এরকম কথা নিমাই তাকে আগেও বলেছে। নতুন হল, চিঠি।

কাঁচড়াপাড়ায় একদিন সকাল দশটা নাগাদ নিমাই তার দোকানের কোণটিতে বসে এক গেলাস ঘোল খাচ্ছিল। দোকানে এখন ভিড় নেই। দুপুরের খাবার তৈরি হচ্ছে। এগারোটার পর মানুষের গাদি লেগে যাবে। রান্নার গন্ধটা পাচ্ছিল নিমাই। রোজ সে এই গন্ধটা খুব ভাল করে পরীক্ষা করে। গন্ধেই তো স্বাদ। ঠিকমতো গন্ধ না বেরোলে গিয়ে রাঁধুনীকে একটু সমঝে দিয়ে আসে। সে সতর্ক মানুষ। কোথাও ফাঁক রাখতে চায় না। বাসি জিনিস মেশাতে দেয় না কখনও। রাতের বাসি বাড়তি খাবার নিয়ে যায় কিছু ভুখা মানুষ আর কচিকাঁচা বাচ্চারা। ওটা তার নিত্যকার কাঙালীভোজন। লোকে নানারকম বুদ্ধি পরামর্শ দেয় তাকে। লাভ বাড়ানোর ফন্দিফিকির বলে যায়, নিমাই সেগুলো শোনে, কিন্তু মানে না। সেই যে কথায় আছে, হাঁ জী, হাঁ জী করতে রহো, বৈঠো আপনা ঠাম। তেল মশলায় তার কোনও ফাঁকি নেই। ঘানির তেল, বাছাই মশলা। তার দোকানে বাসন, কাপ প্লেট ধোয়া হয় সযত্নে, কোথাও ফাঁক থাকে না নিমাইয়ের। শালপাতা, কলাপাতা, ভাঁড়ের ব্যবস্থাও আছে। এত সামলে চলতে গিয়ে মাথার মধ্যে আর অন্য চিন্তা পাক খায় ঘোলটা শেষ করে হিসেবের খাতা টেনে নিয়ে বসতে যাবে, এমন সময়ে একটা লোক ঢুকল দোকানে।

নিমাই যে! ভাল আছ?

নিমাই শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল। একগাল হেসে হাত জোড় করে বলল, কাকা! এতদিন পর নিমাইকে মনে পড়ল তাহলে? আসুন, আসুন, বসুন ভাল করে।

কাকা বসল। নিমাই বলল, একটু কিছু মুখে দিতে হবে। কী খাবেন বলুন তো!

ব্যস্ত হয় না। সকালে জিলিপি আর কচুরি ঠেসেছি, এখন আর খাওয়া নয়। এক কাপ চা দাও শুধু।

চায়ের হুকুম দিয়ে জুৎ করে বসল নিমাই মুখোমুখি। বলল, তারপর খবরটবর কি?

তুমি তো আর বনগাঁ-মুখো হলে না!

নিমাই হাত উল্টে বলল, কি করতে যাবো? বনগাঁর পাট তো চুকেই গেছে। তা এখানে হঠাৎ আসা হল কেন?

একটা বায়নার ব্যাপার ছিল। কাল রাতেই এসেছি। আজ বনগাঁ রওনা হওয়ার মুখে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাচ্ছি। বীণার খবর-টবর নাও না?

নিমাই সলজ্জ হেসে বলল, তার কথা আবার কেন? যতদূর জানি ভালই আছে, নামটামও হচ্ছে।

কাকা মৃদুস্বরে বলল, তোমাদের মধ্যে কি হয়েছিল আমাকে একটু বলবে নিমাই? যদি বাধা না থাকে?

নিমাই একটু চুপ করে থেকে বলল, সব কথা কি খোলসা করে বলা যায় কাকা?

খোলসা করে বলতে বলছি না। স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, আবডাল থাকাই ভাল। কিন্তু মোদ্দা কথাটা কী?

নিমাই মুখখানা গম্ভীর করে বলল, আমাকে তার আর দরকার হচ্ছে না।

এটা কোনও কথা হল?

একটা মানুষ আর একটা মানুষের কাছে হঠাৎ যে কেন ফুরিয়ে যায় তা তো বলতে পারি না। মনের রহস্য কে ভেদ করতে পারে বলুন।

বীণাও কি তোমার কাছে ফুরিয়ে গেছে?

নিমাইয়ের চোখদুটো মেদুর হয়ে গেল! গলাটাও কি ধরে গেল একটু? সামান্য ভারী গলায় বলল, না কাকা। সে আমাকে যে চোখে দেখত আমি তো তাকে সে চোখে দেখতাম না।

ওইটেই তো আমি জানতে চাই।

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমার জন্য অনেক করেছে বীণা। অনেক। অসুখবিসুখে যখন যেতে বসেছিলাম তখন সে-ই আমাকে যমের হাত থেকে ছিনিয়ে আনে। তার দয়ায় আমার মা-বাবা উপপাসের হাত থেকে বেঁচে যায়। কত মুখে তার কথা বলব? সে আমার কাছে ফুরোবে কেন?

কাকা একটু চুপ করে থেকে বলল, সজল নামে একটা ছেলে এসেছিল তোমার কাছে?

নিমাই তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এসেছিলেন। বড় ভাল ছেলেটি।

কী বলতে এসেছিল?

নিমাই ম্লান একটু হাসল, তিনি বোধ হয় আমার মনোবাসনা জানতে এসেছিলেন। তা আমি বলে দিয়েছি, আমার কোনও দাবিদাওয়া উঠবে না কখনও। মানুষকে কি দাবিদাওয়া করে, আইন আদালত করে আটকানো যায়?

কাকা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল। তারপর বলল, তোমার মতো মানুষ আমি বেশি দেখনি নিমাই। তোমার রাগ হয় না?

জিব কেটে নিমাই বলে, রাগ! বলেন কি? রাগ কি আমার শোভা পায়। আজও তার ঋণে আমার কাঁধ ভারী হয়ে আছে। আমি অকৃতজ্ঞ নরাধম বলে তার ঋণ শোধ করতে পারিনি। শোধ করতে গেলে হয়তো উল্টো বুঝবে, তাই চেষ্টাও করিনি।

কাকা দৃঢ় গলায় বলে, তোমার কাছে বীণার অনেক শেখার ছিল। আমাদেরও শেখার আছে। দোকানটা তো দিব্যি দাঁড়িয়ে গেছে দেখছি।

ভগবানের দয়া।

এলেম তোমার কম ছিল না। হাত পা গুটিয়ে বসে ছিলে বলে হচ্ছিল না। তোমার উন্নতি দেখে যে কী খুশি হয়েছি তা বলার নয়।

আশীর্বাদ করবেন যেন টাকাপয়সা আমাকে খেয়ে না ফেলে। ভগবানে যেন বিশ্বাস-ভক্তি থাকে। একটা কথা বলব কাকা? আমার একটা কাজ করে দেবেন?

কী কাজ?

বীণার জন্য পাঁচ হাজার টাকা তুলে রেখেছি। এমনিতে সে হয়তো নেবে না। আমার নাম না করে টাকাটা তাকে দেবেন?

পাঁচ হাজার টাকা! সে তো অনেক টাকা!

টাকাই তো। কাগজ মাত্র। তবু এ দিয়ে তার যদি কিছু উপকার হয় তো আমি শান্তি পাবে। আপনি একটু অন্যভাবে দেবেন।

কী বলব তাকে?

সে আপনি ঠিক করে নেবেন।

মিথ্যে কথা বলতে বলছ?

জিব কেটে নিমাই বলে, না না, তা কেন? ধরুন, টাকাটা আমি আপনাকেই দিচ্ছি। এবার আপনার অভিরুচি।

ইতি গজ? বলে কাকা হাসল। তারপর হাত বাড়িয়ে বলল, দাও। এ টাকায় খেলে তার অনেক পাপ কেটে যাবে। দাও।

নিমাই উজ্জ্বল হয়ে বলল, বাঁচলাম।

৮১

আপার মা আর বাবা দুজনেই শান্ত মানুষ। শান্ত এবং স্থির। তাঁদের দুজনের মধ্যে কখনও ঝগড়াঝাঁটি বা কথা কাটাকাটি পর্যন্ত হয় না। দুজনেই খুব ধার্মিক। পুজো-আচ্চা তাদের বাড়িতে লেগেই থাকে। আপার বাবা মস্ত সরকারি অফিসার, কিন্তু ঠাঁটঠমক বিশেষ নেই। কাজ-অন্ত প্রাণ। আপার দুই দাদার একজন আই আই টি-তে ইনজিনিয়ারিং-এর ফাইনাল ইয়ার পড়ছে খড়্গপুরে। অন্য জন দিল্লিতে ম্যানেজমেন্ট শিখছে।

বিমলাকে সন্ধেবেলা যখন ঘরে তুলে আনল আপা তখনও তার বাবা ফেরেননি। মা একটু আতঙ্কিত হয়ে বললেন, এসব কী ব্যাপার?

আপা সংক্ষেপে সব বলল, মায়ের কাছে সে প্রায় কিছুই গোপন করে না।

মা শুনলেন এবং শান্তভাবে বললেন, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ায় বাইরের লোকের ঢুকে পড়াটা বিপজ্জনক। বিমলাকে ভিতরের ঘরে নিয়ে যাও। যশবীর এলে তুমি বেরিও না। যা বলবার আমি বা তোমার বাবা বলব।

কেন মা, যশবীরকে তো আমি ভয় পাই না।

ভয় পাওয়ার কথা বলছি না। তুমি কাউকেই ভয় পাও না, তা আমি জানি। কিন্তু তুমি হয়তো গরম গরম কথা বলবে, তোমার বয়স তো অল্প। আমরা বুঝিয়ে বলতে পারব।

যশবীর যদি বিমলাকে নিয়ে যেতে চায়?

যাতে না নেয় তা দেখব। তবে তুমি নিশ্চয়ই চাও না যে, ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাক?

চাই মা। বিমলার যা অবস্থা করেছে তাতে তো ও মরেই যেত। এর পর হয়তো সত্যিই মেরে ফেলবে। যশবীর স্বাভাবিক অবস্থায় নেই।

তুমি তো দূরবীন দিয়ে দুনিয়াকে দেখছ, তাই এমন মনে হচ্ছে। যাকগে, তুমি বিমলাকে ভিতরের ঘরে নিয়ে শুইয়ে দাও। তুমি আজ ওর সঙ্গেই থাকবে। যশবীরকে আমরা সামলাবো। যশবীরকে আমি চিনি, আমাকে আন্টি বলে ডাকে।

বিমলাকে নিজের ঘরে নিয়ে এল আপা। তার খাটটা বেশ বড়। দুজনের অনায়াসে হয়ে যাবে। বিমলা বাথরুম থেকে চোখেমুখে জল দিয়ে এসে বসল, তারপর বলল, কেন ঝামেলা পাকালে? তোমার বোঝা হয়ে তো থাকা যাবে না।

আপা বলল, কেউ কারও বোঝা নয় বিমলা। কিন্তু বিপদে পড়লে একে অন্যের ওপর নির্ভর না করলে কি হয়?

আন্টি আর আঙ্কলকেও বিপদে ফেলা হল।

ওসব ভেবো না। আমাদের পরিবারটা একটু অন্যরকম। আমরা নিজেদের নিয়ে থাকতে ভালবাসি না। আমাদের ভয়ডরও একটু কম। কিন্তু তোমাদের ব্যাপারটা আমাকে বলবে?

বিছানায় গুটিসুটি হয়ে অসহায়ের মতো বসেছিল বিমলা। খুব দুর্বল দেখাচ্ছে। চোখ দুটিতে গভীর একটা হতাশা। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, বলতে গেলেই আমার খুব কান্না পাবে।

কাঁদবে কেন? মনটাকে শক্ত করার সময় এসেছে বিমলা। এই টরচার সহ্য করো কি করে? কী চায় যশবীর?

যশবীর চায় অল অ্যাটেনশনস্। যখন বাড়ি আসবে তখনই আমাকে অ্যালার্ট থাকতে হবে। সে সময়ে বাইরে কোথাও গেলে রেগে যায় ভীষণ। অসম্ভব পজেসিভ। আমাকে অনেকটা পুতুল বানিয়ে রাখতে চায়। সাজো-গোজো, টি ভি দেখ, মার্কেটিং করো, ঘর সাজাও, কিন্তু গণ্ডির মধ্যে থাকো। যেন আমার আলাদা মত নেই, সত্তা নেই, চরিত্র নেই। আমি দাসী না পুতুল, বলো তো!

তুমি কোনোটাই নও, যশবীরকে সেটা বুঝিয়ে দেব।

প্লিজ! ওর সঙ্গে কনফ্রন্টেশনে গিয়ে বিপদে পড়ো না, ও কিন্তু খ্যাপাটে আছে।

আপা হাসল, তোমার মতো আমি ভিতু নই।

জানি আপা, তোমার খুব সাহস। কিন্তু যশবীর তো পশুর মতো হয়ে গেছে। সাবধান হওয়া ভাল।

কাল রাতে কী হয়েছিল?

রোজই হচ্ছে। ইদানীং ওর মাথায় এসেছে, আমি উইমেন্স লিব করছি। ওকে ঠিকমতো দেখভাল করছি না। কি করব বলো? লেডিজ গ্রুপের হয়ে আমাকে কিছু কাজ করতে হচ্ছে। সাবস্ক্রিপশন, অ্যাকাউন্টস, মিটিং-এ কিছু সময় দিতে হয়। ইদানীং ফিরতে দেরি হয়ে যাচ্ছিল। প্রথম তাই নিয়ে ঝগড়া। বাঙালি মেয়েদের মতো স্বাধীন তো নই আমরা। আমাদের স্বামীসেবা করতেই হয়। সেটাতে ঢিলেমি দেখা দিলেই মুশকিল। কিন্তু আমার আর ভাল লাগে না। যশবীরের তো কোনও কালচার নেই। সারা দিন লরি, ট্রাক, খালাসি, ড্রাইভারদের সঙ্গে কাটায়, বাড়ি ফিরে হুইস্কি আর হিন্দি সিনেমা, তারপর খাওয়া আর শোওয়া। ছুটির দিনে মাঝেমধ্যে একটু আউটিং বা সিনেমায় যাওয়া। লোকটাকে আমার আর একদম ভাল লাগছে না। জীবনের কত দিকে কত কী ঘটে যাচ্ছে, ও তার কোনও খবরই রাখে না। ওর অন্য সব ভাড়াটে মেয়ের সঙ্গেও সম্পর্ক আছে। ওর এক বন্ধু কিছুদিন আগে মারা গেছে। সেই বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গেও আছে। এগুলো কিন্তু সন্দেহ নয়, সব সত্যি।

ডাক্তার এলেন। বিমলার হাতপায়ের বাঁধনের জায়গা, মুখে স্টিকিং প্লাস্টারের দাগ সবই লক্ষ করলেন। গম্ভীর মুখে নাড়ি, বুক সব পরীক্ষা করে দেখে আপার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভেরি শকিং। কী হয়েছিল?

পাড়ার চেনা ডাক্তার, আপা মৃদু স্বরে বলল, ওর স্বামী ওকে নিজের পৌরুষ আর কর্তৃত্ব দেখিয়েছে। ওর কেমন অবস্থা ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার দাশগুপ্ত গম্ভীর মুখে বললেন, এমনিতে ঠিক আছে। কিন্তু যশবীরটা যে এরকম অমানুষ তা তো জানতাম না।

আপা বলল, ওর মাথায় হঠাৎ যেন ভূত চেপেছে।

ডাক্তারবাবু মাথা নেড়ে বলেন, তাহলে আপাতত ওদের সেপারেট থাকাই ভাল। একসঙ্গে হলেই আবার গণ্ডগোল হবে। আজকাল খুনোখুনিও হচ্ছে।

ডাক্তার একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে গেলেন। বললেন, রেস্ট নিতে বলল। একটু ঘুমের ট্যাবলেট দিয়ে গেলাম। ওটা কিন্তু অবশ্য খাওয়াবে। কোনওরকম উত্তেজনা বারণ।

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর বিমলা বলল, ওর সব অত্যাচার আধিপত্য মেনে নিচ্ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ মনে হতে লাগল, এতে আমার কী লাভ হচ্ছে? আমি কী পাচ্ছি ওর কাছ থেকে? অকেশনাল সেক্স আর শাড়ি গয়না বা প্রেজেন্টেশন। এসব দিয়ে কী হবে? আমি কি শুধু যশবীরের বউ? এ ছাড়া কি আমার অন্য পরিচয় কিছু নেই? আমাদের লেডিজ গ্রুপে এইসব নিয়েই তো কথা হয়। তাই ইদানীং আমি ওর মেজাজমর্জিকে বেশি পাত্তা দিচ্ছিলাম না। ফলে ঝগড়া হতে লাগল, বুঝতে পারছিলাম ও আমার স্বাধীনতা, স্বাধীন চিন্তা, বাইরের কাজ সহ্য করতে পারছে না। ও চায় আমি সারা দিন ওর ধ্যান করি। কিন্তু ধ্যান করার মতো মানুষ তো আগে ওকে হতে হবে! ও তো একটা পয়সা কামানোর যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়।

বেশির ভাগ মানুষই তাই। তুমি কি কিছু ভাবছ?

কিসের কথা বলছ?

যশবীরের সঙ্গে থাকবে, না আলাদা হবে?

ডিভোর্স? আমার বাপের বাড়ি খুব রক্ষণশীল পরিবার। তারা আমাকে ডিভোর্স করতে দেবে না।

তাহলে?

আমি সেপারেট থাকতে চাই। আমার লেডিজ গ্রুপ আমাকে হেল্প করবে।

আমরাও সাহায্য করব।

আপা, তোমার ওপর যশবীরের খুব রাগ। ও তোমাকে দেখতে পারে না। হি ইজ এ ডেনজারাস ম্যান। আমাকে তোমাদের বাড়িতে এনে তুমি নিজের বিপদ ডেকে আনছ। আমি জানি তুমি খুব সাহসী মেয়ে। কিন্তু পুরুষের ইগো যে কী সাতিক হয় তা তো তুমি জানো না।

আমি এ সবই শিখছি। জানছি। মানুষ ধীরে ধীরে শেখে। যশবীর যে আমাকে পছন্দ করে না তা আমি জানি।

তবু রিস্ক নিচ্ছ?

রিস্ক না নিলে কি জানতে পারব? তুমি অত ভেবো না। এ পাড়ায় আমার কিছু বন্ধু আছে। পিছনের বস্তির লোকজন। আমি তেমন দরকার হলে তাদের ডাকতে পারি। আশা করি ততটা করতে হবে না। তুমি কিছু খেয়ে নাও। তারপর ওষুধ খেয়ে ঘুমোও। খুব টেনশন গেছে তোমার।

পাড়ার দোকান থেকে ওষুধ নিয়ে এসে আপা দেখল, বিমলা খেতে বসেছে। কিন্তু কিছু খেতে পারছে না। বলল, ভমিটিং টেন্ডেন্সি হচ্ছে। কি করে খাবো?

মা বললেন, আচার দিয়ে খাও। ভাল আচার আছে।

বিমলা মাথা নেড়ে বলে, না আন্টি। আমি বরং শুধু ঘোলটা খাই। সলিড ফুড ভিতরে যাচ্ছে না।

তাই খাও।

ওষুধ খেয়ে বিমলা শুলো। আপা দরজা টেনে দিল বাইরে থেকে।

মা খাবার টেবিল গোছাতে গোছাতে বললেন, তোমার এসব সোশ্যাল ওয়ার্কের জের আমাকে আর কত টানতে হবে?

আপা একটুও হাসল না। গম্ভীর মুখে বলল, আমাকে তো অনেক টানতে হবে মা। সমাজটা এত পচা-গলা।

মা তার দিকে চেয়ে শান্ত গলায় বললেন, তোমার বিচার খুব একপেশে। যশবীর কিন্তু খুব খারাপ লোক নয়। মদ খায়, সে তো বহু মানুষ খায়। কিন্তু তার স্বভাব বা কথাবার্তা আমার তো খারাপ লাগে না। বিমলা কি খুব শান্তিপ্রিয় মেয়ে ভেবেছ? রোজ যশবীর ফিরলেই অশান্তি করে।

এটা কী হচ্ছে মা, তুমি যশবীরের পক্ষ নিচ্ছ? আজ সকালেই আমাকে ও ধাক্কা দিয়েছে। বিমলাকে তো প্রায় মেরেই ফেলেছিল।

মা গম্ভীর মুখে বলেন, ঘটনা ভাল করে জানো, তারপর বিচার কোরো। আমার ধারণা বিমলাকে যশবীর খুব ভালবাসে। আর ভালবাসার মধ্যে একটু দখলদারি থাকেই, নইলে ভালবাসা কিসের? যেমন আমাকে তুমি বলো, আমার মা। ওই আমার মা কথার মধ্যে একটু দখলদারি থাকে না কি?

এটা সে জিনিস নয় মা।

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, কি জানি কি! আজকাল সব পাল্টে যাচ্ছে।

হ্যাঁ মা, পাল্টে যাচ্ছে। পরিবর্তনটা তুমি বুঝতে পারছ না কেন?

তুমি কি বিমলাকে স্বাধীন হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছ? ডিভোর্সের কথা বলেছ শুনলাম। কাজটা ভাল করনি। স্বাধীন হয়ে বিমলার লাভ হবে না। আরও কষ্টে পড়বে।

তুমি কি বলো ও অত্যাচারী স্বামীর পা ধরে থাকবে?

মা ব্যাজার মুখে বলেন, যশবীরকে আমার অত্যাচারী বলে মনে হয় না। হতে পারে ওর মাথা গরম। তারও কারণ বিমলাই। তুমি বোধ হয় এবার আমাকে নারীমুক্তির কথা শোনাবে! শোনো বোকা মেয়ে, নারীমুক্তি বলে কিছু নেই। প্রতি মুহূর্তেই পুরুষকে তার দরকার। কোনও মেয়ে যদি তার স্বামীকে না মানে, স্বাধীন হয়, তবে অন্য পুরুষরা তাকে ছিড়ে খাবে। স্বাধীন মেয়ের মতো এমন সহজ ভোগ্যবস্তু পুরুষের আর কী আছে? বহুভোগ্যা হলে কি স্বাধীন হওয়া হয়?

তাহলে মা, তুমিই স্বীকার করছ যে, পুরুষেরা পশুর মতোই। সুযোগ পেলেই মেয়েদের ছিঁড়ে খায়? তাহলে এই জাতকে মেয়েরা প্রভুর আসন দেবে কেন?

উপায় নেই বলে। পৃথিবীতে মেয়েদের আর কোনও উপায় নেই, তাই ওই নিয়ম মানতে হয়। মেয়েতে মেয়েতে তো আর বিয়ে হয় না!

আজকাল তাও হয় মা।

যা গম্ভীর মুখে বলেন, হয় যে তা আমিও শুনেছি। তোমার বাবা আমাকে মাঝে মাঝে সেসব খবর শোনায়। তুমি কি চাও সেইটেই স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে উঠুক? ওটা তো কুৎসিত একটা বিকৃতি। তাও যদি মেনে নিই, তাহলেও জেনো, মেয়েতে মেয়েতে বা পুরুষে পুরুষে বিয়ে হলে কোনওদিনই আর সন্তান হবে না। প্রকৃতিকে কি এতটা অস্বীকার করা যায়?

আপা একটু অবাক হয়ে মায়ের দিকে চেয়ে রইল। তার শান্ত মা এত কথা কদাচিৎ বলে। আজ বলছে, তার কোনও কারণ আছে।

হ্যাঁ মা, যশবীর কি তোমাকে ঘুষ দেয়? কী ঘুষ দেয় বলো।

মা হাসলেন না। গোমড়া মুখেই বললেন, আমি যশবীরের পক্ষ নিচ্ছি না। সে অন্যায় করেছে। কিন্তু আগে ভাল করে দেখ, সেই অন্যায়ের পিছনে, আর কারও আর একটা অন্যায় আছে কি না।

ডোরবেল বাজতেই একটু চমকে উঠেছিল আপা। কিন্তু দরজা খুলে দেখা গেল, না, কোনও হামলাকারী নয়। আপার বাবা। দীর্ঘকায়, কালো, মজবুত চেহারা, কাঁচা-পাকা চুলের মানুষটি খুবই শান্ত ও দৃঢ় প্রকৃতির। কেন্দ্রীয় সরকারের মস্ত অফিসার। সকাল থেকে অনেক রাত অবধি নিবিষ্ট মনে অফিসে কাজ করে।

জামাকাপড় পাল্টানোর আগেই ভদ্রলোককে আপা ও তার মায়ের কাছ থেকে ঘটনাটা আদ্যোপান্ত শুনতে হল। আপা প্রশ্ন করল, বলো বাবা, আমি অন্যায় করেছি?

আপার বাবা ভ্রূ কুঁচকে বললেন, আমি কোনও অন্যায় দেখছি না। আমি চাই তুমি এরকম কাজই করো। কিন্তু কখনও যেন ভুল সিদ্ধান্ত নিও না।

তাহলে কি এটা ভুল হল?

যশবীর না ফিরলে তো বোঝা যাবে না। অপেক্ষা করো।

অপেক্ষা অবশ্য অনেকক্ষণই করতে হল। যশবীর ফিরল না।

রাত দুটো অবধি অপেক্ষা করল আপা। তারপর বাইরের ঘরে সোফায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

যশবীর ফিরল সকালে। উসকোখুসকো চুল, রক্তবর্ণ চোখ, ক্লান্ত। প্রথমে নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল, কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে সোজা আপাদের বাসায় এল। দরজা খুলল আপা-ই।

কী চাই?

যশবীর যেন সংকুচিত, ভীত। অপরাধী মুখ করে বলল, সি ইজ নট দেয়ার। বাট থ্যাংক ইউ। আই ওয়ান্ট হার ব্যাক।

আপা দরজা আটকে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, বিমলা যাবে না। কোনওদিনই যাবে না।

একটু যেন অবাক হয়ে চেয়ে রইল যশবীর। শুধু প্রতিধ্বনি করল, যাবে না?

না। আপনার নামে পুলিশ কেস করা উচিত।

যশবীর কেমন যেন গুটিয়ে গেল। মাথা নিচু করে একটু ভেবে বলল, বিমলার সঙ্গে আমার একবার দেখা হতে পারে কি?

না। বিমলা আপনার সঙ্গে দেখা করবে না।

নিঃশব্দে পিছনে মা এসে দাঁড়িয়েছেন, টের পাচ্ছিল আপা। মা বুদ্ধিমতী। তাকে টপকাতে চেষ্টা করলেন না। শুধু পিছনে আড়ালে থেকেই বললেন, ওদের দেখা হওয়াটা কিন্তু দরকার আপা।

আপা কঠিন মুখ করে নীরব রইল।

যশবীর তার দিকে তাকাল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর মৃদু স্বরে বলল, তুমি ওকে নিয়ে এসেছ বলে থ্যাংকস দিচ্ছি আপা। ঠিকই করেছ। আমার সঙ্গে বিমলার আর না-থাকাই ভাল। আমি ভীষণ জেলাস। আই লাভ হার ভেরি মাচ। টু মাচ। হয়তো সেই কারণেই আমার দিক থেকে ওর বিপদও বেশি। আই অ্যাম সরি ফর এভরিথিং।

এই বলে চলে গেল যশবীর। সে যে কোনও নাটক করল না, চেঁচামেচি করল না, গায়ের জোর দেখানোর চেষ্টা করল না এতে একটু অবাক হল আপা। হয়তো নিজের অপরাধের গুরুত্ব বুঝতে পেরে ভয় পেয়েছে।

হয়তো ভেবেছিল, বিমলা মরে পড়ে আছে ফ্ল্যাটের মধ্যে, তাই মুখে অপরাধী ভাব। কিন্তু লোকটা যে আদ্যন্ত হৃদয়হীন তা তো মিথ্যে নয়।

আপা দরজা বন্ধ করে ফিরতেই মায়ের মুখোমুখি।

তুমি একটু মেজাজি আছ আপা।

আপা সামান্য রাগের গলায় বলল, আমি খুব ভাল মেয়ে মা, তাই ওকে পুলিশে দিইনি। ও তো খুনের চেষ্টাই করেছিল বিমলাকে।

ঠিক আছে। এখন বিমলাকে ঘুম থেকে তুলে খাওয়াও। ওর যে এখন কী হবে তাই ভাবছি।

স্বামী ছাড়াও মেয়েরা বাঁচে। তুমি ভেবো না।

মা আর কথা বাড়ালেন না।

বিমলা ওষুধের গাঢ় ঘুম থেকে উঠল বেলা ন'টায়।

ইস! কত বেলা হয়ে গেছে!

আপা বলল, তাতে কি? তোমার তো এখন রেস্ট-ই দরকার। কেমন আছ?

গায়ে হাতে-পায়ে কোমরে দারুণ ব্যথা। রাতে কিছু হয়নি তো!

না। যশবীর সকালে ফিরেছে। এসেছিল। তাড়িয়ে দিয়েছি।

বিমলা একটু চমকে উঠল, সহজে গেল?

গেল। ওর ভয় হয়েছে। বোধ হয় ভেবেছিল সকালে এসে তোমাকে মরা অবস্থায় দেখবে।

তাহলে কী করত?

কাপুরুষরা কী করে? তারা বউ খুন করে ফেরার হয়।

উঃ! বলে বিমলা দু'হাতে মুখ ঢেকে রইল কিছুক্ষণ।

তুমি যশবীরের কথা ভেবো না। তাতে শরীর খারাপ হবে।

আমি শুধু ওর নিষ্ঠুরতার কথা ভাবছি। ও যে আমাকে এত শাস্তি দিতে পারে তা আমার ধারণাই ছিল না। ওর কথা ভাবলেই আমার এত ভয় করছে!

সাড়ে ন'টা নাগাদ ফোনটা এল।

আমি একটু কৃষ্ণমূর্তিজীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

আপার বাবার আজ ছুটির দিন। শনিবার, পুজো-আচ্চা সেরে সবে সকালের জলখাবার খেতে বসেছিলেন। উঠে এসে ফোন ধরলেন। কি একটু শুনে নিয়ে বললেন, আচ্ছা, আসছি।

ফোনটা রেখে আপার দিকে চেয়ে বললেন, যশবীর কিছু বলতে চায়। আমি আসছি।

প্রায় ঘন্টা খানেক বাদে বাবা ফিরলেন। বললেন, যশবীর চলে গেল।

মা বললেন, তার মানে?

বাবা অনুত্তেজিত গলায় বললেন, ওর একটা অদ্ভুত ধারণা হয়েছে যে, বিমলাকে ও হয়তো হঠাৎ ইমপালসের মাথায় কোনওদিন খুন-টুন করে ফেলতে পারে। ও নিজের বশে নেই। বলে গেল যে, ওর ফ্ল্যাটে বিমলা একাই থাকতে পারে। জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের পাসবই আর চেকবই দিয়ে গেল। আর ফ্ল্যাটের চাবি। আরও বলেছে, বিমলাকে ডিভোর্স দিয়ে দেবে। যদি ও চায়।

বিমলা ভিতরের ঘর থেকে উঠে এসেছে। সব শুনে বলল, ওর কথায় বিশ্বাস কী? রাতে যদি ফিরে আসে?

কৃষ্ণমূর্তি শান্ত চোখে বিমলার দিকে চেয়ে বললেন, আমার চেয়ে তুমিই ওকে বেশি চেনো। কাজেই কোনটা করা ভাল হবে তা তুমিই ঠিক করো। তবে আমার মনে হল, যশবীরের মন খুব খারাপ। বেশ ভেঙেও পড়েছে। এক ড্রাইভারের অসুখ হওয়ায় কাল ট্রাক চালিয়ে আসানসোল গিয়েছিল। সারারাত ট্রাক চালিয়ে আজ সকালে এসে পৌঁছেছে। খুব টায়ার্ডও ছিল।

বিমলা মৃদু স্বরে বলল, আমি ওকে বিশ্বাস করি না আঙ্কল। আফটার ইয়েস্টারডেজ এক্সপিরিয়েন্স ওকে আর বিশ্বাস করা যায় না। আপা বুদ্ধি করে ফ্ল্যাটে না ঢুকলে আজ আমার ডেডবডিই পাওয়া যেত।

যশবীরও তাই বলছিল। খুব রিপেন্টেন্ট। যাই হোক, নিজের জিনিসপত্র ও নিয়ে গেছে। ফ্ল্যাটটা তোমার জন্য রেখে গেছে। বলেছে, ও তোমাকে আর কখনও ডিস্টার্ব করবে না।

বিমলা একটা শ্বাস ছাড়ল। তারপর বলল, টু বি অন দি সেফ সাইড আমি আরও দু’ দিন আপনাদের শেলটার চাই। ওর মতলবটা এখনও আমার বোঝা বাকি আছে।

ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম। তুমি আমাদের কাছেই এখন থাকো। তোমার চিকিৎসা এবং বিশ্রামও দরকার। যশবীরকেও ওয়াচ করা যাক। ডোন্ট ওরি।

আপা সব শুনল। দাবার খেলায় প্রতিপক্ষ যেন প্রত্যাশিত চালটা দিল না। এমন কূট চাল দিল যে আপা খেলাটা বুঝতে পারছে না।

সোমবার স্কুলে যেতেই বন্ধুরা ঘিরে ধরল, যশবীরের কী হল আপা? বলো তো আমরা গিয়ে ধোলাই দিয়ে আসি।

আপা গম্ভীর মুখে বলল, তার দরকার হবে না। যশবীর হার মেনে নিয়েছে।

বুবকা হতাশার গলায় বলল, যাঃ, তাহলে তো অ্যাডভেনচারটা মাটি হয়ে গেল। হার মানল কেন?

স্ট্র্যাটেজিক রিট্রিট হতে পারে। কিছু বোঝা যাচ্ছে না। যাই হোক, এখন আর তোমাদের কিছু করার নেই।

আরও তিন দিন বাদে বিমলাকে সঙ্গে নিয়ে তার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিল আপা। ফ্ল্যাটের ভিতরে একটু ধুলো পড়েছে আর সোঁদা গন্ধ জমেছে একটু। আর সব ঠিকই আছে।

আপা বিমলাকে ঘরদোর পরিষ্কার করতে সাহায্য করল। তারপর বলল, এখন তুমি স্বাধীন।

বিমলা আপার দিকে চিন্তিত মুখে চেয়ে বলল, আপা, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

কী বিশ্বাস হচ্ছে না?

যশবীর ঠিক এরকম নয়। এত মিক্‌লি ও আমাকে রেহাই দেবে সেরকম মানুষ কি যশবীর?

তোমার কি এখনও ভয় করছে?

না। আর ভয় করছে না। এখন একটু চিন্তা হচ্ছে।

৮২

দাড়ি আর গোঁফের কতগুলো অসুবিধের দিক আছে। দাড়ি নেমে বুক পর্যন্ত ঝুলে পড়তে চায়। গোঁফ ঢেকে ফেলে দুটো ঠোঁটকেই। শিখরা দাড়ি জাল দিয়ে বেঁধে রাখে, কিন্তু সেরকমটা করতে যাওয়ার হ্যাপা আছে। তার চেয়ে কি একটু ট্রিম করে নেওয়া বেশি সুবিধেজনক? গোঁফ নিয়েও কিছু অসুবিধে হচ্ছে হেমাঙ্গর। বিশেষ করে খাওয়ার সময়। চা খেতে গিয়ে সে প্রায় দেখছে, চায়ের কাপে ঠোঁট ছোঁয়ানোর আগেই তার গোঁফ গিয়ে চায়ে ডুব দিচ্ছে।

অনেক ভেবেচিন্তে সে এক শুক্রবার সকালে ম্যাগনিফায়িং আয়না, চিরুনি আর কাঁচি নিয়ে বসল দাড়ি-গোঁফকে ভদ্রস্থ করতে। কিন্তু ছাঁটতে গিয়ে দেখল, তার সেই কৃতবিদ্যতা নেই যা দিয়ে সুদক্ষ নাপিত গোঁফটোফ ছেটে একটা ব্যালান্স নিয়ে আসতে পারে। তার হাতে বানরের রুটি ভাগের মতো বাঁ দিকের গোঁফ ছোট তো ডান দিকেরটা বড় হয়ে যাচ্ছে। ফের ডান দিকেরটা ছোট তো বাঁ দিকটা বড় থেকে যাচ্ছে। ডেবিট ক্রেডিট সমান হচ্ছে না, ব্যালান্স-শিট মিলছে না।

মাঝপথে হাল ছেড়ে দিল হেমাঙ্গ। যা হয়েছে তাই থাক। যা হল তা অবশ্য নয়নসুখকর নয়। আঁচড়ানোর পর দেখা গেল, নাকের নিচে দুদিকে দুটো ছোটখাটো ঝাঁটা উঁচিয়ে রয়েছে। গোঁফের এই ছিরি নিয়েই তাকে আজ বিকেলের ফ্লাইটে দিল্লি যেতে হবে, অফিসের কাজে।

ফটিককে ডেকে বলল, গোঁফটা কেমন হল বলল তো ফটিকদা!

ফটিক খুব ভাল করে নিরীক্ষণ করার পর বলল, ভালই দেখাচ্ছে। মিলিটারিদের মতো।

তার মানে কি?

আজ্ঞে ভালই।

তুমি গোঁফের কিছু বোঝো?

ফটিক এক গাল হেসে বলল, আপনিই কি আগে বুঝতেন? আজকাল গোঁফদাড়ি রেখে মুখখানা সোঁদরবন বানিয়ে কি সুখ হচ্ছে তাও তো ভেবে পাই না। দিন না ও আপদ নিকেশ করে। কামিয়ে ফেলুন।

হেমাঙ্গ আঁতকে উঠে বলে, ও বাবা! কামাবো কি? গোঁফদাড়ি এখন আমার খুব দরকার।

সে দরকার হয় ফেরারিদের। খুনটুন করে যারা গা ঢাকা দেয়। আপনার ওসব কি দরকার? সুন্দর মুখখানার কি যে ছিরি করে রেখেছেন!

নাঃ, তুমি এর মর্ম বুঝবে না।

দিল্লি যাবে বলে আজ অফিসে যাওয়ার কথা নয় তার। কিন্তু ঘরে শুয়ে বসে সময় কাটাতেও তার আজকাল ভাল লাগে না। কোথাও যাওয়ারও নেই তেমন। এলোমেলো উদ্দেশ্যহীন খানিকক্ষণ ঘুরে আসা যায় মাত্র।

পোশাক পরে বেরোতে যাবে ঠিক এমন সময়ে চারুশীলার ফোন এল।

ওরে হেমাঙ্গ, এবার আমি পাগল হয়ে যাবো।

সে তো তুই আছিসই একটু। নতুন করে হওয়ার কিছু নেই।

শোন, পিন্টু সাইকেলের জন্য ভীষণ বায়না করছে। সামলাতে পারছি না। তুই নাকি ওকে সাইকেল কেনার টাকা দিয়েছিস?

সাইকেল! সাইকেলের জন্য বায়না করছে তো কিনে দে না, এর জন্য পাগল হওয়ার কি আছে?

তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? পিন্টু দু' চাকার সাইকেল চাইছে। বলছে এখন থেকে সাইকেলেই স্কুলে যাবে।

মাই গড!

তুই-ই ওকে লাই দিয়ে মাথায় তুলছিস। কেন যে টাকাটা ওকে দিতে গেলি। এখন এসে ভাগ্নেকে সামলা।

খুব জেদ ধরেছে নাকি?

ভীষণ।

ও তত জেদী ছেলে নয়। ঠাণ্ডা, শান্ত, বাধ্যের ছেলে।

কি জানি, কাকে দেখে যেন মাথায় ভূত চেপেছে। ওর এক ক্লাসমেট নাকি রোজ সাইকেলে স্কুলে যায়। তার মা-বাবারও বলিহারি বাবা, ওইটুকু দুধের শিশুকে সাইকেলে কলকাতার অসভ্য বাস মিনিবাস ট্যাক্সির মুখে ছেড়ে দিচ্ছে। একটু ভয় নেই! এখন তুই এসে যদি কিছু করতে পারিস।

পিন্টুকে খুবই ভালবাসে হেমাঙ্গ। আর একটু যখন ছোট ছিল তখন দেবশিশুর মত লাগত। এখনও সুন্দর, তবে লম্বা হয়েছে একটু। সামান্য এক পর্দা ফারাক হয়েছে। আজকাল আর কোলে চড়ে না, হামি দেয় না, বন্ধুবান্ধব আর খেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। পিন্টু এখনও তার ভীষণ প্রিয়।

চারুশীলার বাড়িতে হাজির হয়ে সোজা দোতলায় উঠে হেমাঙ্গ হাঁক মারল, কোথায় রে পিন্টু?

নিজের পড়ার ঘর থেকে পিন্টু বেরিয়ে দরজায় দাঁড়াল। মুখে সলজ্জ হাসি।

বায়না করেছিলি?

পিন্টু মুখ লুকিয়ে ফেলল। তারপর বলল, মা সবসময়ে এত ভয় পায় কেন বলো তো!

তোর মায়ের চেয়ে আমি বেশি ভয় পাই।

রাজ্যের অবাক বিস্ময় চোখে নিয়ে তার দিকে ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে পিন্টু বলল, তাহলে যে তুমি কিনতে বললে?

আমার দোষ কি জানিস? অর্ধেক কথা বলতে ভুলে যাই। আমি তোকে বলতে চেয়েছিলাম, সাইকেল কিনে নিস আঠারো বছর বয়স হলে। ওই আঠারো বছরটা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।

আঠারো বছর বয়স হলে কেন?

কারণ আছে। আঠারো বছরে লোকে অ্যাডাল্ট হয়।

পিন্টু একটু হাসল, সত্যি?

সত্যি।

তাহলে টাকাটা তুমি নিয়ে নাও, আঠারো বছর বয়স হলে দিও।

না না, কিছু দিয়ে ফেরত নিলে কালিঘাটের কুকুর হয়। এক কাজ কর, টাকাটা মাকে দিয়ে দে।

মা কিনে দেবে না কিন্তু।

মা কিনে দেবে না, জানি। কিন্তু তোর আঠারো বছর বয়স হলে আমিই ও টাকা তোর মার কাছ থেকে নিয়ে কিনে দেবো।

মা আমাকে খুব বকেছে।

সেইজন্যেই তো তোর মায়ের সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে এসেছি। আজ দারুণ ঝগড়া করব। ফাটাফাটি হয়ে যাবে। শুনবি নাকি ঝগড়াটা?

হি হি। তুমি তো হেরে যাও।

তোর মা আমার দিদি তো, বয়সে বড়, তাই মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে হেরে যাই। কিন্তু আজ দারুণ ফাইট দেবো। দেখবি?

পারবে? মাও খুব ভাল ঝগড়া করতে পারে।

রোজ করে নাকি?

সবাইকে বকে তো। সেটাই তো ঝগড়া, না?

হ্যাঁ, বটেই তো।

পিন্টুর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে ছেড়ে দিল হেমাঙ্গ। পিন্টু পড়তে গেল।

তার পর দেয়ালে মস্ত অয়েল পেন্টিংটার দিকে নজর পড়ল হেমাঙ্গর। এটা আগে ছিল না তো! কাছে গিয়ে দেখল, একটি গ্রাম্য বাড়ির উঠোনে নানা ধরনের গৃহকর্মে রত কয়েকজন মহিলার ছবি। সকালের রোদ, গাছের সবুজ, উঠোনের মেটে রং, ঘাগরা, চোলি সব আলাদা উজ্জ্বল রঙে দক্ষ হাতে আঁকা। সমস্ত ছবিটার মধ্যে একটা নৃত্যপর আনন্দের আভাস রয়েছে। দেখলেই মনটা ভাল হয়ে যায়। একটু ঝুঁকে ছবির নিচে ডান ধারে শিল্পীর স্বাক্ষর দেখে বিস্ময়ে ভ্রূ উঁচু হল তার। হুসেনের ছবি! এর তো অনেক দাম। পাওয়াও কঠিন। হুসেনের ছবি তো আঁকার আগেই আগাম বিক্রি হয়ে যায়। এ বাড়িতে ছবির সমঝদারই বা কে আছে?

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আপন মনেই বলল, হুঁ।

একটি ওরিজিন্যাল হুসেনের দাম নিশ্চয়ই লক্ষাধিক টাকা। বা তারও অনেক বেশি। হয়তো ডবল। কোনও কালেক্টরের কাছ থেকে কিনতে গেলে আরও বিচ্ছিরি রকমের বেশি।

খুঁজতে খুঁজতে চারুশীলাকে এই বিচিত্র বাড়ির আড়াইতলার একটা চাতালে পাওয়া গেল। একখানা চৌকো, প্রায় প্যানোরামিক জানলার চওড়া সিল-এর ওপর বসবার গদি পাতা। মুখোমুখি বসে খুব হাসাহাসি করছে চারুশীলা আর অন্য একটা মেয়ে।

এই যে! কখন এলি?

হেমাঙ্গ ভ্রূ কুঁচকে বলল, গত আধঘণ্টা ধরে এই ভুলভুলাইয়াতে তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

মিথ্যুক! আমি জানালার ধারে বসে রাস্তার দিকে লক্ষ রাখছি। তোর গাড়ি এলে দেখতে পেতাম।

গাড়ি আসেনি। তবে আমি যে এসেছি সেটা তো মিথ্যে নয়! পিন্টুর সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিলাম।

কি হল শুনি!

ও টাকাটা তোর কাছে জমা দেবে। আঠারো বছর বয়স হলে সাইকেল কিনবে। আমাকে কথা দিয়েছে।

বাঁচলাম বাবা। যা সমস্যায় ফেলেছিল।

না, এখনও বাঁচিসনি। তোর আরও একটা ফাঁড়া আছে।

কিসের ফাঁড়া? বলে অকৃত্রিম বিস্ময়ে চাইল চারুশীলা।

হলঘরের ছবিটা কে কিনেছে?

কেন, আমি!

তুই!

কেন, আমি কিনতে পারি না?

তুই শকুনের ডিমও কিনতে পারিস, কিছু অবিশ্বাসের নেই। কিন্তু ছবির তুই কী বুঝিস?

ইস, ছবি যেন তুই বড় বুঝিস!

হয়তো আমিও বুঝি না। কিন্তু আমার মক্কেলরা তাদের ব্ল্যাকমানি দিয়ে আজকাল ছবি কিনে রাখছে। সেটাও ব্যবসা। আর্ট না বুঝলেও ছবির কমার্সটা আমি জানি। তোর কি ব্ল্যাকমানি প্রবলেম? টাকাটা লগ্নি করে রাখলি?

কী পাজি আর জংলি তুই! আমি বুঝি তোর পেটমোটা, লোভী, জোচ্চোর মক্কেলদের মতো? ওরকম আনকালচার্ড, নভিস, আনএডুকেটেড?

তুই যে ছবির ছ-ও বুঝিস তা তো জানতাম না। জীবনে একটাও এগজিবিশনে যেতে দেখিনি, ছবি নিয়ে কোনওদিন একটাও কথা বলিসনি। কবে সমঝদার হলি বল তো!

আমার বাড়িতে কত আর্টের বই আছে জানিস!

জানি। তুই সেগুলোর পৃষ্ঠাও উল্টে দেখিস না কখনও। বইগুলো সুব্রতদার। ভদ্রলোক আর্কিটেক্ট, তাকে আর্টের খোঁজখবরও রাখতে হয়। কিন্তু তুই! তোর কবে থেকে আর্টের নেশা হল? নাকি স্ট্যাটাস সিম্বল। আজকাল ঘরে পেইন্টিং ঝোলানো অবশ্য একটা ফ্যাশান হয়েছে।

চারুশীলা রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেলল, একটা পেইন্টিং কিনেছি বলে কেমন হিংসেয় জ্বলে যাচ্ছে দেখ। তুই যে গুচ্ছের আজেবাজে জিনিস কিনে ঘরে জঙ্গল বানাচ্ছিস!

হেমাঙ্গ ব্যথিত হয়ে বলল, আজকাল কিনি না। আমার বৈরাগ্য আসছে। কিন্তু তুই সত্যিই পয়সা খরচ করে হুসেনের ছবি কিনেছিস এটা ভাবা যাচ্ছে না। ওটার অনেক দাম।

ভাল জিনিসের দাম একটু হবেই।

হেমাঙ্গ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সত্যিই আজকাল আমি তোকে আর বুঝতে পারছি না। তুই রহস্যময়ী হয়ে যাচ্ছিস।

যে মেয়েটা চারুশীলার মুখোমুখি বসে আছে সে হাঁটুর ভাঁজে মুখ লুকিয়ে একটু হাসছে। মুখটা চেনা। ঠিক চিনতে পারছিল না হেমাঙ্গ। সে বেশি তাকায়ওনি। মেয়েদের দিকে সে কমই তাকায়।

চারুশীলা মেয়েটার দিকে চেয়ে বলল, শুনলি তুই ওর কথা? আমি নাকি আর্ট বুঝি না, ছবি কেনা নাকি আমার ইনভেস্টমেন্ট! অ্যাকাউন্ট্যান্সি করে করে আর বদ লোকদের চুরির কাজে হেলপ করে করে ওর মনটাই হয়ে গেছে পিশাচের মতো। সবাইকেই সন্দেহ করে।

মেয়েটা মুখ তুলল না।

চারুশীলা নেমে পড়ল সিল থেকে। অগোছালো চুল খোঁপায় বাঁধতে বাঁধতে বলল, তোর চেহারাটা দিন দিন ট্রাফিক পুলিশের মতো হয়ে যাচ্ছে কেন রে? ইস, কি বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে! একটুও ভদ্রলোকের মতো নয়।

ওটা দৃষ্টিভঙ্গির তফাত। পৌরুষ জিনিসটা তুই তো বুঝিস না।

পৌরুষ বুঝি আজকাল দাড়ি-গোঁফে গিয়ে ঢুকেছে?

হেমাঙ্গ সামান্য অনুতপ্ত গলায় বলে, গোঁফটা আজ ছাঁটতে গিয়ে ডেবিট ক্রেডিট ঠিক মিলল না।

তাই বল! গোঁফ ছেঁটেছিস! তাই কেমন পাগলা মেহের আলি বলে মনে হচ্ছে।

মেহের আলি কে?

চারুশীলা হঠাৎ নাটুকে গলায় হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল, তফাত যাও! তফাত যাও! সব ঝুট হায়!

ওঃ! ক্ষুধিত পাষাণ!

যাক। আমি ভেবেছিলাম এটাও বুঝি ধরতে পারবি না। তোর পড়াশুনো এত কম। ঝুমকির সামনে কী লজ্জায় পড়তে হত তাহলে!

ঝুমকি! বলে অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল হেমাঙ্গ। তারপর বলল, ইনি কোন ঝুমকি?

ওমা, আমার কাছে আবার আর কোন ঝুমকি আসবে? তোর মাথাটাই গেছে দেখছি। নাকি চোখের দোষ!

ঝুমকি মুখ তুলে হাসি মুখে বলল, উনি সেদিন মিস্টার বিশ্বাসের বাড়িতেও আমাকে প্রথমে চিনতে পারেননি।

হেমাঙ্গ লজ্জা পেয়ে বলল, তা নয়। আপনার চেহারা পাল্টে যাচ্ছে।

তাই নাকি? কই আমি তো বুঝতে পারি না।

একটা শ্বাস ফেলে হেমাঙ্গ বলল, হয়তো কসমেটিক সার্জারি কিংবা যোগ, কিংবা আর কিছু করেছেন আপনি।

ঝুমকি এত হাসল যে ফের মুখ চাপা দিতে হল তাকে।

চারুশীলা তার মাথায় একটা গাট্টা মেরে বলল, বুদ্ধ আর কাকে বলে!

হেমাঙ্গ সত্যিই একটু অবাক হয়েছে। এ মেয়েটা যে ঝুমকিই তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু ওর চেহারায় যে একটা পরিবর্তন হয়েছে সেটাও মিথ্যে নয়। কিন্তু পরিবর্তনটা কিরকম তা সে ধরতে পারছে না।

চারুশীলা বলল, ঝুমকি, হয়তো এ বোকাটা খুব একটা ভুলও বলেনি। হিসেবী চোখ তো। তোর চেহারা যে একটু ভাল হয়েছে সেটা ওর চোখ দিয়েই পরীক্ষা হয়ে গেল। চার কেজি ওজন বাড়া সার্থক হল।

ওজন! বলে হেমাঙ্গ একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। কিন্তু মুখে আর কোনও কথা এল না। ঠিকই, কৃষ্ণজীবনের বাড়িতেও মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার এবং প্রথম দর্শনে সে কয়েক পলক চিনতে পারেনি একে। মেয়েটা একটু ঠেস দিয়ে কি এক-আধটা কথা বলেছিল তাকে। আর ঘুরে ঘুরে তাকে দূর থেকে লক্ষ করেছিল।

দোতলার হলঘরে এসে বসল তারা। কফি এল। হেমাঙ্গর অবাধ্য চোখ বারবার ঝুমকির মুখের ওপর এবং চারদিকে ওড়াউড়ি করছিল। মাত্র চার কেজি মাংস বা চর্বি বাড়লে এতটা পাল্টে যায় মানুষ। ডেবিট ক্রেডিট আজ কিছুতেই সমান হতে চাইছে না। হিসেবের গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। ব্যালান্স শিট মিলছে না।

একটু আনমনা ছিল হেমাঙ্গ, চারুশীলা হঠাৎ বলল, তুই ঝুমকিকে অত লজ্জা পাচ্ছিস কেন বল তো!

হেমাঙ্গ অবাক হয়ে বলে, লজ্জা! লজ্জার কী আছে?

লজ্জার অবশ্য তোর একটা কারণ আছে। তুই ঝুমকিকে একটা চাকরি করে দিতে পারিসনি।

হেমাঙ্গ বিব্রত হয়ে বলল, উনি তো মোটে একবারই আমাকে অ্যাপ্রোচ করেছিলেন, তারপর আর কখনও বলেননি। আমি ধরে নিয়েছিলাম হয় উনি চাকরি পেয়ে গেছেন, নয়তো দরকার নেই।

ঝুমকি নিজের যোগ্যতাতেই একটা চাকরি পেয়ে গেছে। সামনের মাসে জয়েন করবে। খুব ভাল চাকরি অবশ্য নয়। মাইনে খুব কম। তবে পরে বাড়াবে।

হেমাঙ্গ ঝুমকির দিকে একঝলক চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কফির কাপে মুখ দিতে দিতে বলল, ভালই তো। তবে আজকাল চাকরির বকলমে নানারকম এক্সপ্লয়টেশন হয়। সেটা সম্পর্কে একটু কেয়ারফুল থাকবেন।

ঝুমকি বলল, কিরকম এক্সপ্লয়টেশন?

এক্সপ্লয়টেশনের ভ্যারাইটি এবং ম্যাগ্নিচুড এত বেশি যে স্পেসিফাই করা মুশকিল। কখনও সূক্ষ্ম, কখনও স্থূল।

চারুশীলা একটা ধমক দিল, ওর কথা শুনিস না তো ঝুমকি! নিজে একটা চাকরি দিতে পারেনি, এখন জ্যাঠামশাইয়ের মতো উপদেশ দিতে লেগেছে।

হেমাঙ্গ একটু দম নিয়ে বলল, সেটা ওঁর ইচ্ছে। তবে তুই এত সুখের মধ্যে থেকে তো ওয়ার্কিং গার্লদের সমস্যা বুঝতে পারবি না। গোলাপি চশমা দিয়ে দুনিয়া দেখছিস।

আমার বর যদি আমাকে সুখে রেখে থাকে তাতে তোর হিংসে হয় কেন রে? বেশ করব গোলাপি চশমা দিয়ে দুনিয়া দেখব।

যত খুশি দেখ, কিন্তু ওঁকে গোলাপি চশমাটা পরানোর চেষ্টা না করাই ভাল।

ঝুমকি এবার মৃদুস্বরে বলল, হেমাঙ্গবাবু ঠিকই বলেছেন মাসি। দেয়ার আর প্রবলেমস্। তবে আমি এত ভয় পাই না। আমাকে সহজে এক্সপ্লয়েট করা যাবে না।

হেমাঙ্গ জানে, সব মেয়েই এরকম ভাবে। কিন্তু চারদিকে এত সূক্ষ্ম জাল আর ফাঁদ থাকে যে, শেষ অবধি সামাল দিতে পারে না। কিন্তু সে আর এ নিয়ে কথা বলল না। চুপ করে রইল।

চারুশীলা কোনও মুডই বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে না। হঠাৎ বলল, এই, তুই অমন গোমড়া মুখ করে আছিস কেন রে? দু' চক্ষে গোমড়া মুখ দেখতে পারি না। আজ মাছের রোস্ট হচ্ছে, একটু খেয়ে যা।

আমার খিদে নেই।

ডায়েটিং করছিস নাকি? চেহারা তো হাড়গিলের মতো হচ্ছে।

চেহারা! চেহারা নিয়ে তারাই ভাবতে পারে যাদের হাতে অঢেল সময় আছে। আমাদের ফালতু সময় নেই।

জানা আছে। বেশি বকিস না। যখন সুন্দরবনে গিয়ে বিরহী যক্ষের মতো বসে থাকতি তখন সময় হয়েছিল কি করে?

সেটা অন্য ব্যাপার।

কাওয়ার্ড কোথাকার! সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেললি। এখন দাড়ি রেখে দেবদাস সাজছে।

হেমাঙ্গ হেসে ফেলল। বলল, দেবদাস দাড়ি রাখত নাকি?

তা কে জানে! তোর ওপর এত রাগ হয় আমার!

সন্ধে সাতটার দিল্লি ফ্লাইটে প্লেনের আইল সিটে বসে হেমাঙ্গ খুব আনমনে এক কাপ কফি খেল। খাবারটা নিলই না। কেন কে জানে আজ নিজেকে সে ঠিক বুঝতে পারছে না। যেন একই শরীরে দু'জন বসে আছে। চেনা হেমাঙ্গ আর অচেনা হেমাঙ্গ।

দিল্লিতে নেমে ট্যাক্সি নিয়ে পাঁচতারা ঝলমলে হোটেলে পৌঁছনো, পাঁচতলায় ওঠা, ঘরে ঢোকা, জামাকাপড় পাল্টানো, ক্লায়েন্টকে ফোন করে পৌঁছ-সংবাদ দেওয়া সবই যেন ঘটছিল একটা ঘোরের মধ্যে। এই হোটেলের ভাড়া, ডিনার-লাঞ্চ-ব্রেকফাস্টের পয়সা সবই দেবে তার ক্লায়েন্ট। তবু ডিনারটা সে খেল না। ফ্রিজ থেকে একটা কোল্ড ড্রিংক বের করে খুব আস্তে আস্তে খানিকটা খেল। তারপর বাতি নিবিয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকল সে।

মনটা বিষণ্ণ।

কখন ঘুমিয়ে পড়ল, টেরও পেল না সে।

রবিবার সকালের ফ্লাইটে তার ফেরার কথা ছিল। কিন্তু সে ফিরে এল শনিবার রাতেই। তার মনের মধ্যে একটা ভীষণ তাড়াহুড়ো, একটা তীব্র অস্থিরতা। যেন সময় বয়ে যাচ্ছে, যেন এখনই কী একটা কাজ তাকে সেরে ফেলতে হবে।

রবিবার ভোর রাতে উঠে সামান্য জিনিসপত্র গুছিয়েই সে বেরিয়ে পড়ল। ক্যানিং, নদী, নৌকো, তার পরই তার নদীর ধারের ঘরখানা। আঃ, কী আনন্দ! কী স্বস্তি!

বাসন্তী যেন হাওয়ার মুখে খবর পেয়ে ছুটে এল, ওমাঃ তুমি এসে গেছ? এবার কতদিন পর এলে বলো তো! আমি তো ফি শনিবার ভাবি, আজ আসবেই আসবে।

হেমাঙ্গ অকপট হেসে বলল, ভাবিস?

ভাবব না? ও কি, দাঁড়াও দাঁড়াও, হুট করে বিছানায় উঠো না। ঘরদোর পরিষ্কার করি, বিছানা ঝেড়ে দিই, কাচা চাদর পাতি, তবে না! যাও, হাতমুখ ধুয়ে এসো ভাল করে।

আজ কী খাবো রে? বাজার তো নেই।

সে তোমাকে ভাবতে হবে না। দশটা টাকা দাও সব নিয়ে এসে রান্না করে দিই। ততক্ষণ জিরোও।

হেমাঙ্গ মাথা নেড়ে বলল, জিরোবো না। নৌকো করে একটু ঘুরে আসি। উঃ, কী যে ভাল লাগছে এসে!

হেমাঙ্গ বেরিয়ে পড়ল। বিশাল নদী, বিশাল আকাশ, বিশাল ব্যাপ্ত চরাচর যেন কোল পেতে আছে তার জন্য। বাতাস এসে সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, খেলা করছে এলোমেলো চুলে, দাড়িতে।

নৌকো করে অনেক দূর গেল হেমাঙ্গ। রূপমুগ্ধ দুটি চোখ দিয়ে পৃথিবীকে পান করতে লাগল। ভিতরে কী তেষ্টাটাই না জমে ছিল তার!

যখন দুপুরে স্নান করে খেতে বসেছে তখন বাঁকা মিঞা এল।

আবার এলেন! এবার বেশ দেরি করে এলেন। আমি তো ভাবলাম শখ মিটে গেছে।

হেমাঙ্গ হাসল। বলল, না, শখ আরও বেড়েছে। আবার ঘন ঘন দেখতে পাবে আমাকে।

বিয়েটিয়ে কি শিকেয় তুলে রাখলেন?

হেমাঙ্গ ফিচেল হাসি হেসে বলল, ভাবছি এদিককারই কোনও গাঁয়ের মেয়েকে বিয়ে করব। এখানেই থাকব। তুমি বরং পাত্রী খোঁজ করতে লেগে যাও।

বাঁকা মিঞার বাক্য হরে গেল। তারপর খুব হাসতে লাগল সে।

৮৩

বামাচরণকে প্রথমটায় চিনতেই পারেনি বিষ্ণুপদ। দু'গালে বিজবিজ করছে কাঁচা-পাকা দাড়ি, চুলও লম্বা হয়ে জট পাকানোর জোগাড়, চোখ ঘোলাটে। বেশ রোগাও হয়ে গেছে। চিনতে কষ্ট হল খুব। বামা প্রণাম করে দাঁড়ানোর কয়েক লহমা পর বিষ্ণুপদ বলল, আয়, বোস।

বাম। শানের ওপরেই বসে পড়ল। বিষ্ণুপদ লক্ষ করল, বামার জামাকাপড়ের অবস্থাও ভাল নয়। ময়লা হাকুচ একটা হাওয়াই শার্ট আর তেলচিটে একটা প্যান্ট। এত ময়লা যে রঙ বোঝা যায় না। চটিজোড়াও লক্ষ করল বিষ্ণুপদ। সিঁড়িতে ছেড়ে রাখা একজোড়া হাওয়াই। তলা ক্ষয়ে গেছে। বামার ছেলেপুলে নেই। পিওন বা আর্দালিগোছের চাকরি করলেও সরকারি পাকা চাকরি। তার এমন দুরবস্থা হওয়ার কথা নয়।

কি খবর রে?

এই এলাম। গলায় যেন জোর নেই বামার।

কোথায় আছিস এখন?

শ্বশুরবাড়িতেই ছিলাম এতদিন। এখন একটা ঘর ভাড়া করতে হয়েছে। শ্বশুরবাড়িতে খুব অশান্তি হচ্ছিল।

কিসের অশান্তি?

সম্বন্ধী আর তার বউ অশান্তি করছে। থাকতে দিচ্ছে না।

একটা শ্বাস ফেলে বিষ্ণুপদ বলল, তা কষ্ট করে থাকার দরকারটা কি? তোর ঘর তো ফাঁকা পড়েই আছে এখানে। তোর মায়েরও ইচ্ছে।

কিন্তু শ্যামলী চাইছে না। কী করব বলুন তো!

বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বল। বউমার এখানে অসুবিধে কি?

এখানে আসতে চায় না। বলছে তার ভাগের সম্পত্তি বাবদ যা টাকা পাওনা হয় তা দিয়ে দিতে। সেই জন্যই আসা।

বিষ্ণুপদ একটু চুপ করে থেকে বলে, টাকা! টাকাটা দেবে কে? তোর ভাগের অংশটা যদি কেউ কেনে তবে হয়তো হয়। কিন্তু সে তো অবাস্তব কথা। এ হল দখলের জমি, সেই পার্টিশনের পর কিছু মাতব্বর মুরুব্বি এসব জায়গায় আমাদের বসিয়ে দেয়। দলিলপত্রের কারবার ছিল না। এখানকার বসতবাড়ির ভাগ কিনবেই বা কে!

রামজীবনকে বলুন, সে কিনে নিক।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলল, তোরা কি রামজীবনের অবস্থা জানিস না নাকি? সে টাকা কোথায় পাবে? কিনবেই বা কেন? ওসব বুদ্ধি করে লাভ নেই। এখানে বসবাস করতে পারিস, সেটাই সোজা।

বামাচরণ মাথা নেড়ে বলল, আমি কিছু জানি না। আমার টাকার দরকার।

বামাচরণের গলার আওয়াজটা হঠাৎ যেন একটু কেমন-কেমন ঠেকল বিষ্ণুপদর। বামাচরণ যেন আগের মতো নেই। অন্যরকম হয়ে গেছে। সেটা ভাল মনে হচ্ছে না তার।

বিষ্ণুপদ বলল, টাকার দরকার কার নয়? কিন্তু ব্যবস্থা কি করে হবে তাই ভাবছি। তুই বরং আজকের দিনটা থেকে যা। রামজীবনের সঙ্গে কথা বলে দেখ।

বামা একটু রুক্ষ গলায় বলে, ওর সঙ্গে কথা বলতে যাবো কিসের জন্য? আমি ওসব পারব না বাবা। ব্যবস্থা যা করার আপনিই করে দিন।

বিষ্ণুপদ অবাক হয়ে বলে, আমি! আমার টাকা কোথায় দেখলি তুই? আমি টাকা দেবো কোত্থেকে?

বামাচরণ যে তা জানে না তা নয়। খুব ভাল করেই জানে। তবু কেমন অসহিষ্ণু গলায় বলল, তা আমি জানি না।

গতিকটা ভাল ঠেকছে না বিষ্ণুপদর। নয়নতারা বাড়িতে থাকলে একটু সুবিধে হত বিষ্ণুপদর। কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার, লক্ষ্মীর জন্য বাতাসা আনতে দোকানে গেছে। একবার বেরোলে নয়নতারা চট করে ফেরে না, পাঁচ বাড়ি ঘুরে গল্পসল্প করে আসে।

বিষ্ণুপদ গলাখাঁকারি দিয়ে অস্বস্তিটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে বলল, ঠাণ্ডা হয়ে বোস। তোর মা একটু বেরিয়েছে, আসুক।

বামাচরণ বসে বসে অন্য দিকে চেয়ে হঠাৎ বিড়বিড় করতে লাগল আপনমনে। এরকম আগে দেখেনি ওকে বিষ্ণুপদ। আগে তো এসব ছিল না! কী বিড়বিড় করছে তা শোনার জন্য বিষ্ণুপদ একটু ঝুঁকল। তার কানটা গেছে। ইদানীং কানে একটু যেন কম শুনতে পায়। তবু দু'-চারটে কথা কানে এল তার। বামাচরণ বলছে, চালাকি হচ্ছে? অ্যাঁ! চালাকি হচ্ছে? বাপের নাম ভুলিয়ে দেবো...শুয়োরের বাচ্চা...

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিষ্ণুপদ ফের সোজা হয়ে বসল। নিজের ওপর কি বামার বশ নেই? লক্ষণ তো ভাল নয়!

এ কথা ঠিক যে সব মানুষেরই ভিতরে নানা উল্টোপাল্টা কথা প্রায় সব সময়েই ভুরভুরি কাটে। সব মানুষই ভিতরে ভিতরে অল্পবিস্তর পাগল। পাগল ভিতরটাকে চেপে ঢেকে রেখেই মানুষকে চলতে হয়। যখন মানুষ নিজের ওপর বশ হারিয়ে ফেলে তখন বিড়বিড় করে, একা একা কথা কয়। বামার হলটা কী?

বিষ্ণুপদ সস্নেহে ডাকল, বামা!

বামাচরণের বিড়বিড় থামল। স্বাভাবিক গলায় বলল, কি বলছেন?

তিন-চার মাস কোনও খবর দিলি না। কেমন ছিলিটিলি সব খুলে বলবি তো!

বামাচরণ তিক্ত গলায় বলল, আমার খবর জেনে আপনাদের কী হবে? আমি যে আপনার ছেলে সেটাই তো আপনারা স্বীকার করেন না। মেরে-ধরে বাড়ির বার করে দিলেন। এখন আর খবর জেনে কী হবে? দাদাকেও এইভাবে তাড়িয়েছিলেন। তাতে দাদার কাঁচকলা হল। সে এখন সাততলায় থাকে, মোটা মাইনে পায়, এরোপ্লেনে ঘোরে।

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কৃষ্ণকে বড় অপমান করা হয়েছিল, সে ঠিক কথা। অপমান যারা করেছিল তার মধ্যে তো তুইও ছিলি বাবা। ভুলে গেছিস সব? তোদের ঠাণ্ডা করতে আমি তোদের হাতে-পায়ে অবধি ধরেছিলাম।

বামাচরণ চট করে কথা পাল্টে ফেলে বলল, ওসব পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে কী হবে? ওসব ছাড়ুন। আমাকে যখন তাড়িয়েই দিয়েছেন তখন আমার ন্যায্য পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিন। আর জীবনে কখনও আপনাদের মুখদর্শন করব না।

বিষ্ণুপদ মৃদুস্বরে বলল, তোকে কেউ তাড়ায়নি। তুই নিজে থেকেই গেছিস। ঝগড়াঝাঁটি সব সংসারেই আছে। অত গায়ে মাখতে নেই।

ওসব উপদেশ দিয়ে লাভ হবে না বাবা। আমি ভাগের টাকা চাই। হিসেব করে দেখেছি আমার যা ভাগ আছে তাতে আমার ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা পাওনা হয়।

কত বললি?

ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার। কম করেই ধরেছি। টাকাটা ফেলে দিন, আর আসব না।

বিষ্ণুপদ অসহায়ভাবে মাথা নেড়ে বলে, এ সম্পত্তির কত দাম তার কোনও আন্দাজই নেই আমার। হিসেব শুনে কী হবে? তবে টাকাটা অনেক টাকা বটে।

বামাচরণ একটু রুখে উঠে বলে, আপনার কি ধারণা আমি বেশি চাইছি?

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, না রে, আমার কোনও ধারণাই নেই। বলোম তো। একটা কথা শুনবি আমার?

বলে ফেলুন।

বউমাকে একবার নিয়ে আয়। তাকে একটু বুঝিয়ে বলি।

সে আসবে না। এ বাড়ির ছায়াও মাড়াবে না। তাকে কী বোঝাতে চান আপনি? বুঝিয়ে-টুঝিয়ে কিছু হবে না। টাকা দিয়ে দিন, আমাদের সঙ্গে আর সম্পর্ক থাকবে না।

বিষ্ণুপদ মৃদু স্বরে বলল, বামাচরণ, সম্পর্ক ছাড়া আর কিসের জোরে তা হলে সম্পত্তির ভাগ চাইছিস?

তার মানে?

বিষ্ণুপদ একটু ম্লান হেসে বলল, ছেলে তার বাপের সম্পত্তি পায় কিসের জোরে? বাপ-ছেলে সম্পর্কের জোরেই তো! তা হলে সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক থাকবে না বলে জোরগলায় বলতে আছে? সম্পর্কই যদি নেই তা হলে উত্তরাধিকার বর্তায় কিসের জোরে?

বাজে কথা রেখে দিন, ওসব শুনে আমার লাভ নেই।

একটু ঠাণ্ডা হ বাবা, বড্ড মাথা গরম করে এসেছিস আজ। একটু বিবেচনা করে দেখ। আমাদের অবস্থা তো জানিস, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তুই যে টাকার কথা বলছিস আমি একসঙ্গে অত টাকা জীবনেও দেখিনি।

তা হলে বাড়িটা বেচে দিন। তারপর টাকা ভাগ করে দিন সকলকে।

বাড়ি বেচলে আমরা যাবো কোথায়?

তার আমি কি জানি?

বিষ্ণুপদ স্তব্ধ হয়ে গেল। বামাচরণ কি পাগল হয়ে গেল নাকি? স্তব্ধ হয়ে সে দেখল, বামাচরণ ফের লেবুগাছের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে যাচ্ছে একনাগাড়ে। ভাল কথা বলছে না। ভিতর থেকে নানা রাগ, ক্ষোভ, অভিমান দূষিত কথা হয়ে বেরিয়ে আসছে।

পড়ন্ত দুপুর। রাঙা ঘুম ভেঙে উঠে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে এদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল একটু। বামাচরণকে দেখে অবাক হয়েছে। তারপর পুকুরের দিকে চলে গেল। বামা অবশ্য ভ্রূক্ষেপ করল না। শুধু বিড়বিড় করে যেতে লাগল।

নয়নতারা ফিরল যেন এক যুগ পরে। এক হাতে বাতাসার ঠোঙা, অন্য হাতে আম্রপল্লব, আরও কি যেন।

বিষ্ণুপদ একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল, এলে? বামা এসে কতক্ষণ বসে আছে দেখ।

বামা! বলে এক গাল হাসল নয়নতারা, বামা এলি? এতদিন পর মনে পড়ল বাবা? এমন ভুলে থাকতে পারিস কি করে? কাল রাতেও তো তোকে স্বপ্ন দেখলাম।

বামা উঠে মাকে তাড়াতাড়ি প্রণাম করল। একটু কাণ্ডজ্ঞান যেন এখনও আছে বামাচরণের। বলল, তোমাকে দেখতেই এলাম।

বউমাকে আনিসনি? সে এল না কেন?

তার সময় হয় না।

রাগ করে আছে নাকি এখনও?

বামাচরণকে এই প্রথম হাসতে দেখল বিষ্ণুপদ। হেসে বলল, তা রাগ তো হতেই পারে।

বোস বাবা, বোস। আমি সব রেখে আসি। চা খাবি তো!

বেলাবেলি রওনা হতে হবে। পথ তো কম নয়।

বোস একটু। ভাল করে মুখখানা দেখি।

নয়নতারা ঘরে গিয়ে জিনিসপত্র রেখে বেরিয়ে এসে আঁচলে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, চেহারাটা এমন খারাপ করলি কি করে? এ তো দেখছি ভীষণ শরীর ভেঙে গেছে।

বামাচরণ একটা শ্বাস ফেলে বলে, শরীর ভাল যাচ্ছে না। পেটে অম্বলের ব্যথা হয় খুব।

ইস্! অম্বল বড় খারাপ অসুখ। ওষুধ খাস।

বামাচরণ ভাল মানুষের মতো মাথা নেড়ে বলল, খাবো। আমাকে চাট্টি শুকনো মুড়ি দাও তো মা, পেটে কড়ার নিচে ব্যথা হচ্ছে। এই ব্যথাটাই আমাকে মেরে ফেলবে।

বালাই ষাট। আজকাল কত ওষুধ বেরিয়ে গেছে। কত ভাল ভাল ডাক্তার। বলে নয়নতারা ঘরে গিয়ে এক বাটি মুড়ি এনে দিল। বলল, একটু দুধ দিয়ে মেখে খাবি? ভাল দুধ আছে।

না মা। বলে মুড়ি চিবোতে থাকে বামাচরণ।

তা হলে শো কেটে দেবো?

বামাচরণ এ কথাটার জবাব না দিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, আচ্ছা, বাগানের ওপাশে কুয়োর ধারে অত ইট কেন বলো তো! ইঁট দিয়ে কী হবে?

বিষ্ণুপদ সতর্ক চোখে একবার নয়নতারার দিকে চাইল। কিন্তু নয়নতারার চোখ ছেলের দিকে। একগাল হেসে বলল, শুনিসনি বুঝি! কৃষ্ণ যে আমাদের ঘরখানা পাকা করে দিচ্ছে। ইঁট সিমেন্ট বালি সব এসে গেছে।

আর দু'-তিন দিনের মধ্যে ভাঙা শুরু হবে।

বামাচরণ হাঁ করে মায়ের দিকে চেয়ে থেকে বেশ একটু বাদে বলল, কে পাকা করে দিচ্ছে?

কৃষ্ণ রে। আর কে দেবে?

বলো কি? এ খবর তো বাবা আমাকে বলেনি!

বিষ্ণুপদ একটা শ্বাস ফেলে বলল, ফুরসত দিলি কই?

বামাচরণ খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলল, পাকা ঘর মানে কি ছাদও ঢালাই হবে?

বিষ্ণুপদ কিছু বলার আগেই নয়নতারা বলে ফেলল, ও মা! ছাদ ঢালাই কী রে? মস্ত দোতলা হবে যে! তিনতলায় ঠাকুরঘর হবে, ছাদ থাকবে।

ওঃ। বলে বামাচরণ কেমন যেন হয়ে গেল। উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ! মুড়ির বাটিটা হঠাৎ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, তাও বাবা বলছে যে টাকা নেই? মিথ্যেবাদী কোথাকার! দালান হাঁকড়াচ্ছো, আর আমার ক'টা টাকা ফেলে দিতে হাত কুঁকড়ে যাচ্ছে!

নয়নতারা অবাক হয়ে বলে, কিসের টাকা? কে তোর টাকা নিয়েছে?

বিষ্ণুপদ তাড়াতাড়ি বলল, বামা আজ এ বাড়ির ভাগ বাবদ টাকা চাইতে এসেছে।

নয়নতারা অবাক হয়ে বলে, ভাগ বাবদ টাকা! সেটা আবার কী?

ও তুমি বুঝবে না।

বামাচরণ গলা তুলে বলল, বেশ আছ তোমরা! পায়ের ওপর পা তুলে দোতলা বাড়িতে থাকবে। আর আমার ব্যবস্থা কী হবে? আমার কথা একবারও ভাবলে না?

নয়নতারা বলল, তোর কথা কী ভাবব? তুই কি ভাবনার তোয়াক্কা করিস?

বামাচরণ ক্ষিপ্তের মতো লাফিয়ে উঠে বলল, তোমাদের সব ষড়যন্ত্র এখন বুঝতে পারছি। দাদার সঙ্গে আর রামজীবনের সঙ্গে ঘোঁট পাকিয়ে আমাকে তাড়িয়েছ যাতে বেশ ফাঁদিয়ে বড় বাড়ি তুলতে পারো! সব মতলব আমি বুঝতে পারছি। কী ভেবেছ তোমরা, আমাকে বঞ্চিত করে নিজেরা সব ভোগদখল করবে? আমি আজই উকিলের কাছে গিয়ে ইনজাংশন বের করব।

বিষ্ণুপদ বলল, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কর বাবা। একটু ঠাণ্ডা হয়ে বোস। ওরকম লাফালাফি করিস না। যা ভাবছিস তা নয়।

বামাচরণ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, আমি কিছু শুনতে চাই না। আমার টাকা দিয়ে দিন। আপনারা তিনতলা বাড়িতে থাকুন, আমি অন্য জায়গায় আমার ঘর তুলে নেবো। দিন টাকা।

কেন যে টাকা-টাকা করছিস! টাকা-পয়সা আমাদের কাছে থাকে না। কৃষ্ণ ঠিকাদার দিয়ে কাজ করিয়ে দিচ্ছে। ঠিকাদারের সঙ্গে তার বন্দোবস্ত। এর মধ্যে আমরা নেই।

মিথ্যে কথা বলছেন। আপনাদের আমি খুব চিনি। বদমাইসের ধাড়ি আপনারা। টাকা না দিলে বাড়ি আমি কিছুতেই করতে দেবো না।

কোথাও কিছু নয়, হঠাৎ শান্ত নয়নতারা রুখে উঠে বলল, এই মুখপোড়া, চেঁচাচ্ছিস যে বড়, তোর লজ্জা হয় না?

লজ্জা! কিসের লজা?

তোর যদি মনুষ্যত্ব থাকত তা হলে চেঁচামেচি করে মা-বাপের সঙ্গে বীরত্ব না দেখিয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকতি। কৃষ্ণ আমার আর একটা ছেলে, তোরই ভাই, নিজের টাকা দিয়ে দুঃখী মা-বাবার জন্য বাড়ি করে দিচ্ছে। আর তুইও আমাদের আর একটা ছেলে, সারা জীবন কী করেছিস বল তো আমাদের জন্য? দু' টাকার মিষ্টিও কখনও কিনে এনেছিস হাতে করে? রামজীবন মাতাল-বদমাস যাই হোক, যত বদনামই করিস, সেও বুক দিয়ে মা-বাপের জন্য করে। এসব দেখে তোর লজ্জা হয় না? মুখ লুকোতে ইচ্ছে করে না?

বামাচরণ কেমন একটু থতমত খেয়ে গেল। তবু একটু তেজ দেখিয়ে বলল, আমার টাকা থাকলে আমিও করতাম।

টাকা থাকলে করার লোক তুই? বউয়ের আঁচল ধরে এ বাড়ি থেকে বিদেয় হয়েছিস, ফের বউয়ের হুকুমেই এসেছিস ফন্দি করে টাকা আদায় করতে। তোর লজ্জাশরম থাকলে করতিস এরকমটা? বাপকে হুমকি দিচ্ছিস, সে নিরীহ লোক বলে। পারবি রেমোকে হুমকি দিতে? বিষদাঁত ভেঙে দেবে।

বামাচরণ তবু একবার তড়পানোর চেষ্টা করে, তা হলে তোমরা সবাই একজোট হয়েছ? সবাই মিলে আমাকে ফাঁকি দিয়ে দিব্যি আরামে থাকবে? এই তোমাদের মনে ছিল তা হলে?

কে তোকে ফাঁকি দিয়েছে? তোর ঘর ওই তত পড়ে আছে। কেউ ঢোকেনি, দখলও করেনি। ইচ্ছে হলে ফিরে আসতে পারিস। তা কি আর তুই আসবি? সম্পত্তি সম্পত্তি করে হেঁদিয়ে মরছিস, ক'লাখ টাকার সম্পত্তি আমাদের? তোর বাবা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, ধারকর্জ করে এই ক'খানা ঘর তুলেছিল অনেকদিনের চেষ্টায়। তুই বাপের জন্য কিছু করিসনি, মায়ের কথা ভাবিসনি, সম্পত্তির ভাগের বেলায় খুব তো বুঝ আছে!

নয়নতারার এই তেজ বহুকাল দেখেনি বিষ্ণুপদ। ছেলেমেয়েদের কাছে ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকাই তার স্বভাব। আজ হঠাৎ এই তেজী ভাব দেখে বিষ্ণুপদ খুব অবাক হল। কিন্তু এই বয়সে উত্তেজনা ভাল নয়। রেগে গেলে প্রেশার চড়ে বসবে।

বিষ্ণুপদ বলল, ওগো, আর নয়। এবার চুপ করো। তোমার মুখ খুব লাল হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা হও তো।

নয়নতারা বলল, ঠাণ্ডা হবো? ওর লজ্জা করে না তোমাকে না তোক অপমান করে যেতে? এই সংসারের জন্য, মা-বাপের জন্য, ভাইবোনের জন্য ও কোনও কালে কিছু করেছে? যা, তোর বউকে গিয়ে বল আমরা পয়সাকড়ি দিতে পারব না, যা পারে করুক।

নয়নতারা আর বিষ্ণুপদ বরাবর একতরফা কথা শুনে যায়। কোনও দিন প্রতিবাদও করে না। আজ হঠাৎ নয়নতারার এই সাঙ্ঘাতিক রূপ দেখে বামাচরণ ঘাবড়ে গেল। শরীরও বোধ হয় যুতের নয়। ধপ করে দাওয়ার মেঝের ওপর বসে পড়ল। কিছুক্ষণ বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে রইল চুপচাপ।

বিষ্ণুপদ নয়নতারার দিকে চেয়ে বলল, তুমি বরং একটা পান খাও।

আঁচলে মুখের ঘাম মুছে বলল, সংসার না নরক। সাধ্যি থাকলে বুড়োবুড়ি কাশীবাসী হতাম।

বিষ্ণুপদ একটু হেসে বলল, এও কাশী। এই কাশীতে পাপ ক্ষয় হবে তাড়াতাড়ি। একটু পান মুখে দাও।

রাঙা তাদের দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়ে খর চক্ষুতে এদিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। অবস্থাটা জরিপ করল। এতক্ষণ আশেপাশে থেকে সবই শুনেছে। চেয়ে থেকে তারপর ঘরে চলে গেল।

বিষ্ণুপদ জানে, কৃষ্ণজীবন যে দোতলা বাড়ি করে দিচ্ছে এটা কেউ ভাল চোখে দেখবে না। রামজীবনকে টেক্কা দিয়ে দিল কৃষ্ণজীবন। রামজীবনের পাকা ঘর এখনও শেষ হয়নি। ছাদ-ঢালাইয়ের মুখে গিয়ে থেমে

আছে। টাকা নেই। কৃষ্ণজীবন বাড়ি করে দিচ্ছে শুনে সেও প্রথমটায় রেগে গিয়ে বলেছিল, এ তো জুতো মেরে গরু দান। ওর বাড়িতে তোমরা থাকবে কেন?

বিষ্ণুপদ বলেছে, সে আমাদের কোনও কালে অপমান করেনি, অনাদর করেনি। বরং তাকেই এখান থেকে তাড়ানো হয়েছিল। তার বাড়িতে থাকতে বাধা কী? আদর করে দিচ্ছে। তোর পাকা ঘর হোক, তোরও তো দরকার।

রামজীবন খুশি হয়নি। তবে মেনেও নিয়েছে।

নয়নতারা বলেছে, কৃষ্ণ যখন দোতলা বাড়িই করে দিচ্ছে তখন তুই-ই বা আলাদা ঘরে থাকবি কেন? নিচের তলায় তুই থাকবি, ওপরতলায় আমরা। আর বুড়োবুড়ি মরলে সবটাই তোর হবে।

রামজীবন এ কথাটা ভেবে দেখেছে। বলেছে, দাদার টাকা হয়েছে, করে দিচ্ছে। আমার টাকা নেই মা, কিন্তু আমার কলজেটা আছে।

জানি বাবা, খুব জানি। তোর মতো কলজে ক'টা ছেলের থাকে? কৃষ্ণকে ভুল বুঝিসনি বাবা, সে বড় ভাল ছেলে।

এইভাবেই মীমাংসা হয়েছে। কিন্তু বামাচরণ আবার উৎপাত শুরু করল আজ।

বামাচরণ অনেকক্ষণ বাদে যখন মুখ তুলল তখন আর সেই তেজটা নেই। দুর্বল গলায় বলল, তা হলে আমার কী হবে বাবা?

বিষ্ণুপদ বলল, তোর আবার কী হবে? বউমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে আয়। এখানেই থাক। সব দিক বজায় থাকবে তা হলে।

আপনাদের ঘরখানা আমারই পাওয়ার কথা ছিল, মনে আছে?

বিষ্ণুপদ একটু হেসে বলে, আমাদের ঘর আবার কি? আমার বয়স তো চলে গেছে। আর ক'দিন? পাকাবাড়ি দালান-কোঠা দেখে যেতে পারব কি না তাও ঠিক নেই। যদি বা দেখেও যেতে। পারি তবু ভোগ করব ক'দিন। যা থাকবে তোদেরই থাকবে। যদি বনিবনা করে থাকতে পারিস তবে আর চিন্তা কিসের?

দোতলাটা কে পাবে?

বিষ্ণুপদ একটু চুপ করে থেকে বলল, এটাও একটা ক্যাচালে প্রশ্ন। দোতলা কে পাবে সে তো দূরের কথা। আগে বাড়িটা হোক।

বামাচরণ কেমন যেন হতাশ হয়ে বসে রইল। তারপর বলল, আমাকে রেমো ঢুকতে দেবে না। বাড়িতে। পাকাবাড়ি হলে ও সবটাই নেবে। দেখো।

তোর আর কতটাই বা দরকার? যদি আসতে চাস চলে আয়। তোর জন্য আমি আমার ঘরখানাই ছেড়ে দিয়ে যাবোখন। রামজীবন পিতৃভক্ত ছেলে, আমি বললে সে কথার অমান্য করবে না।

বামাচরণ তবু যেন উৎসাহ পেল না। বসে রইল। তারপর বলল, দাদাকে বলো-না, আমার ঘরখানা নিয়ে আমাকে টাকা দিয়ে দিক।

বিষ্ণুপদ তার এই লোভী সন্তানটির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, সে কি কোটিপতি বলে ভাবিস? সে নামে বড়, টাকায় নয়। বউমাকে না জানিয়ে গোপনে জমানো টাকা দিয়ে বাড়ি করে দিচ্ছে। বলেছে, এ তার প্রায়শ্চিত্ত। এসব একটু বুঝে দেখ বাবা, একটু ভেবে দেখ। শুধু স্বার্থচিন্তা করলে মানুষ বড় ছোট হয়ে যায়।

বামাচরণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর উঠে পড়ল।

৮৪

লিফটে একাই ছিল চয়ন, দরজা বন্ধ করার সময়ে খুচ করে একটা লোক এসে ঢুকে পড়ল। লোকটার পরনে হাকুচ ময়লা প্যান্ট আর শার্ট, লম্বা রুক্ষ চুল, গালে বিজবিজ করছে দাড়ি। লোকটা অবিরল বিড়বিড় করে কী বকে যাচ্ছে। চেহারাটা একসময়ে খারাপ ছিল না। কিন্তু অযত্নে বা রোগে বা অভাবে শুঁটকো মেরে গেছে। এইসব মানুষকে দেখলে চয়ন তার নিজের ভবিষ্যতের চেহারা কল্পনা করে নিতে পারে। সে হয়তো বয়সকালে এরকমই আধপাগলা, ভ্যাবলা, বিড়বিড় করা লোক হয়ে যাবে।

হঠাৎ লোকটা তার দিকে চেয়ে বলল, আচ্ছা কৃষ্ণজীবন বিশ্বাস যেন কোন তলায় থাকে? জানতাম, কিন্তু ভুলে গেছি।

আপনি তাঁর ফ্ল্যাটে যাবেন?

হ্যাঁ, আমার দাদা। কোন তলা জানেন?

জানি। আমিও তাঁদের ফ্ল্যাটেই যাচ্ছি।

অ। আপনি কে?

আমি মোহিনীকে পড়াই।

লোকটা আর উচ্চবাচ্য করল না। সাততলায় পৌঁছে তার পিছু পিছু নেমে এল। এ লোকটা কৃষ্ণজীবনের ভাই বলে বিশ্বাস করবে কে? বয়সে যেন কৃষ্ণজীবনের চেয়ে বছর দশেকের বড়, আর পোশাক একেবারেই কৃষ্ণজীবনের ভাইয়ের মতো নয়।

ডোরবেল বাজিয়ে অপেক্ষা করার সময় লোকটা ফের জিজ্ঞেস করল, বউদিকে এখন পাওয়া যাবে?

জানি না। সাধারণত এ সময়ে থাকেন।

দরজা খুলল মোহিনী। তার দিকে চেয়ে হেসে লোকটার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল। যেন চিনতেই পারল না।

চয়ন তাড়াতাড়ি বলল, তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চান।

লোকটা খুব বিনয়ের গলায় বলল, আমি বামাচরণ। তোমার কাকা হই। চিনতে পারছ না? আগেও বার দুই এসেছি।

মোহিনী দরজা ছেড়ে দিয়ে বলল, আসুন।

বাইরের ঘরে বামাচরণকে বসিয়ে সে তার মাকে খবর দিতে গেল।

কলেজ থেকে ফিরে রিয়া এ সময়ে একটু শুয়ে থাকে। বেশিক্ষণ নয়। আধঘণ্টা। তাকে একজন ডাক্তার বলেছিল, আফটার ডে'জ ওয়ার্ক আধঘণ্টা মনটাকে শূন্য রেখে শুয়ে থাকবেন। বালিশ ছাড়া। হেলপস্ টু স্টে ইয়ং। বলতে নেই, রিয়া নিজের শরীরে বয়সের লক্ষণ টের পাচ্ছে। একটু মেদের সঞ্চার ঘটছে। মুখের চামড়া সামান্য শ্লথ। বয়সের ব্যাপারটা তাকে ইদানীং একটু টেনশনে রাখছে। অথচ পাশাপাশি তার স্বামী কৃষ্ণজীবন এখনও কী টগবগে, প্রাণবান। ওকে বয়সে পায় না কেন? সবসময়ে তো পড়ছে, লিখছে দুনিয়া নিয়ে ভাবছে, এ-দেশ সে-দেশ দৌড়ে বেড়াচ্ছে। তবু ওকে বয়সে পায় না কেন? ও কি গোপনে প্রেম করে? কে জানে! অনু প্রায়ই ফোন করে ওকে। একদিন এক্সটেনশন লাইনে ফোন ধরে কিছুক্ষণ শুনে রেগে গিয়েছিল রিয়া। চেপে ধরেছিল কৃষ্ণজীবনকে, ওইটুকু মেয়ে তোমার সঙ্গে অত পাকা পাকা কথা বলে কেন? কী চায় ও? কৃষ্ণজীবন অবাক হয়ে বলেছিল, পাকা? তা হবে হয়তো। আমি ঠিক বুঝতে পারি না। বেশ করে বকে দিয়েছিল রিয়া। সেই থেকে অনু মেয়েটাকে দেখতে পারে না সে। তবে জানে, অনু প্রায়ই কৃষ্ণজীবনকে ফোন করে, বাড়িতে এসে আড্ডা মারে, কোথাও দেখা হলে গা ঘেঁষে থাকে। ওইটুকু মেয়েকে সন্দেহ করার মানেই হয় না। কিন্তু পাকামি দেখলে গা জ্বলে যায় তার। কালকেও চারুশীলার বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল, এমন ন্যাকামি করছিল কৃষ্ণজীবনের সঙ্গে যে একটা চড় কষাতে ইচ্ছে হয়েছিল তার।

শুয়ে শুয়ে বিষাক্ত মনে অনুর কথাই ভাবছিল সে।

মোহিনী এসে বলল, মা, শিগগির এসো। আমাদের সেই কাকা এসেছে। বামাচরণ না কী যেন নাম! কী নোংরা আর ময়লা, দেখ গিয়ে।

বামাচরণ! বলে অবাক হয়ে চোখ মেলে রিয়া, সে আবার কী চায়?

দেখ না গিয়ে!

উঃ, এরা জ্বালিয়ে খাবে। টাকাপয়সা চাইতে এসেছে বোধ হয়।

রিয়ার পরনে একটা নাইটি। টোকিও থেকে এনে দিয়েছিল কৃষ্ণজীবন। জাপানি প্রিন্টের দারুণ জিনিস। তবে এটা পরে বাইরের বিশিষ্ট লোকজনের সামনে বেরোয় না রিয়া। কিন্তু বামাচরণকে অতটা সম্মান দেখানোর প্রয়োজন বোধ করল না সে। উঠে চুলটা বেঁধে নিল এলো খোঁপায়। বাথরুমে গেল। তার পর শ্লথ পায়ে এসে ড্রয়িং রুমের পর্দা সরিয়ে যে দৃশ্যটা দেখল তাতে মনটা বিরক্তিতে আরও ভরে গেল তার। একটা হাড়-হাভাতে ভিখিরির মতো পোশাকে বামাচরণ সোফায় বসে আছে গ্যাঁট হয়ে। বসে আপনমনে বিড়বিড় করছে আর বাতাসে আঙুল দিয়ে আঁকিবুকি কাটছে। দেখলেই বোঝা যায়, মেন্টাল পেশেন্ট।

রিয়া খুব নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বামাচরণকে দেখে নিল। তারপর গলাটা সংযত করেই বলল, বামাচরণ, কেমন আছ?

বামাচরণ টপ করে উঠে এসে পদধূলি নিয়ে হেঁ-হেঁ করে হেসে বলল, বউদি, ভাল আছ?

শত হলেও আপন দেওর, একে তাড়ানো যায় না। রিয়া বলল, বোসো, তোমার খবর কী?

আর খবর! আমাকে তো বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, জানো না?

রিয়া অবাক হয়ে বলে, না তো! কি করে জানব? কেউ তো খবর দেয় না!

অনেকদিন যাও না দেশে। আমরা গরিব বলে?

রিয়া মুখটা গম্ভীর করে বলে, নিয়ে গেলে যেতে পারি। কিন্তু তোমার দাদারই তো সময় হয় না।

দাদা তবু মাঝে মাঝে যায়।

জানি। কিন্তু আমাকে তো নিয়ে যায় না।

বামাচরণ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বলল, তোমাকে একটা খবর দিতে এলাম বউদি।

খবর।

হ্যাঁ। দাদা তো দেশে তিনতলা বাড়ি করছে। জানো?

রিয়া অবাক হয়ে বলে, না তো! তিনতলা বাড়ি?

হ্যাঁ। দারুণ ব্যাপার। ইট সিমেন্ট সব এসে গেছে। আমি তো ওখানে এখন থাকি না। রামজীবন গুণ্ডা লাগিয়ে আমাকে মেরেধরে তাড়িয়ে দিয়েছে। দিন কুড়ি আগে হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলাম। তখন দেখি, এই কাণ্ড। এলাহি ব্যাপার হচ্ছে।

কই, আমাকে বলেনি তো!

বামাচরণ মুচকি হেসে বলল, তোমাকে গোপন করেই হচ্ছে বলে শুনলাম।

গোপন করার কী আছে?

তা তো জানি না। কিন্তু অন্যায়টা দেখ। আমাকে ভিটে থেকে তাড়িয়ে তবে সব হচ্ছে।

রিয়ার মুখচোখ লাল হয়ে যাচ্ছিল রাগে। সে বলল, বাড়ি কার জন্য হচ্ছে?

মা আর বাবার জন্য। রামজীবনেরও ভাগ আছে।

বাঃ, বেশ কথা তো! অদ্ভুত ব্যাপার।

সবার জন্যই হচ্ছে, শুধু আমি বঞ্চিত। অবিচারটা দেখ।

রিয়া মুখ গম্ভীর করে বসে রইল। তারপর বলল, চা খাবে?

তা খেতে পারি। দাদা কোথায়?

তার ফিরতে রাত হবে।

আমি যে খবরটা দিয়েছি তা দাদাকে বোলো না।

কেন, দাদাকে ভয় পাও?

কী দরকার বলে? আমার ওপর রাগ করবে।

ঠিক আছে, বলব না। কিন্তু খবরটা সত্যি তো?

বিশ্বাস না হয় কালকেই আমার সঙ্গে বিষ্ণুপুর চলো, দেখে আসবে। ঠিকাদার দু-চারদিনের মধ্যেই কাজ শুরু করে দেবে।

তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে বলছিলে, তা তুমি এখন কোথায় আছ?

বামাচরণ দুঃখের গলায় বলল, কোথায় আর থাকব? প্রথমটায় শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে উঠেছিলাম। তা সেখানে সুবিধে হল না। একটা ভাড়াবাড়িতে আছি।

সেটা কি বিষ্ণুপুর থেকে দূরে?

তিন চারটে গ্রামের তফাতে।

তাড়াল কেন?

সে অনেক কথা। তবে আমাকে তাড়িয়ে সব গাপ করে নিল ওই রামজীবন।

সে তো শুনি মদটদ খায়।

সব দোষ আছে বউদি। গুণের অন্ত নেই।

ছিঃ ছিঃ। বলে চুপ করে থাকল রিয়া। মনটা বিরক্তি আর রাগে খিচড়ে গেল। উঠে গিয়ে কাজের মেয়েটাকে চা করতে বলে ফের এসে মুখোমুখি বসে বলল, তোমার দাদা সব টাকাপয়সা দিয়ে ফেলেছে বুঝি বাড়ি করার জন্য?

তা জানি না। তবে ঠিকাদার লাগিয়েছে। বাড়ি করাটা যদি আটকাতে পারো তবে বড় ভাল হয়। বাড়ির ভাগ আমিও পাবো না, দাদার তো কথাই নেই।

তোমার দাদা তো বলেন রিটায়ার করে দেশে গিয়েই থাকবেন।

আর থেকেছে! তুমিও যেমন। দাদা এখন একজন ডাকসাইটে লোক। সে গিয়ে ওই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে থাকে কখনও? টাকাটা জলে দিচ্ছে। আটকাতে পারবে না বউদি?

রিয়া রাগ-রাগ মুখ করে বলে, আটকানো হয়তো সহজ হবে না। টাকা হয়তো দিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আমরা বড়লোক নই বামাচরণ। আমার মেয়ের বিয়ে বাকি। ছেলের পড়ার খরচ আছে। দোলনও তত বড় হচ্ছে। তোমার দাদা কোন আক্কেলে যে বাড়ির টাকা দিতে গেল তা বুঝতে পারছি না।

আমিও সেই কথাই বলি। এ বাজারে এতগুলো টাকা! না হোক দেড় দু'লাখ তো খসবেই।

আমি যদি বিষ্ণুপুর যেতে চাই নিয়ে যেতে পারবে?

কবে যাবে বলল, আমি এসে নিয়ে যাবো।

সামনের রবিবার তোমার সময় হবে?

খুব হবে। মাঝখানে তো দুটো দিন।

সকালের দিকে চলে এসো। আমি যাবো।

ঠিক আছে।

বসে বসে আরাম করে চা খেল বামাচরণ। বিস্কুট খেল চায়ে ভিজিয়ে।

আর কিছু খাবে?

ক্যাবলার মতো একটু হাসল বামাচরণ। খুব সংকোচের সঙ্গে বলল, সকাল থেকে আজ তেমন কিছু খাওয়া হয়নি।

তা হলে বোসো। বলে রিয়া উঠে গেল। ফ্রিজ থেকে মাখা ময়দা আর তরকারি বের করে কাজের মেয়েটাকে পরোটা ভেজে দিতে বলে এল। তার মাথাটা উত্তেজিত। এইসব লোককে আত্মীয় বলে স্বীকার করা বা পরিচয় দেওয়াটাই এক লজ্জার ব্যাপার। কৃষ্ণজীবনের মতো একজন বিশিষ্ট এবং বিখ্যাত লোকের ভাই বলে একে কে বিশ্বাস করবে? কৃষ্ণজীবন ছাড়া তার ভাইবোন বা বাপ-মাও ভদ্র শ্রেণীর মধ্যেই আসে না। গরিব বলে কথা নয়, কোনও কালচার বা শিক্ষাও তো নেই এদের। একজনও কোনও ভদ্র পেশায় নিযুক্ত নেই। জীবন থেকে, মন থেকে এদের সম্পূর্ণ বর্জন করে দিয়েছিল রিয়া। কৃষ্ণজীবনকেও চেয়েছিল ওদের সঙ্গে সম্পর্করহিত করে দিতে। এ কাজটা পেরে ওঠেনি সে। কৃষ্ণজীবন তাকে না জানিয়ে মাঝে মাঝে বিষ্ণুপুর যায়। রিয়া ধরে ফেলেছিল, কৃষ্ণজীবনের ছাড়া শার্টের বুক পকেটে ট্রেনের টিকিট পেয়ে। এখন দেখা যাচ্ছে, শুধু সম্পর্ক নয়, দায়দায়িত্বও ঘাড়ে নিচ্ছে এইসব অপোগণ্ডদের।

তোমার বউয়ের নাম শ্যামলী না?

হ্যাঁ। তোমার মনে আছে?

আছে। সে কেমন মেয়ে?

গাঁয়ের মেয়ে, যেমন হয় আর কি।

বিয়ের সময় দেখেছিলাম একবার, ভাল করে আলাপ হয়নি।

চাও তো নিয়ে আসব'খন একদিন।

প্রমাদ গুনল রিয়া। এ সব লোকের সঙ্গে সম্পর্ক প্রলম্বিত করার কোনও ইচ্ছেই তার নেই। সে বলল, এখনই এনো না। আমরা সব সময়ে তো থাকি না। উনি বোধ হয় কয়েক বছরের জন্য আমেরিকায় চলে যাবেন। আমরাও যাবো।

উরিব্বাস! আমেরিকা!

এখনও ঠিক হয়নি। তোমার দাদা তো দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চান না। কিন্তু ও সব দেশে না গেলে উন্নতিই বা করবে কি করে!

আরও উন্নতি? দাদা তো শুনি এখন একজন মস্ত মানুষ।

হওয়ার কি শেষ আছে? তোমার দাদার যা কোয়ালিফিকেশন, যা ক্ষমতা তার কতটুকু দাম এ দেশে পায় বলো? সাহেবরা খাতির করে বলেই যা দাম।

এ সব উঁচু উঁচু কথার খেই ধরতে পারে না বামাচরণ। সবেগে মাথা নেড়ে বলে, তা বটে। আমেরিকা গেলে এ ফ্ল্যাটটা কি করবে?

কি করব মানে? আমরা তো পার্মানেন্টলি যাচ্ছি না। কয়েক বছরের জন্য। এই ফ্ল্যাট থাকবে।

যেন একটু হতাশ হয়ে বামাচরণ বলল, অ।

গরম পরোটা আর তরকারি এসে যাওয়ার পর লোভর মতো ক্ষুধার্ত বামাচরণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে খেতে লাগল। খাওয়ার মধ্যেও কোনও কালচারের প্রকাশ নেই। হাপুস হুপুস শব্দ করছে। খাওয়ার আগে নোংরা হাতটা ধুয়েও নিল না। ঘেন্নায় মুখ কোঁচকাল রিয়া।

খেয়েদেয়ে উঠে পড়ল বামাচরণ, আজ তা হলে আসি বউদি।

এসো।

সামনের রবিবার আমি সকালের দিকেই চলে আসবো।

ঠিক আছে।

আবার একটা প্রণাম করে বামাচরণ চলে গেল। রিয়া দরজাটা বন্ধ করার আগে দেখল, বামাচরণ লিফটের চেষ্টা করল না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রিয়া। এই একটা আনকালচার্ড, পেঁয়ো, অসভ্য পরিবারের সঙ্গে তার আত্মীয়তার সম্পর্কটাই তার জীবনের একটা কলঙ্ক হয়ে থাকবে চিরকাল।

ঘরে এসে আর একবার শুলো বটে রিয়া, কিন্তু বিশ্রামটা আর হল না। মন অস্থির, উত্তেজিত থাকলে শরীরের বিশ্রামও হতে চায় না।

রাত দশটার পর কৃষ্ণজীবন ফিরে এল। হাতে মস্ত ফুলের বোকে। রিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ধরো।

রিয়া ফুলটা নিয়ে ক্যাবিনেটের অভ্যস্ত জায়গায় সাজিয়ে রাখল। রাখতে রাখতে তার মনে হল, কৃষ্ণজীবনের বয়স কত হল? এ বাড়িতে কৃষ্ণজীবনের জন্মদিন পালন করার রেওয়াজ নেই। ছেলেমেয়েদের একটু শখ হয় বটে, কিন্তু কৃষ্ণজীবন তাতে জল ঢেলে দেয়। রিয়ার হিসেব থাকে না, কিন্তু আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ ছাড়িয়ে গেছে। তবু আদ্যন্ত যুবক চেহারার অক্লান্ত এই মানুষটির নাগাল বয়স বা সময় আজও পায়নি। সারা দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেও দিনান্তে সে যখন ফেরে তখন কোনওদিনই তাকে শ্রান্ত-ক্লান্ত মনে হয় না। কোন ধাতুতে গড়া ও?

রাতের খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত নির্বিঘ্নে পার হতে দিল রিয়া। দোলনকে ঘুম পাড়াল। বড় দুই ছেলেমেয়ে নিজেদের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ কৃষ্ণজীবনের ঘরে হানা দিল রিয়া। কৃষ্ণজীবন রাত জেগে রোজই কাজ করে। পড়ে, লেখে। মার্কিন দেশ থেকে তার আরও একটা বই বেরোনোর প্রস্তুতি চলছে।

শোনো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ভীষণ অন্যমনস্ক, দূরলগ্ন দুটি চোখ তুলে তার দিকে চেয়ে কৃষ্ণজীবন যেন প্রথমটায় চিনতেই পারল না। তারপর একটু সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, এসো, বোসো। কিছু বলবে?

হ্যাঁ। একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

কৃষ্ণজীবন কী বুঝল কে জানে, হঠাৎ একটু হেসে বলল, তোমার মুড দেখে মনে হচ্ছে প্রশ্নটা খুব প্যালেটেবল নয়। কী জিজ্ঞেস করবে?

আমি শুনলাম, তুমি বিষ্ণুপুরে তিনতলা বাড়ি করে দিচ্ছ ওদের। সত্যি নাকি?

কৃষ্ণজীবনের হাসিটা হারিয়ে গেল। বলল, কে বলেছে?

সেটা অবান্তর কথা। খবর চাপা থাকে না।

কৃষ্ণজীবন হাতের বইটা একটা মাকার দিয়ে বন্ধ করে রাখল। তারপর হার ধীর স্বভাবসিদ্ধ গলায় বলল, হ্যাঁ। মা-বাবা খুব কষ্ট করে থাকে। বর্ষায় ঘর জলে ভেসে যায়। পোকামাকড়ের উৎপাত। সাপও ঢোকে শুনেছি।

তোমার টাকা খুব সস্তা হয়েছে? তিনতলা বাড়ি মানে এক কাঁড়ি টাকা। আমাদের কি এত বাড়তি টাকা আছে উড়িয়ে দেওয়ার মতো?

উড়িয়ে দেওয়া কি একেই বলে?

তা ছাড়া কী?

আমার তো মনে হয় টাকা দিয়ে এর চেয়ে ভাল কাজ আমি আর অল্পই করেছি।

এটা ভাল কাজ? তোমার মা-বাবার জন্য তিনতলা বাড়ির কোনও দরকার ছিল কি? বুড়োবুড়ি থাকবেন, তার জন্য একখানা পাকা ঘর হলেই তো যথেষ্ট। সামান্য টাকায় হয়ে যেত। তিনতলা বাড়ি ওদের কোন কাজে লাগবে? শেষ অবধি তো বাড়ি ভোগ করবে ওই মাতাল আর লম্পট রামজীবন।

কথার যৌক্তিকতায় একটু মিইয়ে গেল কৃষ্ণজীবন। কথাটা মিথ্যে নয়। সে এ কথার জবাব খুঁজে পেল না। একটু উদাস থেকে বলল, ভেবেছিলাম একটা ভাল বাড়ি করলে কখনও-সখনও আমরাও গিয়ে থাকতে পারব।

তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? আমি বিষ্ণুপুরে গিয়ে থাকব?

আমি আউটিং-এর কথা বলছি।

আউটিং-এর জন্য অনেক সুন্দর জায়গা আছে। বিষ্ণুপুরে মরতে আউটিং-এ যাবো কেন?

কৃষ্ণজীবন একটা অসহায় খাস মোচন করে বলল, ছেলেমেয়েরা মাঝে মাঝে বলে ওরা বিষ্ণুপুর যেতে চায়। বিশেষ করে দোলন।

ওদের আমি যেতে দেবো না।

তা হলে আর কী করা যাবে! তোমরা কেউ না গেলেও আমি তো যাবো। তারা তোমাদের কেউ হলেও, আমার তো আপনজন!

সেটা নিয়েও আমার কিছু কথা আছে। ওদের সঙ্গে আমরা সম্পর্কটা রাখছি কেন?

কৃষ্ণজীবন একটু অবাক হয়ে বলে, তার মানে কি রিয়া?

তোমার হয়তো আত্মসম্মান বোধ একেবারেই নেই, কিন্তু আমার আছে। তোমার এক ভাই মাতাল, আর একটার পাগলামির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। বোন যাত্রাদলের নটী। সম্পর্ক রাখার মতো মানুষ কি ওরা?

কৃষ্ণজীবন যেন ঘুঁষি খেয়ে কুঁকড়ে গেল। ছোট হয়ে গেল। মুখে একটা ব্যথাতুর বিষণ্ণতা ফুটে উঠল হঠাৎ। হাঁফ-ধরা গলায় সে বলল, আমার পাপ বড় কম নয় রিয়া, তাদের জন্য আমিই দায়ী।

তুমি দায়ী? তুমি কেন দায়ী হবে?

কৃষ্ণজীবন দু'হাতে মুখ ঢাকা দিল। তারপর অস্ফুট একটা গোঙানির শব্দ করে মাথা নেড়ে বলল, আজ আর কিছু বোলো না রিয়া। আর বোলো না।

আমি কিছু বলতে চাইও না। আমি শুধু চাই, বাড়িটা তুমি করবে না। শুনেছি ইট আর সিমেন্ট কেনা হয়ে গেছে। গেছে যাক। এবার ওরা যা করার করুক। তুমি আর একটা পয়সা দিতে পারবে না। পয়সা তোমার এল কোথেথকে?

কৃষ্ণজীবন মুখ ঢেকে রেখেই বলল, শোনো রিয়া, এটা আমার প্রায়শ্চিত্ত। আমার যে কাজ করা উচিত ছিল তা আমি করিনি। আমি টেনে তুলিনি আমার ভাইবোনদের। তারা নষ্ট হয়ে গেছে অবস্থার চাপে। আমি পারতাম, করিনি। এখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

আমি তা মানি না। তুমি ওদের জন্য কী করতে?

কৃষ্ণজীবন মুখের ঢাকাটা খুলল না বলে ভৌকি শোনাল তার গলা, তুমি জানো না রিয়া, আমার ভাইবোনরা কতটা আমার মুখাপেক্ষী হয়ে ছিল। কতটা আশাভরসা করত। বামা, রেমো, বীণা, সরস্বতী এরা তো কেউ খারাপ ছিল না। কেউ না। আমি মন দিলেই, চেষ্টা করলেই ওদের দাঁড় করাতে পারতাম। চেষ্টাই করলাম না। বিয়ে করে আলাদা হয়ে এলাম।

দোষটা কি বিয়ের? তার মানে কি আমাকেই ইনডাইরেক্টলি দায়ী করতে চাও? ভুলে যেও না, ওরা তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

মাথা নেড়ে কৃষ্ণজীবন বলল, তুমি বুঝবে না, ওই তাড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে রাগ নয়, ছিল অভিমান। বড় ভেঙে পড়েছিল ওরা।

আহা, কী কথা! একটা মানুষ চলে এল বলে সংসারের বাকি সবাই নষ্ট হয়ে যাবে? তুমি কি কল্কি অবতার নাকি?

না। তবে ওদের কাছে আমি যে কতটা সেটা কি তুমি বুঝতে পারবে?

বুঝবার দরকার নেই। তুমিও বোঝোনি। তোমার মাথায় ওরা কাঁঠাল ভাঙছে। তোমার বোধবুদ্ধি নেই বলেই গলা বাড়িয়ে দিচ্ছ। কত টাকা দিয়েছ বলো তো! টাকাটা এল কোথা থেকে?

টাকাটা আমেরিকা থেকে এসেছে। বইয়ের রয়্যালটি।

সে কি অনেক টাকা! কই আমাকে তো বলোনি?

কৃষ্ণজীবন কী বলবে ভেবে পেল না। এ কথা সত্যি যে পাবলিশারের দেওয়া বেশ কয়েক লক্ষ টাকার কথা সে রিয়ার কাছে প্রকাশ করেনি। জানে, রিয়া জানতে পারলেই টাকাটার ওপর একটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে। কিছু টাকা হিসেবের বাইরে রাখা দরকার ছিল।

কত টাকা পেয়েছ?

আপাতত পনেরো লাখ। তার মধ্যে ইনকাম ট্যাক্স যাবে।

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রিয়া বলল, পনেরো লাখ? অথচ আমাকে বলোনি!

বলতাম। একটু সময় নিচ্ছিলাম।

কবে থেকে গোপন করা শিখলে?

কৃষ্ণজীবন এ কথারও জবাব জানে না। মুখ ঢেকে সে বসে রইল চুপ করে।

রিয়া অবিশ্বাসের গলায় আপনমনে কয়েকবার আওড়াল, পনেরো লাখ! প-নে-রো লাখ!

কৃষ্ণজীবন একটা শ্বাস ফেলে বলল, টাকাটা একটু আনএক্সপেক্টেড। তাই মা-বাবার জন্য বাড়িটা করে দিচ্ছি রিয়া।

রিয়া শক্ত হয়ে বলল, না। শুধু একটা ঘর পাকা করে দিতে পারো। আর কিছু নয়। রবিবার আমি বিষ্ণুপুর যাচ্ছি।

কৃষ্ণজীবন চমকে ওঠে, বিষ্ণুপুর যাচ্ছ?

হ্যাঁ। তাদের একটু শিক্ষা হওয়ার দরকার।

৮৫

বীণা এত অবাক হল যে, প্রথমটায় মনে করল স্বপ্ন দেখছে। তারপর অবিশ্বাসের গলায় বলল, পাঁচ হাজার টাকা? এত টাকা আমাকে দিচ্ছো কেন গো কাকা?

কাকা শান্ত গলায় বলল, দিচ্ছি, রেখে দাও। তোমাকে তো খুব বেশী কিছু দিতে পারি না। তোমার গুণের কদর হল কই?

তা বলে হঠাৎ এত টাকা! এ তো অনেক টাকা গো!

বীণা, মানুষ আর কতটুকু দিতে পারে? দেনেওয়ালা ভগবান। তাঁর দান হিসেবেই নাও।

বীণা অবাক হয়ে বলল, আবার জল ঘোলা করলে যে—তুমি দিচ্ছো, না ভগবান দিচ্ছে?

কাকা একটু শুকনো হেসে বলল, ভগবানই দিচ্ছে বীণা।

এটা কিসের টাকা? বোনাস?

তাই ধরে নাও।

বোনাস হলে তো সবাই পাবে।

তার কোনও মানে নেই। আমি বলি কি, টাকা ডবল করার অনেক স্কিম হয়েছে আজকাল, সেরকমই একটা স্কিমে টাকাটা ফেলে রাখো। খরচ কোর না।

উদাস গলায় বীণা বলে, আমার আর খরচ কি? দু' মুঠো খাওয়া আর পরনের কাপড়। ফুর্তি তো আর করব না। কী ইচ্ছে করছে জানো? আমার মা-বাবা তো গরিব, এ টাকা থেকে তাদের কিছু দিই।

সে তো ভাল কথা। তাই দাও।

বীণা একটু ভাবল। না, সেটা ভাল হবে না। তার ডলার আর পাউন্ডের কথা বাবা জানে। বাবা হয়তো সন্দেহ করবে এটা সেই ডলার বেচা টাকা। বাবার অ্যাটাং নেই, কিন্তু ঠ্যাটাং আছে। ট্যাঁকে পয়সা নেই, ওদিকে যুধিষ্ঠির। নিমাইয়ের সঙ্গে খুব স্বভাবের মিল। আর সেইজন্যই বোধ হয় হাড় হাভাতে সচ্চরিত্রটাকে ধরে এনে গলায় ঝুলিয়ে দিল তার। না, বীণা এক পয়সাও দেবে না। বাবাকে।

কী ভাবছো বীণা? পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে ভাবছো? এ বাজারে ও টাকার আর কী-ই বা দাম বলো! অত ভেবো না।

আমার কাছে এ অনেক টাকা কাকা। কেন দিলে বলবে না? যা বলছে তা যেন আলগা-আলগা কথা। তোমার মুখটা বড্ড গম্ভীরও।

না বীণা, মুখ গম্ভীর হবে কেন? এই তো হাসছি।

বীণা হঠাৎ একটু ধরা গলায় বলল, টাকা-টাকা করে আমাদের জীবনটা কিভাবে কাটে বলল তো? ক'টা টাকার জন্য আমাদের কত হা-পিত্যেশ! এই যে এত টাকা হাতে এল, আমার এত আনন্দ হচ্ছে, কিন্তু কী যে করব টাকা দিয়ে তাই ঠিক করতে পারছি না। মাথাটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

বাড়ি যাও বীণা। ওই টাকাটা থেকে পাঁচ টাকার একটা পুজো দিও।

পুজো দেবো? কিসের পুজো?

আমি তার কী জানি! পুজো-আচ্চা তো মেয়েরাই করে। তোমার কোনও ঠাকুর নেই? লক্ষ্মী হোক সরস্বতী হোক, কালী বা শিব হোক?

না গো, আমার কি ঠাকুর দেবতার কথা মনে থাকে? সারাদিন যাত্রাপালা নিয়ে ভাবছি।

ঠাকুর দেবতার কথাও বোধহয় একটু ভাবা ভাল।

টাকার কথা কি গোপন রাখব সকলের কাছে?

হ্যাঁ, খুব গোপন রেখো।

আমিও তাই ভাবছিলাম। আমাকে হঠাৎ এত টাকা বকশিশ দিয়েছে জানতে পারলে সবাই তোমাকে ছিঁড়ে খাবে।

বকশিশ! ছিঃ, কী যে বলো বীণা। ওটা বকশিশ হবে কেন? বরং ভগবানের আশীর্বাদ বলে জেনো।

তোমাকে আজ ভগবানে পেয়েছে গো।

কাকা ম্লান হেসে বলে, ভগবানে পাওয়া ভাল। ভূতে পাওয়া ভাল নয়।

বীণা একটু স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তার মনের মধ্যে নানা আবেগ, নানা ঢেউ। এই পাঁচ হাজার টাকাকে সে সহজভাবে নিতে পারছে না। কত কী মনে হচ্ছে!

আচ্ছা কাকা, তুমি কি একটা কথা জানো?

কী কথা?

কোরাকাঠিতে পালার পর তুমি আমাকে আংটি দিয়েছিলে, মনে আছে?

কেন থাকবে না? খুব মনে আছে। আংটি তুমি নাওনি।

কিন্তু সেই ঘটনা থেকে কী রটেছিল জানো?

কাকা ফের ম্লান একটু হেসে বলল, জানি বীণা। মানুষ তোমাকে আর আমাকে জড়িয়ে গল্প কেঁদেছিল। হঠাৎ কথাটা তুললে কেন? পাঁচ হাজার টাকা দিলাম বলে কোনও সন্দেহ করছ নাকি?

বীণা জিব কেটে বলে, ছিঃ ছিঃ, তুমি দেবতার মতো মানুষ। কোনওদিন পাপচক্ষুতে আমার দিকে তাকাওনি পর্যন্ত। পুরুষের চোখ তো আমি চিনি।

কাকা হাসল, চেনো? সত্যিই চেনো?

খুব চিনি কাকা।

কাকা একটু চিন্তিত হয়ে বলল, তোমার সঙ্গে ছিল একজন ভারী ভাল লোক। নিমাই। তাকে চিনেছিলে?

বীণা অবাক হয়ে বলল, হঠাৎ তার কথা কেন কাকা?

কাকা মাথা নেড়ে বলে, কি জানি কেন, নিমাইয়ের কথা আমার খুব মনে হয়।

ওর কথা ভাবলে তো আমার গা জ্বালা করে।

তা অনেক্কার বলেছো। দোষঘাট ছিল না বলছি না, কিন্তু লোকটা তো সাচ্চা।

সাচ্চা ধুয়ে কি জল খাবো? অপদার্থ।

কাকা একটু হেসে বলল, নিমাইয়ের কোনও খোঁজ রাখো?

জানি। কাঁচরাপাড়ায় দোকান দিয়েছে। সে দোকান নাকি ভালই চলে। ভাল থাকুক, আমার তাতে কী?

সে তো বটেই। তবে তার হিল্লে হয়েছে শুনে আমার কিন্তু মনটা ভাল লাগে। কলিযুগে ওসব লোকের তো কোনও দাম নেই! কিন্তু তবু নিমাই যে নিজের জোরে সততা বজায় রেখে টিকে আছে এটা কিন্তু আমাদের মতো পাপী-তাপীদের কাছেও ভরসার কথা। চন্দ্র সূর্য কাদের জন্য ওঠে জানো? ওইসব মানুষের জন্য, তাদের ভাগ্যে আমরাও চন্দ্র সূর্যের ভাগ পাই। নইলে পেতাম না।

বড্ড যে গদ্‌গদ ভাব দেখছি তোমার।

লোকটাকে ফিরিয়ে নিতে পারো না বীণা?

তোমার কি মাথা খারাপ হল?

কাকা একটু চুপ করে রইল বিমর্ষ ভাবে। তারপর বলল, সজল কী বলছে?

বীণা ভ্রুকুটি করে বলে, কী বলবে?

কোনও প্রস্তাব করেনি?

ও আমাকে বিয়ে করতে চায়।

আর তুমি?

বীণা খিলখিল করে হেসে বলে, দুদিন রোসো। পুরুষ মানুষের প্রেম হঠাৎ উথলে ওঠে, আবার মিইয়ে যায়।

ওটা কথা হল না বীণা। সজল ভাল ছেলে, অনেক গুণ। তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারা কি সহজ কাজ? শুনেছি ও নাকি নিমাইয়ের কাছেও গিয়েছিল।

কে বলল তোমাকে?

জানি।

বীণা ভ্রুকুটি করে বলে, সেটাই বা কোন অপরাধ হয়েছে?

কাকা মাথা নেড়ে বলল, ওর অপরাধ নয়। তোমারও অপরাধ নয়। ভাবছি, নিমাই ব্যাপারটা টের পেল কিনা!

পেলে পাবে। অত ভয় কিসের? শোনো কাকা, আমার জীবনটা আমারই। এটা কাউকে দাসখৎ লিখে দানপত্র করে দিইনি। একবার বিয়ে হয়েছিল বলে যে চিরদিনের জন্য এক খোঁটায় বাঁধা থাকতে হবে, তেমন নিয়ম আমি মানি না।

কাকা তার দিকে চেয়ে হাসছিল, বলল, তোমার নেত্রী হওয়া উচিত ছিল। বেশ গুছিয়ে বলতে পারো বটে। কিন্তু আমাদের জীবনটা তো গোছানো নয় বীণাপাণি। সব বেগাছ। যাকগে, আমাকে আবার শত্রু মনে কোরো না।

বীণাপাণি একটু গোঁজ হয়ে থেকে বলল, কেন যে তোমরা সবাই ওই লোকটার পক্ষ নাও, তা বুঝি না।

কাকা অবাক হয়ে বলে, কে পক্ষ নিয়েছে? আমি মোটেই নিমাইয়ের পক্ষ নিইনি। নিমাইয়ের কথা খুব মনে হয়, সে কথাই বলছিলাম।

জানি গো জানি।

পাঁচ হাজার টাকা ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে নিয়ে যখন বাড়ি ফিরে এল বীণাপাণি তখন তার মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন, অনেক দোলাচল। সে বোকা নয়। কাকা হঠাৎ তাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে ফেলল কেন সেইটে নিয়ে সে আগাপাশতলা ভেবে দেখতে লাগল। এ টাকা কি তার কোনও ভাবে পাওনা হয়? টাকাটা দিতে অনেক ভূমিকা করে নিয়েছিল কাকা। কাল রিহার্সালের পর বলল, আগামী কাল সকাল দশটার সময় আমার কাছে একবার এসো বীণা। কথা আছে। ওই সময়টায় আমি একটু ফাঁকা থাকি। খুবই ফাঁকা ছিল কাকা। দরজা বন্ধ করে টাকাটা দিল। বীণা বুঝতে পারছে না, হঠাৎ এত বদান্যতা কেন! দুঃখের দিনে কাকা তার জন্য অনেক করেছে। এখনও যাত্রার জন্য, হিসেব রাখার জন্য দুটো খাতে কাকা তাকে মাসে হাজার টাকার ওপরেই দেয়। সেও অনেক টাকা। তবে আবার বাড়তি পাঁচ হাজার দিল কেন?

কুসুম আজকাল রোজই আসে। রান্না করে, ঘরের কাজ করে দিয়ে যায়। এমনিই করে। কুসুম তো তার কাজের মেয়ে নয়। ভালবেসে করে। আজ কুসুম আসতেই বীণা বলল, হ্যাঁ রে, আজ একবার বিষ্ণুপুর যাবো ভাবছি। রাতটা থেকে আসবো। তুই আমার বাড়ি পাহারা দিবি আজ?

কুসুম ঘাড় নেড়ে বলে, দেশে! যাও না। মা-বাবাকে দেখে এসো গিয়ে। অনেকদিন তো যাওনি।

বীণা গড়িমসি করে উঠতে যাচ্ছিল, কুসুম হঠাৎ বলল, একটা খবর আছে বীণাদি।

কী খবর?

আমার কাঁচরাপাড়ার জামাইবাবু এসেছে। বলল পালপাড়ায় তোমার শাশুড়ি ঠাকরুন গত হয়েছেন।

মানে! মারা গেছে নাকি?

হ্যাঁ, চার পাঁচদিন হল। খবরটা তোমাকে দিতে বলছিল।

বীণা একটু স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। শাশুড়ি! হ্যাঁ, এখনও তো সম্পর্কটা সামাজিকভাবে আছে। কী করবে সে? তার কি কিছু করা উচিত?

কুসুম তার দিকে চেয়েছিল। খবরটা শুনে তার কী প্রতিক্রিয়া হয়, সেটাই দেখছে বোধ হয়।

বীণা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, কি করে হল?

তা তো জানি না। নিমাইদাদা নাকি উত্তম কুস্তম কান্নাকাটি করছে। জল অবধি খাচ্ছে না। ভীষণ অবস্থা। মাকে বড় ভালবাসত, তাই না?

বাসত। খুবই বাসত। নিমাইয়ের কাছে মা বাপ ছিল দেবতার মতো। বিয়ে হয়ে এসে বীণা অনেক অভাবের কষ্ট সয়েছে, কিন্তু শাশুড়ির মুখঝাড়া খায়নি কখনও। বড় নিরীহ মানুষ, বড় বোকাসোকা। অনেকটা তার মায়ের মতোই। আরও নিরীহ। আরও বোকা।

খবরটা কি তোর নিমাইদাদাই দিতে বলেছে আমাকে?

কুসুম একটু ইতস্তত করে বলল, না। তোমাকে সে খবর দিতে বলেনি।

ঠিক জানিস?

কুসুম আবার একটু চুপ করে থেকে বলল, কি জানি বাবা, তোমাকে বলা উচিত হবে কিনা। তুমি যা নিমাইদাদার ওপর রেগে যাও।

কী গোপন করছিস বল তো? এমন কী কথা!

আমার জামাইবাবু তো নিমাইদাদার সঙ্গেই পালপাড়া গিয়েছিল। নিমাইদাদা তাকে বলেছে, খবরটা বীণা যেন না পায়, দেখো। তার সুখের জীবন, এসব খবরে তার আনন্দ মাটি হবে। আমরা তো তার কাছে মুছে গেছি, এ খবরে তার আর দরকার নেই।

বীণা একটু জ্বলে উঠল, বলেছে! তাহলে খবরটা আমাকে দিলি কেন?

কুসুম কাঁচুমাচু হয়ে বলে, জামাইবাবু বলল নিমাইদাদা ঠিক কথা বলেনি। শাশুড়ি মরলে তো তোমার অশৌচ হয়। খবরটা না দিলে পাপ হবে।

অশৌচ!

হ্যাঁ, সেটাও তোমাকে বলে দিতে হবে নাকি?

বীণা দাঁতে দাঁত পিষে বলে, অশৌচ হবে কেন? সম্পর্কই যেখানে নেই, সেখানে অশৌচ হবে কেন?

তুমি মানবে না অশৌচ?

কেন মানব?

কুসুম এ জবাবে খুশি হল না। বলল, না মানলে মেনো না। তবে অশৌচ কিন্তু হয়।

বীণা স্তব্ধ হয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, ওসব আমি মানি না। আমার কেউ নেই।

কুসুম খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, অন্তত নিরামিষটা তো খেতে পারো। চুলে তেল-টেল দিলেই হল।

বীণা একটা শ্বাস ফেলে বলে, তোদের অনেক সংস্কার।

কুসুম মুখটা শুকনো করে বলে, তা যাই বলো, এসব মানতে হয়।

সাহেবরা তো অশৌচ মানে না, তাদের কোন ক্ষতিটা হয়েছে শুনি? দুনিয়াটা তো তারাই চালাচ্ছে। আমরা এত মানছি, তাতে কোন হাত পা গজিয়েছে আমাদের। ধুঁকছি।

কুসুম একটু অবাক হয়ে বলে, সাহেবদের কথা ভেবে কী হবে? তারা আলাদা মানুষ। আমরা তাদের মতো নই। তুমি কেন রেগে যাও বীণাদি? নিমাইদাদা কাছে থাকলে তুমিও কিন্তু মানতে। যাকগে বাবা, যা ভাল বোবঝা করো। আমি আর কিছু বলব না।

আমি যাচ্ছি কুসুম। তুই ঘরদোর দেখে রাখিস।

এসো গিয়ে।

বীণা উঠল।

কুসুম হঠাৎ বলল, শোনো, এ খবর শুনলে স্নান করতে হয়।

বীণা বলল, না করে দেখিই না কী হয়!

বীণা শাড়ি পাল্টাল, মুখে একটু পাউডার দিল, সামান্য লিপস্টিক ছোঁয়াল। পাঁচ হাজার টাকা-ভরা ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। খুব তীক্ষ চোখে আগাগোড়া লক্ষ করল তাকে কুসুম। কুসুম খুশি হচ্ছে না। কুসুম তাকে সমর্থন করছে না।

বীণা বাস স্ট্যান্ডে এসে দুপুরের রোদে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার কান্না পাচ্ছে না, কিন্তু কে জানে কেন মনটা খারাপ লাগছে একটু।

বিষ্ণুপুরে যখন পৌঁছলো তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে সে অবাক হয়ে থমকে দাঁড়াল। এ কাদের বাড়ি? সে কি ভুল বাড়িতে ঢুকছে? মা-বাবার ঘরখানা লোপাট। চারদিকে ইট কাঠ টিন ভূপাকার ছড়ানো। অনেকগুলো মিস্তিরি গোছের লোক ধ্বংসস্তূপের ভিতরে কি সব করছে।

সে চেঁচিয়ে ডেকে উঠল, মা!

নয়নতারা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে একগাল হেসে বলে, ওমা, তুই এসেছিস? আয়, দ্যাখ কী সব কাণ্ড হচ্ছে!

কী কাণ্ড মা?

কৃষ্ণ আমাদের বাড়ি করে দিচ্ছে যে!

দাদা বাড়ি করে দিচ্ছে? কই আমাকে খবর দাওনি তো!

বড্ড তাড়াতাড়ি সব হয়ে গেল কিনা! আমরা বামার ঘরটায় আছি। যা, গিয়ে ও ঘরে কাপড়-টাপড় ছাড়।

মেজদা নেই?

না। সে চলে গেছে। অনেক কথা। পরে শুনিস।

বীণা অবাক চোখে ভাঙা ঘরের জায়গাটা দেখছিল। ফাঁকা ন্যাড়া অদ্ভুত দেখাচ্ছে। জন্ম থেকেই দেখে-আসা চেনা জায়গাটা কেমন হবে এবার!

কত বড় বাড়ি হবে মা?

ওরে সে মস্ত বাড়ি হবে শুনছি। তিনতলা। বড় বড় ঘর হবে, বারান্দা হবে, দরদালান হবে, বাথরুম হবে, ঠাকুরঘর হবে, কল লাগানো হবে, পাম্প বসবে কুয়োয়।

বলো কী! দাদা এত করবে?

করছে তো।

বীণার মনটা ভিজে গেল। মা-বাবাকে সে চিরকাল কষ্ট করতেই দেখে এসেছে। এত সুখ সইবে তো!

বীণা একটা শ্বাস ফেলে বলল, যাক, তাহলে দাদার এতদিনে সুমতি হল।

ওকথা কেন বলছিস? কৃষ্ণর কি কখনও কুমতি ছিল! ওই খাণ্ডার বউয়ের পাল্লায় পড়ে অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কৃষ্ণর মনটা তো আমি জানি। কষ্ট করে মানুষ হয়েছে, সেই কষ্ট তোরাও করিসনি। দুঃখীর ছেলে বলেই সে বরাবর আমাদের দুঃখ বুঝত। কিছু করতে পারত না, তা সেটা তার দোষ নয়।

তুমি তো বরাবর দাদার পক্ষে মা, দাদার এতটুকু নিন্দে সইতে পারো না।

নয়নতারা অহংকারে উজ্জ্বল মুখে বলে, আমার কথার কী দাম বল? কিন্তু আজ যে দুনিয়াসুদ্ধ লোক আমার কৃষ্ণর নামে জয়জোকার দিচ্ছে! দেখতে পাস না আমার কৃষ্ণ কিরকম মাথা-উঁচু মানুষ। আমি কি এমনি এমনি পক্ষ নিই?

বীণা মুখটা চুপ করে বলে, হ্যাঁ মা, দাদা আজ অনেক বড়, আমাদের নাগালের বাইরে। দাদা বলে ভাবতেও ভয় করে। পরিচয় দিলে লোকে বিশ্বাস করে না।

বীণা ধীর পায়ে ঘরে এল। কাপড় ছাড়ল। তারপর শুয়ে রইল একটু চুপচাপ। কী করবে সে এখন? কী করা উচিত? শাশুড়ির মরার খবরটা পেয়ে অবধি তার মৃদু একটা অস্বস্তি হচ্ছে। মন থেকে তাড়াতে পারছে না অস্বস্তিটাকে।

বাবা কোথায় গিয়েছিল। গরমে ঘেমে ফিরে এসে তাকে দেখে বলল, কখন এলি?

একটু আগে। তোমরা বেশ সুখে আছো, না বাবা? পাকা বাড়িতে থাকবে।

বিষ্ণুপদ জামাটা ছেড়ে রেখে বসল। তারপর বলল, সংসারে সুখ বড় একটা নির্ভেজাল হয় না। তার মধ্যেও কত চোরা টান, কত শত্রুতা থাকে। বামা তো শুনছি আইন আদালত করবে। বাড়ির কাজ না বন্ধ হয়ে যায়।

কেন, বাড়ি হলে মেজদার ক্ষতি কী?

সেটা সে-ই জানে। গত রোববার সে বড় বউমাকে নিয়ে এসেছিল। বড় বউমা এসে মিষ্টি মিষ্টি করে অনেক কথা শুনিয়ে গেল। মনটা তাই ভাল নয়।

বউদি কথা শুনিয়ে গেল? কেন বাবা?

বিষ্ণুপদ অসহায় ভাবে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে বলে, সে সব বুঝবার মতো মাথা কি আমার আছে? তোর মাও বোকা মানুষ।

কী বলছিল?

সে শিক্ষিতা মেয়ে, পাপষ্টি তো ঝগড়া করে না। নানারকম কথা বলল। ইংরেজিতেও অনেক কথা। সব কি বুঝি? তবে জানিয়ে গেল এ কাজটা ভাল হচ্ছে না।

এ বাড়িতে এল, ভাতটাত খেয়েছে তো?

না। খেয়ে এসেছিল। চা-টুকু খেয়েছিল। সেটাই ভাগ্যি। তবে তার দোষ নেই। কৃষ্ণ খরচটাও তো কম করছে না! বউমার সেটা ভাল না লাগতে পারে। আমি সেই থেকে ভাবছি, এ বাড়ি কি আনন্দের বাড়ি হবে? বামা ক্ষেপে আছে, বড় বউমা খুশি নয়, ওই দালানে থাকতে কাঁটা কাঁটা লাগবে না একটু?

তা কেন বাবা? টাকা তো বউদির নয়, দাদার।

হ্যাঁ। কৃষ্ণ পরদিন এসে সে কথাই বলল। বউমা যে কথা শোনাতে আসবে তা জানা ছিল তার। তাই পরদিনই এসে হাজির। আমাদের মন খারাপ দেখে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে গেল। তোর মুখটা অমন শুকনো কেন বল তো?

রোদে এলাম তো!

তাই হবে।

বীণা বারবার আনমনা হয়ে যাচ্ছে। বারবার মনে হচ্ছে। অশৌচ! হঠাৎ হঠাৎ মনে হচ্ছে, পালপাড়া। মাঝে মাঝে বুকটা ধক করে উঠছে।

খাওয়ার সময় সে ইচ্ছে করেই জিজ্ঞেস করল, মাছ নেই মা?

নয়নতারা বলল, মাছ তো রোজ আসে না। মাঝে মাঝে। তাও এখন ঘর ভাঙাভাঙির গণ্ডগোলে আমাদের খাওয়া-দাওয়া সব মাথায় উঠেছে।

রাঙা বলল, আজ রাতে তোমাকে ভাল মাছ খাওয়াবো।

রাতে! বলে একটু থমকাল বীণা। তারপর বলল, আজ রাতে আমি থাকব না তো!

ওমা! কেন? গোপাল যে তোমাকে দেখে কত লাফালাফি করল! পটল তো বলছে, সাতদিন রেখে দেবে তোমায়।

না বউদি। আজ যেতে হবে।

এত অল্প সময়ের জন্য কেউ আসে?

পরে এসে থাকব। দালানও উঠে যাবে ততদিনে। কী বলো?

৮৬

গ্যারেজের ওপর একখানা ঘর, কাঠের পার্টিশন করা। সামনে রিসেপশন। ভিতরের ঘরে দুটো কম্পিউটার। এই ঘরেই একটা এয়ারকুলার চলে। ঝুমকির নতুন অফিস। মাইনে তিনশো টাকা। কনফার্মড হলে বারোশ হওয়ার প্রতিশ্রুতি আছে। কিন্তু অফিসে প্রথম দিনেই ঝুমকি বুঝতে পারছিল, প্রতিশ্রুতি বোধহয় শেষ অবধি রক্ষা করবে না এরা। কারণ একটা রোগা মেয়ে বাসবী তাকে চুপি চুপি বলল, আমি দু' বছর 'আছি। মোটে চারশ টাকা পাই।

তবে আছো কেন?

এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করছি। কিছুদিনের মধ্যেই চাকরি পেয়ে যাবো।

পার্মানেন্ট হওনি এখনও?

ওটা হচ্ছে খুড়োর কল। পার্মানেন্টও হব না, মাইনেও বানোশ টাকায় পৌঁছবে না। দরকার কি বলো? তিনশ-চারশতেই তো আমাদের মতো ছেলেমেয়েদের পেয়ে যাচ্ছে। চলে গেলে সঙ্গে সঙ্গে অন্য একজন ঢুকে পড়ছে। চাকরির বাজার তো জানো।

তুমি চারশতেই দু' বছর আছো?

আছি। টাকার দরকার ছিল, তাই খুব খাটতাম প্রথম প্রথম। ভাবতাম বুঝি কাজ দেখে খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি পার্মানেন্ট করে দেবে। শেষে দেখলাম, খেটেই মরছি, এদের গা নেই।

এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে?

কিছুটা। সব সময়ে তো আর মেশিন অপারেট করতে দেয় না, রিসেপশনে বসিয়ে রাখে বা অন্য সব অফিসে লেগ ওয়ার্ক করতে পাঠায়। ছাত্র-ছাত্রীও তত বেশি হয় না। তিনটে শিফটে মেরেকেটে জনা পনেরো। জায়গাও তো নেই।

একটু দমে গেল ঝুমকি। এই চাকরির জন্য সে বাবার সঙ্গে কত ঝগড়া করেছে। বাবা কিছুতেই তাকে চাকরি করতে দিতে চায়নি। সেও করবেই। তাও মাইনের কথা বাবা জানে না। জানলে বোধহয় বাবার আবার হার্ট অ্যাটাক হবে।

কে যে মালিক তা বোঝা মুশকিল। একজন চটপটে স্মার্ট ছোকরা তার ইন্টারভিউ নিয়েছিল। কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছে না। একজন পেটমোটা যুবক বসে আছে সামনের ঘরে। হেলাফেলার ভাব। তাকে দেখে নড়লও না। জয়েন করতে এসেছে শুনে বলল, বৈঠ যাইয়ে।

পরে কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী এল, তাদের মধ্যে দুজন বেশ বয়স্ক লোকও আছে। কিছুটা শেখাল তাদের বাসবী। প্রথম দিন ঝুমকিকে মেশিন দেওয়া হল না। মেশিনে ছিল আর দুজন পুরুষ ট্রেনার। একজনের নাম শুভ, অন্যজন দেবদত্ত। দেবদত্ত গোমড়ামুখো, কথা-টথা বলে না। শুভ আলাপী না হলেও কথাটথা বলল। জিজ্ঞেস করল, আপনি কি নীডি?

হ্যাঁ, অবশ্যই।

তা হলে এখানে সুবিধে নেই। অবশ্য আপনাকে দেখে নীডি মনে হয় না।

কেন বলুন তো!

এই তো মুশকিলে ফেললেন। চেহারা-টেহারা দেখে আন্দাজ করছি।

ঝুমকি একটু হাসল। বলল, আমার নীডটা আর ক'দিন পরেই দেখা দেবে। আপনাকেও কি এরা কম মাইনে দেয়?

এখানে ম্যাক্সিমাম মাইনে পাই আমি আর দেবদত্ত। তাও ঝুলোঝুলি করে পাঁচশো।

ক'বছর আছেন?

প্রথম থেকে। সাড়ে তিন বছর।

মাত্র পাঁচশো টাকায়?

কী করব বলুন! কম্পিউটারের বাজারটাও স্যাচুরেটেড হয়ে যাচ্ছে। আমরা যা শিখেছি তা যথেষ্ট নয়। হায়ার ট্রেনিং থাকলে ভাল হত।

এখানে ও লেভেল কোর্স আছে?

শুভ হাসল, তাই তো বলে। কিন্তু ওই নামেই ও লেভেল। আপনি তো এসব না জানেন এমন নয়।

ঝুমকি এখনও অনেক কিছু জানে না। সে বলল, মেশিন তো মাত্র দুটো, আমাকে তা হলে কী করতে দেবে এরা?

শুভ হাসল, ঝুলঝাড়নি বা ঝাঁটাও ধরিয়ে দিতে পারে। রাগ করবেন না, প্রথম প্রথম আমাকে আর দেবদত্তকে তাও করতে হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম এরা আমাদের আন্তরিকতার দাম দেবে। দেয়নি।

ঝুমকি বলল, এরা আসলে কারা? মালিক কে বলুন তো!

মধ্যপ্রদেশের লোক। যে আপনার ইন্টারভিউ নিয়েছিল সে হল মালিকের ছেলে। নবীন প্রসাদ। আর এখন যে বসে আছে সে হল নবীনের ভাই যম্‌না

লোক কেমন?

যেরকম দেখছেন সেরকমই। যত তাড়াতাড়ি পারে টাকা কামিয়ে নেওয়ার ধান্দা ছাড়া এরা আর কিছু বোঝে না।

ভারাক্রান্ত মনে সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরল ঝুমকি।

বাবা জিজ্ঞেস করল, কী হল?

ঝুমকি একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, কী আবার হবে? চাকরি করে এলাম।

মনীশ ভ্রূ কুঁচকে বলল, আমি জিজ্ঞেস করছি কনসার্নটা কেমন বুঝলে।

প্রথম দিনেই কি বোঝা যায়? ভালই।

মাইনে কত?

এখনও ঠিক হয়নি। এক মাস যাক তো।

তার মানে কি ওরা মাইনেটা কমিট করছে না? না কি তুই চেপে যাচ্ছিস?

আচ্ছা বাবা, অভিজ্ঞতারও তো একটা প্রয়োজন আছে। প্র্যাক্টিসে না থাকলে যে সব ভুলে যাবো। পয়সা খরচ করে শেখাটাই বৃথা হবে।

এটা শেখারও তোর কোনও দরকার ছিল না। এম এ পাশ করতে পারতি।

লাভ কী বলো!

কিসের লাভ? চাকরির কথা ভেবে পড়াশুনো যারা করে তাদের পড়াশুনোটাও বৃথা। জানার জন্য যদি পড়তি তা হলে তার একটা দাম হত।

আজকাল তো কেউ জানার জন্য পড়ে না বাবা, চাকরির জন্যই পড়ে। জানার দাম আছে ঠিকই। কিন্তু দাম তো কেউ দেয় না।

মনীশ বলল, তোর জন্য আমার টেনশন হচ্ছে। এরা কেমন লোক জানি না, তুই একটা বয়সের মেয়ে, বিপদ হবে না তো!

কেন ভাবছো বাবা? বিপদ এত সহজ নয়। ওখানে আর একটা মেয়ে আছে। জমজমাট অফিস।

মনীশ চুপ করে গেল। মুখে একটুও হাসি নেই।

আজ বাবার সঙ্গে খুনসুটি করল না ঝুমকি, যা সে রোজই একটু করে। আজ সে সোজা নিজের ঘরে চলে গেল এবং ভাবতে বসল। চাকরিটা তার ভাল লাগছে না।

চারুমাসির ফোনটা এল রাত আটটা নাগাদ।

এই ঝুমকি, চাকরিতে জয়েন করলি আজ?

হ্যাঁ মাসি।

যাক বাবা, বাঁচা গেল।

কেন মাসি?

ভাবছি তোর চাকরির অনারে কাল ডিনার খাওয়াবো।

তার চেয়ে বেড়ালের বিয়ে দাও না। আগের দিনের বড়লোকরা তো এসব ছুতোয় টাকা ওড়াত।

ইয়ার্কি করছিস?

যা চাকরি এর অনারে ডিনার দিলে যে আমার লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করবে।

শোন, কাল শনিবার। তোর মা বাবা অনু বুবকা সবাইকে নিয়ে চলে আয় সন্ধেবেলা।

প্লীজ মাসি, এতটা কোরো না। আমার লজ্জা করছে।

যাঃ, লজ্জা কিসের?

তুমি সব সময়েই কেবল বাড়িটাকে একটা নেমন্তন্ন বাড়ি করে রাখো! তোমার বুঝি অকেশনেরও দরকার হয় না?

এটাই তো জীবন। শোন, সামনের মাসের শেষ দিকে আমি লম্বা ট্যুরে বাইরে চলে যাচ্ছি। অন্তত ছ'মাস। নন্দনাকে হয়তো ওর বাবা আমেরিকার একটা স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে আসবে এবার।

ওমা! কেন? ওইটুকু মেয়েকে?

ওর বাবা খুব চায় মেয়েটা আমেরিকায় পড়ুক। অবশ্য এখনও সব ঠিক হয়ে যায়নি। আমার ইচ্ছেও নেই। যা সব শুনি আমেরিকার হালচাল তাতে ভয় করে। বারো-তেরো বছর বয়স থেকেই নাকি সেক্স শুরু হয়। ভাব তত একবার কী কাণ্ড!

তুমি রাজি হয়ো না মাসি।

এখনও হইনি। তা ছাড়া এখন ছাত্র-ছাত্রীদের নিতেও চাইছে না আমেরিকা। সুব্রত খুব চেষ্টা করছে অবশ্য। আসল কথাটা হল, ছ'মাস তো আমি থাকব না, তাই এই ক'দিন একটু মেলামেশা করে নেবো সকলের সঙ্গে।

তুমি না থাকলে ছ'মাস যে আমারই কি করে কাটবে! খুব খারাপ লাগবে আমার।

কেন, চাকরি তো করছিস। ব্যস্ত থাকবি।

ছাই। আজ জয়েন করে মন এত খারাপ হয়ে গেল!

কেন রে? ওরা ভাল নয়?

একদম বাজে।

তা হলে ছেড়ে দে।

দিয়ে? কিছু তো করতে হবে।

আচ্ছা মুশকিল। করতেই হবে কেন? ভাল না লাগলে ছেড়ে দিবি।

অত সোজা নয় মাসি। বাড়িতে আমার প্রেস্টিজ বলে কিছু আর থাকবে না।

আচ্ছা, তুই কাল সবাইকে নিয়ে আয় তো। দেখা যাবে।

কী দেখবে মাসি?

কিছু একটা করতেই হবে তোর জন্য। আচ্ছা, আমার পি.সি-তেই তো তুই এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করতে পারিস। চাকরির কী দরকার?

একা একা হয় না মাসি। দেখানোর লোক চাই। আমি এমন কিছু বেশি তো শিখিনি।

আচ্ছা, আয়। আমি সুব্রতর সঙ্গে কথা বলছি।

আবার আমার জন্য ওঁকে কেন জ্বালাতন করবে?

করব, আমার ইচ্ছে। ও হয়তো ইচ্ছে করলে পারে।

একজনকে তো যথেষ্ট জ্বালাতন করেছে। আবার আর একজনকে কেন?

কাকে জ্বালাতন করেছি? হেমাঙ্গর কথা বলছিস? ও একদম কোনও কাজের নয়। এখন তো বলছে কাজকর্ম সব বন্ধ করে পৃথিবীকে দূষণমুক্ত করার কাজে লাগবে।

সে কী? এটা কবে থেকে?

কৃষ্ণজীবনবাবুর একটা বই বেরিয়েছে জানিস?

জানি তো।

সেটা পড়ে ওর মাথা গরম হয়েছে। একদম পাগল।

জোর করে একটা বিয়ে দিয়ে দাও। পাগলামি সেরে যাবে।

বিয়ের কথা আর বলিস না। রশ্মিকে নিয়ে কী বিশ্রী কাণ্ড করল বল তো। অত ভাল মেয়েটা।

ভাল মেয়ে অনেক পাবে।

রশ্মির মতো তো আর পাবো না। বেশ ছিল।

যাই বললা বাপু, আমার আবার তত ভাল লাগত না।

কেন রে?

কী জানি! রশ্মির সব বেশি বেশি।

পড়ে তো থাকবে না। শুনছি তো তারও একটা হিল্লে হচ্ছে।

কী বলছো?

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চারুশীলা বলল, কাল ফোন করেছিল। সেরকমই একটা আভাস দিল যেন।

কী বলল বলো তো?

কাল বলব। আসবি কিন্তু। তোর মাকে ফোনটা দে। নেমন্তন্নটা আমারই করা উচিত।

ঝুমকির বুক কেন কাঁপছিল? মায়ের হাতে ফোনটা ধরিয়ে দিয়ে সে নিজের ঘরে এসে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। তার যেন ঘাম দিয়ে একটা জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে। হাত-পা অবশ লাগছে। রিলিফ! কিন্তু কেন?

পরদিন সন্ধেবেলা চারুশীলার বাড়িতে একগাদা অতিথি দেখে অবাক হল ঝুমকি। পারেও খরচ করতে মানুষটা।

এত আয়োজন কেন মাসি? বোলো না যে আমার চাকরির অনারে।

চাকরির অনারে না হোক, তোর অনারে।

আমার অনারেই বা কেন?

আমার তো জানিস একটা ছুতো দরকার হয়। আমি আসলে মানুষ ভালবাসি।

সে জানি।

অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ল চারুশীলা। ঘুরে ঘুরে হলঘরে সকলের মুখ দেখছিল ঝুমকি। যারা চারুশীলার বাড়ির নেমন্তন্নে প্রায়ই আসে তারা সবাই আছে। বাদ শুধু হেমাঙ্গ। একটু অদ্ভুত ব্যাপারটা।

চারুশীলা একটু বাদে এসে বলল, চল কোথাও বসি। একটা ঠাণ্ডা খাবি?

না। আমার টনসিলটা বেড়েছে বোধহয়। অফিসের কুলারটা সহ্য হচ্ছে না।

ছেড়ে দে।

কুলারে আমার অভ্যাস আছে। যেখানে শিখতাম সেখানেও কুলার ছিল। কিন্তু এই অফিসের কুলারটা বড্ড ঠাণ্ডা।

চাকরি করিস না ঝুমকি।

এবার বললা তো, রশ্মি কী বলেছে?

চারুশীলা একটু দ্বিধা করল। বলল, বলাটা কি ঠিক হবে। আমাকে প্রাইভেটলি বলেছে। হেমাঙ্গকে বলতে বারণ করেছে এখন।

আহা, বলো না!

কাউকে বলিস না।

বলব না মাসি। বলো।

একটা বাঙালি ছেলের সঙ্গে ওর একটু আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে। ছেলেটা লন্ডনের একটা বড় ব্যাঙ্কে মস্ত চাকরি করে।

আন্ডারস্ট্যান্ডিং মানে?

তুই কি আন্ডারস্ট্যান্ডিং মানেও ভুলে গেলি?

কিরকম আন্ডারস্ট্যান্ডিং?

বলল, একা থাকা এখন বেশ বিপজ্জনক। ভালও লাগছে না। তাই ও শিগগিরই একটা ডিসিশন নিতে চায়।

বিয়ে করবে?

ভাবছে।

এত ভাবার কী আছে?

আছে রে আছে। বিয়ে সাঙ্ঘাতিক জিনিস।

তা জানি। কিন্তু বেশি ভাবতে গেলে আবার কেঁচে যাবে।

চারুশীলা হাসল। বলল, না, কাঁচবে না। রশ্মি খুব প্র্যাকটিক্যাল মেয়ে। সে বিয়ে করবে বিয়ের প্র্যাকটিক্যাল প্রয়োজনের জন্যই। ভাবাবেগ থেকে নয়।

রশ্মি সম্পর্কে আমার এ কথাটাই তোমাকে বলার ছিল মাসি। রশ্মি বড় বেশি প্র্যাকটিক্যাল, সহজ, বাস্তববাদী। সে আমাদের মতো নয়।

চিন্তিতভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে চারুশীলা বলল, সেটা কি আমি জানি না? হেমাঙ্গর সঙ্গে ওই একটা জায়গায় ওর মেলে না। কিন্তু হেমাঙ্গ যে বড় বেশি স্বপ্নবিলাসী, বড্ড ভাবাবেগ! উদাসী ধরনের ছেলে। ভেবেছিলাম, রশ্মিই ওকে চালিয়ে নিতে পারবে।

ঝুমকি একটু হাসল।

চারুশীলা একটা শ্বাস ফেলে বলল, এই এক পাগলকে নিয়ে কি করি বল তো। কাল রাতে ফোন করেছিলাম। ওর চাকর বলল, দাদাবাবু নাকি কাল বিকেলেই তার গাঁয়ের বাড়িতে চলে গেছে।

ও। বলে ঝুমকি বুকের মধ্যে একটা পতনের শব্দ পেল কি?

চারুশীলা আবার অতিথি অভ্যর্থনায় এগিয়ে গেল।

ঝুমকি সরে এল একটা কোণের দিকে। একা। তার বেশি কথা বলতে ভাল লাগছে না। মেলামেশা ভাল লাগছে না।

রাত্রিবেলা যখন নিজের ঘরে একা হল ঝুমকি, অন্ধকারে জেগে থেকে তখন নিজের সামনে অকপট নিজেকে দাঁড় করাল সে। প্রশ্ন করল, সত্য বলো।

ঝুমকি বলল, তাই।

তাই? ঠিক জানো?

ঝুমকি বলল, মনে তো হচ্ছে।

ঠিক হল কাজটা?

কে জানে!
ভাবো। আরও ভাল করে ভাবো।
ভাবছি। দিনরাত ভাবছি।
কোনও ভুল নেই?
হয়তো ভুলই হচ্ছে। ভীষণ ভুল।
তার কথা কি গোপন রাখব সকলের কাছে?

৮৭

আর কী বাকি রাখলেন বলুন তো! নৌকো বাওয়া শিখলেন, মাছের জাল ফেলা শিখলেন, হাল চাষ শিখলেন! লেখাপড়া যা শিখেছিলেন সব তো ভুলে মেরে দেবেন এর পর।

শিখলাম আর কই? শুধু কায়দাটা শিখলেই কি হল? অভ্যাস করতে হবে না? নৌকো বাইতে বাইতে আর হাল চাষ করতে করতে যখন হাতে কড়া পড়বে, লোহার মতো শক্ত হয়ে যাবে তখন বুঝব যে শিখেছি।

আর লেখাপড়া যা শিখলেন তার গতি কী হবে? এই হাল চালানো, নৌকো বাওয়া বা মাছ ধরা এসব কি আপনার কাজ? এ শিখে কী হবে?

হেমাঙ্গ একটু হেসে বলে, এ শেখাটা তোমার কাছে কিছু নয় বুঝি?

এ তো সবাই পারে। কিন্তু মাথার কাজ তো সকলকে দিয়ে হয় না।

বাঁকা মিঞা, এ শেখার দাম তোমার কাছে না থাক, আমার কাছে অনেক। আগে বিচি দেখে গাছ চিনতে পারতাম না, কত বোকা আর অশিক্ষিত ছিলাম বলো তো? জীবনটাকে সাপটে ধরতে হলে এসবও দরকার হে।

আপনার দরকার আপনি বুঝবেন। কিন্তু বিডন স্ট্রিটের বাড়িতে গেলে মা ঠাকরুন আমাকেই ধরে পড়বেন, ও বাঁকা, তোমার পাল্লায় পড়েই আমার এ ছেলেটা গোল্লায় গেল।

গোল্লায় আগে ভাল করে যাই তবে তো!

যেতে আর বাকিটা কী? গত সাত দিন কলকাতায় যাননি। কত কাজকর্ম বকেয়া পড়ে আছে ভাবুন তো!

সেসব আমার পার্টনাররা সামলে নেবে বাঁকা, ভেবো না। জীবনের একটা দিক আমার একদম অচেনা থেকে গিয়েছিল, সেইটে ভাল করে চেনা দরকার।

বাঁকা মিঞা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, এ আবার চেনাচেনির কী আছে? চাষাভুষো, জেলে, মাঝির জীবনে কিছুই নেই। পেট আছে আর পেটের চিন্তা আছে। গতর খাটিয়ে চাট্টি খাওয়া। এর মধ্যে কোন মধু আছে?

সে তুমি বুঝবে না।

বুঝবে না বলে তো আমাকে ঠেকালেন, শেষে দায়টাও আমার ওপর পড়বে।

তা দায় তোমারও একটু আছে। এমন সুন্দর জায়গাটায় এনে ফেললে যে আমার যেতেই ইচ্ছে করে না।

মাঝে মাঝে না গেলে চলবে কেন? তা সেই যার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল তিনি কি চলে গেলেন?

হুঁ।

বিয়েটা হলে আপনার একটু ঘরমুখো ভাব হত।

হেমাঙ্গ হাসল, বিয়ের দরকার নেই বাঁকা মিঞা। বউ এসে আমার জীবনটাকে ছোট ফ্রেমে বাঁধিয়ে নেবে। তখন কি আর ইচ্ছেমতো চলে আসতে পারব? এই যে সাত দিন ধরে এক মুক্ত জীবন ভোগ করছি এ আর পারব?

আমারও তো সেই কথা। এ সব করার দরকারই বা কী?

হেমাঙ্গ মাথা নেড়ে বলল, তুমি কিছুতেই সেটা বুঝতে পারবে না। আচ্ছা বলল তো, এই জায়গাটাকে তুমি কি সুন্দর দেখ?

মুশকিলে ফেললেন। এখানেই আমার জন্ম।

আমারও জন্ম। আমি এখানে নতুন করে জন্মেছি। তুমি জন্মেছো বটে, কিন্তু এ জায়গা রোজ দেখেও দেখনি। তোমার চোখই যে পুরনো।

বাঁকা মিঞা মাথা নেড়ে বলে, নাঃ, আপনার রোগের চিকিৎসা নেই।

কথা হচ্ছিল দাওয়ায় বসে। একখানা মোড়ার ওপর বাঁকা মিঞা, আর জলচৌকিতে হেমাঙ্গ। বর্ষার পর শরতের আসি-আসি ভাবটা চারদিকে খুব টের পাওয়া যাচ্ছে। হেমাঙ্গর শিউলি গাছ দুটোয় দুটো চারটে ফুল হয় আজকাল। আকাশে মাঝে মাঝে মেঘের সঞ্চার হয়, হুড়মুড় করে বৃষ্টি নামে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মেঘ কেটে গিয়ে এক আশ্চর্য রোদ্দুরে ঝলমল করতে থাকে চারদিক। কাশফুল ফোটে কাছেপিঠেই, নৌকো বেয়ে গিয়ে সেই কাশফুলের শোভা প্রায়ই দেখে আসে হেমাঙ্গ। স্পষ্টভাবে নয়, কিন্তু অস্পষ্টভাবে হেমাঙ্গ আজকাল এই জগতের সঙ্গে, এই মহাবিশ্বের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের একটা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূত্রকে টের পাচ্ছে। বাঁকা মিঞা সেই গভীর আবিষ্কারের খবর রাখে না। বাঁকা মিঞার কাছে তার এইসব আচার-আচরণ একটা মহাপতন, এক সাংঘাতিক সর্বনাশ।

তুমি আমাকে নিয়ে এত ভাবছ কেন বাঁকা?

ভাবছি, তার কারণ আছে। আজ কলকাতায় যাব। বিডন স্ট্রিটে আপনাদের বাড়িতেও একবার যেতে হবে। মাঠাকরুন সুন্দরবনের মধু চেয়েছিলেন। তা, তার জোগাড় হয়েছে। সেইটে নিয়েই যাব। গেলে পর আপনাকে নিয়ে কথা উঠবে। কী বলব তাই ভাবছি।

হেমাঙ্গ হাসল, আমাকে কি তুমি জোর করে ধরেবেঁধে রেখেছ এইখানে? আমি তো নিজের ইচ্ছেয় আছি।

সে তো ঠিকই। কিন্তু ইচ্ছেরও তো নানারকম ব্যাখ্যা হয়। দাড়ি লম্বা হচ্ছে, চুলে জট ধরছে, গায়ের রং তামাটে মেরে এল—এ তো ভাল লক্ষণ নয়। কিছু একটা হয়েছে আপনার, মুখে বলছেন না।

তা তো হয়েছেই। কী মনে হচ্ছে জানো? এই দুনিয়ায় জন্মে এতকাল দুনিয়াটাকে চিনবার চেষ্টাই করিনি, দুনিয়াটার ভাল-মন্দ নিয়ে ভাবিওনি কিছু, এত যে মানুষজন তাদের সঙ্গে সম্পর্কও তৈরি করিনি। অনেক বকেয়া পড়ে গেছে। দুনিয়াটাকে এখন নানাভাবে চিনবার চেষ্টা করছি।

বাঁকা মিঞা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল। বলল, কলকাতা থেকে ফিরে কাল সকালে খবর দিয়ে যাব'খন।

খবর! না, কলকাতার খবরে আর দরকার কি আমার?

বাঁকা মিঞা অবাক হয়ে বলে, মা বাপ কেমন আছে সেটাও কি জানতে ইচ্ছে করে না আপনার?

ভালই আছে বাঁকা, তারা ভালই আছে।

বড্ড চিন্তায় ফেলে দিচ্ছেন।

সকালের নরম রোদে উঠোন ভরে আছে। বাঁকা চলে যাওয়ার পর তার ছোট উঠোনে রোদের লালচে নরম আলো আর গাছের চিকরি-মিকরি ছায়ার কাঁপন চোখ ভরে দেখছিল হেমাঙ্গ। কত পোকামাকড় আসে। কত অদ্ভুত ধরনের তাদের ওড়াওড়ি, ঘোরাঘুরি। আকাশের মেঘে কত আকার। আজকাল তার প্রকৃতিমুগ্ধতা এসে গেছে।

কী গো দাদা, বসে বসে হাঁ করে কী ভাবছ? চা খাওনি এখনও?

হেমাঙ্গ বাসন্তীর দিকে চেয়ে বলল, হ্যাঁ রে, চা খাওয়ার এখন কী দরকার? ছেড়ে দিলেই তো হয়!

ওমা! ছাড়বে কেন? তোমার চা করতে গিয়ে আমিও যে একটু করে খাই।

হেমাঙ্গ হেসে বলল, তাহলে কর।

আজকাল বড্ড আনমনা থাকো। কী হয়েছে বলো তো!

হেমাঙ্গ একটু বিরক্ত হয়ে বলে, তুইও কি বাঁকা মিঞার মতো হলি! সব সময়ে কী হয়েছে, কী হয়েছে। মানুষ মাঝে মাঝে একটু একা থাকতে চায়, একটু ভাবনাচিন্তা করতে চায়। সেটা কি দোষের?

বাসন্তী আগে একটু সমীহ করত হেমাঙ্গকে। আজকাল আর একদম করে না। ঝংকার দিয়ে বলল, আহা, কী হয়েছে জানতে চাইলে বুঝি দোষ হয়? তোমার ভাল-মন্দ নিয়ে ভাবব না তো আর কে ভাববে? বাঁকা চাচা কি সাধে বলে বাবুর ঘাড়ে ভূত চেপেছে?

চোখ পাকিয়ে হেমাঙ্গ বলল, বলেছে?

হ্যাঁ বলেছে। তাতে হয়েছেটা কী? বাঁকা চাচা তোমাকে কত ভালবাসে জানো?

তোদের ভালবাসার জ্বালায় না আমাকে এ গাঁ ছাড়তে হয়।

ছেড়েই দেখ না। কলকাতায় গিয়ে ফের ধরে নিয়ে আসব।

তুই রাখতে চাস, আর বাঁকা তাড়াতে চায়। তার ধারণা হয়েছে আমি কলকাতায় না গেলে দুনিয়া অচল হয়ে যাবে। তোদের দুটিকে নিয়ে যে কী করি!

আর কিছু করতে হবে না, শুধু গোমড়া মুখে থেকো না। একটু কথাটথা কয়ো। আজ সকালেও নাকি আফজলের সঙ্গে নৌকো বাইতে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ তো। জাল ফেললাম।

মাছ পেয়েছ?

পেয়েছিলাম। আফজলকে দিয়ে দিয়েছি।

ওমা! কেন?

মাছে আজকাল আঁশটে গন্ধ পাই। আফজল নিয়ে গেল, কিছু খাবে, কিছু বেচে দুটো পয়সা পাবে।

বাসন্তী অসন্তোষের গলায় বলে, এই করে করে তোমার সব যাবে। মাছ আনলে আজ মাছের ঝাল করে তোমাকে খাওয়াতাম।

ডাল ভাত তরকারিই তো পেট ভরে খাচ্ছি।

তবে ধরারই বা কী দরকার? না-ই যদি খাবে তবে মাছ ধরা শিখছ কেন?

শিখে রাখা ভাল।

তোমার শুধু ওই কথা।

বাসন্তী একটু গনগন করতে করতে স্টোভ জ্বেলে চা করল। তারপর চা দিতে এসে হঠাৎ শিহরিত আতঙ্কিত একটা চিৎকার দিল, ই কী!

চমকে গিয়েছিল হেমাঙ্গ। কাপের চা খানিক চলকে গেল। অবাক হয়ে বলল, কী হয়েছে?

তোমার নখগুলো দেখেছ? এ যে রাক্ষসের নখ হয়ে উঠেছে! মা গো!

হেমাঙ্গ নিজের নখগুলোর দিকে তাকাল। বাস্তবিকই অভদ্র রকমের বড় হয়ে গেছে। নেল কাটার নেই বলে কাটা হয়নি। লজ্জিত হয়ে বলল, কাটতে হবে।

আজই কাটবে। ছিঃ, ওরকম নখ নিয়ে কেউ থাকে? এর পর লোকে তোমাকে বলবে, পাগলা।

নেল কাটার নেই বলে কাটা হচ্ছে না।

আহা, কী কথা! নখ-কাটুনি নেই বলে আমরা বুঝি নখ কাটছি না? মদনদাকে খবর দিচ্ছি, এসে নরুন দিয়ে মুড়িয়ে কেটে দিয়ে যাবে।

নরুনকে হেমাঙ্গর বড় ভয়। যন্ত্রটাকে ছেলেবেলা থেকেই সে সুনজরে দেখে না। তা ছাড়া অন্যের হাতে নখ কাটানোর অভ্যাসও তার নেই। বলল, আচ্ছা, আমি নিজেই কেটে নেব'খন। মদনকে ডাকতে হবে না।

আজই কাটবে?

দেখছি। তুই যা তো, রুটি বানা। খিদে পেয়েছে।

বাসন্তী ঘরের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লে নিজের নখগুলোর দিকে ফের চেয়ে রইল হেমাঙ্গ। বাস্তবিক নখগুলোর একটা ব্যবস্থা না করলেই নয়। আজকাল ভাতের থালায় হাত দিলে নখের শব্দ হয়। নখের গোড়ায় অস্বাস্থ্যকর নীল ময়লাও জমেছে।

নখ নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবল হেমাঙ্গ। তারপর একটা সিদ্ধান্ত নিল।

রুটি বেড়ে এনে বাসন্তী সামনে বসে বলল, হ্যাঁ দাদা, সেই সুন্দর মেয়েছেলেটার সঙ্গে বিয়ে হল না তোমার কেন বলো তো!

কতবার শুনবি?

আবার বললা। তোমার কথাগুলো এমন যে স্পষ্ট করে বোঝা যায় না। বারবার শুনলে বুঝতে পারব।

তুই জন্মেও বুঝবি না।

আচ্ছা, বিয়েটা হল না বলেই কি তুমি বিবাগী হয়ে আছ এখানে?

তাই ধরে নে।

না, স্পষ্ট করে বলো।

হেমাঙ্গ রুটি খেতে খেতে বলল, বিয়ে করে কোন বোকা? বিয়ে তো কয়েদখানা। এই বেশ আছি।

বেশ আছ না ছাই আছ। তোমার মুখচোখ মোটেই ভাল নয় বাপু। সব সময়ে দুঃখ-দুঃখ ভাব করে থাকো।

তাই বুঝি?

আচ্ছা, একটা কথা কইব?

বল না। তোর তো কথার শেষ নেই দেখছি।

কথা না কইলে বাপু আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। আমি নাকি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও রাত-বিরেতে জোরে জোরে কথা বলি। সেইজন্য আমাদের বাড়িতে নাকি কখনও চোর ঢোকে না। বলে হি হি করে খুব হাসল বাসন্তী। হ্যাঁ, সেই কথাটা।

বলে ফেল।

আচ্ছা সেই যে রোগামতো মেয়েটা এসেছিল, কী নাম যেন!

আবার তাকে নিয়ে ভাবছিস কেন?

তার সঙ্গে কিন্তু তোমাকে খুব মানায়। নামটা ঝুমকি না কী যেন?

একটু স্তব্ধ হয়ে থাকে হেমাঙ্গ। বুকের অন্তঃস্থলে থিতানো জলে একটু নাড়া পড়ে কি?

হেমাঙ্গ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ও সব ভাবিস না।

কেন, ভাবলে বুঝি দোষ?

বিয়ে করার প্রশ্নই নেই। করলেও শহুরে মেয়ে নয়।

বাসন্তী চোখ বড় বড় করে বলল, তো কি গাঁয়ের মেয়ে?

যদি কখনও বিয়ে করি তবে গাঁয়ের মেয়েকেই করব।

বাসন্তী হঠাৎ হেসে গড়িয়ে পড়ল, বলো কী গো! গাঁয়ের মেয়েরা যে ভীষণ বোকা আর ঝগড়ুটে হয়। কিছু স্টাইল জানে না। তোমার সঙ্গে মানাবে কেন?

আমি স্টাইল-জানা মেয়ে পছন্দ করি তোকে কে বলল?

লেখাপড়া জানে নাকি তোমার মতো?

লেখাপড়া না জানলেই ভাল। লেখাপড়া তো আর একটা আপদবিশেষ।

তোমাকে নিয়ে আর পারি না বাপু। তোমার ঘাড়ে ঠিক ভূত চেপেছে!

দুপুরে খাওয়ার পর হেমাঙ্গ বিনা ভূমিকায় তার ব্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছিল।

বাসন্তী চেঁচাল, ও কি? কোথায় চললে?

কলকাতায়। নখ কাটতে।

বাসন্তী চোখ বড় করে বলে, নখ কাটতে কলকাতায়?

হেমাঙ্গ একটু হেসে বলে, নেল কাটার ছাড়া হবে না, বুঝলি? এবার যখন আসব যন্ত্রটা নিয়েই আসব। পায়ের নখ এত বড় হয়েছে যে, হোঁচট খেলে এক-আধটা নখ উল্টে যেতে পারে। রক্তারক্তি কাণ্ড হবে তখন।

বাসন্তী কপালে হাত দিয়ে বলে, পোড়া কপাল! বাবু নখ কাটতে কলকাতায় চললেন। তাহলে আর তুমি ইহজন্মে গাঁয়ের মানুষ হতে পারবে না। বুঝলে?

বুঝলাম। ঘরদোর দেখে রাখিস।

সে তোমাকে বলতে হবে না। কবে আসবে?

চলে আসব। খেয়াল হলেই চলে আসব।

আমি এদিকে পাত্রী দেখতে লেগে যাচ্ছি কিন্তু।

মাথায় চাঁটি খাবি। ফাজিল কোথাকার!

বাসন্তী হাসল না। একটু ছলো ছলো চোখ করে বলল, তুমি চলে গেলেই না এ জায়গাটা আমার বড্ড ফাঁকা লাগে। কী করি জানো? তোমার ঘরে এসে বসে থাকি। একা একা ভূতের মতো।

হেমাঙ্গর মনটা একটু মেদুর হয়ে গেল। বলল, দেখিস যেন তোকেও আবার ভূতে না পায়।

ঘাট অবধি এগিয়ে দিয়ে গেল বাসন্তী। বলল, তাড়াতাড়ি চলে এসো কিন্তু।

ভটভটিতে বসে হেমাঙ্গ ছেড়ে-আসা ঘাট আর নদীর ধারে তার ঘরখানার দিকে চেয়ে ছিল। বড় মায়া জন্মে গেছে। এটা কি ভাল? কলকাতার প্রতি তার কোনও টানই নেই। যেতে হচ্ছে বলে যাওয়া। কথাটা মিথ্যে নয় যে, তার অনুপস্থিতি ক্রমে ক্রমে কলকাতায় কিছু অনিশ্চিত শূন্যতার সৃষ্টি করছে। তার পার্টনাররা অস্বস্তিতে আছে। উদ্বিগ্ন তার মহাজন ক্লায়েন্টরা। অথচ সে কীই বা করতে পারে?

ফটিক তাকে দেখেই একগাল হাসল, এলেন তাহলে? না এলে কালই আমাকে সেই গাঁয়ে গিয়ে আপনাকে ধরতে হত।

সে কী! কেন?

চারুদিদি খবর পাঠাচ্ছেন বারবার। গতকাল এসে হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে গেলেন। বললেন শুক্কুরবার গিয়ে যেন আপনাকে ধরে নিয়ে আসি। তাড়াতাড়ি তাঁকে ফোন করুন। বিডন স্ট্রিটের বাড়ি থেকেও খুব খোঁজ হচ্ছে।

এই খোঁজখবর, উদ্বেগ ইত্যাদি হেমাঙ্গর আর ভাল লাগে না। বিতৃষ্ণায় মনটা ভরে যায়। স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় অন্তরায় এইসব আত্মীয়তা।

হেমাঙ্গ আগে তার হাত আর পায়ের নখ কাটল। কফি খেল। বসে বসে অনেকক্ষণ ভাবল। সন্ধে সাড়ে সাতটার বাংলা খবর শুনল টিভিতে। যদিও খবর তাকে স্পর্শও করল না।

বিডন স্ট্রিটে প্রথম ফোনটা করল মাকে।

মা প্রথম কথাই বলল, তুই ভেবেছিসটা কী?

কিছু ভাবিনি মা। কয়েকটা দিন একটু—

একটু? একে একটু বলে?

শরীরটা একটু সারিয়ে এলাম।

তোর যে কী চেহারার ছিরি হয়েছে তা আমি জানি। টকটকে ফরসা রংটাকে জ্বালিয়ে দিয়েছিস। তারপর ওখানে নাকি নৌকো বাইছিস, জাল ফেলছিস, চাষ করছিস। এই এতক্ষণ সব বলে গেল বাঁকা মিঞা। তোকে আর গড়চার বাড়িতে থাকতে হবে না। কালকেই চলে আসবি। আমি তোর বাবাকে বলেছি ও বাড়ি বিক্রি করে দিতে।

হেমাঙ্গ আতঙ্কিত হয়ে বলল, শোনো মা, শোনো। আমি আর না হয় এরকম করব না।

না বাপু, এসব পাগলামিকে আমি সহ্য করব না। তোর বাবাই ভুলটা করেছেন। ও বাড়িতে তোকে পাঠানোটাই সব সর্বনাশের মূল। মায়ের কোলছাড়া হয়ে থেকে তোর এখন নানা বাই দেখা দিচ্ছে। এখন থেকে তোকে আমি নিজের কাছে রাখব।

শোনো মা, এটা কোনও পাগলামি নয়। কলকাতার ভিড় ছেড়ে ফাঁকায় যেতে ইচ্ছে করে না বলো! ঠিক আছে, সামনের শনিবার চলল, তোমাকে আর বাবাকে নিয়ে গিয়ে আমার গাঁয়ের বাড়িটা দেখিয়ে আনি। দেখলেই তোমার মত পাল্টে যাবে।

রক্ষে করো বাপু, আমার আর ওই ধাপধারা গোবিন্দপুরে গিয়ে কাজ নেই। তোর যাওয়াও আমি বন্ধ করব। বিয়ে না দিয়ে আমি আর তোকে বিডন স্ট্রিটের বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে দেব না। ফটিককে খবর পাঠাচ্ছি সে আজই জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখুক। কাল ট্রাক গিয়ে সব নিয়ে আসবে।

মা, আর একটা মাস সময় দাও।

এক মাস! এক মাসে কোন হাত-পা গজাবে তোর? বাঁকা মিঞাকেও বলে দিয়েছি খদ্দের দেখতে। গাঁয়ের বাড়িটাও বিক্রি করে দিবি।

সর্বনাশ!

কিসের সর্বনাশ? ওই গাঁ-ই তো তোকে খেল। বিয়েটা হয়ে থাকলে একটু নিশ্চিন্তি ছিল। সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেললি! অমন মেয়ে কি পড়ে থাকে? এই তো কেমন বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে গেল।

কার কথা বলছ মা?

আবার কার কথা? রশ্মি কেমন বুদ্ধিমতী মেয়ে দেখ তো! বিলেত-বিদেশে একা থাকবে না বলে কেমন বর জুটিয়ে ফেলেছে। আর তুই হাঁ করে গাঁয়ে বসে আকাশ গিলছিস।

হেমাঙ্গ একটু স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, এ খবর কে দিল?

খবর কি আর চাপা থাকে? সে নিজেই খবর দিয়েছে চারুকে। চারু আমাদের বলেছে। অমন চারচৌকো মেয়ে তোর বউ হলে সব দিক দিয়ে ভাল হত।

হেমাঙ্গর হাত-পা শিথিল লাগছিল। কেন যেন একটু অপমানও বোধ করছিল সে। বলল, মা, আমি কালকেই তোমার কাছে যাব, অফিসের পর। সব বুঝিয়ে বলব। এক মাস সময় দাও আমাকে। তাড়াহুড়ো কোরো না।

অফিসেও তোর কাজ পড়ে আছে। পার্টনাররা তোর বাবাকে জানিয়েছে, তোর নাকি কোথায় কোথায় যাওয়ার কথা ছিল, যাসনি। তারা হয়রান হচ্ছে। এ সব কী পাগলামি বল তো?

আচ্ছা মা, কাল গিয়ে সব বলব।

কাল রাতে এখানেই খাবি। মনে থাকে যেন।

আচ্ছা মা।

হেমাঙ্গ ফোন রেখে স্তম্ভিত মাথায় বসে রইল কিছুক্ষণ।

এ কি সত্যি হতে পারে? এত তাড়াতাড়ি তার স্মৃতিকে মুছে ফেলে দিতে পারে রশ্মি? ঠিক কথা, হৃদয়াবেগ নিয়ে থাকার দিন চলে গেছে। কিন্তু তা বলে একটুখানি আবেগও কি থাকবে না? সামান্য সেন্টিমেন্ট?

ফোনটা আবার তুলে নিল হেমাঙ্গ।

চারুদি, কেমন আছিস?

কেমন আছি? তা দিয়ে তোর কি দরকার? আমাদের থাকা বা না-থাকায় তোর কী আসে যায়?

আমার খোঁজ করেছিলি কেন?

চারুশীলা একটু চুপ করে থেকে বলল, এখন আটটা বাজে। আসতে পারবি?

টায়ার্ড লাগছে। কেন যেতে বলছিস বল তো!

কথা আছে।

হেমাঙ্গ একটু হেসে বলল, বিলিতি বৃত্তান্ত নাকি? ওটা মায়ের কাছে শুনলাম।

কী শুনলি?

রশ্মি কাউকে বিয়ে করছে।

চারুশীলা দুঃখিত গলায় বলে, বলতে বারণ করেছিল।

গোপন করার বিষয় তো নয়। বলে ভালই করেছিস।

তুই কি একটু দুঃখ পেলি?

না। দুঃখ পাওয়ার কথাই তো নয়। আমিই রিফিউজ করেছিলাম, সুতরাং আমার তো কোনও দাবি থাকতে পারে না।

ওকে বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে। ইংল্যান্ডে এখন একা থাকা যে কোনও মেয়ের পক্ষেই খারাপ। ও ভয় পাচ্ছে।

আমি জানি। ইটস্ এ গুড ডিসিশন।

কাল আসবি?

কাল হবে না। মা ক্ষেপে গেছে। এ বাড়ি বিক্রি করে দিতে চাইছে। আমাকে পুনর্মূষিক হয়ে বিডন স্ট্রিটে ফিরে যেতে বলছে।

যাবি?

সেটা বুঝিয়ে বলতেই কাল মায়ের কাছে যাব।

তাহলে আজই চলে আয়। এমন কিছু রাত হয়নি। কাছেই তো। ফটিককে রান্না চাপাতে বারণ করে আয়।

হেমাঙ্গ একটু ভেবে অনিচ্ছার সঙ্গে বলল, আচ্ছা।

গাড়িতে পাঁচ মিনিটের পথ। পৌঁছে গিয়ে হেমাঙ্গ দেখল আজও চারুশীলার বাড়িতে অতিথি সমাগম। অতিথি ছাড়া ও থাকতেই পারে না।

চিনতে পারছেন তো! বলে মানি প্ল্যান্টের পাশ থেকে একটি হাসিমুখ এগিয়ে এল।

একটু চমকে উঠল কি হেমাঙ্গ? একটা বিট মিস করল তার হার্ট। একটু অবরুদ্ধ গলায় সে বলল, পারছি।

৮৮

টাকা জিনিসটার যে কী মহিমা তাই বসে বসে দেখে বিষ্ণুপদ। টাকা যেন ফুঁ। সেই ফুঁয়ে বাড়িটা যেন বেলুনের মতো ফুলে-ফেঁপে উঠছে। দেখ-না-দেখ একতলা ঢালাই হয়ে গিয়ে দোতলার দেওয়াল উঠে গেল লিন্‌টেল অবধি। পরশু থেকে শাটারিং-এর কাজ। সামনের সপ্তাহে দোতলারও ঢালাই।

মুখোমুখি আজও রামজীবনের আধখ্যাঁচড়া বাড়িটা। তবে আজকাল আর মুখ ভ্যাংচায় না, যেন স্নান চোখে সামনের বুক ফোলানো দোতলা বাড়িটার দিকে চেয়ে থাকে জুলজুল করে। গায়ে এখনও ভারার মই একটা রয়েছে, তাতে শ্যাওলা ধরেছে। ইঁটগুলো কালো হয়ে এসেছে। ছাদহীন পাকা দেওয়ালগুলো ফাঁকা দাঁড়িয়ে হাহাকার করছে শুধু। দুটো বাড়ির মধ্যে এই রেষারেষিটা— আর কেউ নয়—বিষ্ণুপদ টের পায়।

রামজীবন কি হেরে গেল? একেই কি হেরে যাওয়া বলে? প্রাণপাত চেষ্টা করে মা-বাপের জন্য পাকা ঘর তুলতে গিয়েছিল। পেরে ওঠেনি। সেইটেই কি তার পরাজয়?

কে জানে কি! তবে রামজীবনের আধখ্যাঁচড়া বাড়িটার ভিতর থেকে বাতাস যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে আসে।

তবে রামজীবন শুকনো মুখে নতুন বাড়ির তদারকি করে যাচ্ছে। খুব ব্যস্ত। মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে কৃষ্ণ আসছে দেখাশুনো করতে। আসছে বামাচরণও। তবে তার মতলব আলাদা।

আদালত থেকে কী একটা ইনজাংশন বেরও করেছিল বামা। একদিন সেই কাগজ নিয়ে এসে হাজির। গাঁয়ের মাতব্বর মুরুব্বিদেরও জড়ো করেছিল। চেঁচিয়ে-মেচিয়ে একখানা নাটক জমিয়েছিল, দেখুন আপনারা, বামাচরণের বুকের ওপর বাড়ি হাঁকড়াচ্ছে এরা। ওই বুড়ো ভাম নিজের মুখে কবুল করেছিল, এ ঘরখানা আমায় দেবে। দেখুন অবিচার। আমাকে মেরেধরে তাড়িয়ে সেই জায়গায় বাড়ি তোলা হচ্ছে। এই দেখুন আদালতের অর্ডার। বাড়ির কাজ বন্ধ করতে হবে। নইলে জেল, জরিমানা সব ব্যবস্থা করে এসেছি। আপনারা আমাকে সাহায্য করুন।

কিন্তু বক্তৃতায় বিশেষ কাজ হয়নি। আদালতের হাত এই প্রত্যন্ত গাঁয়ে বিশেষ পৌঁছয় না। আদালতের কাগজে কী লেখা আছে তাও কেউ জানবার জন্য আগ্রহী নয়।

পঞ্চায়েত ষষ্ঠীপদ বলল, মা-বাপের জন্য ছেলে বাড়ি করে দিচ্ছে, তাতে তোমার এত আপত্তি হচ্ছে কেন হে বামাচরণ? সম্পত্তি তো আর বাপ-মা সঙ্গে নিয়ে যাবে না!

আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ওই শালা শুয়োরের বাচ্চা রামজীবন গুণ্ডা লাগিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। পাছে মা-বাপের বাড়ির ওয়ারিশ হিসেবে আমি দাবি করে বসি। আপনারা ষড়যন্ত্র বুঝতে পারছেন না? আমাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে যে!

খুব তুমুল বচসা হল দু' পক্ষে। কোনও ফয়সালা হল না। তার ভাগ্য ভাল যে, রামজীবন টু শব্দটিও করেনি। গালাগাল খেয়েও নয়।

পরদিন বামা এল শ্যামলীকে নিয়ে। শ্যামলী এসেই মড়াকান্না জুড়ে দিল, বাড়ি উঠছে, আমাদের ঘরখানা অবধি দখল করেছে, এ কী কাণ্ড গো? এ যে পুকুরচুরি...

বাড়ির সবাই তটস্থ হয়ে রইল।

শ্যামলী শাপ শাপান্ত বাপ বাপান্ত করে হেদিয়ে পড়ল।

পরদিন তারা থানা থেকে পুলিশ নিয়ে এল। একজন সেপাই আর বোধহয় একজন সাব-ইন্সপেক্টর। তারা এসে চারদিক দেখেশুনে বিষ্ণুপদকে বলল, এ কাজ তো ঠিক হচ্ছে না। বাড়ি তৈরির কাজ বন্ধ করতে হবে। কোর্টের অর্ডার।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, আমাকে বলে কোনও লাভ নেই। বাড়ি করছে কৃষ্ণজীবন, আমার বড় ছেলে। সে কলকাতায় থাকে। আদালতের অর্ডারের কথা সে বোধ হয় শোনেনি। তাকেই খবর পাঠাচ্ছি, যা হয় সে করবে।

সাব-ইন্সপেক্টর মুখে একটু তম্বি করল; বলল, ঠিকাদারকে বারণ করে দেবেন আর যেন কাজে হাত না দেয়।

বামাচরণকে চলে যেতে বলে সাব-ইন্সপেক্টরটি রয়ে গেল একটু। বামাচরণ সেপাইটির সঙ্গে হাসিমুখে চলে যাওয়ার পর সাব-ইন্সপেক্টর এসে বিষ্ণুপদর পাশে বসে বলল, জ্যাঠামশাই, কৃষ্ণ আর আমি এক ক্লাসে পড়েছি। বামাচরণ আমাকে চেনে না। বামার মাথাটাও একটু গোলমাল মনে হচ্ছে। ওর ওসব কথায় কান দেবেন না। বাড়িটা তাড়াতাড়ি তুলে ফেলুন। কিচ্ছু হবে না।

আদালতের অর্ডার আছে নাকি?

আছে। তবে ওসব সাজানো ব্যাপার। উকিলরা কত কী পারে!

কৃষ্ণ পরের রবিবার এসে সব শুনল। তারপর বলে গেল বামার দুঃখের কারণ নেই। চায় তো ওর ঘরটাও পাকা করে দেওয়া যাবে।

শুনে হাঁ হয়ে গেল বিষ্ণুপদ।

নয়নতারা বলল, কেন, তোর টাকা কি সস্তা হয়েছে? যে কাণ্ড বামা করে বেড়াচ্ছে ওর বউকে সঙ্গে জুটিয়ে, তাতে ওকে দানছত্র করতে আছে? এক নম্বরের নেমকহারাম।

কৃষ্ণ মৃদু হেসে বলল, ঘুষ দিতে চাইছি মা, যাতে তোমাদের আর জ্বালাতন না করে।

ও যা ছেলে, চিরকাল জ্বালাবে বাবা। ঘর পাকা করে দিলে তো বাঘের ঘরে ঘোগের বাসাই হল। শান্তি থাকবে না। বরং যদি পারিস ওর মাথার চিকিৎসা করা।

মাথার চিকিৎসার দরকার নেই মা। ও করতে গেলে আরও সন্দেহ করবে। শুনলাম তোমাদের কাছে বাড়ির ভাগ বাবদ টাকা চাইতে এসেছিল?

হ্যাঁ বাবা, সে কী রাগ!

কত টাকা চায়?

সে অনেক টাকা। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার।

সেটা পেলে কী করবে?

ও-ই জানে! পিছনে থেকে বউ বুদ্ধি দিচ্ছে। ও কি আর ভেবেচিন্তে বলেছে?

ধরো সেই টাকাটা দিয়ে যদি লিখিয়ে নিই?

না বাবা। ওসব করতে যাস না। ওর লোভের শেষ নেই। টাকা নিয়ে আবার একটা ফ্যাঁকড়া তুলবে। ওকে চিনি।

তা হলে থাক। বাবা, আপনি কি বলেন?

বিষ্ণুপদ তার কৃতী ছেলেটির দিকে চেয়ে তটস্থ হয়ে বলল, আমি আর কী বলব?

বামার উৎপাত তো বন্ধ করা দরকার।

উৎপাত আছে থাক, গায়ে না মাখলেই হল।

আপনার চিরকাল ওই কথা বাবা, কোনওদিনই কিছু গায়ে মাখেন না। কিন্তু আমি চাই শেষ জীবনটা অন্তত আপনারা একটু শান্তিতে থাকুন।

বিষ্ণুপদ খুব হাসল। মাথা নেড়ে নিজের পণ্ডিত এবং আহাম্মক ছেলেটির দিকে চেয়ে বলল, তোমারও বাস্তববুদ্ধি বলে কিছু নেই। টাকার ব্যবহারও শেখনি। আমার মতোই।

টাকাই তো চাইছে, টাকা দিলে যদি ঠাণ্ডা হয়।

নয়নতারা পাশ থেকে বলে উঠল, খবর্দার না। এখানে এক কাঁড়ি খরচ হচ্ছে বাড়ির পিছনে, ফের যদি বামার পিছনে টাকা ঢালিস তা হলে বউমা কুরুক্ষেত্র করবে।

সে জানবে না, মা।

তোকে বলেছে! বামাই গিয়ে বলে দিয়ে আসবে।

তা হলে কী করা?

বিষ্ণুপদ বলল, আমি বলি কি, তুই অত ভেবে মরিস না। বামার সঙ্গে তো চিরটা কাল আছি। সব সয়ে গেছে। নতুন উৎপাত নয় বাবা। তবে আগে এত মাথা-গরম ছিল না, আজকাল বায়ু বেড়েছে।

কৃষ্ণজীবন দুঃখিত মুখে বসে রইল। তারপর বলল, বামা গিয়ে আজকাল আমার ফ্ল্যাটে চড়াও হচ্ছে। যখন আমি থাকি না, তখন গিয়ে তার বউদির সঙ্গে বসে নানা খবর দেয়। কেন এসব করে বলো তো! ওর কাজকর্ম নেই? এই যে ইনজাংশন বের করল এতে ওর লাভটা কী? নিজের পায়ে কেউ কুড়ল মারে?

বিষ্ণুপদ প্রসন্ন গলায় বলে, মানুষ হিংসের জ্বালায় কত কী করতে পারে! বামাচরণ এসব করছে জ্বালায়। বড় লোভী ছেলে। অথচ ছেলেপুলে নেই, ওরটা খাবেই বা কে? নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ! গাঁয়ের লোক ডেকে এনে জমায়েত করল, হেঁকে ডেকে গালাগাল করল আমাদের, তাতে যে ওরও গৌরববৃদ্ধি হল না, সেটা বুঝবার মতো বুদ্ধিটাও নেই। ওকে টাকা দিতে চাইছো বাবা? তাতে আরও নষ্ট হবে। টাকা দিয়ে কি সব হয়?

কৃষ্ণজীবন কিছুক্ষণ দুঃখিতভাবে বসে রইল। তারপর মেনে নিল।

বামা তবু আশায় আশায় আসছে। রোজ আসছে। শেয়ালের মতো উঁকিঝুঁকি মারছে। বাড়ির গড়ন পেটন দেখছে। বিড়বিড় করছে। মাঝে মাঝে হুংকারও দিচ্ছে, সব শালাকে জেলে পাঠাবো।

আদালতের সেই কাগজখানা ছাড়া বামার পক্ষে এখন আর কেউ নেই। কেউই তার পক্ষ নিচ্ছে না। পুলিশও আসছে না। আদালত থেকে পেয়াদা আনানোর মতো দমও তার নেই। শুধু আক্রোশটুকুই যা সম্বল। বিষ্ণুপদর একটু মায়াও হয়। ওই আক্রোশের বিষে, হিংসের বিষে তিলে তিলে ক্ষয় পাচ্ছে ছেলেটা।

আজ সকালে বিষ্ণুপদ উঠোনে বসেছে। রোদটা খারাপ লাগছে না। বৃষ্টি-বাদলা ছেড়ে এখন বেশ মোলায়েম আবহাওয়া। গরমটা তেমন নেই।

নয়নতারা এক বাটি মুড়ি মেখে দিয়ে গেল।

খাও।

মুড়ি দিলে নাকি?

হ্যাঁ। সঙ্গে নারকেল কোরা।

বাঃ বেশ। তবে মুড়ি চিবোতে এখন কষ্ট। কষের দাঁত নড়ছে।

জল দিয়ে ভিজিয়ে দেবো?

না। জল ছিটিয়ে ঘটিরা মুড়ি খায়। আমাদের ও অভ্যাস নেই।

তা হলে দুধ দিই একটু? মুড়ি মুখে দিয়ে দুধে চুমুক দিলে মুড়ি নরম হয়ে যাবে।

ও বাবা, না। দুধে অভ্যাস নেই। পেট ছেড়ে দেবে।

তা হলে?

চালিয়ে দেবোখন। চিবোতে একটু সময় লাগবে, এই যা।

নয়নতারা চলে যেতে যেতে উর্ধ্বপানে চেয়ে বলল, ও মা গো! গোপালটা কোথায় উঠেছে দেখ। ও রাঙা বউমা, দেখ কাণ্ড! ছেলে পড়ে যাবে যে! হনুমানটা কোথায় উঠে বসে আছে দেখ!

দোতলার একটা জানালার ফাঁকায় গোপাল পা ঝুলিয়ে বসা। অবশ্য ভয়ের কিছু নেই। পায়ের নিচে একতলার রেন শেড। সারাদিন দুই ভাই এখন নতুন বাড়িতে বেয়ে বেড়ায়। এটাই তাদের নতুন খেলনা। এরকম আশ্চর্য কাণ্ড তারা কখনও দেখেনি। পটলের ইস্কুলের বন্ধুরা অবধি দল বেঁধে দেখতে আসে।

রাঙা বেরিয়ে এসে গোপালের দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। গোপাল নড়ল না। রাঙারও তেমন উদ্বেগ নেই। একটু চেয়ে থেকে ফের রান্নাঘরে চলে গেল।

নয়নতারা বিষ্ণুপদর দিকে চেয়ে বলল, পড়ে যাবে না তো!

বিষ্ণুপদ একটু হাসল। তোমার চোখের আড়ালেও তো কত কী করে। সবসময় কি তুমি সঙ্গে থাকো? পড়বে না। পড়লেও তলায় পা রাখার জায়গা আছে, ভারার বাঁশ আছে, আত্মরক্ষার জৈবী তাগিদ আছে। ভয় পেও না।

তোমার কথা শুনেই বেশি ভয় লাগে। এমন করে বলো!

বিষ্ণুপদ একটু হাসল।

হ্যাঁ গো, তোমাকে বরং একটু চা দিই। চায়ে ভিজিয়ে মুড়ি খাও! তা হলে আর কষ্ট হবে না।

তা দিতে পারো। মাঝে মাঝে চা খেতে খারাপ লাগে না।

মুড়ি খেতে খেতেই চা দিতে এল নয়নতারা। ঊর্ধ্বপানে চেয়ে বলল, হ্যাঁ গো, যা বড় বাড়ি হচ্ছে শেষ হলে একেবারে রাজবাড়ি বলে মনে হবে, না?

মন্দ হচ্ছে না। বিরাট ব্যাপারই হচ্ছে।

যখনই বাড়িটার দিকে চাই বুকখানা ভরে ওঠে। আমাদের বুড়োবুড়ির জন্য এত আয়োজন! গা যেন সিরসির করে।

তা বটে। আমি ভাবি খরচটাও বড্ড বেশিই করে ফেলছে। আর একটু কম করে করলেও পারত।

ওগো, এই বাড়ির দিকে চেয়ে আমি যে কৃষ্ণকেই দেখতে পাই। কৃষ্ণ কি ছোট? সে বড় বলেই তার বাড়িও অমন। সে তো কৃপণ নয়।

বিষ্ণুপদ এক গাল হাসল, বড় ভাল বলেছো তো। দিব্যি কথা ফুটছে আজকাল। মাঝে মাঝে আমাকে তাক লাগিয়ে দাও।

হ্যাঁ গো, আমরা কি অনেকদিন বাঁচবো?

ও কথা কেন?

বেশি দিন না বাঁচলে ও বাড়ি ভোগ করব কেমন করে?

বিষ্ণুপদ চায়ে একটা পেল্লায় চুমুক দিয়ে বলল, মরার তত দিনক্ষণ নেই। কে কখন কবে কোথায় ঢলে পড়বে। আর সেই জন্যই তো মানুষের এত ভোগ-দখলের জলদিবাজি। তবে আমি বলি কি, ও বাড়িতে দুটো দিন বাস করে মরলেও আমার বুকখানা ভরে থাকবে। বাড়িটা তো কথা নয়, ওই বাড়ির পিছনে যে ছেলেটার টান আছে, সেইটেই অনেক।

ঠিকই বলেছো। উঃ, কী কাণ্ডই হচ্ছে!

আজকাল নয়নতারার মুখখানা সবসময়ে ঝলমল করে আনন্দে, গর্বে। অনেকদিন নয়নতারাকে এত খুশি দেখেনি বিষ্ণুপদ।

মিস্ত্রিরা এল নটা নাগাদ।

দুড়ুম দুড়ুম শব্দে কাজকর্ম শুরু হয়ে গেল। সারাদিন চলবে। কিছু খারাপ লাগে না বিষ্ণুপদর। বরং বেশ লাগে। শুধু মনটা খারাপ হয়, মুখোমুখি রামজীবনের অক্ষম বাড়িটার দিকে চাইলে।

রামজীবন রিকশা থেকে কয়েক বস্তা সিমেন্ট নামিয়ে বাড়িতে ঢোকাচ্ছে। ঠিকাদারবাবুর সঙ্গে জরুরি কথা সারল। তারপর দোতলায় উঠল কাজ দেখতে।

অনেকক্ষণ বাদে নেমে এসে বিষ্ণুপদর সামনে উঠোনে বসে একটু শুকনো হাসি হেসে বলল, আর মাসখানেকের মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে যাবে। গৃহপ্রবেশের দিনটা পুরুত ডাকিয়ে ঠিক করে ফেলব নাকি বাবা?

তা করতে পারো। বলে আধ-খাওয়া মুড়ির বাটিটা রামজীবনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, খা।

রামজীবন উচ্ছিষ্ট বাটিটা কপালে ঠেকিয়ে নিল। বলল, ব্যাপারটা জম্পেশই হচ্ছে বাবা। টাকা থাকলে কত তাড়াতাড়ি কত বড় কাণ্ড করা যায়!

তা বটে। বলে চুপ করে রইল বিষ্ণুপদ।

কী ভাবছেন বাবা?

বিষ্ণুপদ একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তোর বাড়িটা কি ওরকমই থাকবে? কিছু করবি না?

রামজীবন উদাস মুখে বলল, আমি তো পারলাম না বাবা। ঠেকে গেল। দাদা আমাকে নতুন বাড়ির একতলাটা ছেড়ে দিচ্ছে। তাই ভাবছি ও বাড়ি দিয়ে আর হবেটাই বা কি? থাক পড়ে।

পড়ে থাকলে কি ভাল দেখাবে?

কী করব বাবা?

এ বাড়ি হওয়ার পর ইট সিমেন্ট কিছু বাঁচবে না?

ঠিকাদার কন্ট্রাক্টে কাজ করছে। জিনিস সব তার। আমরা তো কিনে দিইনি। জিনিস বাঁচলে সে নিয়ে যাবে।

আমি ভাবছিলাম, বাড়তি জিনিস দিয়ে ও বাড়িটা শেষ করা যায় কিনা। এই মজুররাই করে দিত।

আপনি কি মেজদার কথা ভাবছেন বাবা? মেজদাকে এনে ও বাড়িতে বসত করাবেন? সে হবে না। মেজদা আসবে না। তার টাকার দরকার। বাড়ি নয়।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, বামার জন্য নয়। ভাবছিলাম, নতুন একটা বাড়ির মুখোমুখি ও বাড়িটা ভাল দেখাচ্ছে না। ওর মধ্যে যে আমি তোকে দেখতে পাই। কত কষ্ট করে বুকের রক্ত তুলে করতে চেয়েছিলি। পারলি না, সে তো তোর দোষ নয়। কিন্তু ওটার দিকে চাইলে আমার কষ্ট হয়।

তা হলে ভেঙে দিই বাবা।

তা কেন? ভাবি কেন? গড়ছিলি যখন, শেষ কর।

আরও কিছু টাকা লাগবে।

তা লাগুক। চেষ্টা রাখতে হয়।

কিছুক্ষণ মুড়ি চিবিয়ে রামজীবন বলল, আপনার আশীর্বাদ থাকলে হয়ে যাবে।

ওই যে বললাম, ওটাই আশীর্বাদ। লেগে থাক।

যদি করে উঠতে পারি তা হলে ও বাড়িতে কী হবে বাবা?

হয়ে থাক। আমার একটা সান্ত্বনা রইল যে, রামজীবনও পেরেছিল।

রামজীবন হাসল, তাই হবে বাবা। করব।

বিষ্ণুপদ একটু হাসল।

বামাচরণ আর শ্যামলী এল বেলার দিকে। যখন বিষ্ণুপদ স্নানে যাবে যাবে করছে। দু'জনেরই উস্কোখুস্কো চেহারা। বামাচরণের চেহারা আরও একটু উদ্‌ভ্রান্ত।

বামাচরণ বলল, আপনার কাছে আসা বাবা।

বস তোরা। দাওয়ায় মাদুর আছে। পেতে বস।

শ্যামলী মাদুরটা নিয়ে এসে পাতল। দুজনে বসল।

বামাচরণ গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, একটা কথা শুনে ছুটে এলাম।

কী কথা?

আমাদের তো ধনেপ্রাণে মারলেন। শুনছি নাকি দাদা আমার ভাগের টাকাটা দিতে চেয়েছিল। আপনি আর মা বাগড়া দিয়েছেন।

বিষ্ণুপদ একটু অস্বস্তি বোধ করল। হাসবার একটা বৃথা চেষ্টা করে বলল, টাকাটা সে দিতে চাইলেও তোর নেওয়ার হকটা কোথায় তা একটু বুঝিয়ে বলবি?

তার মানে?

কৃষ্ণ তোকে কী বাবদে টাকাটা দিতে চাইছে?

বাঃ, আমার সম্পত্তির ভাগ!

সম্পত্তি কি ভাগ হয়েছে? আইন মোতাবেক কি স্থির হয়েছে কার কতটা ভাগ?

তা না-ই বা হল!

তা যদি না-ই হয়ে থাকে তা হলে তোর পাওনাগণ্ডার কথা উঠছে কি করে?

বামাচরণ হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল, শুয়োরের বাচ্চা বুড়ো, তুমি শালা বসে বসে শকুনির মতো মতলব আঁটছো? জুতিয়ে তোমার মুখ ছিঁড়ে দিতে হয়!

বিষ্ণুপদ স্তম্ভিত হল বটে, কিন্তু হার্টফেল হল না। এরকম হতে পারে বলে তার একটা আন্দাজ ছিল। সে শুধু বামার দিকে চেয়ে রইল।

নয়নতারা আর রাঙা বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। পটল আর গোপাল দৌড়ে নেমে এল ওপর থেকে। মিস্ত্রিরা কাজ বন্ধ করে মজা দেখছে।

বিষ্ণুপদ তাড়াতাড়ি দেখে নিল, রামজীবন ধারেকাছে আছে কিনা! এ বাড়িতে বামার রক্তপাত হোক তা আর সে চায় না। রামজীবন নেই। বাঁচোয়া।

শ্যামলী তাড়াতাড়ি বামাচরণকে টেনে বসিয়ে একটা ধাক্কা মেরে বলল, তোমার আক্কেল নেই! কাকে কী বলছো? ছিঃ ছিঃ! কথা বলতে যখন জানো না, চুপ করে থাকলেই হয়। বাবা, আপনি ওর কথায় কিছু মনে করবেন না, ওর মাথার ঠিক নেই।

বিষ্ণুপদর একটু হাঁফধরা গোছের ভাব হচ্ছিল। মুখে কথা এল না। শুধু মাথা নেড়ে বোঝানোর চেষ্টা করল, সে বুঝতে পেরেছে।

শ্যামলী বলল, বাড়ির চিন্তাতেই ওর মাথা এত গরম। দেখুন, যদি সত্যিকারের বিচার করে দেখেন তা হলে এ বাড়িতে আমরাই কেবল বঞ্চিত হচ্ছি। আমাদের ওপর খুব অবিচার করছেন আপনারা। দাদা এত টাকা খরচ করতে পারছেন আর আমাদের সামান্য কিছু টাকা ওঁকে দিতে দিচ্ছেন না আপনারা, এটা কেমন কথা?

নয়নতারা এগিয়ে এসে বলল, তাই ঝগড়া করে টাকা আদায় করতে এসেছো?

বামাচরণ তার মায়ের দিকে চেয়ে বলল, ওই আর এক বদমাশ মাগী!

শ্যামলী তাকে ফের একটা ধমক দিল, ফের মুখ খারাপ করছো?

নয়নতারা শ্যামলীর দিকে চেয়ে বলল, ওর আর বলতে কিছু বাকি নেই। সব বলা হয়ে গেছে। আমাদের আর নতুন করে অপমান হবে না। নতুন শুধু বাপকে গালাগাল দেওয়া। তা সেটাও তো হয়ে গেল। আমি বলি এবার ওকে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাও। রেমো এলে অক্ষত ফিরতে পারবে না। যাও।

বামাচরণ লাফিয়ে উঠে বলল, কেন যাবো? কাকে ভয় খাই? রেমো শালা আমার এইটা করবে।

বলে এমন একটা কুৎসিত ভঙ্গি করল যে, নয়নতারা আর রাঙা চোখ ফিরিয়ে নিল।

ও শালার গুষ্টির তুষ্টি করে ছাড়ব। নির্বংশ করে দেবো।

শ্যামলী হঠাৎ উঠে বামাচরণের চুলের মুঠি ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বসিয়ে দিল। বলল, ফের ওরকম করলে কিন্তু মুশকিল আছে।

নয়নতারা বলল, বসছো কেন? বসে কিছু লাভ হবে না। তাড়াতাড়ি চলে যাও। পটল দৌড়ে গেল বোধ হয় বাপকে খবর দিতে। কাজটা ভাল করোনি এসে। ও তো পাগল, কিন্তু তোমার তো আর মাথার গোলমাল হয়নি। ওকে নিয়ে এসেছোই বা কেন?

শ্যামলী হঠাৎ শাশুড়ির দিকে চেয়ে বলল, বাড়ি কি একা আপনার? আমাদের নয়? বে-আইনিভাবে বাড়ি তুলছেন, আবার বড় বড় কথা!

নয়নতারা বলল, যা বলছি শোনো। বাড়ি যাও। এখানে আর থেকো না। বামা তার বাপকে গালগাল দিয়েছে, রেমোর কানে গেলে আস্ত রাখবে না। যাও।

শ্যামলী উঠল। বলল, যাচ্ছি। কিন্তু আমাদের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে না দিলে কিন্তু বিপদে পড়বেন। বলে দিচ্ছি।

বামাচরণের হাত ধরে টেনে শ্যামলী বেরিয়ে গেল।

বিষ্ণুপদ তার জলচৌকি ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল। পারল না। হঠাৎ হাঁটু ভেঙে গোটা শরীরের ভার নিয়ে পুরনো বাড়ির মতো ভেঙে পড়ল উঠোনে।

৮৯

তার ভিজিটিং কার্ড নেই, দেওয়ার মতো পরিচয় নেই, জানানোর মতো ডিগ্রি নেই, ভরসা কৃষ্ণজীবনের চিঠিটা। রিসেপশনিস্ট মেয়েটির হাতে একটু নার্ভাস হাতে সেইটেই সমর্পণ করল চয়ন। বলল, দয়া করে যদি এটা মিস্টার সেনের কাছে পাঠিয়ে দেন।

মেয়েটা বেয়ারা ডেকে চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়ে তাকে একবার দেখল। চয়ন আজ যথাসাধ্য সাজগোজ করে এসেছে। পরিষ্কার ইস্তিরি করা প্যান্ট, হাওয়াই শার্ট, আজ সে দাড়ি কামিয়েছে। এর চেয়ে বেশি আর কি সে করতে পারে? ব্যক্তিত্ব বলে একটা জিনিস আছে, যেটা সাজগোজকে টেক্কা মেরে যায়, আর স্মার্টনেস বলেও আর একটা জিনিস আছে যা এ যুগের পৃথিবীতে খুব বিকোয়। কিন্তু চয়নের ও দুটো নেই। মেধা? মেধা আছে কিনা তা সে ঠিক বোঝে না। সে ইংরিজি আর অঙ্কটা ভালই জানে, অন্তত ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে যে-টুকুর দরকার হয়। সেই মেধা এই আধুনিক বাণিজ্য সংস্থার কাজে লাগবে কিনা সেটাই প্রশ্ন। নিজেকে এত ঐশ্বর্যহীন, এত বিত্তহীন, গুণহীন মনে হয় তার যে জড়সড় হয়ে গদি-আঁটা নরম চেয়ারে বসে সে তীক্ষ্ণ একটা হতাশায় বিদ্ধ হতে লাগল বারবার। হবে না সে জানে।

চয়ন শুনেছে, সেন বিদেশ থেকে এক কাঁড়ি টাকা আর নো-হাউ নিয়ে ফিরে প্রথম কিছুদিন চাকরি করে বাজারটা বুঝে নিয়েছিলেন। এখন বোম্বাইয়ের কাছে একটা আধুনিক কারখানা খুলেছেন। কিসের কারখানা তা ভাল জানে না চয়ন। তবে সেনের অবস্থা যে খুব ভাল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। মাসে মাত্র দিন দশেকের জন্য কলকাতায় আসেন, বাকি দিন ভাগ করা আছে দিল্লি ও বোম্বাইয়ের জন্য। এগুলো মূলত সেলস্ অফিস। সেন প্রায়ই বিদেশে যান। একটা মানুষ অনেক মানুষকে ছাড়িয়ে কি করে যে এত উঁচুতে উঠে যায় সেটাই ভেবে পায় না চয়ন। এসব অচেনা, রূপকথার জগতের মানুষের কাছে যেতে তার ভয় ভয় করে। আর একটা অনুভূতি হয়, নিজের জন্য লজ্জা।

আধ ঘণ্টা বসে থাকতে হল চয়নকে। তারপর একজন ছিমছাম বেয়ারা এসে তাকে নিয়ে গেল ভিতরে। শেকস্‌পিয়র সরণির এই ফ্ল্যাটের ভাড়া কত তার কোনও আন্দাজ নেই চয়নের। শুনলে সে হয়তো অজ্ঞান হয়ে যাবে।

অফিসটা যে খুব বড় তা নয়। এক বা দেড় হাজার স্কোয়ার ফুটের একটা ফ্ল্যাট। হলঘরটা পার্টিশন দিয়ে সামনে রিসেপশন। পিছনে ছোট অফিস। সব মিলিয়ে জনা সাত-আট লোক কাজ করছে। দুটো কম্পিউটার আছে। হলঘর পেরিয়ে বাঁ দিকে একটা ঘরের দরজা ঠেলে তাকে ঢুকিয়ে দিল বেয়ারা।

ভিতরটা বেশ সাজানো। সবুজ কার্পেট, দেয়ালে হালকা সবুজ রং। বেশ বড় একটা আধুনিক টেবিলের ওপাশে সেন সাহেব বসে। বয়স মধ্য ত্রিশ। চল্লিশের কাছাকাছিও হতে পারে। ফরসা, ভাল চেহারা। মাথায় বড় বড় চুল। মুখখানা লম্বাটে, নাকটা প্রবল, ঠোঁট দুটোয় একটা নিষ্ঠুর ভাব আছে। চোখ দুটো তীক্ষ্ণ এবং স্বপ্নহীন।

ভদ্রলোক খুবই ভদ্র গলায় বললেন, মিস্টার বিশ্বাস আপনাকে পাঠিয়েছেন? কিন্তু...

এই কিন্তুটাকেই সবচেয়ে বেশি ভয় পায় চয়ন। কতবার কিন্তু এসে তার পথ আটকে দিয়েছে। সে কিছু বলল না, শুধু ভয়ার্ত চোখে সেন সাহেব নামক অতি-সফল লোকটির দিকে চেয়ে রইল।

সেন চিঠিটা আর একবার দেখে বলল, বসুন।

নরম গদির চমৎকার চেয়ারে সে প্রায় ডুবে গেল বটে, কিন্তু শরীরের আরামটা তাকে প্রভাবিত করল না। সে খরগোশের মতো সচকিত ভঙ্গিতে বসে একটা-দুটো-তিনটে শুকনো ঢোঁক গিলতে লাগল।

সেন সাহেব সামান্য একটা হাসির রেখা মুখে ফুটিয়ে তুলে বললেন, বিশ্বাস স্যার আমার খুবই শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই। নাউ হি ইজ এ বিগ অ্যান্ড রিনাউনড্ ম্যান। তিনি যখন পাঠিয়েছেন তখন আপনার জন্য আমার একটু চেষ্টা করা উচিত। আচ্ছা, আপনি কি একটু স্পেসিফিক্যালি বলতে পারেন, ঠিক কী ধরনের জব আপনি করতে পারবেন?

চয়ন আকাশপাতাল ভেবেও এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেল না। সে বিচ্ছিন্নভাবে অনেক কিছুই জানে। ডারউইন তত্ত্ব থেকে মার্কসবাদ, সে জানে ইংরিজি গ্রামার বা সাহিত্যের ইতিহাস, যে জানে অঙ্ক, ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি, কিন্তু বিশেষজ্ঞের জ্ঞান তার কোনও বিষয়েই নেই। নিজেকে উপস্থাপনা করা বড় কঠিন মনে হচ্ছিল তার। সে খুব ক্ষীণ গলায় বলল, আমি তো জানি না।

সেন সাহেব কি একটু অবাক হলেন? কপালে বিস্ময়ের ভাঁজ-গম্ভীর মুখে বললেন, যদি অফিস ওয়ার্ক হয়, যাকে ক্লারিক্যাল জব বলে, তাহলে কিন্তু কলকাতায় কোনও ভ্যাকান্সি নেই। যদি ওরকম সাদামাটা চাকরি করতে চান তাহলে আপনাকে বোম্বাই যেতে হবে। পারবেন? আমরা যা মাইনে দিই তাতে বোম্বাইতে বাসা ভাড়া করে থাকা বা সংসার চালানো খুব শক্ত ব্যাপার।

চয়ন দাঁতে ঠোঁট কামড়াল। তার কাছে কলকাতাও যা, বোম্বাইও তা। কিন্তু বোম্বাই গিয়ে তার কিছু লাভ হবে বলে মনে হল না। সে একটু ভদ্রলোকের দিকে চিন্তিতভাবে চেয়ে থেকে বলল, ও। তাহলে—

একটু ভেবে নিন। সামনের মাসে দশ তারিখের পর আমি আবার কলকাতায় আসব। যদি রাজি থাকেন তাহলে তখন দেখা করবেন। স্যালারিটা, ধরে নিন অ্যারাউণ্ড টু থাউজ্যান্ড। বম্বের পক্ষে কিন্তু স্যালারিটা বেশ কমই। লোকাল পিপলদের হয়তো চলে যায়, কিন্তু—

আবার একটা কিন্তুতে হোঁচট খেতে হল তাকে। কিন্তুই তার সবচেয়ে বড় বাধা। শব্দটা যদি লোপাট করে দেওয়া যেত।

একটা কুণ্ঠিত নমস্কার করে বেরিয়ে এল চয়ন।

টিউশনি সেরে বাড়ি ফিরতে রাত নটা বেজে গেল। ছাদে উঠে যখন ঘর খুলছিল তখন অন্ধকার ছাদের কোণে জলের ট্যাংকের পাশ থেকে মেয়েলী গলার স্বর জিজ্ঞেস করল, চাকরি হল?

চয়ন একটু হাসল, না।

অনিন্দিতা এগিয়ে এসে বলল, কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি তোমার জন্য। কেন হল না?

চয়ন মৃদু একটু হেসে বলল, হল না বললে ভুল হবে। ভদ্রলোক বম্বেতে চাকরি দিতে রাজি। মাইনে মাত্র দু' হাজার।

ধুস। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রিফিউজ করল বোধ হয়।

তাই হবে।

আমার কিন্তু খুব আশা ছিল, চাকরিটা তোমার হবে।

চয়ন মৃদু হেসে বলে, আশা করতে নেই।

শত হলেও কৃষ্ণজীবনবাবু নিজে চিঠি দিয়েছিলেন তো, হওয়া উচিত ছিল।

চয়ন মাথা নেড়ে বলে, কৃষ্ণজীবনবাবু খুব প্র্যাকটিক্যাল মানুষ নন। কাকে কী বলতে হবে, কোন অন্ধি-সন্ধি দিয়ে কাকে চাকরিতে ঢোকানো যাবে সেসব ভাববার সময় ওঁর কোথায়? হয়তো এরোপ্লেনে বা কোনও মিটিঙে ছাত্রটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাই বলেছিলেন। আমার মনে হয়, আমার কোয়ালিফিকেশন কী তাও কৃষ্ণজীবনবাবু ভাল করে জানেন না।

অনিন্দিতা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের বাতির আভায় তার মুখের ম্লান ভাবটা লক্ষ করল চয়ন। অনিন্দিতা একটু ধরা গলায় বলে, মনটা বড্ড খারাপ লাগছে।

আমার লাগছে না। চাকরি জিনিসটা করা তো আমার অভ্যাস নেই। চাকরি হয়তো আমার ভাল লাগবে না।

অনিন্দিতা একটু অবাক হয়ে বলে, শুধুই টিউশনি করে জীবন কাটাতে চাও নাকি?

অকপটে চয়ন বলে, কাটবে না? আমার তো মনে হয় বেশ কেটে যাবে।

তোমার অ্যাম্বিশন বলে কিছু নেই কেন বলো তো! তোমার ওই একটাই ভীষণ দোষ।

চয়ন চিন্তিতভাবে বলে, অ্যাম্বিশন থাকাই কি ভাল? অলস চিন্তা আর অ্যাম্বিশন তো এক জিনিস নয়। অ্যাম্বিশন কথাটার মধ্যে হয়তো অ্যাচিভমেন্টও কিছুটা থাকে। আমার পক্ষে কিছু অ্যাচিভ করা কি সম্ভব?

তাই অলস চিন্তা করতে বুঝি ভাল লাগে?

না অনিন্দিতা, আমি অলস চিন্তাও করি না। আমার মাথায় সেটাও আসতে চায় না।

কী হবে তাহলে তোমার?

আমার কিছুই হওয়ার নয়।

তুমি একটা কাজ করবে? কৃষ্ণজীবনবাবুকে গিয়ে বলল, তাঁর চিঠিতে কাজ হয়নি। উনি নিশ্চয়ই আবার চেষ্টা করবেন।

না অনিন্দিতা, উনি ব্যস্ত মানুষ। মাথায় অনেক চিন্তা। তার ওপর মনে হচ্ছে ওঁর একটা ফ্যামিলি ট্রাবল চলছে। এসব বলে ওকে ডিস্টার্ব করা ঠিক নয়।

তোমাকে উমেদারি করতে বলছি না। যা হয়েছে সেটা তো বলতে পারবে।

সুযোগ পেলে অবশ্যই বলব। আমার মনে হয় উনি যে আমাকে চিঠি দিয়ে এক জায়গায় পাঠিয়েছিলেন সেটাই ওঁর মনে নেই।

তবু বলো। তোমার তো আর কোনও সোর্স নেই। আচ্ছা, সেই সুব্রতবাবুকে বলেছ?

উনি জানেন। কিন্তু উনিও আর একজন বিগ গাই। সারা পৃথিবীতে বাড়ির ডিজাইন আর কনস্ট্রাকশন করে বেড়ান। ওঁরও কি কথা মনে রাখা সম্ভব?

তা বলে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াবে নাকি? তুমি শুধু মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দিয়েই দেখ না।

ওঁরা বিরক্ত হবেন।

তুমি চারুশীলাকেই ধরো না। শুনে তো মনে হয় মহিলা খুব ভাল।

খুবই ভাল অনিন্দিতা। কিন্তু বায়না করা শুরু করলে বেশি দিন ভাল থাকবেন না। বিগড়ে যাবেন। তা ছাড়া চারুশীলা বোধ হয় কিছুদিনের জন্য বিদেশে যাবেন। খুব ব্যস্ত।

যাঃ। তোমার কপালটাই খারাপ।

যে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অত ভেবো না। আমি তো ভালই আছি।

ছাই আছো। ভাল থাকা কাকে বলে তা তুমি জানোই না।

দুজনেই একটু চুপ করে রইল। এত কাণ্ডের পরও যে অনিন্দিতা ছাদে তার কাছে আসে সেটা একটা অদ্ভুত টানের জন্যই। তাদের মধ্যে প্রেম হয়তো নেই, কিন্তু একটা ভালবাসা আছেই। অনিন্দিতা তাকে জীবনে দাঁড় করানোর একটা শপথ নিয়েছে হয়তো। কিন্তু—

ওই কিন্তুই কুরে কুরে খায় চয়নকে। সব সময়ে একটা কিন্তু এসে সব কাজ ভণ্ডুল করে দেয়।

অনিন্দিতা হঠাৎ বলে, আচ্ছা, তোমার কাছে হেমাঙ্গবাবুর কথাও তো খুব শুনি। উনি কিছু পারেন না?

কী পারবেন? ওঁর একটা অডিট ফার্ম আছে। ইনকাম ট্যাক্স, আরও সব ট্যাক্স নিয়ে কারবার। সেখানে আমার হওয়ার নয়। ওঁর ক্লায়েন্টরা বেশির ভাগই ঝানু ব্যবসাদার। চাকরি দায়ে পড়ে দিলেও বেশিদিন রাখবে না। উনি নিজেই বলেছেন সেকথা। চাকরির বাজারটাই স্যাচুরেটেড।

আচ্ছা, তুমি কেন কম্পিউটার শেখো না?

কত কী শেখার আছে অনিন্দিতা! শেখা হল কই? আমার আর নতুন করে জীবন শুরু করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। টিউশনি বজায় থাকলেই হল। চলে যাবে।

একটা কথা জিজ্ঞেস করব? কিছু মনে করবে না?

না। বলো।

টিউশনি করে তুমি মাসে কত পাও?

দু' হাজারের মতো।

সেটা কি খারাপ?

না তো! খারাপ কেন হবে?

বাসা ভাড়া তো পঞ্চাশ, তাই না?

হ্যাঁ।

তাহলে তোমার চলে যায়।

যায়।

আমার কী ইচ্ছে করে জানো? তোমার টিউশনিগুলো সব কেড়ে নিই। এই টিউশনি করে চলে যায় বলেই তোমার আর কিছু করতে ইচ্ছে করে না। এসো, রেলিঙের পাশে একটু দাঁড়াই—

খুব সংকোচের সঙ্গে দাঁড়ায় চয়ন। তাদের নিয়ে এ বাড়িতে কথা হচ্ছে। মেলামেশাটা বন্ধ করতে পারেনি চয়ন। অনিন্দিতা বলে, যা হয় হোক, তোমার বন্ধুত্ব আমার দরকার।

বন্ধুত্বটাই আছে। হয়তো তার বেশি কিছুই নেই। তবু দাদা আর বউদি কথা শোনাতে ছাড়ে না। আজকাল অবশ্য বলে বলে তারাও কিছু ক্লান্ত।

অনিন্দিতা খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, আমার কিন্তু তোমার মতো নয়। আমার অনেক অ্যাম্বিশন।

জানি।

আমি বসে থাকি না। বি এ পাস করেই টাইপ আর শর্টহ্যান্ড শিখেছিলাম। কোনও কাজে এল না। বি এড করলাম। মাস্টারি জুটল না। এবার ভাবছি কম্পিউটার শিখব। কিন্তু এত টাকা লাগে যে বাবার ওপর প্রেশার পড়ে যাবে।

নার্সিং হোমে কেমন লাগছে?

ধুস। একদম বাজে। আমি তো আজকাল রিসেপশন আর অফিস ওয়ার্ক দেখি। কিন্তু কী জানো? ডাক্তার বাসু লোকটা ভাল নয়। নানারকম আভাস ইংগিত শুরু করেছে।

সেটা কি রকম?

সেটাও বুঝিয়ে বলতে হবে নাকি? মেয়েদের যেভাবে ক্ষমতাবান পুরুষেরা ব্যবহার করতে চায় ঠিক সেরকম। গত সপ্তাহেও উইক এন্ডে কোথায় যেন নিয়ে যেতে চেয়েছিল। আমি কাজ আছে বলে পার পেয়ে গেলাম। আমার বদলে শুক্লা নামে একজন নার্সকে নিয়ে গেল। শুক্লার অবশ্য প্রেজুডিস নেই। ডিভোর্সি, এক ছেলের মা। আমার তো তা সম্ভব নয়। এর পর যদি আবার ওরকম প্রস্তাব দেয় তাহলে বোধ হয় চাকরি ছাড়তে হবে।

চয়ন একটু চুপ করে রইল। মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল হঠাৎ। বলল, বুঝেছি।

নতুন কিছু নয়। দেশ জুড়ে এসব হয়। আমরা যারা সংস্কার আঁকড়ে থাকি, সতীত্ব, কৌমার্য আঁকড়ে থাকি তাদেরই কিছু হয় না। পড়ে মার খাই।

চয়ন মৃদু স্বরে বলল, এসব ভ্যালুজ একটু পারসোনাল অনিন্দিতা, যারা একবার হারিয়ে ফেলে তারা আর মূল্যটা খুঁজেই পায় না। ভোঁতা হয়ে যায়।

তুমি কি মনে করো শারীরিক পবিত্রতার কোনও দাম আছে?

দাম নেই নাকি?

আছে? ওটা তো পুরনো অচল ধারণা। সংস্কার। আমরা কিছু বোকা মানুষ ওসব মেনে চলি।

লোভী লোকের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া কি সংস্কারমুক্তি?

অনিন্দিতা একটু ভেবে বলল, ঠিক তা বলছি না। কিন্তু প্রয়োজনে যদি শরীর দিতে হয়?

প্রয়োজনটাকে খুব বড় করে দেখতে গেলে অনেক গণ্ডগোল হয় অনিন্দিতা। বরং প্রয়োজন কাটছাঁট করা ভাল।

অনিন্দিতা হাসল, তোমার মতো?

তা বলিনি।

আচ্ছা, আমি পবিত্র থাকলে কি তুমি খুশি হও?

হই অনিন্দিতা।

কেন হও?

এমনি। আমি একটু প্রাচীনপন্থী বোধ হয়।

অনিন্দিতা সামান্য মন্থর গলায় বলল, ওটা আমার প্রশ্নের জবাব হল না। আমি পবিত্র থাকলে তোমার কি?

আমার কিছুই না।

কেন কিছুই না?

মুশকিলে ফেললে।

এবার অনিন্দিতা হাসল, আচ্ছা থাক, বলতে হবে না।

চয়ন বাঁচল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অনিন্দিতা বলল, জানো, আমার খুব ইচ্ছে ছিল নাটকে অভিনয় করি। দু' চারটে করেছিও। কিন্তু গ্রুপ থিয়েটারে চান্স পাওয়ার কোনও স্থিরতা নেই। পয়সাও পাওয়া যায় না।

ক'টা নাটকে অভিনয় করেছ?

করেছি কয়েকটা। কিন্তু ভাল রোল পাইনি। আমার চেহারাও তো ভাল নয়।

চয়ন চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে বলে, থিয়েটারে মেয়েদের এক্সপ্লয়েটেশন নেই?

ওমা! নেই আবার! খুব আছে। তবে কী হয় জানো, প্রেম-ট্রেম হয়ে যায়। বিয়েও হয়।

তোমার হল না?

না তো! তবে একটা প্রেম হবোহবো হয়েছিল। যে ছেলেটার সঙ্গে হয়েছিল, পরে জেনেছি ওটা একটা হারামজাদা। বউ আছে, তবে তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না।

তোমার অভিজ্ঞতা অনেক, না?

অনেক।

দুজনে ফের চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

হঠাৎ তার হাতে একটা হাত রেখে অনিন্দিতা বলে, শোনো, তুমি হার মেনো না।

তার মানে কি অনিন্দিতা?

তুমি হার মানলে আমার খারাপ লাগবে।

চয়ন এই নাটকীয় ডায়ালগে একটু অবাক হয়ে বলে, হার মানবারও কিছু নেই। আমার অ্যাম্বিশনই নেই যে। আমার শুধু মনে হয়, এই বেশ আছি।

এটাকে থাকা বলে না। তোমার ব্রেন ভীষণ শার্প। তুমি অনেক জানো। তোমার কিছু হবেই।

আমার বয়স ত্রিশের কাছাকাছি হল অনিন্দিতা।

তাতে কি? ওটা কি বয়স? আমারও তো পঁচিশ।

দুজনে ফের কিছুক্ষণ চুপচাপ।

আমি এলে তোমার খারাপ লাগে না তো!

না। ভাল লাগে।

৯০

থেকে থেকে বুকের মধ্যে যেন একটা শাঁখ বেজে ওঠে, মা! মা! বুকটা বড় হা-হা করে, বড় ফাঁকা হয়ে যায়, ধু-ধু হয়ে যায়। ক'টা দিন বড় কেঁদেছে নিমাই। এত কেঁদেছে যে আজও তার মাথা ভার হয়ে আছে। পুরো এক মাস অশৌচ পালন করেছে সে, তারপর নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রাদ্ধ। তার বোকা মা কোন্ অজানায় পাড়ি দিল, ভগবান তার সহায় হোক।

মরণের কাছে যে মানুষ কত অসহায় তা যত ভাবে ততই দুনিয়াটাকে তার তুচ্ছ বলে মনে হয়।

তার অবস্থা দেখে ভয় খেয়ে বাবা বলল, ওরে, তুই অত মনমরা হয়ে থাকলে মাথার দোষ হয়ে পড়বে। যা না, বন্ধুদের সঙ্গে একটু কথা-টথা কয়ে আয়, না হলে কাঁচরাপাড়ায় হোটেলে গিয়ে খানিকটা সময় বোস।

মা মারা যাওয়ার পর তার বাবা আছাড়ি-পিছাড়ি হয়ে কেঁদেছে বটে, কিন্তু নিমাইয়ের অবস্থা দেখে বাবা ভয় খেয়ে চুপ মেরে গিয়েছিল। ছেলেটার না আবার কিছু হয়ে যায়। মায়ের শোকে হয়তো মরেই যাবে।

ধড়া গায়ে, উসকো-খুসকো চুল, এক মুখ দাড়ি নিয়ে বাবার আদেশে অশৌচের মধ্যেও কাঁচরাপাড়ায় গিয়ে হোটেলের কাজকর্ম দেখেছে নিমাই। কর্মচারী দুজন মিলে চালিয়ে নিয়েছে বটে, কিন্তু ক'দিনেই বড় নোংরা করে ফেলেছে চারধার। প্লেট কাপও ঠিকমতো ধোয়া হয় না, ঝাট-পাট ঠিকমতো পড়ছে না, ঝুল-টুল জমেছে, তরকারির খোসা, মাছের আঁশ পচছে রান্নাঘরের কোণে। নিমাই থাকলে এসব হতে পারে না, তার দোকানের পরিচ্ছন্নতার নাম আছে। অশৌচের মধ্যে নিমাই কিছু ছোঁবে না, তবু দাঁড়িয়ে থেকে সব পরিষ্কার করাল। দোকানের বাইরে একখানা টুলে চুপচাপ কুশাসন পেতে উদাস ভাবে বসে রইল। চেনা মানুষরা এসে কত সমবেদনা প্রকাশ করে গেল।

বুকটা বড় ফাঁকা, বড় উদাস, বেঁচে থাকার রসটাই যেন মরে গেল মায়ের সঙ্গে সঙ্গে। বীণাপাণির সঙ্গে বনগাঁ চলে গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতে অনেকটা ফাঁক পড়ে গিয়েছিল। মায়ের জন্য কত কী করার ছিল তার, কত কী করেনি, সেসব উল্টোপাল্টা হয়ে বারবার মনে পড়ে আর চোখ জলে ভাসতে থাকে।

বাবা একদিন খরখরে গলায় জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ রে, বীণাপাণি যে এল না!

তাকে খবর দিইনি বাবা।

বাবা একটু স্তম্ভিত হয়ে বলে, খবর দিসনি? এ খবর তো দিতেই হয়।

নিমাই মাথা নেড়ে বলে, ঠিক কথা। কিন্তু সে তো আর আমাদের জন নেই বাবা। তার এখন অন্য রকম জীবন।

বুড়ো মানুষ এসব হেঁয়ালি বুঝতে পারে না। গম্ভীর মুখে খানিকক্ষণ বসে থেকে বলল, ঘরের বউ তো, তাকে না জানানো কি ঠিক হল?

ঘরের বউ কি আর বাঁধা আছে বাবা? সে যুগ আর নেই। এখন সব অন্যরকম হয়ে গেছে।

বুড়ো মানুষটি তবু ঠিক বুঝতে চায় না। বলে, যাত্রা-টাত্রায় নামা ভাল কথা নয়। ওটাই একটা ভুল হয়ে গেছে।

নিমাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বাঁচতে গেলে কত কী করতে হয়। তার কী দোষ বল? সে তো আমাকে বাঁচাতেই রোজগার করতে নেমেছিল। দোষ তার নয় বাবা।

বাবা কিছুই তেমন বুঝতে পারে না। চুপ মেরে যায়। মনটা ভাল লাগে না বোধ হয়।

নিমাই বলে, এবার পালপাড়ার পাট তুলে দিলে হয় বাবা।

তুলে দিবি?

মা যখন নেই তখন আর এ-বাড়িতে থেকে তোমার কাজ কী? কাঁচরাপাড়ায় দিব্যি থাকতে পারবে।

বাবা কিছুক্ষণ তোম্বা মুখে বসে থাকে। তারপর বলে, ওই যে সব গাছপালা ওসব তোর মায়ের লাগানো, ওই যে কাপড় শুকুতে দেওয়ার দড়ি, ওটি সে টাঙিয়েছিল। সারা বাড়িতে এখনও ম-ম করছে তার গন্ধ। এ বাড়ি বেচতে পারবি? আমার তো কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না। মনে হয়, মরেনি, কোথাও পাড়া-বেড়াতে গেছে। এখুনি এসে পড়বে।

নিমাই এ কথা শুনে হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে, না বাবা, থাক তাহলে। এ বাড়ি থাক।

শ্রাদ্ধ ভালরকমই করল নিমাই। গায়ের সব লোককে নেমন্তন্ন দিল, খুব খাওয়াল। নিয়মভঙ্গের পরদিন বাবাকে বলল, তাহলে কি আমি আসব বাবা? কাঁচরাপাড়ায় অনেক কাজ পড়ে আছে।

এসো গিয়ে।

একা লাগবে না তো তোমার?

না না, একা কেন? তোর মা তো আছেই। চারদিকে ছড়ানো রয়েছে স্মৃতি। বেশ থাকব, মাঝে মাঝে আসবি।

সে তো আসবই। ভাবি, শরীর-টরীর হঠাৎ খারাপ করলে দেখবে কে? আমাদের তো জনের অভাব।

আমাকে নিয়ে ভাবিস না। পাড়ার লোক আছে। ভুরো রইল।

ভুরো একজন বয়স্কা বিধবা। ইদানীং সে-ই রান্নাবান্না করে দিয়ে যায়। তবে তার ঘরসংসার আছে বলে এ বাড়িতে থাকে না। নিমাইয়ের চিন্তাটা তাই গেল না।

হ্যাঁ রে, বীণাপাণি কি আর ফিরবে না?

না বাবা।

ছাড়ান কাটান হয়ে গেছে নাকি?

সেরকমই ধরে নাও।

আমি ভাবি তোকে তাহলে দেখবে কে? তোরও তো বয়স হচ্ছে।

তোমাকে যে দেখবে, আমাকেও সে-ই দেখবে। ভয় কি?

কাঁচরাপাড়ায় ফিরে এল নিমাই একটা শ্মশান-বৈরাগ্য নিয়ে। সবই করে যাচ্ছে, কিন্তু যন্ত্রের মতো। মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে একটা শাঁখ শুধু বেজে উঠছে, মা!

একদিন সন্ধেবেলা কাকা এসে হাজির।

নিমাই কেমন আছ?

নিমাই তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়াল, ভাল আছি কাকা।

তোমার মায়ের গত হওয়ার খবর পেয়েছি।

বসুন কাকা, কিছু খেয়ে যেতে হবে আজ।

তোমার কেবল খাওয়া আর খাওয়া। আজকাল খাওয়া অনেক বাদ দিতে হয়েছে। প্রেশার দেখা দিয়েছে। এখন আর আমদা খাওয়া-দাওয়া করি না।

তবু কিছু মুখে না দিলে ছাড়ছি না। কবে এসেছেন?

আজই। রাতের বাস ধরে ফিরে যাবো। শোনো, অনেক মিথ্যে কথা-টথা বলে বীণাপাণিকে সেই পাঁচ হাজার টাকা গছিয়েছি।

বড় ভাল লাগল শুনে। তাকে আরও কিছু দিতে পারলে হত। কিন্তু মায়ের কাজ গেল, অনেক খরচ হয়ে গেছে।

অত অস্থির হচ্ছ কেন? তার তো অভাব নেই।

জানি কাকা। তবে আমি বড় ঋণী হয়ে আছি।

স্বামীর জন্য স্ত্রী করলে কি ঋণ হয়?

নিমাই মাথা নেড়ে বলে, তা ঠিক। তবে আমাদের সম্পর্ক তো জানেন। ঠিক স্বামী-স্ত্রীর মতো নয়। সে আমাদের প্রতিপালন করেছে। কষ্ট করেই করেছে।

শাশুড়ি মারা গেল, কিন্তু অশৌচটুকুও তো মানল না দেখলাম।

নিমাই জিব কেটে বলল, তাকে খবরই দেওয়া হয়নি।

কাকা অবাক হয়ে বলল, কে বলল খবর দেওয়া হয়নি? খবর সে সময়মতোই পেয়েছে। কিন্তু মানল না।

নিমাইয়ের মুখটা বিষণ্ণ হয়ে গল, খবর পেয়েছে?

নিশ্চয়ই। কুসুম নিজে তাকে খবর দিয়েছে।

নিমাই একটু চুপ করে থেকে বলে, না মানুক, সম্পর্ক তো আর নেই যে মানতে হবে।

কাকা একটু হাসল। বলল, তা বটে। তবে সম্পর্ক না থাক, এক সময়ে ঘর তো করেছে। সেই সুবাদে হবিষ্যি বা শ্রাদ্ধের বাবদ কিছু টাকাও তো পাঠাতে পারত।

নিমাই হাসল, ভগবানের দয়ায় তার আর দরকার কী? বীণাপাণির টাকায় আমার মা-বাপ একসময়ে খেয়েছে পরেছে, সেটাই যথেষ্ট।

কাকার মুখটা কিছু গম্ভীর হল। তারপর হঠাৎ গলা পাল্টে গেল। একটু থমথমে গলায় বলল, আজ তোমার কাছে একটা বিশেষ প্রয়োজনে আসা।

গলাটা শুনে আর একবার তটস্থ হল নিমাই। বলল, আজ্ঞে, বলুন। গুরুতর কথা নাকি?

খুবই গুরুতর। একটু আড়ালে বলতে চাই। বাইরে চলো।

নিমাই চটিজোড়া পায়ে দিয়ে কাকার সঙ্গে বেরিয়ে এল। কাছেই একটা ফাঁকা জায়গা। লোক চলাচল নেই।

নিমাই, তোমাকে আমি সত্যবাদী বলে জানি। মিথ্যে কথা বলতে বোধ হয় তুমি জানোই না। আজ তোমার কাছে একটা কথা জানতে চাইলে বলবে?

নিমাইয়ের বুকটা একটু কেঁপে গেল। লক্ষণ সে ভাল বুঝছে না। কাকা যখন ভাল তখন অতিশয় ভদ্রলোক। কিন্তু কাকা যদি ক্ষেপে ওঠে তাহলে কুরুক্ষেত্র হয়ে যায়।

একটু ভয়ে ভয়ে নিমাই বলল, কিছু কবুল করতে হবে নাকি?

যদি করো তাহলে ভাল হয়।

নিমাই এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, একটা কথা বলে নিই কাকা। যদি এমন কিছু কবুল করতে বলেন যা করলে কারও ক্ষতি হয় তবে আমি কিন্তু মুখ খুলতে পারব না।

কাকা একটু হাসল, তাহলেই হবে।

এবার বলুন।

তোমার কি মনে আছে বনগাঁয়ে পগা নামে একটা ছেলে খুন হয়েছিল?

বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা একটা পেল্লায় লাফ মারল নিমাইয়ের। দাঁতে দাঁত চেপে সে মৃদু গলায় বলল, আছে।

বীণার সঙ্গে তার একটু খাতির ছিল। তাই না?

যে আজ্ঞে।

পগার কাছে অনেক ডলার আর পাউণ্ড ছিল। যে রাতে সে খুন হয় সেই রাত থেকেই টাকাগুলো হাওয়া।

সব জানি কাকা।

ভোলার কথা নয়। সেই ডলার আর পাউন্ডের জন্য আমার দলের দুজন খুন হয়, আমার ব্যবসা লাটে ওঠার অবস্থা হয়। মনে আছে?

আছে কাকা।

সেই ডলার আর পাউন্ডের হদিশ আজও আমরা পাইনি।

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

নিমাই, তোমার কাছে আজ কথাটা জানতে চাই।

কী বলব কাকা?

সেই টাকাটার কী হল?

নিমাই মাথা নেড়ে বলল, জানি না।

কাকা তার দিকে একটু চেয়ে থেকে বলল, জানো না?

না কাকা।

কিন্তু টাকাটা কে নিয়েছিল, কার কাছে গচ্ছিত ছিল তা কি জানো নিমাই?

নিমাই চুপ করে থাকে।

এ কথাটার জবাব দেবে না?

না কাকা। এ কথাটার জবাব আমার কাছে চাইবেন না।

তবে কি তুমি জানো?

জানতাম।

শোনো, পল্টু আমাকে কয়েকদিন আগে বলেছে যে, ওর কাছে বীণাপাণি একবার ডলার ভাঙিয়েছিল। আর সনাতন গতকাল বলেছে যে, তোমাকে ও ঘরের ভিত খুঁড়ে ডলার আর পাউন্ড বার করতে দেখেছে। সত্যি?

নিমাইয়ের চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছিল। গলায় কান্নার হেঁচকি তুলে সে কাকার দু' খানা হাত ধরে বলল, কত বললাম ওকে, শুনল না। আমাকে কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিল। আজ ভাবি কোন পাপে সেদিন ইদুরের গর্ত বোজাতে গিয়ে ওই অলক্ষুণে পাপের টাকাগুলো টেনে তুললাম গর্ত থেকে।

কেঁদো না নিমাই, তোমার তো দোষ নয়।

কাঁদতে কাঁদতে নিমাই বলল, কতগুলো প্রাণ চলে গেল কাকা। কত পাপ হল!

কাকা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, বীণাপাণি তার ঘরের মেঝে বাঁধিয়ে নিয়েছে। তোমার কি মনে হয় যে ওর কাছেই টাকাটা আছে?

আমি কিছু জানি না কাকা।

কাকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, দু-একজন সন্দেহ করছে যে, ওই টাকাটা বীণাপাণি তোমাকেই দিয়েছে। আর সেই টাকাতেই তুমি হোটেল খুলেছ। তোমাদের মধ্যে ঝগড়া ছাড়াছাড়িটা লোক দেখানো ব্যাপার।

নিমাই হাঁ করে কাকার মুখের দিকে তাকাল। তারপর কথা খুঁজে না পেয়ে চোখ বুজল। দুটো হাত মুঠো পাকাল, খুলল। তারপর হঠাৎ খুব শান্ত হয়ে গিয়ে বলল, যদি তাই হয় কাকা, তবে একটা কাজ করবেন? আমার যা আছে সব আপনি নিন। এই হোটেল, নগদ যা টাকা আছে আমার সব কালই লেখাপড়া করে দেবো আপনাকে। খুব কম হবে না কাকা। ঋণটা শোধ হয়ে যাবে।

কাকা তার কাঁধে হাত রেখে বলল, তুমি কি স্বীকার করছ যে, ডলার আর পাউন্ড তুমিই নিয়েছ?

কান্নার মধ্যেও হাসল নিমাই, আমাকে কবুল করতে বলছেন কেন? তার পাপের স্খালন হোক, আপনি আমার সব নিয়ে নিন।

তুমি কি ভাবো যে আমি ওসব কথায় বিশ্বাস করেছি?

নিমাই ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, অবিশ্বাসেরও ব্যাপার নয়। আমার মাথাতেই শুধু খেলেনি। ঠিকই তো, বীণাপাণির হাতে ডলার আর পাউন্ড এল আর নিমাইও হোটেল খুলল, এ তো দুইয়ে দুইয়ে চার কাকা। অবিশ্বাসের কিছু তো নয়। আপনার হাত দিয়েই তাকে পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়েছি, সেটাও তো সন্দেহজনক। তাই না?

হ্যাঁ নিমাই, খুবই সন্দেহজনক। নিমাই, তোমাকে আজ না বলে আমার উপায় নেই। ব্যাপারটা এতই সন্দেহজনক যে আমার দলের ছেলেরা খুবই গরম হয়ে আছে। তারা হয়তো ভেবেও দেখবে না, তুমি কতটা ভাল লোক বা সত্যবাদী। তারা বীণার ওপরেও রেগে আছে বটে, কিন্তু তাদের ধারণা টাকাটা তোমার কাছেই আছে। অবস্থাটা বুঝতে পারছ নিমাই?

নিমাই ঘাড় নেড়ে ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলল, পারছি কাকা। খুব পারছি। শুধু বলুন, আমাকে কী প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

প্রায়শ্চিত্ত? সেটা আবার কি রকম?

আমার যা আছে সব যদি দিয়ে দিই তাহলে কি হবে? নাকি আমাকে খুন করতে চায় তারা? তাহলেও আমার কোনও আপত্তি নেই কাকা। যখন যেখানে বলবেন আমি হাজির হয়ে যাবো, যা শাস্তি দেবেন তা মাথা পেতে নেবো। বীণাপাণিকে শুধু ছেড়ে দেন আপনারা। সে অসহায় মেয়েমানুষ।

কাকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তুমি বড় গণ্ডগোলে ফেলে দিলে আমাকে। সোজা কথা বলো তো, টাকাটা কি তুমি নিয়েছ, না নাওনি?

হাতের পিঠে চোখ মুছে নিমাই বলে, আমি কিছু বলতে পারব না কাকা। মাপ করুন।

কাকা কিছুক্ষণ থম ধরে থেকে বলল, তুমি একবার বনগাঁয়ে যেতে পারবে?

এখনই!

না, এখন নয়। হুট করে হাজির হলে তোমার বিপদ হতে পারে। আমার ছেলেরা কেমন তা তো জানো।

জানি কাকা। তারা খারাপ তো নয়।

খুবই খারাপ। তারা ক্ষেপে আছে।

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, একটা কথা বলি কাকা। আমাকে একটা ভিক্ষে দিতে হবে।

কী চাও নিমাই?

আপনারা বীণাপাণিকে কিছু করবেন না। তার প্রাণটা ভিক্ষে চাই।

কাকা হাসল, বলল, বীণাপাণির অনেক গুণ। আমি গুণের খুব সমঝদার। তাকে কিছু বলা হয়নি, শাস্তি দেওয়ার কথাও ওঠেনি এখনও। তবে ছেড়েও দেওয়া হবে না।

তার দায় যদি আমি ঘাড়ে নিই?

বলেছি তো, তুমি আজ আমাকে খুব গণ্ডগোলে ফেলে দিয়েছ। আমি কিচ্ছু ভেবে পাচ্ছি না। বনগাঁয়ে ফিরে গিয়ে আজ রাতেই দলের ছেলেদের নিয়ে বসব। তারপর যা হয় ঠিক হবে। ওই ডলার আর পাউন্ডের জন্য আমাদের কত ক্ষতি হয়েছে তা তুমি জানো না। আমার দুটো লোক খুন হয়েছে, তার ওপর টেনশন, মারদাঙ্গা।

নিমাই দু' হাতে মুখ ঢাকল।

বীণার যদি মনুষ্যত্ব থাকত নিমাই, তাহলে সে এসব চোখে দেখেও চুপ করে থাকত না। অথচ তার দুর্দিনে আমার অনেক অসুবিধে সত্ত্বেও তার জন্য কম করিনি। দুধকলা দিয়ে কালসাপ পোষা হয়েছে।

নিমাই দু' হাত মুখ থেকে নামিয়ে কাকার হাত দুটো চেপে ধরে বলল, তাকে মারবেন না কাকা। প্রাণে মারবেন না।

কাকার মুখটা খুব থমথমে। বলল, আমি তোমাকে খবর পাঠাবো। খবর নিয়ে যে ছেলেটি আসবে তার সঙ্গেই বনগাঁয়ে চলে যেও। বুঝেছ?

আমি আপনার সঙ্গে আজ রাতেই যাই না কেন? আমার যে বড় উদ্বেগ হচ্ছে।

না নিমাই। বোকার মতো কাজ কোরো না। তোমাদের এক সময়ে ভাল চোখে দেখতুম, তাই তোমাদের ক্ষতি হোক তা চাই না। আগে আমাকে দলের ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে দাও।

যে আজ্ঞে। একটু দেখবেন দয়া করে।

কাকা চলে যাওয়ার পর মাঠের মধ্যে অন্ধকারে ভূতগ্রস্তের মতো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে নিমাই। তারপর হঠাৎ একটা ইটের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে সজোরে নিজের কপালে মারল সে, প্রায়শ্চিত্ত! প্রায়শ্চিত্ত হোক

ভগবান!

তারপর ফিরে এল নিমাই। কপাল ফেটে গাল বেয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে জামায়। চোখ মুখ উদ্‌ভ্রান্ত।

বিশে, বিলু ইত্যাদি তার কর্মচারীরা দৌড়ে এল, কে মারল আপনাকে বাবু? ওই লোকটা নাকি?

নিমাই মাথা নেড়ে বলে, না না, সে বড় ভাল লোক। সে কত করেছে আমাদের জন্য। আমরাই নিমকহারাম। পড়ে গিয়ে চোট হল কপালে।

প্রায় সারা রাত কাঁদল নিমাই। এক ফোঁটা ঝিমুনি এল না তার গুদামঘরের গুমটিতে পাহারা দিতে বসে। সারা রাত ভগবানকে ডাকল, সারা রাত মনস্তাপে হাহাকার করল বুক। না, তার একটুও লোভ নেই। তার যা আছে সব সে দিয়ে দেবে কাকাকে। তারপর কাকা ছোরা বা গুলি যাই দিয়েই মারুক শান্তভাবেই মরবে নিমাই। কর্মফল ক্ষয় হোক।

ওদিকে রাত ন'টা নাগাদ বনগাঁয়ে বীণার দরজায় ধাক্কা পড়ল, বীণা দরজা খোলো শিগগির।

বিরক্ত হয়ে বীণা উঠে এল, এত রাতে জ্বালাতে এলেন বাবু। কী গো, কী চাই?

সজলকে কিছু উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। বলল, বীণা, আমি ছুটতে ছুটতে আসছি। একটা কথা ছিল।

বীণা মুখ টিপে হেসে বলল, রসের কথা তো! অনেক বলেছ।

বীণা, কথাটা জরুরি। তোমার বিপদ!

বিপদ!

৯১

আপাতত একতলা। দোতলাটা পরে হবে, যদি প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই "প্রয়োজনটা" নিয়েই আবার মণীশ আর অপর্ণার মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিচ্ছে। মণীশ বলল, দোতলাটা একবারেই করে ফেলা দরকার। দোতলাটা হবে লিভিং কোয়ার্টার, একতলায় থাকবে বসবার ঘর, ডাইনিং রুম, রান্নাঘর।

অপর্ণা মাথা নেড়ে বলে, দোতলার এখন কোনও দরকার নেই। দু' কাঠা জমি নিয়ে বাড়ি হচ্ছে। একতলাতেই অনেক জায়গা।

মণীশ আপত্তি করতে লাগল, একতলায় মশা বেশি। চোরের উৎপাত হবে খুব। জানালা দিয়ে লগি ঢুকিয়ে আলনার জিনিসপত্র টেনে নিয়ে যাবে।

অত সোজা নয়। জানালায় জাল থাকবে।

শোনো অপু, একতলায় আরও হ্যাজার্ডস্ আছে। ক্রলিং ওয়ার্ম এসে ঢুকবে বর্ষাকালে। ব্যাঙ লাফাবে ঘরের মধ্যে, কেঁচো বেয়ে বেড়াবে, বিছে কিলবিল করবে।

হ্যাঁ গো, এরপর আমাকে ভয় দেখানোর জন্য রাক্ষস-খোক্কসের গল্পও ফাঁদবে নাকি? একতলায় কি মানুষ থাকছে না? সব একতলাই কি সুন্দরবন!

খুবই ব্যথিত হয়ে মণীশ বলল, একতলার হ্যাজার্ডস্ তুমি স্বীকার না করলেও, আছেই। বেশি বৃষ্টি হলে ডুবেও যেতে পারে ঘরদোর।

অনেক কিছু হলে অনেক কিছুই হতে পারে। তা বলে সেসব ভেবে গুটিয়ে থাকতে হবে নাকি?

তুমি ভীষণ অ্যাডামেন্ট অপু।

মোটেই নয়। আমি প্র্যাকটিক্যাল। এক গাদা টাকা খরচ করে দোতলা বানাবে। থাকবে কে বলো তো? মোটে তো পাঁচটি প্রাণী। অনু আর ঝুমকির বিয়ে হয়ে যাবে, বুবকা হয়তো পড়তে চলে যাবে হোস্টেলে, তখন অত বড় বাড়ি হাঁ হাঁ করবে না? তুমি তো ভাড়াটেও বসাতে দেবে না।

না, না, ভাড়াটের প্রশ্নই উঠছে না। কিন্তু দোতলা অনেক সেফ এটা তো মানো?

সাবধান থাকলে একতলাও সেফ। অত ভয়ের কিছু নেই।

আচ্ছা অপু, একটা কাজ করলে হয় না?

আবার কী?

ধরো, একতলাটা আমরা কমপ্লিট করলাম না, শুধু পিলার থাকল। শুধু পিলারের ওপর দোতলাটা করলাম। ডিজাইনটাও চমৎকার হবে আর দোতলায় থাকাও হবে।

মাথায় নতুন নতুন আইডিয়া এলেই তো হবে না। দোতলা মানেই দু' দফা ছাদ ঢালাই। খরচ কাছাকাছিই পড়বে।

মণীশ খুবই হতাশ মুখে বসে থাকে। মুখে থমথম করে বাচ্চা ছেলের মতো অভিমান। তারপর বলে, ঠিক আছে, ছেলেমেয়েদের মতও নেওয়া হোক। লেট আস পুট ইট টু ভোট।

অপর্ণা সবেগে মাথা নেড়ে বলে, কখনও নয়। তোমার ডেমোক্র্যাসির চালাকি আমার জানা আছে। ছেলেমেয়েরা সবাই তোমার দলে। তোমার মতোই ইমপ্র্যাকটিক্যাল। ওরা যখনই বুঝবে যে, তুমি দোতলা করতে চাও তখনই ওরা তোমার পক্ষ নেবে। আমি তোমার ভোটাভুটি মানি না।

তুমি একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছো অপু।

তাই চালাবো। তোমাদেরও মানতে হবে।

আবার ভেবে দেখো অপু। তুমি বড় কৃপণ।

আমাদের টাকা তো ছপ্পড় ফুঁড়ে আসে না!

প্রচুর আপত্তি, বাদানুবাদের পর ছেলেমেয়েদেরও চুপ করাতে পারল অপর্ণা। বাড়ি করার ব্যাপারে স্বপ্নশীল মণীশকে সে দূরে রাখল। ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও কোনও পরামর্শই করল না। সে ধরল চারুশীলাকে।

আপনার হাজব্যান্ড তো নামকরা মানুষ, যদি তাঁর চেনাজানা কোনও ঠিকাদার বা রাজমিস্ত্রি ঠিক করে দেন তো ভাল হয়।

চারু অবাক হয়ে বলল, তা কেন? সুব্রত নিজেই করে দেবে আপনার বাড়ি।

অপর্ণা শিহরিত হয়ে বলে, কী যে বলেন! আমাদের বাড়ি নিতান্তই ছোট আর সাদামাটা। ওঁর মতো মস্ত মানুষ কেন ওরকম বাড়ি করতে যাবেন?

তাতে কী? সাদামাটা বাড়ি করলে কি ওর জাত যাবে?

তা নয়। আসলে উনি ব্যস্ত মানুষ। আমার তো ওঁকে দরকার নেই। একজন ভাল রাজমিস্ত্রি পেলেই আমার হয়ে যাবে।

চারুশীলা অবশ্য এত সহজে ছাড়ল না। সুব্রতর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিল অপর্ণার। বলল, ওঁর বাড়িটা তোমাকেই করে দিতে হবে।

অপর্ণা তো লজ্জায় মরে।

কিন্তু সুব্রত এতটুকু বিব্রত বা বিরক্ত হল না। মিটিমিটি হাসিমুখে অপর্ণার বাড়ির প্ল্যানটা খুব খুঁটিয়ে দেখল। দু' একটা প্রশ্ন করল। তারপর বলল, বাড়ির প্ল্যান ভালই হয়েছে। সয়েলটা একটু টেস্ট করিয়ে নিলে ভাল হত। জলা বা পুকুরটুকুর ছিল না তো ওখানে!

তা তো জানি না।

তাহলেও একটু ডীপ ফাউন্ডেশন করবেন। আমি মিস্ত্রি ঠিক করে দিচ্ছি। তাকেই বুঝিয়ে বলে দেবো সব।

উঃ, বাঁচালেন!

আপনি কি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ি করাবেন, না কি কন্ট্রাক্টে?

যদি নিজে করাই?

সুব্রত মিষ্টি হেসে বলল, করতে পারলে তো ভালই। কিন্তু প্রবলেমও আছে। মেটিরিয়াল চুরি হয়ে যাবে। চৌকিদার রেখেও সেটা আটকাতে পারবেন না। লোকাল মস্তানরা চাঁদা চাইবে। তারপর আপনার ফিজিক্যাল কষ্টটা তো আছেই। অনেকে বাড়ি করাতে গিয়ে শেষে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

তাহলে কন্ট্রাক্ট দেওয়াই কি ভাল?

কলকাতায় সেটাই ভাল। একটু দেখাশুনো করলেই হবে।

তাতে কি টাকা একটু বেশি লাগবে?

সুব্রত মিটিমিটি হেসে বলে, যে টাকাটা বেশি লাগবে সেটা নিজে করলেও লেগে যাবে। চুরিটুরি গেলে তো সেটাও এস্টিমেটের মধ্যে চলে আসবে কিনা।

তাহলে দয়া করে আমাকে একজন ঠিকাদার ঠিক করে দিন। আমার কর্তাটি কোনও কাজের নন।

কোনও সমস্যা হবে না। কাল বা পরশু সকালেই ঠিকাদার গিয়ে আপনার বাড়িতে দেখা করবে।

আপনাকে বিব্রত করলাম।

আরে না। এ তো সামান্য ব্যাপার।

চারুশীলা এসব কথায় মোটেই খুশি হল না। বলল, তোমাদের কথার মাঝখানে কথা বলিনি। কিন্তু বাড়িটা তুমি করলেই পারতে।

সুব্রত একটুও বিব্রত না হয়ে বলল, পারতাম। কিন্তু আমাকে তো পরশুই আবার দিল্লি যেতে হবে। সময় কি হবে?

অপর্ণা বলল, না না, আপনাকে একটুও বিব্রত হতে হবে না। একজন ভাল ঠিকাদার পেলেই আমার হবে।

পরদিন সকালে যে লোকটি সুব্রতর রেফারেন্সে এসে অপর্ণার সঙ্গে দেখা করল তাকে দেখে অপর্ণা তটস্থ। লোকটা এসেছে একখানা ঝকঝকে মারুতি গাড়িতে। তার পোশাকআশাক এবং চেহারা এতই অভিজাত যে, ঠিকাদার কথাটা এর পরিচয়ের সঙ্গে মেলে না।

কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বিষয়, লোকটি বিনয়ী এবং সুব্রতর প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল। সে ইউ পি-র লোক তবে বাংলা বলতে পারে। বলল, কোনও চিন্তা করবেন না। মিস্টার রায় যখন বলেছেন তখন দেয়ার উইল বি নো প্রবলেম।

লোকটা প্ল্যান খুঁটিয়ে দেখল। একটা পকেট ক্যালকুলেটারে হিসেব করল। আর বুক কাঁপতে লাগল অপর্ণার, এস্টিমেট যা দেবে তা সে সইতে পারবে তো?

লোকটা যা এস্টিমেট দিল তাতে খুবই অবাক হল অপর্ণা। সে যা ভেবে রেখেছিল তার চেয়েও কম। ভুল শুনেছে কিনা তা বুঝতে না পেরে বারকয়েক জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হয়ে নিল। তারপর বলল, আপনি কাজ শুরু করে দিন। কত টাকা দিতে হবে এখন আপনাকে?

লোকটা হাত তুলে বলল, নো মানি নাউ। পেমেন্ট করবেন আফটার কমপ্লিশন।

কমপ্লিশন! ভূতগ্রস্তের মতো চেয়েছিল অপর্ণা। বিশ্বাস হচ্ছে না।

লোকটা বলল, টাকা তো বেশি নয়, সামান্যই! ওদিকে আমার কাজও হচ্ছে। আপনি ভাববেন না। আপনি ভূমিপূজা করে নিন, তারপর আমাকে একটা খবর দেবেন। কাজ শুরু হয়ে যাবে।

লোকটা তার কার্ড রেখে চলে গেল।

অপর্ণা একটু অভিভূত হয়ে বসে রইল। চারুশীলা আর তার বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় বুকটা ভরে উঠছিল তার। প্রতিদানে চারুশীলার জন্য কিছুই করার নেই তার। ওরা এত বড়লোক, এত ওদের ক্ষমতা, অপর্ণা কী করতে পারে ওদের জন্য?

সে চারুশীলাকে ফোন করে বলল, ভাই, আপনি যে আমার কী উপকার করলেন তা বোঝাতে পারব না। কন্ট্রাক্টর আজ এসে দেখা করে গেছে।

চারুশীলা বলল, উপকার আবার কিসের? জানেন তো, ঝুমকি আমার খুব বন্ধু। মাসি বলে ডাকে, কিন্তু আসলে আমরা বন্ধুই। আমার ইচ্ছে ছিল বাড়িটা সুব্রত করে দিক।

আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি করেন। আমার বাড়ি উনি করলে কি ওঁর মান থাকে? আমিও যে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।

এস্টিমেট বেশি দেয়নি তো?

না। বরং আমি যা ভেবে রেখেছিলাম তার চেয়েও কম।

লোকটা কে বলুন তো! শর্মা নাকি?

না। এঁর নাম এ পি সিং।

চিনি না। ওর তো অনেক চেনা। আজ আসুন না বিকেলে আপনার বাড়ির সম্মানে ডিনার হোক।

উঃ, আপনাকে নিয়ে পারা যায় না।

আসবেন তো? সবাইকে নিয়ে কিন্তু।

দুপুরে আগে কেউ বাড়িতে থাকত না। অপর্ণা একা। আজকাল ঝুমকি সকালে বেরিয়ে দুপুরে ফিরে আসে। চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে। একটু আনমনা, কিন্তু খুব যেন হতাশ নয়।

ঝুমকি আজ ফিরতেই অপর্ণা সুসংবাদটা তাকে দিয়ে বলল, জানিস, একটা পয়সাও আগে দিতে হবে না, বাড়ি কমপ্লিট হলে টাকা।

খুব একটা খুশি হল কি ঝুমকি? খবরটা যেন তাকে স্পর্শই করল না। শুধু একটু হেসে বলল, তাই নাকি? বাঃ, বেশ ভাল তো!

চারুশীলার বর লোকটা খুব ভাল, না রে? একটা কথায় সব ঠিক করে দিল।

হ্যাঁ, খুব ভাল। সুব্রতদার কোনও তুলনাই হয় না।

তুই ওকে দাদা ডাকিস নাকি? এই যে শুনলাম, চারুশীলাকে মাসি ডাকিস!

ঝুমকি ক্ষীণ হাসল, কি করব? চারুমাসি নিজেই আমাকে মাসি ডাকিয়েছে। সুব্রতদাকে মেসো ডাকতে হয়নি, রক্ষে। আত্মীয় তো নয়, ডাকে কী আসে যায়?

ঝুমকির আনমনা ভাবটা অপর্ণার পছন্দ হয় না। তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে একমাত্র ঝুমকিই ভীষণ চাপা। তার পেট থেকে কখনও কথা বের করতে পারে না অপর্ণা। ঝুমকিকে ঠিক বুঝতেও পারে না। তবু চেষ্টা করে।

বলল, হ্যাঁ রে, তোর কী হয়েছে বল তো! এত আনমনা কেন?

জবাবে সাধারণত রেগে যায় ঝুমকি। কিন্তু আজ রাগল না। হেসেই বলল, কত কী ভাবছি।

কী ভাবছিস, চাকরির কথা?

চাকরির কথাও। এই বিংশ শতাব্দীকে বুঝতে পারো মা?

কেন পারব না? আমি তো এ যুগেরই মেয়ে।

এই যুগটা খুব অদ্ভুত। কত নতুন ভ্যালুজ জন্মাচ্ছে।

আবার কোন ভ্যালুজ জন্মাল যা নিয়ে তুই এত চিন্তা করছিস!

আছে মা! সব কথা কি বলতে হয়?

তুই তো কিছুই বলিস না আমাকে।

যারা সব বলে দিতে ভালবাসে তারা কি ভাল? তারা সরল হতে পারে, কিন্তু বোকা।

থাকগে বাবা, শুনতে চাই না।

ঝুমকি আলগোছে নিজের ঘরে চলে গেল।

সন্ধেবেলা আজ পারিবারিক মিটিং বসিয়ে সগৌরবে অপর্ণা কন্ট্রাক্টরের কথা ঘোষণা করল। মণীশকে বলল, বুঝলে মশাই, এখন তোমাকে একটি পয়সাও ডাউন পেমেন্ট করতে হচ্ছে না।

মণীশ একটু অবাক হয়ে বলল, লোকটা তোমার প্রেমে পড়েনি তো অপু?

অপর্ণা চোখ পাকিয়ে বলল, ছিঃ ছিঃ, ছেলেমেয়ের সামনে ও তোমার কেমন ঠাট্টা?

বুবকা বলে উঠল, কিন্তু মা, বাবা তো ঠিক কথাই বলেছে। এ যুগে কেউ এত লিনিয়েন্ট হয়?

অনু বলল, মম ইজ স্টিল বিউটিফুল অ্যান্ড ইয়ং অ্যান্ড ভেরি অ্যাট্রাকটিভ।

অপর্ণা রাঙা হয়ে বলল, ছিঃ ছিঃ, তোরা যে বাপের পাল্লায় পড়ে গোল্লায় গেছিস!

বুবকা বলল, যুগ পালটে গেছে মা, এখন এত লজ্জা পেতে হবে না। ইউ আর মাই বেস্ট ফ্রেন্ড।

মণীশ মিটিমিটি হাসছিল। বলল, যুদ্ধে হেরে যাচ্ছো অপু। এখন সন্ধি করাই ভাল।

তোমার আর তোমার ছেলেমেয়েদের মতো অসভ্য আমি জন্মে দেখিনি বাবা। তোমাদের সঙ্গে সন্ধি নয়।

আহা, বলোই না, লোকটাকে কি করে জপালে। হিপনোটিজম প্র্যাকটিস করছো নাকি?

ওসবের দরকার হয়নি। মিস্টার সিং খুব ভাল লোক। তাছাড়া সুব্রত রায়ের চেনা।

মণীশ একটু অবাক হয়ে বলে, সুব্রত মানে চারুশীলার বর নাকি? তুমি তাকে কনট্যাক্ট করেছিলে? সে তো মস্ত আর্কিটেক্ট!

তাতে কি?

না, তাতে কিছু না। তবে বলতেই হবে তোমার বুদ্ধি আছে। বাচ্চারা তোমরা তোমাদের মায়ের নামে জয়ধ্বনি দাও। বলো, মাতাজীকি জয়।

অনু, বুবকা আর ঝুমকি এমন হুল্লোড় করে উঠল যে, কানে হাত চাপা দিতে হল অপর্ণাকে।

প্রাথমিক উত্তেজনা আর আনন্দ রইল কয়েকদিন। সিং-এর সঙ্গে আরও দু'বার দেখা এবং টেলিফোনে কয়েকবার কথা হল অপর্ণার। একদিন সিং এসে ডিনার খেল এবং সকলের সঙ্গে পরিচয় করে গেল।

বাড়িটা শুরু হল পুজোর আগে। ডিসেম্বরে ছাদ ঢালাই হয়ে বাড়িটা যখন একটা সম্পূর্ণতার চেহারা পেয়ে গেল তখন বড্ড অবাক লাগতে লাগল অপর্ণার। স্যাংশন করা প্ল্যানের মধ্যেই বাড়িটাকে চমৎকার একটা আধুনিকতার ডিজাইন-যুক্ত করে দিয়েছে সিং। তার দক্ষ মিস্ত্রিরা টপাটপ কাজ করে ফেলছে। শূন্যতার মধ্যে একটা বাড়ি গজিয়ে ওঠার ঘটনাটা যেন অপর্ণার কাছে এক অষ্টম আশ্চর্য!

এক রাতে অপর্ণা লেপের তলায় মণীশকে আঁকড়ে ধরে বলল, কেমন করে ফেললাম বাড়িটা, বলো।

হ্যাটস্ অফ। কিন্তু অপু, দোতলা হল না।

প্রভিসান তো রইল। দোতলাটা আমরা নিজেরাই দেখেশুনে করিয়ে নিতে পারব।

এ লোকটিকে দিয়েই তো করাতে পারতে।

ওগো, বড় বাড়ি করলেই তো হবে না। পরিষ্কার রাখতে হবে যে! আর বড় বাড়িতে বড্ড ফাঁকা লাগবে।

তোমার কৃপণতাটা আর কিছুতেই গেল না। দোতলা করতে দাওনি ঠিক আছে। কিন্তু এবার আমার একটা কথা রাখো।

আবার কী কথা?

এসব ফার্নিচার, খাটফাট সব বেচে দেবো। নতুন বাড়িতে খুব মডার্ন ফার্নিচার দিয়ে সাজাবো।

পাগল নাকি? আমার ফার্নিচারগুলো দেখেছো? কী দারুণ মজবুত ভাল জিনিস! বেচলে আর পাবো এরকম? কত খুঁজে খুঁজে ঘুরে ঘুরে ঝুল কাঠের সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিস কিনে পালিশ করিয়ে তবে সাজিয়েছি। প্রাণ গেলেও বেচতে পারব না। হ্যাঁ গো, তোমার কি পুরনো জিনিসের ওপর মায়া হয় না?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মণীশ বলে, তোমার ওপর হয়। তুমি যে পুরনো ধ্যানধারণা কেমন আঁকড়ে ধরে থাকতে ভালবাসো! তুমি কেন আর একটু আধুনিকা হলে না, বলো তো!

আমাকে বুঝি আজকাল আর পছন্দ হচ্ছে না?

না হচ্ছে না। আমি পাত্রী দেখছি।

দেখাচ্ছি। বলে এমন জড়িয়ে ধরল মণীশকে যে, মণীশ হাঁফসে পড়ল।

বলল, আচ্ছা, আচ্ছা, পাত্রী দেখব না।

খুব শখ, না? এই প্রাচীনপন্থীকে নিয়েই এ জীবনটা কাটাতে হবে, বুঝলে?

আর পরের জন্ম?

যদি পরজন্ম থাকে তবে পরের জন্মেও।

ও বাবা, পরের জন্মেও তুমি?

হ্যাঁ, বরাবর আমি। আমি ছাড়া আর কেউ নয়। শোনো, তুমি একবার একটা খুব খারাপ কথা বলেছিলে, মনে আছে?

কী কথা?

তুমি বলেছিলে পঁচিশ হাজার বছর বেঁচে থাকলে আমরা কেউ কাউকে সহ্য করতে পারতাম না। বলেছিলে?

ঠিকই তো বলেছি অপর্ণা! পঁচিশ হাজার বছর যদি আমরা বেঁচে থাকতাম তাহলে কি সত্যিই আমরা দুজনে দুজনের কাছে পুরনো হয়ে যেতাম না?

বলেছি তো, না।

মণীশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ভাগ্যিস সেই পরীক্ষাটা আমাদের দিতে হবে না।

ভাগ্যিস কেন? পঁচিশ হাজার বছর ধরেই আমি তোমাকে ভালবাসতে পারি। একটুও কমবে না ভালবাসা।

মণীশ একটু হেসে বলল, তোমার কথা আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে অপু। হয়তো তোমার পক্ষে তা সম্ভব।

ফ্ল্যাটের অন্য একটা ঘরে আর একজনও ভালবাসার যন্ত্রণায় বিদ্ধ হচ্ছিল বিছানায় শুয়ে। খুব শীত। কিন্তু এই ঠাণ্ডাতেও সে বার বার উঠে জল খাচ্ছিল। সমস্ত শরীরে কেমন একটা সিরসিরে ভাব। একটা উৎকণ্ঠা। সঙ্গে অচেনা ভয়।

কয়েকদিন আগেই দেখা হয়েছিল। কী আশ্চর্য উদাসীন, বিষণ্ণ, গম্ভীর হয়ে গেছে লোকটা! ও কি সত্যিই রশ্মিকে ততটা ভালবাসত? কোনওদিন বিশ্বাস হয়নি ঝুমকির।

অনেক লোক ছিল সেদিন চারুশীলার বাড়িতে। তবু ঘুরেফিরে তাদের দেখা হয়ে যাচ্ছিল। চোখাচোখি হচ্ছিল বারবার।

শেষ অবধি তাদের দেখা হল একটা নির্জন ঘরে। কারা ক্যারম খেলতে খেলতে ছিটোনো গুটি ফেলে চলে গেছে। একা একা হেমাঙ্গ স্ট্রাইকারে টোকা মেরে গুটি ফেলার চেষ্টা করছিল।

ঝুমকি ঢুকেই বেরিয়ে আসছিল লজ্জায়।

হেমাঙ্গ ডাকল, শুনুন।

ঝুমকি দাঁড়াল।

হেমাঙ্গ হঠাৎ বলল, আপনি আমাকে খুব অপছন্দ করেন, না?

অবাক ঝুমকি বলল, কেন? অপছন্দ করব কেন?

মনে হয়।

ও।

৯২

হেমাঙ্গদের বাড়িতে এখনও একটা মধ্যযুগীয় শাসনতন্ত্র বহাল আছে। এখনও এ বাড়ির ছেলেমেয়েরা যা খুশি করতে পারে না এবং করার কথা ভাবতেও পারে না। একটা অদৃশ্য শাসন এবং দৃশ্যমান ভ্রূ-কুঞ্চন তাদের আতঙ্কিত এবং সতর্ক রাখে। প্রেমঘটিত বিয়ে অবশ্য একটা-দুটো ঘটেছে, কিন্তু তাও আবার বর্ণে মিললে তবেই। কাজেই এ বাড়ির ছেলেমেয়েরা প্রেমে পড়তে হলেও আগেভাগে হিসেব করে নেয়।

হেমাঙ্গ জানে, সেও স্বাধীন নয়। স্বাধীনতা একটা মনোভাব যা ব্যক্তিত্বের ব্যাপার। সেটা কেমন তা অবশ্য হেমাঙ্গ জানে না। হয়তো সেটা যথেচ্ছাচার বা উচ্ছৃঙ্খলতাই হবে। যখন যা মনে এল করে ফেললাম, কারও তোয়াক্কা করলাম না। হেমাঙ্গ সেটা ইহজীবনে পেরে উঠবে বলে মনে হয় না।

এই যে গরচার বাড়িতে বসবাস বা মাঝে মাঝে গাঁয়ের বাড়িটিতে যাওয়া কিংবা গাঁয়ের প্রাকৃত মানুষের মতো জীবনযাপনের চেষ্টা, এর কোনওটাই মা বা বাবা সুনজরে দেখছে না বলে তার অস্বস্তি হচ্ছে, এটাই হয়তো মানসিক স্বাধীনতার মস্ত অন্তরায়। সে ইচ্ছে করলেই কি মা-বাবার মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যা করছিল তা করে যেতে পারে? পারে না। তার স্বাধীনতা এইখানেই মার খেয়ে যাচ্ছে।

হেমাঙ্গ অবশ্য কয়েক মাস ধরে মাকে বেশ কয়েকবার বোঝাতে চেষ্টা করল। কিন্তু মা শেষ অবধি একটা কথাই বলল, গরচার বাড়ি তোকে লিখে দেবো, গাঁয়ে গিয়েও যা-খুশি করতে পারিস, কিন্তু শর্ত একটা। আগে বিয়ে কর। তারপর যা-খুশি করিস।

ওরে বাবা!

তোর বাবারও একই মত। বিয়ে করলে সব মেনে নেবো।

হেমাঙ্গ তাই আজকাল একটু বিমর্ষ। একটু আনমনা। বিয়ে খুব সুখের ব্যাপার নয়। একটা মেয়ের সঙ্গে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলার মানেই হচ্ছে জীবনটা ভোগে চলে যাওয়া। প্রেম জিনিসটা কম দামী সেন্টের মতো, গন্ধ টপ করে উবে যায়। একজন চিন্তাশীল, কল্পনাপ্রবণ মানুষ বিয়ের পর হয়ে যায় শ্রমিকের মতো। প্রেমের সমাধির ওপরেই তো বিয়ের সৌধ!

প্রায় দু' মাস ফোন করেনি রশ্মি। বোধ হয় লজ্জায়। তাকে বিব্রত করতে চায় না বলে হেমাঙ্গও করেনি। টেলিফোনের সম্পর্কটা বড্ড আনুষ্ঠানিক হয়ে যাচ্ছিল। কুশল প্রশ্ন এবং আলগা কিছু কথা ছাড়া কোনও গভীরতায় পৌঁছচ্ছিল না। বাড়ছিল শুধু টেলিফোনের বিল। সম্পর্কটা আর জিইয়ে রাখার কোনও মানেই হয় না।

কিন্তু দু’ মাস বাদে একদিন রাতে রশ্মিই টেলিফোন করল।

কেমন আছ?

ভালই। তুমি?

আমি ভাল নেই।

কেন রশ্মি?

মন ভাল নেই। তোমার জন্য।

আবার আমি কি করলাম?

তুমি কিছু করোনি। আমিই করেছি। কেবল ভাবছি কাজটা কি তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হয়ে গেল?

তা কেন রশ্মি? তুমি প্র্যাকটিক্যাল।

ঠেস দিলে না তো!

আরে না। আমি তোমার অসুবিধের কথা জানি।

এখন এখানকার অবস্থা তো খুব ভাল নয়। অনেক এথনিক গ্রুপ ঢুকে পড়েছে, রিসেশন শুরু হয়েছে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা হচ্ছে। একা একটা মেয়ের পক্ষে থাকা খুব নিরাপদ নয়। অথচ আমাকে তো থাকতেই হবে।

জানি রশ্মি। তুমি কিন্তু অ্যাপোলোজাইজ কোরো না। আমি তো জানিই, একা তোমার পক্ষে ওখানে থাকার অসুবিধে আছে। পৃথিবী পাল্টে যাচ্ছে রশ্মি। এখন চারদিকে ভায়োলেন্স।

হ্যাঁ হেমাঙ্গ। ভীষণ ভায়োলেন্স। আর কত ছোট ছোট গ্রুপ তৈরি হচ্ছে, কত তাদের অভাব-অভিযোগ-দাবিদাওয়া তার সীমাসংখ্যা নেই। সবাই মিলিট্যান্ট, সবাই টেরোরিজমে বিশ্বাসী। ক্রমে ডিটোরিয়েট করছে। আমার কী মনে হয় জানো? সব দেশেই গভর্নমেন্টগুলো এদের কাছে অসহায়। কিছুই করতে পারছে না।

ফিরে এসো রশ্মি।

ফিরে গিয়ে কী হবে বলো তো! আমাদের দেশে কোনও কাজ হয়? নাকি লোকে কিছু মাথার কাজ করতে চাইলে তা করতে পারে? একটা ভাল লাইব্রেরি অবধি নেই। কী হবে ফিরে গিয়ে? আমরা ভাবছি সুইজারল্যান্ডে সেটল করব। এখনও সুইজারল্যান্ড বোধ হয় কিছুটা ভাল। আমার হাজব্যান্ডটি অবশ্য আমেরিকা বেশি পছন্দ করছে। দেখা যাক।

তোমার বিদেশবাস ঘুচবে না, না রশ্মি?

আমার কাছে ইংল্যান্ড তো বিদেশ ছিল না কখনও। বরাবর ইংল্যান্ড আমার প্রিয় জায়গা। এটাই আমার দেশ। ছোট সুন্দর শান্ত পরিচ্ছন্ন সুশৃংখল একটা দেশ। হাতের কাছেই ইউরোপ। চারদিকে যত ইতিহাস আর ঐতিহ্য ছড়ানো। কিন্তু ধীরে ধীরে সব কেমন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ইংল্যান্ডই আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। সুইজারল্যান্ড বা আমেরিকায় সেটল করতে আমার একটুও ইচ্ছে করে না। কিন্তু বুঝতে পারছি না কী হবে।

হেমাঙ্গ খুব সন্তর্পণে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল। সে খুব ভাগ্যবান যে রশ্মির প্রস্তাবে রাজি হয়নি। সে কিছুতেই বিদেশে থাকতে পারত না। নস্ট্যালজিয়া তাকে টানত, তাকে টানত আত্মীয়তা, তাকে টানত শিকড়। বিদেশে থাকার কথা হেমাঙ্গ ভাবতেও পারে না।

চুপ করে আছ যে! তোমার খবর তো কিছু বললে না।

আমার খবর কিছু নেই রশ্মি।

গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছ এখনও?

মাঝে মাঝে।

আমার কিন্তু তোমার নদীর ধারের বাড়িখানার কথা খুব মনে পড়ে। ভারি কিউট, সুন্দর বাড়িটি তোমার। যদি আমাদের বিয়ে হত তাহলে আমি তোমাকে ওখানেই হানিমুন করতে বলতুম।

একটু হাসল হেমাঙ্গ। বলল, থ্যাংক ইউ।

তুমি এখানে বেড়াতে আসবে বলেছিলে। সত্যিই আসবে?

হেমাঙ্গ বলে, কী হবে বেড়াতে গিয়ে বলো তো! প্লেনের যা ভাড়া হয়েছে তাতে বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছেটাই চলে যায়। আর কী জানো, ভেবে দেখেছি বেড়ানোর কোনও মানে হয় না। দেশ দেখে বেড়ানো একটা পণ্ডশ্রম মাত্র। বরং এই যে কাছেপিঠে যাই, নিজের দেশটাকে বুঝবার চেষ্টা করি, মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করি এতে অনেকটা গভীরতা খুঁজে পাই।

তুমি বরাবরই একটু অন্যরকম। অলওয়েজ ইন সার্চ অফ সামথিং। সেই জন্যই তুমি সবসময়ে ইন্টারেস্টিং।

কী যে বলো! আমার মনের ভিতরটা যদি দেখতে পেতে!

দেখার চেষ্টা কি করিনি? সেই যে গাঁয়ের স্কুলে অডিট করতে গিয়েছিলে সেই প্রথম দিনটি থেকেই তোমাকে লক্ষ করে আসছি। প্রথম দিন থেকেই মনে হয়েছিল তুমি নরম মনের মানুষ। তোমার খুব একটা স্ট্রং পারসোনালিটি নেই ঠিকই, কিন্তু তোমার ভিতরে একটি কৌতুহলী শিশু আছে। পৃথিবীটা তোমার কাছে সহজে পুরনো হবে না। এটা কিন্তু একটা মস্ত কমপ্লিমেন্ট, বুঝেছ?

হয়তো ঠিকই বলেছ।

বিয়ে করার কথা ভাবছ নাকি?

না তো!

ভাল থেকো।

তুমিও ভাল থেকো।

এইভাবে শেষ হল টেলিফোন পর্ব। কিন্তু রেশ থেকে গেল। টেলিফোন রেখে দেওয়ার পর রশ্মিকে নিয়ে অনেক ভাবল হেমাঙ্গ। ভাবল প্রেম-ভালবাসা ইত্যাদি নিয়ে। ভাবল মানুষে মানুষে সম্পর্ক নিয়ে। তারপর তার মনে হল, দুটি কাঁটা যেমন ক্রমাগত উল বুনে বুনে তৈরি করে সোয়েটারের প্যাটার্ন, দুটি মানুষ কি তা পারে? সম্পর্ক কি ওইরকম, উলের মতো নানা নকশা সৃষ্টি করে যাওয়া?

বিয়ে, প্রেম ইত্যাদি তামাদি হয়ে যাচ্ছে দুনিয়ায়। ইউরোপ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়ায় রোমান্টিক প্রেম কবেই নির্বাসনে গেছে। আছে কেবল দগদগে যৌন সম্পর্ক। ওই সম্পর্কের দিকেই ঝুঁকে পড়ছে মানুষ। বিয়ে করছে না, একসঙ্গে থাকছে, ছেলেপুলে হচ্ছে, বাঁধা পড়ছে না। পৃথিবীর ভবিতব্য কি তাহলে ওটাই? কুকুর বেড়ালের মতো শুধু দেহের প্রয়োজনে একসঙ্গে হওয়া এবং ফের আলাদা হয়ে যাওয়া, ইচ্ছে হলেই?

হেমাঙ্গ কিছুটা অস্থির বোধ করতে থাকে। মাঝে মাঝেই জীবন থেকে বিষধর সাপের মতো নানা প্রশ্ন উঠে এসে তাকে ছোবল দিয়ে যায়। বিষ অনেকক্ষণ জর্জরিত রাখে তাকে।

আজকাল মা নিয়ম করে দিয়েছে, শনি আর রবিবার বিডন স্ট্রিটের বাড়িতে গিয়ে থাকতে হবে। নিয়মটা যে মানতেই হবে, এমন নয়। কিন্তু মা তার জন্য ইদানীং এত বেশি চিন্তিত আর উদ্বিগ্ন যে, সে না গেলে বা যেতে না চাইলে মার প্রেসার বাড়ে, হার্টে প্যালপিটিশন হয়।

উইক এন্ডটা মায়ের কাছে বিডন স্ট্রিটে কাটাতে খারাপও লাগে না হেমাঙ্গর। মার হাতের কিছু অনবদ্য রান্না খেতে পায়। আর মায়ের নানা কথা বসে বসে শুনতে তার ভালই লাগে।

কিন্তু এই শনিবারটা তার বিডন স্ট্রিটে যেতে ইচ্ছে করছিল না। গাঁয়ের বাড়িটা তাকে ডাকছে। দু' মাস যায়নি। বিডন স্ট্রিটে মাকে ফোন করে জানিয়ে দিল, শনিবার বাইরে যাচ্ছে। কোথায় তা অবশ্য বলল না। না বললেও বাঁকা মিঞার কাছ থেকে মা ঠিকই পরে খবর পেয়ে যাবে। কিন্তু পরের কথা পরে। এখন যে তার হাঁফ ধরে যাচ্ছে!

প্রচণ্ড শীত, মেঘলা আকাশ, টিপটিপ বৃষ্টি আর উত্তাল নদী পেরিয়ে যখন ভটভটি তার ঘাটে লাগল তখন মনটা ভাল লাগছিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে হাঁচি এবং শারীরিক অস্বস্তি টের পাচ্ছিল সে। পিছল ঘাট বেয়ে ওপরে উঠেই বৃষ্টির সহস্র শরে বিদ্ধ হতে হতে সে ভাবল, মেরেছে। জ্বর হয়ে পড়ে থাকলে যে সব মাটি।

বাসন্তী এল, বাঁকা মিঞা এল, ফজল এল। অনেক দিন বাদে যেন আপনজনদের কাছে ফেরা।

বাসন্তীই টের পেল সবার আগে, ও দাদাবাবু, তোমার চোখ অমন ছলছল করছে কেন? মুখখানাও যে একটু লাল মতো! জ্বর বাঁধিয়েছ নাকি?

বাঁকা মিঞা নাড়ি ধরে কিছুক্ষণ নিবিষ্ট হয়ে থাকার পর বলল, একশ'র ওপর। এখন কী হবে বলুন তো! এখানে না পাবেন বদ্যি, না ওষুধ। এই জন্যই তো বলি এখানে ঘাঁটি করার দরকার নেই।

কেন বাঁকা, এখানে কি মানুষের জ্বরটর হয় না? তারা যা করে আমিও তাই করব।

তাদের শরীরের ধাত আর আপনার শরীরের ধাত কি একরকম? এখানকার ডাক্তার কে জানেন? ওই বিশু মুদি। অসুখ হলে লোকে গিয়ে বিশুর কাছে ওষুধ চায়। বিশুর সাত পুরুষে কেউ ডাক্তার নয়, তবু ওই বিশুই ওষুধ বেচে। এমন কি পেনিসিলিন অবধি।

জানি।

আপনাকে বিশু ওষুধ দিলে খাবেন?

হেমাঙ্গ হাসল। বলল, সামান্য সর্দিজ্বর। অত ঘাবড়াচ্ছ কেন? বিশুর দোকানে যে ওষুধ পাওয়া যায় তাই ঢের। বিশু না জানুক, আমি তো খানিকটা জানি। দরকার হলে ওষুধ আনিয়ে নেবো।

বাসন্তী বলল, এর আগে একবার কিন্তু তুমি কিছু ওষুধ এনে রেখে গিয়েছিলে। সেগুলো বের করে এনে দেবো?

না, থাক। তুই খুব গরম চা খাওয়া আমাদের। দুপুরে আজ রুটি করিস আর সন্ধের পর ঘরে একটু তুষের আগুন করে দিয়ে যাস।

বাঁকা মিঞা মাথা নেড়ে বলে, তা হবে না। আমার একটা দায়িত্ব আছে। নদীর ধারের ঘরে থাকলে আপনার নিউমোনিয়া হয়ে যাবে। আমার পাকা ঘরখানায় থাকবেন। আমি গিয়ে সব ব্যবস্থা করছি। ফজল, দৌড়ে গিয়ে তোর মাকে বল তো, ঘরটা তৈরি রাখতে।

অত ভেবো না বাঁকা। আমি এখানেই থাকতে পারব। ঘরের জানালা-দরজা এঁটে দিলে হাওয়া লাগবে না।

তা বললে হয়? নদীর ধারে হাওয়ার নানা চক্কর। তার ওপর শীতের বাদলা, এ বড় ভয়ংকর খারাপ জিনিস। এ ঘরটা ড্যাম্পও বটে। শেষে অসুখ গাড়িয়ে গেলে জবাবদিহিটা করব কি?

বাসন্তী তেমন না ভেবে-চিন্তে হঠাৎ বলে উঠল, আমি রাতে এসে থাকব'খন।

কথাটা মুখ ফসকা, বলে ফেলেই বোধ হয় লজ্জা পেয়েছিল। বাঁকা চোখ পাকিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি, না?

বাসন্তী খুব মিইয়ে গেল এ কথায়।

বাসন্তীর ওপর একটু মায়া হল হেমাঙ্গর। বেচারা! কথাটার যে গর্হিত দিক আছে তা তো বোঝেনি। হেমাঙ্গর প্রতি টান থেকেই বলেছে। হেমাঙ্গ বলল, তাহলে বরং ফজল এসে থাকুক। পাশের খুপরিটায় তো চৌকি আছে। বিছানা আনলেই হবে।

বাঁকা বলল, ফজল থাকবে? থেকে লাভ আছে কিছু? ওর যা ঘুম গায়ের ওপর দিয়ে মোষ হেঁটে গেলেও টের পায় না। ওর থাকাও যা না থাকাও তাই।

মাথাটা টিপটিপ করছিল হেমাঙ্গর। গা ভরে জ্বর আসছে। জ্বরটা সম্ভবত একটু ভোগাবে। আবহাওয়া আরও খারাপ হচ্ছে। বাতাসের জোর বাড়ছে, বৃষ্টি বাড়ছে। ঘরে এসে কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ল সে। একটু কাঁপুনি হল। বাসন্তী তুষের আগুনটা দুপুরের আগেই এনে দিল ঘরে। বলল, বাঁকা চাচা তোমার জন্য কী একটা ব্যবস্থা করতে গেল গো দাদা। তুমি ওর বাড়িতেই চলে যাবে?

হেমাঙ্গ বলল, ওর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এত যত্ন করবে যে তাতে আমার হাঁফ ধরে যাবে। কিন্তু কী করব বল! বাঁকা যদি নিয়ে যেতে চায় তো যেতেই হবে।

মাথাটা টিপে দেবো?

না, এখন থাক।

তাহলে পায়ের তেলোয় গরম তেল মালিশ করে দিই?

দে। তার আগে ওষুধের স্টকটা বের কর। দেখি কী আছে।

বাসন্তী একটা টিনের বাক্স নিয়ে এল। জ্বর আর ইনফ্লুয়েঞ্জার চার-পাঁচ রকম ওষুধ থেকে বেছে নিয়ে দুটো একসঙ্গে খেয়ে নিল হেমাঙ্গ। ওষুধ তার ভাল লাগে না।

বাসন্তী তার পায়ে খুব যত্ন করে গরম তেল মালিশ করে মোজা পরিয়ে পা কম্বলে ঢেকে দিয়ে গেল রুটি করতে।

আধঘণ্টা বাদেই বাঁকা এসে বলল, কপালটাই খারাপ। এই শরীরে আপনি আমার বাড়িতে যাবেন, তা ভ্যানগাড়ি একটাও নেই এখন। কোথায় ধান তুলতে গেছে, বিকেলের আগে ফিরবে না। থাকলেও লাভ ছিল না। এ বৃষ্টিতে ছাতার আড়াল দিয়ে তো আর নেওয়া যাবে না। ভিজবেনই। তার চেয়ে ওবেলা বৃষ্টিটা ধরলে বরং নিয়ে যাওয়া যাবে। ফজলকে বলেছি, জানালার দিকটা আড়াল করে একটা ত্রিপল টাঙিয়ে দিতে। ফাঁকফোকর দিয়ে বাতাস না এসে ঢোকে।

হেমাঙ্গ শুধু অসহায়ভাবে হাসল।

বৃষ্টি আর বাতাস বাড়তে লাগল। রীতিমতো ঝড়ের গতিতে বাতাস বইতে লাগল দুপুরের পর। চারদিক অন্ধকার। এই চমৎকার প্রাকৃতিক ব্যাপারটি হেমাঙ্গ দেখতে পাচ্ছে না। তার ঘরের দরজা-জানালা এঁটে বন্ধ।

নদীর দিকের জানালা ঢেকে ত্রিপল টাঙিয়ে দিয়ে গেছে ফজল। ওষুধের গুণে এবং ঘর গরম থাকায় একটু হাঁসফাঁস লাগে হেমাঙ্গর।

বাসন্তী গরম রুটি আর তরকারি খাইয়ে বাসন-টাসন ধুয়ে রেখে একবার বাড়ি গিয়েছিল। আবার চলে এসে ঘরের একধারে বসেছে।

কেমন লাগছে এখন তোমার?

একটু ভাল। ওষুধের গুণটা কেটে গেলে অবশ্য আবার জ্বর উঠবে।

কী হবে গো দাদা?

মরব না, তোর ভয় নেই।

ছিঃ, মরার কথা মুখে আনতে আছে? আমি বুঝি সে কথা বলেছি?

অত ভাবছিস কেন? ঠাণ্ডা লেগে সর্দি-জ্বর। তুই আর বাঁকা এমন করিস যে আমার এখানে আসতে এখন ভয় করে।

আচ্ছা বলো তো, আমি কী করলুম আবার? এখানে তোমার যত্ন-আত্তি কে করে বলো! তুমি শহুরে মানুষ, আমাদের মতো কি তোমার সয়?

একটু বিরক্ত হয়ে হেমাঙ্গ বলে, আমি আর শহুরে লোক নেই। দেখছিস না কেমন লাঙ্গল চালাতে পারি, নৌকো বাইতে শিখেছি। আমার শরীর অনেক পোক্ত হয়েছে আজকাল।

বাসন্তী খুব হাসল। তারপর বলল, তোমার মতো কিম্ভুত মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। একখানা আস্ত পাগল।

দেশে পাগলের অভাব কি? কত পাগলই তো দেখেছিস?

আহা, তুমি কি তাদের মতো নাকি? কী বললাম, কী বুঝলে। তুমি হচ্ছ ভাবের পাগল।

হেমাঙ্গ একটু অস্থিরতা বোধ করে বলল, ওরে বাসন্তী, অসুখে না হোক, দম বন্ধ হয়েই মরতে হবে দেখছি। জানালা হোক, দরজা হোক একটা কিছু একটু খুলে দে। ঘরে অকসিজেনের অভাব হচ্ছে।

অকসিজেন? ওঃ, হ্যাঁ। দাঁড়াও। কিন্তু কী বৃষ্টি দেখেছ? চতুর্দিক থেকে ছাঁট আসছে।

উঠোনের দিকটায় একটা জানালা সামান্য ফাঁক করল বাসন্তী। বাইরে তুমুল ঝড়। জানালা ফাঁক হতেই হিম ঠাণ্ডা হাওয়া আর বৃষ্টির ঝাপটা দাওয়া পেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরে। ভয়ে পিছিয়ে এল, ও মা গো!

জানালাটা দড়াম করে খুলে ফের দড়াম করে বন্ধ হয়েই ফের খুলল। বাসন্তী ঝাঁপিয়ে পড়ে জানালা টেনে বন্ধ করে বলল, হবে না।

ঘরে একটা প্রদীপ জ্বলছিল। হাওয়ায় সেটা নিবে গেছে।

বাসন্তী হাতড়ে হাতড়ে দেশলাই খুঁজে সেটা জ্বালাল, হ্যারিকেনটা জ্বালাই দাদা?

খবরদার না। হ্যারিকেনের গ্যাসে কত লোক মারা গেছে।

ও বাবা, তাহলে থাক।

শোন, খুপরির দিকটার দরজাটা খুলে রাখ। আর খুপরির ঝাঁপের জানালাটা একটু ফাঁক করে রেখে আয়, তাহলে ভেন্টিলেশনটা হবে।

তাই করল বাসন্তী। এসে ফের খাপ পেতে বসে বলল, এখন কেমন লাগছে?

হ্যাঁ। ফ্রেশ বাতাস পাচ্ছি। খুব দুর্যোগ, না রে?

ভীষণ। ভটভটি বন্ধ হয়ে গেছে। নদীতে সাঙ্ঘাতিক ঢেউ দিচ্ছে। যা ঝড় আর বৃষ্টি! চারদিক ঘুটঘুট্টি অন্ধকার।

ঝড়বৃষ্টি চলতে থাকল। সন্ধের পর জ্বর ফিরে এল হেমাঙ্গর। শীত করে কাঁপুনি দিয়ে। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা। আর তার মধ্যেই বাস্তব আর ঘোর মিলেমিশে যেতে লাগল।

মাথায় একখানা ঠাণ্ডা হাত এসে পড়তেই সে বলে উঠল, কে, মা নাকি?

না গো, আমি।

ওঃ, তুমি! কাকে বলল তা নিজেও বুঝল না হেমাঙ্গ। কিন্তু খুব চেনা একজনকেই বলল যেন। ফের একটা ঘোরের মতো এসে কোথায় যেন নিয়ে গেল তাকে।

অনেক রাতে ঝড়বাদল একটু কমতেই এসে হাজির হল বাঁকা আর ফজল।

বাঁকা বলল, ওঃ, কী লণ্ডভণ্ড কাণ্ডই হয়ে গেল। গাঁয়ের বহু বাড়ি পড়ে গেছে। আপনারটা কী করে দাঁড়িয়ে আছে তাই ভাবছি। কপালের জোর বটে আপনার। আমি তো ঝড়ের গতিক দেখে ভাবছিলাম, গেল এবার বাবুর বাড়ি। আসার উপায় ছিল না। উড়িয়ে নিয়ে যেত। আজ নির্ঘাৎ কয়েকটা নৌকো ডুবেছে।

হেমাঙ্গ একটু ক্ষীণ হাসল। বলল, এ ঝড়টা আমার দু' চোখ ভরে দেখা হল না।

ওঃ, কী যে আপনার সব বাই চাপে! খুপরিতে আজ ফজল থাকবে। বিছানা নিয়ে এসেছে। বলে দিয়েছি রাত জেগে পাহারা দেবে।

কোনও দরকার নেই। ও ঘুমোক।

না না, ঘুমোলেই ও মড়া। জেগে বসে থাকবে।

হেমাঙ্গ ঘুমোলো। তারপর ঘুমের মধ্যেই ফের আধো-জাগা একটা ঘরের ভিতরে চলে এল। বারবার একখানা আবছায়া মেয়ের মুখ চলে আসছে চোখের সামনে। মেয়েটা মাঝে মাঝে তার মাথার কাছটিতে এসে বসছে। চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে।

ঠিক চিনতে পারছে না সে। আবার চেনা-চেনাও লাগছে। কে মেয়েটা?

কে?

আমি।

আমি কে?

একটু হাসির শব্দ হল, আমি তো।

ওঃ তুমি!

হেমাঙ্গ বুঝতে পারল না। তবু যেন বুঝল। হাসল। ঘুমিয়ে পড়ল।

৯৩

বিষ্ণুপদ ক'দিন যাবৎ পুত্রকন্যা শব্দগুলির অর্থ খুঁজে বেড়াচ্ছে মনে মনে। তার চেয়েও বড় কথা সম্পর্কটা কিসের, কেন সম্পর্ক সেইটে—এত কিছু জানার পরও— নতুন করে জানতে চায় সে। এ বাড়িতে তেমন কোনও শাস্ত্রটাস্ত্র নেই, ভাল ডিকশনারি নেই, নাগালের মধ্যে তেমন কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি নেই যার কাছে নতুন করে এ বিষয়ে পাঠ নেবে। তাই সারাদিন শুয়ে শুয়ে মনে মনে মানে খুঁজে যাচ্ছে সে। সব বিশ্বাস, সব বলভরসা পুরনো ইমারতের মতোই ধসে পড়ে গেল যে সেদিন, যেদিন বামাচরণ তার বাপান্ত করে গেল।

প্রায় দু-তিন ঘণ্টা বিষ্ণুপদর জ্ঞান ছিল না। প্রেশার ঠেলে উঠেছিল দুশোর ওপরে। পুলিন তেমন দরের ডাক্তার না হতে পারে কিন্তু ঠেকা সে-ই দিয়েছিল। প্রেশারের ওষুধ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, হাতের শিরা কেটে খানিক রক্তমোক্ষণ করে দিয়েছিল। বলেছিল, ওরে বাবা, আমরা সেকেলে লোক। আধুনিক চিকিৎসা না জানতে পারি, কিন্তু পুরনো চাল এখনও ভাতে বাড়ে।

দুদিনের মধ্যেই খবর পেয়ে কৃষ্ণজীবন কলকাতা থেকে একজন বড় ডাক্তারকে এনে দেখায়। ডাক্তার মেলা ওষুধপত্র দিয়ে গেছে। বলেছে, শুয়ে থাকতে হবে কিছুদিন। তেমন ভয়ের নাকি কিছু নেই।

মানুষের অসুখটা যে কোথায় তা ডাক্তাররা কি ঠাহর পায়? এই যে শরীরটা কাটা কলাগাছের মতো পড়ে গেল সেদিন, তার কারণ কি শুধু শরীর? মন নয়? বামাচরণের ওইসব কথা শোনার পর থেকেই শরীরের ভিত কেঁপে গেল। সেই থেকে ভাবছে আর ভাবছে। শরীর হয়তো সারবে, মন সারায় কে!

ধাঁ ধাঁ করে বাড়িটা প্রায় উঠে গেল। মেঝেতে টালি বসানোর কাজ চলছে। জানালা দরজা বসানো হচ্ছে। ইলেকট্রিক মিস্ত্রি লাইন বসাচ্ছে। এলাহি ব্যাপার। জানালা দিয়ে সব দেখতে পায় বিষ্ণুপদ। জীবনের বারো আনা কেন, পনেরো আনাই কেটে গেল ভাঙা ঘরে। বাকি আর ক'টা দিন! তাও আয়ু ফুরোনোর আগে যদি বাড়ি শেষ হয় তবে পাকা ঘরে মরার সুখটা অন্তত পাবে। সারাদিন চেয়ে চেয়ে কাণ্ডটা দেখে বিষ্ণুপদর মনটা যেন কেমন হয়ে যায়। বাড়িতে সুখ নেই, টাকায় সুখ নেই, সংসারে সুখ নেই। সুখ যে কোথায় আছে কে জানে!

রামজীবন আর কিছু পারেনি তবে মাসটাক আগে হঠাৎ একটা দুধেল গাই বাছুর সমেত কোত্থেকে কিনে এনেছে। এনেই বলল, এখন আপনার একটু ছানাটানা খাওয়ার দরকার।

গরু দেখে বিষ্ণুপদর চোখ চড়কগাছ। বলল, ও বাবা, এ মরা পেটে দুধ ছানা সইবে নাকি?

খুব সইবে। আপনার শরীরে তো সারবস্তু কিছু নেই। দুধ সহ্য না হোক, ছানা খাবেন। এ খুব তেজী গাই, দিনে দুবেলা মিলিয়ে পাঁচ সের দুধ দেয়।

বিষ্ণুপদ খুশি হয়ে বলে, তা হলে পটল আর গোপালও দুধ খেতে পারবে। ওদের বাড়ের বয়স, কচু-ঘেঁচু খেয়ে থাকলে কি বাড় হয়?

আমরা কচু-ঘেঁচু খেয়েই বড় হয়েছি। বাড়ের বয়সে এমনিতেই বাড়ে। তা খাবে'খন ওরাও।

বিষ্ণুপদ বলল, গরুর পিছনে খাটুনি আছে বাবা। বড় সুখী জীব। যত্ন করতে হয়। তুই তো আলায় বালায় ঘুরিস, গরু দেখবে কে?

রাখাল রাখব।

তবেই হয়েছে। এ কি ভাড়াটে লোকের কাজ? নিজে হাতে করতে হয়।

তাই করব। আপনি বললে তাই করব।

গো-সেবা করলে অনেক শেখা যায়, জানা যায়। অবোলা প্রাণী। কিন্তু তারও বলার মতো কথা আছে। বুঝবার চেষ্টা করতে হয়।

সেই থেকে রামজীবন গরু নিয়ে খুব মেতে আছে। ঘাসের মাঠে বেঁধে দিয়ে আসে। দুবেলা জাবনা দেয়। স্নান করায় নিয়মিত। খোল ভুষি কিনতে হাটে যায়। ভেটেরিনারি ডাক্তার দেখিয়ে এনেছে। গরুটা যত্ন-আত্তি পেয়ে বেশ তেল চুকচুকে হয়ে উঠেছে। দুধটাও দেয় খাসা। সকালে বাতাসার গুঁড়ো দিয়ে বেশ খানিকটা ছানা খায় রোজ।

সেই দৈনিক বরাদ্দটা নিয়ে রাঙা এসে ঘরে ঢুকল। হাতে গরম ছানার প্লেট।

বাবা, আপনার ছানা।

বিষ্ণুপদ উঠে বসে বলল, এটা থেকে তোমার শাশুড়ি মায়েরটা কি তুলে রেখেছো?

তাঁর জন্য আছে। আপনি খান।

বিষ্ণুপদ প্রসন্ন মনে প্লেটটা হাতে নিয়ে রাঙার দিকে চেয়ে বলে, আচ্ছা মা, আমি কি খুব লোভী মানুষ?

রাঙা অবাক হয়ে বলে, ও কি বলছেন!

বিষ্ণুপদ খুব হেসে বলে, বলোই না! আমাকে তোমার খুব লোভী বলে মনে হয় না?

না না, সে কী কথা!

বিষ্ণুপদ খুব হেসে মাথা নেড়ে বলে, স্বীকার কর বা না কর, আমি কিন্তু খুব লোভী মানুষ। সারা জীবন পেটে খিদে নিয়ে কেটেছে। ভরপেট বড় একটা থাকিনি, ভালমন্দ তো দূরের কথা। জিভ তাই শেষ জীবনে শোধ তুলতে চায়। বুঝলে?

আপনি খান তো। ও সব ভাববেন না।

বলতে নেই, রাঙা আজকাল খাতির করে খুব। করারই কথা। সংসারে বাতিল শ্বশুর-শাশুড়ির কল্যাণেই তারা এত বড় দোতলা বাড়িটা ভোগ দখল করবে। কাজেই এখন সে শ্বশুর আর শাশুড়িকে একটুও কথা-টথা শোনায় না। সেবা-টেবাও খুব করে।

পাতিলেবুর গন্ধওলা ছানার একটুখানি মুখে দিয়ে চিবোতে চিবোতে বিষ্ণুপদ বলল, বড্ড দেরিতে সব হল, বুঝলে, তবু হল তো!

কিসের কথা বলছেন?

এই সব যা হচ্ছে। বাড়ি হল, গরু হল, ভোগসুখ হল। সবই হল, তবু গলায় যেন একটা কাঁটা খচখচ করে।

কিসের কাঁটা বাবা?

গলার কাঁটা ওই বামা। যখনই ওর কথা ভাবি, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

ও সব ভাববেন না বাবা। মেজদাদার মাথাটাই গেছে।

সেটার কথাও ভাবি। মাথাটাই বা গেল কেন? আমাদের বংশে কেউ পাগল ছিল না। তোমার শাশুড়ির বংশেও না। আগের দিনে বিয়ের সময়ে এ সব দেখা হত। আজকাল আর হয় না।

মেজদার পাগলামি তো বংশগত নয়। লোভের তাড়সে আর মেজদিদির জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে হয়েছে।

তাই হবে। সে কি আর আসে-টাসে?

না। আপনার সেজো ছেলে তাঁকে খুব শাসিয়ে দিয়েছে।

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আজ যেন ছানাটা খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। মুখের ছানাটা একটু জিভ দিয়ে নেড়েচেড়ে বলল, আমাদের সকলেরই বড় খিদে, না বউমা? বিষয়সম্পত্তি, খাবারদাবার, যশ-প্রতিষ্ঠা, খিদের যেন শেষ নেই।

রাঙা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বিষ্ণুপদ একটু হেসে বলল, আমি ভাবি কি জানো? মনে হয় সারা জীবন আমার যে সব খিদে চাপা ছিল তা ওই বামাচরণের ভিতরে ফুটে বেরিয়েছে। ভগবান ওকে সন্তান দেননি, সেটাও একটা কথা। ওরটা কে খাবে বলো তো! বসো বউমা, আমার কাছে একটু বসো।

বসছি বাবা, কিন্তু রান্না পড়ে আছে।

তোমার শাশুড়ি কোথায়?

শীতলাবাড়ি গেছেন।

তাঁর খুব পুজো-আচ্চার বাই। বলে বিষ্ণুপদ হাসে।

রাঙা কাঠের চেয়ারটায় বসে বলে, আপনি আজ কিন্তু ছানাটা খাচ্ছেন না, নাড়ছেন শুধু।

এক একদিন রুচিটা থাকে না। রোজ কাঁচা ছানা না দিয়ে এক একদিন ছানা দিয়ে ডালনা রেঁধো তো মা। বোধহয় ভালই লাগবে। ছানার ডালনার কথা শুনেছি, খাইনি কখনো। জানো রাঁধতে?

সোজা তো। দেবোখন বেঁধে। আজ কষ্ট করে খেয়ে নিন।

বউমা, আজকাল আর রাতে রেমোর চেঁচামেচি শুনি না। জিজ্ঞেস করতে ভয় করে, সে কি মদ ছেড়ে দিয়েছে?

রাঙা একটু জিব কেটে বলে, একরকম তাই। গরুটা আনার পর থেকে খায় না।

কেন বলো তো?

তা জানি না বাবা। মনের কথা তো আর খুলে বলেন না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিষ্ণুপদ বলে, বটতলার বন্ধুরাও আসে না, না?

আজকাল আসে না। উনি তো দেখছি সন্ধেরাতেই বাড়ি চলে আসেন।

তোমাকে কিছু বলে না?

দুঃখ করেন, ওঁর তো খুব ইচ্ছে ছিল পাকা বাড়ি করে আপনাদের রাখবেন। উনি পারেননি, বড়দাদা করে দিলেন। এইজন্যই দুঃখ।

জানি। আমিও চেয়েছিলাম আমার হেয়রা ছেলেটা বাড়িটা করে দেখাক।

উনি পারতেন না বাবা। ওর টাকা নেশায় আর জুয়ায় খরচ হয়ে যাচ্ছিল। টাকা উপার্জনও তো ভাল পথে করত না।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, আমারও সেই সন্দেহ ছিল।

বড়দাদা বলেছেন একটা দোকান করে দেবেন।

বলেছে? বলে আগ্রহে ঝুঁকে বসে বিষ্ণুপদ, কী বলেছে?

বটতলায় একখান সাইকেলের দোকান করে দেবেন।

সাইকেলের দোকান? মানে সাইকেল সারাই নাকি?

না। সাইকেল আর সাইকেল পার্টসের দোকান। এ দিকে নাকি সাইকেলের দোকান নেই।

কথাটা এগিয়েছে?

হ্যাঁ। শুনেছি, দোকানঘর হচ্ছে। প্লাস্টিকের জিনিস, স্টিলের বাসন, কেরোসিন স্টোভ এ সবও নাকি থাকবে দোকানে।

রেমো বলেনি তো আমাকে! এ তো গুরুতর খবর।

বড়দা বলতে বারণ করেছেন। আমি তো পেটে কথা রাখতে পারি না, তাই আপনাকে বলে ফেললাম।

বেশ করেছে। অনেক জ্বালাপোড়ার মধ্যে এই একটা ভাল খবর। বুকটা ঠাণ্ডা হল। আমার মনে হয়, মদ ছাড়লে রেমো অনেক কিছু পারবে। তোমার কি ধারণা?

কে জানে বাবা! তবে ওঁর কথা তো কিছু বলা যায় না। আজ ভাল তো কাল খারাপ। মদের নেশা ছাড়া নাকি শক্ত। বেশির ভাগ লোকেই পারে না।

নেশা জিনিসটাই শক্ত জিনিস। তোমার শাশুড়ি কি পারবে দোক্তাপাতা ছাড়তে?

কষ্টেসৃষ্টে ছানাটা শেষ করল বিষ্ণুপদ। তারপর ওষুধ খেল। তারপর বসে রইল। মিস্ত্রিরা কাজে এল সব। আজকাল মিস্ত্রির সংখ্যা কমে গেছে। বাইরে প্লাস্টারিং হবে বলে তোড়জোর হচ্ছে। ছাদে ট্যাংক বসেছে। বাড়িটা যেন বুক ফুলিয়ে হাসছে এখন।

জানালা দিয়ে সম্মোহিতের মতো চেয়ে থাকে বিষ্ণুপদ। এত বড় পাকা বাড়ি তাদের দেশেও ছিল না। জমিজমা ছিল কিছু বাড়ির চৌহদ্দিও বড়ই ছিল। কিন্তু সবই কাঁচা ঘর। বলতে কি, এই প্রথম তারা পাকা বাড়িতে বাস করবে।

নয়নতারা ঘরে ঢুকে বলল, শুনলে তো, লোকে বলছে আজকাল নাকি অহংকারে আমার মাটিতে পা পড়ছে না।

বিষ্ণুপদ আচমকা গলার স্বর শুনে একটু চমকে গেল। বাড়ির দিকে চেয়ে এমন মজে ছিল যে, নয়নতারার আসাটা টের পায়নি। বলল, কেন?

এই সবাই বলছে। এ গাঁয়ে তো এত বড় বাড়ি কারও নেই, তাই।

বিষ্ণুপদ একটু হাসল, এ সবও শুনতে হচ্ছে! তা ভাল। একটু শুনে নাও।

তা শুনছি। তা সত্যি কথা বলতে কি, আমার একটু দেমাকও হয়েছে বাপু। কী করব বলো তো!

বিষ্ণুপদ বলল, কখনও-সখনও একটু অহংকার করতে ভালই লাগে। কখনও তো করোনি!

সেই কথাই বলছি। অহংকার করার মতো তো কিছু ছিল না। এই হল। তা হ্যাঁ গা, গৃহপ্রবেশ করতে হবে না? সবাই যে খুব ধরেছে ভালরকম ভোজ খাওয়ানোর জন্য। আমরা তো তেমন করে কাউকে কখনও নেমন্তন্ন করে খাওয়াইনি। ছেলেমেয়েদের বিয়ে নমো-নমো করে সারতে হয়েছে। তা এবার কি একটু ভাল করে করবে নাকি?

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, লোককে খাইয়ে হবেটা কি? পয়সা উড়িয়ে দেওয়া বই তো নয়! লোকে পাত পেড়ে খেয়ে যায়, গিয়ে নিন্দেমন্দ করে—এটা ভাল হয়নি, ওটা বাদ গেছে। তার চেয়ে একটু পূজোটুজো দিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়লেই হয়।

নয়নতারা হেসে বলে, তা হলে আমার অহংকারের কি হবে? লোকে যে বাড়ির কথা বলাবলি করছে তাদের কাছে মুখ দেখাব কি করে? দুয়ো দেবে যে! কৃষ্ণ যে মাস মাস পাঁচশো টাকা করে দিচ্ছে তা তো জমেই যাচ্ছে। আমরা তো অত টাকা খরচ করার পথই পাই না। তা সেই টাকায় হয় না?

বিষ্ণুপদ একটু ভেবে বলল, ইচ্ছে হলে দাও লাগিয়ে।

আমার বড় ইচ্ছে, একটা উপলক্ষ ধরে সবাই আবার একজোট হোক, সরস্বতী আর বীণাপাণিও আসুক।

আর বামা?

তাকে ডাকব? পাগল হলে নাকি! তোমাকে তো প্রায় মেরেই ফেলেছিল! ও ছেলেকে যে পেটে ধরেছিলাম সেইটে ভাবতেই লজ্জা হয়। কী কাণ্ডই করে গেল দুজনে!

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, যদি বামাকে নেমন্তন্ন না করে তা হলে আবার একটু খোঁচ থেকে যাবে। পাঁচজনের কাছে বলে বেড়াবে নানা কথা।

সে বলে বেড়াবেই! তাছাড়া ব্যাপার-বাড়িতে এসে সে যদি চেঁচামেচি করে, তা হলে তো সব পণ্ড হবে!

বিষ্ণুপদ একটু ভেবে দেখল, কথাটা ঠিকই। বামাচরণের মাথার ঠিক নেই। শ্যামলীও সুবিধের মানুষ নয়। দুজনে মিলে কী যে করবে তার ঠিক কি? বিষ্ণুপদ বলল, তাহলে থাক।

তাহলে মত দিচ্ছো তো? গৃহপ্রবেশ একটু ভাল করেই হচ্ছে তাহলে।

তোমার যখন ইচ্ছে তখন আর অমত করি কি করে? গৃহপ্রবেশের কথায় তোমার মুখখানা একেবারে ঝলমল করে উঠল যে!

নয়নতারার মুখ সত্যিই ঝলমল করছিল। হাসি আর ধরে না। বলল, দেমাকটা বড্ড চকমক করছে ভিতরে।

তাই দেখছি।

বামাচরণ এল আরও দুদিন বাদে, এক সন্ধেবেলায়। বিষ্ণুপদ নতুন বাড়ির দালানে বসে ছিল। একখানা ডুম জ্বলছে মাথার ওপর। তাতে দালানখানা ঝকমক করছে। ওপরতলায় মেশিন চালিয়ে মেঝে পালিশ করছে মিস্তিরিরা। এমন সময়ে শ্যামলীকে নিয়ে এসে হুড়মুড় করে ঢুকল বামা।

একটু আঁতকে উঠেছিল বিষ্ণুপদ।

বামা পায়ের ওপর একেবারে উপুড় হয়ে পড়ে বলল, বাবা, মাপ করে দিন। বড় অপরাধ হয়েছে।

বিষ্ণুপদ ব্যস্ত হয়ে বলল, ওরে, ওঠ ওঠ।

বামাচরণ উঠল না। হাপুস কাঁদতে লাগল।

শ্যামলী বলল, ক'দিন ধরেই কান্নাকাটি করছে। আমিও খুব বকাঝকা করেছি।

ওকে উঠতে বলো বউমা। আমার শরীর ভাল নয়। এ সব তেমন সহ্য হয় না।

শ্যামলী হাত ধরে টেনে বসাল বামাচরণকে। বলল, তোমার জন্যই যত অশান্তি। বাবা তো বলেইছিলেন দোতলাটা আমাদের দিয়ে দেবেন। তা হলে ওরকম করতে গেলে কেন?

বিষ্ণুপদর বুকের মধ্যে একটা হাঁচোড়-পাঁচোড় হচ্ছিল। হাঁফ ধরে যাচ্ছিল। বলল, তোমরা বসো। শান্তভাবে কথা কও। বেশি উত্তেজক কিছু হলে আমার কেমন হাঁফ ধরে যায়।

পরিষ্কার মেঝের ওপর দুজনে পাশাপাশি বসল। বামা চোখের জল মুছে বলল, আমি মহা পাপী, আমাকে জুতো মারুন। নইলে নরকেও ঠাঁই হবে না।

বিষ্ণুপদ হাঁফধরা গলায় বলে, একটু দম নিতে দে বাবা। বড় চমকে দিয়েছিস।

দুজনে ভয় পেয়ে চুপ করে গেল।

সাড়াশব্দ টের পেয়েই বোধহয় নয়নতারা কোথা থেকে উড়ে এল যেন।

এ কি, তারা এখানে কেন? কি করতে এসেছিস?

বামাচরণ তাড়াতাড়ি মায়ের পায়ের ওপর পড়তে গেল, মা! মা গো! মাপ করে দাও।

নয়নতারা দু' হাত পিছিয়ে গিয়ে বলল, ওরে বাপ রে, মাপ চাওয়ার কি ঘটা! কেন রে মুখপোড়া, হঠাৎ মাপ চাইতে এসে হাজির হলি কেন? মতলবখানা কি তোর?

বামাচরণ উঠে বসল। বলল, একটা অপরাধ হয়ে গেছে মা, তা বলে কি আর তার মাপ নেই?

শ্যামলী বলল, আমাদের তো তাড়িয়েই দিয়েছেন মা, নতুন করে আর কী শাস্তি দেবেন?

নয়নতারা বলল, শোনো বউমা, কথাটথা যা আছে সব আমার সঙ্গে আর রেমোর সঙ্গেই বলো। ওঁর সঙ্গে নয়। ওঁর শরীর ভাল নয়। আগের বার এসে তোমরা যা করে গেছ তাতে ওঁর কি অবস্থা হয়েছিল, তা পাঁচজনে জানে। এসো তোমরা ওপাশের পুরনো ঘরে গিয়ে বসো। আমি আসছি।

শ্যামলী একটা ঠেলা দিয়ে বামাচরণকে তুলে দিল। বিষ্ণুপদ দেখল, বামাচরণের চেহারাটা আরও খারাপ হয়েছে। রোগা পাঁশুটে, কেমনধারা যেন!

বাবা, আসি তাহলে?

বিষ্ণুপদ ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

ওরা চলে যাওয়ার পর বিষ্ণুপদ কাঁপা বুক নিয়ে বসে রইল চুপটি করে। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। শরীর কি আর দেবে? গৃহপ্রবেশের আগেই ফট হয়ে যাবে নাকি!

তা কামনা-বাসনা রাখতে নেই। গৃহপ্রবেশের আগেই হোক, পরেই হোক, শরীর যখন ছাড়ে ছাড়ুক, ভেবে কেন ব্যস্ত হওয়া?

উঠতে গিয়ে বিষ্ণুপদ টের পেল, হাঁটুতে বল নেই। ওঠা যাচ্ছে না। তাই ফের গা ছেড়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে চুপ করে রইল। পুত্র শব্দটার অর্থ খুঁজে পাচ্ছে না সে।

৯৪

হেমন্তের স্নিগ্ধ বিকেল। রবীন্দ্রসদনের দিক থেকে ডানহাতি ফুটপাথ ধরে দুজনে উত্তর দিকে হেঁটে যাচ্ছিল। রবীন্দ্রসদনের টিকিট পায়নি তারা। সম্ভবত অ্যাকাডেমিরও পাবে না। টিকিট না পেলে অবশ্য তাদের কিছুই যায় আসে না। টিকিট বা নাটক দেখা একটা ছুতো মাত্র।

অনিন্দিতা বলল, তোমাকে নিয়ে আর পারি না। কোনও ব্যাপারেই তোমার কোনও আগ্রহ নেই কেন বলো তো! নাটক হোক, ফিল্ম হোক, পেইন্টিং হোক, কোনও না কোনও বিষয়ে তো মানুষের কণামাত্র ইন্টারেস্ট থাকবে! তোমার কিছুতেই নেই।

চয়ন মৃদু হেসে বলে, আছে।

কিসে আছে শুনি?

আমি পড়তে ভালবাসি।

ওটা কোনও কথা হল? পড়তে ভালবাসলেই কি হয়? জীবন কত ছড়ানো। কত কী হয়ে যাচ্ছে আর্টে, কালচারে!

তাই নাকি?

তুমি কোনও খবরই রাখো না। বড্ড কুনো স্বভাব বাপু তোমার।

তা ঠিক। ঘরের কোণ আমার খুব পছন্দসই জায়গা। লোকজনের জমায়েত দেখলেই আমার অস্বস্তি হয়।

কী যে করি তোমাকে নিয়ে! এই স্বভাবের জন্যই তোমার কিছু হয় না। যদি একটা ঝাঁকুনি মেরে জড়তার ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারতে, তাহলে কিন্তু তুমি অনেক কিছু করতে পারতে।

তাই কি? সবাই কিন্তু সব কিছু পারে না। আর একটা কথা শোনো, আর্ট কালচারে আমাকে ইন্টারেস্টেড করে তুলে কী হবে বলো তো! কত মানুষ তো ও সব ছাড়াই দিব্যি বেঁচে আছে।

ওকে বেঁচে থাকা বলে না। তোমাকে এ পর্যন্ত আট-দশটা নাটক দেখালাম, তবু তোমার নাটকে আগ্রহ হচ্ছে না দেখে অবাক হচ্ছি। কেন হচ্ছে না বলো তো!

নাটক দেখতে তো আমার ভালই লাগছে।

মোটেই না। তুমি দেখতে হচ্ছে বলে দেখছো। জোর করে ধরে নিয়ে আসি, তাই।

না অনিন্দিতা, ঠিক তা নয়। নাটক বা ফিল্মে একটা কৃত্রিমতার গন্ধ থাকেই। কিছুতেই সেটা আমি ভুলতে পারি না।

আচ্ছা পাগল যা হোক! এইজন্যই বলি তোমাকে আর মানুষ করা গেল না।

অ্যাকাডেমিতেও টিকিট নেই। অনিন্দিতা মুখ ভার করে বলল, আজ যে কী হল! কোথাও টিকিট পেলাম না। নিশ্চয়ই তুমি মনে মনে এ রকমটা চেয়েছিলে। বেরসিক কোথাকার!

আমার ইচ্ছাশক্তির কি এত জোর আছে অনিন্দিতা?

আছে বোধহয়।

চলো হাঁটি। বন্ধ ঘরে বসে ও সব দেখার চেয়ে খোলা হাওয়ায় একটু হাঁটাহাঁটি করা বরং অনেক ভাল।

হাঁটা একটা বিচ্ছিরি একঘেয়ে ব্যাপার। তুমি এত হাঁটতে ভালবাসো কেন?

হাঁটতে ভালবাসি তার একটা কারণ আছে। হাঁটতে হাঁটতে খুব ধীরে ধীরে চারদিকটাকে খুব ভাল করে অবজার্ভ করা যায়। ডিটেলসে।

কি জানি বাবা, চারদিকটা তো রোজই একইরকম আর একঘেয়ে।

ঠিক বোঝাতে পারব না। জানোই তো আমার কথাটথা ভাল আসতে চায় না। অনেক কথা বুঝতে পারি, কিন্তু বোঝাতে পারি না।

অনিন্দিতা মৃদু একটু রহস্যময় হাসি হেসে বলল, আচ্ছা তোমার আর আমার সম্পর্কটা নিয়ে কখনও ভেবেছো?

কী ভাববো?

এই সম্পর্কটা আসলে কি? প্রেম ভালবাসা, না বন্ধুত্ব?

চয়ন একটু অস্বস্তি বোধ করে বলে, এটাও আমি ঠিক বুঝতে পারি না, অনিন্দিতা। আমি জীবনে কারও সঙ্গে প্রেমট্রেম করিনি। আমার ভিতরে আবেগ এত কম!

দূর বোকা, প্রেম একটা বায়োলজিক্যাল ব্যাপার। ওর জন্য এক্সপেরিয়েন্স দরকার হয় না। তবে ভয় পেও না। তোমার আর আমার মধ্যে বন্ধুত্বটাই আছে। অন্য কিছু নয়। কি, শুনে স্বস্তির শ্বাস ফেললে তো!

চয়ন একটু হেসে বলল, তা হবে! তবে তোমাকে আমি কখনও অপছন্দ করিনি তো। তোমার সঙ্গ আমার বেশ ভাল লাগে।

সেটা আমারও লাগে। প্রেম জিনিসটা তার চেয়ে কিছুটা বাড়তি জিনিস।

তুমি কখনও কারও প্রেমে পড়েছে অনিন্দিতা?

অনিন্দিতা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, একবার।

ও।

শুনবে সে কথা?

চয়ন একটু মিটিমিটি হেসে বলল, সেটা কি ব্যর্থ প্রেম?

তা তো বটেই! আমার মত মেয়েকে তার পাত্তা দেওয়ার কথাই নয়। দেয়নি কোনোদিন। কিন্তু তার কথা ভাবলেই আমার চোখে জল আসে।

ও।

তুমি কৌতূহল দেখাচ্ছো না তো!

না।এ সব ব্যাপারেও আমার আগ্রহ নেই।

কেন নেই?

প্রেমটাও একটা আবেগসর্বস্ব ব্যাপার। বিয়ে-টিয়ে করলে সেই আবেগটা অনেকটাই কেটে যায়।

উল্টোটাও আছে।

থাকতে পারে!

তুমি ভীষণ নেগেটিভ টাইপের লোক।

তা হবে।

মোড় অবধি এসে অনিন্দিতা থমকে দাঁড়িয়ে বলল, এবার কি করব বলো তো! কোনদিকে যাবো?

চলো চৌরঙ্গি ধরে হাঁটি। এসপ্লানেড অবধি গিয়ে বাস ধরব।

উঃ, হাঁটতেও পারো বটে তুমি! আমার কিন্তু হাঁটু ব্যথা করছে। আচ্ছা, ফুচকা খেলে কেমন হয়?

তোমার না খুব অম্বল হয়?

সে তো আছেই! চলো ভিক্টোরিয়ার সামনে খুব ভাল ফুচকা পাওয়া যায়।

আমি যে ও সব খাই না। সহ্য হয় না।

সহ্য হয় কি না আজ পরীক্ষা হয়ে যাক। আমার ব্যাগে অ্যান্টাসিড আছে, ভয় নেই।

চয়ন মৃদু স্বরে বলে, আমি বোধহয় ও সব খেলে অজ্ঞান হয়ে যাবো।

মোটেই না। ওসব ভাবলেই তোমার হয়।

অনিন্দিতার ফুচকা খাওয়ার দৃশ্যটা মোটেই ভাল লাগছিল না চয়নের। বড্ড লোভীর মতো খাচ্ছে। একটু বাদে ওর আইঢাই অম্বল হবে, কড়ার নিচে ব্যথা হবে। তবু কেন খাচ্ছে? চয়ন মাঝে মাঝে খুব ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে ঠিকই, কিন্তু সে কখনও যা-তা খেতে পারে না।

তুমি শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে রইলে, একটু ঝালমুড়ি অন্তত খাও।

না অনিন্দিতা। আমার সহ্য হয় না।

বড্ড সাবধানী, বড্ড গুডি গুডি তুমি।

চয়ন একটা শ্বাস মোচন করে বলে, আমি ঠিক আমারই মতো। অপদার্থ, অচল।

তোমার ওসব অটো সাজেশনই তোমাকে খেয়ে ফেলছে।

তাও জানি। তুমি আর খেও না। অনেক হয়েছে।

আচ্ছা আচ্ছা। একজন শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে থাকলে খেতে ভালও লাগে না।

ফুচকার দাম মিটিয়ে ফের দুজনে হাঁটতে লাগল। আজ রবিবার। ঈষৎ শীতল সন্ধেবেলায় ময়দানে মানুষের ঢল নেমে এসেছে। ভিড়ের জায়গা চয়নের ভাল লাগে না।

এবার বাসে উঠবে চয়ন?

চলো।

বাসায় নিজের চিলতে ঘরখানার নির্জনতায় ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল চয়ন। ছুটির দিনে আজকাল অনিন্দিতা তাকে টেনে হিঁচড়ে নানা জায়গায় নিয়ে যায় বা যেতে চেষ্টা করে। এই আউটিংটা তার একদম পছন্দ নয়। বড় নিরর্থক আর ক্লান্তিকর মনে হয়। নাটক দেখে বেড়ানোতেও সে তেমন কোনও আকর্ষণ বোধ

করে না। এ বার সে অনিন্দিতাকে বলবে, আমি আর এসব পারছি না। ছেড়ে দাও আমাকে। বলাটা খুব শক্ত। সে কিছুতেই দৃঢ়ভাবে নিজের মত প্রকাশ করতে পারেনি কখনও।

অনিন্দিতার ফুচকা খাওয়ার দৃশ্যটা কেন বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছে তার? ঊর্ধ্বমুখ, মস্ত হাঁ, ফুচকাটা টপ করে হাঁয়ের মধ্যে ফেলে দেওয়া, তারপর চিবোনো এবং মুখে আহ্লাদ ও উত্তেজনা ফুটে ওঠা— সবটাই তার কাছে এত খারাপ লাগছে।

একটু রাতের দিকে অনিন্দিতা ফের ছাদে উঠে এল। চয়ন তখন স্টোভ জ্বেলে রাঁধতে বসেছে।

এই, শুনেছো, তোমার দাদা আর বউদি আজ বাড়ি নেই। কোন্নগর না কোথায় বেড়াতে গেছে, আজ ফিরবে না। তাই আড্ডা মারতে চলে এলাম।

চয়ন একটু হাসল। দাদা বউদি থাকলেও আজকাল অনিন্দিতা প্রায়ই আসে। তবে সন্ধের পর বেশিক্ষণ থাকে না। সে বলল, ভালই তো! কিন্তু খোলা ছাদে ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

কিছু হবে না। রান্না তাড়াতাড়ি শেষ করো। একটু গল্প করি।

তাদের গল্প করাটা কিন্তু অদ্ভুত। চয়নের কথা বিশেষ থাকে না। অনিন্দিতার অনেক থাকে। ও বক্তা, সে শ্রোতা। সম্পর্কটা যে কোনদিকে গড়াবে তা ভেবে পায় না চয়ন।

তার পাশে উবু হয়ে বসে অনিন্দিতা বলে, কী রাঁধছো?

ভাত আর সেদ্ধ। আজ আর বেশী কিছু নয়।

আহা, কবেই বা তুমি পঞ্চব্যঞ্জন রাঁধো! মা আজ মাংস বেঁধেছে, একটু নিয়ে আসব?

না না, মাংস আমার সহ্যই হয় না।

ওঃ, কী নিরামিষ লোক।

চয়ন মৃদু একটু হাসে।

আচ্ছা, তুমি ডিম খাও না কেন?

এ কথার জবাব দিলে তুমি আমার ওপর বিরক্ত হবে।

ও মা, কেন?

একই কথা বারবার বলতে হয় যে! আমার সহ্য হয় না।

মাছ তো খেতে পারো।

তা পারি। কিন্তু ঝামেলা। খাওয়াটা আমার কাছে উপভোগ্য ব্যাপার নয়। খেতে হয়, তাই খাই। খাওয়া না থাকলে আমার খুব ভাল হত।

কিম্ভূত আছে। আমি কিন্তু খেতে ভালবাসি।

সেটাই স্বাভাবিক। আমি তো স্বাভাবিক নই!

স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে শুরু করলেই দেখবে তুমি আর পাঁচটা মানুষের মতো সব কিছুই ভালবাসবে।

হয়তো ঠিকই বলেছো।

আমার কী ইচ্ছে করে জানো? তোমাকে জোর করে স্বাভাবিক জীবনে টেনে আনি।

আমাকে নিয়ে কেন ভাবো অনিন্দিতা? দুঃখ পাবে।

অনিন্দিতা তার সুন্দর দাঁত ঝলসে হাসল, তবু ইচ্ছে করে।

চয়ন মৃদু একটু হেসে বলল, ইচ্ছেটাকে আর প্রশ্রয় দিও না। তাহলে তোমাকে আমার ভয় করবে।

ও মা! কী কথা দেখ! আমাকে আবার ভয়ের কি?

ওই যে, জোর করতে চাও!

যাকে ভালবাসা যায় তার ওপরেই তো জোর করা যায়। তাই না?

চয়ন মৃদুস্বরে আত্মবিশ্বাসহীন গলায় বলে, তা বটে।

তা হলে?

আমার ওপর জোর খাটাতেও হয় না। আমি সবসময়ে অন্যকে খুশি রাখতে চেষ্টা করি। অনেক সময়ে ইচ্ছের বিরুদ্ধে। করি না, বলো?

হ্যাঁ, তা করো। যেমন ইচ্ছে না হলেও আমার সঙ্গে নাটক দেখতে যাও, বেড়াতে যাও। শুধু ফুচকাটা খাওনি।

আরও একটু জোর করলে তাও হয়তো খেতাম। তারপর সারা রাত জেগে থাকতাম অস্বস্তিতে। তাই বলি, আমার ওপর জোর করার দরকার নেই।

তাই বুঝি?

বলে আচমকা যে কাণ্ডটা করে বসল অনিন্দিতা তার কোনও যুক্তিসিদ্ধ অর্থ হয় না, না হয় তার কোনও ব্যাখ্যা। খুবই অকস্মাৎ সে দুই হাতে চয়নের দুটো কাঁধ ধরে নিজের শরীরের দিকে টেনে নিল তাকে। খোলা, বিপজ্জনক ছাদে তার দুখানা ঠোঁট চেপে বসে গেল চয়নের ঠোঁটে। কয়েকটা অদ্ভুত মুহূর্ত। তারপরই তাকে ছেড়ে দিল অনিন্দিতা।

বেসামাল চয়ন পড়েই যাচ্ছিল ছেড়ে দেওয়ার পর। সামলে নিল। কি হল কাণ্ডটা তা সে বুঝতেই পারল না প্রথমে। কি করল এটা অনিন্দিতা? কেন করল?

অনিন্দিতা উঠে দাঁড়াল। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বলল, যাচ্ছি।

সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ যখন নেমে যাচ্ছিল তখন কাঁধে আর ঘাড়ে একটা ব্যথা টের পায় চয়ন। বড্ড হঠাৎ তাকে জাপটে ধরেছিল। বেকায়দায় লেগেছে।

হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁটদুটো মুছে ফেলে চয়ন। কিন্তু ঘটনাটা তো ও ভাবে মুছবে না: এর যে গভীর দাগ থেকে যাবে তার স্মৃতিতে। এটা কী করল মেয়েটা।

চারদিকে কাছাকাছি ছাদগুলোর দিকে চেয়ে দেখল চয়ন। না, কেউ কোথাও নেই। হয়তো কেউ দেখেনি। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল, এই ঘটনাটা ঘটিয়ে অনিন্দিতা কী বলতে চাইল তাকে?

স্টোভটা নিবিয়ে দিল চয়ন। তার ভিতরটা গুলিয়ে উঠছে। অদ্ভুত লাগছে। তার জীবনে এরকম অভিজ্ঞতা এই প্রথম। কিন্তু অভিজ্ঞতাটা ভাল না মন্দ তা সে বুঝতে পারছে না। তার ভাল লাগছে না। তার শরীর খারাপ লাগছে।

আধাসেদ্ধ ভাত স্টোভের ওপরেই পড়ে রইল। ঘরে ঢুকে বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়ল চয়ন। তার শরীর কাঁপছে থরথর করে। মনটা অস্থির। মাথাটা পাগল-পাগল লাগছে। শুয়ে থেকে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল চয়ন। কিন্তু কেবলই মনে হচ্ছে, একটা অঘটন তার অস্তিত্বের ভিত বড্ড নাড়িয়ে দিয়ে গেছে। তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে ভীষণ।

অথচ একটি চুম্বন তো এমন কিছু দোষের ব্যাপার নয়। তার জীবনে হয়তো প্রথম। কিন্তু এ রকম তো হয়! অনিন্দিতার কাছ থেকে ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত ছিল বলেই কি তার একটুও ভাল লাগছে না?

অনিন্দিতা এ ভাবে কিছু কি বলতে চাইল তাকে?

কি বলতে চাইল, তা চয়ন জানে না। কিন্তু তার শরীর জেগে উঠল না এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায়। বরং তার চোখে জল এল। প্রেমহীন চুম্বন কত কষ্টকর হতে পারে। এমন কি যেখানে কামনাটুকু অবধি নেই!

প্রায় সারা রাত জেগে রইল চয়ন। যখন ঘুম এল না তখন চাদর মুড়ি দিয়ে ছাদে ঘোরাফেরা করল। রেলিং ধরে উদাস চোখে চেয়ে রইল দূরের দিকে। মানে হয় না, কোনও মানেই হয় না।

ধীরে ধীরে ভোর হয়ে গেল। আর কি কখনও অনিন্দিতার সঙ্গে সহজে মিশতে পারবে সে? পারবে ওর চোখের দিকে তাকাতে?

সারাদিন একটা ঘোরের মধ্যে রইল চয়ন। যন্ত্রের মতো সকালের টিউশনিগুলো সেরে এল। ভাত রাঁধল, খেল। তারপর বিকেলে গেল চারুশীলার বাড়ি। সবই ঘটছিল যেন স্বপ্নের মধ্যে। তাকে এই কঠিন বাস্তব যেন স্পর্শই করছে না।

চারুশীলা তাকে দেখেই বলে উঠল, এই চয়ন, তোমার কী হয়েছে বলো তো!

চয়ন এই সামান্য প্রশ্নেই ভীষণ থতমত খেয়ে বলে উঠল, না না, কিছু হয়নি তো!

না মানে? তোমার মুখ যে ভীষণ শুকনো। চোখ অমন লাল কেন?

চয়ন যেন ধরা-পড়ে গেছে এমন আতঙ্কের সঙ্গে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, না, কিছু হয়নি আমার। কিছু হয়নি।

টেম্পারেচার নেই তো! সিজন চেঞ্জের সময়, খুব জ্বর হচ্ছে চারদিকে।

না, জ্বর নয়। রাতে ঘুম হয়নি।

কেন হয়নি?

এমনিই।

আমার ভীষণ ঘুম, তা জানো? লোকে বলে ব্রেনলেসদের নাকি ভাল ঘুম হয়।

চয়ন এবার একটু হাসল। কিছু বলল না।

শরীর খারাপ লাগলে আজ পড়াতে হবে না। আজ ছুটি। বসো, তোমাকে একটা নতুন জিনিস খাওয়াবো।

আজ আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।

শোনো, আমি কিছু অফার করলে কখনও না বলবে না। নেগেটিভ জবাব আমার একদম পছন্দ নয়। একটু হলেও খাবে। এসো তো, ডাইনিং টেবিলে এসে বোসো।

অগত্যা একটা অচেনা ঝাল-নোনতা হালুয়া গোছের জিনিস অনিচ্ছের সঙ্গে খেতে হল চয়নকে।

চারুশীলা জিজ্ঞেস করল, এক রাতেই তোমার চেহারাটা অন্যরকম হয়ে গেল কেন বলো তো!

চয়ন লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিল।

তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, ইউ আর ইন এ শক।

না তো! কিছু হয়নি।

বলতে না চাইলে বোলো না। কিন্তু খুব শকিং কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে। আচ্ছা, তুমি কি ওজন নাও?

না তো!

কেন নাও না? রেগুলার ওজন নিলে বুঝতে পারবে তোমার স্বাস্থ্য ভাল হচ্ছে কি না।

চয়ন বলল, আমার আর ভাল কিছু হবে না।

আমার তো মনে হচ্ছে উল্টোটাই। ইদানীং তোমার ওজন একটু বেড়েছে বোধহয়। চলো তো, তোমার ওজনটা একটু দেখি।

চয়নকে তাও করতে হল। ডাইনিং হল-এর কোণে দামী একটা ওজন নেওয়ার যন্ত্রে তাকে তুলে চারুশীলা স্কেলটা দেখে বলল, এখনও তুমি বেশ আন্ডারওয়েট। আরও দশ কেজির মতো বাড়লে তবে হয়।

চয়ন খুব লজ্জিত মুখে চুপ করে থাকে।

রাতে নিজের ঘরে যখন চয়ন ফের একা হল তখন একটা হতাশা আর বিভ্রান্তিতে সে কয়েক টুকরো হয়ে আছে। কিছু করতে ইচ্ছে করছে না।

শুয়ে থেকে থেকে সে অনেক ভাবল। অনেক, অনেক ভাবল।

অনিন্দিতার সঙ্গে দেখা হল আরও তিনদিন বাদে।

সন্ধের পর অনিন্দিতা উঠে এল ছাদে।

ক্ষমা করো চয়ন।

চয়ন চুপ করে রইল।

তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারছি, ভুল করেছি।

কেন করলে?

তোমাকে শক দেওয়ার জন্য। ভেবেছিলাম ধাক্কাটা তোমার উপকার করবে।

৯৫

পালপাড়ায় গিয়ে একদিন বাবাকে প্রায় জোর করেই ধরে নিয়ে এল নিমাই। আসতে চাইছিল না, বলল, ও বাবা, আমি ভিটে ছেড়ে কোথাও যাব না।

নিমাই বলল, উপায় থাকলে কি নিয়ে যেতাম! আপনাকে একটু কাজকারবার বুঝে নিতে হবে যে, আমার কবে কি হয়ে যায়!

তোর আবার কী হবে?

সে আপনি বুঝবেন না, চলুন।

অনিচ্ছুক বাবাকে নিয়ে এসে দোকানে বসাল নিমাই, বলল, কাজকারবার একটু বুঝে নিন।

বাবা তো অবাক, আমি কাজকারবার বুঝব কি রে? এ বয়সে এসব আমার মাথাতেই ঢুকবে না।

নিমাই থমকে যায়। কথাটা ন্যায্য। তার বাবার পক্ষে হোটেল চালিয়ে রোজগার বজায় রাখা অসম্ভব ব্যাপার। মাথা আর শরীর দুটোতেই মরচে ধরেছে। নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে হতাশ গলায় বলল, আপনার জন্য যে কী করি!

পরদিন নিমাই তার ইনসুরেন্স পলিসি বের করে বাবার হাতে দিয়ে বলল, এটা হচ্ছে পলিসি। পলিসি বোঝেন তো!

তা বুঝি। মরলে তার আত্মীয়রা টাকা পায়।

ব্যস, সেটুকু বুঝলেই হবে। আমার যদি ভাল-মন্দ কিছু হয়, তাহলে সিদ্ধিনাথ দাসের কাছে কাগজখানা নিয়ে যাবেন। ত্রিশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে। বুঝলেন?

বাবা একটু রেগে গিয়েই বলে, ভাল-মন্দ হবে কেন রে? বুড়ো তুই, না আমি?

বাবা, আপনাকে সব কথা বুঝিয়ে বলা যাবে না। আমার একটা বিপদ হতে পারে। যদি-র কথাই বলছি। দোকানটার একটা বিলিব্যবস্থা করে রাখতে হবে। অবশ্য যদি শেষ অবধি দোকানটা রাখতে পারি। হয়তো বা বেচে দিয়ে আক্কেলসেলামী গুনতে হবে। বড্ড বিপদ যাচ্ছে বাবা।

বাবা ভ্যাবলা চোখে চেয়ে বলে, কিসের বিপদ বুঝিয়ে বলবি তো! অমন ভাসা-ভাসা বললে কি বুঝতে পারি?

সে অনেক কথা। বলতে গেলে মহাভারত। মরতে আমার তেমন ভয় করে না। শুধু ভাবি, আমি মরলে আপনার কী হবে! কে দেখবে আপনাকে! টাকাটা হাতে পেলেও কি রাখতে পারবেন?

তুই তো আমাকে গণ্ডগোলে ফেলে দিচ্ছিস বাপ! আমার মাথাটা কেমন করে!

তাহলে আর বুঝে কাজ নেই। যা হওয়ার হবে। ভগবানকে ডাকুন।

নিমাই ভিতরে ভিতরে বড় উচাটন। বনগাঁ থেকে আর কোনও খবর বার্তা নেই। কাকা এসেছিল দিন পাঁচেক আগে। এর মধ্যে সেখানে যে কী হচ্ছে, কে জানে! কাকা তাকে যেতে পইপই করে নিষেধ করে গেছে। নইলে সে গিয়ে ঠিক হাজির হয়ে যেত। কাকা লোক পাঠাবে, তার সঙ্গে যেতে হবে।

বাঁচার কোনও পথ দেখছে না নিমাই। বীণাপাণি যে গণ্ডগোল পাকিয়ে রেখেছে তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনও উপায়ও দেখছে না সে।

নিমাইয়ের আজকাল ঘুম হয় না, সব সময়ে বুক কাঁপে, মাথাটা পাথরের মতো ভার হয়ে থাকে দুশ্চিন্তায়, বীণাপাণির ওপর কাকার বড্ড রাগ। দলের ছেলেরাও ক্ষেপে আছে। মেরে-টেরে ফেলল না তো! একটা লোভের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারল না বীণা। আর সেই লোভই ডেকে আনল সর্বনাশ। আবহমান কাল ধরে এই লোভ আর তার পরিণাম নিয়ে কত কত রামায়ণ মহাভারত লেখা হল, তবু মানুষ আজও কিছু শিখল না, পাঠ নিল না।

মাঝে মাঝে নিমাই একা একা কাঁদে। মাঝে মাঝে তার ইচ্ছে করে এই পাপ পৃথিবী ছেড়ে স্বেচ্ছায় বিদায় নেয়, রেললাইনে কাটা গিয়ে কিংবা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে। কিন্তু সেটা আর এক দফা পাপ হবে বলে চিন্তাটা পুষে রাখে না সে। তার খাওয়া ঘুচে গেছে, মুখে কিছু রোচে না। শরীরটাও বেশ দুর্বল।

কাঁচরাপাড়ায় তার বন্ধুবান্ধব মেলাই হয়েছে। নিমাইয়ের কখনও বন্ধুর অভাব হয় না। সিদ্ধিনাথ একদিন বলল, ওহে নিমাই, ব্যাপারটা কি বলো তো! কাজকারবার মন্দা যাচ্ছে নাকি? মুখ শুকনো কেন?

না, কাজকারবার ঠিকই আছে। নানা কথা ভেবে মনটা ভাল নেই।

সিদ্ধিনাথ ইনসিওরেন্সের দালালি করে। লোক ভাল। নিমাইয়ের তাকে খুব পছন্দ। সিদ্ধিনাথ বলল, নানা কথা ভাবো, সে জানি। ঘরের বউকে যাত্রায় নামিয়েছো, কাজটা ভাল করোনি। এ হল গিয়ে ঘোমটার নিচে খ্যামটা নাচ। তা তোমাদের সম্পর্কটা কোথায় দাঁড়িয়েছে বলো তো!

সম্পর্ক আর কোথায়?

আইনে যদি না আটকায় তো একটা কথা বলি।

কি কথা?

অমন শুকনো মুখে থাকো বলেই বলছি। আবার সংসার করো। হাতে ভাল মেয়ে আছে। গোত্রে বর্ণে একেবারে ঠিকঠাক।

নিমাই ম্লান মুখে একটু হেসে বলে, পেরে উঠব না ভাই। এক বিয়ের নাকে খত এখনও চলছে। তা হ্যাঁ হে সিদ্ধিনাথ, তুমি তো মাঝে মাঝে বনগাঁয়ে যাও, তাই না?

যাই মানে? হপ্তায় দু-তিনবার তো বটেই। আমাকে পেটের দায়ে চরকিবাজি করতেই হয়।

টাপেটোপে একটা খবর এনে দেবে?

কিসের খবর? তোমার বউয়ের নাকি?

হ্যাঁ। তারই।

কী খবর চাও বলো।

শুধু জেনে এসো সে কেমন আছে।

ব্যস?

হ্যাঁ। বেঁচে আছে কিনা, সেইটেই জানা দরকার।

তার আবার মরার কি হল?

শুনেছিলাম তার বিপদ যাচ্ছে। খবরটা টাপেটোপে নিও। সে যেন টের না পায়।

আরে না। গোবিন্দ ঘোষ আমার বন্ধু মানুষ। চেনো তো তাকে!

খুব চিনি। বাজারে মুদির দোকান আছে তো!

সে-ই। সে হল ওখানকার গেজেট। কালই খবর পেয়ে যাবে। তবে একটু রাত হতে পারে।

হোক। খবরটা রাতেই দিও। বড় অশান্তিতে আছি।

রাতটা আর দিনটা খুবই উদ্বেগের মধ্যে গেল নিমাইয়ের। পরদিন রাত প্রায় এগারোটা নাগাদ যখন দোকান ধোলাই হচ্ছিল সেইসময় সিদ্ধিনাথ এসে হাজির। তাকে দেখেই হৃৎপিণ্ডটা একটা ডিগবাজি খেয়ে গেল।

কী খবর সিদ্ধিনাথ?

সিদ্ধিনাথের মুখটা কিছু গম্ভীর। মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে বলল, তোমার বউ ওখানে নেই, কিছুদিন হল বাপের বাড়ি গেছে। তবে পালিয়েই যেতে হয়েছে। কাকার দল নাকি তাকে খুঁজছে।

পালিয়ে গেছে?

কী করেছিল বলল তো তোমার বউ? কি সব টাকাপয়সা চুরির কথা শুনলাম।

ঠিকই শুনেছো। পরে বলব সব।

আর সজল বলে কে একটা ছেলে আছে শুনলাম, তোমার বউয়ের সঙ্গে ভাব ছিল। তাকে খুব মেরেছে দলের ছেলেরা।

কেন, সে কী করেছিল?

ঠিক জানি না, বোধহয় বীণাকে সে-ই পালানোর পরামর্শ দিয়েছিল। তবে বীণা রেহাই পাবে না। তুমি বরং ওদিকে আর যেও না, বুঝলে?

নিমাই কথাটা শুনতে পেল না। কাঁপা কাঁপা বুক নিয়ে শুকনো মুখে বসে রইল।

পরদিন দোকানটা সকালে চালু করে দিয়ে, বাবাকে ক্যাশে বসিয়ে, ঠাকুর চাকরকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। যা হওয়ার হবে, এ উদ্বেগ আর সহ্য হয় না।

বাস ধরে বনগাঁ পৌঁছোতে বেশী সময় লাগল না। বাস থেকে নেমে সে একটু দাঁড়িয়ে চারদিক দেখে নিল। এই বনগাঁ জায়গাটাই তার বন্ধু ছিল একসময়ে। আজ এই শহরে কি তার লাশ পড়বে?

বাস-আড্ডার কাছেই কাকার ডেরা। রাস্তায় মেলা লোকজন যাতায়াত করছে। একটু দ্বিধায় জড়িত পায়ে সে বাজারের পিছন দিকটায় কাকার ঘরে গিয়ে উঁকি দিল।

কাক আর দুটো ছেলে বসে আছে মুখোমুখি।

কাকা, আমি নিমাই।

কাকা তার দিকে তাকাল। মুখে হাসি নেই, চোখেও নেই অভ্যর্থনা। কাঠ গলায় বলল, এসো নিমাই।

নিমাই জড়সড় হয়ে ঘরে ঢুকল।

তোমাকে আসতে নিষেধ করেছিলাম না?

নিমাই তার শুকনো গলায় একটা ঢোঁক গিলে বলল, আসতে হল, মনে শান্তি পাচ্ছি না বলে।

বসো নিমাই।

নিমাই লক্ষ করল, ছেলেদুটো নতুন। খুব মস্তান মার্কা চেহারা। তাকে টেরিয়ে টেরিয়ে দেখছে।

কাকা ছেলেদুটোকে বিদেয় করে দিল। তারপর তার দিকে চেয়ে বলল, বীণা পালিয়েছে, জানো?

শুনেছি।

ডলার আর পাউন্ড সব নিয়ে গেছে সঙ্গে করে।

কি করে বুঝলেন?

আমরা ওর ঘরে হানা দিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি ঘরের মেঝে ভেঙেছে শাবল দিয়ে। বেশ বড় গর্ত হাঁ হয়ে আছে। চিড়িয়া উড়ে গেছে।

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাকে মুখোমুখি পাননি? জিজ্ঞেস করেননি সব কথা?

তোমার কাছ থেকে ঘুরে আসার পর একটা জরুরি কাজ পড়ে গিয়েছিল। তবে ছেলেদের বলেছিলাম বীণার ওপর নজর রাখতে। তারা নজর রেখেছিল বটে, কিন্তু পালিয়েছে ভোর রাতে।

এখন কী হবে কাকা?

তাকে পেলে তো বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে। বীণা পালিয়ে বাঁচবে না, বরং তুমি তার কাছে যাও। গিয়ে বলল, ডলার আর পাউন্ডগুলো সে যদি ভালয় ভালয় ফেরত দিয়ে দেয়, তাহলে এখনও তাকে বাঁচিয়ে দেওয়া যায়।

নিমাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, এ কাজ আমার দ্বারা হবে না কাকা। সে আমাকে মানবে না।

তাকে বাঁচানোর ওইটেই একমাত্র পথ।

আমি এটা পারব না কাকা। এই নিয়েই বীণাপাণির সঙ্গে আমার বনিবনা হয়নি। সে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

কাকা এবার একটু হাসল। বলল, তোমাকে একসময়ে আমার সন্দেহ হয়েছিল নিমাই। কিন্তু ভেবে দেখলাম, সন্দেহটা অমূলক। তুমি ঠিক সেরকম ফেরেব্বাজ বোধহয় নও।

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বাঁচালেন কাকা, কলঙ্ক নিয়ে মরতেও বড় জ্বালা। তবে বীণার পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে আমি রাজি।

তা কি হয়? একজনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আর একজনকে দিয়ে হয় না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে নিমাই। তারপর বলে, আমি বীণার ঘরখানা একটু দেখে আসতে পারি?

যাও না। পাশের বাড়িতে চাবি আছে।

আপনি কি আমার সঙ্গে যাবেন?

আমি গিয়ে কি করব?

চলুন একটু ঘুরে সব দেখে আসি।

চলো তাহলে। বলে কাকা উঠল।

রিকশা করে দশ মিনিটের মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে গেল তারা।

বাড়িখানা ভালই করেছে বীণা। দেওয়াল দিয়ে ঘর তুলেছে নতুন করে। পাকা মেঝে। একখানা দাওয়া হয়েছে। বেশ দেখাচ্ছে। শুধু সুখটা তার সইল না।

কাকা চাবি আনিয়ে ঘরে ঢুকল। পশ্চিম-উত্তর কোণে গর্তটা দেখিয়ে বলল, দেখ কাণ্ড!

গর্তটা ভাল করে দেখল নিমাই। একখানা শাবল পড়ে আছে পাশে। গর্তের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে নিমাই কিছু একটা খুঁজছে।

কি খুঁজছো?

মাপটা দেখছি।

কিসের মাপ?

গর্তের মাপ।

কেন বলো তো!

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আগের গর্তটা এখানে ছিল না। মাপটাও বড় ছিল।

কোথায় ছিল গর্তটা?

ওই দিকটায়। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। ওদিকটা আমি একটু খুঁড়ে দেখব কাকা?

তোমার কি ধারণা মালটা এখানেই ফেলে গেছে বীণা? তাহলে গর্ত খুঁড়ল কেন? ও জিনিস ওর সঙ্গেই আছে।

নিমাই খুব বোকার মতো মুখ করে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, সঙ্গেই থাকার কথা। তবে কিনা আপনার ছেলেরা নজর রাখছে টের পেয়ে সে জিনিসটা সঙ্গে নাও নিতে পারে। ধরা পড়লে তো হয়েই গেল। তাই হয়তো বুদ্ধি খাটিয়েছে। সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না।

সেটা কিরকম?

ঘরে যে খানাতল্লাসি হবে সেটা বীণা জানে। তাই গর্তটা করে রেখে গেছে যাতে আপনার মনে হয় যে, মাল হাপিস হয়েছে।

ও বাবা! এ যে সাঙ্ঘাতিক কথা বলছো!

লোভ মানুষকে দুষ্টবুদ্ধি জোগায়।

তাহলে ওদিকটা খুঁড়েই দেখ। যদিও আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি, তবু দেখ।

নিমাই শাবলটা নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মেঝেটা আগে ভাল করে দেখে নিল। তার চোখ খুবই ভাল। দেখতে পেল, একটা জায়গায় একটা টিপ ছাপ আছে। খুব হালকা, প্রায় চোখেই পড়ে না। গাঁথনি খুবই কাঁচা। সামান্য সিমেন্ট আর মেলা বালি দিয়ে সস্তায় কাজ সারা হয়েছে। নিমাই অল্প পরিশ্রমেই গর্ত করে ফেলতে পারল। তারপর ভিতরে হাত ঢুকিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করে প্লাস্টিকে জড়ানো স্টেনলেস স্টিলের কৌটোটা বের করে আনল। তার হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। বুক কাঁপছে। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

কাকা অবিশ্বাসের চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল নিমাইয়ের দিকে। মুখে বাক্য নেই।

নিমাইও কথা কইতে পারল না কিছুক্ষণ। তারপর স্খলিত গলায় বলল, এই নিন। বোধ হয় এটাই।

দু'হাতে জিনিসটা বাড়িয়ে ধরল নিমাই। চোখে জল।

কাকা হাত বাড়িয়ে নিল। তারপর চৌকিতে বসে ধীরে ধীরে প্লাস্টিকের মোড়ক খুলল। কৌটোর ঢাকনা খুলে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। কৌটোটার ভিতরে প্লাস্টিকে মোড়া ঠাসা ডলার আর পাউন্ডের নোট। কাকা নোটগুলো বের করল, নীরবে গুনল। তারপর নিমাইয়ের দিকে চেয়ে বলল, সব ঠিক আছে নিমাই।

ঠিক আছে? বলে নিমাই মাথা নেড়ে বলল, কিছুই ঠিক নেই কাকা। মানুষ ঠিক নেই। মতলব ঠিক নেই। বুদ্ধি ঠিক নেই।

তুমি বড্ড ভেঙে পড়েছে নিমাই। বসো, দম নাও!

নিমাই মাথা নেড়ে বলে, কটাই বা টাকা বলুন! তার জন্য গুনোগার কত দিতে হল। মানুষ খুন হল, স্বামী-স্ত্রী ছাড়াছাড়ি হল, উদ্বেগ অশান্তি সন্দেহ কত কী দেখা দিল! তবু বীণাপাণি লোভ ছাড়তে পারেনি। হিসেব করে বলবেন তো, এই বিলিতি টাকায় আমাদের কত টাকা হয়।

হিসেব করতে হবে। তবু অনুমান পঞ্চাশ হাজারের মতো হবে।

ব্যস! বলে চোখ বুজল নিমাই।

কাকা একটু হাসল, আজ সত্যি করেই বলছি, তোমার মতো মানুষ আমি আর দেখিনি। আমি পাপীতাপী লোক বটে, কিন্তু যে ভাল, তাকে ভাল বলতে জানি।

হাত জোড় করে নিমাই বলল, দোহাই কাকা, আমার প্রশংসা করবেন না। ও শুনলেও পাপ হয়। কাজ হয়ে গেছে, এবার তবে আসি গিয়ে আমি?

আরে পাগল? এত সহজে ছাড়ব নাকি তোমায়? চলো, আমার ওখানে বসে একটু চা-মিষ্টি খেয়ে যাবে।

এসব আমার গলা দিয়ে নামবে না কাকা। আজ মাথাটা বড্ড চক্কর দিচ্ছে। বুকটাও হালকা। এখন বীণা আমাকে শত শাপশাপান্ত করলেও কিছু না।

বাক্সটা আবার প্লাস্টিকে মুড়ে নিল কাকা। তারপর বলল, বীণার একটা ছেলের সঙ্গে নটঘট ছিল, জানোই তো! তাকে খুব মারধর করা হয়েছে। ছোকরা হাসপাতালে পড়ে আছে। এসব কাণ্ডের পর বীণাকে আর বনগাঁয়ে থাকতে দেওয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়াল।

নিমাই কাকার হাত দুটো চেপে ধরে বলল, ওকে মাপ করে দিতে হবে কাকা। আপনি যদি রক্ষে করেন তো কেউ ওর ক্ষতি করবে না, প্রাণটা রক্ষে করুন।

কাকা হাসল, তুমি কি বীণাকে এখনও এত ভালবাসো?

ভালবাসা জিনিসটা কিরকম তাই জানি না। আমার ওর ওপর কোনও দাবিদাওয়া বা লোভ নেই কাকা, তবে সে আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছিল। রোগেভোগে যখন মরতে বসেছিলাম, তখন বীণা না বাঁচালে, বাঁচা যেত না। সেই ঋণটা শোধ হওয়া দরকার।

কাকা একটু ভেবে বলল, আজ দলের সবাইকে ডেকে ঘটনাটা বলব, তারপর একটা কিছু স্থির করতে হবে। যাত্রার দলে বীণাকে আর রাখতে চাই না। তার বদনাম হয়ে গেছে।

সে আপনি যা ভাল বুঝবেন, করবেন। শুধু প্রাণে মারবেন না।

না, সে ভয় আর নেই। বীণাও শিগগির এদিকে আসবে বলে মনে হয় না।

নিমাই মাথা নেড়ে বলল, আসবে। ঠিক আসবে।

কি করে বলছো?

ডলার আর পাউন্ডের লোভে আসবে ঠিকই। তবে দিনের আলোয় নয়, রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে আসবে। আমার ভয় তখন যদি আপনার দলের ছেলেরা তাকে ধরতে পারে তো বিপদ ঘটবে।

কাকা মাথা নেড়ে বলে, না। আমি বারণ করে দেবো। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

আর সজলবাবুকে সে যদি বিয়ে করতে চায় তো করতে পারে। যদি দেখা হয় তো বলে দেবেন।

এত বড় কথাটা বলতে বলছো!

বলছি। সে যাতে খুশি হয় তাই করুক। আমার আর কিছু এসে যায় না। আমি আসি গিয়ে কাকা?

চলো, তোমাকে বাসে তুলে দিয়ে আসি।

চলুন।

বাস স্ট্যান্ডে এসে নিমাই বাস ধরে ফিরে এল।

মনটা ভাল নেই। মানুষ পাপের জঞ্জাল জমিয়ে তোলে। একটা জঞ্জাল সাফ হয়, তারপর ফের জমে যায়।

ফিরে এসে কাজেকর্মে মন দিল নিমাই।

বাবা বলল, ওরে, আর কতকাল আমাকে এখানে ধরে রাখবি? আমার এখানে মন বসছে না।

নিমাই বলল, চলুন, আজই পালপাড়ায় রেখে আসি আপনাকে।

সন্ধেবেলা ফিরে এসে দেখল দোকানে রামজীবন বসে আছে।

আরে, আপনি কখন এলেন? বলে পায়ের ধুলো নিতে গেল নিমাই।

তাকে ধরে ফেলে রামজীবন বলল, বিকেল থেকে বসে আছি। সামনের সপ্তাহে আমাদের গৃহপ্রবেশ। বাবা তোমাকে নেমন্তন্ন করতে পাঠাল।

আমাকে? বলে নিমাই অবাক।

তোমাকেই। বড়দা বিরাট বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে। মা বাবা থাকবে, দেখলে তাজ্জব হয়ে যাবে।

কিন্তু— বলে নিমাই ঘাড় চুলকোলো।

ওজর আপত্তি শুনতে আসিনি। তোমাকে যেতে হচ্ছে।

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বীণাপাণি কি এখন ওখানে আছে?

আছে।

আপনাকে একটা কথা বলব?

বলেই ফেল।

তাকে বলবেন বনগাঁর গণ্ডগোল মিটে গেছে।

কিসের গণ্ডগোল?

ছিল একটা। সে ইচ্ছে করলে ফিরে যেতে পারে।

রামজীবন একটু ভেবে বলল, হ্যাঁ। বীণাও বলছিল বটে, ওর এবার বনগাঁয়ে যাওয়া দরকার।

বলবেন যেন নির্ভয়ে যায়। কেউ কিছু বলবে না।

আচ্ছা বলব। তাহলে আসি। তারিখটা মনে রেখো।

যে আজ্ঞে। মনে থাকবে। তবে একটু বসে যান।

বেশ কারবারটি ফেঁদেছো তো! ভালই চলছে দেখছি। সন্ধে থেকে তো খদ্দেরের কামাই দেখছি না।

চলে যাচ্ছে।

আমিও দোকান করছি। কিরকম চলবে কে জানে! গাঁয়ে গঞ্জে দোকান চালানো কঠিন।

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, যে আজ্ঞে।

রামজীবনকে মাংস পরোটা ঠেসে খাইয়ে দিল নিমাই। রামজীবন মহা খুশি। বলল, ওঃ, অনেকদিন এরকম ভাল রান্না খাইনি। তাই বলি, দোকান এত চলে কেন?

রামজীবন চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল নিমাই। গৃহপ্রবেশে সে যাবে না। সম্পর্কই চুকে গেছে, যাবে কেন? তবে শ্বশুর লোকটা বড় ভাল।

৯৬

মণীশের বাক্যহীন চেয়ে-থাকাটা আজকাল সহ্য করতে পারে না অপর্ণা। মণীশ রোগা হয়ে যাচ্ছে, চোখের নিচে কি কালিও পড়ছে? দুর্বল হৃদযন্ত্র নিয়ে মণীশের বেঁচে থাকা, তার ওপর যদি ওরকম বিষণ্ণতা চেপে বসে মাথায় তা হলে কি ভাল?

এ কথা ঠিক যে বুবকা আই আই টি-তে চলে যাওয়ার পর সকলেরই মন খারাপ। বাড়িটা হাঁ-হাঁ করছে ফাঁকা। তবু লোকে সব অবস্থাই তো সামলে নেয়। মণীশ পারছে না কেন?

জয়েন্ট এন্ট্রান্স পাশ করে বুবকা যখন হস্টেলে গেল তখন আর এক উদ্বেগ পেয়ে বসেছিল মণীশকে। আই আই টি-তে ভীষণ র‍্যাগিং হয়। মণীশ উদ্বেগে প্রায় পাগল হয়ে বুবকার সঙ্গে চলে গেল খড়্গপুরে। হোটেলে রইল কয়েকদিন, যাতে বিপদে পড়লে বুবকা তার কাছে পালিয়ে আসতে পারে। বুবকা অবশ্য পালিয়ে আসেনি। র‍্যাগিং সহ্য করেছে এবং তারপর সকলের সঙ্গে মিশেও গেছে। ছেলের র‍্যাগিং নিয়ে এমন চিন্তায় পড়েছিল মণীশ যে, ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল। র‍্যাগিং-এর ভয় গেছে, কিন্তু মণীশ এখনও বুবকার অভাবটা সামলে উঠতে পারছে না।

হ্যাঁ গো, ছেলে কি কারও বিদেশে যায় না? সবসময়ে বুকে আগলে থাকা যায় বুঝি? ছেলের ভবিষ্যৎ বলে কি কিছু থাকবে না?

মণীশ এ কথার সরাসরি জবাব দেয় না, কিন্তু চেয়ে থাকে শূন্য চোখে। তারপর বলে, নাউ হি ইজ অ্যান অ্যাডাল্ট। বড় হয়ে গেল!

সেটা কি কোনও ট্র্যাজেডি? ছেলে বড় হচ্ছে এটা তো আনন্দের কথাই গো!

মণীশ মাথা নেড়ে বলে, ঠিকই তো। বড় হওয়ারই তো কথা। কিন্তু এই যে আলাদা হয়ে গেল, এই কিন্তু ছাড়াছাড়ির শুরু।

সে আবার কী কথা! ছাড়াছাড়ির কী আছে? পাশ করে চলে আসবে।

না অপু, পাশ করে চাকরি করবে, হয়তো বিদেশে যাবে, তারপর বিয়ে করবে, তারপর আমার বুবকা আরও অনেকের বুবকা হয়ে যাবে। কথাটা স্বার্থপরের মতো শোনাচ্ছে হয়তো, ঠিক বোঝাতেও পারব না। তবে বুবকা যেমন আমার এক্সক্লুসিভ ছিল ঠিক তা তো আর থাকবে না। নিজস্ব মতামত হবে, ব্যক্তিত্ব হবে, চরিত্র হবে। এ জেন্টলম্যান অফ হিজ ওন।

সেই জন্য তুমি মন খারাপ করে আছো? আচ্ছা পাগল তো! তুমি নিজেও তো বড় হয়েছো, আলাদা হয়েছো, তাতে কী অসুবিধে হল শুনি!

মণীশ মৃদু একটু হাসি মুখে টেনে বলে,বুবকা আমার এত ক্লোজ ছিল বলেই বোধহয় বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

তুমি বাপু বড্ড নরম। যা ভেবেছিলাম তোমাকে তার চেয়েও অনেক বেশি নরম।

দুর্বল, তাই না?

তাও।

হার্ট অ্যাটাকটা হওয়ার পর থেকেই আমার এরকম একটা ব্যাপার হয়েছে। ঝুমকির বিয়ের কথা মনে হলে বা বুবকা চাকরি করতে বাইরে যাবে ভাবলে কেমন যেন রি-অ্যাকশন হতে থাকে। মনে হয় ওদের দূরে কোথাও যেতে না দেওয়াই বোধহয় ভাল।

তোমার এ সব কথা বুবকার কানে গেলে ও কিন্তু পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে চলে আসবে। হস্টেলে যাওয়ার সময় লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছে, তা জানো?

জানি অপু। তুমি ভেবো না। আমাকে একটু সময় দাও, ঠিক সামলে উঠব।

তোমার যা অবস্থা দেখছি আমার তো চিন্তা হচ্ছে। আমি তো মা, তবু তোমার মতো অবস্থা তো আমার হয়নি।

মণীশ একটু চুপ করে থেকে বলল, কাউকে কাছ-ছাড়া করতে ইচ্ছে হয় না। কেবল মনে হয়, আমার সঙ্গে যদি আর দেখা না হয়?

ছিঃ! ও কি অলক্ষুণে কথা!

অলক্ষুণে হলেও মিথ্যে হয়তো নয়। জীবন এত অনিশ্চিত, আয়ুর ঘরে মস্ত এক প্রশ্নচিহ্ন ঝুলে আছে, আর কতদিন?

তুমি বুবকার ভবিষ্যতের কথা ভাবছো না কেন?

তাও ভাবি। খুব ভাবি। বুবা একটি উজ্জ্বল ছেলে। পড়াশুনোয় ভাল, স্বভাবে ভাল, হৃদয়বত্তায় ভাল, ওর ভবিষ্যৎ তো ভালই হবে অপু। ওর জন্য কখনও আমাকে কোনও উদ্বেগ পোয়াতে হয়নি। বরাবর ওবিডিয়েন্ট ছিল, বিনীত ছিল, ভদ্র ছিল। সব ভাল, তবু একটু দূরে সরেই গেল কিন্তু। এই দূরত্বটা ক্রমে ক্রমে বাড়বে। তাই না?

উঃ, তুমি এত ভাবতেও পারো! আমার তো এ সব কথা একবারও মনে হয় না। ছেলে দূরে গেলেই কি পর হয়ে যায় নাকি?

মণীশ মৃদু হেসে বলে, ঘরে ঘরে কত ছেলে পর হয়ে যাচ্ছে তার হিসেব জানো?

সেও জানি। অত ভেবো না। পরই যদি হয় তো তার অনেক দেরি আছে। ছেলেরা পর হতে থাকে বিয়ের পর, তার আগে নয়। আগ বাড়িয়ে অত ভাবছো কেন?

ঠিক আছে, আর ভাবব না।

চলো, একটু সিনেমা থিয়েটার কিছু দেখে আসি।

মণীশ মাথা নেড়ে বলে, না। ওসব আমার ভাল লাগে না। তার চেয়ে ক্যামেরাগুলো বের করো। তোমাদের কিছু ছবি তুলি।

আবার আমাদের ছবি? তোমার মাথাটাই গেছে। বারো-চোদ্দটা অ্যালবাম ভর্তি হয়ে আছে শুধু আমাদের ছবিতে।

তা হলে বরং এমনি ছবি তুলে বেড়াই কয়েকটা দিন।

পরিশ্রম আর ধকল সইতে পারবে তো? ভেবে দেখ।

মণীশ হাসল, পারব। ছবি তোলার একটা নেশা আছে। শুরু করলেই একটা টনিকের কাজ করবে।

যা ভারী তোমার ক্যামেরার ব্যাগ!

না, ব্যাগ নেবো না। দুটো ক্যামেরা নিলেই হবে। শুধু লেন্সের জন্য একটা ছোটো ব্যাগ হলেই হবে।

কয়েকটা ছুটির দিনে মণীশ বাস্তবিকই ছবি তুলে বেড়ালো। নিজেই ওয়াশ করল ফিল্ম। প্রিন্ট করিয়ে আনল। তারপর খুঁটিয়ে দেখল সব ছবি। অপর্ণাকে বলল, নাঃ, এখনও মরে যাইনি দেখছি। তবে অ্যাকশনের ছবি আর তুলতে পারব না। আর পারব না ছুটতে বা খুব উঁচু জায়গায় উঠতে।

পেরে দরকার নেই।

মণীশ বলল, না, সত্যিই দরকার নেই। ক্যামেরা তুলে রাখো।

শখ ফুরিয়ে গেল নাকি?

ঠিক তা নয়। মনের বিষণ্ণতাটা কেটেছে।

বাঁচা গেল। যা ভাবছিলাম!

বিষণ্ণতাটা সত্যিই কাটল কিনা তা বুঝতে পারল না অপর্ণা। শুধু বুঝল, মণীশ এখন আগের চেয়ে কম কথা বলে এবং মাঝে মাঝে অদ্ভুত শূন্য এক চোখ মেলে ভাষাহীন চেয়ে থাকে।

মাস দেড়েক বাদে বুবকা তিন দিনের ছুটিতে বাড়ি এল। কী যে হইচই হল তা বলার নয়। মণীশের এমন উত্তেজনা হচ্ছিল যে আবার তার হার্ট না বিগড়ে বসে ভয় হল অপর্ণার।

ছুটির দ্বিতীয় দিনটায় তারা একটা পার্টির ব্যবস্থা করে রেখেছিল আগে থেকেই। পার্টি যেমন হয় তেমন নয়। রাতে তারা একটা বড় হোটেলে গিয়ে খেল। মাত্র পাঁচজনের জন্য খরচ হল তিন হাজার টাকার ওপর।

অপর্ণা বলল, টাকা কি তোমাকে কামড়ায়? ওগো, আমরা কিন্তু শেঠজী নই। আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকার ব্ল্যাকমানি নেই, তোমাকে বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকার ওপরে ইনকাম ট্যাক্স দিতে হয়, মনে রেখো।

জানি অপু। এর পর তুমি মেয়েদের বিয়ে আর বুবকার পড়ার খরচের কথাও তুলবে। অত ভেবো না, এই একটা দিন। বুবকা বাড়ি এসেছে।

আর নয় কিন্তু। ফের এরকম পাগলামি করলে আমি ভীষণ রেগে যাবো। ইস, গালে থাপ্পড় মেরে পয়সা নিয়ে নিল।

বুবকা বলল, মা, দাম বেশি ঠিকই, কিন্তু খাওয়াটা ফ্যান্টাস্টিক হয়েছে।

অনু বলল, ঠিক মা, এরকম পসিন্দা কাবাব আর দম পুখত, কখনও খাইনি। মুখের মধ্যে যেন গলে গেল।

সমর্থক পেয়ে মণীশ বলল, তোমার ভাল লাগেনি অপু?

ভাল? আমি হোটেল দেখেই দামের কথা ভেবে এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে, খাবারের স্বাদই বুঝতে পারিনি।

মণীশ বলল, এই ঝুমকি, তুই চুপ কেন রে?

ঝুমকি করুণ মুখ করে বলল, আমারও কিন্তু মার মতোই মনে হচ্ছে। খাবারগুলো খুব ভাল, কিন্তু দামটা বড্ড বেশি।

তুই স্বভাবে ঠিক তোর মায়ের মতোই হয়েছিস। দাম নিয়ে অত ভাবিস কেন? একদিন তো!

না, ভাবছিলাম, দামটা একটু কম হলে আবার আসা যেত।

আবার আসব। তাতে কি?

না বাবা, আর আসতে আমার লজ্জা করবে।

তোর খাবারগুলো ভাল লেগেছে তো!

দারুণ।

বুবকা দিদির কাঁধে একটু দাদাসুলভ চাপড় মেরে বলল, তুই একটু কিপটে আছিস কিন্তু দিদি।

কাল আমি তোকে একটা জিনিস বেঁধে খাওয়াবো, দেখিস এদের চেয়ে মোটেই খারাপ হবে না।

বুবকা হঠাৎ বলল, আচ্ছা দিদি, সবাই একরকম আছে, কিন্তু তোকে একটু অন্যরকম লাগছে কেন রে?

ঝুমকি অবাক হয়ে বলল, অন্যরকম! যাঃ, অন্যরকম লাগবে কেন?

ঠিক ডিফাইন করা যাবে না। কিন্তু তোকে ঠিক আগের মতো দিদি-দিদি লাগছে না।

কিরকম লাগছে? পিসি-পিসি?

আরে নাঃ। মনে হচ্ছে তুই একটু পাল্টে গেছিস।

মাত্র এই ক'দিনে? তুই তো সবে এই সেদিন হস্টেলে গেলি!

তাই তো ভাবছি হোয়াট ইজ ডিফারেন্ট অ্যাবাউট মাই ডিয়ার দিদি?

অপর্ণা বলল, ঝুমকি তা হলে নিশ্চয়ই আরও রোগা হয়ে গেছে। হবে না! খাওয়া নিয়ে ওরকম বাছাবাছি যাদের থাকে তাদের শরীর শুকোবেই।

বুবকা বলল, না মা, দিদি আর শুকোবে কি করে? ও তো সম্পূর্ণ ডিহাইড্রেটেড। তা নয়, কিন্তু একটা অন্যরকম লাগছে, ধরতে পারছি না।

তোকে আর পণ্ডিতী করতে হবে না। এই, আপার খবর কি রে? পাশ করে তো দেখা করতে এল না!

পাশ করাটা ওর কাছে আবার একটা ব্যাপার নাকি? ও তো ডাক্তারিতে চান্স পেয়েছে।

সে তো জানি।

পড়ছে। পাশ-টাশ করে কোথাও সেবায় লেগে যাবে। ওর তো আমাদের মতো ক্যারিয়ারের ব্যাপার নেই, ওর হল মিশন।

কিরকম রেজাল্ট করেছিল?

ও বাবা, ও ছিল টুয়েলভথ্। ভাল করে পড়লে ফার্স্ট হত।

তোর সঙ্গে আর তো দেখা হয় না!

না। তবে একটা চিঠি দিয়েছে।

কী লিখেছে?

হাই ফিলজফি। চিঠিটা আমি বাবার জন্য রেখে দিয়েছি। ওর ওই সব ফিলজফি বাবার খুব পছন্দ হবে।

মণীশ মৃদু হেসে বলে, ও মেয়েটাকে আমার খুব ভাল লাগে। বড় কিছু করবে দেখিস।

অপর্ণা বলল, বড্ড সাহস। মেয়েদের অত সাহস ভাল নয়।

বাড়ি ফিরে যখন সবাই এক প্রস্থ আড্ডায় বসল তখন বুবকা ফের বলল, দিদি, ইউ রিয়েলি লুক ডিফারেন্ট। তোকে আগে একটু কাঠখোট্টা লাগত, এখন লাগছে না।

ঝুমকি একটু নার্ভাস হাসি হেসে বলল, যাঃ, আমি বুঝি কাঠখোট্টা ছিলাম!

ছিলি একটু।

আমি বদলাইনি মোটেই। বরং তুই একটু বদলেছিস। আগে কো-এডুকেশনে পড়তিস, একটু নরম ভাব ছিল। এখন হুমদো হুমদো ছেলেদের মধ্যে থাকিস, তাই তুই কাঠখোট্টা হয়েছিল।

বুবকা হাঃ হাঃ করে খানিকক্ষণ হেসে বলল, কথাটা কিন্তু ঠিক। আমি এখন টোটাল ম্যাসকুলিন সারাউন্ডিংস-এ থাকি। মা নেই, অনু নেই, দিদি নেই, মেয়ে-বন্ধুরা নেই। কিন্তু ভালই লাগে।

অপর্ণা হঠাৎ বলল, তোর কার জন্য সবচেয়ে বেশি মন খারাপ লাগে?

বাবার জন্য অফ কোর্স। কিন্তু সকলের জন্যই। তবে কি জানো মা, এত বন্ধু আর এত পড়ার চাপ যে মন খারাপ-টারাপ সব উড়ে যায়। তারপর খেলাধুলো আছে, আড্ডা আছে।

মণীশ বলল, ইজ ইট থ্রিলিং?

ভেরি মাচ।

একটু গভীর রাতের দিকে যখন সবাই শুতে গেল তখন ঝুমকি এসে বুবকাকে ডাকল, এই ভাই, ঘুমিয়েছিস নাকি?

না রে। আজ এতদিন পরে বাড়ি এসে এত অদ্ভুত লাগছে যে ঘুম আসছে না। আয় না, গল্প করি।

ঝুমকি আলো না জ্বেলে চেয়ার টেনে বিছানার মুখোমুখি বসে বলল, আমাকে তোর অন্যরকম লাগছে কেন বল তো!

কি জানি রে দিদি, বুঝতে পারছি না।

তুই এমনভাবে বলছিলি যে আমার ভয় করছিল।

কেন, ভয়ের কি আছে?

কেমন মনে হচ্ছিল, আমি বুঝি কোনও অন্যায় করে ফেলেছি।

যাঃ, তোকে সেরকম লাগছে না মোটেই। মনে হয় তুই বোধহয় একটু ওয়েট গেন করেছিস। ওজন নিয়ে দেখিস তো।

তা হতে পারে।

সেটাই হবে।

ঝুমকি একটা শ্বাস ফেলে বলল, বাবা তোর জন্য খুব ভেঙে পড়েছিল, জানিস?

জানি, মা বলেছে। কিন্তু বাবা সামলেও গেছে। জীবনটা যে কত বড় তা বাড়িতে থাকলে বোঝা যায় না। হস্টেলে থাকলে বোঝা যায় খানিকটা।

কত বড় রে?

ঠিক আন্দাজ করা মুশকিল। এখানে তোরা আছিস, তুই, মা, বাবা, অনু সবাই মিলে কেমন একটা ঘেরাটোপ। নিজেকে ঠিক স্বাধীনভাবে ফিল করা যেত না। আমি হয় কারও ছেলে, নয়তো ভাই, নয়তো দাদা।

কিন্তু ওখানে তো তোরা নেই। হঠাৎ মনে হল অথৈ জলে পড়ে গেছি। তারপর ধীরে ধীরে মনে হতে লাগল, এই পৃথিবীটা অনেক বড় এবং এখানে তোরা ছাড়াও অনেক মানুষ আছে। ঠিক বোঝাতে পারব না। হোয়েন আই অ্যাম অন মাই ওন তখন অন্যরকম ফিলিং হয়।

তোর ভাল লাগছে ওখানে?

খুব।

আমাদের ভুলে যাচ্ছিস না তো!

আরে নাঃ। দিদি, দাবা খেলবি?

এত রাতে?

আজ ঘুম আসবে না। আয় এক পাট্টি খেলি।

ঠিক আছে।

দাবায় দু'বার হেরে যখন মাঝরাতে ঘুমোতে গেল ঝুমকি তখন তারও ঘুম এল না। আজকাল মাঝে মাঝে এটা হয়। বুকের ভিতরে একটা হায়-হায়, শূন্য ভাব ভর করে থাকে। সে কি ধরা পড়ে গেছে বুবকার চোখে? তার গভীর গোপন একটা অন্তর্জগতের ঘটনা কি ছায়া ফেলছে তার মুখে বা শরীরে?

অনেকক্ষণ জেগে শুয়ে রইল ঝুমকি। কাউকে সে কখনও বলতে পারবে না। মরে গেলেও না। চারুমাসি বিদেশে চলে যাবে, তারপর আর ও বাড়ি যাওয়া হবে না। আর হয়তো দেখাই হবে না হেমাঙ্গর সঙ্গে।

না হোক। দেখা হয়েই বা কী হত? হেমাঙ্গ এখনও ডুবে আছে আকণ্ঠ রশ্মির প্রেমে। রশ্মি বিয়ে করেছে শুনে প্রায় বিবাগী হয়ে গ্রামে গিয়ে থানা গেড়ে ছিল। আবার ফিরেছে বটে, কিন্তু মেয়েদের আর লক্ষ্যই করে না সে। হয়তো মেয়েদের ঘেন্নাই করে মনে মনে।

করুক, তাতে আর ঝুমকির কী?

পরদিন বুবকা সারাদিন বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখা করে এল। রাতের বেলা আড্ডা হল একটু। ভোর হতে না হতেই চলে গেল খড়্গপুর। বাড়ি ফের ফাঁকা। এই ফাঁকটা আর ভরাট হবে না সহজে। ফাঁকাই থেকে যাবে।

ঝুমকি চাকরি ছেড়েছে। কম্পিউটার শেখা শেষ হয়েছে। মাঝে মাঝে প্র্যাকটিস করতে চারুশীলার বাড়ি যায়। চারুশীলা গোছগাছ শুরু করেছে। বলে, জানিস, আমার আর এ দেশ ভালই লাগছে না।

তুমি তো সুব্রতদার সঙ্গে বিদেশেই থাকতে পারো।

বিদেশেও কী বেশি দিন ভাল লাগে ভাবিস? আমার মনটাই একটু চঞ্চল ধরনের। যখন ভাল না-লাগে তখন কোথাও ভাল লাগতে চায় না। আর নিজের ইচ্ছেয় জায়গা বদল করলে তো হবে না। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো আছে।

ওদের বিদেশেই পড়াও না কেন?

সুব্রত সেটা পছন্দ করবে না। মেয়েটাকে এবার আমেরিকায় ভর্তি করে দেবো ভাবছি। সুব্রতর খুব ইচ্ছেও ছিল। কিন্তু এখন বলছে, নাঃ, ওসব দেশে না রাখাই ভাল। কী যে করব বুঝতে পারছি না।

তোমার যে কত সমস্যা।

আমিই আমার সমস্যা।

আর একদিন ঝুমকি গিয়ে কম্পিউটার খুলে বসেছে, চারুশীলা এসে হঠাৎ বলল, হ্যাঁ রে, তুই বিয়ে করছিস না কেন বল তো!

ঝুমকি অবাক হয়ে বলে, বিয়ে? এখনই কিসের বিয়ে?

এটাই তো বয়স।

তোমার আমলে ছিল। এখন নয়।

তোর কোনও অ্যাফেয়ার নেই তো?

ঝুমকি লাল হয়ে বলল, থাকলে টের পেতে না?

না। তুই ভীষণ চাপা।

কাজ করতে দাও তো। বড্ড জ্বালাও।

আমাকেও বলবি না?

অ্যাফেয়ার নেই মাসি।

বাজে কথা। তুই বলছিস না।

তোমার কাছে কি কিছু লুকোই?

চারুশীলা অন্য প্রসঙ্গে চলে যাওয়ায় সাময়িক রেহাই পেয়ে গেল ঝুমকি। কিন্তু দু'দিন বাদে আবার কথাটা উঠল। ঝুমকি বড্ড অস্বস্তি বোধ করে প্রসঙ্গটা উঠলেই।

একদিন চারুশীলা করুণ মুখ করে বলল, জানিস আমি আমার ওই পাগলা ভাইটাকে বড্ড ভালবাসতাম। যতই গালাগাল করি আর বকি-ঝুকি ওর মতো সাদা মনের মানুষ হয় না। কিন্তু ও বোধহয় সন্ন্যাসী-ইন্ন্যাসীই হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত।

ঝুমকি অবাক হয়ে বলে, কেন মাসি?

তা যদি জানতুম তা হলে তো হতই। রশ্মি বিয়ে করেছে বলেই কি না জানি না, ও যেন কেমন বারমুখো আর উদাসীন হয়ে গেছে।

ঝুমকির বুকটা ধক ধক করছিল। বলল, ওঁদের মধ্যে কি খুব ভালবাসা ছিল মাসি? আমার তো মনে হয় না।

আমারও তা মনে হয় না। হেমাঙ্গ তো চিরকাল মেয়েদের ব্যাপারে উদাসীন। তবে কি জানিস, হয়তো রশ্মির বিয়েটা ওর পৌরুষে ধাক্কা দিয়েছে। তাই ওরকম হয়ে গেছে। মানুষের ভিতরের কথা কে জানতে পারে বল!

তুমি ভাল করে খোঁজ নাও। এত অনুমান করো কেন?

কি করে খোঁজ নেবো বল তো! হেমাঙ্গ তো কলকাতায় থাকেই না। কখনও হিল্লি-দিল্লি করে বেড়ায়, কখনও গাঁয়ে গিয়ে বসে থাকে। আজকাল নাকি চাষবাস করছে, মাছ ধরছে, আরও কি কি সব করছে। কিছু বুঝতে পারছি না।

ঝুমকি একটু চুপ করে থেকে বলল, ওসব করা তো খারাপ নয়।

কে জানে কী! তবে হেমাঙ্গ বড় পাল্টে গেছে। গত শনিবার এসেছিল। মুখে হাসি নেই, কথাবার্তা নেই। এমন কি ভাল করে খেল না অবধি।

ওঃ। বলে ঝুমকি চুপ করে থাকে।

হেমাঙ্গর সঙ্গে তার আর কবে দেখা হবে তা জানে না ঝুমকি। কখনও দেখা হবে কি? মাঝে মাঝে তার মনে হয়, জীবনের নানা স্রোত, ফেনা, ঘটনা বা ঘটনাহীনতার ভিতর দিয়ে হেমাঙ্গ বহু বহুদূর সরে যাচ্ছে। সে কি কখনও জানবে বা টের পাবে যে একজনের হৃদয় তার জন্য অপেক্ষা করে?

মুখ ফুটে কখনও বলতে পারবে না ঝুমকি। কখনও নয়। কাউকে নয়। কিন্তু হৃদয়ের কথা কি পৌঁছয় না তবু?

৯৭

সে বুঝতে পারছে ধীরে ধীরে এই পৃথিবীর রূপের জগৎ তার চোখের সামনে খুলে যাচ্ছে। খুব ধীরে ধীরে। অফিস আর বাড়ি, টুর আর টাকা তাকে ক্রমে ক্লান্ত করে দিচ্ছিল। টাকার কুমিরদের সঙ্গে দিন-রাত ফন্দি-ফিকির করতে করতে নিজেকে প্রায় কবর দিয়ে ফেলছিল হেমাঙ্গ। সেই কবর থেকে, জীবনের ভার সরিয়ে সে কি একটু একটু করে উঠে আসছে রোদে আর হাওয়ায়? এ কি তার উত্থান? লোকে বলছে, এ তার অধঃপতন, লোকে বলছে, এ তার পাগলামি। একটা লম্বাটে ক্যাটারপিলার গোত্রের সরীসৃপ পোকাকে পেয়ারা গাছের ডালে আর পাতায় অনেকক্ষণ ধরে অনুসরণ করছিল তার চোখ। সবুজ রঙের পোকাটার শুধু দেহযন্ত্রটা লক্ষ করতে করতে বিস্ময়ে বুঁদ হয়ে যাচ্ছিল সে। কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সমাবেশ, কত স্বচ্ছ ও শৌখিন তার চামড়া। শুধু শরীরই তো নয়, ও তুচ্ছ পোকাটারও আছে বিপদ আঁচ করার অ্যান্টেনা, আছে জৈব অনুভূতি, আছে ক্ষুধা ও প্রজনন, হয়তো আছে সন্তান পালন করার মতো দায়। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এইসব পোকামাকড়কে যত দেখে সে ততই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর এই জগৎ তার কাছে উন্মোচিত হয়। এর পরও আছে জীবাণুরা, অনুবীক্ষণ ছাড়া যাদের দেখাই যায় না। অথচ জীবাণুরও আছে ইন্দ্রিয়সকল, আছে বংশবিস্তার, আছে নিজস্ব জগতের অনুভূতি। কি করে এটা হয়? কে ঘটায় এই সমন্বয়? কে আছে এই মরকোচ বা মেকানিজমের পিছনে? এই রহস্যের কূলকিনারা না পেয়েই কি মানুষ অবশেষে ঈশ্বর নামক অলীককে কল্পনা করে নিয়েছিল?

অলীক! হবেও বা। তবে হেমাঙ্গ আজকাল এত সহজে কিছুই উড়িয়ে দিতে পারে না। আজকাল সে নদীর ধারে বসে কত ভাবে। কত আকাশ-পাতাল চিন্তা করে। কোথাও পৌঁছায় না তার চিন্তা, কিন্তু হেমাঙ্গর তাড়া নেই। পৌঁছনো কি একান্ত দরকার? থাকুক না কিছু অধরা!

আজকাল আসতে হয় উইক এন্ডে। গাঁয়ে বেশি পড়ে থাকলে বিপদ আছে। মা রাগ করে। ছেলে বিবাগী হয়ে যাচ্ছে এই ভয়ে মা কোমর বেঁধে লেগেছে তাকে গৃহবাসী করতে। পাত্রী দেখা চলছে খুব।

হেমাঙ্গ মাঝে মাঝে একা একা হাসে। তাকে পাত্রীস্থ করে কোনও লাভ হবে কি? বরং বউ হয়ে যে আসবে সেই মেয়েটা কষ্ট পাবে। হেমাঙ্গ কি সংসারী হতে পারবে কখনও? জগতের বিশালত্বে সে একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে, এই ছড়ানো হেমাঙ্গকে কি আবার গুটিয়ে এনে ছোট্টো কৌটোর মতো সংসারে পুরে রাখা যাবে? তা হলে কি বাঁচবে হেমাঙ্গ?

বাঁকা মাঝে মাঝে তার কাছে এসে বসে থাকে। খুব ঠাহর করে লক্ষ করে তাকে। সতর্ক চোখে তাকে জরিপ করতে করতে বলে, সন্নিসী হওয়াই কপালে লেখা আছে আপনার।

তাই নাকি?

তা নয় তো কি?

এ ঠিক সন্ন্যাস নয় বাঁকা মিঞা। নৌকো বার-দরিয়ায় গিয়ে পড়েছে। সহজে ফিরবে না। সেটা সন্ন্যাস নয়, বাউণ্ডুলে হয়ে যাওয়া বলতে পারো।

সেটাই কি ভাল?

জীবনটা যে কত বড় তা বোঝো?

আমাদের বোঝায় কেডা?

ও বোঝানো যায় না, আপনি বুঝতে হয়।

তা বটে। আমাদের বুঝও যে বড্ড কম। তবে আপনার বড্ড বেশি।

আমার গাঁয়ের বাস তো মার কাছে লাগিয়ে ভাঙিয়ে প্রায় তুলেই দিয়েছ তুমি। এর পর আরও কি চাও?

গাঁয়ের বাস তুলে দিচ্ছি আপনার ভালর জন্যই। এর পর একেবারে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে যাবেন যে। গাঁয়ের লোক আপনাকে আড়ালে কি বলে জানেন? বলে পাগলাবাবু, অবশ্য আদর করেই বলে, আপনার ওপর কারও কোনও খার নেই। তবে ওসব শুনতে কি আমার ভাল লাগে, বলুন।

হেমাঙ্গ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমি তো পাগলই। লোকে যখনই জীবনের সবচেয়ে সত্য বস্তুর সন্ধান পায় তখনই কি করে যেন লোকের চোখে পাগল বা ক্ষ্যাপা বলে মনে হয় লোকটিকে। তা সে লোকে যাই বলুক আমার কিছুই যায়-আসে না।

আরও একটা কথা। আপনার বাড়ির লোকের ধারণা হয়েছে, আপনি এই গাঁ-গঞ্জেই একটা বিয়েসাদি করে বসবেন হয়তো। তা হলে ষোলো কলা পূর্ণ।

হেমাঙ্গ একটু অবাক হয়ে বলে, তুমি এটাও মাকে বুঝিয়েছ নাকি? তুমি তো মহা বিপজ্জনক লোক!

জিব কেটে বাঁকা বলে, মিছে কথা বলব আপনার নামে? ওসব নষ্টামো করতে যাব কেন? কিছু বলিনি। তবে আপনাকে একটা বিষয়ে একটু সাবধান করে দিই। নগেন সামন্তর মেয়েটা বড্ড ঘুরঘুর করছে আজকাল। অত আসকারা দেবেন না।

পারুল! সে তো পড়তে আসে মাঝে মাঝে।

বয়সের মেয়ে, বুঝলেন না! গাঁ-গঞ্জ জায়গা, পাঁচটা কথা উঠে পড়বে।

হেমাঙ্গ অবাক হয়ে বলে, সে তো বাচ্চা মেয়ে! তোমরা কিরকম মানুষ বলো তো! ওটুকু মেয়েকে নিয়েও কথা হয়?

টুকু আবার কি? ষোলো বছর বয়স হল।

ধুস! বারোর বেশি হতেই পারে না।

আপনার কি দেখার চোখ আছে? অত উদাস থাকলে ওরকমই হয়। ও মেয়ের বয়স পনেরো পুরে এই ষোলো চলছে। সন্ধের পর টর্চ বাতি নিয়ে পড়তে আসার অত কি গরজ? আর পড়া মানে তো হাঁ করে আপনার মুখের দিকে চেয়ে থাকা। আপনি আর ওসব একদম ঘাড়ে নেবেন না।

হেমাঙ্গ একটু অসহায়ভাবে চুপ করে রইল। পারুল তার কাছে পড়তে আসছে মাত্র মাসখানেক হল। তাও সপ্তাহে মাত্র দু'দিন, শনি আর রবিবার, যখন হেমাঙ্গ এখানে আসে। নগেন সামন্ত নিজেই নিয়ে এসে বলেছিল

একদিন, বাবু, আমার এ মেয়েটা লেখাপড়ায় ভাল। সবাই বলে, মাথা আছে। ক্লাসে ফার্স্টও হয়। যদি আপনি একটু দেখিয়ে দেন তাহলে আরও ভাল করবে।

সেই থেকে একটু করে পড়ায় হেমাঙ্গ। মেয়েটার মাথা সত্যিই ভাল। গাঁয়ে-গঞ্জে— কে জানে কেন— ছেলেমেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার চাড় এবং মেধা নেই। এই মেয়েটার আছে দেখে হেমাঙ্গ একটু উৎসাহ বোধ করেছিল। পারুল দেখতে খুব সাদামাটা গেঁয়ো আর পাঁচটা মেয়ের চেয়ে সামান্য আলাদা চেহারার। চোখে বুদ্ধির দীপ্তি আছে। কিন্তু তার বয়স এতই কম যে তাকে পুরুষের চোখ দিয়ে কখনও লক্ষই করেনি হেমাঙ্গ।

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ভুলটা আমারই। গাঁয়ের মেয়ের বয়স আর শহরের মেয়ের বয়সের যে আলাদা হিসেব সেটা মনে ছিল না, বুঝলে বাঁকা?

আপনার বরাবরই হিসেবের ভুল। অথচ আপনি নাকি হিসেবের ওস্তাদ।

হেমাঙ্গ একটু ভয়ে ভয়ে বলে, গাঁয়ে কি পারুলকে নিয়ে কথা উঠেছে নাকি? না আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?

বাঁকা মিঞা ঘাড় চুলকে বলল, কথাটা ওঠেনি, তবে উঠে পড়বে। আমি আপনাকে আগাম একটা হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলাম। সামন্তকেও বলে দিয়েছি যেন বাবুকে আর ডিস্টার্ব করা না হয়।

হেমাঙ্গ হেসে বলল, তুমি আমার মাকেও ছাড়িয়ে গেলে দেখছি।

আমি হলাম আপনার লোকাল গার্জেন। ঠাকরুন তাই বলে দিয়েছেন।

তা হলে তো কথাই নেই।

আপনি কিন্তু আমার প্রথম কথাটার জবাব দেননি। বলছি এ ভাবেই কি চলবে? সাধু-সন্ন্যাসীই হয়ে যাবেন শেষ অবধি?

তা আর হতে পারলাম কই। সাধুরা তো জপতপ করে, আমি তো তা করি না। আমি শুধু পৃথিবীটা দেখি। চার দিকে কত রূপ বলো তো! ছোট্ট একটা পোকা, একটা ফুল, একটা পাতার মধ্যেও কত সূক্ষ্ম মেকানিজম আর এসথেটিক্স! তুমি দেখতে পাও না?

তা পাই, তবে আপনার মতো অমন মজে যাই না। শুধু দেখে বেড়ালে কি জীবন চলে? এবার একটু সংসারী হওয়ার কথাও ভাবুন।

হেমাঙ্গ শুধু হাসল, কিছু বলল না। বাঁকা মিঞা আরও কিছুক্ষণ সদুপদেশ দিয়ে উঠে গেল। লোকটা যে তাকে ভীষণ ভালবাসে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু ওর ভালমন্দের বোধটা অন্যরকম।

গতকাল শুক্রবার ছিল। অফিস থেকে দুপুরবেলা বেরিয়ে সে সোজা চলে এসেছে এখানে। এখানে যেন গাছপালা, পোকা-মাকড়, বাতাসটা অবধি তার জন্য অপেক্ষা করছিল। এসব কথা সে কাকে বোঝাবে? এখানে আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা, জলের লহরী, পাতার কাঁপন, উড়ন্ত পোকার পাখনায় আলোর বর্ণালী সে ছাড়া আর কে দেখবে? এখানে এসে সে কত শিখেছে, কত কি বুঝতে পেরেছে, অনুভূতি হয়েছে কত সূক্ষ্ম! তাকে কেন পাগল ভাবে লোক?

উঠোনে নতুন শীতের সকালবেলার রোদ চাদরের মতো বিছিয়ে পেতে দিয়ে গেছে কে। সেই চাদরে গাছপালার ছায়ার নানা নকশা। উঠোন নিকোনো, তকতকে। এ সবই করে বাসন্তী।

বাসন্তীর কথা ভাবতে ভাবতেই বাসন্তী চলে এল। একদিন বাসন্তীকে বলেছিল হেমাঙ্গ, হ্যাঁ রে, অত নোংরা উলোঝুলো হয়ে থাকিস কেন? পরিষ্কার থাকতে পারিস না? সেই থেকে বাসন্তী এখন ফরসা শাড়িই শুধু পরে

না, চুল বাঁধে, মুখে বোধ হয় পাউডারও দেয়, তারপর আসে।

আজ এসেই বলল, ও দাদা, গত সোমবার থেকে ব্রাশ আর পেস্ট দিয়ে দাঁত মাজছি, তা জানো? কী ভাল গো স্বাদটা! মুখটা যেন মিষ্টি হয়ে যায়।

হেমাঙ্গ একটু হেসে বলল, তুই বোধ হয় দাঁত মাজতে গিয়ে পেস্ট একটু খেয়েও ফেলিস!

লজ্জা পেয়ে বাসন্তী বলে, দু-একবার কি আর গিলে ফেলিনি! তবে ব্রাশে বাপু মুখে বড় জ্বালা করে প্রথমটায়। ছড়ে গিয়েছিল। এখন অবশ্য সয়ে গেছে। মুড়ি এনেছি, এই দেখ। সকালে ভাজিয়ে আনলাম সুবাসীর বাড়ি থেকে।

এই বলে একটা প্ল্যাস্টিক ব্যাগ তুলে তাকে দেখায় বাসন্তী।

হেমাঙ্গ নিস্পৃহ গলায় বলে, চা কর।

লহমায় চা করে নিয়ে এল বাসন্তী। সঙ্গে গরম মুড়ি, একটু তেল আর আদাকুচি দিয়ে মাখা, ওপরে কয়েক দানা বাদাম ছড়ানো। বাসন্তী রোজ সকালে তার সামনে বসে চা খায় আর আগড়ম-বাগড়ম বকে।

তোমার মুখখানা আজ শুকনো দেখাচ্ছে কিন্তু দাদা।

হেমাঙ্গ গভীর চিন্তামগ্ন ছিল, বলল, হুঁ।

আজ কী খাবে বলো তো!

খাওয়ার এখনও দেরি আছে। অত তাড়া দিস না।

জোগাড়যন্তর তো করতে হবে। ফুলু বেলা দশটা নাগাদ মাছ দিয়ে যাবে। শুধু মাছের ঝোল আর ভাত করলে হবে? সঙ্গে একটা ভাজাভুজি করে দেবোখন। হবে? বলো না।

খুব হবে।

বাসন্তী উঠে গেল। তার অনেক কাজ এখন। ঝাঁটপাট, বাসন মাজা, নিকোনো, বিছানা তোলা। বাসন্তী গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে কাজ করে, দাওয়ায় বসে শুনতে পায় হেমাঙ্গ। ধীরে ধীরে উঠে সে চটিটা পরে বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে। ইট বাঁধানো বিচ্ছিরি ভাঙাচোরা রাস্তাটা ধরে সে গাঁয়ের মধ্যে খানিকটা হেঁটে যায়। যত দিন যাচ্ছে তত লোক বাড়ছে। বছরটাকের মধ্যে ঘাটপাড়ে নতুন নতুন কয়েকটা দোকান হল। খুবই দীন দোকান। তবু তো দোকান। মানুষ বাড়ছে, ফাঁকা জায়গা ভরাট হচ্ছে, অরণ্য বা চাষের জমি কেড়ে নিচ্ছে মানুষের বসত আর রুজিরোজগার। কৃষ্ণজীবন লড়াই করছেন বটে, কিন্তু লড়াইটা থেকে যাচ্ছে ওপর মহলে। এখনও সেই লড়াইয়ের কোনও প্রভাব এসে পড়েনি এলাকার এইসব মানুষের জীবনযাপনে।

হাঁটতে হাঁটতে বসতি ছাড়িয়ে পতিত জমি আর আগাছার জঙ্গলে এসে পড়ল হেমাঙ্গ। নিত্যই সে নতুন নতুন জায়গা আবিষ্কার করে। একটা করে নামও দেয়। তারপর সেই দেওয়া নাম ভুলেও যায়।

ভাঙাচোরা জমি হঠাৎ খাদের মতো ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে। নিচে ক্ষয়া জমি, ঘাসপাতা, কিছু অখ্যাত গাছ। তেমন শ্রী নেই জায়গাটার। তবু সকালের রোদের ঐশ্বর্যে কিছু ঝলমল করছে। ঢালুর ধারে একটু ঘাস-জমি খুঁজে নিয়ে সাবধানে বসল হেমাঙ্গ। আজকাল সে আর সুন্দর জায়গা খোঁজে না, হতশ্রী জায়গাতেও সৌন্দর্যের সন্ধান করে। আজকাল এটাই তার হবি। তার জগৎ অনেক বড় হয়েছে।

পাখি ডাকছে। একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে উত্তর থেকে। আজ হেমাঙ্গর মন ভাল নেই। আজ হোক, কাল হোক, তাকে ঘরবন্দী করার চেষ্টা একদিন ফলবতী হবেই হয়তো। নিজেকে সে আর বিশ্বাস করে না। রশ্মির

প্রেমে পড়ে বিয়ে প্রায় করেই ফেলেছিল আর কি। কী যে হত তা হলে। ভাগ্যিস রশ্মি বিলেতে ফিরে যাওয়ার বায়না ধরেছিল। ওই শর্ত উপেক্ষা করলে আজ রশ্মি তার বউ হয়ে যেত। কোথায় থাকত তার এই স্বাধীনতা?

থেকে থেকে একটা বিশ্রী পচা গন্ধ আসছিল। কুকুর বেড়াল কিছু একটা মরে পচছে কোথাও কাছেপিঠে। এই গন্ধটার মধ্যে কোনও সৌন্দর্য আবিষ্কার করার চেষ্টা বৃথা। গোঁ ধরে খানিকক্ষণ বসে থেকে উঠে পড়ল সে। হাঁটতে হাঁটতে নদীর বাঁধে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নদী তার অদ্ভুত লাগে।

পৃথিবীর সব সভ্যতা, সব বড় বড় নগরের পত্তন হয়েছে কোনও না কোনও নদীর ধারে। নদী ছাড়া কোনও মহানগর নেই। কারণটা হয়ত নৌবাহনের সুবিধে। কিন্তু নদী হেমাঙ্গকে পাগল করে দেয়। নদীর ধারে এসে দাঁড়ানোমাত্র তার চোখ দুটো মুগ্ধ আর নিষ্পলক হয়ে গেল।

মন কেন ভাল নেই তার? কিছুতেই বুঝতে পারছে না হেমাঙ্গ। ইদানীং মাঝে মাঝে এটা হয়। মনটা কেমন বিগড়ে বসে থাকে। খুব অস্থির আর হতাশ লাগে তখন। কারণ ছাড়া কিছুই হয় না। মন খাবাপেরও কারণ একটা আছেই। কিন্তু কেন, ধরতে পারে না হেমাঙ্গ?

ঘুরে ঘুরে, অনেকটা হেঁটে, অনেকের সঙ্গে কথাটথা বলে সে যখন ফিরল তখন রান্না সেরে হাঁ করে বসে আছে বাসন্তী।

এই তোমার ফেরার সময় হল? ক'টা বাজে বলো তো! দেড়টা। এর পর কখন চান করে খাবে? অবেলা হয়ে যাবে না?

হেমাঙ্গ একটু হাসল, অত হুড়ো দিস না। ছুটির দিনটা একটু আমার মতো থাকতে দে।

আমার খিদে পায় না নাকি?

খেলেই পারতিস।

ও-বাবা! তোমার খাওয়া হয়নি আর আমি রাক্ষুসী গিলতে বসব? যাও চান করে এসো গে।

একটু চা খাওয়াবি না?

চা? উঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না। বউ হলে তাকে জ্বালিয়ে খাবে বাপু।

বাসন্তী চা করে দিল অবশ্য। স্নান করে আসার পর ভাত বেড়ে দিল। তারপর বলল, হ্যাঁ দাদা, আমার কিন্তু একজনকে খুব পছন্দ।

অন্যমনস্ক হেমাঙ্গ মুখ তুলে বলল, কাকে পছন্দ হল আবার? তোর তো এখন একটা বর আছে।

আহা, আমার কথা বললাম নাকি?

তবে কার কথা?

তোমার কথা গো! তোমার জন্য একটা পাত্রী আমার পছন্দ হয়েছে খুব।

যাক বাবা। আমি ভাবলাম তোরই বোধ হয় আবার কাউকে পছন্দ হল।

আমার কথা বাদ দাও। এই মরদটাও দেখো, কিছুদিন পরই পিঠটান দেবে। ভাবগতিক ভাল নয়। কাজকর্মও তত নেই। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে সারা দিন।

ওরকম লোককে বিয়ে করলি কেন?

না করে কী করব? কোন জজ-ব্যারিস্টার জুটবে এই পোড়া কপালে? এ-সবই জোটে এসে।

ঘরামী না কী যেন বলছিলি!

ঘরামীই। কিন্তু কাজ নেই হাতে।

কোথা থেকে জোটালি?

ঘাট পেরোনোর সময় ভটভটিতে আলাপ হয়েছিল।

ব্যস! অমনি বিয়ে করে বসলি?

অত অবাক হয়ো না তো। ওরকম হয়। আমাদের সব সয়ে গেছে।

হেমাঙ্গ মাথা নেড়ে বলে, এটা কিন্তু ভাল নয়। বিয়ে কি এত সহজ? জলভাতের মতো? আমার তো একটা বিয়ের কথা ভাবতেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

তোমার আবার সবতা'তেই বেশি বেশি।

কী যেন বলছিলি?

সেই রোগা মেয়েটা এসেছিল না, সে কিন্তু খুব সুন্দর!

কোন রোগা মেয়েটা?

ঝুমকি গো!

হেমাঙ্গ একটা বিষম খেল। তারপর বলল, ওঃ, তাকে বুঝি তুই খুব সুন্দর দেখিস?

সুন্দর নয়?

হেমাঙ্গ ভাতটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, তাতে আমার কী?

ওকে তোমার পছন্দ নয়?

পছন্দ করে কী করব রে? সে তো আর আমাকে পছন্দ করেনি।

কী করে বুঝলে?

ওসব বুঝতে কি দেরি হয় রে।

তার বুঝি কেউ আছে?

থাকতেই পারে।

আমার মনে খুব ইচ্ছে, ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে হোক। রশ্মিও খুব ভাল ছিল, কিন্তু বড্ড মেমসাহেবের মতো দেখতে।

তাকে বুঝি তোর পছন্দ ছিল না?

ছিল। তবে কেমন যেন একটু বিলিতি গন্ধ। এ মেয়েটা কেমন আটপৌরে।

হেমাঙ্গ হেসে বলে, আটপৌরে মানে জানিস?

ওই কথার কথা একটা।

খাওয়া সেরে একটু উঠোনের রোদে চেয়ার পেতে বসে থাকে হেমাঙ্গ। বাসন্তী চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরে অবধিও তার কথাটা কানে বাজতে থাকে হেমাঙ্গর। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাত্র।

চেয়ারে বসেই ভাতঘুমে কিছুটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল সে। হিজিবিজি স্বপ্ন দেখছিল। তাদের বিডন স্ট্রিটের বাড়ির পাশেই নুটুবাবু বলে একজন থিয়েটারের লোক থাকে। পাড়ার লোকে বলে, নুটুবাবু নাকি মেয়ের দালাল। স্বপ্ন দেখল, সেই নুটুবাবু বিয়ে করে ফিরেছেন। সঙ্গে নতুন বউ নিয়ে গাড়ি থেকে নামছেন। হেমাঙ্গ

দেখল নতমুখী বউটি ঝুমকি। হেমাঙ্গ চেঁচাতে লাগল, ঝুমকি! পালিয়ে যান, এ লোকটা ভাল নয়! ঝুমকি তার দিকে চেয়ে একটু হাসল।

কে জানে কেন স্বপ্ন দেখে মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল তার।

পরদিন সারাক্ষণ মনটা বিগড়েই রইল। একটুও ভাল লাগল না। বিকেলের দিকে কলকাতা রওনা হল সে।

সোমবার অফিস করে হঠাৎ অনেকদিন বাদে সোজা গাড়ি চালিয়ে চলে এল চারুশীলার বাড়ি।

যাক বাবা, এতদিনে আমাকে মনে পড়ল? দাঁড়া শাঁখ-টাখ বাজাই।

হেমাঙ্গ একটু হাসল, গরিবদের কথা ভাবিস তা হলে?

তুই গরিবদের চেয়েও খারাপ। তুই একটা ইডিয়ট।

তাও বটে, এখন ভাল-মন্দ কিছু খাওয়া তো!

কেন, ভালমন্দ খাওয়ানোর জন্য আমি কেন? বিয়ে করে বউ আন, সে খাওয়াবে।

বউরা কি ভালমন্দ খাওয়ায়? ওরা তো আটপৌরে।

ইস, কথা শিখেছে। আটপৌরে!

হ্যাঁ রে, ঝুমকি কোথায় বল তো!

৯৮

লোকটা বিনীতভাবে নমস্কার করে বলল, আপনি এই গ্রামের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, আমরা তার কী প্রতিদান দিতে পারি? কত সামান্য আমরা। এই গ্রামের কোনও গৌরব কখনও ছিল না। আপনার সুবাদে আজ আমরা বলে বেড়াই এ হল কৃষ্ণজীবন বিশ্বাসের গ্রাম।

কৃষ্ণজীবন অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে বলল, গৌরব! গৌরবের কি আছে? আমি সামান্যই করতে পেরেছি। কত কী পারিনি।

আপনার কৃতিত্ব কতখানি তার পরিমাপ করার মতো শিক্ষাও তো এ গাঁয়ের মানুষদের নেই। তারা শুধু জানে, কৃষ্ণজীবন বিশ্বাস এখন মস্ত মানুষ। তবে আমি আপনার বইখানা পড়েছি। মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে, মনটা যেন কেমন হয়ে যায়। অদ্ভুত আপনার ভাষা, তেমনি পর্যবেক্ষণ।

কৃষ্ণজীবন খুশি হয়ে বলল, আমার বই আপনি কোথায় পেলেন? এ দেশে তো বিশেষ পাওয়া যায় বলে শুনিনি।

লোকটি অমায়িক হেসে বলে, পেপারব্যাক এডিশন বেরোলে হয়তো আসবে। এখনও আসেনি। তবে আমার এক ভাগ্নী নিউ জার্সিতে থাকে। তাকে আপনার বইটির কথা লিখেছিলাম। সে নিয়ে এসেছিল।

একটা তৃপ্তির শ্বাস ছাড়ল কৃষ্ণজীবন। সে খ্যাতি চায় না, প্রচুর টাকাও করতে চায় না, সে চায় তার কথা লোকে শুনুক, বুঝুক। সে তো এই পৃথিবীর মঙ্গল চায়, মানুষের জন্য চায় একটি সবুজ দূষণমুক্ত পৃথিবী। সে চায় দোলনের নিরাপদ বড় হওয়া। ভাবীকালের মানুষেরা যেন তাদের অভিশাপ না দেয়।

লোকটি বলল, আপনার বাবাকে গত তিন দিন ধরে আমি বইয়ের বিভিন্ন অংশ অনুবাদ করে শুনিয়েছি। উনি খুব খুশি হয়েছেন।

কৃষ্ণজীবন আবেগে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। বাবাকে যে এ বইটির কিছু অংশ শোনানো দরকার এটাই তার মনে হয়নি। সে গাঢ় কণ্ঠে বলল, বড় ভাল করেছেন। কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেবো!

কী যে বলেন! এই বইটির কথা আমি অনেককে বলেছি। কিন্তু গ্রামের লোক তো ইংরিজি পড়তে পারে না। আপনি বরং এর একটা বাংলা ভাষ্য বের করুন।

কৃষ্ণজীবন ম্লান হেসে বলে, বাংলা এডিশন বেরোলেও গ্রামের লোকে পড়বে না। প্রথমত, তাদের বই পড়ার অভ্যাস নেই, দ্বিতীয়ত তাদের বই কেনার মতো সামর্থ্য নেই।

লোকটি মাথা নেড়ে বলল, ঠিক কথা। তবু বলি, ধীরে ধীরে এই বইয়ের কদর বাংলাতেও হবে। আমাদের গ্রামগুলোতে সভ্যতার কোনও খবরই পৌঁছতে চায় না। বড্ড পিছিয়ে আছে সব কিছু। তবু যদি লাইব্রেরিতে এক-আধ কপি করে রাখা হয় তা হলে এক-আধজনও তো পড়বে।

কৃষ্ণজীবন একটু হেসে বলল, আপনি এ বইয়ের প্রচার নিয়ে ভাববেন না। এ দেশের লোক আজ পর্যন্ত কারও কোনও শিক্ষাই নেয়নি। আমারটাও নেবে না। ভাল কথা শোনে, বুঝতেও পারে, কিন্তু কাজের সময় পাশ কাটিয়ে যায়।

লোকটি বিনীত হেসে বলে, তবু কি হাল ছাড়লে চলবে?

কৃষ্ণজীবন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমার প্ল্যান কী ছিল জানেন? গান, যাত্রা, নাটক, কবিগানের ভিতর দিয়ে এ সব মানুষকে শেখাবো। গাছ কেটো না, পৃথিবীকে দূষণমুক্ত রাখো। কিন্তু পরে হাল ছেড়েছি। দেখলাম এরা এন্টারটেনমেন্টটা নেয়, শিক্ষাটা সাবধানে মাছের কাঁটার মতো বেছে ফেলে দেয়।

লোকটি এ কথায় যেন একটু চিন্তিত হয়ে কৃষ্ণজীবনের মুখের দিকে চেয়ে রইল। মাত্র কয়েকদিন আগে লোকটির সঙ্গে পরিচয়। পটলের স্কুলের হেডমাস্টারমশাই। বছর দুই আগে চাকরি নিয়ে এসেছে। একটু আত্মভোলা, পড়ুয়া ধরনের মানুষ। আশ্চর্যের বিষয় এঁর লেখাপড়া এবং জ্ঞান বেশ বিস্ময়কর। সতীশ ঘটককে কৃষ্ণজীবনের ভালই লাগে।

সতীশ ঘটক ওপর-নীচে মাথা নেড়ে বলল, হিন্দি সিনেমা আর ভিডিওর অত্যাচারও কম নয়। মানুষগুলোকে বড্ড ভোঁতা করে দিচ্ছে। গ্রামে আজকাল চিন্তাশীল, সচেতন লোক নেই। একটা কালচারাল গ্যাপও ঘটে যাচ্ছে। আপনার মতো মানুষকেই গ্রামে দরকার ছিল। কিন্তু গ্রাম আপনাকে তো কিছুই দিতে পারবে না। না চাকরি, না মর্যাদা।

সতীশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কৃষ্ণজীবন উদাস গলায় বলল, আপনি জানেন না এই বিষ্টুপুর শীতলাতলা আমাকে কত দিয়েছে। আমার জীবনের বোধটাই তৈরি হয়েছিল এখানে। কিন্তু আপনার কথাও মিথ্যে নয়। বিষ্টুপুর আজ আর আমাকে তেমন কিছু দিতে পারে না। তবু বিষ্টুপুর আমার সঙ্গেই থাকে, পৃথিবীর যেখানেই যাই বিষ্টুপুরের সঙ্গে মিলিয়ে সব কিছু দেখি। আপনাকে ঠিক বুঝিয়ে উঠতে পারব না।

আমি বুঝতে পারছি।

বিনয়ী মানুষটি উঠে পড়ল। বলল, আমরা স্কুল থেকে আপনাকে একটা সংবর্ধনা দিতে চাই। কবে আপনার সময় হবে?

কৃষ্ণজীবন মাথা নেড়ে বলল, না। সংবর্ধনা মানেই মানপত্র-টত্র তো! ওসব ভারী কৃত্রিম ব্যাপার। অনুষ্ঠানের দরকার নেই। যদি চান তো আমি একদিন ছাত্রদের মুখোমুখি গিয়ে বসব। কথা বলব।

সতীশ উজ্জ্বল হয়ে বলল, সেটাই ভাল হবে। একটা ডেট দিন। সবাইকে জানাতে হবে, ক্লাসে নোটিশ দিতে হবে।

কৃষ্ণজীবন বলল, কাল আমাদের গৃহপ্রবেশ। পরশু অবধি আমি আছি। পরশুই করুন।

সতীশ ঘাড় নেড়ে "যে আজ্ঞে" বলে চলে গেল।

কৃষ্ণজীবন কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল বৈঠকখানায়।

এ বাড়িতে মোজেইক করা বৈঠকখানা হয়েছে, তাতে সোফাসেট সাজানো হয়েছে, রঙিন টি ভি এসেছে— এ সব প্রায় রূপকথার মতো। তবু হয়েছে। মিথ্যে নয়। এই পরিবর্তনটার কথাই ভাবছিল কৃষ্ণজীবন। তার অতীতের দারিদ্র্য, তার লড়াই, তার কষ্টের বড় হওয়ার ভিতর দিয়ে একটা সাফল্যের পরিণতি এসেছে। কিন্তু এটাকেই কি সফলতা বলে? দরিদ্র থেকে ধনী হয়ে ওঠা? অখ্যাতি থেকে খ্যাতির স্পষ্টতায় আসা? শুধু এইটুকু? কৃষ্ণজীবনের কাছে সফলতার সংজ্ঞা কিছু আলাদা। এখনও কত কী করার আছে তার। এখনও কত কাজ বাকি, কত সিঁড়ি ভাঙতে হবে তাকে। পৃথিবীর মুখ থেকে মৃত্যুর পাণ্ডুরতা যতক্ষণ দূর না হয় ততক্ষণ তার বিশ্রাম নেই, থামা নেই।

গৃহপ্রবেশ বড় করেই হচ্ছে। অনেক লোকের নেমন্তন্ন। টাকাটা কৃষ্ণজীবনই দিচ্ছে। এটুকু সে আজকাল পারে। ডারলিং আর্থ বাবদে সে পনেরো লাখ টাকা পেয়েছে, আরও দশ-পনেরো লাখ এসে যাবে। দ্বিতীয় বইয়ের জন্য প্রকাশক আগাম দিচ্ছে শিগগিরই। কৃষ্ণজীবনের সামনে এখন অভাবিত ঐশ্বর্যের দরজা খোলা। তবু তার মন থেকে বিষণ্ণতা যায় না।

অভাব তাকে দুঃখী করে রেখেছিল ঠিকই, কিন্তু টাকা তাকে কখনোই সুখী করেনি। রিয়ার সঙ্গে এই টাকা নিয়েই অশান্তি হচ্ছিল। দিন কুড়ি আগে রিয়াকে পাঁচ লাখ টাকার চেক দিয়েছিল সে। রিয়ার মুখে হাসি ফুটল, সব অশান্তি দূর হয়ে গেল। টাকার এই আশ্চর্য শক্তি শুধু কৃষ্ণজীবনের ওপরেই কেন যে ক্রিয়াশীল নয়, কে জানে! টাকার খেলায় তার মা-বাবা-রামজীবনের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। শুধু সে কেন পারল না খুশি হতে?

এ প্রশ্নটার জবাব খুঁজতেই যেন বেরিয়ে পড়ল কৃষ্ণজীবন। ডেকে নিল পটল আর গোপালকেও। সকালের আলোয় শীতের বিষ্ণুপুরের কিছু শোভা আছে। ন'পাড়ার মজা দীঘি আমবাগান, বটেশ্বরের বাঁশবনের ভিতরকার সঁড়ি পথটা, জোড়া পুকুর। দেখার চোখ থাকলে এই বিষ্ণুপুরই কত কী দেখাতে পারে। কৃষ্ণজীবনের রূপমুগ্ধ চোখদুটি আজও নষ্ট হয়নি।

পটল বলল, বড় জ্যাঠা, কোনদিকে যাবে?

যেদিকে খুশি চল।

হরিজ্যাঠার ওখানে খেজুরের রস পেড়েছে। খাবে?

কৃষ্ণজীবন হাসল, চল।

হরিহর গুড়ের কারিগর। মেলা খেজুরগাছ আছে তার। সুন্দর মেটেবাড়ি, নিকোনো দাওয়া।

হরিদা আছে নাকি? বলে কৃষ্ণজীবন হাঁক মারতেই হরিহর বেরিয়ে এল। গলায় কণ্ঠি, কপালে তিলক। গায়ে এই শীতেও একখানা বেনিয়ান মাত্র।

ওরেব্বাস রে! কেষ্টবাবু যে! এসো, এসো!

সবাই জানে, কৃষ্ণজীবন এখন মস্ত মানুষ। কতটা মস্ত তার আন্দাজ অবশ্য নেই। কিন্তু যার সঙ্গেই দেখা হয় সে-ই বিস্তর খাতির-টাতির করে। জ্যাঠার এই খাতির খুবই উপভোগ করে পটল। দেখ কেমন একখানা জ্যাঠা আমার! আছে তোমাদের এরকম?

হরিহর উঠোনে মোড়া আর জলচৌকি পেতে দিয়ে বসাল। তারপর রসের হাঁড়ি আর গেলাস এনে রস খাওয়াল। বলল, আজকাল তো আর আসা-টাসা হয় না? খুব নাকি বিলেত-টিলেত ঘুরে বেড়াও?

তা ঘুরি।

বেশ বেশ। আমাদের যে মনে রেখেছে এটাই ভাগ্যি। এক হাঁড়ি নতুন গুড় নিয়ে যেও এবার কলকাতায়। দিয়ে আসব'খন।

রস খেয়ে তারা আবার বেরিয়ে পড়ে।

জ্যাঠা, তুমি এখনও খুব হাঁটতে পারো, না?

তা পারি।

তোমার সঙ্গে হাঁটায় পাল্লা দেওয়া কঠিন কাজ।

কৃষ্ণজীবন একটু হাসল।

খানিকক্ষণ বাদে পটল হঠাৎ বলল, জানো তত বড় জ্যাঠা, আজকাল আমি ক্লাসে ফার্স্ট হই।

কৃষ্ণজীবন হঠাৎ থমকে গিয়ে বলল, তাই নাকি? কই, কেউ বলেনি তো আমাকে!

আমার লেখাপড়ার কথা বাড়িতে কেউ জানেই না। জিজ্ঞেসও করে না। দাদু কিছুদিন পড়াতো। আজকাল নিজেই পড়ি। হিমাদ্রি স্যার আমার রেজাল্ট দেখে কি বলেছে জানো? বলেছে, এও কৃষ্ণজীবনের মতো হবে।

তোকে কেউ পড়ায় না?

না তো! এখন নিজেই পড়ি। শক্ত লাগলে হেডস্যার বা অন্য সব স্যারের কাছে পড়া বুঝে নিই।

কৃষ্ণজীবন একটু ভেবে বলল, কোন ক্লাস হল তোর?

নাইন।

ওরে বাবা, তুই তো বড় হয়ে গেছিস।

পটল হাসল, বড়ই তো।

কত লম্বা হয়েছিস বল তো!

মাপিনি তো! তবে সাড়ে পাঁচ ফুট বোধহয়। তুমি কিন্তু খুব লম্বা। আমি অত লম্বা হবো না বোধহয়।

খেলিস?

হ্যাঁ। ফুটবল, ক্রিকেট। স্পোর্টস-এও প্রাইজ পাই। তুমি পেতে?

কৃষ্ণজীবন হাসল, পেতাম। তবে তখন ভাত জুটত না, বেশি দৌড়ঝাঁপ করতে সাহস হত না, পাছে খিদে পেয়ে যায়। ওই খিদের ব্যাপারটা থাকা ভাল, বুঝলি? খিদে মরে গেলে জীবনটা আলুনি হয়ে যায়।

বুঝেছি।

খিদে কিন্তু নানারকম আছে। যত বড় হবি, টের পাবি।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে হেঁটে তারা একটা পুকুরের ধার পেরিয়ে গেল। কৃষ্ণজীবন জলের দিকে চেয়ে বলল, সাঁতার জানিস?

হ্যাঁ।

এই পুকুরটায় আমি সাঁতার শিখেছিলাম, মনে আছে।

বিস্ময় আর আনন্দে পটল বলে উঠল, আমিও তো এটাতেই শিখেছি জ্যাঠা।

কৃষ্ণজীবন হঠাৎ প্রশ্ন করে, জল তোর কেমন লাগে?

জল! জল খুব ভাল লাগে।

বাঁ ধারে একটা সজনেগাছে বৃষ্টিধারার মতো অজস্র কচি সজনে ঝুলে আছে। কৃষ্ণজীবন দৃশ্যটা দাঁড়িয়ে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর স্বগতোক্তির মতো বলল, জল আর মাটি, মাটি আর জল! কত কী করতে পারে।

বড় জ্যাঠাকে খানিকটা বুঝতে পারে পটল, অনেকটাই পারে না। এই যে জ্যাঠা কেমন আনমনা আর বিষন্ন হয়ে গেল, কেমন গুটিয়ে পড়ল নিজের একটা অদৃশ্য খোলের মধ্যে, এই জ্যাঠাকে বুঝতে পারে না পটল। তবে তার ঠিক জ্যাঠার মতোই হতে ইচ্ছে করে।

কৃষ্ণজীবন হঠাৎ প্রশ্ন করে, লাঙল চালাতে পারিস?

না। কখনও চালাইনি।

শেখা ভাল। মাটির সঙ্গে একটা বুঝ হয়।

আচ্ছা জ্যাঠা।

গাছ চিনবি, বীজ চিনবি, ঋতুচক্র চিনবি, খনার বচন শিখবি। পাখি, পোকামাকড় এ সব লক্ষ করিস? গাছপালা?

একটু-আধটু।

একটু-আধটু নয়, ভাল করে। যা করবি ভাল করে করবি। শুধু বই পড়লে শেখা হয় না। জীবন থেকেই পাঠ নিতে হয়। চারদিকে তোর কত মাস্টারমশাই দেখেছিস? ওই রোদ, আকাশ, গাছপালা, প্রজাপতি, চড়াইপাখি, সব তোর মাস্টারমশাই। পাঠশালা সাজিয়ে বসে আছে।

পটল হাসল, বুঝেছি।

কৃষ্ণজীবনও হাসল। বলল, আমি সামান্যই পেরেছি। তুই অনেক পারিস।

তুমি কত জানো!

শীতলাতলায় আজ হাটবার। মেলা লোকজন। গিসগিসে ভিড়। কৃষ্ণজীবন ভাইপোদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে হাট দেখল। দর জেনে নিল অনেক কিছুর। তারপর বলল, এখানে বোধহয় একটু সস্তা।

হ্যাঁ জ্যাঠা, এখানে কলকাতার চেয়ে অনেক সস্তা। সবাই বলে।

জিলিপি খাবি? আগে নিরাপদর দোকানে জিলিপি ভাজত, এখনও কি আছে সেই দোকান?

পটল নাক কুঁচকে বলল, আছে। তবে আজকাল আর ভাল নেই। এখন ইন্দ্রনীল মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে ভাল জিলিপি করে।

ইন্দ্রনীল বেশ পরিচ্ছন্ন দোকান। পাকা ঘর, টেবিল চেয়ার আছে।

কৃষ্ণজীবন পটলকে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ রে, এরা শালপাতার ঠোঙায় জিলিপি দেয় না?

না জ্যাঠা, প্লেটে দেয়।

ধুস। শালপাতা না হলে জিলিপি খেয়ে সুখই নেই।

ইন্দ্রনীলের মালিক উমাপদ অবশ্য কৃষ্ণজীবনকে চেনে। সে শশব্যস্তে মান্য অতিথির জন্য শালপাতা নিয়ে এল, যত্ন করে বসিয়ে গরম জিলিপি ভাজিয়ে দিয়ে বলল, কেমন হয়েছে আজ্ঞে।

কৃষ্ণজীবন জিলিপিতে কামড় দিয়ে নিমীলিত চোখে উমাপদর দিকে চেয়ে বলল, আমাকে আপনি-আজ্ঞে করছো কেন? তুমি তো আমার সঙ্গে পড়তে। ক্লাসমেট।

উমাপদ লজ্জায় ঘাড় নিচু করে বলল, সে কবেকার কথা! তুমি এখন কত বড় হয়েছো। তাতে কি সম্পর্ক বদলায়? তোমার ছেলে যদি দেশের প্রধানমন্ত্রীও হয়, তাকে কি আপনি-আজ্ঞে করবে?

তা নয়। প্রথমটায় ভরসা পাচ্ছিলাম না, চিনতে পারবে কি না, মনে আছে কি না।

আমার স্মৃতিশক্তি সাংঘাতিক। কিছু ভুলি না।

উমাপদ বিগলিত হয়ে গেল। বলল, গরম সিঙাড়া খাবে? কড়াইশুটি আর ফুলকপি দিয়ে করে দিচ্ছি।

না উমাপদ, থাক। কত দাম বলো তো জিলিপির?

ও তোমাকে দিতে হবে না। চিনতে পেরেছে এতেই আমার দাম উঠে গেছে।

কৃষ্ণজীবন তার জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা দামী ক্যালকুলেটর বের করে উমাপদর হাতে দিয়ে বলল, এটা রাখো, তোমার কাজে লাগবে।

ও বাবা, এ তো দামী জিনিস।

রাখো। হিসেবের সুবিধে হবে।

উমাপদ খুব লজ্জার সঙ্গে হাসল, আমাদের যা হিসেব তা তো মুখে মুখেই হয়ে যায়। যন্ত্র লাগে নাকি?

ঠিক কথা। ক্যালকুলেটর হাতে থাকলে মানুষ দুইয়ের সঙ্গে দুই যোগ করতেও মাথা ঘামায় না, বোতাম টেপে। যন্ত্র খুব খারাপ জিনিস।

উমাপদ এক ঠোঙা জিলিপি বেঁধে পটলের হাতে দিয়ে বলল, তোর দাদুকে দিস। আগে খুব আসতেন, আজকাল আসেন না।

জ্যাঠা, এখন বাড়ি যাবে?

না না, এখনই কি? চল, এখনও কত দেখার আছে।

৯৯

চারুশীলারা দীর্ঘকালের জন্য বিদেশ চলে যাওয়ার পর একটু ফাঁকা লাগছিল চয়নের। চারুশীলা তার প্রতি খুবই দয়ালু ছিল। যাওয়ার আগে তাকে হাজার দুই টাকা, একগাদা শার্টপ্যান্ট, কলম, ক্যালকুলেটর, সুগন্ধী স্প্রে দিয়ে গেছে। চয়ন এয়ারপোর্টে গিয়েছিল। চারুশীলা খুব কাঁদছিল। কান্নার প্রধান কারণ, তাকে বিদায় জানাতে হেমাঙ্গ আসেনি। যথাসময়ে খবর পেয়েও আসেনি বা কোনও খবরও দেয়নি। তবে গিয়েছিল অনেকেই। ভিড়ে ভিড়াক্কার।

হেমাঙ্গ লোকটাকে চয়ন খানিকটা বোঝে, রোমান্টিক, একা, ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা পছন্দ করে না। তার জীবনে একটা স্থায়ী ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি করতে চেয়েছিল চারুশীলা। ভাল ভেবেই করেছিল। কিন্তু সিদ্ধান্তটা ছিল ভুল। চয়নের বরাবর মনে হয়েছে, হেমাঙ্গর সঙ্গে রশ্মি ঠিক খাপ খাবে না।

এয়ারপোর্টে তাকে আলাদা ডেকে চারুশীলা ধরা গলায় বলল, শোনো চয়ন, হেমাঙ্গ আজ আমাকে সত্যিকারের দুঃখ দিয়েছে। ওকে আমি কতটা ভালবাসি তা হয়তো বোকাটা জানেও না। আমাকে সি-অফ করতে আসেনি বোধ হয় রাগে। তুমি প্লিজ ওর সঙ্গে একটু কাল বা পরশু দেখা করতে পারবে?

পারবো না কেন?

ওর অফিসে আজ ফোন করেছিলাম। ওরা বলল হেমাঙ্গ আউট অফ স্টেশন। কোথায় গেছে বলতে পারল না। এরকম হওয়ার কথা নয়, আজ আমি চলে যাচ্ছি এটা ও ভালই জানে। তুমি ওর সঙ্গে দেখা করে বোলো, আমি খুব দুঃখ পেয়েছি। ভীষণ।

বলব চারুদি, আপনি চিন্তা করবেন না।

আমি আর ওর কোনও ব্যাপারে থাকতে চাই না। বিয়ে করুক বা না করুক, কখনও কিছু বলব না । তা বলে সম্পর্ক কেন তুলে দেবে বলো তো! আমরা পিঠোপিঠি ভাইবোনের মতো মানুষ হয়েছি, আমাকে ভীষণ ভালবাসত ও। কেন যে এরকম হয়ে গেল!

আপনাকে এখনও উনি ভালবাসেন।

চারু মাথা নেড়ে বলে, আর বাসে না, এখন ও অন্যরকম হয়ে গেছে, একেবারে বাউণ্ডুলে। হয়তো সন্ন্যাসী হওয়াই ওর কপালে আছে। সেই জঙ্গলের বাড়িটাতে গিয়ে পড়ে থাকে। শোনো, দরকার হলে তুমি সেখানেও যেও।

যাবো!

ওকে একটু দেখো।

চারুশীলার যে কী গভীর মায়া হেমাঙ্গর প্রতি সেটা বুঝতে পেরে একটু ঠাণ্ডা হল চয়ন। এই ভালবাসাটা তার আর অয়নের মধ্যে নেই। খুব কম পরিবারেই ভাইবোনে এরকম ভালবাসা আছে। তাও চয়ন শুনেছে, হেমাঙ্গ আর চারুশীলা আপন ভাইবোন নয়, পিসতুতো মামাতো। একসঙ্গে বড় হয়েছে মাত্র।

কথা রেখেছিল চয়ন। দু'দিন পর অফিসে ফোন করে জানল, হেমাঙ্গ ফিরেছে, তবে ফের বাইরে গেছে।

আরও দু'দিন অপেক্ষা করল চয়ন। তারপর এক সোমবার হেমাঙ্গকে ধরল অফিসে, টেলিফোনে।

হেমাঙ্গ খুব খুশির গলায় বলল, আরে গ্রেট চয়ন! কী খবর?

আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

চলে আসুন আজ বিকেলে আমার বাড়িতে। ধরুন সাতটা?

যাবো।

রাতের খাবারটা একসঙ্গেই খাবো দু'জনে, কেমন?

না না, তার দরকার নেই।

অত লজ্জা পাচ্ছেন কেন? আমি আজকাল খুব সিম্পিল খাই। টান লাইফ স্টাইল, ফ্রুগাল মিল, আমার পরিবর্তনটা লক্ষ করে অবাক হবেন। চলে আসুন। আড্ডা মারা যাবে।

সাতটার পনেরো মিনিট আগেই পৌঁছে গেল চয়ন। হেমাঙ্গ তখন নিজের হাতে কী একটা রান্না করছিল মাইক্রোওয়েভে, পাশে তার চাকরটিও বেশ ব্যস্ত।

তাকে দেখে সত্যিকারের খুশি হল হেমাঙ্গ। তাকে দেখে খুশি হয় এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম। হেমাঙ্গ তাদের মধ্যে একজন। সে বলল, আরে বাঃ, আপনার চেহারার তো বেশ উন্নতি হয়েছে দেখছি।

চয়ন লাজুক হাসল, কথাটা মিথ্যে নয়। তার চেহারার সম্প্রতি কিছু উন্নতি ঘটেছে।

বসুন বসুন, আগে কি একটু চা বা কফি খেয়ে নেবেন?

না, আমার নেশা নেই।

হালকা কিছু খাবার খাবেন? ইফ ইউ আর হাংরি?

না; চারুদি আমাকে যাওয়ার আগে একটা মেসেজ দিয়ে গেছে।

তাই নাকি? কিরকম মেসেজ?

আপনি সি-অফ করতে যাননি বলে উনি খুব দুঃখ পেয়েছেন, ভীষণ। খুব কান্নাকাটিও করছিলেন।

হেমাঙ্গর মুখ থেকে হাসিটা ধীরে ধীরে মুছে গেল। সে একটু মাথা নেড়ে বলল, চলুন বসি।

সোফা-সেটে সাজানো ড্রয়িং রুমে মুখখামুখি বসে হেমাঙ্গ ধীর গম্ভীর গলায় বলল, খুব কাঁদছিল?

খুব, উনি আপনাকে বড্ড ভালবাসেন।

হেমাঙ্গ মাথা নেড়ে বলে, জানি। খুব ছেলেবেলা থেকেই চারুদি আমাকে সারা দিন কোলেপিঠে করে রাখত। আমি ওর খুব ন্যাওটা ছিলাম। আমাদের বাড়িতে কড়া শাসন আর ডিসিপ্লিনের মধ্যে ওই চারুদিই আমাকে আড়াল করে রাখত। আমি দুষ্টুমি করলে বা অন্যায় কিছু করলে আমার হয়ে নির্বিকারভাবে মিথ্যে কথা বলত। ওর নিজের ভাইবোন বলতে কেউ ছিল না। মা-হারা মেয়েকে ওর বাবা বাধ্য হয়ে আমাদের বাড়িতে রেখে দেয়। সেই থেকে ও আমার নিজের দিদির মতোই। তা ছাড়া ও আমার খুব বন্ধুও। একটু

ডমিনেটিং, কিন্তু চারুদি অত্যন্ত অফ-বিট মেয়ে। লোভ নেই, সঞ্চয় করতে জানে না, টাকা ওড়াতে ভালবাসে, লোকের জন্য করেও অনেক। সবগুলো হয়তো প্লাস কোয়ালিটি নয়, কিন্তু তাতেই ও অফ-বিট। তাই না?

হ্যাঁ । ওঁকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি।

হেমাঙ্গ হেসে ফেলে, শ্রদ্ধা-ফ্রদ্ধা আপনার একটা রোগ। চারুদিকে শ্রদ্ধা করার কি আছে? সি ইজ এ ভেরি গুড ফ্রেন্ড। এরপর হয়তো বলবেন আপনি আমাকেও শ্রদ্ধা করেন। শ্রদ্ধা রোগটা আপনার সারানো দরকার।

চয়ন ফের লাজুক হাসল। বলল, উনি বলে গেছেন, আপনাকে আর ডিস্টার্ব করবেন না।

হেমাঙ্গ একটু হেসে বলল, আপনাকে আর কষ্ট করে মেসেজ দিতে হবে না। বোম্বাইয়ের শাহর এয়ারপোর্টে প্রায় সারা রাত আমি চারুদির অনেক করুণ বিলাপ শুনেই এসেছি।

অবাক হয়ে চয়ন বলে, তার মানে?

চারুদি রওনা হওয়ার আগের দিন আমি বোম্বাই যাই।

ওঃ।

চারুদিকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্যই খবরটা আগে দিইনি। বোম্বাইতে আমার ইনফ্লুয়েনশিয়াল ক্লায়েন্ট আছে। তাদের একজনই আমাকে ট্রানজিট লাউঞ্জে ঢোকার ব্যবস্থা করে দেয়। চারুদি আর সুব্রতদা তো ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠেছিল। আর ছেলেমেয়ে দুটো যা খুশি হয়েছিল তা বলার নয়। ভোরে প্লেনে ওঠার আগে অবধি জোর আড্ডা হয়েছিল।

চয়ন একটা শ্বাস ফেলে বলল, যাক, আপনি একটা খুব ভাল কাজ করেছেন। চারুদি এত আপসেট ছিলেন। তা ছাড়া অনেক দিনের জন্য চলে গেলেন তো!

হেমাঙ্গ ভ্রূ কুঁচকে একটু ভেবে বলল, চারুদিকে যতদূর চিনি, ও বেশি দিন বিদেশে থাকতে পারবে না। ছেলেমেয়েকে ছেড়েও থাকা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। আমার মনে হয় ওর গোটা প্ল্যানটাই ভেস্তে যেতে পারে। ডেভেলপড় দেশগুলোর অবস্থা আমার ভাল বলে মনে হয় না। বড্ড পারমিসিভ। বড্ড বেশি ব্যক্তিস্বাধীনতা, বড্ড বেশি সেক্স অ্যান্ড অবসেশন। সবচেয়ে বেশি লোনলিনেস্। কিছুদিনের মধ্যেই দেখবেন ওসব দেশে সাঙ্ঘাতিক মানসিক সংকট দেখা দেবে। অ্যালুয়েনস্ যে শেষ কথা নয় সেটা বুঝতে বেশি সময় লাগবে না।

চয়ন বিদেশ সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না। সে চুপ করে রইল।

হেমাঙ্গ বলল, চারুদি হয়তো ফিরে আসবে। আগেও একবার চেষ্টা করেছিল সুব্রতদার সঙ্গে বিদেশে সেটল করার। পারেনি।

চয়ন খাবে বলে বেশ ভাল আয়োজন করেছিল হেমাঙ্গ। তবে আমিষ ছিল না। হেমাঙ্গ বলল, আজকাল আমি নিরামিষ খাচ্ছি।

কেন?

এমনি, আমার মনে হচ্ছে, পশুপাখিদের ধরে ধরে খাওয়ার কোনও অধিকার আমার নেই।

তাই বা কেন? লোকে তো খায়।

লোকে কত কিছু করে। সব কিছুর মানে হয় না। আপনার কি নিরামিষ খেতে অসুবিধে হচ্ছে?

চয়ন মৃদু হেসে বলল, না তো! আমি তো নিরামিষই খাই। মাছ কেনার ক্ষমতা নেই, রাঁধেই বা কে? তবে প্রেজুডিস নেই। আচ্ছা, আপনার চারটে মিক্সি কেন লাগে?

হেমাঙ্গ হেসে ফেলল, আগে নতুন নতুন জিনিস কেনার খুব ঝোঁক ছিল। বাজারে একটা নতুন প্রোডাক্ট এলেই কিনে ফেলতাম। ওসব তখনকার ব্যাপার। রয়ে গেছে। এখন একটাও কাজে লাগে না। আপনাকে একটা প্রেজেন্ট করে দিচ্ছি আজই।

আমি! আমি নিয়ে কি করব?

প্রোডাক্টটা হাতে এলে কাজে লাগানোর কথা মনে হবে।

না, দরকার নেই। আমার ঘরে জায়গাও নেই। চারুদি কত কী দেন, আমার সবই পড়ে আছে। কাজে লাগে না।

আপনিও একটু অফ-বিট, তাই না?

না, অফ-বিট নই। আমি যা হয়েছি তা অবস্থার চাপে!

ভিকটিম অফ সারকামস্ট্যান্সেস? আমরা সবাই তো তাই। আচ্ছা একটা সত্যি কথা বলবেন? আপনার টিউশনি করে মাসে কত ইনকাম হয়?

চয়ন একটু হিসেব করে বলল, বোধ হয় হাজার দুই।

কত খরচ করেন?

হিসেব করিনি। তবে হাজার খানেক তো বটে।

বছরে তাহলে আপনার বারো হাজার টাকা সেভিংস হওয়ার কথা। হয় কি?

চয়ন একটু অস্বস্তি বোধ করে বলল, তা তো জানি না।

আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই?

আছে একটা।

তাতে কিছু রাখেন না?

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে টাকা রাখি। কারণ ঘরে রাখলে চুরি যেতে পারে।

ব্যাঙ্কে কত জমা হয়েছে জানেন না?

পাস বই অনেকদিন এন্ট্রি করানো হয়নি।

আপনি কি মানিকনশাস নন?

চয়ন লজ্জা পেয়ে বলে, ঠিক তা নয়। তবে মনে হয় ব্যাংকে আমার খুব বেশি থাকে না।

আমি অ্যাকাউন্ট্যান্ট। টাকাপয়সার ব্যাপারে মনে-হওয়াকে গুরুত্ব দিই না। কালকেই ব্যাঙ্কে গিয়ে জেনে নেবেন আপনার ঠিক কত টাকা আছে। আর পাস বইটা আপ-টু-ডেট করে নেবেন।

কেন বলুন তো?

টাকাপয়সার ব্যাপারে ইনফর্মড থাকা ভাল। আপনি কি এখনও চাকরি খুঁজছেন?

চয়ন একটু স্তিমিত গলায় বলল, না, আর খুঁজছি না। ওটা আমার হবে না।

দেশে তত চাকরিও নেই। যদি চাকরি একটা কষ্ট করে পেয়েও যান মাইনে পাবেন অত্যন্ত কম। খাটাবে বেশি। এমপ্লয়ারদেরই এখন যুগ।

তাই দেখছি।

যদি কিছু টাকা জমাতে পেরে থাকেন ডু সামথিং অন ইওর ওন।

কি করব? ব্যবসা?

আপনি তো পড়াতে পারেন। বরং একটা টিউটোরিয়াল খুলুন।

টিউটোরিয়াল অনেক আছে। আমারটা চলবে না।

নেগেটিভ আইডিয়া নিয়ে শুরু করলে হবে না। আদা-জল খেয়ে লাগুন না! কাজটা করতে শুরু করলেই দেখবেন, কিছু একটা হতে শুরু করেছে। স্টার্ট ইট রোলিং।

চয়ন একটু হাসল।

হেমাঙ্গ বলল, এদেশে দেখবেন কেউ কোনও ভেনচার করতে চায় না। একটা কাপড়ের দোকান কেউ করল, দেখাদেখি আর একজনও কাপড়ের দোকানই করল তার পাশে। ফের আর একজনও তাই করল ফলে বিজনেসটা ভাগ হয়ে গেল। কারোই তেমন লাভ হল না। কিন্তু মাথা খাটালে দেখতে পেত সেখানে হয়তো সেলুন খুললে বা স্টিম লন্ড্রি করলে বা ওরকম কিছু করলে কম্পিটিশন কম হত। এই মাথা খাটানোটুকুও নেই। আর একটা কথা কি জানেন? এদেশের ব্যবসাদার বা দোকানদাররা সেবাবুদ্ধি কাকে বলে জানে না। মানুষকে সেবা দেওয়ার মনোভাব থাকলে ব্যবসার ভোল পাল্টে যেত। প্রত্যেকটা ব্যবসাই হওয়া উচিত ওয়েলফেয়ার বিজনেস। দিনরাত অসৎ লোকদের ট্যাক্স ফাঁকিতে সাহায্য করতে করতে আমি টায়ার্ড।

টিউশনি করতেও আমার তেমন ভাল লাগবে না।

টিউটোরিয়াল হয়তো ভাল লাগবে। না হলে আমার সঙ্গে গ্রামে চলুন। চাষবাস করবেন। পারবেন না?

চয়ন এবার হাসল না। একটু ভাবল। তারপর বলল, আমার দ্বারা বোধ হয় কিছু হবে না।

ভাবুন। ভাল করে ভাবুন। মাথা থেকে কিছু একটা বেরোবেই। তারপর হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড অনেস্টি অ্যান্ড সার্ভিস।

চয়ন মৃদু হেসে বলল, আপনি খুব প্র্যাকটিক্যাল। আমি তা নই। অথচ চারুদি আমাকে কী বলে গেছেন জানেন? বলে গেছেন যেন আপনাকে আমি চোখে চোখে রাখি।

হেমাঙ্গ হাঃ হাঃ করে হাসল। বলল, ও আমাকে এখনও নাবালক বলে মনে করে।

ওঁর ভয় আপনি সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন।

হেমাঙ্গ গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে বলে, না, সন্ন্যাসী হওয়ার কোনও চান্স নেই।

চয়নের ভিতরে মৃদু একটা বেল বেজে উঠল। সে জানে। সে টের পায়। কি করে পায়? হয়তো রোগে ভুগে তার স্নায়ুতে এমন কিছু স্পর্শকাতরতার সঞ্চার হয়েছে যাতে সে অনেক সূক্ষ্ম জিনিস আবছা বুঝতে পারে।

মৃদু হেসে চয়ন বলল, সেটা আমি জানি।

অবাক হয়ে হেমাঙ্গ বলে, কি জানেন?

আপনি হয়তো শিগগিরই ঘর-সংসার করবেন।

সে কী? আমি তো সে কথা বলিনি!

না, আপনি বলেননি।

তাহলে?

এমনি মনে হল।

এমনি মনে হল? না মশাই, ওটা কথা নয়। ঝেড়ে কাশুন।

চয়ন মৃদু হাসল শুধু।

আমি বলতে চেয়েছিলাম সন্ন্যাসী হওয়ার হ্যাজার্ডস আমার পোষাবে না। তা ছাড়া আমি তো ধর্ম। করি না। সংসারী হওয়ার ইচ্ছে আমার নেই।

চয়ন মৃদুস্বরে বলে, হয়তো তার আছে।

কার?

যাকে আপনি বিয়ে করবেন!

অবাক হেমাঙ্গ বলে, কাকে?

ভেতরটা বলি বলি করে ওঠে চয়নের। সে বলে না। মৃদু হাসে শুধু।

আপনি তো সাঙ্ঘাতিক লোক মশাই। জ্যোতিষী করেন নাকি?

না।

তাহলে?

মনে হয়।

কী মনে হয়?

মনে হয় আপনি কাউকে ভালবাসেন। সত্যিকারের ভালবাসেন। কিন্তু টের পান না।

আমিই যদি টের না পাই তাহলে সেটা আপনি টের পান কেমন করে?

আমিও পাই না।

তবে বলছেন যে!

আমার মাঝে মাঝে অদ্ভুত কিছু একটা মনে হয়।

সেই অদ্ভূতটা কি?

ওই তো বললাম, আপনি না জেনেই কাউকে ভালবাসেন। সেটা এত ভিতরের ব্যাপার যে টের পান না।

তাই কি হয়? ভালবাসা টের না পেয়ে উপায় নেই।

হয়তো সেটাকে ভালবাসা বলে চিনতে পারেন না।

ওসব হেঁয়ালিতে আমি বিশ্বাস করি না। তবে আমি একজনকে খানিকটা ভালবাসার চেষ্টা করেছিলাম ঠিক কথা। সে রশ্মি।

চয়ন চুপ করে রইল।

হেমাঙ্গ বলল, ভালবাসাটা ছিল বন্ধুর মতো। কিন্তু চাকদি সব গোলমাল করে দিল।

উনি ভুল করেননি। বিয়ের চেষ্টা করে উনি আপনার উপকারই করেছেন। তাতে আপনি বুঝতে পারলেন যে রশ্মিকে আপনি সেরকম ভালবাসেন না।

এরকম একটা কথা আপনি আগেও বলেছিলেন। আপনি কিন্তু একটু বিচ্ছু টাইপের আছেন। এবার বলুন তো, আজ যা বললেন তার সোসটা কি?

আমি সত্যিই জানি না।

না জেনেই বলছেন?

মনে হয়, ব্যাপারটা এতই গভীর এবং গোপন যে, আপনি সেটা কনশালি স্বীকার করতে চান না । তাই ব্যাপারটা আপনার কাছে ধরা দেয় না।

এটা কি ফ্রয়েডীয় ব্যাপার নাকি মশাই?

ফ্রয়েড আমি পড়িইনি।

কিন্তু ভালবাসার জন্য তো একটা মেয়ে অন্তত চাই। সেটা কে?

আছে হয়তো!

কে হতে পারে?

চয়ন মুচকি একটু হেসে চুপ করে থাকে।

হেমাঙ্গ তার চোখের দিকে চেয়ে বলে, আপনি কি তাকে চেনেন?

হয়তো চিনি।

আপনাকে আজ হয়তোতে পেয়েছে কেন?

আমার অনুমানটাও এত পাতলা যে বলার মতো নয়।

আমার পরিচিত মেয়ের সংখ্যা এতই কম যে অনুমানটা খুব ডিফিকাল্ট নয়।

দুজনে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর হেমাঙ্গ বলল, চলুন আপনাকে গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।

থাক। আমি চলে যেতে পারব।

সেটা জানি। তবু আপনার কম্পানি আমার কিছুক্ষণ আরও দরকার।

তাহলে চলুন।

১০০

এই যে এত আনন্দ হল বাড়িতে, গৃহপ্রবেশে এত লোক খেল, এত হইচই, এর মধ্যেও বীণাপাণি রইল আড় হয়ে। তার মনে একটুও সুখ নেই। সে শুনেছে ভিড়ের মধ্যে এক ফাঁকে এসে নিমাই নাকি শ্বশুর-শাশুড়িকে প্রণাম করে চলে গেছে। চোখাচোখিটুকুও হয়নি তার সঙ্গে। না হয়ে ভালই হয়েছে। বীণাপাণির যত অশান্তির মূলে তো ওই একটা লোক।

ভয়ে বীণাপাণির বুক সবসময়ে দুরদুর করে। বনগাঁয়ে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবলেই বুক হিম হয়ে যায়। নিমাই নাকি ছোড়দাকে বলেছে, বীণাপাণি বনগাঁয়ে ফিরে যেতে পারে। কথাটার মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝেনি বীণা। সে বনগাঁয়ে ফিরবে কি না তা নিয়ে নিমাইয়ের মাথাব্যথা কেন?

বীণার সবচেয়ে দুঃখ, নাটকটাই জীবন থেকে বাদ হয়ে যাচ্ছে। সজল বলেছিল, কাকা টের পেয়ে গেছে। কাকা এমনিতে ভাল, কিন্তু চটলে সাড়ে সর্বনাশ। বীণা কি করবে তাই ভেবে পাচ্ছে না। ডলার আর পাউন্ড বাঁচাতে সে চট করে যা মাথায় এসেছিল তেমনই একটা কৌশল করে রেখে এসেছে বটে, কিন্তু তাতে বিপদটা রয়েই গেল। কাকা তাকে খুঁজবে, দরকার হলে খুনও করাবে। তবে বিষ্ণুপুর শীতলাতলার পাল্লাটা একটু দূরের, এইটুকুই যা ভরসা। উদ্বেগ টাকাগুলোর জন্যও রয়েছে। মেঝের নিচে গর্তের মধ্যে চাপা আছে ঠিকই, তবু নাগালের মধ্যে যে নেই সেটাই দুশ্চিন্তার কারণ। কী হচ্ছে কে জানে!

বাড়িটা যে দেখনসই হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। মা বাবার মুখে হাসি ধরছে না। দাদা মেলা জিনিসপত্র কিনে ঘর সাজিয়ে দিয়েছে। সোফাসেট, লোহার আলমারি, নতুন খাট। এরকম রাজার হালে থাকার কথা মা-বাবা তো কখনও ভাবেনি।

তবে বিষ্ণুপদ তাকে বলেছে, বড় অস্বস্তি হচ্ছে, বুঝলি! প্রথম প্রথম তো! মনে হচ্ছে যেন পরের বাড়িতে ঢুকে পড়েছি।

নতুন বলে হচ্ছে বাবা, দুদিনেই সয়ে যাবে।

তা বটে। আজ ঝাঁঝরির জলে চান করলুম, ঠাণ্ডা না লেগে যায়।

বুঝেসুঝে কোরো।

কাল থেকে ভাবছি ওই কুয়োপাড়েই চানটা করব। এ ঠিক জুত হচ্ছে না।

না বাবা, পুরনো অভ্যাস বজায় রাখলে নতুনটা আর অভ্যাস হবে না। দাদা এত আদর করে সব করে দিল।

তা বটে।

সবচেয়ে খুশি নয়নতারা। চোখে-মুখে সবসময়ে ডগমগ ভাব। মুখে উপচে পড়ছে হাসি।

ও মা, তোমার যে দেমাকে মাটিতে পা পড়ছে না গো!

নয়নতারা হেসে বলে, তা বাপু, একটু দেমাক আমার হয়েছে। সব ঘুরে ঘুরে দেখলি তো! মেঝেটা বাপু যেন তেলতেল করছে। সিঁড়িটিড়ি সব দেখলি? আর রান্নাঘর? কত তাক, কত কাবার্ড।

কাবার্ড কথাটা দাদা শিখিয়েছে মাকে। শুনে সবাই হাসে।

বীণাপাণিও হাসল, আমাকে কোন ঘরখানা দেবে মা?

কেন, দোতলায় তিনখানা শোওয়ার ঘর। আমাদের পাশের ঘরেই তুই থাকবি।

দাদাকে বড় ভয় বীণার। অপরাধবোধও কম নয়। এই দাদাকে তারা এ বাড়ি থেকে অনেক অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তবু এতদিন বাদে দাদা কিছু মনে করে রাখেনি নিশ্চয়। তা না হলে এখানে এত বড় বাড়ি করে দিত না। খুব ভয়ে ভয়ে আর লজ্জার সঙ্গে গৃহপ্রবেশের পর দিন সকালে দাদার ঘরে গেল বীণা। প্রণাম করে বলল, কেমন আছ দাদা?

কৃষ্ণজীবনের মুখে গভীর চিন্তার ছাপ। বলল, ভালই! তুই কেমন?

ওই একরকম। আমাদের আর ভাল থাকা!

কৃষ্ণজীবন গম্ভীর গলায় বলে, তুই নাকি যাত্রায় নামিস?

নামি দাদা। না নেমে উপায় ছিল না তখন।

কৃষ্ণজীবন চিন্তিতভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে বলে, আমার যাত্রা সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই কিন্তু লোকে বলে, যাত্রার দলে ভদ্রবাড়ির মেয়েরা যায় না। তুই যে কেন গেলি!

সামান্য ক্ষোভের সঙ্গে বীণাপাণি বলল, আমি কি ভদ্রবাড়ির মেয়ে দাদা? তুমি কি জানোনা আমরা কত কষ্টে মানুষ হয়েছি? আর কীভাবে আমাকে একজন হাড়হাভাতের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হল! ওরকম শ্বশুরবাড়ি যেন শত্রুরও না হয়। কী গরীব ভাবতে পারবে না। তার ওপর হল অসুখ, চিকিৎসার টাকা নেই, পথ্যি জোটে না। কী করতাম বলো তো!

কৃষ্ণজীবন তার মুখের দিকে গভীর নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল। বলল, বল শুনি।

কেঁদে ফেলল বীণাপাণি। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বলল, নিজেকে ভদ্রবাড়ির মেয়ে বলে ভাবতে কবেই তো ভুলে গেছি। এ গরিব বাড়ি থেকে আরও গরিব আর-এক বাড়িতে গিয়ে উঠেছি। ভদ্র পরিবেশ কোথায় পেয়েছি বলল তো! জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল আমার। তখন তো তুমি আমাদের পাশে ছিলে না। তুমি ছাড়া আর এ বাড়ির কেই-বা ভদ্রলোকের মতো বলো তো! মেজদা সেজদা এদের তো জানো। আজ মস্ত বাড়ি হয়েছে তোমার দয়ায়, কিন্তু এতদিন কিভাবে কেটেছে আমাদের?

কৃষ্ণজীবন মাথা নেড়ে বলল, ঠিক কথাই তো। কিন্তু তবু যাত্রাদলে কেন গেলি সেটা বোঝা গেল না।

ওই জন্যই তো। কাকা নামে একটা নাটক-পাগল লোক আছে, সে-ই বাঁচিয়ে দিল চাকরি দিয়ে।

কিন্তু সেই লোকটা নাকি স্মাগলার?

হ্যাঁ, তাও ঠিক। তবে সে লোক ভাল।

নিমাই কি খুব খারাপ লোক রে বীণা?

মেরুদণ্ডহীন।

কৃষ্ণজীবন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, অনেকদিন আগে তাকে একবার দেখেছিলাম। ফের দেখা হল গতকাল। আশ্চর্যের বিষয় হল, তাকে আমার ভীষণ ভাল লোক বলে মনে হয়েছে। কেন রে?

কেন তা কি করে বলব? বাবাও বলে, তুমিও বলছ, আমি তো ভালর কিছু দেখি না। অকমার ধাড়ি।

আমরা ছাড়া আর কেউ বলে না?

বলে। ভাল লোক ভাল লোক শুনে শুনে কান পচে গেল। কিন্তু ভাল ধুয়ে কি জল খাবো?

শুনি এখন সে কাঁচরাপাড়ায় হোটেল চালাচ্ছে। ভাল আয়।

কে জানে কি!

তোর সঙ্গে কি ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে?

ওইরকমই।

কেন হল?

বনল না।

কৃষ্ণজীবন মাথাটা একটু দু'ধারে নেড়ে বলল, খুব অল্প সময়ের মধ্যে যে একটা ব্যবসাকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে সে খুব অকর্মণ্য বলে আমার মনে হয় না।

এতদিন তো পারেনি।

কৃষ্ণজীবন তার চোখের দিকে চেয়ে বলল, সেইটেই তো তোর কাছে জানতে চাইছি, এতদিন পারেনি কেন?

ও মা! তা আমি বলব কি করে?

তোর সঙ্গে ছিল, অথচ তখন পারল না, তোকে ছেড়ে এসেই পেরে গেল তার মানেটা কী দাঁড়াচ্ছে?

কী বলো তো?

তার মানে দাঁড়াচ্ছে কোনও কারণে ও তোর কাছে বাধা পেত, সাহস করে উঠতে পারত না, তোর মুখাপেক্ষী হয়ে ছিল। হা রে, নিমাই কি খুব স্ত্রৈণ?

মোটেই নয়।

ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়। এনিওয়ে, তোকে ছেড়ে গিয়ে লোকটার তো উন্নতিই হয়েছে দেখছি।

হোক, আরও হোক। আমি তো আর ভাগ বসাতে যাচ্ছি না।

কৃষ্ণজীবন হাসল, কী কথার কী জবাব। বোস, ঠাণ্ডা হ। ওর ওপর তোর এত রাগের কারণটা আমাকে বলবি? নিরীহ, সৎ একজন লোক, হয়তো-বা মুখচোরা, তার বেশি আর কি খারাপ হবে নিমাই বল তো!

তোমরা বুঝবে না। তোমরা সবাই ওর পক্ষে।

আমরাই বা কেন নিমাইয়ের পক্ষে সেটাও কি ভেবেছিস?

তোমরা ওর সততাকে খুব দাম দাও।

সততাকে তুই দাম দিস না?

দেবো না কেন, কিন্তু বেশি-বেশি করলে রাগ হয়। এটা কলিযুগ, সততা দিয়ে কি বাঁচা যায়? কাকা ওকে একটা চাকরি দিয়েছিল, কেন নিল না জানো? ওটা নাকি পাপের টাকার তহবিল। সেই চাকরি পরে আমি নিই।

সেটা কি নিমাই অন্যায় করেছে?

করেছেই তো। তোমার নিমাই হল নিমকহারাম। এতদিন আমারটা খেল-পরল, আমার টাকায় মা বাবার প্রতিপালন করল, আর আমাকেই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলে গেল। এই লোকের কী যে গুণ দেখলে তোমরা!

কৃষ্ণজীবন হঠাৎ প্রশ্ন করে, বনগাঁয়ে তুই কি একা থাকিস?

একা আবার কি? সেখানে আমার নিজের বাড়ি, পাড়া-প্রতিবেশী আছে, চেনাজানা কত লোক। ওকে একা বলে না।

নিমাই আসে না?

আসবার মুখ আছে নাকি?

কৃষ্ণজীবন একটু উদাস হয়ে গিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কাল নিমাই এসেছিল। চেহারাটা ভাল হয়েছে একটু। বেশি কথা বলল না। কিন্তু মুখখানায় এমন একখানা ভাব আছে যাতে ওকে ভাল লাগে। এরকম শুদ্ধ চোখ বড় একটা দেখি না।

কী বলল তোমাকে? আমার নামে লাগায়নি?

কৃষ্ণজীবন মাথা নেড়ে বলে, সেরকম লোকই নয়। তোর কথা তার মনে আছে বলেও তো মনে হল না।

কি করে বুঝলে?

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

কী জিজ্ঞেস করেছিলে?

তোর সঙ্গে দেখা করেছে কিনা। অবাক হয়ে বলল, আমি তো তার কাছে আসিনি। এ বাড়ির কর্তা আমার গুরুজন, তাঁকে প্রণাম করে চলে যাবো।

এত আস্পর্ধা?

কৃষ্ণজীবন হাসল, আমাকেও প্রণাম করেছে। বাবাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে প্রণাম করেছে।

পাঁচ হাজার?

হ্যাঁ। বাবা অবশ্য নেয়নি। ফিরিয়ে দিয়েছে।

কতক্ষণ ছিল?

আধঘণ্টার বেশি নয়। দোকান খোলা আছে বলে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

বীণাপাণি চুপ করে বসে রইল। তার কান্না পাচ্ছে, রাগ হচ্ছে, সব লণ্ডভণ্ড করে দিতে ইচ্ছে করছে। ভগবান এমন একচোখো কেন? আজ দান উল্টে বীণাপাণির রোজগার বন্ধ, আর ওদিকে নিমাইয়ের বরাত ফিরেছে। এরকম কেন হয়?

কৃষ্ণজীবন হঠাৎ একটু নরম গলায় বলল, আমাকে একটা কথা বলে গেছে নিমাই। তোকে বলার জন্য।

কি কথা?

বলেছে তুই বনগাঁয়ে ফিরে গেলে তোর কোনও অসুবিধে হবে না। বলে গেছে কাকা না কে যেন, তোকে আর কিছু বলবে না। মিটমাট হয়ে গেছে।

তড়িৎস্পর্শে উঠে দাঁড়ায় বীণাপাণি, বারবার খবরটা দিচ্ছে কেন বলল তো! আমার বনগাঁয়ে যাওয়া নিয়ে ওর এত মাথাব্যথা কেন?

তা তো জানি না। আমিও ভাবছিলাম মেসেজটার মধ্যে একটা রহস্যের গন্ধ আছে।

না গো দাদা। কোনও রহস্য নেই। কাকার সঙ্গে আমার একটু মন কষাকষি চলছিল, তাই।

কৃষ্ণজীবন মাথা নেড়ে বলল, তা নয় রে বীণা। আমি বাবার কাছেও কিছু শুনেছি।

কী শুনেছ দাদা?

তোর ডলার আর পাউন্ডের কথা। কাজটা ভাল করিসনি।

বাবাকে কে বলল?

নিমাই, এখান থেকে যেদিন চলে গিয়েছিল মাঝরাতে, বাবার সঙ্গে দেখা হয়। তখন বলেছিল।

ওঃ। বলে বীণা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

ও টাকা তুই কেন যে বিপদ মাথায় করে নিজের কাছে রেখেছিলি!

ও টাকা তো কারও নয় দাদা।

সে তো ঠিকই। কারও নয়। তার মানে তোরও নয়।

কিন্তু গচ্ছিত ছিল যে।

তাহলেও সেটা যে গচ্ছিত রেখেছিল তার বাড়ির লোকের পাওনা। তোর পাওনা হয় কি করে?

তার বাড়ির লোককে পাবো কোথায়?

খুঁজেছিলি?

না।

ও টাকার জন্য তোকে বোধ হয় অনেক গুনাগার দিতে হল। না?

দাদা, আমি কি তবে চোর?

তুই বোকা।

আমি লোভী, না দাদা?

অভাবে পড়ে হয়তো লোভ করেছিলি।

তুমি আমাকে চোর বলবে না?

বললে কি তুই খুশি হোস?

না, বলোই না, চোর বলতে ইচ্ছে করে কি না।

না। চুরি করিসনি ঠিকই, তবে কাজটাও ভাল হয়নি।

এখন আমি কি করব দাদা?

কৃষ্ণজীবন মৃদু একটু ম্লান হাসি হেসে বলে, অনেক দুঃখের কথা শুনিয়েছিস আজ। তোর বিয়ে, সংসার, জীবনসংগ্রাম সব শুনলাম। কিন্তু এবার তোর সুখের কথাও শুনতে ইচ্ছে করছে।

সুখ কোথায় দাদা? আমার মতো পোড়ারমুখি আর আছে?

অনেক আছে। তোর এখনই বা বয়স কী?

কী করতে বলল আমায়?

আমি বলি নিমাই যা বলে তাই কর। বনগাঁয়ে ফিরে যা। যাত্রাদলের চাকরি গেছে ভালই হয়েছে। আর ওপথে যাওয়ার দরকার নেই।

পেট চলবে কি করে?

পেট চালানোর ভার বাবা যাকে দিয়েছে তার ওপর আর একবার নির্ভর করে দেখ না!

কার কথা বলছ? নিমাই? ওর সঙ্গে আর এ-জীবনে আমার মিল হবে না।

তাহলে যা ভাল বুঝবি করিস।

হ্যাঁ দাদা, তোমাদের নিমাই কাকার সঙ্গে মিটমাটের কথা বলে গেল কেন? ঝগড়া তো আমার সঙ্গে কাকার, নিমাই মাঝখানে আসছে কোথা থেকে?

তা জানি না।

বীণাপাণি সারা দিন কথাটা নিয়ে ভাবল। মিটমাট তো হওয়ার কথা নয়। মিটমাট হবে কি করে?

সারা রাতটা ঘুমহীন কাটল তার। সকালে উঠেই সে বনগাঁয়ে রওনা হয়ে গেল। সরেজমিনে ব্যাপারটা দেখতে হবে। বুটা দুরুদুরু করছে।

ঘোমটা টেনে বাস থেকে এক স্টপ আগে নেমে পড়ল বীণা। তারপর অনেকটা হেঁটে দুপুরে নিজের ঘরে পৌঁছলো। দরজার তালা খুলে ভিতরে ঢুকে স্তব্ধ হয়ে গেল সে। মিটমাট কিভাবে হয়েছে তা বুঝতে আর বাকি থাকল না।

তবু উপুড় হয়ে গর্তটা ভাল করে খুঁজে দেখল বীণা। নেই। তার বুক-বুক করে লুকিয়ে রাখা অত ডলার আর পাউন্ড সব হাওয়া।

মেঝের ওপরই বসে পড়ল বীণা। বুকটা হাহাকারে ভরে গেল। দু' চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। দুঃখের দিনে ওই লুকোনো যখের ধনের কথা ভেবে কত ভরসা পেত সে। ভাবত সব গেলেও ওটা তো আছে।

আজ কিছু রইল না তার।

কাকাও তাকে আর বিশ্বাস করবে না কখনও।

সারা দিন রান্নাবান্না না করে না খেয়ে চুপ করে শুয়ে রইল বীণা।

বিকেলে তার কাছের প্রতিবেশীর মেয়ে সুমনা এসে বলল, ও মা! তুমি এসেছ বীণাদি! এদিকে কত কাণ্ড হয়ে গেল! তোমার জন্য খুব চিন্তা হচ্ছিল।

কী কাণ্ড রে? বলে বীণা উঠে বসল।

তুমি কিছু জানো না?

না তো।

তোমাকে মারবে বলে কাকার দল ঘোঁট পাকিয়েছিল তা জানো?

না। তাও জানি না।

সজলদাকে তো খুব মেরেছে।

বীণা চুপ করে রইল।

ওরা নিমাইদাকেও ধরেছিল। নিমাইদা নাকি তোমার টাকা নিয়ে কাঁচরাপাড়ায় দোকান দিয়েছে। নিমাইদাকেও মারত।

মারেনি!

না। কাকা নিমাইদাকে খুব ভালবাসে তো!

তারপর বল।

নিমাইদা তোমাকে বাঁচানোর জন্য অনেক টাকা দিতে চেয়েছিল কাকাকে। এমন কি দোকান অবধি বিক্রি করতে চেয়েছিল। তা অবশ্য করতে হয়নি।

ঘরে গর্ত করল কে রে?

নিমাইদা এসে তোমার লুকোনো টাকা বের করে কাকাকে দিয়ে দিয়েছে। নইলে নাকি তোমার বিপদ ছিল। হ্যাঁ, বীণাদি, এ নাকি সেই পগার টাকা?

বীণা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, একটু জল খাওয়াবি সুমনা? গলাটা শুকিয়ে আছে।

সুমনা দৌড়ে গিয়ে জল এনে দিল। তারপর বলল, তুমি নাকি আর যাত্রা করবে না বীণাদি?

কে জানে কী করব।

সজলদার সঙ্গে কি তোমার বিয়ে হবে?

কে বলেছে?

সবাই বলছে।

না রে। ওসব বাজে কথায় কান দিস না। সজল কেমন আছে জানিস?

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে। ভালই আছে বোধ হয়।...

সন্ধের পর সজল নিজেই এসে হাজির। বীণা ঘরদোর ঝাঁটপাট দিয়ে হ্যারিকেন জ্বেলে স্টোভ ধরিয়ে চা করছিল।

সজল এসে বলল, বীণা, কেমন আছ?

আমার জন্য মার খেয়েছ শুনলাম।

তোমার জন্য সব পারি।

তোমার বীরত্বের দরকার ছিল না।

বীরত্ব কে বলল? তোমাকে পালানোর পরামর্শ দিয়েছিলাম বলে এই শাস্তি।

এখন কী হবে বলো তো!

তাই ভাবছি, দুজনেই বেকার।

১০১

আমাদের কত সামান্য হলেই চলে যায়, তবু দেখ, সেই সামান্যটুকুই হতে চায় না। রাজপ্রাসাদও নয়, বড়লোকদের ফ্ল্যাটবাড়িও নয়। দুখানা ঘর, একটু বারান্দা, কলঘর, একখানা রান্নাঘর, ব্যস হয়ে গেল। তা সেটুকুরও যা এস্টিমেট দাঁড়াচ্ছে তাতে চোখ উল্টে যায়। অনিন্দিতা আর তার মায়ের তাড়নায় না করেও উপায় নেই, কিন্তু বড্ড ভয় পাচ্ছি বাবা, শেষ করতে পারব তো!

অনিন্দিতার বাবার মুখে দুশ্চিন্তার রেখাগুলি সকালের স্পষ্ট আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল চয়ন, দেশের লক্ষ মানুষের মুখেও কি একই দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে নেই! একই গল্প, একই টেনশন, একই অনিশ্চয়তা, এঁরা মানুষের কাছে একটু আশা-ভরসার কথা শুনতে চান। চয়ন কীই বা শোনাতে পারে!

ইঁট, সিমেন্ট, কাঠ যাতেই হাত দিতে যাই, হাতে যেন ছ্যাঁকা লাগে। গত মাসখানেক ধরে কেবল দর জানতে বাজার ঘুরছি। যদি ছাদ ঢালাই না করে ওপরে টিন লাগাই তাহলে অনেকটা সস্তা হয়। কিন্তু এঁরা তো টিনের চাল শুনলেই ক্ষেপে যাচ্ছেন। এই যে তুমি টিনের চালের ঘরে আছো, তেমন কিছু খারাপ আছে কি? ওরা বুঝতেই চায় না।

চয়ন মৃদু স্বরে বলল, শুরু করলে ধীরে ধীরে হয়তো হয়ে যাবে।

দুর! সে চাকরি থাকলে হয়তো হত। তখন তো একটা আয় ছিল হে। এখন তো ঘরের টাকা ভেঙে খাচ্ছি। ফিক্সড ডিপোজিটে রেখে খানিক সুদ হয় বটে, কিন্তু তাতে কি চলে?

আপনার পেনশন নেই?

তাও আছে। তবে ওই যে বললুম, খরচ তো বাড়ে, কমে না।

ও। বলে চয়ন চিন্তিত হওয়ার একটা ভাব করল। কিন্তু অনিন্দিতার বাবার সমস্যা তাকে খুব একটা পীড়িত করছে না। করার কারণও নেই। বরং তার শুনতে একঘেয়ে এবং বিরক্তিকর লাগে। মানুষটিকে তার খুব পছন্দও হয় না। ইনি এখনও মনে করেন, অনিন্দিতার সঙ্গে চয়নের বিয়ে হওয়াটা উভয় পক্ষের আর্থিক সমস্যার সমাধান ও লোকবলের অভাব মেটানোর জন্য দরকার। এবং এ ব্যাপারে চয়নের মতামতের যে কোনও দাম আছে তাও ইনি মনে করেন না।

অনিন্দিতার বাবা মিটিমিটি চোখে তার দিকে চেয়ে হঠাৎ বলল, তোমার তো বাবা ঝাড়া হাত-পা।

চয়ন একটু অবাক হয়ে বলল, অ্যাঁ!

বলছিলাম, তোমার তো দায়-দায়িত্ব কিছু নেই। নো লায়াবিলিটি।

চয়ন বলল, তা বটে।

টিউশনিতে আজকাল আয়ও তো ভালই।

চয়ন সংকুচিত হয়ে বলে, কোনওরকমে চলে যায়।

দেবে নাকি আমাকে কিছু ধার? আমি সুদ দেবো।

চয়ন একটু হাঁ করে থাকে। একজন লোক তার কাছে ধার চাইছে, এই ঘটনাটাই তার অবিশ্বাস্য মনে হয়। সে আবার কথা খুঁজে না পেয়ে বলে, অ্যাঁ!

বেশি নয়, হাজার দশেক পেলেই সামলে নিতে পারব।

চয়ন অবিশ্বাসের চোখে লোকটার দিকে চেয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে তার পূর্বাপর ঘটনাগুলো মনে পড়তে থাকে। ক'দিন আগে হেমাঙ্গ তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, ব্যাংকে তার কত টাকা আছে এবং তা দিয়ে কোনও একটা ব্যবসা বা টিউটোরিয়াল খোলা যায় কিনা, বাস্তবিকই তখনও সে জানত না, ব্যাংকে তার কত টাকা আছে।

না জানার কারণ হল, সে জানতে চাইত না। ভাবত অনেক টাকা জমলে সে একদিন নিজেকে নিজেই একটা সারপ্রাইজ দেবে। তার চেক-বই নেই, টাকাও তোলার দরকার হয় না। পাশ-বই এন্ট্রি করায় না। মাসে মাসে শুধু টাকা জমা দিয়ে যায়।

হেমাঙ্গ খোঁজ নিতে বলায় কয়েকদিন আগে সে ব্যাংকে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে, তার সুদে আসলে একান্ন হাজার টাকার ওপর জমা আছে। টাকাটা তার অনেক বলে মনে হল। এতটা আশাই করেনি।

সেদিনই সন্ধেবেলা সে ঘটনাটা অনিন্দিতাকে বলে।

অনিন্দিতাও অবাক হয়ে বলেছিল, একান্ন হাজার! তাহলে তো তুমি বড়লোক।

আমি ভাবছি কিছু একটা এই একান্ন হাজার দিয়ে শুরু করব।

করো। খুব ভাল হবে। কী করবে বলো তো!

এখনও ভাবিনি। তুমিও ভেবে দেখো তো কী করা যায়। আমার খুব ইচ্ছে করে একটা মনোহারি দোকান দিই। হরেক জিনিস থাকবে, নানারকম খদ্দের আসবে, বিনিময় হবে। বেশ একটা জমজমাট ব্যাপার। বেঁচে থাকাটাকে টের পাওয়া যাবে।

করো, দোকানই করো।

কথা এইটুকু থেকে এতখানি গড়াল। অনিন্দিতা নিশ্চিত তার টাকার কথা এঁর কাছে গল্প করেছে। করতেই পারে। সেটা শুনেই লোকটা ধার চেয়ে বসেছে বোধহয়।

অনিন্দিতার বাবা একটু ব্যগ্র গলাতেই বললেন, ভেবো না যে, শোধ দিতে পারব না। বাড়িটা করলে বাসা-ভাড়াটা তো বেঁচেই যাবে। সেটা থেকে তোমাকে মাসে মাসে দিয়ে যাবো। ওখানকার একটা ওষুধের দোকানে একটা চাকরিও পাকা হয়ে আছে আমার। মাসে আট শো টাকা। সেটা হলে তো কথাই নেই।

লোকটার ওপর রাগ হল না চয়নের। মায়া হল, এ যে তার চেয়েও অপদার্থ লোক! চয়ন কিছুক্ষণ ভেবে বলল, আমার এত টাকা আছে বলে আপনার মনে হল কেন?

লোকটা অবাক হয়ে বলে, নেই? কিন্তু অনিন্দিতা যে বলছিল, তোমার নাকি অনেক টাকা আছে ব্যাংকে!

চয়ন একটু হাসল। বলল, অনেক কষ্টে জমিয়েছি। একটা দোকান দেওয়ার ইচ্ছে ছিল।

লোকটা চয়নের ডান হাতটা চেপে ধরে বলে, দোকান তোমার হবে। দশটি হাজার টাকা আমার বড় দরকার। বিশ হাজারই চাইতুম, কম করেই বলছি।

চয়ন নিজের দুর্বল হাতটা চেষ্টা করেও ছাড়াতে পারল না। বলল, আচ্ছা, আমি চেষ্টা করে দেখব।

চেষ্টা নয় বাবা, টাকাটা না দিলেই নয়। বড্ড বেঘোরে পড়ে গেছি। আমার বউ আর মেয়ে আমাকে বাড়ি-বাড়ি করে তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না। মাঝে মাঝে আত্মহত্যা করতেও ইচ্ছে হয়। মেয়ের বিয়েটা আর হবে না। তা না হোক, বাড়িটাই করে ফেলি। হিসেব করে দেখেছি, ওই দশ হাজারই টান পড়বে আমার।

আপনি অত উতলা হচ্ছেন কেন? আমি ভেবে দেখছি।

কবে আসব বাবা?

চয়ন হাসল, আসবেন।

আমি বরং রোজই একবার তোমাকে মনে করিয়ে দিয়ে যাবো। কিন্তু একটা কথা। টাকার ব্যাপারটা যেন অনিন্দিতা বা তার মা না জানতে পারে। তাহলে আস্ত রাখবে না আমাকে।

চয়ন ম্লান হেসে বলল, ধার করা তো অপরাধ নয়।

তবু বলার দরকার নেই। আমি নির্লজ্জ বলে তোমার কাছে ধারটা চাইতে পারলুম। ওরা তো আমার সমস্যাটা জানে না।

ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পর চয়ন অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। মানুষকে প্রত্যাখ্যান করার শক্তিটাও যে তার কেন নেই! তার জানা আছে, এই ছাপোষা অবসরপ্রাপ্ত লোকটি কোনও দিনই তার টাকা শোধ দিতে পারবে না। তবু একে না দিয়েই কি সে পারবে? বাধা হবে চক্ষুলজ্জা; বাধা হবে নিজের কাছে ছোট হয়ে যাওয়ার ভয়।

সকালের টিউশনি সেরে ফেরার পথে সে ব্যাংকে গেল এবং ভয়ে ভয়ে কাউন্টারে বলল, আমি যদি দশ হাজার টাকা তুলতে চাই তাহলে কী করতে হবে?

সুবেশ এবং সুভদ্র ক্লার্কটি বলল, অত টাকা তুলতে একটা প্রায়র ইন্টিমেশন দিতে হয়। আপনি ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করুন।

ম্যানেজারও একজন সুবেশ লোক, তবে কিছুটা গম্ভীর। শুনে-টুনে একটা চেক-বই ইস্যু করে বললেন, কাল এসে টাকা নিয়ে যাবেন।

রাত্রিবেলা ভদ্রলোক আর একবার এলেন, গিয়েছিলে নাকি ব্যাংকে?

হ্যাঁ।

তুলেছো?

না। তবে কাল দেবে।

ভদ্রলোক স্বস্তির শ্বাস ফেলে বললেন, বাঁচালে বাবা। টাকাটা পেলেই কাজ শুরু করে দেবো। রাজমিস্ত্রির সঙ্গে কথা হয়ে আছে।

এটা বলেই ভদ্রলোক চলে গেলেন।

পরদিন টাকাটা দুপুরে তুলে আনল চয়ন। ভদ্রলোক রাত্রিবেলা এসে নিয়ে গেলেন। তারপর চয়নের একটু ফাঁকা-ফাঁকা লাগল। এর আগে সে আর কাউকে কখনও ধার দিয়েছে বলে মনে পড়ে না। এই প্রথম। এবং

এতগুলো টাকা! তার একটু দুঃখও হচ্ছিল টাকাগুলোর জন্য। অনিন্দিতার বাবার যা অবস্থা তাতে ইচ্ছে থাকলেও টাকাটা শোধ করার উপায় ওঁর নেই।

টাকার কথাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে চয়নের একটু সময় লাগল। পরদিন বিকেল পর্যন্ত অন্যমনস্কতাটা রয়ে গেল তার। মোহিনী বলল, চয়নদা, আপনার কী হয়েছে? এত আনমাইন্ডফুল লাগছে কেন?

ও এমনি।

আপনার সবই শুধু এমনিই।

কত কী ঘটে যায়! বলে চয়ন লাজুক হাসল।

মোহিনী বলল, মা বলে, চয়নটা যা অন্যমনস্ক রাস্তায় ঘাটে অ্যাকসিডেন্ট না করে বসে!

না, ওসব ভয় নেই। অন্যমনস্ক থাকি বটে, কিন্তু একটা ইনস্টিংক্ট কাজ করে।

আচ্ছা, আপনি কি একটা খবর শুনেছেন?

কী খবর?

চারুমাসি ফিরে আসছে।

অবাক হয়ে চয়ন বলে, তাই নাকি!

হেমাঙ্গদা এসেছিল কাল। বলে গেল চারুমাসি নাকি ফোন করে কানাডা থেকে জানিয়েছে এ মাসের শেষেই ফিরে আসবে।

কেন?

একদম নাকি ভাল লাগছে না।

চয়ন, কেন কে জানে, খবরটায় খুশি হল। টিউশনি ফিরে পাবে বলে নয়, চারুশীলা পরম উদারতাবশে তাকে নানা উপঢৌকন দেবে বলেও নয়—যেন এক প্রবাসের আত্মীয় বা প্রিয়জন ফিরছে। এরকম তো তার আর কারও বেলায় হয় না!

টাকার কথাটা চয়ন ভুলে যেতে পারল এবার। আর কোনও কাঁটা খচ খচ করল না তার মনের মধ্যে।

দিন দশেক বাদে একদিন ভদ্রলোক এসে সন্ধেবেলা বললেন, বাবা চয়ন, যা উপকার করেছো তা আর বলার নয়। কাজ ধাঁ-ধাঁ করে এগিয়ে যাচ্ছে। ভাগ্যিস একতলার গাঁথনিটা অনেক আগেই একটু করে রেখেছিলুম, বাড়িটা তাই টকাটক উঠে যাচ্ছে।

সেটা তো খুব ভাল কথা।

টাকায় একটু টান পড়তে পারে শেষের দিকে। যদি পড়েই, তুমি একটু দেখো বাবা।

টান পড়বে?

পাঁচ-দশ হাজার পড়তে পারে। ঠেকাটা পার করে দিও।

চয়ন লোকটার দিকে চেয়ে রইল। খুবই বিস্মিত সে। কিন্তু বিরক্ত নয়। এ লোকটার আর কোনও সোর্স নেই।

একটা কথা ভেবেছি।

কি কথা?

বাড়ির অর্ধেকটা তোমার নামে লিখে দেবো।

সে কী! আমাকে দেবেন কেন?

আমার তো ছেলে নেই, একটা মাত্র মেয়ে। লিখে দিলে তোমার কাছে আমার ঋণেরও খানিকটা শোধ হয়।

চয়ন প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, না না, তার দরকার নেই।

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বলেন, দুখানা তো মাত্র ঘর। তা হোক, একটা তুমি নাও।

আমি নিয়ে কী করব?

কেন, থাকবে! এ ঘরে তোমার কত কষ্ট হয়।

না, আমার কষ্ট হয় না। বেশ তো আছি।

তোমার মাসিমারও খুব ইচ্ছে তোমাকেও নিয়ে যায়।

কেন! আমি গিয়ে কী করব?

ওই যে বলেছিলুম তোমাকে, সবাই মিলে একটা টিম করে থাকব। তোমাকে আমাদের খুবই পছন্দ।

চয়ন মৃদু হেসে বলল, জানি। কিন্তু সেটা ভাল দেখাবে না। আমারও সুবিধে হবে না। অত দূরে গেলে টিউশনির অসুবিধে হবে।

আহা দূর কিসের! আমাদের অফিসের একটা লোক রোজ কাটোয়া থেকে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করত, জানো?

তা হয়তো করে। কিন্তু আমি ততটা শক্ত মানুষ নই।

ভেবে দেখো বাবা। একটু ভাবো।

চয়ন মাথা নেড়ে বলে, ভাববার কিছু নেই। এটা হয় না।

তাহলে ওই কথাই রইল। যদি শেষ দিকে ঠেকে যাই, পাঁচ-দশ হাজারের জন্য যেন কাজটা আটকে না থাকে, একটু দেখো বাবা। পাই পয়সা অবধি শোধ দেবো। সুদ সমেত।

আমি সুদ চাই না।

ন্যায্য পাওনা ছাড়বে কেন!

লোকটা চলে গেলে চয়ন দুঃখিত হৃদয়ে বসে রইল। সে কি একটুও কঠোর হতে পারে না!

মাস শেষ হয়ে নতুন মাসের শুরুতেই ফিরে এল চারুশীলা। মোট বারোটা স্যুটকেস এবং হ্যান্ডব্যাগ ভর্তি জিনিস। এয়ারপোর্টে নেমেই কোনওক্রমে কাস্টমস ডিঙিয়ে বাইরে পা দিয়েই বলে উঠল, উঃ, বাঁচলাম বাবা!

চারুশীলাকে রিসিভ করতে একটা বাহিনীই হাজির ছিল এয়ারপোর্টে। তার মধ্যে চয়নও। সে চারুশীলার মুখে যে স্বস্তির প্রকাশ দেখল তাতে হাসিই পাচ্ছিল তার। আনন্দের হাসি। এই অস্থিরচিত্ত মহিলা চয়নের একটা নির্ভরতার স্থল। এই ফিরে আসা যেন চয়নের রুক্ষ শুষ্ক জীবনে মেঘের সঞ্চার। দুর্বল হাতে সেও গোটা দুই স্যুটকেস বইল। তিনখানা গাড়ি এবং চারটে ট্যাক্সিতে বোঝাই হল মাল ও মানুষ।

বাড়িতে বসে গেল একটা সভা। সুব্রত আসেনি। ছেলেমেয়ে নিয়ে শুধু চারুশীলা। তিনজনের মুখেই আনন্দ আর স্বস্তির হাসি। এই ভিড়ের মধ্যে চয়ন এক ধারে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। তার শুধু চেয়ে থাকা। চেয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ তার চোখে একটা দৃশ্য ধরা পড়ল। এই ভিড়ে ভিড়াক্কার জমায়েত ও উচ্চকণ্ঠ

কথাবার্তার মধ্যে দু জোড়া চোখ মাঝে মাঝে পরস্পরের দিকে নিবদ্ধ ও নিষ্পলক হয়ে থাকছে। তারপর দুজনেই যেন লজ্জা পেয়ে সরিয়ে নিচ্ছে চোখ। বার বার।

হেমাঙ্গ হঠাৎ চারুশীলাকে বলল, বারোটা স্যুটকেস এনেছিস, তোদের তিন জনের পাওনা তো মোটে ছটা স্যুটকেস! তাও আমেরিকা থেকে এলে। বাকি ছটা কি মাশুল দিয়ে আনলি? কত গেল?

চারুশীলা চোখ পাকিয়ে বলে, সব জায়গায় তোর এত হিবে কেন রে? মাশুল দিয়েছি বেশ করেছি।

আমেরিকার বাজার তো ফাঁকা করে দিয়ে এসেছিস দেখছি।

কিনবো না তো কি? কী সস্তায় কী সুন্দর সুন্দর জিনিস! যা দেখি তাই কিনতে ইচ্ছে করে।

ওইটেই তো তোর রোগ! কনজিউমারিজমের চূড়ান্ত।

আর তুই! তুই কিছু কম যাস নাকি! বাড়িটাকে তো জিনিসের মিউজিয়ম বানিয়ে রেখেছিস।

হেমাঙ্গ ব্যথিত গলায় বলে, অতীতের কথা। আজকাল আর কেনাকাটা করিই না। তোকে দেখেই বৈরাগ্য এসেছে।

বেশি বকিস না। জাহাজে আমার আরও জিনিস আসছে।

গোটা জাহাজ বোঝাই করে নাকি?

হলেই বা। তোর মত সন্নিসি তো নই। আমার বাপু টাকা ওড়াতে ভাল লাগে।

চয়নের দিকে চেয়ে চারুশীলা হঠাৎ বলল, এই চয়ন, অমন চুপচাপ কোণে দাঁড়িয়ে কেন? ইস, কতকাল পরে চেনা মুখগুলো আবার দেখছি! আমার হাঁফ ধরে গিয়েছিল। এসো তো চয়ন, আমার সামনে এসে বসো। তোমার জন্য অনেক জিনিস এনেছি।

চয়ন মৃদু হেসে বলে, অত জিনিস দিয়ে কি করব? আমি তো একটা মানুষ। আপনি কত শার্ট প্যান্ট দিয়েছেন।

তাতে কি? আরও দেব। ওই হেমাঙ্গর মতো বৈরাগী হয়ে থেকো না। ভাল পোশাক পরবে, ভাল খাবে-দাবে। তোমার চেহারা একটু ফিরেছে।

বিদেশের গল্প উঠল। কফি আর বিদেশী বিস্কুট সার্ভ করা হল। সব কিছুর মধ্যে চয়ন শুধু দেখেছিল দুটি নিঃসঙ্গ মানুষের দু' জোড়া চোখ মাঝে মাঝে জোড়া লাগছে। সরে যাচ্ছে। বার বার।

চারুশীলার ফিরে আসায় কলকাতাটা অনেক ঝলমলে হয়ে গেল চয়নের কাছে। বাতাসে যেন একটা আনন্দের বার্তা বয়ে যাচ্ছে। বড় খুশি হল। আরও খুশি হল, দু' জোড়া চোখ দু' জোড়া চোখকে খুঁজে বেড়াচ্ছে বলে।'...

তিন মাসের মাথায় হঠাৎ এক সন্ধেবেলা অনিন্দিতা উঠে এল ছাদে।

শোনো, তোমার সঙ্গে সিরিয়াস কথা আছে।

চয়নের আজ শরীর ভাল নেই। বর্ষার শুরুতেই তার ঠাণ্ডা লেগে সামান্য জ্বর হয়েছে। টিউশনিতে যায়নি। ঘরে বসে বই পড়ছিল। উঠে বসে বলল, বলো।

অনিন্দিতা দরজায় দাঁড়িয়ে তার দিকে গম্ভীর চোখে চেয়ে বলল, তুমি কি বাবাকে টাকা দিয়েছে?

চয়ন মাথা নত করে বলল, কে বলেছে?

বাবাই বলেছে। তবে সহজে নয়। আমরা বাবার লক্ষণ জানি। জেরা করে করে কথা বের করেছি।

চয়ন মৃদু স্বরে বলল, উনি ধার নিয়েছেন।

কত টাকা?

আপাতত দশ হাজার।

আপাতত মানে! আরও দেবে নাকি?

উনি বলেছেন, আরও কিছু লাগতে পারে।

অনিন্দিতা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, ছিঃ।

রাগ করছো কেন?

রাগ করব না। তুমি কত কষ্ট করে চালাও তা তো আমি জানি। বাবা কী আক্কেলে তোমার কাছ থেকে টাকা নিল তা বুঝতে পারছি না। লোকটা সারা জীবন এইসব করে বেড়াচ্ছে।

চয়ন মৃদু হেসে বলল, ছিল, তাই দিলাম।

ছিল মানে! কষ্ট করে টাকা জমিয়েছে, ব্যাংকে থাকলে সুদ হত। তোমার টাকার গল্পটা আমিই বাবা আর মায়ের কাছে করেছিলাম। সেইটেই ভুল হয়েছে দেখছি। টাকার গন্ধ পেয়েই তোমাকে এসে ধরেছে। আমাদের কিছু বলেনি। কিন্তু বাবার টাকার সব হিসেব আমরা জানি। বাড়তি দশ হাজারের হিসেব আমিই ধরেছি। তারপর চেপে ধরায় বাবা স্বীকার করেছে যে, টাকাটা তুমি দিয়েছে। আচ্ছা চয়ন, বাবাকে টাকাটা দেওয়ার আগে তোমার কি উচিত ছিল না আমাকে একবার জিজ্ঞেস করে নেওয়া! তুমি তো জানো না, বাবা কিরকম লোক।

চয়ন একটু হাসল।

অনিন্দিতা বলল, কাজটা খুব খারাপ করেছে। আমরা না জানতে পারলে টাকাটা তুমি আর ফেরত পেতে না। বাবা খারাপ লোক নয়। কিন্তু গরিব তো! গরিবের চরিত্র বলে কিছু থাকে না। তোমার টাকাটা বাবার শোধ দেওয়ার ক্ষমতাই নেই।

সেটা আমি জানতাম।

জেনেও দিলে? তুমি অদ্ভুত মানুষ। দশ হাজার টাকা এক কথায় যে দিয়ে দেয় সে কিন্তু বোকাও।

কেন যে টাকাটা নিয়ে এত কথা বলছো! আমার লজ্জা করছে।

তোমার চেয়েও আমার লজ্জা ঢের বেশি। শোনো, বাবাকে আর একটি পয়সাও দেবে না। বাবাকে আমিও খুব বকে দিয়েছি।

তুমি আজ খুব উত্তেজিত।

আমার বড্ড সম্মানে লেগেছে। বাবা যদি টাকাটা শোধ দিতে না পারে তাহলে তোমার কী ধারণা হত বলল তো আমাদের সম্পর্কে?

খারাপ ভাবতাম না। লোকে তো অভাবে পড়েই নেয়!

তুমি জানো না। বাবার অভাব যতটা নয় তার চেয়ে বেশি হল উদ্বেগ। আমরা গরিব ঠিকই, কিন্তু একখানা ছোটো বাড়ি করার মতো টাকা বাবার ছিল। বসে থেকে থেকে সময় গেল, জিনিসের দাম বাড়ল, এই কৃপণতার কোনও মানে হয়!

চয়ন ফের মৃদু একটু হাসল।

তোমাকে আজই বাবা এক হাজার টাকা দিয়ে যাবে। বাকিটা শোধ দিতে একটু দেরি হতে পারে, কিন্তু দু মাসের মধ্যে নিশ্চয়ই।

আরে, অত তাড়াহুড়োর কি আছে!

তোমার নেই, আমার আছে। বুঝলে!

বুঝেছি। বাড়ি কদ্দূর?

ছাদ ঢালাই হয়ে গেছে। জানালা দরজা হয়নি, হবেও না। তবে বাঁশের ঝাঁপ দিয়ে কাজ চালানো যায়। দেখা যাক।

তুমি যে কেন এত উতলা হচ্ছো? বাড়িটা ওঁকে শেষ করতে দাও, তারপর টাকা শোধ দিলেও চলবে।

না, তা হয় না। তোমার কষ্টের টাকা, ও টাকা নেওয়া পাপ।

তা নয় অনিন্দিতা, আর কেউ ওঁকে টাকাটা দেবে না। সন্দেহ করবে, অবিশ্বাস করবে, কিংবা দিলেও চড়া সুদ নেবে।

সে তো ঠিকই। কিন্তু এভাবেই আমাদের চলতে হবে। ভেবো না।

তুমি অকারণে রাগ করছো।

অকারণে নয়। বাবাকে আমি চিনি। উনি তোমাকে পেয়িং গেস্টও রাখতে চাইছেন। লোকটা খুব বোকা। বাস্তব বুদ্ধি কিছু নেই। উনি ভাবছেন তোমাকে আর আমাকে একটা সম্পর্কে বেঁধে ফেলা যাবে।

চয়ন মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

অনিন্দিতা বলল, হেসো না। বাবার বোকামি দেখলে গা জ্বলে যায়।

আরও তিন মাস বাদে অনিন্দিতারা চলে গেল। বাড়ি যাহোক করে শেষ হয়েছে। বাকিটা বাড়িতে গিয়ে শেষ করবে। যাওয়ার সময় অনিন্দিতা খুব কেঁদেছিল। বলল, তোমার মতো একটা মানুষ কি আর পাবো? ভাল থেকো।।

টাকাটা ওরা শোধ দিয়ে গেল। কিন্তু তাতে একটুও খুশি হল না চয়ন। মনে হল, না দিলেই বোধহয় ভাল ছিল। কত কষ্ট হল ওদের! হয়তো গয়না-টয়না বিক্রি করেছে।

১০২

কাকা তাকে ডাকল না, খোঁজও করল না। প্রথম দিন কয়েক আশায় আশায় ছিল বীণাপাণি। কাকা তাকে বড় আর্টিস্ট করার স্বপ্ন দেখত। হয়তো দোষঘাট ভুলে গিয়ে ক্ষমা করে দেবে, ডেকেও পাঠাবে। কিন্তু একদম সাড়াশব্দ নেই।

দিন সাতেক বাদে বীণাপাণি বুঝতে পারল, কাকা তাকে আর ডাকবে না। হয়তো প্রতিশোধ নেবে না, কিন্তু তা বলে সব ভুলেও যাবে না। নিজের সম্মান বিসর্জন দিয়ে বীণা গিয়ে দাঁড়াতেও পারবে না কাকার সামনে।

কিন্তু দিন কি করে চলবে সেইটেই সমস্যা। পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিল কাকা। তখন সুনজরে দেখত, বোনাস না কি যেন বাবদে টাকাটা দিয়েছিল তাকে। ব্যাঙ্কে একটা ফিক্সড ডিপোজিট করে রেখেছিল সে। টাকাটা তুলতে হল।

সজল এসে প্রায়ই বলে, চলো, বিয়েটা সেরে ফেলি।

আজকাল বিরক্ত হয় বীণাপাণি। বলে, বিয়ে-বিয়ে করছে কেন বলল তো! ওটা একটা ব্যাপার নাকি? আমার জীবনে কত বড় সর্বনাশটা হয়ে গেল বলল তো! কোনও দল যদি না ডাকে তবে না খেয়ে মরতে হবে। ভাগ্যিস কিছু টাকা বোনাস দিয়েছিল কাকা, তাই চলছে।

সেই পাঁচ হাজার টাকা?

হ্যাঁ।

সজল একটু হেসে ম্লান মুখে বলল, বোনাস কে বলল?

কাকাই তো বলেছিল এরকম একটা কথা।

সজল মাথা নেড়ে বলল, বোনাস নয়। কাকাও দেয়নি নিজের ট্যাঁক থেকে।

তাহলে?

ওটা দিয়েছিলেন তোমার স্বামী নিমাইবাবু।

স্তম্ভিত হয়ে গেল বীণাপাণি, তার মানে!

কাকাই একদিন বলেছিল, নিমাই বীণার ঋণ শোধ করতে টাকা পাঠিয়েছে। মিথ্যে কথা বলে টাকাটা তাকে গছাতে হয়েছে।

নিমাই দিয়েছে!

হ্যাঁ। আমি জানি বীণা।

বীণা বিছানায় অবশ শরীরে বসে পড়ে বলল, ঋণ শোধ দিয়েছে?

সেরকমই শুনলাম। নিমাইবাবু মানুষটি বড্ড ভাল। আমি যখন গিয়েছিলাম তখনও মনে হয়েছিল, খুব সৎ ধর্মভীরু মানুষ। আমি মাংস-পরোটা খেয়েছিলাম, উনি দাম দিতে দেননি।

সেইজন্যই ভাল?

না বীণা, সেইজন্য নয়। কেমন যেন মনে হয়েছিল, উনি এই আমাদের মতো নুন। অন্যরকম।

ওকে তোমরা কিছুই জান না। ভীষণ পাজি, নিমকহারাম, শয়তান।

সজল মাথা নেড়ে বলে, তা ঠিক। বাইরে থেকে আর কতটা বোঝা যাবে! তবে দোকানটা কিন্তু খুব চলে। আমি গত সপ্তাহে কাঁচরাপাড়া গিয়েছিলাম। দোকানটা দেখলাম আরও বড় হয়েছে। প্রচণ্ড বিক্রি।

বীণা রাগের গলায় বলল, তাই এত টাকার গরম! আমার ঋণ শোধ দিয়েছে!

ভাগ্যিস দিয়েছিল! নইলে তোমার এখন চলত কিসে? তোমারও চাকরি নেই, আর আমাকে তো তাড়িয়েই দিয়েছে অপমান করে।

বীণা চুপ করে রইল। বুকে আগুন জ্বলছে।

বীণা, মিছিমিছি রাগ করে কী করবে? জীবনে এরকম খারাপ সময় সকলেরই মাঝে মাঝে আসে। আমি তোমাকে বিয়ের কথা কেন বলি জানো? দুজনে মিলে আমাদের একটা জোর হবে। একটা কিছু করতে পারব।

কী করবে?

ধরো যদি যাত্রার দল করি!

যাত্রার দল করা কি চাট্টিখানি কথা!

খুব শক্তও নয়। এ অঞ্চলে তোমার বেশ নামডাক আছে! তোমাকে দাঁড় করালে ধীরে ধীরে একটা দল করা যায়।

তোমার অভিজ্ঞতা নেই বলে স্বপ্ন দেখছো। কাকার বিশ্ববিজয় অপেরা নিতান্তই ছোট দল, তবু তারও কত লোকজন, কত জিনিসপত্র লাগে দেখেছো? কাকা পয়সাওলা মানুষ বলে পেরেছে। আমরা পারব না।

চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি!

বীণা সবেগে মাথা নেড়ে বলে, ওসব আমাকে বোলো না। নতুন দল গড়ে তারপর কেঁচে গণ্ডুষ করা আমার পোষাবে না। ওসব তোমার জন্য। আমি অনেক ঠেকে শিখেছি।

কেন যে এত হতাশ হয়ে পড়ছো!

আমার সমস্যা তুমি বুঝবে না। তাই বিয়ের জন্য অমন হামলে পড়ছো।

আমরা তো একসঙ্গে থাকতেও পারি!

না সজল, তাও পারি না। আমাকে যত সস্তা বলে তুমি ভাবো ততটা সস্তা আমি নই। যদি শরীর চাও তাহলে বাজারে মেয়েমানুষের অভাব নেই। তাদের কাছে গেলেই পারো।

সজল লজ্জায় লাল হয়ে বলল, ছি ছি বীণা, আমি মোটেই ওভাবে বলিনি। আমি বলছিলাম নিমাইবাবুর সঙ্গে যখন তোমার ডিভোর্স হয়নি তখন বিয়েটা হয়তো অসামাজিক হবে। তাই বলছিলাম, আজকাল তো লিভিং টুগেদার হয়।

হতে পারে। কিন্তু ওসব প্রস্তাব আমার এখন ভাল লাগে না সজল। এখন তুমি যাও।

কথার মাত্রা রাখতে পারিনি। মাপ করে দিও।

সজল গেল। কিন্তু ছাড়ল না। মাঝে মাঝেই আসতে লাগল। সজলকে কিছু খারাপ লাগে না বীণার। কিন্তু এই অনভিজ্ঞ, কপর্দকহীন সুন্দর ছেলেটার হাতে নিজেকে সমর্পণ করার কথাও কেন যেন আজকাল আর সে ভাবতেই পারে না। বসে বসে গল্প করতে তার অবশ্য খারাপ লাগে না।

গল্প করে করে তিন মাস কেটে গেল। তাদের সম্পর্ক একটুও এগোলো না। বীণা ঘোরাঘুরি করে এল চিৎপুরের যাত্রাপাড়ায়। কোনও দলেই জায়গা নেই। অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপ হচ্ছে। হাতের টাকা ফুরিয়ে এল প্রায়। দুশ্চিন্তায় রাতে ভাল ঘুম হয় না।

কুসুম এসে একদিন বলল, বীণাদি, কাজ করবে?

কী কাজ রে?

সেলাই ফোড়াই জানো? তাহলে সমীরবাবুর ওখানে কাজ হতে পারে। উনি সেলাই জানা লোক খুঁজছেন। কাঁথা ফোঁড় না কী যেন বলে, শাড়ির ওপর সেই কাজ করতে হবে।

ধুস! ওসব আমি পারি না।

কুসুম হেসে বলল, তাহলে কী করবে?

হ্যাঁ রে, কাকা আমার কথা কিছু বলে না?

না।

একদম না?

না গো, তোমার কথা আর কেউ বলে না।

নতুন পালা নামছে নাকি, জানিস?

হ্যাঁ। কাকা তো নতুন একটা পালা লিখল। বর্ষাকালটা জোর রিহার্সাল হবে।

আমার বদলে এখন কে করবে মেইন পার্ট?

পুতুল রায় বলে সেই যে মেয়েটা। সে-ই করছে।

এঃ মা! তার তো লেপাপোঁছা নাক-চোখ। জিবের আড় ভাঙেনি।

এখন কাকা তো তাকেই তৈরি করছে।

বীণার মন খারাপ হয়ে গেল। কুসুম তার ঘরের কাজকর্ম আজও করে। তাকে সঙ্গও দেয়। তার কাছে দলের অনেক খবর পায় বীণা। সেইসব খবর তার দীর্ঘশ্বাসের কারণ হয়। এই যে পুতুল নামে মেয়েটা, ফিরে তাকানোর মতো চেহারাও নয়। আর অভিনয়ের কিছুই জানে না এখনও, এর কথা ভেবে আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

হ্যাঁ রে কুসুম, আমাকে একটা লক্ষ্মীর পট এনে দিবি?

দেবো না কেন? কী করবে?

কোনওকালে পুজোআচ্চা ধর্মকর্ম করিনি তো! আজকাল মাঝে মাঝে মনে হয়, এসব একটু করে দেখি।

খুব ভাল হয় বীণাদি। লক্ষ্মীর পাঁচালিও কিনে আনব'খন। মন ভাল হবে। দেখো।

শুধু লক্ষ্মী নয়, কয়েকদিনের মধ্যেই বীণার ঘরে লক্ষ্মী, শিবলিঙ্গ, কালী আর শীতলার পট চলে এল। একটা সস্তা জলচৌকির ওপর তাদের বসানো হল। বীণা ব্যস্ত হয়ে পড়ল তাদের নিয়ে। ঠিক যেরকম ছেলেবেলায়

পুতুল খেলত সেরকমই অবস্থা এখন তার।

সজল এসে সব দেখে হাসে, কী করছো বলো তো! হঠাৎ এত পুজোআচ্চা কেন?

কিছু নিয়ে তো থাকতে হবে!

কিছু নিয়ে থাকতে চাও তাহলে তো সবচেয়ে ভাল হত একটা দল করলে। নতুনদের নিয়েই করব।

তুমি এখনও দল করার কথা ভাবছো?

ভাবছি। আমার তো আর কোনও যোগ্যতা নেই। অভিনয়টাও ভাল জানি না, তবু বড় নেশা।

একটু ভাবো না বীণা! তোমাকে পাশে পেলে মনে হয়, অনেক কিছু করতে পারি।

আমাকে পাশে পাওয়ার আশা ছাড়ো। আমি আর নতুন করে কিছুই শুরু করতে পারব না। আমার মন ভেঙে গেছে।

ডলার আর পাউন্ডগুলো নিয়েই কি এত কাণ্ড হল?

হ্যাঁ। ও টাকা কাকার নয়। আমার কাছে একজন গচ্ছিত রেখেছিল। ন্যায্য পাওনা আমারই হয়।

আমাকে যদি একবার বলতে তাহলে ঠিক লকাতায় নিয়ে গিয়ে ব্ল্যাকে বেচে একটা ক্যাপিটাল করে ফেলতাম। আজ আর টাকার জন্য কিছু আটকাত না।

আজ আর টাকাটার জন্য শোক নেই! তবে দল ছাড়তে হল বলে কান্না পায়। কেউ আর আমাকে চিনবে না।

চিনবে বীণা। তোমার ভিতরে যা আছে তা কম মেয়ের মধ্যেই পাওয়া যায়। আমি দল করার কথা ভাবছি। তুমি তাতে অভিনয় করতে রাজি তো?

বীণা হাসল, গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল।

পারব বীণা, নিশ্চয়ই পারব।

আচ্ছা আমার আজও জানা হয়নি তোমাকে ওরা মারল কেন?

ও কথা থাক। মেরেছে তো কী হয়েছে! আমি ওদের অন্য ভাবে মারটা ফিরিয়ে দেবো। সেইজন্য তো দল করার কথা ভাবছি।

বরং বাড়ি ফিরে যাও সজল। সংসারে মন দাও।

দূর! আমার আবার সংসার কোথায়?

মা-বাপ তো আছে।

তারা আমার ধার ধারে নাকি? ভাই তো আমাকে দেখতেই পারে না। যাত্রা করে বেড়াই বলে প্রেস্টিজও দেয় না।

এখানেই বা কোন মুখে আছো? কি করে চলে তোমার?

সে কি তুমি জাননা না? চেহারাটা ভদ্রলোকের মতো, গান গাইতে পারি, গল্প জমাতে পারি, লোকের দায়ে দফায় দৌড়ঝাঁপ করতে পারি, এইসব প্লাস পয়েন্ট থাকায় এর ওর তার বাড়িতে মাথা গোঁজা বা দু-মুঠোর জোগাড় হয়ে যায়। দুটি মেয়েকে গান আর একটা ছেলেকে তবলা শেখাই। আবৃত্তি শেখানোর ক্লাসও খুলছি। একে কি বেঁচে থাকা বলে বীণা? কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় কি বলো তো!

বিয়ের ভূত মাথা থেকে নেমেছে?

বিয়ের ভূত? কী যে বলো! বিয়ে করার কথা কখনও মনেই হয়নি। তোমাকে দেখার পর মনে হল, হ্যাঁ, এরকম কাউকে পেলে এ জীবনটার একটা সার্থকতা আসবে। এটা ঠিক শরীরের আকর্ষণ নয় বীণা, এ একটা অন্যরকম ব্যাপার।

শোনো, আমার একটু তীর্থে যাওয়ার শখ হয়েছে। যাবে সঙ্গে?

কোথায় যেতে চাও?

প্রথমে তারকেশ্বরে যাই চলো। সকালে গিয়ে বিকেলে চলে আসব। তারপর একবার তারাপীঠ।।

কেন বলো তো! তোমার হলোটা কী?

কী যে হল তা বুঝতে পারছি না। দেখিই না এসব করে একটু। কোনওদিন তো ভগবানকে ডাকিনি।

ঠিক আছে। কবে যাবে বোলো, সঙ্গে যাবো। তোমার সঙ্গে যাওয়ার তো একটা থ্রিল আছেই।

কথাটা কেন যেন ভাল লাগল না বীণার। কথাটা পবিত্র নয়।

দু'দিন পর বীণা তারকেশ্বর গেল বটে, কিন্তু সঙ্গে সজলকে নিল না, নিল কুসুমকে। সারা দিনটা কেটে গেল যাতায়াতে। ভিড়ে, ঠেলাঠেলিতে। যখন ফিরল তখন শরীর ক্লান্ত, মনও ক্লান্ত।

হ্যাঁ রে কুসুম, তীর্থ করে এলাম তবু মনটা ভাল লাগছে না কেন রে?

ওমা! ও কি কথা! আমার তো খুব ভাল লাগছে। বাবা তারকেশ্বর যেন গা থেকে পাপতাপ সব পুঁছে নিয়েছেন। ঝরঝরে লাগছে।

তোর আবার পাপটা হল কিসে?

আহা, কত পাপ অজান্তেও হয়।

তাহলে তোর জন্যই এইসব তীর্থটীর্থ। তোর মতো যদি সরল হতে পারতাম!

তোমার না মনটাই খুব চঞ্চল। সকলের তীর্থে গেলে আনন্দ হয়, তোমার কেন হয় না?

আমি বোধহয় খুব পাপী।

যাঃ। তুমি খুব ভাল।

সে তোর কাছে। ভগবানের কাছে নয়।

একটা কথা বলব বীণাদি?

বল না।

মেয়েদের কাছে কিন্তু স্বামীও ভগবান। কথাটা বললে তুমি রাগ করবে, নিমাইদাদাও কিন্তু বড্ড ভাল মানুষ। ভগবান যদি তোমার ওপর রেগে থাকেন তাহলে ওইজন্যই।

রেগে যেতে গিয়ে বীণা হেসে ফেলল, তোর অঙ্ক খুব সোজা। সব একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাস, না?

তা নয় তো কী?

তুই জীবনে খুব সুখী হবি। খুব আহ্লাদে থাকবি।

তুমি কেন নিমাইদাকে ভালবাসো না বলো তো! ওরকম মানুষকে ভাল না বেসে পারা যায়

তুই বুঝি নিমাইদার প্রেমে পড়েছিস রে মুখপুড়ি?

কী যে সব অসভ্য অসভ্য কথা বলো!

অসভ্য কেন হবে! ঠিকই তো বলছি। এতই যদি পছন্দ তবে বিয়ে করে ফেল। এখন তো আর আমি তার বউ নই।

ইস! তোমার মুখের একেবারে আগল নেই। বীণাদি, ভগবান কিন্তু পাপ দিচ্ছেন।

বীণা খুব হাসল, বলল, দিক না পাপ।

খুব তো বলছো, ওদিকে জ্বরের ঘোরে স্বপ্ন দেখে তো কাঁদতে বসেছিলে নিমাইদাদা আবার বিয়ে করেছে ভেবে। আমাকে খবর আনতে বলেছিলে, মনে নেই?

তা আছে।

তবে অত বড় বড় কথা বলছো যে! তুমি মনে মনে ঠিকই নিমাইদাদাকে ভালবাসো, মুখে স্বীকার করতে চাও না।

খুব বুঝেছিস।

বুঝিনি?

ছাই বুঝেছিস।

কুসুম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কি জানি বাপু, আমি মুখসুখ মানুষ। যেমন বুঝি বলি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বীণা গম্ভীর হল। বলল, হয়তো তুই-ই ঠিক বুঝিস রে। কে জানে কে ঠিক আর কে ভুল!

বীণা চুপচাপ শুয়ে রইল। সারা দিন গরম আর ঘামে তার শরীর দুর্বল লাগছে। মনটা বিস্বাদে ভরা। এভাবে কি জীবন কাটবে? এই কাজ-না-থাকা, পালা-না-থাকা, ক্ল্যাপহীন জীবন কিভাবে কাটবে তার?

রাতে কিছু খেল না বীণা। রান্না করতেই ইচ্ছে করল না। শুয়ে মড়ার মতো ঘুমোলা।

সকালে উঠে তার মনে হতে লাগল, এভাবে জীবন কাটবে না তার। এভাবে কিছুতেই বেঁচে থাকা যাবে না। তাকে কিছু করতেই হবে। কী করবে সে? কী করবে?

বেলা দশটা নাগাদ যখন দ্বিতীয়বার চা খেতে বসেছে বীণা, তখনই একটা ছেলে এল। সাধারণ চেহারা। বিনয়ী। বলল, আমাকে নিমাইদাদা পাঠিয়েছেন। এই যে চিঠি।

নিমাইয়ের চিঠি! খুব অবাক হল বীণা। মুক্তোর মতো হস্তাক্ষরে খামের ওপর তার নাম লেখা।

চিঠিটাও মুক্তাক্ষরে। তবে সম্বোধন নেই। শুধু লেখা : তোমার অবস্থা আমি জানি। যদি দোষ না ধরো তাহা হইলে সামান্য কিছু টাকা গ্রহণ করিও। এই অর্থে কোনও গ্লানি নাই। আমি পরিশ্রম দ্বারা উপার্জন করিয়াছি। নিমাই।

বীণা চোখ তুলে চাইতেই ছেলেটা তার প্লাস্টিকের ব্যাগ খুলে এক বাণ্ডিল নোট বের করে দিল।

আশ্চর্যের বিষয়, বীণা কিছু না ভেবেচিন্তেই টাকাটা নিল।

পাঁচ হাজার আছে। গুনে নিন।

গুনতে হবে না।

একটু যদি লিখে দেন তো ভাল হয়।

কী লিখবো?

টাকাটা যে পেয়েছেন।

ও।

বীণা ঘরে খুঁজেপেতে একটা পার্ট মুখস্থ করার খাতার কাগজ ছিঁড়ে তাতে লিখল, টাকাটা পেয়েছি। বীণা।

সারাটা দিন বীণা আজ ঝুম হয়ে বসে রইল। রান্না করতে ইচ্ছে হল না। খিদে পেয়েছিল, মুড়ি চিবিয়ে চা খেয়ে খিদেটা মারল।

কুসুম সন্ধেবেলা এল।

কী গো বীণাদি, মুখ শুকননা কেন?

এমনি বসে আছি। মন ভাল নেই।

আবার কী হল?

তোর নিমাইদাদার কাছে হেরে যাচ্ছি।

আহা, কী কথা! হারার কী হল?

তোর নিমাইদাদা আমাকে খারপোষ পাঠাচ্ছে।

সে আবার কী?

বউকে ত্যাগ দিলে খোরপোষ দিতে হয় না, তাই!

কুসুম হাসল, টাকা পাঠিয়েছে বুঝি?

হ্যাঁ, আর আমিও নির্লজ্জের মত নিলাম।

নেবে না কেন? ও টাকা তো আশীবাদ!

তোর মতো করে ভাবতে পারলে বোধহয় ভাল হত। আমি যে পারি না।

না পারো, টাকাটা মাথায় ঠেকিয়ে খরচ কোরো। ওতেই হবে।

কী হবে রে?

ভাল হবে।

বীণা কিছু বলল না। আজ মনটা অন্যরকম লাগছে। অদ্ভুত লাগছে।

বীণাদিদি, একটা কথা বলব?

বল না!

যাও না একবার নিমাইদাদার কাছে!

গিয়ে?

পায়ে পড়ো গিয়ে।

ওমা, কেন?

ক্ষমা চাও।

তাই বা কেন?

স্বামীর পায়ে ধরতে হয়।

তোর মাথা!

১০৩

হ্যাঁ গো, গৃহপ্রবেশে আমরা কাকে কাকে নেমন্তন্ন করব? রবিবারের এক সকালে বিষন্ন মণীশকে কথাটা জিজ্ঞেস করল অপর্ণা।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। মেঘলা আকাশ নিবিড় মেঘে ছাইরঙা হয়ে আছে। মণীশ বসে আছে আবছা অন্ধকার ঘরে, জানালার ধারে তার পলকা ইজিচেয়ারে। পাশে একখানা টেবল। ইংরেজি-বাংলা দুটো খবরের কাগজ জড়ো হয়েছে তার ওপর। মণীশ কাগজদুটো একটু উল্টে পাল্টে রেখে দিয়েছে, যেন পৃথিবীর কোনও খবরেই তার আর কোনও প্রয়োজন নেই। বিষন্ন দুটি চোখ জানালার বাইরে স্থাপন করে সে চুপ করে বসে আছে।

ক্রমে ক্রমে মণীশের এই চুপ হয়ে যাওয়া ভাল লাগছে না অপর্ণার। আজকাল রাতে বিছানায় শুয়ে আগেকার মতো কিছুক্ষণ গল্প করার অভ্যাসটাও কমে যাচ্ছে তাদের। অপর্ণার অনেক কথা থাকে। বলেও, কিন্তু মণীশ নীরবে শশানে। জবাব দিতে চায় না। মণীশের কাছ থেকে কথা বের করতে না পেরে অপর্ণার নিঃসঙ্গ লাগে, ভয় হয়। ভয় জিনিসটার কোনও মাথামুণ্ডু নেই। কতরকম ভয়, কত রকম যে অমঙ্গলের কথা মনে হয় সব সময়ে!

হ্যাঁগো, কী হল তোমার? বলে মণীশের মাথায় সস্নেহে হাত রাখল অপর্ণা।

মণীশ চোখ দুখানা তার দিকে তুলল। মুখে বিমর্ষতা ছাড়া আর কোনও এক্সপ্রেশন নেই। শুধু ছেলে হোস্টেলে গেছে বলেই কি এতটা মনখারাপ হয় কারও!

মণীশ একটু জোর করেই হাসল। বলল, কিছু হয়নি। আজকাল একটু গুটিয়ে যাচ্ছি নিজের মধ্যে। কী বলছিলে?

আমি বলছিলাম, গৃহপ্রবেশে কাকে কাকে ডাকা হবে?কার্ড ছাপিয়ে নেমন্তন্ন করতে হবে কি না। ক্যাটারার কাকে ঠিক করবে। অনেক কথা আছে যে তোমার সঙ্গে। অমন চুপ করে থাকলে তো আমার চলবে না!

মণীশ একটু উঠে সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করে বলল, এগুলো তো সব তোমার ব্যাপার। আমার তো কয়েকজন অফিস কলিগ ছাড়া ঢাকার কেউ নেই। আত্মীয়স্বজনই বা কে বলো! একটা ভাই, তা সেও বিকানিরে। তাকে নেমন্তন্ন করলেও আসতে পারবে না। আমি বলি, তুমি যাকে ইচ্ছে ডাকো। আমি আমার কলিগদের কয়েকজনকে ডাকতে পারি।

তোমার অনেক বন্ধু ছিল একসময়ে। যখন খবরের কাগজে কাজ করতে তখনকার কলিগরাও তো আছে! ডাকবে না তাদের?

মণীশ প্রস্তাবটা মাছি তাড়ানোর মতো হাতের ঝাপটায় উড়িয়ে দিল। বলল, আরে না না, ও চ্যাপটার কবেই ক্লোজড হয়ে গেছে। কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে? পুরনো আমল ধরে টানাটানি কেন ভাই!

কেমন দেখাবে বলল তো সেটা! আমার বাপের বাড়ির লোকেরা আসবে, তোমার কেউ আসবে না?

মুখটা করুণ করে মণীশ বলল, আমার কেউ নেই যে অপু! কবে মা-বাবা মরে গেছে। এক কাকা ছিল, বছর পাঁচেক হল নেই। তার ছেলে নয়ন দিল্লিতে চাকরি করে, মেয়ে রাউরকেল্লায়। বহুকাল যোগাযোগ নেই। এদের ডাকার কোনও মানেই হয় না! কেউ আসবে না।

তাই তো বলছি, পুরনো বন্ধুদের ডাকো!

সেটাও অর্থহীন হবে। সম্পর্কই নেই, হঠাৎ নেমন্তন্ন করার মানে হয়?

আচ্ছা, একটা কথা বলবে?

কি কথা?

তুমি এক সময়ে দারুণ আড্ডাবাজ ছিলে। কিন্তু ধীরে ধীরে সব ছেড়ে দিলে কেন?

আবার জোর করে একটু হাসে মণীশ, মেজাজটা হারিয়ে গেছে।

কেন হারাল?

বিয়ে করার পর থেকেই কেন যেন বাইরে বাইরে কাটাতে ভাল লাগত না। তখন ফটোগ্রাফির জন্য খুব ঘুরে বেড়াতে হত। একটা ক্লান্তি ছিল। তোমাকে পেয়ে ঘরমুখো হলাম। তারপর নতুন একটা ভাল চাকরি পেয়ে আড্ডাটা ছাড়তে হল। ছেলে-মেয়ে হওয়ার পর আরও সরে এলাম। এরকম সবারই অল্পবিস্তর হয়।

না গো, তুমি বড্ড বেশি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছো! তোমাকে এতখানি ঘরকুনো আড্ডাছাড়া করতে কি আমি চেয়েছিলাম, বলো তো?

একটু অবাক হয়ে মণীশ বলে, তুমি করেছো বলিনি তো! আমার নিজেরই ভাল লাগত না।

কাজটা বোধহয় ভাল করেনি। তোমার একটা বাইরের জগৎ থাকলে বোধহয় ভালই হত।

ম্লান একটু হাসল মণীশ, এই-ই ভাল আছি।

বুবকার জন্য কি তোমার খুব বেশি কষ্ট হয়?

মণীশ মাথা নেড়ে বলে, না, বুবকা বড় হয়ে গেল, এখন তো দূরে সরে যাবেই। ওটা মেনে নিয়েছি। অত ভাবছো কেন?

তোমার মুখখানা যে ভীষণ করুণ দেখায় আজকাল।

ও এমনিই। আমার মনের কোনও ব্যালান্স নেই। এই ভাল, এই খারাপ।

অফিসে কিছু হয়নি তো?

আরে না, অফিসে কী হবে!

তাহলে এমন মেলাঙ্কলিক হয়ে যাচ্ছো কেন? আগে তো ঝুমকি বুবকা আর অনুর সঙ্গে আড্ডা মারতে, মেয়ে দুটো তো আছে।

মণীশ হাসল, হ্যাঁ আছে। তবে ওরা পরভৃৎ। ভাব করে কি হবে! কিছুদিন পরেই তো অন্যের ঘরে পালিয়ে যাবে।

উঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না। নিজের মেয়ে পরের ঘরে যাবে বলে তো খুব দুঃখ, আর পরের মেয়েকে যে তুলে এনেছে নিজের ঘরে! তার বেলা?

তা বটে। কিন্তু আমি তো জীবনের নিয়ম পাল্টে দিতে চাই না অপু। যা ঘটবার তা ঘটবেই! বুবকা বড় হল, হস্টেলে গেল, এরপর হয়তো বিদেশে চলে যাবে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাবে। এসব ঘটনা তো স্থির হয়েই আছে। আমি শুধু একটু গুমরে মরব এই যা!

ইজিচেয়ারের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে অপর্ণা বলল, ওগো ওরকম করতে নেই। তুমি ওরকম করলে আমি যে ভীষণ দুর্বল হয়ে যাই। তুমি আগের মতো একটু হই-চই করলে আমার বুকটা ঠাণ্ডা হবে।

স্তিমিত গলায় মণীশ বলে, আমার ভিতর থেকে হৈ-চৈ ভাবটা উঠে আসছে না অপু। তোমাকে যদি আমার ভিতরটা দেখাতে পারতাম! যেন একটা অন্ধকার ঘর। শব্দ নেই, আলো নেই, কিছু নেই।

ও মা গো! শুনলে বুকটা কেমন করে।

ভয় পেও না। হয়তো একটা ডিপ্রেশন চলছে। ঠিক হয়ে যাবে।

বরং বুবকাকে তাড়াতাড়ি আসতে বলে চিঠি লিখে দিই।

না না, এই তো সামার ভ্যাকেশন কাটিয়ে গেল। ওসব করতে যেও না। বুবকার জন্য নয় অপু। বুবকাও একটা ফ্যাক্টর বটে। কিন্তু আসলে হার্ট অ্যাটাকটাই আমার ভিতরে মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে। আজকাল কেবল এই বৃথা জীবনযাপনের অর্থটা হাতড়ে বেড়াই, কিছু পাই না।

তোমাকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে এবার ঠিক আমার হার্ট অ্যাটাক হবে। কী করলে তুমি ভাল থাকবে বলো তো?

তা তো জানি না। মাঝে মাঝে মনে হয় বেশ তপোবনের মতো যদি একটা জায়গা খুঁজে পেতাম। শান্ত, পবিত্র, নির্জন, চারদিকে নিবিড় গাছপালা, তাহলে বোধহয় সেখানে গিয়ে থাকতে ভাল লাগত।

সেরকম জায়গা বোধহয় খুঁজলে পাওয়া যাবে। ক'দিন ছুটি নিয়ে চলো ঘুরে আসি।

খুব উৎসাহ দেখাল না মণীশ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ওরকম জায়গা হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু গিয়ে হয়তো আমার আর ভাল লাগবে না।

হঠাৎ অপর্ণা বলল, আচ্ছা, আমার মনে পড়ল, চারুশীলার ভাই হেমাঙ্গ এরকমই একটা কোন জায়গায় যেন গিয়ে মাঝে মাঝে থাকে। চারুশীলার সঙ্গে ঝুমকিও একবার গিয়েছিল। সুন্দরবনের দিকে বোধহয়। সে নাকি নদীর ধারে খুব সুন্দর নির্জন একটা জায়গা। দাঁড়াও, ঝুমকিকে ডাকি।

থাক অপু। ওসব পরে হবে। তুমি তোমার গৃহপ্রবেশের কথা কী বলছিলে?

অর্পণা ম্লান হয়ে বলে, আমার গৃহপ্রবেশের কথা তো কেউই শুনতে চাইছে না। বাড়িটা যেন একা আমার। কী সুন্দর দেখতে হয়েছে বাড়িটা! যে দেখছে সেই পছন্দ করছে। চারুশীলার বর সুব্রত নিজে ডিজাইন দেখে দিয়েছে! কত বড় আর্কিটেক্ট! শুধু এবাড়ির কারোরই গাল উঠছে না।

তা নয় অপু। আমার এখন আর জাগতিক কিছুর প্রতিই আকর্ষণ নেই। তোমার বাড়ি খুব সুন্দর হয়েছে সন্দেহ নেই। আমার ভালও লেগেছে। তবে আমার আরও গভীর চিন্তার কারণ ঘটেছে বলেই বাড়িটা নিয়ে ভাববার বা আনন্দ করার মেজাজটা নেই।

সেইজন্যই তো আমার মন খারাপ। তোমার আনন্দ না হলে ও বাড়ি দিয়ে আমার কী হবে? আমার এত পরিশ্রম বৃথা গেল।

মণীশ মৃদুস্বরে বলল, আচ্ছা, আমি কি ইচ্ছে করে ডিপ্রেসড হয়ে আছি? মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে এমন তো হতেই পারে যখন সে নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করে হেরে যায়।

আমি শুধু কারণটা জানতে চাই।

কারণটা যদি আমিও জানতাম! নিজের মনে পাঁতি পাঁতি করে খুঁজে দেখছি রোজ, বুঝতে পারছি না।

আমার মনে হয়, বুবকার জন্যই।

হতে পারে। তবে কি জাননা, আজকাল আমার একা চুপচাপ থাকতে ভাল লাগে। আমি বরাবর হৈ-চৈ হুল্লোড় ভালবাসি। নির্জনতা বরং সইতে পারতাম না। আজকাল কেন লোনলিনেস ভাল লাগে!

তুমি কি ইনট্রোভার্ট হয়ে যাচ্ছো?

তাও জানি না। কিছুই জানি না। শুধু তোমাকে বলি, প্লীজ, আমাকে নিয়ে অত দুশ্চিন্তা কোরো না। কয়েকদিন যাক, স্পেলটা হয়তো কেটে যাবে।

অপর্ণার দু'চোখ টলটল করছিল জলে, এবার উপচে পড়ল। স্বলিত গলায় বলল, তোমাকে এরকম দেখলে আমার কত কষ্ট হয় তা জানো?

জানি অপু। আমি তো তোমার কাছেই আছি।

কোথায় কাছে আছে! কত দূর মনে হয় তোমাকে তা কি জানো?

তাও জানি। বিয়ার উইথ মি। আমার সঙ্গে এই সময়টা পার করে দাও।

আমার গৃহপ্রবেশের কী হবে?

গৃহপ্রবেশ হতে বাধা কি? হোক।

তুমি পার্টিসিপেট করবে তো?

কেন করব না? শুধু একটা অনুরোধ, অফিস থেকে এ বাড়িটার ভাড়া দিচ্ছে। আপাতত আমরা এ বাড়ি ছাড়ব না। কেমন?

নিজের বাড়ি থাকতে আর পরের বাড়িতে কেন?

এখান থেকে অফিসে যাতায়াতের সুবিধে বেশি। তাছাড়া এ জায়গাটা আমার বেশ ভদ্র বলে মনে হয়।

গৃহপ্রবেশের পর কি বাড়ি তালাবন্ধ পড়ে থাকবে?

তাই থাক না কিছুদিন।

অপর্ণা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাই থাক।

আজ মেঘলা বৃষ্টির দিনের চাপা অন্ধকারে অপর্ণার সকালটা মাটি হয়ে গেল। সে ধীর পায়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। হল পেরিয়ে সামনের বারান্দায় এসে বৃষ্টির দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার এখনও কত অপূর্ণ সাধ রয়ে গেছে। বাড়িটা হল, এরপর ছিল বাড়ি সাজানোর পালা। এখনও রং হয়নি ভিতরে। প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে পলেস্তারা পড়েছে। ওপরে হবে হাল্কা খুশিয়াল রঙের প্ল্যাস্টিক পেইন্ট। সামনের ঘরে ওয়াল পেপার লাগাবে বলে পছন্দও করে রেখেছিল একটা আরণ্যক দৃশ্য। কী যে চমৎকার হত। নতুন কিছু আসবাব দিয়ে সামনের হলঘরটা ছবির মতো সাজাবে।

কিন্তু কী হবে আর? যাকে নিয়ে, যাকে ঘিরে তার জীবনের সব সাধ-আহ্লাদ, সে কেন এরকম মনমরা হয়ে যাচ্ছে?

কী হয়েছে মা? এনিথিং রং? কাঁদছে নাকি?

অপর্ণা ফিরে অনুকে একটু দেখল। অনু আর ছোটোটি নেই। তার কাঁধ ছাড়িয়ে উঠছে। লকলক করছে বয়স। ওদের আর ভুলিয়ে রাখা যায় কি?

অপর্ণা চোখ মুছল। ধরা গলায় বলল, বাপির কাছে যা। কথা বলিস না। কাছে বসে থাক। মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দে, যা।

অনু একটু চিন্তা করল যেন। তারপর বলল, বাপি ইজ ব্রুডিং। ভেরি মাচ ইন এ ট্রান্স। বাপিকে ডিস্টার্ব কেন করবো মা?

তোর বাবার কী যে হয়েছে বুঝতে পারছি না।

বোধহয় হি ইজ মিসিং দাদা ভেরি মাচ।

তাই তো ভাবছি। কিন্তু এতটা কি স্বাভাবিক? ছ' মাসের বেশীই তো হয়ে গেল। এখনও কেন মিস করবে?

বাবা যে দাদাকে ভীষণ ভালবাসে। কিন্তু তুমি এত আপসেট কেন মা? হোয়াই ইউ?

আমার ভাল লাগছে না। গৃহপ্রবেশে কত আনন্দ হবে বলে ভেবেছিলাম। কিছু করতে ইচ্ছে করছে না।

অনু বেশ সুন্দরী। ফরসা, স্বাস্থ্য বেশ চমৎকার, মুখখানা চটক-সুন্দর। ঝুমকির সৌন্দর্য অন্যরকম। সে রোগার দিকে, লাবণ্যই বেশী। তাকে চোখে পড়ে না, কিন্তু একটু তাকিয়ে থাকলে ঝুমকি যে কত সুন্দর তা বোঝা যায়। অনু চট করে চোখে পড়ে। নিচের ঠোঁটটা ঝকঝকে সুন্দর দাঁতে একটু কামড়ে ধরে সে বলল, আচ্ছা আমি বাপির কাছে যাচ্ছি।

শোন, বেশি কথা বলিসনি।

আচ্ছা মা। আমি আজকাল বাপিকে অন্য ধরনের কম্প্যানি দিই। কবিতা শোনাই, শেক্সপীয়র শোনাই, বিটোফেন শোনাই। বুঝেছো?

বুঝেছি, তুমি তো পাকা মেয়ে।

ঠিক কথা। আমি ম্যাচিওরড।

শোন, বরং এক কাপ কফি করে নিয়ে যা। তোর বাবা এসময়ে একটু কফি খায় ছুটির দিনে। আজ বৃষ্টিও হচ্ছে।

ঠিক আছে।

ঝুমকি উঠেছে?

কখন! শী ইজ অলসসা ব্রুডিং।

কেন?

আজকাল দিদিও তো চুপচাপ মা। অল অফ ইউ আর কিপিং মাম।

অনু চলে যাওয়ার পর আরও কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখল অপর্ণা। তারপর হলঘর পেরিয়ে এল ঝুমকির ঘরে।

ঝুমকি এই সাতসকালে একটা মোটা বই খুলে পাশে রেখে টেবিলে খাতা খুলে কী লিখছে।

কী করছিস?

ঝুমকি তার ঠাণ্ডা হাসি হেসে বলল, একটু কাজ।

কিসের কাজ?

একটা প্রোগ্রামিং। যা শিখেছিলাম সব প্র্যাকটিসের অভাবে ভুলে যাচ্ছি।

তোর বাবা এত চুপচাপ হয়ে গেছে যে আমার মনটা ভাল নেই।

ঝুমকি একটু অবাক হয়ে বলল, ঠিক বলেছো তো মা! বাবা আগের মতো আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কিও করছে না আজকাল, তাই না?

এতদিনে সেটা টের পেলি?

ঝুমকি একটু লজ্জা পেয়ে বলে, আমি ভাবছিলাম, বুবকার জন্য বোধহয় মন খারাপ।

যদি তাই হয় তবে কি আমাদের উচিত হবে না লোকটাকে একটু আনন্দের মধ্যে রাখা।

সে তো ঠিক কথা। আচ্ছা, আমি বাবার কাছে যাচ্ছি।

এখন দরকার নেই। অনুকে পাঠিয়েছি। এখন আবার তুই গেলে ভাববে আমিই দুজনকে পাঠিয়েছি।

তাহলে থাক। আমি বরং পরে যাবো। বাবাকে নিয়ে তুমি কি খুব চিন্তায় পড়েছো?

পড়ব না?

অত চিন্তা করো না, আমার বাবা একজন কারেজিয়াস সেলফ্-মেড ম্যান। একটু সেন্টিমেন্টাল আছে, কিন্তু আমার বাবা সহজে কাবু হওয়ার লোক নয়।

অপর্ণা মেয়ের দিকে একটু চেয়ে থেকে বলে, আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল একটা ট্রামের মধ্যে। সামনে একটা রক্তমাখা লাশ পড়ে আছে, তখনও ভাল করে মরেনি। ভয়ে কাঠ হয়ে আছি। অধচৈতন্য। তোর বাবা ক্যামেরা ঝুলিয়ে উঠে এল। পটাপট ছবি তুলল, তারপর আমাকে দেখে খুব অবাক হয়ে কী যেন বলল। আমি জবাবও দিতে পারিনি। তখন আমাকে হাত ধরে টেনে নামিয়ে আনল। চারদিকে কাঁদানে গ্যাস, গুলি। এসপ্ল্যানেড ইস্টে পুলিশ লাঠিচার্জ করছে। কী সাহস ছিল লোকটার!

গল্পটা তারা বহুবার শুনেছে। ঝুমকি বলল, ছিল নয় মা, আমার বাবা এখনও সাহসী। বাবার মতো এরকম পুরুষ দেখাই যায় না। বাবা এই ফেজটা কাটিয়ে উঠবে।

তোমরা দুই বোন বাবাকে একটু সঙ্গ দিও। ছেলের জন্য তাহলে আর ততটা মন খারাপ করবে না।

আচ্ছা মা।

হ্যাঁ রে, হেমাঙ্গবাবুর একটা বাড়ি আছে না কোন গ্রামে যেন!

ঝুমকি হঠাৎ যেন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তারপর বলল, হ্যাঁ, নিশিপুর।

তুই একবার গিয়েছিলি না চারুশীলার সঙ্গে?

হ্যাঁ তো।

তোর বাবাকে সেখানে কয়েকদিন রাখা যায়?

ঝুমকি একটু ভেবে বলল, তার কি দরকার আছে মা?

কথাটার জবাব আগে দে। উল্টে প্রশ্ন করছিস কেন?

রাগ করলে?

তোর বাবা একটা নির্জন জায়গা চাইছে।

ঝুমকি ইতস্তত করে বলে, বলে দেখা যায়। হেমাঙ্গবাবু প্রতি উইক-এণ্ডে সেখানে চলে যান বলেই শুনেছি।

এক সপ্তাহ যদি আমি আর তোর বাবা গিয়ে সেখানে থাকতে চাই তাহলে রাজি হবে হেমাঙ্গ?

তা হবে বোধহয়।

একটু বলে দেখ না। হেমাঙ্গ তো চমৎকার মানুষ। যেমন বিনয়ী, তেমনি ভদ্রতাবোধ, ওর বাড়িতে ফোন আছে, ফোন করে দেখবি?

আজ রবিবার। বোধহয় আজ সেখানেই গেছে।

দেখ না একবার! যা বৃষ্টি হচ্ছে কদিন। হয়তো যায়নি।

নম্বর দিচ্ছি, লাইনও না হয় ধরে দিচ্ছি, তুমিই কথা বলো মা।

আমি! আমার সঙ্গে তো ততটা পরিচয় নেই। একটু আলাপ।

ঝুমকি ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলে, আমার বড় লজ্জা করছে মা। গুছিয়ে বলতে পারব না।

ওমা! মেয়ের লজ্জা দেখ। যখন চাকরি করতে গিয়েছিলি তখন এ লজ্জা কোথায় ছিল? দুটো মাত্র কথা জিজ্ঞেস করবি, অত লজ্জার কী?

ঝুমকি কাতর গলায় বলে, প্লীজ মা। আচ্ছা, আমি না হয় চারুমাসীকে দিয়ে বলিয়ে দিচ্ছি।

তবু নিজে বলবি না? ঠিক আছে, চারুকেই বল। সেটাই ভাল হবে বোধহয়।

ঝুমকি উঠল এবং চারুশীলার নম্বর ডায়াল করল।

তার গলা শুনেই চারুশীলা চেঁচিয়ে উঠল, এই ঝুমকি! শীগগির চলে আয়। আজ শাহী পোলাও করা হচ্ছে। সঙ্গে আলু মটর আর মুগীর দোপেঁয়াজা। আসবি?

না মাসী। এ বৃষ্টিতে বেরোলে মরে যাবো।

আচ্ছা বাবা, গাড়ি পাঠাচ্ছি।

ঝুমকি হাসল, ফের বাড়াবাড়ি শুরু করেছ! তুমি কি একটুও একা থাকতে পারো না?

একা কী রে? জয়েন দ্য ক্রাউড। আমার বাড়িতে এই বৃষ্টিতেও কারা আজ এসেছে জানিস?

কারা?

রিয়া উইথ চিলড্রেন, মলয় নামে সুব্রতর এক বন্ধু উইথ ফ্যামিলি অ্যাণ্ড দেয়ার ইজ অ্যানাদার পারসন। গেস হু?

কি জানি বাবা।

দূর বোকা! পারলি না? হেমাঙ্গ! দ্যাট গ্রেট সন্ন্যাসী ব্রাদার অফ মাইন। চলে আয়।

শোনো মাসী, আমার একটা কাজ করে দেবে?

কি কাজ রে?

আমার মা আর বাবা এক সপ্তাহের জন্য একটা আউটিং-এ যেতে চায়। হেমাঙ্গবাবুর সেই নিশিপুরের বাড়িটায় ওদের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে?

ধুস! এটা একটা কাজ হল?

দাও না তাহলে বলে।

তুই নিজেই বল না। ঐ তো হেমাঙ্গ ক্যারম খেলছে।

না মাসী। আমার লজ্জা করছে।

আচ্ছা তাহলে বলছি। কিন্তু কণ্ডিশন আছে।

কী কণ্ডিশন?

গাড়ি পাঠাচ্ছি, চলে আয়। এ বাড়িতে আসতে তো তোর নেমন্তন্নের দরকার নেই।

না, আজ থাক।

অবজেকশন ওভাররুলড্। গাড়ি যাচ্ছে। পাঁচ মিনিটে তৈরি হয়ে নে।

আচ্ছা বাবা, গাড়ি লাগবে না। দু' মিনিটের তো হাঁটাপথ। আমিই যাচ্ছি।

না বাবা, তোর ঠাণ্ডার ধাত। ভিজলে আবার গণ্ডগোল হবে। গাড়ি তো বসেই আছে। তৈরি হয়ে নে।

ফোনটা রেখে মায়ের দিকে চেয়ে ঝুমকি বলল, হল তো! ফোন করে ফ্যাসাদ ডেকে আনলাম। এখন ও বাড়িতে যেতে হবে।

হেমাঙ্গর বাড়িটা পাওয়া যাবে?

তা যাবে। কিন্তু এখন আমাকে তৈরি হতে হবে যে! নেমন্তন্ন।

তা যা না। চারু বড় ভাল মেয়ে।

ঝুমকি তৈরি হচ্ছিল। বুক কাঁপছে। গলা শুকোচ্ছে। সে নিজের কাছে ধরা পড়ে গেছে অনেক দিন। মনে মনে অনেক লড়াই করেছে। হেরে গেছে। কী করবে ঝুমকি? তার যে কিছুই করার নেই।

প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে সদরে একটা গাড়ি এসে থামল। দরজা খোলা ও বন্ধের শব্দ হল। তারপরই ডোরবেল।

দরজা খুলে অপর্ণা একটু অপ্রতিভ। সামনে এক গাল হাসি নিয়ে হেমাঙ্গ দাঁড়িয়ে।

আরে, আপনি এসেছেন! আসুন।

গায়ের পাতলা বর্ষাতিটা খুলে হেমাঙ্গ ঘরে ঢুকে বলল, মণীশবাবু কোথায়?

বসুন, ডাকছি।

মণীশ এল। প্রসন্ন মুখে বলল, কী খবর?

আপনাকে আমার গাঁয়ের বাড়িতে নেমন্তন্ন করতে এলাম। কবে যাবেন বলুন!

মণীশ অপ্রস্তুত, বলল, যাবোখন। তাড়া কি?

না, আমার তাড়া আছে। আমি আমার বাড়িটা কয়েকজন সজ্জনকে দেখাতে চাই।

মণীশ হাসল।

অপর্ণা বলল, হেমাঙ্গবাবুর বাড়িটা নাকি খুব সুন্দর জায়গায়। চলোই না কয়েকদিন বেড়িয়ে আসি।

মণীশ মাথা নেড়ে বলল, ছুটি নেই যে।

ছুই দরকার নেই। চাকরি যাবে না। চলো।

ভিতরের ঘরে ঝুমকি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চারুমাসীটা যে কী? ওকেই পাঠাল কেন নিতে? ঝুমকির বুঝি লজ্জা করে না?

১০৪

ছোট ফিয়াট গাড়ির মধ্যে তারা দুজন সামনের সিটে পাশাপাশি বসা। চারদিকে বৃষ্টির ঝরোখা, সামনের উইন্ডস্ক্রিনে বৃষ্টির লহর খেলছে। চারদিক আবছা, মেঘলা আলোয় কিছু অপ্রসন্নতা। কিন্তু পৃথিবীর ঋতুচক্রের নিয়ম অনুযায়ী বাদলার সময় বৃষ্টিও তো হবে। আজ বুঝি এই বৃষ্টির আলাদা কোনও প্রয়োজন ছিল? কে জানে কী!

কলকাতার বৃষ্টি এরকম, নিশিপুরে কিন্তু অন্যরকম।

অনেকক্ষণ বাদে গাড়ির ভিতরকার নিস্তব্ধতায় এই একটামাত্র কথা শোনা গেল।

ঝুমকি বাঁ দিকে কাচের ভিতর দিয়ে বাইরে চেয়েছিল, চোখ ফিরিয়ে বলল, কিরকম?

কলকাতার বৃষ্টি কি কারও ভাল লাগে? শান বাঁধানো শহরে বৃষ্টির কোনও ভূমিকাই নেই, সৌন্দর্য তো নয়ই, প্যাচপ্যাচে, নোংরা শহরটা যেন আরও কুচ্ছিত হয়ে যায়।

আর নিশিপুরে?

দেখেননি তো! মস্ত নদীর ওপর যখন মেঘলা আকাশের ছায়া পড়ে আর বৃষ্টির শব্দ মাদলের মতো বাজতে থাকে টিনের চালে, মাটির কোষে কোষে, ঘাসে, গাছে সব জায়গায় যখন বৃষ্টি নেমে আসে তখন মন ভরে যায়। কী দামাল বাতাস!

ছোট্ট একটু গলা খাঁকারি দিয়ে ঝুমকি বলল, কলকাতায় কি বৃষ্টির দরকার নেই? বৃষ্টি হলে শহরের রাস্তাঘাট ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়, আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়, শুনেছি নাকি অসুখবিসুখও কমে যায়।

গাড়ি খুব ধীরে আর সাবধানে চালাতে চালাতে, হেমাঙ্গ বলে, বৃষ্টির প্রয়োজন শহরেও আছে, কিন্তু বৃষ্টিকে তেমন করে উপভোগ করা যায় না। এখানে রাস্তায় জল জমে যায়, ট্র্যাফিক জ্যাম হয়।

আমার কিন্তু কলকাতার বৃষ্টি বেশ লাগে।

নিশিপুরে বর্ষাকালে গিয়ে কয়েকদিন থেকে আসলে আর কলকাতার বৃষ্টি তত ভাল লাগবে না।

ঝুমকি একটু হেসে হঠাৎ বলল, আচ্ছা, চারুমাসির বাড়ি যেতে আজ আমাদের এত সময় লাগছে কেন বলুন তো! আমি তো রোজ হেঁটেই চলে যাই।

উৎকণ্ঠ হেমাঙ্গ বলে, একটু ঘুরপথে যেতে হচ্ছে। সোজা রাস্তায় একটা ট্রাক ব্রেকডাউন হয়ে পড়ে আছে। সেখানে জ্যাম।

ও।

তাছাড়া রাস্তায় জল জমে আছে। বেশি জোরে চালালে ইঞ্জিনে জল ঢুকে যাবে। তখন গাড়ি ঠেলা ছাড়া উপায় থাকবে না।

ও বাবা!

হেমাঙ্গ একটু হাসল, যন্ত্র নিয়ে ওইটেই তো অসুবিধে।

আপনি ঠিক কৃষ্ণজীবনবাবুর মতো হয়ে যাচ্ছেন, না?

হেমাঙ্গ আহত হল। সে কারও মতো, একথা শুনতে তার ভাল লাগার কথা নয়। সে গম্ভীর গলায় বলল, আমি আমার মতোই।

কৃষ্ণজীবনবাবুও খুব যন্ত্রবিরোধী লোক। উনিও খুব প্রকৃতি আর গ্রাম ভালবাসেন।

বুদ্ধিমান বিবেচক মানুষদের পক্ষে সেটাই তো স্বাভাবিক!

আচ্ছা, আমার তো শহরই বেশি ভাল লাগে। শহর কত ইন্টারেস্টিং। রোজ কত ঘটনা ঘটছে আর গ্রাম যেন থেমে আছে। দিনের পর দিন একইরকম।

হেমাঙ্গ ফের একটু চুপ করে থেকে বলল, গ্রামেও ঘটে। অনেক কিছু ঘটে। চোখ থাকলে ঠিকই দেখা যায়।

কী ঘটে সেখানে?

খুব ছোট ছোট ঘটনা। জোঁক কিভাবে চলে জানেন?

না। আমি জোঁক দেখিইনি। কিরকম হয় বলুন তো?

আপনার জন্য শিশিতে ভরে কয়েকটা নিয়ে আসব।

একটু বিবর্ণ হয়ে ঝুমকি বলল, কামড়ায় তো!

কামড়ে ধরে থাকে। সহজে ছাড়ে না।

ও বাবা!

জোঁকের কাছ থেকেও কিন্তু আমাদের শেখার আছে।

ঝুমকি হেসে ফেলল, জোঁকের কাছ থেকে আবার কী শেখার আছে?

টেনাসিটি। ওই কামড়ে ধরে থাকাটা। সকলে কি পারে ধরে থাকতে?

আমার শিখে দরকার নেই বাবা।

হেমাঙ্গ হাসল, ভয় পেলেন? প্রকৃতিতে কিছুই ভয়ের নেই। শহুরে লোকেরা যে কোনও পোকামাকড় সরীসৃপ দেখলেই ভয় পায়। আমিও পেতাম। এখন ভয়ের বদলে আনন্দ হয়। আমার উঠোন দিয়ে কত সাপ যাতায়াত করে জানেন?

মা গো!

কিন্তু আমার আর ভয় করে না। বেশিরভাগ সাপেরই বিষ নেই। বিষধরদেরও না ঘাঁটালে কিছু করে না। ওদের মতো ওদের থাকতে দিন ওরাও আপনাকে আপনার মতো থাকতে দেবে। আর সাপ কী সুন্দর প্রাণী বলুন তো! অমন চিত্রল শরীর ক'টা প্রাণীর আছে?

উঃ, সাপের কথা শুনেই আমার গা সিরসির করছে। প্লিজ, আর বলবেন না।

হেমাঙ্গ গাড়িটা চারুশীলার বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়ে থামাল। তারপর স্বগতোক্তির মতো বলল, ইট ওয়াজ এ সুইট জার্নি। আসুন, সবাই আপনার জন্য বসে আছে।

মুখখানা কেন যে হঠাৎ রাঙা হয়ে গেল ঝুমকির কে বলবে!

ঝুমকির ওই লালিমাটুকু লক্ষ করল হেমাঙ্গ, যখন নেমে ঘুরে গিয়ে বাঁদিকের দরজাটা ঝুমকির জন্য খুলে দিয়ে দাঁড়াল। একটু ভাবল সে, কোনও অন্যায্য কথা বলে ফেলেনি তো! তাদের কথা হয়েছে শহর, গ্রাম, বৃষ্টি, জোঁক আর সাপ নিয়ে। লজ্জা পাওয়ার মতো বিষয়বস্তু তো একটাও নয়!

যখন তারা দোতলার হলঘরে ঢুকল তখন একটা কর্ডলেস টেলিফোনে চারুশীলা কাকে যেন এক্ষুনি চলে আসার জন্য খুব করুণ গলায় অনুনয় করছিল, চলে আসুন না, প্লিজ...না না, এতে কিছু হবে না। জার্নি করে এসেছেন তো কী হয়েছে? আপনি তো দারুণ হার্ডি মানুষ। ...দেখুন না আমি তো প্ল্যান করে কিছু করিনি আজ। হঠাৎ মনে হল এই বৃষ্টির দিনে সবাই মিলে একটু আড্ডা দেওয়া যাক.....আচ্ছা, আপনি আমাদের অপছন্দ করেন না তো! .....তা হলে চলে আসুন। প্লিজ, প্লিজ, প্লিজ!

টেলিফোন রেখেই চারুশীলা দৌড়ে এসে ঝুমকিকে ধরল, এসেছিস? উঃ বাঁচলাম।

কিন্তু তুমি তো আমাকে আগে বলোনি মাসি! আমার খুব রাগ হয়েছে।

আহা, এ বাড়িতে তোর আবার নেমন্তন্নের দরকার হয় নাকি? আগে থেকে ঠিক করা ছিলও না। হ্যাঁ রে, তোকে আজ এত সুন্দর দেখাচ্ছে কেন?

যাঃ! আমি আবার সুন্দর নাকি?

কেন, তুই বুঝি জানিস না যে তুই সুন্দরী? ন্যাকা!

বেশি বোলো না তো, শুনলেও লজ্জা করে।

না রে, তোকে আজ ভারি মিষ্টি দেখাচ্ছে। আয়, আজ তোকে একটা জিনিস দিই।

অনেক তো দিয়েছে মাসি! আর কেন?

আহা, কী আবার দিলাম তোকে?

তিনখানা জাপানি শাড়ি, দুটো দামী সেন্ট, এক ডজন লিপস্টিক আর মেক আপ, ভ্যানিটি ব্যাগ, কলম।

তাতে কি? আরও দেবো। আয় আমার সঙ্গে।

ভিতরের ঘরে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে কাবার্ড থেকে একটা নতুন স্প্রে সেন্ট বের করে তাকে দিয়ে বলল, নে।

আবার সেন্ট!

এটা এলেবেলে সেন্ট নয়। যাকে চাইবি এই সেন্ট মেখে তার কাছে গেলেই সে তোকে ভালবেসে ফেলবে।

ঝুমকি একটু হেসে বলল, তাই নাকি? তাহলে এটা আমার আর দরকার নেই মাসি। আমি কাউকে হিপনোটাইজ করতে চাই না।

ইগোতে লাগল বুঝি? সেভাবে বলিনি রে বোকা! ঠাট্টা করছিলাম। এটা একটা এক্সকুসিভ পারফিউম। এক বুড়ো ফরাসি নাকি নিজের হাতে বানায়। কিরকম জিনিস তা আমিও জানি না। মাখিনি কখনও। তোর ওপর দিয়ে একটু এক্সপেরিমেন্ট করছি।

আমি বুঝি তোমার গিনিপিগ?

নে না বাবা, যাই দিতে চাই তাইতেই সবসময়ে আপত্তি করিস কেন?

ঝুমকি মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, সবসময়ে এত দিও না তো। এত দিলে ভাল লাগে বলো? তোমাকে আমি কী দিই?

চারুশীলা চোখ পাকিয়ে বলে, আমাকে দিবি! সাহস তো কম নয়। আমি তোর বড় না? আর দেখ তত ভাই, জিনিসে জিনিসে বাড়িটাকে আমি কিরকম ওয়্যারহাউজ করে ফেলেছি! আমাকে জিনিস দিতে কি লোকের মায়া হয় না? কোথায় রাখব বল তো!

ঝুমকি হেসে ফেলে বলে, ঠিকই বলেছে। মাঝে মাঝে তোমাকে কিছু দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ভাবি, চারুমাসিকে দিয়ে লাভ কি? সবসময়েই তো কেনাকাটা করছে।

ওইটেই তো আমার রোগ। এই রোগটা হেমাঙ্গরও আছে। কী জিনিস কেনে ভাবতে পারবি আমাদের দুজনের ওই একটা ব্যাপারে খুব মিল।

জানি মাসি।

তবে আজকাল আর ওর কেনাকাটার ঝোঁকটা নেই। বলতে বলতে চারুশীলা একটু আনমনা হয়ে গেল।

কী হল মাসি?

চারুশীলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কি যে হল হেমাঙ্গর! ও কি সাধু হয়ে যাবে রে?

ঝুমকি ফের একটু লাল হল। বলল, যাক না।

সাধু হবে? তাতে ভালটা কি হবে?

সাধু হওয়া কি খারাপ?

খারাপই তো। সাধুরা যে ভিক্ষে করে খায়!

ঝুমকি হেসে ফেলে। বলে, তাতেই বুঝি তোমার ভয়?

হেমাঙ্গ ভিক্ষে করে খাবে! বলিস কি!

দেখ মাসি, তোমার ভাইটি অত সহজে সাধু হবেন না।

কি করে জানলি?

জানবো কি করে আবার! মনে হল তাই বললাম।

না রে, তুই জানিস না। ওর কুষ্ঠিতে আছে কত বছর বয়সে যেন সন্ন্যাস-যোগ।

তুমি বুঝি কুষ্ঠি মানো?

মানি কিনা জানি না। কিসে কি হয় কে জানে বাবা! আমি যখন সুব্রতকে বিয়ে করি তখন তো ও ভেরেন্ডা ভাজে আর বিপ্লব করে বেড়ায়। এক জ্যোতিষী ওর মাকে বলেছিল, একদিন নৃপতুল্য টাকা হবে। কে বিশ্বাস করেছিল সে কথা? অথচ দেখ ফলে তো গেল!

আমার ওসব বিশ্বাস হয় না।

অনেকেরই হয় না। আসলে কি জানিস, ভালটা না ফললেও খারাপটা ঠিকই ফলে যায়।

ঝুমকি ফের হাসল। বলল, সেটা নিজের-জন সম্পর্কে সবসময়েই মনে হয়।

চারুশীলা খুব বিষণ্ণ মুখ করে বলল, কে জানে হেমাঙ্গর জীবনটা আমিই নষ্ট করে দিলাম কিনা।

কেন মাসি, তুমি নষ্ট করবে কেন!

সুব্রত বলেছে, রশ্মির সঙ্গে হেমাঙ্গর সম্পর্কটা ধীরে ধীরে আপনা থেকেই গাঢ় হত। আমি বিয়ের জন্য নানারকম প্রেশার ক্রিয়েট করাতেই নাকি ব্যাপারটা কেঁচে গেল।

ঝুমকি সবেগে মাথা নেড়ে বলল, তুমি কিছু বোঝে না।

বুঝি না!

একটুও না। তুমি বড্ড সরল। তোমাকে আগেই বলেছি রশ্মি একদম অন্য ধরনের মেয়ে। হেমাঙ্গবাবুর সঙ্গে ওকে ঠিক মানায় না।

আমাকে এরকম কথা আরও কেউ কেউ বলেছে। কিন্তু কেন বল তো! আমার তো রশ্মি আর হেমাঙ্গকে মনে হত মেড ফর ইচ আদার।

তুমি তোমার ভাইকে সংসারী করার জন্য এত বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে যে, তখন তোমার অত খুঁটিয়ে বোঝার মতো মনই ছিল না। সুন্দর দেখেই ঢলে পড়েছিলে।

খুব অসহায় মুখ করে চারুশীলা বলল, তাহলে হেমাঙ্গর এখন কী হবে বল তো!

কী আর হবে! সাধু হয়ে যাবে।

চারুশীলা হাসল না। বিষণ্ণ গলায় বলল, রশ্মির বিয়ের খবরটা পাওয়ার পর থেকেই কেমন যেন হয়ে গেছে। একদম উদাস, বৈরাগী। ওর কথা ভাবলেই এত ভয় করে! ভয়ে আমি আর বিয়ের কথাও তুলি না। ওর বাড়ির লোকও হয়রান হয়ে যাচ্ছে।

তুমি ওঁকে নিয়ে এত ভাবছো কেন? কিছু তো করতে পারবে না। কিছু ভেবো না, ওঁকে ওঁর মতো থাকতে দাও।

তাই তো দিচ্ছি। কিন্তু কি হচ্ছে বল তো! বিডন স্ট্রিটের বাড়িতে ওর মা দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে যাচ্ছে! রোজ আমাকে ফোন করে। কত মেয়ে দেখেছে তার ঠিক নেই। গাদা গাদা ফটো জমে গেছে। কী সুন্দর সুন্দর সব মেয়ের ছবি এসেছে দেখলে মাথা ঘুরে যায়!

কেমন যেন হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল ঝুমকির মুখখানা। বলল, বেশ তো। চেষ্টা করতে করতে একদিন ঠিক রাজি হয়ে যাবে। ছেলেরা তো আসলে হ্যাংলা।

যাঃ। হেমাঙ্গ আর পাঁচজনের মতো নয়। হ্যাংলা একদম নয়। অত সুন্দর চেহারা, কিন্তু কখনও মেয়েদের দিকে ফিরেও চাইত না। ওকে তুই চিনিস না।

ঝুমকি হেসে বলল, নিজের ভাইকে সবাই একটু বেশি সুন্দর দেখে।

চারুশীলা চোখ পাকিয়ে বলল, এই পাজি! হেমাঙ্গ কি দেখতে খারাপ?

তাই কি বললাম?

সুন্দর নয়?

তেমন কিছু নয়।

হেমাঙ্গ ম্যাসকুলিন, ছমছমে শরীর। মুখটার কাট দেখেছিস? ফটোজেনিক নয়, লালটুও নয়। কিন্তু ওর হল পুরুষালি চেহারা।।

একটু বুনো-বুনো, তাই না? বলেই ঝুমকি হেসে ফেলল।

ইয়ার্কি হচ্ছে? হেমাঙ্গর নিন্দে করবি তো ফাটাফাটি হয়ে যাবে। আয়, ভাল করে দেখে যা।

বলেই তার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল চারুশীলা।

ভয় খেয়ে ঝুমকি চাপা আর্তনাদ করতে লাগল, ছাড়ো! ছাড়ো! আচ্ছা, ভুল বলেছি মাসি, কান মলছি। আর করব না।

না। আয়, দেখ ভাল করে। তুই কি অন্ধ যে হেমাঙ্গকে সুন্দর দেখিস না!

কাতর গলায় ঝুমকি বলল, খুব সুন্দর মাসি। কী বড় বড় দাঁত, কী সুন্দর কেষ্ট ঠাকুরের মতো গায়ের রং...আচ্ছা মাসি, আর ইয়ার্কি করব না। ছাড়ো না প্লিজ!

ছাড়ব? দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা!

হলঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অতিথিরা বসা। বাচ্চারা হইচই করছে। হেমাঙ্গ ঘরে নেই।

এই, হেমাঙ্গ কোথায় গেল রে?

কেউ বলতে পারল না। চারুশীলা হাত ধরে ঝুমকিকে টানতে টানতে এঘর ওঘর ঘুরে বেড়াল। কোথাও হেমাঙ্গ নেই।

আশ্চর্য! কোথায় গেল বল তো!

ঝুমকি সামান্য হাঁফ-ধরা গলায় বলল, চলে যাননি তো?

আমাকে না বলে? চল তো দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করি।

বাইরে হেমাঙ্গর গাড়িটা ছিল না। দারোয়ান বলল, হেমাঙ্গবাবু একটু আগেই চলে গেছে।

কাঁদো-কাঁদো হয়ে চারুশীলা বলল, দেখলি! ওর আজকাল এরকম অদ্ভুত স্বভাব হয়েছে। কখন কী করে তার ঠিক নেই। একটু আগে যখন বলেছিলাম তোকে গিয়ে নিয়ে আসতে খুব রাজি হয়ে চলে গেল। বেশ হাসিখুশি ছিল। আবার হঠাৎ কী খেয়াল হল কে জানে, দুম করে কাউকে না বলে-কয়ে চলে গেল!

ঝুমকির চোখে বিবর্ণ দিনটা হঠাৎ আরও বিবর্ণ হয়ে মরে গেল। বুকের ভিতরটা কেমন নিথর। হতাশায় তারও চোখে জল আসার উপক্রম হল।

চল যাই ভিতরে।

স্তিমিত গলায় ঝুমকি বলল, চলো।

যখন দুটি হতাশ রমণী ঘরে ফিরে আসছিল ধীর পায়ে তখন পূর্ণ দাস রোড থেকে গোল পার্ক হয়ে ডান দিকে মুখ ফেরাল হেমাঙ্গর ছোট্ট ফিয়াট। চারদিকে আজ জলপ্রপাতের মতো বৃষ্টি নেমেছে। তার ছোট গাড়ি যে-কোনও মুহূর্তে ফেঁসে যাবে।

সাদার্ন অ্যাভেনিউতে লেকের রেলিং ঘেঁষে প্রায় হাঁটু জলের মধ্যে গাড়ি দাঁড় করাল হেমাঙ্গ। তারপর চুপ করে বসে রইল।

কতবার ভুল করবে সে! আর কতবার? তার কেন ওকে ভাল লাগছে? কেন এত বেশি ভাল লাগছে ওকে? এটা কি সঙ্গত? এটা কি হওয়া উচিত?

নিজের সঙ্গে একটা লড়াই দরকার হয়েছে তার। এ লড়াই হেরে গেলে তার চলবে না। গাড়িটা খুব ধীরে, সাবধানে নিজের বাড়ির দিকে ফেরাল হেমাঙ্গ।

জলে গাড়ি বিশ্বাসঘাতকতা করল না এবারও।

হেমাঙ্গ ঘরে ঢুকে চুপচাপ শুয়ে রইল বিছানায়। টেলিফোন টানা বেজে যেতে লাগল। হেমাঙ্গ ধরল না। টেলিফোন থেমে গেল ধৈর্যহারা হয়ে।

ও মেয়েটিকে এবার থেকে অ্যাভয়েড করতে হবে হেমাঙ্গ, বুঝেছো?

বুঝেছি।

শি ইজ টেকিং ইউ ওভার। বি কেয়ারফুল।

হ্যাঁ।

কিন্তু কী করবে হেমাঙ্গ!

দেখা যেন না হয় আর।

কিন্তু চিন্তায় হানা দেবে। সেটাও খারাপ।

খুব খারাপ।

ওর ডিফেক্টগুলো খুঁজে বের করো হেমাঙ্গ। ট্রাই টু হেট হার।

শক্ত কাজ। কারও প্রতি দুর্বলতা এলে ডিফেক্টগুলো নজরে পড়তে চায় না।

খুব সত্যি কথা, তা হলে!

চেষ্টা করতে হবে। এখনই এটা অঙ্কুরে বিনাশ না করলে পরে কষ্ট পেতে হবে।

খুব ঠিক কথা।

তুমি আর কিছুদিন এখন চারুশীলার বাড়িতে যেও না।

হুঁ। কিন্তু চারুদি কি ছাড়বে! খোঁজ নেবে।

আজ নিশিপুরে চলে গেলে ভাল করতে তুমি।

এবার থেকে কোনও উইক এন্ড বাদ দেবো না।

পালাতেই হবে।

খুব ধীরে ধীরে ঘুম চলে এল। কিন্তু ঘুমটাও নিপাট হল না। কত হিজিবিজি স্বপ্ন এল।

ঘুম ভাঙল হঠাৎ টেলিফোনের শব্দে। সতর্ক ছিল না হেমাঙ্গ, ঘুম-চোখে উঠেই টেলিফোন ধরল, হ্যালো!

ওপাশে কিছুক্ষণ চুপচাপ।

হ্যাল্লো! হ্যাল্লো!

খুব চাপা একটা নারীকণ্ঠ বলল, ওভাবে চলে এলেন যে!

হেমাঙ্গর বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড একটা বিট মিস করল। তারপর হঠাৎ রেলগাড়ির মতো চলতে শুরু করে দিল। হেমাঙ্গর একটু শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। তার ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল, ঘৃণা করো ওকে।

আমার জন্যই চলে এলেন?

কে বলল?

আমি জানি। যদি আমাকে অ্যাভয়েডই করার ইচ্ছে তা হলে নিয়ে এলেন কেন?

অ্যাভয়েড করতে চাইনি বলেই।

মোটেই না। বলতে বলতে একটা কান্নার সম্ভাবনায় গলাটা স্বলিত হয়ে গেল একটু।

আপনি কেন ইনসাল্টেড ফিল করছেন? আমি তো এমনিতেই একটু খেয়ালি।

শুধু খেয়ালি?

আরও কিছু?

জানি না। মাঝে মাঝে আপনি এমন করেন যে—

আমি খুব শান্তিতে নেই। আপনাকে যদি বলতে পারতাম!

জানি। আপনি রশ্মির কথা ভেবে—

কিছু জানেন না। রশ্মির কথা আমি কদাচিৎ ভাবি। ভাববই বা কেন? কোনও কারণ ছিল না। তাহলে?

কথাটা আপনাকেই বলা যায় না।

কেন যায় না?

আমি সত্যিই আপনার কাছ থেকে দূরে থাকতে চাই।

তাই তো আছেন। আমি কী এমন করলাম?

জানেন না?

না তো!

নাকি জানেন, স্বীকার করতে পারেন না!

কি করে জানব?

হেমাঙ্গ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

১০৫

চারদিকে সুখ একেবারে উছলে পড়ছে। পাকা দোতলা বাড়ি, চার দিকে বুক-সমান ঘের-দেয়াল উঠেছে। যে বাড়িটা রামজীবন তুলতে গিয়ে পেরে ওঠেনি সেটার ছাদ-ঢালাই করে দিয়েছে কৃষ্ণজীবন। পলেস্তারা পড়ে গেছে, জানালা-দরজাও বসে গেছে। রং হলেই সে বাড়িও হেসে উঠবে। পুরনো ঘরগুলো ভেঙে জায়গা চৌরস করে বাগান হচ্ছে। ময়দানবের কাণ্ড যেন, রামজীবনের আধখ্যাঁচড়া ঘর আর মুখ ভ্যাংচায় না বিষ্ণুপদকে। বিষ্ণুপদ এখন দোতলার চওড়া বারান্দায় বসে দুনিয়াটা দেখে। কিন্তু নতুন রকম লাগে কি? তা তো লাগে না!

সুখের যে একটা বান ডেকেছে সেটা বুঝতে পারে বিষ্ণুপদ। কিন্তু এত সুখে যখন নয়নতারা উথলে ওঠে তখনও বিষ্ণুপদ কেন ঠাণ্ডা মেরে থাকে! কোনও সুখই কেন ভিতর অবধি গিয়ে সেঁধোয় না তার!

সুখের চিহ্নগুলো সারাদিন ধরে ঘরে বাইরে খুঁজে বেড়ায় সে। বাড়ি হল, সাহেবি সব আসবাব হল, আজকাল পাতে রোজ মাছ তো বটেই, তার সঙ্গে আরও দুই-তিন পদ। রামজীবনকে দোকান করে দিয়েছে কৃষ্ণজীবন। সে দোকানও চলছে। রামজীবন আজকাল মদটদ খাচ্ছে না কিছুদিন! সবই সুখের বৃত্তান্ত।

কুয়োর ধারে বড় জমিটা মস্ত ভরসা ছিল সংসারের। আনাজপাতি না জুটলে ওই বাগান থেকে যা-হোক কিছু খুঁটে তুলে আনত নয়নতারা। শাকপাতা, কচু-ঘেঁচু, নিদেন একটা লেবু। আজকাল আর তার দরকার হচ্ছে না। অনটন নেই।

তবু বুকে একটু টনটনানি থেকে যায় কেন! কী নেই? আরও কী চায় বিষ্ণুপদ!

আগাছায় ভরা বাগানটায় বিষ্ণুপদ একদিন সকাল থেকে গিয়ে বসে রইল। আজ বাদলা মেঘ নেই। বৃষ্টি একটু থিতু রয়েছে। আতা গাছের ছায়ায় বসে বিষ্ণুপদ ভাবনাচিন্তার ঝাঁপি খুলে বসল। নিরিবিলি এরকম নিজের মোকাবিলা করা মাঝে মাঝে ভাল।

কিন্তু তার ভিতরটা চিরকালই বড় নিস্তব্ধ। সেখানে কথার ভুড়ভুড়ি কম, ভাবনা-চিন্তাও যেন খেই-হারা। সুখের কথাই ভাবছে বিষ্ণুপদ। এই যে বাড়ি হল, কতকালের কত অভাবের সঙ্গে লড়াই শেষ হয়ে গেল, এসব হওয়ার পরও সে কেন যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেছে? একটা এই হতে পারে যে, তার পুরনো চেনা বাড়িটা লোপাট হয়ে যাওয়ায় কেন যেন নতুন বাড়িতে সে খাপে খাপে বসছে না। খুঁতখুঁতুনি হচ্ছে, নতুন জুতো পরলে যেমনধারা হয়! তাই কি! আর এক অস্বস্তি বামাচরণ। শোনা যাচ্ছে, তার চিকিৎসা শুরু হয়েছে। মাথার ব্যামো। লোভে, অশান্তিতে, আক্রোশেই কি পাগল হয়ে গেল ছেলেটা?

সব মিলিয়ে বিষ্ণুপদর তেমন সুখ হচ্ছে না। কেমন যেন মনে হচ্ছে, পরের বাড়িতে বাস করছে সে। কেন এরকম হয়!

একখানা দা হাতে বোধ হয় গুলতির কাঠ কাটতে বাগানে ঢুকেছিল পটল। দাদুকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

দাদু, কী করছো?

বসে আছি দাদা।

এ সময়টায় সাপ বেরোয় তো।

বিষ্ণুপদ মৃদু হাসল, হেলে ঢোঁড়া সব।

না দাদু, চক্করওলাও আছে।

বিষ্ণুপদ মাথা নাড়ল, নেই। ভিত খোঁড়ার সময় দু-দুটো বাস্তুসাপ মেরে ফেলল মিস্তিরিরা, দেখিসনি?

আর নেই?

বিষ্ণুপদ বলল, সাপও আজকাল কই? আগে কত দেখা যেত। বসত বাড়ছে, সব নিকেশ হয়ে যাচ্ছে।

পটল বলল, সাপের বিশ্বাস কি! তুমি বারান্দায় গিয়ে বোসো।

বিষ্ণুপদ উদাস গলায় বলে, গাঁয়ের ছেলে হয়ে সাপকে ভয় পাস?

খুব পাই দাদু।

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আগে লোকে বাঘ-সিংহী ভয় পেত, আজকাল দেখ তাদের কী দুর্দশা! ফৌত হয়ে হয়ে মাত্র কয়েকটিতে দাঁড়িয়েছে। এখন ভয় দেখা দিয়েছে, একদিন না এসব জন্তু লোপাট হয়ে যায়। সাপেরও সেই অবস্থা হয়ে এল। আগে বর্ষাকালে হেলে-ঢোঁড়া কত কিলবিল করত চার ধারে। উঠোনে, পুকুরে। আজকাল কোথায়?

পটল একটু হাসল, তুমি বুঝি সাপখোপ বাঘ-সিংহ চাও?

বিষ্ণুপদ নাতির দীঘল চেহারা আর কোমল মুখখানার দিকে চেয়ে বলল, তুই চাস না?

না তো!

তোর বড় জ্যাঠা চায়। দুনিয়াটা এক অদ্ভুত জায়গা। প্রকৃতি এমন করে সৃষ্টি করেছিল সব যে পান থেকে চুন খসলেই গণ্ডগোল। প্রকৃতির ভারসাম্য না কী যেন বলে! তোর জ্যাঠা জানে। সে অনেক জানে, বুঝিয়ে বলতে পারবে। আমি তত জানি না। কিন্তু আমারও কেন যেন মনে হয়, সাপখোপ বাঘ-ভাল্লুক না হয় থাকত কিছু কী ক্ষতি হত তাতে!

সাপের কামড়ে যে কত মানুষ মারা যায় দাদু!

বিষ্ণুপদ একটু হেসে বলে, সাপের কামড়ে যত না মানুষ মরেছে তার চেয়ে লক্ষ গুণ সাপ মরেছে মানুষের লাঠিতে। বাঘ যত না মানুষ মেরেছে তার বহুগুণ বেশি বাঘ মরেছে মানুষের হাতে। সবসময়ে যে না মারলেই চলত না, এমন নয়। তবু মেরেছে। মানুষের দাঁতে নখে জোর না থাক, তবু মানুষের চেয়ে হিংস্র আর কে আছে বল তো!

পটল একটু ভাবল। তারপর দাদুর সামনে উবু হয়ে বসে মুখের দিকে চেয়ে বলল, দাদু, বড়জ্যাঠা এইসব নিয়ে লেখে, না?

ও বাবা! সে পণ্ডিত মানুষ, কী নিয়ে লেখে তার আমি কী বুঝি? তবে এসব কথাও নাকি আছে তার বইতে।

বইটা আমি জ্যাঠার কাছে চেয়েছি। বলেছে দেবে।

সে বই কি তুই বুঝবি?

বুঝব দাদু। জ্যাঠার কথা আমি বুঝতে পারি।

বিষ্ণুপদ একটু আনমনা হয়ে গেল। আপনমনে শুধু বলল, সে বড় ভালবাসে দুনিয়াটাকে।

পটল এখন অনেকটাই বড় হয়েছে। সামনের বছর তার মাধ্যমিক পরীক্ষা। সে আজকাল ক্লাসে ফার্স্ট হয়। গোপালকে কলকাতার ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে কৃষ্ণজীবন। হোস্টেলেরও ব্যবস্থা হয়েছে। পটলের একটু ফাঁকা লাগে তাই।

পটল বিষ্ণুপদর দিকে চেয়ে বলল, জ্যাঠা এখন কোথায় আছে দাদু? আমেরিকা না ইউরোপ?

বিষ্ণুপদ এক-গাল হাসল, না রে, কলকাতাতেই আছে এখন। গিয়েছিল কাছেপিঠে কোথায় যেন! ম্যানিলা হবে বোধ হয়। ফিরে এসেছে। যদি ভাল করে লেখাপড়া করিস তাহলে তুইও তার মতো কত দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াবি।

কী যে বলো! জ্যাঠার মতো পারব? উরিব্বাস! আগে মাধ্যমিকটা তো ডিঙোই।

পটল চলে গেলে বিষ্ণুপদ ফের ভাবতে বসল। ভাবনাগুলো বড্ড ছাড়া-ছাড়া, মোয়া বাঁধছে না। সুখের কথাই ভাবছে বিষ্ণুপদ। কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। একটা খোঁড়া লোকের যদি পা গজায়, একজন অন্ধ যদি চোখ ফিরে পায়, একটা হাভাতের যদি ভাতের ব্যবস্থা হয় তো খুব সুখ হয়। কিন্তু সুখটা বড় গড়ানে জিনিস। চূড়ায় বাস করতে পারে না। নেমে আসে। যার নতুন ঠ্যাঙ হল সে ক'দিন খুব খটর মটর করে হাঁটবে তারপর একদিন ঠ্যাং-এর কথা ভুলে যাবে। যার চোখ হল তার আনন্দও বেশিদিন নয়। হাভাতের ভাতের সুখও বড় ক্ষণস্থায়ী।

তুমি এইখানে বসে! সারা বাড়ি খুঁজছি।

নয়নতারাকে দেখলেই বিষ্ণুপদর একটা মায়া হয় আজকাল। এই এক মানুষ যার সুখটা বেশ স্থায়ী হচ্ছে। ডগোমগো ভাবটা আর নেই, তবু মুখখানা সবসময়ে আহ্লাদে মাখা। সারাদিন ঘুরে ঘুরে বাড়ি ঝাড়পোঁছ করছে, যারা বহুবার দেখেছে সেইসব পাড়াপ্রতিবেশীদের ফের ডেকে এনে তার আশ্চর্য বাড়ির অন্ধিসন্ধি দেখাচ্ছে। মজে আছে সব নিয়ে।

বিষ্ণুপদ বলল, এ বাগানটা একটু পরিষ্কার করলে হয়।

তা হয়। রেমোকে বললেই নোক লাগিয়ে দেবে। কিন্তু তুমি এখানে বসে কেন? ওপরের বারান্দায় চেয়ার পেতে রেখেছি, সেখানে বসলেই তো হয়!

বারান্দায় তো রোজই বসি। আজ বাগানে বসতে ইচ্ছে হল। ইচ্ছে তো নানা রকমের।

পুরোনো বাড়িটার কথা ভুলতে পারছে না, না?

তা নয়। আসলে কি জানো, আমরা তো ভোগ করতে কোনওদিন শিখিনি। ভাল বাড়ি, ভাল জামাকাপড়, ভাল খাবার-দাবার এসব ভোগ করার জন্যও একটা ট্রেনিং লাগে, অভ্যাস লাগে। হঠাৎ বুড়ো বয়সে এইসব রাতারাতি হয়ে যাওয়ায় কেমন হাঁফ ধরে যাচ্ছে! সেই হাঁফ ছাড়তেই বাগানে এসে বসা।

তোমার মুখ থেকে যা বেরোয় বেদবাক্য। কথাটা বলেছো বড্ড ভাল। ভোগ করতে শিখতে হয়। তবে চেষ্টা করতে করতে শেখাটা হয়েও যায়। না গো?

তোমার হচ্ছে, দেখছি। বলে বিষ্ণুপদ হাসল।

লজ্জা পেয়ে নয়নতারা বলে, মেয়েমানুষের মন তো বিষয়মুখী, তাই আমরা এগুলো তাড়াতাড়ি শিখি। তোমার মুখখানা আজ রসস্থ দেখছি যে! শরীর খারাপ নয় তো!

আরে না। তোফা আছি।

ভাঁড়িও না বাপু।

না গো, তোমার কাছে লুকোবো সাধ্যি কি! শরীর ভালই আছে। মনটা ভাল নেই।

কেন, হলটা কী?

ছেলেটা দুহাতে কেন যে এত খরচ করল! বউমার সঙ্গে হয়তো অশান্তি হচ্ছে।

সে আর বলতে! খুব হচ্ছে।

জানো ঠিক?

আন্দাজ করছি। ছেলে মুখ-ফস্কা দু-একটা কথা বলেও ফেলে। আর বউমা তো স্পষ্ট কথা শুনিয়েই গেছে। ওসব গায়ে মাখলে তো চলবে না। ছেলে তার বাপ-মায়ের প্রতি কর্তব্য করেছে। বাপ-মাও তো ফ্যালনা নয়।

একটু কম করে করলেও হত। বউমা তো খুব অন্যায্য কথা বলেনি।

সে বিদেশ থেকে মেলা টাকা পেয়েছে তাই করেছে। তার পরিশ্রমের রোজগার।

বিষ্ণুপদ কথাটা ঠিক স্বীকার করতে পারল না। একটু চুপ থেকে বলল, সবই বুঝি নয়নতারা। তবু বলি, এতটা না করলেও চলত। তাদেরও তো হক আছে, দাবি আছে। আমার কেবল মনে হচ্ছে এ যেন অন্যের মুখের গ্রাস।

নয়নতারা বলে, ওগো, তারও তো আমাদের জন্য প্রাণটা পোড়ে। সে তো এতকাল কিছু করেনি। বউ ছেলেমেয়ের সেবাই করেছে। এখন একটু মায়া হয়েছে বলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হল!

কৃষ্ণটা হয়তো মনের কষ্টে আছে। বউমা হয়তো কথা শোনায়। আমাদের তিনকাল তো কেটেই গিয়েছিল। আর কয়েকটা দিন কি চলতো না?

আমাদের চলত, কিন্তু কৃষ্ণ যে প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছিল তা তো হত না।

বিষ্ণুপদ একটু ভেবে বলল, তা বটে!

নয়নতারা একটু বিষণ্ণ গলায় বলল, কৃষ্ণ এত করেও তোমাকে কিন্তু খুশি করতে পারল না। হ্যাঁ গো, তুমি কেন খুশি হলে না, বলো তো!

বিষ্ণুপদ একটু হেসে বলল, সুখটা যে কোথায় থাকে তাই তো বুঝতে পারি না নয়নতারা। রোজ ভাবি, এই যে সাতসকালে বাগানে এসে বসে আছি সে এমনি নয় গো, বসে বসে ভাবছি আর ভাবছি। তা আমার ভাবনা কেমন জানো? যেমন লম্বা দড়ি জট পাকিয়ে যায় তেমনি। মেলা গিঁট, মেলা ফাঁস। কিছুতেই সরল হতে চায় না।

তোমার সুখ না হলে আমার মনটা খারাপ হয়, জানো তো!

তা জানি। তবে ভেবো না, ধীরে ধীরে সব অভ্যাস হয়ে যাবে।

তোমার পুরনো বাড়ির জন্য মন কেমন করে বোধহয়।

তাও করে। সে বাড়ি নিজের রক্ত জল করে করা। অনেক পুরনো দিনের নানা কথা জড়িয়ে ছিল তার মধ্যে, তা বলে ভেবো না আমি স্মৃতি নিয়ে পড়ে আছি। আমি ভাবছি সুখ জিনিসটার কথা। মনটা কেমন ছাড়া হয়ে আছে।

চলো তো, ওপরের বারান্দায় গিয়ে আমার সামনে বসবে। আমি কুটনো কুটবো এখন। তুমি সামনে থাকলে আমার বুকটা ঠাণ্ডা থাকে।

চলো তাহলে। বলে উঠে পড়ল বিষ্ণুপদ।

কৃষ্ণজীবন এল দু'দিন বাদে। রবিবার। দোতলা থেকে তাকে প্রথম দেখল বিষ্ণুপদ। সে নয়নতারাকে ডাকাডাকি করল না। ছানি পড়া চোখে কৃষ্ণজীবনের লম্বা শরীরটাকে সটান হেঁটে আসতে দেখল সামনের মাঠের পাশ দিয়ে। দোতলা থেকে অনেক দূর অবধি দেখা যায়। ছাদে উঠলে তো কথাই নেই।

কৃষ্ণ এল, বাড়িতে একটু তটস্থ ভাব হল। এলেমদার মানুষের কদরই আলাদা!

ওপরে এসে বাপের মুখোমুখি যখন বসল কৃষ্ণজীবন, তখন বিষ্ণুপদ ভাল করে ছেলের মুখখানা লক্ষ করল। কেমন আছে তার এই আলাভোলা ছেলেটা? ভাবের জগতে থাকে, দুনিয়ার নানা উল্টোপাল্টা ব্যাপার ভাল বুঝতে পারে না। বউমার সঙ্গে পট খাচ্ছে তো! অপমান হতে হচ্ছে না তো!

মুখখানা খুব একটা হাসিখুশি নয়। কেমন যেন থম ধরা।

বাবা, কেমন আছেন?

দিব্যি আছি বাবা। এর চেয়ে ভাল কখনও থাকিনি।

বলেই বিষ্ণুপদর মনে হল, মিথ্যে কথা বলা হল নাকি? দুনিয়ায় যত সাধুবাদ আছে তার মধ্যে একটু করে মিথ্যে ঢুকে থাকেই। যত প্রশংসাবাক্য আছে তার অধিকাংশই একটু বাড়তি কথা। কী আর করা যাবে!

কৃষ্ণ একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, যখন যা দরকার হবে বলবেন বাবা। নিঃসঙ্কোচে বলবেন।

বিষ্ণুপদ খুব হাসল। একেবারে ছেলেমানুষের মতো। সারা জীবনে এরকম কথা কেউ তাকে বলেনি। এ যেন হঠাৎ স্বর্গ থেকে দেবতা নেমে এসে বললেন— কী বর চাও বলো, দেবো। কিন্তু বিষ্ণুপদ ভাবে, সারা জীবন খিদে নিয়ে, অপূরণ ইচ্ছে নিয়ে, নিদারুণ অভাব কষ্ট নিয়ে বেঁচে থাকার একটা যে সময় গেছে তখনও তার চাহিদা তো খুব বেশী ছিল না। রাঙা চালের মোটা ভাত আর একটু ডাল হলেই হত। দুখানা মোটা ধুতি, দুখানা জামা হলেই হত। পায়ে এক জোড়া জুতো হলেই হত। তার বেশি আকাঙ্ক্ষাই তো তৈরি হত না মনে।

বিষ্ণুপদ হাসি থামিয়ে স্মিত মুখে বলল, কী আর লাগবে বাবা? কিছুই তো লাগে না এখন। যথেষ্ট আছে।

কৃষ্ণজীবনও একটু হাসল। তারপর বলল, আপনার যে কিছুই লাগে না তা আমি জানি।

বিষ্ণুপদ একটা সরল শ্বাস ফেলে বলল, বড় কষ্ট করে বড় হয়েছে বাবা, তুমি জানবে না তো কে জানবে? কত অল্পে কত সামান্য নিয়েও মানুষের চলে যায়, তা তুমি ভালই জানো।

কৃষ্ণজীবন মেদুর চোখে চেয়ে বসে রইল। জবাব দিল না। জীবনের গভীর গভীরতর মর্মস্থল থেকে মাঝে মাঝে উঠে আসে হলাহল, মাঝে মাঝে উঠে আসে অমৃত। মন্থন করো, জীবনের গভীরে দাও ডুব। নইলে

ওপরসা ওপরসা ভেসে বেড়ানো হবে, লাগবে হাজার উপকরণ, বোঝাই যাবে না কেন জন্ম, কেন এই জীবনযাপন।

কৃষ্ণজীবন মৃদু স্বরে বলল, বামার বউ আমার কাছে গিয়েছিল। সে কিছু টাকা চায় আর ওই রামজীবনের বাড়িটা চায়।

তুই কি বলেছিস?

আমি কিছু বলিনি। বলেছি, ভেবে, পরামর্শ করে বলব।

কত টাকা চায়?

এক লাখ।

কেন?

বলছে তাদের বড় অভাব, বামার চিকিৎসার জন্য মেলা খরচ হচ্ছে, এইসব আর কি!

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, টাকার জন্য আমার ওপরেও হামলা করেছিল। লোভে পাগল হয়ে গেছে।

আমার মনে হয় টাকাটা দিয়ে ওদের ঠাণ্ডা করে দেওয়াই ভাল। নইলে আবার এসে আপনাদের জ্বালাতন করবে।

তুমি অনেক শিখেছো বাবা, তবু লোকচরিত্র বোঝে না। ওদের লাখ লাখ টাকা দিয়েও কিছু হবে না। ওটা তো খিদে নয়, হাঁকাই। টাকা দাও, ফের কিছুদিন পরে এসে হাত পেতে দাঁড়াবে।

দেবো না তাহলে?

না বাবা। তুমি গরিবের ছেলে হলে কি হবে, এখনও টাকার ওপর তোমার কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। ভাবো বুঝি টাকা দিয়েই সব সমস্যা মেটানো যায়! ওরকম ভেবো না।

কৃষ্ণজীবন একটু হাসল, সবাই যে টাকা-টাকাই করে।

তোমার টাকার ওপর মায়া হল না কেন বলো তো?

মায়া? কিসের মায়া বাবা?

তুমি গরিবের ছেলে, নুন জুটতো তো পান্তা জুটত না তোমার, জুতো জামা বই খাতা পেনসিলের জোগাড় ছিল না, সেই তুমি এখন টাকার মুখ দেখলে, তবু টাকাকে তোমার খোলামকুচি মনে হয় কেন বাবা?

কৃষ্ণজীবন একটু হেসে বলে, টাকা নিয়ে ভাবতে বলেন নাকি বাবা?

না, তবে টাকা বড্ড উড়ছে তোমার চারদিকে। ঠক জোচ্চোরেরা ঘিরে ধরবে। শ্যামলীকে বেশি প্রশ্রয় দিও না। ওদের টাকার অভাব নেই। দুটি মোটে মানুষ, বামা চাকরিও করে। ওদের অভাব কি? তবে রামজীবনের ওই বাড়িটায় এসে যদি থাকতে চায় তো থাকবে। রেমোর কাছে কথাটা পাড়ব’খন।

সেই বুদ্ধিই ভাল।

এ বাড়ির পিছনেও তুমি অনেক টাকা ঢেলেছে। এতটা না করলেও হত। বউমা আর ছেলেপুলেদের দিকটাও তো দেখতে হয়!

তাদের জন্যও অনেক আছে বাবা। বেশি টাকাও ভাল নয়। হঠাৎ হাতে বেশি টাকা পড়লে সৎকাজে ব্যয় করা ভাল। নইলে ছেলেপুলে ওই টাকার পাল্লায় পড়ে নষ্ট হয়।

বিষ্ণুপদ একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ অনাবিল হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে বলল, একটা বড় ভাল কথা শুনলাম আজ। বেশ বলেছে বাবা।

কৃষ্ণজীবন চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকে। আজ যে ছেলের মেজাজ ভাল নেই তা বুঝতে পারে বিষ্ণুপদ। সেও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

কৃষ্ণজীবন হঠাৎ বলে, আপনার বাঁ চোখের ছানিটা বোধহয় ম্যাচিওর করে গেছে। কিছু দেখতে পান বাঁ চোখে?

বিষ্ণুপদ ডান চোখে হাত চাপা দিয়ে বাঁ চোখে চারদিকটা দেখে নিয়ে হাসতে হাসতে বলে, না। বড্ড ধোঁয়া ধোঁয়া। এই যে তোকে দেখছি, একটা কেউ বসে আছে বোঝা যায়। তার বেশী নয়। তবে ডান চোখে দেখি।

বাঁ চোখটা কাটিয়ে নিতে হবে।

দরকার কি? দেখার আছেই বা কি? চলে তো যাচ্ছে!

না বাবা। বেশি ম্যাচিওর করে গেলে চোখটা যাবে। এসব পুষে রাখা ভাল নয়। আমি কলকাতায় ফিরেই ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলব। আজকাল ঝামেলা কম। মাইক্রো সার্জারি করালে এক দিনের বেশি আটকেও থাকতে হয় না।

আবার খরচের পাল্লায় পড়বে?

কৃষ্ণজীবন হেসে বলে, মানুষ খরচ করলে তার বদলে কিছু পায়ও তো! শুধু খরচ দেখলেই কি হবে বাবা?

সে তো খাঁটি কথা। কিন্তু লোকে ওই খরচটাই যে দেখে।

আপনি আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না —চোখটা না কাটালেই নয়।

এখানে হয় না?

না বাবা। মাইক্রো সার্জারি করাতে হলে কলকাতায় যেতে হবে। তাতেই বা কি? কলকাতা তো একটুখানি রাস্তা। আমি আপনাকে গাড়ি করে নিয়ে যাবো।

ও বাবা! গাড়িতে কি কম তেল পুড়বে? তার দরকার নেই। ট্রেনেই যেতে পারব।

১০৬

শুরুটা হল এইভাবে: মধ্যপ্রদেশের বান্ধবগড় অরণ্যে এক শীতের বিকেলে আমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। সেই রাজকীয় বিশাল সুন্দর শরীর ধীর গতিতে উঠে এসেছিল একটা পাথরের চাতালে। আমি মুগ্ধ, সম্মোহিত। ভয় নয়, শ্রদ্ধা ও আবেগে আমার মাথা নত হয়ে এসেছিল তার সামনে। কী নিরাসক্ত, নির্ভীক আর উদাস তার চোখ। পৃথিবীতে তার ভয় পাওয়ার মতো কিছুই নেই। হায়, এমন এক অসামান্য জীবকে চিড়িয়াখানার করুণ খাঁচার মধ্যে পুরে কী অপমানটাই না করে মানুষ! এমন দিনের কি আর দেরি নেই যখন রাজ্যহারা এই রাজা আশ্রয়হীন, খাদ্যহীন, বীতশ্রদ্ধ এই পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নেবে? ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হচ্ছে পাখি, পশু, পতঙ্গের প্রজাতি।

প্রথম পরিচ্ছেদের নাম দিল কৃষ্ণজীবন, দি কিং ইজ ডায়িং।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম, দি ফানি ব্যালান্স শিট। তাতে মানুষের সংখ্যা ও পৃথিবীতে উৎপন্ন ফসল ও খাদ্যের অনুপাত আর পশু ও তার খাদ্যের অনুপাতের বিস্তারিত পরিসংখ্যান, কতটা দূষণ ঘটছে পৃথিবীতে আর কতটাই বা শোষিত হচ্ছে সেই দূষণ, গাছপালা অরণ্যের হিসেবনিকেশ।

এইভাবে এগিয়ে গেল তার দ্বিতীয় গ্রন্থ, দি বলডিং হেড। কখনও পরিসংখ্যান, কখনও অঙ্ক, কখনও নীরস বিজ্ঞানের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে পুরাণ, ওল্ড টেস্টামেন্ট, কোরান, রিলকে, লোরকা, বোদলেয়ার, টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ, মিশে যাচ্ছে স্মৃতি, লোকগাথা, রূপকথা। বল্গাহীন এক প্রবহমানতা। রূপসী বাংলার কত কবিতার যে অনুবাদ ঘটাল সে! লিখতে লিখতে সংশয় আসে, এ কি তরল ছেলেমানুষী হয়ে যাচ্ছে? এ কি হয়ে যাচ্ছে একান্ত ব্যক্তিগত রচনা? মাঝে মাঝে তার কাউকে শোনাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কাকে শোনাবে? কার সময় আছে? কে শুনবে মন ও কান দুই-ই নিবিষ্ট রেখে?

সংসার ছেড়ে হয়ত একদিন তাকে পরিব্রাজক হয়ে যেতে হবে। এ সংসার তাকে কিছুই দেয়নি, দিতে পারবেও না আর। রিয়া তাকে শাসন করতে করতে এমন একটা সীমারেখায় পৌঁছে দিয়েছে সেটা যেন ঘর ও বাইরের মধ্যবর্তী চৌকাঠ। পেরোলেই মুক্তি। সে সহ্য করতে পারে না চটুল হিন্দি গান বা ভি সি আর-এ যখন তখন সিনেমা চালানো, জোরে কথা বলা, অকারণে রাগারাগি চেঁচামেচি, ঝি-এর সঙ্গে বিতর্ক তাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। সে কখনও কাউকে শাসন করতে পারে না, তর্ক বা ঝগড়া সে কখনও করেই না। তবে কি তার রাগ হয় না? হয়। কিন্তু সেই রাগ যেন এক অন্ধ হাতির মত দাপাদাপি করে তারই ভিতরে। তার

হৃদযন্ত্রে, পাকস্থলীতে, ফুসফুসে, মস্তিকে সর্বত্র সেই অন্ধ রাগের ধাক্কা গিয়ে লাগে। তাকে ক্লান্ত করে দেয়, বিধ্বস্ত করে ফেলে, নিঃঝুম করে দেয়।

রিয়ার রাগ আজকাল এতই বেড়েছে যে সে আর ভদ্রতার মুখোশটাও রাখছে না মুখে। বারবার সে পনের লক্ষ টাকার হিসেব চাইছে। বিষ্টুপুরের বাড়ি নিয়ে তার দাপাদাপিও সাঙ্ঘাতিক। তার ধারণা হয়েছে সব টাকা ঢেলে ফেলেছে সে গাঁয়ের বাড়ির পিছনে। তাকে শোষণ করে নিচ্ছে তার আত্মীয়রা।

কোনও কথাই সে রিয়াকে বোঝাতে পারে না। একদিন চেষ্টা করতে গিয়েছিল, রিয়া হঠাৎ উন্মত্তের মতো প্রথমে একটা স্টিলের গেলাস ছুঁড়ে মারল তাকে। সেটা কৃষ্ণজীবনের কাঁধে সামান্য আঘাত করে ছিটকে গেল। পরের ঘটনা মারাত্মক। একটা রুটি বেলার বেলন দিয়ে ঘাড়ে, কপালে, গালে, হাতে এলোপাথাড়ি মারল তাকে। কৃষ্ণজীবন চুপ করে দাঁড়িয়ে শুধু ক্ষীণ আটকানোর চেষ্টা করে গেল। কোনও শোধ নিল না। সে অবাক দুটি চোখে ক্রোধ ও আক্রোশের বিকৃত চেহারাটা দেখছিল। এ সবই তার অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। এই পৃথিবী থেকে সে কত কিছু শেখে রোজ!

ঘটনার সময়ে ছেলেমেয়েরা বাড়িতে ছিল না। কিশোরী একটি ঝি ছিল। সেই পরে এসে তুলো ভিজিয়ে তার ক্ষতস্থানের রক্ত মুছিয়ে দিয়েছিল।

না, কৃষ্ণজীবনের এতে কিছু যায় আসে না। শুধু মনঃসংযোগ কেটে যায়। হারিয়ে যায় চিন্তার সূত্র। তাকে অপমান করবে কে! ধুলোমাটি থেকে সে উঠে এসেছে। তার অস্তিত্বের সঙ্গেই তো অবমাননার ধুলোমাটি লেগে আছে। তার কোনও জ্বালা-যন্ত্রণা নেই।

সংসারে তার একটা মাত্র বন্ধু। দোলন। কিন্তু দোলনও কত বড় হয়ে গেল! আগে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে ঘুমোত। আজকাল একটু তফাত। আর আগের মত আবোল-তাবোল কথা হয় না তাদের মধ্যে।

সংসারের বাঁধন কি শিথিল হয়ে এল তার? কাজের মধ্যে, লেখার মধ্যে যখন ডুবে যায় তখন তার তথাকথিত আপনজনেরা হারিয়ে যায় কোথায়। এই যে বলডিং হেড লিখছে সে, লিখতে লিখতে যেন কোন অতলে তলিয়ে যাচ্ছে সে। বারবার চলে আসছে কত তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা, কত স্মৃতির টুকরো, কত বৃষ্টির বিকেল, শীতের রাত, দেশ ও বিদেশের কত ল্যান্ডস্কেপ, ট্রামে বাসে ট্রেনে শোনা কথা, সংলাপের অংশ। লিখতে লিখতে নাওয়া-খাওয়া ভুল হয়ে যায়।

আমেরিকা থেকে পাবলিশার তার দ্বিতীয় গ্রন্থের জন্য অগ্রিম দশ হাজার ডলারের একটা চেক পাঠিয়ে দিয়েছে। এ টাকার কথা গোপন করতে হল তাকে রিয়ার কাছে। কাজ কি অশান্তি বাড়িয়ে। সে মরে গেলে এ সব টাকা তো ওরাই পাবে। আপাতত টাকার কথাটা চাপা থাক।

কিন্তু টাকার এই আকর্ষণ, এই গুরুত্বকে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না সে। গরিব ঘরের ছেলে, প্রাণান্তকর কষ্টের মধ্যে বড় হয়েও কেন সে টাকার মূল্য বুঝছে না, এ প্রশ্নের জবাব সে তার বাবাকেও দিতে পারেনি সেদিন।

কৃষ্ণজীবন টের পায় দিন দিন সে এক গভীর নিঃসঙ্গতার মধ্যে চলে যাচ্ছে। তার বন্ধু নেই, আত্মীয় নেই, ভালবাসার লোক নেই কেউ। শুধু সে আর কাজ।

উত্তেজিত একটা টেলিফোন এল এক সকালে।

হ্যালো, আপনি কি মর্নিং নিউজটা শুনেছেন টিভি-তে?

না তো!

আমি হেমাঙ্গ বলছি। আপনি যে বিরাট একটা প্রাইজ পেয়েছেন!

কৃষ্ণজীবন উদাস গলায় বলল, আপনি কেমন আছেন? অনেকদিন আপনার দেখা নেই।

আরে মশাই, আমি ভালই আছি। আপনি যে প্রাইজ পেলেন সে বিষয়ে একটু রি-অ্যাকশন দেখান!

ওরা যে কেন আমাকে প্রাইজ দেয় কে জানে! পৃথিবী গোল্লায় যাচ্ছে, প্রাইজ দিয়ে কী হবে বলুন তো!

আচ্ছা মানুষ আপনি। একটু খুশি হবেন তো!

খুশি! তা খুশিই না হয় হলাম, ফর ইওর সেক। কিন্তু আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, প্রাইজ আসলে ঘুষ। আমার প্ল্যান বা পরামর্শ কিছুই ওরা নেবে না, ফাইল বন্দি করে ফেলে রাখবে। আর প্রাইজ দিয়ে বন্ধ রাখবে আমার মুখ।

আপনি একজন ইমপসিবল মানুষ। কিন্তু এরকমই থাকুন। খাঁটি লোক পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমে।

কৃষ্ণজীবন একটু হাসল, হারিয়ে যাচ্ছে না। তেমন মানুষ জন্মাচ্ছেই না আর। জন্মও একটা বিজ্ঞান। মানুষ তা মানছে কই। অপমানুষে পৃথিবী ভরে যাচ্ছে।

আপনি ডারলিং আর্থ-এ এ কথা লিখেছেন।

লিখছি। বলছি। আর কী করতে পারি বলুন! কিছুতেই কাউকে বুঝিয়ে উঠতে পারছি না, এখন পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য আমাদের একসঙ্গে বসা উচিত। জড়ো করা উচিত অল আওয়ার রিসোর্সেস। সবচেয়ে গুরুতর কাজ এখন এটাই। নইলে পৃথিবী চলে যাবে শয়তানের থাবায়। শুধু পরিবেশ তো নয়, মানুষকে ধরেছে আরও হরেক রকম ক্ষয়। আপনি কি জানেন হোমোসেকসুয়ালিটি একটা রোগ? মনোবিকার?

তাই তো মনে হয়।

এর থেকে পরিত্রাণ চাইছে না মানুষ। চাইছে তার এই রোগকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হোক।

হোমোসেকসুয়াল আর লেসবিয়ান মানুষ ও মহিলারা জোটবদ্ধ হচ্ছে, মিছিল করছে, আলাদা অলিম্পিক করছে, যেন সেটাই স্বাভাবিকতা।

জানি।

আরও কি জানেন যে, বাপ-মায়ের সঙ্গে সন্তানের যৌন সংসর্গকে পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় তকমা এঁটে পাশ মার্কা দেওয়ার আয়োজন চলছে?

তাও জানি।

আপনি কি মানেন পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন?

মানছি।

এই অসুখ আমাকে দিনরাত কুরে কুরে খাচ্ছে। প্রাইজ দিয়ে আমি কি করব বলুন তো! কয়েক সেকেন্ড টিভি কভারেজ, মালা, রাষ্ট্রপতির হাত থেকে দেঁতো হাসি হেসে পুরস্কার নেওয়া—গোটা ব্যাপারটাই এত কৃত্রিম! জীবনে বহুবার আমাকে এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে।

হেমাঙ্গ হেসে প্রসঙ্গান্তরে গেল, এবার বলুন বলডিং হেড কতদূর এগোল।

শেষের দিকে। প্রকাশকরা তাগাদা দিচ্ছে। আমি একটু সময় নিচ্ছি। লেখা শেষ হতে আরও মাসখানেক। তারপর রিভিশন।

সামনের বছর বেরোবে?

মনে হয়।

আমি অপেক্ষা করছি।

আপনি একজন অত্যন্ত ভাল লোক। আপনি সত্যিই পৃথিবীকে ভালবাসেন।

ধন্যবাদ।

আরও দু-চারটে কথার পর ফোন রাখল কৃষ্ণজীবন। মন তিক্ততায় ভরা।

রিয়া কাছেপিঠেই ছিল। ফোন রাখার সঙ্গে সঙ্গে সামনে এসে দাঁড়াল।

কে ফোন করেছিল?

হেমাঙ্গবাবু।

কী বলছিলেন উনি?

এমনি। কেমন আছি জিজ্ঞেস করলেন।

একটা প্রাইজের কথা শুনলাম যেন!

ও কিছু নয়।

কে প্রাইজ পেল? তুমি নাকি?

কৃষ্ণজীবন একটু লজিত হয়ে বলল, হ্যাঁ, সেরকমই বলছিলেন।

কী প্রাইজ?

তা জিজ্ঞেস করিনি। বোধহয় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কিছু একটা হবে!

অত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার কী আছে? প্রাইজ তো একটা সম্মান।

হ্যাঁ। তা ঠিক।

তা হলে বলছ না কেন?

কৃষ্ণজীবন তার ক্লান্ত বিষণ্ণ দুটি চোখে তার সুন্দরী স্ত্রীর মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে বলে, আমি জানি না রিয়া। রেডিও বা টিভি-তে হয়ত আবার বলবে। শুনে নিও।

তুমি ইন্টারেস্টেড নও?

না। প্রাইজ নিয়ে লাফালাফি করার কিছু নেই। যখন দেবে, হাত পেতে নেব। আর কি?

এতক্ষণ গলায় একটু ধমক ছিল রিয়ার। এবার হঠাৎ কোমল হল। বলল, তুমি কেন এরকম গো? তুমি কেন আর পাঁচজনের মত নও? তোমার জন্য যে আমার ভয় করে।

কৃষ্ণজীবন তটস্থ হল। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। কিছু বলল না।

রিয়া বলল, এইজন্যই তো তোমার সঙ্গে আমার লেগে যায়। তোমার কোনও রি-অ্যাকশনই হয় না কোনও কিছুতে। এইজন্যই তো আমি মাঝে মাঝে পাগল হয়ে যাই।

কৃষ্ণজীবন মৃদু একটু হেসে বলল, আমি পাঁচজনের মতোই। তবে আমার তো অনেক চিন্তা, তাই বোধ হয় রি-অ্যাকশন কম হয়।

না, তা নয়। তুমি বোধ হয় একজন মস্ত মানুষ। আমি বোধ হয় তোমাকে ঠিক বুঝতে পারি না। না গো?

ঘন ঘন মাথা নেড়ে কৃষ্ণজীবন বলল, তা নয়, তা নয়। ওরকম ভাবতে নেই রিয়া। আমি কত সামান্য তা তুমি জানো না।

রিয়া তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তার দু' চোখ বেয়ে টস টস করে জল গড়িয়ে নামে। একটু ফুঁপিয়ে উঠে বলে, আমি মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে রাক্ষুসির মত ব্যবহার করি। কিন্তু তুমি যে....

কথা শেষ করতে পারল না রিয়া। ভেঙে পড়ল।

দ্বিতীয় ফোনটা এল গভীর রাতে, যখন কৃষ্ণজীবন তার রচনার মধ্যে ডুবে আছে। সে যে পরিচ্ছেদটা লিখছিল তার শিরোনাম কপালকুণ্ডলার সেই বিখ্যাত লাইন, পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?

কী করছেন আপনি এখন? লিখছেন তো!

হ্যাঁ। তুমি কেমন আছ?

আচ্ছা, আমি যে বড় হয়েছি তা আপনি লক্ষ করছেন?

কৃষ্ণজীবন হাসল, করছি।

কেমন লাগছে আপনার আমাকে এখন?

তুমি তো সুন্দর মেয়ে।

আহা, ওভাবে বান্ধবীকে কমপ্লিমেন্ট দিতে হয়? একদম গাঁইয়া হয়ে যাচ্ছেন কিন্তু।

গাঁইয়াই তো ছিলাম!

সে ছিলেন তো ছিলেন, এখন ইউ আর এ ফেমাস ম্যান, এ সেলিব্রাইটি। আপনি যে একটা প্রাইজ পেলেন আমি জানি।

ওটা কিছু নয়।

তাও জানি। আপনি একটা খুব অহঙ্কারী লোক।

আমি তো উল্টো জানতাম।

মোটেই না মশাই। আচ্ছা বলডিং হেড কি আমি একটু অ্যাডভান্স পড়তে পারি না?

পারো। ইন ফ্যাক্ট আমি একজন কাউকে শোনাতে চাইছিলামও।

সত্যি? তা হলে কবে?

তোমার কখন সময় হবে?

আমার তো এক্ষুনি আপনার কাছে যেতে ইচ্ছে করছে।

পাগল। বলে হাসল কৃষ্ণজীবন। তারপর বলল, কাল আমার ক্লাস নেই।

আমিও স্কুল পালাব। কোথায় আর কখন?

একটু ভাবল কৃষ্ণজীবন। তারপর বলল, বেলা বারোটায় গোল পার্কের রেলিং-এর সামনে থেকো। তুলে নেব।

খিক খিক করে হাসল অনু। বলল, উইল ইট বি সিক্রেট অ্যান্ড রোমান্টিক মিটিং?

নো, নটি গার্ল। ইট উইল বি অ্যান অ্যাকাডেমিক মিটিং।

আচ্ছা বাবা, তাই হোক। তবু তো কিছুক্ষণ কম্পানি পাওয়া যাবে।

তোমার এখনও একটা বয়ফ্রেন্ড জুটল না?

কে বলল জোটেনি?

কে সে?

আপনিই তো আমার বয়ফ্রেন্ড।

কৃষ্ণজীবন হাসল। বলল, বড্ড পাকা হয়েছে।

কত বয়স হল জানেন? এখন আমি আর গার্ল নই, এ উওম্যান।

পরদিন দুপুর বারোটায় জিনস, সাদা শার্ট আর বড় রোদ চশমা পরা অনুকে যখন গাড়িতে তুলে নিল সে তখন কৃষ্ণজীবনের ভিতরে একটা কিছু হচ্ছিল। একটা সিরসিরে গোপন কাঁপন। মানুষ এসব প্রবণতাকে বুদ্ধি ও বিবেচনা দিয়ে চাপা দেয়।

কোথায় যাব আমরা এখন?

কৃষ্ণজীবন হাসল, চল কোনও ভাল রেস্টুরেন্টে বসি!

আমার কিন্তু খিদে নেই।

এঃ হে, তোমাকে আজ লাঞ্চে ডাকলেই হত!

কেন ডাকেননি?

বড্ড ভুলে যাই যে!

এরকম আনমাইন্ডফুল বয়ফ্রেন্ড নিয়ে যে আমার কী মুশকিল!

আইসক্রিম তো খেতে পারবে!

পারব।

তা হলেই হবে। চল।

খুব দামী একটা হোটেলের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত রেস্তোরাঁয় তারা বসল। কৃষ্ণজীবন তার হাতে টাইপ করা কয়েকটি শিট দিয়ে বলল, পড় তো।

অনু যখন পড়ছিল তখন তাকে লক্ষ করছিল কৃষ্ণজীবন। মেয়েটা এমনিতে একটু ফাজিল, কিন্তু যে-ই পড়তে শুরু করল অমনি গম্ভীর, স্থির, একাগ্র হয়ে গেল। একবারও চোখ তুলল না। খুব খুশি হল কৃষ্ণজীবন। মেয়েটা হয়ত কেবল ফাজিলই নয়, ভিতরে ভিতরে সিরিয়াস।

কয়েকটা পাতা ধীরে ধীরে পড়ে শেষ করল অনু। তারপর মুখখানা যখন তুলে তার দিকে তাকাল, তখন মেয়েটার মুখখানা লাবণ্যে ভরে গেছে।

বুঝতে পারছ অনু?

পারছি না? কী যে বলেন! কী অদ্ভুত লেখা!

শুধু প্রশংসা করলেই তো হবে না। ক্রিটিক্যালি পড়লে তবে আমি নিশ্চিন্ত হব।

ক্রিটিক্যালি! যা খুব সত্যি তাকে কি ক্রিটিসাইজ করা যায়?

ভোলাচ্ছ না তো!

না। আমি সে রকম গার্ল ফ্রেন্ড নই। আমি সিরিয়াস। আপনি একজন অদ্ভুত মানুষ। আমার কান্না আসছিল পড়তে পড়তে।

দ্যাটস গুড। দ্যাট ইজ ভেরি গুড। তোমার কি মনে হয় মানুষ এই লেখা পড়ে নড়েচড়ে বসবে? বই পড়লে মানুষের কিছু প্রতিক্রিয়া হয়। সেটা তাৎক্ষণিক। আমি চাই এমন লেখা লিখতে যা পড়ে মানুষ সত্যি করে কিছু করতে চাইবে এবং করবে।

অনু তার একখানা হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণজীবনের হাতের ওপর রেখে একটু চাপ দিয়ে বলল, আপনিই হয়ত পারবেন। আমি তো অত বুঝি না।

তাও ঠিক। তোমার অভিজ্ঞতা কতটুকুই বা!

আমার আইসক্রিম কই?

আসবে। আমি বেয়ারাকে পরে আসতে বলেছি।

এবার ডাকুন।

কৃষ্ণজীবন অনুর জন্য আইসক্রিম আর নিজের জন্য কফির অর্ডার দিয়ে তৃপ্ত মুখে বসল।

তিন মাস বাদে বলডিং হেড বেরল আমেরিকা থেকে। নিউ ইয়র্কে রিলিজের দিন উপস্থিত ছিল কৃষ্ণজীবন। টিভি থেকে ছোট্ট সাক্ষাৎকার নিল তার।

রাতে হোটেলের ঘরে অন্ধকারে একা বসে কাচের শার্সি দিয়ে বাইরে চেয়ে সেন্ট্রাল পার্কের দৃশ্য দেখছিল সে। দেখতে দেখতে সে চলে গেল বিষ্টুপুর গাঁয়ে, তার ছেলেবেলায়। কাদাজল ভেঙে ইস্কুলে যাচ্ছে। মাথায় কচুপাতা এক হাতে ধরা, জামার নিচে বইখাতা অন্য হাতে ধরা। খালি পা। চলেছে চলেছে। পথ ফুরোয় না আর। পিছল পথ। উঁচু নিচু পথ। কত দূরে ইস্কুল!

১০৭

মাসে মাসে পাঁচশো করে টাকা পাঠাচ্ছে নিমাই। মাসের প্রথমেই একটা ছেলে এসে দিয়ে যায়। হাত পেতে টাকাটা নিতে ইচ্ছে করে না বীণার। কিন্তু তবু নেয়। না নিলে তার চলবে কি করে? নিমকহারাম নিমাইয়ের জন্য তো সে কম করেনি। যদি সেই ঋণ শোধ করতে চায় তা হলে করুক। একটু বাধো-বাধো লাগলেও পুরনো কথা ভেবে বীণা নেয়।

যে ছেলেটা টাকা দিয়ে যায় সে আজ সকালেই এসেছিল। বীণা কোনওদিন তাকে বসতে বলে না, কোনওরকম আপ্যায়ন করে না। নিমাইয়ের লোককে সে তা করবেই বা কেন? তবে ছেলেটা ভারি ভদ্র আর বিনয়ী। খুব নরম গলায় কথা বলে। আজ যখন এসে ঘর্মাক্ত মুখে একটু হেসে পকেট থেকে টাকা বের করে হাতে দিল তখন বীণার একটু মায়া হল। হঠাৎ বলল, তোমার নামটা কী বল তো!

নির্মল রায়।

কী করো?

নিমাইদার দোকান দেখাশুনো করি, সঙ্গে থাকি।

একটু বসে জিরিয়ে নাও। চা খাবে?

চা আমি খাই না।

তা হলে জল খাও।

ছেলেটা অনাবিল আনন্দের হাসি হেসে বলল, একটু আগেই রাস্তার কল থেকে জল খেয়ে এসেছি। বাসে খুব তেষ্টা পেয়েছিল।

আমার ঘরে খাবারটাবার কিছু তেমন থাকে না। মুড়ি খেতে পারো। খাবে?

না। আমি খেয়েই বেরিয়েছি।

তাহলে তোমার সঙ্গে কি দিয়ে ভদ্রতা করি?

ছেলেটা জিব কেটে বলল, কিছু লাগবে না দিদি।

নির্মলের হাসিটা বড় ভাল লাগল বীণার। সরল সোজা ছেলে। রংটা কালো হলেও মুখখানায় মায়া মাখানো। এখনও দুনিয়ার পাপ একে পায়নি।

তা হলে আসি?

এসো গিয়ে।

নিমাইদাদাকে কিছু বলার নেই তো!

না। কী বলার থাকবে? প্রথমবার তুমি টাকা দিয়ে একটা কাঁচা রসিদ লিখিয়ে নিয়েছিলে। মনে আছে? আর নাও না তো!

ছেলেটা লজ্জা পেয়ে একটু হেসে বলল, আর লাগবে না।

ছেলেটা চলে গেছে। বিছানার ওপর টাকাগুলো পড়ে আছে অবহেলায়। বীণা এক ধারে চুপ করে বসা। এই মাসোহারা ভাঙিয়ে তাকে বেঁচে থাকতে হবে নাকি? এই দয়ার দানে? চোখ থেকে মন থেকে স্বপ্নগুলো সব মুছে যাচ্ছে। আলো, হাততালি, উল্লাস, ভরা আসরে নেমে প্রাণ ঢেলে অভিনয়—সব কি মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেল? এখন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চেয়ে থাকতে হবে কাঁচরাপাড়ার দিকে? তার যে বড় অপমান লাগে!

কিছুক্ষণ অঝোরে চোখের জল ফেলল বীণাপাণি। বুকটা এত ভার হয়ে থাকে যে, বলার নয়। মাথা ধরে। শরীর বিবশ হয়ে যায়। মনের কষ্টে তার কি একটা রোগ পাকিয়ে উঠছে? মাথাটাও পাগল-পাগল লাগে আজকাল। কতকাল পালা নেই, রিহার্সাল নেই, প্রশংসা নেই, এখানে ওখানে দল বেঁধে যাওয়া নেই। বনগাঁয়ে থেকে তা হলে আর কী লাভ?

কিন্তু যাবেই বা কোথায় সে? বাপের বাড়িতে ঝকঝকে দালান উঠেছে, একটু জায়গা সেখানে হতে পারে। কিন্তু সেখানেই বা কী আছে? কোন সুখ?

আজ সকালটা বড্ড ভারী। কেমন যেন!

এতদিনে কি কাকার রাগ পড়েনি? এককালে কাকা তো তাকে কতই স্নেহ করত। একবার যাবে নাকি কাকার কাছে? গিয়ে হাতজোড় করে বলবে, আর পারছি না কাকা, এ বারটা যদি ক্ষমা না কর তা হলে যে আমাকে গলায় দড়ি দিতে হয়।

না, কাকার কাছে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে আর গিয়ে দাঁড়ানো যাবে না কখনই। কিন্তু কথাটা নির্লজ্জের মতো মাঝে মাঝে ভাবে সে।

সজল এল একটু বেলায়। একটু উস্কোখুস্কো চেহারা। বেচারা বড়লোক ধরার চেষ্টা করতে করতে হন্যে হয়ে গেল। ভাল একজন স্পনসর পেলেই যাত্রার দল খুলবে। কিন্তু কেউ বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছে না।

চা খাওয়াবে নাকি বীণা?

বীণা বিরস গলায় বলল, শরীর ভাল নেই।

কেন, কী হয়েছে?

সে জানি না। আজ আমি কিছু করব না।

গলার স্বর শুনে মনে হয় কান্নাকাটি করেছ!

মেয়েমানুষ অনেক কাঁদে। ছুতো পেলেই।

তুমি তো শক্ত মেয়ে, সহজে কাঁদার পাত্রী নও।

এককালে শক্ত ছিলাম। আজ নেই।

সজল টুলের ওপর বসল। বিছানার দিকে চেয়ে বলল, টাকাগুলো তুলে রাখো। হাওয়া দিচ্ছে, উড়ে যাবে।

বীণা হাত বাড়িয়ে টাকাগুলো খামচে বালিশের তলায় চাপা দিয়ে রেখে বলল, তোমার কী হল?

কী আর হবে। চেষ্টা করে যাচ্ছি, হার মানছি না। তবে বাজার বড় সাঙ্ঘাতিক। আমার মতো আনাড়িকে কেউ পাত্তা দিতে চায় না। তোমার কথাও বলছি চারদিকে। আমার দলে তুমি থাকবেই। কিন্তু তাতেও কাজ হচ্ছে না।

আমার কথায় কাজ হবে কেন? আমি কোন্ বিনোদিনীটা বল তো?

আমার ধারণা ছিল এই অঞ্চলে তোমার খুব নাম। নাম যে নেই তাও নয়। সকলেই তোমাকে চেনে। কিন্তু উৎসাহ দেখাচ্ছে না।

তুমি বোকা। ভুলে যাচ্ছ কেন যে, আমার বদনামও আছে? কাকা তো আমাকে চুরির দায়ে তাড়িয়েছে।

ধুর! ওটা কোনও কথা নয়। যতদূর জানি কাকা তোমার বদনাম করে বেড়ায় না। তাছাড়া এ সব করার তার সময় কোথায়? সে এখন নতুন নতুন পালা নিয়ে ব্যস্ত। দল বড় হচ্ছে। চিৎপুরে ঘর নিচ্ছে শুনলাম। পুরোপুরি পেশাদার ব্যাপার।

সব জানি। আমার মতো চুনোপুঁটিকে নিয়ে ভাববার তার সময় নেই। তবু আমার বদনাম আমার চারদিকে একটা বেড়া তুলে দিয়েছে। তুমি বরং বনগাঁ ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে দল করো।

সে চেষ্টাও কি করিনি? এখানে দল করতে গেলে কাকা হামলা করতে পারে। সে হামলা না করলেও কম্পিটিশনে তার সঙ্গে পারব না। কিন্তু কোথাও কিছু সুবিধে হচ্ছে না।

তা হলে আর আয়ুক্ষয় করছ কেন?

কী করব তা বলতে পারো? আমার তো মাথায় কিছুই আসছে না।

কাকার মতো স্মাগলিং করো।

কী যে বলো! ও সব পারব না।

বীণা একটু হাসল। বলল, বড় শখের মূল্য দিতে হয়। নীতিকথা মেনে চললে হয় না।

নীতিকথা মানিও না। বাঁচার জন্য সব কিছু করা যায়। কিন্তু সবার তো সব রকম গাটস্ থাকে না। আমার ধাত ওরকম নয়। দেখ, শো বিজনেসের চেয়ে ভাল বিজনেস কিছু নেই। আমি পারলে ওটাই পারব।

বীণা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তা হলে চেষ্টা করে যাও।

করছি বীণা। তোমাকে একটা কথা বলব? অভয় যদি দাও।

বলই না। নাটক করার দরকার নেই।

তোমার হাজব্যান্ডের ব্যবসাটা ভালই চলছে শুনি। উনি আরও একটা হোটেল খুলছেন। জানো?

একটু অবাক হয়ে বীণা বলে, না। কিন্তু হঠাৎ তার কথা কেন?

বলছিলাম কি, নিমাইবাবুকে একবার অ্যাপ্রোচ করলে হয় না?

ভ্রূকুটি করে বীণা বলল, তার মানে?

উনি ইচ্ছে করলে আমাদের ফিনান্স করতে পারেন। দলের মালিকানা ওঁরই থাকবে, আমরা লাভের একটা অংশ পারিশ্রমিক নেবো।

বীণা প্রচণ্ড রাগের একটা উত্তাপ টের পেল তার মাথায়। রগের শিরাগুলো দপদপ করতে লাগল। কঠিন চোখে চেয়ে সে বলল, তুমি কি জানো ও লোকটাকে আমি কত ঘেন্না করি?

সেটা তো পারসোনাল লেভেলে। কিন্তু প্রফেশনাল লেভেলে হেল্প নিতে ক্ষতি কী? ওরও লাভ, আমাদেরও লাভ। পিওর পার্টনারশিপ।

তুমি এক নম্বরের আহাম্মক বলেই এ কথা ভাবতে পারলে। যাত্রার দল খোলার কথা ভাবতে ভাবতে তুমি উন্মাদ হয়ে গেছ। সব জায়গায় পার্টনারশিপ চলে না। আত্মমর্যাদা বলে একটা জিনিস আছে।

সজল উত্তেজিত না হয়ে বলল, আচ্ছা, তুমি অত রেগে যাচ্ছ কেন? বাঁচার জন্য স্মাগলিং করার চেয়ে তো এটা ভাল।

ও কথা আর মুখে এনো না। তা হলে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না।

ঘাট হয়েছে বাবা। কিন্তু নিমাইবাবুর মাসোহারা তো নিচ্ছ বীণা। সেইজন্যই সাহস করে কথাটা পাড়লাম।

মাসোহারা নিই কে বলল?

তা হলে?

আমার কাছে তার অনেক দেনা আছে। কষ্টের দিনে নিজে না খেয়েও তার সংসার টেনেছি। এখন সে সেই দেনা শোধ করছে। সে কথা তোমাকে বলেওছি।

সরি বীণা। তোমার অতীতের কথাটা আমার খেয়াল ছিল না।

বীণা কিছুক্ষণ মুখটা জড়ো করা হাঁটুর মধ্যে গুঁজে রাখল। তারপর মুখ তুলে বলল, তাও নিতাম না, যদি কাকার চাকরিটা থাকত।

সজল কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলল, তোমার রেফারেন্স না দিয়ে যদি নিমাইবাবুকে অ্যাপোচ করি?।

বীণা কঠোর গলায় বলে, কখনই নয়। ওকে ছেড়ে তুমি অন্য কথা ভাবো।

সজল করুণ মুখ করে বলে, আর যে কাউকে রাজি করাতে পারছি না। শুনেছি উনি বেশ দয়ালু লোক।

দয়ালু নয়, দুর্বল লোক। কিন্তু ওকে ভুলে যাও সজল।

তা হলে একটা পরামর্শ দাও। এ ভাবে বসে থাকার মানে হয় না।

আমিও তো বসে আছি।

তোমাকেও বসে থাকতে হবে না। দল করতে পারলে তাতে তো তুমিও থাকবে।

থাকব কি না কে জানে! আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। গলার জন্য একগাছা দড়ি ঠিক জুটবে।

উঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না।

বীণা হঠাৎ বলল, আজ যাও সজল। আমার আজ আর বকবক করতে ভাল লাগছে না। মাথাটা ভীষণ ধরেছে। একটু চোখ বুজে শুয়ে থাকব।

সজল বিদায় নিল। সজল বোকা এবং আহাম্মক। নইলে নিমাইয়ের টাকায় দল খোলার কথা ভাবতে পারত না। কিন্তু নিমাই যে মালদার হয়েছে সেটা জানা ছিল না বীণার। ওর কি এতই টাকা? এমন বুদ্ধিই যদি ওর ছিল তা হলে এতকাল বউয়ের পয়সায় বসে বসে খেল কেন?

বীণা এই ধন্ধটা নিয়ে সারা দিন উপোসী পেটে বসে রইল। শুলো বটে, কিন্তু ঘুম এল না। সারা রাত কাটল এ-পাশ ও-পাশ করে।

খুব ভোরে উঠে সে মুখ হাত ধুয়ে বেরনোর জন্য তৈরি হল। মাথাটা আরও ভার হয়ে ছিঁড়ে পড়ছে। সারা গা জ্বরো রুগীর মতো তপ্ত। ঠাণ্ডা জল ছুঁলে ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে। চোখে জ্বালা-জ্বালা ভাব। এক কাপ চা আর

একটা ব্যথার বড়ি খেয়ে একটু সামাল দিল সে। খালি পেটে ব্যথার বড়ি খেলে অম্বল উথলে ওঠে। কিন্তু কিছু মুখে দিতে ইচ্ছেই হল না তার।

যখন বাস ধরল তখন চারদিকে রোদ ঝলমল করছে। সেই রোদ চোখে লাগছিল খুব।

কাঁচরাপাড়ায় বড় রাস্তার কাছেই নিমাইয়ের দোকান। এই সাতসকালেও সেখানে রাজ্যের ভিড়। দোকানটা বাইরে থেকেই দাঁড়িয়ে একটু দেখল বীণা। চা, ঘুঘনি, পাঁউরুটি, চাপাটি আর জিলিপি খুব বিক্রি হচ্ছে। ভিতরে নিমাইকে দেখা গেল না।

একটা ছোকরা দরজার কাছেই একটা টেবিলে চা দিচ্ছিল। ভিতরে ঢুকে বীণা তাকেই জিজ্ঞেস করল, নিমাইবাবু কোথায় বলতে পারো?

ও বাড়িতে।

ও বাড়ি! সেটা কোথায়?

নতুন দোকানে। সামনে এগিয়ে গেলে বাঁ হাতে পাবেন।

বীণা ইতস্তত করছিল। হঠাৎ ভিতরের কোনও ঘর থেকে নির্মলকে বেরিয়ে এসে ক্যাশ কাউন্টারে বসতে দেখল সে।

বীণা এগিয়ে গিয়ে বলল, তুমি তো নির্মল?

নির্মল দু-এক সেকেন্ড চেয়ে থেকেই টপ করে উঠে দাঁড়িয়ে সেই সরল হাসিটা হেসে বলল, দিদি! কখন এলেন?

এইমাত্র।

বসুন বসুন। চা খান এক কাপ। আর কী খাবেন বলুন?

কিছু নয়। তোমার নিমাইদা কি নতুন দোকান দিলেন?

হ্যাঁ। বড় দোকান। কাছেই তো। যাবেন?

একবার দেখা করব।

চলুন তা হলে, আপনাকে নিয়ে যাই।

তুমি ব্যস্ত হয়ো না। আমি খুঁজে নিতে পারব।

আরিব্বাস, তাই হয়? আপনি এসে পড়েছেন যখন, তখন আমার ওপর সব ছেড়ে দিন। তার আগে একটু কিছু মুখে দিন।

আমার একটুও খাওয়ার ইচ্ছে নেই। মাথা ভীষণ ধরেছে।

অন্তত এককাপ চা! স্পেশাল করে দেবে।

আগে ওর সঙ্গে দেখা করি, তারপর।

তা হলে চলুন।

বাইরে এসে একটা রিক্‌শা নিল নির্মল। বীণা বলল, দূর নাকি? রিক্‌শা নিচ্ছ কেন?

দূর নয়। কাছেই। হেঁটে যাওয়ার দরকার কী?

হেঁটেই যাই চল। হাঁটতে ভালই লাগবে।

তবে তাই চলুন। রিক্শার অবশ্য ভাড়া লাগত না। আমাদেরই রিকশা। নিমাইদা তো অটোরিকশাও কিনছেন।

খুব ফলাও কারবার তো!

লোকে বলে নিমাইদা যা ধরেন তাই সোনা হয়ে যায়। বাজারে এক পয়সা ধার নেই। সবাই মানে।

শুনে বীণার বমি-বমি করছিল। এত পয়সা করল ওই লোকটা? কি করে হয়?

মিনিট কয়েক হাঁটার পর যে দোকানটার সামনে তারা পৌঁছলো সেটা আসলে একটা ধাবা। মস্ত জায়গা নিয়ে ছড়ানো ব্যবস্থা। সামনে মস্ত করুগেটেড শেডের তলায় সারি দিয়ে খাটিয়া পাতা। ভিতরে মস্ত রেস্টুরেন্ট। মেলা টেবিল-চেয়ার। সবটা ঝকঝক তকতক করছে। তন্দুরি রুটি সেঁকার গন্ধ, কষা মাংস হচ্ছে, কোল্ড ড্রিঙ্কস সাজানো, মস্ত ফ্রিজ। বেশ কিছু খদ্দের বসে আছে। উঠোনের এক দিকে বাথরুম-পায়খানা, চৌবাচ্চা ভর্তি জল, মগ, সব আছে। দোকানের সামনের দিকে এক কোণে পান সিগারেটের দোকান রয়েছে।

এইটেই। ভিতরে আসুন দিদি।

এটা কি ধাবা?

হ্যাঁ। রাতে খুব ভিড় হয়। দুপুর থেকে শুরু হয় ভিড়টা।

কবে হল?

মাস দুয়েক।

নিমাইকে পাওয়া গেল না। বাজারে গেছে। সুতরাং বসতে হল বীণাকে। কাউন্টারের গদিআঁটা চেয়ারেই তাকে বসিয়ে নির্মল হাঁকডাক শুরু করে দিল। সবাইকে বুঝিয়ে দিল দোকানের মালকিন এসেছেন।

খাঁটি দুধে লিকার করা চা আর মচমচে টোস্ট চলে এল সঙ্গে সঙ্গে।

খান দিদি। টোস্টে স্পেশাল মাখন লাগানো আছে। আমরাই মাখন বানাই।

বীণা খুব অনিচ্ছের সঙ্গে চাটা মুখে তুলল। শুচিবায়ু করে লাভ নেই। নির্মল হয়ত দুঃখ পাবে।

কিন্তু সুস্বাদু টোস্ট আর চমৎকার চা খাওয়ার পর শরীরটা অনেক ভাল লাগল তার। গতকাল সারা দিন উপোস গেছে। আজ ভীষণ দুর্বল লাগছিল শরীর।

দিদি, আপনাকে খুব টায়ার্ড দেখাচ্ছে। একটু বিশ্রাম করবেন? ভিতরে ভাল ব্যবস্থা আছে।

এই তো বেশ আছি।

নিমাইদার আসতে হয়তো দেরি হবে। আজ একটু মোটা বাজার আছে। ততক্ষণ আপনি একটু গড়িয়ে নিতে পারেন। শরীর ভাল নয় বলছিলেন। আসুন আমার সঙ্গে।

কি জানি কেন বীণা উঠল। ধাবার ভিতরে পিছন দিকে বেশ কয়েকটা ঘর রয়েছে। বেশ সাজান-গোছান।

এ সব ঘর কার জন্য নির্মল?

তিনটে ঘর। দুটো নিমাইদা ব্যবহার করেন। আর একটা আছে কোনও গেস্ট এলে থাকেন। এখনও কেউ থাকেনি এখানে। নতুন চাদর পাতা হয়েছে আপনার জন্য। একটু শুয়ে থাকন।

আশ্চর্যের বিষয়, এই প্রস্তাবটিও বাক্যব্যয় না করে মেনে নিল সে। শরীরটা সত্যিই আর দিচ্ছিল না। বীণা শুয়ে পড়ল। বেশ নরম বিছানা। নির্মল জানালার পর্দা টেনে দিল। তারপর বেরিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে গেল সাবধানে।

বীণা শুয়ে শুয়ে ভাবছিল, সে তো ভাব করতে আসেনি। সে শুধু একটা কথাই বলতে এসেছে। লোভী সজল যদি বীণার বারণ না শুনে যাত্রার দল খোলার প্রস্তাব নিয়ে আসে তা হলে যেন নিমাই রাজি না হয়। সে যতদূর সজলকে চেনে, তাতে তার দৃঢ় বিশ্বাস, সজল তা করবে। ওর চরিত্র বলে কিছু নেই, বুদ্ধিও অবাস্তব। ও আরও একবার নিমাইয়ের কাছে এসেছিল বীণার ওপর অধিকার ছেড়ে দেওয়ার কথা বলতে। সেটা বড় লজ্জার ব্যাপার হয়েছিল বীণার কাছে। নির্বোধ সজল যাত্রার দল খোলার জন্য পাগল হয়ে গেছে। এখন তার পক্ষে সবই সম্ভব।

কিন্তু নিমাইয়ের অবস্থা দেখে বীণাও একটু হকচকিয়ে গেছে। এ কি ময়দানবের কাণ্ড? মাত্র দু-তিন বছরে এত কাণ্ড কি করে নিমাই ঘটিয়ে তুলল? আগে তো এখানেই একটা ফলের দোকান চালাত। তাতে পেটও চলত না ভাল করে।

ভাবছিল, খুব ভাবছিল বীণা। ভাবতে ভাবতে কখন ঘোরের মতো ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল কে জানে! অতল গভীর ঘুমে তলিয়ে যেতে যেতে সে ভাবছিল, কাজটা ঠিক হচ্ছে না।

যখন ঘুম ভাঙল তখন সকাল না বিকেল বুঝতে পারল না সে। জানালার পর্দা টানা, ঘরের দরজা ভেজানো। শুধু একটা জলের পরিচ্ছন্ন জগ আর ঢাকা দেওয়া চকচকে কাচের গেলাস কে রেখে গেছে যেন। আকণ্ঠ তেষ্টা টের পেল বীণা। ঢকঢক করে অনেকটা জল খেল। বাইরে এখনও দিনের আলো আছে।

মাথা ধরাটা ছেড়ে গেছে। শরীর দুর্বল হলেও তেমন জড়তা নেই। সামনে একটা ড্রেসিং টেবিল দেখে বীণা নিজেকে একটু গুছিয়ে নিল। লোকটা কি ফিরেছে?

বীণা উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে দরজায় টোকা দিয়ে বাইরে থেকে নির্মল জিজ্ঞেস করল, দিদি কি উঠেছেন?

হ্যাঁ।

দাদা ফিরেছেন। ডাকব কি?

ডাকো।

ডাকতে বলার পর থেকেই বুকটা হঠাৎ দুরুদুরু করতে থাকে বীণার। কেন করে কে জানে! নিমাইকে সে কোনওকালে পূর্ণাঙ্গ পুরুষ বলে তো মনেও করেনি। তার কি তবে ভয় করছে? নার্ভাস লাগছে? লাগলে সেটা খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার।

দরজায় টোকা দিয়ে নিমাই বলল, আসব নাকি?

জবাব দিতে গিয়ে গলাটা দেবে গেল বীণার। ফেঁসে যাওয়া স্তিমিত গলায় বলল, এস।

দরজা ঠেলে যখন নিমাই ঘরে ঢুকল তখন বীণা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েছিল।

নিমাই বেশ দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে রইল। কিছু বলল না।

খুব আস্তে চোখ ফেরাল বীণা। মানুষটা নিমাই বটে, আবার নয়ও। সেই ছোটখাটো চেহারা, তবে শরীরটা পোড় খেয়েছে। রংটা আরও তামাটে। পরনে একটা ফসা ধুতি আর সাদা শার্ট। হাতে ঘড়ি। কিন্তু এ তো বাইরের খোলস। যেটা অবাক হওয়ার সেটা হল, নিমাইয়ের মুখচোখ। সেই ভীতু, আত্মবিশ্বাসহীন, জুলজুলে চাউনি আর নেই। বদলে ভরপুর, শান্ত, আত্মবিশ্বাসী একজোড়া চোখ!

বীণা বলল, বসবে না? কথা আছে।

নিমাই চেয়ারে বসল। কিন্তু কিছু বলল না। বড় চুপচাপ।

বীণা এই নিমাইকে ঠিক চিনতে পারছে না। কে জানে কেন, তার একটু ভয়-ভয় করছে। সে স্তিমিত ধরা গলায় বলল, একটা জরুরি কথা বলতে এসেছি।

ও। সংক্ষিপ্ত জবাব দিল নিমাই।

সজল বলে একটা ছেলে আছে বনগাঁয়ে। ছেলেটা যাত্রার দল খুলবে বলে পাগল। সে হয়ত তোমার কাছে এসে টাকা চাইবে। ওকে টাকাপয়সা দিও না।

সে ইতিমধ্যে বারকয়েক এসে ঘুরে গেছে।

বীণা সচকিত হয়ে সবিস্ময়ে বলল, এসে গেছে?

কয়েকবার। তোমার নাম করেই বলেছে যে, তুমি নাকি দল খুলতে চাও, টাকার দরকার।

সর্বনাশ! কী মিথ্যুক! তুমি দাওনি তো?

না। অতটা আহাম্মক হলে আমার চলে না। তবে তাকে বলেছি, বীণা যদি নিজে প্রস্তাব দেয় তবে ভেবে দেখব।

আমি কিন্তু ওকে পাঠাইনি। মিথ্যে কথা বলেছে।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে তাই মনে হচ্ছিল।

একটু শঙ্কিত হয়ে বীণা বলল, ও তোমাকে আর কী বলেছে?

নিমাই মাথা নেড়ে বলে, আর কিছু নয়।

আমার সম্পর্কে কিছু বলেনি তো!

নিমাই একটু চুপ করে থেকে বলল, তোমাদের সম্পর্কের কথা বলে।

কী সম্পর্ক?

ভাব-ভালবাসার কথা। তোমরা বিয়ে করবে। ঘর বাঁধবে। এই সব।

বীণার মাথায় বজ্রাঘাত হল। সে শুধু বলল, কী সর্বনাশ!

চারদিকে কত গাছ, তবু চড়াইপাখি সব সময়ে মানুষের ঘরে কেন বাসা বাঁধে বল তো!

বাসন্তী মশলা বাটছিল। বলল, তোমার সব উদ্ভুটে প্রশ্ন বাপু। চড়াইপাখি কোথায় বাসা করে তাই নিয়ে সকালেই কেন ভাবতে বসলে বলো তো!

তুই কখনও লক্ষ করিস না যে অন্য পাখিরা গাছে বাসা বাঁধে কিন্তু চড়াই নয়?

কে জানে বাপু চড়াইয়ের বৃত্তান্ত। ঘরের মধ্যে বাসা করেছে নাকি? তা হলে ভেঙে দাও। ওরা ঘরদোর বড্ড নোংরা করে।

ভেঙে দেবো কি রে? ওরা আমার বন্ধু যে।

এখন কাক বক চড়াই শালিখ তোমার বন্ধু হচ্ছে নাকি? তুমি না পারো আমিই চড়াইয়ের বাসা ভেঙে দিয়ে যাবো।

খবরদার না, বাসায় যদি ডিম থাকে?

বাসন্তী অবাক হয়ে বলে, থাকলে কী হল? হাঁস-মুরগির ডিম ভেঙে দুনিয়াসুদ্ধ লোক খাচ্ছে না?

তোর মায়া-দয়া একটু কম আছে বাসন্তী। এত নিষ্ঠুর কেন তুই?

বাসন্তী ফিক করে হেসে বলল, রাগ করলে নাকি? তোমার যে সব অদ্ভুত কাণ্ড! অত মায়া করছ, কিন্তু দুনিয়াতে মানুষের খাওয়ার জন্যও তো ভগবান কিছু জীবকে পাঠিয়েছেন। জলের মাছ, ডাঙার পাঁঠা, খাসী, মুরগি এদের সৃষ্টিই তো খাওয়ার জন্য।

ভগবানের সঙ্গে তোর এসব নিয়ে কথা হয় নাকি?

আহা, সংসারের যা নিয়ম তাই বলছি।

সংসারের যে কি নিয়ম তা কেউ জানে না। যার যেমন প্রবৃত্তি সে সেরকম নিয়ম করে নেয়। বুঝেছিস?

বুঝেছি গো বুঝেছি। এখন তেনারা কখন আসবেন বলো। সকাল তত আটটা বাজে।

অস্থির হচ্ছিস কেন? আসবে। কলকাতা কি আর এক দৌড়ের রাস্তা? ধামাখালি পৌঁছতেই কত সময় লাগে। তারপর ভটভটি।

আমার খুব আনন্দ হচ্ছে কিন্তু।

তোর তো সব তাতেই আনন্দ।

গাঁয়ে বড় একঘেয়ে জীবন, জানো তো! নতুন মানুষজন দেখলে একটু ভাল লাগে। সেই মেয়েটা আসবে তো!

হেমাঙ্গ সামান্য হেসে বলল, খুব পেকেছিস।

আহা, তাকে আমার প্রথম দেখেই ভীষণ ভাল লেগেছিল যে।

তোর কাকে ভাল না লাগে? সাজগোজ করা শহুরে মেয়ে দেখলেই তো তুই হাঁ হয়ে যাস। তখন তোর চোখের পলক পড়ে না।

কী বলে গো মিথ্যে কথা! বলে বাসন্তী হি হি করে হাসল।

রাস্তার দিক থেকে বাঁকা মিঞাকে আসতে দেখা গেল। পিছনে দুটো লোকের মাথায় একটা চৌকি। তারও পিছনে ফজল। তার মাথায় শতরঞ্চিতে বাঁধা একটা বিছানা।

একমুখ হাসি নিয়ে বাঁকা আগর ঠেলে ঢুকল, সব নিয়ে এলাম।

হেমাঙ্গ বলল, বেশ করেছ।

আপনি একটু ঘাটপানে যান। ততক্ষণে ফজল ঘরটা গুছিয়ে দিক।

এখনই ঘাটে গিয়ে কী হবে? তাদের আসতে দেরি আছে।

কিছু বলা যায় না। হয়তো খুব ভোর-ভোর রওনা হয়ে পড়েছেন।

হেমাঙ্গ একটু হাসল। এ যাবৎ নিশিপুরে কম লোক আসেনি তার বাড়িতে। কিন্তু আজ যারা আসছে তাদের জন্য বাঁকা মিঞা আর বাসন্তী একটু যেন বেশিই তটস্থ। কারণটা কিছু ধরতে পারছে না হেমাঙ্গ। কোথাকার জল কোথায় গড়াচ্ছে কে জানে।

হেমাঙ্গ উঠে পড়ল এবং পায়ে পায়ে ঘাটের দিকেই এগোতে লাগল। ভারি বৃষ্টির পর শরৎকালটা ফুটে উঠছে সবে। এ সময়ে চারদিকে প্রকৃতির ঐশ্বর্য যেন থরে-বিথরে ফুটে ওঠে। এত সুন্দর ঋতু আর হয় না। তার উঠোনে শিউলিফুল ছড়িয়ে থাকে অজস্র। গন্ধে যেন বাতাস শুদ্ধ হয়ে যায়।

নদীর ধারটায় এসে দাঁড়াতেই মুগ্ধ সম্মোহিত হয়ে গেল হেমাঙ্গ। জল আকাশ আর আদিগন্তের প্রসার যেন তাকে টেনে নেয় বুকের মধ্যে।

আশ্চর্যের বিষয়, ঘাটে এসে দাঁড়ানোর দশ মিনিটের মধ্যেই যে ভটভটিটা এসে ভিড়ল সেইটে থেকেই নামল মণীশ, অপর্ণা, অনু আর—না, আর কেউ নয়।

মৃত পায়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল হেমাঙ্গ। মৃত ঠোঁটে হাসল। মৃত গলায় বলল, আসুন, আসুন! কোনও কষ্ট হয়নি তো!

ঘাটে চাঙড় ফেলা। পাথরের চ্যাটালো চাতালটুকু সাবধানে ডিঙিয়ে, মাটি আর ইঁটের পিছল ধাপ ভেঙে ভারসাম্য রাখতে রাখতে উঠে আসছিল অপর্ণা। হেসে বলল, কষ্ট নয় তো কি? বাব্বাঃ, যা দূর!

অপর্ণার তুলনায় অনেক বেশি সপ্রতিভভাবে উঠে এল মণীশ আর অনু। ঘাটে দাঁড়িয়ে চারদিকে চেয়ে মণীশ বলল, বাঃ, এ তো দারুণ সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ!

হেমাঙ্গ বলল, ক্যামেরা এনেছেন?

না।

অনু বলল, আমি এনেছি।

একজন আসেনি। সেই না-আসাটা নিয়ে কোনও প্রশ্ন করতে পারল না হেমাঙ্গ। অথচ প্রশ্ন করাটাই তো স্বাভাবিক ছিল। চারজনের একজন কেন এল না? সেই অনুপস্থিতি যে এই তিনজনের আসার চেয়েও অনেক বেশি গুরুতর সেটা হেমাঙ্গ টের পেল নিজের ভিতরে। তার চোখে এই শরতের সুন্দর সকাল, এই মায়াবী আলো, আদিগন্ত অফুরান বিস্তার সব যেন কেমন মিথ্যে-মিথ্যে লাগছে। সুর কেটে গেল, তালে ভুল।

অতিথিদের ঘরে নিয়ে এল হেমাঙ্গ, এই আমার জঙ্গলবাড়ি। দেখুন কেমন লাগে!

সৌজন্যের বশেই হবে, অপর্ণা উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, বাঃ, কী সুন্দর বাড়ি আপনার! লাউডগা বুঝি চালের ওপর?

অনেক কিছু আছে। দেখবেন।

মণীশ চারদিকটা দেখে-টেখে বলল, আপনি এখানে প্রায়ই থাকেন, না?

হ্যাঁ। আর তাই নিয়েই আমার আত্মীয়স্বজনের অশান্তি।

কেন? তাঁরা আপত্তি করেন নাকি?

খুবই করেন। বিশেষ করে মা। মায়ের ধারণা আমি সাধুসন্ত হয়ে যাচ্ছি।

মণীশ একটু হাসল, আজকাল অনেকেই কলকাতার বাইরে পলিউশন-ফ্রি এলাকায় বাড়ি-টাড়ি করে রাখে। ফুসফুস পরিষ্কার করার এর চেয়ে ভাল পন্থা আর কী আছে? শান্তিনিকেতনে ভিড় বাড়ছে তো এই জন্যই। কত টাউনশিপ হচ্ছে সেখানে।

বাঁকা মিঞা আর ফজল চলে গেছে। তারা ফের দুপুরে মুরগি বেঁধে দিয়ে যাবে। বাসন্তী ঘরের শেষ ঝাড়পোছ সাঙ্গ করে বেরিয়ে এল। একমুখ হাসি।

হেমাঙ্গ বলল, এ হল বাসন্তী। এখানে ওই আমার সব দেখাশোনা করে।

বাসন্তী টিপ-টিপ করে সবাইকে প্রণাম করে চায়ের জল চড়িয়ে দিল স্টোভে।

অনু বলল, আমি চা খাবো না। একটু ঘুরে আসি মা।

হেমাঙ্গ বলল, আরে দাঁড়াও। আমার সঙ্গে যাবে।

আচ্ছা।

ব্যাগ থেকে একটা ক্যামেরা বের করে অনু টুক করে বাড়িটার একটা ছবি তুলে নিল। অনু একটা খুব নরম ভুষো নীলচে রঙের চুড়িদার পরে এসেছে। ফর্সা ও লম্বা মেয়েটিকে দেখাচ্ছে ভারি সুন্দর। দুই বোনের মুখশ্রীর তেমন মিল নেই। কিন্তু অনুর চটক বেশি। সহজেই নজরে পড়ে।

বাসন্তী বারান্দায় চেয়ার সাজিয়ে রেখেছিল। মণীশ আর অপর্ণা বসল; অপর্ণা বলল, ঝুমকিটা এল না। আজ ও চারুশীলার সঙ্গে কোথায় যেন যাবে। চারুর তো রোজ একটা না একটা কিছু আছেই।

হেমাঙ্গ হেসে বলল, জানি।

ঝুমকিকে ভীষণ ভালবাসে তো! ঝুমকি বলল, আমি তো নিশিপুর ঘুরে এসেছি মা, তোমরা যাও।

এসব কথা শুনছে হেমাঙ্গ, বুঝছে অন্যরকম। কেন আসেনি সেটা এরা কেউ জানে না। জানবেও না কোনও দিন। হেমাঙ্গ জানে। গভীরভাবে জানে।

চা খাবার ইত্যাদির পর্বটা কোনও রকমে পার হল হেমাঙ্গ। তারপর ভদ্রতা করে বলল, আপনারা কি একটু বেড়াতে যাবেন?

অপর্ণা বলল, আমার কিন্তু টায়ার্ড লাগছে।

মণীশ বলল, আমারও। একটু জিরিয়ে নিই, তারপর দেখা যাবে। বেরোনোর খুব একটা দরকার আছে কি? উঠোন থেকেই তো নদীটা দেখা যায়। ওইটেই যথেষ্ট। সামনে একটা নদী থাকলে আর কী চাই?

অনুকে নিয়ে হেমাঙ্গ বেরোলো।

রাস্তায় পা দিয়ে অনু বলল, আপনি খুব ডিজহার্টেনড, না?

কেন বলো তো!

অনু হি হি করে হেসে বলে, দিদি আসেনি বলে!

হেমাঙ্গ গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে বলে, তা কেন? অনেকের অনেক জরুরি কাজ থাকতে পারে।

আচ্ছা, আপনি এরকম পিকিউলিয়ার কেন বলুন তো!

কি রকম?

দিদিকে কি আপনি একদিন ফোনে বলেছিলেন যে ওকে আপনি অ্যাভয়েড করতে চান?

তোমাকে কে বলল?

শুনুন, দু'জন বোন যখন কাছাকাছি হয় তখন কেউ কারও কাছে কথা লুকোতে পারে না। উই শেয়ার আওয়ার সিক্রেটস। বলুন না, বলেছিলেন!

হেমাঙ্গ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আনফরচুনেটলি, ইয়েস।

দেন হোয়াই ডু ইউ ল্যামেন্ট?

ল্যামেন্ট! কই ল্যামেন্টের কী দেখলে?

ইউ আর ক্রেস্টফলেন, ইউ আর কিপিং মাম, ইউ লুক স্যাড। ইউ আর ল্যামেন্টিং সাইলেন্টলি।

তুমি একটি বিচ্ছু মেয়ে।

হি হি করে হাসল অনু। তারপর ফের গম্ভীর হয়ে বলল, আমার দিদিটা বড্ড সেকেলে। একদম ব্যাকডেটেড। এখনকার দিনে কেউ অত রোমান্টিক আর লাজুক আছে নাকি?

এক-আধজন থাকলে দোষ কি?

রোমান্টিক, লাজুক, পেটে খিদে মুখে লাজ এসব কি আজকাল চলে? আমার যদি কাউকে ভাল লাগে আমি স্ট্রেট বলে দেবো, ডিয়ার ম্যান, আই লাইক ইউ।

হেমাঙ্গ একটু হাসল।

অনু তার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে একটু চেয়ে বলল, আপনিও ওল্ড ফ্যাশনড আর রোমান্টিক, তাই না?

কেন? আমি আবার কী করলাম?

দিদিকে আপনি এত ভয় পান কেন? মধ্যযুগীয় নায়কদের মতো বুক-টুক কাঁপে নাকি?

হেমাঙ্গ মৃদু একটু হাসল। বলল, তোমার দিদির সঙ্গে আমার এখনও কোনও সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। আই অ্যাম স্টিল এ ভেরি মাচ লোনার।

মিথ্যুক।

কেন, মিথ্যেটা কী বললাম?

তা হলে বোকা।

গালমন্দ করছ কেন?

ইউ কান্ট কল এ স্পেড এ স্পেড।

আমাকে নিয়ে কেন যে এত ভুল বোঝাবুঝি হয় কে জানে!

অনু ভ্রূ কুঁচকে বলল, ভুল বোঝাবুঝি! মাই গড! আর ইউ ট্রায়িং টু সে দ্যাট ইউ আর নট ইন লাভ উইথ দ্যাট রেচেড সিস্টার অফ মাইন ঝুমকি?

হেমাঙ্গ মুচকি হেসে বলল, তোমার ডান দিকে দেখ। এখান থেকে রাতে নদীর ওপর জ্যোৎস্না দেখলে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

ওপেন আপ ম্যান! আরন্ট ইউ ইন লাভ?

হেমাঙ্গ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, শোনো অনু, আমি নিজেকে ঠিক বুঝতে পারি না। শী ইজ এ গুড গার্ল। বাট...

রাবিশ। ভীষণ বোকা আপনি।

হেমাঙ্গ কাষ্ঠহাসি হেসে বলল, বোধ হয় কথাটা ঠিক।

তবু স্বীকার করবেন না? আচ্ছা গোঁয়ার লোক বাবা!

স্বীকার করার কিছু নেই। ঝুমকি তোমাকে কী বলেছে?

বলব কেন? আফটার হোয়াট আই হ্যাভ হার্ড ফ্রম ইউ, আমি দিদিকে সাবধান করে দেবো। শী মে বি হ্যাচিং অ্যান আইডিয়া অফ লাভ অ্যাণ্ড ম্যারেজ। শী ইজ কমিটিং এ ব্লান্ডার।

বলবে এ কথা?

বলাই উচিত।

হেমাঙ্গ চুপ করে রইল। বাঁধের ওপর দিয়ে ধীর পায়ে তারা হাঁটছে। দুজনেই নিঃশব্দ, দুজনেই কিছু গম্ভীর। চারদিকের প্রকৃতি মিথ্যেই নানা সৌন্দর্য প্রদর্শন করার চেষ্টা করছে তাদের। তারা দেখছে না কিছু।

অনু থমথমে মুখে হঠাৎ বলল, চলুন, ফিরি। আমার আর ভাল লাগছে না।

বলেই অ্যাবাউট টার্ন হল অনু। উল্টোদিকে হাঁটতে লাগল। হেমাঙ্গ অপ্রস্তুত বোধ করল। মেয়েটা বড্ড জ্বালাচ্ছে তো!

অনু, শোনো। রেগে যাচ্ছ কেন?

অনু মুখ ফিরিয়ে বলল, রাগব কেন?

শোনো শোনো। কথা আছে।

অনু হাঁটার গতি কমিয়ে দিল, কিন্তু মুখের গাম্ভীর্য বজায় রেখেই বলল, বলুন।

তোমাকে আমি বোঝাতে পারছি না হয়তো।

কী বোঝাবেন?

ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আমার মন এখনও স্থির নয়।

ইউ হ্যাভ অলরেডি টোল্ড দ্যাট।

কখন বললাম?

নট ইন সো মেনি ওয়ার্ডস, বাট ইউ হ্যাভ হিন্টেড ইট।

তা হলে রেগে যাচ্ছ কেন?

আপনার ওপর রাগব কেন? আমি রেগে যাচ্ছি দিদিটার ওপর। ও কেন এত রোমান্টিক আর বোকা? ও কেন যা নয় তাই মনে করে বসে আছে?

ঝুমকি তোমাকে কী বলেছে অনু?

বারবার জিজ্ঞেস করবেন না, প্লিজ! আমাদের মধ্যে অনেক কথা হয়। সব কথা সবাইকে বলা যায় না।

হেমাঙ্গ যেন একটা থাপ্পড় খেয়ে চুপ করে গেল। অনুর পাশাপাশি বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে তার ভিতরে ভিতরে একটা যন্ত্রণা আর গ্লানি হচ্ছিল। কী করবে সে? কী করবে এখন?

তাদের দেখেই অপর্ণা বলে উঠল, এ কী! অনু, ফিরে এলি যে!

ভাল লাগছে না মা। বিচ্ছিরি জায়গা। চলো, কলকাতায় ফিরে যাই।

ও মা! এই তো এলাম! আজকের দিনটা থাকব না?

তোমরা থাকো, আমি একা ফিরে যাবো।

হঠাৎ তোর হল কি?

হেমাঙ্গ ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছিল। মেয়েটা পরিস্থিতি খারাপ করে দিচ্ছে।

অনু বলল, আমার কিছু হয়নি মা। জায়গাটা ভীষণ গ্লুমি, ভীষণ নোংরা। আমি থাকব না।

মণীশ চুপ করে মেয়ের দিকে চেয়ে বসেছিল। এবার বলল, তোর মেজাজ বিগড়েছে বুঝতে পারছি। আমার কাছে আয়।

না বাবা। আমার কিছু ভাল লাগছে না। লীভ মি অ্যালোন। বলে অনু নদীর দিকটায় চলে গেল। আড়ালে।

অপর্ণা হেমাঙ্গর দিকে চেয়ে বলল, আপনি কিছু মনে করবেন না যেন। ও একটু মুডি। হয়তো কিছুক্ষণ পর সব ঠিক হয়ে যাবে।

হেমাঙ্গ একটু কাষ্ঠহাসি হেসে বলল, ও কিছু নয়।

মেয়ের যা মুড দেখছি আজ হয়তো ফিরে যেতে হবে।

তা কেন? আমি একটু বাদে মাথা ঠাণ্ডা হলে ওকে বোঝাবো। আপনাদের জন্য সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে। আজ কেন ফিরবেন?

মণীশ বলল, আগেকার দিনে ছেলেমেয়েরা বাপ-মায়ের কথা শুনে চলত বা তাদের চলতে বাধ্য করা যেত। এখন বাপ-মাকেই ছেলেমেয়েরা চালায়। বুঝলেন? উই আর নাউ ইন এ হোপলেস টাইম। পেরেন্টহুড বলে কিছু আর নেই। আপনি যদি কখনও বিয়ে করেন তা হলে প্রথম থেকেই সাবধান হবেন।

অনুকে ঘণ্টাখানেক বাদে ঘরের পিছনকার বাগানে গিয়ে একা পেয়ে গেল হেমাঙ্গ।

অনু, আই অ্যাম সরি।

অনু ঘাসের ওপর হাঁটু মুড়ে চুপ করে বসেছিল। মুখখানা গম্ভীর, চোখ দূরের দিকে। জবাব দিল না।

হেমাঙ্গর সাহস হচ্ছিল না ওর পাশে গিয়ে বসতে। একটু পিছনে দূরত্ব রেখে বসে সে নরম গলায় বলল, ওঁরা তোমার ভয়ে আজই ফিরে যেতে চাইছেন। কেন যে আমাকে তুমি এত অপমান করছ!

অনু মুখ না ফিরিয়ে বলল, আমার দিদি খুব বোকা। তাই তাকে অপমান করাও খুব সোজা।

ঝুমকিকে আমি একটুও অপমান করিনি। তুমি জানো না বোকা মেয়ে, ঝুমকি আমাকে কিরকম হিপনোটাইজ করে ফেলেছে। কিন্তু আমি তো বিয়ে করব না কখনও। সেই জন্য আমি ওর কাছ থেকে দূরে থাকতে চাই।

সেই কথাটা আমার দিদিরও জানা দরকার। দিদি হয়তো এতটা জানে না। আমি আজই গিয়ে দিদিকে বলব শী ইজ ইন পারসুট অফ এ ওয়াইল্ড গুজ।

হেমাঙ্গ হঠাৎ সামান্য রেগে গেল। চাপা গলায় বলল, তুমি কেন আমাদের মধ্যে আসছ বলো তো! আমাদের ব্যাপারটা আমাদেরই সেটল করতে দাও না কেন?

আমি আমার দিদিকে ভীষণ ভালবাসি। শী ইজ এ ভেরি সিম্পল টাইপ গার্ল। ও হয়তো আপনার ফিলজফিটা বুঝতেই পারেনি। আই মাস্ট কশান হার।

হেমাঙ্গ আর কথা খুঁজে পেল না। চুপ করে রইল।

দুপুরে খাওয়ার পর একটু বেলা থাকতে থাকতেই ফিরে গেল ওরা। মণীশ যাওয়ার সময় গম্ভীর মুখে বিষন্ন গলায় বলল, ডোন্ট মাইন্ড। এর পর যদি কখনও আসি একা আসব। তখন থাকব। ইউ আর এ নাইস ম্যান।

ওরা চলে যাওয়ার পর এত ফাঁকা লাগল হেমাঙ্গর যে সে সহ্য করতে পারছিল না। বড্ড একা, বড্ড অসহায়। একটা তিক্ততায় ভরে আছে মনটা।

রাতটা কাটিয়ে পরদিন সকালেই সে ফিরল কলকাতায়। ধামাখালিতে রাখা থাকে তার গাড়ি। ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালিয়ে সে দুপুরের আগেই পৌঁছে গেল চারুশীলার বাড়ি।

চারুদি, প্রবলেম।

কি হয়েছে তোর? এরকম দেখাচ্ছে কেন?

আমি একটা সমস্যায় পড়েছি।

বোস। তোর তো সব সময়ে সমস্যা। কী হয়েছে ধীরে ধীরে বল।

হেমাঙ্গ বসল। ভাবল। তারপর বলল, মণীশবাবুর মেয়ে অনুকে তো চিনিস! মেয়েটা কেমন?

খুব ভাল মেয়ে। লেখাপড়ায় খুব ভাল। কেন?

মেয়েটা একটু পাজি, না?

না তো। কি সব বলছিস!

মেয়েটা নিশিপুরে গিয়ে এমন একটা সিন ক্রিয়েট করল যে, মণীশবাবু সস্ত্রীক চলে এলেন।

দু'দিন থাকার কথা ছিল। থাকলেন না।

তাই বুঝি? দাঁড়া তো, আমি ঝুমকির সঙ্গে ফোনে একটু কথা বলি।

না। এখন থাক।

থাকবে কেন? অসভ্যতা কেন করেছে জানা দরকার।

তুই তো এখনও সবটা জানিস না, কী বলবি ঝুমকিকে?

কিছু বলব না, ডেকে পাঠাবো। ও এলে শুনবো।

তোকে কিছু বলতে হবে না। ঝুমকিকে বলিস আমাকে যেন সুবিধেমতো একটা ফোন করে।

আমি বাড়িতে থাকব।

কিন্তু কি হয়েছে বলবি তো!

আজ নয়। আজ আমি টায়ার্ড। কাল-পরশু এসে বলব।

বাড়ি ফিরে হেমাঙ্গ কিছুক্ষণ ঘুমোলো। রাতে তার একদম ঘুম হয়নি কাল। মাথা গরম, অপমানে গা রি-রি করেছে।

ফোনটা এল রাত সাড়ে দশটায়। হেমাঙ্গ তখন বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিল।

আমি ঝুমকি বলছি। আপনি ফোন করতে বলেছিলেন?

হ্যাঁ।

বলুন।

অনু আপনাকে কিছু বলেছে?

অনু! না তো!

কাল নিশিপুরে গিয়েছিল। রাগ করে ফিরে এসেছে। কিছুই বলেনি?

না। তবে মা বলছিল ওর নাকি মুড অফ হয়ে গিয়েছিল।

হেমাঙ্গ একটু চুপ করে থেকে বলল, ঘটনাটা আপনাকে আর আমাকে নিয়ে।

আমাদের নিয়ে! কী ঘটনা একটু বলবেন?

শী থিংকস্ দ্যাট উই আর ইন লাভ।

ঝুমকি কোনও জবাব দিল না।

শুনছেন?

ঝুমকি ক্ষীণ গলায় বলল, শুনছি।

আপনি তো জানেন, আমি একটু একা টাইপের লোক। একা থাকতে ভালবাসি। জলে-জঙ্গলে ঘুরি। খেয়ালি। জানেন তো!

জানি।

আমাকে মাঝে মাঝে ভূতে পায়। আমি যে কী করি তা বুঝতে পারছি না। অনু কাল আমাকে খুব অপমান করেছে। হয়তো করাই উচিত।

আমি অনুর হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ওকে যা বলার আমি বলব।

প্লিজ, বলবেন না। অনুর নামে নালিশ করার জন্য ফোন করতে বলিনি। আর একটু গভীর কথা আছে।

কী কথা?

গলা শুনে মনে হচ্ছে আপনারও মুড আজ ভাল নেই। কথাটা বলার জন্য একটু ভাল মুড দরকার।

ঝুমকি একটু হাসল। বলল, মুড ভালই আছে। বলুন।

বলব? না কি আর একটু সময় নেবো?

আপনার ইচ্ছে।

আমি আপনাকেই জিজ্ঞেস করতে চাই। কারণ আমার চেয়ে আপনিই হয়তো ভাল বুঝবেন।

কি জিজ্ঞেস করতে চান?

অ্যাম আই ইন লাভ উইথ ইউ?

ঝুমকি খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর প্রায় ফিসফিস করে বলল, তার আমি কী জানি!

হেমাঙ্গ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমিও জানি না।

ঝুমকি চুপ করে রইল।

হেমাঙ্গ সামান্য বিষন্ন গলায় বলল, এই কথাটাই অনুকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। ও ভুল বুঝল।

আপনি বারবার অনুর কথা বলছেন কেন? ও ছেলেমানুষ, ওর কথা ধরবেন না।

হেমাঙ্গ স্বগতোক্তির মতো করে বলল, আমি যে কী ভীষণ সমস্যায় আছি তা বোঝাতে পারব না।

কিসের সমস্যা?

আগে বলুন আপনি নিশিপুরে গেলেন না কেন?

ঝুমকি একটু চুপ। তারপর খুব নিচুগলায় বলল, আপনি আমাকে অ্যাভয়েড করতে চান বলে যাইনি।

জানি। কিন্তু অ্যাভয়েড করতে চাইলেও পারছি না কেন? আপনি যাননি বলে আমার খুব খারাপ লেগেছিল। দিনটাই মাটি হয়ে গেল যেন।

ঝুমকি চুপ।

আমি আপনাকে নিয়েই প্রবলেমে পড়েছি। রশ্মিকে নিয়ে আমার এই প্রবলেম ছিল না। আই নেভার মিস্‌ড্‌ হার। কিন্তু আপনাকে মিস করি কেন?

ঝুমকি চুপ।

কিছু বলুন, প্লিজ!

ঝুমকি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কী বলব?

তা হলে অন্য দিক দিয়ে বলুন, আমার সম্পর্কে আপনার মনোভাব কিরকম?

ঝুমকি চুপ।

বলবেন না?

ঝুমকি খুব ক্ষীণগলায় বলে, বলে কী লাভ?

আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।

আপনি ভাল থাকুন। ছাড়ছি।

না, প্লিজ!

ঝুমকি ফোন ছাড়ল না। ধরে রইল। ফোন ধরে রইল হেমাঙ্গও। কেউ আর কোনও কথা বলতে পারছিল না। কিন্তু টের পাচ্ছিল দুজনেই ফোন ধরে আছে।

পাঁচ মিনিট পর হেমাঙ্গ বলল, আমার কথা আসছে না।

ঝুমকি মৃদুতম স্বরে বলল, আমি কী করব?

আপনি আমাকে একটু গাইড করতে পারেন তো, নাকি?

ঝুমকি চুপ।

হেমাঙ্গ একটু ধৈর্য হারিয়ে বলল, আপনি কিচ্ছু পারেন না।

কী পারতে হবে তাই তো বলেননি।

আচ্ছা, কাল একবার দেখা হতে পারে?

কোথায়?

কোথাও।

পারে! কিন্তু কোথায় দেখা হবে না জানলে যাবো কি করে?

আপনি বিকেল তিনটের সময়ে আপনাদের বাড়ির কাছে ন' নম্বর বাস টার্মিনাসে থাকতে পারবেন?

পারব।

কিছু মনে করলেন না তো!

মনে করার মতো কিছু তো নয়।

আপনি কি সাদা রং পছন্দ করেন?

সাদা?

হ্যাঁ। সাদা খোলের শাড়ি?

ঝুমকি একটু হাসল, কেন?

এমনি।

আপনি পছন্দ করেন?

হ্যাঁ। সাদা রঙে মেয়েদের এত মানায়!

তাই বুঝি?

কিছু মনে করলেন না তো!

না।

বিরক্ত করলাম। ছাড়ছি।

ঝুমকি ক্ষীণ গলায় বলল, আচ্ছা।

ফোনটা রেখে দেওয়ার পর কৃতকর্মের অনুশোচনায় তার মন ভরে গেল। এ কী করল সে! ঝুমকিকে কাল সে কেন ডাকল? কী বলবে? অস্থির হেমাঙ্গ কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যেই পায়চারি করল। তারপর ধীর পায়ে উঠে এল ছাদে। চাঁদ নেই। এক ঝুড়ি তারা কলকাতার ম্লান আকাশে ছড়িয়ে রয়েছে বিশৃঙ্খলভাবে।

১০৯

সকালেই হেমাঙ্গ হাজির হল বিডন স্ট্রিটের বাড়িতে।

মা!

ছেলের দিকে তাকিয়ে মা একটু অবাক হয়ে বলে, এ কি, আজ অফিসে যাসনি?

না। আজ তোমার হাতের রান্না খেতে এলাম।

ও আবার কোন দিশি কথা! আমি আজকাল রাঁধি নাকি! রাঁধে তো ঠাকুর। কী খেতে চাস?

হেমাঙ্গ বুঝতে পারল না, কেন সে বিডন স্ট্রিটে এল। মায়ের হাতের রান্না? একেবারেই নয়। তার আজ খাওয়ার কোনও ইচ্ছেই হচ্ছে না। তবু কিছুক্ষণ মায়ের সঙ্গে আবোল-তাবোল কথা বলল সে। আবোল-তাবোলই। কারণ বেশির ভাগ সময়েই সে বুঝতে পারল না সে কী বলছে। দুপুরে খাওয়ার পরই সে বেরিয়ে পড়ল গাড়ি নিয়ে। আজ গাড়ি চালানো তার উচিত হচ্ছে না। সে সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে চালাচ্ছে। কিছু দেখছে না, কিছু শুনতে পাচ্ছে না। গাড়ি চালিয়ে নিচ্ছে তার রিফ্লেক্স।

গোলপার্কের কাছাকাছি যখন সে পৌঁছলো তখন দুটোও বাজেনি। সাদার্ন অ্যাভেনিউ ধরে অনেকটা গিয়ে সে ফিরে এল। আবার গেল। কিছুক্ষণ লেকের ভিতর দিয়ে চালাল। তারপর ঘুরে এল গোলপার্কের কাছে। মাত্র আড়াইটে। সময় এত ধীরে যায়? গাড়ি নিয়ে ফের ঘুরপাক খেল সে। অনেকক্ষণ। তবু তিনটের ঘরে কিছুতে পৌঁছচ্ছে না ঘড়ির কাঁটা। তাজ্জব ব্যাপার!

ন' নম্বর বাস টার্মিনাসের কাছেই গাড়ি পার্ক করে বসে থাকে সে। ঝুমকি কোন রাস্তা দিয়ে আসবে তা সে জানে। পূর্ণ দাস রোডের দিকে পলকহীন চোখে চেয়ে থাকল সে।

ঘড়ির কাঁটা তিনটে পেরিয়ে গেল।

কেউই এল না। গাড়ি থেকে নেমে অনেকবার গোটা বাস টার্মিনাস চষে ফেলল সে।

সাড়ে তিনটে নাগাদ সে ফোন করল ঝুমকির বাড়িতে। কেউ ফোন ধরল না।

চারটের পর সে চারুশীলার বাড়িতে ঢুকল। কেমন মাতালের মতো লাগছে নিজেকে। এটা প্রত্যাখ্যান কি না তা সে বুঝতে পারছে না। তার অপমানিত বোধ করা উচিত কি না তাও না।

চারুশীলা বাড়িতে নেই। বাড়ির প্রকাণ্ড লিভিংরুমে একটা গভীর সোফায় ডুবে থেকে চোখ বুজে ঘটনাগুলিকে পরম্পরায় সাজাতে ব্যর্থ চেষ্টা করল কিছুক্ষণ। হল না। চোখ বুজে এল ক্লান্তিতে। কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়ল টেরও পেল না।

চারুশীলাই ডেকে তুলল তাকে, কি রে? শরীর খারাপ নাকি?

হাসবার একটা চেষ্টা করে হেমাঙ্গ বলল, কোথায় গিয়েছিলি? বসে আছি কতক্ষণ!

গিয়েছিলাম নার্সিংহোমে। এখনই আবার যেতে হবে।

কেন? কার অসুখ?

মণীশবাবুর। হার্ট অ্যাটাক।

মণীশবাবুর! বলে হাঁ করে থাকে হেমাঙ্গ।

তোর ওখান থেকে ফিরেই নাকি বুকে ব্যথার কথা বলছিলেন, আজ সকালে নার্সিংহোমে রিমুভ করতে বলে ডাক্তার। ঝুমকি ফোন করেছিল, গাড়ি নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে এলাম।

হেমাঙ্গ বলল, ওঃ।

আমি তো লাঞ্চ করতেই পারিনি। ভীষণ খিদে পাওয়ায় বাড়িতে এসেছি। এখনই যাবো। তুই যাবি?

হেমাঙ্গ উঠে পড়ল। বলল, যাবো।

মুখে চোখে জল-টল দে, ততক্ষণে আমি লাইট কিছু খেয়ে নিই।

একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে হেমাঙ্গ। ঠিক বুঝতে পারছে না, এ সব অদ্ভুত ঘটনা অদ্ভুত সময়ে ঘটছে কেন। এ সব ঘটনা কি কোনও ইঙ্গিত?

বিশাল নার্সিংহোমের রিসেপশনে শুকনো মুখে তিনজন বসে আছে। অপর্ণা, ঝুমকি আর অনু। হেমাঙ্গর বুকে চলকে উঠল কয়েক কোষ বাড়তি রক্ত। ঝুমকির পরনে কালো টেম্পল পাড়ের সাদা খোলের শাড়ি।

তাদের দেখে তিনজনই উঠে দাঁড়াল। অপর্ণা একটু এগিয়ে এসে হেমাঙ্গর দিকে চেয়ে বলল, দেখুন তো কী কাণ্ড!

কিভাবে হল?

পরশু তো আমরা ফিরে এলাম। সন্ধে থেকেই বলছিল, বুকে একটা পেইন হচ্ছে। খুব অ্যাকিউট নয়। কাল ছুটি ছিল, সারাদিন রেস্ট নিল। আজ সকালে অসহ্য ব্যথা।

ডাক্তার কী বলছে?

আমাদের ভেঙে কিছু বলছে না। মুখটা গম্ভীর।

ডাক্তারটি কে?

কে একজন ভট্টাচার্য। বড্ড কম বয়স। কেমন যেন ভরসা হয় না, অত বাচ্চা ডাক্তার কি পারবে? তবে অনেক নাকি ডিগ্রি।

আগে কে দেখত?

সে আর একজন। এখন বিদেশে আছেন।

ওঃ। বলে চুপ করে রইল হেমাঙ্গ। ঝুমকি তার দিকে তাকাচ্ছে না। একটু তফাতে অনু আর চারুদির সঙ্গে কথা বলছে। বলুক। হেমাঙ্গর বুকটা তৃপ্তিতে ভরা। ঝুমকি আজ সাদা খোলের শাড়ি পরেছে।

হেমাঙ্গ আলগাভাবে প্রশ্ন করল, ইনটেনসিভ কেয়ারে নিয়ে গেছে নাকি?

অপর্ণা বলল, আমরা তা জানি না। আমাদের তো ভেতরে যেতেই দেয়নি।

জ্ঞান ছিল?

ছিল। কী হবে বলুন তো! আমার ছেলে খড়গপুর হোস্টেলে। তাকে কি খবর দেওয়া দরকার?

না, এখনই নয়। আমরা তো আছি। দেখা যাক। তেমন দরকার হলে আমি আই আই টি-তে ফোন করে দেবো। ভাববেন না।

রাশভারী বড় ডাক্তাররা রুগীর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বেশি মাখামাখি করে না। কিন্তু এ ডাক্তারটি তেমন রাশভারী নয়। ছিপছিপে, লম্বা, দারুণ ফর্সা এবং অতিশয় সুদর্শন ডাক্তারটি খুব স্মার্ট ভঙ্গিতে একটা কাচের দরজা ঠেলে লবিতে ঢুকে সোজা ঝুমকির সামনে চলে এল।

ওয়েল, আপনারা এখন আর থেকে কী করবেন? আমি ওঁকে ভর্তি করে নিয়েছি।

ঝুমকি তার দু'খানা অপরূপ চোখ তুলে ডাক্তারের চোখের দিকে চেয়ে বলল, বাবা কেমন আছে?

ডাক্তার একটু হেসে বলল, এখনই বলতে পারছি না। তবে ই সি জি-টা একটু গোলমেলে।

অবস্থা কি খুব খারাপ?

কাল সকালে বলব। চিন্তা করবেন না। ম্যাসিভ অ্যাটাক নয়। ট্রিটমেন্ট শুরু হয়েছে।

কথা বলতে বলতে দুজনে কাচের দরজাটার দিকে হেঁটে গেল পাশাপাশি। হেমাঙ্গর অন্তরাত্মা বলে উঠল, কী কথা তাহার সাথে? তার সাথে?

অপর্ণা কিছু একটা বলছিল। হেমাঙ্গ বুঝতে পারছিল না।

অপর্ণা ফের বলল, বড্ড বাচ্চা না ডাক্তারটি?

হেমাঙ্গ বলল, হ্যাঁ। আমি বড় ডাক্তার আজই ডেকে আনব।

না না, তার দরকার নেই এখনই। এও নাকি খুব বড় ডাক্তার।

কাচের দরজার পাশে দুজন মুখোমুখি দাঁড়ানো। ডাক্তারটি মিটিমিটি হেসে কী যে বলছে! ঝুমকি অত উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে কেন?

অপর্ণা ফের কী একটা বলল।

হেমাঙ্গ খুব অবাক হয়ে বলল, অ্যাঁ।

অপর্ণা ফের বলল।

হেমাঙ্গ আর চেষ্টা করল না বুঝতে। সে আর বুঝতে পারবেও না।

চারুশীলাও তাকে কিছু বলল।

হেমাঙ্গ ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

ফের অপর্ণাও কিছু বলল।

হেমাঙ্গ হাল ছেড়ে দিয়ে সামনের সোফাটায় বসে পড়ল ধপ করে। রুমালে মুখ মুছতে লাগল।

সে স্বাভাবিক নেই। কেমন একটা জ্বালাপোড়া হচ্ছে বুকে।

অপর্ণা তার পাশেই এসে বসল। বলল, আপনি নিজেকে গিল্টি ভাবছেন না তো!

গিল্টি!

মানে আপনার ওখান থেকে ফিরেই তো হল! ওটা কিন্তু কারণ নয়। ওর তো একবার হয়ে গেছে। আপনাকে ভীষণ আপসেট দেখাচ্ছে।

নিজের রাশ শক্ত হাতে ধরার একটা চেষ্টা করে হেমাঙ্গ। বলল, ইটস্ এ স্যাড কেস। অতটা জার্নি করা বোধহয় উচিত হয়নি।

জার্নি তো এমন কিছু নয়। শুধু দুবার একটু চড়াই ভাঙতে হয়েছিল ঘাটে উঠতে গিয়ে।

হয়তো সেটাই কারণ।

তাতেই বা আপনার দায়িত্ব কি বলুন!

হেমাঙ্গ চুপ করে রইল। ডাক্তারটি এত কথা বলছে কেন ঝুমকির সঙ্গে? এত কথা কিসের?

নিশ্চয়ই ব্যাচেলর, না? বলেই হেমাঙ্গ তাকিয়ে দেখল তিনজন মহিলা তার দিকে বিস্ময়ভরা চোখে চেয়ে আছে। এত লজ্জা পেল সে যে উঠে একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসতে হল।

ফিরে এসে দেখল, ঝুমকি সেফায় মাথা নিচু করে মায়ের পাশে বসা।

অস্থির হেমাঙ্গ আবার বেরিয়ে এল। ফের ঢুকল। তারপর হঠাৎ বলল, ঝুমকি!

ঝুমকি তার দুখানা চোখ সমেত বিষন্ন মুখখানা তুলল। নীরব।

একটু এদিকে আসবেন? কথা আছে।

ঝুমকি ধীরে উঠল। এগিয়ে এল।

বলুন।

বাইরে।

অস্থির পায়ে বাইরে এসে ঝুমকির মুখোমুখি দাঁড়ায় হেমাঙ্গ।

সরি। ভেরি সরি।

ঝুমকি যে অনেক কেঁদেছে তা তার মুখ দেখলেই বোঝা যায়। দুখানা টানা চোখ এখনও টলটল করছে। মৃদু স্বরে বলল, কী যে হয়ে গেল হঠাৎ!

আমার খুব খারাপ লাগছে।

জানি। আপনি নিজেকে রেসপনসিবল ভাবছেন।

আমি তো খানিকটা রেসপনসিবলই।

না। তা কেন?

হেমাঙ্গ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ডাক্তার কী বলল?

ঝুমকি মাথা নেড়ে বলল, তেমন কিছু নয়।

অনেক কথা হচ্ছিল আপনার সঙ্গে।

হ্যাঁ। উনি অনেকগুলো কেস হিস্ট্রির কথা বলছিলেন।

কেস হিস্ট্রি?

হ্যাঁ। এই সব ক্ষেত্রে কি কি হতে পারে। বলছিলেন ই সি জি রিপোর্ট তেমন খারাপ কিছু নয়। তবে জোর করে কিছু বলা যাচ্ছে না।

ওঃ। আচ্ছা, আপনাদের বোধহয় আজ খাওয়া হয়নি!

খাওয়া! না, সে সব আমাদের মনেই নেই। চারুমাসি একবার বলেছিল। কিন্তু আমাদের কি এখন খাওয়ার সময়?

হেমাঙ্গ বলল, কিন্তু উইক হয়ে পড়বেন যে!

বাবার একটু ভাল খবর না পেলে খাবো কি করে? গলা দিয়ে নামবেই না।

তাই কি হয়? এরকম করতে নেই। আমি ওদের বুঝিয়ে বলছি।

গমনোদ্যত হেমাঙ্গর পথ আটকাল ঝুমকি, প্লিজ! কেউ কিছু খেতে পারবে না এখন। ডাক্তার এখনই আসবে খবর দিতে। আমাদের অপেক্ষা করতে বলে গেছে।

খবর! বলে হেমাঙ্গ ঝুমকির দিকে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

আবার লবিতে এসে বসল তারা। চারজন মহিলা একসঙ্গে। একটু তফাতে হেমাঙ্গ। সে চুপ করে চোখ বুজে বসা। মাথার পিছনে জড়ো করা দুটো হাত। মন অস্থির। মাথা পাগল পাগল।

পাশে কেউ এসে বসল। একটা পারফিউমের গন্ধ।

হেমাঙ্গদা!

হেমাঙ্গ চোখ খুলল। অনু।

আপনার কী হয়েছে? এত আপসেট কেন?

ও কিছু নয়।

ভীষণ আপসেট। আমাদের চেয়েও বেশি।

হেমাঙ্গ একটু হাসল।

আই অ্যাম ভেরি সরি। মাই অ্যাপোলজি।

কেন বলো তো!

পরশু আমি আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি।

হেমাঙ্গ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ভালই করেছিলে। তোমার বাবার হার্ট অ্যাটাকটা নিশিপুরে হলে কী বিপদ হত বলো তো!

ওখানে ডাক্তার নেই, না?

না। ওখানে কিছু নেই। কিচ্ছু নেই। ডাক্তার না, নার্সিংহোম না, অ্যাম্বুলেন্স না, গাড়ি না।

তা হলে কারও অসুখ করলে কী করে লোকেরা?

ভটভটিতে চাপিয়ে শহরে আনে। যদি না আনা যায় তা হলে ভগবানকে ডাকে।

ইস।

তোমার বাবা লাকি। তুমি রাগ করে চলে এসে ভালই করেছে।

আপনি সেই জন্য আপসেট?

না।

তা হলে?

হেমাঙ্গ একটু হাসল।

দিদিকে বাইরে নিয়ে গিয়ে কী বললেন?

বললাম তোমাদের কিছু খাওয়া উচিত।

মাত্র এই কথা?

হেমাঙ্গ হাসল, আর কী বলব?

অনু চুপ করে রইল।

কী ভাবছো অনু?

আপনার ভীষণ ইগো।

তাই বুঝি?

অথচ আপনি ভীষণ ভালও তো।

ভাল?

হ্যাঁ, ভাল।

কে জানে কী!

আমি জানি আপনি ভীষণ ভাল। যদিও ইউ আর নট মাই টাইপ অফ এ ম্যান। তবু আপনি আপনার মতো করে ভীষণ ভাল।

তোমার ফেভারিট টাইপ কেমন?

স্মার্ট, প্র্যাক্টিক্যাল, ড্যাশিং। ওই যে, ডাক্তার ভট্টাচার্য আসছে।

সুদর্শন ডাক্তারটি এসেই ঝুমকিকে ডেকে নিয়ে গেল। হেমাঙ্গর অন্তরাত্মা বলে উঠল, যেও নাকো অই যুবকের সাথে…

কাচের দরজাটা ঠেলে ওরা ভিতরে চলে গেল। খানিক দূর দেখা গেল ওদের। তারপর চোখের আড়ালে।

হেমাঙ্গ হতাশায় কেমন স্থবির হয়ে যাচ্ছে এখন। তার মনে হচ্ছে সে একটা ভুল করছে। এখনই তার যা করা উচিত তা সে করছে না। বয়ে যাচ্ছে একটা জরুরি সময়। এর পর দেরি হয়ে যাবে।

অনু বলল, আজ আপনি সত্যিই খুব রেস্টলেস। তাই না?

হেমাঙ্গ স্তিমিত গলায় বলল, মানুষ তো ঘটনাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

কিন্তু কী হয়েছে?

কথাটার জবাব দেওয়ার আগেই ঝুমকিকে দেখা গেল, ফিরে আসছে।

বাবাকে দেখে এলাম মা!

অপর্ণা চমকে উঠে বলল, কী দেখলি?

ব্যথাটা কমেছে একটু।

কথা বলল?

ডাক্তার বলতে দিল না। বাবা আমার হাতটা একটু ধরল।

কিছু বলল না?

একটু হাসল।

এখন আমরা কী করব?

ডাক্তারবাবু বলল, ভয় নেই। আপনারা বাড়ি চলে যান। অনেকগুলো টেস্ট করা হচ্ছে। কাল-পরশুর মধ্যেই অবস্থাটা বোঝা যাবে। হয়তো সিরিয়াস কিছু নয়।

বলল?

হ্যাঁ তো।

ঠিক শুনেছিস?

হ্যাঁ মা। চলো আমরা বাড়ি যাই।

ঝুমকিদের বাড়িতে নয়, চারুশীলা তাদের নিয়ে এল নিজের বাড়িতে। বলল, তোমাদের তো আজ রান্নাই হয়নি, বাড়ি গিয়ে বেঁধে খেতে হবে। আমার বাড়িতে সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে, চলো।

বিপর্যস্ত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত একটি পরিবার জড়ো হল চারুশীলার বাড়িতে। আজ কারও মন ভাল নেই। হেমাঙ্গ চুপ করে ওদের পাশাপাশি বসে রইল সোফায়। একজোড়া চোখ তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। তার চোখও ছুঁয়ে আসছে ওকে। মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছে চোখে চোখ। হেমাঙ্গর ভিতরে একটা জ্বালা। ওই ডাক্তারকে সে ভুলতে পারছে না।

তিন দিন বাদে ছাড়া পেল মণীশ। জানা গেছে তার হার্টে কিছু হয়নি, পেটে গ্যাস জমে চাপ ধরেছিল বুকে। আপাতত ভয় নেই।

১১০

বাংলাদেশে যাওয়ার আগে বিষ্ণুপদ বলে দিয়েছিল, পূর্বপুরুষের ভিটেটা একটু দেখে আসিস বাবা। আমার তো আর যাওয়া হবে না। তুই দেখে এলেই আমারও এক রকম দেখাই হবে।

ঢাকায় নেমে নানা কনফারেন্সে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল কৃষ্ণজীবন। তারপর একদিন বাংলাদেশেরই একটি অমায়িক ছেলে আনোয়ার তাকে একখানা টয়োটা গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে গেল তার গাঁয়ে। যেতে যেতে বলল, কিছু চিনতে পারবেন না। সব পাল্টে গেছে।

কৃষ্ণজীবন হেসে বলল, চিনব কি? আমার তো কিছু মনেই নেই।

দু'বার ফেরী পেরিয়ে বেশ একটু ধকলের পর যখন গাঁয়ে পৌঁছালো কৃষ্ণজীবন তখন দুপুর। সেই খাড়া শারদীয় রোদে সে দেখল, কিছু আহামরি গ্রাম নয়। একটু ছন্নছাড়া। ক্ষেতে ফসল আছে। গাছপালা বিশেষ রকমের সতেজ।

আনোয়ার দু-চারজনকে জিজ্ঞেস করে একটা বাড়ি খুঁজে বের করল। বলল, দাদা, এইটেই আপনাদের বাড়ি ছিল।

কৃষ্ণজীবন নির্বিকার চোখে চারখানা টিনের ঘর আর একটা কোঠাবাড়ি আর উঠোন সমেত বাড়িটা নিরীক্ষণ করল। এই তাদের বাড়ি। এ বাড়ির স্মৃতিমেদুর মায়ায় বিষ্টুপুরে এক বৃদ্ধ ন্যুব্জ হয়ে বসে থাকে আজও। কৃষ্ণজীবন পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। সামনে আনোয়ার।

খবর পেয়ে বাড়ির মালিক বেরিয়ে এল। মধ্যবয়স্ক একজন রোগা মানুষ।

আসেন, আসেন। বলে নিয়ে গেল ভিতরে। কোঠাবাড়ির বারান্দায় চেয়ার পেতে দিল। বসাল।

দেখতে আসছেন? দেখেন, ভাল করে দেখেন।

কৃষ্ণজীবন একটু হেসে বলল, এ বাড়ি কি হাতবদল হয়েছে, নাকি আপনারাই প্রথম থেকে আছেন?

বিশ্বাসবাবুদের কাছ থেকে আমার আব্বাজান কিনেছিলেন। তারপর থেকে আমরাই আছি। এই কোঠাবাড়িটা ছিল না, আর ওই পশ্চিমের ঘরটা নতুন করে করা হয়েছে।

একটা পুকুর ছিল বলে শুনেছি। আছে?

আছে। এই কোঠাবাড়ির পিছনে।

একটা করমচা গাছ ছিল।

আছে।

এরা সম্পন্ন গৃহস্থ নয়। আবার একেবারে হা-ভাত জো-ভাতও নয়। এদের যা অবস্থা তার চেয়ে ভাল অবস্থা কি তাদের ছিল? মনে হয় না।

লোকটার নাম রজব আলি। মুখে হাসি লেগেই আছে। বলল, আজ এইখানেই দাওয়াত হোক। নিজের বাড়ি দেখতে এলেন, ছাড়ছি না।

কৃষ্ণজীবন মাথা নেড়ে বলল, উপায় নেই সাহেব। আমাকে এখনই ফিরতে হবে।

আনোয়ারও ঘড়ি দেখে বলল, আর পনেরো মিনিটের মধ্যে রওনা না হলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখা যাবে না।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই বাড়িটা ঘুরে দেখল কৃষ্ণজীবন। গাঁয়ের বাড়ি যেমন হয় তেমনি। কোনও আলাদা বৈশিষ্ট্য নেই। এ বাড়িতে তাদের চার পুরুষের বাস ছিল। কিন্তু সেই ইতিহাস তো খুঁজে পাওয়া যাবে না কোথাও। শুধু স্মৃতি, শুধু মায়া নিয়ে অপেক্ষা করে থাকে তার বাবা। দেশ বলতেই ভিজে যায় মন।

রজব আলিকে আনোয়ার বোঝাচ্ছিল, ইনি একজন মস্ত মানুষ। চারদিকে নাম। দেশ-বিদেশের পণ্ডিতেরা চেনেন। মোটাসোটা কেতাব লেখেন।

রজব আলি এ সব শুনে যেন বিগলিত হয়ে যায়। নিজের ছেলেরা সবাই ক্ষেতখামারে কাজ করছে। তাদের ডেকে দেখাতে পারল না বলে দুঃখ করে বলল, আবার আসেন একবার। সারাদিন থাকবেন।

ফেরার সময় কৃষ্ণজীবন উঠোনের বাইরে একটা ঝুপসি আমগাছের নীচে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, এটা কি পুরনো গাছ?

জী। আপনার বাপ-দাদার আমলের। বুড়ো গাছ।

একটা ছোট পল্লব ভেঙে নেবো?

রজব আলি শশব্যস্তে বলল, নিশ্চয়ই। দাঁড়ান আমি পেড়ে দিই।

আমিই নিচ্ছি।

একটা পাতাসমেত ছোট ডাল গাছ থেকে ভেঙে নিল সে। এটার চেয়ে মহার্ঘ উপহার বাবার জন্য আর ভাবতে পারে না সে।

দু' দিন বাদে ঢাকা থেকে কলকাতায় ফিরল সে। তারও দু' দিন বাদে বিষ্টুপুর।

বিষ্ণুপদ হাঁ করে অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে সব শুনল। তার যেন বিশ্বাস হচ্ছে না যে, গ্রামটা এখনও আছে, বাড়িটা আছে। বারবার তাকে স্পর্শ করল হাত বাড়িয়ে। বলল, সব দেখলি, অ্যাঁ! সব দেখলি?

হ্যাঁ বাবা, সব।

বল, আরও বল, সব শুনি।

বাবাকে কদাচিৎ এত উত্তেজিত দেখেছে কৃষ্ণজীবন। একটা মানুষের কত টান থাকে তার পূর্বপুরুষের ভিটের ওপর! অথচ সেখানে কীই বা ছিল আলাদা রকমের? কাঁচা বাড়ি, পুকুর, গাছপালা। কিন্তু ওভাবে তো দেখে না মানুষ। তার স্মৃতি, তার মায়া, তার পক্ষপাতই অন্য একটা মাত্রা যোগ করে দেয়। তখন আর সাধারণ একটা বাড়ি সাধারণ থাকে না। হয়ে যায় রূপকথার মতো অলৌকিক।

উঠোনের বাইরের দিকে একটা আমগাছ ছিল বাবা, মনে আছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ । মধুকুলকুলি আম। আছে সেটা?

আছে। তার একটা পল্লব এনেছি আপনার জন্য।

সাগ্রহে পল্লবটা হাতে নিয়ে মাথায় ঠেকায় বিষ্ণুপদ। কয়েকদিনে পল্লবটা একটু শুকিয়ে গেছে। বিষ্ণুপদ তবু অবাক চোখে পল্লবটার দিকে চেয়ে থাকে। যেন অবিশ্বাস্য কিছু দেখছে।

যারা আছে তারা কেমন লোক?

গরিব সাধারণ লোক। আদর-যত্ন করতে চেয়েছিল। সময় ছিল না।

করমচা গাছটা?

আছে।

ঘরগুলো বোধহয় ভেঙে আবার করেছে! না?

বোধহয়। তবে পরিবর্তন খুব একটা হয়নি শুনলাম।

বিষ্ণুপদ হাঁ করে শুনছে। স্মৃতিতে নতুন করে ঢেউ লাগছে। মন চলেছে উজানে। দুখানা স্বপ্নাতুর চোখ বিষ্টুপুর ছেড়ে কোথায় কোন গহীন অতীতের অন্ধকার ভেদ করার চেষ্টা করছে।

নয়নতারাও সব শুনল। কিন্তু অত ভাবাবেগ নিয়ে নয়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ভাল করেছিস গিয়ে।

বাবাকে খুশি করতে পেরেছি, এইটেই যথেষ্ট।

নয়নতারা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, মানুষটা মুখে তেমন কিছু বলে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে দেশের কথা খুব ভাবে। কেন ভাবে কে জানে বাবা! আমি তো অত ভাবি না। দেশে যে কোন সুখটা ছিল! সেখানেও অভাবের সংসার, এখানেও অভাবের সংসার।

কৃষ্ণজীবন মৃদু হেসে বলে, তোমার হল প্র্যাকটিক্যাল চোখ। বাবার তো তা নয়। বাবা অন্য চোখ দিয়ে দেখে। দেশে থাকতেও কচু-ঘেঁচুই খেয়েছে তবু বলে, ওঃ, দেশে যা খেয়েছিলাম সেরকম আর হয় না। ওটা একটা মায়া।

হ্যাঁ বাবা, তোর বাবার মতো করে আমি দুনিয়াকে দেখি না কখনও।

কৃষ্ণজীবন সারাদিন ধরে বাবাকে ঘুরে ফিরে দেখল। বিষ্ণুপদ বড় নিঃঝুম হয়ে আছে আজ। কথা নেই। স্মৃতির তাড়নায় আজ বিষ্ণুপদ অনেক তফাত হয়েছে।

নয়নতারা একবার বলল, বড় ভয় লাগছে বাবা। ও যে মুখে একদম কুলুপ এঁটেছে।

কৃষ্ণজীবন বলল, আজ আর বাবাকে ঘাঁটিও না মা। আপনমনে থাকতে দাও। আজ বড় পিছুটান।

আম্রপল্লবটা সেই যে ধরে বসে আছে, একবারও ছাড়েনি।

পরদিন আম্রপল্লবটা ঠাকুরের সামনে রেখে বিষ্ণুপদ একসময়ে স্নান করল, ভাত খেল। খেতে বসে নয়নতারাকে বলল, কোঠাবাড়িতে থাকতে ইচ্ছে যায় না।

ও মা! কেন গো?

জুত পাই না। টিনের ঘর, মাটির ভিত সেই যেন ভাল ছিল।

তোমাকে নিয়ে আর পারি না। কৃষ্ণ এত পয়সা খরচ করে রাজার বাড়ি বানিয়ে দিল, তোমার তবু সয় না কেন?

আমার আর্য নেই গো। আমি বড্ড মাটির মানুষ যে!

তা জানি। বাবুগিরি তোমার কোনও কালে ছিল না। মোটা কাপড়, মোটা ভাত, এ সবই পছন্দ। তা জীবনে আরও তো নানারকম আছে। একটু চেখে দেখতে হয়।

চেখেই তো বলছি, এ আমার পোষাচ্ছে না।

হরি বলো মন। এখন কি আবার দালান ভেঙে পুরনো ঘর খাড়া করতে বলব নাকি কৃষ্ণকে?

বিষ্ণুপদ একটু হাসল। বলল, খুব ফুট কাটতে শিখেছো দেখছি। না, ওটার দরকার নেই। বললাম আর কি। তোমাকে ছাড়া আর কাকেই বা বলি!

আমাকেই তো বলো আর সেই জন্যই তো তোমার জন্য আমার কষ্টটাও বেশি।

আচ্ছা বলল তো, তোমার দেশে ফিরতে ইচ্ছে করে না?

সত্যি কথা বলতে কি, তুমি যেখানে থাকো সেটাই আমার দেশ। আমি আর অন্য দেশ নিয়ে ভাবি না। দেশ বলতে আমার হচ্ছে জন।

বিষ্ণুপদ একটু হাসল, শোনো কথা! জন বলতে কি শুধু মানুষ, শুধু আত্মীয়? আর কিছু নয়?

আর কি?

গাছপালা, ঘরবাড়ি, মাটিটা পুকুরটা সবটাই তো জন।

তুমি বললে তাই।

আমাকে এসবও বলে দিতে হবে, তবে তুমি বুঝবে?

আমার বাপু অত মাথায় খেলে না। তুমি বোঝালে বুঝি।

বিষ্ণুপদ ভাতের গরাস নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, বুঝলে তুমিই হয়তো বুঝবে। তোমার মন বড় পরিষ্কার। কী জানো, এই চার ধারে যা কিছু আছে সবই যেন মানুষ। গাছটা, মাটিটা, ঘরটা সবই যেন বড় আপনার জন। দেশের বাড়িতে তাদেরই তো রেখে এসেছি কিনা!

এখানে এসে যে আবার নতুন করে সবাইকে পেলে। গাছ, মাটি, ঘর।

তা পেলাম। তবু পুরনোরা বেশি টানে। বাপ-দাদার ভিটে। পূর্বপুরুষদের বাস ছিল। ওর রকমটাই আলাদা। এই যে কৃষ্ণ একখানা গাছের ডাল হাতে করে এসেছে, কী বলব তোমাকে, সেই ডালখানাও যেন আমার সঙ্গে কত কথা কইল।

ওরকম হয়। তা বলে অমন চুপ মেরে যাও কেন? আমার যে ভয় করে।

ভয়! না, ভয়ের কি? পুরনো সব কথা মনে পড়ছিল। সামান্য সামান্য সব ঘটনা, তুচ্ছ সব কথা। তাই যেন মনটা রসস্থ হয়ে গেল।

তোমার বড় মায়া গো!

সেই জন্যেই তো দেহ ছাড়ে না।

বালাই ষাট। ওসব বলতে আছে?

কৃষ্ণকে দেশের বাড়ি দেখতে পাঠালাম। তা তার চোখ দিয়ে যেন আমারও দেখা। মনটা কিছু অস্থির হয়েছে তাই।

হ্যাঁ গো, তোমার যদি এতই মায়া তবে ঘুরে এসো না একবার। আজকাল কত লোক তো যাচ্ছে।

না না, সে ব্যাপারই নয়।

কেন বল তো!

গিয়ে কত পরিবর্তন দেখতে পাবো। সে কি ভাল লাগবে? মনটা খারাপ হয়ে যাবে। আমাদের কোঠাবাড়ি ছিল না, এখন হয়েছে। ঘরদোর, গাঁ সবই পাল্টে গেছে কত। ভাল লাগবে না। মন খারাপ হবে।

তাহলে বসে বসে ভাববে শুধু?

বিষ্ণুপদ একটু হাসল, ভাবতেই ভাল গো! ভাবনাও এক রকমের ওষুধ। মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।

আমি যে কিছু ভাবি না, তাহলে আমার কী হবে?

তুমিও ভাবো। তবে নিষ্কর্মার মত নয়। তোমার আলাদা একটা রকম আছে, বাস্তববোধও আছে। আমার হল অলস-চিন্তা।

বিষ্ণুপদ কয়েকটা দিন ভেসে রইল মনের এরোপ্লেনে। মাটিতে পা দিল না। খুব রসস্থ মন, খুব আনমনা।

একদিন সকালে বিষ্ণুপদ নয়নতারাকে ডেকে বলল, আমার কত বয়স হল বলল তো! হিসেব আছে?

তা কেন থাকবে না?

হিসেব করে দেখ তো বেশ করে।

হঠাৎ আবার বয়সের দরকার পড়ল কেন?

অনেককাল বয়সের কথা ভাবছি না। একটু হিসেব করা ভাল। কত হল?

বোধহয় ছিয়াত্তর সাতাত্তর।

উহুঁ, বড্ড নামিয়ে ফেলছে। একটু ওপরে ওঠো।

অত চুলচেরা হিসেব কি আমরা পারি? দু-এক বছরের তফাত হতে পারে।

যতই কমাও, প্রকৃতির নিয়মে আমার বয়স আশি পেরিয়েছে।

ওম্মা গো! কী বলে রে ডাকাত! আশি! তোমার কি মাথা খারাপ নাকি?

আশি তো ছার, আমার হিসেবে বিরাশি।

কিছুতেই নয়, তোমাকে কি ভীমরতিতে ধরল, হ্যাঁ গা?

না। সে তোমাকেই ধরেছে।

তা আজ বয়স নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কেন বাপু? জন্মদিন করবে নাকি?

এক গাল হেসে বিষ্ণুপদ বলে, তা করলে হয়। সেবার— কবে যেন— আমার জন্য রেমো একটা কেক এনেছিল। এসে বলল, বাবা, জন্মদিনে সাহেবরা কেক খায় শুনেছি। তাই আনলাম। শুনে হেসে বাঁচি না। জন্মদিন কবে তারই ঠিক নেই, উনি কেক এনে হাজির। তবে জিনিসটা ছিল বেশ ভাল। এখনও মুখে স্বাদটা লেগে আছে। তা লাগাও একটা জন্মদিন। তারিখটা যখন মনে নেই তখন যে কোনও দিন লাগালেই হয়।

নয়নতারাও হাসছিল। বলল, অত সোজা নয়। শাশুড়ি ঠাকরুনের কাছ থেকে আমি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করেছি। তোমার জন্ম কার্তিকে।

তাই বুঝি? সেজন্যই এমন পাথরচাপা কপাল।

কেন, কার্তিকে জন্মানো বুঝি খারাপ?

লোকে বলে, কার্তিকে রবি নীচস্থ থাকে। এ মাসের জাতকের উন্নতি করা খুব কষ্ট। তবে হলে ধীরে ধীরে হয়।

কপাল তোমার মোটেই খারাপ নয়। কষ্ট ছিল, কিন্তু আমাদের মতো বর-বউতে এমন ভাব খুঁজে বের করো তো! পাবে আর এক জোড়া?

তা ঠিক।

আজকাল বর-বউয়ের ঝগড়ায় বাড়িতে কাক-চিল বসতে পারে না। আমাদের কোনওদিন ঝগড়া হয়েছে বলো?

বিষ্ণুপদ মিটিমিটি হেসে বলল, সে একখানা বিশ্বরেকর্ডই বটে। জীবনে একবারটিও ঝগড়া করলে না। করলেও পারতে। তাতে একটু ঝাল-নুনের কাজ হত জীবনটায়।

কেন, ঝগড়া করিনি বলে কি আলুনি লেগেছে তোমার?

বিষ্ণুপদর হাসতে হাসতে চোখে জল এল। বলল, না গো ঠাট্টা করলাম। তুমি কি তেমন মেয়ে? কত কষ্ট দিয়েছি ভাত-কাপড়ের, কত খাটিয়েছি সংসারে, একবারটি নালিশ করোনি।

কেন করব নালিশ? যার কাছে নালিশ করব সে কিছু কম কষ্ট করেছে? তোমার কষ্ট দেখে নিজের কষ্টের কথা ভুলেই যেতাম।

সেই জন্যই তো তুমি রমণীরত্ন।

ও আবার কী? অত প্রশংসা করতে হয় না।

প্রশংসা করলে কী হয়?

লোকে বলবে বউয়ের আঁচলধরা।

তাহলে চেঁচিয়েই বলতে হয় কথাটা। লোকে নিন্দে করুক, তাতে আমার আনন্দই হবে।

ওম্মা গো! কী মানুষ তুমি গো?

বিষ্ণুপদ হাসতে হাসতে বলল, যাঃ, এক ধাক্কায় আমার বয়সটা বোধহয় সত্যিই কমিয়ে দিলে!

বয়স আবার কিভাবে কমল?

আনন্দে কমে, ফুর্তিতে কমে। তোমার কথায় আজ খুব আনন্দ হচ্ছে আমার। ওই ছিয়াত্তর সাতাত্তরই থাক।

অতও হয়তো নয়। আমাদের মোটা হিসেব। দু-চার বছর কমই হবে হয়তো। হ্যাঁ গো, কেক খেতে ইচ্ছে হয়েছে নাকি?

আনাবে?

তা আনাতে পারি। রোমোকে বলে দেবো'খন।

বিষ্ণুপদ ঘুরে ফিরে গিয়ে আম্রপল্লবটা দেখে। শুকিয়ে আসছে। তা হোক। ওটার গায়ে যেন পুব বাংলার আকাশ, বাতাস, মাটির রস, গন্ধ, গাঁয়ের ধুলো সব লেগে আছে। আম্রপল্লবটা হাতে নিয়ে মাঝে মাঝে বসে থাকে বিষ্ণুপদ। নয়নতারাকে বলে, হ্যাঁ গো, এটা পুঁতলে কি গাছ হবে?

তাই কখনও হয়! তুমি তো আমার চেয়ে চাষবাস কম বোঝো না।।

তা বটে। কলমের গাছ করলে হত। বলে দিলে কৃষ্ণ সেই বাড়ি থেকে একটা গাছের চারাও আনতে পারত।

ওগো, অত পুরনো আমল আঁকড়ে থাকতে নেই।

জানি। মনটা বড় উচাটন।

বিষ্ণুপদ সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে এই আশ্চর্য নির্মাণ দেখে। ভাঙা ঘর লোপাট করে রাজপ্রাসাদ উঠল। দুনিয়াতে এরকমই সব হয় কাণ্ডকারখানা।

ও দাদু! বলে পটল হুড়মুড় করে সাইকেল নিয়ে এসে ঢুকল।

কি রে?

চলো।

কোথায় যাবো?

পুলিন দাদুর হয়ে গেল।

পুলিন! পুলিনের কী হল?

আজ টিউবওয়েল পাম্প করছিল সকালবেলায়। সেইখানেই স্ট্রোক।

বলিস কি?

বটতলা থেকে ডাক্তার এসে দেখে বলল, হয়ে গেছে।

দূর! কী যে বলিস! পুলিন বয়সে আমার ছোটো যে!

চলো দেখবে।

বিষ্ণুপদর হাতে পায়ে হঠাৎ একটা থরথরানি উঠল। ক্ষীণ গলায় সে ডাকল, নয়নতারা!

নয়নতারা পান-দোক্তা খাচ্ছিল দোতলার বারান্দায়। ডাকটা শুনতে পেল না। কানে একটু কম শোনে ইদানীং ও। পটল তার হেঁড়ে গলায় ডাক ছাড়ল, ও ঠাকুমা?

নয়নতারা মুখ বাড়িয়ে বলল, কী রে?

পুলিনদাদু মারা গেল সকালে। দাদুকে নিয়ে যাচ্ছি।

সর্বনাশ! বলিস কি?

বিষ্ণুপদ অসহায় মুখ করে বলল, আমার শরীরটা কেমন করছে। এসসা তো!

নয়নতারা পক্ষিণীর মতো নেমে এল নিচে। বলল, কী হয়েছে তোমার?

একটু ধরো তো! ঘরে নিয়ে যাও।

পটল আর নয়নতারা বারান্দা অবধি আনতে পারল বিষ্ণুপদকে। বারান্দাতেই শুইয়ে দিতে হল। হাতে পায়ে কাঁপুনিটাই বড্ড বেশি।

ওরে, ডাক্তার ডেকে আন।

পটল গম্ভীর হয়ে বলল, ডাক্তারই তো পটল তুলেছে। বটতলা থেকে মিত্তিরকে ডেকে আনি ঠাকমা?

তাই যা দাদা। তাড়াতাড়ি যা।

পটল গেল।

কিন্তু বিষ্ণুপদ ততক্ষণে এগিয়ে পড়েছে অনেক। ধুলোপায়ে রাস্তা হাঁটছে। মাথার ওপর আলোভরা আকাশ, দু'ধারে ধানক্ষেত। খালধার। তারপর গাঁয়ের পথ। হাতে আম্রপল্লবটা ধরা। যাক, বহুকাল বাদে দেশে ফেরা হচ্ছে তাহলে!

১১১

শোকের এমন প্রকাশ বহুকাল দেখেনি চয়ন। এরকমও হয় নাকি আজকাল মা-বাপ মারা গেলে? শোকের প্রকাশ কত কমে গেছে মানুষের! আত্মীয়তা জিনিসটাই হয়ে গেছে একটা ফিকে ধারণা মাত্র। মা-বাপ বুড়ো হলে সংসারের মস্ত বোঝা। তারা মরলে মানুষ আজকাল কাঁদেও না ভাল করে। কৃষ্ণজীবনের গভীর শোকাহত মুখটা তাকে গভীরে আঘাত করল আজ। এ মুখখানা সে বোধ হয় আমৃত্যু ভুলতে পারবে না।

ঘটনাটা ঘটল তার সামনেই এক বিকেলে। মোহিনীকে পড়াচ্ছিল চয়ন। কৃষ্ণজীবন ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে বাইরের ঘরে বসে জুতো ছাড়ছিলেন। ঠিক সেই সময়ে টেলিফোন বাজল। রিসিভার ধরলেন কৃষ্ণজীবন নিজেই। দুবার বললেন, হ্যালো। তারপর বললেন, অ্যাঁ! তার পরই কর্ডলেস টেলিফোনটা তাঁর স্খলিত হাত থেকে সশব্দে পড়ে গেল মেঝেয়।

কী হল? বলে উঠে দাঁড়াল মোহিনী। সঙ্গে সঙ্গে চয়নও।

পাশের ঘরে দৌড়ে গিয়েই মোহিনী চিৎকার করে উঠল, বাবা! ও বাবা! তোমার কী হয়েছে?

চয়ন একটু নার্ভাস পায়ে গিয়ে পর্দা সরিয়ে দরজায় দাঁড়াল। টেলিফোনের টেবিলটার পাশে। দাঁড়িয়ে কৃষ্ণজীবন। মুখখানা ছাইবর্ণ, চক্ষু স্থির এবং অস্বাভাবিক বিস্ফারিত, দুটো হাত মুঠো পাকাচ্ছে আর খুলে যাচ্ছে। মোহিনী দু'হাতে বাবাকে আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে ঝাঁকুনি দিতে লাগল, বাবা! বাবা গো! ও বাবা! তোমার কী হল বাবা?

কৃষ্ণজীবন ধীরে ধীরে তাঁর বিস্ফারিত চোখ বুজলেন এবং চোখ ভরা জল দরদর করে নেমে আসতে লাগল।

চয়ন ফোনটা কুড়িয়ে নিয়ে ক্র্যাডলে রাখল। তারও হাত-পা কাঁপছিল নার্ভাসনেসে। এমন কীই বা ঘটতে পারে যাতে উনি এত ভেঙে পড়লেন? মোহিনীর মা তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে কোথাও গেছেন। বোধ হয় যোগব্যায়ামের ক্লাবে। সেরকমই আবছা জানা আছে চয়নের। এঁকে সামলানোর জন্য এখন একজন শক্তসমর্থ লোক দরকার। সে বা মোহিনী কেউই সেই সামর্থ্য রাখে না।

সামলে গেলেন অবশ্য কৃষ্ণজীবন নিজেই। দুহাতে নিজের অরণ্যের মতো চুলের গোছা খামচে ধরে ছেলেমানুষের মতো প্রথম ফুঁপিয়ে, তারপর ডুকরে কেঁদে উঠলেন শক্তপোক্ত কৃষ্ণজীবন। এই কান্নাটার দরকার ছিল। কাঁদতে কাঁদতে পিছু ফিরে একটু টলোমলো পায়ে হেঁটে সোফায় বসে পড়লেন। তারপর শ্বাসরোধকারী একটা শব্দ করতে করতে ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলতে লাগলেন, না···না···না···না···

মোহিনী পাশে গিয়ে বসল। বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, কাঁদে না বাবা, কাঁদে না, কী হয়েছে বাবা?

কৃষ্ণজীবনের এই শোক চয়নের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। শক্তসমর্থ, বিখ্যাত, প্রতিষ্ঠিত এবং বয়স্ক কৃষ্ণজীবন এত ভেঙে পড়তে পারেন তার ধারণা ছিল না। চয়নের ভয় হচ্ছিল যোগব্যায়ামের ক্লাসে গিয়ে দোলনের কিছু হল নাকি? সে জানে কৃষ্ণজীবন দোলনকে প্রাণাধিক ভালবাসেন।

প্রায় মিনিট দশেক কৃষ্ণজীবন ওরকমই বেহেড রইলেন। শুধু মোহিনী বাবাকে ছাড়ল না। ধীরে ধীরে— যেন মায়ের মতো— বাবার মাথাটা নিজের কাঁধে টেনে নিল, অবিকল মায়ের মতোই হাত বুলিয়ে দিতে লাগল মাথায় আর গালে, কাঁদে না বাবা, অত কাঁদে না। কী হয়েছে বলবে তো!

কৃষ্ণজীবন মেয়েকে আঁকড়ে ধরলেন হঠাৎ। মুখ তুলে বললেন, এ কি হতে পারে বল তো! হতে পারে? বাবা নেই! বাবা কোথায় যাবে আমাকে ছেড়ে? কোথায়?

এ প্রশ্নের জবাব মোহিনী কি দিতে পারে? উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেসে গেছে মানুষটির যত জ্ঞান, যত অভিজ্ঞতা, শোক ভাসিয়ে নিয়ে গেছে গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্ব, কৃষ্ণজীবন যেন এখন অসহায় শিশু।

চয়নের মাও মারা গিয়েছিল। সে মৃত্যু যেন শোক বয়ে আনেনি, এনেছিল প্রার্থিত মুক্তি। মায়ের জরাজীর্ণ অস্তিত্বের বন্ধন যেন অষ্টপাশে বেঁধে রেখেছিল চয়নকে। মা মরে যাওয়ায় কি শোক হয়নি তার? হয়তো তাও হয়েছিল। তবে নানা অনিশ্চয়তায় দিশাহারা, এপিলেপসির প্রকোপ, দাদার মুখাপেক্ষিতা সব মিলিয়ে এমন জট পাকিয়ে গিয়েছিল যে, শোকটাকে চিনতেই পারল না সে। এমন কি তার দাদা অয়নকেও কাঁদতে দেখেনি সে। গাম্ভীর্যের পোস্টার মুখে সেঁটে দাঁড়িয়েছিল শুধু।

কৃষ্ণজীবনের প্রতি বড় শ্রদ্ধা হল চয়নের। এ তো ভালবাসার সময় নয়। ভাত-কাপড়ের চেয়েও মানুষের অনেক বেশি অভাব এখন এই মহার্ঘ ভালবাসার। ওই এক জায়গায় মানুষ এখন দেউলিয়া। এখন মানুষের ভালবাসার লগ্নি বড্ড ছোট। বউ আর বাচ্চাকে নিয়ে ছোট ফ্রেমে ভালবাসাকে বাঁধিয়ে নিয়েছে সে।

মোহিনী মুখ তুলে চয়নের দিকে চেয়ে বলল, চয়নদা, মাকে একটু খবর দেবেন? ওই লালরঙা ফোন-বইতে হৃদয়রঞ্জন দাসের নম্বর।

কর্ডলেস টেলিফোনটা পড়ে গিয়েছিল। এখনও ঠিক আছে কি? চয়ন ফোন তুলে কানে দিয়ে দেখল, ডায়ালটোন আছে। নম্বরটা বের করে নার্ভাস আঙুলে ডায়াল করল সে। মোহিনীর মাকে সহজেই পাওয়া গেল। বললেন, কী হয়েছে চয়ন?

আপনার শ্বশুরমশাই মারা গেছেন।

ওঃ! আচ্ছা আসছি। উনি কী করছেন?

উনি খুব ভেঙে পড়েছেন।

ভেঙে পড়েছে?

ভীষণ! সামলোনো যাচ্ছে না।

অত ভেঙে পড়ল কেন? শ্বশুরমশাইয়ের বয়স হয়েছিল তো।

আপনি আসুন।

মোহিনী তার বাবাকে দুটি কিশোরী-হাতে ঘিরে রেখেছে। তাড়িয়ে দিতে চাইছে যতেক শোকতাপ। পারছে না। কৃষ্ণজীবনের হেঁচকি উঠছে। তার মধ্যেই হাহাকার হয়ে বুক থেকে শ্বাসবায়ু বেরিয়ে আসছে, বাবা!

এইভাবেই আরও আধ ঘণ্টা কাটবার পর রিয়া এলেন। মুখে চোখে থমথমে ভাব। কান্না নেই।

কৃষ্ণজীবনকে তেমনি ধরে আছে মোহিনী। তবে কৃষ্ণজীবন এখন সোফার পিছনে মাথাটা সম্পূর্ণ এলিয়ে চোখ বুজে আছেন। চোখ অবিরাম বর্ষণ করছে অশ্রুধারা। কেঁপে কেঁপে উঠছে বুক। কত কালের জমা দীর্ঘশ্বাসসমূহ উপর্যুপরি বেরিয়ে আসছে বুক থেকে।

রিয়া দৃশ্যটা দেখল একটু থমকে দাঁড়িয়ে। তার পর হঠাৎ চয়নের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, এখন আমরা কী করব বলো তো!

চয়ন বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে বলল, আপনাদের একবার ওখানে যাওয়া দরকার। এখনই।

এখনই! কিন্তু এখনই কি করে?

কৃষ্ণজীবন দুটি অসহ্য রাঙা চোখ মেলে তাকায়। তারপর কান্নাভেজা গলায় বলে, তোমাদের যাওয়ার দরকার নেই।

রিয়া কি সামান্য স্বস্তি বোধ করল? বলল, তুমি কি যাবে?

কৃষ্ণজীবন হঠাৎ যেন সচকিত হয়ে সোজা হলেন। তারপর দু'হাতে ফের মুখ ঢেকে ফেললেন। অদ্ভুত চাপা একটা আর্তনাদ করে উঠলেন, মুখাগ্নি বোঝো? মুখাগ্নি? আমি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, শ্রাদ্ধাধিকারী। বোঝো এসব? আমি না গেলে হবে এসব? হবে? বাবা বারান্দায় শুয়ে আছে আমার জন্য। প্রাণ নেই, তবু অপেক্ষা করছে। জানো এসব? মানো?

রিয়া কাছে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায়। কোমল কণ্ঠে বলে, ওরকম কোরো না গো! অত ভেঙে পড়তে নেই। আমি কি তোমাকে একা ছাড়ব ভেবেছ? আমরা সবাই যাবো। ওরা একটু তৈরি হয়ে নিক?

কৃষ্ণজীবন কিছুই বললেন না, আর একটা কান্নার ঘূর্ণি ঝড় যেন অন্তস্তল থেকে উঠে এল তাঁর। ভেসে যাচ্ছিলেন।

এইটুকু দেখে বিদায় নিল চয়ন। তার আর কিছু করার নেই। শোকেসন্তাপে চেনা কৃষ্ণজীবনের ভিতর থেকে যে আর একজন কৃষ্ণজীবন বেরিয়ে এলেন তাঁকে এতকাল চিনত না চয়ন। এ এক আশ্চর্য কৃষ্ণজীবন। ইনি গাছপালা, পশুপাখি ভালবাসেন এটা সে জানত। কিন্তু সেই ভালবাসার এই গভীর উন্মোচন আজ বড় লজ্জিত করে চয়নকে। এত ভালবাসা মানুষটার! এত! বৃদ্ধ গ্রাম্য সরল এক বাবার জন্য এই বিশ্বখ্যাত মানুষটার এত ভালবাসা, এত হাহাকার? কৃষ্ণজীবনের মতো মানুষকে দেখলেও বোধ হয় বহু জন্মের পাপ কাটে।

তুমি চালিও না, তুমি চালিও না, অ্যাকসিডেন্ট করবে। আমি ড্রাইভার ডাকছি। চারুশীলাদের একজন চব্বিশ ঘণ্টার ড্রাইভার আছে।

দাঁতে দাঁত চেপে কৃষ্ণজীবন বলল, না, আমি পারব। আমাকে পারতেই হবে।

পিছনে তিন বিস্ময়াবিষ্ট ছেলেমেয়ে, সামনে রিয়া, কৃষ্ণজীবন গাড়ি ছাড়ল। তার চোখ আজ উষ্ণ প্রস্রবণের মতো ভেসে যাচ্ছে জলে। দীর্ঘশ্বাসে পাঁজর ভেঙে যাচ্ছে যেন।

এই তো সেদিন আম্রপল্লবটা বাংলাদেশ থেকে এনে দিয়েছিল সে। মুখে কী অপার্থিব হাসি ফুটেছিল বাবার! কী হল তোমার বাবা? হঠাৎ কী হল? এইভাবে যেতে হয় বুঝি?

কিছুই কি দেখতে পাচ্ছে না সে? সব যেন আবছা। চোখের জলে পথের আলো নানা বিভ্রম ঘটাচ্ছে। কৃষ্ণজীবন তীব্র হর্ন দিয়ে দিয়ে চালাচ্ছে গাড়ি। বাইপাস ধরে উত্তর দিকে মুখ ঘুরিয়ে সে জোরে ছেড়ে দিল গাড়ি।

অত জোরে নয়, ওগো সাবধান!

কিছু হবে না। আমাকে কনসেনট্রেট করতে দাও। কথা বোলো না।

রিয়া কথা বলল না আর। মাঝে মাঝে রুমালে চোখ মুছে নেয় কৃষ্ণজীবন। গাড়ি চালাতে থাকে।

এরা কেউ জানে না, তাদের সম্পর্ক রচিত হয়েছিল অভাবে খিদেয়, অনেক সর্বনাশকে ঠেকিয়ে। বাবা তাকে পড়াত, চাষ করতে শেখাত। বাবা তাকে শিখিয়েছিল পৃথিবীকে ভালবাসতে। পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্গ, পিতাহি পরমং তপঃ•••

উড়ে গেল ভি আই পি, উড়ে গেল যশোর রোড। তার পর গাঁয়ে যাওয়ার ভাঙা রাস্তা। গাড়ি। লাফায়, টাল খায়, যায়। পিছনে ঘুমিয়ে পড়েছে দোলন, আর দুজন চিত্রার্পিত বসে আছে। তারা জানে না কিভাবে শোক করতে হয়। তারা দাদুকে ভাল করে চেনেই না।

গ্রামবাসী অনেক জড়ো হয়েছে উঠোনে। রামজীবন দাদাকে দেখে দৌড়ে এসে কাটা কলাগাছের মতো পড়ে গেল পায়ের ওপর, দাদা রে!

নয়নতারার চোখে আর জল নেই। সারা দিন ভুল বকে, কেঁদে হাঁফিয়ে এই এখন বিষ্ণুপদর খাট আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে নিঝুম হয়ে। তাকে কেউ সরাতে পারেনি। মাঝে মাঝে বলে উঠছে, কালঘড়ি দেখেছিল না! কালঘড়ি! তখনই জানতাম। তখনই জানতাম ফাঁকি দেবে।

বাবার শিয়রে এসে দাঁড়াল কৃষ্ণজীবন। অপলক চেয়ে রইল মুখের দিকে। বাবার গালে তিন-চার দিনের দাড়ি। মুখ বড় প্রশান্ত। চোখভরা ঘুম। একজন শান্ত, নিরীহ, নিপাট মানুষ। এই পৃথিবীর কারও সঙ্গে তাঁর কোনও বিবাদ ছিল না। ছিল না ঋণ, অভিযোগ, ক্ষোভ বা হিংসে। বাবার মুখের দিকে চেয়ে থেকে সেই গুণাবলীর উত্তরাধিকার আজ গ্রহণ করার চেষ্টা করছিল কৃষ্ণজীবন। এও জ্ঞান, এও বিদ্যা, এও দীনজনের মতো নতমস্তকে গ্রহণ করতে হয়।

কৃষ্ণজীবন তার বাবাকে প্রণাম করল।

হরিবোল, বিষ্ণুপদ কাঁধে উঠলেন। চললেন। রাত ভোর হওয়ার আগেই ছাই হয়ে গেলেন। পঞ্চভূতের শরীর নিয়ে নিল যে যার ভাগেরটা। যা রয়ে গেল তা স্মৃতি।

খালের নোংরা জলে স্নান করে যখন উঠে এল কৃষ্ণজীবন তখন তার বুক পাথরের মতো নিস্তব্ধ। যেন হৃৎপিণ্ডও থেমে গেছে। ব্রাহ্মমুহূর্তের বৈরাগ্যের রং চারদিকে। জীবন ও মৃত্যুর অর্থহীনতার মাঝখানে কী মহান এই পার্থিব জীবন! ক্ষণস্থায়ী, অথচ কত বর্ণময়।

সকালের আলো ফুটল। শ্মশানযাত্রীরা ফিরে এল নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। বিধ্বস্ত, বিহ্বল বাড়িটায় আজ সকালে জাগরণের কোনও কোলাহল শোনা গেল না। খুব নিঝুম।

কৃষ্ণজীবন যখন ধড়া পরে বারান্দার প্রান্তে একটি কুশাসনে নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল তখন কোমল কচি দুখানা হাত পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল তার গলা, বাবা!

বড় চমকে ওঠে কৃষ্ণজীবন। কে?

খুব কেঁদেছো বাবা?

আয় দোলন।

দোলন পাশটিতে বসে বাবার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

কৃষ্ণজীবনের দু'চোখ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ে জল।

দোলন আর কিছু বলে না। শুধু চেয়ে থাকে। এ বাড়িটা কাদের সে বুঝতে পারে না। এরা কারা তাও তার কাছে স্পষ্ট নয়।

বাঁ পাশে কুয়োতলা, তারপর বাগান, সামনে উঠোন। কৃষ্ণজীবন তার বাবার পরিধি দেখছিল। গত কয়েক বছর বাবা এই বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে বড় একটা যায়নি। যেখানে কৃষ্ণজীবন বসে আছে সেখানে ছিল একখানা দাওয়া। কৃষ্ণজীবন বাঁধিয়ে মোজেইক করে দিয়েছে। দাওয়ার এই প্রান্তটিতে বসে ঝুম হয়ে চেয়ে থাকত। কী দেখত বাবা? কী দেখত? অভাবক্লিষ্ট জীবনের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসে এই দাওয়ায় বসে আকাশ-পাতাল ভাবত। কূলকিনারা পেত না, থৈ পেত না এই জীবনের, এই পৃথিবীর। কৃষ্ণজীবন বিদেশে গেছে শুনলেই বাবা পটলের ভূগোলের বই আর ম্যাপ খুলে বসত। এই মস্ত পৃথিবীর কোন সুদূর প্রান্তে গেছে তার ছেলে তা অনুধাবন করত। হয়তো-বা ছেলের চোখ দিয়েই দেখার চেষ্টা করত অচেনা বিদেশ। অজানা দেশ, অচিন দেশ কত কি দেখা হল না তার। বোঝা হল না এই জীবনের অর্থ।

বাবার সেই বিস্ময়ের উত্তরাধিকার আজ কোলে নিয়ে বসে আছে কৃষ্ণজীবন। মাথার ওপর ওই যে মহাশূন্য, এই চারদিকে পরিব্যাপ্ত বিশ্বজগৎ তার অর্থ কি কৃষ্ণজীবন জানে? এই যে মৃত্যু এসে নিয়ে গেল মানুষটাকে— এরই বা অর্থ কি? কোথায় যায়? নাকি···যায় না কোথাও?

দিনের আলোয় চেনা মুখগুলি ফুটে উঠল চারধারে। শোকসন্তপ্ত একটা বাড়ির উঠোনে, বারান্দায়, ঘরে সরস্বতী, বীণাপাণি, রামজীবন, বামাচরণ, নয়নতারা। বাচ্চা। বউরা। বিষ্ণুপদ বিশ্বাস কি বেঁচে আছে এদের মধ্যে?

আম্রপল্লবটা মা যত্ন করে রেখে দিয়েছে বিছানার পাশে একটা ফুলদানিতে।

ওইটে ধরে বসে থাকত, বুঝলি? কেমন ধারা হয়ে গিয়েছিল।

জানি মা।।

কী থেকে কী হয়ে গেল বাবা, বল তো! শেষ দিনটায় বয়সের হিসেব নিচ্ছিল। কেন নিচ্ছিল কে জানে!

মায়ের দিকে চেয়ে বিহ্বল হয়ে যায় কৃষ্ণজীবন। তার মা আর বাবা বিয়ের পর থেকে বোধ হয় একটি দিনও পরস্পরকে ছেড়ে থাকেনি। নিবিড় গভীর ছিল দুটি মানুষের সম্পর্ক। দুজনে মিলে নিঃশব্দে টানত সংসারের জোয়াল। কখনও মা আর বাবার ঝগড়া বা মতান্তর হয়নি। মা যে কী ভীষণ একা হয়ে গেল তা শুধু গভীরভাবে টের পায় কৃষ্ণজীবন। এই একাকিত্ব কি মা সহ্য করতে পারবে? মা হয়তো পারবে। সংসারের সঙ্গে জড়িয়ে-মড়িয়ে, নাতিপুতি ছেলে-বউ নিয়ে হয়তো বা পারবে। কিন্তু বাবার বদলে মা যদি যেত তাহলে বাবা

পারত না। আরও বোবা হয়ে যেত, অসহায় হয়ে যেত। পুরুষরা তো সংসার নিয়ে জড়িয়ে-মড়িয়ে থাকতে পারে না।

কৃষ্ণজীবনের গভীর শোকাহত চেহারা দেখে দোলন আর নয়নতারা ছাড়া কেউই বড় একটা কাছে ঘেঁষছে না।

নয়নতারা শুয়েই আছে ওপরের ঘরে। মাঝে মাঝে নানা কথা ভুরভুরি কাটছে। তারপর দীর্ঘ বিরতি, চোখ বোজা। সেই চোখের কোলে জমে যাচ্ছে পুকুর।

বাড়ির আর সবাই সামলে উঠেছে। বাচ্চারা একটু খেলছে-টেলছে উঠোনে, বাগানে, পাড়ার লোকেরা আসছে যাচ্ছে। জামতলায় গিয়ে বিড়ি টেনে এল বামাচরণ। সবই দেখতে পায় কৃষ্ণজীবন। কিছুই স্পর্শ করে না তাকে।

রিয়া একসময়ে এসে বলল, ছেলেমেয়েদের স্কুল কামাই হচ্ছে। দুটো-তিনটে দিন হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু তার বেশি হলে মুশকিল। জানোই তো মোহিনীর ফাইনাল ইয়ার।

কৃষ্ণজীবন তার উদাস চোখ জোড়া রিয়ার চোখে স্থাপন করে বলে, যাবে? যাও তাহলে।

আজ শনিবার, না গেলেও চলবে। কিন্তু কাল গেলে ভাল হয়।

অস্ফুট গলায় কৃষ্ণজীবন বলে, যেও।

তারও কত গুরুতর কাজ পড়ে আছে কলকাতায়। কত মিটিং সেমিনারে নেমন্তন্ন অপেক্ষা করছে। কিন্তু কিছুই তার ভিতরে কোনও তাগিদ সৃষ্টি করছে না আর। সামনে এক শূন্যতা নিয়ে সে স্তব্ধ হয়ে গেছে বড়। বারবার বুঝতে চেষ্টা করছে উত্তরাধিকারের কথা। তার ভিতরে বাবা কতটুকু বেঁচে আছে?

কে একজন একটা কাটা ডাব হাতে নিয়ে সামনে এসে বলল, এটা খেয়ে নিন দাদা।

কৃষ্ণজীবন চেয়ে দেখল, নিমাই। ডাবটা হাতে নিয়ে সে বলল, কেমন আছ নিমাই?

ভালই।

নিমাই যে ভাল আছে তা তার পরিচ্ছন্ন ধুতি বা জামাতে নয়, প্রকাশ পাচ্ছে তার মুখেচোখে। উদ্‌ভ্রান্ত, তটস্থ, ভীতু সেই মুখখানায় অনেক আত্মস্থ একটা ভাব। দেখে ভাল লাগে। নিমাই চুপ করে বসে রইল সামনে।

তুমি আর বীণা কি একসঙ্গে এলে নিমাই?

আজ্ঞে হ্যাঁ। গতকাল বীণা বনগাঁ থেকে কাঁচরাপাড়ায় গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে খবরটা দিল বিকেলবেলায়। তখনই চলে এলাম।

তোমরা এখনও একসঙ্গে থাকো না?

আজ্ঞে না। সম্পর্কটা সেরকম নয়।

কৃষ্ণজীবন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কোনও সম্পর্কই আর বেঁধে রাখতে পারছে না মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে। এ বড় ভাগের সময় এল। বিষ্ণুপদ আর নয়নতারাদের আর পাওয়া যাবে না দুনিয়াতে। তারা হারিয়েই যাবে বুঝি।

একটু বেলায় শোরগোলটা উঠল। জামতলার দিকে তিনটে গলা উঠল সপ্তমে। বামাচরণ চেঁচাচ্ছিল, বিশ্বাস না হয় মাকে জিজ্ঞেস করে দেখ, দোতলাটা বাবা আমাকে দিয়ে গেছে কি না। দেখ জিজ্ঞেস করে। বাবা

নিজের মুখে বলেছে আমি মরলে তুই দোতলাটা নিস।

বামার বউ গলা মিলিয়ে বলল, আমরা তো আর বলতে যাইনি। উনি নিজের মুখেই বলে গেছেন।

রামজীবন তেজের সঙ্গে বলল, দোতলা-ফোতলা ভুলে যাও। থাকতে হয় তো থাকতে পারো, কিন্তু দোতলা কেউ পাবে না। মা থাকবে যেমন আছে। বাবার সব জিনিস সাজিয়ে রাখা হবে ওখানে।

বামাচরণ বলল, কেন? এত বড় জায়গাটা ফাঁকা ফেলে রাখবি, এ কি গায়ের জোর নাকি? দোতলা আমার পাওয়ার কথা।

কৃষ্ণজীবনের কানে আঙুল দিতে ইচ্ছে করছিল। এরা তার শোকভারনম্র দ্রব মনটাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। সে গভীর স্বরে ডাকল, পটল!

পটল দৌড়ে এল, বলল জ্যাঠা।

চল তো, ঘুরে আসি।

পটলের সঙ্গে হাটে-মাঠে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল কৃষ্ণজীবন। মনটা ছিছিক্কারে ভরা। তার বউ ছেলে-মেয়ে ওই কদর্য ঝগড়ার সাক্ষী থাকছে। বিষিয়ে যাচ্ছে তারা। দূষিত হয়ে যাচ্ছে চারপাশ।

যখন ক্লান্ত কৃষ্ণজীবন ফিরল তখন ঝগড়া থেমেছে। কিন্তু এ হল বারুদের স্তূপের ওপর বসে থাকা। এই বাড়িঘর যতেক নির্মাণ এসব বাইরে থেকেই দেখতে ভাল। এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে থাকে স্বার্থপরতা।

এ বাড়িটা তার বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে হল একবার।

সে ফিরে বারান্দার কোণে কুশাসনে চুপ করে বসে ছিল, এমন সময়ে রিয়া এসে সামনে দাঁড়াল, শুনছ?

বলো।

খুব চাপা গলায় রিয়া বলল, এখানে কি থাকা যাবে? ঝগড়া তো শুনলে!

শুনলাম।

কিরকম খারাপ খারাপ সব কথা বলছিল দু'জন। বাড়ি করে দিয়ে তুমি আরও বিপদ করেছ।

কৃষ্ণজীবন চুপ করে থাকে।

চলো, চলে যাই। শ্রাদ্ধের সময় না হয় আসা যাবে। কী বলো?

কৃষ্ণজীবন আরও খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, তাই চলো! তোমরা তৈরি হয়ে নাও।

দুপুরের খাওয়াটা হোক। তারপর।

কৃষ্ণজীবন স্তিমিত গলায় বলল, আচ্ছা।

কলকাতার দিকে গাড়ি চালাতে চালাতে কৃষ্ণজীবন ভাবছিল, বিষ্টুপুরে তার কি আর ফিরে আসা হবে? ওই ভাগের বাড়ি, তলায় তলায় আক্রোশ, রোজ ঝগড়া— এ সবের মধ্যে হারিয়ে যাবে তার ধ্যান, তার প্রজ্ঞার অনুভূতি। না, বিষ্টুপুর নয়। অন্য কোথা, অন্য কোনওখানে।

বর্ধমানের দিকে একটা খামারবাড়ি দেখে এসেছিল সে। লাগোয়া জমিই অনেকটা, চার বিঘের ওপর। প্রচুর গাছ আছে। বুড়ো মালিক বিক্রি করে দিতে চায়। এখনও কি আছে? থাকলে কিনে নেবে সে। মাঝে মাঝে তার যে পালানো দরকার। সভ্যতা থেকে, আত্মীয়তা থেকে, সম্পর্ক থেকে।

বাড়ি এসে গুম হয়ে রইল কৃষ্ণজীবন। গুটিয়ে গেল নিজের মধ্যে। আর এই গুম হওয়া ভাবটা অব্যাহত রইল বিষ্ণুপদর শ্রাদ্ধ অবধি। ন্যাড়া মাথায় ফিরে এল কলকাতায়।

তারপর একদিন অনুর ফোন, কতকাল দেখা হয় না বলুন তো! এখন কী নিয়ে ব্যস্ত আপনি বলডিং হেডের কাজ তো শেষ?

আমার বাবা চলে গেলেন।

সে তো জানি। স্যাড। আমার বাবারও খুব শরীর খারাপ হয়েছিল একদিন, জানেন! আমাদের এত ভয় হয়েছিল!

উনি এখন ভাল আছেন?

হ্যাঁ। কিন্তু কবে দেখা হবে বলুন তো! আবার তো ফুরুৎ করে চলে যাবেন বিদেশে, না?

কৃষ্ণজীবন হাসে, হয়তো যাবো।

কবে?

সামনের মাসে। বেলজিয়াম।

উঃ, পারেনও বটে আপনি ঘুরতে।

তুমি বেড়াতে ভালবাসো, না?

খুব বাসি।

আমি বেড়াতে যাই না, আমি যাই পৃথিবীটাকে বুঝতে। কত চেষ্টা করি, কিছুতেই আজও বুঝতে পারি না এ পৃথিবীটা কিরকম, এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী?

আপনি আমাকে বুঝিয়ে দেবেন।

নিজে আগে বুঝি তবে তো!

শুনুন, একটা খবর আছে।

কি খবর?

হেমাঙ্গ অ্যান্ড দিদি। বলে হি হি করে হাসে অনু।

১১২

এরকমও হয়? এইভাবেই দান উল্টে যায় পৃথিবীর? একতাল কাদার মত একটা মানুষ ছিল তার হাতে। বশংবদ, জোরে কথা কইতে জানত না, সর্বদা বিগলিত হয়ে থাকত। একটা জায়গায় শুধু শক্ত ছিল। ধর্মভয়। কিন্তু তবু তাকে ইচ্ছেমতো চালিয়েছে বীণা। ছিল অন্নদাস।

এখন সেই ছোট মানুষটা যে পাহাড় হয়ে দাঁড়াল। উচু, কঠিন, গায়ে আঁচড় বসানো যায় না।

শ্রাদ্ধের পর দিন একসঙ্গে ফিরছিল তারা। বাসে পাশাপাশি বসে। ঘটনাটা এমনি ঘটেনি। বীণা ঘটিয়েছিল। কেন ঘটাল? তার বড় ইচ্ছে হয়েছিল জানবার, নিমাইয়ের পরিবর্তন কতটা হল বা সত্যিই হল কিনা। তাই রওনা হওয়ার আগে সে গিয়ে বলল, তুমি যাচ্ছ? আমিও তো যাবো, একসঙ্গে গেলে হয় না?

নিমাই উদাস গলায় বলল, যাবে? তা কথা কি?

বাসে পাশাপাশি খানিকক্ষণ নীরবে বসে থাকার পর বীণা বলল, তোমার খুব মন খারাপ, না?

নিমাই জানালার বাইরে চেয়ে ছিল। একবার মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে নিয়ে বলল, বড় উঁচু মানুষ ছিলেন। লোকে এ সব মানুষকে ঠিক বুঝতে পারে না।

বাবা তোমাকে খুব ভালবাসত। খুব ভরসা ছিল তোমার ওপর।

হুঁ।

বীণা আর এক ধাপ এগিয়ে বলল, বাবা যে তোমার ওপর ভরসা করত তুমিও তার দাম দিয়েছ। তাই না?

নিমাই একটু চুপ করে থেকে বলল, টাকাপয়সা কামাই করার কথা যদি বলো তা হলে বলতে হয়, সে রকম ভরসা উনি করেননি। ভরসাটা ছিল সততার ওপর, ধর্মভয়ের ওপর। তার দাম দিয়ে থাকলে সেটাই কাজের কাজ হয়েছে। কত চোর ডাকাত পাজিরাও তো পয়সা কামাই করে।

বীণা হঠাৎ বলল, তুমি কি সৎ থেকেই বড়লোক হয়েছো বলো?

নিমাই মৃদু হেসে বলে, একে বড়লোক বলে না। বড়লোকের রকম আলাদা। আসল বড়লোক তুমি দেখইনি। আমার একখানা হোটেল। ভগবানের দয়ায় চলে বলে রক্ষা। আর ধাবাটা কিন্তু আমার নয়। নিরঞ্জনবাবুর। উনিই টাকা ঢেলেছেন, আমার কিছু অংশ আছে। আমাকে বলে ওয়ার্কিং পার্টনার।

আর রিক্সা অটোরিক্সা?

দুটো রিক্সা আর একখানা অটোরিক্সা আমার আছে। তাও কেন জানো? মালপত্র আনা-নেওয়ার জন্য। বাকি সময়টা সওয়ারি টানে। আমার কোনও চুরিটুরির পয়সা নেই বীণা। তোমার বাবার বিশ্বাস বৃথা যায়নি এখনও।

তবে আয়ু এখনও পড়ে আছে। যদি কখনও পা পিছলে যায় তখন এসে দুয়ো দিও।

তোমাকে দুয়ো দিলেই বুঝি আমার সুখ?

তা নয়। জানতে চাইছিলে তাই বললাম।

বীণা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, জেনে খুশিই হচ্ছি। আমার মতো তুমি নও। আমি তো পাপীতাপী মানুষ। চোরও।

কে জানে কেন নিমাই এ কথাটার প্রতিবাদ করল না। বাইরের দিকে চেয়ে রইল নীরবে।

খানিক বাদে বীণা বলল, টাকাটা তো তুমি কাকাকে ফেরত দিয়েই দিলে, তাতেও কি আমার পাপ কাটে না?

ফেরত তুমি দাওনি বীণা। তোমাকে বাঁচাতে সেই ডলার আর পাউন্ড আমি মেঝে খুঁড়ে বের করে ফেরত দিই।

কেন দিলে? কাকার কি ওতে অধিকার? কার টাকা কাকে ফেরত দিলে বলো তো! ওই ডলার আর পাউন্ড বেচে কাকা মস্ত দল করেছে জানো? চিৎপুরে ঘর ভাড়া করা হয়ে গেছে। পড়তি একজন ফিল্মস্টারকে অবধি নিয়েছে দলে। ওই টাকা তো চোরের ওপর বাটপাড়ি হল!

নিমাই ব্যথিত মুখে বলল, জানি। কিন্তু আমি কাজটা করেছি তোমাকে বাঁচাতে। কাউকে বিপদ থেকে রক্ষা করাটাই ধর্ম। কাকার দল তোমাকে মেরে ফেলত বীণা।

অত সোজা নয়। থানাপুলিস আছে। তুমি কাজটা ঠিক করোনি। ওই টাকাগুলো আজ আমার হাতে থাকলে আমিই একটা দল খুলে ফেলতে পারতাম। কাকার পরোয়া করতাম নাকি?

থানাপুলিস কাকে দেখাচ্ছ বীণা? কাকা যদি তোমাকে মারতে চাইত তা হলে কি পারত না? ও সব মানুষ দু-দশটা খুন অনায়াসে করতে পারে। পুলিস কিছু করতে পারত না। তোমার অভিজ্ঞতা নেই বলে বলছ। ও টাকা তোমার ভোগে লাগত না। বেঘোরে মারা পড়তে শুধু। তবে কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ, পগার টাকা কাকার পাওনা হয় না। সে তোমারও হয় না। শুনেছি সেটা লাল সিং-এর টাকা। কিন্তু ওয়ারিশান খুঁজে বের করে তার হাতে টাকা তুলে দেওয়ার দায় তো আমার নয়। তোমার। আমি শুধু তোমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছি।

এটাকে কিরকম বাঁচা বলে বলো তো! আমি কি বেঁচে আছি নাকি? এর চেয়ে মরলে জ্বালা জুড়োত।

তুমি কিভাবে বাঁচবে, কিভাবে বাঁচতে চাও তা তোমাকেই ঠিক করে নিতে হবে। এখন জীবনটা তোমার একার। মরলে জ্বালা থাকে না ঠিকই, কিন্তু মরা তো আছেই। জীবন না চাইলে মরণকে আর ডেকে আনতে হবে না।

অত কাঠ-কাঠ কথা বলছ কেন? আমি তো আমার মতো করেই নিজের পথ করে নিচ্ছিলাম। তুমি এসে বাগড়া দিলে। মেঝে খুঁড়ে কোথায় টাকা আছে দেখিয়ে দিলে। দাওনি?

শোনো বীণা, টাকা যে ওখানেই আছে তা আমার জানার কথা নয়। ও টাকার হদিশ আমি পেয়েছিলাম হঠাৎ করে। তুমি বলোওনি। টাকাটা তোমার হেফাজত থেকে কোথায় গেল তা কাকা ভেবে পাচ্ছিল না। তারপর তার নজর পড়ল আমার দিকে। ভাবল, ও টাকা তুমি আমাকেই দিয়েছ ব্যবসা করতে। ওপরে লোক-দেখানো ছাড়াছাড়ির অভিনয় করতে করতে আসল কাজ হাসিল করছি। আমার বদনাম হচ্ছিল।

বীণা একটু অবাক হয়ে বলে, এত কথা আমি জানতাম না তো!

জানার কথাও নয়। তুমি কাকার চোখে ধুলো দিতে ঘরে একটা ভুয়ো গর্ত খুঁড়ে রেখে বাপের বাড়ি পালিয়ে গিয়েছিলে। ওটা বড্ড ছেলেমানুষী হয়েছিল। ওভাবে কি পার পেতে? একদিন বনগাঁয়ে ফিরতেই হত। তখন কী হত বীণা?

আচ্ছা, তুমি কি আমাকে ঘেন্না করো?

হঠাৎ এ কথা কেন?

জিজ্ঞেস করছি। আমি তো চোর, পাপী, নটী। আমাকে কি আজকাল তোমার ঘেন্না হয়?

কম্বলের লোম বাছতে গেলে তো কম্বলই কাবার, ঘেন্না করাটা আমার আসে না। সে তুমি ভালই জানো।

জানতাম। কিন্তু আজকাল সন্দেহ হচ্ছে।

ঘেন্না করলে তোমার ভাত খেতাম নাকি? তোমার রোজগারে প্রতিপালন হয়েছি মা-বাপ সমেত। ঘেন্না করলে পারতুম?

তখন করতে না। এখন করো। আমি তো বলেইছি, আমার কাছে পাপপুণ্যের দাম নেই। বাঁচার জন্য আমাদের মতো মানুষকে সব করতে হয়। ভগবান বলে যদি কেউ থাকে তবে তিনি সেটা বুঝবেন। তিনিই জানেন মানুষ কেন কোন কাজ করে।

একটু হেসে নিমাই বলে, ভগবানের ওপর তোমার এত বিশ্বাস থাকলে করো যা খুশি। ওটাও একটা দর্শন হতে পারে। আমি অত জানি না, বুঝি না। আমার একটা বিশ্বাস আছে মাত্র, সেইটে নিয়ে চলি। সেটা ভুলও হতে পারে।

বীণা চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। প্রসঙ্গটা পাল্টানো দরকার। কোন কথা থেকে কোথায় গড়াল! না, সে নিমাইয়ের সঙ্গে তর্ক বা ঝগড়া করতে তো চায় না!

কিছুক্ষণ ভেবে হঠাৎ বীণা বলল, আমার আর বনগাঁয়ে পড়ে থাকার মানে হয় না।

নিমাই ধীর গলায় বলে, তবে পড়ে আছ কেন?

কোথায় যাবো বলল তো! কোন চুলোয়? থেকে থেকে ওখানেই একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু ভাবি একা একা ওখানে পড়ে থেকে কী হচ্ছে আমার!

বিষ্ণুপুরে যাবে?

বিষ্ণুপুর! সেখানে তো অবস্থা দেখে এলে! ভাইয়ে ভাইয়ে বাড়ির দখল নিয়ে কুরুক্ষেত্র হচ্ছে। দাদা আমাকে বলে গেল, তার বুড়ো বয়সে বিষ্ণুপুরে এসে থাকার সাধ ছিল। এদের কাণ্ড দেখে সে ইচ্ছে চলে গেছে। কত বড় বাড়ি, দুখানা দালান, জায়গাও কত, তবু দোতলা একতলা নিয়ে মাথা কুটে মরছে দুজনে। মেজদা চিরকালই স্বার্থপর, বউটা তো আরও। ওখানে কে থাকতে যাবে বাবা।

তা হলে কী চাও?

বীণা ঝামরে উঠে বলল, কী চাই তা জানি না।

রাগ করছ কেন? রাগের কথা বলিনি। তোমার ভালমন্দ দেখার দরকার হলে দেখব। আমার সাহায্য পাবে। আর যদি কারও সঙ্গে ঘর বাঁধো তখন তার ওপর দায়িত্ব বর্তাবে।

মেয়েরা কি নুনের পুঁটুলি? এর ওর কাঁধে ভর দেবো কেন?

নিমাই গম্ভীর মুখে চুপ করে রইল। তারপর শান্ত গলায় বলল, কী করতে চাও বীণা?

বীণা চুপ করে থাকে।

নিমাই ফের তার শান্ত গলায় বলে, ফের দল করতে চাও? সজলবাবু তো আমাকে সেরকমই বলে রেখেছিল। তুমি টাকা দিতে বারণ করেছ, ভাল কথা। কিন্তু যদি মত পাল্টাও, যদি সজলবাবুর সঙ্গে জোট বেঁধে দল করতে চাও তো আমাকে বোলো। আমার অত টাকা নেই বটে, কিন্তু কিছু দিতে পারব।

আমি দল করতে চাই না।

তা হলে কী করবে?

ভাবছি।

তা হলে ভাবো কিছুদিন। আমার সাহায্য দরকার হলে বোলো।

বীণা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বাবার শ্রাদ্ধে তুমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছ শুনলাম।

হুঁ

কেন দিলে? ওদের তো দরকার ছিল না।

দরকারের কথা তো ভাবিনি।

কাজটা ঠিক করোনি। দাদা তো খরচের কোনও কার্পণ্য করেনি। দেদার খরচ করেছে। সেজদার অবস্থাও এখন ভাল। তুমি খামোখা কেন দিতে গেলে? এই জন্যই তোমাকে লোকে আহাম্মক ভাবে।

নিমাই মৃদু গলায় বলল, আহাম্মকই তো। জন্ম-আহাম্মক। তবে আমার বড় ইচ্ছে হয়েছিল ওই মানুষটার শেষ কাজে আমারও কিছু দেওয়া থাক। আহাম্মকি হয়ে থাকলে হোক, আমার মনটা তাতে ভালই লাগছে।

বীণা পাশ-চোখে নিমাইয়ের দিকে তাকাল। লোকটা কতটা আহাম্মক সে আজ বুঝতে পারছে না। সে আজ বুঝতে পারে না একজন আহাম্মক কি করে আজ এতটা হয়ে উঠতে পারল। বীণা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

শোনো, একটা কথা।

নিমাই ধীরে মুখ ফিরিয়ে বলল, বলো।

আমার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দাও।

চাকরি আমি কোথায় পাবো?

তোমার তো অনেক চেনা।

তা আছে। তবে তারা কেউ চাকরি দেওয়ার মতো নয়।

তা হলে আমি কী নিয়ে বাঁচব?

কী নিয়ে বাঁচতে চাও? চাকরি তো বেঁচে থাকার কোনও কারণ নয়।

আমাকে তো কিছু একটা করতে হবে, নাকি?

সেটা তুমিই ভাল বুঝবে।

আমি এ রকম হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব নাকি?

নিমাই একটু হাসল। বলল, আচ্ছা, ভেবে দেখব। তেমন কাউকে পেলে বলেও রাখব চাকারির কথা।

তোমারও তো হিসেব রাখার জন্য লোকের দরকার হয়। হয় না?

হয়। তবে আমার লোক আছে। আর যাই হোক, তোমাকে নিজের কর্মচারী বানানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কেন, আমি তোমার কর্মচারী হলে ক্ষতি কী? সম্পর্কটা নতুন রকমের হবে। মালিক কর্মচারীর।।

বীণা হাসল, কিন্তু নিমাই হাসল না। বলল, সম্পর্কটার আর দরকার কি? তোমার যাতে গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্টটা না হয় তা আমি দেখব বীণা।

সম্পর্কটা তুমি চাও না?

নিমাই চুপ করে জানালার বাইরে চেয়ে রইল।

বীণা তেতো গলায় বলল, তুমি ভাবো যে সজলের সঙ্গে আমি...?

নিমাই আস্তে করে মুখ ফেরাল। বলল, আর হয় না বীণা। আর হয় না।

কিছু হওয়াতে বলিনি। একটা চাকরির কথা বলেছি।

আমার চাকরি কেন করবে?

আচ্ছা বাবা, তোমার নয়, আর কারও চাকরি তো হতে পারে!

না, তাও পারে না। তোমার ক্ষমতা ছিল অভিনয়ের, তা ছাড়া আর কোনও কাজে তো তোমার অভিজ্ঞতা নেই। চাকরির বাজার খুব খারাপ বীণা। সহজে হয় না।

আমি যে পাগল হয়ে যাচ্ছি।

নিমাই তার দিকে ধীরে ফিরে তাকাল। তারপর বলল, কেন পাগল হচ্ছ বীণা? তোমার কষ্ট কিসের?

সে তুমি বুঝবে না। কোনওদিন আমার কষ্ট বুঝেছ?

ব্যথিত গলায় নিমাই বলে, বুঝেছি। তোমার কষ্ট নিজের চোখে দেখেছি। না বুঝে উপায় ছিল না।

তা হলে আজ বুঝছ না কেন? আমি যে মনে মনে ভিখিরি হয়ে গেছি, সেটা বুঝতে পারছ?

না, তা পারছি না। তোমার যাত্রার দলের কাজটা নেই, এটাই কি বড় কথা?

সেটাই বড় কথা। সেটা যে কত বড় কথা তা তুমি বুঝবে না।

নিমাই দু'ধারে মাথা নেড়ে বলল, না, আমি তা বুঝব না বীণা। আমার বুঝবার মতো মন নেই। তবে একটা কথা বুঝি। তুমি অভ্যাসের দাস হয়ে যাচ্ছ। যাত্রার দলের যে জীবন তার রকম আলাদা। বড্ড বারমুখী করে দেয় মানুষকে। ও রকম কি ভাল বীণা?

উপদেশ দিতে শুরু করলে নাকি?

না, তা কেন? উপদেশ নয়। ভেবে দেখতে বলি। শান্ত হও, মাথা ঠাণ্ডা করো, তারপর ভাবো।

মাথা ঠাণ্ডা থাকছে না। মাথা ঠাণ্ডা রাখাই কঠিন।

এত বড় একটা শোক পেলে, সেটাও তো একটা ক্রিয়া করবে!

শোক! ওঃ, তুমি বাবার কথা বলছ?

হ্যাঁ।

বীণা যেন একটু দ্বিধায় পড়ে গেল। তারপর বলল, হঠাৎ বাবার কথা তুললে কেন? বাবার মরার সঙ্গে আমার অবস্থার সম্পর্ক কী?

বলছিলাম, এ সময়টায় অত উত্তেজিত হতে নেই। শোক মানুষকে শান্ত সমাহিত আত্মমুখী করে দেয়। দেয় না?

আমি অতসব জানি না। বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক কী ছিল বলো তো! আমার বাপু অত সেন্টিমেন্ট নেই।

তাই দেখছি।

বীণা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, শোননা, আমার সঙ্গে কিন্তু সজলের কোনও সম্পর্ক নেই। ও তোমাকে যা বলেছে বানিয়ে বলেছে।

নিমাই একটু অবাক হয়ে বলল, সবটা বানিয়ে?

বীণা একটু লজ্জা পেয়ে বলে, সে রকম ভাব নয়। ও হয়তো চেয়েছিল, আমি চাইনি।

সজলবাবু বেকার, আমি জানি। যদি বেকার না হতেন তা হলে কী করতে বীণা?

কী আবার করতাম! কিছুই করতাম না।

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, মানুষটি জোচ্চোর নয়, ঠকবাজ নয়, মানুষটি ভালই। তোমার দুর্দিনে তোমার পাশেই থেকেছেন। শুনলাম তোমার জন্য মারধর খেয়ে হাসপাতালেও যেতে হয়েছিল। মানুষটিকে অমন তাচ্ছিল্য করছ কেন? ওটা ভাল নয়।

বীণা থতমত খেয়ে বলল, তাচ্ছিল্যও করছি না। তোমার ভুল ভেঙে দিচ্ছি। তুমি একটা কিছু ধরে নিয়েছ। সেটা যে সত্যি নয় তাই বলতে চাইছি।

চাকদহে বীণার নেমে যাওয়ার কথা। চাকদহ এসে গেল। বীণা হঠাৎ বলল, হ্যাঁ গো, আজ বনগাঁয়ে চলো না!

নিমাই অবাক হয়ে বলে, বনগাঁয়ে? কেন?

অনেকদিন বাদে চলো না আমার ঘরটায়। দুজনে গল্প করব। সেই পুরনো দিনের মত।

নিমাই হাসল। মাথা নেড়ে বলল, পাগল! আমার কত কাজ পড়ে আছে।

এক দিনে আর কীই বা ক্ষতি হবে? হলে হোক। একবারটি পুরনো দিনের মতো চলো না দুজনে একটু একসঙ্গে হই।

নিমাই মৃদু মৃদু হেসে বলল, এ রকম হয় না বীণা। এ রকম হতে নেই।

কেন নেই?

তোমার আর আমার পথ আলাদা হয়ে গেছে।

তুমি আমাকে একসময়ে কী ভীষণ ভালবাসতে! আজ তার কিছু অবশিষ্ট নেই।

সবটাই আছে। আমার মতো মঙ্গলাকাঙক্ষী তোমার কেউ নেই।

তা হলে?

তোমার ভাল চাই বলেই এই প্রস্তাবে রাজি হলাম না বীণা। সম্পর্ক কখনও এত তরল হওয়া ভাল নয়। এত অবিবেচকের মতো হওয়া উচিত নয়।

কেন ও কথা বলছ?

স্বামী আর স্ত্রী এ বড় কঠিন সম্পর্ক বীণা। অনেক পরীক্ষায় পাস করে তবে স্বামী-স্ত্রী। আমরা পাস করিনি যে!

কী যে বলো, বুঝতেই পারি না।

আবার দেখা হবে বীণা। তখন বুঝিয়ে বলব। তবে আমি যেমন বুঝি। তোমার হয়তো ভাল লাগবে না।

বীণা বনগাঁয়ের বাস ধরতে নেমে পড়ল। নেমে পড়েই হঠাৎ তার মনে হল, বিশ্বজোড়া খাঁ-খাঁ করছে একটা একাকিত্ব। কী সাঘাতিক একা সে!

সন্ধের পর কুসুম এল।

বীণাদি, কেমন হল বাবার কাজ?

অন্যমনস্ক বীণা বলে, ভালই।

নিমাইদার সঙ্গে দেখা হল?

হ্যা, একসঙ্গে চাকদা পর্যন্ত এলাম।

সত্যি! ভাব হয়ে গেল বুঝি?

না রে।

বলো কি?

বীণা মাথা নাড়ল, তোর নিমাইদা আর সেই নিমাইদা নেই। পাত্তাই দিল না।

যাঃ।

বীণা চোখের জল চাপতে পারল না। একটু চুপ করে থেকে বলল, আজ সে শোধ নিচ্ছে।

নিমাইদা তেমন লোকই নয়।

সে খুব ভাল লোক কুসুম, আর আমি খুব খারাপ। এই তো! তোর দুনিয়াটা সহজ সাদা-কালোয় ভাগ করা। বেশ তাই-ই মানছি।

রাগ করলে নাকি? কী হয়েছে বলো না!

বীণা কিছু বলল না। চুপ করে রইল।

১১৩

মণীশের শরীর খারাপ হয়েছিল এ খবরটা বুবকাকে পাঠানো হয়েছিল খুব সতর্কতার সঙ্গে, পুজোর ছুটির আগে। যাতে বুবকার পড়াশোনার ক্ষতি না হয়। চিঠি পেয়েই বুবকা ট্রাংক কল করল এক সন্ধেবেলায়। সেই সরল বালকের মতো গলা এখনও।

বাবা কেমন আছে মা? আমাকে আগে কেন জানাওনি?

ওরে, তেমন কিছু নয়। এখন ভাল আছে।

কেমন ভাল? হাড্রেড পারসেন্ট?

হ্যাঁ। অফিসে যাচ্ছে তো।

তোমাকে বলে দিচ্ছি মা, বাবার শরীর খারাপ হলেই আমাকে খবর দেবে। আমার পড়ার ক্ষতির কথা ভেবো না। ওসব আমি মেকআপ করে নেবো।

আমরা তো আছিই তোর বাবাকে ঘিরে! চিন্তা কিসের?

বাবার জন্য আমার ভীষণ টেনশন হয়। আচ্ছা মা, বাবা কি পারমানেন্ট হার্ট পেশেন্ট হয়ে গেল?

না, তা কেন? সাবধানে থাকলে সেরে যাবে। ডাক্তার বলেছে ভয়ের কিছু নেই।

বাবা কি বাড়ি ফিরেছে?

না তো।

এত দেরি হয় কেন ফিরতে?

একটু বাদেই ফিরবে, রোজ যেমন ফেরে।

আমি আর তিন-চার দিনের মধ্যেই আসছি। কিপ হিম ফিট অ্যান্ড ফ্রেশ।

আচ্ছা রে আচ্ছা।

আধ ঘন্টা বাদে মণীশ ফিরল। স্মিতমুখে বুবকার ফোন করার কথা শুনল। বলল, তোমার কী যে দুর্বুদ্ধি অপু! কেন ওকে আমার অসুখের কথা জানাতে গেলে? ওর কত পড়ার চাপ বলো তো! আমার তো এমন কিছু হয়নি যে জানাতে হবে!

অপর্ণা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, এমনিতে জানাতাম না। কিন্তু পুজোয় তোমার সবাইকে নিয়ে কুলু-মানালি যাওয়ার কথা না? বুবকা হয়তো আশা নিয়ে আসবে, হয়তো বন্ধুদের কাছে গল্পও করবে। যাওয়াটা যে হচ্ছে না তা জানিয়ে দিলাম।

মণীশ অবাক হয়ে বলল, যাওয়া হচ্ছে না কে বলল? কেনই বা যাওয়া হবে না? যাওয়া-আসার রিজার্ভেশন কবে হয়ে গেছে।

অপর্ণা গম্ভীর হয়ে বলে, যাওয়া যে হচ্ছে না তার একটা খুব সহজ সরল কারণ আছে।

কি কারণ অপু?

আমি যেতে দিচ্ছি না।

মণীশ ব্যথিত মুখে বলে, কেন অপু? আমার তো কিছু হয়নি। ভাল আছি। ছেলেটা আশা করে আসবে। ছেলেটার কত খাটুনি যাচ্ছে, ওর একটু রিলিফ হত।

ওর বয়স পড়ে আছে। সারা দুনিয়া চষে বেড়াতে পারবে। কিন্তু তোমাকে আমি এই শরীরে কিছুতেই ঘরের বার হতে দেবো না।

মণীশ একটু হেসে বলে, এভাবে বাক্সে পুরে রাখতে চাও? সেটাই কি বেঁচে থাকা?

বেঁচে থাকো তো আগে, বেড়ানো অনেক হয়েছে। বেঁচে থাকলে আরও হবে। নিশিপুরের ধকলেই কেমন বিগড়ে গিয়েছিলে বলল তো। এখন দৌড়ঝাঁপ একদম বন্ধ।

খুব হতাশ করে দিলে ভাই। টিকিটগুলো কাটা ছিল। এই পুজোর বাজারে কনফার্মড টিকিট। তিন মাস আগে কেটে রেখেছিলাম।

কালকেই টিকিট ফেরত দাও।

করুণ মুখ করে মণীশ বলে, আর একবার ভেবে দেখ। আমি না হয় গিয়ে হোটেলের ঘরেই বসে থাকব, তোমরা ঘুরে বেড়িও।

অপর্ণা একটু ধমকের গলায় বলে, আচ্ছা, কী আছে বলো তো ওসব জায়গায়? পাহাড় পর্বত আর প্রকৃতি তো? রাজ্যের লোক সেখানে গিয়ে জুটছে প্রত্যেক সিজনে। এমন কিছু রিমোট বা নতুন জায়গাও নয়। আমরা তো ঘুরে এসেছি একবার।

তখন বুবকা ছোট ছিল। ওর মনে নেই।

বড় হলে আবার যাবে। যদি ওর ইচ্ছে হয়।

মণীশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কথাটা তুমি বোধ হয় ঠিকই বলেছ। নির্জন, দুর্গম, অচেনা বলে আর কোনও জায়গাই থাকছে না। সর্বত্র পিলপিল করে লোক যাচ্ছে। এমন কি এভারেস্টে এত লোক উঠছে যে তাদের ফেলে আসা আবর্জনা আর কৌটো-বাউটোয় নাকি এভারেস্টই এখন আস্তাকুঁড় বলে স্বয়ং এডমন্ড হিলারি দুঃখ করেছেন। তা হলে এবারটা বাদ দিতে বলছ?

নিশ্চয়ই।

কাছেপিঠে কোথাও?

হ্যাঁ, গাড়ি করে একদিন দুদিনের জন্য বেরোতে পারি। তাও কাছেপিঠে। দূরে কোথাও নয়।

মণীশ একটু হাসল। বলল, তথাস্তু। তুমি হলে সুপ্রিম কোর্ট, তোমার ওপর তো কথা চলে না। কিন্তু তোমাকে বলি, এবারে কিন্তু আমার হার্টের প্রবলেম ছিল না। ডাক্তার তো বলেইছে পেটে গ্যাস জমে ওপর দিকে প্রেশার দিয়েছিল বলে ওরকম হয়েছিল।

হয়তো তাই। হয়তো নিশিপুরে যাতায়াতের ধকলটা তোমার সহ্য হয়নি।

মণীশ মাথা নেড়ে বলে, না না, তা নয়। নিশিপুর এমন কিছু দুর্গম জায়গা তো নয়।

বিচ্ছিরি জায়গা। খাড়া খাড়া পাড় বেয়ে নামা ওঠা, তার ওপর ভটভটির ডিজেলের গন্ধ, ভাঁটির সময় কাদা। মাগো! কি করে যে ওরকম জায়গা হেমাঙ্গ বেছেছিল ও-ই জানে!

শুনলে বেচারা দুঃখ পাবে।

পাক। ওর ঘাড় থেকে নিশিপুরের ভূত নামানো দরকার।

মণীশ হাসল, সবাই কি তোমার চোখ দিয়ে দুনিয়াটা দেখে? যার কাছে যা সুন্দর লাগে তা লাগতে দেওয়াই তো ভাল। কেন বেচারার নিশিপুর তুমি কেড়ে নিতে চাও?

কেন চাই? সে তুমি বুঝবে না। বলে অপর্ণা একটু মুখ টিপে হাসল।

বুবকার যেদিন আসার কথা সেদিনই একটু বেলার দিকে এল আপা। তার তেমনই শীর্ণ চেহারা। তেমনই অমনোযোগী পোশাক। তেমনই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখশ্রী। এসেই বলল, অনীশ এখনও আসেনি? আমাকে যে চিঠি দিয়েছিল আজ, শনিবার আসবে। আমি যেন অবশ্যই আসি!

মণীশের আজ ছুটির দিন। ছুটি না থাকলেও সে আজ ছুটি নিত। আজ বুবকা আসবে, আজ একটা বিশেষ দিন। সে হেসে বলল, বুবকা এসে যাবে আপা। তুমি ঘরে এসে বোসো। কতকাল পরে এলে! তোমার নতুন সব অ্যাডভেঞ্চারের কথা বলবে না আমায়?

আপা হতাশার সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, আমার দ্বারা ডাক্তারি পড়া হবে না কাকাবাবু। আমি খুব হতাশ।

দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রীর মুখে হতাশার কথা শুনতে আমি রাজি নই আপা। এসো, তোমার প্রবলেমটা শুনি।

ওঃ, আমার যে কত সমস্যা কাকাবাবু। যেখানে যাই সেখানেই সমস্যা চোখে পড়ে। সবাই আমাকে কী বলে জানেন? বলে, আপা ইনভাইটস্ প্রবলেমস্।

ঘরে এসে আপা ডাইনিং টেবিলের পাশের চেয়ারে বসল। তাকে দেখতে রান্নাঘর থেকে অপর্ণা, অন্য দুই ঘর থেকে অনু আর ঝুমকি বেরিয়ে এল। সকলের কাছেই আপা এক কৌতূহলের বস্তু। সে যে কখন কী করে বসে তার তো ঠিক নেই।

বাতাসটা একটু শুঁকে নিয়ে আপা বলল, উঃ, আজ তো দারুণ সব রান্না হচ্ছে কাকিমা! নিশ্চয়ই ফ্রায়েড রাইস বা বিরিয়ানি! আর মুর্গি বোধ হয়?

অপর্ণা হেসে ফেলে বলে, তা হচ্ছে। বহুদিন বাদে বুবকা আসছে তো। তুমি আজ খেয়ে যাবে কিন্তু।

আপা একগাল হেসে বলে, আমার পাকস্থলী কতটুকু জানেন? একটা পিংপং বলের মতো ছোট। আমি তো একটুখানি খাই। তার ওপর আমরা কট্টর তামিল ব্রাহ্মণ, মাছ মাংস খাই না।

ওঃ, তাই তো! আমার মনে ছিল না। কিন্তু কোনও অসুবিধে নেই। নিরামিষ পদও অনেক হচ্ছে।

ঝুমকি বলল, আমি দোসা ইডলি সব বানাতে পারি। খাবে?

মাথা নেড়ে আপা বলে, ইডলি দোসা লাগবে না। আমরা কলকাতায় থাকতে থাকতে খাদ্যাভ্যাস অনেক পাল্টে ফেলেছি। সাদামাটা বাঙালি খাবারও চলবে।

'খাদ্যাভ্যাস কথাটা শুনে মণীশ হাসল, তুমি এখনও সাধু বাংলায় কথা বলল। ফুড হ্যাবিট না বলে খাদ্যাভ্যাস বললে। ভাল লাগল।

ইংরিজিটা আমি সহজে বলি না। একটা দুটো বলে ফেললে কী করি জানেন? ক'টা ইংরিজি বলেছি তা হিসেব করে রাতে শোওয়ার সময় ততবার নিজের কান মলে দিই।

সবাই খুব হাসল।

আপা ম্লান মুখে বলল, একটু আগেই কিন্তু বলেছি ইংরিজি।

কী বলেছ?

বলেছি, আপা ইনভাইটস্ প্রবলেমস্। দু'বার কানমলা পাওনা হয়েছে।

হাসতে হাসতে মণীশের মনটা অনেকটা হালকা হয়ে গেল। বলল, তুমি ইমপসিবল। কিন্তু প্রবলেমটা কি?

সমস্যা কি একটা কাকাবাবু? আর যত সমস্যা সব আমার এই পোড়া চোখেই পড়বে। ডাক্তারি পড়ছি তো, ডাক্তারির প্রথম কথাই হচ্ছে পরিচ্ছন্নতা, জীবাণুমুক্ত পরিবেশ, শান্তি, নিস্তব্ধতা—না হলে রুগী ভাল থাকবে কি করে বলুন! আমাদের হাসপাতালগুলো ত আপনি জানেন!

মণীশ যেন শিউরে উঠে বলে, নরক। যখন প্রেস ফটোগ্রাফার ছিলাম তখন কলকাতার হাসপাতাল নিয়ে একটা ফটো-ফিচার করেছিলাম। বীভৎস।

সত্যিই তাই কাকাবাবু। টয়লেট থেকে শুরু করে বিছানাপত্র, খাবারদাবার সব কিছু এত খারাপ যে আমার মাথাটাই খারাপ হওয়ার জোগাড়।

অনু বলল, এই আপাদি, তুমি কিন্তু এইমাত্র টয়লেট বলেছ।

আপা হাসল, জানি। এই দেখ কড় গুনছি ক'টা হল। বলে সত্যিই আঙুল দেখাল আপা। কড়ে আঙুলের তিন নম্বর কড়ের ওপর বুড়ো আঙুলটা দেখে সবাই ফের হেসে খুন।

অপর্ণা বলল, আহা ইংরিজি বললে কী হয়? কত শব্দ তো ইংরিজি ছাড়া নেই। ইনজেকশনকে কী বলবে?

ওটার বাংলা আছে কাকিমা। সূচিকাভরণ।

অপর্ণা হেসে ফেলে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে ছিল না। কিন্তু সূচিকাভরণ বললে কেউ কি বুঝবে?

আমি চালু করে দিয়েছি। তবে সূচিকাভরণ নয়। হিন্দিতে পুঁইয়া বলে, বাংলা করেছি ছুঁচ। রুগীকে বলি, এবার আপনাকে ছুঁচ দেওয়া হবে। প্রথম প্রথম অবাক হত। এখন হচ্ছে না।

উঃ বাবা, তুমি অদ্ভুত মেয়ে। অথচ বাংলা তো মাতৃভাষা নয়।

ওটাই তো ভুল কাকিমা। কে বলল বাংলা আমার মাতৃভাষা নয়? ভারতের সব ভাষাই আমার মাতৃভাষা। আমি সব কটা ভাষা শিখবার চেষ্টা করছি।

মণীশ বলল, তুমি বোধ হয় পেরেও যাবে। তারপর তোমার প্রবলেমের কথা বলল।

তাই তো বলছি। হাসপাতালে কাজ করতে গিয়ে এসব দেখে মাথা খারাপ হয়ে গেল। ঝাঁটা বালতি নিয়ে পায়খানা, কলঘর পরিষ্কার করে ফেললাম একদিন। রুগীদের বিছানার চাদর পাল্টে দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। তারপর হামলা চালালাম রান্নাঘরে, এসব কী খাবার দেওয়া হচ্ছে?

সঙ্গে অন্য ছেলেমেয়েরা ছিল? তাদের সাপোর্ট পেয়েছ?

প্রথমে নয়। সবাই ভয় পেত। নতুন এসেছে তো, ব্যাপারটা বুঝতে সময় নিচ্ছিল। পরে অবশ্য দু-চারজন করে সমর্থক পেয়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু লেগে গেল ধাঙর মেথর ঝাড়ুদার ওয়ার্ডবয়দের সঙ্গে, তারপর

সুপারের সঙ্গে, তারপর কায়েমী স্বার্থের লোকজন—অথাৎ ঠিকাদার, সাপ্লায়ারদের সঙ্গেও। অনু, আমি হিসেব রাখছি, আরও তিনটে হল। ওয়ার্ড বয়, সুপার আর সাপ্লায়ার।

অনু বলল, কিন্তু এগুলোর তো বাংলা হয় না আপাজি, এগুলো ক্ষমা করা যায়।

সাপ্লায়ারের বাংলা হতে পারে সরবরাহকারী। সুপারের হতে পারে তত্ত্বাবধায়ক। ওয়ার্ডবয়েরও বাংলা হয় বোধ হয়—না মনে পড়ছে না এখন। একটা কী যেন কড়েছিলাম। যাকগে, এসব করতে গিয়ে লেখাপড়া মাথায় উঠল। কর্তৃপক্ষ তাড়ানোর হুমকি দিতে লাগল। নিম্নবর্গীয় কর্মীরা একদিন কাজ করল না। তাদের দাবি, আপাকে সরাতে হবে।

তারপর?

খুব অশান্তি গেল কয়েকদিন। আমি খুব গলাবাজি করলাম। ঠেলা ধাক্কা খেলাম। যারা পেশাদার রক্তদানকারী তারাও একদিন চড়াও হল। শুনছি, আমার নামে মন্ত্রীর কাছে নালিশ গেছে। আমি ভয় পাচ্ছি না। কিন্তু ভাবছি, এসব করে কিছু হবে না কাকাবাবু। সবাই মিলে, অর্থাৎ শহরের সব লোক মিলে যদি হাসপাতালগুলিতে হানা দেওয়া যায় মাঝে মাঝে তাহলে হয়তো হয়। সরকার তো কিছু করতে পারে না। কোনও ক্ষমতাই নেই।

কেন পারে না আপা?

সরকার তো দেশটার সব ডাইমেনশন দেখতে পায় না। তার দেখাটা হয় একবগ্গা, একপেশে। তারপর সরকার চালায় রাজনীতি এবং দল। দল মানেই চোখে রঙিন চশমা, দলের গাইডলাইন মেনে বিচার বিবেচনা সিদ্ধান্ত করতে হয়। তাই নিরপেক্ষতা থাকে না। রাজনীতিকে চলতে হয় দুর্নীতিবাজদের কাঁধে ভর রেখে। কী করে কী হবে কাকাবাবু? সরকার তো কত নীতি বানায়, আইন বানায়, সেগুলো হয়তো খুব ভালও। কিন্তু মানুষ যে সেসব আইন বা নীতির খবরই রাখে না, হাসপাতালের রুগী কি জানে যে তার কতটা পাওনা আর কতটুকু তাকে দেওয়া হচ্ছে? তার বিছানার চাদর কেন পাল্টানো হয় না, তাকে কেন বেডপ্যান দেওয়া হয় না, কেন শৌচাগারগুলো অমন নোংরা, এসব নিয়ে প্রশ্নই নেই তাদের।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মণীশ বলে, সব জানি আপা। সব জানি। তুমি একটু সাবধান থেকো। অর্গানাইজড না হয়ে ভীমরুলের চাকে ঢিল মারা ঠিক নয়।

আপা নির্বিকার মুখে বলে, আমি কাউকে শত্রু বা প্রতিপক্ষ বলে ভাবি না কাকাবাবু। আমি এদের বোঝানোর চেষ্টা করি যে, ইচ্ছে করলেই হাসপাতাল অনেক পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, রুগীদের অনেক আরাম দেওয়া সম্ভব। কিন্তু কেউ নিজেকে পাল্টাতে চায় না, যা হয়ে আসছে, যা চলে আসছে তার পরিবর্তন করতেও কেউ রাজি নয়। তারা বলে, এত রুগীর ভিড়, জায়গা নেই, ডাক্তার বা ওষুধের অভাব, মাইনে কম। সব সত্যি। তবু ওর মধ্যেই করা যায়। এদেশে কেউ তো যথাসাধ্য করে। না। সবাই গা-ছাড়া ভাব। আমি তাদের উৎসাহ দিতে চেষ্টা করি মাত্র।

মণীশ মাথা নেড়ে বলে, তবু সাবধান থেকে আপা। টেক গার্ড।

আপা স্নিগ্ধ হেসে বলল, আমি একটা রোগা দুর্বল মেয়ে কাকাবাবু। আমাকে ক'জন মারবে? ক'বার মারবে? সবাই যে কেন আমাকে মারবে বলে হুমকি দেয় সেটাও বুঝি না। আমাদের হাসপাতালের একজন গুণ্ডা ধরনের লোক আমাকে শাসাতে এসেছিল, আমি তাকে বললাম, আপনি আমার চেয়েও দুর্বল। কারা মারতে

চায় জানেন? যাদের নিজেদের সাফাই গাওয়ার মতো যুক্তি নেই, যারা ধরা পড়ার ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে, যারা অসৎ এবং দূর্বল। লোকটা আমাকে চড় তুলেছিল। অন্যরা ধরে ফেলায় মারতে পারেনি।

ট্যাক্সি থামল বাইরে। হইহই করতে করতে ঘরে এসে ঢুকল বুবকা। সঙ্গে সুটকেস-বিছানা আর দুজন বন্ধু। মুখে এক গাল হাসি।

মা! বাবা! মিট ভাস্কর অ্যান্ড পথিক। ওদের সময় নেই। আমাকে নামিয়ে ওরা একজন টালিগঞ্জ আর অন্যজন বেহালা যাবে। জাস্ট সে হ্যালো। ওঃ আপা! গ্রেট প্লেজার। হাই দিদি! হাই অনু!

বন্ধুরা খুব তাড়াহুড়ো করেই চলে গেল। তারপর বুবকা ছেলেমানুষের মতো জড়িয়ে ধরল মণীশকে।

কী হয়েছিল বাবা তোমার?

মণীশ বুবকার মাথাটা কাঁধে চেপে ধরে বলল, কিছু নয়। আই অ্যাম ফাইটিং ফিট।

তুমি যদি এরকম আর করো তাহলে আমি পড়া ছেড়ে চলেই আসবো বলে দিচ্ছি।

মণীশ একটু হাসল। বুবকার গা থেকে পুরুষ মানুষের মতো তাপ ও গন্ধ আসছে'না? কোমল দাড়ি ও গোঁফে সমাচ্ছন্ন ছিল মুখ। এখন দাড়ি কামাচ্ছে। গোঁফ রাখছে। বুবকা এখন যুবক। পরিপূর্ণ মানুষ।

অপর্ণার মুখ খুশিতে উপচে পড়ছে। দুটি বোনের মুখ উজ্জ্বল। বাড়ির অনুপস্থিত একজন লোক ফিরে এলে যেন নিজের অস্তিত্বেরই একটি হারানো অংশ ফিরে আসে।

সকলকেই একটু একটু ছুঁয়ে দেখল বুবকা। তারপর আপার দিকে চেয়ে বলল, আপা, আই অ্যাম মিসিং অল ফ্রেন্ডস ভেরি মাচ। আমরা চারজন আই আই টিতে, তুমি ডাক্তারিতে, সঞ্জয় আর সিংজী যাদবপুর ইলেকট্রিক্যালসে। কোথায় কোথায় ছড়িয়ে পড়লাম আমরা। অল সেপারেটেড। একটা গেট টুগেদার অ্যারেঞ্জ করো না!

আপা মাথা নেড়ে বলল, আমার সঙ্গে প্রায় সকলেরই যোগাযোগ আছে। সহজে করা যাবে। ওখানে নতুন বন্ধু-বান্ধব কেমন হল?

অনেক। তবে পড়ার চাপ আছে। বেশি আড্ডা হয় না। তবে তোমার কথা আমরা খুব বলি। তোমার নতুন অ্যাডভেঞ্চারের কথা বলো আপা।

আপা একটু হাসল, কাকাবাবু আর কাকিমার কাছে শুনে নিও। আমি এখন চলে যাবো অনীশ, অনেকদিন বাদে তুমি বাড়ি এসেছ, একজন বাইরের লোক বসে থাকলে তোমাদের ছন্দ কেটে যাবে।

অপর্ণা হাঁ হাঁ করে উঠল, বলে কী রে মেয়েটা? এই যে বললাম খেয়ে যাবে। তুমিও তো রাজি হলে।

মুখখানা ম্লান করে আপা বলে, আমাকে খাইয়ে আপনি খুশি হবেন না কাকিমা, আমি যে খেতেই পারি না।

সে জানি। তোমাকে খাইয়ে দেখেছিও, তবু একটু কিছু মুখে দাও। সাদা ভাত আর পটলের কারি আছে।

দিন তবে ছোট্ট করে। হাসপাতালে একটা পোড়া রুগী আছে। শতকারা পয়তাল্লিশ ভাগ পোড়া। সতেরো-আঠেরো বছর বয়সের ফুটফুটে মেয়ে। সে আমাকে খুব খোঁজে। তার জন্যই এখন যেতে হবে।

অপর্ণা ছলছলে চোখে বলে, আহা রে। বাঁচবে তো?

ঠোঁট উল্টে আপা বলে, কে বলতে পারে কাকিমা? পয়তাল্লিশ ভাগ পোড়া তত ভাল হওয়াই উচিত। কিন্তু সেরকম যত্ন যদি পায়। নইলে দ্বিতীয় সংক্রমণে মরে যাবে। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি বাঁচানোর।

একটু অবাক হয়ে অনীশ বলল, আপা, আজকাল যে বঙ্কিমী ভাষায় কথা বলছ?

চেষ্টা করছি। তুমিও শুরু করে দাও। মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করলে দাঁড়ানোর জমি পাবে না। বাঙালিরা বড্ড তাড়াতাড়ি আন্তর্জাতিক হয়ে যায়। তাই তাদের শক্তি কম।

ও বাবা, তুমি তো আরও পেকেছ দেখছি। আগে তবু মাসিমা গোছের ছিলে, এখন তো দেখছি পুরো দিদিমা।।

একটু হাসাহাসি, আরও কিছু খুনসুটির পর আপা তার চড়াইপাখির মতো খাবারটা শেষ করে উঠে পড়ল। বলে গেল, তোমার পুনর্মিলনের ব্যাপারটা সংগঠিত করছি। দেখা হবে।

নাঃ, তোমার সঙ্গে কথা বলতে হলে এখন থেকে বাংলা ডিকশনারিটা হাতে নিয়ে বসতে হবে দেখছি।

মণীশ বলে, ওকে ঠাট্টা করিস না বুবকা, ও যে একটা মিশন নিয়ে চলে, সেটা তো কম কথা নয়। আজকাল পাবি ওরকম মেয়ে?

বুবকা একটু গম্ভীর হয়ে বলে, তা ঠিক বাবা। আমরা ওকে ঠাট্টা করলেও ভীষণ রেসপেক্টও করি। আমি তো বলিই, আপার মতো এমন মহৎ বন্ধু আমার আর নেই।

অনু আর ঝুমকি মিলে বুবকার বাক্স-বিছানা খুলে ফেলছিল। ঝুমকি চেঁচিয়ে উঠল, এঃ মা! জামাকাপড় কিরকম নোংরা করে এনেছে, দেখ মা!

অনু বলল, বিছানার চাদর আর বালিশের কভার দেখ মা, একদম স্লাম ডুয়েলারদের মতো।

তুই কী রে বুবকা?

বুবকা হেসে বলে, না না, রেগুলার কাচি। এবার বাড়িতে আসব বলে গত দশ বারো দিন সব জমিয়ে রাখছিলাম।

অপর্ণা বলল, আচ্ছা থাক না, কেচে দেওয়া যাবে। ও কি কখনও কাচাকুচি করেছে? এই তো সবে হাতেখড়ি। হ্যাঁ রে, তোদের হস্টেলে লন্ড্রি নেই?

ধোবি আছে। তবে আমি নিজেই কেচে নিই। ধোবি শুধু মাঝে মাঝে ইস্তিরি করে দেয়।

সারা দিন গল্পে গল্পে কেটে গেল। বিকেলে বুবকা তার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গেল। একটু বেশি রাতের দিকে সবাই শুয়ে পড়লে বুবকা হানা দিল দিদির ঘরে।

অ্যাই দিদি, ঘুমোচ্ছিস?

ঝুমকি জেগেই ছিল। উঠে বসে মায়াভরা গলায় বলল, আয়। বোস এসে।

বুবকা ঝুমকির চেয়ারটায় বসল। বিছানায় ঝুমকি।

হ্যাঁ রে দিদি, তোর নাকি বিয়ে হয়ে যাবে?

যাঃ। কে বলল?

অনু বলছিল।

অনুটা খুব পেকেছে দেখছি।

ও তো বলছিল সব ঠিকঠাক। শুনে আমার এত মনটা খারাপ হয়ে গেল, বাড়ি এসে তোকে দেখতে পাবো না ভাবতেই পারি না। আচ্ছা, বিয়ের পর মেয়েদের পদবী-টদবী সব চেঞ্জ হয়ে যায় এটা কিরকম নিয়ম বল তো! তোর সব পরিচয় মুছে যাবে নাকি?

বাজে সব নিয়ম। কে যে করেছিল!

আচ্ছা দিদি, আর ইউ ইন লাভ? সত্যি করে বল তো! আমাকে ছুঁয়ে বল।

উঃ, তোকে নিয়ে আর পারি না। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। কোথায় কী!

অনু এমনভাবে বলল যে বিয়ে হুট করে হয়ে যাবে। হেমাঙ্গদাকে আমি দু-একবার দেখেছি অবশ্য। এ পারসোনেবল ম্যান।

ঝুমকি মুখটা একটু ঘুরিয়ে নিল। বলল, এখনও কিছু ঠিক নেই।

কেন ঠিক নেই?

ঝুমকি হঠাৎ মুখটা তুলে বুবকার দিকে চেয়ে বলল, বোধ হয় আমার পক্ষে ও একটা ভুল লোক।

ভুল লোক? তার মানে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঝুমকি মাথা নেড়ে বলে, জানি না। ও মেয়েদের ভয় পায়। একা থাকতে ভালবাসে। নানা রকম খেয়াল নিয়ে চলে।

বাট হি ইজ এ নাইস ম্যান। ভদ্র, বিনয়ী, আন্তরিক।

সেটা তো সবাই বলে।

তোকে প্রোপোজ করেছে?

না। প্রোপোজ করতেই তো ভয়।

তাহলে অনু যে বলল, ভদ্রলোক তোর জন্য পাগল!

অতটা নয়। তবে কিছু সফটনেস আছে হয়তো।

তোর?

আমার! না, আমার তেমন কিছু ব্যাপার নেই।

তুই রাজি নোস?

তাও জানি না।

লোকটাকে তোর ভাল লাগে?

ঝুমকি একটু ভেবে বলল, সেটা তো প্রেম নয়।

তাহলে কী রে দিদি?

ঝুমকি হেসে ফেলল, তুই সেই ছেলেমানুষটাই রয়ে গেছিস।

কেন রে?

এখনও ভারি সহজ সরল আছিস তুই। নইলে এভাবে জিজ্ঞেসই করতে পারতি না।

বুবকা হাসল, বিয়েটা করেই ফেল দিদি। এ লোকটা ভাল। আই অ্যাপ্রুভ।

১১৪

রাওয়াত নামে এক বন্ধু ছিল হেমাঙ্গর। কলকাতায় ইনকাম ট্যাক্সে চাকরি করত। দেশে ফিরে যাওয়ার মোহে সে একদিন চাকরি ছেড়ে দেশে গিয়ে নিজের বাড়িতে একটা স্কুল খুলে বসল। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। সরকারি সাহায্য দূরের কথা, অনুমোদন পর্যন্ত নেই। সেই থেকে খবরবার্তা বন্ধ ছিল হেমাঙ্গর সঙ্গে। কিছুদিন ধরে রাওয়াত তাকে চিঠি লিখছিল, একবার চলে এসো। হিমালয়ের কোলে আমার ছোট স্কুল দেখে যাও। দেখে যাও আনন্দ কী মহান হতে পারে।

দিল্লির অশোক হোটেলের পাঁচতলার ঘরের বারান্দায় রাত আটটার সময় চেয়ার টেনে বসে নানা কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ রাওয়াতের কথা মনে পড়ে গেল হেমাঙ্গর। দিল্লির কাজ শেষ হয়েছে। কলকাতায় ফিরবার তেমন তাড়া নেই। দু-চারদিন দেরি হলেও ক্ষতি হবে না। কাল কর্ণপ্রয়াগ রওনা হলে কেমন হয়? বছর সাতেক আগে একবার কেদার-বদ্রী গিয়েছিল সে। তারপর আর ও পথে যাওয়া হয়নি। কাল রাতটা হরিদ্বারে কাটানো যায়। বাজারের মধ্যে একটা রাবড়ির দোকান আছে। দারুণ করে জিনিসটা। রাবড়ি খাবে, হর কি পৌড়ির চাতালে বসে থাকবে সন্ধেবেলা, আরতি দেখবে। পরশু হরিদ্বার থেকেই রওনা দেবে কর্মপ্রয়াগ। দুটো দিন রাওয়াতের ওখানে কাটিয়ে ফিরে আসবে। মন্দ কী?

ঘরে এসে কলকাতায় এস টি ডি করল সে। সিনিয়ার পার্টনারকে জানিয়ে দিল, ফিরতে দেরি হবে তিন দিন।

পরদিন রওনা হল হরিদ্বার। সেই রাবড়ি খাওয়া, হর কি পৌড়িতে বসে থাকা সবই হল, কিন্তু কেন যেন ভাল লাগল না আগের মতো। আগে যখন এসেছিল তখন দুজন বন্ধু ছিল সঙ্গে। খুব জমেছিল। একা একা জমল না একদম।

ভোর রাতে বাস ধরল সে। বিচ্ছিরি চেহারার বাস। চলতে ঘরঘর শব্দে মাথা ধরিয়ে দিল। তার ওপর গন্ধমাদন ভিড়। অনেকদিন কষ্ট করা অভ্যাস নেই তার। ভিড়টা সহ্য হচ্ছিল না। জানালার ধারে সিট পেয়েছিল বলে রক্ষা। বাস চলতে শুরু করার পর তার মনে হল, রাওয়াত আর তার স্কুল বা কর্ণপ্রয়াগ কেউ তাকে টানছে না। তার যাওয়াটা হচ্ছে জোর করে। নিজেকে সে এক অনিচ্ছুক যাত্রায় বাধ্য করছে যেতে।

শীতের মুখে এসব জায়গায় খুব ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। যত বাস ওপরে উঠবে তত বেশি ঠাণ্ডা। সকালে কুয়াশাও পড়েছে খুব। একটা মাফলারে মাথা আর কান ঢেকে একটু ঢুলছিল বসে হেমাঙ্গ।

ঘটনাটা ঘটল দেবপ্রয়াগ পার হয়ে চড়াইয়ে ওঠার পর। হেমাঙ্গ তখনও ঢুলছিল। সহযাত্রীরা কেউ কথা বলার মতো স্ট্যান্ডার্ডের নয়। বেশির ভাগই পাহাড়ে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ, ব্যবসাদার, তীর্থযাত্রী। সুতরাং একা বসে ঢোলা ছাড়া উপায় কি?

বিকট টায়ার ফাটবার একটা আওয়াজে কেঁপে উঠল হেমাঙ্গ। কিছু বুঝে উঠবার আগেই বাসটা একটা অস্বাভাবিক বাঁক নিয়ে ধাঁ করে ঘুরে গেল। তার পরই বাসসুদ্ধু লোকের প্রচণ্ড চিৎকার সমেত সোজা নেমে যেতে লাগল নিচে, নিরালম্ব।

নিরালম্বের এই বোধ জীবনে ছিল না হেমাঙ্গর। হাত-পা যেন ভারহীন, শরীর যেন হঠাৎ একখন্ড পালক। বাসটা একটা পাথর বা কিছুতে প্রচণ্ড শব্দে ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেল এবং উল্টো অবস্থাতেই গড়িয়ে যেতে লাগল নিচে। কপালে আর পায়ে দুটো সাঙ্ঘাতিক ব্যথা পেল হেমাঙ্গ, চোখ আর মাথা ব্ল্যাক আউট হয়ে যাওয়ার আগে শুধু তার মনে হল, ভগবান! ট্যাংকটায় আগুন লাগবে না তো! তাহলে তো সব শেষ!

তার পরই জ্ঞান হারাল সে।

জ্ঞান ফিরল দু'দিন বাদে।

এত ক্লান্তি আর এত ব্যথা জীবনে কখনও আর বোধ করেনি সে। সর্বাঙ্গই যেন অচল। যেন আর কোনওদিনই বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না। চারদিকে চেয়ে দেখে সে একটু অবাক হল। এ তো নোংরা, ভিড়াকার হাসপাতাল নয়। এ যে বেশ ঝকঝকে তকতকে একখানা সিঙ্গল বেডের ঘর। ড্রিপ চলছে। মাথায় ব্যান্ডেজ, হাতে পায়ে ব্যান্ডেজ, নাকে অক্সিজেনের নল!

জ্ঞানটা বেশিক্ষণ থাকল না। আবার ঘুমিয়ে পড়ল সে। বারকয়েক সারা দিনে জ্ঞান ফিরল তার। কিছু বুঝতে না পেরে ফের ঘুমিয়ে পড়তে লাগল।

তৃতীয় দিনের সকালে অসহ্য ব্যথার বোধ নিয়ে চোখ মেলল সে। কেউ তাকে মৃদু স্বরে নাম ধরে ডাকছিল। যে মুখটা দেখতে পেল সেটা প্রথমে আউট অফ ফোকাস। তার পর চোখ তীক্ষ্ণতর হলে সে বলল, রাওয়াত!

বলল, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরোল না তার। শুধু ঠোঁট নড়ল।

রাওয়াত ঝুঁকে পড়ে বলল, আর ইউ ওকে?

না। আমি বোধ হয় মারা যাচ্ছি।

এ কথাটাও শুনতে পেল না রাওয়াত। শুধু বলল, থ্যাংক গড। ইউ সারভাইভ।

কোন স্মৃতি নেই সেই দুর্ঘটনার। একটা বিকট শব্দ, নিরালম্ব ভাব, তার পরই আছড়ে পড়া। কিন্তু নানা ব্যথা-বেদনার ভিতর দিয়েও বিদুৎচমকের মতো অদ্ভুত একটা ঘটনা মনে পড়ল তার। বাসটা যখন উল্টে যাচ্ছিল, যখন ভিতরে যাত্রীরা পরস্পরের সঙ্গে তালগোল পাকাচ্ছিল আর দুমদাম বাক্সপ্যাটরা এসে পড়ছিল তাদের ওপর তখন একটা শিশু কোথা থেকে ছিটকে এসে তার বুকে ধাক্কা খেয়েছিল। ওই সাংঘাতিক অবস্থাতেও বাচ্চাটার জন্য হাত বাড়িয়েছিল হেমাঙ্গ। কিন্তু পারেনি। মাথাটা অন্ধকার হয়ে গেল নিজের অজান্তে। বাচ্চাটা কি বেঁচে আছে? বোধ হয় না। এইসব ঘটনায় বাচ্চারাই তো আগে মরে।

চারদিনের দিন গলায় স্বর এল তার।

রাওয়াত! তুমি কি করে জানলে যে আমার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে?

রাওয়াত মাথা নেড়ে বলে, কি করে জানব? জানতাম না তো। তুমি আসবে বলে খবরও দাওনি। তবে অ্যাকসিডেন্ট হওয়ার খবর পেয়ে আমরা অনেকেই চলে এসেছিলাম স্পটে। এই পথে আমাদের চেনাজানা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবসময়ে যাতায়াত করে। এসে রেসকিউতে হাতও লাগিয়েছিলাম। ঠিক পঁচিশ জনের পর তোমাকে তোলা হয়।

কতজন মারা গেছে?

একত্রিশ জন। আরও দু-চারটে যাবে।

আমার অবস্থা কেমন?

ইউ আর ওকে। দিল্লিতে নিতে পারলে মাথাটা স্ক্যান করা যেত।

আমি কোথায়?

হরিদ্বার। খুব রিস্ক নিয়ে এতদূর এনেছি। কিন্তু না আনলে মুশকিল ছিল।

আমি বাঁচব?

বেঁচে গেছ। থ্যাংক গড। তুমি যাচ্ছিলে কোথায়? আমার কাছে?

হ্যাঁ।

সরি হেমাঙ্গ। ভেরি সরি। আমার কপালটাই খারাপ। এই ঘটনার পর তুমি আর বোধ হয় কোনওদিনই আমার ওখানে যাবে না?

কে বলল? নিশ্চয়ই যাবো।

আচ্ছা। নাউ টেক রেস্ট।

আমার ইনজুরি কতটা?

কিছু ফ্র্যাকচার আছে। ব্যস।

এনি ভাইটাল উন্ড?

না না।

ভয়ে আর জানতে চাইল না হেমাঙ্গ। চোখ বুজে থেকে বলল, অ্যাকসিডেন্টের সময় একটা বাচ্চা আমার বুকে এসে পড়েছিল। বোধ হয় বাঁচেনি।

একটু বিস্মিত গলায় রাওয়াত বলল, একটা বাচ্চার কথা বলছ? দু-আড়াই বছর বয়স?

তা জানি না। ওই ভয়ংকর অবস্থায় কিছু ভাল করে দেখেছি নাকি?

অবাক কাণ্ড হল, তোমাকে যখন বের করা হয় তখন তোমার দু'হাতে একটা বাচ্চা ধরা ছিল। সে বেঁচে গেছে।

বেঁচে গেছে?

খুব আশ্চর্যভাবে। লোকে তো ধরে নিয়েছিল ওটা তোমারই বাচ্চা। আমি তাদের ভুল ভাঙাই। তবে বাচ্চার মা বাঁচেনি।

আমি কিভাবে বাঁচলাম রাওয়াত?

ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন ভাই। একটা পাথরের চাঙড়ে আছড়ে পড়ে বাসটা দু'খণ্ড হয়ে যায়। একটা খণ্ড গড়িয়ে নিচে চলে গিয়েছিল। ওটায় যারা ছিল কেউ বাঁচেনি। তুমি পিছনের পোরশনে ছিলে বলে বেঁচে গেছ।

এখন বলো, তোমার বাড়িতে কী খবর পাঠাবো! তারা হয়তো চিন্তা করছে।

একটু চিন্তা করে হেমাঙ্গ বলল, বাড়িতে অ্যাকসিডেন্টের খবর দেওয়া ঠিক হবে না। বরং আমার পার্টনারদের জানিয়ে দিও। আমার জিনিসপত্র কিছুই কি পাওয়া যায়নি?

এখানে লুটপাট বিশেষ হয় না। পাহাড়ি লোকেরা এখনও ততটা খারাপ হয়ে যায়নি। তোমার একটা সুটকেস ছিল কি? ইনিশিয়াল মিলে যাচ্ছে, চারকোল ব্ল্যাক রঙের?

হ্যাঁ। দরকারি কাগজপত্র আছে।

ঠিক আছে। আর কিছু?

আমার রিকভারি হতে কত সময় লাগতে পারে?

ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে দেখব। ইট উইল টেক টাইম।

সেক্ষেত্রে আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া যাবে কি?

মে বি আফটার সাম টাইম। তার আগে তোমাকে দিল্লিতে শিফট করা দরকার। ফর দি স্ক্যান।

ব্যথা আর ব্যথা। আর অবসন্নতা। আর হতাশা। আর নিঃসঙ্গতা। হেমাঙ্গ সারা দিন স্থবিরের মতো পড়ে থাকে। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। ডাক্তার বা নার্স কিছু বলতে চায় না। সে অনুমান করে, তার বাঁ হাত আর বাঁ পা ভেঙেছে। সম্ভবত গোটা দুই পাঁজরও। মাথার ব্যান্ডেজ থেকে অনুমান সেখানকার চোটও সামান্য নয়। অনেক রক্তপাত হয়ে থাকবে, নইলে শরীরের এই অবসন্নতা হত না।

রাওয়াত, আমাকে কি রক্ত দেওয়া হয়েছে?

অফ কোর্স। ইউ ব্লেড লাইক হেল।

শঙ্কিত হেমাঙ্গ বলে, সেই রক্ত কি এইচ আই ভি ফ্রি? আজকাল ব্লাড থেকে কত এইডস হয় তুমি জানো?

রাওয়াত হাসল, চিন্তা কোরো না। তোমার রক্তের গ্রুপ ইজি, আমি তোমাকে রক্ত দিয়েছি। আর দুজন বন্ধুকে ধরে এনেছিলাম। তাদের কারও এইডস্ নেই।

হেমাঙ্গর তবু একটু অস্বস্তি রয়ে গেল। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে ক্ষণে ক্ষণে একজনের কথা মনে পড়ছে। ভাবতে ভাল লাগছে। যদি অ্যাকসিডেন্টে মরে যেত তাহলে কী করত ও? কাঁদত নাকি? মন খারাপ করত? তা হয়তো করত। কিন্তু স্বাভাবিক হয়ে যেতে এবং তাকে ভুলে যেতে কতই বা সময় নিত?

দিন সাতেক বাদে একটানা অ্যাম্বুলেন্সে দিল্লি নিয়ে আসা হল তাকে। দুজন পার্টনার কলকাতা থেকে উড়ে এসেছে তার জন্য। খুব ভাল একটা নার্সিং হোমে ভর্তি করা হল তাকে। স্ক্যানে তেমন কিছু ধরা পড়ল না।

বাচ্চা ছেলের মতো সে মাঝে মাঝেই বলতে লাগল, বাড়ি যাবো।

পার্টনার দাশগুপ্ত বলল, বাড়ি বলতে তো গর্চা। সেখানে কে দেখবে তোমাকে? যা অবস্থা করেছ, বেশ কিছুদিন নার্সিং দরকার।

না দাশগুপ্ত, এভাবে হবে না। তোমরা আমাকে কলকাতায় নিয়ে যাও।

তোমার মায়ের পক্ষে কিন্তু ব্যাপারটা শকিং হবে। আমরা ওঁকে অ্যাকসিডেন্টের খবর দিইনি। শুধু বলেছি অফিসের জরুরি কাজে আটকে গেছে, ফিরতে দেরি হবে।

হেমাঙ্গ চোখ বুজে গভীর ক্লান্তির সঙ্গে বলল, শোনা দাশগুপ্ত, রিকভারির জন্য মানসিক স্বস্তিও দরকার। এখানে আমার ভীষণ একা লাগছে। আমাকে নিয়ে যাও।

কিন্তু এখনও যে তুমি বিছানা থেকে উঠতে পারছ না।

স্ট্রেচারেই নেবে।

দাশগুপ্ত একটু ভাবিত মুখে বিদায় নিল।

রাওয়াত কর্ণপ্রয়াগে ফিরে গিয়েছিল। আবার এল। বলল, আরে ভাই, ব্যস্ত হচ্ছ কেন? সাত আটটা দিন থাকো। তারপর একটু ফিটনেস এসে গেলে যেও।

একটা সত্যি কথা বলবে রাওয়াত?

কী?

আমার কোনও ভাইটাল ইনজুরি হয়নি তো? হয়তো আমি টের পাচ্ছি না।

আরে না ভাই। হলে টের পেতে না?

আমার কোমরে একটা ব্যান্ডেজ রয়েছে। আগে বুঝতে পারিনি। আমার স্পাইনাল কর্ড ভাঙেনি তো?

উঃ, তোমাকে নিয়ে পারা যায় না। ইউ আর অলরাইট ম্যান। আউট অফ ডেনজার।

অ্যাকসিডেন্টের প্রায় পনেরো দিন বাদে হাতে পায়ে প্লাস্টার, মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে হুইল চেয়ারে বসে সে প্লেনে উঠল এবং ফিরে এল কলকাতায়। নিজের ডেরায়।

ফটিক যে আর্তনাদটা করল সেটা মাইলখানেক দূর থেকেও লোকে শুনতে পেল বোধ হয়। এ কী দাদাবাবু! আপনি যে খুন হয়ে এসেছেন! অ্যাঁ। এ কী কাণ্ড?

ওরকম কোরো না ফটিকদা। আমি ভাল আছি।

নিজের ঘরে দোতলায় এসে একটা আরামের শ্বাস ছাড়ল হেমাঙ্গ। স্থানেরও মায়া কেন তা সে বুঝতে পারে না। এই যে ঘরদোর, বারান্দা, চেয়ার টেবিল, চেনা আসবাব এদের কি সত্তা আছে? নইলে এত টানে কেন? কেন এই চেনা বাড়িতে ফিরে এসে তার এত স্বস্তি? কী আছে এখানে?

যারা সঙ্গে এসেছিল তারা বিদায় নেওয়ার পর হেমাঙ্গ অনেকক্ষণ ক্যাসেটে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনল। মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই সে কথা যে যাই পাসরি। পায়ের কাছে আগাগোড়া ছলোছলো চোখে ফটিক বসে আছে।

অত মন খারাপ করছ কেন? মরেই তো যেতে পারতুম। কিন্তু মরিনি তো!

কালকেই কালীঘাটে পুজো দিয়ে আসব।

এই ভালবাসাটাকেও ব্যাখ্যা করতে পারে না হেমাঙ্গ। রক্তের সম্পর্ক নয়, মনিব-ভৃত্যের সম্পর্ক, তবু তার কিছু হলে ফটিক কাঁদে কেন? এইসব সামান্য সামান্য জিনিসের জন্যই বোধ হয় আজও মানুষের বাঁচতে ভাল লাগে। বড় বড় জিনিসের জন্য যারা বাঁচে বাঁচুক, কিন্তু এই সামান্য তুচ্ছগুলির জন্যই হেমাঙ্গর বুক তেষ্টায় কাঠ হয়ে আছে।

না, আজ কাউকে কোনও খবর দিল না হেমাঙ্গ। ফটিক আজ যত্ন করে রান্না করল। হেমাঙ্গ অঘোরে ঘুমোলো রাতে। শরীরের সব অস্বস্তি সত্ত্বেও মনটা ভারি ভাল।

এ বাড়িতে হুইল চেয়ার নেই। বেডপ্যান দেওয়ার লোক নেই। কিন্তু একটা দুটো ফোন করলেই সব ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। সকালে উঠে হেমাঙ্গ ভাবল, দেখা যাক কতটা পারা যায়। বাঁ হাতটা কনুই থেকে নিচের দিকটা ভেঙেছিল। বাঁ পা ভেঙেছে হাঁটু বরাবর। দুটোর কোনওটাই ভাঁজ করার উপায় নেই। ডান পায়ে ভর দিয়ে সে দাঁড়াল এবং বাঁ পা মেঝেয় রেখে অল্প একটু ভার রাখল সে। কেমন একটা অবশ বিহ্বল হয়ে রয়েছে

পাটা। কোনও সাড়া নেই যেন। ভয় হল, হয়তো বেশি ভর দিলে আবার মচাক করে প্লাস্টারের মোড়ক সহই ভেঙে পড়বে। বোধ হয় এখনই এতটা অ্যাডভেঞ্চার না করা ভাল।

ফটিক অবস্থা দেখে বলল, দাদাবাবু, বিডন স্ট্রিটে একটা খবর দিন।

পাগল! মা এ অবস্থা দেখলে হার্ট ফেল করবে। আমি যে কলকাতায় ফিরেছি সেটাই মাকে জানানোর দরকার নেই।

তাহলে চারুদিদিকে?

দূর! চারুদি চতুর্দিকে রাষ্ট্র করে বেড়াবে। ও পেটে কথা রাখতে পারে না।

ফটিক একটু ইতস্তত করে লাজুক মুখে বলল, তাহলে অন্তত দিদিমণিকে তো জানানো দরকার।

দিদিমণি! সে কে?

ওই যে। গত কয়েকদিন যাবৎ কেবল খোঁজ নিচ্ছেন ফোনে।

ও। বলে হেমাঙ্গ ভিতরে ভিতরে একটা উথলে ওঠা কিছু টের পেল। বলল, কী বলছিল?

খোঁজ নিচ্ছেন রোজ, আপনি ফিরলেন কি না জানতে।

তাকে খবর দিয়ে কী হবে?

একজন কাউকে জানানো দরকার।

থাক ফটিকদা, জানানোর দরকার নেই। কয়েকটা দিন যাক না।

কিন্তু হেমাঙ্গ বুঝতে পারছিল, তার টয়লেটে যাওয়া বা গা মোছানো, মাথা বোয়ানোর জন্য একজন নার্স গোছের কাউকে দরকার। আবার বাইরের কেউ এলে তার স্বস্তিরও অভাব ঘটবে। কী করবে তা বুঝতে পারছিল না সে।

খানিকটা বেলায় সে টয়লেটে গেল বেশ কষ্ট করে। বাঁ পায়ে ভর না দিয়ে। একজোড়া ক্রাচ হলে কি সুবিধে হবে?

সারা দিন নিজের অবস্থাটা পর্যালোচনা করে দেখল সে। তারপর ক্রাচের সিদ্ধান্ত নিল। সিদ্ধান্ত নিল, নার্স রাখবে না। যতটা পারে নিজেই করবে। পারবে ঠিক।

কতকাল আর নিশিপুর যাবে না সে! এখনও কত কাল। নিশিপুর যেন দূরের এক রূপকথার জগৎ হয়ে গেছে এখন। সে যেন অলীক, মিথ্যে এক সাজানো জায়গা।

রাত আটটা নাগাদ টেলিফোনটা এল, ফটিকই ধরল। বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ এসেছেন। কী কাণ্ড! পাহাড় থেকে বাস সুদ্ধু পড়ে গিয়েছিলেন খাদে। শরীরের একটা হাড়ও আর আস্ত নেই। ... অ্যাঁ, হ্যাঁ দিচ্ছি। ধরুন।

ভ্রূকুটি করে হেমাঙ্গ বলল, কাকে ওসব বৃত্তান্ত দিলে?

একগাল হেসে ফটিক বলল, দিদিমণি। বড্ড ভাল মেয়ে। ধরুন ফোনটা।

কর্ডলেস টেলিফোনটা হাতে ধরিয়ে দিল ফটিক। হেমাঙ্গর শ্বাসকষ্ট হতে লাগল। বুকটার মধ্যে তোলপাড়।

ওপাশ থেকে কান্নাভরা একটা গলা বলল, কী হয়েছে? কথা বলছেন না কেন?

হেমাঙ্গ একটু হেসে বলল, আর বলবেন না! একটা বিচ্ছিরি অ্যাকসিডেন্ট।

পাহাড় থেকে পড়ে গিয়েছিল বাস?

হ্যাঁ।

উঃ। কী হয়েছিল বলবেন তো!

যা হয় আর কি। খবরের কাগজে যেমন বেরোয়, খাদে বাস, নিহত একত্রিশ, ঠিক ওরকম।

আপনার কী কী হয়েছে আমি জানতে চাই।

বাঁ হাত আর পা ভেঙেছে।

কি রকম ভাঙা?

প্লাস্টার করা হয়েছে। ভালই ভাঙা। মাথায় চোট হয়েছিল। পাঁজরেও। কোমরেও।

ও পাশের কণ্ঠস্বরে কান্নার কাঁপন আর চাপা রইল না, ইস! মা গো! আমি এখনই যাচ্ছি।

না না, এখন না। রাত আটটা বেজে গেছে।

তাতে কি? আমি মাকে নিয়ে যাব।

আচ্ছা, কাল সকালে এলেই তো হয়।

আমার ভীষণ খারাপ লাগছে যে!

তা জানি। কিন্তু রাতে আসার দরকার নেই। কাল সকালে এলে কিছুক্ষণ থাকলে খুশি হবো। থাকবেন কিছুক্ষণ?

মাকে নিয়ে যাবো? না একা?

একটু হাসল হেমাঙ্গ। তারপর বলল, একা।

হাঁটাচলা করছেন কি ভাবে?

কোনওরকমে। কাল থেকে ক্রাচ নিতে হবে।

ইস। কী কষ্ট!

আপনি কাঁদবেন না। কাঁদবার মতো কিছু হয়নি।

একটু হলেই তো মারা পড়তেন।

হ্যাঁ। বেঁচে আছি দেখে সবাই অবাক।

ইস!

একটা অদ্ভুত ঘটনা কি জানেন?

কী?

ওই সাঙ্ঘাতিক অ্যাকসিডেন্টেও নাকি আমি একটা বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বাঁচিয়ে দিয়েছি।

সত্যি?

আমি তো জানি না। যারা প্রত্যক্ষদর্শী তারা বলছে।

আমি সব শুনতে চাই।

অনেক সময় নিয়ে আসবেন। কাউকে বলবেন না কিন্তু।

১১৫

বিষ্ণুপদর শ্রাদ্ধাদি মিটে যাওয়ার এক মাস পর বলডিং হেডের শেষাংশ লেখা সাঙ্গ হল। কপি সংশোধনের জরুরি কাজটা দিনরাত খেটে করতে হচ্ছিল কৃষ্ণজীবনকে। প্রকাশক আমেরিকা থেকে তাগিদ দিচ্ছে টেলিফোনে। প্রোগ্রাম এবং শিডিউল নিয়ে তাদের কারবার। টার্গেট ডেট তারা পেরোতে দেবে না। ভূতের মতো খাটছিল কৃষ্ণজীবন।

ঠিক এই জরুরি কাজের মাঝখানে রামজীবন একদিন এসে হাজির।

দাদা, একবার বিষ্টুপুর না গেলেই নয়।

কেন রে, কী হল?

ছোড়দা বড় হুজুত করছে। বাড়ির দোতলাটা নাকি বাবা ওকেই দিয়ে গেছে। এখন পারলে মাকে তাড়িয়ে দোতলার দখল নেয়। গাঁয়ের কিছু লোকও ওর পিছনে আছে।

কৃষ্ণজীবনের মুখ রাগে রাঙা হয়ে উঠল। বলল, দোতলায় ওর তো কোনও দাবি থাকতে পারে না।

সে কথা বুঝছে কে! দিনরাত এমন অশান্তি, গালাগাল, চেঁচামেচি যে, মা বলেছে, ওরে, আমাকে ওদিককার দালানটায় নিয়ে যা। ও-ই এখানে থাকুক।

তা তো হতে পারে না। মা যতদিন বেঁচে আছে দোতলা ভোগ করবে মা।

তুই একবার চল। তোকে একটু ভয় পায়। মাঝে মাঝে আবার এও বলছে, আমাকে দু'লাখ টাকা দিয়ে দে, আমি দাবি-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি।

মজা মন্দ নয়।

সরস্বতীও তার বরকে নিয়ে মাঝখানে এসেছিল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলল, তার ভাগ সে ছাড়বে না। বাড়ির একটা অংশ তারও চাই। সেও বলে গেছে, লাখখানেক টাকা পেলে দাবি ছেড়ে দিতে পারে। ওর বরটা খুব বিষয়ী লোক। পঞ্চায়েতে জিতেছে নিজের গাঁয়ে।

কৃষ্ণজীবন কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকে।

রিয়া আলোচনাটা শোনেনি। চা দিতে এসে বলল, কী ব্যাপার রামজীবন, বিষয়সম্পত্তি নিয়ে গণ্ডগোল লেগেছে নাকি?

তটস্থ হয়ে রামজীবন বলল, আর বোল না বউদি, বাবা যেতে না যেতেই কুরুক্ষেত্র।

ওইজন্যই তো ওকে বলেছিলাম বড় বাড়ি করতে যেও না। অত বড় বাড়ি দেখেই সকলের দাবি-দাওয়া উঠছে।

রামজীবন গম্ভীর হয়ে বলে, বিষয় হল বিষ। দোতলাটা একটেরে রেখে দেবো ভেবেছিলাম, তা আর হল না। দাদা যদি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পারে।

ওকে আর এ সবের মধ্যে টানা কেন? জরুরি কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। তোমরা একটা মীমাংসা করে নাও।

রামজীবন বলল, আমার পরামর্শ হল, দাদা নিজেই দোতলাটা দাবি করে রাখুক। তা হলে বামাচরণের আর কিছু বলার থাকবে না।

কৃষ্ণজীবন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমার একটা ইচ্ছেও ছিল যে, কয়েক বছর পর বিষ্টুপুরেই গিয়ে থাকব। তা আর সম্ভব নয় দেখছি।

কেন সম্ভব নয় দাদা? খুবই সম্ভব। তুই শুধু নিজের ভাগটা বুঝিয়ে দিয়ে আয়। বামাচরণ যদি বুঝতে পারে যে, দোতলাটা তুই নিজের জন্য করেছিস তা হলে আর রা কাড়বে না।

মাকে শান্তিতে রাখতে হলে এরকমই কিছু একটা করতে হবে। কৃষ্ণজীবন বলল, তুই যা, আমি রোববারে যাব। আমি আপাতত বামাকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, ওকে গিয়ে দিস।

রামজীবন চিঠি নিয়ে চলে গেল।

সেই চিঠিতেই কাজ হল। রবিবার কৃষ্ণজীবন বিষ্টুপুরে পৌঁছে দেখে, বামাচরণ রামজীবনের তোলা পাকা ঘরখানায় আশ্রয় নিয়েছে। চিঠি পাওয়ার পর আর গোলমাল করেনি। কৃষ্ণজীবনকে এসে একটা প্রণাম করে বলল, তুই যদি থাকিস তা হলে তো কথাই নেই।

বামার বউও এসে পায়ের ধুলো নিয়ে হাসি-হাসি মুখ করে বলল, আপনিই এখন আমাদের গার্জিয়ান। আপনি যা বলবেন তা-ই হবে।

সমস্যাটা যে এত সহজে মিটে যাবে তা ভাবেনি কৃষ্ণজীবন। সে খুশিই হতে যাচ্ছিল। কিন্তু রামজীবন তাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলল, আমাকে যে দোকান করার টাকা দিয়েছিস এখন সেটা নিয়েই ওরা খুব ভাবছে।

ভাবছে?

ভাবছে মানে আলোচনা করছে। বউদি ছোড়দাকে বোঝাচ্ছে, এক ভাইকে দোকান করার টাকা দিলে আর এক ভাইকেও দেওয়া উচিত। ওরা তোর কাছে টাকা চাইবে।

কিন্তু বামা তো চাকরি করে।

তা করলেই বা। দোকান বউদি দেখবে। সে কথাও হয়েছে।

কৃষ্ণজীবন একটু দমে গেল।

রামজীবন বলল, আমি বলেছি দাদা দোকান করার টাকা আমাকে ধার হিসেবে দিয়েছে, দোকান থেকে যা লাভ হবে তা থেকে সুদ সমেত ফেরত দেবো। কথাটা বিশ্বাস করেনি। বলছে আমরাও না হয় ধার হিসেবেই চাইব। টাকাটা একবার হাতে পেলে আর শোধ দেবে না কিন্তু। তই একটু শক্ত থাকিস।

কৃষ্ণজীবন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। দৃঢ় মানসিকতা বলতে যা বোঝায় তার তা নেই। সংসারের বিকট চেহারাটা তার কোনওদিনই ভাল লাগে না। সে সহ্যই করতে পারে না লোভ, লালসা, মিথ্যাচার, সঙ্কীর্ণতা।

বামাচরণের হাঁড়ি আলাদা। সেখান থেকে আজ কৃষ্ণজীবনের জন্য নানা ভাল ভাল পদ রান্না করে দিয়ে গেল শ্যামলী। বলল, ও বেলা আমার ওখানেই যদি দুটি ডালভাত খান হলে ভীষণ খুশি হই। আপনার সেবা করার সুযোগ তো পাইনি কখনও।

আপত্তি করার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না কৃষ্ণজীবন। ভিতরে ভিতরে যদিও তার একটা অনিচ্ছে হচ্ছিল। শুধু বলল, রাতে আমাকে কাজ করতে হয় বলে বেশির ভাগ সময়েই আমি নামমাত্র খাই। হয়তো একটু স্যুপ, না হয় তো একটু ডাল। আজকাল রাতের খাওয়াটা কমিয়ে দিয়েছি খুব।

না হয় স্যুপই করে দেবো।

পারবে? বলে একটু হাসল কৃষ্ণজীবন। বলল, তার দরকার নেই। দু'খানা রুটি আর একটু ডাল সেদ্ধ হলেই হবে।

মোটে? ওটুকু খেয়ে থাকলে তো শরীর পাত হয়ে যাবে।

তা কেন? কম খেলেই শরীর ভাল থাকে। বেশি খেলেই নানারকম ট্রাবল হয়। আর একটা কথা শোন, আমি আজকাল মাছ মাংস একদম খাই না। ওসব কোরো না বরং একটু স্যালাড কোরো। তা হলেই হবে।

আচ্ছা, তাই করব।

রাতে খাওয়ার সময়েই কথাটা তুলল বামাচরণ, দাদা, আমি একটা কথা ভাবছিলাম ক'দিন ধরে।

কী কথা?

আমার চাকরিটা তো কিছুই নয়। পিওনের আর কতই বা বেতন? তা ছাড়া মাঝে মাঝে শরীরটাও খারাপ করছে আজকাল। যাতায়াতের ধকল সহ্য হয় না।

কৃষ্ণজীবন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। কথাটা মিথ্যে নয়। বামা অনেক রোগা হয়ে গেছে। চেহারাটা একসময়ে বেশ ভাল ছিল। সুপুরুষ বলতে যা বোঝায়। এখন দড়কচা মেরে গেছে। মাঝে মাঝে মাথা খারাপ হয়ে যায়, তখন শরীর জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে পড়ে।

শ্যামলী বলল, জানেন তো, রামজীবনের গুণ্ডারা ওকে বেদম মেরেছিল। তখন মাথায় চোট হয়েছিল খুব। আর সেই থেকেই মাথার গণ্ডগোল।

কৃষ্ণজীবনের ভিতরটা একটা ব্যথায় ভরে গেল। ঘটনাটা সে শুনেছে। বামা যেমনই হোক, মার খাওয়ার কথা শুনে বড় কষ্ট হতে থাকে কৃষ্ণজীবনের। পৃথিবীতে কত অনভিপ্রেত ঘটনাই যে রোজ কত ঘটে? কেন যে ঘটে। সভ্যতার ইতিহাস তো কম পুরনো নয়, তবু মানুষ সভ্যতার এলাকাতেই ঢুকতে পারল না এখনও। শুধু বস্তুপুঞ্জ দিয়ে কি কিছু প্রমাণ করা যায়?

শ্যামলী ধরা-ধরা গলায় বলল, এ বাড়িতে আমাদের পক্ষে তো কেউ নেই। আমরা হলাম একঘরে। ওকে মারার পর ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম। শ্বশুরমশাই ভরসা দেওয়ায় ফিরে এসেছি। কিন্তু আপনার ভাইয়ের শরীরের অবস্থা ভাল নয়। অনেক ছুটি নিতে হয়েছে বলে আজকাল মাইনে কাটে। ওরও চাকরির আর ধকল পোষাচ্ছে না।

চোখ তুলে কৃষ্ণজীবন বলল, কী করতে চাও?

শ্যামলী চুপ করে রইল। বামাচরণ বলল, রেমো তো দোকান দিয়ে বসেছে। চলছেও ভাল। বিষ্টুপুর এখন বেশ গঞ্জ জায়গা। লোকজনের গতায়াত আছে। ব্যবসা করতে পারলে চলে।

শ্যামলী বলল, আপনার অনেক টাকা বাড়ির পিছনে খরচ হয়ে গেছে, রামজীবনকেও দোকান করতে টাকা দিয়েছেন। কোন মুখে যে আপনার কাছে হাত পাতব তা ভেবে পাচ্ছি না। আপনার ভাইয়ের ইচ্ছে একটা স্টেশনারি দোকান দিয়ে বসে। কিন্তু অত টাকা আমরা কোথায় পাব বলুন! আমার গয়না বেচে দু-চার হাজার টাকা হতে পারে। কিন্তু তাতে তো হবে না!

কৃষ্ণজীবন বড় বিব্রত বোধ করতে লাগল।

বামাচরণ বলল, লাখ খানেক টাকা ঢালতে পারলে ভালই হবে। কিন্তু আপাতত যদি কমের মধ্যেই করি তা হলেও পঞ্চাশ হাজারের নিচে হবে না।

কৃষ্ণজীবনের মুখে রুটির টুকরো বিস্বাদ ঠেকছিল। তার কারণ, সে জানে, শেষ অবধি সে এদের সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। লোভী, হয়ত অভাবে পড়েই হয়েছে, হয়ত টাকাটা শোধ দেওয়ার ইচ্ছে নেই, তবু কি পারবে কৃষ্ণজীবন না দিয়ে? রামজীবন বারণ করেছে ঠিকই, কিন্তু সে কি করে ঠেকাবে এদের?

কৃষ্ণজীবন শান্ত গলায় বলল, তুই পারবি দোকান করতে?

কেন পারব না? রেমো পারলে আমিও পারব। দোকান করা তো সোজা কাজ। আমার বিশ্রামও হবে।

শ্যামলী বোধ হয় ভাবল, টাকার অঙ্কটা বেশিই বলা হয়ে গেছে। হয়ত তত টাকা কৃষ্ণজীবন দিতে চাইবে না। সে বলল, আমরা ধারই চাইছি। দু-দশ হাজার কম হলেও কষ্টেসৃষ্টে দোকান খুলতে পারব।

কৃষ্ণজীবন খাওয়া শেষ করে বলল, ভেবে দেখব'খন। তবে একটা কথা বলে রাখি, রামজীবন কিন্তু মাত্র চল্লিশ হাজার টাকায় দোকানটা খুলেছে। তারও দশ হাজার টাকা দিয়েছে ও নিজেই।

বামাচরণ বলল, চল্লিশ হাজারেও হয়। দু-পাঁচ হাজার টাকা আমরাও জোগাড় করতে পারব। চাকরি ছেড়ে দিলে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটাও পাওয়া যাবে।

ভাল করে ভেবে দেখ। ভেবে বলিস। আমি মাসখানেকের জন্য বিদেশে যাচ্ছি। ফিরে এসে একবার আসব।

বামাচরণ আর শ্যামলীকে নিয়ে মাথা ঘামাতে আর ইচ্ছে হল না কৃষ্ণজীবনের। মানুষের অগুণ আর দোষঘাটের কথা ভাবলেই তার মন খারাপ হতে থাকে। এসব ভাবনাকে তাড়ানো দরকার।

শীত পড়তে শুরু করেছে। তবে তেমন তীব্র কিছু নয়। খেয়ে এসে মায়ের সঙ্গে একটু কথা বলে গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে ছাদে উঠে এল সে। এখন কোনও মহান চিন্তা ছাড়া এইসব জাগতিক চিন্তাভাবনা থেকে মনকে মুক্ত করা যাবে না। কিছু অর্থক্ষতি কপালে আছে। যাক, কিছু টাকা যাক। তবু মনটা যেন নীচুতলায় না থিতিয়ে থাকে।

আকাশ এখানে বড় পরিষ্কার। নক্ষত্রমণ্ডলী হীরের ঝাঁপির মতো ঢাকনা খুলে দিয়েছে। আকাশ তার প্রিয় বিষয়। ওই অন্ধকার ও নিস্তব্ধ জগতে আর কোথাও কি আছে পৃথিবীর মতো একটি সজীব গ্রহ? থাকলেই বা তা জানা যাবে কি করে? মানুষের বৈজ্ঞানিক প্রয়াস সীমাবদ্ধ রয়েছে সামান্য পরিধিতে। পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্রটিও চার আলোকবর্ষ দূরে। কোনওদিনই মানুষ আলোর গতি সঞ্চার করতে পারবে কি কোনও মহাকাশযানে? যদি-বা পারে তা হলে আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী সেই মহাকাশযান যেইমাত্র আলোর গতি পাবে অমনি সে নিজেই পর্যবসিত হবে এনার্জিতে। সে আর বস্তু থাকবে না। যদি দুর্মরতর কল্পনায় ধরে নেওয়া যায়, মানুষ তাও পারল, তা হলেই বা লাভ কি? সবচেয়ে কাছের নক্ষত্রটির পরিমণ্ডলে পৌঁছতেই লেগে যাবে চার বছর। মানুষ পারবে না যেতে ওই গতিতে। কারণ মানুষের শরীর ওই অবিশ্বাস্য গতিবেগ

সহ্য করার উপযুক্ত নয়। তা হলে কোটি কোটি অর্ব-খর্ব আলোকবর্ষ দূরে দূরে ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি নক্ষত্রপুঞ্জের কাছে কোনওদিনই পৌছবে না মানুষ। কখনও নয়। কিছুতেই নয়। কল্পবিজ্ঞানে কত কী হয়। কিন্তু মানুষের বিজ্ঞান এখনও সেই অসম্ভব কল্পনার ধারেকাছে পৌঁছয়নি। তার বিজ্ঞান ততদূর পৌঁছতে না পৌছতেই শেষ হয়ে আসবে পৃথিবীর আয়ুষ্কাল। আর সেই অন্ধকার গ্রহে চাপা পড়ে যাবে মানুষের কাব্য-দর্শন-বিজ্ঞান, কোপনিকাস-আর্কিমিডিস-প্লেটো-শেকসপীয়ার-সক্রেটিস-রবীন্দ্রনাথ-আইনস্টাইন, সবাই এবং সব কিছু। তবে কি বৃথাই মানুষের এই বেঁচে থাকা? বৃথা এই প্রকৃতির এত আয়োজন? বৃথা প্রাণ? বৃথা এই অন্বেষণ? ব্যর্থ ও মূল্যহীন মানুষের যতেক সঞ্চয়? বাণিজ্য ও নির্মাণ? প্রেম ও পরিবার? আত্মীয়তা-গৃহ-কর্মকাণ্ড?

ঠিক বোঝাও যায় না সব কিছু। হাতের নাগালেই যেন কোথাও রয়েছে সেই অমোঘ সত্য। একটু আড়ালে। কিন্তু কিছুতেই তার অবগুণ্ঠন মোচন করা যায়নি আজও। আজও জানা গেল না মৃত্যু কি, জন্ম কেন? আজও জানা গেল না এই প্রাণবন্যার অর্থ কি! সেইজন্যই কি আকুল মনুষ্যকণ্ঠ প্রশ্ন করেছিল, হে সূর্য, উন্মুক্ত করো তোমার সত্যের মুখ, আমাকে দেখতে দাও সেই সত্যকে।

অনেক রাত অবধি ঝুম হয়ে ছাদে দাঁড়িয়ে রইল কৃষ্ণজীবন। যখন ঘরে এল তখন ভোর হতে আর বাকি নেই। মন প্রশান্ত। মন ভাসমান। না, বামাচরণ বা শ্যামলী সেখানে পৌছবে না কোনওদিন।

আর বিছানায় গেল না কৃষ্ণজীবন। ভোররাতে মাকে জাগিয়ে বলল, আমি যাচ্ছি মা।

ও মা! কিছু খেয়ে যাবি না?

না মা। দেরি হয়ে যাবে। তুমি ঘুমোও। আমি আবার আসব।

‘আবার আসব’ কথাটা আজ তার পিছু নিল। আবার আসব! সত্যিই কি আবার আসা যায় একবার এ জীবন ছেড়ে চলে গিয়ে? কে জানে! কিন্তু কেবলই মনে হয়, অলক্ষে একটা আসা-যাওয়ার বৃত্তাকার চংক্রমণ চলেছে কোথাও। প্রাণ থেকে প্রাণে, দেহে দেহান্তরে। আবার আসব—এ কথাটা মানুষের বড় প্রিয়।

কলকাতায় তার জন্য অপেক্ষা করছিল কয়েকটা ক্লাস, কিছু মিটিং, কনফারেন্স। অপেক্ষা করছিল কয়েকটা ছোটখাটো কিন্তু গুরুতর ঘটনাও। খাদে বাস পড়ে যাওয়ায় মরতে মরতে বেঁচে ফিরে এসেছে হেমাঙ্গ। আপাতত ঘরবন্দী। দ্বিতীয় খবর হল, সরকার বাহাদুর কৃষ্ণজীবনকে তিন বছরের জন্য জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করেছেন। তৃতীয় খবর হল, চয়ন তার কষ্টে অর্জন করা কিছু টাকা পৃথিবীর ভালর জন্য দান করতে চায়।

তৃতীয় খবরটাই তাকে চমকে দিল সবচেয়ে বেশি। এক সন্ধেবেলা তার মুখোমুখি দীন ভঙ্গিতে বসে এপিলেপটিক, টিউশনি-নির্ভর ছেলেটা যখন অস্ফুট গলায় তার ইচ্ছেটা প্রকাশ করল তখন বিশ্বাসই হল না তার। বলল, কী করতে চাও বললে?

দান করতে চাই। পৃথিবীর যাতে ভাল হয় এমন কাজে।

কত টাকা চয়ন?

প্রায় পঞ্চাশ হাজার।

এ টাকা তুমি জমিয়েছ?

হ্যাঁ। দশ বছর ধরে টিউশনি করছি। আমার বিশেষ খরচ তো নেই। টাকাটা জমে গেছে।

এই ভাবপ্রবণ, আবেগতাড়িত প্রস্তাবে কৃষ্ণজীবন একটু হাসল। বলল, পৃথিবীর কিসে ভাল হবে তা কি তুমি জান?

আপনার কাছে শুনেছি। খানিকটা পড়েওছি ডারলিং আর্থ বইতে।

কৃষ্ণজীবন মাথা নেড়ে বলে, আমার এক ছাত্রও আমেরিকা থেকে ডলার পাঠিয়েছিল যাতে আমি পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য টাকাটা ব্যয় করি। আমি ভেবেই পাইনি কী করব! টাকাটা তাকে ফেরত পাঠাতে বাধ্য হই।

কাতর গলায় চয়ন বলে, আমার টাকাটা আপনি নিন। এ টাকাটা আমাকে খুব জ্বালাচ্ছে।

কেন চয়ন, জ্বলাচ্ছে কেন? এরকম অদ্ভুত কথা আমি জীবনে শুনিনি।

চয়ন লজ্জিত একটু হাসি হেসে বলল, টাকাটা আমি এমনিতেও রাখতে পারব না। আমার দাদা টাকাটা চাইছে।

কৃষ্ণজীবন অবাক হয়ে চেয়ে থাকে তার দিকে। তারপর বলে, কেন চাইছে?

বলছে কি সব শেয়ারটেয়ার কিনবে। আমাকে লোভ দেখাচ্ছে, তাতে নাকি অনেক টাকা লাভ হবে।

কষ্ট করে টাকা জমিয়েছ, সে টাকা তোমার দাদা নেবে কেন? এ তো অদ্ভুত কথা।

ও টাকা আমি রাখতে পারব না, দাদা নিয়ে নেবে।

তোমার চিকিৎসার খরচ আছে, দুর্দিনের জন্য কিছু সঞ্চয়ও রাখা দরকার। টাকাটা দান করলে তোমার চলবে কি করে? তা ছাড়া টাকাটা খুব কমও নয়, ইচ্ছে করলে এ টাকা দিয়ে একটা ছোটখাটো ব্যবসাও করতে পার।

চয়ন মাথা নেড়ে বলল, হেমাঙ্গবাবু আমাকে তাই বলেছিলেন। ব্যবসা আমার দ্বারা হবে না। আর আমার নিজের চলে যাবে। আমি চাই টাকাটা একটা ভাল কাজে লাগুক। আমি চেক কেটেই এনেছি। আপনার নামে।

দাও। বলে কৃষ্ণজীবন হাত বাড়াল। চেকটা হাতে নিয়ে দেখে বলল, তা হলে তোমার অ্যাকাউন্টটায় আর কিছু রইল না?

না।

ঠিক আছে। বলে চয়নের লম্বাটে শীর্ণকায় মুখখানার দিকে চেয়ে কৃষ্ণজীবন যেন একটি পবিত্র ভাবকে অনুভব করার চেষ্টা করল। গরিব যখন দান করে তখন বোধ হয় স্বর্গে ঘণ্টাধ্বনি হয়।

কৃষ্ণজীবন অবশ্য চয়নের আড়ালে চেকটা কুচিকুচি করে ছিড়ে ফেলে দিল। আজ আবেগবশে টাকাটা দান করলেও, কে জানে, কখনও আশু ভবিষ্যতে ও বিপদে পড়বে কি না, টাকাটা ওরই থাক, তবে ওর অজান্তে।

পৃথিবীর ভাল কিভাবে হবে তা কি চট করে নির্ধারণ করা সম্ভব? পৃথিবীর ভালর জন্য চাঁদার খাতা খোলার তো দরকার নেই। চাই শুধু আরও একটু চৈতন্য। নড়েচড়ে বসা। বুদ্ধি শানিয়ে নিয়ে নয়, হৃদয়বত্তা দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করা, মানুষের যতেক কর্মকাণ্ড কোনদিকে নিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীকে।

সম্প্রতি লন্ডনের একটি বিখ্যাত ম্যাগাজিনে ডার্লিং আর্থ বইয়ের রিভিউতে এক সাহেব-পণ্ডিত কিছু প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করার পরই অভিযোগ করেছেন, এই বইয়ের লেখক নিজে বিজ্ঞানের মানুষ হয়েও মহাকাশ গবেষণার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। ইনি পৃথিবীকে পিছিয়ে নিতে চান পঞ্চদশ শতকে। মানুষ এতখানি এগিয়ে আসার পর কি আবার পিছু হটতে পারে?

রিভিউটা পড়ে কৃষ্ণজীবন সামান্য উত্তেজিত হয়ে একটা জবাবী প্রবন্ধ খাড়া করার চেষ্টা করছে। নাম দিয়েছে : ব্যাক টু ফিউচার, অ্যাডভান্স টু পাস্ট। গোটা মনুষ্য সভ্যতার ইতিহাসে যে মানুষের সভ্যতার অগ্রগমন ঘটেছে প্রযুক্তির ঘাড়ে চেপে সেটাকেই আক্রমণ করেছে সে। সে বলতে চেয়েছে, এগোনো মানে কী? এগোনো মানেই কি আরও কলকারখানা? আরও যন্ত্র-নির্ভরতা? আরও আরাম-আয়েস? অগ্রগমন মানে কি সমকামিতা আর বিবাহ বর্জন? অগ্রগমন কি মানুষকে বাঁচতে শিখিয়েছে? অনুধাবন করতে শিখিয়েছে প্রকৃতির নিয়মানুসারে জীবনের ধাঁচ গড়ে নিতে? সভ্যতা কি কাণ্ডজ্ঞান লোপাট করতে চায়? সভ্যতা কি মানুষের ঠোঁটে তুলে ধরা এক পাত্র হেমলক?

প্রবন্ধে সে এক জায়গার সভ্যতার অভ্যন্তরে স্ববিরোধের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছে, টিভিতে দেখতে পাচ্ছি ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি, মর্টার, রকেট, বোমার আক্রমণে গুড়িয়ে যাচ্ছে শহর, মরছে মানুষ! আবার তার ভিতরেই রেডক্রস এসে তুলে নিয়ে যাচ্ছে হতাহতদের, মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। একই সঙ্গে মানুষ দুটো কাজই করছে কি করে? মারা এবং বাঁচানোর চেষ্টা? এখনও পৃথিবীতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যুদ্ধাস্ত্র তৈরি হচ্ছে, চলছে মারণাস্ত্র তৈরির গভীর গবেষণা। এখনও অস্ত্রের বাজার রমরম করছে দক্ষিণী দেশগুলিতে। সভ্যতা তা হলে কত দূর এগোল? কোনদিকে এগোল?

আজকাল বড় অস্থির লাগে তার। ছুটে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। সে কি মানুষকে বোঝাতে পারছে না তার কথা?

১১৬

শীতের শুরুতেই দাদা বউদি বেড়াতে গেল দক্ষিণ ভারতে। বাসা পাহারা দিয়ে রাখতে পারত চয়নই। কিন্তু চয়নকে ওদের বিশ্বাস নেই তেমন। বাড়িতে বহাল করে রেখে গেল বউদির এক বিধবা দিদিকে। একতলায় নতুন ভাড়াটে এসেছে। অল্পবয়সী চাকুরে এক দম্পতি। ভদ্রলোক বড় কোম্পানির সেলসে চাকরি করেন, স্ত্রী রাইটার্সে। এদের সন্তান হয়নি এখনও।

উপরতলায় চিলেকোঠায় চয়ন একা। রাঁধে, খায়, শুয়ে থাকে, কখনও আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, কখনও দিগন্তহীন দিগন্তের দিকে। চারদিকে সংসারী মানুষজন। সে ভাল আছে, না মন্দ আছে তা বুঝতেই পারে না। তবে সে যে আছে ভীষণভাবে আছে তা নিত্য টের পায় শরীরের নানা আদি-ব্যাধি আর বেদনার ভিতর দিয়ে। টের পায় মূর্ছার পর জ্ঞান ফিরে এলে অসম্ভব দুর্বলতার ভিতর দিয়ে। কেন এই থাকা? কেন মুছে যাওয়া নয়? কেন মিলিয়ে যাওয়া নয়?

চয়ন বুঝতে পারে এ জীবনটাকে আর টেনে নিয়ে যাওয়ার মানেই হয় না। সে কি জীয়ন্ত? তার তো মনে হয় সে নিজের শবদেহ বহন করে চলেছে মাত্র। মৃত এ শরীরটা দিয়ে কী হবে তার?

তবু ভুলে থাকা যেত। ভুলিয়ে রেখেওছে নিজেকে সে বহুকাল। কিন্তু আজকাল বড় বন্ধুহীন, বড় একা হয়ে যাচ্ছে। এক জায়গায় যেন ঠেকে গেছে সে। নর্দমার জালিতে যেমন আটকে থাকে কলার খোসা ঠিক তেমনি।

বিপদটা কে ঘটাল কে জানে! সম্ভবত অনিন্দিতার বাবা। লোকটা বোকা এবং সরল। চয়নের টাকার কথা কোনও সময়ে ওই লোকটাই গল্প করে গেছে অয়নের কাছে।

অয়ন একদিন সন্ধের পর হানা দিল ছাদে। অপ্রত্যাশিত।

কি রে তোর খবর-টবর কি?

চয়ন খুবই অবাক হল। তাকে কুশল প্রশ্ন করার মানুষই নয় অয়ন। তুলনায় বরং বউদি কিছুটা ভাল ব্যবহার করে, কিন্তু অয়ন নয়। সে বলল, ভালই আছি।

শরীর ভাল আছে তো? সেই যে অজ্ঞান হয়ে যেতিস?

ওটা তো সারার রোগ নয়।

অয়ন যেন চিন্তিত হয়ে বলল, তা হলে তো তোর জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করে রাখা উচিত।

জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট শুনে কিছুই বুঝতে পারল না চয়ন। হঠাৎ জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট কথাটা আসছে কেন? সে বলল, তার মানে কি?

এসব অসুখ থাকলে সাধারণত জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করে রাখাই সেফ।

চয়ন বলল, ও।

ব্যাঙ্কে তোর কত টাকা আছে?

এ প্রশ্নেও থতমত খেতে হল চয়নকে। সে বলল, আছে সামান্যই।

যত সামান্যই হোক, তোর একটা কিছু হলে টাকাটা জলে যাবে। বুঝেছিস?

তা হলে কী করা উচিত?

বলছি তো জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করে নে, আইদার অর সারভাইভার।

চয়ন একটু ভড়কে গেল, জবাব দিতে পারল না।

অয়ন বলল, সেভিংস অ্যাকাউন্ট নাকি?

হ্যাঁ।

মুখটা বিকৃত করে অয়ন বলল, সেভিংসে আর কীই বা সুদ দেয়! টাকাটা পড়ে পড়ে পচে যাচ্ছে। তুই এত বোকা কেন? চারদিকে কত নতুন নতুন স্কিম চালু হয়েছে।

আমি তো খবর রাখি না।।

অয়ন বলল, সবচেয়ে ভাল অবশ্য স্টক এক্সচেঞ্জে টাকাটা খাটানো। শেয়ারের বাজারটা এখন খুব তেজি। একটু ক্যালকুলেশন করে লাগাতে পারলে ছাক্কা লাভ।

কিন্তু চয়ন এ কথাতেও উদ্বুদ্ধ হল না। চুপ করে রইল। তার টাকার দরকার ঠিকই, কিন্তু টাকা-মনস্ক সে নয়। টাকার পিছনে ছুটতেও তার ভাল লাগে না।

অয়ন বলল, তোর তো আর নেক্সট টু কিন কেউ নেই, আমরা ছাড়া। তুই তোর বউদি বা আমাকে জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে নিয়ে নে। তাতে টাকাটা অন্তত বেহাত হবে না। বুঝেছিস?

না, চয়ন বোঝেনি। আবার বুঝেছেও। তার মাথাটা একটু ভো ভো করছিল। সে চুপ করে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারল না।

অয়ন একটু ওপরওয়ালার মতো আদেশের সুরে বলল, বেশি দেরি করাটাও ঠিক হবে না। দু-চারদিনের মধ্যেই যা করার করে ফেলতে হবে। কোন ব্যাঙ্কে তোর অ্যাকাউন্ট?

চয়ন অসহায়ের মতো বলে দিল। না বলে করেই বা কি? শত হলেও সে তো অয়নের বাড়িতেই থাকে। শত হলেও অয়ন তার আপন দাদা।

অয়ন বলল, অত ভাবছিস কেন? টাকাটা ওভাবে ফেলে রেখে ভুল করছিস। টাকা-পয়সা সবসময়ে খাটাতে হয়। আজকাল বোকারাই ওভাবে টাকা ব্যাঙ্কে ফেলে রাখে।

চয়ন কী বলবে ভেবে না পেয়ে হঠাৎ বলে ফেলল, আমি একটা ব্যবসা করব বলে ভাবছিলাম।

ব্যবসা! কিসের ব্যবসা?

এখনও ঠিক করিনি।

কত টাকা আছে তোর?

খুব বেশি নয়।

লাখ টাকা তো আর নেই?

না, না, হাজার পঞ্চাশেক হবে।

ও টাকায় কিসের ব্যবসা হবে? ওসব বুদ্ধি করতে যাস না। টাকা মার হয়ে যাবে। আমি ব্যাঙ্কের লোক, সব জানি। ব্যবসা করার অনেক হ্যাপা আছে। বরং শেয়ারে খাটালে লাভ, সেটাও ব্যবসা।

চয়ন মাথা নেড়ে বলল, ভেবে দেখব।

এতে ভাবাভাবির কী আছে? টাকাটা আপাতত জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করে রাখ। আমি শেয়ারে খাটিয়ে তোর অ্যাকাউন্টেই আবার জমা করে দেবো। বুঝেছিস?

চয়ন বুঝেছে এবং হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। ঘাড় নাড়ল।

অয়ন সেদিনকার মতো চলে গেলেও, আবার দুদিন পরে এল। হাতে একটা ফর্ম। ফর্মটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, এটা পূরণ করে ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দিস। ব্ল্যাঙ্কগুলো সবই আমি ফিল-আপ করে দিয়েছি। তুই শুধু অ্যাকাউন্ট নম্বর বসিয়ে সই করে জমা দিবি।

অয়ন চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ ফর্মটা হাতে নিয়ে বসে রইল চয়ন। সে জানে তার টাকাটা আর তার থাকবে না। অয়ন তাকে বোকা এবং অসহায় বলে ধরে নিয়েছে। কিন্তু তার মতলবটা খুব পরিষ্কার। অয়নের টাকাটা সে শেয়ারে খাটিয়ে কিছু ঘরে তুলতে চায়। তার পর টাকাটা শোধ না দিলেও চয়ন কিছু বলতে বা করতে পারবে না। অয়ন এসব ধরেই নিয়েছে। আত্মরক্ষার কোনও উপায় চয়ন ভেবে পেল না। ফর্মটা সে আনমনে ছিড়ে ফেলে দিল।

কিন্তু অয়ন আবার হানা দিল দুদিন পর, কি রে, ফর্মটা জমা দিয়েছিস?

বুক দুর দুর করছিল চয়নের। বলল, ছাত্রের পরীক্ষা ছিল, বড্ড ব্যস্ত ছিলাম।

অয়ন একটু অবিশ্বাসের চোখে তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, দুদিনেও সময় পেলি না? নাকি অন্য কিছু ভাবছিস?

কী ভাবব?

মানুষের মনে কত কী থাকে!

চয়ন ভয় পেয়ে চুপ করে গেল।

অয়ন রাগ করল না। বলল, ওরে শোন, টাকাটা যদি মারও যায় তা হলে সেটা মায়ের পেটের ভাইই তো মারবে! অত ভয় পাচ্ছিস কেন? আমি ছাড়া তোর নেক্সট টু কিন তো কেউ নেই। ভাল করে ভেবে দেখ, তোর কিছু হলে টাকাটা ব্যাঙ্কেই পড়ে থাকবে সাসপেন্স অ্যাকাউন্টে, আমি তো জানতেই পারতাম না বাই চান্স খবরটা না পেলে। টাকার জন্য ভয়ের কিছু নেই। আখেরে তোর লাভই হবে। আমি নিজেও শেয়ারে টাকা খাটাচ্ছি। তাতে ঠকছি না।

চয়ন তবু চুপ করে রইল।

ফর্মটা জমা দিয়ে দিস কিন্তু। বলে অয়ন চলে গেল।

পরদিন রবিবার সকালে এল বউদি। মুখভর্তি হাসি। হাতে এক বাটি মুড়িঘণ্ট। গরম। বলল এটা আজ ভাতের সঙ্গে খেও। বুঝলে?

চয়ন অবাক হল। বলল, আবার ওসব কেন বউদি?

এমনিই। খাবে তো?

খাবো। রেখে যাও। এক কাজ করো আমার বাটিতে ঢেলে দিয়ে যাও।

ওমা! তা কেন? তুমি খাও, পরে আমার ঝি এসে এঁটো বাটি নিয়ে যাবে।

বউদি ঢাকা দেওয়া বাটিটা তার ঘরের একধারে রেখে হঠাৎ চাপা গলায় বলল, তোমার দাদা তোমার টাকাগুলো শেয়ারে খাটাতে চাইছে, না?

হ্যাঁ।

বউদি চাপা গলাতেই বলল, আজ ও সকালেই বেরিয়ে গেছে। বলে গেছে তোমাকে যেন রাজি করিয়ে রাখি। তুমি কি রাজি?

চয়ন বিমর্ষ মুখে বলল, আমার কেমন ইচ্ছে হচ্ছে না বউদি।

বউদি বলল, দিও না চয়ন। টাকাটা ও জলে দেবে। মাথায় আজকাল কেবল শেয়ার ঘুরছে। মাথায় কে যে শেয়ারের পোকা ঢুকিয়েছে! তুমি অ্যাকাউন্ট অন্য ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার করে নাও!

তা হলে দাদা খুব রেগে যাবে।

তা রাগবে। তোমাকে বলি, সাত দিন বাদে আমরা মাসখানেকের জন্য বেড়াতে যাচ্ছি। এই সাত দিন কোনওরকমে ঠেকিয়ে রাখো। পারবে না?

চেষ্টা করব।

তোমার কষ্টের টাকা এভাবে নষ্ট হবে ভাবতেই আমার খারাপ লাগছে।

চয়ন তার বউদির দিকে একটু অবাক চোখে তাকাল।

বউদি বলল, আমি তোমার চোখে কেমন তা জানি। আমাকে খুব খারাপ ভাবো তো! ভাল আমি নইও। তবু জেনো, আমি তোমার শত্রু নই। সংসারের নানারকম অশান্তিতে নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না। তোমার দাদার সঙ্গে আজকাল রোজ ঝগড়া হচ্ছে। কেন যে ও এত টাকা টাকা করে বেড়াচ্ছে আজকাল কে জানে!

দাদাকে কী বলব বউদি?

তা কি আমি জানি? তুমিই ভেবে দেখো।

আমার মাথায় কোনও বুদ্ধি আসছে না।

আমি একটা রিস্ক নিতে পারি।

কী রিস্ক?

আমি তোমার দাদাকে বলব যে, তুমি রাজি হয়েছ এবং সব ঠিক আছে। তাতে তোমার দাদা একটু নিশ্চিন্ত থাকবে। বেড়াতে যাওয়ার আগে বোধ হয় টাকাটা তুলবার চেষ্টা করবে না। কারণ এ সপ্তাহটা ওর নানা কাজ আছে। ব্যস্ত থাকবে। বুঝেছ?

হ্যাঁ।

আমি যে বারণ করেছি তা বোলো না কিন্তু।

না বউদি। দাদা কিন্তু ঠিকই বলে। তোমরা ছাড়া আমার তো আপনজন কেউ নেই। দাদা বলছিল, হঠাৎ আমার কিছু যদি হয় তা হলে টাকাটা মার যাবে।

মাগো! অমন কথা বলেছে ও? ছিঃ মৃগীরোগ নিয়ে কত লোক কত কি করছে। মৃগী রুগী বলেই ওরকম ভাবতে হয় নাকি?

চয়ন চুপ করে থাকে।

বউদি বলে, ও খুব খারাপ কথা বলেছে তোমাকে। মোটেই ওরকম বলা উচিত হয়নি।

বউদি চলে যাওয়ার পর আকাশপাতাল ভাবতে বসল চয়ন। টাকাটা এক মাসের জন্য বাঁচালেও শেষ অবধি অয়নের থাবা থেকে টাকাটা বাঁচানো যাবে না, চয়ন জানে। তার তেমন প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই। টাকাটা শেয়ারের বাজারে গাঁটগচ্চা যাওয়ার চেয়েও কি কোনও মহৎ উপায়ে ব্যয় হতে পারে না? টাকাটা জলে গেছে ধরে নিয়েই সে চিন্তা করল, টাকাটার একটা ভাল গতি হওয়া দরকার।

আজ সে অনেকটাই তৃপ্ত। টাকাটা যোগ্য হাতে গেছে। কৃষ্ণজীবন এই পৃথিবীটাকে ভালবাসেন। প্রাণপণে তিনি মানুষের সর্বনাশকে বাঁধ দিয়ে আটকানোর একটা চেষ্টা করছেন। পঞ্চাশ হাজার টাকা হয়তো কিছুই নয়, তবু এই পৃথিবীর জন্য তো কিছু একটু অবদান থাকল চয়নেরও।

আজ সকালে শীতের কবোষ্ণ রোদ নেই। হাওয়া দিচ্ছে, আকাশ মেঘলা। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে মাঝরাত থেকে। চয়নের মন ভাল নেই।

আজ সকাল থেকে ঘরে শুয়ে শুয়ে মরার কথাই ভাবছিল চয়ন। বেঁচে থাকার প্রলম্বিত যন্ত্রণা তাকে রোজই পীড়িত করে আজকাল। এই জীবন যাপন করে যাওয়ার অর্থ কি? কেন তাকে বেঁচে থাকতেই হবে?

ভাবতে ভাবতে মৃত্যুর এমন প্রেমে পড়ে গেল যে সে নিজের মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করতে পারল। নিশ্চিত তার মৃত্যু ঘটবে আত্মহননের পথে। সবচেয়ে সহজ উপায় কোনও হাইরাইজ বাড়ির ছাদে উঠে চোখ বুজে লাফিয়ে পড়া। সেইভাবেই মরবে সে। ঠিক করে ফেলল।

বেলা নটা নাগাদ যখন বিছানা ছেড়ে উঠল তখনই সিঁড়িতে লঘু পায়ের শব্দ। এবং তার পরেই তার দরজায় এসে যে দাড়াল তাকে এই মেঘলা দিনে প্রত্যাশাই করেনি সে। অনিন্দিতা।

অনিন্দিতা ঝলমলে হাসি হেসে বলল, কেমন আছ চয়ন?

চয়নের মনটা হঠাৎ আনন্দে ভরে গেল। সত্যিকারের খুশির হাসি হেসে বলল, তুমি এই বৃষ্টি মাথায় করে কোথা থেকে এলে?

চৌকির এক পাশে বসে অনিন্দিতা আগে বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাল। তারপর বলল, গতকাল পিসির বাড়িতে এসেছিলাম। আজ ফিরে যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাচ্ছি। অনেক দিন তোমাকে দেখিনি।

তোমাকেও কতদিন দেখিনি অনিন্দিতা! তুমি চলে যাওয়ার পর থেকেই আমি একদম বন্ধুহীন।

সত্যি? আমি না থাকায় তোমার খারাপ লাগে?

খুব খারাপ লাগে।

তোমার কি শরীর খারাপ?

মুখটা একটু বিকৃত করে চয়ন বলল, শরীরই তো আমাকে খেয়ে ফেলছে। সারাক্ষণ শরীরের কথা ভাবতে ভাবতে আমি কি পাগল হয়ে যাবো অনিন্দিতা?

কেন, তোমার নতুন করে আবার কী হল?

আজকাল ফ্রিকোয়েন্ট অ্যাটাক হয় এপিলেপসির! কেন হয় তা বুঝতে পারি না। আজ একটু আগেই ভাবছিলাম, বেঁচে থাকা মানে যন্ত্রণাই যদি হয় তা হলে যন্ত্রণাকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি? আমি সুইসাইডের কথা ভাবছিলাম।

ছিঃ চয়ন! তোমাকে আমি খুব বকব আজ। কেন ওসব ভেবেছ তুমি? তোমার বেঁচে থাকাটা বুঝি শুধু তোমারই প্রয়োজন?

আর কার?

ভাল করে ভেবে দেখ তো, তোমাকে কেউ সত্যিকারের ভালবাসে কি না।

চয়ন অনাবিল হেসে বলল, তুমি বাসো।

তা হলে? বলে সেই ঝলমলে হাসিটা হাসল অনিন্দিতা।

কে জানে কেন আজ অনিন্দিতাকে বড় ভাল দেখাচ্ছে। স্বাস্থ্য হয়তো ভাল হয়েছে কিছুটা। একটা চটক এসেছে মুখশ্রীতে।

অনিন্দিতা বলল, ওখানে গিয়ে কিন্তু আমরা বেশ ভাল আছি। একটা বাগান করেছি। আমি ফুলের চর্চা করি, মা করে তরকারির চাষ। পলিউশন নেই। গ্রাম-গ্রাম ভাব। বেশ লাগে। সবচেয়ে ভাল লাগে কী জানো?

কী?

সকালে পাখির ডাক। কত পাখি যে আসে!

তোমার শরীর একটু সেরেছে।

সেরেছে মানে? মাঝখানে তো মুটিয়ে যেতে শুরু করেছিলাম। আমাদের নার্সিং হোমে একজন যোগ টিচার আসেন। তার কাছে রেগুলার ব্যায়াম আর আসন শিখছি।

মানুষ বেঁচে থাকতে ভালবাসে বলে বেঁচে থাকার জন্য কত কিছু করে। ব্যায়াম, আসন, ডায়েটিং। চয়নও কি বেঁচে থাকতে ভালবাসে না? খুব বাসে। কিন্তু তার জীবন তো অন্যের মতো নয়।

কী ভাবছ চয়ন?

কত কি! আমি তো সারা দিন ভাবি।

আমার সব অপরাধ কি ক্ষমা করেছ চয়ন?

অপরাধ! বলে চয়ন অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, কিসের অপরাধ?

ভুলে গেছ বুঝি? বাঁচলাম। আমি তো ভাবি চয়ন আমার সব খারাপ স্মৃতি মনে রেখেছে, আমার ভালটুকু ভুলে গেছে।

আমার স্মরণশক্তি খুব ভাল। তোমার কিছুই ভুলিনি। ভাবতে গেলেই সব ফোটোগ্রাফের মতো চোখের সামনে ভেসে ওঠে। রোগা-ভোগা লোকদের বোধ হয় শরীরের কারণেই স্মৃতিশক্তি প্রখর হয়।

স্মৃতিশক্তি এমনিতেই অনেকের ভাল হয়। তুমি কবে আমাদের বাড়ি বেড়াতে যাবে চয়ন?

কবে যাবো? যাবো একদিন।

নাঃ ওসব এড়ানো কথা। চলো না একদিন, তোমার খারাপ লাগবে না, এখানে তো একা মুখ বুজে পড়ে থাকো। ওখানে গেলে একটু কথা-টথা তো বলতে পারবে। আজ যাবে?

আজ? নাঃ আজ মেঘলা করেছে।

তাতে কি? মেঘলা দিনে কি লোকে ঘরে বসে আছে? আমিও তো যাবো বাড়ি। চলো না চয়ন।

চয়ন ভাবছিল। সিদ্ধান্ত নিতে তার দেরি হয়।

অত ভেবো না, ভাবলে আর হবে না। চলো তো, উঠে পড়ো।

তা হলে একটু বোসো। আমি এখনও মুখে চোখে জলও দিইনি।

ঠিক আছে, বসছি। তুমি যাবে ভাবতেই এত আনন্দ হচ্ছে আমার। মা-বাবা ভীষণ খুশি হবে।

উত্তর চব্বিশ পরগনায় গঞ্জ মতো জায়গায় অনিন্দিতাদের বাড়ি। পাকা বটে, কিন্তু চেহারার দৈন্য তাতে ঘোচেনি। কিন্তু দৈন্য ঘুচিয়েছে সতেজ গাছপালা, দুর্বোঘাস আর আলো-হাওয়া। বাড়িটাকে কী যত্ন করে পরিষ্কার রাখে ওরা।

চয়নকে দেখে সত্যিকারেরই খুশি হলেন অনিন্দিতার মা আর বাবা। মা বারবার বলতে লাগলেন, তোমাকে ছেলের মতোই দেখি বাবা, ছেড়ে এসে মনটা খারাপ লাগত। চোখে জল এসেছে কতবার!

সত্যি?

সত্যি নয়? ওদের জিজ্ঞেস করো। ভাবতাম চয়নটা কী খায় কী পরে কে জানে! শরীর খারাপ হলে তো কেউ খোঁজও নেবে না।

চয়নের মন থেকে মৃত্যুচিন্তা উবে গেল। পৃথিবীর এই একটা কোণে এখনও তার জন্য তিনটি উত্তপ্ত হৃদয় উন্মুখ হয়ে থাকে। তার আর বেশি দরকার কি? এটুকুর জন্যই কি বেঁচে থাকা যায় না?

যায়। হয়তো যায়। ভেবে দেখবে চয়ন।

১১৭

নিমাইয়ের পাঠানো টাকা দু'মাস ধরে নিচ্ছে না বীণাপাণি। ছেলেটা টাকা নিয়ে আসে, বীণা দ্বিতীয় মাসে বলেই দিল, টাকা আর নেবো না। ওকে গিয়ে বোলো আর যেন না পাঠায়।

নিমাইয়ের সঙ্গে একটা মিটমাট তো করতেই চেয়েছিল বীণাপাণি। নির্লজ্জের মতো চাকরি চেয়েছিল ওর কাছে। বিষ্টুপুর থেকে বাবার শ্রাদ্ধের পর ফেরার পথে একটা রাত বনগাঁয়ে থাকতে অনুরোধ করেছিল। তা নিমাই পাত্তা দিল না। টাকা হয়ে লেজ ফুলেছে। সকলেরই হয়, নিমাই কি আলাদা রকমের হবে? অত যার গুমোর তার টাকা হাত পেতে নেবে, এমন বেহায়া এখনও হয়নি বীণা।

একার একটা পেট চলে যায়। কিন্তু বেশিদিন কি যাবে? পয়সাকড়ি তলানিতে এসে ঠেকেছে। এক পয়সাও আয় নেই। বীণা তো আর মানুষের বাড়িতে ঝি-গিরি করতে পারবে না। কুসুম একটা চাকরির প্রস্তাব এনেছিল। বেবি-সিটিং। সারা দিন বাচ্চা সামলাতে হবে, তিন শো টাকা। কিন্তু কেন যেন ইচ্ছে হল না। তার নিজের বাচ্চা নেই, বাচ্চা মানুষ করার অভিজ্ঞতাও হয়নি। কুসুমকে বলল, ও আমি পারব না। বেবি-সিটিং করতে হলে নিজের বাচ্চা মানুষ করার অভ্যাস থাকলে হয়।

কুসুম দুষ্টু হাসি হেসে বলল, তোমারই বা হল না কেন বলল তো?

আহা! তখন নাটক-নাটক করে দম ফেলার সময় নেই। বাচ্চা হলে পারতাম?

কিন্তু এখন তো বুঝছ, একটা কুঁচো কাঁচা থাকলে কত ভাল হত!

কথাটা বীণারও খুব মনে হয়। নিমাই মুখচোরা মানুষ, কিন্তু এক-আধবার সেও বলেছে, একটা বাচ্চা হলে হত।

উল্টে ধমক দিয়েছে বীণাপাণি, দুটো পেটেরই জোগাড় হয় না, আর একটাকে এনে কষ্টের মধ্যে ফেলি আর কি!

আসল কথা তখন ফিগার-টিগারের কথা খুব মনে হত বীণার। যাত্রায় পরিশ্রম তত কম নয়। তার ওপর সিজনের সময় কোথায় কোথায় চলে যেতে হত। বাচ্চা থাকলে পারত ওসব?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, হয়নি বলে আমার দুঃখ নেই। অভাবের সংসারে তো কষ্টই পেত।

কুসুম চোখ বড় করে বলল, আর অভাবের দোহাই পারছ কেন গো বীণাদি? নিমাইদার কি পয়সার অভাব?

নিমাইদার পয়সা নিমাইদারই, আমার তো নয়।

তুমি নাও না কেন?

বীণা একটু চুপ করে থেকে বলে, আজ বুঝতে পারছি সে আমাকে ঘেন্না করে। আমার বাতাসটাও সে সইতে পারে না।

কী যে বলল না তুমি! নিমাইদা কি সেরকম মানুষ?

আমি ঠিকই বুঝি। আমি যা বুঝি তা কি তোরা বুঝতে পারবি? এ বুকটায় আজ বড় জ্বালা।

এবারও কি টাকা ফিরিয়ে দিলে?

দিলাম। ওর টাকা আর নেবো না। বাঁধন যখন কেটেই গেছে তখন কোন লজ্জায় টাকা নেবো বল?

এ বাঁধন কি কাটে?

ওসব তোদের সেকেলে ধারণা। অগ্নিসাক্ষী, নারায়ণসাক্ষী ওসবেরও কোনও মানে হয় না। মেয়েদের ভয় খাওয়ানোর জন্য ওসব চালাকি করা হয়। যাতে স্বামীর সঙ্গে যুঝতে না পারে। আজকাল কত ধর্মের বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে।

সব বিয়েই তো আর ভাঙছে না।

সব বিয়ে ভাঙবে কেন? সকলের কি সমান কপাল?

কুসুম একটু চুপ করে থেকে বলল, সকলের কথা ছেড়ে দাও। তোমারটা নিয়ে ভাবো।

ভাবাভাবির কিছু নেই। বিয়ে আমার সইল না।

ওরকম করে বোলো না তো! আমার খারাপ লাগে। তোমার বিয়ে মোটেই ভাঙেনি। ছাড়াছাড়ি হওয়ার মানেই কি ভাঙা? স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কত মন কষাকষি হয়।

এ তো সে নয়। ও আমাকে মন থেকে উপড়ে ফেলেছে।

তাহলে কি ফি মাসে টাকা পাঠাত?

দয়াধর্ম নেই সে কথা তো বলিনি। কিন্তু বউ কি শুধু দয়ার পাত্রী? আর কিছু নয়? আমি তার দয়ার দান নেবো কেন? তার আগে কি একগাছা দড়ি এ গলার জন্য জুটবে না?

বড্ড মন খারাপ করে দাও তুমি। টাকাটা ফিরিয়েই বা দিচ্ছ কেন? ফিরিয়ে দিলে বুঝি নিমাইদার অপমান হয় না? একবার ফিরিয়ে দিয়েছ, তা সত্ত্বেও তো পরের মাসে পাঠিয়েছে!

বললাম তো, এ সব ওর দয়া।

কুসুম আর কিছু বলল না। কিন্তু দিন তিনেক বাদে কাঁচরাপাড়ায় দিদির বাড়ি যেতে হয়েছিল তাকে, দিদির ছেলের অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্নে। পরদিন গিয়ে নিমাইকে তার দোকানে ধরল।

এই যে নিমাইদাদা, কেমন আছ?

ওরে বাবা, এ যে কুসুম! আয় আয় বোস এসে। গরম চপ ভাজা খা দুটো।

খাওয়ার কথা পরে হবে। তোমার সঙ্গে ঝগড়া আছে।

ঝগড়া! না দিদি, সে পেরে উঠব না। জন্মে কারও সঙ্গে ঝগড়ায় এঁটে উঠিনি। তা বৃত্তান্তটা কী?

তোমার বউ তো শুকিয়ে মরতে বসেছে, তা জানো?

নিমাই একটু গম্ভীর হল। একটু বিষন্ন। বলল, তার কর্মফল আমি কি করে খণ্ডাই বল তো! যাত্রার চাকরিটা গেল। আমার টাকা নিচ্ছে না। এখন উপায় কী?

উপায় অনেক আছে।

কী উপায়?

তুমি অন্য লোকের হাতে টাকা পাঠাও কেন? নিজে যেতে পারো না?

কেন, বীণা কি তা নিয়ে কিছু বলেছে?

তা বলেনি, তবে সে অভিমানী মানুষ। মনে হয় ওভাবে টাকা নিতে তার মানে লাগে।

নিমাই একটু ভেবে বলল, কিন্তু আমার যাওয়াটা কি ঠিক হবে?

কেন হবে না?

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমি একজন পরপুরুষই তো হয়ে গেছি এখন। ভাবি, গেলে হয়তো আর কারও আঁতে লাগবে।

ওমা! কার কথা বলছ?

সজলবাবুর কথাই বলছি। এই তো কালও এসে গেলেন। কবিরাজি কাটলেট করে খাইয়ে দিলাম। বীণাকে বিয়ে করবেন বলে বড় উচাটন হয়ে পড়েছেন।

কুসুম একটু স্তব্ধ থেকে বলল, বীণাদিও কি তাই বলেছে তোমাকে?

না। সে উল্টো কথাই বলে। তবে হয়তো লজ্জায়।

নিমাইদা, সজল কিন্তু ঠিক কথা বলছে না।

বেঠিক বলছে?

কুসুম একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলল, সজলবাবু যায় আসে ঠিকই। কিন্তু সম্পর্ক ওরকম হলে আমি জানতে পারতাম।

নিমাই উদাস গলায় বলে, আমার তো বেশি কিছু জানারও নেই। বিয়ে করতে চাইলে করুক সজলবাবু বলছেন, বিয়ের পর দুজনে মিলে যাত্রার দল খুলবেন। কিছু টাকা চান। আমি বলেছি, যাত্রাদল খোলার মতো টাকা আমার নেই। তবে দশ-বিশ হাজার হয়তো পেরে যাবো। টাকা যাক, তবু বীণা তো মনের মতো কাজ নিয়ে থাকতে পারবে। তার কাছে আমার মেলা ঋণ।

ছাই ঋণ! তোমাকে দুর্দিনে দেখেছে, সে তো বউ আর বর নিজেদের জন্য করেই। ওরকম ভাবো বলেই তো তোমরা কেউ কারও আপন হতে পারো না। একে অন্যের জন্য করবে বলেই তো বিয়ে, অত ভদ্রতা কিসের? তোমার সব ভাল, কিন্তু ওই বিগলিত ভাবটা ভাল নয় কিন্তু। ঋণ-টিন কিছু নেই তোমার। আর শোনো, যার বউ পরে টেনে নিয়ে যায় সে কিন্তু মোটেই উঁচুদরের লোক নয়। সজল এখানে আসে আর তুমি জোড়হাত করে তাকে কবিরাজি খাওয়াও, এ কেমন কথা! থাপ্পড় কষাতে পারো না।

ওরে বাপ রে! তোর যে দেখি আজ রণচণ্ডী মূর্তি।

আমার বড্ড রাগ হয় তোমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে। যেমন দেবা তেমনি দেবী। আচ্ছা, একটা সত্যি কথা বলবে?

বল না!

তোমার কেউ নেই তো!

তার মানে?

বলি, কাউকে পছন্দ-টছন্দ করে বসোনি তো এর মধ্যে?

নিমাই খুব হাসল, বলে কি রে পাগল! আমি কি মেয়েমানুষের দিকে তাকাই? তবে বিয়ের প্রস্তাব যে আসেনি তা নয়। কিন্তু নাকে খত দিয়ে রেখেছি, ও পথে আর নয়।

যাক বাবা, বাঁচা গেল। ওদিকে বীণাদিদিও এইসব ভেবে ভেবে অস্থির। টাইফয়েডের সময়ে নাকি প্রায়ই স্বপ্ন দেখত যে, তুমি ফের বিয়ে বসেছ। একবার তো ঘুম থেকে উঠেই আমাকে তোমার কাছে তক্ষুনি পাঠায় আর কি। বলল, যা গিয়ে দেখে আয় তো সত্যিই বিয়ে করেছে কি না।

নিমাই হাসল না। করুণ মুখ করে বলল, ওরকম সন্দেহের কোনও কারণ নেই।

সে আমি বলেছি। নিমাইদাদা সেরকম লোক নয়। তবু তার সন্দেহ যায় না। শোনো, কালই যাও। নিজের হাতে টাকাটা দিয়ে দেখ নেয় কি না। তার ধারণা তুমি তাকে ঘেন্না করো।

ছি ছি। কেষ্টর জীব, তাকে ঘেন্না করব কি রে! আমার তো নেড়ি কুকুরটাকেও ঘেন্না হয় না।

সে কথাটাই বুঝিয়ে দিয়ে এসো। তা বলে নেড়ি কুকুরের কথাটা তুলো না। তোমার তো আক্কেল নেই।

যাবো'খন।

না না। খন বললে হবে না। কালই যাও। হাতে একটু সময় নিয়ে যেও। গিয়ে হুটোপাটি করে চলে এসো না। দুটো কথা বলার যেন সময় পায় বেচারি।

আমি গেলে টাকা নেবে?

নেবে। তার অবস্থা ভাল যাচ্ছে না। গিয়ে আবার বলে বোসো না যেন যে আমি কাঁচরাপাড়ায় এসেছি। তাহলে ভাববে আমিই তোমাকে পাঠিয়েছি। তুমি ভাবখানা করবে যেন নিজের গরজেই গেছ।

খুব হাসল নিমাই। বলল, অত শেখাচ্ছিস কেন? আমি তেমন আহাম্মক নই। এখন চপ খা।

দাঁড়াও। কথা এখনও শেষ হয়নি। বীণাদিকে নিয়ে ফের ঘর করবে তো!

নিমাই একটু ভাবিত হল। বলল, দেখ, ওসব তো চুকেবুকেই গেছে। ঘর করার মতো মন বীণার আর নেই। একবার বারমুখো হয়ে পড়লে মেয়েদের আর ঘরে মন বসতে চায় না।

তুমি তো সবজান্তা কি না, খুব মন বসবে। তাকে একটা সুযোগ দাও।

মাথা নেড়ে নিমাই বলে, আমারও মনটা মরে গেছে কি না। আর কেমন যেন সম্পর্কটায় বিশ্বাস হয় না।

কাতর গলায় কুসুম বলে, ওরকম বোলো না গো। বীণাদিকে তো রোজ দেখছি। কত যে কাঁদে, কত যে পোড়ে তা তুমি জানো না।

সে তার যাত্রাদলের জন্য কাঁদে রে। আমার জন্য নয়। আমি যখন তার কাছে থাকতাম তখনও কি আমাকে মানুষ বলে মনে করত? ছিলাম অন্নদাস। অতগুলো ডলার আর পাউন্ড নিয়ে চেপে বসেছিল, একবারটি বিশ্বাস করে আমাকে বলেনি পর্যন্ত।

এখন চপ খাওয়াও তো।

চপ খেয়ে কুসুমের মুখে হাসি ফুটল। বলল, বড্ড ভাল তো। আদাকুচি, হিং আরও কী কী সব দিয়েছ। খুব স্বাদ হয়েছে। এইজন্যই না তোমার দোকান এত চলে। আহ, এরকম একখানা দোকান বনগাঁয়ে থাকলে বেশ হত!

কুসুমকে আরও কয়েকটা পদ খাওয়াল নিমাই। কুসুম আহ্লাদে আটখানা। গরিবের মেয়ে, মরা জিব। ভাল-মন্দ বিশেষ জোটে না। সুখাদ্য খেয়ে আজ যেন মুখখানা আলো হয়ে গেল।

মুখ ধুয়ে মশলা মুখে দিয়ে কুসুম বলল, নিমাইদাদা, তোমার টাকা হয়েছে, সে ভগবানের দয়া। কিন্তু তোমারটা খাবে কে বলো তো! এত তো করলে, জন না থাকলে কি হয়? আমি বলি কি, বীণাদিকে ঘরে নিয়ে এসো। সে তো তোমার চাকরিও করতে চেয়েছিল।

তুই বললেই তো হবে না। তারও মতামত আছে। সেও তো একটা আস্ত মানুষ।

আচ্ছা সে নয় হল। তোমার অমত নেই তো!

আগে ভাবতে দে।

কুসুম চলে যাওয়ার পর সত্যিই ভাবতে বসল নিমাই। খুব ভাবল। ছোট্ট একটা মেয়েকে সেই যে বিয়ে করে আনল সেই দিনের ঘটনা থেকে এ পর্যন্ত সব খুঁটিনাটি ভাবল নিমাই। বিয়ের সময়কার সেই কিশোরীর চোখে ছিল স্বপ্ন। বুকভরা অসহায় ভালবাসা। নিমাইকে পেয়ে যেন উথলে উঠত। তারপর অভাবে কষ্টে সেই ভালবাসা মরল। নিমাইকে বাঁচাতে যাত্রাদলে গেল আর তখনই খানিকটা হাতছাড়া হয়ে গেল বীণা। আবার কিছুটা ফিরে পাওয়া গেল অন্যরকম বীণাকে। তাদের দাম্পত্য জীবনে অনেক রকম সম্পর্কের রদবদল হয়েছে। এখন বড় দূরের হয়েছে সম্পর্ক। বীণাকে এখন ছেড়ে দিতেই পারে নিমাই। কিন্তু তাতে বীণার কতটা ভাল হবে?

পরদিন সকালেই বনগাঁ রওনা হল নিমাই।

বীণার চেহারা এতই খারাপ হয়ে গেছে যে, তাকে দেখে চেনাই যায় না। মুখ শুকিয়ে এইটুকু। শরীরটাও যেন রোগা হয়ে কুঁকড়ে গেছে। বীণা কোনওদিনই লম্বাচওড়া ছিল না। ছোট গড়নের বীণা রোগা হয়ে যাওয়ায় দেখাচ্ছে যেন বালিকার মতো। কিন্তু মুখে গভীর বিষণ্নতা আর হতাশা তাকে বুড়িয়েও দিয়েছে অনেক।

দেখে বুকে একটা ধাক্কা খেলো নিমাই। সে জিজ্ঞেসই করল না, কেমন আছ? দরকার নেই। বীণা যে ভাল নেই তা তো দেখেই বুঝতে পারছে।

দরজাটা ছেড়ে দিয়ে বীণা বলল, ভিতরে আসবে কি? নাকি নষ্ট মেয়ের ঘরে ঢুকলেও তোমার জাত যাবে!

এই চিমটি-কাটা কথাটার জবাব দিল না নিমাই। জুতো ছেড়ে সে ঘরে ঢুকল। সেই আগের মতোই সব আছে। তবে দৈন্যদশাটা আজ চোখে পড়ল নিমাইয়ের। বোধ হয় সে নিজে আজকাল ভাল থাকে বলে এ ঘরটার দারিদ্র্য তার বেশি করে চোখে লাগছে।

বিছানার একধারে সন্তর্পণে বসল নিমাই। কিছু বলল না।

বীণা জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বলল, একটা খবর দিয়ে আসা উচিত ছিল। আচমকা দেখে আমি এত চমকে গেছি যে, বুকটা ধড়াস-ধড়াস করছে। স্বাসকষ্ট হচ্ছে।

চমকে গেলে কেন?

তুমি কখনও আসবে বলে ভাবিনি তো!

মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল নিমাইয়ের। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, অম্বলটা কি খুব হচ্ছে নাকি আজকাল?

হ্যাঁ। আজকাল যেন জলও সহ্য হয় না।

খুব খালি পেটে থাকো বোধ হয়?

এ কথাটার জবাব দিল না বীণাপাণি। জবাবের দরকারও নেই। মেয়েরা একা হলে খাওয়াদাওয়ার ঠিক থাকে না। নিজের জন্য কে আর কষ্ট করে, এরকম একখানা ভাব নিয়ে হয়তো একবেলা রান্নাই চড়াল না। খিদে পেলে চা খেয়ে খিদে মেরে দিল।

ঠাকুরের আসনের দিকে চেয়ে দেখছিল নিমাই। মেলা পট আর ছবি গাদাগাদি করে রাখা। সামনে ফুল, বাতাসা, জল, নিবে-যাওয়া ধূপকাঠির দানি।

পুজোআচ্চা করো বুঝি আজকাল?

ও আমার পুতুলখেলা।

নিমাই একটু হাসল। চারদিকে চেয়ে দেখে বলল, মেঝেটা এর মধ্যেই ফেটেফুটে গেছে দেখছি।

হ্যাঁ। গাঁথনি তো তেমন নয়। ইট পেতে সিমেন্টের পলেস্তারা দিয়েছিলাম। ও কি টেকে?

ঠাণ্ডা জল আছে?

এ কথায় বীণা একটু শিউরে উঠল যেন। চাপা গলায় বলল, এ মা! ছিঃ ছিঃ! তোমাকে জলই দিইনি।

বলেই আবার থমকাল, আমার হাতে খাবে তো জল?

কেন, দোষ হবে নাকি?

হবে না! আমি তো নষ্ট মেয়ে।

নিমাই কিছু বলল না। বুকটা ব্যথিয়ে আছে। বীণা একটানা স্টিলের পরিষ্কার গেলাসে মাটির কলসি থেকে জল গড়িয়ে দিল।

জলটা খেয়ে নিমাই বলল, ডান হাতের আংটিটা কোথায়?

নতমুখী বীণা একটু চুপ করে থেকে খুব চাপা গলায় বলল, গত মাসে বেচতে হয়েছে।

নিমাই থম ধরে রইল। বিয়ের সময় তারা অনেক কষ্ট করে ওই আংটিটাই নতুন বউকে দিতে পেরেছিল আশীর্বাদ হিসেবে। অল্প সোনার পলকা আংটি। বীণা যখন জল দিত, ভাত দিত তখন বরাবর নজরে পড়েছে নিমাইয়ের।

চা করবো?

নিমাই একটু ভেবে বলল, করতে পারো। তবে শুধু এক কাপ। আমি খাবো। তুমি খাবে না।

বীণা একটু হাসল। বলল, তাই হবে। কিন্তু চা-পাতা ভাল নয়। তোমার ভাল লাগবে না। সস্তা চা তো।

আমার কি বাছাবাছি আছে? নেশাও নেই। তবু করো একটু।

বীণা চায়ের সঙ্গে দুখানা বিস্কুটও দিতে পারল না। কোনওদিন বিস্কুট ছাড়া চা দেয়নি। আজ ভিতরে ভিতরেও বীণাপাণি ক্ষয়ে গেছে। অহংকারটুকু কি আছে এখনও? সেটাই ধরতে পারছে না নিমাই। পোড়া কপালের কথা হল, তার নিজের চোখটাই আজ বড় ঝাপসা। বড় কষ্ট হচ্ছে বীণার জন্য। এ তার বউ ছিল বটে, কিন্তু আজ যেন মাঝখানে গহীন সমুদ্দুর।

চা করার সময়টুকু একটু ফাঁক পেল নিমাই। কী বলার আছে বীণাকে তার? কিছুদিনের সম্পর্কহীনতায় তারা কি পরস্পরের কাছে পর হয়ে গেছে? আড় ভাঙছে না। লজ্জা-লজ্জা করছে। কথা আসছে না।

কমদামী চা-পাতা দিয়ে খুব যত্নে চা করে আনল বীণা। নিমাই বসে বসে চা খেল। খারাপ লাগল না। চা শেষ করে বলল, একটা কথা বলতে আসা।

বলো।

সজলবাবু একটা দল খুলতে চান। টাকার জন্য ঘোরাঘুরি করছেন। তোমার মত আছে বলে বলছেন। এমন কথাও বলছেন যে, আমাকে সেই যাত্রাদলের অর্ধেক হিস্যাদার করে দেবেন।

সভয়ে বীণাপাণি বলল, মা গো! এত মিথ্যে কথাও বলতে পারে মানুষ!

উনি যে সত্যি কথা বিশেষ বলেন না তা বুঝতে পারছি। সেইজন্যই তোমার কাছে যাচাই করে গেলাম।

আর কী বলেছে?

ওইসব পুরনো কথাই।

ও বোধ হয় আমার নামে তোমার কাছে দুর্নামও করে, তাই না?

না তো! সজলবাবু তোমার খুব প্রশংসাই করেন।

ওর কোন কথাই বিশ্বাস কোরো না। কিছু করার জন্য এত মরিয়া হয়ে উঠেছে যে ওর বুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

ও কি তোমার কাছে আসে?

না, আমি ওকে আর বিশ্বাস করি না। আসতে বারণ করে দিয়েছি।

মানুষটা খারাপ নন। তবে অভাবে স্বভাব নষ্ট।

ওকে টাকাপয়সা দিও না। নষ্ট করবে।

বড্ড নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে আছেন পেছনে। কী যে করি। চক্ষুলজ্জা বলেও তো কথা আছে।

চক্ষুলজ্জা! বলে বীণাপাণি রাগের গলায় বলল, চক্ষুলজ্জায় পড়ে একটা জোচ্চোরকে টাকা দেবে! এসব কী কথা!

নিমাই খুব সংকোচের সঙ্গে বলল, আমি বড় দুর্বল মানুষ বীণা। লোক বিপদে পড়ে এলে আমার নিজের অতীতের কথা মনে হয়। ভাবি, কিছু সাহায্য করলে হয়তো এ লোকটা দাঁড়িয়ে যাবে।

বীণা তার দিকে একটু রুষ্ট চোখে চেয়ে বলল, দয়াদাক্ষিণ্য অনেক দেখাতে পারবে। কিন্তু তার জন্য সজল কেন?

নিমাই বীণার চোখে চোখ রাখল। অনেকক্ষণ। তারপর বলল, আমাকে পাহারা দেবে কে বীণা?

বীণা মাথা নত করল। ফের জানালার কাছে গিয়ে বাইরে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আজ তোমার রান্নার জোগাড় তো কিছু দেখছি না!

ক্ষীণ কণ্ঠে বীণা বলল, এখনও তো বেলা হয়নি। মোটে দশটা বাজে। আরও পরে রান্না চড়াই।

আজ কী রাঁধবে?

কেন, তুমি খাবে?

খেলে?

রাঁধব। যা চাও রাঁধব।

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হঠাৎ বলল, দোকানপাটে ধারদেনা কত আছে?

বীণা একটু চুপ করে থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, আছে কিছু। শ'পাঁচেক হবে বোধ হয়। কেন?

এভাবে চলবে না।

না চললে উপায় হবে।

কী উপায়?

সে আছে।

মরার কথা ভাবছ নাকি?

ভাবলে? বলে জানালার কাছ থেকে ফিরে তাকাল বীণা।

নিমাই বীণার দিকে চেয়ে থেকে বলল, চেহারাটা তো নষ্ট করেছই, রঙটাও কত কালো হয়ে গেছে।

এসব যাওয়ার জন্যই। সব যাবে।

নিমাই দুধারে মাথা নেড়ে বলল, তা হয় না।

ঘণ্টা দুই বাদে পাড়াপড়শিরা দেখল একটা সুটকেস আর গোটানো বিছানা পায়ের কাছে রেখে রিক্সায় পাশাপাশি বসে নিমাই আর বীণাপাণি বাস রাস্তার দিকে যাচ্ছে। ঠিক যেমন গাঁ-গঞ্জের নতুন বিয়ের বর-বউ বিয়ের পর বরের বাড়ি আসে। নটী বীণাপাণির মুখে যে কে নতুন কনের মতো লজ্জা মাখিয়ে দিয়েছে কে জানে!

১১৮

আপনি কি ভেবে দেখেছেন যে, এইসব প্রেম-টেম এবং বিয়ে-টিয়ে আর কতদিন সমাজপতিরা টিকিয়ে রাখতে পারবেন! একবিংশ শতকে কেমন হবে নর-নারীর সম্পর্ক? দাম্পত্য জীবন বলে কিছু থাকবে? থাকবে লাইফ-লং পার্টনারশিপ?

ঝুমকি খুব সিরিয়াস মুখ করে বলল, কেন থাকবে না?

সামান্য উত্তেজিত হেমাঙ্গ বলে, কী করে থাকবে? ভারতবর্ষের এক কোণে বাস করে কি পৃথিবীর ট্রেন্ড বোঝা যায়?

ঝুমকি বলল, কেন যাবে না? আমরা বুঝি পৃথিবীর খবর রাখি না?

তাহলে কী করে বলছেন যে, এসব থাকবে?

থাকবে, কারণ মানুষ বারবার তার জীবনে একটা রিনিউয়াল ঘটায়। অনেক প্রথা অভ্যাস ভেঙে ফেলে। কিন্তু আবার সেগুলোকেই আঁকড়ে ধরে।

হেমাঙ্গ যেন চিন্তিতভাবে ঝুমকির মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, আপনি কি প্রগতি পছন্দ করেন?

প্রগতি একটা ভেগ টার্ম। স্পেসিফিকালি বলুন, প্রগতি বলতে কোনটা!

চিন্তিত হেমাঙ্গ বলে, আমিও কি ছাই জানি! এই যা সব হচ্ছে আর কি।

অনেক কিছু নতুন হচ্ছে, আবার পুরনোও থেকে যাচ্ছে তো। শুধু আমেরিকাই তো নেই, পৃথিবীতে ভারতবর্ষও তো আছে।

হেমাঙ্গর ভাঙা শরীর জোড়া লেগেছে। বাঁ পায়ে সামান্য একটু খোড়ানো ছাড়া আর কোনও দৃশ্যমান ত্রুটি নেই! বাঁ হাত কিছু কমজোরি। ফিজিও থেরাপি চলছে। আশা করা হচ্ছে মাসখানেকের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে যাবে। ঝুমকি গত দু মাস ধরে রোজ বিকেলের দিকে আসত, সঙ্গে মাকে নিয়ে। কখনও কখনও একাও। গত সাতদিন হেমাঙ্গ অফিস করছে বলে আসা কমিয়েছে। শনি আর রবিবার সকালের দিকে আসে। দুপুরে চলে যায়। এখনও তাদের মধ্যে আপনি সম্বোধন রয়ে গেছে। দৃশ্যত দু'জনে পরস্পরের দিকে এক চুলও এগোয়নি।

ঝুমকি এক কাপ দুধে কফি গুলে এগিয়ে দিল হেমাঙ্গকে। হেমাঙ্গ কফিটায় একটা চুমুক দিয়ে বলল, ভারতবর্ষ কি পাল্টে যাচ্ছে না? ব্রিটিশ আর আমেরিকান কালচার বরাবর ভারতবর্ষকে দূর থেকে রিমোট কন্ট্রোল করে।

আপনি তো নিশিপুরে গিয়ে মাঝে মাঝে থাকেন। সেখানে কী দেখতে পান বলুন তো?

ওঃ, গ্রামের কথা আলাদা। সেখানে অন্যরকম।

গ্রামই তো ধরে রাখে।

সবেগে মাথা নাড়ে হেমাঙ্গ, গ্রাম দুর্বল। দেশের কালচারে তার প্রভাব খুব কম।

আচ্ছা, আজ আমরা এসব নিয়ে আলোচনা করছি কেন?

হেমাঙ্গ একটু হেসে বলল, আমারই দোষ। কাল রাতে কী হল জানেন। একটা ক্যাসেট চালিয়ে গভীর রাতে মাইকেল জ্যাকসনের রক শুনছিলাম। শোনা এবং দেখা। দেখতে দেখতে মনে হল, এ লোকটা মূর্তিমান অ্যান্টি-কালচার, অ্যান্টি-এসথেটিকস, অ্যান্টি-মিউজিক। কী অশ্লীল সব জেসচার। এর জন্য দুনিয়া এত পাগল কেন? এ লোকটা সারা পৃথিবীর কালচারে পচন ধরিয়ে দিচ্ছে না কি? তার পর থেকেই মাথাটা এই লাইনে ভাবতে শুরু করে দিল।

মাইকেল জ্যাকসনেরও হয়তো কিছু গুণ আছে। আমরা তত বুঝি না বলে রস পাই না। কিছু না থাকলে লোকটা কি এত পপুলার হত?

অসহায়ভাবে হেমাঙ্গ ঠোঁট উল্টে বলে, কে জানে! আপনি ওর গান শুনেছেন এবং দেখেছেন কি?

হ্যাঁ। তবে আপনার মতো রেগে যাইনি।

ঝুমকি মুখ টিপে হাসল এবং হেমাঙ্গ অপ্রতিভ বোধ করতে লাগল।

এক একদিন তাদের এক এক বিষয় নিয়ে কথা হয়। যেমন পরের রবিবার বাঁ পায়ের স্বাভাবিকতা যখন অনেকটাই এসে গেছে তখন ঘরের মধ্যে হাঁটাহাটি করতে করতে হেমাঙ্গ বলল, আচ্ছা ঝুমকি নিশিপুর কেমন লাগে আপনার?

ঝুমকি বড় বড় চোখ করে বলল, নিশিপুর! কেন, বেশ তো জায়গাটা।

না, না, ওরকম দায়সারাভাবে বলবেন না। আমি জানতে চাই নিশিপুর একটা রোমান্টিক জায়গা কি না।

ঝুমকি একটু ভেবে বলল, হুঁ। রোমান্টিকই তো। কিন্তু মতলবটা কী? নিশিপুর যাওয়ার ইচ্ছে নাকি?

কতদিন যাইনি বলুন তো!

আগে হান্ড্রেড পারসেন্ট সেরে উঠুন। তারপর যাবেন।

না, আমার তাড়া নেই। আমার শুধু মনে হয়, নিশিপুরে নদীর ধারে আমার ঘরখানা হা-পিত্যেশ করে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

ঝুমকি একটু হাসল। বলল, নিশিপুর তো আর কেউ কেড়ে নিচ্ছে না।

কাতর চোখে ঝুমকির দিকে তাকিয়ে হেমাঙ্গ বলল, নিশিপুরের বাড়িটার জন্য আমার বড় মায়া। বুঝলেন!

জানি তো!

আমি ওখানে মাঝে মাঝে পালিয়ে যাই বলে সবাই আমাকে বকে। আমার মা'র তো ধারণা আমি সাধু হওয়ার তালে আছি। আমার পার্টনাররা বলে, আমাকে নাকি নিশি-তে পেয়েছে। চারুদি তো সবসময়ে যাচ্ছেতাই বলছে। অথচ দেখুন, নিশিপুর একটা মুক্তি, একটা ছুটি। আমার যে কী ভীষণ ভাল লাগে!

একটু বিবশ হয়ে গেল ঝুমকি। আবেগতাড়িত, ছেলেমানুষ এই লোকটিকে কি এইজন্যই তার এত ভাল লাগে? মানুষটির ভিতরে একটা গভীর ব্যাপার আছে, মুগ্ধতা আছে। টাকা, কেরিয়ার, সাফল্য একে এখনও

ছিবড়ে করে ফেলেনি।

ঝুমকি সামান্য নরম করে বলল, কয়েকটা নতুন ধরনের ফুলের গাছ লাগাতে হবে। গেট-এর ওপর একটা লতা। আর একটা তুলসীমঞ্চ।

হেমাঙ্গ অবাক হয়ে বলে, কিছু বললেন?

ঝুমকি হেসে ফেলল, বলছিই তো! আপনি শুনলেন না?

নিশিপুরের বাড়ির কথা?

হ্যাঁ। সাজিয়ে নিলে আরও সুন্দর হবে। মাটিটা তো খুব ভাল, কেন যে ভাল ভাল গাছ লাগাননি!

হেমাঙ্গর চোখমুখ আলো হয়ে গেল। আবেগকম্পিত গলায় বলল, উঃ, একটা ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছিল।

কিসের দুশ্চিন্তা?

চারুদি বলছিল, আপনি নাকি নিশিপুর পছন্দ করেন না।

চারুমাসি নিজেই করে না, তাই বলেছে।

আবার এক শনিবার দু'জনের দেখা হল হেমাঙ্গর বাড়িতেই। হেমাঙ্গ অনেকটাই সেরে উঠেছে। বাঁ পায়ের খোঁড়ানিটা একদম নেই। মন দিয়ে একসারসাইজ করে সে। গরম-ঠাণ্ডা কমপ্রেস নিচ্ছে। মালিশ করতে বিশেষজ্ঞ আসছে। শনিবার যখন ঝুমকি এল ম্যাসিওর লোকটি তখন বিদায় নিচ্ছে। ঝুমকিকে বলল, আর দিন পনেরো ম্যাসাজ করলেই হবে। অলমোস্ট নরম্যাল।

তাকে দেখেই আজ হঠাৎ খুব লজ্জা পেয়ে হেমাঙ্গ বলল, আমার মা আপনার জন্য একটা জিনিস পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ঝুমকি অবাক হয়ে বলে, তাই নাকি?

এতে কিন্তু আমার কোনও ভূমিকা নেই। আপনি কিন্তু কিছু মনে করতে পারবেন না।

হেমাঙ্গ ড্রয়ার থেকে একটা চ্যাপটা গয়নার বাক্স বের করে ঝুমকির হাতে দিয়ে বলল, এইটে।

ঝুমকি বাক্সটা খুলে অবাক হয়ে গেল। একটা সাবেক ভারী নেকলেস। লকেটে হিরের সেটিং। অন্তত বারো-চোদ্দ ভরি ওজন।

কিছু মনে করলেন না তো!

ঝুমকি জবাব দিল না। নেকলেসটা গলায় পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটু দেখল নিজেকে। তারপর হঠাৎ হেমাঙ্গর দিকে ফিরে বলল, কেমন দেখাচ্ছে?

হেমাঙ্গ সলজ্জ চোখে চেয়ে দেখে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, এসব কি আধুনিক মেয়েরা পরে?

আমি জিজ্ঞেস করেছি কেমন দেখাচ্ছে।

ভালই তো!

ঝুমকি ফের আয়নায় নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল একটু। এমন স্বাভাবিক হাবভাব যেন নেকলেস পেয়ে সে একটুও অবাক হয়নি। হেমাঙ্গর দিকে ফিরে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, একটু পরে থাকি নেকলেসটা?

হ্যাঁ। কিন্তু ওসব জিনিস পরে রাস্তাঘাটে চলাফেরা না করাই ভাল। ছিনতাইবাজরা পিছু নেবে।

নিক না। আজ আমি এটা পরেই বাড়ি যাবো।

হেমাঙ্গ সভয়ে বলল, সর্বনাশ!

যাবোই।

হেমাঙ্গ বলল, তাহলে আমি গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে আসব।

গাড়ি চালানো এখনও বারণ, খেয়াল আছে?

বারণ ছিল, এখন আর নেই। ডাক্তার কাল বলেছে এখন একটু-আধটু চালাতে পারি।

তার দরকার নেই। নেকলেসটা এখন এখানেই থাকবে।

হেমাঙ্গ নিজের নখ দেখছিল। খুব সলাজ ভাব। হঠাৎ মিনমিন করে বলল, আচ্ছা নর-নারীর সম্পর্কের মধ্যে গুরুজনদের এই যে ঢুকে পড়া এটা আপনার কেমন লাগে?

কেন, আমার তো বেশ ভালই লাগে। এরকমই হওয়া উচিত।

আপনি কিন্তু বেশ সেকেলে আছেন।

সেকেলেদের কি অপছন্দ নাকি?

না, তা বলছি না। বলছি, নরনারীর সম্পর্ককে তো আজকাল তাদের একান্তই নিজস্ব ব্যাপার বলে ভাবা হচ্ছে পৃথিবীতে। এর মধ্যে আত্মীয় বা গুরুজনদের কোনও ভূমিকা থাকার কথা নয়। সেটাকে ইন্টারফিয়ারেন্স বলে মনে করা হচ্ছে। তাই না?

আমার তা মনে হয় না। আপনার বুঝি মনে হয়?

হেমাঙ্গ খুব লজ্জিত হয়ে পড়ল। তারপর আরও মিনমিনে গলায় বলল, আসলে আমি একুশ শতকের জীবনযাত্রার প্যাটার্নটার কথা ভাবছি। কি কি থাকবে, আর কি কি থাকবে না। পৃথিবী তো আস্তে আস্তে লজ্জাহীন হয়ে যাচ্ছে। সুইডেনে এমন সব দৃশ্য দেখেছি যে আমার একসময়ে নরনারী সম্পর্ক নিয়েই একটা রিপালশন তৈরি হয়েছিল।

একটু কড়া গলায় ঝুমকি বলল, সুইডেনে আর কখনও যাবেন না।

হেমাঙ্গ একটু ভড়কে গিয়ে বলে, আমি মোটেই যেতে চাইছি না। কিন্তু বলছি রোমান্স জিনিসটা তো পৃথিবী থেকে ধীরে ধীরে লোপাট হয়ে যাচ্ছে। দেখুন না, এখন বাঙালি ছেলেমেয়েরাও কত ফ্রিলি মেলামেশা করে। তাদের মধ্যে সেই রোমান্টিক ভীতু-ভীতু ভাবটা আর নেই। দে টক ফ্রিলি অ্যাবাউট এভরিথিং..। অল সর্টস অফ সেক্রেট থিংস।

ঝুমকি একটু হাসল। বলল, আমি কিন্তু সেকেলে।

এ কথায় কে জানে কেন, আর এক দফা লজ্জা পেল হেমাঙ্গ।

হেমাঙ্গ এর পরের তিন দিন ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ল আর একটা সমস্যায়। সমস্যাটা হল রোমান্টিক প্রেমটা বিয়ের পরই উবে যায়। আর রহস্য-রোমাঞ্চ থাকে না, প্রেমিক-প্রেমিকারা হয়ে যায় সাদামাটা স্বামী-স্ত্রী এবং তখন সব রহস্যের সমাপ্তি। একটু ফাঁক, একটু দূরত্ব, একটু পিপাসা না থাকলে এই রহস্যময়তা টিকবে কি করে? এমন কোন উপায় আছে যাতে স্বামী এবং স্ত্রী হয়েও নারী-পুরুষ পরস্পরের কাছে প্রেমিক-প্রেমিকার মতো ভীষণ আকর্ষক থেকে যেতে পারে? এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে পারল না সে এবং ক্রমশ অস্থির হল।

সমস্যাটা অতঃপর টেলিফোনেই সে নিবেদন করল ঝুমকিকে। রাত দশটায়।

ঝুমকি বোধ হয় একটা হাই চাপবার চেষ্টা করে বলল, আচ্ছা এ ব্যাপারটা ভেবে দেখব।

সত্যি ভাববেন?

হুঁ।

এটা আপনার কাছেও কি প্রবলেম বলে মনে হয়?

এখন হচ্ছে।

আচ্ছা আর একটা কথা।

কী?

আমি দুদিন ধরে গাড়ি চালিয়ে অফিসে যাচ্ছি।

সাবধান কিন্তু। অনেক দিন অভ্যেস নেই।

না, কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। বলছিলাম, আগামী কাল অফিসের পর কি আপনাকে পিক-আপ করতে পারি?

পারেন।

তাহলে ছটায়? গোলপার্ক ন'নম্বর টার্মিনাসে।

তা কেন? বাড়িতে এলেই তো হয়।

একটু লজ্জা করছে।

কিছু লজ্জার নেই। কাল কী রঙের শাড়ি পরতে হবে?

নীল। কিংবা আপনার যা ইচ্ছে।

না, নীলই পরব।

তাহলে ছটায়?

হ্যাঁ। কিন্তু বাড়িতে আসবেন। মা বোধ হয় কাল আপনার জন্য কোনও খাবার তৈরি করবে।

আরে! উনি কি জানেন যে আমি ফোন করছি?

হ্যাঁ। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।

ছিঃ ছিঃ। লজ্জা করছে। আমি কি খুব বেহায়া?

মোটেই নয়। শুধু একটু রোমান্টিক।

যন্ত্রণাটা তবু হেমাঙ্গকে ছাড়ছে না। ফোন করার পর সে রাতে অনেকক্ষণ জেগে রইল। জীবনের এই একটা সময় কেটে যাবে। শেষ হবে বুকের দুরুদুরু। তারপর শুরু হবে পুরনো হওয়া। বহু বহু পুরনো, ব্যবহৃত, জীর্ণ হয়ে যাওয়া। এর কি কোনও মানে আছে?

শুক্রবার বিনা নোটিসে অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে হেমাঙ্গ চলে এল নিশিপুর। যেন হাজার বছর পর।

বাসন্তী খবর পেয়ে দৌড়ে এল, ওম্মা গো! দাদাবাবু যে!

আহ্লাদে সে আটখানা। ঘরদোর সাফ করাই ছিল। তবু আবার ঝেঁটিয়ে, মুছে, বিছানা পাততে পাততে বকবক করতে লাগল মেলা। বলল, এবার এমন কামাই দিলে ভাবলাম বুঝি দাদাবাবুর নিশিপুরের শখ মিটে গেছে। আর বুঝি এমুখো হবে না।

বাঁকা মিঞা এল আরও রাতের দিকে। একমুখ হাসি।

এলেন তাহলে? খবর সব শুনেছি।

কী শুনলে?

বিডন স্ট্রিটে গেয়েছিলাম গেল হপ্তায়! মা ঠাকরোন সব বলতেন।

হেমাঙ্গ লাজুক হাসল। মায়ের ওই দোষ। সব কিছু সবাইকে বলে দেয়।

বাঁকা মিঞা বলল, তা আমিও ঠাকরোনকে বললাম যে, পাত্রী খুব সরেস হয়েছে। আমরা দেখেছি কি না। একটু রোগার দিকে হলেও ভারি মিঠে চেহারাখানা। স্বভাবও ভাল। ঠাকরোন খুব খুশি।

বাসন্তী রুটি সেঁকতে সেঁকতে গোল গোল চোখ করে শুনছিল। হঠাৎ বলল, সে-ই তো গো দাদাবাবু, না? উঃ, সে বড্ড ভাল। ইস আমার যে কী আনন্দটাই হচ্ছে!

হেমাঙ্গ মৃদু হেসে বলল, আনন্দের চোটে রুটি পুড়িয়ে ফেলিস না।

অনেক রাত অবধি এই শীতে পারঘাটে বসে রইল হেমাঙ্গ। এখানে খুব শীত আর হাওয়া। হেমাঙ্গ গ্রাহ্য করল না এই শীত। মনের যন্ত্রণা নিয়ে বসে রইল চুপ করে। সামনে অন্ধকার উতরোল নদী। দামাল হাওয়া। একটু কুয়াশার মসলিনে ঢাকা আকাশ। এই বিপুল বিস্তারের সামনে একা, নির্জন, ছোট হয়ে বসে থেকে হেমাঙ্গ অনেক ভাবল। আকাশ-পাতাল। ভাবনার কোনও মাথামুণ্ডু নেই। পাগলামিতে ঠাসা। তার একটা জীবন শেষ হবে। শুরু হবে কি অন্যতর জীবন? কেমন হবে সেটা? একজনের সঙ্গে জোড় বাঁধা এমন কি ঘটনা একটা? তবু তার মন ভাল নেই।

উত্তাল বাতাস এসে তার সব এলোমেলো করে দিতে চায় যেন, এই বিপুল বিস্তার আর ওই অন্ধকার থেকে আসে প্ররোচনা : পালাও। কেন বাঁধা পড়বে সংসারে?

পালিয়েই এসেছে হেমাঙ্গ। ঝুমকিকে কিছুই জানায়নি। কাল শনিবার। ঝুমকি তার বাড়িতে এসে তাকে না-পেয়ে অবাক হবে খুব। বিরক্ত হবে? উদ্বিগ্নও কি? হোক। একটু হোক। হেমাঙ্গ কেন এত দায়ভার নেবে? সে কি মুক্ত মানুষ নয় একজন?

অনেক রাতে ঘরে ফিরে ঘুমলো হেমাঙ্গ। বেলায় উঠল। উঠেই মনে হল, ঝুমকি তার বাড়িতে এসে গেছে কি এতক্ষণে? কেমন হয়েছে তার মুখখানা হতাশায়?

বাসন্তী চা করে দিল, কী গো দাদাবাবু, অমন শুকনো মুখে কী ভাবছ?

একটু মাথা নেড়ে হেমাঙ্গ বলল, কিছু না।

শরীর খারাপ নয় তো!

হেমাঙ্গ একটু হাসল। বলল, আচ্ছা বাসন্তী, আমি কি একটু পাগল?

বাসন্তী হি হি করে হেসে ফেলে বলে, তোমার মাথায় পোকা আছে।

তাই?

হ্যাঁ। পোকা না থাকলে কেউ নিশিপুরে এসে পড়ে থাকে? বাঁকাচাচা বলে, তুমি নাকি মস্ত মানুষ। মেলা লেখাপড়া জানো, মেলা টাকা।

দুপুরের দিকে ঝুমকি যখন বাড়ি ফিরে এল তখন তার শুকনো মুখ দেখে অপর্ণা বলল, কী হয়েছে রে? ঝগড়া করেছিস নাকি হেমাঙ্গর সঙ্গে?

ঝুমকি অবাক হয়ে বলল, ঝগড়া করবার জন্য তাকে পাওয়া গেলে তো! কাল অফিস থেকে বেলা বারোটায় বেরিয়ে গেছে, আজও ফেরেনি। কাউকে কিছু বলেও যায়নি। ফটিকদা বলছে, ঠিক নিশিপুরে গেছে।

বড্ড পাগল। কী যে করি ওকে নিয়ে! ওর ঘাড় থেকে নিশিপুরের ভূত নামানো দরকার।

ঝুমকি মাথা নেড়ে বলল, না মা। ওটা ঠিক হবে না। যদি নিশিপুরে গিয়ে থাকে তো ভালই হয়েছে। হয়তো নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে গেছে। ওর ওটা দরকার ছিল।

অপর্ণা সামান্য উদ্বেগের গলায় বলল, হ্যাঁ রে, শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যাবে না তো। রশ্মির বেলায় যেমন করেছিল?

ঝুমকি মাথা নেড়ে বলল, জানি না মা। তবে এ ব্যাপারে ওকে কিছু বোলো না তোমরা।

অপর্ণা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ঝুমকির কোনও দীর্ঘশ্বাস নেই। একটু উদ্বেগ আছে মাত্র। হেমাঙ্গ যদি নিশিপুরে গিয়ে থাকে তাহলে চিন্তার কিছু নেই। আর কিছু না হলেই হল। তার শুধু ধৈর্য ধরে থাকা।

দুপুরের খাওয়ার পর সে চারুশীলার কাছে গেল।

মাসি, কেমন আছ?

চারুশীলা খুশি হয়ে বলল, আয় আয়। কতদিন আসিসনি। আজকাল খুব গর্চায় যাচ্ছিস, শুনছি।

লজ্জা পেয়ে ঝুমকি বলল, যাই মাঝে মাঝে।

যাস। ও যা পাগল, ঠিকমতো না বাঁধলে পরে ওকে নিয়ে মুশকিলে পড়বি। হ্যাঁ রে, কেমন বাসিস ওকে? খুব?

তা জানি না।

খুব জানিস।

শোনো, ও আবার কাউকে কিছু না বলে কোথায় চলে গেছে।

সর্বনাশ!

না না, অত ঘাবড়ে যেও না। ক'দিন খুব নিশিপুরের কথা বলছিল। বোধ হয় সেখানেই গেছে। কাউকে পাঠাতে পারো নিশিপুরে? বড্ড চিন্তা হচ্ছে।

একটু ভাবল চারুশীলা। তারপর বলল, কাউকে পাঠালে আবার তার ফিরে আসার অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে। তার চেয়ে একটা কাজ করি চল। আমরাই চলে যাই।

যদি রাগ করে?

পাগল! ওখানে গিয়ে হাঁ করে তোর কথাই তো ভাবছে। গেলে খুশি হবে দেখিস।

না চারুমাসি। থাক, ওকে একটু একাই থাকতে দাও বরং।

চয়নকে পাঠাতে পারি। কিন্তু সে তো কালকের আগে হবে না।

বুকের উদ্বেগ নিয়ে ভেবে ঝুমকি বলল, তাও থাক মাসি। পাঠাতে হবে না। আর একটা দিন যাক।

একটা দিন যে কী করে গেল তা ঝুমকি বোঝাতে পারবে না কাউকে। অনেক রাত অবধি তার বালিশ ভিজল চোখের জলে। বুকে অনেক ঢেউ উঠল অনিশ্চয়তার। মায়ায় ভেসে গেল বুক। এ কোন সৃষ্টিছাড়ার সঙ্গে জুটল সে?

শেষরাতে একটু ঘুমলো ঝুমকি। তাও বারবার ছিড়ে গেল তন্দ্রা। বুকের মধ্যে উদ্বেগের ডুগডুগি।

টেলিফোনটা এল সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ। তখনও ঝুমকির ঘুম ভাল করে ভাঙেনি। কিন্তু একটা প্রত্যাশা আর উদ্বেগ ছিল বলেই টেলিফোন বাজতেই সে উঠে গিয়ে ধরল।

হেমাঙ্গর গলাটা কি সামান্য কাঁপছে? বলল, কাল সারা রাত ঘুমোইনি। জানেন? কাল সারাটা দিন নিশিপুরে সময়টা যেন কিছুতেই কাটছিল না। কাল ছিল আমার জীবনের মন্থরতম দিন, অর্থহীন, রংহীন...কী বলব আপনাকে, বেশি বললে কাব্য হয়ে যাবে।

হুঁ।

রাগ করবেন না। বেচারা হেমাঙ্গর ওপর রাগ করবেন না কিন্তু। রাত তিনটের সময় পারঘাটে এসে বসে ছিলাম। তখন ভটভটি চালু হয়নি। একটা মেছো নৌকো ধরে ধামাখালি এসে ঝড়ের মতো গাড়ি ছেড়েছি। ঝড়ের মতো।

শুনে আমি মোটেই খুশি হচ্ছি না। একটা অ্যাকসিডেন্টের ধাক্কা এখনও সামলে ওঠননি, এর ওপর যদি আর একটা হত?

তবু জিজ্ঞেস করলেন না কেন এমনভাবে চলে এলাম?

ঝুমকি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, জিজ্ঞেস করার কিছু নেই। জানি। কিন্তু খুশি হইনি। ধীরেসুস্থেই আসা যেত।

আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? আমার কেন পুরনো হয়ে যাওয়াকে এত ভয়? কেবলই কেন মনে হয় আপনি একদিন পুরনো হয়ে যাবেন, আমিও যাবো। আমরা পুরনো হয়ে যাবো বলে এত ভয় পাই কেন?

ঝুমকি একটু হাসল, আমার নেকলেসটা আপনার কাছে রাখা আছে। খুলে দেখুন। কত পুরনো, তবু কী সুন্দর। যত পুরনো হবে তত দাম বাড়বে।

যেমন ভিন্টেজ কার? ভিন্টেজ মদ?

ওসব উপমা আমার পছন্দ নয়।

আচ্ছা। কিন্তু আপনার কথাটা আমি বুঝেছি। আজ কি একবার দেখা হতে পারে?

পারে।

আমি যদি যাই কেউ কিছু মনে করবে না তো!

আমি করব। আপনাকে আজ আর গাড়ি চালাতে হবে না। একদিনের পক্ষে যথেষ্ট পাগলামি হয়েছে।

তাহলে?

আমিই যাবো।

মেয়েরা ভীষণ দেরি করে।

আমার দেরি হবে না।

ঝুমকি ফোন ছেড়ে দিল। অবিশ্বাসের চোখে কিছুক্ষণ ফোনটার দিকে চেয়ে থেকে খুব ধীরে ধীরে ফোন রাখল হেমাঙ্গ। সে দৌড়োয়নি, পরিশ্রমের কাজও করেনি কিছু তবু কেন যেন তার হাঁফ ধরে যাচ্ছে আজ। তার মনে হচ্ছে, ঝুমকিকে তার একটা খুব জরুরি কথা বলার আছে। কিন্তু কথাটা সে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না।

ফটিক কফি নিয়ে এল। তার দিকে ভূত-দেখা চোখে চেয়ে রইল হেমাঙ্গ। গরম কফিতে অসাবধানে বড় চুমুক দিয়ে জিব পোড়াল এবং বিষম খেল। তার মনে হচ্ছে যে একটা অর্থহীনতার স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। ডুবে যাচ্ছে। সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

হাতঘড়িটার দিকে সন্দিহান চোখে চাইল সে। না, ঘড়িটা বন্ধ হয়ে যায়নি। তবে খুব ধীরে চলছে কি? বড্ড বেশি ধীরে?

সামনের বারান্দায় শীতের রোদ খেলা করছে। দুটো বেতের চেয়ার পাতা পাশাপাশি। এই বারান্দায় আজ থেকে চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর পর এরকম এক সকালে এক সাদা দাড়ি-চুলের বুড়োর পাশে একজন পক্বকেশী বৃদ্ধা বসে থাকবে কি? হাঁটুর কাছে দাঁড়ানো নাতি বা নাতনী? সবচেয়ে বড় কথা তখনও কি পরস্পরের জন্য কম্পিত হবে হৃদয়? দুজনেই থাকবে? নাকি মাঝপথে খসে যাবে একজন? কিংবা দুজনেই?

কে জানে! জীবন এত অনিশ্চিত বলেই না এত ভাল এই জীবনযাপন!

১১৯

ক্রাচে ভর দিয়ে হাসপাতাল থেকে যখন বেরিয়ে এল চয়ন, তখন সকাল। দিন দশেক এক নোংরা হাসপাতালের বন্দীদশা থেকে মুক্তি। সব ক্ষত সারেনি। মাথায় ব্যান্ডেজ আছে, বাঁ পায়ে প্লাস্টার। শরীরে এখনও অন্তহীন ব্যথা। বাইরে সকালটা একটু মেঘলা, বিষন্ন। শীতের বৃষ্টি পড়ছে অশ্রুর মতো টিপটিপ করে। স্যাঁতানো হাওয়া।

বাইরে বেরোনোর আগে একটু দাঁড়াল চয়ন। কোথায় যাবে? যাওয়ার জায়গা তার একটাই। দাদার বাড়ির চিলেকোঠা। কিন্তু সেখানে যেতে আজ তার বড় লজ্জা করছে। অনিচ্ছে হচ্ছে। চেনা ঘরটা আজ যেন তেপান্তরের মতো দূর।

একটু খুঁড়িয়ে চয়ন হাসপাতালের বাইরে এসে দাঁড়াল। শীত করছে। ভিজে যাচ্ছে। কিন্তু এই চেনা কলকাতা আজ বড় অচেনা ঠেকছে তার। কোথায় যাবে?

তার মান-অপমানের বোধ তেমন নেই। শুধু আছে পশুর মতো মৃত্যু ও যন্ত্রণার ভয়। আছে বেঁচে থাকার অদ্ভুত সাধ।

এবার অনিন্দিতার কথা মনে হয়েছিল তার। কিন্তু না, এভাবে সে-বাড়িতে হাজির হওয়া যায় না। সেটা হবে ওদের ওপর নিজেকে চাপিয়ে দেওয়া। তাকে ফেলবে না চারুশীলাও। কিন্তু এই অবস্থায় তাকে দেখে চারুশীলার প্রবল প্রতিক্রিয়া হবে। খুব লজ্জা করবে চয়নের।

সে কি শেষ অবধি সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হয়ে গেল? সে বুঝতে পারছে না। দুর্বলতায় তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। অনভ্যাসের ক্রাচ তার বগলে ভীষণ ব্যথা দিচ্ছে। তবু ভাগ্যিস পাড়ার পন্টু তার মৃত জ্যাঠামশাইয়ের দুখানা ক্রাচ দয়া করে পরশু দিয়ে গিয়েছিল তাকে। বলেছিল, এ দুটো তোমার লাগবে। বাঁ হাঁটু তো গুঁড়িয়ে গেছে।

কত কি ভেঙেছে চয়নের তার হিসেব কে রাখে?

আরও একটু হাঁটল চয়ন। হাঁটতে হাঁটতে ভাবল, সেই চিলেকোঠার ঘরে তার সর্বস্ব রয়েছে। না গিয়েই বা সে করে কি?

একদিন হঠাৎ মোহিনীর পড়ার ঘরে কৃষ্ণজীবন হাজির হয়ে বললেন, চয়ন, গ্রাম তোমার কেমন লাগে?

কৃষ্ণজীবনের গ্রাম সম্পর্কে অবসেশন আছে, চয়ন জানে। সে ভাবল বোধ হয় উনি নতুন একটা কিছু ভেবেছেন, তাই নিয়ে আলোচনা করতে চান। সে বলল, ভালই লাগে।

কৃষ্ণজীবনের পরের প্রশ্নটা অনেক বাস্তবঘেঁষা। বললেন, শুধু ভাল লাগলেই হবে না। গাঁয়ে গিয়ে থাকতে পারবে?

চয়ন অবাক হল। একটু ভেবে বলল, বোধ হয় পারব।

কৃষ্ণজীবন ভ্রু কুঁচকে তার দিকে চেয়েই কিছু চিন্তা করে বললেন, তোমার পক্ষে গ্রামের নিস্তরঙ্গ পরিবেশ ভালই হবে মনে হয়। কলকাতার প্রতি কোনও বিশেষ আকর্ষণ নেই তো!

না তবে আমি জন্মাবধি কলকাতায়।

একটু ভেবে দেখবে নাকি?

আমাকে কি গ্রামে যেতে হবে?

কৃষ্ণজীবন একটু হাসলেন। তারপর বললেন, আমার বাবা একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়াতেন। তখন বেতন খুব সামান্য ছিল। এখন তা নেই। সেই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিতে আমি আছি। সেখানে একজন অঙ্ক আর ইংরিজি পড়ানোর লোক চাই। চাকরিটা তোমার হতে পারে। করবে?

চয়ন একটুও না ভেবে বলল, করব।

ভাবতে সময় নিলে না। পরে যদি কলকাতার জন্য মন কেমন করে?

আমার তা করবে না।

ঠিক বলছ? তা হলে কাল সকালে তোমার চেক-বইটা নিয়ে আমার কাছে চলে এসো। যে টাকাটা তুমি আমাকে পৃথিবীর ভালর জন্য দিয়েছিলে সেটা আমি তুলিনি। ভেবেছিলাম ভাবাবেগের বশে দিচ্ছ, পরে হয়তো টাকাটা তোমার দরকার হবে। এবার টাকাটা সত্যিই দরকার।

টাকাটা তো আপনাকে দিয়েই রেখেছি। আপনি যা খুশি করতে পারেন।

যা খুশি নয়। টাকাটা তোমার চাকরির জন্যই দরকার। কত বিচিত্র ধরনের ঘুষ যে আজকাল চালু হয়েছে তার লেখাজোখা নেই। তোমার চাকরির জন্য ত্রিশ হাজার টাকা ডিম্যান্ড করছেন ওরা। তাও আমার খাতিরে কিছু কম করে ধরেই। ভাবতে পারো ছাত্রছাত্রীদের চরিত্র গঠনের পবিত্র প্রতিষ্ঠানে তোমাকে ঢুকতে হচ্ছে ঘুষ দিয়ে? অদ্ভুত দেশ!

কিন্তু ও টাকা আমার চাকরির জন্য খরচ হলে তো আমার দান করাটা বৃথা হল।

কৃষ্ণজীবন মাথা নেড়ে বললেন, না, টাকাটা পৃথিবীর উপকারেই লাগল বলে ধরে নিচ্ছি। তোমার প্রতিষ্ঠা হলে পৃথিবীর উপকার হবে বলেই আমি মনে করি। ঘুষটা মানতে পারছিলাম না। কিন্তু উপায় যখন নেই তখন শুচিবাই ত্যাগ করাই ভাল।

পরদিন কৃষ্ণজীবন তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে টাকাটা তুললেন। বললেন, আরও কুড়ি হাজার টাকা গ্রামের ব্যাংকে রেখে দিও। বিপদে আপদে কাজে লাগবে। আপাতত আমার কাছে থাক।

চয়ন ফিরে এসেই একদিন ছাদে চলে এল। হাবভাব বেশ কঠোর, কী রে? জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের দরখাস্ত জমা দিয়েছিলি?

চয়ন দাদার রুদ্রমূর্তি দেখে ভয় খেয়ে গেল। বলল, টাকাটা অন্য কাজে লেগেছে।

অয়ন যেন ভূত দেখছে, এমন চোখে চেয়ে বলল, তার মানে?

আমি একটা মাস্টারির চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছিলাম। ওরা টাকাটা চাইছে।

থম ধরে কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে অয়ন বলল, মাস্টারির চাকরি না মামদোবাজি?

না না, আমি কৃষ্ণজীবনবাবুকে টাকাটা দিয়েছি।

কে কৃষ্ণজীবন?

আমি তাঁর মেয়েকে পড়াই।

লোকটার ঠিকানা দে।

ঠিকানা! ঠিকানা দিয়ে কী হবে?

আমি খোঁজ নিয়ে দেখব তুই সত্যি কথা বলছিস কি না। যদি সত্যিও হয় তা হলে লোকটার কাছ থেকে টাকা ফেরত নিতে হবে।

কেন?

দেখ, তোর চালাকি আমি বুঝতে পেরেছি। পাছে টাকাটা আমাকে দিতে হয় সেই ভয়ে তুই ওটা সরিয়েছিস।

চয়ন হঠাৎ সাহস করে বলল, কিন্তু টাকাটা তো আমার। আমি কি টাকাটা ইচ্ছেমতো খরচ করতে পারি না?

হঠাৎ অয়নের চোখমুখের চেহারা পাল্টে গেল। খুনীর মতো ঠাণ্ডা গলায় বলল, তাই নাকি রে শুয়োরের বাচ্চা? দুধকলা দিয়ে এতকাল কালসাপ পুষেছি? টাকাটা তোর? আর তুই যে এতকাল বিনা ভাড়ায় এ বাড়িতে বসবাস করছিস! দে শুয়োরের বাচ্চা, বারো বছরের ভাড়া দে।

সে বউদির হাতে প্রতি মাসে আজকাল ঘরভাড়া বাবদ একশ টাকা করে দেয়, কিন্তু সে কথাটা বলতে তার সাহস হল না। সে চুপ করে রইল।

কিন্তু অয়ন চেঁচাতে লাগল, দে শালা, ভাড়া দে। বাপের জমিদারি পেয়েছিস? গায়ের জোরে থাকবি এখানে?

চয়ন একটাও কথা বলতে পারছিল না। এই গনগনে রাগে জল ঢালবে কে? কোন কথায় কাজ হবে? বরং চুপ করে থাকাই ভাল। সে শুধু সম্মোহিতের মতো অয়নের দিকে চেয়েছিল।

আশপাশের ছাদে দু-চারজন লোক জড়ো হচ্ছিল মজা দেখতে। অয়ন লোকলজ্জার তোয়াক্কা না করেই চিৎকার করতে লাগল, যা আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা। আজই যাবি। দেখি কোন কৃষ্ণজীবন তোকে রাখে!

বউদি এই সময়ে উঠে এসে অয়নকে একরকম টেনেই নিয়ে গেল নিচে। চয়ন অর্ধেক রান্না করেছিল। স্টোভ নিবিয়ে দিয়ে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে রইল। রাতে আর কিছু খেল না।

পরদিন অয়ন বেরিয়ে যাওয়ার পর বউদি এল।

চয়ন, তুমি কাকে টাকা দিয়েছ বলো তো!

কৃষ্ণজীবনবাবুকে।

তিনি কি ভাল লোক?

ভীষণ ভাল বউদি। তিনি বিশ্ববিখ্যাত লোক।

তোমার দাদার ধারণা তুমি হয় ঠগবাজের পাল্লায় পড়েছ না হলে মিথ্যে কথা বলছ। কিন্তু আমি বলি, টাকাটা সরিয়ে ফেলে ভাল কাজই করেছ। তোমাকে তো বলেইছি, শেয়ার মার্কেটের নেশায় ও এখন পাগল।

বউদি, দাদাকে তুমি বুঝিয়ে বোলো, টাকাটা আমার সত্যিই দরকার ছিল। আজকাল মাস্টারির চাকরি পেতে নাকি টাকা দিতে হয়।

জানি তো। আমার পিসতুতো ভাই শিবনাথকেও টাকা দিতে হয়েছে। তোমার কি চাকরি হচ্ছে?

হওয়ার কথা।

চাকরি হলে খুব ভাল হবে চয়ন।

আরও দুদিন পর চয়ন ছাদ থেকে শুনতে পেল দাদা আর বউদিতে কথা কাটাকাটি হচ্ছে। বউদি বলছিল, কেন ওর টাকা নেবে তুমি? বেচারা কত কষ্ট করে রোজগার করেছে, কেন সে টাকা তুমি শেয়ারে খাটাবে?

ও আমাকে অবিশ্বাস করে কোন সাহসে?

অবিশ্বাস আমিও করি। তুমি আমার বিয়ের হারটা বেচে শেয়ারে খাটিয়েছ। বলেছিলে দুটো হার দেবে। দিয়েছ? আমারটা গেছে যাক, ওরটা নেবে কেন?

ওরে মাগী! খুব যে দরদ! বলি অন্য কিছু আছে নাকি?

শুনে চয়নের শরীর অবশ আর মাথা বিহ্বল হয়ে গেল। অয়ন কি সত্যিই পাগল হয়ে গেল?

দোতলায় ঝগড়াটা তুঙ্গে উঠল, আবার ঝপ করে বন্ধ হয়ে গেল। এই বন্ধ হয়ে যাওয়াটাই অস্বাভাবিক। অয়ন বউদির গলা টিপে ধরেনি তো।

আশঙ্কায় কাঁটা হয়ে যখন ব্যাপারটা দেখতে নিচে যাবে বলে উঠে দাঁড়িয়েছে চয়ন, ঠিক তখনই সিঁড়ি দিয়ে রড হাতে দৌড়ে ছাদে উঠে এল অয়ন। দিগ্বিদিগভজ্ঞানশূন্য, রাগে অন্ধ, কাণ্ডজ্ঞানহীন।

জীবনে এত মার খায়নি চয়ন। অবিশ্বাস্য। এভাবে কেউ কাউকে মারতে পারে? এত জোরে? এত নিষ্ঠুরভাবে? পরম সৌভাগ্য তার যে, মারটা বেশিক্ষণ সহ্য করতে হয়নি তাকে, হাঁটুতে লাগতেই সে কাটা কলাগাছের মতো পড়ে গিয়ে জান্তব চিৎকার করছিল শুধু। যখন মাথায় লাগল তখন পরম শান্তির মতো মূর্ছা এসে নোংরা নিষ্ঠুর পৃথিবীটাকে যবনিকায় ঢেকে দিল।

জ্ঞান ফিরল পরদিন দুপুরে। আশ্চর্য মানুষের জীবনীশক্তি। তার মতো দুর্বল, ক্ষীণজীবী মানুষও যে কি করে মাথায় ওই রডের বাড়ি খেয়ে বেঁচে রইল কে বলবে। পন্টু এবং পাড়ার ছেলেরা অবশ্য বলেছিল, সে পড়ে যাওয়ায় রডটা মাথায় ঠিকমতো লাগেনি। শানের ওপর ঘষটা খেয়ে তারপর লেগেছিল বলে ইমপ্যাক্ট কমে গিয়েছিল। নইলে ঘিলু বেরিয়ে যাওয়ার কথা।

সে পন্টুকে বউদির কথা জিজ্ঞেস করেছিল।

পন্টু বলল, বউদিকে মেরেছিল টর্চ দিয়ে। মাথায় লেগে অজ্ঞান হয়ে যায়। তবে তেমন কিছু হয়নি। সামলে গেছে।

পুলিশ কেস?

পন্টু লাজুক একটু হেসে বলল, ওটা আর করিনি। শালা পুলিশের হাতে তুলে দিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। কোথায় কোন কলকাঠি নেড়ে খালাস পেয়ে যাবে। পাড়ার লোকই অয়নদাকে টিট করেছে।

মেরেছ তোমরা?

কিছু মনে কোরো না ভাই, ও চিজকে ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত। তার বদলে দু-চার ঘা আর বেশি কি? পাড়ার সিনিয়াররা এসে না পড়লে সেদিন অয়নও ইমার্জেন্সি কেস হয়ে যেত। দুটো দাঁত ভেঙেছে, আর কনুই

মুচড়ে গেছে। কিল চড় লাথি যা পড়েছিল তাতে দিন চার-পাঁচ শুয়ে থাকতে হবে। তুমি চাইলে পুলিশ কেস করতে পারো।

চয়ন গত দশ দিন যাবৎ ভেবেছে, এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর সঙ্গে যুঝবার ক্ষমতাই তার নেই। সে বড় নরম, বড় দুর্বল, বড় ভীতু। মাথার ওপর একটু ছাদের জন্য অয়নকে তার আর বিব্রত করা উচিত নয়। এবার তার চিলেকোঠা ছাড়ার সময় হয়েছে।

হাসপাতাল থেকে তার ছুটি হয়নি। মাথা স্ক্যান করার কথা বলেছে ডাক্তার। আরও কিছু মেরামতি কাজ বাকি।

কিন্তু হাসপাতালে আর থাকতে পারছিল না চয়ন। আজ সকালে কাউকে কিছু না বলে সে বেরিয়ে এল। কেউ আটকাল না। রুগীর ভিড়ে কে কাকে লক্ষ করে!

হাঁটতে তার কষ্ট হচ্ছে। শরীর কাঁপছে, ক্রাচে কষ্ট হচ্ছে। দম পাচ্ছে না। কোথায় যাবে ভেবেও পাচ্ছে না সে।

একটা হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে সে একটা ফোন করল কৃষ্ণজীবনকে। বিরল সৌভাগ্যই বলতে হবে। কৃষ্ণজীবনের ফোন সচল আছে এবং উনি কলকাতায় আছেন। নিজেই ফোন ধরলেন।

স্যার, আমি চয়ন।

কি খবর চয়ন? অনেকদিন আসোনি শুনলাম। শরীর খারাপ নাকি?

হ্যাঁ স্যার। শরীর খারাপ।

কী হয়েছিল?

আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

আজ শনিবার। আমার ছুটি। তুমি কি এখনই আসতে চাও?

চাই স্যার। কিন্তু আমার কাছে এখন গাড়িভাড়া নেই।

চলে এসো ট্যাক্সি করে। মোহিনীকে আমি দশ মিনিট বাদে নিচে পাঠাবো। সে ভাড়া দিয়ে দেবে।

মোহিনী নিচেই দাঁড়িয়ে ছিল। ক্রাচ-সহ তাকে নামতে দেখেই একটা আর্তনাদ করে দৌড়ে এসে তাকে ধরল, কী হয়েছে আপনার? ইস, এ যে সাঙ্ঘাতিক অবস্থা!

ম্লান একটু হাসল চয়ন। বলল, দিজ আর দি উন্ডস্ অফ লাভ। সেলফিস জায়েন্ট মনে আছে মোহিনী?

মোহিনীর চোখ ছলছল করছিল, আপনার কি অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল?

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেরকমই। না, ধরতে হবে না। আমি পারব।

তাকে দেখে অবাক কৃষ্ণজীবন বলল, এ কী কাণ্ড চয়ন?

ক্লিষ্ট হেসে চয়ন বলল, স্যার, সব কথা বলতে আমার লজ্জা করবে।

তার মানে কি চয়ন? কেউ কি তোমাকে মারধর করেছে? সে কি তোমার দাদা?

চয়ন মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

কৃষ্ণজীবন কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, তুমি হাসপাতালে ছিলে?

হ্যাঁ। আজ পালিয়ে এসেছি।

আমাকে আগেই জানাতে পারতে। তা হলে ব্যবস্থা হয়ে যেত। তুমি তো এখনও সুস্থ নও।

না স্যার, আমি ভাল আছি। আপনি আমাকে একটা গ্রামে পাঠাতে চেয়েছিলেন। এখন আমি সেখানেই চলে যেতে চাই।

কৃষ্ণজীবন একটু হাসলেন, যাবে, তার জন্য তাড়া নেই। কিন্তু আগে পুরোপুরি সুস্থ হওয়া দরকার। তোমার তো মনে হচ্ছে গায়ে এখনও জ্বর। শরীর কাঁপছে। মুখ সাদা। বোসো। আমাদের বাড়ির কাছেই একটা নার্সিং হোম আছে। একটা ফোন করে দেখি।

লাগবে না স্যার।

লাগবে।

কৃষ্ণজীবন ফোন করলেন। এবং ঘণ্টা খানেক বাদে একটা নার্সিং হোমের পরিচ্ছন্ন ঘরে চয়ন আশ্রয় পেল। একজন ডাক্তার তার ক্ষত পরীক্ষা করে বললেন, আপনি এখনও হসপিট্যাল কেস। কে আপনাকে রিলিজ করল?

কেউ না। আমি পালিয়ে এসেছি।

ডাক্তার একটু হেসে বললেন, এখনও কিছুদিন শুয়ে থাকতে হবে।

তা রইল চয়ন। তিনতলার নির্জন নিরিবিলি ঘরে বেশ শান্তিতে রয়ে গেল সে। দিন কয়েক বাদে কৃষ্ণজীবন এসে বললেন, তুমি মনের দিক থেকে প্রস্তুত তো চয়ন। এখনও ভেবে দেখ, গ্রামে থাকতে পারবে কি না। শহুরে আরাম কিন্তু সেখানে নেই।

চয়ন অত্যন্ত উদ্বেল হয়ে বলল, আমাকে কি ওরা নেবে স্যার?

নেবে। সে জন্য চিন্তা নেই। চিন্তা হল তোমাকে নিয়ে। তুমি পারবে তো?

পারব।

কৃষ্ণজীবন একটু চুপ করে থেকে বললেন, তুমি হয়তো শুনে খুশি হবে না, আমি তোমার দাদার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করেছি। আমাদের কথা হয়েছে।

অবাক চয়ন বলে, দাদার সঙ্গে?

হ্যাঁ। তুমি কি জানো যে পাড়ার লোকেরা তোমার দাদাকে খুব মার দিয়েছে?

জানি স্যার। আপনার সঙ্গে কোথায় দেখা হল?

আমি তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। ভয় পেও না, তারা আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি।

আপনি কেন এতটা করলেন? আমার দাদা আপনাকে অপমান করতে পারত।

তা পারত। কিন্তু সে এখন অনুতপ্ত। খুবই অনুতপ্ত। তার ছেলেপুলে নেই, স্বামী-স্ত্রীর সংসার। শেয়ার মার্কেটের নেশায় কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছিল। সে তোমাকে ও বাড়ি ফিরে যেতে বলেছে। কথা দিয়েছে আর কোনও গণ্ডগোল হবে না। তুমি এখন কয়েকদিন চুপ করে শুয়ে শুয়ে ভেবে দেখ, গ্রামে যাবে, না এখানেই থাকবে। এখনই জবাব দিও না। হাতে সময় আছে। হয়তো এ শহরেই কোনওদিন তোমার একটা চাকরিও হয়ে যেতে পারে। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করলে হয়তো অসম্ভব নয়। এ শহরের একটা সাঙ্ঘাতিক নেশা আছে! চট করে কলকাতাকে জীবন থেকে মুছে ফেলা যায় না।

আমি পারব স্যার।

তুমি তাজমহল দেখনি, না?

না।

আমি প্রথমবার যখন তাজমহল দেখতে যাই তখন ওরকম একটা মাচ পাবলিসাইজড ইমারত দেখে তেমন কিছু ইমপ্রেশন হয়নি। কিন্তু আশ্চর্য কী জানো? যখন দেখে-টেখে চলে আসছি তখন একটা ম্যাগনেটিক পুল যেন পিছন থেকে টানছিল। বারবার ফিরে তাকাতে হচ্ছিল তাজমহলের দিকে। অ্যাট্রাকশনটা যে কিসের তা আজও বুঝতে পারিনি। কলকাতার আকর্ষণ তাজমহলের মতো নয়। কিন্তু এই শহরেরও একটা মিস্টিরিয়াস অ্যাট্রাকশন আছে। লজ্জার কথা কী জানো, আমি এত গ্রাম-ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও কলকাতাকে কখনও অস্বীকার করতে পারি না। তাই বলছি, কলকাতাকে ডিভোর্স করার আগে ভাল করে ভেবে নাও।

বিচক্ষণ কৃষ্ণজীবন কতখানি সত্যি কথা বলেছিলেন তা তিন-চারদিন ধরে নানা কথা চিন্তা করার পর একটু একটু টের পেতে লাগল সে। হয়ত সত্যিই সে পারবে না অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাকতে। হয়তো বিষণ্ন লাগবে, একা লাগবে।

তাকে দেখতে এল চারুশীলা, ছেলেমেয়ে নিয়ে। দেখতে এল হেমাঙ্গ। দেখে গেল ঝুমকি আর অনু। রোজ দেখে যায় রিয়া আর তার ছেলেমেয়েরা। তারপর, দিন সাতেক বাদে তাকে আপাদমস্তক চমকে দিয়ে এক বিকেলে এসে হাজির হল দাদা আর বউদি।

অয়নের সামনের দুটো দাঁত উড়ে মুখটা ফোকলা আর বোকা বোকা দেখাচ্ছিল। কেমন একটা সংকুচিত ভাব। বউদি বিষণ্ন,ছলছলে।

প্রথমটায় কথা আসছিল না কোনও পক্ষেরই। শেষ অবধি অয়ন কষ্ট করেই বলল, আমিও তো মার খেয়েছি, দেখছিস! শোধবোধ হয়ে গেছে।

চয়ন শান্তভাবে বলল, আমি গ্রামে চলে যাওয়ার কথা ভাবছি।

সে যাওয়ার হলে যাবি। কিন্তু কাজিয়াটা মিটিয়ে নে।

বউদি বলল, ছাদের চিলেকোঠাটা একটু বড় করে ছাদ ঢালাই হবে। বুঝলে? তোমার জন্যই।

কেন বউদি?

আমরা অনেক ভেবে দেখেছি, তোমার দাদার বা আমারও আপনজন বলতে কেউ নেই। আমি মা-বাপের একমাত্র সন্তান। আমাদের কে আছে বলো তো! ছেলেপুলেও হল না। বয়স হয়ে যাচ্ছে।

আমি যদি কলকাতায় থাকি তা হলে ওই চিলেকোঠাতেই থাকতে পারব।

বউদি একটু হাসল, পারবে না। চিলেকোঠা ভেঙে ফেলে ঘর করা শুরু হয়ে গেছে। আজ ঢালাইও হয়ে গেল।

কেন করতে গেলে? কত খরচ!

বউদি মাথা নেড়ে বলল, তোমার জন্যই তো নয়। চিলেকোঠাটা এমনিতেই নড়বড়ে ছিল। ভেঙে করতেই হত। শোনো চয়ন, গ্রামে গিয়ে মাস্টারি করতে চাও কেন? সেখানে কোন উন্নতিটা করবে শুনি? টিউশনি করেই তো তোমার বেশ চলে যাচ্ছে।

তোমরা কি আমাকে চাও বউদি? আমার যে বিশ্বাস হতে চায় না। ভাবি, তোমাদের ঘাড়ে পড়ে আছি বোঝা হয়ে।

বউদি একটু বিষণ্ণ হয়ে বসে থেকে বলল, সবকিছুই বুঝতে একটু সময় লাগে। বয়সও লাগে। আমার আজকাল মনে হয়, তোমাকে আমাদের আর একটু বোঝা উচিত ছিল। তুমি বড্ড নিরীহ বলেই বোধ হয় তোমার ওপর অত্যাচারটা বেশি হয়।

অয়ন মিনমিনে গলায় বলল, কবে ছাড়বে এরা?

জানি না।

ঠিক আছে। খবর নেবো। এসে নিয়ে যাবো'খন।

দাদা বউদি চলে যাওয়ার পরই যেন সে বুঝতে পারল, সত্যিই সে কলকাতা ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকতে পারবে না। নিজের হাতের তেলোর মতো চেনা তার এই শহর। প্রতিটি রাস্তাঘাট, এ শহরের সকাল বিকেল, গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত এ সবই তার আজন্ম চেনা। এ শহর ছেড়ে কোথায় যাবে সে?

না, গ্রামে গিয়ে সে পারত না। বিচক্ষণ ও জ্ঞানী কৃষ্ণজীবনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে গেল।

ক্রাচে ভর দিয়ে যেদিন নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে এল সে, সেদিনই সে অবাক চোখে দেখল, শীতের সকালে কলকাতা যেন তারই অপেক্ষায় সেজে বসে আছে। সাজ কিছুই নয়, একটু রোদ, লোকজন, একটু ঠাণ্ডা হাওয়া। সেই পুরনো কলকাতাই। তবু যেন এক আবিষ্কারকের চোখে নতুন ভূখণ্ড দেখল চয়ন।

দাদা আর বউদি দু'ধারে, সে ধীরে ধীরে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠল।

১২০

"কলকাতা একটা অদ্ভুত শহর। এর নিশ্চয়ই নিজস্বতা কিছু আছে। এই শহরে যারা একবার বসবাস শুরু করে তারা আর অন্য কোথাও যেতে আগ্রহ বোধ করে না। গেলেও তারা কলকাতায় ফিরে আসার কথাই বোধ হয় ভাবে। কিন্তু আমার মনে হয় লন্ডন, নিউ ইয়র্ক বা মস্কোও কি তাই নয়? এইসব শহরের অধিবাসীরা কেউ আর কারও মতো নয়, প্রতিটি শহরেরই পরিবেশ ভিন্ন, ভিন্ন তাদের ভূগোল ও ইতিহাস, ভিন্ন তাদের জীবনযাত্রা। লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, মস্কো বা কলকাতা কেউ কারও মতো নয়। আবার এক অর্থে ওরা সবাই সেই মহানগরী—সেই নরক, যাকে হিন্দুশাস্ত্রে বলা হয় কুম্ভীপাক। যার মধ্যে হাজারো রকমের মানুষকে মিশিয়ে পাক খাওয়ানো হচ্ছে নানা জীবিকায়, নানা মতলবে, নানা আশা বা বঞ্চনায়!

"আমি এইসব শহরের চুম্বকের মতো আকর্ষণের কথা ভেবেছি। কিসের এই আকর্ষণ? জীবিকা? বৃহত্তর সুযোগ? নানা সম্ভাবনা? হ্যাঁ, এ সবই সত্যি। কিন্তু এর অতিরিক্তও কিছু আছে। মহানগর মানেই একটি জঙ্গম, চলিষ্ণুতা। এখানে সারাক্ষণ একটা জীবনের প্রবাহ চলেছে, চলেছে নানা কর্মকান্ড। এই জঙ্গমতাই কি আকর্ষণ করে মানুষকে? কলকাতায় যে ঠেলাওলা দিনরাত খেটে দেশে টাকা পাঠায় সেও কি অনুভব করে এই আকর্ষণ?"

এইভাবেই কৃষ্ণজীবন শুরু করল তার 'হোয়েন আই মিট মাইসেলফ্'। গ্রন্থটির বিষয় কলকাতা এবং কলকাতার সূত্র ধরে পৃথিবীর আরও নানা শহর।

এক জায়গায় কৃষ্ণজীবন লিখল, "সেদিন শীতের এক সন্ধ্যায় আমি একটা বিয়েবাড়িতে গিয়েছিলাম। হিন্দু বিয়ে। হিন্দুরা বর্ণাশ্রম মানে। এই বিয়ের পাত্র-পাত্রীরাও একই বর্ণের। তাছাড়া তাদের মধ্যে পূর্বরাগও ঘটেছে। খুবই সুখী বিয়ে। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। সেই বিয়েবাড়ি আর পাঁচটা বিয়েবাড়ির মতোই হুবহু একরকম। ভাড়া করা বিয়েবাড়ি সাজানো হয়েছে ফুল আর আলোয়। বেনারসী ও গয়নার ঝিলিক চারদিকে। মৃদু হাসি, আড্ডা, ক্যাটারারের পরিবেশিত সখাদ্য সবই যেন একরকম। শুধু অবাক কাণ্ড, পাত্র-পাত্রী ও নিমন্ত্রিত ইত্যাদিদের দেখে আমার যেন মনে হচ্ছিল, এটা এর আগে একশোবার দেখা একটা বিয়েরই রিপ্লে। এই পাত্র-পাত্রীরা যেন এর আগে আরও বহুবার বিয়ে করেছে, একই নিমন্ত্রিতরা এসেছে, একই ক্যাটারার একই খাবার দিয়েছে। সেই বিয়েবাড়িতে হঠাৎ আমার মনে হল, মানুষ কি সঙ্ঘবদ্ধভাবে নিজেরই পুনরাবৃত্তি করে মাত্র?"

লিখতে লিখতে কৃষ্ণজীবন আপন মনে হাসে, কখনও মাথা নাড়ে, কখনও দীর্ঘশ্বাস ফেলে। যে বিয়েবাড়ির কথা সে লিখছিল তা তার চোখের সামনে ভিডিওতে তোলা ছবির মতো ভেসে যেতে লাগল। ঝুমকিকে

একটা নীল বেনারসীতে চমৎকার দেখাচ্ছিল। পোশাক মানুষকে ততটা সুন্দর করতে পারে না, যতটা পারে অভ্যন্তরীণ আনন্দের আভা যখন বিকীর্ণ হয় তার অবয়বে। এক মনোরম গেট টুগেদারের মতো সেই বিয়ে কি বস্তুতই ছিল আরও পাঁচটা বিয়ের রিপ্লে? না, তা নয়। কৃষ্ণজীবন লিখবার জন্য লিখল। অনেক সময়ে আসল অভিজ্ঞতার ওপর একটা দার্শনিকতার প্রলেপ দিতে হয়।

সেই বিশাল বিয়েবাড়িতে অনেক আনাচকানাচ ছিল। যাকে ইংরিজিতে বলা হয় নুক্‌স্‌ অ্যান্ড করনারস্‌। একটা পামবীথি ছিল আর তার ওপাশে ছিল একটা ফুলের ঝোপ।

সে আর অনু বসেছিল পাশাপাশি।

অনু বলছিল, আচ্ছা বিয়েবাড়ি আপনার কেমন লাগে?

ভাল নয় অনু। আজকাল একদম ভাল লাগে না।

কেন ভাল লাগে না?

ভিড় আজকাল আমার সহ্য হয় না। গ্যাদারিং দেখলেই রিপালসন হয়।

যেখানে গ্যাদারিং-এ আমি আছি সেখানেও ভাল লাগে না?

তুমি খুব দুষ্ট আছ।

বলুন না!

তার হোয়েন আই মিট মাইসেলফ্-এ অকপট কৃষ্ণজীবন লিখল, "এ মেয়েটা কি আমার প্রেমিকা? এর সঙ্গে আমার বয়সের তফাত পয়ত্রিশ বা ছত্রিশ বছর। আমার মেয়ের বয়সী এবং তারই বান্ধবী। মোহগ্রস্ত দুখানা চোখে যখন আমার চোখের দিকে চেয়ে আকুলভাবে একটা মৃদু ও প্রশ্রয়ী হুঁ শুনতে চাইছিল মেয়েটি তখন আমার দুরকম কথা মনে হচ্ছিল। ইচ্ছে করলে আমি মেয়েটিকে এমন রূঢ় কথা বলতে পারি যাতে ওর মোহ ভেঙে খান খান হয়ে যায়। আবার ইচ্ছে করলে ও যা শুনতে চাইছে তাই বলতে পারি। আমি একজন পঞ্চাশোর্ধ্ব মানুষ একজন তরুণীকে কী বলব? আমি যেন এক সূক্ষ্ম ভারসাম্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। এ মেয়েটির প্রতি কি আমি আসক্ত? আমি কি অন্ধ, বিচারবোধহীন, মোহগ্রস্ত কামের শিকার? এ কি গড়ানে বয়সে তরুণী-হৃদয়ের জন্য দুর্মর আকাঙ্ক্ষা? নাকি নর ও নারী এরা কোনও বয়স বা সম্পর্কের শর্তে আবদ্ধ নয়? কিন্তু আমি বহুদিন ধরে পশ্চিমী সমাজের ব্যভিচার ও যৌনবিকৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার। আমার বরাবরই অপছন্দ বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক। তবু কেন এই মেয়েটির চোখের দিকে চেয়ে আমি কিছুতেই বলতে পারছি না, না!

"বরং আমি বললাম—খুব পুষ্পিত ভাষায় না হলেও—বললাম, তোমার কথা আলাদা। তোমার টানেই তো আসা।।

"এ আমি কী বললাম? এই অপরিণতবুদ্ধি, সবে বয়ঃসন্ধি পেরোনো, আবেগ-তাড়িত, উদ্বেল-হৃদয় মেয়েটি আমার প্রেমে পড়ে গিয়ে থাকলেও একদিন যে এর চৈতন্য ফিরবে। ফিরবে বাস্তববোধ। এ যে কত বড় ভুল করেছিল তা যেদিন বুঝতে পারবে সেদিন কি ছুঁড়ে আমাকে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেবে না?

"কিন্তু পূর্বাপর চিন্তা করে মানুষ ক'টা কাজই বা করে? মেয়েটি উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে চেয়ে, আমার একটা হাত চেপে ধরে বলে উঠল, সত্যি বলছেন? শুধু আমার জন্য?

“আমার বড় মায়া আর করুণা হচ্ছিল। কীই বা ওর বয়স, কত সম্ভাবনা পড়ে আছে ওর জীবনে। এই পঞ্চাশোর্ধ্ব একজন মানুষের মুখের সামান্য স্তোকবাক্য শুনে ওর ঠোঁটে ভাঙছে বাঁধভাঙা আনন্দের হাসি, নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে আবেগে, গর্বে ভরে উঠছে বুক।

“সে আমার হাত ধরে বসে রইল অনেকক্ষণ। বিয়েবাড়ি, যে কেউ যখন তখন এসে পড়তে পারে। কিন্তু তার পরোয়া নেই। এইটেই তো বেহিসেবী হওয়ার বয়স। কিন্তু আমার বয়স তো বেপরোয়া বয়স নয়। আমার হৃদয়ে আজ অনেক হিসেব-নিকেশ, অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। তবু তার হাতে হাতটি সমর্পণ করে বসে থাকা ছাড়া আর আমার কিছুই করার ছিল না।

“আমাদের এক বাঙালি কবি লিখেছিলেন, একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী। —বাস্তবিক আমরা সেই সন্ধেয় বোধ হয় অমরাবতীর খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম।

“সে বলল, আমি আপনাকে এত ভালবাসি, কিন্তু আপনি আমাকে একটুও না।

‘প্রেমিক প্রেমিকারা প্রলাপ বকেই থাকে। তাদের কথার কোনও মাথামুণ্ডু হয় না। হলে তা আর প্রেমের সংলাপ থাকে কি? আমিও সেই সন্ধ্যায় প্রলাপের স্রোতে ভেসে গেলাম কিছু দূর। বললাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও... আমিও...

“আমি—পঞ্চাশোর্ধ্ব—তিন ছেলেমেয়ের বাবা, দায়িত্বশীল একজন মানুষ কি করে ভেসে যাচ্ছি?

“উজানে ফেরে না নদী। সেই সন্ধ্যায় আমি তবু ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেছি আমার কৈশোরকালে। আচ্ছা, এই যে আমাদের বয়স হয়, এই যে আমরা সেকেন্ড-মিনিট-ঘন্টা-দিন-মাস-বছর পেরিয়ে আসি এটা আসলে কী? সময় বলে কিছু আছে? বয়স বলে কিছু? এ তো আমাদের মনগড়া একটা কল্পনা মাত্র। অ্যাবস্ট্রাক্ট। আসলে সত্যিই কি আমি মধ্যবয়স্ক? ওটা তো ধারণা মাত্র।

“মানুষ সবসময়েই চেষ্টা করে, তার যত দুর্বলতা, যত বৃত্তি-প্রবৃত্তির তাড়না, যত লোভ-লালসা সব কিছুকেই একটা যুক্তিসিদ্ধ ভিতের ওপর দাঁড় করাতে। সে হয়তো জানে, মনে মনে জানে, কাজটা ঠিক হচ্ছে না। তবু নানা পাল্টা যুক্তি দিয়ে সে সেটাকে সমর্থন করার পথ খোঁজে। ভেবে দেখলাম, মানুষ নিজের দুর্বলতাকে ছাড়তে চায় না। সে নিজে দুর্বলতাগুলিকে বড় ভালবাসে। ভালবাসে বলেই তাদের গৃহপালিতের মতো পুষে রাখে।

“সেই বিয়ের রাতটি এইসব কারণেই আমি ভুলব না। সেই রাতে বাড়ি ফিরে আমি ছাদে উঠে এসেছিলাম। শীতকাল। এত রাতে ছাদে কেউ নেই। আমি গভীর রাত অবধি ছাদে বসে থেকে এই মহানগরীর আলো ও অন্ধকার দেখতে দেখতে কত দূরে যে চলে গেলাম। মন—মনই তো সব মানুষের। সর্বোত্তম পুঁজিপাটা। মন দিয়েই মানুষ সব কিছু গড়ে নেয়। মনের মতো শক্তিশালী কিছুই হয় না। মধ্যবয়স্ক আমাকে সেই পরিয়ে দিতে পারে তারুণ্যের মুকুট। মনই রচনা করে প্রেম। মনই এই শহরের দেয়ালে দেয়ালে, আকাশে-বাতাসে এঁকে দেয় নানা বর্ণের ছবি। মনই ভালবাসে, ঘেন্না করে, রাগ-আক্রোশ-বিদ্বেষ-মোহ— সবই তো মন। সে এক দুষ্টু দামাল ছেলে, শাসন মানে না, আইন মানে না, সভ্যতা মানে না। এই দামালকে কি করে যে ঘরে ফেরাই!

“অনেক রাতে আমার ছোট ছেলে দোলন উঠে এল ওপরে। সে মাঝরাতে কখনও কখনও টয়লেটে যায়। তখন সে আমার ঘরে গিয়ে একবার আমাকে দেখে একটু আদর করে আসে। সে এখন আর ছোটটি নেই। বয়ঃসন্ধি পেরোচ্ছে। দোলনের সঙ্গে আমার একটা অদ্ভুত সম্পর্ক আছে। অন্য সকলের কাছে সে বেশ পরিণত

এক কিশোর। কিন্তু যখনই আমার কাছে আসে তখনই সে একেবারে শিশু হয়ে যায়। হয়তো মানুষের মধ্যে শিশু হওয়ার একটা জন্মগত প্রবণতা থাকে। আমারও আছে। দোলন আমার সঙ্গে গল্প করতে ভালবাসে। তার প্রিয় বিষয় মহাকাশ। আমরা মাঝে মাঝে টেলিস্কোপ দিয়ে গ্রহাবলোকন করি। কখনও তাকে নানা নক্ষত্র চিনিয়ে দিই। ওই অসীম শূন্যের প্রতি তার আকর্ষণ তীব্র। মাঝরাতে সে যখন ঘরে আমাকে খুঁজে না পেয়ে ছাদে উঠে এল তখন আমি ভূতগ্রস্তের মতো বসে আছি।

"বাবা, তুমি কি করছ?

"আমি হেসে বললাম, বসে আছি। আজ ঘরে মন টিকল না। তুমি ঘুমোওনি?

"ঘুমিয়েছিলাম। টয়লেট থেকে ফেরার সময় দেখলাম, তুমি ঘরে নেই। ভাবলাম নিশ্চয়ই ছাদে এসেছো। তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না বাবা?

"লাগছে। তবে কলকাতায় আর তেমন শীত কই?

"দোলনের সঙ্গে নেমে এলাম আমার ঘরে। দুজনে পাশাপাশি লেপের তলায় শুয়ে কিছুক্ষণ গল্প হল। তারপর দোলন ঘুমিয়ে পড়ল। আমার ঘুম এল না। আমি ওর আবছায়া মুখখানার দিকে চেয়ে ভাবছিলাম, আমি যদি ব্যভিচারী হয়ে যাই তাহলে দোলন আমাকে কী চোখে দেখবে। আমি যদি ওর মাকে ডিভোর্স করে মেয়ের বয়সী একটি তরুণীকে বিয়ে করে আনি তাহলে আমার এই রচিত সম্পর্কের সংসার মিসমার হয়ে যাবে না কি? ভেঙে পড়বে সব সম্পর্ক। মানুষ এইসব ভেবেই তো সংযত রাখে নিজেকে। এইসব মূল্যবোধ অনেক সময়ে মানুষকে রক্ষা করে। অনেক সময়েই করে না। এইসব ভাঙচুর, এইসব সম্পর্কের অবসানই সারা পৃথিবীতে পরিবার-প্রথার অবলোপ ঘটাচ্ছে। মানুষ হয়ে যাচ্ছে বিচ্ছিন্ন ও একা। নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মানুষও হয়ে পড়ছে অনাত্মীয়। এ এক বিষম পরিস্থিতি।

"গভীর রাতে সন্তানের মুখের দিকে আমি সম্মোহিতের মতো চেয়ে ছিলাম। আমার প্রাণাধিক প্রিয় এই পুত্রটি আমি আমার বলে জানি, তাই এত ভালবাসি। কিন্তু এমন যদি হত যে, আমি জানি না যে, পুত্রটি আসলে আমার নয়, হয়তো অন্য কারও ছেলে, নার্সিং হোমে রদবদল ঘটে গেছে। সে ক্ষেত্রেও একটি বিভ্রম কাজ করবে— পুত্রটি আমার— এই বোধ। তাহলে কি আমি আসলে নিজের বলে না ভাবতে পারলে কোনও কিছুকেই তেমনভাবে ভালবাসতে পারি না। অহং-ই কি মানুষের প্রীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে? আধুনিক মানুষ হয়তো এই অধিকারবোধ থেকে, দায় ও দায়িত্ব থেকে মুক্তি চাইছে। তাই তারা তুলে দিচ্ছে বিবাহ নামক বাহুল্য অনুষ্ঠানটিকে। বিলোপ করছে পরিবারপ্রথা। তারা চাইছে মানুষের সন্তান-সন্ততি আর পিতৃপরিচয় বহন না করুক। তার দরকার নেই! হয়তো এ সমস্তই পুরনো কুসংস্কারমাত্র।

"যদি পৃথিবী ক্রমে ক্রমে সেই মুক্ত সম্পর্কের সমাজে পৌছয় তাহলে কেমন হবে সমাজের চেহারা? কেমন হবে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক? কেমন হবে সন্তানের সঙ্গে পিতামাতার আত্মীয়তা? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমার খুব ভয় হল। আমি হঠাৎ দুহাত বাড়িয়ে আমার ছেলেকে আঁকড়ে ধরে বললাম, না না, এরকম হবে না। এরকম হতেই পারে না।

"আবার ভেবে দেখেছি, আমি আঁকড়ে ধরতে চাইলেই বা কি? সন্তানসন্ততিরা তো সত্যিই আর বাবা-মায়ের সম্পত্তি হয়ে থাকে না। তারা বৃহত্তর কর্মযজ্ঞে চলে যায়, বাবা-মা পড়ে থাকে। আগে শুনতাম, জাপান হচ্ছে শিশুদের স্বর্গরাজ্য—সেখানে শিশুদের সমাদর সবচেয়ে বেশি, যৌবনের কদর আমেরিকায়, আর বৃদ্ধের

সম্মান ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষে একসময়ে তাই ছিল। প্রবীণরা কখনও অবহেলিত ছিলেন না এখানে। পরিবারের কতা, সমাজের মাথা, পাঁচজনের পরামর্শদাতা। কিন্তু এখন কলকাতা এবং তার আশপাশে ক্রমেই বাড়ছে বৃদ্ধাশ্রম। অবহেলিত পিতামাতার জন্য এক একটা নির্বিকার আশ্রয়। সন্তানরা আর মা বাবার জন্য সময় দিতে পারছে না, নিতে পারছে না দায়িত্ব। আমিও তো পঞ্চাশ পেরিয়ে এলাম। বুড়ো বয়সের আর বাকি কী? আজ গভীর রাতে পুত্রের প্রিয় মুখশ্রী অবলোকন করতে করতে ভাবলাম, হায় মন, তুমি কত ভুলই না রচনা করলে, সৃষ্টি করলে কত কল্পমায়া! প্রগাঢ় বিষাদে ডুবে আমি রাত কাটিয়ে দিলাম এইসব লিপিবদ্ধ করে।"

বুকের মধ্যে আজকাল একটা কষ্ট হয় কৃষ্ণজীবনের। সেটা শারীরিক কষ্ট নয়। মানসিক। সবসময়ে একটা হাহাকার যেন ধ্বনিত হচ্ছে ভিতরে। আজকাল সে প্রায়ই চলে যায় বিষ্টুপুর। স্টেশনে নেমে হাঁটতে হাঁটতে দিগন্ত পেরোয়।।

বিষ্টুপুরে মা আছে। মায়ের কাছে চুপচাপ বসে থাকতে কিছুক্ষণ তার ভালই লাগে। সে আর শিশু কৃষ্ণজীবন নয়। বয়স্ক এক দায়িত্ববান পুরুষ। তবু কেন মায়ের কাছে এই বসে থাকা তার প্রিয়?

হোয়েন আই মিট মাইসেলফ্-এ সে লিখল, "আমার এই দুঃখী ও দরিদ্র মা আমাকে কিছুই আর দিতে পারে না। তবু এই যে তার ছায়ায় এসে কিছুক্ষণ বসে থাকি সে শুধু একটা কারণেই। পৃথিবীতে বোধ হয় একদিন মা ডাকটিরও অবসান ঘটবে। লন্ডনের এক বৃদ্ধ সাহেবের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। অশীতিপর সেই বৃদ্ধ আমাকে কেবলেই বলে, ওল্ড লন্ডন কত ভাল ছিল। সেই লন্ডন আর নেই। লন্ডনের গল্প করতে করতে সে প্রায়ই বলে, তার মায়ের মতো এমন চমৎকার পাই সে জীবনে আর কখনও খায়নি। সাহেবরা ভাবাবেগপ্রবণ জাত নয়। তারা মা বাবার স্মৃতি নিয়েও পড়ে থাকে না। কিন্তু কারও কারও হয়তো এখনও কিছু বোধ আছে। মা এক মহান ও আশ্চর্য মহিলা। একজন মহিলা যখন মা হয় তখনই সে সন্তানের কাছে এক মহার্ঘ ও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মানুষ। আমি এক দারিদ্র্যপীড়িত সংসারে জন্মেছি বলেই জানি, মায়েরা সন্তানের জন্য কত অনন্ত ত্যাগ করতে পারে। আমার এই মা সর্বদাই তার ভাগের খাবার থেকে এক মুঠো ভাত সরিয়ে রাখত আমার জন্য। আমার খিদে বেশি, অনেকটা পথ হেঁটে ইস্কুলে যাতায়াত করতে হয়, লাঙল চালিয়ে করতে হয় চাষবাস। মা আমার খিদে বুঝত। একমাত্র মায়েরাই যা বোঝে। মা জাতিই পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে কি?"

একদিন হেমাঙ্গর ফোন এল, কৃষ্ণজীবনবাবু, আমরা রোববার একটা গেট টুগেদার করছি। আসবেন?

রবিবার? বেশ তো।

আবার হুট করে বিদেশে চলে যাবেন না তো!

না। ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত লেখালেখির কাজ আছে। মার্চে যাবো।

এখন আপনি কী লিখছেন?

কৃষ্ণজীবন হাসল, আমার লেখার কিছু মাথামুণ্ডু নেই। আমি এখন যা লিখছি সেটা খানিকটা আত্মজীবনীর মতো। কিংবা তাও নয়। নাম দিয়েছি—হোয়েন আই মিট মাইসেলফ্।

দার্শনিক লেখা নাকি?

অনেকটা। লেখাটা কিছু হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না। শুধু রিফ্লেকশনস। ছোট ছোট ঘটনা। রিঅ্যাকশন।

কারা ছাপবে?

আমেরিকার পাবলিশার। ওরা বলেছে যা লিখব ছাপবে। সেই সাহসেই যা খুশি লিখছি।

লিখুন। হয়তো এটাও হবে মাস্টারপিস।

না, তা হবে না। তবে আমার ভিতরকার বিষন্নতার একটা চিত্র রেখে যাচ্ছি।

আপনি কি বিষন্ন মানুষ?

কে জানে! আনহ্যাপি, ইয়েস। কিন্তু মেলাংকলিক হয়তো নয়। এসব ভারী কথা থাক। হানিমুন কেমন হল?

আমরা গিয়েছিলাম নিশিপুর।

একটু ভেবে কৃষ্ণজীবন বলল, ওঃ, আপনার সেই গ্রাম?

হ্যাঁ। যেখানে আপনাকে আজও নিতে পারিনি। যাবেন একবার?

যাবো। নিশ্চয়ই যাবো।

হোয়েন আই মিট মাইসেলফ্-এ কৃষ্ণজীবন লিখল, ‘‘আমি আজকাল সুখী লোকদের ঈর্ষা করি কিনা কে জানে। এই যে হেমাঙ্গ আর ঝুমকি এক তরুণ দম্পতি, এদের ঝলমলে মুখ, আর উজ্জ্বল সম্পর্ক আমাকে সুখী করল না। ওদের গেট টুগেদারে গিয়ে আমার কেবলই মনে হতে লাগল, এ তো মায়া। এ তো রচিত সম্পর্ক। আঠা কই? জোড় কিসের? শুধু মন, শুধু বিভ্রম জুড়ে রেখেছে এদের। ‘‘

হোয়েন আই মিট মাইসেলফ্ লিখতে লিখতে মাঝে মাঝে ভীষণ অস্থিরতা বোধ করে কৃষ্ণজীবন। ঘরবন্দী থাকতে ইচ্ছে করে না। মাঝে মাঝে লিখতেও ইচ্ছে করে না। মাঝে মাঝে গভীর রাত অবধি ঘুম আসতে চায় না। মাঝে মাঝে মূক-বধিরের মতো আচরণ করে সে। দিনের পর দিন কথা বলে না কারও সঙ্গে। শুধু চুপচাপ বসে থাকে।

এক মধ্যরাতে রিয়া উঠে এল তার ঘরে। একটা ঢাকনা পরানো আলো-আধো অন্ধকার ঘরে কৃষ্ণজীবন বসে আছে পাথরের মূর্তির মতো। সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানরহিত। মাথার ভিতরে নানান চিন্তার সত্র পরস্পরের সঙ্গে নানা অন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করছে, পারছে না। অনেক ছিন্ন সূত্র ঝুলে আছে অর্থহীনতায়। কত ছোট টুকরো ঘটনার স্মৃতি গহীন আবছায়ার চেতনার ভিতর থেকে উঠে আসছে। কত তুচ্ছ অর্থহীন ঘটনা। রিয়া যখন ঘরে এল তখন সে একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা ভাবছিল। ছেলেবেলায় একবার হাতে একটা বাতাসা মুঠোয় নিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মাঝরাতে অজস্র পিঁপড়ে ছেঁকে ধরেছিল তাকে। পিঁপড়ের কামড়ে উঠে বসে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছিল সে। আলো জ্বেলে দেখা গেল, লাল পিঁপড়েয় ভরে গেছে বালিশ এবং আশপাশ। এই ঘটনার পর সে অবাক হয়ে ভাবত, পিঁপড়েদের খবর দিল কে? কি করে তারা টের পেল কোথায় বাতাসাটা আছে? পিঁপড়েরা কি রাতে ঘুমোয় না? তারা কি অন্ধকারেও দেখতে পায়? নিজের প্রশ্নে প্রশ্নে নিজেই জর্জরিত হত সে। আজও হয়।

রিয়া দু’বার ডাকবার পর কৃষ্ণজীবন ফিরে এল বর্তমানে।

কিছু বলছ?

এত রাত অবধি বসে আছ কেন? কী হয়েছে?

কৃষ্ণজীবন তটস্থ হয়ে বলে, কিছু হয়নি তো!

আজকাল এত অন্যমনস্ক থাকো, আমার ভয় করে।

চল্লিশোর্ধ্ব স্ত্রীর দিকে কিছুক্ষণ অপরিচিতের মত চেয়ে থাকে কৃষ্ণজীবন। কোনও কথা আসে না মুখে।

ধীরে ধীরে তুমি কিরকম হয়ে যাচ্ছ বলো তো! আগেও আনমনা থাকতে, চুপচাপও থাকতে। আজকাল যেন বাড়াবাড়ি। কী হয়েছে বলবে?

কৃষ্ণজীবন এবারও কথা বলতে পারল না। তার চোখের সামনে ভাসছে ঘোর বর্ষাকালের একটা দৃশ্য। তিনদিন ধরে তুমুল বৃষ্টি। স্কুল বন্ধ, বাজারহাট বন্ধ, উঠোনে হাঁটু জল। মা, বাবা, ভাই, বোন সবাই বারান্দায় বসে জল দেখছে। চুপচাপ। কারও মুখে কথা নেই। টিনের চালে শুধু বৃষ্টির ঝমাঝম। তারা চুপ করে বসে আছে। কিছু করার নেই। রান্নাঘর ভেসে গেছে বলে সেদিন রান্না হয়নি তাদের। পেটে মস্ত খিদে। তবু তারা নিশ্চেষ্ট হয়ে চুপচাপ বসে আছে। শুধু বৃষ্টি পড়ছে। শুধু বৃষ্টি পড়ছে। কেন মনে পড়ছে দৃশ্যটা? কেন এই অহেতুক স্মৃতি?

কৃষ্ণজীবন অসহায়ভাবে মাথা নেড়ে বলল, কি হয়েছে জানি না। কিছু জানি না।

রিয়া মুখোমুখি চেয়ারে বসল। হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করল হাতে। বলল, চুপচাপ থাকলে আরও বেশি চিন্তা হবে। ওগো, তুমি যা-খুশি কিছু কথা বলো। কথা বললে এই স্পেলটা কেটে যাবে।

কৃষ্ণজীবন বেদনার্ত চোখে রিয়ার দিকে চেয়ে থেকে শুধু মাথা নাড়ল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কাটবে না।

কেন কাটবে না? এত মানুষ, কই কেউ তো তোমার মতো এত ভাবে না। তুমি কেন এরকম হয়ে যাও? ছেলেমেয়েরা অবধি তোমার জন্য চিন্তা করছে। দোলন বারবার জিজ্ঞেস করে, বাবার কী হয়েছে মা? আমি বলি, তোমার বাবা বই লিখছে তো! তাই ভাবছে। কিন্তু আসলে তো তা নয়। তোমার ডিপ্রেশন চলছে। কেন গো?

বিস্ফারিত দুই চোখে রিয়ার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কৃষ্ণজীবন অস্ফুট গলায় বলল, অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা।

কি বলছ?

আজ যদি স্মৃতিভ্রষ্ট হই, কি করে বুঝবো যে তুমি রিয়া? বস্তুর চতুর্থ মাত্রা হল সময়। আইনস্টাইন বলেছিলেন। কিন্তু বস্তুর আরও কত মাত্রা আছে। পঞ্চম মাত্রা হল স্মৃতি, নহলে বুঝব কি করে কোনটা কী? ষষ্ঠ মাত্রা হল ইমাজিনেশন, পারসোন্যাল ভিশন। চারদিকে এই যে এত বস্তুপুঞ্জ দেখছো, সে সবই আমাদের কল্পনার রঙে রঙিন। নইলে কিছুই নয়।

রিয়া উঠে এসে কৃষ্ণজীবনের মাথাটা বুকে চেপে ধরল, এরকম করছ কেন? কেন এরকম সব অদ্ভুত কথা বলছ? আমি যে ভয় পাচ্ছি। কেন দূরে সরে যাচ্ছ?

রিয়ালিটিকে বুঝতে পারো রিয়া?

তোমার মতো করে কি পারি? আমি আমার মতো করে দেখি, বুঝি।

বুঝতে গেলে ইউ হ্যাভ টু লাভ, ইউ হ্যাভ টু লাভ। তুমি কি জানো মানুষ কত দেউলিয়া হয়ে গেছে ভালবাসায়? কত দেউলিয়া? ভাত কাপড়ে নয়, বস্তুপুঞ্জে নয়, মেধায় নয়, দেউলিয়া শুধু ভালবাসায়।

কেন ও কথা বলছ? এই যে আমি তোমাকে এত ভালবাসি এ কি মিথ্যে? তুমি ছাড়া আমাদের যে জগৎ অন্ধকার।

কৃষ্ণজীবন নিঃঝুম হয়ে চোখ বুজে রইল। তার চোখের কোল বেয়ে ঝরে পড়তে লাগল চোখের জল।

হোয়েন আই মিট মাইসেলফ্-এ সে লিখল, "বস্তুর পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম মাত্রাতেই থেমে থাকে না তার প্রকৃত পরিচয়। আমাদের অজ্ঞাত আরও বহু মাত্রাও হয়তো রয়ে গেছে। আমরা কতটুকু জানি? অবিরত নানা মতবাদ, নানা দর্শন মানুষকে আবিল করে দেয়। মানুষের মন সব সময়েই জারিত হচ্ছে অন্যের ভাবনাচিন্তার প্রভাবে। সে যা দেখে, যা বোধ করে, যা বোঝে সবই ওই সব মতবাদ ও প্রভাবের দ্বারা চালিত হয়ে। যদি মানুষের মন রিক্ত থাকত, যদি হাঁসের পালকের মতো ঝেড়ে ফেলতে পারত সব প্রভাব তবে কি সে বস্তুর স্বরূপকে ধরতে পারত? আমি তাই প্রথম মানবের কথা ভাবি। একমাত্র সে-ই অনাবিল চোখ ও মন নিয়ে দেখেছিল এই বস্তুবিশ্বকে। আমি আজ ঠিক তার মতো মন আর চোখ চাই।"

শীতের কবোষ্ণ সোনালি রোদে ভরে আছে মাঠঘাট। মাঝে মাঝে কৃষ্ণজীবন বেরিয়ে পড়ে হারা-উদ্দেশ্যে। পায়ে হেঁটে হেঁটে দূরদূরান্তে চলে যায় অচেনা গাঁয়েগঞ্জে। কখনও অচেনা চাষীবাড়িতে ঢুকে যায়। বসে, গল্প করে। কখনও গাছের মাথায় বসে-থাকা একটি পাখির দিকে চেয়ে থাকে। কখনও হাঁ করে চেয়ে দেখে, বাঁশগাছের ডগা দুলছে উত্তুরে হাওয়ায়। এ পৃথিবী তার বড় প্রিয়। বড় প্রিয় এই মনুষ্যজীবন। মুখ নয়, তার মন নানা কথা বলে যেতে থাকে। বলে, ভালবাসা ছাড়া আর কী আছে মানুষের? মানুষ কেন ভুল মুক্তির খোঁজে নষ্ট করে ফেলছে এই মহার্ঘ জীবন?

"শীতের দুপুরে আমি বকুলপুর নামে একটা গাঁয়ে এক তাঁতঘরে বসে দেখছিলাম, অনাত্মীয় সুতো কেমন টানা-পোড়েনে পড়ে পরস্পরের সঙ্গে রচনা করছে সম্পর্ক। ফুটে উঠছে নকশা। তৈরি হচ্ছে ঘনবদ্ধ কাপড়। এই তো, কী সুন্দর একটা অভিজ্ঞতা! টানা-পোড়েন, টানা-পোড়েন। দৃশ্যটা আমার এত ভাল লাগল যে কী বলব! মনটা ভরে গেল।

"ভালবাসা এক অনুশীলনসাপেক্ষ ব্যাপার। ভাবের ভালবাসা বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। আমার জল-বসন্ত হয়েছিল বলে আমার এক প্রিয় বন্ধু আমার বাড়িতে আসা বন্ধ করে দিয়েছিল। আর আমার মা জেগে বসে থাকত আমার শিয়রে। দিনরাত সেবা করত। যাকে ভালবাসো তার জন্য কিছু করো। তাকে কিছু দাও। রোজ দাও। প্রতিদান চেও না।"

ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব স্কুলের হস্টেলে একদিন গোপালের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল কৃষ্ণজীবন। তাকে দেখে কী আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে গেল গোপালের মুখ। ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে জড়িয়ে ধরল তাকে। কৃষ্ণজীবন তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। গোপালের বুকটা ধকধক করছে আনন্দে।

কেমন আছিস রে গোপাল?

গোপাল তার মুখের দিকে সম্মোহিতের মতো চেয়ে রইল। মুখে হাসি, কেবল হাসি। অনেকক্ষণ ছিল কৃষ্ণজীবন। গোপালের জন্য চকোলেট, বিস্কুট, টি-শার্ট এনেছিল। দিল। যতক্ষণ ছিল কৃষ্ণজীবন, গোপাল তার মুখ থেকে চোখ সরালই না।

ছেড়ে আসতে বড় কষ্ট হচ্ছিল কৃষ্ণজীবনের। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, ভাল থাকিস। আমি আবার আসব।

ছুটিতে বিষ্টুপুর গিয়ে গোপাল তার দাদুকে খুঁজেছিল এ-ঘর ও-ঘর। নানা শব্দে, ইশারায় জানতে চেয়েছিল দাদু কোথায়। মৃত্যু কী জিনিস তা সে আজও জানে না। তাকে বোঝানো যায়নি। যতদিন ছিল ততদিন দাদুকে খুঁজে বেড়াত সে। এ-ঘর ও-ঘর সে-ঘর।

দৃশ্যটা হোয়েন আই মিট মাইসেলফ্-এ বর্ণনা করল কৃষ্ণজীবন। লিখল, "আমিও আজ ওই মূকবধির বালকটির মতো খুঁজে বেড়াচ্ছি এ-ঘর ও-ঘর সে-ঘর। খুঁজতেই হবে। খোঁজাই যে আমার কাজ। খোঁজাই যে জীবন।...."

মাঝরাতে রিয়া ফের উঠে এল।

ঘুমোওনি?

কৃষ্ণজীবন তার বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থেকে বলল, না।

রিয়া কাছে এল। নরম করে চেপে ধরল নিজের বুকে কৃষ্ণজীবনের মাথা।

শুয়ে পড়ো না গো! একটু বিশ্রাম নাও।

ঘুম আসবে না।

এসো আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিই।

কৃষ্ণজীবন রিয়ার মুখের দিকে শিশুর মতো চেয়ে থেকে বলল, আজ কাঁদব। আজ ঘুমোবো না।

ও মা! ও কী কথা? কাঁদবে কেন? ওরকম বোলো না, ভয় পাই।

কৃষ্ণজীবনের মুখ নয়, মন কথা বলছিল। বলছিল, এসো আমার সঙ্গে তুমিও কাঁদো, এসো কান্নায় একাকার হয়ে যাই। একাকার হয়ে যাই।